

সাদাকে সাদা ও কালোকে কালো বলার একমাত্র সহর্ষ মাসিকপত্র

আগস্ট ২০০২

৩য় বর্ষ ১১ সংখ্যা

CUK-H4831-3-P36081

পত্রপাঠ

বিদায় নেবার জন্য নয়

দাম : ৮ টাকা



কাউকে হাসানোর কাগজ
কাউকে ফাঁসানোর কাগজ

সান্মী গোপাল



পত্রপাঠ বরণীয়
শারদীয় ২০০২ পত্রপাঠ

সর্বঘণ্টে গণেশজি

সাদাকে সাদা ও কালোকে কালো বলার একমাত্র সহর্ষ মাসিকপত্র

মনোজ বসুর অপ্রকাশিত রচনা এবং

সন্দোষ কণ্ঠস্বয়ং—

নীলেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ● সুশীল গাঙ্গোপাধ্যায় ● নবনীতা দেব সেন ● সমরেশ মজুমদার
● দিব্যেন্দু পালিত ● সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত ● শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় ● শঙ্করলাল উদ্যোতম
● সিনাকী ডাডুড়ী ● বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় ● ধুবজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায় ● শৈবাল
গুপ্ত ● কৃষ্ণ বসু ● সুরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ● স্বপ্নময় চক্রবর্তী ● রাধাপ্রসাদ ঘোষণা
● সুশান্ত গাঙ্গোপাধ্যায় ● ওম্বিকা গুপ্তা ● কৌশিক রায় ● দিব্যেন্দু দাস ● বিনোদ
রায়চৌধুরী ● শেখর ভাটসেন এবং.....ডাবতেও পারবেন না।

(মহালয়ার পরপরই হাতে হাঁড়ি ফাটবে)

দাম—মাত্র ২৫ টাকা

আজই বলে রাখুন হকারকে। বাধ্য করুন গ্রনে দিতে।

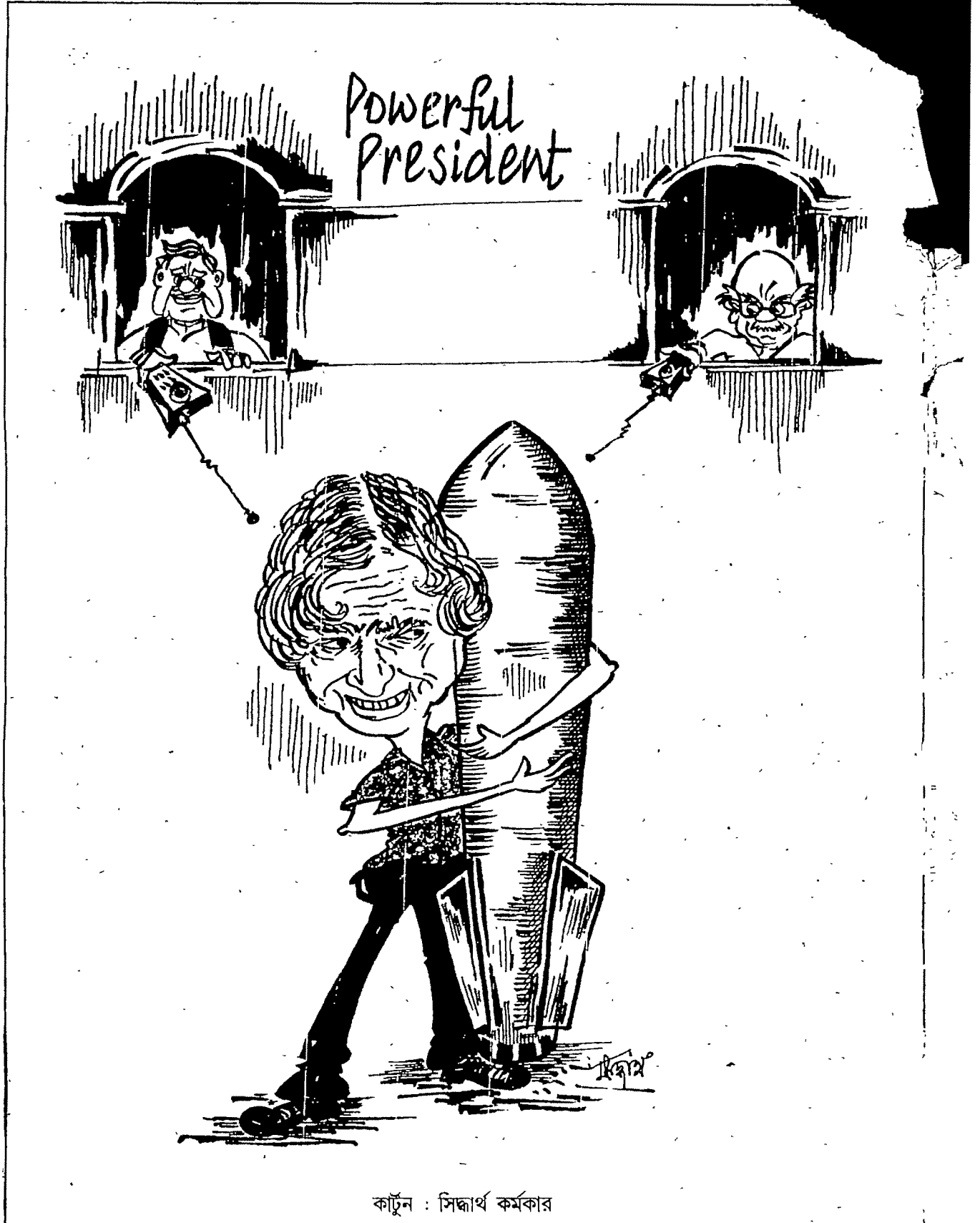
পরিবেশক : পাতিরাম বুক স্টল (কলেজস্ট্রিট জংশন)

শ্যামল বুক সেন্টার (কলেজস্ট্রিট টেমার লেনের মুখে)

কাউকে হাসানোর কাগজ কাউকে ফাঁসানোর কাগজ

কিনলে হাসবেন না কিনলে ফাঁসবেন। পঁচিশ টাকা বাঁচাতে গিয়ে লাখ টাকার মজা মাটি/
বিবেচনা আপনার। হতেই পারে শেষ অবধি কঠা-গিল্লি ফাটাফাটি। আচ্ছা, নমস্কার!!

খবর আহমেদ কর্তৃক ১০ জে, ফার্ম রোড (গ্রাউণ্ড ফ্লোব), কলি-১৯ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন - ৪৪০-৩৮০৩ (সকাল ৮-১০টা, বাস্তি ১০টা পর)
 স্পাদকীয় দপ্তর : (সন্ধ্যা ৫-৩০ থেকে ৮-৩০) ১০ বি, ফার্ম রোড, কলি-১৯, মুদ্রণ : দেবী সারদা প্রেস, ৩০এ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলি-৯



সম্পাদকীয়



গোপাল ভোগ

গোপাল অতি সুবোধ বালক। গোপাল বড়বাবু হইয়া চেয়ারে বসিয়া থাকে, খুনি আসামি লক আপ হইতে গট্‌গট্‌ করিয়া বাড়ির দিকে হাঁটে। গোপাল ভোট চাহিয়া গদি দখল করে, তৎপরে তাহার মস্তকে কাঁঠালটি রাখা হয়, গোপাল উচ্চবাচ্য করে না। গোপাল বড় বাড়ির বড় কুর্সিতে আসীন হয়, কিন্তু যাবতীয় ছকুম আসে অন্যত্র হইতে। গোপাল কাগজের সম্পাদক হয় কিন্তু তাহার বকলমায় অন্যের বাণী ফোটে। গোপালের বড় সুখ। তাহার বাড়ি হয়, গাড়ি হয়, সুখের উপর সতরঞ্চি এবং তাহার উপর চেয়ার-বেঞ্চিও হয়। ইহা সবাই দেখিতে পায়। যাহা দেখিতে পায় না তাহা হইল—গোপালের গলদেশে একটি জ্বরদন্ত বকলস হয় এবং তাহাকে সর্বদাই পিছন ফিরিয়া অদৃশ্য আদেশের প্রতীক্ষা করিতে হয়। আর যখন হাঁড়িটি ফাটে, গোপালচন্দ্র পায়ের তলায় মাটি খুঁজিয়া পায় না, সবিস্ময়ে পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখে—তেপান্তরের মাঠ। রক্ষা করিতে কেহই নাই। গোপালের ভোগ সবাই খায়। দুর্ভোগ খাইতে হয় একা তাহাকেই। আমাদের নিকট গোপাল-দুর্ভোগের বিপুল স্টক। পাঠক, শেয়ার করিবেন কি?

টীকা নিষ্প্রয়োজন

সন্টলেক না নোনাখাল?

ভিক্টোরিয়া না রাসমণি?

ভূগোল বদলায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা রাজনৈতিক দুর্বিপাকে দেশের ভৌগোলিক কাঠামো অনবরতই পাঁটায়। তুবার যুগে পৃথিবীর যে আকৃতি ছিল আজকের পৃথিবীর সঙ্গে তাব কোনো মিল নেই। হিমালয় যে হিমালয়, সে-ই তো সাগরগর্ভে ছিল কতকাল। তারপর একদিন ফুঁড়ে বের হল উত্তর ভারতে। ভারত অবশ্য তখন ভারত ছিল না। আর্যাবতের পশ্চিমই হয়নি তখন।

ইতিহাস কিন্তু বিবর্তনশীল হলেও পরিবর্তনশীল নয়। যা একবার ঘটে গেছে তাকে পুঁছে বা মুছে ফেলা যায় না। অনেক দেশেরই লজ্জাপর্বের ইতিহাস আছে। ভারতবর্ষেরও আছে, বাংলারও আছে। ইংরেজ সাম্রাজ্যের ঔপনিবেশিক অমর্যাদা ভারতকে দহন করেছে। সেটা যতই লজ্জার হোক সেটা সত্য, সেটা ইতিহাস। তাকে অস্বীকার করা যায় না। রাস্তাঘাট, ঘরদোর, পাড়া বা গাঁ, শহরের নাম রাতারাতি বা দিনদুপুরে 'এফিডেবিট করে বদলিয়ে সেই সত্যটাকে মিথ্যে করে দেওয়া যায় না।

ক্যানিং স্ট্রিট, ব্রাবোর্ন রোড, ওয়েলেসলি স্ট্রিট, রেড রোড, কর্নওয়ালিস স্ট্রিট বা হ্যারিসন রোড-এর নাম পুঁছে ফেলাই বাংলার ঔপনিবেশিক ইতিহাস মুছে যাবে না। ১৭৫৭ থেকে ১৯৪৭-এর ফিরিস্তি শোষণ বাংলার ইতিহাস থেকে উঠে যাবে না অষ্টালনী মনুমেন্টকে শহীদ মিনার বলে ঢাকঢোল বাজালে। ক্যালকাটাকে কচুকাটা কবলে তো জব চার্নককে ঠনঠনে কালীবাড়িতে নিয়ে গিয়ে বলি দেওয়া যাবে না। কলকাতার ঔপনিবেশিক ইতিহাসে চার্নক-এর স্থান থেকেই যাবে।

এই ক' বছর আগেই 'ক্যালকাটার দু'শ না তিন'শ বছরের জন্মবার্ষিকী সরকারি সমর্থনেই খুব ঘটা করে হয়ে গেল। তারপর পাঁচটা বছর না যেতেই 'ক্যালকাটার' নামই মুছে ফেলা হল সরকারি উদ্যমেই। বাস্তাঘাটের নাম বদলানোব পালা শুক হয়ে গেছে এব-ও অনেক আগে থেকেই। সাহেব-সুবোদের নামের বদলে দেশের গণ্যমান্য মানুষদের সব রাস্তা জুড়ে দাঁড় কানো হয়েছে। কিছু কিছু, ঠিক সাহেব না হলেও, অন্য দেশের বিশেষ নেতাদেরও অবশ্য স্থান দেওয়া হয়েছে। যেমন লেনিন, হো-চি-মিন প্রমুখ। মাও সে তুং, স্ট্যালিন, ফিদেল কাস্ত্রোকে অবশ্য এখনো কলকাতার রাস্তায় চোখে পড়েনি। পড়ার সম্ভাবনা কিন্তু রয়েই যাচ্ছে।

প্রগতিশীল সরকার ও বিদ্রোহী বাস্তালির কাছে একটা অনুযোগ আছে। অষ্টালনী মনুমেন্টের তো নতুন নামকরণ হল, কিন্তু ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল? সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া তো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেব মুকুটমণি হয়ে উপনিবেশ ভারতের ওপব বহু বছর গিম্পিনা করে গেছেন। তিনি তো ঔপনিবেশিকতার



প্রধান প্রতিভু ছিলেন। তবে তিনি আজ কোন অধিকারে কলকাতার বুকের ওপর মর্মর ভাস্কর্যে ভাসব হয়ে থাকবেন? কেন, আমাদের দেশে কি রানীর কোনো কমতি ছিল? দুর্গাবতী, ঝাঁসিব রানী, রিজিয়া বেগম, চাই কি খোদ কলকাতার বাসিন্দা জানবাজারের রানী রাসমণি তো হাতের কাছেই ছিলেন। ব্রাবোর্ন রোড যদি ব্রৈলোক্য মহারাজে নামান্তরিত হতে পারে তবে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালই বা কেন বানী রাসমণি মিনার বা মেমোরিয়াল হতে পারবে না?

আবার দেখুন, মর্ত্যের কলকাতায় যখন সাহেব-সুবোদের নাম সব মুছে ফেলা হচ্ছে, পাতাল কলকাতায় নতুন কবে রং-তুলিতে ফিরিস্তিদের অভিষেক করা হচ্ছে। পাতালরেলের এস্প্রানেড স্টেশনের দেয়ালে ঔপনিবেশিক কলকাতায় সাহেব-মেমদের জীবনযাত্রার চিত্র-বিচিত্র কাহিনী ফুটিয়ে তোলা হয়েছে!

সবই কেমন যেন উন্টোপাণ্টা। নতুন নতুন যে সব বসতি সরকারি কৃপায় কলকাতার চারপাশে গড়ে উঠছে, তাদের শুভনাম না কী যেন বসে। তা সবই ইংবিজিতে—গল্ফ গ্রীন, লেক টাউন, লেক গার্ডেন, সন্ট লেক

কেন, নোনাদোবা বা নোনাখাল বললে কি জায়গাটা নেটিভ-নেটি শোনাট? অথচ ইংরেজদের আমলেও নোনাপুকুর, পাতিপুকুর নিয়ে দাঁড় ছিলাম আমরা। কেউ কোনোদিন 'সন্টপশু' থাকে বলে তখন শুনি

—বুনো রামনাথ

পত্রপাঠ জবাব

জবাব দিচ্ছেন : দ্বিতীয় সুগ্রীব



- সংস্কৃতি আর সংস্কৃতয় কোনো মিল আছে?

—অদিতি পণ্ডা, হলদিয়া

- হ্যাঁ, এক জায়গায়। দুটোরই সলিল সমাধি হয়েছে।

- আব্দুল কালাম রাষ্ট্রপতি হবার পর নিশ্চয় আর বোমা বানাবেন না।

—বিজয় চক্রবর্তী, বেহালা

- কী আশ্চর্য, ওই বোমা বানাবার ক্ষমতাই তো তাঁকে রাষ্ট্রপতি বানাতে।

- 'গায়ে মানে না আপনি মোড়ল' সংখ্যায় বন্দনা রায়ের লেখাটির কিছু শব্দে শালীনতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। প্রতিবাদ রইল।

—মনতোষ গায়ের, আরামবাগ, হুগলী

- পরের লেখাটি তাঁকে 'নিঃশব্দে' লিখতে বলব। প্রতিশ্রুতি রইল।

- জুলাই '০২ সংখ্যায় বর্ষফর্তির যা ছবি দেখলাম। পাওনাদাররা গ্রাণ্ডাতে আসছে। সম্পাদক উর্ধ্বশ্বাসে দপ্তরে সৈদ্যোচ্ছেন দোর দিতে। কী দরকার এমন কাগজ চালানোর?

—মাসুদ খান, মালদহ

- আপনি ভাবছেন মার খাবার ভয়ে সম্পাদক পালাচ্ছেন? সে ভাস না থাকলে কি তিনি পত্রপাঠের সম্পাদক হতে পারতেন? তা তিনি সম্বাদ পেয়েছেন যে, কেউ একজন পত্রপাঠ-এ বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য দপ্তরে বসে আছেন। পাছে চলে যান...

- আচ্ছা, সম্পাদক দু-দু'বছর পত্রপাঠ পার করলেন কী করে? এর আড়ালে যারা আছেন, তাঁদের মুখ দেখতে ইচ্ছে করছে।

—রাজীবলোচন বসু, খড়গপুর

- মুখ খুঁটব দেখতে ইচ্ছে করছে—মুখ খুঁট—? মুখখুঁ!

- আপনারা সবকিছুর মধ্যেই শুধু অমঙ্গল দেখেন। লজ্জা করে না আপনাদের? কোনোকিছুর মধ্যেই মঙ্গল নেই?

—শ্রী হৃদয়মঙ্গল দাস, কাকদ্বীপ, দঃ চক্ৰিশ পরগণা

- আমরা কি অন্ধ? আপনার নামের জঙ্গলে একটি মঙ্গল গোঁড়া মারছে দেখছি।

- বেলভাগ নিয়ে বড় বেশি জলধোলা করা হচ্ছে। রেলওয়ে জোন ভাগ হলে সাধারণ মানুষের কী এমন ক্ষতি হবে?

—অধীর হালদার, কলকাতা-৫৬

- খুবই ক্ষতি হবে। একই জোনের মানুষ বুঝে উঠতে পারবেন না ভাগ হওয়া তিনটি জোনের কোন লাইনটা বেছে নেবেন মাথা দেওয়ার জন্যে। ফলে আত্মহত্যা ক্রমশ বিলম্ব। ডোমের আর্থিক ক্ষতি, শববাহী ভ্যান-রিক্সা, থানা-পুলিশ, মর্গের ডাক্তারবাবু.....উঃ ক্ষতির জাব্দা খাতা একেবারে।

- মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমরা রাষ্ট্রপতি পদে দেখতে চেয়েছিলাম। পরে বুঝলাম, ভাগিস তিনি হননি। কবে দুম্ব করে পদত্যাগ করতেন কে জানে। তিনি একেবারে পদত্যাগ স্পেশালিস্ট হয়ে উঠেছেন কিনা। রাষ্ট্রপতি হলে কেউ কি তাঁর পদত্যাগ প্রবণতা দূর করতে পারত?

—বুদ্ধিনাথ গড়াই, বাঁকুড়া

- তাঁর পতি। কিন্তু হয়, তার যে অস্তিত্বই নেই।

- হাস্যরস নিয়ে মাথা ঘামাতে কে আপনাদের মাথার দিবা দিল?

—অরুণ শর্মা, দমদম

- আপনাব ভাষ্যরসটি ঠিক মর্গজে ঢুকল না।

কোনো প্রযোজক মেয়ের সঙ্গে একান্তে কথা বলতে চাইলে তাঁরা উদার হয়ে বাইরে গিয়ে বসেন এমন ভঙ্গিতে যে মেয়ে ভেতরে পরীক্ষা দিচ্ছে আর তিনি গার্জেন হিসেবে বাইরে অপেক্ষা করছেন।

অকপটে

প্রচ্ছদ কাহিনী

সমরেশ মজুমদার



সাক্ষী থাকুন গোপালবাবু

দেবদেবী নিয়ে রসিকতা অথবা ব্যঙ্গ বোধহয় বাঙালি হিন্দুবাই করতে পারে। পারে, কারণ এখনকার অধিকাংশ বাঙালি আর হিন্দুই আস্থাবান নয়। ছেলেবেলায় এক বয়স্ক প্রতিবেশিনীকে উদ্বেজিত অবস্থায় বলতে শুনতাম, ‘অদ্ভুত—আমায় কপালেই জুটেছে? এ তো শালগ্রামশিলা!’ অভিযোগ স্বামী সম্পর্কে, কিন্তু বুঝতে আমার দেরি হয়েছিল। প্রশ্ন কবতে শুনলাম, ‘শালগ্রামশিলা দেখিনি? যেভাবে বাঁধবি সেভাবেই থাকবে। কোনো কন্সের নয়, আবার পুজোর সময় না রাখলে চলেও না। তোর মেসোমশাই হলেন সেই শালগ্রামশিলা।’

পুরীর জগন্নাথদেবের কাছে পুজো দিতে, রথ টানতে লক্ষ লক্ষ মানুষ যান। অথচ রাগের সময় গালাগালি হিসেবে ‘ঠুটো জগন্নাথ’ বলতে কিন্তু বাঙালির বাধে না। ঈশ্বর-চিন্তায় তৃতীয় যে শব্দটি মনে এল সেটি হল সাক্ষীগোপাল। এই দেবতার অধিষ্ঠান উড়িয়ায়। কিন্তু বাঙালি তাঁর নাম ব্যবহার করেছে যে অর্থে তা মোটেই সম্মানজনক নয়। শালগ্রামশিলা বা ঠুটো জগন্নাথ যদি নেহাৎই গালাগালি হয় তাহলে সাক্ষীগোপালের ব্যবহারে একটু প্রচ্ছন্ন কিছুপ, অবজ্ঞা যেন জড়িয়ে থাকে।

মিসেস নন্দীর প্রেমিকা হিসেবে অত্যন্ত খ্যাতি আছে। ক্লাবে, পার্টিতে অথবা প্রাপ্তির জায়গায় যখনই তিনি যান তখনই তাঁর স্বামীকে পাশে দেখতে পাওয়া যায়। এই ভদ্রলোক অত্যন্ত শান্ত, মুখে হাসি লেগে আছে। কখনো

কখনো মিসেস নন্দী তাঁর কনুই ধরে দাঁড়িয়ে অন্য লোকের সঙ্গে কথা বলেন। যেমন—

‘গুড ইভনিং ম্যাডাম। দাফন দেখাচ্ছে আপনাকে।’ চাটুকারের নিবেদন।

‘আর দাফন? কী যে প্রভ্রমে আছি!’ মিসেস নন্দী ডান হাত বাড়িয়ে স্বামীর কনুই জড়িয়ে ধরলেন। চোখমুখে সমস্যা ফুটে উঠল তাঁর।

‘কেন? কী হয়েছে?’ চাটুকার উদ্বিগ্ন।

‘ম্যাকনিবার অ্যাণ্ড ম্যাকনিবারে হাবি একটা টেণ্ডার সাবমিট করেছে কিন্তু মনে হচ্ছে ওটা পাওয়া যাবে না।’ নিশ্বাস ফেললেন ভদ্রমহিলা। তাঁর হাবি অর্থাৎ স্বামী মাথা দোলালেন।

নির্দিষ্ট দিনে প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদিত ভাষণ রাষ্ট্রপতিকে পড়তে হয়। একমাত্র প্রধানমন্ত্রীর দল যদি গরিষ্ঠতা হারায় তাহলে তিনি ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন। বাকি দিনগুলোয় তাঁর নামে রাষ্ট্র চলে অথচ তাঁর ভূমিকা দর্শকের।

‘এটা কোনো সমস্যাই নয়। ম্যাকনিবারের এম ডি আমার ভায়রাভাই।’

‘ওঃ কি ভালো। সত্যি?’

‘হ্যাঁ। বাট ইউ লুক গ্রেট।’

‘থ্যাঙ্ক। বেয়াবা কোথায়? হাবিকে একটা স্কচ দিতে বলুন না।’

চাটুকারের আদেশে বেয়াবা স্বামীকে স্কচের গ্লাস ধরিয়ে দিলে মিসেস নন্দী বললেন, ‘অ্যাঁ শোনো, তুমি ড্রিন্কাটো এনজয় করো। আমি ওঁর সঙ্গে

একটু আলাদা টেণ্ডারটা নিয়ে কথা বলি। এখানে বললে কেউ না কেউ ঠিক শুনে 'ফেলবে।'

'ওঃ, সিওর।' স্বামী মদে চুমুক দিলেন,—'চীয়ার্স।'

'চীয়ার্স।' বলে মিসেস নন্দী চাটুকারের দিকে তাকালেন,—'চলুন, আমরা ওই নির্জন কোণে গিয়ে কথা বলি, কেমন?'

দূরের টেবিলে বসা দু'জন লোক ওদের লক্ষ্য করছিল। একজন বলল, এই নন্দীটা এক নম্বরের ভেড়ুয়া। ওর বউ ওকে সাক্ষীগোপাল করে রাখে বুঝতেই পারে না।'

দ্বিতীয়জন বলল, 'পারে। কিন্তু বলে না।'

'পাকড়াশি কোণে নিয়ে গেল মিসেস নন্দীকে। এবার চিবিয়ে খাবে।'

'চিবোবে কিন্তু খেতে পারবে না।'

'কেন?'

'মিসেস নন্দী হলেন সেই বুদ্ধা খাসির মতো যার মাংস এখন ছিবড়ে। চিবিয়ে শেষ করা যায় না। মাঝখান থেকে নন্দীর টেণ্ডার অ্যাঞ্জন হয়ে যাবে।'

এরকম সাক্ষীগোপালদের সংখ্যা দিনদিন বাড়বে। বউ মক্ষিরানীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় মহারানী হতে চাইছে আর স্বামী নির্লিপ্ত, যেন সমুদ্রের ঢেউ দেখছেন।

আজকাল স্টুডিওপাড়ায় বা প্রযোজকদের অফিসে কিশোরী বা যুবতী মেয়েকে নিয়ে বিগতা সুন্দরী মায়াদের প্রায়ই আসতে দেখা যায়। একটু

আনন্দিত তাঁরা। আফশোষ মনে এলে তো তিনি আর সাক্ষীগোপাল থাকতেন না।

তবে সাক্ষীগোপালও মাঝে মাঝে মানুষ হয়ে যায়। তখন বিপদ। শিশু রাজপুত্রকে সিংহাসনে বসিয়ে মৃত রাজার দূর সম্পর্কের আত্মীয় রাজ্য চালাচ্ছিল। কিন্তু একটু বড় হতেই রাজপুত্র তাকে শূলে চড়ালো, এরকম ঘটনা ইতিহাসে আছে।

ভারতবর্ষের সংবিধানে রাজ্যপাল এবং রাষ্ট্রপতির যে ভূমিকা, তা নিয়ে অনেকের দ্বিধা আছে। এঁদের মুখ বন্ধ করে থাকতে হয়। নির্দিষ্ট দিনে প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদিত ভাষণ রাষ্ট্রপতিকে পড়তে হয়। একমাত্র প্রধানমন্ত্রীর দল যদি গরিষ্ঠতা হারায় তাহলে তিনি ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন। বাকি দিনগুলোয় তাঁর নামে রাষ্ট্র চলে অথচ তাঁর ভূমিকা দর্শকের।

অর্থাৎ আমাদের রাষ্ট্রপতিকেও মাঝে মাঝে সাক্ষীগোপালের ভূমিকায় অভিনয় করতে বাধ্য করেছে সংবিধান।

মিস্টার নন্দীদের এটুকুই সাঙ্ঘনা।

শালগ্রামশিলা দেখিসনি?
যেভাবে রাখবি সেভাবেই
থাকবে। কোনো কন্মের নয়,
আবার পূজোর সময় না রাখলে
চলেও না। তোর মেসোমশাই
হলেন সেই শালগ্রামশিলা।

সুযোগ, একটা নায়িকার চরিত্র মেয়েকে দেওয়ার জন্যে তাঁরা ঝুলোঝুলি করেন। কোনো প্রযোজক মেয়ের সঙ্গে একান্তে কথা বলতে চাইলে তাঁরা উদার হয়ে বাইরে গিয়ে বসেন এমন ভঙ্গিতে যে মেয়ে ভেতরে পরীক্ষা দিচ্ছে আর তিনি গার্জেন হিসেবে বাইরে অপেক্ষা করছেন। এঁদের সাক্ষীগোপাল বলতে কারো নিশ্চয়ই আপত্তি হবে না।

স্কুল বা কলেজে ব্যক্তিত্বহীন হেডমাস্টার বা প্রিন্সিপালের অভাব নেই। দেখা যায় সেখানকার কোনো শিক্ষক এই সুযোগটাকে কাজে লাগান। হেডমাস্টার বা প্রিন্সিপালকে সাক্ষীগোপাল করে দিয়ে তাঁরই বকলমে তিনি ছড়ি ঘোরান।

সাক্ষীগোপালদের কি কোনো দুঃখ বা আফশোষ থাকে? মনে হয় না। কোনো কাজ করতে হচ্ছে না অথচ সবকিছু তাঁর নামেই হচ্ছে, এতেই

ট্যারা চোখে

ভোটকাস্তি

বাঁচাটা মরার চেয়েও কত দুর্বিষহ হতে পারে—এটা বছর দেড়েক ধরে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন শিক্ষক মশায়রা। অসীম দাশগুপ্ত, সত্যসাধন চক্রবর্তী এবং কাস্তি বিশ্বাস—এই তিন মহামানবের ক্রমাগত শিক্ষক-বিরোধী তর্জন-গর্জন-এ 'হিনাথ বউরাপী' দর্শনাস্তর পিসেমশাই ও তাঁর দুই পুত্রের প্রতিক্রিয়া স্মরণ হচ্ছিল—“পিসেমশাই তাঁর দুই ছেলেকে বগলে চাপিয়া ধরিয়া তাহাদের অপেক্ষাও তেজ্জে চোঁচাইয়া বাড়ি ফাটাইয়া ফেলিতেছেন। এ যেন তিন বাপ-ব্যাটার কে কতখানি হী করিতে পারে, তারই লড়াই চলিতেছে।”

এ হেন ধমক-বিলাসী কাস্তি বিশ্বাস কিনা বলিয়া বসিলেন—শিক্ষকদেরও একটা মর্যাদা আছে। প্রথমে মনে হয়েছিল কাস্তিবাবু বুঝি বা আত্ম-বিস্মৃত হয়েছেন। পার্টিনির্দেশ ভুলে মেরে দিয়েছেন। পরে স্মরণ হল, হরি হরি, পঞ্চায়েত সম্মান য়ে। বিশেষত কিছুদিন পূর্বে স্বয়ং জ্যোতি বসু ঘোষণা করেছেন যে বামফ্রন্টকে ক্ষমতায় আনার পিছনে শিক্ষকদের একটা বড় ভূমিকা আছে। হ্যাঁ, শিক্ষকদের ওই একটাই মাত্র গুণ। বাকি সব দোষের—যাবতীয় কিছু—চলা-ফেরা শোওয়া-বসা পড়ানো—সব। হরি হরি। এ কাস্তি সে কাস্তি নয়। এ যে ভোটকাস্তি। আচ্ছা, পঞ্চায়েত ভোট চার বছরে একবার না করে মাসে মাসে করা যায় না? মাস্টার মশাইরা ফি মাসের বেতনটি অন্তত সেই সুবাদে হাতে পেতেন। কাস্তিবাবু, স্বপ্নর আপনাকে দিনে দিনে নধরকাস্তি করুন,—পরামর্শটি একটু বিবেচনা করবেন?

—সুচতুর গুপ্ত

চরণ বৈরাগীর ইকড়ি মিকড়ি

প্রচুদ কাহিনী



মগজটাই আসল রাজা

একটা ইন্টারভিউতে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় বলেছিলেন, ঈশ্বর বা ম্যানেজিং ডিরেক্টরস—যাই বলা যাক, লোকটা কেমন, মিটিংয়ে কতক্ষণ থাকে, তার পি এ কে, পাবকুইজিটস্ কী কী—জ্ঞানতে ইচ্ছে করে। করা খুব স্বাভাবিক তো।

ইচ্ছেটা অবশ্যই স্বাভাবিক। কিন্তু জানা যায় না। খাদিমকর্তাব অপহরণকাব্যী কে বা কারা জানা গেছে? তিন ডজন লোককে তিলজলা থেকে দুবাই পর্যন্ত টুড়ে দুঁদে গোয়েন্দারা ছ'মাস পবেও মূল 'ঈশ্বর'কে খুঁজে পাননি। বফর্স কেলেকারির রহস্যও তথৈবচ। ক্রিকেটর গট আপ গেম বা হ্যান্সি-কীর্তির ভাবতীয় ভার্সানের নায়ক এখনো অচিহ্নিত। কেবল আজহার-অজযের জামায কিছু কালিব ছোপ।

কৃষ্ণ মঙ্গলবার ১১ই সেপ্টেম্বর ওয়ার্ল্ড-ট্রেড সেন্টার ধ্বংসেব শিল্পীর সঠিক ঠিকানাও জানা যায়নি। লাদেন-ই একমাত্র মুখ? তবু আফগানিস্তানে আমেরিকাব বোমা পড়ল। কিন্তু তালিবানদের উদ্ভবে তালি দিয়েছিল কে? দিল্লিতে শিখমারণ যজ্ঞ, মুম্বাইয়ের হত্যালীলা আর সাম্প্রতিক গুজরাতে ভাষাহীন বর্বরতার বিধকর্মী কারা?—কখনো জানা যাবে না।

খাদিমকর্তা গায়েব হলেন তিলজলায়। তার পবিকল্পনা নাকি হয়েছিল দুবাইয়ে বা পাকিস্তানে। কুশীলবরা এসেছিল সারা দেশেব নানা প্রান্ত থেকে। কিন্তু কেউই নাকি জানে না কে আসল রাজা। সারা ভারতের, বিশেষত মুম্বাইয়ের অপবাধ জগতের কর্তব্যাক্তি তথা রাজা-বাদশারা, দীর্ঘকাল শুনে এসেছি, দুবাইবাসী। এখন ইনি করাচীব প্রাসাদে অধিষ্ঠিত। এমনকি তাঁরই অঙ্গুলি হেলনে কাপালি পর্দায় বলিউডি নায়ক-নায়িকাদের পতন-অভ্যুদয়

ঘটে থাকে। কোনো কোনো নায়ক-নায়িকা পছন্দের 'রোল' পাওয়ার জন্যে নাকি দুবাই ছুটে যান মূল নিয়ন্ত্রক ঈশ্বরের প্রসাদ-ভিক্ষায়।

দেশে দেশে মাঝে মাঝেই যুদ্ধ-সংঘর্ষ লেগে থাকে, কখনো কখনো অফুরান যুদ্ধ—তাবও লাটাই ধবা থাকে কোনো অদৃশ্য হাতে। গত পঞ্চাশ বছর ধবে কাশ্মীর নিয়ে ভাবত-পাকিস্তান নিছক বালক-বিলাসে সংখ্যাতিত মানুষেব মৃত্যু ও দুর্দশাব পিংপং খেলে চলেছে। একই উপদেষ্টা দু'দেশের প্রধানদেব পিঠ চাপড়ে বলে যান, চালিয়ে যাও, তবে বাড়াবাড়ি কবো ন। আর নতুন অস্ত্রশস্ত্র কী কী লাগবে তাব তালিকাটা শীঘ্রই পাঠিয়ে দিও। দু'দেশেবই কাগজে সদন্ত উল্লাস, টিভিতে গণ-উন্মাদনার মেঘ-আহ্লাদ। নিভৃত 'ঈশ্বর' তাঁর পারকুইজিট কত বাড়িয়ে নিতে পারলেন সে হিসেব করার গণকযন্ত্র এখনো অনাবিষ্কৃত।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে ১৯৬৬ সালে জটনৈক বাঙালি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী'র অপাব কীর্তিকথা—ভারতীয় মুদ্রাব অবমূল্যায়ন (ডিভালুয়েশন)। এক ধাক্কা ৫৭.৫%। প্রধানমন্ত্রী থেকেওক করে সব নেতা-উপনেতা, সাংবাদিক নামক সাবমেয়কুল-উদ্ধাষ নৃতো. মুখব হয়ে বলেছিলেন, ওটা ছিল দৃপ্ত নেতৃত্ব, অসমসাহসী পদক্ষেপ। পবে জানা গেছে আই এম এফ-এর মার্চ মাসের হুঁকুমমাত্র তালিম করা হয়েছে জুনে। সেই জেনেওনে বিষ পানের শাস্তি আজও অব্যাহত। অদৃশ্য 'ঈশ্বরের' আপন খেয়ালী খেলার মতোই।

ক'দিন আগেই বিশ্ব ফুটবল নিয়ে সারা বিশ্ব টগবগ করছিল। ফ্রান্স, আর্জেন্টিনাব সাফল্য নিয়ে অন্তহীন গবেষণা, অগ্রিম ঘোষণা। ফলাফল এখন জানা। যা জানা নেই, আসলেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা কাদের মধ্যে ছিল? দুই

কীড়া-সরঞ্জাম প্রস্তুতকারী সংস্থা, না, তাদের সরকার? ৯৮এর ওয়ার্ল্ড কাপ ফাইনালে রোনাল্ডো-কাহিনীর রহস্য এখনো অনুমোচিত। যা চালু তা গুল, ঘটনা নয়। সেবাবও কে ছিল মূল খেলোয়াড়?

বিভিন্ন সাহিত্য পুরস্কারের কথাই ভাবুন—নোবেল থেকে আকাদেমি থেকে রবীন্দ্র, বঙ্কিম। মাঝে মাঝেই এমন প্রাপকের নাম ঘোষণা হয় যে তাবৎ শিক্ষিত সমাজ চোখ রগড়ে রগড়ে বারবার ভাবতে থাকেন, ঠিক পড়ছি তো? ভুল শুনি না তো? এই অমূল্য রত্নের সম্মান এতকাল সকল মনস্ত্ব পাঠকের অজ্ঞাত ছিল, কোন যোগবলে বিচাবক মণ্ডলী কোন গোপন খনি থেকে তা আবিষ্কার কবলেন, সে মহাভারত কখনো দেখা হবে না।

এ ব্যক্ত্যেব এক মহাকীর্তিমান মন্ত্রী জনৈক বেণ্ডসারীকে ‘পদ্মশ্রী’ দেবার সুপারিশের কথা নিশ্চয় পাঠকদের মনে পড়বে।

তো কথা হচ্ছিল, বিভিন্ন কাণ্ডের আদত কাণ্ডারীর খোঁজখবর নিয়ে। এ যেন পৈয়াজের খোসা ছাড়ানোর মতো। শুধু ছাড়িয়েই যাওয়া। হৃদিশ আর মেলে না। এক বন্ধুর মুখে একটা গল্প শুনেছিলাম। আধা সরকারি

নোবেল থেকে আকাদেমি থেকে রবীন্দ্র, বঙ্কিম।

মাঝে মাঝেই এমন প্রাপকের নাম ঘোষণা হয়

যে তাবৎ শিক্ষিত সমাজ চোখ রগড়ে রগড়ে

বারবার ভাবতে থাকেন, ঠিক পড়ছি তো?

প্রতিষ্ঠানের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর এক গুরুতর মিটিংয়ের শেষে মস্তব্য কবেন, এবারে ম্যানেজমেন্টকে সাহসী সিদ্ধান্ত নিতেই হবে। উপস্থিত অন্য ডিরেক্টররা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে ভাবেন, ডি এম ডি যদি এমন বলেন, তবে ম্যানেজমেন্ট কে? এম ডি? ক্যাবিনেট? নাকি সংসদ? নাকি—

এই যে উদারীকরণ, বিলম্বিকরণ, বিদেশি বিনিয়োগের জন্য লাল কার্পেট-আমন্ত্রণ—এ সবের কলাকার কে? অর্থমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী না শাসকদল? খেঁচু। “নাচায় পুতুল যথা দক্ষ বাজীকরে”—পড়েছেন বা পড়লেও মনে আছে? ঐ বাজীকরের খোঁজে যাবেন নাকি?

‘শ্রী’ ছবিতে মামা দে গেয়েছিলেন, ‘মেজাজটাই তো আসল রাজা, আমি রাজা নই।’ অর্থাত্। আমরা যাঁদের রাজা ভাবি তাঁরা রাজা নন। তাঁদের মেজাজও নয়। আসল হল মগজ—মগজটাই আসল রাজা। কিন্তু তাব ঠিকানা কী? কোটি কোটি ডলাব মূল্যের প্রশ্ন। সে কি অমনি হবে?

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় একই ইন্টারভিউতে বলেছিলেন, কারেক্ট লোক হলে তো শালা একেবারে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মস্বামী হয়ে যেত—যে বিশ্বাসই করে নিয়েছিল, সে ভগবানের পাটনার।

আমরা চারদিকে এমন পাটনারই দেখি বেশি এবং ভুল করি। আমাদের ভুলে ভরা ভক্তিই আসলে নকল পাটনারদের শক্তি।

তাই আমরা, জনগণ, তাঁদের দেওয়া যদুচ্ছ গুলি অবলীল গলাধঃকরণ করে সাড়স্বর জয়ধ্বনি করি। মেঘ আমরা, নই তো মানুষ!

পুনশ্চ : প্রায় বছর কুড়ি আগে একটা পূজা-স্মাভেনিরে জনৈক কল্যাণ মজুমদারের “ক্ষমতা” শীর্ষক স্কেচখরী লেখা পড়েছিলাম। লেখাটি বর্তমান

বিষয়ের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক মনে করে পাঠালাম। সম্পাদক মহাশয়, পুনর্মুদ্রণের বিবেচনা করবেন কি?

ক্ষমতা

কল্যাণ মজুমদার

ফকির—ভোট আমরা আপনাকে দেব। তবে আমাদের দাবী মানতে হবে।

হবু এম এল এ—কী দাবী?

—রোজ দু মুর্তো ভাত চাই, বছবে দুটো কাপড়, চিকিৎসার অমুখ আর ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা।

—এ সব তো দিতেই হবে। এ তো ন্যূনতম দাবী।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। নুন-ভাত হলেই চলবে।

(২)

ফকির—তিন বছর হল আপনাকে ভোট দিয়েছি। আপনি বিপুল ভোটে জিতেছেন। কিন্তু আমাদের তো কিছু সুরাহা হল না।

এম এল এ—আমি চেষ্টা করছি। এটা একটা দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম। এই তো ক’দিন আগে বিধানসভায় আধঘন্টা ধরে দাবী-দাওয়া নিয়ে কথা বলেছি। মন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন নিয়ে গেছি।

—কিন্তু আমাদের তো খালি থিদে বাড়ছে। বোজ্জ বিনা চিকিৎসায় লোক মরছে। সারা অঞ্চলে একটা রাস্তাও হল না। আমরা সেই একই ভিমিরে।

—দ্যাখো ফকির, আমার হাতে তো ক্ষমতা নেই। ক্ষমতা সব মন্ত্রীর। আমি একটা প্রজেক্ট দিয়েছি। সেটা আদায়ের জন্য আমার লড়াই চলবে। তবু, তুমি একবার মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করো। আমি ভেতর থেকে চাপ দেব, তোমরা বাইরে থেকে চাপ দাও।

(৩)

মন্ত্রী—হ্যাঁ, তোমাদের এম এল এ আমাকে বলেছে। প্রজেক্টও দেখেছি। চেষ্টা করছি। দেখা যাক কতটা কি করা যায়।

ফকির—আমরা যে আর পারছি না। আপনিও যদি কিছু না করেন তবে কোথায় যাব।

—দ্যাখো, ধৈর্য রাখতে হবে। সময় দিতে হবে। প্রত্যেক জেলা, প্রত্যেক ব্লকের একই দাবী। সব মেটানো সম্ভব না একবারে। ধীরে ধীরে হবে। আমাদের সীমিত ক্ষমতার মধ্যেও আমরা চেষ্টা করছি।

—আমাদের প্রজেক্টটা করে দিন। ওটা তো আপনার ক্ষমতার মধ্যে আছে।

—আমার ক্ষমতা? কী বলছ! আমার কোনো ক্ষমতাই নেই। সব ক্ষমতা মুখ্যমন্ত্রীর। তাঁরই হাতে অর্থদপ্তর। তিনি অনুমোদন করলে তবেই কাজ হবে। টাকা ছাড়া তো কাজ হয় না।

—আজ্ঞে সেটা সরকারি অফিসে গেলেই টেব পাঁই।

(৪)

মুখ্যমন্ত্রী—কে বলেছে আমার হাতে ক্ষমতা আছে? কিছু নেই, সব ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে। এক ডায়গাঘ কেন্দ্রীভূত। সেখান থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে না আনতে পারলে কিছুই করা সম্ভব নয়। ক্ষমতা কেউ দান করে না। উপহারও দেয় না জোর করে কেড়ে নিতে হয়। সেজন্য আমাদের লড়াই চলছে, লড়াই চলবে। দেশের প্রতিটি

মানুষকে এ-সতটা বোঝাতে হবে যে কেন্দ্রের বৈষম্যমূলক
আচরণই জনগণের দুঃখকষ্টের কারণ। চাল চিনি গম কেবোসিন—
সব কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণে। এমনকি অ্যালকোহল পর্যন্ত।
ফকির—স্যাব, আমাদের হেল্থ সেন্টারে অমুখ নেই, ডাক্তার নেই।
কেবল ইঁদুর আর কুকুর ঘুরে বেড়ায়।
—শিগাঁবিই দিল্লি যাচ্ছি। সেখানে কথা বলব।
—রেশন দোকানে কাপড় দেবাব কথা ছিল—
—কেন্দ্র দিলে পাওয়া যাবে।
—স্যার, বিদ্যুতের অভাব—
—বিদ্যুৎ ৭ বিদ্যুৎ নিয়ে কথা কেন! জানেন, সর্বভারতীয় বিদ্যুৎ উৎপাদনের
হাবশতকবা ৯.২% আরো বেশি বিদ্যুৎ কি থাকবে?
—দু'বছর খাবা গেল। জলের অভাবে চাষ হচ্ছে না।
—কেন্দ্রের কাছে দাবী জানিয়েছি।
—জলের দাবী?
—হ্যাঁ—না, মানে—খরাত্রাণের জন্য বাড়তি টাকা চেয়েছি।
—আমরা তবে এখন কী করব?
—সংগঠন আবে শক্তিশালী করুন। বেঁচে থাকার অশেষ সংগ্রামে এই
সরকারকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার জন্য সববকম প্ররোচনা
ও ষড়যন্ত্রের বিবন্ধে একে চোখের মণির মতন বক্ষা করুন।
—চোখের যে জ্যোতি কমে আসছে।
—তা আসুক। তার জন্য আটকাবে না। অন্ধকাবে জ্যোতি থাকা আর
না থাকা দুইই সমান।
—অ্যা?
—হ্যাঁ।

(৫)

(নির্বাকচী সফবে হ্যালিকপ্টারের ফডিং-ডায়া উড়ে এসেছেন প্রধানমন্ত্রী।
সকালে চাবটি বহুতা সেবে সার্ফিট হাউসে বিশ্রাম নিচ্ছেন।
বিস্কেলে আরো পাঁচটি মিটিং আছে। সার্ফিট হাউসে গণ ডেপুটেশনের
দলের সঙ্গে এসেছে ফকির মণ্ডল।)
প্রধানমন্ত্রী—আপনাদের স্মারকলিপি আমি দেখব। দাবী-দাওয়া যা আছে
তাও কতটা কিভাবে মেটানো যায় বিবেচনা করব। আমি শুনে
খুবই দুঃখিত যে খরার কবলে পড়ে দুঃখিত খাদ্য খেয়ে এখানে
সাতজন মারা গেছে। আমি সেই হতভাগ্য শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে
আমার সমবেদনা জানিয়ে এসেছি। যদিও এটা রাজ্য সরকারের
ক্ষমতাভুক্ত বিষয়, তবু দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আমি নিশ্চুপ
দর্শক হয়ে থাকতে পারি না। মৃত্যু সবসময়েই দুঃখের। অথচ
মানুষের মৃত্যু হবেই। আমার মহান পিতা প্রধানমন্ত্রী থাকাকালেই
মারা গেছেন। আমার এক ছেলে, বেঁচে থাকলে সেও প্রধানমন্ত্রী
হত, অকালে মারা গেছে। প্রধানমন্ত্রী হয়েও আমি কিছু করতে

পারিনি। এবং তা সত্ত্বেও দেশের ও জনগণের সেবায় যে একনিষ্ঠ
ঐতিহ্য আমাদের পরিবারের রয়েছে আমি তাব গৌরব-পতাকা
বয়ে নিয়ে চলেছি। দেশ থেকে গরীবী না হটানো পর্যন্ত আমাকে
কেউ থামাতে পারবে না। একজন মানুষকেও না খেয়ে মরতে
দেব না—এটা আমার সরকারের দৃষ্ট ঘোষণা। তবে অনাহারজনিত
রোগে অপুষ্টির কারণে যদি কেউ মারা যায়, তার জন্য দুঃখ পাওয়া
ছাড়া আমাদের কিছু করার থাকে না।

সকলে বলে আমার অনেক ক্ষমতা, প্রচুর শক্তি। ভুল বলে সবাই। আমরা
কোনো ক্ষমতা নেই। সব ক্ষমতা আপনাদের। দেশের জনগণই
ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী। তাই আমি আবেদন করতে এসেছি,
দেশের সার্বিক উন্নতির জন্য প্রচুর অর্থ সম্পদ বিদেশি মুদ্রা
প্রয়োজন। তার জন্য প্রয়োজন আপনাদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা,
ত্যাগ। হ্যাঁ, আপনাদের আরো একটু ত্যাগ কবতে হবে। ত্যাগের
আদর্শ সুপ্রাচীন মহান ঐতিহ্য। আমি আশা করি সেই ঐতিহ্য
অনুসরণ করেই আমরা সুখী ভারতবর্ষ গড়ে তুলতে পারব।

ফকির—মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনার ভাষণে আমরা খুবই উদ্বুদ্ধ।
আমরা তো প্রায় সবই ত্যাগ কবেছি। খাদ্য বস্ত্র অমুখ বাসস্থান—
যা-ই বলবেন, আমরা আর কিছুই ভোগ করি না। মলমূত্রও
নিয়মিত ত্যাগ করে থাকি। তবে তা আর কতদিন পারবে, জানি
না। তবু আমরা আবে ত্যাগ স্বীকার কবতে ইচ্ছুক। এই দেহ ছাড়া
আমাদের আব কিছু নেই। দেশের জন্য, আপনাব জন্য আমরা
তা ও ত্যাগ করতে চাই। যেহেতু দেশের বিদেশি মুদ্রা দরকার
এবং আমরাই সব ক্ষমতাব অধিকারী, তাই আমরা আপনাকে
আমাদের দেহ দান করছি। না, না। ভুল বুঝবেন না। শুনেছি
বিদেশে কঙ্কাল বণ্টানি করে প্রচুর বিদেশি মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব।
আপনি আমাদের দেহ থেকে কঙ্কাল বের কবে নিয়ে দেশ থেকে
গরীবী হটান।

প্রধানমন্ত্রী—আমি অভিভূত—আন্তরিক ভাবে অভিভূত। এমন মানুষ
যে—কোনো দেশের গর্ব। আপনাকে অভিনন্দন জানাবার ভাষা
নেই। ত্যাগের যে মহান ঐতিহ্য আপনাকে উদ্বুদ্ধ করেছে, তাব
জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে আমি শীঘ্রই যথাযথ নির্দেশ জারি—
প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা—(বাধা দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কানে কানে)
ম্যাডাম আব বলবেন না। ক্লান্ত হইয়ে যাবে।

প্রধানমন্ত্রী—কেন?

উপদেষ্টা—কঙ্কাল বের কবে নিলে ওরা ভোট দেবে কী কবে?

প্রধানমন্ত্রী—তার মানে?

উপদেষ্টা—ওরাই আপনার ভোটার। আসল ক্ষমতার অধিকারী।

প্রধানমন্ত্রী—অ্যা?

উপদেষ্টা—হ্যাঁ।

সম্পাদকের নিবেদন : বৈরাগীর সহিত আমাদের চুক্তি ছিল যে, তিনি বিশ্বময় প্রেমের বাণী বিতরণ করিয়া কেন আর
পায়েব পাতা ব্যথা করেন, পত্রপাঠের পাতাতেই তাঁহার কৃষ্ণপ্রেম মদিরা ঢালিতে থাকুন। হাঁ রক্তকরবীর গৌসাইজিব
মতোই তাঁব মধু বর্ষণে ট ট ড ড গ—সব পাড়াই ভক্তিভাবে গদগদ হইবে—এরূপ আশা ছিল। কিন্তু বৈরাগীজির একতারাটি
ইদানীং বড়ই বেসুবো বাড়িতেছে। বুকিবা বাঘুর প্রকোপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ক্রিষ্ণেজির নিকট পুনঃ পুনঃ অনুরোধ, বৈরাগীর
সুরক্ষার প্রতি কিঞ্চিৎ নজর রাখিবেন, বাঘ কিংবা বাঘুর প্রকোপ হইতে রক্ষা হেতু।



রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “রাজর্ষি” থেকে

প্রভাতে নক্ষত্ররায় আসিয়া রঘুপতিকে প্রশ্নাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,
“ঠাকুর, কী আদেশ করেন?”

রঘুপতি কহিলেন, “তোমার প্রতি মায়ের আদেশ আছে। আগে মাকে প্রশ্নাম করিবে চলো।”

উভয়ে মন্দিরে গেলেন। জয়সিংহও সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। নক্ষত্ররায় ভুবনেশ্বরী-প্রতিমার সম্মুখে সান্ত্বাস প্রণিপাত করিলেন।

রঘুপতি নক্ষত্ররায়কে কহিলেন, “কুমার, তুমি রাজা হইবে।”

নক্ষত্ররায় কহিলেন, “আমি রাজা হইব। ঠাকুরমশায় যে কী বলেন তার ঠিক নাই।” বলিয়া নক্ষত্ররায় অত্যন্ত হাসিতে লাগিলেন।

রঘুপতি কহিলেন, “আমি বলিতেছি, তুমি রাজা হইবে।”

নক্ষত্ররায় কহিলেন, “আপনি বলিতেছেন, আমি রাজা হইব।” বলিয়া রঘুপতির মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

রঘুপতি কহিলেন, “আমি কি মিথ্যা কথা বলিতেছি?”

নক্ষত্ররায় কহিলেন, “আপনি কি মিথ্যা কথা বলিতেছেন? সে কেমন করিয়া হইবে? দেখুন ঠাকুরমশায়, আমি কাল ব্যাঙের স্বপ্ন দেখিয়াছি। আচ্ছা, ব্যাঙের স্বপ্ন দেখিলে কী হয় বলুন দেখি।”

রঘুপতি হাস্য সম্বরণ করিয়া কহিলেন, “কেমনতরো ব্যাঙ বলো দেখি। তাহার মাথায় দাগ আছে তো?”

নক্ষত্ররায় সর্গর্বে কহিলেন, “তাহার মাথায় দাগ আছে বৈকি। দাগ না থাকিলে চলিবে কেন।”

রঘুপতি কহিলেন, “বটে! তবে তো তোমার রাজ্যটিকা লাভ হইবে।”

নক্ষত্ররায় কহিলেন, “তবে আমার রাজ্যটিকা লাভ হইবে। আপনি বলিতেছেন, আমার রাজ্যটিকা লাভ হইবে। আব, যদি না হয়?”

রঘুপতি কহিলেন, “আমার কথা ব্যর্থ হইবে। বল কী!”

নক্ষত্ররায় কহিলেন, “না-না, সে কথা হইতেছে না। আপনি কিনা বলিতেছেন, আমার রাজ্যটিকা লাভ হইবে, মনে করুন যদিই না হয়। দৈবাৎ কি এমন হয় না যে—”

রঘুপতি কহিলেন, “না-না, ইহার অন্যথা হইবে না।”

পুরনো কাহিনী

নক্ষত্ররায়। ইহার অন্যথা হইবে না। আপনি বলিতেছেন, ইহার অন্যথা হইবে না। দেখুন ঠাকুরমশায়, আমি রাজা হইলে আপনাকে মন্ত্রী করিব।

রঘুপতি। মন্ত্রিত্বের পদে আমি পদাঘাত করি।

নক্ষত্ররায় উদারভাবে কহিলেন, “আচ্ছা, জয়সিংহকে মন্ত্রী করিব।”

রঘুপতি কহিলেন, “সে কথা পরে হইবে। রাজা হইবার আগে কী করিতে হইবে সেটা শোনো আগে। মা রাজরক্ত দেখিতে চান, স্বপ্নে আমার প্রতি এই আদেশ হইয়াছে।”

নক্ষত্ররায় কহিলেন, “মা রাজরক্ত দেখিতে চান, স্বপ্নে আপনার প্রতি এই আদেশ হইয়াছে। এ তো বেশ কথা।”

রঘুপতি কহিলেন, “তোমাকে গোবিন্দমাণিক্যের বস্ত্র আনিতে হইবে।”

নক্ষত্ররায় খানিকটা হাঁ করিয়া রহিলেন। এ কথাটা তত ‘বেশ’ বলিয়া মনে হইল না।

রঘুপতি তীব্র স্বরে কহিলেন, “সহসা ভাতৃস্নেহের উদয় হইল নাকি!”

নক্ষত্ররায় কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিলেন, “হাঃ হাঃ, ভাতৃস্নেহ! ঠাকুরমশায় বেশ বলিলেন যা-হোক, ভাতৃস্নেহ।”

এমন মজার কথা, এমন হাসিবার কথা যেন আর হয় না। ভাতৃস্নেহ। কী লজ্জার বিষয়। কিন্তু অত্যন্ত জানেন, নক্ষত্ররায়ের প্রাণের ভিতরে ভাতৃস্নেহ জাগিতেছে, তা হাসিয়া উড়াইবার জো নাই।

রঘুপতি কহিলেন, “তা হইলে কী করিবে বলো।”

নক্ষত্ররায় কহিলেন, “কী করিব বলুন।”

রঘুপতি। কথাটা ভালো করিয়া শোনো। তোমাকে গোবিন্দমাণিক্যের বস্ত্র মায়ের দর্শনার্থ আনিতে হইবে।

নক্ষত্ররায় মস্তকের মতো বলিয়া গেলেন, “গোবিন্দমাণিক্যের বস্ত্র মায়ের দর্শনার্থ আনিতে হইবে।”

রঘুপতি নিতান্ত ঘৃণার সহিত বলিয়া উঠিলেন, “না, তোমার দ্বারা কিছু হইবে না।”

নক্ষত্ররায় কহিলেন, “কেন হইবে না? যাহা বলিবেন তাহাই হইবে। আপনি ত্রো আদেশ করিতেছেন?”

রঘুপতি। হাঁ, আমি আদেশ করিতেছি।

নক্ষত্ররায়। কী আদেশ করিতেছেন?

রঘুপতি বিরক্ত হইয়া কহিলেন, “মায়ের ইচ্ছা, তিনি বাজরক্ত দর্শন করিবেন। তুমি গোবিন্দমাণিক্যের বস্ত্র দেখাইয়া তাহার ইচ্ছা পূর্ণ করিবে, এই আমার আদেশ।”

নক্ষত্ররায়। আমি আজই গিয়া ফতেখাঁকে এই কাজে নিযুক্ত করিব।

রঘুপতি। না না, আর কোনো লোককে ইহার বিন্দুবিসর্গ জানাইয়ো না। কেবল জয়সিংহকে তোমার সাহায্যে নিযুক্ত করিব। কালি প্রাতে আসিয়ো, কী উপায়ে এ কার্য সাধন করিতে হইবে কাল বলিব।

নক্ষত্ররায় রঘুপতির হাত এড়াইয়া বাঁচিলেন। যত শীঘ্র পারিলেন বাহির হইয়া গেলেন।

সমাজ দুঃসংবাদ

ফজল আলির ফাজলামি



তেল টেকনোলজি

তেল কি না হয়? আলু-পটল-বেগুন ভাজুন, বড়ি-বড়া-পোস্ত ভাজুন, ফুসুবি-বেগুনি-চপ-কাটলেট-ওমলেট ভাজুন, সবতেই তেলের প্রয়োজন। আবার মউজ করে তেল মেখে আচ্ছায়ে স্নান করুন, তনুদেহটি স্নিগ্ধ হবে। তেলের অভাবে প্রদীপের সলতে স্রিয়মান। ভ্যাম্পের ঘুমের জন্য নাকে সর্বের তেল দিন। তেল কি না স্নেহ পদার্থ। মায়েব স্নেহের সঙ্গেই তাব তুলনা চলে। তেলে কিনা হয়? কিন্তু তেলটি খুঁটি হওয়া চাই। আর খাঁটি তেল সংগ্রহ 'সহস্র বর্ষের কথা সাধনা' ধন'।

হ্যাঁ, তেলটি খাঁটি হওয়া চাই। যদি কবে-কয়েক বৈতে চান, বাড়-বাড়ন্ত চান, প্রতিষ্ঠা চান, তা হলে আগে খাঁটি তেল জোগাড় করুন। তারপর হিসেব মতো ব্যবহার করুন। সঠিক ফর্মুলাটি জেনে নিন। ফর্মুলাব আবার রকমফের আছে।

গিমির গোমড়া মুখটি নমনীয় কমনীয় সহনীয় এবং বমনীয় করে তুলতে হলে তেলটা সোহাগেব ফর্মুলায় অ্যাপ্রাই কবতে হবে। অবশ্যই আক্কেল বজায় বেখে। বে-আক্কেল হবেন না। মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু ঠিকমতো অ্যাপ্রাই কবতে পারলে নিমেষে কার্যসিদ্ধি।

আজকাল কাজেব লোককেও তেল দিতে হয়। পিতামহ-প্রণিতামহেব

সত্যযুগের কথা ভুলে যান। কঠোর বাস্তবকে মেনে নিন। চোখ বাঙাতে যাবেন না। তাতে হিতে বিপরীত হবে। বাজার ফেবত খুচরো পয়সাগুলোর মাথা ত্যাগ করুন। এক্ষেত্রে উদাসীন হতে শিখুন। সন্ধ্যাবেলা চ্যানেল পাণ্টে পাণ্টে যখন সে টিভি প্রোগ্রাম এনজয় কববে তখন প্রসন্নতাব হাসি হাসুন। মারোমধ্যে হিন্দি ফিল্মের গল্পটা ওৎসুক্য দেখিয়ে জেনে নিন। এ হল কম্প্রোমাইজিং ফর্মুলা।

আপনার এলাকার ডাকসাইটে মস্তান-নেতাকে ঘাঁটাবেন না, চটাবেন না। মনে রাখবেন, তিনিই আপনার এলাকার ইজ্জৎ বক্ষক, বিঘালা অভিভাবক। তাঁকে সমীহ কবে চলুন। বয়সে ছোট হলেও দাপটে বড়ো 'দাদা' বলুন। মাঝে মাঝে তাঁর সাধ-আত্মদ হলে দু'পাঁচশো টাকা নজরানা চাইলে মিষ্টি মিষ্টি মুখ কবে দিয়ে দিন। এ হল 'লোকাল ট্যাক্সো'। লোকালয়েব ট্যাক্সোও বলতে পাবেন। জানেনই তো, স্থানীয় কব অতিবিক্ত। ওযুখে দিচ্ছেন, সাবানে দিচ্ছেন, টুথপেস্ট আব টুথব্রাশে দিচ্ছেন, অথচ ল অ্যাণ্ড অর্ডার বজায় রাখাব জন্যে দিতে পাববেন না? সহনশীল হতে হবে, বুঝেছেন, সহনশীল হতে হবে।

মনে রাখবেন, আপনি ডাক্সায় বাস কবছেন না। জলে বাস কবছেন। জলে বাস কবে কুমিবেব সঙ্গে বিবাদ করবেন না। বরং আত্মসমর্পণ করতে শিখুন। ভক্তি, বিগুদ্র ভক্তিই আপনাকে ত্রাণ কবতে পারে। ফর্মুলা এখানে ভক্তি। এ ফর্মুলায় ঝক্কি নেই, বামেলা নেই, নিশ্চিণ্ডে নিকদ্বিগে বৌ-বাচ্চা নিয়ে ঘর কববেন। দেশের হাল-হকিকত সম্পর্কে আপনি যথাযথ ওয়াক্টিবহাল তো? তাহলে ভক্তি-উপাচারে মস্তান-সুপ্রিমোকে খুশ বাখুন। পরমাযু বেড়ে যাবে।

এলাকা তো ম্যানেজ হল। কিন্তু কর্মক্ষেত্র? ভুল বললাম, কুর্কক্ষেত্র, কুর্কক্ষেত্র। নেপথ্যচারী মহানায়কের খুব কাছেব মানুষ হয়ে ওঠাব চেষ্টা কবুন। তাঁর দৈনন্দিন অসুখ এবং অসুবিধাগুলোব তালিকা তৈরি কবে কোমর বেঁধে নেমে পড়ুন। ফর্মুলা আনুগত্য। নিষ্ঠাব সঙ্গে ছায়াসঙ্গী হয়ে উঠুন। অসুখের দাওয়াই হাতের কাছে এগিয়ে দিন। অসুবিধার ক্ষেত্রে মুক্তিলা আসান দেবতার ভূমিকা নিন। আগে সাধনা, পবে সিদ্ধি। আগে ত্যাগ, পবে ভোগ। আনুগত্যেব মই বেয়ে তরতব করে ওপবে উঠে যান। ভুলেও নিচের দিকে তাকাবেন না। সেখানে অনেক ঈর্ষার চোখ জ্বলজ্বল করছে। বয়ে গেল, বয়ে গেল।

তেলের দাম আছে। তার চেয়েও বেশি দাম ফর্মুলায়। ফর্মুলা গোপন রাখবেন। গোপন রাখবেন পরিমাণেব মাত্রা। কোথায় দু'ফোঁটা, কোথায় পাঁচ ফোঁটা, কোথায় দশ ফোঁটা তেল ঢালবেন, সে হিসেব আপনাব। অভিজ্ঞতা, কাণ্ডজ্ঞান আর যষ্ঠ ইন্দ্রিয়েব সূচু প্রয়োগ। এ টেকনোলজির উদ্ভাবক আপনি স্বয়ং। আপনার তেল-টেকনোলজিব শ্রীবৃদ্ধি ঘটুক। খোদা হাফেজ।

গঙ্গামণির স্বামীর অসুখে ডাক্তারদের কন্ফারেন্স শুরু হল নাকি? এদিকে একই ঘরে একই পাড়ার পাঁচজন ডাক্তার। এঁদের মধ্যে অনেকেই অনেককে দু'চোখে দেখতে পারেন না।

তারাপদ রায় ও গঙ্গারাম

তারাপদ রায়



সে দিন গঙ্গামণির কাছ থেকে একটা জরুরি ফোন পেয়ে গঙ্গারামের বাসায় গিয়ে উপস্থিত হলাম। তখন সকাল এগারোটো সাড়ে এগারটা বাজে। আমি গঙ্গামণির ফোন পেয়ে আশঙ্কা করেছিলাম—গঙ্গারামের হার্ট স্ট্রোক হল কিনা। কিন্তু সেটা তো হওয়ার কথা নয়। গঙ্গারাম সারাদিনে যথেষ্ট কায়িক শ্রম করে। তাছাড়া মিতাহারী, বয়স ত্রিশের কোঠায়—এরকম ক্ষেত্রে হৃদরোগ স্বাভাবিক নয়।

আমার অনুমান সত্যি। গিয়ে দেখলাম গঙ্গারাম এই গরমেও কবল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। জ্বর ঠাই ঠাই করে তিন-চার ডিগ্রিতে উঠে গেছে। সঙ্গে সঙ্গেই গঙ্গামণি ডাক্তারকে ফোন করতে গিয়েছিল। গঙ্গারাম তাকে বাধা দেয়। এত জ্বরেও তার রসিকতা ফুরোয়নি। সে গঙ্গামণিকে বলেছে—

“এখন ডাক্তার ডেকে কি করবে? আরেকটুকু জ্বর বাড়ুক। দমকলে ফোন করো। তখন আমি দমকলের আওতায় চলে যাব।”

কিন্তু কিছুক্ষণ পরে ব্যাপারটা আর ইয়ারকি রসিকতার পর্যায়ে থাকেনি। গঙ্গারাম বিছানা য় আচ্ছন্নের মতো পড়ে থাকে। ভয় পেয়ে গিয়ে গঙ্গামণি আমাকে ফোন করে। অবশ্য সে ডাক্তারকেও ফোন করেছে।

যাই হোক, আমি যেতে গঙ্গামণি একটু সাহস পেল। গঙ্গারামও কবলের ফাঁক থেকে মুখ বার করে আমাকে কি বলতে যাচ্ছিল, আমি তাকে হাত দিয়ে থামিয়ে দিলাম।

বৈশিষ্ট্য অপেক্ষা করতে হল না। ইতিমধ্যে ডাক্তারবাবু এসে গেলেন। তিনি একটু দেখেই বললেন,—“মনে হচ্ছে সাবেকি ক্যালকাটা ম্যালেরিয়া। তবে রক্ত পরীক্ষা করতে হবে।”

এই বলে ডাক্তারবাবু প্রেসক্রিপশন লিখে একশ টাকা ভিজিট নিয়ে চলে গেলেন।

ডাক্তারবাবুকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গেছি। দেখি, সিঁড়িতে আরেক জন ডাক্তার। এই বাড়িতেই ঢুকছেন।

দ্বিতীয় ডাক্তারকে দরজা ছেড়ে দিয়ে প্রথম ডাক্তার বেরিয়ে গেলেন। আমি ভাবলাম—ব্যাপারটা কি? গঙ্গামণি কি দু'জন ডাক্তারকেই কল দিয়েছে?

ডাক্তারবাবু ঢুকেই জিজ্ঞাসা করলেন—“রোগী কোথায়?”

তাকে বাইরের ঘরে বসিয়ে আমি বললাম,—“বসুন, দেখছি।”

বাড়ির মধ্যে ঢুকে গঙ্গামণিকে দেখতে পেলাম না। গঙ্গারামকে জিজ্ঞেস করলাম—

“গঙ্গামণি কোথায়?”

গঙ্গারাম বলল,—“ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন হাতে করে বেরিয়েছে। বোধহয় ওষুধ কিনতে গেল।”

এবাড়ির বাইরের ঘরের পাশে একটা দরজা আছে। সেখান দিয়ে বারান্দা হয়ে বেরিয়ে যাওয়া যায়। গঙ্গামণি বোধহয় তা-ই করেছে। তাই যাওয়ার সময় দেখতে পাইনি।

ইতিমধ্যে বাইরের ঘরে লোকের কথাবার্তার শব্দ শুনে অবাক লাগল। ডাক্তারবাবুকে তো একা বসিয়ে এলাম। আবার কে এল। গিয়ে দেখি—এ পাড়ারই আরেকজন ডাক্তার এসেছেন। দু'জনে কথাবার্তা বলছেন। আমি বাইরের ঘরে পৌঁছতে না পৌঁছতেই দেখি আরো তিনজন ডাক্তার বাড়িতে ঢুকলেন। আমি তো অবাক। একি ব্যাপার। গঙ্গামণির স্বামীর অসুখে ডাক্তারদের কন্ফারেন্স শুরু হল নাকি? এদিকে একই ঘরে একই পাড়ার পাঁচজন ডাক্তার। এঁদের মধ্যে অনেকেই অনেককে দু'চোখে দেখতে পারেন না। রীতিমতো বহুগর্ভ ব্যাপার। এ ওঁর দিকে কটমট করে তাকাচ্ছেন। অন্য একজন স্টেথোস্কোপের নল টেনে টেনে লম্বা করছেন। সবচেয়ে প্রবীণ ডাক্তারবাবু জুতোর গোড়ালি দিয়ে মেঝেতে ঠকঠক করছেন। আমার কি করণীয় বুঝতে পারছিলাম না। এমন সময় গঙ্গামণি এল। সে আমাকে ভিতরের ঘরে নিয়ে বলল—“একসঙ্গে ছ'জন ডাক্তারকে কল দিয়েছিলাম। এর মধ্যে যিনি প্রথম এসেছেন তাঁকে রোগী দেখিয়েছি। তাঁকেই ভিজিট দিয়েছি, পুরো একশ টাকা।

আমি বললাম—“বাকিরা?”

গঙ্গামণি বলল—“বাকিরা দেবি করে এসেছে। তাদের রোগীও দেখাব না, ভিজিটও দেব না। শুধু একশাপ করে চা।”

ডাক্তারবাবুরা অবশ্য চা খেলেন না। রাগারাগি করতে করতে চলে গেলেন। শুধু একজন তরুণ ডাক্তার কাতরকণ্ঠে বললেন—“আজ তিনদিন কোনো কল পাইনি। বড় আশা করে এসেছিলাম।” গঙ্গামণি ভালো মেয়ে। সে আলমারি খুলে আরো একটা একশ টাকার নোট বের করে শেষের সেই ডাক্তারকে দিল।

কেন জানি না থেকে থেকেই মনে হয়,
আহা মেচেদাটা একবার ঘুরে এলেই
হত। বিশেষ করে এঁড়েদা ঘুরে আসার
পর মেচেদা না যাওয়াটা কেমন যেন
ছন্দপতন বলেই মনে হয়েছিল আমার।



মেচেদায় আমার যাওয়া হয়ে ওঠেনি। যাই যাই করেও কেন জানি না শেষপর্যন্ত আর যাওয়া হয়নি।

যাবার যে বিশেষ কোনো কারণ ছিল তা নয়। কাজেবশে ওদিকে আমার যাবার কথা নয়। শশুববাড়ি, মামার বাড়ি কোনোটাই আমার মেচেদায় নয়। মাসি, পিসি, আত্মীয়-বন্ধু তেমন কেউ ওখানে থাকতেন বলে কখনিকালেও ওনিনি। হাওয়া বদল করতে অনেককেই এদিক-ওদিক যেতে দেখেছি। কিন্তু কাছেপিঠেই ঘাটশিলা, শিমুলতলা, জামতাড়া, মধুপুর থাকতে খামোখা মেচেদায় 'চেঞ্জে' যাব কোন দুঃখে।

হ্যাঁ, অনেকেই অবশ্য হিন্দিদিল্লি বেড়িয়ে আসেন এটা-ওটা দেখার লোভে। সারা দেশটাতেই তো তাজমহল, কুতুব মিনারের মতো কত সব সেকেন্দ্রে ঘরবাড়ি, দবগা-দুর্গ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। কিন্তু মেচেদায় সে গুড়েও বালি। দেখার মতো কিছু নেই ও অঞ্চলটায়। বরং কাছাকাছি মধ্য ব্যাঙুলে পর্তুগিজ চার্চ আছে। তিনশ চারশ বছরের পুরনো তো হবেই। কতলোকেই তো দেখতে যায় উইক এণ্ডে।

গুণ্ডগোলটা সেইখানেই। আগঙ্গার দেশ বলেই ইতিহাসের রাজহাঁসবা গলা দুলিয়ে ইদিকটায় আর ভেসে আসেনি। পর্তুগিজ, ওলন্দাজ, ফরাসি, ইংরেজ—সবাই গঙ্গার বুকে দাপাদাপি করে গেল। তাই হুগলি, ব্যাঙুল, সেরামপুর, চন্দননগর, চুচড়ো, মায় কলকাতা পর্যন্ত গঙ্গাব হাওয়া খেতে খেতে বাংলার ঔপনিবেশিক ইতিহাসের অনেকগুলো পাতা দখল করে বসল। গঙ্গার বুকে না হওয়ায় ইতিহাস ছুঁই-ছুঁই করেও মেচেদাকে আর ছুঁলো না। মেচেদার ভূগোলই জায়গাটার ইতিহাস ভঙুল করে দিলে। আজ

মেচেদা

ওমরিকা গুপ্তো

যে সুতানটি, গোবিন্দপুরের এত দাপট, সে তো ওই গঙ্গার কল্যাণেই। গঙ্গা যদি ওই গ্রামগুলোর থেকে পাঁচ দশ ক্রোশ ঘুরে সাগরমুখে হত তাহলে সুতানটি গোবিন্দপুরের আজ আর কলকাতাই হওয়া হত না।

সেই জন্যেই মেচেদা মেচেদাই রয়ে গেল, ওর আর মেসোপটেমিয়া বা ঐতিহাসিক কোনো নগরী হয়ে ওঠা হল না। অতএব মেচেদায় ছাতার কী দেখতে যাব?

না, মেচেদায় যাবার তেমন কোনো কারণ নেই ঠিকই, কিন্তু অকারণেও তো মানুষ হরদমই এখানে ওখানে যায় আসে। এই তো আমিই সেদিন ঝুটমুট চাকদা, এঁড়েদা ঘুরে এলাম। তা এঁড়েদাই যদি যেতে পারি, মেচেদাই বা যাব না কেন? বন্ধু দম্পতি শঙ্করলাল-ইন্দ্রাণীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ওরা মেচেদা গেছে কি না। যাযনি। ওরা অবশ্য এঁড়েদাও যায়নি।

সত্যি বলতে কি কারণ যেমন নেই তেমনি মেচেদা যাবার অকারণও খুব একটা নেই। জায়গাটা কার্গিল বা কাশ্মীরের কাছাকাছি নয়। গুজরাট থেকে অনেক দূরে। নরেন্দ্র মোদী তো নয়ই, কোনো মোদী পদবীর ব্যক্তিই মেচেদায় থাকেন না। মার্কিন ইন্টারেস্ট বলে কিছুই নেই মেচেদায়। অতএব তালিবান আল-কাযদার উৎপাত বলেও কিছু নেই। স্থানীয় ঝঞ্ঝাট কমই বলব। গড়বেতের তুলনায় মেচেদায় সি পি এম তৃণমূলের ক্যাডেট-কলহ অনেক ঢিলেঢালা। সেদিক দিয়ে জায়গাটা নিবিবিলি, নির্বিবাদী, সম্ভ্রাসমুত্ত বলেই মনে হয়।

কথাটা তর্কের খাতিরেই উঠল। অত সাত-সতেবো হিসেব করে আমি মেচেদায় যাবার কথাটা ভাবিনি। আব যাব ভাবলেই ডো যাওয়া যায় না। যাওয়ার ল্যাটা অনেক। শুধু নিজের ইচ্ছে হলেই হবে না, ঠাকুরের ইচ্ছেটাও হওয়া চাই। এই তো তিন-তিনবার টিকিট কেটে সীট রিজার্ভ করেও পুরী যাওয়া হয়নি আমার। একটা না একটা উটকো বাধা যাত্রা নাস্তি করে দিয়েছে। প্রথমবার হায়দ্রাবাদ অপারেশানে ট্রেন চলাচল বন্ধ। দ্বিতীয়বার মেজবৌদির সীজারিয়ানের ঝুঁকি পোয়াতে হল আমায় দাদাব অবর্তমানে। শেষবার বানে ভেসে গেল কটক, পুরী, ভুবনেশ্বর। ওগুলো নাকি কোনো বাধাই নয়, সেরেফ ভড়কি। আশ্বাস দিয়েছিলেন পাতিপুকুরের কণক পিসিমা। অতঃপর রায় দিয়েছিলেন উনি, জগন্নাথ না ডাকলে জগন্নাথথামে রেল চললেও বান না ডাকলেও যাবার কোনো উপায় নেই। মানতেই হল আমাকে, জগন্নাথের ডাক আমি শুনতে পাইনি। না ডাকলে শুনবই বা কী করে? সমুদ্রের হাঁকডাকেই আমি পুনঃপুনঃ পুরীতে পাড়ি দেবার প্রয়াস করেছিলাম। আমি একা নই। জানাশোনার মধ্যে যারাই পুরী গেছেন তাঁদের প্রায় সবাই আমায় বলেছেন সমুদ্র দেখতেই তাঁদের পুরী যাওয়া। এক বাণী ছাড়া। বাণী ঠাকুর। বাণীকে নাকি প্রতিবছরই জগন্নাথ ডাকেন। এবাব নিয়ে বাণী বোধহয় বার কুড়ি পুরী ঘুরে এল। হয়ত বৈশি।

জানাশোনার মধ্যে জগন্নাথ জন্ কেনেথ, গলব্রেকও ডাকতেন।

একবার নয়, বারবার। কেনেডির আমলে ভারতে রাষ্ট্রদূত ছিলেন গলব্রেথ সাহেব। আমিও তখন দিল্লিতে মার্কিন দূতাবাসে লেখালিখির কাজ করি। পরিচয় তো ছিলই, যে কোনো কারণেই হোক কিছুটা সৌহার্দ্যও গড়ে উঠেছিল দু'জনের মধ্যে। ঠিক স্টাফ হিসেবে গণ্য না করে ভদ্রলোক আমায় “কোলিগ” সম্ভাষণেই সম্মানিত করতেন।

পুরী যাওয়ার বাতিক ছিল গলব্রেথের। প্রায় প্রতি হপ্তা-শেষেই সাহেব ছুটতেন পুরী। বি এন আর হোটেল সাত ফুট লম্বা অতিথির জন্যে বিরাট খাট অর্ডার দিয়ে বানিয়েছিল। প্রত্যক্ষদর্শীর কাছে শুনেছি, সমুদ্র এবং সৈকতেই ফন্টার পর ফন্টা কাটিয়ে দিতেন সাহেব। মন্দিরের ভেতরে হয়ত যাবার উপায় ছিল না, কিন্তু দুয়োরেও উনি ধনী দিয়েছিলেন বলে শুনি। অবশ্য গলব্রেথ জানতেন না যে জগন্নাথের ডাকেই ওনার বারবার লাগাতার পুরী পরিভ্রমণ সম্ভব হয়েছিল। কলক পিসিমার সঙ্গে দেখাই হয়নি সাহেবের। কাশী গেছি আমি। আশিবার না হলেও বার আঠারো তো হবেই। জগন্নাথের মতো বিশ্বনাথের অত ডাকাডাকির বালাই নেই। বারাগসীর টিকিট কাটলেই দিব্যি বাবাদর্শন ও গঙ্গাস্নান দুটোই হয়। ওই রথ দেখা আর কলা বেচা আর কি। এখন মেচেন্দার গড়-ইন-রেসিডেন্স যদি জগন্নাথ হন, সেক্ষেত্রে দুটো জগন্নাথের মুখ খোলার অপেক্ষায় আমাকে কান খাড়া করে থাকতেই হবে।

অবশ্য মেচেন্দায় যে আমায় যেতেই হবে, এমন নয়। ডাক্তার আমায় মেচেন্দা যাবার নির্দেশ দেননি। এমনকি ওখানে না গেলে এখানের রাস্তার কালো কুকুরে যে আমাকে কাটবে, এমন ভয় আমায় পাতিপুকুরের কলক পিসিমাও দেখাননি। না গেলে আমার নিজেও যে খুব একটা আশাভঙ্গ হবে তাও নয়। কত জায়গায়ই তো যাওয়া হয়নি। শুধু পুরী তো নয়, চাঁদের ঘাটেই বা কবে গেলাম। মেমারি গেছি ঠিকই, কিন্তু বইটি তো পাশেই, তবু যাওয়া হল কই? নীলফমারি, ফটিকচারি, বাঁশবেড়ে, উলুবেড়ে, গাদঘাট, কুস্তীঘাটে কত লোকেই তো গেছে। আমার যাওয়া হয়নি। জন্ম ইস্তক কলকাতায় আছি, তবু ব্যাটরা কোথায় তা-ও জানি না, যাওয়া তো দূরের কথা।

কিন্তু তবু কেন জানি না থেকে থেকেই মনে হয়, আহা মেচেন্দাটা একবার ঘুরে এলেই হত। বিশেষ করে ঐডেঁদা ঘুরে আসার পর মেচেন্দা না যাওয়াটা কেমন যেন ছন্দপতন বলেই মনে হয়েছিল আমার। পয়ার রচনার পথ বোধহয় বন্ধই হয়ে গেল আমার। ইদানীং অবশ্য বিয়েতে ছাপানো কবিতা বিলির চলটা নেই বললেই চলে। মামাতো মাসভূতো বোনদের বিয়েতে কবিতা লিখে দেবার অনুরোধ তেমন আর আসে না, তাই রক্ষে। তবে বলা তো যায় না, দৈবাৎ যদি তেমন অনুরোধ এসেই পড়ে, তখন ওই গদ্য কবিতা লিখেই কাজ চালিয়ে নিতে হবে, হয়ত!!



শ্রী সূশীলকুমার সান্যাল

প্রয়াণ : ১৭ই জুলাই ২০০২

প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি ও ভূতপূর্ব প্রধান পৃষ্ঠপোষক, পত্রপাঠ

ছোট্ট চণ্ডে যাওয়া—সে কখনো নয় যাওয়া
তোমারি অগ্ন্যোকে অগ্ন্যগ্নীর পথ যাওয়া....

—সম্পাদক, পরিচালকবৃন্দ, কর্মীবৃন্দ—

১০জে, ফার্ম রোড, কলকাতা-১৯

২৭শে জুলাই ২০০২

পত্রপাঠ

প্রচ্ছদ কাহিনী

শুধুই পুতুল

কৌশিক রায়



হা লফিলে টি ভি, সিনেমা, ডি. ভি. ডি; হোম থিয়েটার আর ইন্টারনেটের জগৎজোড়া আল না হয় সারা দুনিয়ার মনকে বেঁধেছে বেঁধেছে। তবে বছর পনেরো-কুড়ি আগেও বিনোদনে বা তামাশার ব্যাপারটায় এত বেশি যান্ত্রিক বোতাম টেপার কিছু ছিল না। যাত্রা-উরজার আসর ডো ছিলই। তা ছাড়াও খোলা মাঠে প্রায়ই একশতান তাল্লিমাঝা একটা তাঁবু পড়ত। রংচটা গেটের ওপর সাবি সারি কাঁচা হাতের আঁকা কাঠের বা টিনের পাতের ওপর ছবিতে কখনো সাপেকাটা লখিন্দরকে নিয়ে বেঙ্লা, মাথায় ফেটি বেঁধে ফুলন দেবী, শ্রৌপদীর কাপড় ধবে দাঁত বের করা দুঃশাসন অথবা হাসিমুখে বনের দিকে চলা রাম-সীতা। প্রতি সন্ধ্যায় তিনটে শো। ‘দুই টাছা’-র টিকেট কেটে তাঁবুর ভিতর ঢুকলেই সুতো আর কাঠির টানে জ্যাজ হয়ে ওঠা পুত্রশোকে পাগল চাঁদবেনে, মহিষাসুরকে শূলে বেঁধা দেবী দুর্গা অথবা মা কালীর পায়ের কাছে আছাড় খাওয়া সাধক রামপ্রসাদ। পুতলনাচ দেখে চোখ মুছতে মুছতে মা দিদিমা মাসিমারা বহিরে এসে বলতেন—“আহা-হা! বেঙ্লাব মতন সতীলক্ষ্মী এয়োগ্রী কয়ডা জন্মায় কও দিহি!”

ভুবনভাঙা ব্যাপারটির সেই পুতলনাচই আজ চলছে—সারা দেশ আর পৃথিবী জুড়ে। যেখানেই তাকানো যাক না কেন সব জায়গাতেই দামি জামা আর রংদার তকমা নিয়ে কলকাঠির টানে দেহ-মনকে নাচাচ্ছে সাক্ষীগোপালবা। দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা হুকো বরদার হয়ে রয়েছেন মন্ত্রীদেব হেডমাস্টাররের কাছে, আবার মন্ত্রীদেব মাথা তাঁর মানসন্মান বিক্রিয়ে দিয়ে

বসে আছেন তাঁব পরমারাধ্য পালক পিতা (এবং মাতা) রাজনৈতিক দলের ব্যাকস্টেজ ছকুমনার কাছে—দরজার আড়াল থেকে আদুরে বৌয়ের ইশারাতে ভড়কে দু’কান কাটা কর্তা যেভাবে নিজের বাবা-মাকে বাড়ি থেকে কাটানোর জন্য আপিসের মাইনে কমে যাওয়ার বেস্তান্ত শোনান। বাংলা ও ইংরেজি স্কুলে দিদিমণি-দাদামণিরা ছাত্রছাত্রীদেরকে টেক্সট বই-এর বাইরে এক কলমও না লেখার হুমকি দিয়ে কাষ্ঠপুতল বানিয়ে রাখেন। আবাব তাঁরাই পুতুলেব মতো বাম-যেঁষা অথবা ঘাসফুল ফোটানো শিক্ষক সংস্থার কলকাঠিতে নিজেদের বেঁধে রাখেন।

হেডমিস্ট্রেস বা অধ্যাপক-এর পয়সাওয়ালী পোস্ট হাসিল কবা যায় কীভাবে? ফুটবল টিমের জেতা-হারার পাতলা সুতোতে পুতুল হয়ে ঝুলতে থাকে অসাধারণ বুদ্ধি ও স্কিল ওয়ালা কোচদেব ভবিষ্যৎ। বিশ্বাসঘাতকদের পান্নায় পড়ে কানপাতলা হয়ে গিয়ে মুঘল শাহজাদা দারারশিকো অথবা বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলা যেভাবে বুদ্ধিরাজ ছত্রসাল এবং মোহনলাল-মীরমদনকে আদেশ দিয়েছিলেন শত্রুর সামনে থেকে সেনা সরিয়ে নিয়ে নিজেদের সম্মানের ব্যারোটা বাজায়ে, সেরকমই কলের পুতুল হয়ে নিবোধ রাষ্ট্রনায়ক এবং সেনানায়কদের কথাত্মতো নিশ্চিত জয়ের মুখ থেকে সৈন্যদেরকে সরিয়ে নিয়ে আসতে হয় অনেক অপবাজেয় সেনাপতিকেই। দেশের ও দেশের কল্যাণের জন্য নিজেদের প্রতিভাকেই উৎসর্গ করার শপথ নিলেও অনেক বিজ্ঞানীকেই শেষ পর্যন্ত ছদ্মি ও বাগড়াটে সরকারের নিষ্ঠুর অঙ্গুলি হেলনে হতে হয়েছে মারণাস্ত্র তৈরি করে পৃথিবীকে নিশ্চিহ্ন করে

দেওয়ার অসহায় কারিগর। দাগি আসামি—পাইপ রোডের পেটোচরণ বা কালিতলার হাতকাটা হালুয়াকে পেটো-পাইপগান-রক্তমাখা ছুরি সমেত হাতেনাতে ধরলেও থানার ও সি বা আই জিকে নিমেষেই কলকাঠির পুতুল হয়ে যেতে হয়, যখন ফোনে পার্টির লোক্যাল কমিটি সেক্রেটারি বা এম. এল. এ বা ততোধিক প্রভাবশালী কারো ‘আদেশ’ আসে—পার্টির ‘একনিষ্ঠ’ কর্মী এবং ‘সচ্চিরত্ৰ’ ‘কাজের ছেলে’ হালুয়া আর পেটোকে বেকসুর খালাস করে দিন।

বড়লোকের উচ্ছ্বসে যাওয়া ছেলে, পেনশন ভোগী মাস্টার মশাই-এর ফুলের মতো নিষ্পাপ, কলেজগামী মেয়েটিকে অন্তঃস্বত্ত্বা করে দিলেও ছেলের বাবার হাতের নোটের তাড়া অথবা ভাড়াটে পিস্তলবাজেরা সেই মাস্টার মশাইকে বোবা পুতুল বানিয়ে দেয় অনায়াসেই। তার বদলে সেই ‘কলঙ্কিনী’, ‘কুমারী মা’ মেয়েটির জন্য অপেক্ষা করে থাকে ঝোঁলার জন্য ঘরের সিলিং ফ্যান অথবা রেললাইন। আসলে বিশ্বজুড়ে পুতুলখেলার অংশীদার হতে গিয়ে নিজের সজীব সচল অস্তিত্বটাই খেলো হয়ে গেছে সাত তাড়াতাড়ি।

জাঁকাজমক পূর্ণ রাজনৈতিক সাক্ষীগোপাল হয়ে থাকার সবচেয়ে বড় উদাহরণ এই উপমহাদেশে বোধহয় ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি পদটি। সংবিধানে বলা হয়েছে—ভারতের যাবতীয় রাজনৈতিক অর্থনৈতিক এবং সামরিক সিদ্ধান্তের চূড়ান্ত রূপকার নাকি রাষ্ট্রপতি। ব্যাপারটা শুধু কাগজে কলমেই। ক্যাবিনেট মন্ত্রীসভার লিডার প্রধানমন্ত্রীর কথামতোই কোনো আইন পাশ হলে সেখানে শুধু সেই করার ক্ষমতাই আছে রাষ্ট্রপতির, বিলের ব্যয়ন নিজের পছন্দ না হলেও। দেশের জল স্থল ও বায়ুসেনা বাহিনীর হর্তাকর্তা বিধাতা নাকি রাষ্ট্রপতিই। কিন্তু একজন রাষ্ট্রপতিরও কি খুঁটির জোর আছে একটা ‘মিগ’ জঙ্গি বিমান বা একটু ‘অর্জুন’ ট্যাঙ্ক খরচা দিয়ে দুটো প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং চারটে প্রাথমিক বিদ্যালয় বানিয়ে দেওয়া? তাহলেই প্রতিরক্ষা মন্ত্রক তাঁর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠবে। হয়ত সংসদে টি টি পড়ে যাবে—বুড়ো রাষ্ট্রপতির মাথাটাই বিগড়েছে—মগজ খোলাই করতে করা দরকার। এমনকি যুদ্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্তও গ্রহণ করবে ক্যাবিনেট। রাষ্ট্রপতি নিয়ম মারফি সেটি ঘোষণা করবেন মাত্র।

জ্ঞানী জৈল সিং তখন ভারতের রাষ্ট্রপতির চেয়ার পাকড়ে আছেন। শিখদেব স্বঘোষিত নেতা সন্ত জার্নাইল সিং ভিন্দ্রানওয়ালের মাথায় খেয়াল চাপল—শিখদেব জন্য আলাদা রাষ্ট্র ‘খালিস্তান’কে খুবলে নিতে হবে ভারতের শরীর থেকে। জৈল সিং কিছু বলার আগেই প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ডুকুম দিলেন ‘অপারেশন ব্লুস্টার’ শুরু করার। জৈল সিংকে ইন্দিরার হুমুনামায় দস্তখত দিতে হল পুতুলের মতো! সেনাবাহিনীর সাহায্যে, খালসা ধর্মমত আর আকাল তখতের তোয়াক্কা না করেই ইন্দিরা অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরে লুকিয়ে থাকা শিখ উগ্রপন্থীদের শেষ করে দিলেন। ভিন্দ্রানওয়ালেবও পরপাবে যেতে বেশি দেরি হল না। অবশ্য ইন্দিরা গান্ধীও এই সামরিক অভিযানের জের-এ শিখ দেহরক্ষীদের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যান।

‘রাবার স্ট্যাম্প’-এর মতো প্রধানমন্ত্রীর আর্জি মোতাবেক কাজ করতে হয়েছে নিলম সঞ্জীব রেড্ডি, বরাহগিরি ভেঙ্কট গিরি, ডাঃ জাকির হুসেন, ফরুদুদ্দিন আলি আহমেদ-এর মতো রাষ্ট্রপতিদেরও। এই সময়ে ভারতীয় জনতা পার্টি এবং জাতীয় মোর্চা সমর্থিত রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী, পারমাণবিক বিজ্ঞানী ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞান উপদেষ্টা ডাঃ আবদুল কালাম-এর

ক্ষেত্রেও ‘পুতুল’ কথাটা ঝাটলেও ঝাটতে পারে। পোখরানে আনবিক বোমার ভূগর্ভস্থ পরীক্ষাতে ফুল মার্কস পেলেও জনাব কালাম কিন্তু কৃত্রিম উপগ্রহগুলোকে মহাশূন্যে পাঠাতে এখনো স্টাব মার্কস পেতে পারেননি। সেক্ষেত্রে যান্ত্রিক গোলযোগ, অন্যান্য বিজ্ঞানীদের ভুলত্রুটি আর প্রযুক্তির হেবফেব-এর অজুহাত দেখিয়ে কালাম সাহেব বলছেন যে মহাকাশ-শক্তি বানাতে তাঁর ছান কয়লা হয়ে যাচ্ছে। রাষ্ট্রপতি হিসেবেও তিনি এইসব অজুহাত দেখাতেই পারেন। বিশেষত রাষ্ট্রপতির করণীয় যেখানে বিশেষ কিছুই নেই।

বাম সমর্থিত রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী এবং নেতাজির আজাদ হিন্দ ফৌজের ঝাঁসির রাণী ব্রিগেডের প্রধান ক্যাপ্টেন (কর্ণেল) লক্ষ্মী স্বামীনাথন (সায়গল) আসলে হবকিষণ সিং সুরজিৎ, সীতারাম ইয়েচুরি, প্রকাশ কারাত, জ্যোতি বসুদের কথাতেই তাঁর মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন। ভারতের ব্রিটিশ সংগ্রামেব শেষ ‘অ্যাকশন হিরো’-র সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে তিনি ইন্সফল ও কোহিমাতে তেরঙ্গা ঝাণ্ডা উড়িয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু দুর্নীতি আব শয়তানির মাইন বিছোনো ভারতীয় রাজনীতির রণক্ষেত্রে অশীতিপর বয়সে তিনি কতটা আস্থ থাকবেন সেটাই ভাবার বিষয়।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতেও মুখ্যমন্ত্রীদের কথামতো আইনের বসড়াত্তে মুখ বুজে সেই মারতে হয়েছে রাজ্যপাল কৈলাসনাথ কট্টু, সৈয়দ নুসুল হাসান, এ এল ডায়াস, ভৈরবদত্ত পাণ্ডে অথবা এ আর কিদোয়াকৈ। এখনকার রাজভবনের বাসিন্দা শ্রী বীরেন জে শাহ্ উঠে পড়ে লেগেছেন রাজ্যে শিল্প ও বিদেশি বিনিয়োগের মরা গাঙে জোয়ার এনে দিতে। এদিকে ম্যাককিনসে রিপোর্টে দেখানো হয়েছে যে রাজ্যে শিল্প-প্রযুক্তির কঙ্কালটাই শুধু অবশিষ্ট। এক্ষেত্রে ভোটব্যাঙ্ক তৈরি কবাব জন্য মহাকরণ কি গভর্নরের কাগজবিধিকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছেন না? এমন কি সন্তরের দশকে কলকাতায় সিদ্ধার্থশংকর রায়ের কংগ্রেসি সরকার নকশালদের দমনের অঙ্কিলায় নির্বাচনে নরহত্যা, শারীরিক অত্যাচার এবং নারী নির্যাতন চালিয়েছিল। তখনো রাজ্যপালেব কাষ্ঠপুস্তকের মতো বসে থাকা ছাড়া আব কোনো উপায় ছিল না।

বাজ্য বামফ্রন্টের চালকদেব বিরুদ্ধে বাতচিং করতে গেলেই পার্টির একদা নির্ভরযোগ্য সদস্যকেও নাকানিচোবানি খেতে হয়। সেইফুদ্দিন চৌধুরী আর সমীর পুতুলের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা তাই-ই ঘটল। যখনই আলিমুদ্দিন স্ট্রিট-এর মাতবররা নজর করলেন যে সফি-সমীররা আর তাঁদের আঙুলেব নাচনে ওঠাবসা করছে না, তখনই দু’জনকে অচ্ছুৎ করে দেওয়া হল। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে চূবমাব হওয়ার কারণই হল লেনিন-স্তালিনের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের হাইকম্যান্ডের নির্দেশে কাঠের পুতুল বনে যাওয়া। মার্শাল বুলগানিন এবং আলেক্সেই কোসিগিন-এর মতো ঝানু মন্ত্রীদের ব্রেজনেভ-ইউরি আন্দ্রোপভ ও কনস্তান্টিন চেরনেমকের জমানাতে পুতুলের মতোই চলতে হয়েছে। মিখাইল গোরবচেভও সাম্যবাদের কাষ্ঠনীতি জগাধলি দিয়ে মার্কিনীদের বাণিজ্যবাদের দাসানুদাস হয়ে মস্কো-ফ্রেমলিনে ‘গ্রাসনস্ত’ আব ‘পেরোব্লেসকা’র উদার খোলা বাজারের বসন্তবাতাস বইয়ে দিলেন। হলে কি হবে, কমিউনিস্টদের রেলগাড়ির খোলে কয়লা তখন ফুরিয়ে গেছে। পুতুল সরকার ‘হেইয়ো’ বলে টান দিলেও সোভিয়েত দেশের এশীয় শরিকরা, যেমন কাজাখস্তান, তুর্কমেনিস্তান বা কির্গিজিস্তান-এর নেতারা মুখ ফিরিয়ে যে যার মতো কেটে পড়লেন। রুশ কমিউনিস্টদের কবরের ওপর প্রেসিডেন্ট হলেন বরিস ইয়েলিৎসিন। পার্টির পলিটব্যুরোর

চাইদের আঙুলের ইশারাতে এবং সৈন্যবাহিনীর হোমরা-চোমরা আলেক্সান্দর সেবেদ-এর পরামর্শ মতো ইয়েলৎসিন হুকুম দিলেন আর্মেনিয়ার নাগোরনো কারাবাখ অঞ্চলে স্থানীয় জন অসন্তোষ এবং চেচনিয়া প্রদেশের রাজধানী গ্রজ্জনি-তে বিদ্রোহ দমন করতে। বিদ্রোহ থামানো গেল, কিন্তু তদদিনে চেচেন নেতা জোশার দুদায়েভ-এর ঝটিতি গেরিলা আক্রমণ একবছরের বেতন বাকি থাকা কশ সেনাবাহিনীর কোমর ভেঙে দিয়েছে। এখনকার কশ বাষ্ট্রপতি ডাদিমির পুতিন-এব জোড়াতালি সরকারের ওপবও কলকটি নাড়াতে শুরু করেছে সেনাবাহিনী, আলাউদ্দিন খিলজি যেভাবে শেষ জীবনে তাঁর প্রধান সেনাধ্যক্ষ, মালিক কাফুর এবং হুকুমের দাসানুদাস হয়ে পড়েছিলেন।

মন্ত্রীসভার প্রধান বা প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতিদেবকে ঠুটো জগন্নাথ বানান ঠিকই, তবে নিজেরাও মন্ত্রীসভার সদস্য-বন্ধুদের কথামতো ডাইনে-বাঁয়ে মোচড় মারেন না—এটা হতেই পারে না। কংগ্রেসি মন্ত্রীসভাব ওপর নির্বিধায় ছড়ি ঘুরিয়ে এসেছেন সীতারাম কেশরীর মতো ঘাঘু রাজনীতিক সভাপতিরা। কংগ্রেস মন্ত্রীসভা যেন জামাইবস্তীতে অপোগণ্ড জামাইকে মাছের মুড়ো দিয়ে তোয়াজ করা শ্বশুরবাড়ি। প্রেনের ককপিট ছেড়ে প্রধানমন্ত্রীর মিউজিক্যাল চেয়ারে বসতে না বসতেই বাজীর গান্ধীকে বোর্কস কামানের প্যাচে ফাঁসিয়ে দিলেন তাঁরই পেয়ারের দুই অরুণ—অরুণ নেহেরু আর অরুণ সিং। ১৯৬২ সন নাগাদ চৌ এন লাই-এর চীন দেশের বিবন্ধে লড়তে গিয়ে চাচা নেহেরুর হাড়ির হাল হত না, যদি না তিনি ডি কৃষ্ণমেনন এবং সচিব এম ও মাথাই-এর শলাপবামর্শ শুনে নাচতে নাচতে সৈন্যসজ্জা করতেন। অটল বাজপেয়াজির টলটলায়মান অবস্থা অবশ্যই খুলে যাওয়া হাঁটু এবং সবেধন নীলমণি কিডুনিটির জন্য। তবে আর এস এস এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ‘হেডমাস্টার’ অশোক সিংঘল এবং তাঁর চালাদের অক্ষাং তিলককাটা গেরুয়াবাজীদের ‘পরামর্শ’ শুনতে গিয়ে অটলজি দেশের সুস্থ রাজনীতির পটল তো তুলিয়েছেনই উপরন্তু গুজবট বাজাকে সাম্প্রদায়িক নরহত্যার নরককুণ্ড বানাতে দেখেও তাঁর এমন কিছু ধৈর্যচ্যুতি ঘটেনি।

প্রাণিয়ার প্রধানমন্ত্রী অটো ফন বিসমার্ক, অস্ট্রিয়ার প্রিন্স ক্রেমেন্স ফন মেটারনিখ আর ইংল্যান্ডের উইলিয়াম পিট—এঁরা প্রধানমন্ত্রী হয়ে শুধু তাঁদের ক্যাবিনেট কেন, আশপাশের দেশগুলোর মন্ত্রীসভা নিয়েও ডাঙগুলি খেলেছেন। রাজনীতির সাপলুডোতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতিরা বহু আগেই ঘুঁটি হয়ে গেছেন। ৪৭-এব প্রাণঘাতী দাঙ্গার সময় নোয়াখালি জাণশিবিরে মুসলিম শরণার্থীদের অসহায় অবস্থা দেখে মহাত্মা গান্ধী টেলিফোনে কিছু কথা বলতে চেয়েছিলেন স্বাধীন ভারতের দুই প্রধান—জওহরলাল নেহেরু এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সঙ্গে। কোনো সাড়া পাননি জাতির জনক। প্যাটেলের চোখটিপুনিতে পণ্ডিত নেহেরু বলেই দিলেন—তিনি ব্যস্ত, দেখা করতে পারবেন না। সর্দার প্যাটেল নয়, তাঁর সেক্রেটারি ফোনে গান্ধীজির সেক্রেটারি প্যাবেলালকে সাফ জানানলেন, প্যাটেল সাহেব এখন খুব ব্যস্ত, আপাতত কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া যাচ্ছে না। সেই মুহূর্তে ঘরশত্রু বিভীষণদের বিরুদ্ধে আবেকটি আন্দোলন গড়ে তোলার ইচ্ছে থাকলেও বাদ সেধেছিল গান্ধীজির অশক্ত শরীর, বার্ষক্য।

রক্তলোভী, উপনিবেশবাদী জঙ্গি রাষ্ট্রনায়কদের খেয়াল মেটাতে গিয়ে ‘যুদ্ধ’ নামক নরমেধ যজ্ঞে প্রায়ই কাঠের পুতুল হয়ে পড়তে হয় সৈনিক

ও সেনানায়কদের। ১৯৭১-এব মুক্তিযুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের ওপর থেকে দখলদারি সত্ত্ব সরিয়ে নিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর চাপে সেই দেশকে গণপ্রজাতন্ত্রী ‘বাংলাদেশ’ রাষ্ট্রের স্বাধীন মর্যাদা দিতে বাধ্য হয়েছিল পাকিস্তান। খানসেনাদের পরাজয় স্বীকার কবে আত্মসমর্পণেব দলিলে সেই করেছিলেন জেনারেল নিয়াজি। পবে জানা গেছিল, স্থলবাহিনীতে যথেষ্ট সংখ্যক সৈন্য এবং গোলাবারুদ মজুত থাকা সত্ত্বেও পাক রাষ্ট্রপতির পদে বসাব জন্য এটি ছিল জুলফিকার আলি ভুট্টোর কৌশল। তাঁরই কূটনৈতিক প্যাচে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জেনারেল নিয়াজিকে জেনাবেল অরোরার কাছে মাথাটি বাড়িয়ে দিতে বলেন।

বাইজানটিয়ান সাম্রাজ্যের অধীশ্বর জাস্টিনিয়ান-এর হুকুমের ঠিক একইভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করতে বাধ্য হয়েছিলেন সেনাপতি বেলিসারিয়াস। নিমকহাবাম মীবজাফব-এর পরামর্শে ঘাবড়ে যাওয়া সিরাজউদ্দৌলাব হুকুম মাকিক রবার্ট ক্রাইভ-এর ভীতসন্ত্রস্ত ফৌজের ওপর হামলা করা বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন মীবমদন। তিনি যুদ্ধ চালিয়ে গেলে পলাশীব আমবাগানে হয়ত বাংলাব অটুট স্বাধীনতার একটা নতুন অধ্যায় বচিত হতে পারত। রুশ রাষ্ট্রনায়ক যোসেফ স্টালিন-এর হুকুমে মেনেই জার্মান সেনাদেরকে আক্রমণ কবে হাস্পেরির রাজধানী বুদাপেস্টে রক্তেব নদী বইয়ে দিয়েছিলেন মার্শাল গেওর্গিছুকভ। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘনঘটাব সময় নাৎসি সর্বাধিনায়ক ফ্যুয়েরার হিটলারের আদেশের বিরোধিতা করেছিলেন সেনানায়ক আর্ভউইন রোমেল। তাই পুতুল না হয়ে ‘গুপ্তচর’ হওয়ার ‘অপরোধে’ রোমেলকে কোর্ট মার্শাল-এ দাঁড় করানো হয়। অথচ ফ্যুয়েরার একবারও ভেবে দেখেননি যে ‘মকভূমিব শিযাল’ রোমেল সাহারা মরুভূমির অন্তর্গত এল আলামিয়েন নামক অঞ্চলে তাঁব অধীনস্থ প্রবাদপ্রতিম ‘প্যানজার’ ট্যাঙ্কবাহিনী নিয়ে কিংবদন্তী ব্রিটিশ সেনাধ্যক্ষ ফিল্ডমার্শাল মন্টগোমাবিকে শুইয়ে দিয়েছিলেন প্রায়।

খেয়াল-খুশির পুতুল বানিয়ে নাচানোব দৃষ্টান্ত সম্ভবত বেশি দেখা যায় খেলাধুলোর জগতে। ছোট বড় ক্লাব, তা সে মাঝেরপাড়া ‘জুবোক সম্ঘো’ই হোক আর ‘ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড’ হোক—টাকাপয়সা আর প্রচার পাওয়ার জন্য প্রভাবশালী রাজনীতিকদের হাতটান সেখানে থাকেই। কলকাতার ময়দানের তিন প্রধান—ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান ও মহমোডান স্পোর্টিং ফুটবল ক্লাবের দলবদলের রং ঘন ঘন পাশ্টাতে নেপথ্যে আসল ভূমিকা নেন টুটু বসু বা মীর মোহসাদ ওমব-এর মতো ‘দাদা’রা। তাঁদের আঙুল নাচানোব জন্যই বঙ্গ ফুটবল আঙিনায় বেনো জলের মতো হোসে ব্যারেটো, ইগর স্কিরিভিন, চিমা ওকোরি বা জুলিয়েন ক্যামিনো-র মতো সাগবপারের ফুটবলাররা এসে জাঁকিয়ে বসেছেন। ক্লাবকর্তাদের এ ধরনের ম্যানিপুলেশন-এর জন্য নতুন প্রজন্মের ফুটবলপ্রেমীদের মন থেকে সূত্রত ভট্টাচার্য, হরজিন্দর সিং, বিদেশ বোস, পিটার থঙ্গরাজ, কম্পিয়া, চুয়া গোস্থামী, জেভিয়ার পায়াস, প্রসূন ব্যানার্জি বা পেমা দোবজি-র মতো চৌশল ফুটবলাবাবা হয়ত শিগগিরই স্মৃতির তলানিতে তলিয়ে যাবেন। যাচ্ছেন। বিদেশেব পেশাদারি ফুটবল লীগগুলোতেও খেলোয়াড়দের নিয়ে পুতুল খেলাটা এমন ন্যাকারজনক পর্যায়ে চলে গেছে যে সেখানে মোটা দক্ষিণাব বিনিময়ে যে কোনো নামি ফুটবলারকে বেচে দেওয়া হয়। ইতালির একনম্বর ক্লাব এ সি মিলান এর হর্তাকর্তা শিল্পপতি সিলভিও বার্লুসকোনি এবকমভাবে বহু ফুটবলারের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছেলেখেলা করেছেন। ইতালির তারকা ফুটবলাবাবা—রবার্তো বাজ্জো, গিয়োনিনি, সালভাদোর স্কিলাচ্চি, ওয়াশটার

জেন্স-রা ঠিক এইরকম পুতুলখেলার শিকার হয়েছেন বহুবার। ১৯৩৪ আর ১৯৩৮ সালে ইতালির ফুটবল দল বিশ্বকাপ জেতে। সেইসময় ইতালির কোচ ভিক্টোরিও পোজো কিন্তু ছিলেন ফাসিস্ত একনায়ক বেনিতো মুসোলিনিব হাতের পুতুল। পোজো বুঝেই নিয়েছিলেন—মুসোলিনির কথামতো পিওলা কলোসি লুইজিমণ্টি-গিসেল্লি মেয়াঙ্কার মতো ফুটবলারদের ঠিকমতো নিয়ন্ত্রণ না করলে ফাইনালে ইতালি হাঙ্গেরি ও চেকোস্লোভাকিয়ার বিরুদ্ধে হাবতে বাধ্য। তা হলেই পোজোর অন্য মুসোলিনি সযত্নে ফায়ারিং স্কোয়াড সাজিয়ে রাখবেন।

রিয়েল মাদ্রিদ, বার্সেলোনা, স্টুয়া বুখারেস্ট বেয়ার্ন মিউনিক, বেনফিকা, ডায়নামো কিয়েভ, আর্সেনাল—সব প্রথম সারিব ফুটবল দলেই প্লেয়ারদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এভাবে পুতুলখেলা চলে, সাতিন আমেরিকাতে, বিশেষ করে কলম্বিয়াতে অবস্থাটা আরো ভয়াবহ। কোটিপতি ড্রাগ মافیয়ারা অকাতরে কালো টাকা চালে ফুটবল ক্লাবগুলোকে চালানোর জন্য। ম্যাচ জিততে ভুলচুক হলেই শুধু খেলোয়াড় নয়, কোচ-ম্যানেজারদের জন্যও গরম বুলেট অপেক্ষা করে থাকে। বিশ্বকাপ ফুটবলে একবার সামান্য ভুলেব বশে নিজের

দলেব গোলে বল চুকিয়েছিলেন কলম্বিয়ার বিশ্বমানের ফুটবলার আদ্রিয়াস এক্সোবার। ব্যস; রেস্তোরাঁ থেকে বেরোবার মুখেই মافیয়াদের ভাড়াটে গুণ্ডার বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে যান তিনি। প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হল কোচ ফ্রান্সিসকো মাতুরানাকেও। প্রাণ বাঁচানোর ভয়ে প্রায় দেশ ছাড়ার মতো অবস্থা হয় কলম্বিয় অধিনায়ক কার্লোস ভালদাবেমা, কাউস্তিনো অ্যাসপ্রিনা আর ফ্রেদি বিন্‌কনেরও।

শুধু ফুটবলই নয়, অন্যান্য খেলাতেও পুতুল বানানোর দৃষ্টান্ত বড় একটা কম নয়। কৃষ্ণস মুষ্টিযোদ্ধারা ‘বর্ণবৈষম্য’ নামক ঘৃণ্য পুতুলখেলার শিকার কম হননি। কিংবদন্তী বঙ্গার জ্যাক জনসনকে বহুবার শ্বেতাঙ্গ কর্মকর্তাদের কথামতো ম্যাচ ছেড়ে দিতে হয়েছে। একবার তো তাঁকে বস্ত্রিংয়ের এবেনাতে পাড়ে যাওয়াব পব উঠতে মানাই করা হয়। ‘ব্রাউন বস্ত্র’ জো লুই, মোহাম্মদ আলি, এজার্ড চার্লস বা জর্জ ফোরম্যান—এর মতো নামজাদা বঙ্গাররাও রেহাই পাননি এই পুতুলখেলা থেকে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি পুতুল খেলেন কে? তিনি কি আমাদের সেই অদৃশ্য নিয়ামক? না কি সবই অলীক কল্পনা?

প্রয়োজনী

দিব্যলোচন কলমধারী

বাবুদের আমলে সংসার ছিল ‘সোল প্রপাইটির’। এখন জয়েন্ট ভেন্টচার। ফিফটি ফিফটি। আমি বেলাছি, তুমি পেকে নাও। আমি ফোড়ন দিলাম, তুমি সাঁতলে নাও, আমি ধুয়ে দিলাম, তুমি মেলে দাও। তার আগে সাদা কাপড়ে দু’ফোঁটা রু আমি, দু’ফোঁটা তুমি। আরো চরম উদাহরণও আছে। তুমি অফিস যাচ্ছ। ফিরব আমি। সেই সন্ধ্যা বেলী আর সালোয়ার জগতে। পরকীয়া প্রেম ফিরে ফিরে আসে। আমি জন্মেছি, মরবে তুমি। ভেড়ুয়া নিয়ে ভেন্টচার হয় না। এখন শেষারের যুগ। মালীও কটা শেয়ার কিনে কোম্পানির মালিক। কর্পোরেট ফ্যামিলি। দাও তোমার চশমাটা। দুটুকরো করি। ইউরোপিয়ানরা কত উন্নত! একটা প্যাণ্টেব দুটো পকেট। দু’জনের জন্যে। আর তোমার পাঞ্জাবিতে দুটো সুড়ঙ্গ। হাত গলালে হাঁটুতে ঠেকে যাবে। স্বামী সব শুনে বলল, চলো, দাড়ি কামিয়ে আসি।

জল আর মিথ্যে—সংসারের দুটো নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু। শাঁসালো শব্দর থাকলে কামাই ছাড়াও সংসার সচল। কিন্তু মিথ্যেহীন সংসারে সারি সারি নিমগাছ। যমরাজের বাগান। কোথায় আমি? কোথায় তুমি? কোথায় খুকি? হেঁসেল? জলছাত? টুলু পাম্প? উডো ফোন? কাটা বাঘ? তিরিশের সকালে পকেটে খরা।

- শুনছ? গুপি মাছওলা মরে গেছে। আজ বাজার বন্ধ।
- ঈশ—কবে?
- কাল রাতে।
- কী করে জানলে? তুমি তো বাজারই গেলে না।
- খবরে বলল।
- তবে আর কি। লেডো বিস্কুট মধুতে ঠুকে ঠুকে আজকের দিনটা



চালিয়ে নাও। খুকি, লেপ বেব কর।

জলপাইগুড়িতে মলি-শালিব বিয়ে। গেলে হাজার পাঁচেক। না গেলে শ’ পাঁচেক।

—হার্নিয়ার ব্যাথাটা। চড়ছে গো—। তোমরা যাও। ওখানে গিয়ে কিছু হলেই হয়েছে। বোনকে সধবা করতে গিয়ে তুমি বিধবা হবে।

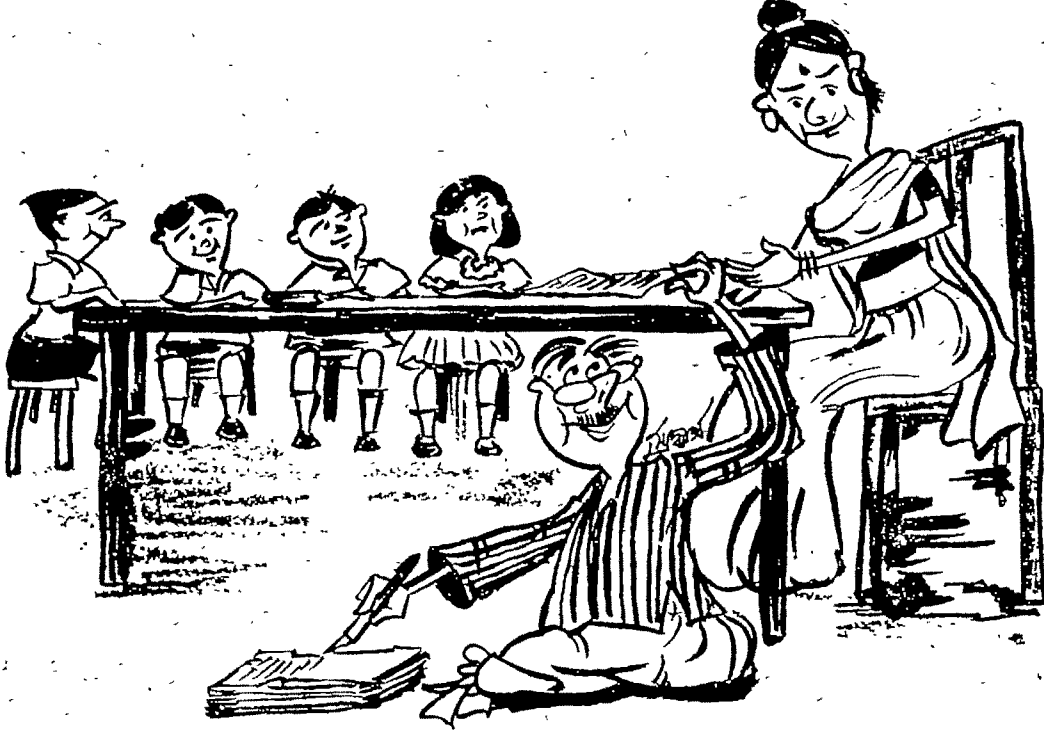
—কি আবাব হবে? তাছাড়া জলপাইগুড়িতে সদর হাসপাতাল আছে।

—ওটাই তো চিন্তার—। ডাক্তার বলেছে হার্নিয়া অপারেশনে হারানোর কিছু নেই। কিন্তু সরকারি হাসপাতালের বেডে যমরাজের চেলারা শুয়ে থাকে। চোখে দেখা যায় না। ওদের গায়েব ওপর শুয়ে পড়লেই হয়ে গেল। রাত্রিবেলা ফুস্লে বের করে নিয়ে যাবে। তোমরা সকালে গিয়ে দেখবে আমি আর নেই। নানা পাটেকর—না না, থাকগে। মলির গিফটটা ডলির বেলা ধরে দেব। চলো বাটনা বাটবে। মেয়েদের কখনো হার্নিয়া হয় শুনেছ?

গল্প

অথ গৃহিনীর গৃহশিক্ষকতা

অলোক বসু



কি ছুদিন ভজুস্যারের মুখে মনে বেশ ভারী রকমের মেঘ জমেছিল। কিন্তু সব শুনেটুনে গিম্মি পুটুরানী উপায় বাতলেছেন। সে বেশ এক মোক্ষম উপায়।

আহা! আমার কুটু কুটু পুটুরানী যেন ঠিক লেডি চাণক্যের জেরক্স কপি। মনের সুখে এখন ভাসছেন স্যার ভজুবাবু। ব্যাপার হল কি, ইদানীং সরকার বড় কড়া হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতি ঘটানোর মানসে রীতিমতো আইন করে মুচলেকা নিয়ে শিক্ষকদের গৃহশিক্ষকতা বন্ধ করা হয়েছে। না, শিক্ষাক্ষেত্রে আর কোনো নৈরাজ্য নয়। অনেক হয়েছে। এবার পরিকাঠামো ঠিক করতে হবেই হবে। অতএব গৃহে আর নয়, বাইরে, অর্থাৎ কেবল ইন্সকুলেই শিক্ষকতা চলবে। তা, এই আইনে কোচিং-বিলাসীরা একটু মুশ্কিলে পড়েছেন। কিন্তু আইনের আবার এদিক-ওদিক আছে। গৃহে যেমন সেয়ানা গৃহিনী। অতএব রীতিমতো মুচলেকা দিয়েও ভজুস্যার দিবি কামাচ্ছেন। ইদানীং শিক্ষকদের মাইনে নেহাৎই মন্দ নয়। তবে গৃহশিক্ষকতার সঙ্গে তার কি আর তুলনা চলে!

তবে ভজুস্যাবের ইংরাজি কোচিং-এর ব্যাপারে অভিভাবককুল বেশ গল্পগদ। দক্ষিণা তেমন গলাকাটা নয়। কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের রেজাল্ট

প্রতিবছরই বেশ ভালো। তিনি নাকি বেশ পড়িয়ে থাকেন। গাধারাও সাদা খাতায় গাদাগাদা লিখে 'জাদা' নম্বর পেয়ে যায়। ভজুস্যারের অনেক ব্যাচ। ছাত্রসংখ্যাও অনেক। এক জেরক্স কপি বিলি করে করে কত কামিয়ে নিল ভজুব্যাটা। জেরক্সের জন্য আলাদা চার্জ ধরে দিতে হয় অবশ্য। নিন্দুকেরা বলে, ভজু নাকি তার শালার সবকারি অফিস থেকে বিনা পয়সায় জেরক্স করায়। তবে কিনা এ ব্যাপারে নিন্দুকোবা ঠিকও বটে, বেঠিকও বটে। সবসময় নয়, মাঝে মাঝে সুযোগ সুবিধে বুঝে বিনা পয়সার জেরক্সও করবে থাকেন। সবসময় করলে ঠিক মান থাকে না।

পুটুরানী বয়সের ভারে চর্বি'র ধলে হয়ে ইদানীং সামান্য পুখুলা। ভজুস্যারের আদর করে ডাকা কুটু কুটু পুটুরানী ক্লাশ এইট পাশ। খাটি সার্টিফিকেট আছে। ঐ যে রকম খবরের কাগজে শোনা যায়, সেরকম ঐ কর্পোরেশনের মজদুরদের মতো ফরমায়েসি নয়। তবে বুদ্ধিসুদ্ধি তেমন ছিল বলে মনে হয়নি। রাম্মাবামা খারাপ করত না। আর সেই কিনা কেমন বিপদের বুদ্ধি বাতলে দিল। কোচিং-এর দু'একজন অভিভাবক একটু দোদুল্যমান ছিলেন।

—স্যার, মুচলেকা—

—কোনো সমস্যা হবে না। ভজুস্যারের অগাধ আত্মবিশ্বাসে মুচলেকা নাকচ,—যেমন চলছে তেমনই চলবে।

—যদি সরকার কড়াকড়ি করে? তদন্ত করা শুরু করে?

—কিছুই প্রমাণিত হবে না তদন্তে। —ভজুস্যার মনে মনে বলেন, আমার কুটু কুটু পুটুরানী আছে যে। সে ভারী বুদ্ধি ধরে। (না, মানে এতদিন তেমন ধরত না—কিন্তু ইদানীং ধরছে!)

কোচিং-এর একটু এদিক-ওদিক হবে না। তবে কিনা সামান্য মুখবদল হবে। সেও নাম কা ওয়াস্তে। নেপথ্যে আসল কোচই থাকবেন। যদি কিনা খুব কড়াকড়ি হয় তাই আগে থাকতেই কিছু মহড়া। বলা কি যায়, নিজের দল কিংবা বিরুদ্ধ দল কখন পেছনে লেগে যায়। টাকা কামানোকে কি কেউ সহ্য করতে পেরেছে?

তবে এখনো পর্যন্ত ঐ, নামেই মুচলেকা।

ভজুবাবুর রিটারের বারো বছর এখনো বাকি। ছেলে মেয়ে সব কোচিং-এর দৌলতে বড় বড় জায়গায় জাঁকিয়ে পড়াশুনা করছে। সামান্য সরকারি খোরাকিতে কি আর এসব হয়? অতএব কিছু জ্ঞানপিপাসুকে জ্ঞান দিয়ে পকেটের টান কিছু কমে।

তার একদা কুটু কুটু পুটুরানীকে এখন যেন আবার নতুন করে মিষ্টি লাগে। আহা রে, আমার রসগোল্লাটি। স্বামীর “MONEY” যাতে রাহাজানি না হয় তার জন্য কী সুন্দরই না ফন্দি। মনে হয় অতীত দিনের মতোই পুটুরানীর গাল টিপে দিয়ে আদর করে বলেন—আমার কুটু কুটু পুটুরানী। আহা। জলি রঙের ম্যাক্সি-পরিহিতা বেচপ সাইজের গেরামভারি পুটুরানী অবশ্য বলল, পেরাকটিক্যাল হতে শেখো। টাকাগুলো তোমার কপালে থাকলে তোমারই। আমি তো নিমিত্ত মাত্র।

—তুমি আমার ইস্তিরির মতো ইস্তিরি। সরকারি মুচলেকা আইন কেমন ইস্তিরি করে পরিপাটি করে দিলে।

ছেলে সামান্য কাছাকাছি ছিল। সে বেশ বুঝছিল হাফ বুড়োবুড়ির আবার বেশ প্রেম জেগেছে। এ কি স্বার্থের পেরেম বাবা। এক মুচলেকায় কোচিং ডুবুডুবু ছাত্র ভেসে যায়। সে সামান্য ফাজিল গলায় চট্টিয়ে বলল—তুমি বরং তোমার আদরের পুটুরানীকে একটু শিথিয়ে পড়িয়ে নাও। নাহলে এদিকে যা কাশ হবে।

পুটুরানী ছেলের অজ্ঞতায় যারপরনাই অবাক,—ভারী আমার এলেন। বিশেষজ্ঞ তো থাকবেই তোর বাবা। আমি শুধু জেরঞ্জ কপি বিলোবো—আর তদন্ত হলে পড়াবার ভাগ করে বলল—পড়ো সব, লেখো সব।

—ঘোড়িডিম।—ছেলে বলে, ঐ আইনই থাকবে। এভাবে হয় নাকি। অসম্ভব।

ভজুস্যারও ভাবেন। হয়ত ভাবগতভাবে এ আইন ঠিকই। কিন্তু অসম্ভবও বটে। স্কুলে কেউ কেউ পড়ায় না ঠিকই, কিন্তু সবাই তো ঠিকিনাজ্জ নয়। তিনিও স্কুলে যথেষ্ট মন দিয়েই পড়িয়ে থাকেন। আসলে সেই মাম্বাতার আমলের সিলেবাসের বোঝা। এগুলো বেশ ভালো রকম কমিয়ে দেওয়া উচিত। এ তো প্রায় অত্যাচার।

মুচলেকায় পাড়ায় সামান্য খুশির হওয়া। শালার কোচিং-এর টাকার স্রোত এবার একটু কমুক। কিছু লোক বেজায় খুশি। পাড়ায় সব দম্ পাটি, শাস পাটি, ছিপির পাটি—সবাই অল্পবিস্তর আওয়াজ ভাসায়, চুকচুক শব্দে বলে,—এই আইনটা কি ঠিক বাস্তব সম্মত হল মেশোমশাই? এ যে কত ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা।

কেউ বলে—নৈরাজ্য। পরিকাঠামো ঠিক না করে এসব করা কি ঠিক? কেউ জিজ্ঞেস করে—পরিকাঠামো জিনিসটা কি? খায়, না মাথায় দেয়?

—আজ্ঞে—ঐ যে বাংলায় বলে না ইনফ্রাস্ট্রাকচার।

—ও! তাই বলুন। তবে কিনা স্কুলবাসে গিয়ে সিলেবাস শেষ করা যায় না। এত বিরাট সিলেবাসে প্রত্যেক সাবজেক্টকে মনে হয় যেন অমনিবাস।

কেউ কেউ ঠাট্টাচ্ছিলে বলে—সরকারি শিক্ষকদের বেশ ভালোই বাঁশ হয়েছে গো। গাছেরও খাব আবার তলারও কুড়োবো। শালা সব টাকার পিচাশ।

আসলে কিছু শিক্ষক কিছু ডাক্তারের দায়িত্বহীনতা, কর্তব্যে অবহেলার জন্যই আজ এই অবস্থা। আসলে সবকিছুতেই যে গোড়ায় গলদ।

আলোচনা উঠেছে—সরকারি শিক্ষকদের মুচলেকা দিয়ে গৃহশিক্ষকতা যে বন্ধ করে দেওয়া হল তা যে সঠিকভাবে পালন হচ্ছে তা দেখার কি হবে? কে পাহারা দেবে? পাবলিকে বলছে—শিক্ষকদের নৈতিক অবনমনের বিরুদ্ধে পুলিশ পাহারা থাকবে নাকি? নাকি স্থানীয় ছেলেদের দিয়ে গ্রহণ? সর্বনাশ! স্থানীয় যুবকবৃন্দ যে কী জিনিস। এরা যে জরুরি অবস্থার পুলিশের চেয়েও সাঙ্ঘাতিক। —মেসোমশাই কিছু ভাববেন না—আমরা স্-স্থানীয় যুবকরা পাহারায় থাকব— কেউ জিজ্ঞেস করলে বলব স্যার পড়ানো ছেড়ে দিয়েছেন—

—না ভাই, একেবারে ছাড়িনি, স্কুলে এখনো পড়াছি—নাহলে খাব কি?

—না—ব—বাড়িতে শ—শিক্ষাদান?

—সে তো আমি করি না ভাই—আমার জেরঞ্জ কপি নিয়ে তোমাদের মাসিমা করেন। তিনি ইদানীং গৃহশিক্ষিকা হয়েছেন—

—গৃহিনীর গৃহশিক্ষকতা। ব—বলেন কি? তিনি তো শুনেছি বেশিদূর—

—তোমরা তো সব পি-টি-আই। সবই জানো। তা ঐ ঠিক করলাম লালু-রাবড়ি কেসের মতোই ব্যাপারটা। লালু জেলে, রাবড়ি সিংহাসনে—

—তাহলে মুচলেকা মানে একপ্রকার জেলই বলুন।

—তা আর বলতে। আর্থিক অনটন মানেই তো জেলে বন্দী রে ভাই! লালু গেল জেলে, রাবড়ি বসে রাজ্যপাটে। মুচলেকায় গেল সেই, গিমি ধরেন মই। কোচিং-এর ছাদ ধসে পড়ছে না। বিভিন্ন চাঁদাপাটি মুচলেকার সুরে প্রচ্ছন্ন আশ্বাসি হুমকি দেয়—

—মেশোমশাই দিনকাল ভালো নয়, চাঁদাটা একটু বেশি করে—

—না ভাই, এখন তো গৃহশিক্ষকতায় মুচলেকা পড়েছে। তাই চাঁদাটাও ভাই—

এমন সময় কুটু কুটু পুটুরানীর আবির্ভাব।

—তোমাদের মেশোমশাইয়ের সরকারি আইনে আমদানি কমেছে। উনি এখন গৃহশিক্ষকতা করেন না। ওনার বদলে আমিই করি এখন।

—আপনি?

—আমি তো আর সরকারি গৃহিনী নই। তাই মাছ ভাজতে ভাজতে যা শিখেছি। তোমাদের স্যারকে পাশে বসিয়ে শিক্ষাদান করি—

—পাশে বসিয়ে? তাহলে সেই তো একই হল?

—না একই হল না। উনি মাঝে মাঝে একদম অবৈতনিক ভাবে বিশেষজ্ঞের মতামত দেন—

—তাহলে কোচিং-এর সব মালকড়ি, মানে মাইনে এখন সব আপনার?

P 36,081

—ওই হল।

পুটুরানী এখন গৃহশিক্ষক হয়েছেন। ভজুবাবু পাশে বসে প্রায় সারাক্ষণই বিশেষজ্ঞের মতামত দিয়ে চলেন। সবাই জানে কে পড়াবে, তবুও পুটুরানী বিচক্ষণতার সঙ্গে এখন থেকে দায়িত্বশীল গৃহশিক্ষকতা শুরু করেছেন। কে জানে কখন হঠাৎ আইনের কড়াকড়ি শুরু হয় আর পাড়ার লোকেরা পেছনে লাগে! যন্তোসব কুচুটের দল।

ইদানীং ভজুস্যারের পুটুরানীকে বেশ ইয়ে লাগছে।

মাঝে মাঝেই মনে মনে বলে ওঠেন—আমার কুটুকুটু পুটুরানী! পুটুরানী ইদানীং গোটাচারেক নতুন ম্যাসি না হাউসকোট না কি যেন কিনেছে। শাড়ি পরে পড়ালে নাকি কেমন ম্যাডমেডে ব্যাকডেটেড লাগে। বরং হাউসকোট পরে পড়াতে বসলে বেশ পরিবেশটা বিদেশ বিদেশ লাগে। হাজাব হোক ইংরাজি ভাষা তো! কোন ফচুকে একদিন বলল, মাসিমা—

—আই চোপ। পুটুরানীর ধমক—এটা ‘কোচিন’, সবাই ‘ম্যাডাম’ বলে ডাকবে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমরা জানি স্যারের স্ত্রীলিঙ্গ ম্যাডাম—বিশেষজ্ঞ তখন পাশের ঘবে টেলিফোন ধবতে গেছেন। এক কোচিং-পুত্র বলল,—প্যাসিভ ভয়েসটা একটু বুঝিয়ে দেবেন ম্যাডাম?

অবশ্য ভজুনি বিশেষজ্ঞ এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। পরে পুটুরানীর একটু জ্ঞানপিপাসা জেগে উঠেছিল। ভজুবাবুকে বলছিলেন,—প্যাসিভ ভয়েসটা আমাকে একটু বুঝিয়ে দেবে গো?

বিশেষজ্ঞ মতামত দিলেন,—এই বয়সে ভয়েস নিয়ে নাই বা কষ্ট করলে। তাছাড়া সব ব্যাপারে একটু প্যাসিভ হতে শেখো—জীবনে আনন্দ পাবে—

—হ্যাঁ—সব ব্যাপারে প্যাসিভ হলে তোমার কোচিনও ভেসে যাবে।

পুটুরানীর কথা শুনে বিশেষজ্ঞ ভাবী পুলকিত হন। সত্যিই তো গিমি তাঁর কত অ্যাকটিভ। আরো ভালো লাগে তাঁর পুটুরানীকে। ভারী ওজনদার আর বুঝদার বৌ তাঁর। এবার সত্যি সত্যি বলে বসেন,—আমার কুটুকুটু পুটুরানী।

—আদিক্যোতা! মনে মনে খুশি হলেও গৃহশিক্ষিকা মুখ ঝামুটে ওঠেন,—বুড়ো বয়সে ভীমরতি!

কিছুটা থেমে পুটুরানী বলেন,—পরশুদিন দিল্লি থেকে তোমার Present Perfect-Continuous Tense ফোন করেছিল—

—মানে?

—সেই যে গো তোমার ছোটশালীকে খুব দরদ দিয়ে শিখিয়েছিলে—যে কাজ অতীতে আরম্ভ হয়ে এখনো চলছে—ভবিষ্যতেও চলতে থাকবে বোঝায়—

—ম-মানে আছে?

—থাকবে না আবার! কি যে হিংসে হয়েছিল! ভাগ্যিস, সে এখন দিল্লিতে স্বামীঘর ঘরে।

ভারী হাসতে থাকেন প্রাক্তন গৃহশিক্ষক ভজুবাবু। আবারও মনে মনে বলেন—আমার কুটুকুটু পুটুরানী। তোমার বুদ্ধি তো বেশ। মুচলেকার কড়াকড়ি হোক বা না হোক, তোমার মাথার থেকে বুদ্ধি বেশ বেরিয়েছে! তুমি থাকবে সামনে ভাবতীয় রাষ্ট্রপতি হয়ে নিয়মমাফিক— পেছন থেকে তোমাকে চালাবে প্রধানমন্ত্রীর দল। কোচিং-এ আমার জেবক্স কপি বিলোকে— তুমি আর আমি সাবাক্ষণই বিশেষজ্ঞের মতামত দিয়ে যাব—

কুটুকুটু পুটুরানীর পরামর্শে বাড়ির সামনে কোচিং-এর হোর্ডিং-এ যোগাযোগের স্থানে ভজুবাবুর পবিত্র পুটুরানীর ভালো নাম শ্রীমতী কমলাসুন্দরী দাসী লেখা হল। ছেলে বলল, দাসী—তে কেমন যেন ঔপনিবেশিক ঔপনিবেশিক গন্ধ! যেন মনে হয় বড়লোকের বউ মন্দিরের চাতাল বাঁধিয়ে দিয়ে মোজাইকে তার নাম খোদাই করে দিয়েছে। ছাত্রদের অভিভাবকবৃন্দ অবশ্য সবই জানেন।

পাড়ায় ষ দিন কমলাসুন্দরী দাসীকে নিয়ে খুব হাসাহাসি হল।

হঠাৎ একদিন সেই হোর্ডিং-এ দেখা গেল আলকাতরা দিয়ে বড় বড় করে লেখা—মুচলেকা।

নির্ধাৎ কোনো চ্যাংড়ার কাজ।

উটে বেশি প্রচার হয়ে গেল কমলাসুন্দরী কোচিং সেন্টারের। ছাত্রস্রোত আসতে লাগল। অভিভাবকবৃন্দ ভাবী ভালো, সদয় আর বুঝদার। তাঁরা কমলাসুন্দরী কোচিং-এর প্রতি খুবই আস্থাশীল। শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য দূর, হোক, পরিকাঠামো ঠিক হোক। কিন্তু লালুর বদলে রাবাড়ি বা ভজুস্যারের পাশে পুটুরানী জিন্দবাদ।

চ্যারা চোখে

জবাব চাই, জবাব দাও

আগে প্রাথমিক শিক্ষকেরা বিয়ের বাজারে রাত্য ছিলেন। ইদানীং কয়েকটি পে-কমিশনের দযায় ইঁহারা এবং শিক্ষাদানে রত সর্বজাতীয় পাত্ররাই পাত্রীর পিতাদের চোখে সুপাত্রে পরিণত হইয়াছিলেন। এমনকি স্কুল-কলেজের বাহিরে কোচিং সেন্টার বা নোটবই কৃত রোজগার থাকিলে তাহা পাত্রীর বাবার কাছে একস্ট্রা ক্যারিকুলাব অ্যাকটিভিটি রূপে পরিগণিত হইত। কিন্তু হায! সেই একস্ট্রা ক্যারিকুলাব অ্যাকটিভিটিই বুঝেরাং হইয়া সেই সুপাত্রদিগের বাজারবদর শেয়ার বাজারের সূচককে

নিম্নাভিমুখী করিতে চলিয়াছে। ডাক্তার হাসপাতালে চাকুরি করিয়া নিজ নিজ চেম্বারে রোগী দেখিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। উকিল আদালতে সওয়াল করিবার পর বিভিন্ন কোম্পানির ইইয়া কাজ কবিয়া অভিজ্ঞতা এবং বাড়ি গাড়ি সঞ্চয় করেন। আব যত দোষ হইল গিয়া শিক্ষকবৃন্দের তঁহাবা সবকারের ভোটের বাডা ভাতে ছাই তো দেন নাই, তবু এমন চক্ষুশূল কেন হইলেন?

—সুরঞ্জনা ঘোষাল

মধু কৈটভের বিষুও

দিব্যেন্দু দাস



যেই না স্টেথো বুকে ঠেকেছে,
কি যে হল, কিসে যে কামড়াল,
তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে লোকটা
খাদে ঝাঁপ দিল। আ' কেস্ অফ
ম্যাসিড্ টাটাবাস ইন্টস্ক্রিকেটেড্
সাইকো-সেরিক্যাল্ এটাক্।

ডা জাব হলে মানুষের দুটো জিনিস হয়। একটা চেম্বার, আর একটা গাড়ি। বাড়ির নিচে চেম্বার হবে। চেম্বারের সামনে গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকবে। কাছেই একটা রিক্সা স্ট্যান্ড হবে। রিক্সাওলাবাই জানবে কখন বসি, কখন উঠি, ক'জন দেখি, কত নি, কোথায় এটাচ, স্বভাব কেমন, হাতযশ কেমন। এফ. এম প্রচার তবঙ্গ। বিশ্বকর্মায় ঠাকুর আর প্যাণ্ডেল আমার খরচ। পাড়ায় পাড়ায় ওরাই আমার প্রতিনিধি। এ তো গেল বাইরের ব্যাপার। দশজন যা দেখবে। ভেতরে ভেতরেও দুটো জিনিস হয়। এক—কোটির মধ্যে আমি একজন মানুষ হলাম। সাগর মেলায় একটা চীনে। একডাকে সবাই চিনে যাবে। সম্মান করবে। পাড়ায় হনুমান এলে আমার ছাদে বসবে না। কাছেই একজন ডাক্তার বসেন। পাল ডাক্তার। সেই পালতোলা যুগের। যখন পাশ কবেছিলেন, আলীবর্দি তখন বাংলা কাঁট দিচ্ছে। কুড়িয়ে বাড়িয়ে চলে। এইবার আমি আত্মপ্রকাশ করলাম। চতুর্দিক উদ্ভাসিত হল। বাড়ির নিচে পিজ্জির ব্রাঞ্চ হল। দলে দলে মানুষের বাচ্চারা দেখাতে আসবে। কাদাটিংগি মার্কা হরকে পাভাভবা প্রেসক্রিপশন হবে। বীরশা মুণ্ডাদের হাতে হাতে মাউন্ট ব্যাটেনেব সই-করা চিঠি। পড়ে কার পিতার সাথি! বতনে রতন চেনে। শকুনে চেনে শেয়াল। পড়বে ওষুধের দোকানি। কষে বিল করবে। বিলের পেছনে ছাপানো ছড়া—

রোগে যাবে কাঁড়ি কাড়ি,
কমিশনে চলে নাড়ি।
এটাব মানে কি বাবা?

অঞ্জলি দেবার সময় মানে জিজ্ঞাসা করে না বাবা। ডাক্তারবাবু রাগ করবেন। গুরোরের কাছে গোটা পৃথিবীটাই রেস্টুরেন্ট। কালকা মেল দিমি যাচ্ছে। ঘূমের ঘোরে 'বাক্স' থেকে পড়ে গেল একজন। এই তো আমি ডাক্তার, একটা সারিডন হাতে দিয়ে বললাম, "মিনারেল ওয়াটার দিয়ে মেবে দিন। আর স্বপ্ন আসবে না। নো মোর ড্রিম!"

স্বপ্নমোষের কথা যখন উঠেছে তখন টুক কবে আমার জানা একটা টেটিকার কথা বলে রাখি। আচমকা লাথি খাওয়া কুকুরের লেজটা চেপে ধরতে হবে। ফাঁকা জায়গা দেখে কষে লাথি হওয়া চাই। ধরতে পারলেই চবম বাস্তব। জীবনের সব স্বপ্ন ওখানেই শেষ।

'অম্বারে' লাঞ্চ চলেছে। হঠাৎ পাশেব টেবিলে একজন 'চাবি চাবি' বলে খাবি খেতে লাগল। এই তো, পাশেই ডাক্তার। লাঞ্চ খাচ্ছি। এটো গ্রাসের জল ছড়া দিতেই কগি শান্ত হল। 'ওভার ডায়েট' হয়ে গেছে। বাড়ি গিয়ে উপড় হয়ে বেডরেস্ট। রুমালের খুঁটে চাবি বেঁধে ঘুকন। টাকার টেনশন বেশি নেবেন না। কাঁচা নুন খাবেন না। কার্বাইডে পাকিয়ে খাবেন।

উঠিতে ভ্রমণ হচ্ছে। একটা ম্যাড্রাসি ফ্যামিলিও গেছে। হিলে উঠে কৃষ্ণ সুন্দবেরা হাঁপাচ্ছে। হঠাৎ লোকটা বুক চেপে ধরে পড়ে গেল। নিশ্চয়ই হার্ট প্রবলেম ছিল। এত কাছ থেকে ডাক্তারের চোখকে ফাঁকি দেওয়া যাবে না। পকেট থেকে 'স্টেথো' বেব করতেই ভিড় ফাঁক হয়ে দাঁড়াল। পেশেন্ট গৌ গৌ করছে। যেই না স্টেথো বুকে ঠেকেছে, কি যে হল, কিসে যে কামড়াল, তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে লোকটা খাদে ঝাঁপ দিল। আ' কেস্ অফ ম্যাসিড্ টাটাবাস ইন্টস্ক্রিকেটেড্ সাইকো-সেরিক্যাল্ এটাক্। তেঁতুল মাথায় উঠে গিয়ে

হয়েছে। ‘নো হোপ’ কেস্।

এবার ডাক্তার হলে ভেতরে ভেতবে যে দুটো জিনিস হয়, তার দু’নম্বর। একপাড়া লোক নিয়ে হাসপাতালে বসে আছে। বৌ ভেতরে লাউ পাডছে। খবর এস, পেড়ে ফেলেছে। চল চল, দেখে আসি। ও বাড়ির দাদুর মতো মুখখানা। সেই নাক, সেই টার্ক। বটতলার বটুক বাপ হলুম। এই আমাব পোটা হয়েচে। আমার গা থেকে হয়েচে! যেন বিষ্ণুর নাভি থেকে মধু হল। জুনিয়র বটুক। মাথার চুল থেকে কড়ে আঙুল পর্যন্ত সব আমার। আবার মিট মিট করে তাকাচ্ছে শযতান! রঙটা পেয়েছে মায়ের মতো—ভেজিটেবিলের চপ। ও বাবা, পায়ে একটা তিল গো! বিদেশ ভ্রমণ করবে। সংহতি এক্সপ্রেস চেপে লাহোব যাবে। শুকে আমি প্রোমেটার বানাব। এই সটে, মিষ্টি নিয়ে আয়। আগে নিচে ড্রাইভারকে দিবি। তিনি আবার আনন্দে পেটেল খেয়ে বসে থাকবেন। কাশিতে মাসিকে ফোন কর। বলবি বটুকেব পোটা হয়েছে। যাঁড়কে একটা গজা খাওয়ায় যেন। মানত ছিল। হরি, জিগ্যেস কব তো বার্থ সার্টিফিকেট আমার হাতে দেবে, না বাচ্চাব গলায় টাঙিয়ে দেবে? লকা-র ভাই রেশন অফিসেব দালাল না? রাতে ধরব।

এই হল মোটামুটি বাপ হওয়ার অভিব্যক্তি। বর্তমান-ভবিষ্যৎ সব ঠিক করে ফেললে ওয়ার্ডে দাঁড়িয়ে। কিসে যে অমন ক্ষেপে গেলে বোঝা গেল না। শুধু বোঝা গেল এ বাচ্চাব শ্বাস-প্রশ্বাস, থাকা-খাওয়া, বেড়ে ওঠা, রাজনীতিক হওয়া, প্রোমেটাব হওয়া সব হবে তোমাব নির্দেশে। এই ভাবটাই হয় ডাক্তার হলে। মানুষেব খাওয়া, শোয়া, পোশাক পরা, চান করা, গা মোছা, দু’বক্সমেব আঁচানো, কান খোঁচানো, বংশ বাঁচানো, নাক ঝাড়া, টেরি কাটা সব হবে ডাক্তাবেব কথামতো। কগি হল ডাক্তারেব পোটা। বার্থ সার্টিফিকেট থেকে ডেথ সার্টিফিকেট আমবাই সই করব। আমরাই চিবে দেব, আমবাই সেলাই করব। আমরাই জোলাপ খাওয়াব। বাপ-মা যা দিতে পারে না সেই ভিটামিন আমবাই খাওয়াব। ঘুম আমরাই পাড়াব, আমরাই কেড়ে নেব। তা’ব জন্যে গালে কেমো খেবাপির কাজল আমবাই পরিয়ে দেব। পাপেব রক্ত ফেলে নতুন রক্ত ভবে দেব। নতুন চোখ বসিয়ে দেব, নতুন কিডনি দেব। কাচেব টিউবে বংশেব বাতি ছেলে দেব। বটতলাব বটুকেব মতো আমরা মানুষেব বাপ। আমবা কোটি কোটি মধু-কৈটভের বিষ্ণু! তোমাদেব সর্বস্ব আমাদের মুঠোয়! বুঝে চলো।

ট্যারা চোখে

সেজেগুজে রইলুম বসে খেলা হল না কপালদোষে

পুরনো কলকাতায় একটা প্রথা বা চল ছিল, কোনো বনেদি বাড়ির উৎসব-অনুষ্ঠানে আত্মীয়-কুটুম্ব যাঁদের নিমন্ত্রণ করা হত, অনুষ্ঠানের দিন তাঁদের নিয়ে আসার জন্য গাড়ি পাঠাতে হত। বিশেষত বাড়ির মহিলাদের আসার জন্য। কারণ মেয়েরা তখন সাধারণত বাড়ির বাইরে বেবোতেন না, এমনকি বাড়ির বৌ-বিদের গঙ্গানানের ইচ্ছে হলে পাঙ্কি করে নিয়ে গিয়ে পাঙ্কিসমেত গঙ্গায় ডুব দিয়ে আনা হয়েছে, এমনও শোনা যায়। এক বাড়ির গিমির নিমন্ত্রণ হয়েছে কোনো এক কুটুমবাড়ি থেকে। নিমন্ত্রণের দিন তিনিও সেজেগুজে তৈরি হয়ে বসে আছেন, কুটুমবাড়ি থেকে গাড়ি এলেই চড়ে বসবেন তাতে। বসে আছেন তো আছেন, আছেন তো আছেন। অপেক্ষায় থেকে থেকে সাজ নষ্ট। আবার সাজ করেন, কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। কোথায় কি, গাড়ি আসার নামগন্ধও নেই। হুয়ত নিমন্ত্রণ-কর্তা কাউকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তিনি বিভিন্ন আত্মীয়-কুটুম্বকে হাজির করতে করতে এর কথা ভুলেই গেছেন। যথার্থই নিমন্ত্রণে যাবার মতো সময় যখন উত্থরে যায়, তখন নিমন্ত্রিতাকে কপালে করাঘাত করে বলতে গোনায়— সেজেগুজে রইলুম বসে, নিতে এলো না কপালদোষে।

এই প্রবাদটি আমরা একটু ঘুরিয়ে বলতে পারি সদ্য শেষ হওয়া ফুটবল বিশ্বকাপের প্রথম রাউণ্ডেই ফ্রিটকে যাওয়া দল আর্জেন্টিনার খেলোয়াড় ক্যানিজিয়া সম্পর্কে— সেজেগুজে রইলুম বসে, খেলা হল না কপালদোষে। বয়স হয়েছে, এই শেষ বিশ্বকাপ। আহত থাকায় গ্রুপলিগের প্রথম দুটো ম্যাচ খেলেননি। সুস্থ হওয়াতে কোচও ঠিক করলেন গ্রুপের তৃতীয় ম্যাচটিতে শেষেব দিকে তাঁকে খেলাবেনই। ক্যানিজিয়াও সেই আশায় মাঠে রিজার্ভ বেঞ্চে সেজেগুজে বসে রইলেন। কিন্তু উত্তেজিত হয়ে মাথাটি হল



আগ্নেয়গিরি। বেফারিকে উদ্দেশ্য করে এমন কিছু অশ্রাব্য শব্দ ব্যবহার করলেন যে রেফারি তাঁকে রিজার্ভ বেঞ্চেই লাল কার্ড দেখিয়ে সেল্লা গ্যালারিতে ফেরৎ পাঠালেন। বিপ্লবের বং লাল। লালকার্ড-দেখা ক্যানিজিয়ায় ক্যানভর্তি সেই বৈপ্লবিক বহিষ্কারের স্মৃতিই রইল, খেলার নয়। রবীন্দ্র সঙ্গীত জানা থাকলে সারাজীবন গাইতে পারতেন—আমার খেলা যে যায়.....

—অঞ্জনা দত্ত

কচ্ছপিকা

দেবপ্রসাদ কুমার



কচ্ছপ? কাছিম না কুম? নাকি তাহাদের অপরিণীতা স্ত্রী? অপরিণীতা শব্দটি এইজন্যই ব্যবহৃত হইল যে কচ্ছপ কদাপি দার পরিগ্রহ করিয়াছে এমনতর অঙ্কুরসুদেশ কোনো সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় নাই। কোনো এক বিখ্যাত লেখকের লেখায় 'কচ্ছপিকা' শব্দটি পড়িয়াছিলাম। কিন্তু তাহার অর্থ কি হইতে পারে তাহা কোনোক্রমেই স্মরণ করিতে পারিতেছি না। আমার অবস্থা এখন পরশুরাম প্রণীত "ভুশুভির মাঠে"—র শিবুর মতো। অকালমৃত্যুর পর শিবু ব্রহ্মদৈত্য হইয়া শাঁকচূষি, পেড়ি প্রভৃতির নিকট হইতে প্রশম-প্রত্যাখ্যাত হইয়া অবশেষে স্থির করিল—নাঃ একটা উপদেবীর জোঁগান দেখিতে হইল। আমিও কুল-কিনায়া না পাইয়া অবশেষে স্থির কবিরাম—নাঃ অভিধান দেখিতে হইল। কষ্ট পাঠক নিশ্চয়ই লেখকের চতুর্দশ পৃষ্ঠা উদ্ধার কবিয়া মনে মনে বলিতেছেন যে অভিধানই যখন দেখিতে হইবে তখন অত ভণিতা না কবিয়া প্রথমে দেখিলেই তো ল্যাঠা চুকিয়া যাইত। আচ্ছা মহাশয়, প্রয়োজন হইলে ভণিতা করে না এমন মহাশয়নের সন্ধান আপনার জানা আছে কি? ধরা যাক সকাল আটটার মধ্যেই আপনার দুই কাপ চা হইয়া গিয়াছে। তৃতীয় কাপের জন্য

প্রাণ আকুলি বিকুলি কবিতোছে। আপনি কি এতাদৃশ অকৃতোভয যে বন্ধনবতা গৃহিনীকে তৃতীয় কাপ চায়ের সন্ধানসি প্রস্তাব কবিয়া ভীমকলের চাকে প্রস্তাব নিষ্ক্ষেপ করিবেন? না ত্রিভাণ্ডার, অথবা "ওগো! গাটা বড্ড ম্যাড ম্যাড করছে" বসিয়া বিক্ষিৎ ধূরপথে গড়্যাব্যো পৌছাইবার প্রয়াস পাইবেন? আপনার পুত্রের চাকুরি প্রাপ্তিব সম্ভাবনা আছে, কিন্তু অমুকবাবুকে তুষ্ট করিতে না পারিলে চাকুরিটি পরহস্তে অর্পণের যথেষ্ট আশঙ্কা আছে। ইহা উন্মুক্ত গোপন যে অমুকবাবুর জীবনদর্শনে তেল নিষিক্ত হওবার সহিত কড়ি নিষ্ক্ষেপের প্রত্যক্ষ যোগ আছে। কিন্তু তিনি Cash পূর্ণ করা আর নিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণ করাকে সমান অপরাধ জ্ঞান করেন। কিন্তু যোহেতু তিনি দয়ালু ব্যক্তি এবং কোমল হৃদয় সত্যং kind- এ গ্রহণ বিধিসম্মত। ধনাময়না পল্লভরামের "উৎকোচ তত্ত্ব" বাহ্যাব পাঠ কবিয়াছেন এতদ্বিধায়ে তাঁহাবা সমাক অবগত যে উৎকোচ প্রদানও কৌদৃশ

উদ্যোগের শিল্প এবং তাহাতে প্রতিভা বনিকামন যোগ না ঘটিলে শুধুমাত্র অধা সায়েন পিতাব সান্না নাই যে তাহাব বাস্তবায়ন কবে। অথবা ধরা যাক যে আপনার Better-hall অপেক্ষা তাঁহাব সহোদর Better than hall আপনার হৃদয়বোধ্য উত্তম হইবে দান্য সহোদর জন্য যে কলতবস বাধ্যলহরী ওঠে তাহা আপনাকে অব্যাহত নিষ্ঠাবরের মতো গলাধঃকরণ কবিতো হইবে। কিন্তু এ মণিল দ্যুরাটুকু পার হইবার জন্য প্রয়োজনীয় সাহস আপনি আধরণ কবিতো পারিবেতেন না। গৃহিনীর অসুস্থতাব অজুহাতে কিছুদিন কাছিতা শ্যালিকাকে গৃহবন্দে বাপ্ত বাগান জন্য কি আপনি বলত্র সকাশে উমেদারি করিবেন না? ববাবকে আকর্ষণ করিলে তাহা এমোই বর্ণিত হইতে থাকিবে, সূতরাং দৃষ্টান্ত লাড়হিয়া আব লাভ কি?

হইতেছিল 'কচ্ছপিকা'র কথা। সুবল চন্দ্র মিত্র সংকলিত অভিধানে ইহার অর্থ ক্ষুদ্র প্রণ, আশ্রয়ন দেন বা চলন্তকার যাহাব উদ্দেশ্য নাই। এখন কথা হইতেছে যে এম যদি দৃষ্টান্তের সৌম্যবদ্ধ থাকত তাহা হইলে এত ভণিতাব প্রয়োজন হইত না। বিপদ হইতেছে, তাহাব বিবন্ধে সমঝোচিত সতর্কতা অবলম্বন না করিলে

পরিণতি প্রায়শঃই ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করে। অতিবিক্ত আদর দিলে অকালপক্ শিশু যে বাদবে পরিণত হয় ইহা স্বীকৃত সত্য। ক্ষুদ্র ব্রণ—চিকিৎসা শাস্ত্রে নব রসের ভয়ানক বর্ষাশ্রিত বলিয়া সচরাচর গণ্য করা না হইলেও এবং ইহা শৃঙ্গার, বীর, বোদ, হাস্য ও শান্ত বিবোধী হইলেও ইহা যদি পবিপক্ স্মেরটিকাকার রূপ পরিগ্রহ কবে তবে ইহাব নিবমিয় কন্মে ভুক্তভোগী ও ভিয়কের জেব যথাক্রমে লঘু ও গুরু আকাব ধাবণ করে।

নীতিশিক্ষার নমুনা হিসাবে “শাদির পযলা রাতে বধিবে বিড়াল”—প্রবচনটি সম্যক অভিজ্ঞতা লব্ধ এবং ইহা উপেক্ষা করায় প্রশয়প্রাপ্ত ও প্রশয়দাতা দম্পতির পবিপ্রেক্ষিতে “জব কা গুলাম” সম্পৃক্ত লোকপ্রবাদ রাষ্ট্রভাষায় প্রচারিত হইল। অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় অবশ্য ইহার সমধর্মী অনুবাদের দুর্ভিক্ষ হয় নাই। ক্ষুদ্র ব্রণ রূপ প্রাথমিক আশকারা প্রথম সুযোগে দমন না করিলে তাহা পাকিয়া এবং ক্ষীত হইয়া টেল হইলে তাহা বন্ধা করিতে গোবিন্দও উৎসাহ বোধ করিবেন না। সুতরাং ইহাব প্রতিষেধক হইতেছে শুভবিবাহের প্রথম রজনীতে মার্জাব নিধন। সাহেবরা অবশ্য Prevention is better than cure-Idiom-টি ঠিক এই পটভূমিতে প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা সন্দেহ কষ্টকিত, কারণ তাহারা দীর্ঘদিন একত্র সহবাস করিতে নিতান্তই অনিচ্ছুক। কিন্তু আমবা, এই হতভাগ্য ভারতীয়রা যে অঞ্চলেই বাস করি না কেন, আমাদের গড়পড়তা আশ্রয় হইতেছে স্বীয় বসনাঞ্চল।

প্রাক স্বাধীনতা পর্বে পণ্ডিত কালোবাজারীদের কচ্ছপিকা ভ্রমে বৈদ্যুতিকালোক দণ্ডে ঝুলাইবার সদস্ত তথা উদ্রগ বাসনা প্রকাশ যে কেমন করিয়া শনৈ শনৈ বকাও প্রত্যাশায় পবিণত হইল তাহা আছ প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না, কারণ গোকুল, নবনী অপহারকেব বাল্যলীলাক্ষেত্র বা গোচারণ ভূমি হিসাবে একদা প্রসিদ্ধি লাভ কবিলেও তাহা যে অধুনা কালোবাজারীদের চন্দ্রকলাবৎ বুদ্ধি পাইবার জনাই সৃষ্ট হইয়াছিল তাহা বৈয়ব পদকর্তার স্বপ্নেও চিন্তা করেন নাই।

আব একটি অল্প-মধুর কিন্তু বিয়োগান্ত কাহিনীর উল্লেখ করিয়া কৃষ্ণিতনাসা জনীহা-আচ্ছয় পাঠকবৃন্দকে নিদ্রুতি দিব। বেকর্ড কোম্পানির দৌলতে “আমাব

ধর্মাদর্ম হল কোদন্ত বকপ, পূণ্যক্ষেত্র মাঝে কাটলাম কূপ”—এই শ্যামাঙ্গীতটি বর্ণগোচর হয় নাই এমন বদসন্তানোব সংখ্যা বিবল। বৈকুণ্ঠনানু জী অনুগত প্রাণ, উচ্চনিও, চন্দ্রবাঙ্কু, স্বর্বকায় গৃহস্থ। তাহাব আর্থিক অবস্থা সম্বল হইলেও ব্যাবকৃষ্ট বলিয়া অখ্যাতি ছিল, যদিও তাহাব বয়স্যবৃন্দ তাহাকে অনুচিত খাতিব কবিত। তাহার পক্ষে যন্ত্রচালিত দ্বিচক্রযান অন্য সাধ্যাতীত ছিল না। কিন্তু তাহার বাহন একটি সাইকেল এবং তাহাও ছিল তাহাব শাশ্বতীয় উচ্চতার তুলনায় উচ্চতর। ব্যাবকৃষ্ট বৈকুণ্ঠনানু দেখিলেন যে মূল্যেব হিসাবে চব্বিশ ইঞ্চি এবং ছাব্বিশ ইঞ্চি সাইকেলে ইতব বিশেষ ধর্তব্যের মধ্যো নয়। ইতব বিশেষ যাহা গাটিল তাহা তাহার প্রত্যঙ্গে। তাহাব জীবনে দেবদাসেব চুণীল্যালেব মতো এক গ্রহেব উদয় হইল এবং চন্দ্রমুখীর সহিত বৈকুণ্ঠবাবুব পবিচয় কবাইয়া দিয়া অস্ত গেল। একান্ততা এবং মুগ্ধতায় এই চন্দ্রমুখী অবশ্য শবৎচন্দ্রেব চন্দ্রমুখীর ত্যাগেব সহিত সম্মতিপূর্ণ ভাবিলে সত্যোব চনম হাসলাপ হইবে। চন্দ্রমুখী তাহার দেহলতাব পেণগয়ালে বৈকুণ্ঠনাবুব প্রাণপ্রণোদিতভাবে পবিণত কবিতো ব্যস্ত ছিল। মোটকথা বৈকুণ্ঠবাবু সাইকেলযোগে নানাবিধার এবং অর্থাবয়োগ শুক করিলেন। বিপদের সূত্রপাত ঘটিল কাটিল পথে। বৈকুণ্ঠবাবু গ্রামবাসী এবং তাহার অধুনা গন্তব্যস্থল প্রাপ্ত উচ্চাচর বন্ধুব মতেই বন্ধুর। তদুপরি সাইকেলের উচ্চতা বৈকুণ্ঠ হওয়ার তাহার মুগ্ধদয়ের আকাংখে ইতব বিশেষ ঘটিল। এই ইতব বিশেষের কোরকোদাম পর্বকে তিনি কচ্ছপিকা জ্ঞানে বিশেষ আমল দিলেন না। কাবণ তাহাব কোদন্ত বকপ ধর্মাদর্ম জ্ঞান বিশেষ পূণ্যক্ষেত্র কূপ কাটিতেছিল। টনক যখন নড়িল তখন,

শল্যচিকিৎসায় এই প্যামি দবারোগা নহে কিন্তু ছিগড়ায় পরিণত বৈকুণ্ঠবাবুব তখন পাথের নাস্তি। এমনতাবস্থায় জীব দারহ হওয়া লজ্জাজনক হওয়ায় তিনি চন্দ্রমুখীর নিকট দূরবস্থা ভগপন কবিলে অনবদ্যাব চন্দ্রময়ন যে আকার ধাবণ করিল সে মুখেব একমাত্র তুল্যা সেই ললনা, বনবাস পর্বে লক্ষণ যাহাব নাসিকা বর্তন করিয়াছিল।

অথ গুরু-শিষ্য সংবাদ

শিক্ষক অনেকক্ষণ আগে ছাত্রকে অঙ্ক করতে দিয়েছেন। তিনি জিজ্ঞাসা কবছেন ছাত্রকে,—কী হে, ক’টা অঙ্ক হল?

ছাত্র মাথা চুলকে আমতা আমতা করে বললে,—স্যার এবাব যেটা কবর, সেটা নিয়ে একটা হবে।

□

ছাত্র শিক্ষকের বাড়িতে পড়তে আসে। একদিন সে দেখে, শিক্ষক মশাই মগন বদ্ধ করে মুড়ি খাচ্ছেন। ছাত্র হেঁটে এসে বসেছে। তার খুব ঘাম হচ্ছে। তখন শিক্ষককে সে জিজ্ঞাসা কবছে—স্যার, আপনি নাকি হাড়-কেপন?

শিক্ষক—কূপণ? কে বললে? আমি কি মলমূত্র ত্যাগ করি না? আমি কি নখ কাটি না? আমি কি দাড়ি কামাই না? বাজে কথা-শুনছ কেন? গুজবে কান দিও না।

□

শিক্ষক জিজ্ঞাসা করলেন,—তোমরা জনাইয়ের নাম শুনেছ?

ছাত্র—না স্যার।

শিক্ষক—জনাইয়ের ‘মনোহবা’ খুব বিখ্যাত। জনাই হুগলী জেলায়। কলকাতা থেকে ত্রিশ মাইল মতন। আচ্ছা বলো তো, তোমরা হয় বন্ধু মিলে

বওনা হলে গুণাই। হয় বন্ধুতে ত্রিশ মাইল বাঙা, হাঁটলে। একেক জনের কত রাস্তা হাঁটতে হল?

ছাত্র—পাঁচ মাইল স্যার।

শিক্ষক—চমৎকার। তোমরা ভাগ অঙ্ক তো ভালোই শিখেছ। এবারে একটা বিয়োগ অঙ্ক বলছি। মনে কবো, একটা গাছে তিনটে পানি বসে আছে। একটা লোক এসে একটি পানিকে গুলি কবে মেরে ফেলল। সেই গাছে আর ক’টা পানি বসে আছে?

ছাত্র—দুটি পানি গাছে বসে আছে, স্যার।

□

শিক্ষক—যা বলি তা মনে দিয়ে শোনো। তোমাকে আবো অনেক কিছু জানতে হবে।

ছাত্র—স্যার, খেলতে খেলতে হয় খেলোয়াড়, জানতে জানতে কি জানোয়ার হয়?

শিক্ষক—এ কথাব উত্তর আমি এখনই দিতে পারব না। আমাকে ভালো বর্ণে ভেবে উত্তর দিতে হবে। খুব দামি কথা বলেছ। আমাকে ভাবিয়ে তুলেছ।

—প্রণয়কৃষ্ণ গোস্বামী

সমাজসেবী শানুলাল

অদিতি ঘোষ

গল্প



কাউন্টারের সামনে ছ'জন বসে মাথা চুলকোচ্ছিল। শানুকে কখন পাঠিয়েছে, এখনো আসার নাম নেই। ছ'জনের কেউই কোনো কথা বলতে পারছে না। কথা মানে তো একে অপরকে দোষারোপ করা। কিন্তু কে কাকে দোষারোপ করবে? সবাই মিলে তখন একমত হয়েই শানুকে ধরেছিল।

গবমে ঘামছে ওরা। দলের মাতব্বর ছেলেটা ঘড়ি দেখে আর পানপরাগের থুথু ফেলে ঘন ঘন। মেয়েদের মুখগুলো ধুলোপড়া আমচুরের মতো। এদের দেখে এক ছাপোষা ভদ্রলোক এগিয়ে আসেন।

—আচ্ছা, এনকোয়ারি কি বন্ধ হয়ে গেছে?

শ্যারন হাই তোলে।

—না, দেখছেন না বসে আছি দোকান খুলে? যা জিজ্ঞেস করার করতে পারেন।

লোকটার থোতামতো মুখ দেখে হাসি পেয়ে গেল নাতাশার। মাতব্বর ছেলেটা, যার পিতৃদত্ত নাম স্বপন চক্রবর্তী, আর স্বয়ং শোষিত নাম স্প্যান চাক্—উত্তর দেবে বলে এগিয়ে এল।

—দেখুন ভাই, আই মিন দাদা, দুপুর থেকেই আমরা ব্যাপক বিধ্বস্ত, নতুন এনকোয়ারি এত বড় অ্যারো দিয়ে দেখানো আছে, আপনার চোখে লেন্স থাকা সত্ত্বেও যদি না বুঝতে পারেন দু' হাতের চারটে আঙুল কান-ঘেঁষা বঙ্গ ছাঁটের চুলগুলোকে বাগে আনতে আনতে বাকি কথাগুলো মনে মনে সাজিয়ে নেয় সে,—তাহলে বলতে হবে ওখানে গিয়েও কোনো লাভ নেই। সবাই ভায়া এনকোয়ারি এই সিঁড়িতেই আসে। চাবপাশটা একবার দেখুন।

বলতে বলতে দু'জন বয়স্ক মহিলা একটি কিশোরীর হাত ধরে ভদ্রলোকের পিছনে এসে দাঁড়ায়।

সেদিকে চোখ পড়ে না কারো। রওনক বিপদের গন্ধ পেয়ে স্বপনকে

পোষ মানানোর চেষ্টা করে। নিজের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট ধরিয়ে ওব চোটে বসিয়ে দেয়। শুধু স্বপনের নয়, ভদ্রলোকের মুখেও স্বভাবিক রঙ আসে।

—আরেঃ, ঐ তো শানু। লাভণি ও নাতাশা একসঙ্গে চোঁচিয়ে ওঠে।

—ঐ যে লাল জামা—

—সবাই মিলে উৎফুল্ল হয়ে সেই দিকে তাকায়। কিন্তু কাছে এলে প্রথমে নূতনই আবিষ্কার করে, এ শানু নয়, শানুর কোনো কুস্তমেলায় হারিয়ে যাওয়া ভাই। শানুব পাতলা গাফ আছে।

যা—শশালা। রওনক মনে মনে হতাশ হয়। স্বপন বলে, অ্যাঁই, গিয়ে লাভি আর ন্যাশের গলাদুটো চেপে ধর তো। ওই দুটোই আমাদের মিসগাইড কবেছে। আর নেস্টট উইকে আমবা ফিরে এলে আই স্পেশালিস্টের সঙ্গে ওদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে দিবি।

ভদ্রলোক একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেন, আপনাবাও কি শানুঃ? খুঁজছেন?

—হ্যাঁ। আপনিও? —সমস্বরে ওবা চোঁচিয়ে ওঠে। তারপর ভদ্রলোককে ঘিবে ধরে।

—ব্যাপার কি বলুন তো?

—ব্যাপার আর কি? দু'দিন আগে ট্রেনের টিকিট কাটতে দিয়েছি। বলল চিন্তা করবেন না, ট্রেনে বসিয়ে দেব। আজ সকালে খবর নিয়ে জানলাম, ওয়েটিং চাব। তখনো বলছে হয়ে যাবে, হয়ে যাবে, ট্রেনে বসিয়ে দেব। আর এই গরমে বৌ-বাচ্চা, মা নিয়ে আমি টইটই করে ঘুরছি। শানুর পাশ নেই। মোবাইল কেউ তুলছে, না।

—ওহ্ গাশ! স্প্যান চাক্ ধপ্ কবে বসে পড়ে সিঁড়িতেই।

ওদেরও আজ এক একই ভাবে শানুলাল ধাপা দিয়েছে। এনকোয়ারির সামনে গত দু'ঘন্টা ধরে দাঁড়িয়ে থেকেছে পালা করে। শানু ওদের পাড়ার ছেলে। রেলের টিকিট কেটে দেয় বিনা দক্ষিণায়। শুধুই নাকি সমাজসেবা। ওরা একই স্থলের ছ'জন বন্ধু ম্যানেজমেন্টের পরীক্ষা দিতে যাবে। সাতদিন আগে কল লেটাব পেয়ে সবাই খুব উত্তেজিত ছিল। এই প্রথম একসঙ্গে বোরোবে। বেডানোঃ অঙ্গনা পরিকল্পনায় দু'দিন কেটে যেতে মনে পড়েছে টিকিটের কথা। নূতন আর নাতাশা ছাড়া সবারই প্রেনে যাবার সঙ্গতি আছে। কিন্তু ওরা ঠিক করেছে সবাই ট্রেনেই যাবে। কিন্তু পাঁচদিন আগে কোনো ছায়গায় নিশ্চিত আরক্ষণ তো পেলই না, ওয়েটিংও একশ-র ওপরে। একটামাত্র ট্রেনে তৎকাল সুবিধা পাওয়া গেল।

শানুকে সবাই মিলে ভার দিয়েছিল। শানু বলেছিল ওর কী যেন একটা বিশেষ কাজ আছে। তাও ও সব ব্যবস্থা পাকা করে দেবে। এত বড় ধাপা এই প্রথম।

ওরা মালপত্র নিয়ে কোনো দালালের খোঁজ করার চেষ্টা করে।

কাউন্টারের আশেপাশেই ঘোরামুরি করতে দেখা যায় একজনকে।

কোনো টিকিটের দালালকে কোনোদিনই ওরা স্বচক্ষে দেখেনি। এক কাল্পনিক সিনেমা প্রসূত ইমেজকে সন্দেহ জনক ভাবে ঘুরঘুর করতে দেখে ওরা এগিয়ে এসে লোকটাকে ধরে।

লোকটা বেজায় অবাক। সে মোটেই দালাল নয়। তারপর ওর মুখ থেকে ছ'বন্ধু যা শুনল, তাতে ওদের প্রায় ফিট্ হবার অবস্থা। শানু নাকি ওকেও বলে গেছে দাঁড়িয়ে থাকতে। ওর টিকিটের ব্যবস্থাও শানু করে দেবে।

স্প্যান চ্যাঙ্ক, যার কলারে এই গরমেও মিঠুন মার্কা একটা স্কার্ফ ঝোলানো, সে আবার সিগারেট ধরায়। বাকিরা সবাই ততক্ষণে শুয়ে পড়েছে।

দালাল গোছের লোকটি কাছে এগিয়ে এসে মরীয়া হয়ে এবার জিজ্ঞেস করে, ব্যাপার কি বলুন তো ভাই? শানু কি আপনাদেরও ...কথা শেষ করতে দেয় না রওনক। স্বপনকে উপেক্ষা করে রওনক বলে, কোনো ব্যাপার না, আমাদের মতো শানু বসিয়ে দেবে আপনাকেও। ট্রেনে নয়, পথে।

—মানে? আমার যে হার্টের অসুখ। একটু রয়েসয়ে বলুন।

—ভাই-ই বলছি। আপনার তবু হার্ট আছে। ওই ব্যাটিচ্ছেলের নেই। এক্সরে করিয়ে দেখবেন—কালো বেরোবে।

লোকটা হাসল না। ঘড়ি দেখে বলল, যাই, তৎকালে একটা চেষ্টা করি গে।

আর সময় নেই। রওনক নিজের ও বন্ধুদের জন্য বাবার এজেন্সি থেকে শেষমেশ ভি. আই. পি কোটায় টিকিট কাটতে যায়। ভাগ্য ভালো, টিকিট পাওয়া গেল। ফিরে এসে মালপত্রের জন্য কুলি ডাকতে যাবে, এমন সময় কী আশ্চর্য, একগাল হাসি নিয়ে লাল জামায় শানুলালের অনুপ্রবেশ।

স্বপন আন্তিন গোটায়ে। শানুর কোনো বিকার দেখা গেল না।

—আপনারা খুব চিন্তা করছিলেন তো?

—না? পাকোড়ি ভাজছিলাম।

—হেঁ হেঁ, অপরাধ নেবেন না, তক্ষুনি একটা কাজ পড়ে গেল।

ইতিমধ্যে সপরিবারে বয়স্ক লোকটি ও দালাল গোছের লোকটিও এসে গেছে। তারা শানুলালকে এই মারে তো সেই মারে।

—বাজে কথা বলার জায়গা পাও না?

—অনেক টাকা খেয়েছ, এবার সব বের করো। সুদ সমেত চাই। আমার হার্টের অসুখ। এতক্ষণ বস্তু টেনশন কবিয়েছ। দালাল-মতো লোকটা তড়পায়।

শানুলাল অমান বদনে টাকা বের করে দিয়ে দেয়।

—হাজার টাকা। শুনে নিন। সুদ-টুদ দিতে পারব না।

লোকটার টাকা শুনে গিয়ে আঙুল কেঁপে গেল।

একে একে সবাইকে টাকা ফেরত দেওয়া হয়ে যায় শানুলালের। টাকা পেয়ে যখন পরিস্থিতি অপেক্ষাকৃত নবম, তখন স্প্যান চ্যাঙ্ক এগিয়ে এসে নাটকীয় ভঙ্গিতে স্যালুট করে শানুকে।

—তুমি ভাই সুস্থ মানুষ তো?

শানুর মুখে লজ্জা-লজ্জা ভাব।

—সবাই তই বলে, জানেন। কিন্তু পারি না, লোকের মুখের ওপর না বলে দেয়া...এই দেখুন, প্রথমে বাড়ি থেকে বেরোবার আগে মা বলল, ভাইপোর নাকি অ্যাপেনডিসাইটের যন্ত্রণা হচ্ছে। হাসপাতালে নিতে হতে পারে। বললাম, একটা ফোন করলেই সোজ্জা চলে যাব। অফিসে তো

যাই এখন। তারপর আপনাদের কাজগুলো নিয়ে বেরোলাম। পথে মনে পড়ল এই ভদ্রলোকের মা-বৌ নিয়ে বৃন্দাবন-মথুরা যাবার কথা। তারও দায়িত্ব নিয়ে স্টেশনের দিকে রওনা হলাম। মাঝরাস্ত্রায় এ থরল;—দালাল-মতো লোকটার দিকে আঙুল তোলে শানু;—বলল, ওর নাকি আজকেই যাওয়া জরুরি। সরকারি চাকরির মৌখিক পরীক্ষায় ডাক পড়েছে। শেষ বছর। মায়া হল...‘না’ করতে পারলাম না।

—তাই চলে এলে আবার এখানে? হাল ছেড়ে দিয়ে এবার স্বপন জিজ্ঞেস করে।

সবার চোখ তখন টেনিস ম্যাচ দেখার মতো একবার শানুর দিকে একবার স্বপনের দিকে ঘুরে যাচ্ছে।

ওর কথার রেশ টেনে শানু বলল, না ভাই, তাও কি আর পারা যায়? এই যে এক গেরো হয়েছে, সেল ফোন। টিকিট লাইনে দাঁড়িয়ে আছি, গোড়ায় আসব-আসব করছি, টাকা-ফাকা বের করে রেডি। বাস্তবি তো বাজ তখনই বাজল—

শানু মুখেচোখে দুঃখ আর হতাশার মিশেল ফুটিয়ে বলল, মায়ের না, এবার বৌদির। মশাই চলে গেলাম হাসপাতালে। ‘না’ তো করা যায় না।

সবাই দীর্ঘ নিশ্বাস নেয়।

—এখন ঠিক আছে তো আপনার ভাইপো?

পকেট থেকে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন বের করে শানু।

—কী করে থাকবে? দাদার ওষুধ সব সরকারি খাত থেকে আসে।

কী সব সেই-টই লাগবে, আমি তো অত জানি না। দাদার এক অফিস-কলিগ আর বৃহ্ম ফ্রেণ্ড গেল তার বন্দোবস্ত করতে। আমি এদিকে মশাই ঘড়ি দেখছি; আপনাদেরও সময় হয়ে যাচ্ছে।—শানু দম নেয়।

—থামলেন কেন? বলে যান। বেশ লাগছে শুনতে। স্বপন সিগারেটে ঘন ঘন ফুঁ দেয়।

—আপনাদের কাছেই আসছিলাম। কী বলব মশাই, হবি তো হ, আজকেই দেখা পিসির ননদের সঙ্গে। নন্দাই নাকি এই হাসপাতালেই ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডে। রক্ত লাগবে। মহিলা অসহায়ের মতো দৌড়াদৌড়ি করছেন। কেউ করার নেই ওদের। বাচ্চা মেয়েটার মুখ দেখে মায়া হল। চলে গেলাম ব্লাড দিতে।

—সেটা দিয়ে তারপর এখানে, তাই না? চালিয়ে যান, চালিয়ে যান।

মরীয়া হয়ে যায় শানু।

—আপনারা বিশ্বাস করছেন না? বুক ঠুকে চলে গেছি। কিন্তু কী করব? ব্লাড মিলল না। এখন আবাব ডোনার খুঁজতে যাব...‘না’ তো করা যায় না। বুঝলেন কিনা? না না, কোনো চিন্তা করবেন না—শানু নির্ভীক মুখে বলে,—আমি কাল ঠিক বন্দোবস্ত করে দেব। আপনাদের ট্রেনে বসিয়ে দিয়ে তবে আমার স্বস্তি। বুঝলেন না, এই সব সমাজসেবাই তো...যাই তাহলে?

কারো মুখে শব্দ জোগাল না। শানু দু’পা এগোতে না এগোতেই আবার ওর সেল রাজতে শুরু করে।

সবাই শুনে পায়, শানু বলে চলেছে,—হ্যাঁ। কীটার ট্রেন? না না, কোনো চিন্তার কাবণ নেই। একদম সময় মতো ট্রেনে বসে যাবেন। টিকিট? আরে, একেবারে হাতে ধরিয়ে তবে আমাব শান্তি। এখন নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়ুন। বাব্বা। শানুলালকে দায়িত্ব দিয়েছেন, বুঝলেন কিনা....



হরদম চলুক না.....

(১)

হাঙলে ভালো আসেন্ তো? এইবার কন্ ভাইপুসা গরমে কী কী রাইফল্যান? আমি তো ব্যাশ্ অনেকদিন বাদেই আইলাম পত্রপাঠের রাইমাঘরে।

কী খাইব্যান কন। বর্যিও আবহাওয়া দইপুয়ের কথামতোন চ-ই জুন আইয়া পড়সে। তাই ম্যাজাঙটাও একটু ঠাইগা হইসে, কী কন?

বাজালি গো ভাইত ছাড়া কি চলে? তাই, ভাইতেরই একটা রাইরা কই? না-না, প্লাইন ভাইতের কথা কইতাসি না। আইজ ভাইতটারে একটু আলাদা রকমের বানাইয়া ফেলি, যাইর নাম দ্যাওন যায়—“রাজ ভাত”।

আইন্যা রাখেন : চাউল, সইরবার ত্যাল, ঘি, ত্যাজপাতা, হলুদ, গরম মশলা, লবণ, প্যায়াইজ, আদা, ফুলকপি, মটরশুটি, কাঁচা লঙ্কা, কাজু, কিশমিশ।

গুরু করেন : চাউল বাইছা জলে ভালো কইর্যা ধুইয়া রাখেন। কয়েকখান প্যায়াইজ কুচি কইরা কইট্যা ত্যালে ভাইজা রাখেন আর কয়েকখান প্যায়াইজ কুচাইয়া রাখেন। কাঁচা লঙ্কাও কুচি কুচি কইর্যা রাখেন। খোসা থিকা মটরশুটিগুলো বাইর কইরা রাখেন। ছোট ছোট টুকরা কইরা ফুলকপিগুলো ধুইয়া, লবণ মাখাইয়া ত্যালে গ্র্যামনভাবে ভাইজা রাখেন, যাতে ঐগুলি আন্দেক সিদ্ধ হইয়া যায়। কড়াই তো আগেই আঁচে বসাইসেন (প্যায়াইজ আর ফুলকপি ভাজনের লিগা, যাইর কাম আগেই হইয়া গ্যাসে)। কড়াই তাতলে ত্যাল দ্যান। ফ্যানা মইরা গ্যালে ত্যাজপাতা, আদাকুচি ছাড়েন—খোস্তা দিয়া লাড়েন। এইবার ছাড়েন গোটা গরম মশলা। তাইর পর দ্যান কুচানো প্যায়াইজগুলো। হলুদ বাটা দ্যান। খোস্তা লাড়েন। ধোওয়া চাউলগুলো এইর মধ্যে ছাইড়া ভালো কইরা লাড়েন। সিদ্ধ হওনের মতন জল ঢালেন। এখন কাজু আর কিশমিশ দিয়া দ্যান। এইবার বুইজ্যা কাঁচা লঙ্কা ও লবণ ছড়াইয়া দ্যান। ঢাকনা চাপা দিয়া আঁচ কমাইয়া দিবেন। ততক্ষণে আপনি র্যান্ডাম প্রস্তুতি চালাইয়া যান। এখনে মটরশুটিগুলো এইতে দিয়া দ্যান। আবার ঢাকনাডা বসাইয়া চাপা দিবেন। সিদ্ধ হইল কিনা—খোস্তার আগা দিয়া দেখিয়া লন। এখনে ভাতের জলটা শুকাইয়া লওনের জইন্য আঁচ বাড়াইয়া দিবেন, আর ঢাকনাডারে তো খুইল্যা রাখসেন। জল প্রায় মইরা আইলে ভাজা ফুলকপির টুকরাগুলি

হেঁ সেল

ছড়াইয়া দিয়া লাইড়া লন। রাইস-বোলে তৈরি রাজ ভাত হাতা দিয়া আলগা আলগা কইরা তুইল্যা তুইল্যা ভরেন, তারই উপরে ছড়াইয়া দ্যান প্রাণহরা ঘি আইর ভাইজ্যা রাখা প্যায়াইজ।

আপনার কর্তার অফিসের লাঞ্চ-টাইমটা ব্যাশ্ আনন্দে কাটার নইন্য তাঁইব হট কেসে “রাজ ভাত” পানিকটা ভইর্যা দিতে পারেন, যা নাকি উনি চোখ বুইজ্যাই শুদা শুদাই খাইয়া ফ্যালবেন। আর, ছুটির দিনে তো কওনই লাগে না—সপরিবারে হাঙলে “রাজ ভাত” খাওয়াইয়া—ব্যাশ্ রানীর মতন সদর্পে কর্তারে কন—“আর দিমু নাকি?”

(২)

অক্ষনে যে রাজ ভাতের রেসিপি জানাইলাম, তারই লগে মুরগির একটা প্রিপারেশন হইলে ব্যাশ্ হয়। তাই কী কইরা তৈয়ার করন যায়—তাই কই। নাম তো আগেই পাইসেন—“র্যান্ডাম” (রাজ ভাত তৈয়ারের সময়)।

রেডি করেন : বোনলেস চিকেন, প্যায়াইজ, আদা, টমেটো, ক্যাপসিকাম, ধইনা পাতা, শুকনা লঙ্কা বাটা, হলুদ বাটা, সাদা জিরা বাটা, কাজু বাটা, পিস্তা বাটা, লবণ আর ত্যালের বদলে মাখন।

ভাবতাসেন, মাখন দিয়া ক্যামন লাগব? ইচ্ছা না হইলে দিবেন না, ত্যালই দিবেন।

কইর্যা দ্যাখেন : চিকেনের টুকরাগুলি ভালো কইরা জলে ধুইয়া রাখেন। প্যায়াইজ, টমেটো, ক্যাপসিকাম টুকরা কইরা রাখেন। আদারও ব্যাশ্ কয়েকটা বড় বড় সরু সরু টুকরা করেন।

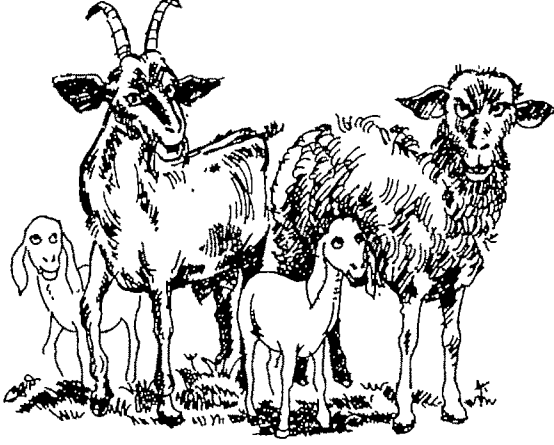
গ্যাসে কড়াই বসান। ব্যাশ্ খানিকটা মাখন দ্যান। সাথে সাথেই ছাড়েন প্যায়াইজ কুচা—খোস্তা দিয়া লাড়েন। প্যায়াইজ লাল হইলে টমেটো কুচা, কুচানো ক্যাপসিকামও সাথে সাথেই ছাড়েন। এখন এইতে ছাইড়া দ্যান—একে একে প্যায়াইজ বাটা, কাজু বাটা, আদা বাটা, শুকনা লঙ্কা বাটা, হলুদ বাটা, সাদা জিরা বাটা। খুব ভালো কইরা মশলাগুলো কষাইতে থাকেন। এইর খানিক বাদেই মুরগির মাংসের টুকরাগুলি ছাইড়া দ্যান। আন্দাজ মতন লবণ ছড়াইয়া দিয়া মাংসের টুকরাগুলিতে সমানভাবে মশলা মাখাইয়া লন খোস্তা দিয়া লাইড়া চাইড়া। ঢাকনা চাপা দ্যাওনের আগে আদার সরু টুকরাগুলি ছড়াইয়া দিয়া ঢাকনা দিয়া আঁচ টিমা করেন। মিনিট পনেরো বাদে ঢাকনা খুইল্যা দ্যাখেন—চিকেনের টুকরাগুলো সিদ্ধ হইল কি না? এ্যাতক্ষণে আপনি চান্স পাইলেন পিস্তা বাটা দ্যাওনের। পিস্তা বাটা দিয়া পুরা রান্নাডারে খোস্তা দিয়া মাখেন। এখন ধইনা পাতা ছড়াইয়া লাবাইয়া ফ্যালেন।

গরম-গরম রাজ ভাতের লগে গরম-গরম “র্যান্ডাম” পরিবেশন কইরাই চলেন।

অখন কন—শ্যাম্ব অদি আপনার লিগা কিছু থাকল তো?

—সম্পা দাস

জবর থবর



দু'নশ্বর মা

দু'নশ্বর মোটরবাইক হয়, দু'নশ্বর সিমেন্ট বালি চুন-সুরকি হয়। এমনকি দু'নশ্বর স্কুল, কোচিং সেন্টার আর মাস্টারও হয়। দু'নশ্বর বউ আর স্বামীর তো হিসেবপত্তরই নেই। তাহলে,— এই ঘোর কলিকালে দু'নশ্বর মা-ই বা মিলবে না কেন? অবশ্য বাঁজা মহিলাদেরকে গর্ভ ভাড়া দেওয়া মেয়ে বা 'সারোগেট মাদার'দের নিয়ে চ্যাচামেচিও হয়েছে বিস্তার। বিশ্বসুন্দরী সুস্মিতা সেন আর টাবু আবার গুলজাবেব মেয়ের ছবিতে ভাড়াটে মায়ে রোলে অ্যাক্টও করেছেন। তবে দু'নশ্বর মা হওয়ার একমাত্র পাশপোর্ট হয়ত মিলবে জিন প্রযুক্তিবিদদের নতুন ছু'মস্তর ক্রোনিং'-এর পিলে চমকানো কেরামতি থেকেই। এর মধ্যেই 'ক্রোনিং' নামক ব্রহ্মাঠাকুরের বদান্যতায় নকল ভেড়া, বাঁদর আর শুয়োর বানানো গেছে। ল্যাভে এবার মানুষের বাচ্চা বানালেই সৃষ্টিকর্তাকে বুড়ো আঙুল দেখানো যাবে।

তবে দুঃখের কথা, ক্রোন মানবশিশু এখনো পয়সা হয়নি। তার বদলে চীনে ক্রোন করা ছাগলী ইয়াং ইয়াং তার মাত্র দু'বছর বয়সের মধ্যেই গে গে নামে আরেকজন ক্রোন করা ভেড়ার সঙ্গে ফুলশয্যা করে নাদুস নুদুস বাচ্চাব জন্ম দিয়েছে। এহেন দু'নশ্বর বাপ-মায়ের ছেলেপুলে তো তিন নশ্বর হওয়াব কথা। তবে চীনের জিন বিজ্ঞানীরা হাঁ হাঁ করে উঠে বলেছেন—মোট্টেও না—একেবারে সাধারণ ছাগলছানার মতোই এই বাচ্চাগুলো। ইয়াং ইয়াং অবশ্য বেশ পোড় খাওয়া মা। এর আগে সে শুয়াই শুয়াই নামে আরেকটি ক্রোন ছাগলের বউ হয়ে জোড়া বাচ্চাব জন্ম দিয়েছে।

টেলি-পরিণয়

সেই চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের দুগ্ধপোষ্য রাজকবি কালিদাসও নেই, মেথকে বৌয়ের কাছে প্রেমদূত করে পাঠানো চোখের জল ফেলা যক্ষও নেই। থাকলে তিনি অন্তত স্বর্গের ফ্রাটবাড়ি থেকে আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল সাহসবকে পাকড়ে এই মর্ত্যেই নেমে আসতেন, নিজের চোখে একবার দেখতে এবং কান খাড়া করে শুনতে—কিভাবে মেথকে রিপ্রেস করে টেলিফোন যন্ত্রটির দৌলতে প্রেম, খুড়ি, বিয়েও করা যায়।

এপাড়ার খেদি নাহয় ও পাড়ার খাদার সাথে বেল সাহেব উদ্ভাবিত দূরভাষ যন্ত্রে আকছারই বাপ-মা-দাদাকে টপকে নিজেদের মনের বাতচিং করছে, টেলিফোন মস্তকেব লাভের গুড় পিঁপড়েকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করছে এবং টেলিফোন বিলের টাকার অঙ্ক যৎসামান্য বাড়িয়ে দিয়ে বাপের ব্লাড প্রেসার বাড়ানোর বন্দোবস্তও করছে। তবে পাকিস্তান জাতীয় ক্রিকেট দলের তরুণ তুর্কি অলরাউন্ডার মাত্র একুশ বছরের শোয়েইব মালিক ওসব টেলি-পরিণতের ধারেকাছে না গিয়ে একেবারে ফোনের মাধ্যমেই বিবাহেব কলমা পড়ে দিলের দিলরুবা বানিয়ে নিয়েছেন ১৮ বছরের হবু দস্ত চিকিৎসক আয়েবাকে। ফোনের বিল যতই চোখ কপালে তোলা হোক না কেন, অস্ট্রেলিয়াতে থাকা শোয়েইব আর সৌদি আরবেব আয়েমার, সাদির কলমা পড়া হয়ে গেছে টেলিফোনেই। তবে মেহবুবাকে একেবারে কাছে পেতে হলে আরো বেশ কিছুদিন দিল-এ লাগাম দিয়ে রাখতে হবে শোয়েইবকে। মৌলবিরা দাড়ি নেড়ে বলে দিয়েছেন, সামনের বছরের বিশ্বকাপ ক্রিকেটের আগে রুক্সতী দূর অস্ত্র, কেউ কারোর মুখদর্শনই করবে না।

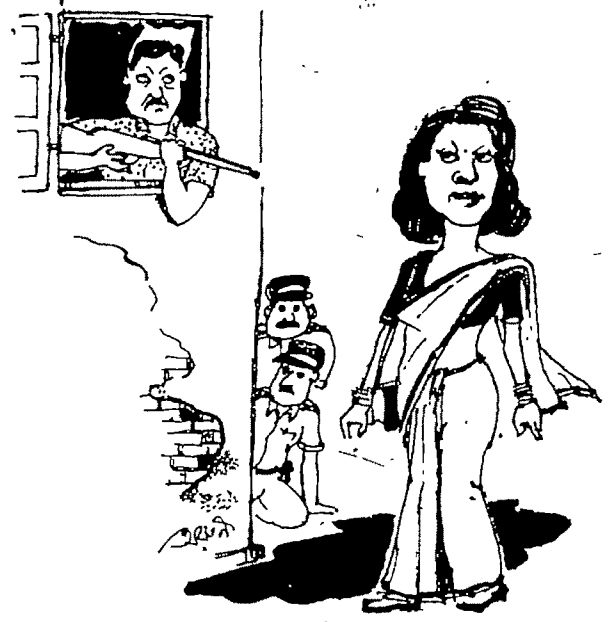
বন্দুকবাজ কামদেব

হিন্দু পুরাণে কামদেবতা মদনের ছোঁড়া পাঁচ বাণের ছোঁয়া লাগলেই মানব-মানবীর মধ্যে প্রেমের শৃংখোপোকগুলো কিলবিল করে ওঠে। বয়স আর গোত্র-ঠিকুজি তখন ছার প্রেমভাসি মনের কাছে। গ্রীক প্রেমদেবতা কিউপিডও কতবার যে তাঁর প্রেমমাথা তীব্র দিয়ে কত হৃদয়কে বধ করেছেন তার ঠিকঠিকানা নেই। তবে কলকাতার মদন ওরফে কিউপিড, আশিস ব্যানার্জি'ব প্রেম নিবেদনে কামধনুর জকরং খোড়াই আছে।

আশিসবাবুর বয়স বছর ৩৪ হলেও এম ফিল করে 'ডঃ' হওয়া এবং একই সঙ্গে মন দেওয়া-নেওয়ার ট্রেনিং চালানো'ব সাধ মোটেই-মার্চে মান্না যায়নি। তাই সঙ্গে হলেই প্রেমিক আশিস, সামনে কালীঘাটের মহামায়াকে ধন্যোসাঙ্গী রেখে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোডেব বাড়ির জানালার পেছনে

ঘাপটি মেরে থাকেন তাঁর সাথের এয়ারগানটি নিয়ে। বন্দুকটিতে ভরা থাকে বাবার বুলেট। রাস্তা দিয়ে যে-কোনো নন্দিনী কোমর দুলিয়ে গেলেই হল। সঙ্গে সঙ্গে আশিসবাবুর এয়ারগানের রাবার বুলেট বেপরোয়া প্রেমচূষনের মতো এসে লাগে সেই সুন্দরী পথচারিণীর পিঠে এবং অস্থানে কুস্থানে। আশিসের এই বুলেটবাণে রক্তারক্তি হতে হয়েছে অনেক সুনয়নীকেই।

এহেন বুলেট-দীওয়ানাকে পাকড়াও করতে কালীঘাট থানাকেই এগোতে হল। আশিসবাবুর বুলেটের আওতার মধ্যে রাখা হল কয়েকজন সাদা পোশাকের পুলিশকন্যাকে। আশিসের বুলেটশর তাদের দেহবল্লরীকে মিস করলেও বন্দুক সমেত ধরা পড়েছেন তিনি।



রিজার্ভ বর.

একজন পরামর্শ দিয়েছেন—রাষ্ট্রপতি হিসেবে তাঁর প্রধান কর্তব্য হবে প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীর কেশবর্ধনের ব্যবস্থা করা। খোদ রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী যদি কেশ-কর্তনরোধী নর্তন শুরু করেন, তবে শ্রেফ চুল না কেটেই একশ কোটি মানুষ দেশের ডুবন্ত অর্থনীতিকে টেনে ডাঙায় তুলতে সক্ষম হবেন—

চুল-বুলি

নজির বিহীন। শুধু ভোট নয়, কিঞ্চিৎ পরামর্শও। যাকে তাকে নয়, খোদ হবু রাষ্ট্রপতিকে। চুল কাটুন। পদ নিয়ে দীর্ঘকেশী লক্ষ্মী সায়গলের সঙ্গে চুলোচুলি কবার আগে নিজের অহেতুক দৃষ্টিকটু চুল-বিষয়ক এই সংপরামর্শ পেয়েছেন বিজ্ঞানী আব্দুল কালাম। দু-দু'জন সাংসদ বা বিধায়ক কালাম সাহেবের সাধের চুলের মূলে এমনই কুঠারাঘাত করেছেন ভোটপত্রের সঙ্গে স্বতন্ত্র চিরকুট ছেড়ে। আব্দুল কালামের ইয়া লম্বা নামের মধ্যে 'ফকির' শব্দটিও আছে। কিন্তু কানাকড়ি সর্বস্ব ফকিরি নয়, বেশ আমিри চালেই তিনি চুল ছেঁটে থাকেন সবচেয়ে দামি পার্লামে। তবে কিনা তা তিনমাস অন্তর। (এবং নাপিতভায়া, খুড়ি, বিউটিশিয়ান, আদৌ কিছু ছাঁটেন কিনা তা জানা যায়নি।) একজন পরামর্শ দিয়েছেন—রাষ্ট্রপতি হিসেবে তাঁর প্রধান কর্তব্য হবে প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীর কেশবর্ধনের ব্যবস্থা করা। খোদ রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী যদি কেশ-কর্তনরোধী নর্তন শুরু করেন, তবে শ্রেফ চুল না কেটেই একশ কোটি মানুষ দেশের ডুবন্ত অর্থনীতিকে টেনে ডাঙায় তুলতে সক্ষম হবেন—সম্ভবত এমনই তাঁর ধারণা। বিশ্বস্ত সূত্রে প্রকাশ—অনেকেই আশঙ্কা করছেন ক্ষিপ্ত হয়ে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী না শেষে রোনান্ডো ছাঁট নিতে ছোটেন। তারপর দেশ ছেড়ে ফুটবল মাঠের দিকে ছুট লাগালে দেশকে কে ছোটাবে চুলের, খুড়ি, চুলোর দিকে!!

না যক করেস্তান এঞ্জিনিয়ার, নাযিকা হিঁদুর আদুবে মেয়ে। প্রথম দর্শনেই চোখ টেপাটেপি এবং পিরিতের টোমিয়েন তৈরি। ধর্মের ওপর অবিচার করা হচ্ছে বলে প্রেমিক-প্রেমিকার বাড়ির মাতব্বররা যতই চেষ্টা করে গলা শুকোক না কেন, খড়গপুরের মজ্ঞনু আর নিউ আলিপুরের লায়লি একেবারেই ধনুকভাঙা গণ করে বসল—মালাবদল করে তারা 'এক দুজ্ঞে কে লিয়ে' হবেই। মিঞা-বিবি যখন রাজি, তখন শাকের আঁটি কাজিবা আর কী-ই বা করবে। গ্যাঁড়াকলটা হল গিয়ে কন্যা-সম্প্রদানের সময়। ববযাত্রীরা এসে বলল—মানবপুত্র যীশুর আদেশ—একদমই নমো নমো করে বিয়ে সারতে হবে। মেয়েপক্ষই বা ছাড়বে কেন? সাতপাক চক্কোর, ছাদনাতলা, ডালপুরি, মটন কোর্মা, রুইমাছের কালিয়া—সবই তো তাহলে মাঠে মারা যাবে। নাছোড়বান্দা বরযাত্রীদের রাজি করাতে না পেরে লাঠৌষধের শরণাপন্ন হল কনেপক্ষ। মেয়েকে ঘরে না তুলতে না চাওয়ার অপরাধে বরকে আড়ং ধোলাই ভালোমতনই দেওয়া হল। পুলিশ ঠ্যাঙানি থামাতে এলে তাদেরকেও ঢিল আর লাঠি বাড়ি উপহাস দেওয়া হল। গুণগোলের সাতপাকে মেয়ে লগ্নভট্টা হয় আব কি! অগত্যা মূর্তিমান স্বর্গদূতবব মতোই বিবাহ-রণক্ষেত্রে কনেপক্ষেই একজন ছোকরা এগিয়ে এল। মেয়েকে তার হাতে সঁপে দিয়ে একঘরে হওয়া থেকে বাঁচলেন মেয়ের বাপ। পুলিশ অবশ্য নিমরাজি হওয়া বরকে ছেড়ে দেয়নি। নান্নার ফোরটোয়েন্টি ফৌজদারি আইনের দৌলতে ছোকরাকে হাজতে পুরে দিয়েছে। রিজার্ভ বেঞ্চে বসে থাকা ছেলটি এভাবে বর বনে যাবে, তা কে ভেবেছিল। ব্যাপারটা অবশ্য বন্ধুর বিঘেতে নেমন্তন্ন সাঁটাতে যাওয়া ইয়ংম্যানদের পক্ষে লোভের। কোন বিড়ালের ভাগ্যে সীতা, মানে শিকে ছেঁড়ে, কে জানে!!

—পরশ সংবাদদাতা



পোশাকি সংস্কৃতি

আমরা বাঙালিরা এতদিনে বোধহয় নিজস্বের নিয়ে ভাবতে শুরু করেছি। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভাবুন তো, কবে আমরা আমাদের ধ্রুপদী ঐতিহ্যকে আপন করে ভেবেছি। নববর্ষের দিন কষ্ট করে বাংলা সাল মনে রেখে কিংবা সেই উপলক্ষে একটা লম্বা প্রশেসান করে কিংবা ২৫ বৈশাখে রবীন্দ্রসদন চত্বরে চোখ বন্ধ করে বাদাম ভাজা চিবোতে চিবোতে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল এই যে, এইবার আমরা আমাদের সংস্কৃতি নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করতে উঠেপড়ে লেগেছি, সংস্কৃতি বা ঐতিহ্যের যত্নতত্ত্ব ছড়াছড়ি ঘটিয়ে। নিজস্বের ঐতিহ্যকে কি করে জীবনে প্রশস্ত জমি দেওয়া যায়—তা ছিল সত্যজিৎ রায়, রবিশঙ্করের ভাবনা। প্রয়োগ নিয়ে কোথায় কোনটা মানানসই, দৃষ্টিকণ্ট নয়—এই বোধটাই সহসা উবে গেছে। সংস্কৃতির যে কোনো মাধ্যমের সৃষ্টিতে একটা বার্তা থাকবে এবং সেখানে শেষ পর্যন্ত শুভবুদ্ধির জয় হবে, এটাই প্রত্যাশিত। বিনিময়ে দেখা গেল হঠাৎ করে ক্লাসিকও নিরাকণ ভোগ্যপণ্য হয়ে উঠেছে। মুক্ত অর্থনীতির বাজারে পণ্যের তো আর ওকুত লঘুত্ব বলে কিছু থাকে না। থাকে একটাই জিনিস, তা হল বিক্রয়যোগ্যতা।

আজকাল রাস্তাঘাটে প্রায়ই চোখে পড়ে বুটিকের শাড়ি পরিহিতা বমলী। মুখমণ্ডল থেকে চোখ সরালেই দেখা যায় শাড়ির আঁচলে যামিনী রায়ের ছবি। এ শিল্পকর্ম যামিনী রায়ের কাজের পুনঃপ্রসার ঘটাবার জন্য নয়। শুধুমাত্র নতুনত্বের বিশ্ববাস ঘটিয়ে বাজারে খেয়ে যাচ্ছে বলে। পুরনো গানগুলিই নতুনত্বের মুখোশ পরে রিমেক নামকরণে বাজারে ছড়িয়ে দিচ্ছে ক্যাসেট। ডিজাইনারের প্রতি সম্মুখ সমীহ ও সহানুভূতি রেখেই বলা যায়, এভাবে কিন্তু যামিনী রায়ের প্রতি অবিচারই করা হচ্ছে। ছবির নিজস্ব আয়তন ও তল আছে। শাড়িতে ছবির একটা দিকের আদল আসতে পারে

সংস্কৃতি দুঃসংবাদ

মাত্র। কারণ কর্মব্যস্ত এই জীবনে নিশ্চয়ই কেউ র‍্যাম্পশোয়ের মতো আঁচল নৌকার পালের আকারে উড়িয়ে ঘুরে বেড়াবেন না। আর নারীর শরীরে পের্টানো শাড়িকে ঘুরে ঘুরে দেখা ভদ্রভাবে সম্ভবও নয়।

বলতে দ্বিধা নেই, এমন শিল্পকর্ম সাধারণের মধ্যে বিতরণ কবে বাহবা পাওয়া যায় কিংবা এই ধরনের নান্দনিকতা, ডিজাইন, রঙের মাত্রা ও মিশেল, কাপড়ের সঠিক প্রয়োগ—সবই এক লহমায় নজর কাড়ে। আজকাল শুধুমাত্র চিত্রশিল্প নয়, জামাকাপড়ের ডিজাইন হিসাবেও কয়েকছত্র জীবনানন্দ, শক্তি চট্টোপাধ্যায় বাদ যাননি। হয়ত কপিরাইট উঠে যাওয়ায় পাঞ্জাবি, শাড়ি কিংবা টি-শার্টেও থাকবেন রবীন্দ্রনাথ। এভাবে কি জীবনানন্দ, রবীন্দ্রনাথদের চেনা সম্ভব?

ক'দিন আগে আমারই এক পরিচিতার সঙ্গে দেখা রাস্তায়, ছোট করে চুল ছাঁটা, টাইট জিন্স পরিহিতা তরুণীটির টি-শার্টে লেখা “চুল তার কবেকার অঙ্ককার বিদিশার নিশা/মুখ তাব শ্রাবস্তীর কারুকার্য।” সাহিত্য সম্বন্ধে মেয়েটির আগ্রহ জানা থাকায় কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে সে এই লাইনেব অর্থ বা কবির পরিচয় জানে কিনা। স্বভাবতই উত্তর ছিল—“না”।

শুধু কবিতা বা চিত্রকল্প নয়, হিন্দু দেবদেবী তথা বিভিন্ন ভারতীয় দেবদেবীও আজ ফ্যাশানবাজারে এনেছে দারুণ হাওয়া। নামাবলী ছাপা টি-শার্ট তো তরুণ প্রজন্মের কাছে দারুণ আদরণীয়। অথচ ক'দিন আগেই পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের পুরোহিতরা এক বুটিক ডিজাইনারের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন জগন্নাথদেবের মূর্তিকে শাড়িতে ডিজাইন হিসাবে ব্যবহার ক'বা হয়েছিল বলে। নারীর শরীর বেটন করে ওঠার সময় জগন্নাথদেবের কিছু অংশ চলে গিয়েছিল রমণীর পাযের কাছে। আর এখানেই ছিল তাঁদের আপত্তি। এতদসত্ত্বেও গলায, কানে কৃষ্ণ কিংবা গণেশকে দুলাতে প্রায়ই দেখা যায়।

কোনটা ভালো আর কোনটা খারাপ—এই নিয়ে সমস্যার অন্ত নেই। ভালোর সংজ্ঞা এবং ব্যাপ্তি দুই-ই দিনেব পর দিন কমছে। দুটোই হারিয়ে যাচ্ছে চলতি ফ্যাশানের গড়পড়তার ভিড়ে। ক্লাসিকের এই বিশৃঙ্খল ব্যবহার বাঙালির শোভা পায় না। এই ক্লাসিক আমাদের রঙে, মস্তজায়, ভাবনায়, ভঙ্গিতে, মননে, চলনে। তবে তাকে জামায় ছাপিয়ে ঘোরার প্রয়োজনীয়তা কোথায়? যদি পুরাতনকে আধুনিকতার জালে জড়িয়ে নতুনত্ব দিতেই হয় তবে হাজার হাজার বছরের পুরনো মেটিফ ডিজাইন যা আধুনিকতার ধাক্কায় ছিটকে সরে গেছে অনেক দূরে, তা নয় কেন?

ধ্রুপদীকে নিজের মতো করে থাকতে দেওয়াই তো সংস্কৃতির প্রতি সুবিচার। ক্লাসিককে জনপথে নামিয়ে এনে জনসাধারণের ভোগ্যপণ্য করে তুললে ক্লাসিকেরই অবমাননা করা হয়। বনলতা সেন-জামা বা শাড়িতে পরার চেয়ে বইয়ের পাতা থেকে প্রাণভরে আবৃত্তি করা অনেক সুখের।

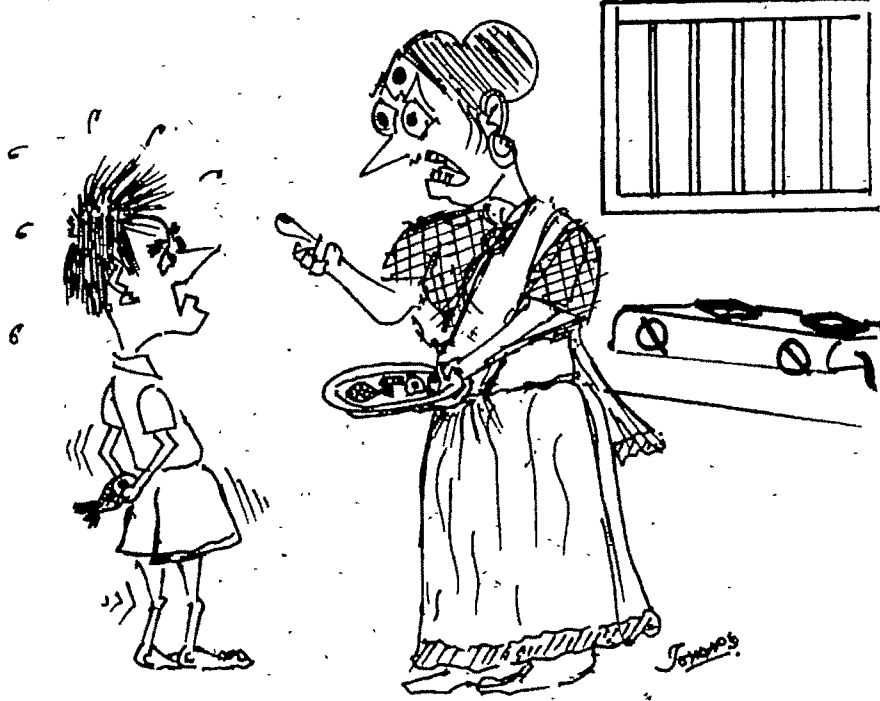
ফ্যাশান শো-র মতো জামাকাপড়ে সাহিত্য আর আর্টের শো নাই বা ক'বা হল। খুঁড়িয়ে জড়িয়ে কোনোক্রমে আজ অবধি দাঁড়িয়ে থাকা সংস্কৃতিকে এভাবে ওইয়ে না দিলেই কি নয়।

—সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায়

খাতুম

গল্প

বিনতা রায়চৌধুরী



ছেলোটা আমাদের বাড়ি এনে দিয়েছিল বামুনদি। বাবার গ্রাম সম্পর্কের দিদি। সে বাবারও বামুনদি, আমাদেরও বামুনদি, বাড়ির দশ বছরের বাচ্চারও বামুনদি। বয়স প্রায় সত্তর। কিন্তু শক্তপোক্ত। তাকে আমরা ভালোবাসতাম, কারণ সে যখনই দেশ থেকে আসত, আমসবু আসত।

বাড়িতে ফাই-স্করমশ খাঁটির একটা ছোট ছেলের খুব দরকার ছিল। বামুনদিকে মা বোধহয় আগেই বলে রেখেছিলেন। এবার দেশ থেকে আসার সময় বামুনদি একটা বছর তেরো-চোদ্দো বছরের ছেলেকে নিয়ে এল। রোগা ডিগ্‌ডিগে চেহারা, মাথায় খোঁচা খোঁচা কদমছাঁট চুল। গায়ে একটা হাফ হাঁতা আধময়লা শার্ট আর হাফপ্যান্ট। চেহারাটা যেমনই হোক, সে দিবা আমাদের সবাইয়ের দিকে জুলজুল করে তাকাচ্ছিল। আর মিটিমিটি হাসছিল। জুলজুল করে তাকাতেই পারে, সবাই অচেনা। কিন্তু হাসছে কেন? পরে বুঝেছিলাম হাসতে ও ভালোবাসে।

মা জিজ্ঞাসা করলেন,—কি নাম তোমার?

একগাল হেসে বলল,—বটুক।

—বটুক? আমরা সবাই হেসে উঠলাম।

বটুকও কিছু না বুঝে হেসে উঠল।

—থাকবি, আমাদের এখানে?

—হ, থাকব বলেই তো এলুম। বটুক যে খুব স্মার্ট সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

—কাজটাজ করতে পারবি তো?

—দেখিয়ে দিলেই পারব।

—থাকবে তো ঠিক, নাকি দুদিন পরেই পালাবে? মা তবু জিজ্ঞাসা করলেন।

—পালাবু কেন? বটুক হাসতে হাসতে জবাব দেয়।

বটুক রয়ে গেল।

হাসিখুশি বলেই বটুককে সবার আরো বেশি পছন্দ হল।

বটুক কাজও শিখতে লাগল চটপট। একবার একটা কাজ দেখিয়ে দিলে দু'বার সেটা দেখাতে হয় না। যদিও বা কখনো দেখাতে হয় তাহলে বটুক নিজেই বলে,—এক আধবার একটু ভুল সকলেরই হয়।

ওর ভাবভঙ্গি দেখে আমরাই হেসে ফেলি।

কিছুদিন যেতে কর্মবীর বটুকের একটা দোষ ধরা পড়ল। সে এক জীঘৃণ দোষ। সে দোষের নাম চুরিও বলা যেতে পারে, নাও পারে। বটুক লুকিয়ে খেয়ে নেয়। যখন যা পায়। আড়াল করে টুকটাক মুখে পুরে দেয়।

প্রথম প্রথম কেউ অতটা খেয়াল করেনি। কিন্তু কদিন আর লুকিয়ে

খাবে? ধরা পড়ে গেল। মা বললেন, বটুক এখানে একটা মিষ্টি ছিল কোথায় গেল? বটুক হাত ওলটাল,—কি জানি।

তারপর একদিন পটলভাজা উধাও, আপেল উধাও। সবসময় বা রোজই যে খেত তা নয়। মাঝে মাঝে হঠাৎ খেয়ে নিত।

আমিই একদিন বললাম,—বটুক, খোকনের টিফিনের জন্য ফ্রিজ থেকে একটা কলা বার করে রেখেছিলাম, কি হল?

—কি জানি? হাত ঘোরাল বটুক।

আমি এগিয়ে গেলাম,—এই, তোর গালের পাশে ওটা কি লেগে আছে?

—কোথায় কি? চট্ করে মুছে ফেলল গালটা বটুক।

—তুইই খেয়েছিস কলাটা। সত্যি স্বীকার কর।' বলেই ফেললাম আমি।

—হ, আমিই খেলম। স্বীকার করল বটুক, দাঁত বের করে।

আমার একটু রাগ হল, আবার মায়াও হল। বললাম,—বটুক, না বলে আর কখনো এভাবে খাবি না। চাইলেই তো পাবি।

—নিচ্চয়-নিচ্চয়। মাথা নাড়ল বটুক।

যতই নিচ্চয় বলুক, বটুকের লুকিয়ে খাওয়া বন্ধ হল না।

মাছ ভাজা হচ্ছিল রান্না ঘরে, বৌদি ভাঙছে, তুলে রাখছে বটুক। একটু পরেই খেয়াল হল একটা মাছ কম। বৌদি বুঝি এক কাজে একটু এদিকে এসেছিল, সেই ফাঁকেই—

—বটুক, একটা মাছ ভাজা কম কেন?

—কি জানি? পরিচিত ভঙ্গিতে হাত ঘোরাল বটুক।

—তুই খাসনি তো? বৌদি স্পষ্টতই সন্দেহ প্রকাশ করল।

—না না, আমি কখনো খাই না। স্বপক্ষে জোরালো সমর্থন করল বটুক।

আমি বলে উঠলাম, সে কি করে, সেদিন কলা খেয়ে আমার কাছে ধরা পড়লি না?

—সে আগে খাতুম, এখন আর খাই না। বটুকের হাস্যময় অম্লান উত্তর।

—মিথ্যে বলবি না বটুক। বৌদি এবার একটু কড়া হল।

—আমার মনে হয় তুই ছাড়া আর কেউ খায়নি। আমিও বেশ চাপ দিলাম। বটুক কয়েকবার ঘাড় মাথা চুলকে দাঁত বার করে স্বীকার করল—হ আমিই খাইছি।

তারপর থেকে এই চলল।

বটুক চুরি করে খায়। ধরা পড়লে বলে—আমি কখনো এমন করে খাই না। আগের চুরির রেফারেন্স দিলে নাকি সুরে বলে ওঠে,—আগে খাতুম এখন আর খাই না।

একটু ধমক-ধামক দিলে আবার স্বীকার করে ফেলে। সবাই রাগ করে, বিরক্ত হয়, ওকে বোঝায়। মাও বলেন,—এভাবে খেতে নেই। সবাই কত ভালোবাসে তোকে। যখন যা খেতে ইচ্ছে করবে ঢেয়ে নিবি। সব সময় চো তোকে দেওয়া হয়।

—সব সময় ইচ্ছা করে না। তবে এখন আর খাই না। আগে খাতুম।

একটু আগেই যে ধরা পড়েছে, সে কথা মনে থাকে না। কিংবা মনে থাকলেও বলে—আগে খাতুম, এখন আর খাই না। দিব্যি দাঁত বার করে হাসে।

বটুকের কথার ধরনধারণও খুব মজার। সে বেশ নিজের মতো করে ভাষা সাজিয়ে কথা বলে। বাড়িসুদ্ধ লোক হেসে মরে। একদিন ওকে

জিজ্ঞাসা করেছি, এই বটুক দিদিমণি কোথায় রে?

—দিদিমণি দাঁত ঝেঁটাচ্ছেন।

দাঁত ঝেঁটাচ্ছে? তাকিয়ে দেখি টুনটুনি দাঁত মাজছে। ওফ্ বটুক!

একদিন বটুক বলল,—বাবু এখন শরীর তেলাচ্ছেন।

মানে? মানে সুপ্রকাশবাবু গায়ে তেল মাখছেন। এই হল বটুক!

বটুক এত কাজের হয়ে উঠল কয়েক মাসেই যে ওকে ছাড়া আমাদের কারো আর চলে না।—বটুক এখন এই জামাটা কেচে দে। বটুক জুতোটা পালিশ করে নিয়ে আয়। বটুক চা। বটুক খবর কাগজ। বটুক ঝড়ের মতো কাজ করে ফেলে। আমার মেয়ে টুনটুনি ওকে মাঝে মাঝে বলে—জিনি।

এত করে ঠিকই কিন্তু ওর ওই একটি মাত্র দোষ আর কিছুতে যায় না।

বৌদি স্যালাড বানিয়ে ওব হাতে দিল খাবার টেবিলে দিতে। টেবিলে আসার আগেই শশাগুলো সাবাড় করে দিল। টুনটুনি বলে উঠল,—মা, আর একটা শশা কেটে আনো।

—কেন শশা তো দিয়েছি।

—নেই তো প্লেটে।

আমি চোখ পাকাই বটুকের দিকে—বটুক আবার?

—কি হইছে, আমি তো খাই নাই।

—খাই নাই? শশাগুলো কোথায় গেল? পাখা মেলল?

বটুকেব দাঁত বার করে হাসি—শশাগুলান বড্ড কচি।

—একেবারে হাসবি না। চুরি করে খেতে লজ্জা করে না? বললে কি দিতাম না?

—কই খাইছি? সে আগে খাতুম।

বটুক চরকির মতো পরিবেশনের কাজে সাহায্য করে। আমাকে আর বৌদিকে খেতে বসিয়ে দেয় নিজেই।

বাড়ির সবাই বলে,—যাক্গে এত কাজ করে, মনটাও ভারি সাদা।

ছেড়ে দাও। খেতে ভালোবাসে, গুটুক ক্ষমা করে দাও।

দিদিভাই বলে,—'চুরি করে কেন খাবে?

আমিও রেগে যাই,—প্রথমে অস্বীকার করবে, বলবে আগে খাতুম।

তারপর চেপে ধরলে স্বীকার করবে দৃষ্টবিকাশ করে।

—কী করবে বলো, বটুকের মতো কাজের লোক কোথাও পাবে না।

তবে দেখো যেন এঁটো-কাঁটা করে না রাখে খাবার জিনিস। টুনটুনির বাবা সুপ্রকাশ বলেন।

একদিন রান্নাঘর থেকে বটুক ঘরে এল। টুনটুনিরা বন্ধুদের সঙ্গে বলে ক্যারাম খেলছে। ওরা বটুককে দেখে হেসে গড়িয়ে পড়ল। কিছু না বুঝে বটুকও হাসতে লাগল। আমি উল বুনছিলাম। ওদের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে বললাম,—কি হল রে, অত হাসছিস কেন?

ওরা হাসি থামাল না। টুনটুনি হাসতে হাসতেই আঙুল দিয়ে বটুককে দেখাল,—ওই দেখ, ওর গৌফ।

তাকিয়ে দেখি, সত্যি বটুকচন্দ্রের একখানা সাদা গৌফ তৈরি হয়েছে। আমিও প্রথমে হেসে ফেলি। তারপর গম্ভীর হয়ে বলে উঠি,—বটুক, কী চুরি করে খেয়েছিসরে।

—কিছু না। নিপাট ভালোমানুষের মতো উত্তর দেয় বটুক।

—তাহলে তোর গৌফ হল কী করে?

—তা বয়স বাড়ছে, গৌফ হইতেই পারে। বিজ্ঞের মতো জবাব দেয় বটুক। সে যে কোন দেশের লোক জানি না। অদ্ভুত খিচুড়ি ভাষায় কথা বলে। যখন তখন যে কোনো শব্দের আগে পিঁছে একটা ই-কার বা উ-কার লাগিয়ে দেয়।

—বয়স বাড়ছে বলে গৌফ হয়েছে? আমি কড়া গলায় জিজ্ঞাসা করলাম। সে চোখ বুঁজে বিনা বিধায় উত্তর দিল,—ই বয়স বাড়লে গৌফ হয়।

—কত বাড়ল? একেবারে একসঙ্গে পঞ্চাশ বছর বাড়ল নাকি?

আমার গলা একটু উঁচুতেই ওঠে, চোখও পাকাই। বটুক একটু ভয় পেয়ে যায়। সামান্য তোতলায়—কে-কে-ন? কে-ন?

—গৌফটা সাদা দেখাচ্ছে কিনা? এই, তুই দুখে চুমুক দিয়ে দুখ খেয়েছিস! বড় কড়াইতে দুখ ছিল। কী করে খেলি? বিড়ালের মতো মুখ ডুবালি নাকি? সত্যি বলতে কি ওর সাদা গৌফ দেখে আমারও হাসি পেয়ে যাচ্ছিল। ও তাড়াতাড়ি বাঁ হাতের উল্টো পিঠে গৌফ মুছে বলল,—না, গেলাসে ঢেলে নিয়েছিলাম।

টুনটুনির বাবা সুপ্রকাশবাবু বললেন,—চুরি করে খাওয়া দুদিনেই বন্ধ করা যায়। তোমাদের একটু হিসেবী হতে হবে।

—কি করে হিসেবী হব? আমি একটু অবাকই হই।

—শুনে রাখবে সবকিছু মিষ্টি-সন্দেশ, মাছভাজা। ও জানবে সব গোনা আছে। খেতে সাহস পাবে না।

—ঘরের সব খাবার শুনে রাখা যাবে? দুখ? সেও কি শুনে রাখবে? মাছের ঝোল, চাটনি, পায়স, এসব কী করে শুনে রাখবে?

—ওসব মেপে রাখবে। একটু কষ্ট করতে হবে তোমাদের।

সবাই মেনে নিল টুনটুনির বাবার কথা। বটুককে সবাই ভালোবাসে। সে খাচ্ছে সেটা বড় কথা নয়, তার স্বভাবটাও তো শোধরানো দরকার। ধরা যাক, যদি বাড়ির ছেলেই হত, তাকেও কি শাসন কবা হত না। আর বটুক তো বাড়ির ছেলেই এখন।

একদিন সবাই পিকনিকে গেল। প্রত্যেকেব জন্য শুনে শুনে প্যাকেট নেওয়া হল। শুনে শুনে আপেল, লেবু নেওয়া হল। বটুকের জন্যও। সবাই খেল, খেলাধুলো করল, আনন্দ করল।

বটুক জিমন্যাসটিক দেখাল। সে কত কঁসর! একবার মুরগি হয়ে দেখাল, একবার ব্রহ্মদত্ত। কানামাছি ভেঁ ভেঁ খেলার সময় পা পিছলে পড়ল। সবাই যখন হায় হায় করে বটুকের চোখের বাঁধন খুলে তুলে ধরল সে সঙ্গে সঙ্গে টুনটুনিকে হুঁষে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল—আটু—আটু

ফোঁস করে উঠল টুনটুনি,—মোটাই আউট নয়। আটু বললেই হল সবাই হাসতে লাগল হো হো করে।

পিকনিক থেকে ফিরে এসে মা বললেন, বটুকের লুকিয়ে খাওয়ার দোষ গেছে। আমিও সে কথা সমর্থন করে বললাম,—ঠিক বলেছেন মা,

পিকনিকে অত খাবার-দাবার তার থেকে যখন ও খায়নি, ওর ওই দোষ গেছে।

সুপ্রকাশবাবু বেশ গভীর চালে বললেন,—আমার ওয়ুমেই কাজ হল, দেখলে তো। তোমারা যখন সাবধান হলে তখনই ব্যাপারটা সামলানো গেল। ও বুঝে গেল, আর এসব চলবে না। হাতেনাতে ধরা পড়তে হবে। আর আমি তো বলেই রেখেছিলাম ধরা পড়লে শাস্তি পেতে হবে।

বাড়ির সবাই সুপ্রকাশবাবুকে ডেরি শুভ টিচার বলে প্রশংসা করতে লাগল।

এরপর বেশ কয়েকদিন কেটে গেছে।

সুপ্রকাশবাবুর সেদিন সকাল থেকে পৈটিক গোলযোগ চলাছে। সারাদিনে প্রায় কিছুই খাননি। ডাক্তারবাবু বললেন, খুব খিদে পেলে একটু রসগোল্লা খেতে পারেন। তাছাড়া অন্য কোনো খাবার নয়। রাতে লেবু চটকে একমুঠো ভাত মাত্র।

বিকেলবেলায় সুপ্রকাশবাবুর বেশ খিদে পেল। কী করেন। পাউরুটি বা মুড়ি এসব তো চলবে না। তিনি বটুককে ডেকে দশ টাকার একটা নোট দিয়ে বললেন—যা তো, পাঁচটা রসগোল্লা নিয়ে আয়।

বটুক দোকানে চলে গেল।

টুনটুনি বলল,—বাবা, ওকে খাবার আনতে পাঠালে? দেখ-রাস্তায়ই হয়ত ...

—না-না, গোনাগুনতি পাঁচটা, সাফাইয়ের সুযোগ নেই।

মিনিট দেশেক পর বটুক দোকান থেকে ফিরল। দোকান কাছেই, সেই তুলনায় একটু দেরিই হল। সুপ্রকাশবাবু বটুকের হাত থেকে ভাঁড়টা নিয়ে ওপরের কাগজ সরিয়ে তাড়াতাড়ি গুনলেন—এক দুই পাঁচ। একটা রসগোল্লায় কামড় বসালেন তাড়াতাড়ি। খবুই খিদে পেয়েছিল ওনার। দ্বৈট আনতে দেরি করলেন না। রসগোল্লা খেতে খেতে বললেন,—একসঙ্গে গোনাগুনতি পাঁচটা। চুরির সুযোগই নেই। তাছাড়া বটুকের সে অভ্যাস গেছে।

বটুক মিটিমিটি হাসছিল।

—হাসছিস কেন বটুক?

—ওবোশ কি কারো যায়? পায়স, চাটনি এসব যেমন চেটে রাখি, এখন বসগোল্লা থেকেও রস চুষে চুষে খেয়েছি।

বটুকের মুখে বেশ জয়ের হাসি।

—কি বললি? ওয়াক্—থুং থুং সুপ্রকাশবাবু উগরে দিলেন আধচুনো রসগোল্লা। যেমায় তিনি মরে যাচ্ছিলেন। রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে ছুটে গেলেন বটুকের দিকে। বড়সড় একটা গাঁটা মারাব জন্য হাত তুললেন। বটুক দু-হাত মাথার ওপর তুলে মার বাঁচানোর চেষ্টা করতে করতে পূর্ববৎ নাকি সুরে বলে উঠল,—না-না, খাই নাই। আগে শাত্তম।

পত্রপাঠ-এর তৃতীয় শারদ সংখ্যা সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০০২ যৌথ সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হবে। অতএব সেপ্টেম্বর '০২ সংখ্যা আলাদা করে প্রকাশিত হবে না। সেপ্টেম্বর সংখ্যা কিনতে পেলেন না বলে যাঁরা রুষ্ট হলেন, তাঁরা পূজো সংখ্যা একটার জায়গায় দুটো কিনে সহজেই তুষ্ট হতে পারেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

নাট্য সুসংবাদ

চারদুয়ার



একটা বাসার চারটে দুয়ার। দুয়ারগুলোকে দেখে এলাম একাডেমিতে গিয়ে। বাসাটাকে দেখা গেল না। জানা-গেল ওটি ঘুরুর বাসা। ঘরে ছেলে-বৌ রেখে বাইরে আর একটা বিয়ে। সে পক্ষে আবার তিন তিনটে মেয়ে। দ্বিতীয় পক্ষের শোঁজ রাখছে টেলিফোন করে— যেন কত দরদ। অথচ একবার উকি মেরেও নিজে অসহায় মা আর মেয়েদের দেখতে আসে না। এমনকি সংসার খরচাও ছাড়ে না। তবু কিছু করার নেই অনুবাদিক্স বিজয়লক্ষ্মী বর্মনের। প্রশান্ত দলভীর মূল মারাঠী নাটকে সেই ঘুরুর কথাই আছে। আর একজনেরও ঐ ঘুরুটিকে নিয়ে করার কিছু নেই। সে হল দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। নাম ভূমিকায় সেই বিজয়লক্ষ্মী। গাঙ্কারের অ্যাসেট চিত্ত বিজয় করা পারফরমেন্স। একটা স্কুলের চাকরি যোগাড় করে একাই হিড় হিড় করে টেনে দিলেন সংসার আর নাটকটা। তিন মেয়েকে মানুষ করলেন। দু'মেয়ের বিয়ে দিলেন। পুরুষ ভাব্তিক সমাজের নগ্নতাকে বার বার চোখে আঁচুল দিয়ে দেখিয়ে গেলেন টিকিটকাটা জনগণকে। তাই চোখে জল ছেটাবার জন্য এক জোড়া বিরতির ব্যবস্থা ছিল আড়াই ঘণ্টার শোয়ে।

চার দুয়ারের এক দুয়ার মেজ মেয়ে বৈজয়স্তী। বৈজুর স্বামী শ্রীকান্ত (সৌমেন মুখোপাধ্যায়) অক্লান্ত পরিশ্রম করে একমাত্র কমিডিয়ানের চরিত্রটি গুছিয়ে করে গেলেন। এক জায়গায় বেশিদিন চাকরি থাকে না শ্রীকান্তর। (আদতে সৌমেনবাবুকে আর চাকরি করে যেতে হবে না। ভদ্রলোক পাকা শিল্পী, কাঁচা সেজে যোৱেন।) অকর্মণ্য শ্রীকান্ত এই নারীবাদী নাটকে একটা পুরুষবাদী প্রশ্ন করেছেন। বেকার পুরুষের কি সন্তানলাভের অধিকার নেই? রোজগারই কি পুরুষ জীবনের শেষ কথা? শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তর মতো বিজয়লক্ষ্মীর শ্রীকান্তও প্রতিবাদী। তাঁর পুরুষকে বেকারত্বের ঝাঁটাটি কোনো ছাপই ফেলতে পারেনি। দিনে কাজ না করলেও রাতে বেশ সক্রিয় ছিলেন তিনি। স্ত্রী বৈজুকে গর্ভবতী করে অভিনয়ে ফেরালেন

শ্রীকান্ত। মাথায় পাগড়ি না বাঁধলে যেমন শিখ হয় না, বৈজুরূপী মেথনা লাহিড়ীর পেটে বালিশ না বাঁধলে তেমন অভিনয় হয় না।

তিন বোনের বড়জন বিদ্যা। বাবার মতো চরিত্রবান স্বামী আর একমাত্র বাচ্চাটিকে নিয়ে তাব কাদামাথা সংসার। মায়ের কাছে শেষ বারের মতো ছিটকে এল আমরা হলে ঢোকান পরেই। একা। বাচ্চাকে বাবা তুর্কপের তাস বানিয়ে নিজের কাছে রেখেছে। বিদ্যা হারবে না। মামলা করল। কিন্তু হয়। জজ, পেশকার, কেরানি সব তো পুরুষ। মামলা হেরে গেল বিদ্যা, মার খেয়ে গেল পুরুষ।

এটাই নারীবাদ। কিন্তু বিদ্যার খুঁতটা কোথায়? শিক্ষিতা, সুশ্রী, চাকুরিরতা, সাংসারিক, অথচ স্বামী অন্য একজনকে ভালোবাসে। না, বিদ্যার কোনো খুঁত ছিল না। খুঁত ছিল না মানসীরও। বিদ্যারূপী মানসী সিনহার কাছে নাটকের বিদ্যা শেখার আছে অনেকেরই। অসাধারণ, অনবদ্য, নয়নাভিরাম অভিনয়ে চারদুয়ারের বিদ্যাকে মানসী সিংহদুয়ারের সমান যোগ্য করে তুলে ধরেছে। মানসী ম্যান-অফ-দ্য-ম্যাচ। বিজয়লক্ষ্মী ক্যাপ্টেন।

চারদুয়ারের সবচেয়ে ছোট দুয়ার 'বিনী' (মন্দিরা বন্দ্যোপাধ্যায়) সবচেয়ে বড় প্রশ্নটা করে বসেছে। তার পুরুষ পিতা যদি দুটো বিয়ে করে বহাল তবিয়েতে থাকতে পারে, তবে সে কেন তার দুই পুরুষ সহপাঠীকে একসাথে বিয়ে করে থাকতে পারবে না? নাটকের মূল বক্তব্যটাই বোধহয় এখানে। পুরুষ পেটানো। কপাল ভালো যে বিনীব মা এবং দিদিরা এতে সায় দেয়নি। বেঁচে গেল দুটো অসহায় পুরুষ। (পার্শ্ব ও অর্পণ)। অবশ্য মন্দিরা, পার্শ্ব, অর্পণদের পারফরমেন্স দেখে মনে হয়নি যে তারা এতবড় অঘটনটা ঘটাতে পারত। এখনো ট্রেনিং দরকার।

গাঙ্কারের গোরা মিত্র আর পরিচালক মেঘনাদ বাবুর সঙ্গে নান্দীকান্তের সুরত পাল ফন্দি এঁটে 'চারদুয়ার' করেছেন। সুরতবাবুই নেপথ্য নায়ক। তবে ঐ বাস্তবঘুটি কিনা তা জানা নেই। মনু দত্তের মধ্যে কাপ, ডিশ, তোয়ালে, গামছা সব ছিল। ড্রেসিং টেবিলের কাচটা ছিল না। অতবড় কাচটা ভাঙলে মনুবাবুর দৈ নেপায় মেয়ে যাবে।

কিন্তু সব 'ছিল' না 'ছিল'— কে ছাপিয়ে এ নাটকে যা ছিল তা হল দুহের সেবা। নাটকের আয় যাবে বাস্তবের লড়াইতে। অসহায়, দুরারোগ্য আর্থের পাশে দাঁড়িয়েছেন চারদুয়ারের সমস্ত কর্মীরা। সুরতবাবুদের এই মহৎ উদ্দেশ্যের উচ্চতার কাছে এ প্রতিবেদন বড়ই বেদনাকর এবং তুচ্ছ।

—দিব্যেন্দু দাস

সাক্ষীগোপাল

বলু মুখোপাধ্যায়



গোপাল ভগবানের শিশুত্বের রূপ। সেই শিশুরূপী ভগবানকে ভক্তরা নাড়ু খাইয়েছে, তখন তিনি নাড়ু গোপাল। নাড়ু গোপাল আবার ব্যঙ্গার্থে ক্যাবলা। বোকা।

বিশ্বাসী ভক্তের তীর্থযাত্রার সাক্ষী দিতে যখন গোপালরূপী ভগবান দেহ ধারণ করেছেন, সেই উপাখ্যানে তিনি হয়েছেন সাক্ষীগোপাল। কথাটির পরবর্তী কালে এক অন্য ব্যঙ্গনা এসেছে, শক্তিশালী বা ক্ষমতামণ্ডলী ব্যক্তি কোনো অন্যায় ঘটনার নীতির দর্শক থাকলে তাঁকে বলে সাক্ষীগোপাল। অথবা কিছুটা তাঁর করার নেই। ঠুটো জগন্নাথ।

যে সময় থেকে সাক্ষীগোপালের প্রকৃত মন্দির হয়েছে পুরীর কাছে, তার বহু পূর্ববর্তী কালেও সাক্ষীগোপালের মতো চরিত্র দেখা গেছে। পুত্র-স্নেহে অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং ভীষ্ম, দ্রোণ, তথা পঞ্চপাণ্ডব—যাঁরা দ্রৌপদীর প্রতি কৌরবদের অত্যাচার নীরবে লক্ষ্য করেছেন। মাথামাটি গোঁয়ার ভীম একটু তেড়েমেড়ে উঠতে গেছিল। কিন্তু তাকে দাবড়ে রাখা হয়েছে। অথবা পট্টী প্রেমে অন্ধ রাজা দশরথ, যার ভূমিকার জন্য রামকে রাজ্য ত্যাগ করে বনবাসে যেতে হয়েছিল। আহা বুড়ো বয়সের মোহ। ছলাকলায় মুগ্ধ বুড়ো রাজা পেয়ারের বড় ব্যাটার বাড়িছাড়া হওয়া জুলজুল করে দেখলেন শুধু। পরবর্তীকালে সেই রামচন্দ্রই সাক্ষীগোপালের মতো প্রজাদের অভিযোগ মেনে সতী স্ত্রী সীতার সতীত্বে সন্দেহ করেছেন। দুই-দুইবার সীতাকে অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে। বাপ কা ব্যাটা একেই বলে।

শূদ্রকের 'মুচ্ছকটিক' নাটকে রাজার আদরের শ্যালক অত্যাচার করে

প্রজাদের উপরে। অসহায় বসন্তসেনা ও চারুদত্ত—দু'জনেই তার লোভ ও ক্রোধের শিকার হয়। রাজা নিজে? সাক্ষীগোপাল।

গ্রীক মহাকাব্যে রয়েছে ক্যাসান্ড্রার চরিত্র। দেবতার বরে, ভবিষ্যতে কী দুর্ঘটনা ঘটবে—আগে থেকে জানতে পারত। আবার দেবতার অভিশাপে তার ভবিষ্যদ্বাণী কেউ বিশ্বাসও করত না। সে-ও এক মমবিদারী অবস্থা। আর গ্রীক নাটকের কোরাস? এই কোরাসের অন্তর্গত চরিত্রগুলি অধিকাংশই বুদ্ধ বা রমণী, যারা ঘটনাবলী দূর থেকে দেখে, অতীতকে মনে পড়ায়, ভবিষ্যৎকে-ও কখনো কখনো বলতে চেষ্টা করে। কিন্তু তবুও তারা থেকে যায় মূল ঘটনাস্রোতের বাইরে। সবকিছু দেখে আর বিলাপ করতে করতে জানান দেয়। কিন্তু তাদের করার কিছুই নেই।

দক্ষ যখন কন্যা সতীর সমক্ষে জামাই তার পতি শিবের নিন্দা আরম্ভ করেন, উপস্থিত অন্যান্য আমন্ত্রিত অতিথি রাজারা একেবারে স্পীকটি নট।

ভারতীয় পুরুষরা বোধহয় অনেকেই অল্পবিস্তর সাক্ষীগোপালের ভূমিকা পালন করে। যখন শান্তি বোয়ের উপরে অত্যাচার করে তখন স্বপ্তর হয়ে, যখন বৌ শান্তি উপর অত্যাচার করে তখন ছেলে হয়ে, যখন বিমাতা সতীন-পুত্রকন্যাদের উপর পরাক্রম দেখায় তখন অসহায় বাবা সেজে। বারে বারে। পুরুষদের খারাপ লাগতে পারে। আবার তলিয়ে ভাবলে মেয়েদেরও খারাপ না লেগে উপায় নেই যে মেয়েদের উপরে যে অত্যাচার করেছে পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা, সেই অত্যাচারে মেয়েরাই তাদের অনেকাংশে সাহায্য করেছে।

সূর্যের চাইতে বালির উত্তাপ বেশি হয়ে যায়, তাই অনেক সময়ে রাজার

চেয়ে পারিষদরা বলে 'শতগুণ, রাজা হয়ে পড়েন জগন্নাথ। জাহাঙ্গীরের কানটি ধরে ইচ্ছেমতন যেদিকে খুশি চালাতেন নুরজাহান। অথচ জাহাঙ্গীরই কিনা তাবড় মুঘল সাম্রাজ্যের কর্তা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্ববর্তী এবং সমসাময়িক কালে ইউরোপে নাৎসীরা যখন ইহুদিদের প্রতি চূড়ান্ত অত্যাচার চালিয়েছে, সমকালীন অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলি চেয়েও দেখেনি কী হচ্ছে। আর তাই ঐ অত্যাচার চূড়ান্ত রূপ নিতে পেরেছে।

হিটলারের অত্যাচারে জার্মানি থেকে বিতাড়িত হবার পূর্বেই পরমানুকে চূর্ণ করার পারমানবিক শক্তির মূল সূত্র নিয়ে গবেষণা শুরু হয়েছিল। তাই আমেরিকায় পৌঁছে আইনস্টাইনের নেতৃত্বে মূলত জার্মান-ইহুদী বংশোদ্ভূত বিজ্ঞানীরা ঐ কাজ পুনরায় গোপনে শুরু করেন। তার নাম দেওয়া হয়েছিল ম্যানহাটন প্রজেক্ট। আমরা সবাই আজ জ্ঞানি, কেমন করে কোটি সূর্যের দীপ্তিতে ভাস্বর প্রথম পারমানবিক বিস্ফোরণ ঘটেছিল টেক্সাসের মরুভূমিতে। যা দেখে বিজ্ঞানীরাও মনে এসেছিল গীতার শ্লোক। আর তাব পরে যা ঘটেছিল তা মানবসভ্যতার ইতিহাসে সর্বাধিক কলংকপূর্ণ অধ্যায়গুলির অন্যতম। হিরোশিমা আর নাগাসাকি সেই ঘটনার নাম। সেই সময় ঐ বিজ্ঞানীদের নিজেদের কে সাক্ষীগোপাল ছাড়া আর কিছুই মনে হয়নি, খুব সম্ভবত।

আমাদের চারপাশে গণতন্ত্র বিপন্ন। সভ্যতা বিপন্ন পৃথিবী আজ

বিগতযৌবনা। দেশে বহু শাসনকর্তা। তাঁদের সব গালভরা নাম। তাঁরা নানান পদাধিকারী। তাঁদের আমরাই দিল্লির মসনদে বসিয়েছি, অস্তিত্ব আমাদের তাই ধারণা। দেশে অন্ন নেই, বস্ত্র নেই (অথচ কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন ভালোই), দেশে সম্পদ নেই (অথচ আমাদের দেশে খনিজ ভাণ্ডার গর্ব করার মতো), শিক্ষা নেই, জীবিকা নেই, সর্বোপরি ন্যায়বিচার, আইনকানুন কিছুই নেই। আমাদের শাসনকর্তাদেরকে আদর করে সাক্ষীগোপাল বলে ডাকলে কি গৌসা করবেন?

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষ হলে বহুবছর পাণ্ডবদের পৃথিবী শাসন ক'বা হলে, হঠাৎ দেখা গেল অর্জুনের গাভীর আর কার্যকরী হস্ত স্তব্ধ। ফ্যালফ্যাল করে দেখলেন যদুবংশ ধ্বংস হল। শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের নশ্বর দেহাঙ্গ হলে পাণ্ডবরা গেলেন মহাপ্রস্থানব পথে।

এই সমাজে, এই পৃথিবীতে ক্রমবর্ধমান সাক্ষীগোপালের ভিড়ে বিপন্ন মানবসভ্যতার সামনে জীবনানন্দের সেই ভবিষ্যৎবাণী বৃষ্টি বা মূর্ত হয়ে উঠছে—

“অদ্বিত আঁধার এক এসেছে এ-পৃথিবীতে আজ
যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দেখে তারা
যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই—প্রীতি নেই—করুণার আলোড়ন নেই
পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।”
সাক্ষীগোপালদের জয় হোক।

ট্যারা চোখে

গৌতম-বুদ্ধদেব-এর নির্বাণ-রাজ

মান্যবর মন্ত্রী গৌতম দেব মশায় মালদা জেলায় একটি আসেনিক মুক্ত জল প্রকল্প উদ্বোধন করতে গিয়ে জল যুক্ত ধর্ম প্রকল্পের উদ্বোধন করে বসেছেন। শংকরটোলা ঘাটে গেলে স্থানীয় অধিবাসীরা জল থেকে আসেনিক ছাড়াবার আগে নিদারুণ বন্যাভয় তাড়াবার আর্জি জানান। এত দূর কলকাতা থেকে কত কষ্ট করে মন্ত্রীমশায় গেছেন। রাজ-কার্যের স্বীকৃতির বদলে দিকুত হলে গৌতম বুদ্ধেরই মাধ্যম রক্ত চড়ে যেত। অতএব দেব গৌতমও রেহাই পাননি। রেগেমেগে বন্যা রোষের দেবী পরামর্শ দান করেছেন—কালীপুজো এবং পাঁঠাবলি। আর এতেও বন্যা দেবী তুষ্ট না হলে হু—ই নদীর ওপারে ভূতনিব চরে গিয়ে চরে বেড়াও। গরিবগুণে চাষা ভূতদের জন্যে ভূতনিব চরই আদর্শ জায়গা।

যাঁরা এ কথায় গৌতম দেবের রাগের বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করেছেন, তাঁরা অবশ্যই নাস্তিক এবং স্বভাবতই গৌতম-এর সেবকে সন্দিহান। আমাদের পরামর্শ—পাঠক, পানী-তালীদেব কথায় কণপাত করবেন না। এই বসে শ্রীচৈতন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। আসমদ্র নীলাচলে ভক্তি আর প্রেমের বন্যা বইয়ে দিয়েছিলেন। সেই পথ ধরেই এঁরা এয়েছেন। গৌতম-বুদ্ধদেবগণ। একদিন এঁদের বাপ-পিতামহা “হিন্দী-চীনী ভাই-ভাই” বলে একটা ধর্মবিপ্লবের চেষ্টা করেছিলেন। হয়নি। তাই বলে চিরকাল কি নইবে পিছে? কক্ষনো



না। কালের ধর্মে কার্ল মার্কসকে একদিন ‘গতকাল’ হতেই হবে। গৌতম নির্বাণ লাভ করেছেন। সবই সমান এখন তাঁর কাছে। অথচ মণ্ডলাকায়। সমুখে বুদ্ধদেব। তদগ্রভাগে সংঘ পরিবার। ইস্কুল-পাঠশালা সরস্বতী বন্দনায় আব ‘ভেটো’ নয়। এসো হে আর্থ এসো অনার্থ। সব সমান। ভাই ভাই। এসো বক্ষে বক্ষে বক্ষে আলিঙ্গন করি। এসো গেয়ে উঠি—মোরা একই বৃত্তে দুটি কুসুম বি জে পি ও সি পি এম/ বি জে পি তাহারে জোগাবে শক্তি সি পি এম দেবে প্রেম।

—মৈনাক মিত্র

সার্টিফিকেট

স্মৃতি

প্রণবেন্দ্রনাথ ঘোষ



বিকালের পড়ন্ত রোদে পাড়ার লাইব্রেরির বারান্দায় চাকরি থেকে অবসরপ্রাপ্ত বুড়োদের সান্ধ্য আড্ডা বসেছে। সকলেবই বয়স যাটের ওপর। অবশ্য দু-একজন কম বয়সী ছেলেছোকরা আসে, বুড়োদের রসিকতায় যোগ দেয়। আমি এখানে নবাগত, যদিও আমি এই গ্রামেরই ছেলে, এই গ্রামেরই স্কুল থেকেই ম্যাট্রিক পাশ করেছি। তারপর দেশে-বিদেশে পড়াশোনা চাকরি ও অধ্যাপনার শেষে আবার দেশে বসেছি। এরা আমাকে একটু বিশেষ মর্যাদা দেয়, নানা বিষয়ে আমার মতামতও জানতে চায়। সেদিন কথাটা উঠল সার্টিফিকেট নিয়ে। কার সার্টিফিকেটের দাম বেশি? স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধানের, না বি-ডি-ও সাহেবের, না ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের? যে যাব অভিজ্ঞতা বলতে লাগল। কার সার্টিফিকেটের জোরে এক কথায় চাকরি হয়েছে, কাব বা প্রমোশন হয়েছে, কার বা বদলি রদ হয়েছে ইত্যাদি নানা অভিজ্ঞতার কথা শোনা গেল। শেষে ঘুরেফিরে কথাটা আমার দিকে এল।

সুবোধের বয়স বছর ত্রিশ। মাঝে মাঝে আমাদের মতো বুড়োদের কাছে বসে আমাদের সত্য-মিথ্যা মেশানো গল্প শোনে। সেই আমাকে প্রশ্ন করল, জেঠু, আপনি কি বলেন? কার সার্টিফিকেটের দাম জীবনে সবচেয়ে বেশি? আপনি তো অনেক সার্টিফিকেট পেয়েছেন। আজ আপনার কাছে কোনটির

দাম বেশি?

সুবোধের প্রশ্নটা শুনে একটু থমকে গেলাম। এক কথায় উত্তর দিতে পারলাম না। একটু থেমে বললাম, দেখ, পাঠদশায় বলা আর চাকরি জীবনে বলা, আমরা অনেক লিখিত সার্টিফিকেট পাই। চাকরি শেষ হলে সেগুলো আর কেউ দেখতেও চায় না, জানতেও চায় না; যেন তাদের Potency শেষ হয়ে গেছে যেমন হয় সমযোজীর্ণ ওষুধের ক্ষেত্রে। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও আছে। কিন্তু আর এক ধরনের সার্টিফিকেট আছে, অলিখিত, কিন্তু জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, যার কার্যকালের ব্যাপ্তি আমৃত্যু।

আমার কথা শুনে সুবোধ লাফিয়ে উঠল। বলল, বলুন জেঠু, আপনার অভিজ্ঞতার কথা বলুন। সেবার আপনার একবস্ত্রে জামানি যাওয়ার গল্প শুনে মনে শিহরণ জেগেছিল।

হাক আমাব সঙ্গে এক ক্লাসে পড়ত। বয়সে একটু বড়, তাই স্কুল থেকেই ওকে হারুদা বলে ডাকতাম। হারুদা বলল, ভায়া, হেঁয়ালি ছেড়ে সোজা কথা বলো। লিখিত সার্টিফিকেট তো বুঝলুম, কিন্তু অলিখিত সার্টিফিকেট কে-ই বা দেয়, তাতে কার কী বা কাজ হয়?

উত্তরে বললাম, দেখ হারুদা, এক কথায় এর উত্তর দিতে পারব না। তবে আমার একটা বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা তোমাদের বলছি। তোমাদের সব প্রশ্নের উত্তর সেখানেই ভেঁমর পাাবে। তাহলে শোনো—

আমার বাবাকে তোমরা অনেকেই দেখেছ। বাবার গানও কেউ কেউ ওনেছ। এ গ্রাম থেকে আমার বাবাই প্রথম বিলেত যান। সে প্রায় ৮০/৯০ বছর আগের কথা। বাবা বিলেতে পাঁচ বছর থেকে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে ফিবলেন। পেশা ইঞ্জিনিয়ার কিন্তু নেশা হচ্ছে গান, যাত্রা-গান, কীর্তন গান। বাবা খুব আমুদে লোক ছিলেন। স্কুলের সহপাঠী বন্ধুদের নিয়ে নিজ খবচে একটা কীর্তনের দলও গড়েছিলেন। তিনি এই জেলার ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। বড় বড় জমিদারবাড়িতে নিজ খরচে দল নিয়ে গিয়ে কীর্তনগান শুনিতে আসতেন। ভালই উপার্জন করতেন শিশু সঞ্চয় করা কাকে বলে তা জানতেন না। কেউ সেকথা উল্লেখ করলে বলতেন, জীব দিয়েছেন যিনি আহাব দেবেন তিনি। আমি তখন সবে বি.এ পাশ করেছি। বাবার একটা অপারেশন হল। তিনি হঠাৎ মারা গেলেন। পাঁচটি নাবালক ভাইবোন ও বিধবা মাকে নিয়ে আমি অতল জ্বলে পড়লাম। ভাগ্যক্রমে ২/৩ মাসের মধ্যে একটা পরীক্ষা দিয়ে আখা সবকারি অফিসে একটা চাকরি পেয়ে গেলাম। পোস্টটা যত উঁচু, মাইনে ততটা নয়। তবুও নিদাক্ষণ অভাবটা তো দূর হল। সসার চলছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। প্রত্যেক মাসেই কিছু না কিছু ধার হত। একবার মাসের শেষের দিকে মা বললেন, ওরে, এ মাসে তোর ভাইবোনদের বইপত্রের জন্য একটু বেশি খরচ হয়েছে। কোথাও থেকে অন্ততঃ একশটা টাকা এনে দে। তা না হলে সসার চালাতে পারব না।

একশ টাকা। বড় চিন্তায় পড়লাম। বাবার জীবদ্দশায় খাঁরা নানা সুযোগ

সুবিধা নিতে বাবার কাছে আসতেন তাঁরা আজ পরিযায়ী পাখির মতো সম্পূর্ণরূপে দেশান্তরিত। কার কাছে যাই? কোথায় টাকা পাই? অনেক ভেবে একজনের কথা মনে পড়ল। তিনি আমাদের আত্মীয়। বাবার চেয়ে ৮/১০ বছরের বড়। নানা কাজে বাবার কাছে আসতেন। তিনি বন্ট্রাস্টার ছিলেন। শুনেছি তাঁর ঐশ্বর্যের মুখে আমার বাবার কিছু অবদান ছিল। তাই সাহসে ভর করে তাঁর কাছেই গেলাম। আমাকে দেখে তিনি খুব প্রসন্ন হলেন মনে হল না। ইনিই বিনিয়োগ একথা সেকথার পর যখন টাকার কথা বললাম, তিনি যেন আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন, টাকা? টাকা কোথায়? বললেই টাকা পাওয়া যায়?

ভাবলাম বলি, ঐ তো টাকা আপনার ফতুয়ার পকেটে রয়েছে। সে কথা বলার সাহস হল না। তাঁর মুখেচোখে এমন কপট বিষময় আর তীব্র বিরক্তি লক্ষ্য করলাম যে আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম। তবুও সাহস সঞ্চয় করে বললাম, মা টাকাটা চেয়েছেন। বড় অসুবিধে। আমি মাসে মাসে ২০ টাকা করে শোধ দেব। কোনোক্রমে কথাকাটা বলে ওঁর মুখের দিকে তাকালাম। উনি অশ্রুতে ঝুঁ, তুমি টাকা শোধ করবে বলে সেই বিষময় আর বিরক্তিতে আমার দিকে তাকালেন। বুঝলাম আশা নেই। কিভাবে যে ওঁর ঘর থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় পড়লাম তা আজ স্পষ্ট মনে পড়ে না। তবে এটা মনে পড়ে যে সেদিনই বুঝলাম গরিবের কথায় কেউ বিশ্বাস করে না। তার সত্যতার দাম নেই। তাই বোধহয় স্কুলপাঠ্য বইয়ের উদাহরণে লেখা হয়—He is poor but honest. কেউ কোথাও এর বিপরীতে লেখে না—He is rich but dishonest.

সুবোধের গুৎসুক্য বেশি। ও জিজ্ঞাসা করলে, টাকা তো পেলেন না। তারপর কী করলেন? বললাম, কি আর করব। ধীরে ধীরে টালিগঞ্জ অফিসের পথে পা বাড়ালাম। টাকার জন্য শিয়ালদহে গিয়েছিলাম সেখান থেকে বিভ্রান্তের মতো অফিসে ফিরলাম। আমার অফিস ছিল প্রিন্স আনোয়ার শা রোডে। ট্রাম স্টপেজ থেকে বাদিকের বড় মসজিদটা ফেলে পূর্বদিকে মিনিট দশেক হাঁটতে হয়। দুপুর রোদে ঘর্মাক্ত হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে অফিসে এলাম। আমিই ঐ অফিসের বড়কর্তা। তিনতলায় আমার বিরাট অফিসঘর। বাড়িটা আগে কোনো নবাবের ছিল। এখন আধা সরকারি অফিস।

হাক্কদা বললে, কই, টাকার কী হল বললে না তো? তোমার অলিখিত সার্টিফিকেট কোথায় গেল? উত্তরে বললাম, দাঁড়াও হাক্কদা। সবই শুনে। তবে ক্রমশ। একটু ধৈর্য ধরো।

সুবোধ বললে, আপনি কারুর কথা না শুনে বলে যান ত।

যাই হোক আবার বলতে লাগলাম। আমি ছিলাম কালেকশন ইন্সপেক্টর সমস্ত টালিগঞ্জ এলাকার বাড়ির ট্যাক্স আদায়ের ভার ছিল আমার ওপর। আমার একজন ওয়ারেন্ট পিওন ছিল। লোকটির বয়স পঞ্চাশের কাছে, দীর্ঘ দেহী, উত্তর প্রদেশের মুসলমান। নাম রশিদ খাঁ। তার যেমন উন্নত চেহারা, তেমনি উন্নত আচরণ। এর একটি বিশেষ গুণের কথা পরে জেনেছিলাম। ইনি বাংলা সিনেমার নামি-দামি নায়ক-নায়িকাকে উর্দু-হিন্দি ডায়ালগ শেখাতেন। প্রতিদিন আমি অফিসে এলেই আমাকে সসম্মানে সেলাম দিয়ে কোথাও কোনো বাড়িতে টাকা আদায়ের জন্য ওয়ারেন্ট জারি করতে যেতে হবে কিনা জেনে নিতেন। ট্যাক্স আদায়ের এই অগ্রিম কাজে একটু ঝুঁকি ছিল। কিন্তু রশিদ খাঁ সঙ্গে থাকলে আমি নিশ্চিন্ত। যাই হোক, সেদিন যথারীতি রশিদ খাঁ সেলাম দিয়ে আমার নির্দেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে

রইল। ঘরে আরো তিনচারজন লোক ছিল। তারা বেরিয়ে যেতে রশিদ খাঁকে কাছে ডেকে আস্তে আস্তে বললাম, খাঁ সাহেব, আমাকে একশ'টা টাকা দিতে পারেন? বড় দরকার।

ভেবে দেখ, আমার কি মরিয়া অবস্থা। আমি অফিসার, আমি টাকা ধার চাইছি আমার অধস্তন কর্মচারীর কাছে। আমার গলার স্বরে বোধহয় এমন কিছু থেকে থাকবে যা রশিদ খাঁর মনকে নাড়া দিয়েছিল। একটু আক্ষেপের সুরে বলল, স্যার, আপনি একদিন আগে বললেন না? আমি আজ সকালেই আমার বস্তির ভাড়ার টাকা দেশে পাঠিয়ে দিলাম। আমি শুনেছিলাম রশিদ খাঁ একটা ছোটখাটো বস্তির মালিক। তোমরা দেখেছ কিনা জানি না, তখন আনোয়ার শা রোডের দু'দিকে অনেক বস্তি ছিল। অনেক পুরনো আমলের ছোট ছোট বাড়িও ছিল। সেখানে নানা ধরনের লোক বাস করত। আমার মুখে হতাশা ফুটে উঠেছে দেখে রশিদ বলল, আপনি কিছু ভাববেন না স্যার। দেখি কি করতে পারি। আমি ছুটির আগে আপনার সঙ্গে এসে দেখা করছি।

রশিদের কথা শুনে মনে একটু সাহস হল, আশাও হল টাকাটা পেলেও পেতে পারি। নচেৎ মাকে গিয়ে কী বলব? ভাইবোনেরদের গুনো মুখই বা দেখব কি করে? আমি না ওদের পিতৃতুল্য বড় ভাই।

পাঁচটা বাজল। অফিস ছুটি হল, সকলেই একে একে বাড়ির পথ ধরেছে। আমি তখনো আমার ঘরে বসে আছি দেখে বড়বাবু বললেন, কি, আজ বাড়ি যাবেন না? অন্যদিন তো এতক্ষণে চলে যান। আমি গুনো মুখে বললাম, রশিদ খাঁর জন্য অপেক্ষা করছি। ও এলেই যাব। বলতে বলতেই রশিদ এসে সেলাম দিয়ে দাঁড়াল। বড়বাবু আগেই চলে গেছেন। রশিদ অফিস বন্ধ করে নিচে নামতে নামতে বলল, চলুন স্যার, ব্যবস্থা হয়েছে। আপনাকে পাঁচ মিনিট কষ্ট করতে হবে।

আমাদের অফিসের ঠিক উল্টোদিকে সারি সারি কতকগুলো অস্থায়ী দোকানঘর ছিল। তার মধ্যে একটা চায়ের দোকান। দোকানের সামনের দিকে দু'তিনটে বেঞ্চ পাতা। একটু ভেতরের দিকে যে বেঞ্চটা ছিল সেটা বাইরে থেকে ঠিক নজর করা যায় না। রশিদ আমাকে ঐ চায়ের দোকানের ভেতরে নিয়ে গেল। ভালো করে তাকাতে দেখলাম একজন পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের কাবুলি যুবক বসে চা খাচ্ছে। আমাদের ঢুকতে দেখে “সেলাম বাবুসাহেব” বলে উঠে দাঁড়াল। আমি তো বুঝতে পারছি না টাকাটা দেবে কে? বশিদ না এই কাবুলি যুবকটি? রশিদই আমার সংশয় দূর করল, বলল, স্যার, এব নাম সমুন্দর খাঁ। ভারি ভালো ছেলে, এই আপনাকে টাকা দেবে।

এবার আমার অবস্থাটা ভেবে দেখ। ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি কাবুলিওয়ালার কাছে টাকা নিলে আর নিস্তার নেই। সুদের চাপে প্রাণ ওষ্ঠাণ্ডত হবে। কিন্তু আজ আমি নিরুপায়। আমি ডুবছি, যা পাই তাই ধরে বাঁচার চেষ্টা। মনে ভাবলাম আপাতত অভাব তো দূর হোক, তারপর দেখা যাবে। তা ছাড়া রশিদ খাঁ তো আছে।

সমুন্দর আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলল, বাবু, তোমার যদি টাকার দরকার ছিল তো তুমি একলা এলে না কেন? রশিদ খাঁকে দেখিয়ে বলল, এ লোকটাকে সঙ্গে এনেছ কেন? ও লোকটা বদমাস আছে।

বুঝলাম ওদের মধ্যে রসিকতা হচ্ছে। আমি বললাম, আমি তো তোমাকে চিনি না। তুমিও আমাকে চেনো না। অচেনা লোককে তুমি টাকা ধার দেবে কেন?

শুনে সমুন্দর সঙ্গে সঙ্গে বলল, না, না বাবু, আমি তোমাকে চিনি।

আমি তো অবাক। বললাম, কি ভাবে? ও বলল, বাবু তুমি রোজ ঐ ফুটপাথ দিয়ে ছাতা মাথায় একলা অফিসে যাও। বিকালে একলাই ফিরে যাও। কারো সঙ্গে কথা বলো না।

বুঝলাম সমুদ্রব আমাদের ভালো মতোই লক্ষ্য করেছে। সম্ভাব্য খাতক হিসেবে ওর খাতায় হয়ত আমার নামও উঠেছে। আজই বোধহয় তার শুভ উদ্বোধন হবে।

সমুদ্র চা খাওয়া। ওর ব্যবহার ভালো লাগল। চা খাওয়া শেষ হতে বলল, চলো বাবু, আমার ডেরায় চলো। সেখানে তোমাকে টাকা দেব। ওর ডেবাটা কাছেই। ঐ বড় মসজিদটার উল্টোদিকে। আমার অফিস যাতায়াতের পথে পড়ে। তবে কোনোদিন ভেতরটা ভালো করে দেখিনি। দেখার দরকারও হয়নি। আজ ভালো করে দেখার প্রয়োজন হল। আগেকার আমলের বড় বারান্দাওয়ালা একতলা বাড়ি। সামনে বেশ খানিকটা ফাঁকা উঠোন। বাড়িটা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। উঠোনের বাঁদিকে একটা খুব বড় চৌবাচ্চা। সেখানে দেখি তিন-চারজন বয়স্ক কাবুলিওয়ালা স্নান করছে। ওদের পাশ কাটিয়ে পাঁচিলের গা ধবে বাড়িটার পিছনদিকে সমুদ্রব আমাদের নিয়ে এল।

একটা ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কাকে যেন ডাকল। কোনো সাড়া নেই। ঘরের ভেতর থেকে একটা আওয়াজ আসছে। যেন সিংহের গর্জন। সমুদ্রব দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল। আমাদেরও আসতে বলল। ঘরটি অনতিপ্রশস্ত। দুটি খাটিয়া রয়েছে। একটিতে এক কাবুলিওয়ালা শুয়ে ছুরে কাৎরাচ্ছে, আর মাথা চাপড়াচ্ছে। বোধহয় খুব মাথা ব্যথা করছে, সমুদ্রব ওদের ভাষায় লোকটাকে কি যেন বলল। লোকটা চুপ করল। সমুদ্রব আমাদের অপর খাটিয়াতে বসতে বলে ওর হাতবান্স খুলে একটা বড় রসিদবই বার করল। আমার হাতে দিয়ে বলল, বাবু তোমার নাম ঠিকানা লিখে স্ট্যাম্প-এ সেই কবা রসিদবই দেখে আমার তো গায়ের রক্ত হিম। কোথাও টাকার অঙ্ক লেখা নেই, সুদের উল্লেখ নেই। ফাঁকা রসিদবইতে আমাকে সেই করতে হবে? আমি খুব ভয় পেয়ে রশিদ খাঁর দিকে তাকালাম। ও বলল, স্যার আপনার কোনো ভয় নেই। ওবা বেইমানি করে না, যদি লোকে ওদের সঙ্গে যা কথা হয়েছে সেইমতো কাজ করে। আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, একশ টাকার সুদ কত? সমুদ্রব বলল, এখন একশ টাকার সুদ ছ'টাকা। তবে তোমার কাছে বাবু আমি মাসে পাঁচ টাকা নেব। ভাবলুম, আমার প্রতি এ দয়া কেন? এ কি বলির পাঁঠাকে বলিদানের আগে ছোলা খাওয়ানো? যাই হোক, প্রথম মাসের সুদ বাদ দিয়ে পঁচানব্বই টাকা নিয়ে ওর ডেরা থেকে বেরিয়ে পড়লাম। তবু কিছুটা রক্ষা হল।

পথে যেতে যেতে ভাবতে লাগলাম, আমি কী অপদার্থ। একটু বাঁকা পথে চললে, করদাতাদের একটু চোখ রাজালে এমন দু'একশ টাকা আমি সহজেই পেতে পারি। অথচ আমি তা নিতে পারি না। আমার চক্ষুজ্ঞা। রশিদ খাঁ কি ভাবে? আমার অপদার্থতা আরো প্রকট যে আমি কাবুলিওয়ালার কাছে টাকা নিতেও ভয় পাই। ঈশ্বর এমন অপদার্থদের কেন যে সংসারে পাঠান তা ভাবতে ভাবতে বাড়ি এলাম। মার হাতে টাকা কটি দিয়ে বললাম, তুমি এই দিয়ে এ মাসটা চালিয়ে নাও মা।

বাকি যারা শুনছিল তারা বলল, কই, অলিখিত সার্টিফিকেটের কথা তো কিছু বললে না।

আমি হেসে বললুম, দাঁড়াও ভায়া, সবুরে মেওয়া ফলে। সবই শুনবে। এরপর প্রতি মাসে কথামতো সমুদ্রবকে কুড়িটা টাকা আর মাসিক সুদ

দিয়ে আসি। কাবুলিদের ডেরায় যাতায়াত করে আমার সাহস বেশ বেড়ে গেছে। শেষ মাসেব টাকা দিতে গিয়ে সমুদ্রবের দেখা পেলাম না। টাকাও দেওয়া হল না। ভাবলুম আরো এক মাসের সুদ চেপে গেল। পরের মাসে টাকা দিতে গিয়ে ওকে বললাম যে আমি টাকা দিতে এসে ফিরে গেছি। সমুদ্রব বলল, হ্যাঁ বাবু। আমি সে খবর পেয়েছি। তোমাকে বাড়তি এক মাসের সুদ দিতে হবে না। আর ঐই নাও তোমাব সেই করা রসিদ।

যাবার সময় বলল, বাবু, তোমাব যদি আবার টাকার দরকাব হয়, সোজা আমার কাছে চলে এসো। আমি সম্মতি জানিয়ে দুর্গা দুর্গা বলে ওর ডেরা থেকে বেরিয়ে এলাম। বলতে ভুলে গেছি, মাঝে একদিন ছুটির পবে ট্রাম স্টপেঙ্গে দাঁড়িয়ে আছি। পেছনে একটা মিষ্টির দোকান। সেখান থেকে সমুদ্রব আমাকে দেখে বেরিয়ে এসে মিষ্টি খাবার জন্য দোকানের ভেতর নিয়ে গেল। আমি রসিকতা করে বলেছিলাম, না বাবা, মিষ্টি খাব না। তুমি বারো আনার মিষ্টি খাইয়ে পরের দিন একটাকা চাইবে। আর যার কোথায়! বক্রমুষ্টিতে আমাব ডান হাতটা চেপে ধরে বললে, কী বাবু! আমি বেইমান? আমি তোমাকে মিষ্টি খাওয়াব বলেছি। তুমি আমার মেহমান। তোমার সঙ্গে আমি বেইমানি করব?

ঐই হচ্ছে সমুদ্রব খাঁ। অনেক বুঝিয়ে ওকে শান্ত করলাম। মিষ্টি খেয়ে বাড়ি ফিরলাম।

এরপর আমার জীবনে হঠাৎ বড় পরিবর্তনের সূচনা হল। Administrative Trainee হিসাবে আমার পশ্চিম বার্লিনে যাওয়ার সুযোগ এল। পাসপোর্ট, ভিসা, ছুটির দবখাস্ত ইত্যাদি নিয়ে আমি ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। সমুদ্রবের কথা তখন আর মনে নেই। হঠাৎ একদিন ছুটির একটু আগে আমার অফিসঘরে সমুদ্রব হাজির।

কি ব্যাপার সমুদ্রব? অনেকদিন তোমাব সঙ্গে দেখা হয়নি। আমাকে কিছু বলবে?

ও উৎসুক হয়ে বলল, হ্যাঁ বাবু, তোমার সঙ্গে একটু কথা আছে। তুমি তো এখন বাড়ি যাবে। যেতে যেতে কথা হবে।

দু'জনে একসঙ্গে অফিস থেকে বেরোলাম। ও আমাকে নিয়ে গিয়ে সেই পুরনো চায়ের দোকানে বসিয়ে চায়ের অর্ডার দিল। চা খেতে খেতে একথা সেকথার পব আমাকে জিজ্ঞাসা করল, বাবু, শুনলুম তুমি নাকি চাকরি ছেড়ে দিয়ে বিলাত যাচ্ছ? আমি বললাম, হ্যাঁ যাচ্ছি। তবে চাকরি ছেড়ে নয়, দু'বছরের ছুটি নিয়ে।

সমুদ্রব বললে, বাবু বিলাত যেতে তো অনেক টাকার দরকার। কথটা সত্যি। জাহাজ ভাড়া ও আনুষঙ্গিক খরচ জোগাড় করতে আমার নাজেহাল অবস্থা। ও একটু থেমে বললে, বাবু, তুমি আমার থেকে টাকা নাও। আমি তোমার সব খরচ দেব। আমি আকাশ থেকে পড়লাম। এ বলে কী? আমি বিষয় চেপে রাখতে না পেরে বললুম, সমুদ্রব, কোন ভরসায় তুমি আমাকে টাকা দেবে? তুমি তো জানো বিলেতে গিয়ে অনেকেই সেখানে থেকে যায়, আর দেশে ফেরে না। তখন তোমার টাকার কী হবে? তাছাড়া ধরো আমি মবে গেলুম ওদেশে। তখন কে তোমার টাকা শোধ দেবে?

সমুদ্রবের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। সামনের নারকেল গাছের মাথা ছাড়িয়ে ওর দৃষ্টি দূরে প্রসারিত। আজও আমার সেই মুখ মনে পড়ে। সমুদ্রব ধীরে ধীরে বলল, বাবু তোমাব দেশে আমার আশি-নব্বই হাজার টাকার সুদের কারবাব চলছে। আমরা লোকের চলাফেরা দেখে বলে দিতে পারি—কে টাকা ফেরৎ দেবে আর কে টাকা মেরে দেবে, আমাদের সঙ্গে বেইমানি

করবে। বাবু, তুমি যদি ওসেবে বেঁচে থাকো তাহলে আমার টাকা মারা যাবে না। একদিন না একদিন তা আমি ফেরৎ পাবই। আব যদি মরে যাও— তাহলে সেকথা আলাদা।

এই হচ্ছে আমাব অলিখিত সার্টিফিকেট, যাকে সম্বল কবে ১৯৬৩ সালের জানুয়ারি মাসে বিদেশ যাত্রা করলাম। তখন চীন-ভারত যুদ্ধ লেগেছে। ভারত সরকার পাশপোর্ট দিল। কিন্তু বিদেশি মুদ্রা দিল মাত্র পাঁচ পাউণ্ড। যাওয়ার পথে মিশরের পিরামিড ও নেপলস-এর পম্পিয়ারাই নগরীর ধ্বংসাবশেষ দেখতেই পাঁচ পাউণ্ড শেষ হয়ে গেল। জাহাজে একজন অস্ট্রিয়ান ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তিনি দশ মার্ক ধার দিয়েছিলেন, যাতে জেনোয়া বন্দর থেকে ট্রেনে করে পরদিন সন্ধ্যায় পশ্চিম বার্লিনে পৌঁছতে পারি। তিনি ঐ টাকা না দিলে আমাকে ট্রেনে অনাহারে থাকতে হত।

বার্লিনে পৌঁছে কাছে যোগ দিলাম। প্রথম মাসের স্টাইপেন্ড-এর টাকা পেয়ে প্রথমেই ঐ ১০মার্ক অস্ট্রিয়ার ঠিকানায় ফেরৎ পাঠালাম। ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোক তো টাকা পেয়ে অবাক। প্রত্যুত্তবে তিনি যা লিখেছেন তার মর্ম এই 'যে, স্বদেশবাসীকে টাকা ধার দিয়ে যখন তার আশা ছেড়ে দিতে হয় তখন স্বল্প পবিচিত্ত বিদেশির কাছ থেকে টাকা ফেরৎ পাওয়া ঠাকে অবাক করেছে। তিনি ভেবেছিলেন আমাকে আগেই জানাবেন যে আমি যেন ঐ টাকা দেশে ফিরে কোনো সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে দান করি। আমি চিঠি পড়ে মনে মনে বললাম, আমার হাত দিয়ে পুণ্য অর্জনের কি প্রয়োজন বাবা? দান তুমি নিজে করো। আমি ঋণমুক্ত হতে চাই। বুঝলে-সুবোধ, এই হচ্ছে ঐ অলিখিত সার্টিফিকেটের তাড়না, আমৃত্যু যার ব্যাপ্তি।

সুবোধ আমার ভক্ত-শ্রোতা। ও জানতে চাইলে পবে আমার সমুদ্রের সঙ্গে দেখা হয়েছিল কিনা। আমি বললাম, এই গল্পের একটা উপসংহার আছে। সেটা শোন তাহলে সমুদ্র মানুষটাকে চিনতে পারবে।

বছর দুই পবে দেশে ফিরলাম। বার্লিন থেকে প্যারিস হয়ে মার্সে বন্দর থেকে জাহাজ ধবলাম। প্যারিসে একরাত্রি ছিলাম। ল্যুভর মিউজিয়াম দেখা, দিকচাব পোস্টকার্ড কেনা ও অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থান দেখতে দেখতে বেশ পরস্রা খরচা হল। মার্সে বন্দরে একরাত্র থেকে পরের দিন জাহাজে উঠে যিদের হাত থেকে রক্ষা পেলাম। বয়েতে ছোটভাই নিতে এসেছিল, তাই রক্ষা। আমার তখন কপর্দকহীন অবস্থা। একটা নতুন নাইলন শার্ট জাহাজখাটেতেই বিক্রি করে দিলাম।

যাই হোক, ছোট ভাইয়ের সঙ্গে কলকাতায় ফিরে কাছে যোগ দিলাম। একমাস পরে মাইনে হবে। মাঝ হাতে তো কিছু টাকা দিতে হবে। ভাবছি কোথায় টাকা পাই। হঠাৎ সমুদ্রের কথা মনে পড়ে গেল। অঙ্ককারের মধ্যে যেন আলোর রেখা দেখা গেল। বিদেশে থাকতে থাকতে আমি অনেক স্মার্ট হয়েছি, মনেও সাহস এসেছে। জীবনের নানা অভিজ্ঞতায় বুঝেছি যে টাকা ধার করাটা তত অন্যায্য নয় যত অন্যায্য কথামতো যথাসময়ে টাকা শোধ না দেওয়া।

পরের দিন সকালে টালিগঞ্জে কাবুলিওয়ালাদের ডেরাতে হাজির হয়ে সমুদ্রের খোঁজ নিলাম। ও তখন ডেরাতে নেই। একজন খবর দিয়ে বললে, বাবু ও এখন ভবানী সিনেমার সামনে অপেক্ষা করছে। তাড়াতাড়ি যাও। ওব দেখা পেলেও পেতে পারো। ভবানী সিনেমা বেশি দূর নয়। আমি তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগলাম। ভবানী সিনেমার কাছাকাছি গিয়ে দেখলাম মক্কেল ট্রামরাস্তার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। ততদিনে সমুদ্রের সঙ্গে

আমার বেশ দোস্তি হয়ে গেছে। আমি ওর কাছাকাছি গিয়ে পাশ থেকে ওর কোমরে দু'আঙুল দিয়ে একটা খোঁচা দিলাম। ও অবাক হয়ে ঘুরে দাঁড়াতেই ওকে কোনো সময় না দিয়েই জিজ্ঞাসা করলাম, সমুদ্র, আমাকে চিনতে পারছ? ও আমার দিকে ঋণিকৃষ্ণ তাকাল। চট করে চিনবেই বা কি করে? শীতের দেশের জল-হাওয়ায় আমার গাত্রবর্ণ উজ্জ্বল হয়েছে। চেহারা স্মার্ট হয়েছে, গৌরব কামিষে ফেলেছি, মাথাব চুলে তখনো বিলিতি ছাঁট। কথায় বলে কাবুলি স্বতিশক্তি। একটু তাকিয়ে বলল, তুমি না কর্পোরেশন বাবু? তুমি তো বিলেত গিয়েছিলে? তা কবে ফিরলে? আমার সঙ্গে এখন কী দরকাব? বললাম, পাঁচ-ছয় দিন হল ফিরেছি। এখন আমি হেড অফিসে বসি। বড় টাকার দরকার। তোমার ডেরায় চলো। একসঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে ওদেব ডেরাতে এলাম।

কাবুলিওয়ালার সঙ্গে মাথা উঁচু করে হাঁটছি। এ এক বিরল দৃশ্য। ওর ঘবে গিয়ে বসলাম। ও জিজ্ঞাসা করল, কত টাকা চাও বাবু? আমি বললাম, একশ টাকা। ও মাথা চাপড়ে বলল, এই সামান্য টাকার জন্যে তুমি আমাকে এতটা হাঁটিয়ে আনলে? ওখানেই বললে পারতে, আমি টাকা দিয়ে দিতাম। আমি বললাম, সে কি? রাস্তায় কাবুলিওয়ালার কাছে টাকা নিচ্ছি দেখলে লোকে কি বলবে? এখন মাসে তোমাব সুদ কত করে বলো? ও বললে, দশ টাকা। আমি প্রবলভাবে মাথা নেড়ে বললাম, না, ও হবে না। আমি পাঁচ টাকাব বেশি দিতে পারব না। দাও তোমার রসিদবই। আমি সই করে দিচ্ছি।

বুঝেছ সুবোধ, এই হচ্ছে বিদেশে থাকার ফল। আত্মপ্রত্যয় কত বেড়ে গেছে দেখছ? আমি নিজেকে চিনেছি। তাই সমুদ্র কেন, অন্য কোনো কাবুলিওয়ালার কাছে টাকা নিতে আমার ভয় বা দ্বিধা নেই। এরপর 'হা ঘটল তা শুনে তোমরা আকাশ থেকে পড়বে। সমুদ্রের হঠাৎ হাত জোড় করে অতি বিনয়ের সঙ্গে আমাকে বলল, বাবু এই নাও তোমার একশ টাকা। তোমাকে সই করতে হবে না, সুদও এক পরস্রা দিতে হবে না। তোমার যেদিন সুবিধে হবে আমাকে টাকা ফেরৎ দিয়ে যেও। আমি কোনোদিন তোমার কাছে টাকা চাইতেও যাব না। তুমি আমাকে ছুটি দাও বাবু, আজ আমার অনেক কাজ।

এই বলে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে ভবানী সিনেমার দিকে হাঁটা দিল। আমার ডি, এল, রায়েব চন্দ্রগুপ্ত নাটকের কথা মনে হল—“সত্য সেলুকাস, কি বিচিত্র এই দেশ।” এখানে কাবুলিওয়ালার মিষ্টি খাইয়ে টাকা নেয় না, টাকা ধার দিয়ে সুদ চায় না। তাহলে কী চায়? বন্ধুত্ব, হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের বন্ধন।

সুবোধ জিজ্ঞাসা কবল, তারপর কি হল?

আমি বললাম, ওর টাকা দু'তিন মাসের মধ্যে শোধ দিয়ে আমি দিল্লিতে অন্য চাকরি নিয়ে চলে গেলাম। বছর দশেক পবে কলকাতায় ফিরে একবাব আনোয়ার শা রোডে গিয়েছিলাম। দেখলাম, রাস্তা অনেক প্রশস্ত হয়েছে। বস্তি উচ্ছেদ হয়েছে। কাবুলিদের ডেরাটাও আর দেখতে পেলাম না। তবে সমুদ্রের দেওয়া সেই প্রথম রসিদটা আমি বন্ধুত্বের চিহ্ন হিসেবে বেখে দিয়েছি। যদি দেখতে চাও তো দেখাতে পারি। তাই বলছিলাম অলিখিত সার্টিফিকেট মনেও ওপব যে লেখা লিখে যায় তা আমৃত্যু অমলিন থাকে। সমুদ্রবের চোখের আলোয় আমি নিজেকে চিনেছি, আমি নির্ভরযোগ্য মানুষ, আমাকে বিশ্বাস করা চলে। এটাই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সার্টিফিকেট সুবোধ আমার মুখের দিকে গভীর দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে রইল।

বিবাহ হল স্ব নিযুক্তি প্রকল্প। এই যে কাজের জন্যে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে ফোকলা হয়ে গেলে। একটা বিয়ে করে ফেল। দেখবে তোমার মরা গাঙে কাজের বান ডেকে যাবে। সেল্ফ মেড্ ম্যান। এক হাত ফুলঝাড়। এক হাতে ঝুলঝাড়। দু'পকেটে ন্যাটা।



গড়ের মাঠ

আইভান হো হো

মধ্যযুগের দর্শনা ক্রীতদাস মরে এযুগের একটা মধ্যবিত্ত হয়েছে। আমি হয়েছি বিশ পঁচিশটা মরে। তাও অপঘাতে। প্রায়ই ভূতের মতো মাঝরাতে উঠে গিমির চেটোয় রসুন তেল মাশিশ করি। সর্দির খাত। জল পড়ার শব্দেই এফেক্ট হয়। আমার ঠাকুরদার আমলের গরু বাড়ি থেকে বের করে দিতে হয়েছে। ওটা পেছাপ করলেই গিমির নিমোনিয়া হত। এখন আমি আছি গোয়ালে। আমার ভালো নাম পাখুণ্ড। বিয়ের রাতে পাওয়া নাম। বিয়ের দিন উপোস করে গা-গুলিয়ে পড়ে গিয়েছিলাম নব শাওড়ির গায়ে। অজ্ঞান অবস্থায় 'সারদা' 'সারদা' বলে দু'বার ডেকেছিলাম। আমি মায়ের বড় ভক্ত। ঠাকুর স্ট্যাণ্ডবাই। কে জানত যে স্বশ্রবণবাদের কাজের মেয়েটার নামও সারদা। বাসু। সন্দেহের মৌচাকৈ প্রজাপতির লাধি।

তবে কি কাজের মেয়ের সঙ্গে—। ঠিকে সারদার চাকরি গেল। আমার বাসরের ওপর দিয়ে বাস চলে গেল। সেকি মড়া কান্না। —বাবা আমাকে আরব সাগরে ভাসিয়ে দিলো গো। আমার কি হবে গো। স্বশ্রবণবাদের সঙ্গে সানাই কনসেট ব্যজিয়ে জেলে গেলেন। পুলিশ এসে বলল রাত্রিবেলা ডেসিবেল ভেঙে সানাই। ওসি নাকি শিশি ফেলে আঁতকে উঠেছেন। সে রাতে পুলিশ আমাকেও খুঁজেছিল। আমি তার অনেক আগেই ওনার কিল খেয়ে স্টেশনের বোর্ডিতে এসে উঠেছি। এরপর শুরু হল আমার মধ্যযুগ। বাঙালি থেকে নিখো হয়ে গেলাম। চরিত্রে বাসন মাজার ছাই

লাগা। তাই কাজের লোক নেই। অতএব দুবেলা মিল্ একবেলা চা। ঝাড়, মোছা, ধোয়া, বাটা, বেলা, কাচা। গিহ্ এণ্ড টেক্। উনি যখন চুসে আমি তখন চুলোয়। ওনার মামা দে। আমার হরিমুদি। ওনার জন্মভূমি। আমার রামলীলা। ওনার কুঁচোফুল-বেলপাতা। আমার ছাই শালপাতা। আবার শুন্ শুন্ করে গান—“চল রে নওজওয়ান.....”। আমার শিরাতুলো রিফিলের মতো হয়ে গেল। আঙুলগুলো পাকা হাইব্রিড ট্যাডসের মতো হয়ে গেল। ঠোঁটগুলো সাইকেলের ব্রেকসু হয়ে গেল। তুমি ভাবছ কেন বিয়ে করলাম। কি দরকার ছিল। দরবদর একটা ছিল। তোমারও আছে। চাপা দিয়ে রেখেছ। বলছ না। প্রচণ্ড প্রাইভেট। তবে বিয়ের স্বপক্ষে তোমায় একটা যুক্তি দি।

বিবাহ হল স্ব নিযুক্তি প্রকল্প। এই যে কাজের জন্যে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে ফোকলা হয়ে গেলে। একটা বিয়ে করে ফেল। দেখবে তোমার মরা গাঙে কাজের বান

ডেকে যাবে। সেল্ফ মেড্ ম্যান। এক হাত ফুলঝাড়। এক হাতে ঝুলঝাড়। দু'পকেটে ন্যাটা। বগলে কলার ঘষা ব্রাশ। বুক পকেটে সার্ফের স্যাসি। যেন ছাব্বিশে জানুয়ারি ধোপাদের ট্যাবুলা চলেছে রেড রোডে। বছর ঘুরতেই তুমি সেল্ফ ম্যাড ম্যান। আরব্য রজনীর আবদুল্লাহ বিনিময় রজনী কাটাচ্ছে। গিমির পায়ের গোছে আরোডেন্স ঘষছ। সেই ট্রাডিশন সমানে চলছে। সিরিয়াল দেখে উঠতে গিয়ে শিরায় টান পড়েছে। নায়কের হাতে শাওড়ির খুনট। ভুলতে পারছেন না। একটা পাশবালিশ নিয়ে ককাচ্ছেন। তার মাঝে তোমার কখন জোরে ঘবা হয় 'গেল'। 'খুনি' 'খুনি' বলে তোমার মুখে সজোরে একটা ক্রিকিক করলেন। তুমি খাট থেকে মেঝেয়। ভাবছ এই ছিল কপালে? হ্যাঁ, কপালে ঐ থাকে। পাঁচ ইঞ্চি বাই দু'ইঞ্চি কামার মতো খসখসে একখণ্ড তক্তাপোষ টাইপের কপাল। তাও ধার দুটো সিঁজাড়ার মতো মোড়া। ঐ কপালে ঐশ্বর্য রাই ভেবেছিলে? প্রিয়াক্ষা গান্ধী? নবনীতা দেব সেন? ফুলন দেবী? মেরী পাটকর? ছোঃ। স্ব-নিযুক্তি প্রকল্পে মুরগি পালন, দর্জির দোকান, পাঁপড় কারখানা হয়। হেলিকপ্টার শিল্প হয় না রে। তোমার রাস্তা একটা ছিল। রাজনীতি। জীবনটা দেশকে দিতে। দেশ তোমার দর্শনা খঁচা দিত। তা তোমার তো ভোট নামই উঠল না আজ পর্যন্ত। শেষনের চাকরি শেষ হয়ে গেল। পাকিস্তানে গণতন্ত্র শেষ হয়ে গেল। ভগবান তোমার ভাগ্যে প্যাটন ট্যাঙ্ক চাপিয়ে চলে গেল। গড়ের মাঠে দেখবে রাখা আছে। বাঙালির কত গর্বের গড়ের মাঠ!!

সাহিত্য দুঃসংবাদ



কবিতা কিংবা দৈবের নির্বন্ধ

ঐতিহ্যবাহী “চতুর্ভঙ্গ” পত্রিকাটি সম্পাদক আব্দুর রউফের গুণে বেশ রঙ্গভূমি হয়ে উঠেছে। সম্পাদক একজন প্রাবন্ধিক। প্রবন্ধের নানারূপ নির্বন্ধ থাকে। দৈবের নির্বন্ধ। সহজ কথাটাকে কত পেঁচিয়ে, লেছে খেলিয়ে, দেশ-বিদেশের নোনাঙ্কে চুবিয়ে তবে দাঁড় করানো হয়। অবশ্য সেগুলি পড়ার পর পাঠক আর খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারেন না। আবার পড়েন। ভুঁয়ে, চোখ উন্টে। এটা হল সার্বিক পড়া। কপাল ভালো যে ওই ভয়ঙ্কর বস্তু খুব বেশি লোক নাড়বার চাড়বার সাহস পান না। নইলে দেশটা ঠ্যাংভাঙা কোমরভাঙায় ভবে যেত। রউফ সাহেব তেমন প্রবন্ধেব বান ডাকুন, আপত্তি নেই। কিন্তু তাঁর কাগজের পাতায় কবিতা নামে যা সব বের হচ্ছে—সেও যদি আদতে প্রবন্ধই হয়, তবেই তো মুকিল। প্রবন্ধ মানুষ পড়তে চায় না বলে তাকে কবিতার খোলসে পুরে গিলতে বাধ্য করা হবে—এ আকারটা একটু বেশিই হয়ে যাচ্ছে। মে ২০০২ সংখ্যায় তেমনই একটি কবিতা চোখে পড়ল—“হে সমষ্টি।” কবির

নাম অতনুশাসন মুখোপাধ্যায়। দু’কলম জোড়া পাতাভর্তি লেখাটি পড়ার পর যে প্রমাণটি প্রথমেই মনে এল, তা হল—শ্রীযুক্ত অতনুশাসনকে এই বলে শাসন কবাব মতো কেউ কি নেই যে তিনি আর যাই কবন না কেন, কবিতা লেখার দুরূহটি যেন কোনোদিন না কবন।

আহা, শব্দ বর্ণ বাক্য আদি মশলা ও আনাঙ্গপাতি সহযোগে যে চচ্চড়িটি তিনি বানিয়েছেন তা তাত্ত্বিক মতে কিনা জানি না, তবে গলাধঃকরণে আত্মিক যে অনিবার্য—এটা জানি। কিঞ্চিৎ নমুনা—
যে সামান্য ভূণ থেকে উঠে আসা—
ধরো, যদি তাদের সৃষ্টিই না হত?
অতএব, জন্মানোর অর্থই সৃষ্টিশীলতা।

আহা, কী নতুন কথাই শোনালেন! ভূণেব সৃষ্টি না হলে মানুষটি জন্মাত না—ওধু এমন অসামান্য আবিষ্কারের জন্যেই কবিকে বেল কিং নো-বেল দেওয়া উচিত।

কবির লক্ষ্য অধুনা বড়দা আমেরিকা। আমেরিকার লোক ইংরেজিতে কথা কয়—কবি বোধহয় কারো কাছে গুনেছেন। এবং তাঁর নিশ্চিত ধারণা—আপামর আমেরিকান ছমড়ি ঝেঁবে কবিতাটা পড়বে। সে জন্যে তাঁর সঞ্চয়ে যতগুলো ইংবেজি শব্দ ছিল তার সবগুলোই যদৃচ্ছ রসিয়ে দিয়েছেন,—

সাবভাইভাল অব দ্য ফিটেস্ট, অ্যাকশন, ফ্যাসিস্ট; এডিশন, চেয়ারম্যান, রান, স্ট্যাচু, রিওয়াইগু ইত্যাদি ইত্যাদি। ওধু তাই নয়, কবি যে দুনিয়ার ইতিহাস টিতিহাসও জানেন, সে প্রমাণ দিতেও ছাড়েননি—হারকিউলিস, অজিয়াস রাজা, আলফিউস নদী—এসবের কথাও বলেছেন। আর কাব্য? এ কবিতার বাক্যে বাক্যে, শব্দে শব্দে, বর্ণে বর্ণে কাব্য। এমনকি বর্ণহীনতায়ও। কবিতার বর্ণমালাও বলা যায়। আর একটু নমুনা চাখা যাক। (পাঠক, ঈশ্বর আপনার সহায় হোন)

হে সমষ্টি, তোমার বোধ আর বোধাত্তর কতগুলো

মানচিত্র চেনাল

কোনওটা নিমকি, কোনওটা সিঁজাড়া, কোনওটা

খেসারির বড়ির আকার

ক্ষেত্রবিশেষে, যদি বিপরীত বোধ বা বিপরীত বোধাত্তর

কিংবা ভাবলেশহীন ভাবাত্তর ঘটত

ঘটলে, সেটাও স্বাভাবিক হত—

তা হলে তো নিমকি হতে পারত অন্য কিছু

সিঙাড়া বা বড়ি তৈরিচ।

পাঠক, কী পাচ্ছেন না কবিতায়? নিমকি, সিঙাড়া, খেসারির বড়ি। এতেও যদি সম্ভূষ্ট না হন তো কবির কিছুই করার নেই। তিনি তো আর একই কবিতায় রসগোল্লা, মালাই চম্‌চম্‌, পাস্তুরা গুঁজে দিতে পারেন না! চট্‌চটে হয়ে যাবে, পিঁপড়েও ধরবে। তারাই খেয়ে নেবে কবিতাটা। আপনার কপালে লবডঙ্কা।

ধ্বংসরস, পরমাণুরস, ধর্মরস, বর্ণরস, মায় হালফিল গ্লোবরস
রসশাস্ত্রজ্ঞব অভিবানের নতুন এডিশন ছাপতে গেল বুকি।

একটা রসের কথা তাঁর মাথায় আসেনি। সেটা হল বৈর্যরস। পাঠকের ধৈর্যরসে ঢের আগেই বাঁধ ভেঙেছে এবং তা হ হ করে কবির পানে ধৈর্য চলেছে তুমুল বন্যার মতো। কবিদের সুদিন এলো বলে। একেবারে রস-সমুদ্রে ভাসবেন। আব কষ্ট করে ‘ব্যাকং রসাত্মকং কাব্যম্’ করতে হবে না, নিজেরাই বেশ সরস হয়ে উঠবেন। সারা অঙ্গে ফুটে ফুটে উঠবে কাব্য। জীবনানন্দ শুধু শব্দচিল শালিখ নয়, ভোরের কাক হয়েও ফিরে আসবেন বলে হুমকি দিয়ে গেছিলেন। বলা যায় না, হয়ত এসেওছেন কোন ফাঁকে। ষাপটি মেরে আছেন। কবিতা নামের ঢেব আবর্জনা সাফ করতে হবে তাঁকে। বসাপ্রুত কবির গায়ে রসের লোভে ঠোঁকব বসালেই হয়েছে।

অবশ্য, কিছুই বলা যায় না, সেই ঠোঁকরে যে উচ্চাঙ্কিত ধ্বনি কবিকণ্ঠ হতে নিঃসৃত হবে তাকেও কবিতার খোলসে ছেপে দিতে পারেন সম্পাদক। টেকি স্বগুণে গিয়েও ধান ভানে, আর কবি সামান্য কাকের ঠোঁকবে কবিতার জন্ম দিতে পারবেন না? বলাই যাট।

—মৈনাক মিত্র

একসঙ্গে তেলেভাজা আর মুদিব দোকান। পুরনো বাংলায় এমনটিই তো ছিল। নিজেদের প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি কবির এই গভীর শ্রদ্ধা দেখে আপনি মাথা নত হয়ে যাব, অবশ্য ঘুমে। পাঠক, কী পাচ্ছেন না কবিতায়? নিমকি, সিঙাড়া, খেসারির বড়ি। এতেও যদি সম্ভূষ্ট না হন তো কবির কিছুই করার নেই। তিনি তো আর একই কবিতায় রসগোল্লা, মালাই চম্‌চম্‌, পাস্তুরা গুঁজে দিতে পারেন না। চট্‌চটে হয়ে যাবে, পিঁপড়েও ধরবে। তারাই খেয়ে নেবে কবিতাটা। আপনার কপালে লবডঙ্কা।

সম্পাদক মশায় কেন যে এটিকে প্রবন্ধ হিসেবে ছাপেননি, সেটাই ভাববার বিষয়। সম্ভবত এই জ্বরদস্ত প্রাবন্ধিক তাঁর বাজার নষ্ট করতে পারে ভেবে ব্যাজার হয়েছে। আমরা বউফ সাহেবকে এই বলে আশ্বস্ত করতে পারি যে, তাঁর ভয় পাওয়ার কিছু নেই, কেন না তাঁর প্রবন্ধ আজও খুব বেশি লোক পড়েন না, ভবিষ্যতেও পড়বেন না। তফাৎ কিছুই নেই।

যাই হোক, কবি এবং কবিতায় ফেরা যাক। কবি রসগোল্লা পাস্তুরা সরবরাহ না করলেও বসের জোগান দিয়েছেন ঢের—



কার্টুন : উৎপল চক্রবর্তী

পথঘাটের কিসসা



শেলী-এম্পেশাল

লে কটাউন যশোর রোড উজিয়ে বাঙ্গুর অ্যাভিনিউ আর শ্যামনগরের মধ্যখানে শেলী সিনেমার একেবারে মুখোমুখি পি. ডব্লিউ. ডি আর বাম সরকারের দক্ষিণহস্তের অসীম দয়াতে খালের উপড়ে আসা জনকে হঠানোর জন্য পাইপ বসানোর কর্মযজ্ঞ চলছে। বলা বাহুল্য, সরকারের এ ধরনের খোঁড়াখুঁড়ির পরিকল্পনা সাধারণত দীর্ঘমেয়াদি হয়ে থাকে, তা সে পথচারীরা আর বাসযাত্রীরা অফিস টাইমে জ্যামে আটকে থেকে, জলকাদা মেখে ভূত হয়ে যতই সরকারেব চোন্দপুরুষ উদ্ধার করুক না কেন। আপনি এই এলাকাতে বাসে উঠলেই ধবে নেবেন আপনার গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে যে অতিরিক্ত সময় লাগবে তাব মধ্যে “কিউ কি সঁস ভি বহ থি” অথবা “একক দশক শতক”-এর গোট দুয়েক এগিসোড আরামসে দেখে নিতে পারেন। হয়ত যশোর বোডের এরকম শবব্যবচ্ছেদ দেখে দুঃখ পাবেন এই ভেবে যে কেন কোনো কবিতকর্মা ট্রাফিক কনস্টেবলকে এখানে বেয়াড়া এবং এদিক-সেদিক টু মারা গাড়িকে ধমকি দেওয়ার জন্য রাখা হয়নি। গরু খেদানোর খোঁটা নিয়ে অবশ্য কয়েকজন পার্টির ক্যাভার দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে ‘ভাইনে, বায়ে, চপে বাদিকে’—বলে গল্পা ফাটিয়ে চ্যাচান। স্বর্গ আব নবকের মাঝেও বোধহয় রাজা ত্রিশঙ্কু এভাবে বলে গিয়ে গান গাননি—“কত দূর আর কতদূর—বলো মা।” বাঙ্গুর অ্যাভিনিউ-এর সামনে এভাবে ডাঙাতে মাগুরমাছের মতো খাবি খেতে খেতে বাসযাত্রীরা একে অপরকে শুধোচ্ছেন—“ভাই, ফরাকার দ্বিতীয় বাঁধ কবে তৈরি শেষ হবে?” সঙ্গে সঙ্গে উত্তর আসে—“দাদা। এ হল ফাইভ ইয়াবস্ প্ল্যান। শেলী এম্পেশাল বলে কথা।” বাসযাত্রীদের অনেকেই এভাবে বাঁধ-এর কাছে বেঁধে থাকতে গিয়ে ব্লাড প্রেসার, হার্টবিট, মেজাজ—সমুদ্রে চড়ে যাচ্ছে। প্রাইভেট টিউটর রূপী বেকারদের মাথায় হাত। বাম সভ্যতার এই জননিকাশী প্রকল্পের গুতোয় তাঁদের সাড়ে

সাতটা টিউশনে গিয়ে পৌছতে হচ্ছে সাড়ে আটটায়। গার্জিয়ানদের ইন্ডিপোড়া মুখশ্রী আর স্টুডেন্টদের পেটেট প্রশ্ন—“এত দেবি কেন?” সামনা করতে গিয়েই তো তাদের প্রাণপাখি উড়ে যাচ্ছে। টিউশনগুলোই না মায়ের ভোগে চলে যায়।

—কৌশিক রায়

শ্রীযুক্ত ভদ্রমহিলা

বাস চলেছে গড়িয়াহাট থেকে ধর্মতলার দিকে। যুবক দুই শ্যালিকাকে নিয়ে চলেছেন নিউ মার্কেটে। মার্কেটিং করতে। যুবকের মার্কেট ভালোই যাচ্ছে বলতে হবে। ভিড় বাসেও হাসাহাসি, কাসাকাসি, গায়ে খোঁচা, মুখ মোছা। কবতে করতেই এসে গেল রাসবিহারী ক্রসিং। এক ভদ্রমহিলা উঠলেন। এমন কিছু নয়, প্রায় সওয়া ছ’ফুট, ওজন তাও খুব বেশি নয়, আন্দাজ নব্বই, উপরি হিসেবে বেশ পুরু গোঁফের রেখা। প্রমীলাকুলের প্রহ্লাদকে দেখে জামাইবাবুর প্রেম প্রায় হাওয়া। শ্যালিকারাও চোখ গোম্মা গোম্মা করে দেখছে শ্রীযুক্ত ভদ্রমহিলাকে। হঠাৎই জামাইবাবু বাসযাত্রীদের ভবিষ্যৎ ভাবনায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন—“ইস্! যদি কারো ঘাড়ে পড়ে, কী দশা হবে তার?”

শ্যালিকাদ্বয়ের মধ্যে তল্লবয়সীটি বলে উঠল, “উনি পড়লে তিনিও পড়বেন। ওনার প্রেমে।”

“নিজেব ফ্রেমটা অক্ষত থাকলে তবেই না!” জামাইবাবু দৃষ্টিস্তা তবু যায় না।

বিশালদেহী ভদ্রমহিলা দু’পাশের যাত্রীদের অবলীলাক্রমে দু’দিকে হঠিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন জামাইবাবুর সামনে। সিটে বসে জামাইবাবু তাঁর অপরাপ রূপমাধুরীর সঙ্গে সম্ভবত নিজের স্ত্রীর আদলটি মেলাচ্ছিলেন। আব-সেই সময়ই, বলা নেই কওয়া নেই আচমকা মারণ-ব্রেক। সুপুরুষ ভদ্রমহিলা সিধে জামাইবাবুর ঘাড়ে। জামাইবাবু এক হাত জিত বের করে পর্বতের ভেতর থেকে বেরোনোর চেষ্টায় ব্যাকুল। এক যাত্রী মন্তব্য করলেন,— “হয়েছে তো। কারো চেহারা নিয়ে ব্যঙ্গ করা পাপ। পাপ বাপকেও ছাড়ে না।”

শ্যালিকাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ যিনি, বলে উঠলেন, “আহা, উনি তো বাপই হননি এখনো।”

যাত্রীর ঝটিতি জবাব,—“হয়ে যাবে বৌদি। চেষ্টা চালিয়ে যান।”

শ্যালিকার মুখ ষ।

—শচীন মিত্র

চলচ্চিত্র দুঃসংবাদ



বলিউডি ভগত-এর পাঁচ অবতার

‘পাঞ্জীব কেশরী’ লালা লাক্ষণ্য রায়েব হত্যাকারী গোরা পুলিশ অফিসার সশাসকে গুলিতে নরকের দরজা দেখিয়ে এবং ইংরেজ বিতাড়নী ‘ইনক্লাব জিন্দাবাদ’-এর জিগির তুলে সশস্ত্র সংগ্রামের ইতিহাসে নিজেই এক মাইলস্টোন হয়ে আছেন ভগৎ সিং আর তাঁর তিন সুযোগ্য বিপ্লবী সঙ্গী সুখদেব, রাজগুরু আর বটুকেশ্বর দত্ত। কিন্তু হালফিলে বলিউডের সিনেমা-কড়াইতে দেশপ্রেমের ফোড়ন দিতে গিয়ে পাঁচ-পাঁচজন পরিচালক শহীদ ভগৎকে নিয়ে ভক্তির যে পায়তাঁড়া করছেন তার ফলে এই অমর শিখ বিপ্লবীর আত্মারামটির নিশ্চয়ই খাঁচাছাড়া হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। ভগৎ সিং-এর ফিল্মি গাজনটি বেসুরো সুরে গাওয়ার জন্য যে পাঁচজন পরিচালক, খুড়ি ‘সম্যাসী’, কোমর বেঁধে নেমেছেন তাঁরা হলেন শুভু ধানোয়া, রাজকুমার সন্তোষী, সুকুমার নায়াব, তরুণ ওয়াধওয়া আর আনন্দ সাগর। এনাদের ‘অ্যাকশন’ আর ‘কাট’-এর গোলকধাঁধায় পড়ে ভগৎ সিং হওয়ার তাকৎ দেখাতে জনতার দরবাবে হাজির হয়েছেন ববি দেওল, অজয় দেবগণ, সোনু সুদ, তরুণ খান্না আর দীপক দত্ত। পরিচালকবা আবার বুক বাজিয়ে ঢাকঢোল পিটিয়ে বসেছেন—দীপক দত্ত আর তরুণ খান্নার বংশের সঙ্গে লতায়পাতায় নাকি ভগৎ সিং-এর খুড়িমা-ঠাকুর্দার আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে। সুতরাং ভগতের শহীদাখ্যা তাঁদের অভিনয়ের মধ্যে জ্যাস্ত না হয়ে যায়ই না। তবে মুশকিলটা হচ্ছে, এই পাঁচ হিরো যেভাবে ভগৎজিব মেকআপ নিয়েছেন তাতে শুধু পাকানো গোঁফছোড়া আর সাহেবি হ্যাটিট ছাড়া ভগতের চেহাবার নামগন্ধও পাওয়া যায়নি। সৌভাগ্যের কথা, ভগৎজি এখন আর ধরাধামে নেই। তা না হলে এই পাঁচটি ছবির ককটেল দর্শন করে নিজের চেহারাটাকেই বেমানুম ভুলে কোনো মানসিক সংশোধনাগারে ভর্তি হতে চাইতেন। অবশ্য তার আগে সুখন্য পরিচালকদের ওপর তাঁর রিভলবারের পাঁচটি গুলির সম্ভাবহারও

করে যেতে পারতেন তিনি। পরিচালকদের মধ্যে আনন্দ সাগর ও রামানন্দ সাগরও বর্তমান আছেন। একসময় বোকা বাজের অরুণ গোভিল আর দীপিকা চিখলিয়াকে মেগা সিরিয়াল ‘রামায়ণ’-এ তাঁরা এমন জ্যাস্ত রাম-সীতা বানিয়ে ছেড়েছিলেন যে ভক্ত-দর্শকেরা ঠাকুরঘরের সিংহাসনে টি.ভি. কেই বসিয়ে ধূপধূনো সহকারে পূজো করতেন। ভগৎ সিংকেও রামজি আর বজরদবলী হনুমানজির স্ট্যাটাসে তোলার গভীর বাসনা সাগর কোম্পানির আছে বোধহয়। তবে ভগৎ সিং-এর বিপ্লবী আত্মা ওই সাগর থেকে কতটা লোনা জল খাবেন সেটাই বিবেচনার বিষয়।

তবে হ্যাঁ, ভগৎ সিং এর ক্রোন বা জলজ্যাস্ত ছবি হওয়ার দেশপ্রেমিক বাসনাতে বাকি তিন সর্দারজিকে পেছনে ঝেড়ে ফেলে ফিল্মিং লাইন ছুঁতে চলেছেন রাজকুমার সন্তোষীর ‘ভগত’ অজয় দেবগণ আর শুভু ধানোয়া আর ধর্মেন্দ্রব ভগত ববি দেওল। কিছুদিন আগেই রামগোপাল ডার্মার ‘কোম্পানি’ ছবিতে মাফিয়া ডন মালিক-এর রোলে অভিনয় করেছেন তরুণাব আদুরে জামাই অজয়। আগুর ওয়াশের বোলকে একেবারে ‘খালাস’ করে এবার একটু দেশপ্রেমিক হওয়ার বাসনা বোধহয় হয়েছে অজয়ের। ফাইট মাস্টার বীক দেবগণের ব্যাটা তিনি। বাবাব কাছে হাতে-কলমে শিখে নিয়ে ‘ফুল আউব কাটে’, ‘দিব্যশক্তি’, ‘প্ল্যাটফর্ম’, ‘সংগ্রাম’ আব ‘জিগর’ ছবিগুলোতে হলিউডের সরতোলা অ্যাকশন দৃশ্যে কম ডিগবাজি খাননি অজয়।

হিন্দি ছবিতে অ্যাকশন বিপ্লবী বলতে তো দেবগণই। তাঁর কাছে সানি, সঞ্জয়, অক্ষয়, সুনীল, শেঠীয়া নস্যিমাাত্র। সুতরাং ভগৎ সিংকেও দেশেব ও দেশের স্বাধীনতার স্বার্থে অ্যাকশন কিং বানাতে অজয় দেবগণের বাধা কোথায়? তার ওপব বোনাস হিসেবে আছে অজয়ের সাপের মতো চোখ। দেবেই মনে হবে বুঝি কোনো হতভাগাকে মেরে তক্তা করার জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই ধরনের চোখের আগুনপাবা নজর বোধহয় মাস্টারদা সূর্য সেন, চে গেভারা, মার্শাল টিটো বা চাক মজুমদারেরও ছিল না। তাহলে বিপ্লবী ভগৎ মানেই অজয়। তবে বাপ ধর্মেন্দ্র আর তাগড়ই বড়দা সানি দেওল-এর কাঁধে ভর দিয়ে কলকাতায় সাংবাদিক সম্মেলনে ববি দেওল জাঁক করে বলে গেছেন—ওসব দেবগণ-টেবগণ কথার কথা মাত্র। আসল ভগৎ সিং-এর পবিত্র স্মৃতিকে তিনিই একমাত্র সেলুলয়েডের মাধ্যমে ফিবিয় এনেছেন। ববি-র মুখটা নাহয় প্রেমিকার ধাতানি-খাওয়া গ্যাজো-বেবি মার্কা। চোখদুটোতে না হয় গার্লস স্কুলের দিকে অনিমেষ দৃষ্টি। তবুও তিনিই হতে পারেন সর্দার ভগৎ সিং। ‘শহীদ’ ছবিতে ববি যেভাবে মুঠি পাকিয়ে ‘ইনক্লাব জিন্দাবাদ’ বলে চোঁচিয়ে গলা ভেঙেছেন, অথবা যে নিখুঁত টিপ-এ আইনসভায় বোমা হুঁড়ে মেরেছেন, তা দেখে দেশভক্ত মনোজ কুমার আর দিলীপ কুমারের হযত শহীদেব রোল কবার ইচ্ছা চিরকালের জন্য উড়ে যাবে। ‘ক্রান্তি’ ছবিতে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অথ পুলিশ অভয় প্রতাপ সিং-এর ভূমিকাতে ববি ভিলেন কবীর বেদীকে আড়ং ধোলাই দিতে গিয়ে বলেছিলেন—‘ফয়সালা অন দ্য স্পট’। ‘বাদল’ আর ‘সোলজার’ ছবিতেও ভিলেনদের মেরুদণ্ডকে জেলি বানিয়ে দিয়ে ববি বিপ্লবী হওয়ার সহজপাঠ নিয়েছেন। বলিউডকে বিপ্লবের প্লাবনে ভাসিয়ে

দিতে ববিই ভগৎ সিং। ঐশ্বর্য রাই আবার তাঁর হবু বউ। অবশ্য একবার নাচানাটির পরই বিদায় নিয়েছেন। 'ইণ্ডিয়ান' ছবিতে কমিশনার রাজশেখর আত্মদ হয়ে সানি দেওল ড্যানিকে বাসের সঙ্গে ডুবিয়ে দিয়ে বীর হয়েছিলেন। ববির ফিল্মে ভগৎ সিং-এর বিপ্লবী বন্ধু চন্দ্রশেখর আত্মদ-এর রোলে তর্জন-গর্জন করা ও গাছের আড়াল থেকে ব্রিটিশ পুলিশের দিকে গুলি চালাবার মধ্য দিয়ে সানির 'বিপ্লবী' হওয়ার পাঠক্রম সমাপ্ত। তবে অ্যাকশন কা বাত্ হ্যায়। ভগৎ-এর সঙ্গে ব্রিটিশদের তুলোধোনা করার সুযোগ ছাড়বেন কেন সানি? যা হোক, শুভু ধানোয়া-র 'ভগৎ' চিত্রে-আর কিছু না হোক, অমৃত সিং-এর পদোন্নতি হয়েছে। 'বেতাব' ছবিতে সানি দেওল-এর লাভার ছিলেন অমৃত। এরপর কয়েকদিন অলরাউণ্ডার রবি শাস্ত্রীর সঙ্গে 'এক দুজ্ঞে কে লিয়ে' হলেন। তার পরেই পাঠোদ্রির নবাবের বোমা, মানে সঈফ আলি খানের ঘরগী। এবার তিনি বয়স ভাঁড়িয়ে ভগৎ ওবফে ববি দেওল-এর মা হয়েছেন। মায়ের অমৃতসমান বাণী তাঁর মুখ দিয়ে বেরোবে না তো কার মুখ দিয়ে বেরোবে!!

—কেশোরাম সিনেমাওয়াল

কলকাতায় ফরাসি বিপ্লব

কলকাতায় কী না হয়! ফরাসি চলচ্চিত্র উৎসবের শুরু। আর এইসব বন্দনের জন্যেই আছে নন্দন। ১৪ই জুলাই ৬টায় "কার্নিভাল" নামের যে নামকরা ফরাসি ছবিটি প্রদর্শিত হল, বাংলায় অনায়াসে তার নাম দেওয়া চলত—নাচন কোঁদন। ঘটনা দুয়েক জুড়ে একদমল মেয়ে-মদ স্রেফ নেচে-কুঁদেই হদ্দ হয়ে গেল। নায়িকার বর ইয়ার্ডে পাহারার ডিউটিতে। সেই সুবাদে

প্রেমিক প্রবর হাজিব। নায়িকা প্রথমে ভিডেওর মধ্যে তার কাঁখে চড়ে বসলে, তারপর এক নিভৃত কক্ষে গিয়ে, যা হবার তাই, সব ছেড়েছুড়ে কোলে। দর্শকদের আশা অবশ্য বিশেষ-পূর্ণ হয়নি। বিদেশি ছবিতে মোটে একটা দৃশ্য? ভরভরতি প্রেক্ষাগৃহে শো শেষ হবার পর দীর্ঘশ্বাসে ঘাটতি ছিল না। তবে একটা নতুন জিনিস এখানকার মেয়েরা শিখল যে এমন বগরগে প্রেমদৃশ্যের আগে শুধু নিজেরাই লিপস্টিক মাখলে চলে না, প্রেমিকের ঠোঁটদুটোতেও জাবড়ে কবে মাখাতে হয়।

মুহূর্মুহু বিয়ার গেল। লম্বা লম্বা ডাঙায় রকমাবি বাণী লাগিয়ে সারাক্ষণ উদ্যম নেতা। এমন উৎসবের দিনে ডিউটি। ছোঃ। সবাই মিলে তার বরকে আনলে উঠিয়ে। ইয়ার্ডে রইল শুধু কুকুরটা। কাছের ফাঁকি খালি কলকাতায় চলবে? কেন? কলকাতার একচেটিয়া অধিকার? এবং ডিউটি ফাঁকি নিয়ে কিছু বলতে এলে? দেখা গেল—একই দৃশ্য কতাকে ঘরে বেধড়ক মার। ইয়ার্কি! ফাঁকি দেওয়া সব দেশেব মানুষেরই জন্মগত অধিকার। কতাকে পিটিয়ে, যখন কতী ঘরে গিয়ে দোর বন্ধ করে কাঁপছেন, সেখানে গিয়ে দরজাঘ লাখিটাখি মেরে বাবু গেলেন ইয়ার্ডে। তাবপব পেট্রোল বোমা মেরে ফ্যাপা কুকুবটাকে দিলেন জ্বালিয়ে।

বাণী নাচিয়ে নাচন-কোঁদন এবং কর্মে ফাঁকির এমন দৃষ্টান্তে এদেশের লাল-তেরঙ্গা-গেরুয়াবাবুরা যতই উল্লসিত হোন না কেন, ছবিটি দেখার পর উপলব্ধি এবং পবামর্শ :

- ১) কুকুরটিকে না পুড়িয়ে ছাত্ত রাখা উচিত ছিল পরিচালকের।
- ২) পোড়ানো উচিত ছিল কুকুব বাদে বাকি সবকটাকেই।
- ৩) তারপর সেই গণচিহ্নিত বাপ দেওয়া উচিত ছিল পরিচালকের।

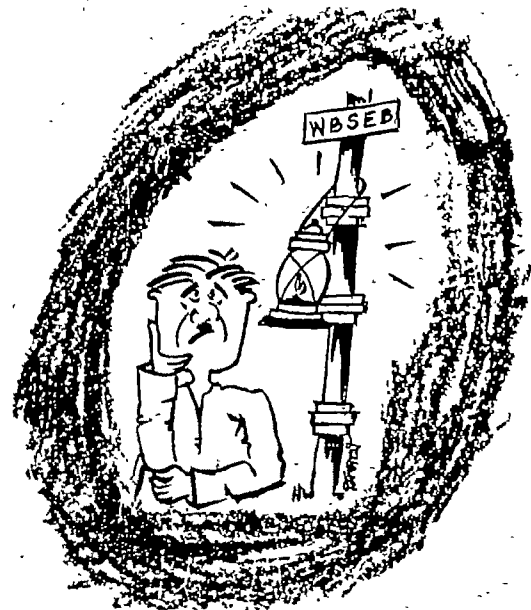
হ্যাঁ, ভবিষ্যতের ঢের ফিল্মি জঞ্জাল তাহলে পয়দা হত না।

—ভূতলেন্দু ভৌমিক

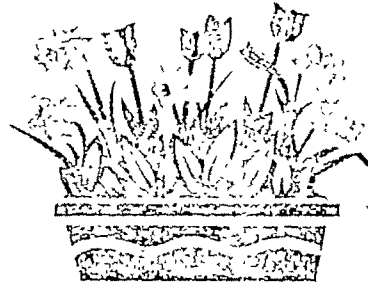
হে আমার পৃষ্ঠপোষক, নিঠুর হে

অচিন্ত্য সুরাল

হৃদয় হতে উৎসারিত এই যে গানের আলো
এই আলোতে পথ চলা দায় পথটা যেমনই ভালো
সন্ধে-সকাল ধন্দে ভরা
জীবন বানান দ্বন্দে ভরা
ঈর্ষা মোহ রঞ্জে ভরা
পথটা খানখন্দে ভরা।
গানের আলো দাও নিভিয়ে পথ হোক নিকষ কালো।
রইব বসে অন্ধকারে
অচিন পথের বন্ধ ছারে
গানের ভুবন কজা করে তোমার চালটি চালো।
কানের ভিতর গোপন লীলায় বিষের মন্ত্র ঢালো
এই করেছ ভালো নিঠুর
এতেই তোমার ভালো
এমনি করেই পাব দয়াল
পাদপ্রদীপের আলো।



“হিন্দু না ওরা মুসলিম? ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন?
কাণ্ডারী! বলো, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র!”



শিক্ষা
প্রগতি
সমাজসেবা
অসাম্প্রদায়িকতা

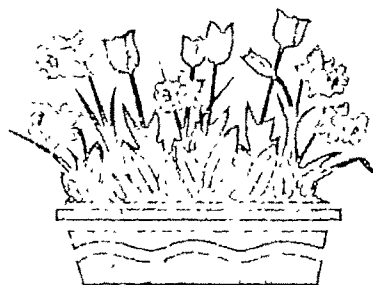
পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতি

৩০/৩, আলিমুদ্দিন স্ট্রিট (চারতলা)

কলকাতা-৭০০ ০১৬

ফোন : ২৪৪-৭৫৬৯

Best Wishes From



**R. G. SHAW
&
SONS
PVT. LTD**

**59, DHARMATALA STREET.
KOLKATA-700013.**

দাকে সাদা ও কালোকে কালো বলার একমাত্র সহর্ষ মাসিকপত্র

শারদীয় ১৪০৯

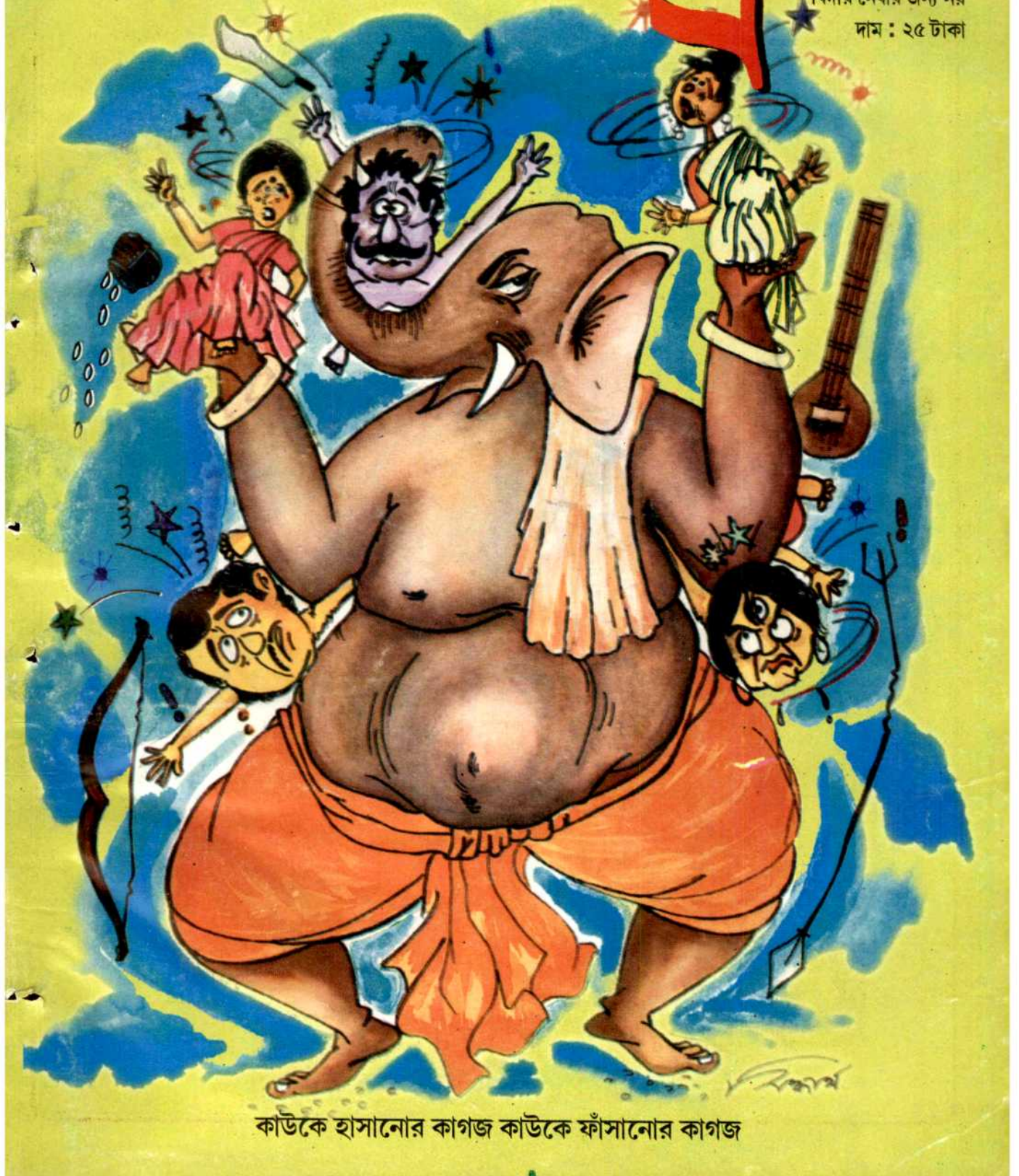
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অপ্রকাশিত মজাদার চিঠি

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মুখবন্ধ সহ

পটপাঠ

বিদায় নেবার জন্য নয়

দাম : ২৫ টাকা



কাউকে হাসানোর কাগজ কাউকে ফাঁসানোর কাগজ

সংসদের সেবা সাহিত্য সস্তার

স্বদেশীয় ভারত-বিদ্যা সাধক (গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত)	৫০.০০
রাজনীতি (স্বামী প্রজ্ঞানন্দ)	১৫.০০
রক্তের অন্ধরে (কমলা দাশগুপ্ত)	৪০.০০
বিপ্লবের পদচিহ্ন (ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত)	৭৫.০০
অগ্নিযুগ ও বিপ্লবী ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত (সংযুক্তা মিত্র)	৪০.০০
স্বাধীনতা সংগ্রামে বরিশাল (হীরালাল দাশগুপ্ত)	৮০.০০
হারানো দিনের নাটক (পিনাকেশ সরকার সম্পাদিত)	১৫০.০০
কাশীদাসী মহাভারত (দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত) ১ম, ২য় (প্রতি খণ্ড)	৬০.০০
লোরচন্দ্রাণী ও সতী ময়না (দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত)	৮০.০০
সংস্কৃত নাটকের গল্প (অমিতা চক্রবর্তী)	২৫.০০
বিবেকানন্দ : প্রশ্ন ও প্রসঙ্গ (নিমাইসাধন বসু)	৭৫.০০
দণ্ডনীতি (নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী)	১০০.০০
বৈষ্ণব পদাবলী (হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত)	৩০০.০০
গীতার কথা ও সাধনা (মহেন্দ্রনাথ দে)	১৫.০০
স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী (মহেন্দ্রনাথ দত্ত)	১২.০০
যথা নিযুক্তোহস্মি (মহেন্দ্রনাথ দত্ত)	২০.০০
বাংলা ভাষাচর্চা (সুভাষ ভট্টাচার্য)	২৫.০০
ঠাকুরবাড়ির কথা (হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়)	৬০.০০
চরিত কথা (রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী)	৪০.০০
চলার পথের দিনলিপি (চারুবালা দেবী)	১০০.০০
বিলুপ্ত জনপদ : প্রচলিত কাহিনী (দীপঙ্কর লাহিড়ী)	১০০.০০



● সাহিত্য সংসদ ●

৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৯

ফোন : ৩৫০-৭৬৬৯/৩১৯৫ ● ফ্যাক্স : + ৯১ ৩৩ ৩৬০-৩৫০৮

শারদীয় ১৪০৯

সাদাকে সাদা ও কালোকে কালো বলার একমাত্র সহর্ষ মাসিকপত্র

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০০২

৩য় বর্ষ।। ২-৩ সংখ্যা

দাম : ২৫ টাকা

কাউকে হাসানোর কাগজ
কাউকে ফাঁসানোর কাগজ

ঐপাঠ

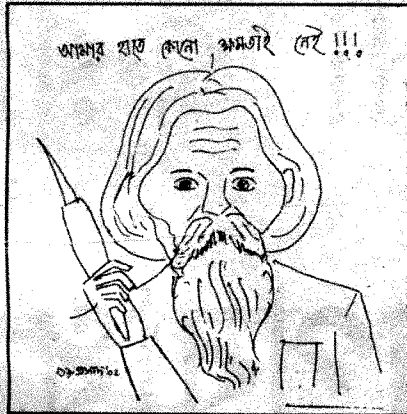
বিদায় নেবার জন্য নয়

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী • তারাপদ রায় • সমরেশ মজুমদার • শঙ্করলাল ভট্টাচার্য

সম্পাদক : শেখর আহমেদ

পরিচালন সমিতি : ডাঃ তুষারকান্তি রায় • প্রদ্যোত কুমার মিত্র • বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী • অঞ্জনা দত্ত • ডাঃ শুভাশিস নিয়োগী • শচীন মিত্র

কপিরাইট উঠে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের
অপ্রকাশিত লেখাপত্র ছাপার হিড়িক উঠেছে। ওঠাই
স্বাভাবিক। কোনো কোনো পত্রিকায় গাদাগুচ্ছের
অপ্রকাশিত কেজো-অকেজো চিঠিপত্র ছাপাও হচ্ছে।
চিঠির ম্যারাথনে না গিয়ে এমন তিনটি মাত্র
চিঠি ছাপা হল যা একঅর্থে আপাত বিরোধী, **৬**
আবার উপভোগ্যও বটে।



সম্পাদকীয় □ ৫

অপ্রকাশিত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অপ্রকাশিত চিঠি • মুখবন্ধ : সুনীল
গঙ্গোপাধ্যায় □ ৬
মনোজ বসুর অপ্রকাশিত গল্প □ ১০

পুরনো কাসুন্দি

দুর্গোৎসব (জ্ঞানান্বেষণ) □ ১১

বারয়ারী (সোমপ্রকাশ) □ ১২

প্রচ্ছদ কাহিনী

কলকাতা ও গণেশ ঠাকুর • চরণ বৈরাগী □ ১৪৮

মা দুর্গার ঐটো আরাধনা • কুশিকনন্দন রায়বাহাদুর □ ৩৩

উপন্যাস

ত্রাণ্তিকাল • রাখাগ্রসাদ ঘোষাল □ ৭৩

বড়গল্প

জাম্বু • বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় □ ৩৬

আমার পাড়ার মেয়েরা • শঙ্করলাল ভট্টাচার্য □ ১৫০

গল্প

ব্যানার্জি দিদিমা • সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত □ ৭০

কলুর বুদ্ধিজীবী বলদ • সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় □ ৬০

স্বপ্ন পরিচয় • কল্যাণ মজুমদার □ ১৩৪

শত্রু যখন
সাম্প্রদায়িকতা

প্রতিবাদ না করাই
তখন অপরাধ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই. সি. এ...

কল-কাঠি ● বিনতা রায় চৌধুরী □ ৬২
লালা ● দিব্যালোচন কলমধারী □ ১১৫
চাপা চাপা কাব্য চলে ● বিমান ভট্টাচার্য □ ৬৫
রিমেকি লেখা ● উৎপল চক্রবর্তী □ ১২৩
বিশ্টু বিজ্ঞানী ● দিব্যেন্দু দাস □ ৫৬
১০ম বিচ্ছেদ বার্ষিকী ● শেখর আহমেদ □ ১১৭

অনুবাদ ও রূপান্তরিত গল্প

দেওয়াল ● জাঁ পল সার্ত্র—অনুবাদ: প্রণবেন্দ্রনাথ ঘোষ □ ১৬
নাস্তিকের পুজো ● অনুরে দ্য বাল সার্ত্র—রূপান্তর: সুস্মিতা গঙ্গৈ
পাধ্যায় □ ১২৭

রসনাট্য

কলকোতা দর্শন ● কৌশিক রায় □ ২৫

আড়ং খোলাই

লাল শায়ায় ইস্ত্রি ● সমরেশ মজুমদার □ ৩৪
সাহিত্যের স্বাভাবিকতা ● শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় □ ১৩২
শতং বদ মাং লিখ ● পিনাকী ভাদুড়ী □ ৫০

সেকালের তাজ্জব কি বাত

উচ্চশিক্ষা-সমুদ্রযাত্রা প্রায়শ্চিত্ত ● হরিপদ ভৌমিক □ ১৩৮

রসকাব্য

আরশোলা ● সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত □ ১৫৯
হায়দ্রাবাদে পিণ্টে ● নবনীতা দেব সেন □ ১৬০
বোল ● সৌরেন বসু □ ৫৫
পুজোর বাজার ● সনৎকুমার মিত্র □ ৬৪

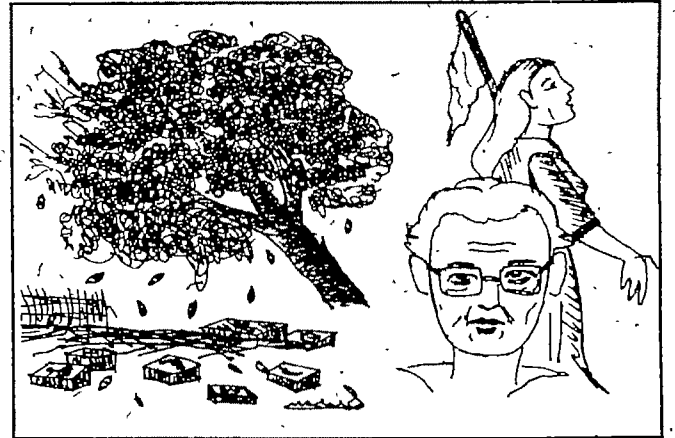
রম্য রচনা

ফজল আলির ফাজলামো □ ৫৯
যা দেবী ● তীর্থঙ্কর দাশ পুরকায়স্থ □ ৬১

পাঁচমিশেলি

পত্রপাঠ জবাব □ ১১৯
পত্রপাঠ লা জবাব □ ৪৭
দী. কু. সা-র গল্প ● প্রণয়কৃষ্ণ গোস্বামী □ ৫২
হেঁসেল □ ৫৪
জবর খবর □ ১২১
রসকেলি □ ৪৭
রাশি চক্কোর □ ১২০

উপন্যাস নয়, সময়ের দলিল। এবং সে সময় হল অতি
সাম্প্রতিক। কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের সার্থকতা বিফলতা এবং
ঘাত-প্রতিঘাতে দ্বন্দ্বমুখর সময়। প্রকৃত সত্তা বেঁচে থাকে নাকি
সত্তা বদলে যায় নানা কারণে। সমসাময়িক বিতর্কিত
'হিং-টিং-ছটু প্রশংসো' বৃথিবা লেখক রাধাপ্রসাদ
ঘোষালের 'মাথার মধ্যে কামড়ায়'।



প্রচ্ছদ : সিদ্ধার্থ কর্মকার

অলঙ্করণ : গুরুপ্রসাদ দাস ● সিদ্ধার্থ কর্মকার ● অরুণ সেন ●
সুশানচন্দ্র ভূঁইয়া
কর্ম সহায়ক : অচিন্ত্য কারক ● জয়িতা হালদার

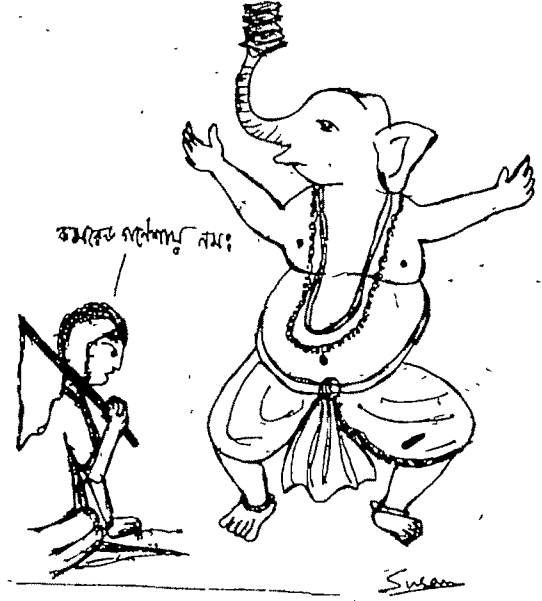
পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের অধীনে স্বীকৃত মাদ্রাসা
সমূহের ছাত্রছাত্রীদের 'কম্পিউটার' শিক্ষার সেবায়

TECHNO POWER (INDIA)

BA 21, DESHBANDHU NAGAR, BAGUIATI
KOLKATA-700059 PHONE : 543-0355/576-5733

আপনার সন্তানের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে
TECHNO POWER-এর বন্ধুত্বে এগিয়ে আসুন।

সম্পাদন কীর



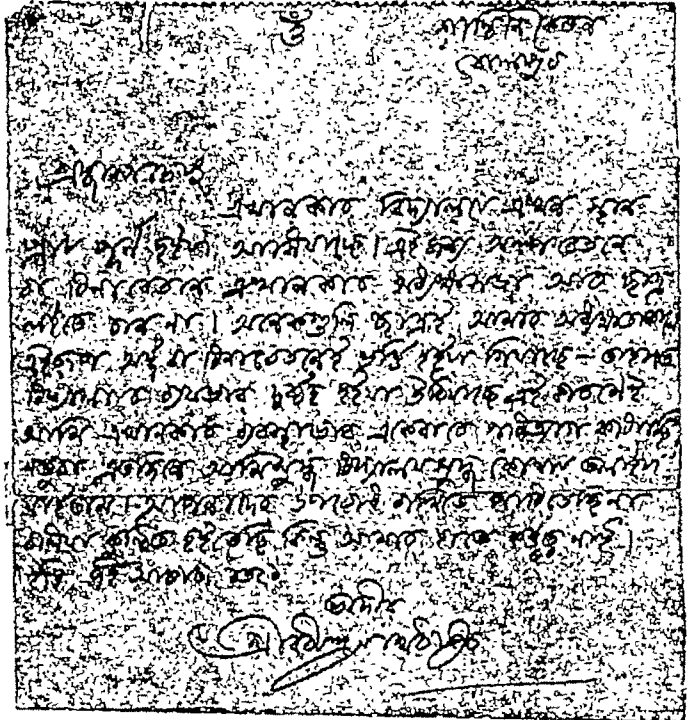
গণপতিজি ক্রমশই নিজের আধিপত্য বিস্তার করিতেছেন। যে হারে গণপতিজির প্রভাব বাড়িতেছে তাহাতে একালের বনেদী গৃহে সে কালের বারোমেসে দুর্গার ন্যায় গণেশ বাবাজির গদীয়ান হওয়ার দিন আসিল বলিয়া। এমনিতেই মা দুর্গা কিংবা লক্ষ্মীদেবী বাঙালিকে যৎকিঞ্চিৎ করুণা করিলেও গণেশজির কৃপা বাঙালি বিশেষ লাভ করে নাই। কোনো অজ্ঞাত কারণে বাঙালির প্রতি তিনি বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন না কোনোদিনই। তাই বুঝিবা তাঁহাকে তুষ্ট করিবার ধুম পড়িয়াছে। কিন্তু গণেশ বাবাজির গোসা তাহাতে যায় নাই। নিজের ন্যায় পেটমোটা বেঁওসায়ীদের প্রতিই তাঁহার যাবতীয় দাক্ষিণ্য। সে থাকুক, তাহাতে কীই বা বলিবার আছে? তাঁহার বরপুত্রগণ তো বঙ্গের অধিষ্ঠান করিতেছেন এবং বঙ্গদেশের কলিকাতা নামক শহরের বড়বাজার নামক অঞ্চলে তাঁহার স্নেহও বিতরিত হইতেছে মন্দ নহে। কিন্তু কেন যে বঙ্গ সরকারের প্রতি তাঁহার এমত কোপদৃষ্টি পড়িল, তাহা বুঝা যাইতেছে না। সরকার-ব্যবসার হাল এতই করুণ যে আর শুধু শিক্ষক-অধ্যাপক নহে, সরকারি বরপুত্র আমলা-গামলাদিগের কাছাতেও হ্যাঁচকা টান। গাড়ি আউট, টেলিফোন বাতিল। একেবারে ভাঁড়ে মা ভবানী যে। মার্কসবাদী সরকারের হেভিওয়েটগণ পূজা-আচ্চায় বিশ্বাসী নহেন (যদিও পূজা উদ্বোধনে কখনো কখনো তাঁহাদিগকে দেখা যায়)। আর মহাকরণে পূজার ব্যবস্থাও নাই। কিন্তু কথায় বলে, বিপদে পড়িলে গামলা চড়িয়াও গঙ্গা পার হইতে হয়। কলিকাতার ৩০০ বৎসরে পূজার বাড়া উৎসব যদি হইতে পারে, তবে ঐকবার শ্রী শ্রী গণপতি জিন্দাবাদ বলিয়া নামিয়া পড়িলেই বা কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হইবে? ইহার পরও কি গণেশজি। মুখ ফিরাইয়া থাকিতে পারিবেন? অর্থদণ্ডের অনর্থ দূর করিবার আর কোনো পস্থা দিকচক্রবাল অবধি তন্ন তন্ন দৃষ্টিপাতেও যে গোচরীভূত হইতেছে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অপ্রকাশিত পত্রাবলী

ব্রহ্মব্রাহ্মণ উপাধ্যায়ের প্রভাবে রবীন্দ্রনাথ একসময়ে বেশি বেশি হিন্দুয়ানির দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন। সে সম্পর্কে তিনি নিজেই বোধহয় ভত সচেতন ছিলেন না। ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের ধারণা নিয়ে তিনি শাস্তিনিকেতনে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে মেতে উঠেছিলেন। এ বিদ্যালয়ে হিন্দু ছাড়া অন্য ধর্মের ছাত্রদের স্থান ছিল না। একজন ক্রিস্চান শিক্ষক বিতাড়িত হয়েছিলেন। এবং ছাত্রদের মধ্যে যারা ব্রাহ্মণ-সন্তান তাঁরা কায়স্থ শিক্ষকদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণামও করতেন না। এমনকি খাওয়া-দাওয়ার সময়েও ব্রাহ্মণ-কায়স্থদের বাছবিচার ছিল। প্রাচীনত্বের গৌরবের পুনরুদ্ধারের বদলে এই যে কুসংস্কারকে প্রসার দেওয়া—তা বোধহয় রবীন্দ্রনাথ বোঝেননি। তাঁর এই পশ্চাৎমুখিতা অবশ্য স্বল্পস্থায়ী হয়েছিল।

বিদ্যাশ্রমটি নিয়ে তিনি এমনই মেতে উঠেছিলেন যে তাঁর পিতার সাহায্য, ঠাকুরবাড়ি এস্টেটের সাহায্য ছাড়াও তিনি নিজের অর্থ ব্যয় করতে বাধ্য হতেন প্রচুর। প্রথম দিকে বিদ্যাশ্রমটি ছিল অবৈতনিক। উপরন্তু ছাত্রদের আহার-বাসস্থানের ব্যবস্থাও করতে হত এবং কেতন দিতে হত শিক্ষকদের। এইজন্য তিনি নিজের সোনার পকেটঘড়ি এবং স্ত্রীর অলঙ্কারও বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। পরে অবশ্য কোনোক্রমে ছাত্রদের বেতন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। কিন্তু তখনো বিনা বেতনে ছাত্র ভর্তির অনুরোধ আসত অনেকের কাছ থেকে। এইসব অনুরোধ সরাসরি তিনি প্রত্যাখ্যান করতে পারতেন না, তাই অন্যদের ওপর দায় চাপিয়ে দিতেন।

—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়



চিন্তামণি চ্যাটার্জীকে লিখিত শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র

৩

শাস্তিনিকেতন

বোলপুর

শ্রদ্ধাস্পদেষু

এখানকার বিদ্যালয়ে এখন স্থান প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। এই জন্য অল্প বেতনে বা বিনা বেতনে এখানকার অধ্যক্ষসভা আর ছাত্র লইতে চান না। অনেকগুলি ছাত্রই আমার অধ্যক্ষতাকালে এইরূপ অর্দ্ধ বা

বিনাবেতনেই ভর্তি হইয়া গিয়াছে—তাহাতে বিদ্যালয়ের ব্যয়ভার দুর্ব্বল হইয়া উঠিয়াছে এই কারণেই আমি এখানকার ব্যবস্থাভার একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছি। নতুবা এতদিনে আমি সুদূর বিদ্যালয়সুদূর কোথায় তলাইয়া যাইতাম। আপনাদের উপরোধ রাখিতে পারিতেছি না বলিয়া কুণ্ঠিত হইতেছি কিন্তু আমার হাতে কর্তৃত্ব নাই। ইতি ৭ই আষাঢ় ১৩২১

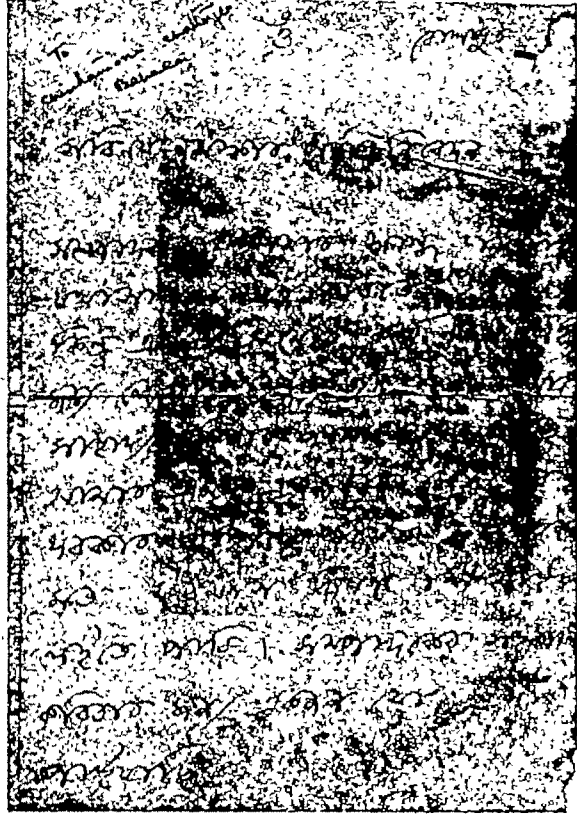
ভবদীয়

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতনে গুরুদেবের হুকুমের ওপরে হুকুম চালান, এমন গুরুর সম্মান অস্বত আমাদের জানা নেই। তাঁর কথা আশ্রমের কর্তৃপক্ষ শুনছেন না, একথা শুনলে মানুষ কাঁদবে কিনা জানি না তবে ঘোড়া নির্বাণ হাসবে। মোন্দা কথা, চূড়ান্ত আর্থিক সঙ্কট তাঁকে এতটাই পীড়িত করে তুলেছিল যে তিনি তাঁর অত্যন্ত মান্য ও ঘনিষ্ঠ জনের অনুরোধও রাখতে পারতেন না। চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের গুরুত্ব ও আন্তরিকতা কতখানি ছিল তাই প্রমাণ করে পূর্বোক্ত চিঠির বহু পূর্বে লেখা আরো দুটি চিঠি, যা এখানে মুদ্রিত করা হচ্ছে।

তবে কবিশূর ক্ষেত্র বিশেষে অত্যন্ত শাওভাবে নিকটজনকেও যে নস্যাত্ন করে দিতে পারতেন, তার প্রমাণ শেষে মুদ্রিত চিঠিটি। যে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার জন্য তিনি চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়কে বিশেষভাবে সাহায্য চেয়ে পত্র রচনা করছেন সেই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতেই তাঁর পত্র অনুরুদ্ধ সংখ্যায় না ছাপার জেদটি কবিশূর পুরোপুরি বজায় রেখেছেন। চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়ের 'শাসনবাক্য' ব প্রতি যথেষ্ট সমীহ ও শঙ্কা প্রকাশ করেও চিঠিটি সে মাসের সংখ্যায় নয়, 'আগামী মাসের' জন্যেই বরাদ্দ করেছেন।

—শেখর আহমেদ



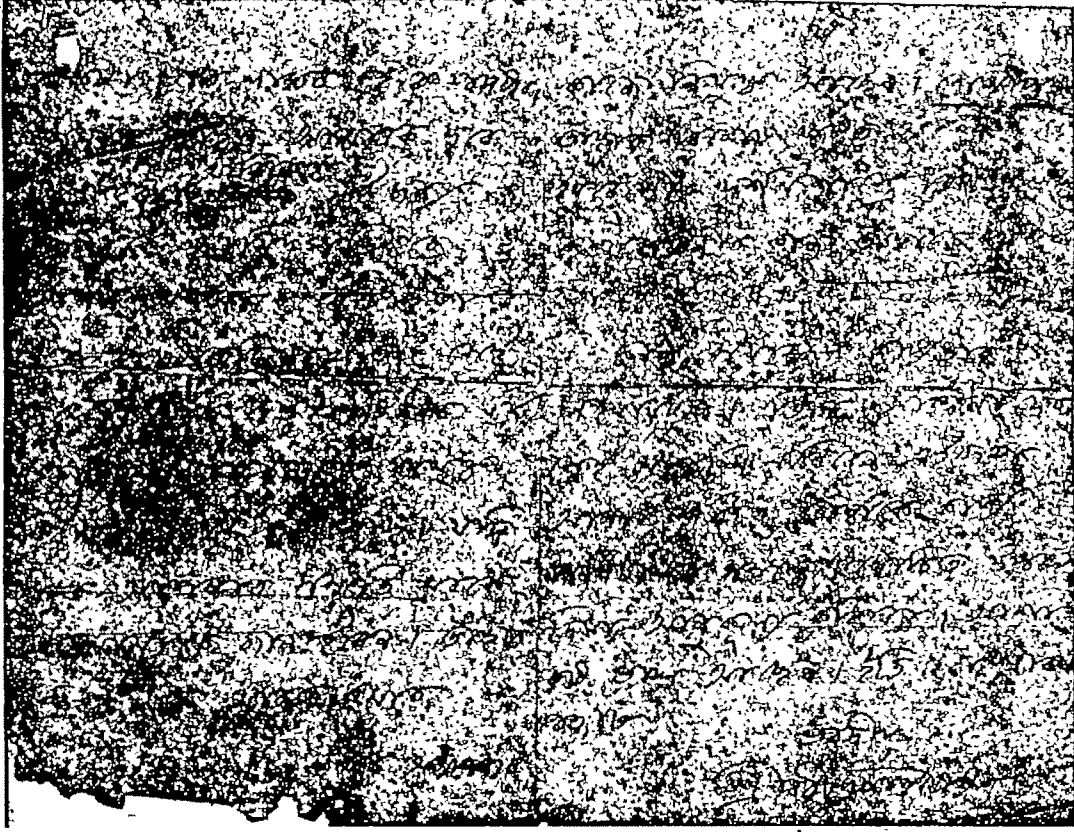
চিন্তামণি চ্যাটার্জীকে লিখিত শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র

ও

বোলপুর

বিনয় সম্ভাষণ পূর্বক নিবেদন—

তত্ত্ববোধিনী সম্পাদকতা আমার স্বন্ধে পড়িয়াছে। যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেই হইবে। কিন্তু একলা আমার কর্ম নহে। এই জন্য লেখা প্রভৃতি ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করিবার জন্য হাতের কাছে আমার এমন একজন



লোকের দরকার যাহাকে দিয়া আবশ্যিক মত ফরমাস দিয়া লেখাইয়া লইতে পারি। সম্পাদকের সহকারিতা করিবার জন্য একজন যোগ্য পাইয়াছি। ইহার দ্বারা আমার অনেকটা ভার লাঘব হইতে পারিবে। আপনার সহিত আমাকে দূরে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে হয় এই জন্য আপনাকে আমি পত্রিকার প্রয়োজন অনুসারে খাটাইয়া লইতে পারিতেছি না। তাই সেই ভদ্রলোকটিকে তত্ত্ববোধিনীর সহকারী সম্পাদকরূপে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিতেছি। যদি ইহাতে আপনার সম্মতি থাকে তবে আমাকে জানাইবেন। তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত অজিত কুমার... বি এ। এখানে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত আছেন। লেখাপড়ায় তাঁহার বিশেষ পটুত্ব আছে— ইয়ুরোপীয় দর্শনশাস্ত্রে তিনি অভিজ্ঞ। তত্ত্ববোধিনীর কাজ তাঁহাকে দিয়া ভালই চলিবে।

তিনি সমাজের কার্যভার লইয়াছেন। তিনি আপনাদের স্নেহ আকর্ষণ করিবেন এইরূপ আশা করি। তাঁহাকে কার্য পরিচালন সম্বন্ধে যথোচিত উপদেশ দিয়া আনুকূল্য করিবেন। আশা করি ভাল আছেন। ইতি ২রা শ্রাবণ ১৩১৮

ভবদীয়
শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিন্তামণি চ্যাটার্জীকে লিখিত শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র

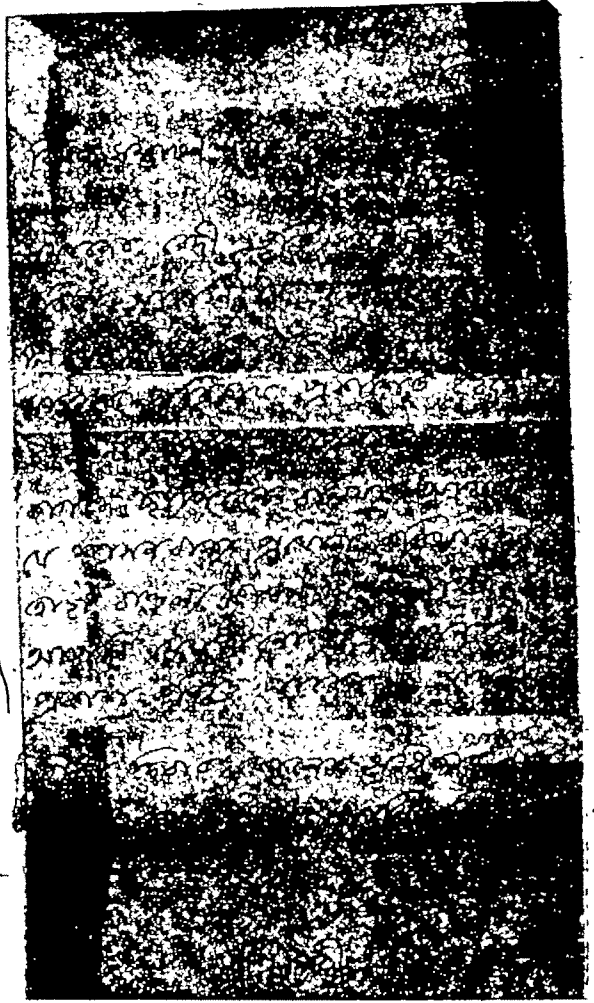
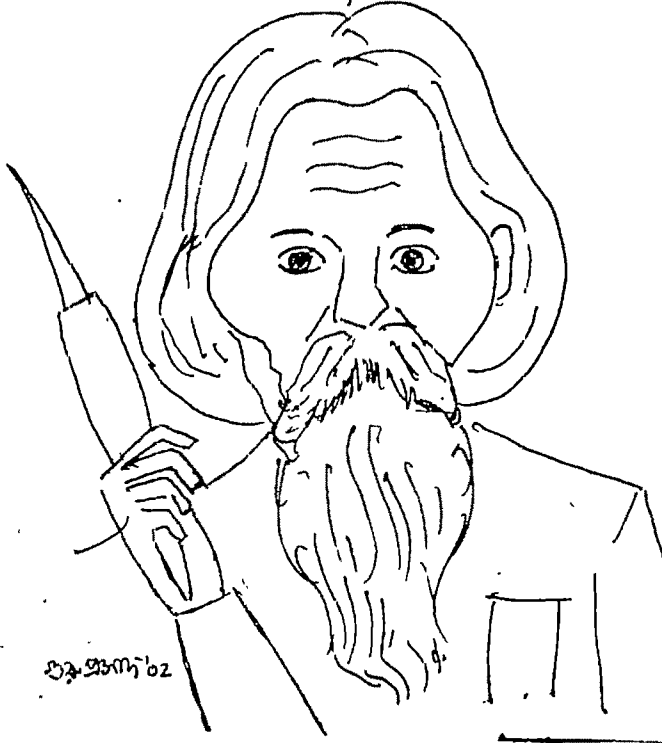
৩

শিলাইদা
নদীয়া

বিনয়-সম্ভাষণ পূর্বক নিবেদন

আদি ব্রাহ্মসমাজের বেদী প্রভৃতি সম্বন্ধে তর্ক উত্থাপন করিয়া আপনি যে পত্র আমাকে লিখিয়াছেন তাহার উত্তর

আমার হাত কেঁদে, ভ্রমতাই নেই!!!



আগামী মাসের পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। উত্তর না পাইলে আপনার পত্র অন্য কাগজে ছাপিবেন বলিয়া আমাকে যে শাসনবাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা বাহুল্য কারণ সংবাদপত্রে আপনি যে কোনো পত্র যখন ইচ্ছা প্রকাশ করিতে পারেন—আপনাকে বাধা দিবার কোনো অধিকার আমার নাই এবং সেরূপ ইচ্ছাও আমি করি না।

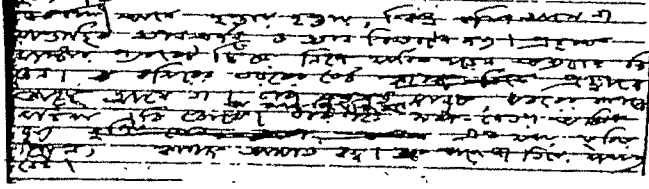
ইতি ১৫ই ফাল্গুন ১৩১৮

ভবদীয়
শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[এই দুর্লভ চিঠিপত্রগুলি অগ্রজ বঙ্ক শিল্পী ও বিশিষ্ট মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ দেবশিস ভট্টাচার্য প্রথম দেখেন তাঁর বালাবঙ্ক শ্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে। প্রণব মুখোপাধ্যায়ের মাতামহের পিতামহ ছিলেন স্বনামধন্য বেচারাম চট্টোপাধ্যায়। তাঁরই সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত চিত্তামণি চট্টোপাধ্যায়। প্রণব মুখোপাধ্যায়ের সমবয়সী মামা শ্রী অমরেশ চট্টোপাধ্যায়ও ছিলেন এই বঙ্কবংশে। তিনি এখন কানাডাবাসী। বিদেশ পাড়ি দেওয়ার আগে এই দুর্লভ বোঝা তিনি ডাঃ ভট্টাচার্যের কাছে অর্পণ করে যান। আমরা তার কিঞ্চিৎ তর্পণ করতে পেরে ধন্য বোধ করছি।]

মনোজ বসুর অপ্রকাশিত গল্প

ফকির কবিরাজ



ফকির কবিরাজ নামে একজন আসত প্রহ্লাদেব পাঠশালায়। লম্বা চওড়া হাটপুট কাশো কোলো চেহারা। হিতবাদী নামে সাপ্তাহিক খবরের কাগজ আসত ফকিরের নামে। মাঝে মধ্যে ভি-পি পার্শেল কলকাতার আসত। প্রহ্লাদগুরু একাধারে পাঠশালার পণ্ডিত গ্রাম্য ব্রাহ্ম পোস্টঅফিসের পোস্টমাস্টার এবং পিওন।

ডাক আসে বিকাল বেলা। ১২রবাব হল হিতবাদী আসার দিন। সে দিন ঠিক নয়, তার পরের দিন সকালে ফকির কবিরাজ দেখা দিত।

বেশ সৌম্য চেহারা। ও তল্লাটে তখন চণ্ডীপাড়ার মধ্যে অক্ষব পবিচয় কমই ছিল। যারা পড়তে পাবত রীতিমত ঋতিব-সন্ত্রম তাদের। ফকির বিদ্যোৎসাহী, যেহেতু পয়সা খবচ করে কাগজের মেদ্বাষ হয়েছে। কাগজখানা খুলে ঐ নতুন বাড়ি (পাঠশালা নতুন বাড়িতে) থেকেই সংবাদ ও জ্ঞান বিতরণ করতে করতে গড়ডাঙা মুখো (ফকিরের বাড়ি গড়ডাঙায়) চলে যায়। এছাড়া ফকির কবিরাজিও করে অল্পসল্প। বোগিপণ্ডব তাব কাছে যায়। এতসব সত্ত্বেও ফকিরকে সন্ত্রম করে না লোকে। কানাঘুষো বলাবলি করে ফকির অতি চোর।

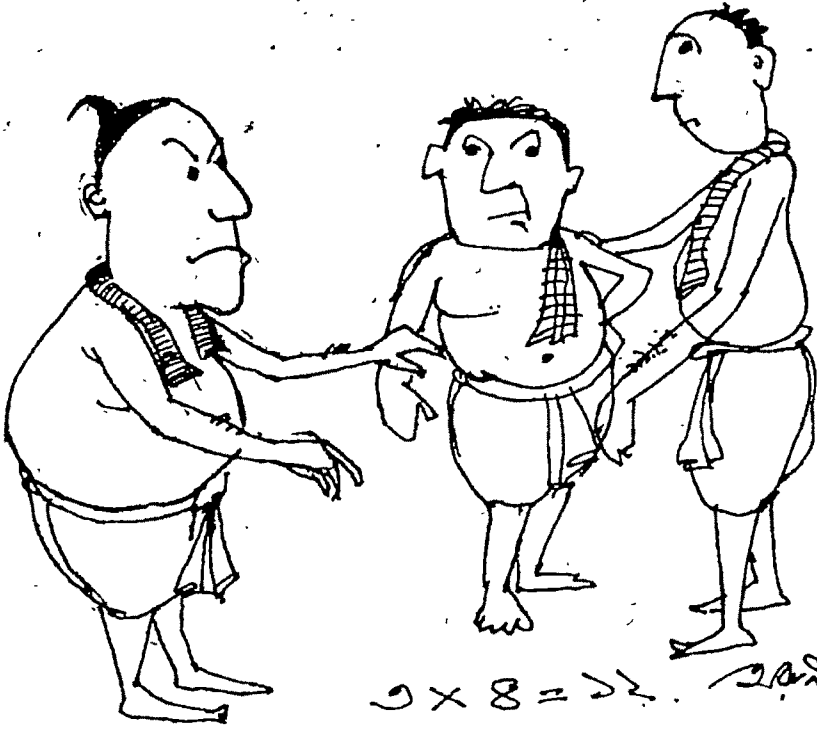
একবার নাকি ফাটকেও গিয়েছিল কম বয়সে। কিন্তু এখনকার সৌম্য চেহারা, চালচলন দেখে ও কথাবার্তা শুনে অনেকে বলে, একসময় পদস্থলন হয়েছিল। এখন সংসারধর্ম করছে, সে সব রোগ নিরাময় হয়ে গেছে এখন। মনিং ইস্কুল তখন পাথরঘাটার সর্দার পাড়ার গা ঘেঁষে। প্রকাশ আম কাঁঠাল বাগানের মধ্য দিয়ে পথ। শোনা গেল পাড়ার মধ্যে কাল রাত্রে হৈ হৈ কাণ্ড। কাল রাত্রে সিন্ধের মুখে চোর ধরেছে। আমরা ঢুকে পড়লাম পাড়ায় চোর দেখবার জন্য। কী সর্বনাশ, আমাদের বসির ফকির। আমরা সোনাখড়ির চারজনে দাঁড়িয়েছি, চেনে আমাদের খুব ভাল। তা ফ্যাল ফ্যাল করে অচেনার মতন তাকাচ্ছে, কথাবার্তা বলছে না। গরুর দড়ি দিয়ে হাত-পা কষে বাঁধা বয়েছে। থানা আড়াই ক্রোশ দূর, সেখানে খবর দিতে লোক রওনা হয়ে গেছে। সর্দার পাড়ায় বিস্তর লোক, ছটকো ছোঁড়ারা সব। ধবে গুঁতোন খুব হয়েছে, পা ফুলে ফুলে উঠেছে। বসির বলছে সে নির্দোষ। দিব্যি-দিশেনা করছে, একেবারে কিছু জানে না। সে। কুশখালি কুটুমবাড়ি থেকে ফিরছিল বিলের মধ্যে দিয়ে। হঠাৎ বাতাসে উড়িয়ে এনে ফেলেছে এখানে। বৃদ্ধ এক-আধটি কিন্তু এ হেন কৈফিয়তে প্রত্যয় পাচ্ছেন। ছোঁড়াদের বলছেন, হয় গো এমন। রাত দুপুরে বিলে খালে ওনাদের বিচরণ, কখন কি খেয়াল ওঠে বলা যায় না। আমাদের কালে এমন তো আখছার শুনতাম। অবিশ্বাসী ছোঁড়াবা বলে, বাতাসে উড়িয়ে না হয় আনল। এনে ফেলল ঠিক একেবারে সিন্ধের মুখে? আর সিঁধকাটিটাও কোনখান থেকে এনে হাতে গুঁজে দিল? বুড়োবা চূপ হয়ে যান। বেদম পিটেছে ইতিমধ্যে, রাত দুপুরে সেই চোর ধরা ইস্তক। চলছে। সৌম্যদর্শন মধুরভাষী বসিরের এই অবস্থা সব অবাক হয়ে দেখছে।

শোনা গেল এক বছরের জেল হয়েছে বসিরের।

কাগজ আসে হপ্তায় হপ্তায়। কিন্তু বসির আসে না সাপ্তাহিক জ্ঞান অর্জন ও জ্ঞান বিতরণের জন্য। প্রহ্লাদ মাস্টার প্যাকেট ছিঁড়ে নিজে খানিক পড়েন। অন্যদেব দিয়ে দেন। বসিরের তবফের কেউ প্রহ্লাদের কাছে আসে না। তাবা মুখ্যস্থ্য মানুষ। খবরের কাগজের মহিমা কি বোঝে। কাগজ নিয়ে কি করবে। তার পরে জমা দেওয়া অগ্রিম মূল্য একসময় ফুরিয়ে গেল, কাগজ আসাও বন্ধ। কারো তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই।

কয়েদ খেটে বছর অস্ত্রে বসির গ্রামে এল। যেন শ্বশুরবাড়ি নেমস্তম্ব খেতে গিয়েছিল, এমনিথারা ভাব। আবার খলনুড়ি নিয়ে সে কবিরাজি ধরল। না খেয়ে না দেয়ে বেলা দুপুর। আবার টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে কলকাতায় হিতবাদীর আপিসে। এবং মুখে সেই সাধু-সাধু কাব্য। মানুষ হয়ে যারা মানুষের খবর রাখে না সে তো চোখ থাকতে অন্ধ হয়ে থাক। থাকার শামিল।

পুরনো কাসুন্দি



দুর্গোৎসব

জ্ঞানাস্থেয়ণ। ১৩ অক্টোবর ১৮৩২।

২৯ আশ্বিন ১২৩৯।

অবশ্য পাঠক বর্গের স্মরণে থাকিবে অনেকস্থলে যেমন এবৎসর মুসলমানেরা মহরম উঠাইয়াছেন তদ্রূপ হিন্দুদের প্রধান কর্ম যে দুর্গোৎসব তাহাও এবৎসরে অনেক ন্যূনতা শুনা যাইতেছে পূর্বে এতন্নগরে ও অন্যান্য স্থানে দুর্গোৎসবে নৃত্যগীত প্রভৃতি নানারূপ সুখজনক ব্যাপাব হইয়াছে বহিনাচ ও ভাঁড়ের নাচ দেখিবার নিমিত্তে অনেক ইঙ্গরেজ পর্যন্ত নিমন্ত্রণ করিয়া এমন জনতা করিতেন যে অন্যান্য লোকেরা সেই

সকল বাড়ী প্রবিষ্ট হইতে কঠিন জ্ঞান করিতেন এবৎসবে সেই সকল বাড়ীতে ইতর লোকের স্ত্রীলোকেরাও স্বচ্ছন্দে প্রতিমার সম্মুখে দণ্ডায়মানা হইয়া দেখিতে পায় এবং বাইজীরা গলী গলী বেড়াইয়াছেন তত্রাপি কেহ জিজ্ঞাসা করেন নাই অনেকে এ বৎসর পূজাই করেন নাই এবং যাদের বাড়ীতে পাঁচ সাত তরফা বাই থাকিত এবৎসর কোন বাড়ীতে বৈঠকি গানের তালাই মান রহিয়াছে কোন ২ স্থলে চণ্ডীর গান ও যাত্রার দ্বারাই রাত্রি কাটাইয়াছেন দুর্গোৎসবে প্রায় বাড়ীতে এমত আমোদ নাই যে লোকেরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতে পাবে এবং যাঁহারা আল করিয়া কাল বিনাশ করিতেন তাঁহারাও প্রায় এতদ্বর্ষে বাতীর স্বাস্থ্য কবিয়াছেন অতএব দুর্গোৎসবে যে আমোদ

প্রমোদ পূর্বে ছিল এবৎসরে তাঁহার অনেক হ্রাস হইয়াছে ইহাতে অনেকে কহেন যে এতদেশীয় লোকের ধন শ্রুণ্য হওয়াতেই এরূপ ঘটিয়াছে ইহা ইহাতেও পারে কেননা ধন থাকিলে যেমন মনের স্মৃতি থাকে ও আমোদ প্রমোদ করিতে বাঞ্ছা হয় দরিদ্র হইলে তাহার কিছুমাত্র থাকে না সর্বদা পরিবাবের ও আপানার ভরণ-পোষণ এবং অন্ন বস্ত্রাদির ভাবনাতেই উদ্বিগ্ন থাকিতে হয় ধন যে কেমন বস্তু আর তাহা না থাকিলে কিরূপ যাতনা পাইতে হয় তাহা এতদেশীয় প্রায় ভাগ্যবন্ত সন্তানেরা পূর্বে বিবেচনা করেন নাই বৃথা কর্মে অনেক ধনের ব্যাঘাত করিয়াছেন যে সকল বাবুরা বাইজীর বাড়ীতেই হাঁড়ী কাড়িয়াছিলেন এবং নানাপ্রকারে রসনেন্দ্রিয় প্রভৃতির সুখ দিয়াছেন এইক্ষণে স্ব ভবনে তাঁহাবদিগের শাকসব্জি পরিতোষ জন্মিতেছে ধনাভাব এইরূপ শোকসাগরে পতিত হওয়াতে কেহ এরূপ কহেন যে বর্তমান রাজ্যাধিকারি মহাশয়দিগের শাসনে বিস্তর ধন ব্যয় হইতেছে এ কারণে লোকের তাদৃক চাকচিক্য নাই ইহা সত্য বটে শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের শাসনে ধন ব্যয় বিস্তর হইতেছে কিন্তু আমরা সাহসপূর্বক ইহা কহিতে পারি যে জ্বনাধিকারাপেক্ষা এইক্ষণে প্রস্তর অন্যান্য হইতে মুক্ত হইয়াছেন যদিও কোম্পানি বাহাদুর টাকস ইষ্টাম্প পরমিট ইত্যাদির দ্বারা ধন লইতেছেন বটে কিন্তু প্রজাদের হিতার্থে চেষ্টাও বিস্তর করিতেছেন দেখ জ্বনাধিকারে লোকের গমনাগমনের পথ এমত কদর্য ছিল যে লোকেরা তাহাতে বিস্তর ভয় পাইত এবং দস্যুকর্তৃক হত হইত কোন পথে পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইলেও জল মিলিত না এবং নানা রোগে দরিদ্র লোকের মহাক্লেশ ভোগ হইত। এইক্ষণে বর্তমানাধিকারিরা প্রজার নিকটে টাকা লইয়া দুর্গমা পথসকল সুগম্য করিয়াছেন এবং স্থানে ২ জলাশয় করাতে লোকেরা জলপান কবিয়া সন্তুষ্ট হন বিশেষতঃ চিকিৎসার বিষয়ে এমত সুধারা করিয়াছেন যে দরিদ্র লোকের চিকিৎসাতে কপর্দক মাত্রও লাগে না

এবং বিদ্যার বিষয়ে এমত সুগম করিয়াছেন যে এতদেশীয়েরা যে সকল বিদ্যার শব্দমাত্র বুঝিতে পারিতেন না তাঁহারা এইক্ষণে ঐ সকল শাস্ত্রের প্রসাদে বিস্তর ধনোপার্জন করিতেছেন অথএব রাজ্যখিপতিরা যে ধন লন তাহার সমুদায়ই বৃথায় যায় ইহা কি প্রকারে কহা যায়।

বারয়ারী

সোমপ্রকাশ ২৯ আষাঢ় ১২৯৩।

৩৫ সংখ্যা

আমাদের কোন সহযোগী বারয়ারীর বড় পক্ষপাতী হইয়াছেন। তাঁহার মতে বারয়ারী অনেক লোকের আমোদের আত্মাদের স্থান এরূপ “জাতীয় আমোদ একতার আমোদ” উঠিয়া দেওয়া তাঁহার মতে বুদ্ধিমানের কার্য নয়।

আমাদের আত্মা যে মনুষ্য জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় একথা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন কিন্তু সেই আমোদ দূষিত হইলেই প্রয়োজনটা কিছু সামান্য হইয়া পড়ে। যদি গ্রামের ভিতর একটা গুড়ির দোকান ব্যতীত আমোদ আত্মাদের আর স্থান না থাকে, তবে কি সেখানকার আমোদপ্রমোদ জীবনের কোন অভাবপূরণ করে? আজকালকার বারয়ারীতে বিশুদ্ধ আমোদ লাভ করা যায় না। প্রায়ই মদ বেশ্যা ইত্যাদি লইয়া বারয়ারীর পাণ্ডাদিগের আমোদপ্রমোদ হয়। ইহাতে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে পাপেরই বিলম্ব প্রশ্রয় পাইয়া থাকে। বারয়ারীতে স্থানে স্থানে দাস্তা হাঙ্গামা নিবারণ করিবার জন্য পুলিশের সাহায্য আবশ্যক করে। কোথাও বা হত্যাকাণ্ড হইতেও দেখা গিয়াছে। বারয়ারীর পাণ্ডারা প্রায়ই নিষ্কর্মা। দেশের ভিতর তাহারা কেবল পরনিন্দা পরম্প্রাণি করিয়া দিনাতিপাত করে। যাহাদের কোন সঙ্গতি নাই, এমন কোন সামর্থ্য নাই, যাহাতে স্বীয় ভরণপোষণের উপায় করিতে পারে, চৌর্যবৃত্তি যাহাদের অভ্যাস, দেশে গ্রামে প্রায়ই যাহাদের অত্যাচারের কথা শুনিতে পাওয়া যায় এই প্রকার বারয়ারীর গন্ধ পাইয়া নাচিয়া উঠে, পাণ্ডা সাজিয়া চাঁদা আদায়ের জন্য গ্রামের লোকের উপর উৎপীড়ন করে, কাহারও চাঁদা দিবার সামর্থ্য না থাকিলে ঘরের ঘটি-বাটি ঝাড়ের বঁশ কাড়িয়া লইয়া যায়। যে যে গ্রামে এই প্রকার লোকই বারয়ারীর পাণ্ডারা বাস করে সেখানে বিবাহ

দিতে যাওয়া ভদ্রলোকের পক্ষে বড় বিপদের কথা। বরকন্যা বিদায় কালীন বর পক্ষীয় ও কন্যাপক্ষীয় আত্মীয়দিগের ভিতর অপ্রণয় জন্মাইবার প্রধান কারণ এই সকল বারয়ারীর পাণ্ডা। ইহারা অভদ্রোচিত গালাগালি দিয়া বরযাত্রের নিন্দা করাকে বড় পুরুষ মনে করে, তাই বরযাত্রীরা যতই কেন বরযাত্রীর জন্য টাকা দিন না, পাণ্ডাদের নিন্দা কুৎসা অপমানসূচক বাক্য, এমন কি কুৎসিত ভাষায় গালি পর্যন্তও না খাইয়া ফিরিতে পারেন না। এই সকল ব্যক্তি যখন বারয়ারীর পাণ্ডা তখন যে তাহাদের কার্যে বিশুদ্ধ আমোদ পাওয়া যাইবে তাহা কখনও সম্ভব নহে।

সহযোগী কেবল কলিকাতা ও সহর অঞ্চলে বারয়ারীর চাঁদা আদায়ের প্রথার কথা উল্লেখ করিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। একবার তিনি যদি পল্লীগ্রামের চাঁদা আদায়ের দিকে দৃষ্টিপাত করেন তাহা হইলে আদায় প্রথার ততদূর সুখ্যাতি করিতে তাঁহার আর প্রবৃত্তি হইতে হইবে না। সহরের ভিতর দোকানদারেরা খদ্দেরের কাছে বৃত্তি (বিস্তি) আদায় করে। ইহাতে কাহাকেও বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় না। কিন্তু পল্লীগ্রামে দোকানদারেরা তেমন বিরূপ বিস্তি আদায় করে না। সেখানে কেবল কতকগুলি মাদকসেবী রক্তস্রাব নিকর্মা ব্যক্তি ঘরে ঘরে রাজস্ব আদায়ের মত বারয়ারীর চাঁদা আদায়ে বহির্গত হয়। কেহ চাঁদা দিতে অপারক বা অস্বীকৃত হইলে পাণ্ডাদের হস্তে তাঁহাদের আর নিস্তার থাকে না। গাল মন্দ প্রহার, এমনকি ডাকাইতি করিয়া সময়ে সময়ে বারয়ারীর পয়সা আদায় হয়। বার্ষিক বারয়ারীর সময় হইলে লোকের মনে আমোদ দূরে গিয়া ভয়ের সঞ্চার হয়।

বারয়ারী নিষেধ ও অপরিণামদর্শী ব্যক্তিদিগের উৎসর্গ যাইবার হেতু। পল্লীগ্রামে জোর জবরদস্ত করিয়াও আশানুরূপ চাঁদা উঠে না, প্রায়ই একটী যাত্রার খরচ যোগাইবার সংস্থান হওয়া কোন কোন স্থানে ভার হইয়া ওঠে, কিন্তু বারয়ারীর আদায়ের অগ্রে খরচের ব্যবস্থা। টাকা সংগ্রহ না করিয়া বারয়ারীতে যাত্রার বায়না হয়। শেষে সেই টাকার অধিকাংশ সংগ্রহ করিতে না পারিয়া যাত্রাওয়ালা বিদায়ের সময় পাণ্ডাদের মোড়লকে ঘরের টাকা বাহির করিয়া দিতে হয়। আমরা কোন দরিদ্র মোড়লকে স্ত্রী ও পুত্রবধূর গহনা বন্ধক দিয়া যাত্রাওয়ালা বিদায় করিতে দেখিয়াছি।

বারয়ারী বালকগণের মাথা খাইবার সহজ উপায়। বারয়ারীর দুই চারি দিন পূর্বে হইতে পল্লীগ্রামের বালকেরা পড়াশুনা স্থল পাঠশালা ছাড়িয়া পাণ্ডাদের সঙ্গী হয়, তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে গৃহস্থের ঘরে ঘরে চাঁদা আদায়ের জন্য বাহির হয়। পাণ্ডাদের কুৎসিত বিদ্রূপ কদর্য গীত, পাষণ্ডের ন্যায় ব্যবহার এই চারি পাঁচদিন কি সপ্তাহ কালের মধ্যে তাহারা বেশ অনুকরণ করিতে শিখে। ধর্মের বৃষের ন্যায় বারয়ারীর সময়ে তাহাদের কেহ কোন কথা বলিতে সাহস পায় না। সুতরাং অনুকরণ স্বভাব বালকের কোমল মনে একটা কালির দাগ পড়ে। সহস্র চেষ্টায় প্রায় তাহার অপনোদন হইতে দেখা যায় না। বারয়ারীর উদ্যোগের পর, উৎসবের দিন এই সকল পাণ্ডাদের মাদক সেবন, দাস্তা হাঙ্গামা, গালাগালি বীভৎস কৌতুক এ সকলও বালকদিগের বেশ অনুকরণের সামগ্রী, বারয়ারীতে বালকেরা হলহল পান করে আর তাহাদের চরিত্রের মাথা খায়।

এই সকল কথাই আমরা পল্লীগ্রামের বারয়ারী সম্বন্ধে বলিলাম। সহরের বারয়ারীতে লোকের উপর উৎপীড়ন হয় না বটে কিন্তু সেখানেও পাপের স্রোত বন্ধ নাই। মদ ও বেশ্যার কাণ্ডটা সহরেই কিছু বাড়াবাড়ী। যে আমাদের সঙ্গে মদ ও গণিকার সংস্রব রহিল তাহাকে আমরা আমোদের মধ্যে গণ্য করি না। এই বারয়ারী ছাড়া বাল্যী হিন্দুর আমোদের কার্য অনেক আছে। যার ঘরে বারমাসে তের পার্বণ তাহার আবার আমোদের অভাব কি? যদি জাতীয় আমোদ ও একতার আমোদের কথা বলেন হিন্দুর দশবিধ সংস্কার কার্যে তাহার যতটুকু উপভোগ হয় বারয়ারীতে কখনই ততটুকু হয় না। জন্ম, আদ্যশ্রাদ্ধ, বিবাহ এই তিনটি সংস্কারে হিন্দুর আত্মীয়-স্বজন জ্ঞাতি বান্ধব স্বদেশী বিদেশী নানা বর্গের শ্রেণীর লোক গৃহস্থের গৃহে সমবেত হয়, জন্ম ও বিবাহাদি আনন্দের কার্যে, কখনও কখনও বৃদ্ধগণের শ্রাদ্ধ কার্যে নাচ তামাসা আমোদ আত্মাদের অভাব হয় না। বিশেষতঃ একত্রে বসিয়া ভোজন, আলাপ, পরিচয় তর্ক-বিতর্ক ইত্যাদি দ্বারা জাতীয়তার যত বৃদ্ধি পায় বারয়ারীতে কখনও ততদূর হইতে পারে না। এত বিশুদ্ধ জাতীয় আমোদ ও জাতীয় একতার সময় ও উপকরণ থাকিতে দূষিত বারয়ারী আমোদের প্রশ্রয় দিবার আমরা কোনও আবশ্যকতা দেখি না।

মদন-মোনালিসা

স্বপ্নময় চক্রবর্তী



মোনালিসা মিত্রের দোকানের নাম 'লিসা'স বুটিক'। দোকান বললে আবার মোনালিসা রাগ করে, বুটিক বলতে হয়। যেমন বড় বড় হোটেলের কোল বললে রাগ করে, গ্রেভি বলতে হয়, দালালরা আজকাল দালাল বললে রাগ করেন, এজেন্ট বলতে হয়। মোনালিসা মূলত পাঞ্জাবি-বিশারদ, নানা ধরনের সৃষ্টি করেন। তাঁর কম্পিউটার মদন মণ্ডল। ওঁর ডিজিটিং কার্ডে নামটা এভাবে

লেখা—MADAN MANDAL. নামের প্রথম অংশ একটু ছোট্টে ওর বুটিকের নাম দেয়া হয়েছে MAD'S HOUSE. কী দারুণ নাম। রঞ্জন ব্যানার্জি অবশ্য এই নামের মধ্যেও যৌনতার বিভা দেখতে পাবেন। ওঁর মহিলা খদ্দেরই বেশি। খদ্দের বললে মদন রাগ করবেন, ক্রাসেন্ট বলতে হয়, কাস্টমার নয়। মদনের মাথায় খুব সামান্যই চুল। চাঁদি চক্চক করে। যৌনতার বিভা। মুখে দাড়ি, বঁটেখাটো, বেশ ভালোই

তুঁড়ি, হাফ প্যান্ট আর টি শার্ট পরে থাকেন। খুব সিগারেট খান। মেয়েরা ওঁর নাম আর একটু ছোট্টে আদর করে ডাকে MAD MAN.

MADAN MANDAL স্ত্রী অঙ্গবাসের বিশারদ হলেও পাঞ্জাবি নির্মাণেও বেশ নাম করেছেন। লক্ষ্য করুন, পাঞ্জাবির নির্মাণ নিয়েই কিন্তু প্রতিযোগিতা। পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, এত কিছু থাকতে পাঞ্জাবি কেন? আরে, সভ্য বাঙালির পাঞ্জাবিয়ানাটা খেয়াল করছেন না? নব্য বাঙালিকে পাঞ্জাবিতে পেয়েছে যে।

ফি পুজোয় দেখবেন ফ্যাশানের একটা সংক্রমণ হয় একবার লুসিহিটস্ হয়েছিল, মনে আছে? লুসির সংক্রমণ। মেয়েরা সব লুসি পরে ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছিল? মনে পড়ছে, একটা সিনেমা এসেছিল, ববি। ঋষি কাপুর আর ডিম্পল কাপাদিয়া ছিল। তারপরই ববি শাড়ি, ববি ফ্রক, ববি স্কার্ট...

বুটি বুটি কিছু হলেই ববি। যদিও তখন এত বুটিক ছিল না। আমার সেবার বসন্ত হয়েছিল। চিকেন পস্স। আমার বোন তখন ছোট। বলেছিল, দাদার 'ববি' হয়েছে।

ডিস্কো মনে আছে? ডিস্কো ড্যান্সার? তারপর ডিস্কো পোশাকে বাজার মাত। কহো না প্যার হায় শাড়ি মাত করেছিল বছর তিনেক আগে। এইসব সিনেমা-মার্কা পোশাক ছাড়াও এক এক বছর এক এক পোশাকের প্রাদুর্ভাব হয়। লুসির কথা তো বলেছি। এ ছাড়া কোনোবার হয় মিনিস্কার্ট পুজো, কোনোবার জিন্স পুজো, ...পুজো। পুজোর পরও ওই ফ্যাশন কিছুদিন থেকে যায়। কিন্তু গত তিন-চার বছর ধরে ঝা তারও বেশি হতে পারে, পাঞ্জাবিটা কিন্তু শো টিকে আছে। ছেলেরাও পরছে, মেয়েরাও পরছে, ভালো পরীক্ষা নিরীক্ষা হচ্ছে পাঞ্জাবি নিয়ে। ঝুল লম্বা হতে হতে গোড়ালির কাছাকাছি চলে যাচ্ছে। মোনালিসা সাড়ে সাত গজি তালিবানি পাঞ্জাবি বানায়ে, তো মদন মণ্ডল এক গজ বাড়িয়ে দিল। নাম দিল—সামার ইঞ্জি। ফটুয়াটাই।

মেয়েরা বেশ পছন্দ করল। মোনালিসা আটটা পকেটওলা পাঞ্জাবি বানালো তো মদন পকেটহীন। মদন পাঞ্জাবিতে কবিতা লেখানোর জন্য কবি ফিট করল, তো মোনালিসা মোটর গ্যাবেজে গিয়ে লবির পিছনে যারা বাণী লেখে, তাদের ফিট করল।

পাঞ্জাবির গায়ে নানারকম বাণী শ্বেত থাকে আঙ্গকাল, দেখেছেন নিশ্চয়ই। যেমন লরির পিছনে থাকে, বাসের পিছনেও থাকে। যথা, সুখ স্বপনে, শান্তি শ্বশানে। দ্যাখ কেমন লাগে। দেখবি আর জুলবি, জুটিব মতো ফুলবি। দেখলে হবে, খরচা আছে। যদ্বত বাড়িতে, ব্যাবসা গাড়িতে। জন্ম থেকে ঘুরছি। এরকম কত। পাঞ্জাবিতেও এরকম থাকে। আগে কবিতাব লাইন থাকত। একটি পাঞ্জাবিতে দেখেছিলাম লেখা আছে এত দিন কোথায় ছিলেন? আব একটি পাঞ্জাবিতে ছিল। ভয় পেয়ো না, ভয় পেয়ো না তোমায় আমি মারব না। পরে জেনেছিলাম, উনি একজন লাইফ-ইনসিওরেন্সের এজেন্ট। আর একজনকে দেখেছিলাম, উনি পাঞ্জাবিতে ওঁর আইডেনটিটি ঘোষণা কবেছেন—আমি একজন মানুষ। কে জানে কেউ সম্ভেদ করেছিল কিনা। আর একটি পাঞ্জাবিতে ছিল, বাংলার মুখ আমি দেখিযাছি তাই যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী। যাব পাঞ্জাবি তার তাতে কোনো ফ্লোড আছে বলে মনে হচ্ছিল না। কিন্তু ভিতরে ভিতরে যে ঘটনাটা ঘটে গিয়েছিল তা হল—একটা ডিজাইন খাতায় পাতায় পাতায় এইসব বাণী লেখা ছিল। শিল্পী যে পাতাটা আঁকছিলেন, সেটা হাওয়ায় উড়িয়ে নেয় অজান্তে, একটা লাইন লেখা হয়ে গিয়েছিল। পবেব লাইনটা পবের পাতায়।

পাঞ্জাবেব গণ্ডগোলটা বন্ধ হয়েছে, কিন্তু সেটা পাঞ্জাবিতে চলে এসেছে। গত কয়েক বছবে একটি বড় ধবনের পাঞ্জাবি-বিপ্লব ঘটে গেল। পাঞ্জাবির গলায় নানা ধবনের সস্ত্রাসবাদী কাটিং দেখতে পাবেন। গলাবন্ধ, হাফ গলা বন্ধ, কলারে বোতাম, বোতামের বদলে দড়ি, সাইডে দড়ি, বোতামের বদলে ছক, ফলস বোতাম, বোতামের পাশে এমব্রয়ডারি, এবকম কত কাযদা। পাঞ্জাবি গুলির বুক পকেট থাকেনা। পাশে পকেট থাকলেও তাব কাটিং এমনই যে সহজেই খালি করে দেওয়া যায়।

মোনালিসা যখন আটটা পকেটওলা পাঞ্জাবি বানালো, তখন শ্লোগান দিল—আমাদের সঙ্গে পকেটমাবদেব কোনো আপোষ নেই। ইন্সিটো মদনের দিকে। যেন মদনের সঙ্গে পকেটমাবদেব গোপন আঁতাত আছে। আসলে তখন মদন বুকপকেটহীন পাঞ্জাবি ডিজাইন কবেছিল। ভিতরে চোরা পকেটও রেখেছিল। মোনালিসা যখন তালিবানি পাঞ্জাবি বানালো অনেক কাপড়ের, আর গোড়ালি পর্যন্ত ঝুল কবে মদন তখন হ্যাণ্ডবিল ছড়াল—আসল তালিবান পাঞ্জাবি ম্যাডুস হাউসেই পাওয়া যায়। পাঞ্জাবির গায়ে অন্য কাপড়ের টুকরো সেলাই করে তালি লাগিয়েছিল।

বাঙালিবা কিন্তু পাঞ্জাবি পরতই না। বামমোহন-বন্ধিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের কোনো পাঞ্জাবি-পবা ছবি দেখেছেন? ওঁরা সেই লম্বা লম্বা বেনিয়ান, কুর্ড এইসব পরতেন। তারও আগে শুধুই চাদর।

ধুতির সঙ্গে পাঞ্জাবি নয়, গত শতাব্দীর শুরু থেকে খ্রি কোয়ার্টার, মানে ১৯৭০/৭৫ পর্যন্ত শার্টই ছিল মধ্যবিস্তৃত বাঙালিবা আটপোরে পোশাক। হেমন্ত মুখার্জিকে মনে আছে তো? পুবনো সিনেমা দেখুন। উত্তমকুমার সহ অনেককেই ওই পোশাকে দেখবেন। এখনো দ্বিজন মুখার্জি ওই পোশাকই পরেন। পাঞ্জাবিব মন্ত্রীভাণ্ডা ভালো। সিদ্ধার্থকর রায় ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের সব মুখ্যমন্ত্রীবাই পাঞ্জাবি পোশাক। ষাটের দশকে ধুতিব

পবিবর্তে অনেকে পাঞ্জামা ধরলেন। খন্দবের পাঞ্জাবি আগে কংগ্রেসদেবই একচেটিয়া ছিল। এবাব সেটা কম্যুনিষ্টদের গায়ে চাপল। নোংরা পাঞ্জামা আর রঙিন খন্দবের পাঞ্জাবি হয়ে গেল কম্যুনিষ্টদের যুনিফর্ম। সাফারি সুট পরা মাথায় টুপি চাপানো কম্যুনিষ্ট তখন অকল্পনীয় ছিল। কংগ্রেস আব কম্যুনিষ্টদের পাঞ্জাবি বোঝা যেত পাঞ্জাবির বং-এ। 'গোঁপের আমি গোঁপেব তুমি গোঁপ দিয়ে যায় চেনা'র মতো পাঞ্জাবি দিয়ে অনেককিছু চেনা যেত। এই মদন বা মোনালিসারও হ্যাণ্ডবিলে জানিছেন—প্রফেশন অনুযায়ী পাঞ্জাবির ডিজাইন করা হয়।

সেটা-কিবকম? ধরুন, সরোদ বা সেতার বাজিয়ে। তার পাঞ্জাবি হবে বড়িন সিক্কের। ছাপা-ছাপাও হতে পারে। 'এক রঙা হলে ব্যাপক কার্যকর থাকবে। যদি বুল লম্বা, কলার উচু, রং সাদা' তবে সেটা বাজনেতিক পাঞ্জাবি। কিন্তু বামপন্থী পাঞ্জাবি নয়। বামপন্থী পাঞ্জাবির কলার থাকে না। হাফহাতা হলে ন্যাশানাল হিউম্যানিস্ট পাঞ্জাবি। ম্যানেজমেন্ট পাঞ্জাবিব ডিজাইন আলাদা, বেশি লেখাটেখা থাকবে না। তবে কাজ বেশি থাকবে। মানে, কথা কম কাজ বেশি। অধ্যাপক পাঞ্জাবি এক রঙা, পকেটটা বড় সড় গলায় কাজ থাকলেও থাকতে পারে। নব্য লেখক বা কবি বা আবৃত্তিকাবদেব পাঞ্জাবিতে কবিতার লাইন থাকতেই পারে। তবে আঙ্গকাল সংস্কৃতি মনস্ক প্রমোটার বা কন্ট্রোল্লর কিম্বা কাব্য-অনুরাগী লৌহ ব্যবসায়ী বা টিভি সিরিয়াল প্রযোজকবাও 'ছবি ওলেখা' পাঞ্জাবি পবেন। ওঁদেব জন্যে চক্কর বক্কর একটু বেশি কবে দিতে হয়। আবাব জনপ্রিয় চলচ্চিত্র নায়কদের জন্য একটু এক্সপ্লুসিভ ভাবতেই হয়। সব গেছে বাঙালির, তবে চৌধা ঢেকুব আর অম্বলের মত কাযদাটা টিকিয়ে বেখেছে। All কাযদা। বাঙালিত্ব হারানো বাঙালি, যে মুখের ভাষা হারাতে বসেছে, নিজেদের খাওয়া-দাওয়া ভুলতে বসেছে, হঠাৎ হঠাৎ বাঙালীত্ব জেগে ওঠে। আমাদের কোনো মুম্বাই মাতানো সিনেমা স্টার মাঝেমধ্যে ময়ূর পুচ্ছ ধুতি পরে প্রবল বাঙালি হয়ে যান। গলায় অবিশ্যি সোনার চেনও থাকে। ঐ ফিশাস্টাবের প্রভাব কিনা জানি না। আঙ্গকাল বিয়ে বাড়িতে, হালখাতায়, কিছু কিছু বাঙালিকে দেখা যায় কোরা ধুতি, কাজকবা পাঞ্জাবি আব গলায় সোনার চেন ঝুলিয়ে 'ওকে, থ্যাংকিউ, সি ইউ,' সর্বস্ব বাংলায় কথা বলাছেন। গত বছর আমাদের পাড়াব পুজো প্যাডেলে একটি বিশাব হেলেকে দেখেছিলাম, যাব আমেবিকাতেই জন্ম, বাবাব সঙ্গে বাবাব দেশে এসে বাবার পোশাক পবেছে। ধুতি পাঞ্জাবি পবানো হয়েছ ওকে। পাঞ্জাবিব গায়ে বাংলা অক্ষব। জিজ্ঞাসা করেছিলাম বাংলায় কী লেখা আছে জানেনা? ছেলোট বলেছিল ওঃ শিওব। ব্যাংলাব মুক আমি ডেকিআচি।

মূল জায়গাটা থেকে অনেকটা দুবে সরে এসেছি। শুরু করেছিলাম মোনালিসা আর মদনকে নিয়ে। ওদের দোকানে এখনো নিয়ে 'বাযনি। দোকান তো নয়, বুটিক। আর সেখানে পোশাক টোশাক তৈরি হয়, সেটাকে কারখানা বললে ওঁরা রাগ করবেন। ওটা স্টুডিও। মদনের ম্যাডু হাউসে একজন কবি আছেন, পাটিটাইমার। উনি একসক্সিসিভ কিছু দেন। স্পেশাল পাঞ্জাবিব স্পেশাল বাণী। যেমন—

মদ খেয়ে মাতাল তো হয় সবাই

কবি শুধু নিজের জোবেই মাতাল

(কবিতা উৎসব স্পেশাল)

কিম্বা সকাল থেকেই আমাব ইচ্ছে

তোমায় ছোঁবাব সাহস দিচ্ছে

(এটা ভ্যালেন্টাইন ডে স্পেশাল)

কিন্তু : খেতে পারি কিন্তু কেন খাব?

(ডায়বিটিস ও কোলেস্টেরলে আক্রান্ত ব্যক্তির নেমস্তম্ভ খাবার স্পেশাল পাঞ্জাবি)

কিন্তু : আমার কাছে এইবেলা খাও

ওইবেলা খাও ওর কাছে

পোকায় আমার কটল পাতা

ফুল ফোটাতে ওর কাছে

(প্রাক্তন প্রেমিকার বিয়েয় নেমস্তম্ভ খাবার স্পেশাল পাঞ্জাবি)

কিন্তু : একটা গরম কড়াইয়ের উপর নেচে গোলাম এতকাল

(বিবাহ বাধিকী স্পেশাল)

এরকম আরো কত। আবার, একজন শিল্পীও আছেন। তিনি কত ছবি আঁকেন।

পাঞ্জাবি তো নয়, যেন ক্যালেন্ডার।

কবি আর শিল্পী মিলে কখনো কখনো চিত্র অনুযায়ী বাক্য বসান। যেন সিনেমার সাব টাইটেল। যেমন—ধানের খেত, নদী, কুঁড়ে ঘর, আকাশে মেঘ পাখি উড়ছে। এবং লেখা, আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে এই বাংলায়, হয়ত মানুষ নয় হয়ত বা শঙ্খচিল শালিখের বেশে। আর একটা পাঞ্জাবিতে কবি আর শিল্পী প্যান করলেন। শিল্পী আঁকলেন একটা শ্রাব, আধাআধি ভাগ করা শ্রাবের অর্ধেক ধরে রেখেছে এক নারীমূর্তি, বাকি অর্ধেক এক পুরুষ। এর সাবটাইটেল কী হতে পারে বলুন তো?—বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর অর্ধেক তার রচিয়াছে নারী অর্ধেক তার নয়।

মোনালিসাও পান্টা পাঞ্জাবি করেছে। হাইপার সংস্কৃতিবানদের জন্য লম্বা দাড়ি সমেত রবীন্দ্রনাথের মুখ কিন্তু গালে হাত দেয়া সুকান্তর ছবি সমেত পাঞ্জাবি তৈরি করে। বৈশাখে রবীন্দ্রনাথের অর্ডার ভালো। জ্যৈষ্ঠ নজরুলের। একই ভাবে শ্রাবণে শিবের ছবি, লোকনাথের ছবিও। লোকনাথ বাবার সাবটাইটেল হল—রণে বনে জঙ্গলে যেখানেই থাকো না কেন, আমাকে স্মরণ করিও। এ ছাড়া মিরর এফেক্ট পাঞ্জাবি করেছে। সে পাঞ্জাবিতে যা লেখা আছে তা সোজা চোখে বোঝা যাবে না। অয়নায় বোঝা যাবে। অয়নবুলেছে যেমন থাকে, সেভাবে পাঞ্জাবিতে উল্টো করে লেখা MARGAND। এরকম কায়দা। All কায়দা যাকে বলে। এ ছাড়াও বলেছি, লরির পিছনে লেখার কারিগর এনেছেন মোনালিসার লিসাস বুটিক। তিনি পাঞ্জাবি, গঞ্জির গায়ে লিখে দিচ্ছেন—

* ভয় কিরে পাগল, আমি তো আছি—

* জিন্দেগি এক জুয়া—

* জীবনের অনেকটা পথ একাই চলে এলাম—

* এসো কিছু করে দেখাই—

* সেই সুখ আর নেই—

গাড়ির লেখা মানুষের গায়ে কেন? মোনালিসার যুক্তি, মানুষও তো মাড়ি।

এর পরিবর্তে মদন মশলের MAD HOUSE লিখল—

* দাঁড়ে দাঁড়ে ক্রম দেড়ে দেড়ে দেড়ে

* খেতে নেই, খাবার হিসেবে

* মানুষ পোশাক পবে লজ্জা বশত

মদন এবার নতুন ডিজাইন করল, পোশাকের সামনে নয়, পিছনে। পিছনের লেখাগুলো এরকম।

* পেটে খেলে পিঠে সয়

* যেতে যেতে একলা পথে নিভেছে মোর বাতি

* তুমি বন্ধু থাকো দূরে আমি চলে যাই।

এবার একটা মোক্ষম পাঞ্জাবির কল বলি। নিজের পাঞ্জাবির সামনের দিকে ফেব্রিকের জলের ঢেউয়ে সুতোয় কাজকরা হাঁস ঘুরছে। ওটার দাম সাড়ে তিন হাজার টাকা। এ রহস্যময় পাঞ্জাবির পিছনে কী লেখা আছে দেখুন—“বুরে নজরওয়ালা তেরা মুহ কালা।”

মোনালিসা এরপর একটা নতুন বুদ্ধি করল। একটা প্রজেক্ট। কবির সঙ্গে ছবি। বিখ্যাত কবিদের স্টুডিওতে ডেকে এনে ছবি তুলে রাখা হচ্ছে। তারপর কোনো ক্রায়েন্ট যদি ঐ বিশেষ কবির সঙ্গে নিজের ছবি নিজের পোশাকে লাগাতে চান, সেই ব্যবস্থাও হয়ে যাচ্ছে। কিভাবে বলি। নিজের ছবির সঙ্গে ঐ কবির ছবি জুড়ে কম্পিউটারে প্রিন্ট করে নেয়া হচ্ছে কাপড়ে, সেই কাপড় জুড়ে দেয়া হচ্ছে। এতে সাকসেসফুল হয়ে, শুধু কবি নয়, গায়ক-খেলোয়াড়—এদের ছবির সঙ্গেও পাটির নিজের ছবি জুড়ে পোশাকে লাগানো হতে লাগল। হৈ হৈ ব্যাপার।

মোনালিসা খুব আশ্চর্যসাদে আশ্বস্ত ছিল।

মদন কিন্তু দমবার পাত্র নয়। ও একটা নতুন কায়দা বার করল। মদনের ম্যাড হাউস থেকে করা পোশাকে এবার নতুন চমক।

প্রথমে চমকে গেল মোনালিসা ওর এক পুরনো এবং বিশ্বস্ত খদ্দেরের গায়ে একটি পাঞ্জাবি দেখে। এ খদ্দেরের নাম শানুবাবু। মোনালিসা জানত ঐ শানুবাবু মাধুরী দীক্ষিত-এর বড় ফ্যান। মোনালিসা দেখল ঐ ভদ্রলোকের পাঞ্জাবিতে একটি আশ্চর্য ছবি। ঐ শানুবাবু আর মাধুরী দীক্ষিত হাত ধরাধরি করে নাচছে।

—কোথায় পেলেন এই পাঞ্জাবি?

মোনালিসার প্রশ্নের উত্তরে শানুবাবু বললেন ম্যাড হাউসে। নেহাত পাঞ্জাবির কলার ছিল না, থাকলে রং-এ কলারটা উঠিয়ে দিত শানুবাবু।

এর ক দিন পরে পাড়ার উঠতি প্রমোটার নাডু, সেও মাধু মাধুরী দীক্ষিতের হাত ধরে নাচছে। বুড়ো ভুঁড়িওলা হাঁদুবাবু মনিং ওয়াক কবতে যাচ্ছেন, তাঁর গঞ্জিতে মাধুরীব সঙ্গে নাচের ভঙ্গিতে হাঁদুবাবু।

একবারে ম্যাড হাউসের জয় জয়কার। কেউ বলে না, রহস্যটা কি। মোনালিসা শেষকালে একটা লোক ভাড়া করে মদনের স্টুডিওতে পাঠাল। ফিরে এসে লোকটা যা রিপোর্ট করল তা হল :

ঘরের ভিতরে একটা দু'হাত তোলা মাধুরী আছে। যেন আকুল হয়ে তাকিয়ে আছে, যেন হাত তুলে বলছে, এ দিকে এসো। কার দিকে তাকিয়ে আছে জানেন! অন্য একটা পিচবোর্ডের ব্যাটাছেলের দিকে। ওর আবার মুণ্ড নেই। মুণ্ডর জায়গায় একটা গোপানা গর্ত। ঐ মুণ্ডকাটা লোকটার ও হাত তোলা, হাতটা ছুয়েছে মাধুরীর হাত। আমি গোলাম, পিচবোর্ডের মানুষটার ঘাড়ের উপরের গর্তে মুণ্ড গলিয়ে দিলাম, ছবি উঠল, ব্যাস।

এবার মোনালিসা ভাবল, আর যুদ্ধ নয়; ওর মদন জাগল। মদনকে প্রেম নিবেদন করল। মোনালিসা আর মদনের আদ্যক্ষর জুড়লে হয় 'মোম'। দেখা যাক এবারে 'মোম' কেমন ছুলে। ওদের জয়েন্ট ভেনচারের মোমের আলো দেখার প্রতীক্ষায় রইলাম আমরা।



দেওয়াল (Le Mur)

জাঁ পল সার্ত্র

অনুবাদ : প্রণবেন্দ্রনাথ ঘোষ

আমাদের একটা সাদা হলঘরের মধ্যে ঠেলে দেওয়া হল। আমার চোখদুটো পিট্ পিট্ করতে লাগল, কারণ আলোতে আমার চোখ ব্যথা করছিল। একটু পরে আমি একটা টেবিল দেখতে পেলাম। টেবিলের পিছনে চারজন লোক বসে কাগজপত্র দেখছিল। অন্য কয়েকজনের হলঘরের ভিতরদিকে জড়ো করা হয়েছিল। স্তম্ভ হলটা পেরিয়ে আমরা তাদের সঙ্গে একত্রিত হলাম। তাদের মধ্যে অনেককেই আমি চিনতাম; আর বাকি যারা ছিল তারা বিদেশি। আমার সামনে যে দু'জন ছিল তাদের রং ফর্সা, মাথা গোল। আমার মনে হল তাদের দেখতে ফরাসিদের মতো। ওদের মধ্যে যে সবচেয়ে ছোট সে থেকে থেকে প্যান্টটা তুলে ধরছিল; বোধহয় খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছিল। প্রায় তিনঘণ্টা এইরকম চলল। আমি বিভ্রান্ত হয়ে পড়লাম। আমার মাথাটা ফাঁকা-ফাঁকা বোধ হতে লাগল; কিন্তু ঘরটা বেশ গরম ছিল, আমার খুব আরাম বোধ হতে লাগল, কারণ চব্বিশ ঘণ্টা আমরা শুধু কাঁপুনি ভোগ করেছি।

রক্ষীরা কয়েদীদের একের পর এক টেবিলের সামনে নিয়ে এল। ওই চারজন লোককে তাদের কি নাম, কি পেশা জানতে চাইল। ওরা বেশিধন দূরে কোথাও যায়নি, কখনো কখনো এটা এটা প্রশ্ন করছিল— যেমন, তুমি কি বারুদ নুঠ কবতে গিয়েছিলে? অথবা ৯ তারিখ সকালে তুমি কোথায় ছিলে, কী করছিলে? ওরা উত্তরটা শোনেনি বা শোনার মতো মেজাজও ওদের ছিল না। ওরা একটু চুপ করে থেকে সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর লিখতে লাগল।

ওরা টমের কাছে জানতে চাইল—এটা কি সত্যি যে সে একসময় আন্তর্জাতিক ব্রিগেডে কাজ করত?

টম অস্বীকার করতে পারল না কারণ ওর কোটের পকেটে বেশকিছু কাগজপত্র পাওয়া গেছে। জুয়ীর কাছে ওরা কিছু জানতে চাইল না। ওর নামটা বলার পর ওরা অনেকক্ষণ লিখতে লাগল।

জুয়া বলল, “আমাব ভাই-যোশে আনার্কিস্ট। আপনারা তো জানেন যে সে এখানে নেই, আব আমি কোনো দলের নই। আমি কখনো রাজনীতি করিনি।”

তারা কোনো উত্তর দিল না। জুয়া আরো বলল, “আমি কিছুই করিনি। অপরের কাছের জন্য আমি কেন মূল্য দিতে যাব?” ওর ঠোঁটদুটো কাঁপতে লাগল। একজন বন্দী ওকে থামাল, ওকে নিয়ে চলে গেল। এবার আমার পালা।

“তোমার নাম পাবলো ইব্বীটা?”

“হ্যাঁ।”

একজন কাগজপত্রের দিকে তাকিয়ে আমাকে বলল, “রাম গ্রি কোথায়?” বললাম, “আমি জানি না।”

আবার প্রশ্ন—“৬ তারিখ থেকে ১৯ তারিখ পর্যন্ত তুমি তাকে তোমার বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছিলে?”

উত্তর দিলাম, “না।”

ওরা কিছু লিখল আর রক্ষীরা আমাকে বাইরে নিয়ে গেল। বারান্দায় টম আর জুয়া দু’জন বন্দীই মাঝখানে অপেক্ষা করছিল। আমরা হাঁটতে লাগলাম। টম রক্ষীদের একজনকে জিজ্ঞেস করল, “তাহলে?”

রক্ষী বলল, “কী তাহলে?”

টম—এটা কি জিজ্ঞাসাবাদ না বিচার?

রক্ষী—এটা বিচার।

টম—তাই বুঝি? তা আমাদের নিয়ে ওরা কী করবে?

রক্ষীটি নির্লিপুভাবে উত্তর দিল, “তোমাদের সেলের মধ্যে তোমাদের রান্না জানানো হবে।”

আসলে যে ঘরগুলো আমাদের সেল হিসাবে কাজে দিচ্ছিল সেগুলো হাসপাতালের ছোট ছোট ঘর। খজু খজু হাওয়া চলাচলের জন্য ঘরগুলো ছিল অসম্ভব ঠাণ্ডা। সারা রাত ধরে আমরা ঠাণ্ডায় কেঁপেছি। দিনের বেলাতেও অবস্থা তাব চেয়ে কিছুমাত্র ভালো ছিল না। আগের পাঁচদিন আমি আর্চ বিশপের কয়েদখানায় কাটিয়েছি, যে ঘরগুলি মধ্যযুগ থেকে একরকম পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। এখন কয়েদীদের সংখ্যা বেড়েছে অথচ তাদের রাখারও যথেষ্ট জায়গা নেই, তাই তাঁদের যত্রতত্র রাখা হচ্ছে। আমার কয়েদঘরের জন্য আমার কোনো আক্ষেপ নেই। আমি সেখানে ঠাণ্ডায় কষ্ট পাইনি। কিন্তু সেখানে আমি ছিলাম একা, নিঃসঙ্গ। বেশিদিন ওভাবে থাকলে বড় বিরক্তিকর লাগে। সেলের মধ্যে আমার সঙ্গী ছিল

জুয়া। কদচিৎ কথা বলত, ওর ভয় করত। তাছাড়া ওর বয়স এত কম ছিল যে বলার মতো ওর কোনো কথাও ছিল না। কিন্তু টম ছিল বলিয়ে কইয়ে, আর স্প্যানিশটা ও ভালোই জানত।

সেলের মধ্যে একটা বেঞ্চ ও চারটে খড়ের মাদুর ছিল। ওরা যখন আমাদের সেখানে নিয়ে এল, আমরা সেখানে বসে নিঃশব্দে অপেক্ষা কবতে লাগলাম। একটু পরে টম বলল, “আমাদের দফা রফা।”

আমি বললাম, “আমাবও তাই মনে হয়। তবে আমাব বিশ্বাস, ঐ বাচ্চা ছেলেটার ওরা কোনো ক্ষতি করবে না।”

টম বলল, “ওকে ওরা কোনোভাবেই দোষ দিতে পারে না। ও শুধু একজন সংগ্রামীই ভাই, এই যা।”

আমি জুয়ীর দিকে তাকালাম। ও শোনার মতো অবস্থায় ছিল না। টম আবাব বলতে লাগল, “তুমি জানো সারাগোসে ওরা কী করে? ওরা এই বন্দীদের বাস্তায় শুইয়ে তার ওপর গাড়ি চালিয়ে দেয়। একজন পলাতক মরক্কোবাসী আমাদের এই খবর দিয়েছে। ওরা বলে বান্দদের খরচ বাঁচাবার জন্য ওরা এইবকম করে।”

আমি বললাম, “ওতে তো তেলের খরচ বাঁচে না।”

টমের ওপর আমি খুব বিরক্ত হলাম। ওর এসব কথা বলা উচিত হয়নি।

টম বলতে লাগল, “অফিসারেরা ওখানে পকেটে হাত দিয়ে সিগারেট খেতে খেতে রাস্তার ওপব পাযচারি ক’বে সব লক্ষ্য রাখে। তোমার কি মনে হয় ওরা তাদের শেষ করে দিতে পারবে? তোমাব ভাগ্য ভালো। ওরা ওদের চ্যাচাতে দেয়, কখনো কখনো এক ঘণ্টা ধরে। ঐ মরক্কোবাসী বলেছিল যে প্রথমবার সে চ্যাচাতে পারেনি।”

আমি বললাম, “আমার মনে হয় না ওরা এখানে ওরকম কিছু করবে। অন্তত ওদের বান্দদের কোনো অভাব হবে না।”

চারটি ছোট জানালা দিয়ে দিনের আলো এসে পড়ছিল, আব আসছিল একটা গোল ফাঁক দিয়ে যেটা বাদিকে ছাদের ওপর কাটা হয়েছিল। সেখান দিয়ে আকাশ দেখা যাচ্ছিল। এই ফাঁকটা সাধারণত একটা ট্র্যাপ ডোর দিয়ে বন্ধ করা থাকত যার ভেতর দিয়ে সেলের মধ্যে কয়লা ফেলা হত। এই ফাঁকটার ঠিক তলায় অনেক ধুলো জমেছিল। হাসপাতালের ঘর গরম করার জন্যে রাখা ছিল ওগুলো। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হতেই অসুস্থদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। অব্যবহৃত অবস্থায় কয়লা ওখানেক পড়ে রইল। সময় সময় ওর ওপর বৃষ্টি পড়েছিল, কারণ ট্র্যাপ ডোরটা বন্ধ করতে ভুলেই গিয়েছিল লোকে।

টম কাঁপতে লাগল। ও বলল, “ঈশ্বর চুলোয় যাক, আমার কাঁপুনি ধরেছে। এই আবার শুরু হল।”

ও উঠে দাঁড়িয়ে জিমনাস্টিক করতে লাগল। প্রতিটি অঙ্গ সঞ্চালনের সময় ওর জামা উঠে গিয়ে দেখা যাচ্ছিল ওর শুভ্র লোমশ বুক। চিৎ হয়ে শুয়ে পা দুটো কাঁচির মতো ওপরে তুলে ধরল। আমি দেখলাম ওর বিশাল দেহটা কাঁপছে। ওর চেহারা বেশ শক্তপোক্ত, মাংসলও চিক্চিকে। আমি ভাবতে লাগলাম বন্দুকের গুলি অথবা বেয়েনেটের খোঁচা এই মাংসল দেহটাকে একতাল মাখনের মতো ভেদ করে যাবে। ওর দেহটা যদি শীর্ণ হত তাহলে হয়ত আমার এমনটা মনে হত না।

আমার যে শীত করছিল ঠিক তা নয়, তবে আমাব পিঠ ও হাতের কোনো অনুভূতি ছিল না। থেকে থেকে আমার মনে হচ্ছিল আমার কী

যেন নেই। আমার চারদিকে আমি আমার কোটটা খুঁজতে লাগলাম। হঠাৎ মনে পড়ল যে ওরা আমার কোটটা আমাকে দেয়নি। এটা বড় কষ্টদায়ক। ওদের সৈন্যদের দেবার জন্যে ওরা আমাদের সব জামাকাপড় নিয়ে নিয়েছে। শুধু শার্টগুলো আমাদের দিয়েছে—আর ওই সুতির প্যান্টগুলো দিয়েছে যেগুলো প্রচণ্ড গরমে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া বোগীরা পরত।

একটু পরে টম উঠে দাঁড়াল। হাঁপাতে হাঁপাতে আমার পাশে বসে বলল, “আবার গা গরম করছে?”

আমি বললাম, “হা ভগবান, তা নয় আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।”

সন্ধ্যা আটটা নাগাদ একজন কমান্ডার দু’জন Phalangist (স্পেনের বিশেষ রাজনৈতিক দলের সদস্য) কে নিয়ে আমাদের ঘবে ঢুকল। তাব হাতে একটা কাগজ ছিল। সে রক্ষীকে জিজ্ঞাসা করল, “ওদের নাম কি? এ তিন জনের?” রক্ষী বলল, “স্টাইনবক্, ইবীটা ও মিরবল।”

চশমাটা রেখে কমান্ডার তালিকাটা দেখল—“স্টাইনবক্ ...স্টাইনবক্...এতো। তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। কাল তোমাকে গুলি করে মারা হবে।”

তারপর সে আবার তাকাল। বলল, “অন্য দু’জনকেও মারা হবে।”

জুয়ী বলল, “অসম্ভব। আমাকে নয়।”

কমান্ডার অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল।

—তোমার নাম কি?

—জুয়ী মিরবল।

—তা হোক, তোমার নাম তো এখানে রয়েছে। তোমাকেও দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে।

—আমি তো কিছু করিনি।

কমান্ডার দু’কাঁখে ঝাঁকুনি দিয়ে টম আর আমার দিকে ফিরল। জিজ্ঞাসা করল, “তোমরা জাতিতে বাস্ক (Basque)?

উত্তর দিলাম, “আমাদের কেউ বাস্ক নয়।”

ওকে একটু উত্তেজিত দেখাল। “আমাকে বলা হয়েছে এখানে তিনজন বাস্ক জাতির লোক আছে। তাদের পেছনে দৌড়ে আমি আমার সময় নষ্ট করব না। আচ্ছা, মনে হচ্ছে তোমাদের তো পাদ্রীর দরকার নেই?”

এ সব কথাই আমরা কোনো উত্তর দিলাম না। উনি বললেন, “এখুনি একজন বেলজিয়ান ডাক্তার আসবেন। ওঁকে বলা হয়েছে রাতটা তোমাদের সঙ্গে কাটাবার জন্যে।”

মিলিটারি অভিযান করে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

টম বলল, “আমি তোমাকে কী বলেছিলাম? ওরা বেশ ভালো, তাই না?”

আমি বললাম “হ্যাঁ, তাই। কিন্তু বাচ্চাটার পক্ষে ওরা অতি জঘন্য।”

বললাম, কিন্তু ঐ বাচ্চাটাকে আমি মোটেই ভালোবাসি না। ওর মুখের আকৃতি খুব নরম, ভয় আর যন্ত্রণায় তা বিকৃত হয়ে গেছে। ওর সমস্ত অবয়বকে তা যেন মুচড়ে দিয়েছে। তিনদিন আগে ও ছিল অতি কোমল শিশু। দেখে ভালো লাগত। কিন্তু এখন ওকে দেখলে মনে হয় কার্পেট ঝাড়ার পুরনো একটা লাঠি। আমার মনে হয় ওকে এখন ছেড়ে দিলেও ও ওর যৌবন আর ফিরে পাবে না। ওকে একটু দয়া দেখানো খারাপ কিছু নয়। তবু দয়া আমার ভালো লাগে না, বরং ওতে আমার খুব ভয় হয়। আমি আর কিছু বলিনি, কিন্তু ও বিবর্ণ হয়ে গেল; ওর মুখ, ওর হাতদুটো ধূসর হয়ে গেল। ও আবার বসে গোল চোখ দিয়ে মাটির দিকে

তাকিয়ে রইল। টমের মন খুব ভালো। সে জুয়ীর হাতটা ধরতে চাইল। কিন্তু জুয়ী একটা মুখভঙ্গি করে হাত ছাড়িয়ে নিল।

আমি নরম সুবে বললাম, “ওকে ছেড়ে দাও। দেখছ তো, ভাঁ কবল বলে।”

অনিচ্ছাব সঙ্গে টম তা মেনে নিল। ও চেয়েছিল ওকে সাধুনা দিতে। এটা করলে ওর একটু সময় কাটত, নিজের কথা ভাববার সময় পেত না। কিন্তু এতে আমি একটু উত্তেজিত হলাম। আমি কখনো মৃত্যুর কথা ভাবিনি, কারণ ভেমন ঘটনাও ঘটেনি। কিন্তু এখন না ভেবে আরতো কিছু কবাব নেই।

টম কথা বলতে শুরু করল,—“তুমি তো ওদের অন্ধা পাইয়েছ, কি হে?”

আমি কোনো উত্তর দিলাম না। ও আমাকে বোঝাতে লাগল যে আগস্ট মাসের গোড়ায় সে ওদের ছ’জনকে যমালয়ে পাঠিয়েছে। কী অবস্থায় পাঠিয়েছে তা বলল না। আমি দেখলাম আমাকে সেকথা বলার ইচ্ছেও ওব নেই। ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। মনশ্চক্ষে দেখলাম ওদের তপ্ত গুলিবর্ষা আমার দেহ ভেদ করে গেছে। ওসব ছিল প্রকৃত প্রণয়ের অতীত; কিন্তু আমি ছিলাম শান্ত; বোঝার জন্য সমস্ত রাতই পড়ে আছে।

একটু পরে টম কথা বলা থামাল; আমি ওকে অপাঙ্গে দেখলাম। ওকে কেমন ধূসর দেখাচ্ছে। হতভাগ্যের মতো। মনে মনে বললাম, এই শুরু হল। প্রায় রাত হয়ে এসেছে। ছাদের ফাঁক দিয়ে ক্ষীণ আলো এসে পড়েছে। কমলার গাছ দিয়ে আলো চুঁয়ে চুঁয়ে পড়ছে। আকাশেব গায়ে যেন একটা আলোব পৌঁচ টানা হয়েছে। ছাদের ঐ ছিদ্র দিয়ে আমি একটা তাবা দেখতে পেলাম। মনে হল আজ রাত্রিটা বড় নির্মল, বড় ঠাণ্ডা।

দবজা খুলে গেল; দু’জন রক্ষী ঘরে ঢুকল। ওদের পেছন পেছন ওড গাত্রবর্ণের একজন। তাঁর পরনে বেলজিয়ান ইউনিফর্ম। তিনি আমাদের অভিযান করলেন। বললেন, “আমি একজন ডাক্তার। এই বেদনাদায়ক অবস্থায় তোমাদের সাহায্য করার জন্য আমাকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।”

ওঁর গলাব স্বব ভালো, একটা বিশিষ্টতা আছে। আমি বললাম, “আপনি কী করতে এখানে এসেছেন?”

“আমি আপনার সেবাব জন্য প্রস্তুত। এই কয়েকঘণ্টার চাপ লাঘব করার জন্য আমার দ্বারা যা সম্ভব, তা সবই আমি করব।”

“আমাদের কাছে আপনি কেন এসেছেন? অন্য লোকও তো আছে, তারা তো সমস্ত হাসপাতাল জুড়ে রয়েছে।”

অস্পষ্ট দোলায়িত মনে তিনি উত্তর দিলেন,—“আমাকে এখানে পাঠানো হয়েছে। আপনারা কি ধূমপান করতে চান? আমার কাছে সিগারেট আছে, চুরুটও আছে।”

আমাদের বিলিতি সিগারেট এগিয়ে দিলেন কিন্তু আমরা তা ফিবিয়ে দিলাম।

আমি বললাম, “আপনি তো দয়ার বশবর্তী হয়ে এখানে আসেননি। তাছাড়া আমি আপনাকে চিনি। জেলখানাব চত্বরে ফ্যাসিস্টদের সঙ্গে আমি আপনাকে দেখেছি, যেদিন আমাকে প্রথম ধরা হল।”

আমি আরো কিছু বললাম, কিন্তু আমার হঠাৎ একটা কিছু মনে এল। যাতে এই ডাক্তারের উপস্থিতি থেকে আমার আগ্রহ চলে গেল। হয়ত আমার কথা বলার ইচ্ছাই চলে গেল। আমি-কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে অন্যদিকে চোখ ফেরালাম। একটু পরে আমি মাথা তুললাম; আমাকে যেন উৎসুক হয়ে

দেখতে লাগল ও। রক্ষীরা একটা খড়ের মাদুরে বসেছিল। ঐ লম্বা রোগাটে পেরো পায়ের আঙুলগুলো মুড়ছিল, অন্যজন ঘুম তাড়াবার জন্য থেকে থেকে মাথা নাড়ছিল।

পেরো হঠাৎ ডাক্তারকে বলল, “আপনার আলো লাগবে?” অপরজন মাথা নেড়ে “হ্যাঁ” বলল। আমার মনে হয় ওর বুদ্ধি একজন মাথামোটা লোকের মতো। কিন্তু আর যাই হোক, লোকটা বদ নয়। ওর নীল বড় বড় নিশ্চল চোখ দেখলে মনে হয় ও কল্পনাশক্তির অভাবে চারদিক হাতড়ে দেখছে, যেন জাল ফেলছে। পেরো ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে একটা পেট্রলের আলো নিয়ে ফিরে এল; আলোটা বেঞ্চের এক কোণে রাখল। ল্যাম্পটা তেমন আলো দিচ্ছিল না, তবু কিছু না থাকার চেয়ে বরং ভালো, অত রাতে ওরা আমাদের অন্ধকারে রেখেছিল। ল্যাম্প থেকে ঘরের ছাদে যে বৃত্তাকার আলো পড়ছিল আমি বেশ কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে রইলাম। আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। তারপর হঠাৎ আমি যেন জেগে উঠলাম, আর আলোব বৃত্তটা মুছে গেল। আমার মনে হল গুরুভার একটা কিছু আমাকে পিষে দিয়েছে। মৃত্যু চিন্তা নয়, মৃত্যুভয়ও নয়। অজানা একটা কিছু। আমার দুই চোয়াল জ্বালা করতে লাগল, মাথা ব্যথা করতে লাগল।

আমি একটু ঝাঁকুনি দিয়ে দু’জন সঙ্গীর দিকে তাকলাম। টম তার মাথাটা দু’হাতের মধ্যে ধবে রয়েছে; আমি শুধু তার মাসেল ঘাড়টা দেখতে পেলাম। জুয়াঁ খুব মুগ্ধে পড়েছে। ওব মুখ খোলা, নাসাবন্ধু কাঁপছে। ডাক্তার ওর কাছে গিয়ে যেন সান্ত্বনা দেবার জন্য ওর কাঁধে ওপর হাত রাখল। ওব চোখদুটো শীতল, নিশ্চল। আমি দেখলাম ঐ বেলজিয়ান তার হাতটা কায়দা করে জুয়াঁব হাত বরাবর হাতের মুঠো পর্যন্ত নামাল। জুয়াঁ নির্লিপ্তভাবে তা কবতে দিল। অন্যমনস্কভাবে ডাক্তার ওর মুঠোটা তিন আঙুলের মধ্যে ধরল। ঠিক সেই সময় সে একটু পিছু হঠে নিজেকে ঠিকঠাক করে নিল যাতে আমার দিকে পিছন ফিরতে পারে। আমি একটু পিছনে হেলে দেখলাম সে তাব ঘড়িটা বাব করে এক বলক দেখে নিল; বাচ্চাটার মুঠোটা ওর হাতেই ধরা ছিল। একটু পরে সে হাতটা আবার নামাল, যেন অসাড়। তারপর দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল। ওর যেন হঠাৎ গুরুত্বপূর্ণ কিছু মনে পড়ে গেল যা সঙ্গে সঙ্গে লিখে রাখা দরকার। ও পকেট থেকে একটা নোটবই বের করে কিছু লিখল। রেগে গিয়ে ভাবলাম, ঐ হতভাগটা যদি আমাব নাড়ি দেখতে আসে তাহলে আমার মুঠোটা ওর নোংরা মুখের মধ্যে পুরে দেব।

সে এল না। আমি অনুভব করলাম, সে আমাকে লক্ষ্য করছে। মাথা তুলে তাব দিকে তাকলাম। সে এমন গলায় কথা বলল যেন সে হাওয়ায় কথা বলছে। বলল, “তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না যে এখানে লোকে ঠাণ্ডায় কাঁপছে?” ওকে দেখে শীতভর্ত বলে মনে হল, ও বেগুনি হয়ে গেছে।

উত্তবে বললাম, “আমার শীত করছে না।”

ও আমাকে কঠিন দৃষ্টিতে দেখতে লাগল। আমার দেহের ওপর হাত দুটো বোলালাম; যামে ভিজ্জে গেছি। এই সেলের মধ্যে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় হাওয়ার মুখোমুখি হয়েও আমি ঘামছি। আমাব চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে দিয়ে দেবি সেগুলোও ভিজ্জে জ্বজ্ববে হয়ে গেছে। আমার জামা ভিজ্জে দেহের সঙ্গে আটকে গেছে। অস্তত এক ঘণ্টা আমার ঘাম গড়িয়েছে, অথচ আমি কিছুই অনুভব করিনি। কিন্তু ঐ বেলজিয়ান ব্যাটার দৃষ্টি এড়ায়নি। আমার গাল দিয়ে বিন্দু বিন্দু ঘাম গড়িয়ে পড়ছে এটা ও দেখেছে। ওভেবেছে যে এটা ভীত অবস্থার একটা প্রকাশ যা আধা প্যাথোলজিকাল। ও নিজেকে

স্বাভাবিক মনে করে গর্ব অনুভব করল, কারণ ও শীতে কাঁপছিল। আমার ইচ্ছে হচ্ছিল উঠে গিয়ে ওকে আচ্ছা করে পেটাই। উঠতে যাব, এমন সময় আমাব ঘৃণা, আমাব বাগ মুছে গেল। আমি নির্লিপ্তের মতো আবার বেঞ্চে বসে পড়লাম।

রুমাল দিয়ে আমাব ঘাড় মোছার প্রয়োজন বোধ কবলাম। বুঝতে পারছি মাথার চুল থেকে ঘাড়ের ওপর অস্বস্তিকরভাবে ঘাম ঝরছে।

আমার রুমাল নিঙড়োবার মতো ভিজ্জে গেছে; ক্রমাগত ঘামছিলাম। আমার পাছাও যামে ভিজ্জে গিয়েছিল। আমার প্যাণ্টটা ভিজ্জে আটকে গিয়েছিল বেঞ্চে।

হঠাৎ জুয়াঁ বলল, “আপনি ডাক্তার?”

“হ্যাঁ”। বেলজিয়ান উত্তর দিল।

“কি? ভুগতে হবে...অনেকক্ষণ?”

“ও হো! কখন...? না, না। তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে।”

সে যেন একজন অসুস্থ মানুষকে আশ্বস্ত করছে।

“কিন্তু আমি...আমাকে লোকে বলেছে যে প্রায়ই দুটো গুলির দবকার হয়।”

“কখনো কখনো”। বেলজিয়ান মাথা তুলে বলল, “এমনও হতে পারে যে প্রথম গুলিটা দেহের গুরুতর অংশে লাগেনি।”

“তাহলে তো আবাব বন্দুকে গুলি ভরে নতুন করে তাক করতে হবে?”

সে একটু ভেবে ধরা গলায় বলল, “সময় এলে দেখা যাবে।”

ওর ভীষণ ভয় করছিল যে অনেকক্ষণ কষ্ট ভোগ করতে হবে। ওর কেবলই সেই কথা মনে পড়ছিল; ওর বয়সের জন্যই এমনটা হচ্ছিল। আমি এ বিষয়ে বেশি কিছু ভাবিনি। কষ্ট ভোগ করার ভয়ে যে আমি ঘামছিলাম তা নয়।

যেখানে ধুলো জমে রয়েছে আমি উঠে সে পর্যন্ত হেঁটে গেলাম। টম লাফিয়ে উঠে কটমট করে আমার দিকে তাকাল। আমাব ভুতোর মচমচে আগুয়াজে খুব বিরক্ত হয়েছিল। আমি ভাবলাম একবার আয়নায়ে দেবি আমার মুখটাও ওর মতো কদাকার হয়ে গেছে কিনা।

টমও ঘামছে। আকাশ দীপ্ত নির্মল। কিন্তু ঐ প্রায়াক্ষকার ঘরের কোণে আলো প্রবেশ করছে না।

পবনদিন আর্চবিশপের কয়েদখানা থেকে আকাশের অনেকটাই আমি দেখতে পাচ্ছিলাম আর দিনের প্রতিটি দণ্ডে আমার মনে পড়ছিল বিভিন্ন স্মৃতির পরম্পরা। সকালে আকাশ যখন স্বচ্ছ ঘন নীল ছিল তখন আমার মনে পড়ছিল আটলান্টিকের সমুদ্রবেলা; দুপুরে দেখলাম খর রোদ। আমাব মনে পড়ল সেভিলের পানশালা, যেখানে বসে আমি জলপাই সহযোগে হেরিং মাছ খেতে খেতে বিশেষ ধরনের পানীয় পান করছিলাম। বিকেলে আমি ছায়ায় বসেছিলাম, ঘন ছায়া চত্বরটার অর্ধেক জুড়ে ছিল আর বাকি অর্ধেক রোদে ঝলমল করছিল। আকাশের বুকে এমন করে সমস্ত ধরণীকে প্রতিবিম্বিত হতে দেখা সত্যিই খুব কষ্টকর।

কিন্তু এখন আকাশে বাতাসে আমি যা চাই তাইই দেখতে পাবি, আকাশ আর আমাকে তেমন করে টানে না। এটাই আমার বেশি ভালো লাগছিল। আমি টমের পাশে এসে বসলাম। অনেকক্ষণ কেটে গেল।

টম গলার স্বব নামিয়ে কথা বলতে লাগল। ওর সবসময় কথা বলা দরকার। কথা না বললে ও তার ভাবনাগুলোকে যেন শুহোতে পারছিল না। মনে হল ও যেন আমাকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলছে। কিন্তু ও আমার

দিকে তাকায়নি, নিঃসন্দেহে আমার এই ধূসর ঘর্মাক্ত দেহটা দেখতে ওর ভয় কবছিল। আমাদের অবস্থা একই, বরণ আরো খারাপ। আমবা একে অন্যের প্রতিবিশ্ব ছিলাম। ও তাকিয়ে রইল উচ্ছল বেলজিয়ানটিব দিকে।

বলল, “তুমি কিছু বুঝছ? আমি তো কিছুই বুঝছি না।”

আমি স্বব নিচু করে কথা বলতে লাগলাম, “কী ব্যাপার, কী হয়েছে?”

“আমাদের কিছু একটা ঘটবে যা আমি বুঝতে পারছি না।”

টমের গায়ে এক অদ্ভুত গন্ধ। আমি যেন আগের থেকে আরো বেশি গন্ধসচেতন হয়ে উঠেছি। বত্র হেসে বললাম, “তুমি এখনি বুঝতে পারবে।”

একগুয়ের মতো ও বলল, “কথাটা পবিদ্ধাব হল না। আমার এখন সাহস সঞ্চয় কঁবা দবকার, আমার অন্তত জানা প্রয়োজন... শোনো, আমাদের উঠানে নিয়ে যাওয়া হবে। আমাদের সামনে ঐ লোকগুলো সাবি সাবি দাঁড়াবে। ওবা ক'জন থাকবে?”

“আমি জানি না। পাঁচ কি আট। তাব বেশি নয়।”

“ওতেই চলবে। ওরা আটজন থাকবে। ওদের চেষ্টায়ে বলা হবে—“গুলি করো।” আমি দেখব আটটা বন্দুক আমার দিকে তাক কবে আছে। আমার মনে হচ্ছে আমি দেওয়ালের মধ্যে ঢুকে যাব। আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে পিঠ দিয়ে দেওয়ালটা ঠেলব। দেওয়াল তা প্রতিহত করবে, দুঃস্থগে যেমন কবে। হাঃ! তুমি যদি জানতে আমি কেমন কবে ওসব কল্পনা করতে পারি।”

আমি বললাম, “ঠিক আছে। আমিও তা কল্পনা করছি।”

দুইটুকি করে ও বলল, “তুমি তো জানো, বিকৃত করার জন্য ওরা চোখ ও মুখের দিকে তাক করে থাকে। ক্ষতগুলো আমি এখনই অনুভব করছি। একঘণ্টা হল আমার মাথা ধরেছে, ঘাড় ব্যথা করছে। সত্যি, সত্যি কোনো ব্যথা নয়, বরণ আরও খারাপ—কাল সকালে আমি যা অনুভব করব এ সেই ব্যথা। কিন্তু তারপর?”

ও যা বলতে চায় আমি বুঝলাম, কিন্তু আমি যে বুঝছি তা জানাতে চাইলাম না। ব্যথার কথা বলতে গেলে আমার দেহেই আমি তা বয়ে বেড়াচ্ছি। যেন একঝাঁক ক্ষতচিহ্ন। আমি এমনটা কবতে পারিনি, কিন্তু আমার অবস্থা ছিল ওরই মতো। আমি এতে কোনো গুরুত্ব আরোপ করিনি।

রুক্ষভাবে বললাম, “তুমি ডাঙিলিয়ন ফুল শুকবে।”

ও নিজের মনে কথা বলতে লাগল, কিন্তু বেলজিয়ানটিকে চোখে চোখে রেখেছিল। ওর কথা শোনার মতো তার ভাবগতিক ছিল না। বেলজিয়ানটা কী করতে এসেছে তা আমি জানি।

আমরা কি ভাবছি তাতে ওর কোনো আগ্রহ নেই। ও এসেছে আমাদের দেহগুলো দেখতে, যে প্রাণবান দেহগুলো যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে।

টম বলল, “দুঃস্থগে যেমন হয় তেমন। কিছু ভাবতে ইচ্ছে হয়। সব সময় মনে হয় ওটা তো আছে। বুঝতে চেষ্টা করি কিন্তু তা ফসকে যায়; আর সেটা মনে পড়ে না। পরক্ষণেই সেটা এসে হাজির। কখনো কখনো আমার প্রায় মনে পড়ে যায়, তারপরেই আর মনে পড়ে না। আমি ওই যন্ত্রণা, ওই গোলাগুলি, ওই বন্দুকবাজি স্মরণ করি। আমি বাস্তববাদী। তোমার কাছে আমি তা স্বীকার করি। আমি পাগল হয়ে যাইনি। কিন্তু কিছু ব্যাপার আছে যা হয় না, যা চলে না। আমি আমার প্রাণহীন দেহটাকে দেখি। এটা এমনকিছু শূন্য নয়, কিন্তু আমিই দেখছি আমারই চোখ দিয়ে? এখন মনে হয় আমি ভাবি ভাবি যে আমি আর কিছুই দেখব না, কিছুই

ওনব না। অন্যদিকে ভ্রগৎ সংসার যেমন চলছিল তেমনই চলবে। এমনটা ভাবাব জন্য আমবা তো প্রস্তুত নই, পাবলো। তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পাবো, একটা কিছুব অপেক্ষায় সাবারাত জেগে বসে থাকাব চিন্তা আমার মাথায় এসেছে। কিন্তু সে জিনিস তো একরকম নয়। ওটা পেছন থেকে আমাদের চোপে ধববে পাবলো, আমবা তাব জন্য প্রস্তুতও হতে পারব না।”

“তুমি কি চাও যে স্বীকাসোক্তি করার জন্য আমি কাউকে ডাকি?”

ও উত্তর দিল না। আমি ইতিমধ্যে লক্ষ্য করেছি ওর ধর্মগুরুর মতো আচরণের প্রবণতা। পবিদ্ধাব গলায় কথা বলতে বলতে ও আমাকে ‘পাবলো’ বলেও ডাকছে। আমি তা খুব একটা পছন্দ কবিনি। সকল আইবিশই এমনটা হয়ে থাকে বলে মনে হয়েছে আমার। আমার অস্পষ্ট ধারণা হল—ওব যেন প্রশাব পেয়েছে। আমি অন্তবে টমের জন্য বেশি সহানুভূতি অনুভব কবিনি। একসঙ্গে মবতে চলেছি—এই যুক্তিতে আমি বুঝি না কেন আমি ওব জন্য বেশি সহানুভূতি অনুভব কবব। আরো অন্য লোক আছে যাদের সম্পর্কে ব্যাপারটা অন্য বকম হত,—যেমন বার্ম গ্রি-ব ব্যাপারে। কিন্তু টম ও জুয়ার মধ্যে আমি নিঃসঙ্গ বোধ করেছি। তাছাড়া এমনটাই আমি পছন্দ কবেছি। রামের ব্যাপারে আমি হযত সদয় হতাম, কিন্তু এই মুহূর্তে আমি ছিলাম ভয়ানক বকম কঠিন। আব আমি কঠিনই থাকতে চেয়েছিলাম।

একটু অনামনক হয়ে বিভবিড় কবে ও কথা বলতে লাগল। যাতে ভাবতে না হয় নিশ্চয় সেই জনাই ও কথা বলছিল। বুদ্ধ অণুকোষের রোগীদের মতো ওর নাকে বোধহয় প্রশাবের ঝাঁঝ আসছিল। স্বভাবতই ওব মতই আমার মত, ও আমাকে যা বলল আমিও ওকে তাই বলতে পারতাম। মরাটা স্বাভাবিক ছিল না। আব যেদিন থেকে আমি মৃত্যুর মুখোমুখি ছিলাম সেদিন থেকে আমার কিছুই স্বাভাবিক বলে মনে হয়নি। ধুলোব গাদা নয়, বেধ নয়, পেছোর কদাকাব মুখও নয়। ওধু টমের মতো সেই একই জিনিস ভাবতে আমাব ভালো লাগেনি। তাছাড়া আমি ভালোই জানতাম যে, সারা বাত ধবে প্রতি পাঁচমিনিটে আমবা একই সময় একই জিনিস ভাবতে থাকব, ঘামতে থাকব, কাঁপতে থাকব। আমি ওকে আডচোখে লক্ষ্য করলাম, আব এই প্রথমবাব ওকে আমার অচেনা বলে মনে হল। ওব দেহে মৃত্যুর ছায়া পড়েছে। আমার গর্বে আঘাত লাগল। গত চব্বিশ ঘণ্টা আমি টমের পাশেই কাটিয়েছি, ওব কথা আমি শুনেছি, ওর সঙ্গে কথা বলেছি, দেখেছি আমাদের মধ্যে কোনোই মিল নেই। আর এখন যমজ ভাইয়ের মতো একত্র হয়েছি। এব সহজ কারণ এই যে, আমরা একসঙ্গেই মরতে চলেছি। আমার দিকে না তাকিয়ে টম আমার হাতটা ধরল—“পাবলো আমি ভাবি... আমি ভাবি সত্যিই কি আমবা ধবৎস হতে চলেছি?”

আমি হাত ছাড়িয়ে নিলাম। বললাম, “দুব বোকা, তোর দু'পায়ের ফাঁকে দ্যাখ।”

ওব দু'পায়ের ফাঁকে (প্যাণ্টের মধ্যে) জমা জলের আধার তৈরি হয়েছে, আর ওর প্যাণ্ট থেকে তা ফোঁটা ফোঁটা পড়ছে। সচকিত হয়ে ও বলল, “এটা কী?”

আমি বললাম, “তোমার প্যাণ্টে তুমি প্রশাব করে ফেলেছ।”

ও রেগে গিয়ে বলল, “ও কথা সত্যি নয়। আমি প্রশাব করিনি। আমি তো কিছুই অনুভব কবছি না।”

বেলজিয়ানটি কাছে এল। মিথ্যে সহানুভূতি জানিয়ে ও জানতে চাইল, “তোমাদের কি কষ্ট হচ্ছে?”

টম উত্তর দিল না। বেলজিয়ানটি কোনো কথা না বলে টমের দু’পায়ের ফাঁকে ভেজা অংশটির দিকে তাকিয়ে বইল।

টম রেগে বললে, “ওটা কী জানি না? আমার কিন্তু ভয় করছে না। আমি শপথ করে বলছি যে, আমার ভয় করছে না।”

বেলজিয়ানটি উত্তর দিল না। টম উঠে এক কোণে প্রস্রাব করতে গেল। বোতাম আঁটতে আঁটতে ফিরে এসে ও আবার বসল। একটিও কথা উচ্চারণ করল না। বেলজিয়ানটি তার মস্তব্য লিখতে লাগল।

আমরা তিনজনেই তাব দিকে তাকিয়ে ছিলাম, কাবণ সে ছিল বেশ প্রাণবন্ত। তার হাবভাব ছিল প্রাণোচ্ছল, তার চিন্তা-ভাবনাও ছিল জীবন্ত মানুষের মতো। এই কুঠুরিতে বসে ও কাঁপছিল, যেমন কাঁপে একজন জীবন্ত মানুষ। ওর দেহটা ছিল হটপট, নমনীয়—আর আমরা, আমাদের দেহের কোনো অনুভূতিই ছিল না। আমার ইচ্ছা হল, আমার দু’পায়ের ফাঁকে প্যান্ট ছুঁয়ে দেখি; কিন্তু সাহস হল না; আমি বেলজিয়ানটিকে লক্ষ্য করতে লাগলাম। সে দু’পায়ের ওপর ভর দিয়ে নুয়ে রয়েছে; পেশীগুলো সঞ্চালিত। ও আগামী কালের কথা ভাবতে পারে। আর আমবা রয়েছে যেন তিন রক্তহীন ছায়ামূর্তি। আমরা ওর দিকে এমন ভাবে লক্ষ্য রাখলাম যেন ভ্যাম্পায়ারের মতো আমরা ওর রক্ত চুষে খাচ্ছি।

অবশেষে ও জুয়ার কাছে এল। সে কি পেশাগত ডাক্তারি কোনো ইচ্ছা নিয়ে ওব ঘাড়টা ছুঁতে চায়, নাকি ওব মনে দয়ার ভাব জেগেছে? যদি ওব মনে দয়া জেগে থাকে তাহলে সমস্ত রাত্রিতে এক এবং একবার মাত্র। ও জুয়ার মাথা আর ঘাড়ে হাত বুলাল। বাচ্চা তা বিনা বাধায় করতে দিল, কিন্তু সর্বক্ষণ দৃষ্টি ছিল তার দিকেই। হঠাৎ বাচ্চাটা ওব হাত ধরল, ফ্যান্ ফ্যান্ করে ওর দিকে তাকিয়ে বইল। ওর দু’হাতের মধ্যে বেলজিয়ানের হাতটা ধরল। ওর হাতদুটির মধ্যে কমনীয় কিছু ছিল না। ধূসর তালুর মধ্যে ধরা ছিল রক্তাক্ত মাংসল হাতটি। আমার সন্দেহ হচ্ছিল, কি কিছু ঘটতে চলেছে; টমও হয়ত সেই একই কথা ভাবছিল। বেলজিয়ানটি শুধু আগুনের দিকে তাকিয়েছিল আর পিতৃসুলভ হাসি হাসছিল। এক মুহূর্তের মধ্যে বাচ্চাটা ঐ রক্তাক্ত মাংসল মুঠোটা নিজের মুখের ওপর ধরে কামড়াতে চেষ্টা করল। বেলজিয়ানটি সজোরে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে হেঁচট খেতে খেতে দেওয়ালের দিকে ফিরে গেল। এক মুহূর্ত সে ভয়াবহ চোখে আমাদের দিকে তাকাল। ও নিশ্চয়ই হঠাৎ বুঝেছে যে আমরা ওর মতো আর মানুষ নই। আমি হাসতে লাগলাম। রক্ষীদের একজন লাফিয়ে উঠল। অপরজন ঘুমিয়ে পড়েছে। তার বড় বড় খোলা দু’চোখ ভাবলেশহীন।

‘আমার মনে’ হল আমি যুগপৎ অবসন্ন ও উত্তেজিত। উষাকালে যে মৃত্যু আসন্ন, সে বিষয়ে আমি আর ভাবতে চাইলাম না। যখনই আমি অন্য কথা ভাবতে চেষ্টা করেছি, তখনই আমি দেখেছি বন্দুকের নল আমার দিকে তাক করে আছে। আমি সম্ভবত একাদিক্রমে কুড়িবার মৃত্যুদণ্ডের মুখোমুখি হয়েছি। একবার এমনও মনে হয়েছে যে, যা হচ্ছে তা ভালোই হচ্ছে। আমি হয়ত এক মিনিট ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ওরা আমাকে দেওয়ালের দিকে টেনে নিয়ে গেল; আমি বাধা দিচ্ছিলাম। পরে ওদের কাছে ক্ষমা চাইলাম। আমি হঠাৎ জেগে উঠে বসলাম, আর বেলজিয়ানটিকে লক্ষ্য করতে লাগলাম। আমার ভয় হল আমি হয়ত ঘুমের ঘোরে চিংকার করেছি। কিন্তু ও গৌফে তা দিতে লাগল; ও কিছুই লক্ষ্য করেনি। আমি যদি চাইতাম তাহলে আমার

মনে হয় একটু ঘুমোতে পাবতাম। আটচল্লিশ ঘণ্টা জেগে আছি, আমার শক্তি নিঃশেষিত। কিন্তু আমার ইচ্ছা হল না আমার জীবনের দু’ঘণ্টা নষ্ট করতে। ওরা উষাকালে এসে আমাকে জাগাবে। আমি ঘুমচোখে ওদের অনুসরণ করব। ‘উফ’ না বলেই আমি হয়ত মরে যাব। আমি তা করতে চাইব না। আমি পশুর মতো মরতে চাই না, আমি বুঝতে চাই। পরে আমার ভয় হল, হয়ত দুঃস্বপ্ন দেখব। আমি উঠলাম, এদিক-ওদিক পদচারণা করলাম। আমার ভাবনায় পবিবর্তন আনার জন্য আমি আমার অতীত জীবনের কথা ভাবতে লাগলাম। এসোমেলো একগুচ্ছ স্মৃতি ভেসে এল, যার মধ্যে কিছু ভালো কিছু মন্দ—অন্তত যে যেমন আসতে চেয়েছে, সেই ভাবেই আমি তাদের স্মৃতিপথে এনেছি। সেগুলো কিছু মুখচ্ছবি, কিছু ঘটনা। আমার একটা বাচ্চা গরুর মুখ মনে পড়ল, বিশেষ উৎসবের সময় যার শিং ভাঙা হয়েছিল। আমার কাকাদের মধ্যে একজনের মুখ মনে পড়ল, আর মনে পড়ল রান্না গ্রির মুখ। অতীত ঘটনার কথাও মনে পড়ল। ১৯২৬ সালে তিনমাস আমি বেকার ছিলাম। খিদেয় আমার মরার উপক্রম হয়েছিল। আমাব মনে পড়ল গ্রেনাদে আমি একরাতি বেঞ্চ শুষে কাটিয়েছি। তিনদিন আমি তখন খাইনি। আমি উত্তেজিত হয়েছিলাম কিন্তু ভেঙে পড়তে চাইনি। আমাব হাসি পেয়েছিল—কী প্রত্যাশায় আমি ছুটেছিলাম সৌভাগ্যব পেছনে, অনুসরণ করেছিলাম নারীকে, খুঁজেছিলাম স্বাধীনতা। কিন্তু কী করাব জন্য? আমি স্পেনকে মুক্ত করতে চেয়েছিলাম। আমি পী ই মরগালের প্রশংসা করেছিলাম। আনাকিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ছিলাম। জনতার সমাবেশে বক্তৃতা করেছিলাম। সমস্তই গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেছিলাম, যেন আমি অমর হয়েছি।

এই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছে আমার সমস্ত জীবনটাকে যেন আমি আমার সামনে প্রত্যক্ষ কবছি। আমি ভাবলাম, এটা একটা পবিত্র মিথ্যা। এ জীবন তো মূল্যহীন, কারণ এ শেষ হয়ে গেছে। আমি নিজেকেই প্রশ্ন করলাম, কেমন করে আমি বেড়াতে, মেয়েদের নিয়ে আমোদ-আহ্লাস করতে পেরেছিলাম? আমার কড়ে আঙুলটাও আমি নাড়াতে পারতাম না যদি আমি কোনোভাবে জানতাম যে এইভাবে আমার মৃত্যু হতে চলেছে। যেন বতাবন্দী হয়ে অবরুদ্ধ অবস্থায় আমার জীবন আমার সামনে পড়ে রয়েছে, আর সম্ভবত এই জীবনের যা কিছু সবই অসম্পূর্ণ থেকে গেছে।

এক মুহূর্ত আমি এ জীবনকে বিচার করতে চেষ্টা করলাম। আমি নিজেকে বলতে চাইলাম, এ জীবন বড় সুন্দর। কিন্তু জীবন সম্বন্ধে মস্তব্য করা আমার সম্ভব ছিল না। এ তো একটা খসড়া মাত্র, একটা আউট লাইন। অনন্তের দিকে লক্ষ্য রেখে আমি আমার জীবন অতিবাহিত করেছি। আমি কিছুই বুঝিনি, আমি কোনোকিছুর জন্যই আক্ষেপ করিনি। অবশ্য অনেক কিছুই ছিল যার জন্য আমি আক্ষেপ করতে পারতাম। যেমন, একটা বিশেষ পানীয়ের স্বাদ অথবা গ্রীষ্মকালে কাডিকস্-এর ছোট খাঁড়ির কাছে আমি যে নান করেছিলাম। কিন্তু মৃত্যুর অন্তিম্বাতে এল মোহমুক্তি।

বেলজিয়ানের মাথায় একটা ভালো বুদ্ধি এল। ও হঠাৎ বলল, “মিলিটারি শাসনকর্তাদের সম্মতি সাপেক্ষে আমি তোমাদের কোনো চিঠি বা কোনো স্মারক চিহ্ন তোমাদের ভালবাসার পাত্রপাত্রীদের কাছে পৌঁছে দিতে পারি....।”

টম বিরক্তি প্রকাশ করে বলল, “আমার তেমন কেউ নেই।”

আমি কোনো উত্তর দিলাম না। টম একটু অপেক্ষা করল, তারপর ওৎসুক্যের সঙ্গে আমার দিকে তাকাল। বলল, “কঁশার কাছে তুমি কিছু

বলে পাঠালে না কেন?”

“না।” আমি বললাম।

বন্ধুত্বের এই অন্তরঙ্গতা আমার ভালো লাগেনি, ওটা আমার দোষ। গত রাতে আমি কঁশার কথা বলেছি; আমার চূপচাপ থাকাই উচিত ছিল। এক বছর আমি তার সঙ্গে কাটিয়েছি। গত সন্ধ্যায় পাঁচ মিনিট ওকে দেখতে পাওয়ার জন্য আমি আমার হাতটা কুড়ুলের আঘাতে কেটে ফেলতে পারতাম। এই জন্যেই গতকাল ওকে বলেছিলাম যে, আশ্রয় চেয়েও আমার এই আকাঙ্ক্ষা বলবতী। এখন ওকে আবার দেখতে আমার আর কোনো ইচ্ছা নেই, ওকে বলারও আমার কিছু নেই। এমনকি আমার দু’বাহু দিয়ে ওকে আলিঙ্গনেরও ইচ্ছা নেই, আমার এই ধূসরায়িত ঘর্মাক্ত দেহটাকে নিয়েই আমি ভয় পাচ্ছি। ওর দেহটাও যে আমাকে ভয়ানক করে না সে বিষয়েও আমি নিশ্চিত নই। আমার মৃত্যুর কথা যখন কঁশা জানবে তখন সে কাঁদবে। মাসের পর মাস ওর বাঁচার কোনো ইচ্ছাই থাকবে না। সে যাই হোক, আমি তো মরতে চলেছি। ওর নরম সুন্দর চোখদুটো আমার মনে পড়ল। ও যখন আমার দিকে তাকাত তখন একটা কিছু যেন ওর কাছ থেকে আমার কাছে আসত। কিন্তু আমি ভাবছি সে সব তো শেষ হয়ে গেছে। এই মুহূর্তে ও যদি আমাকে দেখত তাহলে ওর দৃষ্টি ওব চোখের মধ্যেই স্থিতি হয়ে থাকত, আমার দিকে আর আসত না। আমি ছিলাম নিঃসঙ্গ।

টমও নিঃসঙ্গ, কিন্তু ওর নিঃসঙ্গতার ধরন আমার মতো নয়। ও বেঞ্চের দু’দিকে পা দিয়ে বসে স্নিগ্ধ হাস্যে বেঞ্চের দিকে তাকাতে শুরু করল। ও যেন অবাক হয়ে গেছে। ও হাতটা এগিয়ে দিয়ে সাবধানে কাঠটা ধরল। যেন ওর ভয় হচ্ছে যে কিছু ভেঙে ফেলবে। একটু পরেই ও সজোরে হাতটা সরিয়ে নিল আর কাঁপতে লাগল। আমি যদি টম হতাম তাহলে বেঞ্চটা ছুঁয়ে আমোদ পেতাম না। ওটা ছিল আইরিশ কমেডি। কিন্তু আমি দেখলাম যে ওই ব্যাপারগুলোতে কিছু মজার জিনিস আছে। ওগুলো বেশ মুছে গেছে, সাধারণত যা হয় তার চেয়ে ওগুলো কম ঘন সম্বন্ধ। ঐ বেঞ্চ, ওই ল্যাম্প, ওই জমা ধুলোর দিকে তাকানোই আমার যথেষ্ট ছিল, যাতে করে আমি অনুভব করতে পারতাম যে আমি মরতে চলেছি।

স্বভাবতই আমি স্পষ্ট ভাবে আমার মৃত্যুর কথা ভাবতে পারিনি, কিন্তু সর্বত্রই আমি তা প্রত্যক্ষ করেছি—প্রত্যক্ষ করেছি যেভাবে ঐ সব জিনিস বেশ ভেবেচিন্তে আমার থেকে দূরে সরে গেছে, অস্পষ্ট হয়ে গেছে, যেমন ভাবে লোকে মৃত্যুপথযাত্রীর মাথার ধাবে বসে ফিস্‌ফিস্‌ করে কথা বলে। সে তারই মৃত্যু, যা টম এইমাত্র বেঞ্চ ছুঁয়েছে।

আমি যে অবস্থায় ছিলাম, তখন যদি কেউ এসে আমাকে বলত যে আমি শ্রান্তভাবে ঘরে ফিরে যেতে পারি বা কেউ আমার জীবন বাঁচিয়েছে তাহলে তা আমার কাছে অর্থহীন বলে মনে হত। কয়েকটা ঘটনা কি কয়েক বছরের প্রতীক্ষা তো একই মনে হয় যখন মানুষ শাশ্বত হওয়ার মোহ থেকে মুক্ত হয়। একভাবে বলতে গেলে কিছুই আমার মনকে আকর্ষণ করেনি, আমি খুব শান্ত ছিলাম। কিন্তু সেই শান্ততা ছিল ভয়ানক, কারণ আমার দেহ। আমার দেহ, আমি দেহের চোখ দিয়ে দেখেছি, এই দেহের কান দিয়েও শুনেছি, তবুও সে আমি ছিলাম না। দেহটাই শুধু ঘর্মাক্ত হয়েছে, কঁপেছে; আমি সেটাকে আর চিনতে পারিনি। আমি সেটাকে ছুঁতে, সেটাকে দেখতে বাধ্য হয়েছিলাম, কারণ ওর গতি কী হল তা জানতে ইচ্ছা হয়েছিল—যেন সেটা অন্যের দেহ। থেকে থেকে আমি এই দেহটাকে অনুভব করেছি।

অনুভব করেছি তাব খসে পড়া, তার ধ্বংস, যেমন করে লোকে উড়োজাহাজের মধ্যে বসে অনুভব করে তার মুখ খুঁড়ে পড়া অথবা আমি অনুভব করেছিলাম আমার বকের স্পন্দন। কিন্তু তাতে আমি আশ্বস্ত হইনি। আমার দেহ থেকে যা উৎসৃত হয়েছিল তার মধ্যে সন্দেহজনক বিন্দু কিছু ছিল। অনেকক্ষণ ঐ দেহটা নীরব নির্বাক ছিল; আমি অন্তরে একটা গুরুভার অনুভব করছিলাম, অনুভব করছিলাম আমার বিপরীতে রয়েছে কোনো অস্বচ্ছ উপস্থিতি। আমার মনে হল আমি যেন বৃহদাকাব কোনো কীটের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছি। পরক্ষণে আমি প্যান্টটা পরীক্ষা করে দেখলাম। বুঝলাম ওটা ভিজে। জানি না ওটা ঘামে ভিজেছে না প্রস্রাবে। সাবধানতার কারণে আমি কাঠকয়লার ওপর প্রস্রাব কবলাম।

বেলজিয়ানটি ঘড়ি বার করে দেখে বলল, “সাড়ে তিনটে বেজেছে।”

যাঃ চলে। তাড়াতাড়ি কবা দরকার ছিল। টম লাফিয়ে উঠল। সময় যে বয়ে যাচ্ছে তা আমরা বুঝতেই পারিনি। রাত্রিটা যেন অবয়বহীন অন্ধকার একটা পিশুর মতো আমাদের ঘিরে ছিল। রাত্রি যে আরম্ভ হয়েছে তা আমি আর মনেই করতে পারিনি।

বাচ্চা জুয়া চ্যাচাতে লাগল। হাতদুটো বেকিয়ে কাতরাতে লাগল,— “আমি মরতে চাই না।”

হাতদুটো ওপরে তুলে ও কুঠুরিওর একদিক থেকে ওদিকে দৌড়োতে লাগল; তারপর খড়ের মাদুরের ওপর পড়ে ফোঁপাতে লাগল। টম বিষম চোখে ওকে দেখতে লাগল, কিন্তু ওকে সাধুনা দেবার কোনো ইচ্ছাই ওর হল না। ঘটনাটা তেমন বেদনাদায়ক ছিল না, ও শুধু আমাদের চেয়ে বেশি গোলমাল করছিল। ও কম আহত হয়েছিল। ও যেন একজন রোগী, যে জ্বর দিয়ে তার রোগকে প্রতিহত করে। ওর যখন আব জ্বর এল না তখন ওর অবস্থাটা আরো গুরুতব হল। ও কাঁদতে লাগল। আমি বেশ দেখলাম যে ও নিজের প্রতি দয়াদ্র হয়েছিল। ও আর মৃত্যুর কথা ভাবছিল না। এক মুহূর্ত, শুধু এক মুহূর্তের জন্য আমার কাঁদতে ইচ্ছা হল, নিজের প্রতি দয়াদ্র হয়ে কাঁদতে ইচ্ছা হল। কিন্তু যা হল সেটা তার বিপরীত : বাচ্চাটার দিকে আমি এক বলক তাকলাম। ওব শীর্ণ কাঁধ দুটো আমি রক্তাক্ত দেখলাম; আমার নিজেকে অমানুষ বলে মনে হল। আমি দয়াদ্র হতে পারিনি, না অপরের প্রতি, না নিজের প্রতি। আমি মনে মনে বললাম, “আমি ঠিকমতো মরতে চাই।”

টম উঠে গোল ঘুলঘুলিটার তলায় দাঁড়াল, দিনের আলো ফুটেছে কিনা আন্দাজ করতে লাগল। আমি একপাশে, আমি ঠিকমত মরতে চেয়েছি। আমি শুধু ঐ কথাই ভাবছিলাম। কিন্তু ডাক্তারটা যখন থেকে সময়টা জানিয়ে দিয়েছে তখন থেকেই আমার মনে হয়েছে সময় বয়ে যাচ্ছে, বিন্দু বিন্দু করে প্রবাহিত হচ্ছে।

তখনও রাত্রি ছিল যখন আমি টমের গলা শুনলাম।

“তুমি ওদের চলাফেরা শুনে পাচ্ছ?”

—“হ্যাঁ।”

চব্বরের মধ্যে ওরা চলাফেরা করছে। “ওরা কি ঠাণ্ডাবার জন্য এসেছে? সম্ভবত ওরা রাতে গুলি করতে পারবে না।”

একটু পরে আমরা আর কিছু শুনলাম না। আমি টমকে বললাম, “এই সকাল হল।”

হাই তুলতে তুলতে পেরো উঠল। ল্যাম্পটা ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিল। ওর সঙ্গীকে বলল, “ঠাণ্ডায় কুঁকড়ে গেছি।”

কুঠুরিটা সম্পূর্ণ ধূসর বিবর্ণ হয়ে গেছে। দূর থেকে আসা বন্দুকের আওয়াজ আমরা পেলাম।

টমকে বললাম, “এই শুরু হল। ওরা সম্ভবত পেছনের উঠানে যা করার করবে।”

টম ডাক্তারকে একটা সিগারেট দিতে বলল।

আমি কিন্তু তা চাইনি; আমার না সিগারেট না মদ, কিছুই দরকার হয়নি। এই সময়টুকুর পরে ওরা আর গুলি করা থামায়নি।

টম বলল, “তুমি কিছু বুঝছ?”

ও আরো কিছু বলতে চেয়েছিল, কিন্তু চূপ করে গেল। ও দরজার দিকে তাকিয়ে রইল। দরজা খুলে গেল। একজন লেফটেন্যান্ট চারজন সৈন্যকে নিয়ে ঘরে ঢুকল। টম সিগারেটটা ফেলে দিল।

জুয়াঁ নড়ল না। দু’জন সৈন্য ওকে বগলদাবা করে ধরল, ওকে পায়ের ওপর দাঁড় করিয়ে দিল। ওকে যেই ওরা ছেড়ে দিল ও আবার পড়ে গেল।

সৈন্যরা একটু ইতস্তত করল।

“ওই প্রথম ব্যক্তি নয় যে অসুস্থ বোধ করছে।” লেফটেন্যান্ট বলল, “ওকে তোমাদের টেনে নিয়ে যেতে হবে। তারপর ওখানে গিয়ে ব্যবস্থা করা হবে।”

এরপর সে টমের দিকে তাকাল। “চলে এসো।”

দু’জন সৈন্যের মাঝখানে টম ঘর থেকে বেরোল। অন্য দু’জন সৈন্য তাদের অনুসরণ করল। ওরা বাচ্চাটাকে দুই বগলে ধরে হাঁটুর টোকা দিতে দিতে নিয়ে চলল। ও অজ্ঞান হয়ে যায়নি। ওর বড় বড় চোখ দুটো খোলা ছিল আর দু’গাল দিয়ে চোখের জল ঝরছিল। আমি যখন বেরোতে চাইলাম লেফটেন্যান্ট আমাকে থামাল,—“আপনিই তো ইবীটা?”

“হ্যাঁ।”

“আপনি এখানে অপেক্ষা করুন। এক্ষুনি একজন আপনার খোঁজ করবে।”

ওরা বেরিয়ে গেল। ঐ বেলজিয়ান ও দু’জন কাররক্ষীও বেরিয়ে গেল। আমি একলাই রইলাম। আমি বুঝতে পারলাম না আমার কী হবে। আমি বরং চাইলাম ওরা সঙ্গে সঙ্গে আমাকে শেষ করে দিক।

আমি প্রায় নিয়মিত অভিবাদনের আওয়াজ পেতে লাগলাম, আর প্রতিটি অভিবাদনের সময় আমি কঁপে কঁপে উঠছিলাম। আমার ইচ্ছা হল চিৎকার করি, মাথার চুল ছিড়ি। কিন্তু আমি দাঁতে দাঁত চেপে আমার দু’হাত পকেটে ঢুকিয়ে দিলাম। আমি চেয়েছিলাম স্বাভাবিক অবস্থায় থাকতে।

একঘণ্টা পরে একজন এসে আমার খোঁজ করল। আমাকে দোতলায় একটা ছোট ঘরে নিয়ে গেল। চুরুটের গন্ধ আসছিল। দু’জন অফিসার চেয়ারে বসে ধূমপান করছিল। তাদের হাঁটুর ওপর কিছু কাগজপত্র ছড়ানো ছিল।

“তোমার নাম ইবীটা?”

“হ্যাঁ।”

“রাম গ্রি কোথায়?”

“আমি জানি না।”

যে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছিল তাকে দেখতে বেঁটে ও মোটাসোটা। চশমার পেছনে ওর চোখদুটো কঠিন। ও আমাকে বলল, “এগিয়ে এসো আমার কাছে।” আমি এগিয়ে গেলাম। ও উঠে দাঁড়িয়ে আমার হাতটা ধরল

আর এমনভাবে আমার দিকে তাকাল, যেন আমাকে মাটিতে কবর দিতে চায়। আমার দুই বাহুতে খুব জোরে চিম্টি কাটল। আমাকে কষ্ট দেবার জন্য ও ওরকম করেনি; ওটা ছিল ওর খেলা। ও চেয়েছিল আমাকে দমিয়ে দিতে। ও মনে করেছিল ওর দুর্গন্ধময় মুখের স্বাস আমার সমস্ত মুখে ছড়িয়ে দেওয়াও প্রয়োজন। এক মুহূর্ত ওই অবস্থাতেই আমরা ছিলাম। এতে আমার বরং হাসতে ইচ্ছা হচ্ছিল। মৃত্যুপৃথিবী একজনকে দমাবার জন্য এরকম আরো কিছু করা প্রয়োজন। কিন্তু ওটা ঠিকমতো খটল না। ও আমাকে খুব জোরে ঠেলে দিয়ে আবার বসে পড়ল।

ও বলল, “দাঁড়িপাল্লার একদিকে তোমার জীবন আর অন্যদিকে ওর জীবন। তোমার জীবন বেঁচে যাবে, যদি তুমি বলো ও কোথায় আছে।”

ঘোড়ার চাবুক হাতে চামড়ার জুতো পরে ওই যারা বসে রয়েছে ওরাও চলেছে মরতে। অবশ্য আমার থেকে একটু পরে, তবে খুব পরে নয়। ওদের কাগজপত্রের মধ্যে ওরা নামগুলো খুঁজতে লাগল। ওরা অন্য লোকদের পেছনে ছুটল তাদের বন্দী করতে অথবা তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে। স্পেনের ভবিষ্যৎ ও অন্য বিষয়ে ওদের কিছু মতামত ছিল। ওদের ছোটখাটো কাজগুলো আমার বেদনাদায়ক ও হাস্যকর মনে হয়েছিল। ওদের জায়গায় আমি কখনোই নিজেকে দাঁড় করাতে পারতাম না। মনে হয়েছিল, ওরা নির্বোধ।

ওই ছোটখাটো মোটাসোটা লোকটা কেবলই আমাকে দেখছিল আর ঘোড়ার চামড়ার চাবুকটা বাতাসে চাবকাচ্ছিল। চলাফেরা দেখে মনে হচ্ছিল ও একটা জীবন্ত হিংস্র প্রাণী।

“কী হে, ওটা কী, বুঝেছ?”

আমি বললাম, “গ্রি কোথায় আমি জানি না। আমার বিশ্বাস ও মাদ্রিদে ছিল।”

অন্য অফিসারটি অলসভাবে তার বিবর্ণ হাতটা তুলল। সে অলসতাও ছিল প্রবল। আমি ওদের কাজ দেখছিলাম আর বিষয়ে হতবাক হচ্ছিলাম এই ভেবে যে মজা করার জন্য ওরা এই লোকগুলোকে পেয়েছে। অফিসার ধীরে ধীরে বলল, “ভাববার জন্য ওকে পনেরো মিনিট সময় দেওয়া হল। তার পরে ওকে জামাকাপড় রাখার ঘরে নিয়ে এসো। ও যদি না আসতে চায় তাহলে ওখানেই ওকে খতম করে দিও।”

আমি প্রতীক্ষায় রাতটা কাটিয়ে দিলাম। তারপর ওরা আরো একঘণ্টা ঐ কুঠুরিতে আমাকে অপেক্ষা করালো। ঐ সময়ের মধ্যে ওরা টম ও জুয়াঁকে গুলি করে মারল। গত সন্ধ্যায় ওরা হয়ত নিজেদের প্রস্তুত করে থাকবে। ওরা মনে করেছিল যে অনেকক্ষণ চাপের মধ্যে থাকলে এদের স্নায়ু ভেঙে পড়বে। ওরা আশা করেছিল আমারও তাই হবে।

চুল করেছিল। পোশাক ছাড়ার ঘরে একটা টুলের ওপর আমি বসেছিলাম। আমার খুব দুর্বল বোধ হচ্ছিল। আমি ভাবতে লাগলাম। আমি জানতাম গ্রি কোথায় ছিল। এই শহর থেকে চার কিলোমিটার দূরে ওর খুঁড়তুতো ভায়েদের কাছে ও লুকিয়েছিল।

আমি জানতাম, ওদের অত্যাচার ছাড়া (যে কথা ওরা ভাবেনি) আমি ওর লুকোবার গোপন আস্তানার খবর দেব না। এ সবই ছিল বেশ নির্ধারিত, নিয়ন্ত্রিত। এতে আমার কোনো আগ্রহই ছিল না। গ্রিকে মুক্ত করার আগেই আমি চেয়েছিলাম আমার বিলুপ্তি। কিন্তু কেন? রাম গ্রিকে আমি তো আর ভালোবাসতাম না। উষাকালের একটু আগেই ওর প্রতি আমার ভালোবাসা মরে গিয়েছিল—সেই একই সময় কঁশার প্রতি আমার আকাঙ্ক্ষা নিঃশেষিত

হয়েছিল। নিঃসন্দেহে সবসময় আমি তার মূল্য বিচার কব্বছিলাম। কিন্তু তা করা কঠিন ছিল। শুধু এই জন্যই আমি কিন্তু ওর জায়গায় নিজের মৃত্যু বরণ করিনি; আমাব চেয়ে ওর জীবন বেশি মূল্যবান ছিল না। কোনো জীবনেরই মূল্য ছিল না। একটা লোককে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড় করিয়ে তার মাথায় গুলি মারা, যাতে সে এতেই শেষ হয়ে যায়—তা সে আমিই হই, গ্রি হোক বা আর কেউ হোক। আমি জ্ঞানতাম, স্পেনের ব্যাপারে আমার চেয়ে ওব কার্যকারিতা বেশি কিন্তু আমি স্পেন থেকে, নৈরাজ্য থেকে পালিয়েছি। আর কিছুই বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল না।

আমি ওখানে থেকে গিয়ে গ্রি-কে ধরিয়ে দিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচাতে পারতাম। আমি তা প্রত্যাখান করেছি। বরং আমার তা হাস্যকর মনে হয়েছিল। ওটা ছিল একরোখামি।

আমি ভাবলাম, একগুঁয়ে হওয়ার কী দরকার ছিল? একটা মজার আনন্দ আমাকে পেয়ে বসল।

ওরা আমাকে খুঁজতে এল; আমাকে নিয়ে গিয়ে দু'জন অফিসারের সামনে দাঁড় করালো। আমাদেব পাবেব তলা দিয়ে একটা ইদুর ছুটে গেল। আমাব খুব মজা লাগল। একজন ফালনজিস্টেব দিকে আমি ফিরে তাকালাম। তাকে বললাম, “ঐ ইদুরটাকে দেখেছেন?”

সে কোনো উত্তর দিল না। সে গম্ভীর, আরো গম্ভীর হয়ে গেল। আমার ইচ্ছা হল খুব হাসি কিন্তু আমি সংযত হলাম। আমাব ভয় হল যদি একবার গুরু করে আর ধামতে না পারি! ঐ ফালনজিস্টের গৌফ ছিল। আমি তাকে আবাব বললাম, “তোমার ঐ গৌফের ঝাড়টা কেটে ফেলা উচিত।”

সে আলগাভাবে আমাব পায়ে টোকা দিল, আমি চুপ করে গেলাম। মোটাসোটা অফিসারটি বলল, “কী হে, ভেবে দেখেছ কি?”

“আমি উৎসুক হয়ে ওর দিকে তাকালাম; ওরা যেন দুর্লভ প্রজাতির কোনো কীটপতঙ্গ। আমি বললাম, “আমি জানি ও কোথায় আছে। ও কববখানায় লুকিয়ে আছে। হয়ত কবরের গম্বুজের তলায় অথবা কবব খনকদেব কুঁড়েঘরে।”

ওদেব নিয়ে মজা কবার জন্য আমি এ কথা বলেছিলাম। আমি দেখতে চেয়েছিলাম ওরা উঠে দাঁড়িয়েছে, বেস্ট বেঁধেছে পেটে, আর বেশ ব্যস্ত হয়ে হকুম দিচ্ছে।

ওরা লাফিয়ে উঠল—“চলো যাই। মোল, লেফটেনাণ্ট টোপাজের কাছে গিয়ে বলো পনেরোজন লোক দিতে।”

বটে মোটাসোটা লোকটি বলল, “এই, তুমি যদি সত্যি কথা বলো তাহলে আমি এক কথার মানুষ। কিন্তু তুমি যদি আমাদের নিয়ে মজা করো তাহলে জেমাকে তার জন্যে যথেষ্ট মূল্য দিতে হবে।”

ওরা হট্টগোল করতে করতে বেরিয়ে গেল আর আমি ঐ ফালনজিস্টদের ভক্তাবধানে শাস্তভাবে অপেক্ষা করতে লাগলাম। থেকে থেকে আমি মৃদু হাসছিলাম। ভাবছিলাম ওরা কেমন খোঁজাখুঁজি কববে। আমি মানশচক্ষে দেখলাম ওরা কবরের পাথরগুলো তুলছে, কবরের গম্বুজের দরজাগুলো একেব পর এক খুলছে। অবস্থাটা আমার মনে প্রতিফলিত করলাম, যেন আমি অন্য একজন। ঐ বন্দী নিজেকে হিরো বানাতে ব্যস্ত, ঐ গৌফওয়ালা গম্ভীর ফালনজিস্টরা ঐ উর্দূপবা লোকগুলো কবরগুলোর মধ্যে নোড়োদোড়ি করছে—এ কথা ভাবতে ভাবতে আমি হাসি চাপতে পারছিলাম না।

আধঘন্টা পরে ঐ ছোটখাটো মোটাসোটা লোকটা একলা ফিরে এল।

বুঝলাম ও এসেছে আমাকে গুলি কবে মারার হুকুম দিতে। অন্যেরা নিশ্চয়ই কববখানায় থেকে গেছে।

অফিসাবটি আমার দিকে তাকাল। ওকে একটুও বিভ্রান্ত দেখাল না। ও বলল, “অন্যদেব সঙ্গে একে বড় চতুবে নিয়ে যাও। মিলিটারি অপারেশনের পরে একটা নিয়মিত বিচাবালয় ওব ভাগ্য নির্ধারণ কববে।”

কথাগুলো আমি বুঝিনি বলেই আমার বিশ্বাস হল। আমি ওকে জিজ্ঞাসা কবলাম, “তাহলে ওরা আমাকে . . . ওরা আমাকে গুলি করে মারবে না?”

“যে কোনো কারণেই হোক, এখন নয়, পরে। ওটা আব আমার ব্যাপাব নয়।”

আমি কিছুতেই কিছু বুঝতে পারছিলাম না। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, “কিন্তু কেন?”

কোনো উত্তর না দিয়ে সে কাঁধ ঝাঁকুনি দিল।

সৈন্যরা আমাকে নিয়ে গেল। বড় চতুবে প্রায় একশ বন্দী মহিলা, শিশু ও কয়েকজন বৃদ্ধও ছিল। মধ্যাধানের লনের চারধাবে আমি ঘুরতে লাগলাম। আমি বিভ্রান্ত। দুপুরবেলা ডাইনিং হলে নিয়ে গিয়ে ওবা আমাকে খাইয়ে আনল, দু'তিন জনলোক আমাকে ডাকাডাকি কবল। আমি তাদের চিনেছিলাম, কিন্তু কোনো সাড়া দিইনি। আমি যে কোথায় ছিলাম তাও বুঝতে পারিনি।

ওরা সন্ধ্যা নাগাদ দশ-বাবোজন নতুন বন্দীকে চতুবে আনল। আমি রুটিওয়ালা গারসিয়াকে চিনতে পাবলাম। ও আমাকে বলল, “তুমি বড় ভাগ্যবান। আমি তোমাকে জীবন্ত দেখব ভাবিনি।”

আমি বললাম, “ওরা আমাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে আর তাবপব ওদের মত বদলেছে। কেন, তা জানি না।”

গারসিয়া বলল, “ওরা আমাকে দুটোব সময় ধবেছে।”

“কিন্তু কেন?”

গারসিয়া তো বাজ্ঞনীতি কবে না।

ও বলল, “আমি জানি না। যাদের সঙ্গে ওদের মতেব মিল হয় না, তাদেরই ওরা ধবে।”

ও গলার স্বব নিচু করল, “ওবা গ্রি-কে ধবেছে।”

আমি কাঁপতে লাগলাম,—“কখন?”

“আজ সকালে। ও খুব বোকামি করেছে। ওর খুড়তুতো ভাইকে মঙ্গলবাব ও ছেড়ে এসেছে, কারণ ওরা খবর পেয়ে গেছে। ওকে লুকিয়ে রাখাব লোকের অভাব ছিল না। কিন্তু ও কাকব কাছে ঝণী থাকতে চায়নি। ও বলেছে, আমি ইব্বীটাব কাছে লুকিয়ে থাকতাম, কিন্তু যেহেতু ও ধরা পড়েছে তাই আমি কবরখানায় লুকোব।

“কবরখানায়?”

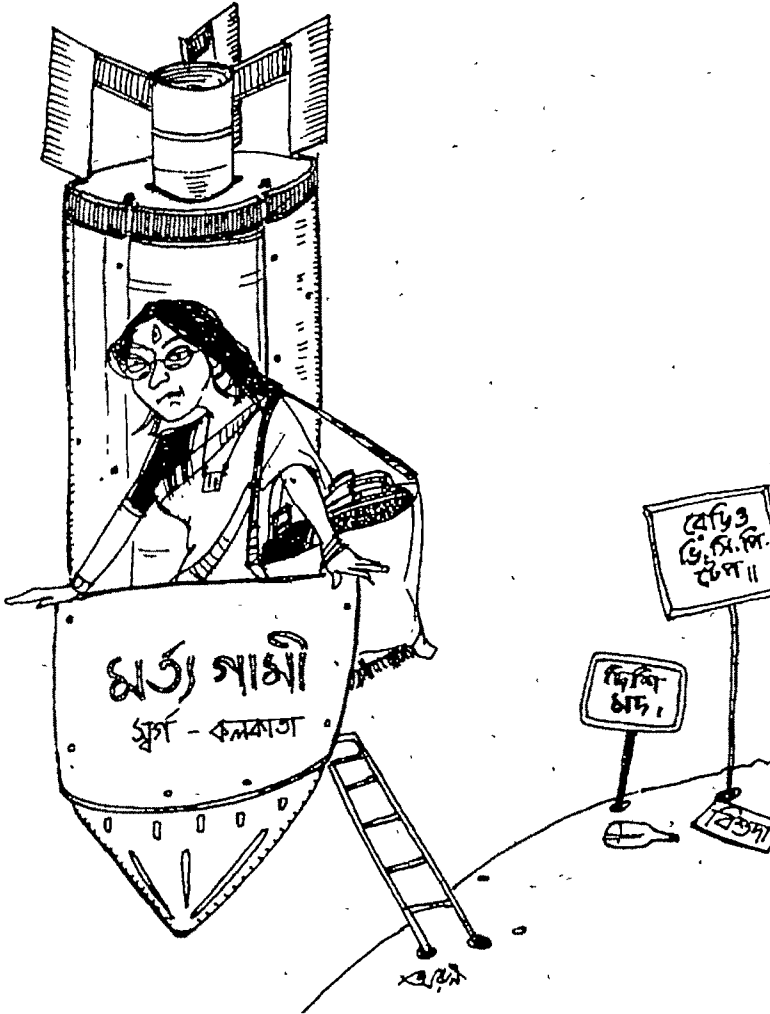
“হ্যাঁ। কিন্তু কী বোকামি! স্বভাবতই আজ সকালে ওরা ওখানে খোঁজাখুঁজি কববেছে। এটা তো হবেই। ওরা কববখনকদেব, বুপড়ির মধ্যে ওকে খুঁজে পেয়েছে। ও তাদের দিকে গুলি ছুঁড়েছে, আব তারাও ওকে নামিয়ে দিয়েছে।”

“কবরখানা?”

আমার চোখে সবকিছু ঘুরতে লাগল। আমি দেখলাম আমি মাটিতে বসে আছি। আমি এত জোবে হাসতে লাগলাম যে আমার চোখে জল এসে গেল।

কলকেতা দর্শন

কৌশিক রায়



[নাটকের যবনিকা উন্মোচন বরফে ঢাকা কৈলাস পর্বত। একদিকে একটু জায়গা পরিষ্কার করে একটা ছোট দোকান বানানো হয়েছে। দোকানের সাইনবোর্ডে লাল জমিতে সাদা হরফে বড় বড় করে লেখা—‘শ্রীল শ্রীযুক্ত ভাগোবান, দেবাদিদেব মহাদেবের নাইসেন্স প্রাপ্ত এক লম্বরেব দিশি মদ, রেয়াজি গাঁজা আর ঠাণ্ডা বিয়ারের দোকান। অংশীদার—দেবী মা দুর্গা মোহামায়া, সাহাজ্জকারী—সিরিমান নন্দী আর ভিরিসি।’ বোঝাই যাচ্ছে কোনো গ্রাইমারি স্কুল

ফেল-করা, আধা-শিক্ষিত দেবতার হাতের কাজ। সাইনবোর্ডের এক কোনায় অবশ্য খুদে খুদে অক্ষরে লেখা আছে—‘সরস্বতীব নাথার ওয়ান পাবলিসিটি’। দোকানের সামনে কয়েকজন ছোট আর মেজো দেবতাকে দেখা যাচ্ছে মদ কেনার লাইনে দাঁড়িয়ে গুঁতোগুঁতি করতে এবং একে অপরের বাপ-মা তুলে গাল দিতে। মহাদেবের প্রধান ভূত-চালা বীরভদ্রকে দেখা যাচ্ছে দোকানের সামনে বরফের ওপর খালি গায়েই পড়ে থাকতে। পাশে দুটো ভদ্রকা আর একটা

স্কচ হইন্ডির খালি বোতল গড়াগড়ি যাচ্ছে। মদের দোকানের পাশে আরো একটা ছোট দোকান। সাইনবোর্ডে লেখা ‘রেডিও, ভি.সি.পি, টেপ, টু-ইন ওয়ান, ইলেকট্রনিক্সের যাবতীয় জিনিসপত্র সারানো হয়। প্রোপাইটার—বিশ্বকর্মা।’ দোকানের মধ্যে বিশ্বকর্মাকে দেখা যাচ্ছে, এই শীতের মধ্যেও ঘেমে নেয়ে একটা স্টিরিও অ্যামপ্লিফায়ারের বক্সে নাটব-টুলাগাতে। পরনে একটা সবুজ, হাতকাটা গেঞ্জি, পিছনে লেখা—‘মেক অব ব্রেক’, সামনে লেখা ‘বিশ্বদা’। বিশ্বকর্মা বসে গা-হাত-পায়ে মোবিল মাখা। চোখ দুটোও জবাফুলের মতো লাল।

স্পটলাইটের আলো এবার সরে ডানদিকে এলো দেখা গেল লেখা আছে—‘দেবকৈলাশ কেন্দ্রীয় স্বর্গদপ্তরের বাস টার্মিনাস এবং স্বর্গ-মর্ত্য-নরক শাটল মহাকাশ ফেরী (স্পেশ-ট্যাক্সি) বুধ। পরিবহন মন্ত্রী নারদ দ্বারা সংশোধিত নতুন ভাড়ার হার : (১) স্বর্গ হইতে নরক—১৫০ টাকা বা ১০ পাউণ্ড। (২) স্বর্গ হইতে লণ্ডন, বেইজিং কলকাতা ও ওয়াশিংটন ডি. সি. (ভায়া নরকের ১৪ নং আত্মা রাখার গোডাউন)—৪৫০ টাকা বা ৩০ পাউণ্ড (যাত্রীদের সম্ভাব্য মৃত্যুর ক্ষেত্রে খাটিয়া ও ফুল-বেলপাতার খরচ সহ)। (৩) স্বর্গ হইতে কাবুল—২০০ টাকা বা ২০ পাউণ্ড (দেবতা যাত্রীরা নিজেদেরকে জঙ্গীদের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য এ. কে. ৪৭ রাইফেল এবং ১০টি করিয়া চিনাপটকা সঙ্গে লইতে পারেন)। (৪) স্বর্গ হইতে কালীঘাট এথেন্স রোম রিও ডি জেনেইরো—প্যারিস—ভিয়েনা—ঢাকা—ইসলামাবাদ প্যাক্স ট্রান্স (ব্রেকফাস্ট ও লাঞ্চ সহ)। ৩ বৎসরের নিচে দেবশিশু, অসুরশিশু, ১৮ থেকে ২৫ বৎসরের কুমারী, সুন্দরী অঙ্গরী ও কিম্বীদের কোনো ভাড়া লাগিবে না—৩০০০ টাকা বা ২৫০ পাউণ্ড। (৫) বিশেষ বুলেট প্রুফ মহাকাশযানে চড়ে নরকে আকর্ষণীয় সাইট সিয়িং—গরম

তেলে ভাজা, করাচকলে কেটে টুকরো করা, ফ্রিজের ঢুকানো এবং পাথরের ভলায় ফেলে চ্যাপটানো আত্মাদের নিজচক্ষে প্রত্যক্ষ করা (হৃদরোগ বা বুক ধড়ফড়ানির ওষুধ বিনামূল্যে)—১৫০ টাকা ঘণ্টা প্রতি।

বাস ও মহাকাশযান টার্মিনালে দেখা গেল মর্ত্যগামী একটি স্পেস শাটল বা মহাকাশযানের সামনে লালপেড়ে তাঁতের শাড়ি পরে উদ্বিগ্নমুখে একজন স্ত্রী, মধ্যবয়স্কা মহিলা এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করছেন। ভদ্রমহিলার গায়ের বং বেশ ফর্সা বলতেই হবে। চোখে বাহারি গোল্ডেন ফ্রেমের চশমা। কাঁধে একটা পেটমোটা শাড়িনিকেতনি বোলা। বোলার মধ্য থেকে কতকগুলো পেটমোটা পুজো সংখ্যা উঁকি মারছে। একটু দূরে তিনটে বড় ভি আই পি স্ক্রিনের আর একটা গোটানো বেডিং। একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারা গেল ভদ্রমহিলা মহাদেবের গিমে দেবী দুর্গা দুর্গাভিনাশিনী ছাড়া আর কেউ নন। অবশ্য দেবতাদের বরে পাওয়া লম্বা চুল অনেকটা ছোট্টে ফেলেছেন। ১০ হাতের বদলে দুর্গার কিন্তু এখন দুটো হাত। হাই হিল জুতো পরে হাঁটতে দেবীর যে একটু কষ্টই হচ্ছে বুঝতে পারা যাচ্ছে। লিপস্টিক আর নখপালিশ লাগিয়েও দেবী দুর্গা এখনো সম্ভবত আধুনিকা হতে পাবেননি। কেননা, ওপরের ঠোটে লিপস্টিকের প্রলেপ নিচের ঠোটের থেকে অনেক কম, দু'হাতের সবকটা আঙুলে ঠিকমতো নেলপালিশ লাগাতে ভুলে গেছেন তিনি। হাতের ঘড়ির দিকে একবার চোখ কুঁচকে তাকালেন মহামায়া।]

দুর্গা :—নাঃ, আর ব্যাটার নিয়ে পারা যায় না। এতবার পইপই করে হতচ্ছাড়াগুলোকে বলে দিলাম, ঠিক সন্ধ্যে ৭টা ২০ মিনিট সাড়ে ১৮ সেকেন্ডে কলকাতার দিকে আমাদের মহাকাশগাড়ি ছাড়বে। দু'দিন পবেই যষ্ঠী। এরপর আরো দেরি করলে মঙ্গল আর পৃথিবীর মাঝখানে অসুর ট্যাক্সিওয়ালাদের ভিড়ে জ্যামে পড়ে যাব। ব্যাটারি সব এমন তালকানা। এই ক'দিন আগেই দৈত্যগুরু গুণ্ডাচার্যের মহাকাশ মারুতি ইঞ্জিনের গাড়িতে এমন ধাক্কা মারলে যে গাড়ির সামনের বনেটটাই গেল খুলে। ড্রাইভার মাতলির গায়েও কালসিটে পড়ে গেল। অগত্যা ইঞ্জিনে নিশুস্ত অসুরের ড্রাগমান গ্যারাজে গাড়ি নিয়ে যেতে হল। দেবতা দেখেই মণ্ডকা পেয়ে নিশুস্ত ছোকরা বনেট বদলাতে ডবল মঞ্জুরি নিয়ে নিলে।

(এই সময় হস্তদস্ত সীতাকে আসতে দেখা গেল। রামচন্দ্রের স্ত্রী অনেক কায়দা কবে একটা ভয়েল শাড়ি পরতে পেরেছেন। হাতে একটা ছোট বট্টা। বেশভূষাতে আধুনিকতার ছাপ সুস্পষ্ট।)

সীতা :—কি কাকিমা? এখানে এমন ভরসঙ্কেষ দাঁড়িয়ে কী বিভবিড় করছেন? শিবুকাকুকে তো দেখলাম বীরভদ্রের নেশা তাড়ানোব জন্য তার গায়ে বালতি বালতি জল ঢালছেন। নিজেও হাতে একটা পাইটের বোতল রেখে দিয়েছেন। কাকুর সঙ্গে আপনার কোনো গণ্ডগোল হাতাহাতি হয়নি তো?

দুর্গা :—দূর দূর, ও মুখপোড়া ঝাঁটাথেকো মিন্‌সে ঝগড়াঝাটির কিছু বোঝে নাকি? একপয়সা আয়ের তো মুরোদ নেই, বোজ্জ দিশি গিলে লটকে রয়েছে। আবার সকাল হতেই বাবুর ফরমায়েশ—বেগুনব ভর্তা করো, রুই মাছের খাল করো। মর্ত্যে ইঙ্কুলেব টিফিনে মায়েরা বাচ্চাগুলোকে কেঁচোর মতো কি একটা দেয় না, সেই চাউ নডুল্‌স্‌ করো। চিড়ে ভাজা করে দাও, তাড়ির সাথে চাটু করে খাব। হতভাগার চালা-ছুত-পেড়িগুলোও হয়েছে তেমনি। তোমায় আর পোড়া কপালের কথা কি বলব সীতা,

আজকাল কয়েকজন কাঁচা বয়েসের শাকচুমির আনাগোনা বেড়েছে, তাদের সঙ্গে তেনার আবার কী রসিয়ে রসিয়ে কথা! হুঁ, পরনের ট্যানা নাই, পিরিতের রোশনাই। কেন যে দেবতা হয়ে অমর হতে গেলাম! মবণও হয় না আমার! আবার দেখি মর্ত্যেব বুদ্ধ আইবুড়ো মেয়েগুলো এই ভোলাটাকেই পুজো করে, ওর মতন স্বামী পাবে বলে। এদিকে পাত্র চাই বিজ্ঞাপনে চাম সূচাকুরে, ব্যবসায়ী বা ইঞ্জিনিয়ার পাত্র। তার চেয়ে লিখতেই পারে—বেকাব, উড়নচণ্ডী, মাতাল সুপাত্র চাই। ধূর! যশ্বেসব ভড়ং!

সীতা :—আরে শিবকেই তো মেয়েরা স্বামী রূপে চাইবে, কাকিমা। শিবুকাকু কি গোড়ারমুখে বামচন্দ্রের মতো নাকি। অশোকবনে রাবণ কস্তোবার আমার সামনে এসে বুকুর ছাতি ফুলিয়ে বলল—আমায় বিয়ে করো। বিভীষণের বউ সরমাকে দিয়ে শ্যাম্পু লিপস্টিক বেনারসি তাঁত সিঁদ্ধ পাঠাল, লঙ্কার ফাইভস্টার হোটেল ডিনাব পার্টিতে কতবার নেমস্তন্ন জানাল। আমি তবুও রাবণকে একবারও কিস্‌ করিনি। ওম্মা। অযোধ্যায় যেই ফিরে এলাম, সেই বামবাটা প্রজাদের মুখের ঝাল খেয়ে আমায় বলে কিনা, তুমি নিশ্চয়ই বাবণের সঙ্গে নাহলে এখনো এত খুকি-খুকি আছ কী করে। আমাকে বনবাসে পাঠিয়ে দিলে। পেটে তখন আমাব লব-কুশ রয়েছে। রাখল গিয়ে বাম্বীকিবুড়োর আশ্রমে। ঋষি না ছাই! কারণে অকারণে সবসময়ে মা-মা বলে আমার গায়ে হাত বোলানো। তবে ব্যাপারটা কি জানো কাকি? আজকালকার ধান্দাবাজ মেয়েগুলোর কাছে শিবের মতো স্বামী না হলে হয়! ডাইনে বললে ডাইনে যাবে, বাঁয়ে বললে বাঁয়ে। জুতোর স্ট্যাপ সেলাই করিয়ে হাসিমুখে হাতে বুলিয়ে নিয়ে আসবে, শাড়ির ফল্‌স্‌ কেনার জন্যে সারা বাজার অফিস কামাই করে চষে বেড়াবে, বউয়েব নামে ১০০ খানা পাশবই আর ফ্রেডিট কার্ড বানাবে। বউয়ের হয়ে বাপকে 'শালা' আর মাকে 'ডাইনিবুড়ি' বলবে, বউকে মাইনেটা দিয়ে নিজে আণ্ডারপ্যান্ট পরে ঘর ঝাঁট দেবে। এসব না হলে হয়!

দুর্গা :—যাক্‌গে। সে নাহয় হল। তোমাব রামকে তো সেদিন দেখলাম বাবণের চিরসতী স্ত্রী মন্দোদরীর সঙ্গে বেশ হেসে হেসে কথা বলছেন। তা বাপু পুরুষ মানুষের ওরকম একটু মেয়ে-বেঁধা স্বভাব থেকেই থাকে। স্বর্গের দেবতাগুলোকেই দেখ না—কোনটার চরিত্র নির্মল আছে বলা তো? মর্ত্যের মানুষ তো কোন ছার!

সীতা :—এখানে কী জন্যে দাঁড়িয়ে আছেন বললেন না কাকিমা? মহাদেবকাকুর সঙ্গে মর্ত্যে নাইটশো সিনেমা দেখার প্ল্যান আছে নাকি?

দুর্গা (নাক কুঁচকে) :—খ্যাত্তেরি। ও তো নিজেই একটা জলজ্যান্ত সিনেমা। প্রেম বিরহ পাগলামি বোকামি ন্যাকামি, কী নেই ওর জটার মধ্যে? একসঙ্গে সিনেমা দেখার বয়স আর আছে নাকি? এখানে দাঁড়িয়ে আছি, কলকাতায় যাবার জন্যে। স্বর্গেব আর নরকেব আত্মাদের জন্যে ব্যাঙ্ক ম্যানেজার কুবেবের একটা 'সুপার নাথার' লটারি করেছিল। সেই লটারিতে লাকি নাথার বেখেছে কয়েকটা আত্মার। তাবাই আমার সঙ্গে এবার পুজোর আগে কলকাতা ঘুরে আসবে। যষ্ঠী হলেই তো প্যাণ্ডেলে প্যাণ্ডেলে আমাকে গিয়ে ধড়াচুড়া পরে দাঁড়িয়ে দর্শন দিতে হবে, তখন তো আর টাইম হবে না।

সীতা :—তা, লটারিতে কারা কারা জিতল কাকিমা?

দুর্গা :—চাবজন। জোব চার্নক, লর্ড ক্লাইভ, রাজা রামমোহন রায়

আর নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা। কিন্তু দ্যাখো না, সময় নেই কোনোটারই। রামমোহন অবশ্য একটু আগে আমাকে মোবাইল ফোনে জানিয়েছে—
বৈকুণ্ঠ ধামে স্বর্গের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের হয়ে অঙ্গরীদের দর্শনের একটা পরীক্ষা নিচ্ছে, আসতে একটু দেরি হবে। কিন্তু বাকিরা সব গেল কোথায়?

সীতা :—(বটুয়া থেকে একটা ফ্লোডিং আয়না আর ফেস পাউডারের কৌটো নিয়ে মুখে পাউডার মাখতে মাখতে) যাবে আর কোথায়? আজকে সন্ধ্যায় কৈলাসের টাউন হলে উর্বশী আর রম্ভার ক্যাবারে শো আছে না? দেখুন গিয়ে, সেখানে হয়ত জমিয়ে বসেছে।

দুর্গা (চিন্তিত মুখে) :—নাগো! টাউন হলের আটখানা ফুরোসেন্ট আলো খারাপ হয়ে গিয়েছে। ওইজন্যই স্বর্ণ-নরক সংযুক্ত সাংস্কৃতিক সংস্থার সভাপতি কার্তিক আজকে শো-টা বাতিল করে দিয়েছে। সূর্য বলেছে ওর কাছে বাড়তি সোলার ব্যাটারি আছে। ওগুলো দিয়েই লাইটগুলো সারাতো হবে। সূর্য অবশ্য এর জন্য মজুরি নেবে না। কার্তিকের ক্লাশমেট ছিল তো। কার্তিকটা তো আবার হায়ার সেকেন্ডারিতে দু'বার গাডু মেয়ে ফিশের হিরো হওয়ার চেষ্টা করতে লাগল। সূর্যের অবশ্য মেরিট আছে। এক চাপে ইঞ্জিনিয়ারিংটা পাশ করে গেল। এই মহাকাশফেরীগুলোর নকশা তো ও-ই বানিয়েছে।

(এই সময়ে হৃদয় হয়ে রাজা রামমোহন রায়, জোব চার্নক, লর্ড ক্লাইভ আর নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা প্রবেশ করলেন। রামমোহনের মাথায় চিরাচরিত শামলা আর পরনে জোকা আছে ঠিকই, তবে বাঁহাতের চণ্ডা কজিতে শোভা পাচ্ছে একটি আনকোরা নতুন রোলস্ব গাড়ি আর পায়ে নাগরা জুতোর বদলে বর্ষা পরার জুতো। লর্ড ক্লাইভ তাঁর বাবরি করা পরচুলে কিছুটা হিট দিয়েছেন বোঝা যাচ্ছে। বুকখোলা, কালো চামড়ার জ্যাকেটের মধ্যে দিয়ে উকি মারছে সাদা টি-শার্ট। সেখানে লেখা—“যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই।” পায়ে হাঁটু অর্ধ ব্রীচেস-এর বদলে সবুজ জুগিং ও। ফ্রেন্চকাট ডাডিও রেখেছেন ক্লাইভ। চার্নকের মাথায় একটা স্পোর্টস ক্যাপ, উল্টোদিক করে বসানো, একটা লুঙ্গি দু'ভাঁজ করে পরেছেন তিনি। পরনে অবশ্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সেই চিরাচরিত ওভারকোটই আছে। তবে থেকে থেকে একটা বিড়িতে সুখটান দিচ্ছেন চার্নক। নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলাকে মনে হচ্ছে পোশাক-আশাকে একটু আধুনিক হওয়ার চেষ্টা করেছেন। মাথায় উকীষ নেই। চুলে নবাব স্পেশাল হাঁট দিয়েছেন—কলকাতার ছেলেরা যাকে বলে ‘রেকহ্যাম কাট’। মাথায় একটা লাল হেডব্যাণ্ড আটকানো। স্টোনওয়াশ জিনসের সঙ্গে তাঁর পরনে শোভা পাচ্ছে কালো রং-এর ডেনিম-এর ফুলশার্ট। পায়ে অবশ্য নাগরা জুতোজোড়া ঠিকই আছে। প্যান্টের হিপপকেট থেকে মোটা মানিব্যাগ বেরিয়ে আছে।)

দুর্গা :—যাক বাবা। এতক্ষণে বাবুদের সময় হল। টাইমের ঈশ নেই, আবার কলকাতা দেখার শখ আঠারো আনা। বাবা সিরাজ, তুমি তো দেখছি একেবারে টলিউডের তাপস পাল হয়ে আছ। ভুঁড়িটাও তো তাগড়াই হয়েছে। স্বর্গের মুসলিম লজিং-এ থেকে বেশ ভালোই রুমালি রুটি আর গোস্ব সঁটাচ্ছ দাদু আলিবর্দীর পয়সায়। ওকি। ক্লাইভের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রয়েছে কেন?

সিরাজ :—ওই হারামজাদাটাকে দেখতে কে চায় বলুন তো আশ্বি?

মীরজাফরের সঙ্গে গটআপ কেস করে পলাশিতে আমাকে হেরো ভূত করে দিল। এখন আবার জামা-তে নিকে রেখেছে—যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই। মীরজাফর দু'নম্বর না করলে ওর চোদ্দপুরুষের সাধি ছিল, আমার ফোর্সকে উশ্টে দেওয়ার। গোটা বাংলাদেশটাকে পকেট মেরে একদম ফর্সা করে দিলে ব্যাটা। ঠাঁ! যদি আর একবার পলাশির যুদ্ধের মতকা পেতাম, তাহলে ওর হাড়ে আমি দুকো গজিয়ে দিতাম।

ক্লাইভ :—আরে, তোমার মুরোদ ঢের বোঝা আছে। ওই মীরমদন আর মোহনলাল না থাকলে পলাশির আমবাগানেই তুমি একদম খান্নাস হয়ে যেতে। মদ খেয়ে আর বাঁজি নাচিয়েই বয়সকালটা বরবাদ করে দিলে। দেখছিলাম তো, পলাশিতে ভালোয়ার ধরতে গিয়েই হাঁপাচ্ছিলে। বুকের খাঁচায় দম নেই, আবার গাল পাড়ার গোসাই। দাদুর দেওয়া মসনদটা ছিল তো। ওইজন্য দিবি ধড়াচুড়ো পরে গ্যাট হয়ে বসতে পেরেছিলে। নিজের ক্ষমতায় রাজি করতে হলে মুরোদ বেরিয়ে যেত।

রামমোহন :—ওঃ ধামো ধামো! বাপু রে, যেন এক্স এক্স রেডিও-তে টক শো হচ্ছে।

চার্নক :—শুভযাত্রায় এসেছি। দুটোয় মিলে একেবারে নরক গুলজার করে দিলে গো। এরকম জানলে কোন শালা জলা-জঙ্গল সাফ করে কলকাতা বানাত? জমিদার বিদ্যাধরের কাছ থেকে নগদ কাশ দিয়ে গ্রাম তিনটে কিনলাম আমি আর এ দুটো মরল কামড়া-কামড়ি করে।

দুর্গা :—অর্ডার অর্ডার। মেছোপটি বানিয়ে তুলল সব একেবারে। ঝগড়া শুরু হলে আর থামতেই চায় না। যেন নতুন বৌদি-ননদের কৌদল শুরু হয়েছে। মহাকাশবানে সবাই উঠে পড়ো। এক্ষুনি টেক অফ করতে হবে। (সবাই মহাকাশবানে উঠে পড়ে)

রামমোহন :—আমাদের সঙ্গে গাইড বা পথ প্রদর্শক কেউ থাকবেন না ম্যাডাম? প্রায় একশ পাঁচাত্তর বছর পর কলকাতায় পা রাখছি। কোনদিকে হারিয়ে যাব তার নেই ঠিক, শুনছি নাকি আজকাল পথ ভুল করে রাস্তায় ঘুরে বেড়ালেই সো—জা লালবাজারে চালান করে দিচ্ছে।

দুর্গা :—হ্যাঁ গো। শনির আসার কথা ছিল গাইড হয়ে। কলকাতার গলিঘূর্ণি ও সব ভালো করেই চেনে। হেন কোনো স্ট্রিট লেন বাইলেন নেই যেখানে শনির একটাও মন্দির নেই। কিন্তু কী করব বলো। গত পরশ থেকে ওর আবার জ্বর হয়েছে। ইনফ্লুয়েঞ্জা। গত শনিবার পুজোর এত সিমি খেয়েছে আজকালকার সিমি তো জানোই, ডিপ ফ্রিজে জমানো, দশ দিনের বাসি কলা দিয়ে তৈরি হয়। অম্বিনীকুমাররা চারটে ক্যালপল খাইয়ে গেছে। তবুও জ্বর কমার নাম নেই। বোধহয় অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে।

চার্নক :—নর্সেস। শনিকে, মানে স্যাটার্ন? ওকে দিয়ে কিঙ্গু হবে না ম্যাডাম। আমার ল্যাপটপে কলকাতার ওল্ড নিউ, দুটো ম্যাপই লোড করা আছে।

দুর্গা :—ও কথা বলো না বাবা। শনি বড় জাগ্রত দেবতা। ও যদি ষষ্ঠ ইঞ্জির দিয়ে এসব কথা শুনে তাহলে ওর চোখের আতনে তোমাদের মাথা উড়ে যাবে। গণেশের মতো ঐরাবত তো জুটেবে না। তখন তোমাদেরকে ছাগল কিংবা শিয়ালের মাথা লাগাতে হবে।

ক্লাইভ :—হোয়াট ডিড যু সে? জাগ্রত দেবতা। জীবনে কোনোদিনও যুয়োনি নাকি। নিদ্রাহীনতা রোগ? ইন্সমনিয়া? জলে তিনটে ডায়ালিসিস প্রাস ট্যাবলেট গুলে খাইয়ে দিন। এমন ঘুম যুমোবে, কুস্তকর্ণেও রেকর্ড ব্রেক করে দেবে।

(মহাকাশফেরী এসে থামল একটা ফাঁকা মাঠের পাশে। বুঝতেই পারা যাচ্ছে কলকাতা পুরসভার যাবতীয় জঞ্জাল জমা করার সেই অকৃত্রিম খাপার মাঠ এটা। রাত শেষ হয়ে ভোর হয় হয়। দেবী দুর্গা এবং তাঁর যাত্রাসঙ্গীরা একে একে বেরিয়ে এলেন।)

নবাব সিরাজ :—হায় খোদা! এটা দোস্তখ, না জাহান্নাম! এ কোথায় আমাদের নিয়ে ফেললেন আশ্মিজ্ঞান? দুর্গক্ষে যে বারো ভূত পালায়।

ক্রাইড :—ওঃ, অ-ফুল।

চার্নক :—লুকস লাইক আ লিভিং হেল। আমরা কি অশরীরী অবস্থায় আবার নরকে ফিরে এসেছি? স্বেলটা বড্ডো বিচ্ছিরি।

রামমোহন :—কাছেপিঠে কোথাও একসঙ্গে কয়েকজন সতীনারীকে পোড়ানো হচ্ছে মালুম হচ্ছে। এ তারই গন্ধ। বেটিঙ্কটা থাকলে আজকেই হেস্তনেন্ত করে ছাড়তাম।

দুর্গা :—তোমাদের অ্যাক্সেল বলিহারি। বুঝলে রামু, আজকাল স্বামী ম'লে কোনো বউ আর সতী হয় না। অফিসের বস, দেওর-চাকরের সঙ্গে ভেগে যায়। বরঞ্চ বউদের সতীপনার চূড়ান্ত দেখে স্বামীগুলোই বিব খায়, নয়ত গলায় দড়ি দেয়। দমদম এয়ারপোর্টে নামতে পারতাম। কিন্তু সেখানে আজ এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলারদের লাগাতার ধর্মঘট। তার ওপর আছে কাস্টমস্-এর বামেল। কোন চুলো থেকে এসেছেন, সঙ্গে কত কেজি হিরে আছে, আপনাদের কোনো সন্তাসবাদী-দলের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগাযোগ আছে কিনা, পাশপোর্টগুলো জাল না আসল—এসব হরেক বকমের প্রশ্ন। মাথা খারাপ করে দেবে। এর ওপর সঙ্গে আবার সিরাজটা রবেছে। কাস্টমস্-এর লোকেরা ভাববে, পাকিস্তান কিংবা আফগানিস্তানের উগ্রপন্থী। রামমোহনকে নিয়েও সমস্যা হত। নামের সঙ্গে 'রাম' জড়িয়ে আছে না। এয়ারপোর্টের পুলিশ ডিপার্টমেন্ট হয়ত ভেবেই বসবে—বাটা নিশ্চয়ই আর এস এস কিংবা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের চর; এয়ারপোর্ট জ্বালাতে এসেছে।

রামমোহন (একটু অপ্রস্তুত হয়ে) :—আজ্ঞে না ম্যাডাম। কলকাতায় আসার আগে আমার নামটা এফিডেভিট করবার জন্য ঋষি মনুর কাছে গিয়েছিলাম। কিন্তু তিনি একটু সেকেন্ডে। বাপ-ঠাকুরদার দেওয়া নাম নাকি পাণ্টাতে নেই। কত করে বোঝালাম, আজকাল নাম চেনে করটাই স্টাইল। এই যে অরুণকুমার নাম পাণ্টে উত্তমকুমার হল, রাজীব ভাটিয়া অক্ষয়কুমার হয়ে বলিউড একেবারে কপি হয়ে দিলে, ক্যাসিয়াস ফ্রে নামটা পাণ্টে মহম্মদ আলি রাখার পরই ওরকম ভালো বস্ত্রারকে পাওয়া গেল। বুড়োর তাতেও টনক নড়ে না। তখন বললাম রাম-টাকে একটু ইংলিশ টাচ দিয়ে 'রাম' করে দিতে। ওমা! মনু বলে রাম মানে ভেড়া। আর কম্পিউটারের ভাষাতে রাম হচ্ছে গিয়ে 'র্যান্ডাম অ্যাক্সেস মেমরি'। আমার মধ্যে ভেড়া আছে কিনা আমি জানি না, তবে মেমরি-র ম-ও যে আমার মধ্যে নেই এটা মনুখুড়ো নাকি ভালোভাবেই জানে।

দুর্গা :—নাম নিয়ে নামাবলী বানিয়ে দিলে দেখছি। তোমাদের কোনো কথা বলাও ঝকমারি। টি ভি সিরিয়ালের মতো কথার ঝাঁপি বাড়িয়েই চলবে। শোনো, কলকাতা ঘুরে বেড়ানোর সময় আমরা কেউই কিন্তু সশরীরে, অর্থাৎ দৃশ্যমান অবস্থাতে থাকব না। তাতে লোকে আমাদের দেখে পাণ্টি খেতে পারে। রীটিরর-পাগলা গারদে 'সেয়ানা পাগল' বা আটআনা পাগল হিসেবেও চালান হয়ে যেতে পারি আমরা। সেইজন্য

আমরা অদৃশ্য অবস্থায় ঘুরে বেড়াব।

ক্রাইড :—শুভ আইডিয়া। ইন্ভিজিবল মেন, মানে গোস্টস্। কলকাতায় শুনেছি নাকি অনেক বিউটিফুল কলেজ অ্যান্ড স্কুল গোইং গার্লস আছে। ওদেরকে একটু দেখাও যাবে। পারলে দু-একটা কিসও...। গাঙ্গুরাম আর কে সি দাশ-এর দোকান থেকে দু-একটা রসগোল্লা রসোমালি তুলে নিলেও দেখতে পাবে না কেউ।

দুর্গা :—খবরদার রবার্ট, একদম বেলোম্পনা করবে না। তাহলেই পুরস্কারের শর্ত সরাসরি ক্যানসেল করে ডাইরেক্ট নরকের কড়ইতে পাঠিয়ে দেব। কলকাতায় পাঁচদিনের যে বাসি সরসের তেলে আলুর চপ আর ফুলুরি ভাজা হয়, সেই তেল এখন কড়ইতে দেওয়া হচ্ছে। সারা গায়ে এমন দাদ বেরিয়ে যাবে যে কোনো স্কিন স্পেশালিস্টকে দেখিয়েও কাজ হবে না।

(ক্রাইড একটু হকচকিয়ে গেলেন। রামমোহন, সিরাজ আর চার্নক-এর মুখে স্বস্তির দৈতো হাসি।)

চার্নক :—কোন জায়গা থেকে শহর ট্রার শুরু করা যায় ম্যাডাম? আমি যেখানে প্রথম জাহাজ থেকে নেমেছিলাম সেটা তো আর ম্যাপে খুঁজেই পাচ্ছি না।

দুর্গা :—সেটাই তো সমস্যা। সরস্বতীকে বললাম—স্যাটেলাইট থেকে তোলা কলকাতার ছবিগুলো একটু ভালো করে স্টাডি করতে। সে বেটি আবার হোম সায়েন্স না কি নিয়ে পড়ে আছে। ওদের আবার প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে শুক্কো রেঁধে দেখাতে হবে। তার নানারকম রন্ধন প্রণালী নিয়ে পড়াশোনা করছে। আমাদের তো বাপু কোনোদিন বই পড়ে শুক্কো রান্না শিখতে হয়নি।

সিরাজ :—চার্নকের নসিবটাই খারাপ। এই শহরটার জন্ম দিল ও নিজেই। অথচ ওর নামে একটা রাস্তা তো দূরের কথা, একটা গলিরও নাম রাখা হয়নি। সবকটা নেমকহারাম।

দুর্গা :—ওর নামে কোনো রাস্তার নাম রাখা হয়নি, ঠিক কথা। তবে সপ্ট লেকের একটা সুপারমার্কেট কমপ্লেক্সের নাম রাখা হয়েছে চার্নক সিটি। কলকাতা বলতেই তো এয়ার কন্ডিশন, ঝাঁ চকচকে মার্কেট। রাস্তায় যত মানুষ-সমান জল জমুক না কেন, ব্যাক ডাকাতির কেস বাড়ুক না কেন, ফুটপাথে বেওয়ারিশ বাচ্চাকাচ্চা বাড়ুক না কেন, আমেরিকান স্টাইলের সুপারমার্কেট থাকলে শহরের ইমেজ বেড়ে যায়। চলো তাহলে চার্নক সিটিতেই যাওয়া যাক।

(চার্নক সিটি-র সামনে দেবী দুর্গা ও তাঁর ভ্রমণ-সঙ্গীরা। পুজোর আগের কেনাকাটা এখন জোর কদমে চলছে। সুপারমার্কেটের সামনে তাই সার বেঁধে দেশি-বিদেশি গাড়ি দাঁড় করানো। তাই দেখে চার্নকের মুখ হাঁ হয়ে যায়।)

দুর্গা :—অমন হাঁ করে দেখার কি আছে। কলকাতা একটা আজব জায়গা। তুমি শহরটা বানানোর সময় স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিলে এখানকার লোকে খেতে পাক আর না পাক, জলের পাইপ ফেটে যাক বা না যাক কতগুলো জিনিস তাদের অবশ্যই দরকার। ঘরে একটা তুষোপানি ঠাণ্ডা মেশিন, ওই যাকে বলে ফ্রিজ, সেটা রাখতে হবে। ধারদেনা করে গলায় গামছা দিয়ে, খেসারির ডাল খেয়ে ছেলেমেয়েকে 'সেন্ট' যুক্ত ইংলিশ

মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি করতে হবে। কেননা বাংলা স্কুলে পড়লে শুধু ছেলের কেন, চোদ্দগুটির মর্যাদা ট্যালকম পাউডারের মতো মিহি হয়ে যাবে। ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হেবোইট টিভিকে ঝেড়ে দিয়ে রিমোটের ঘোরানো কালার টিভি আনতেই হবে। তাতে দুপুরে গিমিরা বিছানাতে আধশোয়া হয়ে পান চিবোতে চিবোতে সিরিয়াল দেখবেন আর প্রসেনজিৎ না হাত্তিক—কার নাকটা বেশি লম্বা তা নিয়ে রিসার্চ করবেন। এখন আবার বাজারে নতুন অসুর ঢুকেছে, বুঝলে? নাম ইনস্টলমেন্ট। দু'বেলা ঘাঁটিচুড়ি খেয়ে মাসে মাসে পয়সা দিয়ে অনেকেই ওয়াশিং মেশিন, গিয়ার, এয়ার কন্ডিশনার কিনে তুচ্ছ মানবজন্ম সার্থক করেছে। এই কিস্তির টাকাতে চারচাকো কেন্দ্র যাচ্ছে আত্মকাল। এখান থেকে ওখানে যেতে হলে গাড়িতে না চড়লে পায়ে বাত হচ্ছে কলকাতাবাসীদের। ছেলেমেয়েকে গাড়িতে করে স্কুলে পাঠাতে না পারলে বাবা-মায়ের প্রেস্টিজ পাংচার।

(চার্নক সিটিভ ভেতরে দেবী দুর্গা এবং তাঁর ভ্রমণসঙ্গীরা সবাই অদৃশ্য অবস্থায় ঘুরে ঘুরে দোকান দেখছেন। ক্লাইভ একটা গয়নার দোকান থেকে একটা হিবার নেকলেস হাতানোর চেষ্টা করছিলেন। দুর্গার চোখ পড়ে গেল সেদিকে)

দুর্গা :—বলি মীরজাফরের কাছ থেকে কাঁড়ি কাঁড়ি সোনাদানা, হিরে জ্বরত নিয়ে তো ব্যাকের লকারে রাখলে, বাংলাদেশটাকে ফতুর করে দিলে। তা সফেও লাভ গেল না? দামি জিনিস দেখলেই হাতানোর ধাম্মা।

ক্লাইভ :—বেগ ইয়োর পার্ডন, ম্যাডাম। নেকলেসটা আসল কি নকল দেখছিলাম। মীরজাফরের কাছ থেকে ঝাড়া ক্যাশের কথা আর বলবেন না, স্বর্গের ব্যাঙ্কে কুবের সেদিন বলেছে ওসব বহুদিন আগের টাকাপয়সা। এখন অচল। সেইজন্যই আমার সব ষ'টা চেক আর ব্যাঙ্ক ড্রাফট বাউন্স কবতে শুরু করেছে। ভেবেছিলাম একটা মোপেড কিনব। তাও কেনা হল না।

চার্নক :—জাস্ট লুক, ম্যাডাম। ওই দোকানটার শো কেসে নানা সাইজের কতগুলো পেটমোটা লোকেব মূর্তি সাজানো আছে। কোনোটা দাঁড়িয়ে, কোনোটা বসে, দোকানটাতে মোটা হওয়ার মেডিসিন বিক্রি হয় নাকি?

দুর্গা :—আরে না না। দেখছ না, সাইনবোর্ডে লেখা আছে ফেংশুই-এর দোকান? আজকাল কলকাতার বাবু-বিবির খুব ফেংশুই নিয়ে মাতামাতি করছে। ওগুলো হল গিয়ে লাফিং বুদ্ধের মূর্তি। পোড়ামাটি পিতল সোনা রূপোর তৈরি। যার যেরকম খরচ করার ক্যাপাসিটি সে সেইটি কিনবে আর কি।

রামমোহন :—ফেংশুইটা আবার কি দিদি। চাউমিনের নতুন কোনো প্রিপারেশন নাকি?

দুর্গা :—তোমাদের আর বুদ্ধিশুদ্ধি হল না। ফেংশুই হল গিয়ে বাস্তবায়ন। এই শাস্ত্র বেদ-পুরাণের থেকেও বেশি পাওয়ারফুল বলে কলকাতাবাসীরা মনে করে। অন্তত ফ্যাট বানানোর প্রোমোটার আর বাড়ি সাজানোর ইন্টেরিয়র ডিজাইনাররা তো বটেই। তেমনদের মতে কোনোরকমে শোওয়ার ঘরের ডানদিক ঘেঁষে অথবা পড়ার টেবিলে উত্তরদিকে মুখ করে একটা লাফিং বুদ্ধকে রাখতে পারলেই সেই বাড়ির ছেলে জয়েন্ট এন্ট্রান্সে

দশের মধ্যে র‍্যাংক করতে পারবে। মেয়ে গাবলুমার্কাসিস্টেমস এপ্রিন্সিপালের প্রেমিকা হয়ে তার মাথাটা চিবিয়ে খেতে পারবে, বুড়ো থুথুরে শব্দ-শাওড়ি খুব জ্বলদি নার্সিং হোমের খরচ বাঁচিয়ে টেসে যেতে পারবে, কর্তার আরো জিন-চারটে প্রমোশন হবে। এখন দেখছি, ফেংশুইতে আমার গণেশকেও সৌভাগ্যের সিংহল বলে মনে করা হচ্ছে। কলকাতায় এমন কোনো বাড়ি নেই যেখানে মাদুরে বোনা পশুর ছবি বা টেরাকোটার মূর্তি নেই। এই নিয়েই তো লক্ষ্মী আর সরস্বতী গণেশের ওপর ঋণা হয়ে আছে। ফেংশুইতে তাদের কোনো জায়গাই নেই।

সিরাজ :—শোভানামা! কলকাতায় তো ট্রাফিক জ্যাম, খানা-খন্দ, মরে ভুত হয়ে যাওয়া টেলিফোন, রেশনের পানিভর্তি কেরোসিন আর কাঁকরওয়ালা চাল খেয়ে লোকজনের হাসি ভুলে যাওয়ারই হাল। সেজন্যেই বোধহয় ঘরে ঘরে এরকম হাসিমুখো পুতুল রেখে দিচ্ছে। যাতে দেখামাত্রই দাঁত বেরিয়ে আসে। শুনেছি বাস্তবশাস্ত্রে বলা আছে পড়ার টেবিল দক্ষিণমুখো করে রাখলেই পরীক্ষায় হাড্ডেট পার্সেন্ট কোশ্চেন কমন পাওয়া যাবে। সিলিং থেকে কাচের বল ঝুলিয়ে রাখলে কোনো রোগই হবে না। তা আমি তো দক্ষিণমুখো টেবিলে পড়াশোনা করেই বেহস্তের কম্পিউটার সেন্টারে ক্লার্ক হওয়ার পরীক্ষাটা দিলাম। টোয়েন্টি পার্সেন্ট কোশ্চেন মোটে কমন এসেছে। উন্টে জাহাঙ্গীরের খাতা থেকে টুকতে গিয়ে ধরা পড়ে গেলাম। ঘরের সিলিং থেকে কাচের বল ঝুলিয়ে রাখলাম। মাথাধরা তো সারলই না, উন্টে হাওয়ার তোড়ে বলটা ভেঙে গেল। কাচের টুকরো লেগে আমার পা থেকে খুন বেরিয়ে এল। অশ্বিনীকুমারদের কাছ থেকে আবার দুটো টেটুডাক ইন্জেকশন নিতে হল।

ক্লাইভ :—আরে সবই হচ্ছে ভড়ং। কলকাতার শুধু 'কেতা'টাই আছে। আলো নেই, স্কুল-কলেজে সিট নেই, মাস্টার-প্রফেসরদের মাথায় ইউনিয়ন আর প্রমোশন ছাড়া কিস্যু নেই, ছেলেমেয়ের আসল বাপ-এর নাম জানা নেই, কলে জ্বল নেই, ড্রাগ স্টোরে ওষুধ নেই। এর চেয়ে তোমার দাদু আলিবর্দীর বানানো আলিনগর শহরটা অনেক হাই স্ট্যাণ্ডার্ডের ছিল।

চার্নক (হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে) :—খ্যাং। আমার নামে মার্কেট, অথচ আমার ছবি আঁকা কোনো জিনিসই নেই। বইয়ের দোকানগুলোতে শুধু দেখছি ভূতের আর অবৈধ প্রেমের গল্পের বই। আমি এত কষ্ট করে শহরটার গোড়াপত্তন করলাম, আমার ওপর একটাও বই নেই! 'জব চার্নকের বিবি' বইটা অন্তত রাখতে পারত।

রামমোহন :—বাংলা বই তো। এক কপিও বিক্রি হবে না। কলকাতার ছেলে-ছোকরারা এখন শুধু চাইছে—কিভাবে ফ্যাট কমানো যায়, লাভ লেটার লেখা যায় কি করে, পার্ট-টাইমে ইনকাম করা যায় কিভাবে, এই সবের ওপর কিতাব। এদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখ, রবীন্দ্রনাথ কে তা-ই বলতে পারবে না। কেউ বলবে—“ওঃ, দ্যাট ওন্ড ফুল উইথ লং হোয়াইট বিয়ার্ড?” অথবা বলবে, “হিস্ট্রি বইয়ের ফোর্থ চ্যাপ্টারে পেজ নান্বার থার্টাইভ-এ টাগোর বলে কেউ আছে বোধহয়।”

দুর্গা :—তোমার অবশ্য দুঃখের কোনো কারণ নেই রামু, মধ্য কলকাতায় তোমার নামে একটা বড় রাস্তার নাম রাখা হয়েছে। চলো একবার যাবে নাকি সেখানে?

রামমোহন :—মন্দ হয় না।

ক্লাইভ :—ওঃ, সেখানে সিওর অনেক লাভলি ইয়াং সতীর আত্মাকে পাওয়া যাবে। তাদের সঙ্গে না হয় একবার..

দুর্গা :—চোপ! মেয়ে দেখলেই হল! যেন জয়নগরের মোয়া।

(আমহাস্ট স্ট্রিট, অর্থাৎ রাজা রামমোহন সরণি এবং মহাত্মা গান্ধী রোডের ক্রসিং। দুপুরবেলা স্বভাবতই বাদুড়ঝোলা অফিসযাত্রীদের ভিড়ে হাঁসফাংস করা বাসের চলাচল চোখে পড়ছে না। পোস্ট অফিসের পাশে মা দুর্গা, রাজা রামমোহন এবং অন্যান্যদের হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল।)

রামমোহন :—কলকাতার লোকগুলোর আক্কেল বলিহারি! আমহাস্টের নাম উড়িয়ে দিয়ে আমার নামে এই রাস্তার নাম রাখলে। আরে, লর্ড আমহাস্ট ছিল বলেই না-আমি আর বেন্টিঙ্ক মিলে বাঙালি ছোকরাদের ইংরিজিটা শেখানোর জন্য ব্রিটিশদের দেওয়া একলাখ টাকা খরচা করতে পারলাম। তা না হলে তো ওই লর্ড ম্যাকলে আর রাখাকান্ত দেব বাহাদুর-এর পামায় পড়ে বাঙালিদের এখনো সংস্কৃত আরবি ফারসি শিখতে হত। একটাও কি চাকরি পেত?

ক্রাইড :—পলাশির গ্রাউণ্ডে আমি মনে হয় এই রাস্তা দিয়েই গিয়েছিলাম। ডু য়ু রিমেম্বার দ্যাট, সিরাজ?

সিরাজ :—গলৎ। এটা ওয়ান ওয়ে রাস্তা আছে। পলাশি যেতে হলে রাইট টার্ন নিতে হবে! তা না হলেই দেড়শ টাকা ফাইন।

চার্ণক :—মাই গড। এত লোকও থাকতে পারে কোথাও। বাসগুলো দেখুন ম্যাডাম। পাঁচশ জন করে একটা বাসে উঠেছে।

দুর্গা :—তা না হলে ঠিক সময়ে অফিসে পৌছানো যাবে না, হাজিরা খাতায় লাল দাগ পড়ে যাবে। অফিসে গিয়ে দু-একটা ফাইল নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হবে। জুনিয়র ক্লার্ক মৌমিতা বা অভসীর শাড়ির পাড়ের ভূয়সী প্রশংসা করতে হবে, শচীন-সৌরভের ব্যাটিং কিরকম হবে তা নিয়ে গোলটেবিল বৈঠক করতে হবে, কাউন্টারে লোকদের দাঁড় করিয়ে রেখে আধঘণ্টার টিকিন আওয়ার্সকে দু-ঘণ্টা মতন লম্বা করে নিয়ে বাসি পরোটা আর আলুভাজা চিবোতে হবে। তারপর চারটে বাজলেই পেটমোটা ফোলিও ব্যাগটা নিয়ে বাড়িমুখে হওয়ার জন্য ডালহৌসির বাস টার্মিনাসে হাঁড়িমুখে লাইন দিতে হবে। জানলার কোনাতে সিট পাওয়ার জন্য গুতোগুতি করে বাসে উঠতে হবে। এই না হলে সরকারি চাকরি।

রামমোহন :—একটা জিনিস দেখে ভালো লাগল। সিটি কলেজের মর্নিং সেকশনটা দেখছি আমার নামে রাখা হয়েছে। মেয়েগুলোকে লেখাপড়া শিখে বইখাত নিয়ে বেরোতে দেখে প্রাণটা জুড়িয়ে গেল। সরকার তাহলে কলকাতায় স্ত্রী শিক্ষার প্রসার ঘটচ্ছে, বলুন দিদি।

ক্রাইড :—আপনার প্রাণ জুড়িয়ে গেল? আমার তো চোখ জুড়িয়ে গেল ব্রাদার। দে আর সো কিউট।

চার্ণক :—ঠিক কথা! রামমোহন কলেজে এখন শহরের মোহিনীদের অধিষ্ঠান হয়েছে দেখছি। পড়া মুখস্থ করার থেকে এরা বোধহয় কী শেড-এর চুড়িদার পরে কলেজে আসবে, ঠোটে ক'পোঁচ লিপস্টিক লাগাবে, কিভাবে ক্লাস ফাঁকি দিয়ে মণ্টুদার সঙ্গে আউট্রাম ঘাটে গঙ্গার হাওয়া খেতে যাবে—এই সবেরই কায়বার করে আর কি। আমার বিবি কত ভদ্র ছিলেন। এদেরকে দেখলে কবরেই হয়ত তিনবার ডিগবাজি খেতেন।

সিরাজ :—এই রাস্তার ক্রসিং-এ দেখছি মহাত্মা গান্ধী রোড। তাহলে

ওই রাস্তা দিয়ে যাঁরা যাতায়াত করেন, তাঁদের মনে হিংসে নিষ্ঠুরতা বিন্দুমাত্র থাকবে না। এক গালে কষে তিন থাপ্পড় লাগালেও হেসে অন্য গাল বাড়িয়ে দেবে।

দুর্গা :—ঠিক উল্টোটা। মহাত্মা গান্ধী রোডের মুখেই আছে সুরেন্দ্রনাথ আর বঙ্গবাসী কলেজ। বিনা টিকিটে এই দুটো কলেজে ট্রেনে করে অনেক স্টুডেন্টই পড়তে আসে। তারা চরমপন্থীদের বাবা। টিকিট চেকাররা তাদের দেখতে পেলেই লুকিয়ে পড়ে। না হলেই প্যাঁদানি। স্টুডেন্টস ইউনিয়ন ইলেকশনের দিন কলেজ দুটোতে একবার গিয়ে গিয়ে দেখো না, ভূত হয়েও স্বর্গে ফিরতে পারবে না। ছোরা, বোমা, নানচাকু, পিস্তল—কী না থাকে সেই ইলেকশনে।

(কলেজ স্ট্রিটেব বইপাড়া। বথারীতি অদৃশ্য অবস্থায় মা দুর্গা এবং তাঁর সফরসঙ্গীদের দেখা গেল। প্রেসিডেন্সি কলেজের গেট দিয়ে জিন্স আর মিডি. স্কাট পরিহিতা সুন্দরী ছাত্রীদেরকে দেখে ক্রাইড একটু আনমনা হয়ে পড়েছেন মনে হল। মুখ দিয়ে আফশোষের চুকচুক শব্দ করলেন। রামমোহন সঙ্গে সঙ্গে চোখ পাকিয়ে ক্রাইডের দিকে তাকালেন।)

রামমোহন :—ওহে। এই কলেজ একসময় আমার আর ডেভিড হেয়ার-এর মাথার ঘাম পায়ে ফেলে বানানো হিন্দু কলেজ ছিল। ডেভিড ঘড়ি সারানোর ব্যবসা ফেলে আমার সঙ্গে যোগ দিয়ে এই কলেজ বানালো। কম পয়সাতে বাংলা ভাষায় বই প্রকাশ করার জন্য স্কুল বুক সোসাইটি করল। আর সেই পবিত্র কলেজের মাতৃসমা মেয়েদের দেখে তুমি চোখ টিপছ।

সিরাজ :—হ্যাঁ, শহরের একটা দেওয়ালে লেখা আছে—তরুণী কিশোরী বৃদ্ধা—জগতের সব উমর-এর এবং সব জাতের মেয়েরাই তোমার মা। সুতরাং লেড়কি দেখলেই ওভাবে জ্বিত বের করা বন্ধ করো। সশরীরে থাকলে দেখতে! ইভটিজার মনে করে কোমরে দড়ি দিয়ে কলকাতা পুলিশ লালবাজারে নিয়ে যেত।

ক্রাইড :—লিভ্‌ ইট। এরকম স্টুপিডের মতো কথাবার্তা কে বলেছিল? আরে সমস্ত উওয়ানই যদি আমার মা হয় তাহলে আমার একমাত্র বাবার চরিত্র বজায় রাখা তো দুষ্কর হয়ে দাঁড়াবে।

চার্ণক :—আচ্ছা ম্যাডাম। প্রেসিডেন্সি কলেজের চুড়োতে একটা বড় ঘড়ি দেখছি। ওটা কি ডেভিড হেয়ার-এর বানানো সবচেয়ে বড় ঘড়ি? গ্র্যান্ড ফাদার ক্লক?

দুর্গা :—তোমার মাথা। অত বড় ঘড়ি বানাতে হলে ডেভিড হেয়ারকে দোকানেই পটল তুলতে হত। এই ঘড়িই আমাদেরকে বলতে পারে, পশ্চিমবঙ্গের বারোটা বাজতে আর কত বাকি।

(দেবী দুর্গা এবং তাঁর ঐতিহাসিক সফরসঙ্গীরা এবার ছায়াশরীরে এস্প্যাননেডে এসে হাজির। সময় ভরদুপুর বেলা।)

সিরাজ :—কলকাতার লোকদের এলেম আছে দেখছি। আমি যখন ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের ওপর হামলা করি তখন এখানে শুধু বনবাদাড় ছিল, দিনের বেলাতেও বাঘ বেরোত, শিয়ালে হুকাহুকা কবত।

চার্ণক :—আমার ল্যাপটপে দেখলাম—জায়গাটাকে নাকি ধর্মতলাও

বলে থাকে। কোনো রিলিজিয়াস প্লেস নাকি। কাছেপিঠে একটা মসজিদ ছাড়া আর কিছু তো দেখছি না ম্যাডাম। তাও মসজিদটা টিপু সুলতানের সম্পত্তি। সেদিন টিপু আমাকে দৃষ্ট করে বলছিল—আল্লাহ্ তার মাথাটি চিবিয়ে খেলেন বলে। কেননা, মসজিদটার চারপাশে শুধু অডিও ক্যাসেট, এগরোল, চাউমিন আর “পয়সটি রাপেয়া”-র জামার বাণ্ডিল ভর্তি, মসজিদটা একেবারে সুপারমার্কেটের জায়গা হয়ে দাঁড়াল দেখছি।

দুর্গা :—ধর্মতলার ধর্ম—ভালোবাসার ছিটেফোঁটাও পাওয়ার কোনো চান্স নেই তোমার। নামেই ধর্মতলা, কাছে গিয়ে দেখ, যত রাজ্যের অধর্ম দিবা ঘটে চলেছে এখানে। ওই দেখ না, পার্ক সার্কাসের তৈরি ঘড়ি আর জুতোকে লেবল লাগিয়ে মেড ইন চায়না বলে হকাররা ট্রিপল দামে বেচছে। সিনেমা হলে হিট ছবি হল তো পুলিশের সামনে তোমাকেই ব্র্যাকে টিকিট কেটে ঢুকতে হবে। আর একটু বেলা হলেই দেখবে কলকাতার ভাড়া খাটা উর্বশী মেনকা রস্তা-রা এসে লেনিন সরণির মুখে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে থাকবে। ধর্মটা তাহলে বাঁচল কিনা এবার তোমরাই বিচার করে বুঝে নাও। সামনেই

ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই এর অফিস দেখতে পাচ্ছ। কেন্দ্রের কাছে ব্যাটারের কত কোটি টাকা এখনো বাকি পড়ে আছে তার ঠিক নেই। কেন্দ্রও তাই বিদ্যুৎ আটকে রেখেছে। লোডশেডিং-এ শহরটার দফারফা হয়ে গেল।

রামমোহন :—ও, একটা কথা মনে পড়ে গেল। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে আমার কথাবার্তা হয়েছিল। কলকাতায় আসার খুব ইচ্ছে ছিল জগদীশের। বসু বিজ্ঞান মন্দিরে কী-সব গবেষণা চলছে দেখার জন্য। ওর লাক খারাপ, লটারিতে ওর নাম্বারটা খেলল না, মনটাও খারাপ। ও বলছিল, কলকাতায় ওর নামে নাকি একটা রাস্তা হয়েছে। সেটা দেখতে চেয়েছিল।

দুর্গা :—ঠিক কথা! তুমি বোধহয় লোয়ার সার্কুলার রোডের কথা বলছ। জগদীশের নামে ওই রাস্তাটারই নাম হয়েছে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড। কর্পোরেশন রাস্তাটাকে খোঁড়াখুঁড়ি করে একেবারে দফারফা করে দিলে। ওখানে নাকি উড়ালপুল তৈরি হবে। ফ্লাইওভার। কিন্তু কোন চুলায় যে ফ্লাইওভারের ল্যাক্স গিয়ে মিলবে, সেটা কর্পোরেশনের ইঞ্জিনিয়ারই জানেন না। মধ্যস্থান থেকে পাবলিকের নিতিদিনের ভোগান্তি। রাস্তাটায় জ্যাম লেগেই আছে। টিফিন আওয়ারে স্টুডেন্টরা গিয়ে স্কুলে পৌঁছচ্ছে। বাসে করে প্রেমিক ভিক্টোরিয়াতে পৌঁছচ্ছে দু'ঘণ্টা পরে। প্রেমিকা অন্য ছেলে ধরবে না তো কি।

(আচার্য জগদীশ বসু রোডে হোটেল হিন্দুস্তান ইন্টারন্যাশনাল-এর সামনে দেবী দুর্গা এবং তাঁর সফরসঙ্গীরা। হোটেল থেকে দুলাকি চালে বেরোনো দু'জন সুন্দরী এয়ার হোস্টেসকে দেখে চোখ ছানাবড়া করে ক্লাইভ দাঁড়িয়ে রইলেন। রামমোহনও একবার চোখ না চেয়ে পারলেন না।)

চানক্ :—রাস্তাটা তো জগদীশবাবুর নামে দেখছি। কিন্তু গাছ কোথায়? হোটেল, ভূজিয়াওয়ালার মিঠাই এর দোকান, গাদাখানেক অফিস আর এগরোলার স্টল। লোকটা এত কষ্ট করে গাছের প্রাণ আছে, এই তথ্যটা প্রমাণ করে দেখাল, তার স্মৃতির জন্য অন্তত খানকয়েক গাছও তো পুঁততে পারত কর্পোরেশন।

দুর্গা :—গাছ আবার পোঁতা হবে না কেন। কোনো বিশেষ উপলক্ষ এলেই একটা করে স্মারক বৃক্ষ রোপন করা হয়। ব্র্যাক ক্যাট কমান্ডোদের

নিম্নে একজন মন্ত্রী আসেন ধবধবে সাদা পাঞ্জাবি-পাজামা পরে। টাইপ করা কাগজ থেকে সেক্রেটারির লেখা ভাষণ দেখে দু'চার কথা বলেন গাছ পোঁতা উচিত কেন সেটা সবাইকে জানানোর জন্য। তারপর পোঙ্ক দিয়ে ঢং করে কোদাল আর বেলচা নিয়ে একটা চারাগাছ পুঁতে দেন। নাম হয়—‘মৈত্রী’ বা ‘সম্প্রীতি’ বৃক্ষ। এরপর একটা তারের জাল দিয়ে গাছটাকে মুড়ে দেওয়া হয়। সুন্দর দেখতে মেয়েরা শীখ বাজায়। মাস দু'য়েক যেতে না যেতেই দেখা যায় তারের জাল খুলে গেছে, গাছটা নেতিয়ে গেছে, অথবা কোনো মাকড়সির চাকা এসে বেচারাকে ফ্ল্যাট করে দিয়ে চলে গেছে।

সিরাজ :—রাস্তায় এতসব ফ্রেন কেন? বড় বড় কংক্রিটের থাম, লোহালকড়—ওহো, ফ্লাইওভার তৈরি হচ্ছে বুঝি? আমাদের নরক আর স্বর্গের মধ্যে এরকম একটা ব্রিজ বানাতে হেঁচি ভালো হত। আমাদের স্বর্গে যেতে হলে বৈতরণী নদী পার হয়ে আসতে হয়। বহুৎ রিক্সি। এই তো সেদিন একটা বোট উন্টে গেল। আমি তো কোনোরকমে চিৎসীতার দিয়ে তীরে উঠলাম। নৌকোয় থাকা যমদূত তিনটে এত জল খেল যে হাসপাতালে ভর্তি হতে হল।

ক্লাইভ :—এই কংক্রিট-এর পিলার তুলতে ব্যাটারের ফ্রেন ইউজ করতে হচ্ছে? হারকিউলিসকে ডাকলেই হত। কোনো কাজ না পেয়ে স্বর্গের গ্যারেজে বসে ও তো শুধু বিয়ার খাচ্ছে। পাশাড ভেঙে জিরাণ্টার প্রণালী বানিয়ে দিল, ওর কাছে এসব পিলার তোলা ছেলেখেলা মাত্র।

দুর্গা :—কেন, হারকিউলিস কেন। আমাদের কেঁস্ট কী দোষ করল। ওই তো ছোটবেলায় যশোদা আর নন্দের কাছে ব্রজধামে যখন ছিল, তখনই তার কী পাওয়ার। ইন্দ্র একবার বস্তু ছুঁড়েছিল। তাকে ঠেকানোর জন্য বুড়ো আঙুলেই গোটা গোবর্ধন পাশাডটা ধারণ করল। কৃষ্ণ একাই সব কাজ করে দিতে পারবে।

রামমোহন :—কৃষ্ণের যখন এতই মাসুলের জোর তখন অলিম্পিকে গিয়ে ভারতের হয়ে ওয়েট লিফটিং-এ সোনার মেডেল জিততেই পারে। হুঁ, কমনওয়েলথ গেম্‌সে তালতলা-র ওয়েট লিফটারদের সঙ্গে লড়ে দু'টো সোনার মেডাল পেয়ে কী দেমাক ভারতীয়দের। তাও আবার তাদের মধ্যে দুটোকে স্টেরয়েড নিয়ে ওজন তোলার জন্য ব্রিটেন থেকে গালে জুতো মেরে পদক কেড়ে বের করে দেওয়া হল। স্পেস শাট্‌লে করে গঙ্গার ওপর দিয়ে একবার যাওয়ার সময় দেখছিলাম আউট্রাম ঘাটে অনেকগুলো পালোয়ান কাদা মেখে ভূত হয়ে মল্লযুদ্ধ করছে। নিদেনপক্ষে ওগুলোর সঙ্গেও তো কেঁস্টটা লড়তে পারে?

দুর্গা :—কৃষ্ণের আর সেই জোর নেই গো রামু। সেই কবে থেকেই রয়েছে। লাখ বছর বোধহয় বয়স হল। তাও তো মুখে ফেস ওয়াশ আর ময়শচারাইজার লাগিয়ে কেঁস্ট বেশ খোঁকা খোঁকা চেহারায়ে আছে। প্লাস্টিক সার্জারিও করিয়েছে বার চারেক। তবুও এখন কৃষ্ণের চোখের কোণে কালি, দাঁতগুলো নড়তে শুরু করেছে, হাঁটতে গেলে হাঁটতে বাডের ব্যথা কনকনিয়ে ওঠে। কলকাতায় এসে কী সেই শেহনাজ না সানাই নামে এক মহিলা আছে, তার বিউটি পার্কারে গিয়ে চিকিৎসা করানোর কথা ছিল কেঁস্টর। কিন্তু রাধার পায়ে সেদিন আবার বাটনা বটিতে গিয়ে শিলনোড়া পড়ে বুড়ো আঙুলটা খেঁতো হয়ে গেছে। তাই নিয়ে আবার স্বর্গের আউটডোর ক্রিনিকে কৃষ্ণ দৌড়োল।

ক্লাইভ :—ক্যালকাটার নর্দান সাইডে টুওয়ার্ডস্‌ দমদম এয়ারপোর্ট নাগেরবাজার বলে একটা প্লেস আছে শুনেছি। চার্নকের ল্যাপটপ

কম্পিউটারের ম্যাপে দেখলাম, আমার ওল্ড হাউসটা এখন ওই জায়গাতেই আছে। পূর্বনো দিনের স্মৃতি ম্যাডাম, রিয়েল নস্টালজিয়া, একবার ওখানে যাওয়া যায় না?

দুর্গা :—না যাওয়ার কি আছে? শিবও আমাকে বলেছিল, নাগেরবাজারের বাস টার্মিনাস-এর কাছে দেশি মদের একটা ভালো দোকান আছে। সেদিন ছদ্মবেশে নন্দী আর ভূঙ্গী গিয়ে ওখান থেকে নাকি ফার্স্ট ক্লাস চুসু আর মাকালী খেয়ে এসেছে। আমাকে কতটা ভাই রিকোর্য়েস্ট করল যদি অদৃশ্য হয়ে দু-তিনটে বোতল সরিয়ে নিয়ে আসতে পারি। বুড়ো কতটা তো! কোনো আশ্বাস করলে শুনতেই হবে।

(ক্রাইভ হাউসের মধ্যে মা দুর্গা আর তাঁর অন্যান্য ভ্রমণসঙ্গীকে দেখতে পাওয়া গেল। দুর্গার ঝোলা ব্যাগে দু'টো চুসুর বোতলের মুখ উঁকি মারছে। রামমোহন সেদিকে চেয়ে মুখ কঁচকালেন। সিরাজ-এব জিন্স-এর প্যান্টের দু'টো পকেট ঝোলা। বোকাই যাচ্ছে, সেও দু'টো ছোট বোতল সাঁচিয়েছে।)

ক্রাইভ :—মাই গড! হাউ হরিবল! আমার সাধের বাড়ির এই কণ্ঠশন? দেয়ালের প্রিন্টার খসে পড়ে গেছে। ধামশুলোব ইট বের করা, আরশোলা, ছুঁচো, ইঁদুর ঘুরে বেড়াচ্ছে। ছাদ ফুটো হয়ে জল পড়ছে। ঘরের মধ্যে লুঙ্গি আর শার্ট শুকোচ্ছে। একেবারে বাবো ভূতের আড্ডা।

দুর্গা :—বারো ভূত নয় ক্রাইভ, বারোটা ক্যামিলি। এরা তোমার বাড়ি জ্বরদখল করেছে। ভূত হয়ে ভয় দেখালেও উঠবে না। গোটা শহরেই এখন জ্বরদখল কলানি বানানোর অভিযান চলছে।

ক্রাইভ :—বাড়িটাকে স্টেট গভর্নমেন্ট হেরিটেড বিল্ডিং করতে পারত।

সিরাজ (রেগে গিয়ে) :—কী আমার ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। ব্যাটা চোর, শুণ্ডা, ওর বাড়ি আবার সরকার সংরক্ষণ করবে।

ক্রাইভ :—আই, বি কেমারফুল, দীতগুলো উপড়ে নেব ওয়ান বাই ওয়ান।

(দেবী দুর্গা ও তাঁর সঙ্গীদের বেজাব মুখে শিয়ালদহ সাউথ রেল স্টেশনের প্রাটফর্ম দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। ক্রাইভ আর সিরাজ দু'জনকেই দেখা গেল পেয়ারা চিবোচ্ছেন।)

ক্রাইভ :—থাক গড! ক্যালকাটা পেয়ারার দাম এখনো বাড়েনি। টাকায় দু'টো? চীপ্ গ্রাইসে এত বেশি ক্যালরি।

দুর্গা :—তা সত্ত্বেও কলকাতার বাবু-বিবিবা পেয়ারা খাবেন না। তেনাদের আবার 'ম্যাক্স' দরকার। অর্থাৎ কিনা ডবল এগ রোল, ন্যালবেলে চাউমিন আর ঝালমুড়ি খেয়ে অম্বল গলা-বুক-জ্বালা সারাতে জেলুসিল ট্যাবলেট না খেলে তাদের নাকি মানবজন্ম বৃথা।

চার্নক :—ম্যাডাম, আপনি বলছিলেন না সাউথ ক্যালকাটা খুব ডেভেলপ করেছে? আমার তো নর্থ ক্যালকাটা তৈরি করতে গিয়েই জান কয়লা হয়ে গেল। একবার সাউথটা টু মারলে হয় না? ল্যাপটপে দেখলাম ওখানে কোন কোন ক্লাবে যেন আপনার স্পেশাল কেলুনের প্রতিমা আর

আইসক্রিমের কাঠির ঠাকুর তৈরি হচ্ছে! ওগুলোও একবার তাহলে দেখে আসা যাবে। টালিগঞ্জ না কালিগঞ্জ কোথায় যেন দেখলাম, “পিছিয়ে চলো” ক্লাবে আপনার প্রতিমা তৈরি হচ্ছে পাটালিগুড়ের। বিসর্জনের দিন ক্লাবের পক্ষ থেকে প্রত্যেককে দু'টো করে রুটি দেওয়া হবে। প্রশংসা করে নামার সাথে সাথেই মূর্তি থেকে আখের গুড়ের এক একটা অংশ কেটে নিয়ে রুটির সঙ্গে খেয়ে নিলেই হল। আপনাকে গঙ্গার ঘাটের পচা জল খেয়ে বিসর্জনে আর যেতে হবে না। ক্লাবের বিসর্জনের খরচও কমবে।

(ট্রেনের মধ্যে দেবী দুর্গা এবং তাঁর সঙ্গীদের দেখা গেল। ট্রেন পার্ক সার্কাস স্টেশন ছাড়িয়ে চলেছে)

রামমোহন (নাকে কমাল চেপে) :—বাবাগো! এত দুর্গন্ধ কেন? মনে হচ্ছে নরকের ভাগাড়ের মধ্যে দিয়ে ট্রেন যাচ্ছে।

দুর্গা :—নবকের ভাগাড়ের থেকেও মাঝামাঝি রাস্তা। এ হল গিয়ে গরুর শুকনো চামড়ার গন্ধ। যত বাজ্যের ট্যানারি, মানে চামড়া প্রসেস করার কারখানা এখানেই আছে। আর চুসু খাওয়ার লোভে তোমাদের শিবঠাকুর আর যমরাজ পার্ক সার্কাস আর ট্যাংরোয় আসতে চেয়েছিল। কিন্তু গরুর চামড়ার যা সেন্ট। দু'জনেই পালাতে পথ পায়নি। দু'জনের কী ভেদবমি!

ক্রাইভ :—মেট্রো রেলটায় একবার চড়লে মন্দ হত না। চক্ররেলেব লাইন তো নাকি ওনলাম জলে ডুবে আছে। অবশ্য সার্কুলার রেলে গেলে অনেকের ঘরের মধ্যে দিয়ে, বাথরুমের মধ্যে দিয়েও যাওয়া যায়।

সিরাজ :—শশানের মধ্যে দিয়েও কবরখানার মধ্যে দিয়েও লাইন আছে চক্ররেলের। বেও-ফুফ কীহেকা!

ক্রাইভ :—অ্যাই, কথায় কথায় ফোড়ন দেবে না একদম, স্কাউন্ডেল।

চার্নক :—মেট্রোরেলে যাওয়াটা ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছি না ম্যাডাম। ওদের টিকিট চুকিয়ে পার হওয়ার মেশিন তো প্রায়ই বেগড়বাই করে। আমাদের দেহ উইদাউট ফ্রেশ অ্যাণ্ড ব্লাড-এর হলেও ওই মেশিনের ফাঁকে আটকে যেতে পারে। তখন আবার এক কেলোর কীর্তি!

(দেবী দুর্গা আর তাঁর সঙ্গীদের গোলপার্কের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল।)

রামমোহন :—কী আশ্চর্য! নামে গোলপার্ক। অথচ পার্কের কোনো চিহ্নই নেই। সত্যি, শহরটা একেবারে ঝাপছাড়া হয়ে গেছে। নামের সঙ্গে কোনো জিনিসেরই মিল নেই।

চার্নক :—সত্যি, আমার সিস্টেমটাকে এই জালার একদম চেঞ্জ করে দিল।

দুর্গা :—আরে, এই জন্যই তো কলকোতা গো। উন্টোডাসাতে সোজা ডিসি নৌকাও পাবে না, নারকেলডাসার লোকেরা নারকেল হয়ত খায়ই নি কোনোদিন। বালিগঞ্জে বালির কোনো সিনই নেই। ফড়িয়াপুকুরে পুকুর নেই। অবশ্য ঘন্টা দু'য়েক বৃষ্টি হলেই তিনটে পুকুরের সমান জল দাঁড়িয়ে যায়। বেব্বাগান-এ বাগানের ব-ও নেই। সাথে কি আর এই শহরে এসে ভির্মি খায় লোকে। অথচ এই শহরেই একবার অন্তত আসা চাই!!

মা দুর্গার 'এঁটো' আরাধনা

কুশিকনন্দন রায় বাহাদুর



যদি বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে সন্যাসীদের প্রধান, স্বামী সত্যানন্দ জমিদার মহেন্দ্রকে মন্দিরে জগৎজননীর মূর্তি দেখিয়ে বলেছিলেন—আজ দেশের সর্বত্র শ্মশান, মা তাই নিঃস্ব, নিরাবরণা, কংকালমালিনী, ব্রিটিশরা এদেশ থেকে পিঠটান দেওয়ার পরও জগৎজননী. মানে ভাং-খোর শিবের অর্ধাঙ্গিনী মা দুর্গা যে এখনো' এবকম হা-ঘরের মতো সর্বহারা, লক্ষীছাড়া অবস্থায় রয়েছেন—সেটা এবারের বারোয়ারির পুজোয় বাড়াবাড়ি রকমের যোগাড়-যন্ত্রের কথাই হাড়ে হাড়ে মনে করিয়ে দিচ্ছে। মাতৃশক্তির আরাধনার নব্য পুরোহিতরা, মার্কণ্ডেয় পুরাণ ও শ্রী শ্রী চণ্ডীর কোন রিমিঙ্গ সংস্করণ পড়ে শিক্ষিত হয়েছেন কে জানে; বৈদিক ধর্মে উচ্ছিন্ন বা 'এঁটো' বলে চিরনিবৃত্ত যাবতীয় ফেলে-ছড়িয়ে দেওয়া জিনিস—মাটির খুরি, বাতিল হওয়া কাপড়ের ফাঁসো, আখের ছিবড়ে, পুরনো আর ভাঙা গ্রামোফোন রেকর্ডের গোছা, গাড়ির তালিমারা টায়ার, শোলার ভাঙা টুকরো বা থার্মোকল, ভাঙা বাতাম, নারকেলের মালা, মায় ধুধুলের ছোবড়া পর্যন্ত দিয়ে মা দুর্গার, তাঁর ছেলেপুলেদের বড়ি আর প্যাণ্ডেলের খোলনলচে বানানো হয়েছে। সত্যি! 'বারো ইয়ারি' পুজোতে এবার দর্শনার্থীদের কাছে পিলে-চমকানো, পোস্ট-মডার্ন 'লুক' দিতে গিয়ে মাতৃশক্তির একেবারে সাড়ে বারোটাই বাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। আগেরবারের পুজোতে বাগমারি অঞ্চলে ভাঙাচোরা ক্ষু-ড্রাইভার, গাড়ির ভাঙা ইঞ্জিন, মোটর পার্টস, জংঘরা লোহার টুকরো দিয়ে দুর্গা-মা-র নতুন যে অবতাব বানানো হয়েছিল, তা দেখলে ময়দানব-বিশ্বকর্মাও হয়তো স্বর্গে নিজের ফ্যাক্টরিতে লজ্জায় তালা বুলিয়ে লকআউট করে দিতেন।

দক্ষিণ কলকাতার কসবাতে বোসপুকুরে তালবাগানের পূজা কমিটির উদ্যোক্তারা সত্যিই এবার রেকর্ড ভাঙতে সেইজন্য শিয়ালদার কোলে মার্কেট থেকে নগদ ১০ পয়সা কিলো দরে প্রায় ৫০ হাজার ভাঙা রেকর্ড

কিনে প্রদীপদে-র ভাস্কর্যধানে রেকর্ডের প্যাণ্ডেল বানাচ্ছেন। ভয় হয়। এই ঘোর কলিকালে স্বার্থপর মানুষগুলোর কাতর ডাকে "স্পিকটি নট" হয়ে থেকে পার্থিব সমাজের কাছে দেবদেবীদের জনপ্রিয়তার রেকর্ড এমনতেই খারাপ হতে শুরু করেছে। এই রেকর্ডের তৈরি বাড়ি তাঁদের সেই ত্রৈত্যগুণীয় জনপ্রিয়তাকে আবার কি ব্যাক করাতে পারবে? মাতৃবন্দনায় অধিতীয়া হওয়ার জন্য বোসপুকুর শীতলা মন্দিরের বন্দনা রাহা ঠিকই করেছেন শহরের যত আন্তাকুঁড়ের জঞ্জাল আছে—সব নিয়েই তিনি প্যাণ্ডেল বানাবেন। শুধুমাত্র আখের ছিবড়ে দিয়েই ৭ ফুট কৃষ্ণলীলার মডেল বানিয়েছেন বন্দনাদেবী। তা বটে! বন্দাবনের বাঁশিফোঁকা কেটকিশোরকে দেখে এখনও মন ওইভাবেই আখের ছিবড়ের মতো চিমসে হয়ে যায় অনেক তরুণীরই। বন্দনাদেবী আবাব পুজোর এই জঞ্জাল-বাজেটের কিছুটা দিয়ে একটা মড়া বয়ে নিয়ে যাওয়ার গাড়ি কেনারও প্ল্যান করেছেন। আসলে, মানুষ পটল তোলার পর মৃতদেহটাও তো তার বউ-ছেলে-মেয়ের কাছে জঞ্জাল হয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ প্যান প্যান করে কেঁদে নিয়ে মড়াকে শ্মশানঘাটে চালান করে দাও। কসবারই খেয়ালি সংঘের এবার খেয়াল হয়েছে—দেবী আরাধনাতে নারকেলকে জাতে না তুললেই নয়। হাজার হোক, মহাতেজী ঋষি বিশ্বামিত্র তো একবার নারকেল থেকেই মানুষের 'বাচ্চা প্রায়' বানিয়ে ফেলেছিলেন আর কি, টেস্টিটিউব বেবি আর জেনেটিক ক্রোনিং-এর তোযাক্কা না করেই। নেহাৎ শিবঠাকুর আব বিষ্ণু এসে বিশ্বামিত্রের এই মানুষ প্রোডাকশনকে ধামিয়েছিলেন, তাই রক্ষা। এঁদের প্যাণ্ডেলে চারদিকে শুধু নারকেলের ছোবড়া, নারকেলের আঁশ আর নারকেল গাছের গুড়ি। দেখে বলতেই হবে—ব্রহ্ম নয়, নারকেল সত্য, জগৎ মিথ্যা।

অনেকেই ভেবেছিলেন, বড়বাজারের আলু পোস্তার মধ্যেই যখন আছে, তখন আলু বা আলুর বস্তা দিয়েই হয়ত এবার দর্পনারায়ণ স্ত্রীতে দেবী দুর্গার কাঠামো বানানো হবে। তবে, চন্দ্রমুখী বা চুপড়ি আলু—দুটোরই কেজিদের ততটা সুবিধার নয়। গণেশ আর কার্তিককে একেই আলুভাতে মার্কা দেখতে। সেজন্য এঁরা শুধুমাত্র বাতিল, ছেঁড়া শাড়ি আর মাটির সরা দিয়ে দুর্গা-মূর্তি গড়েই দর্পের পরিচয় দিতে চেয়েছেন। মা দুর্গা আর তাঁর সন্তান সন্ততিদের বরাত সত্যিই মন্দ। পুজোয় সবাই নতুন ড্রেস চড়াবে, অথচ যাকে নিয়ে পুজো তাঁকেই এভাবে বন্যাত্রাণে রিলিফের সেকেন্ডহ্যান্ড শাড়ি পরতে হচ্ছে। যা হোক এই পুজো কমিটি আগের বারের মতো এবারও মা দুর্গার সব অঙ্গে গোবরের নকশা তোলেনি! করবাগান সার্বজনীন এবাবও নিষ্কর, বাতিল হয়ে যাওয়া জিনিস নিয়ে মাকে ওয়েলকাম জানিয়েছে, তারা বেছে নিয়েছে প্রায় ৪০ হাজার ধুধুলের ছোবড়াকে। অনেকেই বলাবলি করেছেন—আখের গুড় দিয়ে দুর্গা বানানো তো যেত। বিসর্জনের দিন সিঁদুর পরানোর সময় মা-বোন-পিসি আর ইয়েদের হাতে দু'টো করে আটার রুটি দিয়ে দেওয়া হত। বিসর্জনের খরচাটাও বাঁচত, আবার গুড়-রুটির কল্যাণে বিজ্ঞায় মিষ্টিমুখও হত।

অকপটে



সমরেশ মজুমদার

ধরা যাক, একজন লেখক যে গল্প লিখছেন তার কেন্দ্রীয় চরিত্র কোষ্ঠকাঠিন্যে ভোগে। চরিত্রটি টয়লেটে গেল। কমোটে অর্দ্রনগ্ন হয়ে বসল। এবং তারপর তার প্রয়াস যদি লেখক পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বর্ণনা করে চলেন এমনকি তার শরীর থেকে নির্গত মলের রং, আকৃতি এবং পরিমাণের বিস্তৃত বর্ণনা লিখতে থাকেন তাহলে সেই গল্পকে সাহিত্য বলা হবে?

লাল শায়ায় ইস্তি

কোনটা মীল কোনটা অমীল তার পার্থক্য একদল চটপট করে ফেলেন, একদল ধন্দে পড়েন। বলেন, কার মন কিভাবে নেবে সেটা তার মনের ওপর নির্ভর করছে।

একসময় গুরুজনের সামনে 'শালা' শব্দটা আমরা উচ্চারণ করতে পারতাম না। সেটা তাদের কানে অমীল শোনাত। রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র তো বটেই, কম্রোলের অনেক লেখকও 'শালা' শব্দটি লেখেননি। অন্তত গালাগাল হিসেবে ব্যবহার করেননি। এখন শালা অত্যন্ত নিরীহ শব্দ।

অনেক মহিলা বিরক্তি প্রকাশের সময় সহজেই উচ্চারণ করেন। অল্পবয়সীরা তো বটেই, আমেরিকা বাসিনী এক খ্রোটা সেদিন বলছিলেন, শালা বড় হয়ে গেছে তবু এখনো ছোঁকছোকানি গেল না। ওঁর মনেই হয় না শব্দটা অমীল। আমরা যারা প্রকাশ্যে মেয়েদের সিগারেট খেতে দেখতে অবস্টি বোধ করি তাদের কানে অবশ্য ঝট করে লাগে। অথচ শালার বদলে এখন রাস্তাঘাটে অনর্গল যে শব্দটি ছেলেরা ব্যবহার করে তা পুরুষদের দু'অক্ষরের প্রতিশব্দ। আমার বাড়ির রকে তো মিনিটে একবার উচ্চারিত হচ্ছে। বিরক্ত হয়ে প্রতিবাদ করতে গিয়ে জানতে পারলাম, শব্দটা যে অমীল তা ওরা জানেই না। কেন খারাপ কথা বলছ, স্খিঙ্কাসা করলে জবাব দিল, কোনো খারাপ কথা ওরা বলছে না। এক বন্ধু আমায় বোঝালেন, মানুষের শরীরের বিভিন্ন অংশ, যেমন, হাত, পা, মুখ গলা যদি অমীল না হয় তাহলে ওই শব্দটি কেন অমীল হবে? ঢাকা থাকে বলে? তাহলে তো 'স্তন' শব্দটি অমীল হয়ে যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ যদি মনে করতে স্তন অমীল তাহলে নিশ্চয়ই লিখতেন না। এরাও পুরুষদের প্রতিশব্দটিকে অমীল বলে মনে করছে না। অমীল হলে মানুষ কেন বহন করবে?

অর্থাৎ, বন্ধুবর আমার মীল এবং অমীল ভাবনাকে গুলিয়ে দিলেন।

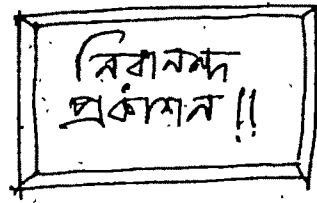
মহাভারতের পাতায় পাতায় যৌনবিহারের কাহিনী। এই অঙ্গরা অমুক মুনিকে প্রলুব্ধ করেছেন, ওই দেবতা মর্ত্যের এই মহিলায় সঙ্গে এসে শুচ্ছেন, কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, কখনো তাদের সঙ্গমের বিস্তৃত বিবরণ কোথাও নেই। এবং প্রতিটি মিলনের পরে যে সন্তান আসছে সে কোনো না কোনো ইতিহাস তৈরি করছে। সেখানে অমীলতা প্রাধান্যই পাচ্ছে না। নগ্ন শরীর অমীল নয়, সেই শরীরে ঢেউ তুললে বা মোজা পরালে অমীলতা দেখেন অনেকেই। কিরণময়ী দিবাকরকে চুমু খেতে পারে, এটা অমীল নয়, কিন্তু খাওয়ার পরে খিল খিল করে হেসে ওঠাটা নাকি অমীল। ঠিক বুঝতে পারি না।

তরুণ বয়সে লেডি চ্যাটার্জিস লাভার পড়েছিলাম অমীলতার সন্ধান করতে। তেমন খুশি হইনি। সমরেশ বসুর বিবর, প্রজাপতি, পাতক, বুদ্ধদেব বসুর রাতভোর বৃষ্টি পড়ার সময় সাহিত্য ছাড়া অন্য কিছু মনে আসেনি। যেসব মামলা হয়েছিল সেগুলোকে হাস্যকর মনে হত আমার। যিনি মামলা করেছেন তিনি তো ওই সব উপন্যাসের পাঁচটা লাইনও কখনো লিখতে পারবেন না। প্রয়োজন হলে নিশ্চয়ই সঙ্গমের কথা বলা যেতে পারে। কিন্তু যা সবাই জানে তার বর্ণনা দেওয়ার মধ্যে শিল্প নেই। বাংলা সাহিত্যের সম্পদ ওই বইগুলোর মধ্যে যারা অমীলতা খুঁজেছেন তাঁরা বাতিকগ্রস্ত মানুষ।

কলেজে পড়ার সময় এক সহপাঠীকে গোপনে বই পড়তে দেখেছিলাম,

স্কটিশের সামনে হেদুয়ার নির্জন দুপুরে সে তন্ময় হয়ে বইটি পড়ছিল। হঠাৎ গিয়ে পড়ায় লুকোবার চেষ্টা বিফল হওয়ায় স্মার্ট হয়ে বলেছিল, 'বই পড়ছি। বই পড়া তো অপরাধ নয়।' এখনো মনে আছে, বইটির নাম ছিল 'লাল শায়া'। কোনো মলাট নেই। কোথায় ছাপা হয়েছে তার নির্দেশ নেই, শুধু লেখা ছিল, চিংপুং, কলিকাতা। প্রথম লাইনেই ছিল, বউদি ঠাকুরপোকে তার লাল শায়া দেখাচ্ছে। চতুর্থ লাইন থেকে তাদের যৌন মিলনের বর্ণনা যাবতীয় অকথ্য শব্দ সঞ্চয় করে বর্ণনা করা হয়েছিল। কয়েকটা লাইন পড়ার পর শরীর যিনঘিন করে উঠেছিল। সহপাঠী গর্বিত গলায় বলেছিল, সে দৈনিক তিনটাকা ভাড়ায় বইটি এনেছে। দশটাকা জমা রাখতে হয়েছে।

সেই প্রথম এবং শেষ। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত ওই ধরনের বই আমি চোখে দেখিনি। বাংলা ভাষায় যে ওইরকম শব্দাবলী লিখে ছাপা যায় তা জেনে খুব কষ্ট পেয়েছিলাম। অনেক পরে মাস্টারমশাই নারায়ণ



জগদ্বন্দ্য, যাদের
ওঁরা চালায় থাকে !!



বাংলা সাহিত্যের এতকালের ইতিহাসে এমন ঘটনা কখনো ঘটেনি। আর সেই লেখা প্রচারিত করার জন্যে প্রকাশক যদি চোখে ঠুলি আর পিঠে কুলো বেঁধে মাংসওয়ালার হাসি হাসেন তাহলে তো কথাই নেই।

গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে বইটির উল্লেখ করেছিলাম। মাস্টারমশাই বলেছিলেন, 'এটা স্বাভাবিক নয়। অনেক অবিবাহিত পুরুষ বার্ষিক পৌছেছেন অথচ তাঁদের জীবনে নারী না আসায় এই বইগুলো পড়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। আবার অনেক বিবাহিত পুরুষের মনে অবদমিত বিবৃতি আকাঙ্ক্ষা এত প্রবল যে বইগুলো তাদের শান্ত করে। ধরে নাও যে কারণে পতিতাপন্নীর উদ্ভব, এই বইগুলোও সেই কারণেই ছাপা হয়ে থাকে।'

এতদিন তো এসবই জ্ঞানতাম। জীবনে যা ঘটে তাই সাহিত্য নয়। জীবনের মা যেভাবে কাঁদে সাহিত্যের মা সেভাবে কাঁদলে আর যাই হোক শিল্প হয় না। সেদিন একজন বড় প্রকাশক হাসতে হাসতে বললেন, 'বাং, জীবনে যা ঘটছে, যা স্বাভাবিক, তা গল্প-উপন্যাসে লিখলেই খাই খাই-রব উঠবে কেন? তাহলে জীবনে ওগুলো ঘটাবেন না।'

তিনি যে অশিক্ষিত, কিছু বোঝেন না, এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। ধরা যাক, একজন লেখক যে গল্প লিখছেন তার কেন্দ্রীয় চরিত্র কোষ্ঠকাঠিন্যে ভোগে। চরিত্রটি টয়লেটে গেল। ক্রমোচ্চ অর্জন হয় বসল। এবং তারপর তার প্রয়াস যদি লেখক পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বর্ণনা করে চলেন এমনকি তার শরীর থেকে নির্গত মলের রং, আকৃতি এবং পরিমাণের বিস্তৃত বর্ণনা লিখতে থাকেন তাহলে সেই গল্পকে সাহিত্য বলা হবে? আমরা সবাই পিতামাতার শারীরিক মিলনের কারণে পৃথিবীতে এসেছি। এই সরল সত্য নিয়ে আমরা কেউই মাথা ঘামাই না। কেউ পিতা বা মাতাকে প্রশ্ন করি না—সেই মিলনের সময়টা কখন ছিল? দিনদুপুর না সন্ধ্যা অথবা শেষ রাত? আমরা জানতে চাই না মিলনের সময় কার কি ভূমিকা ছিল। এই জ্ঞানতে চাওয়াটাই পৃথিবীর অশ্লীলতম কাক্সের একটা। আমরা বাবা-মায়ের কাছে কৃতজ্ঞ থাকি এই পৃথিবীতে নিয়ে আসার জন্য। আবার আমরাই যখন

বাবা-মা হয়ে সন্তানের জন্ম দিই তখন নিজেরাই ভুলে যাই ওই মিলনের কথা, ভূপ্তির আনন্দে বুদ্ধ হয়ে থাকি।

মনে আছে বনফুল নবকল্লোল পত্রিকায় 'হাটে বাজাবে' উপন্যাস লিখেছিলেন। তাতে 'আলুর দোষ' শব্দ দুটি ছিল। তাতেই সে সময় অনেকে বিরক্ত হয়েছিলেন। এঁরা বয়সপন্থী। অধিকাংশ পাঠকই কৌতুক বোধ করেছিলেন। বুদ্ধদেব বসু 'রাতভোর' বৃষ্টির শুরুতেই 'ওটা হয়ে গেল' বলে যে কথা বোঝাতে চেয়েছিলেন তার অর্থ ধরে নিয়ে কিছু বাঙালি পাঠক টেটিয়েছিল। হাংরিদের কথা ছেড়ে দিলাম, শক্তি চট্টোপাধ্যায় যখন লিখেছিলেন 'পৌদে মারব লাঠি', তখন সেটাকে একটুও খারাপ লাগেনি, কারণ তার আগের লাইনে ছিল, 'চোয়ালে ধানপড় যদি কম হয়।'

কিন্তু লেখার হাত আছে, কলমে জোর আছে, চমৎকার চরিত্র বিশ্লেষণ করতে পারেন, পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতে যিনি সক্ষম, এমন একজন লেখক যদি হঠাৎ সব ছেড়েছড়ে যৌনমিলনের বিস্তৃত বিবরণ লিখতে শুরু করেন, শুধু চরিত্রের মুখ দিয়ে নয়, লেখক হিসেবে বর্ণনা করার সমর্থ ওইসব শব্দ অনায়াসে লিখে যেতে পারেন, তাহলে মনে হওয়া স্বাভাবিক, তিনি আমার সেই সহপাঠীকে চাইছেন, যে লুকিয়ে লুকিয়ে তাঁর বই পড়বে। হয় কিনে নয় ভাড়া নিয়ে। বাংলা সাহিত্যের এতকালের ইতিহাসে এমন ঘটনা কখনো ঘটেনি। আর সেই লেখা প্রচারিত করার জন্যে প্রকাশক যদি চোখে ঠুলি আর পিঠে কুলো বেঁধে মাংসওয়ালার হাসি হাসেন তাহলে তো কথাই নেই।

এই ক্ষেত্রে শ্রীল-অশ্লীলের লড়াই-এ এঁদেরই জিত হবে। এঁদের প্রতিনিধি আদালতে গিয়ে সওয়াল করবেন, 'ধর্মাবতার, আমাদের বাবা-মা যদি ওই কর্ম ঠাকুরা বেঁচে থাকতে করতে পারেন তাহলে আমরা লিখলেই অন্যায অশ্লীল হবে? তাহলে দয়া করে বাবা-মাকে শাস্তি দিন, কারণ তাঁরাই তো প্রথমে অশ্লীল কর্ম করেছেন।'

জাম্বু

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়



দীর্ঘদিন বেকার বসে থাকলে একটি সুদপদেশ সবাই দেবে, বসে না থেকে টাইপটা শিখে ফেলো। দুলুকেও সেই উপদেশ দিল অনেকেই। পৃথিবীতে এই একটা জিনিসই আছে, উপদেশ। কিনামূল্যে সবাই দিতে চায়, অযাচিত, নিতে চায় না কেউ। দুলুও চাইল না। বলল, 'শিখে কী করব? চাকরি হবে?'

উপদেশদাতা বাবার তাসের ইয়ার। দুলু ডাকে নুপেন কাকা। আড়ালে বসে ন্যাপা।

ন্যাপা বলল, 'আর দু'পাঁচ বছর আগে জন্মালে হত বৈকি। ঐ সবারকলে সেদিনও ঘন্টা বাজিয়ে লোক নিত। চাকরির হরির লুট।'

রং চড়িয়ে বলা ন্যাপার স্বভাব। শহরসুদু লোকে জানে। কেউ অবিশ্বাস্য রকমের কিছু বললেই অল্প বয়সীরা তাকে বলত ন্যাপামি। ন্যাপার ন্যাপামি শুনে বাবার ইয়ার বলে আর রেয়াত করতে পারল না দুলু। বলল, 'একজন একসঙ্গে দুটো-তিনটেও কুড়িয়েছে তাহলে?'

ন্যাপা একটু দমে গেল। বাপের বন্ধু, কাকা ডাকে। গুরুজন। তার সঙ্গেও মকরা হচ্ছে। কি দিনকাল পড়ল। মনোভাব গোপন করে বলল, 'বাড়িতে বসে আছি, তাই বলছিলাম শিখে রাখলে ক্ষতি কী।'

—সেই বাড়িতেই বসে থাকব।

ন্যাপা বলল, 'চুল ধারণা বাবা। বাড়িতে বসে থাকবে কেন? টাইপিস্ট, মিস্ত্রি, নাপিত কখনো বাড়িতে বসে থাকে? কোর্টের বারান্দায় গিয়ে বসবে।'

—হাউস ফুল। বারান্দায় জায়গা নেই।

—বারান্দায় না হোক, অশথ গাছের নিচে বসবে। গাছতলা থেকে কত লোক বারান্দায় উঠে গেল, আমার দ্যাখতাই। ভালো ইনকাম। কতজনকে দেখলাম একখানা লজ্জবর মেশিন নিয়ে বসল, এখন তিনখানা মেশিন। ভাড়া খটায়।

অসহ্য। একটু চূপচাপ রোয়াকে বসে থাকতেও দেবে না লোকটা। খালি ন্যাপামি! উঠে দাঁড়াল দুলু। ঠেক বদল করতে হবে। পাশেই সাইকেল ঠেস দেওয়া ছিল দেয়ালে। কিছু না বলে সেটা নিয়ে হাঁটতে শুরু করল। ন্যাপা বলল, 'কোথায় চললে বাবা?'

দুলু না থেমে বলল, 'চুচড়ো। এত করে বলছেন, কোর্টের দিকটা একটু ঘুরে দেখে আসি।'

এমনি উপদেশের হাত থেকে বাঁচতেই একদিন সত্যি সত্যি টাইপ স্কুলে ভর্তি হয়ে গেল দুলু।

বাবাদের কালে কাজিডাঙা ছিল গ্রাম। কাছেই ব্যাণ্ডেল স্টেশন। রেলবাথুরা কেউ কেউ বাড়ি-টাড়ি করেছে। তাতেই যা একটু চেকনাই ছিল তখন। দেখতে দেখতে জমি অগ্নিমূল্য। লোকবসতি ঘন। পুরসভা করে ফেলল কর্পোরেশন। এখানকার কিছু লোক সাহেব কোম্পানির সবারকলে, আর লেখাপড়া জানারা কলকাতায় চাকরি করে। ব্যাণ্ডেল থেকে ট্রেনে যায়, ট্রেনে আসে।

কেউ যদি বলত, 'আজকাল কী করছ?' দুলু বলত, 'টাইপ করছি।'

কেউ কেউ আবার তির্যক ভঙ্গিতে বলত, 'তা না হয় করছ, এরপর কী করবে?' দুলুর তৈরি জবাব, 'কেন, ডেলিপ্যাসেঞ্জারি।' বন্ধুরা সাবাসি দেয় দুলুকে। কথার পিঠে কথা বলতে ওস্তাদ।

ইংরেজির ওপর দখল থাকলে নিয়োগকর্তারা পছন্দ করে। চাকরির সুলু-সন্ধান দেওয়ার হরেক রকম পত্রিকা বেরিয়েছে, তার কোনো একটাতে এই টিপস্ দিয়েছিল ইন্টারভিউ স্পেশালিস্ট।

ইংরেজি মানে স্পোকেন ইংলিশ। কথাটা মনে ধরল দুলুর। আরো একটা পরামর্শ ছিল সেই পত্রিকায়। কথা বলবেন স্মার্টলি। কোনো প্রশ্নের উত্তরে ফাঙ্কল করবেন না। চটজলদি যা হোক একটা উত্তর দিয়ে দেবেন। মনে রাখবেন, প্রশ্ন যারা করে বাহাদুরি দেখাবার জন্যে করে, কর্মপ্রার্থীকে ঘাবড়ে দেওয়ার জন্যে করে। সব সঠিক উত্তর তারা নিজেরাও জানে না। একটা উদাহরণ দিয়েছিল লেখাতে। মনে করুন, আপনাকে জিজ্ঞেস করল, ক্রিপটোর বাবার নাম কি? আপনি জানেন? আপনি হয়ত ক্রিপটোরই নাম শোনেননি, তার আবার বাবা। উরে বাব্বা, বলে চুপ করে থাকবেন না। চটজলদি বলে দেবেন, ক্রিপটোর ফাদার ইজ তার মাদার হাজ্জব্যাপ্ত।

দুলু চর্চায় লেগে পড়ল। বন্ধু-বান্ধবদের বলে দিল, 'যখন যার যা প্রশ্ন মনে আসবে, ফার্স্ট আমাকে জিজ্ঞেস করবি।' মজার খেলা। দুলুর বাবা পরমেশ্বর, পশ্চাতের ঈশ্বর ছেঁটে ফেলে পরমেশ। ছেলে চাকরির ইন্টারভিউয়ের জন্য তৈরি হচ্ছে দেখে মনে মনে খুশি হল। অভিজ্ঞ মানুষ। জীবনে অনেক কিছু করেছে। একদিন বলল, তৈরি থাকা ভালো। কিন্তু ইন্টারভিউ কল দিচ্ছে কে? এখন তো শুনি পিওনের চাকরি পেতেও মিনিস্টার ধরতে হয়।

বাবার খালি ডিসকারেজ করা। মিনিস্টার ধরতে হয়। —তোমার তাসের ইয়ার ন্যাপা যে বলে তোমাদের সময় রবারকলে ঘণ্টা বাজিয়ে লোক নিত? তখন তাহলে নিজে একটা জোটাতে পারলে না কেন? মনে মনে দুলু বলল। খালি লম্বাচোড়া কথা। বাতলিং।

দুলু বলে, বাবাটা একটা ডেলপুরি।

ও দেখেনি, মায়ের কাছে শুনেছে, বাড়িতে চৌকির নিচে দুটো ঝাণ্ডা রেখেছিল। একটা তেরগা, একটা লাল। কোনদিকে হাওয়া ঘোরে দেখে ঠিক করবে কোনটার নিচে যাবে।

কোনোদিকেই পাশ্র না পেয়ে পরমেশ ব্যবসা করবে ঠিক করল। ব্যাণ্ডেল স্টেশনের কাছে রেলের জমিতে ঘর বানিয়ে দোকান খুলল। চায়ের পেটিতে ঘর ঠাসা। পেটির পেটে পিছু নেই। শুধু খুচরো বিক্রির জন্যে বিস্কুটের হাফটিনের মতো টিনে দু-তিন কিসিমের চা-পাতা। বায়েন টি হাউস।

দুলু মনে মনে বলে, 'চাও নেশা। নেশার দোকানই যদি দিলে, দিশি মালের দোকান ম্যানেজ করতে পারলে না একটা? নিদেনপক্ষে গাঁজা আফিমের? যখন হাত বাড়ালেই মিনিস্টার ধরা যেত, তখন নিজে ধরতে পারলে না, এখন অ্যাডভাইস দেওয়া হচ্ছে। তখনকার মিনিস্টার আর এখন আছে? দিনে দিনে তাদের অনেক নিরাপত্তার বেষ্টনী, একটা পেরুলে আর একটা। মিনিস্টার তো না যেন মোচা।'

পরমেশের কথার জবাবে বুলু বলল, 'কাউকে ধরতে হবে না। আর পিওনের চাকরির জন্যে খাটছি নাকি?'

টাইপিং প্র্যাকটিসের চেয়ে চটজলদি কথা প্র্যাকটিসে দুলুর আগ্রহ বেশি। বন্ধুদের বলা আছে। ব্যাণ্ডেল রেল স্টেশনের গায়ে রেলের ইনস্টিটিউট। জমাটি আড়ার জায়গা। লাইট আছে, ফ্যান আছে। সব

রেলের খরচা। দুলুর বন্ধুরা ওখানে এসে ঠিক দুলুকে পেয়ে যাবে। দারুণ দারুণ প্রশ্ন নিয়ে আসে বন্ধুরা : আচ্ছা বল তো মরে গেলে নাকে তুলোর ডেলা শুঁজে দেয় কেন?

দুলু বলল, 'যাতে ফাদার নিঃশ্বাস নিতে না পারে।' বলেই অন্যদের দিকে আঙুল নাচিয়ে বলল, 'তোরা কিছু প্রাকটিশ দে আমাকে। এনি মোর কোশ্চেন?'

একটা অফিসে ডাক পেল দুলু।

তারা এমন একজন লোক চায় যে তাদের টুরিং অফিসারদের ট্রেনের বার্থ রিজার্ভ করবে। ওয়েটিং লিস্টে থাকলে কনফার্মেশনের জন্যে তদ্বির করবে। ভালো ইংরেজি ও টাইপ জানা আবশ্যিক। প্রয়োজনে নিজেই চিঠি ড্রাফট করবে, টাইপ করবে। শুধু একজন অফিসারের সই করিয়ে নিতে হবে। এরকম স্বাধীন দায়িত্ব।

ইন্টারভিউতে একজন জিজ্ঞেস করল, 'আমরা দায়িত্বশীল কর্মঠ একজন লোক চাইছি। দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে। পারবেন?'

এতদিন ধরে তৈরি হয়েছে দুলু। মুখ চুলবুল করে উঠল। বলল, 'আপনারা ওয়েস্ট বেঙ্গলের জন্যে লোক চাইছেন তো?'

—'অফ কোর্স।'

—'বাঙালিই নেবেন তো? সন অফ দ্য সয়েল?'

প্রশ্নকর্তা বলল, 'সুইটেবল ক্যান্ডিডেট হলে নেব।'

দুলু বলল, 'জিজ্ঞেস করছেন দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে পারবু কিনা। আচ্ছা, ওয়েস্ট বেঙ্গলে এমন বাঙালি পাবেন, যে ইন্টারভিউয়ে সত্যি কথাটা বলবে—পারব না?'

প্রশ্নকর্তা বিরক্ত হয়ে বলল, 'আপনি পারবেন কিনা বলুন।'

দুলু বলল, 'পারব'।

বলেই মনে পড়ে গেল, চাকরিপ্রার্থীর চটজলদি ইংরেজি উত্তর পেলে ইন্টারভিউ বোর্ড খুশি হয়। দুলু স্মার্টলি বলল, 'বাট ইন শিয়ালদা, হাওড়া, ফেমারলি প্রেস, কমলাঘাটা, আর যেখানেই হোক স্যার, বার্থ কন্ট্রোল ইজ ডিফিকাল্ট।'

শুনে প্রশ্নকর্তার চক্ষুস্থির। হতবাক হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল দুলুর দিকে। তারপর তার কেমন-দিলাম-একখানা গোছের আশ্চর্যত্ব মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'ভেরি গুড। ইউ টাই ইন দ্য ক্যামেলি ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট।'

আর একজায়গায় টাইপ টেস্টে বসতে হল।

সুপারভাইজার টাইপের নমুনা দেখতে দেখতে এক জায়গায় এসে থমকে গেল। 'এটা কী? ডি এন আই?'

'ডু দ্য নিডফুল ইমিডিয়েটলি।' খুব আশ্চর্যত্ব দেখাল দুলুকে। সুপারভাইজারের ব্যাজার মুখের দিকে চেয়ে বিশদ করে বলল, 'বাংলার আছে না, এক কথায় প্রকাশ করো, সেইরকম আর কি?'

সুপারভাইজার বলল, 'ওয়াই এম জি।'

—'মানে?'

—'ইউ মে গো।'

দুই

বায়েন টি হাউস নামেই চায়ের দোকান। ফাঁপা পেটির দেয়ালের আড়ালে তাদের আড্ডা। নূপেন কাকার বুদ্ধি। সময় কাটাতে হবে তো। দেখতে দেখতে তেসুড়ে জুটে গেল অনেক।

সতু দাস তাসের আড্ডায় এসে পরমেশকে জপায়। বলে, 'আমার কথা যদি শোনেন, দোকানঘরখানা ছইড়া দ্যান। পার্টির লোকাল অফিস হোক ঘরটায।'

'তারপর আমি কী করব?'

'যরে বইয়া ভাড়া পাইবেন। পার্টি ডবল ভাড়া দিবে।'

'আর কী দেবে?' পরমেশ বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল।

সতু বলল, 'শোনেন কথা। আবার কী দিবে?'

নুপেনের জুটি বক্সিম বলল, 'কেন, শ্রোগান!'

এই টিম্বুনি আর কটাক্ষ নিয়ে একদিন হুলুস্থল বেধে গেল। বায়েন টি হাউসের সামনে দাঙ্গা লেগে যাওয়ার উপক্রম। চায়ের পেটির পার্টিশনের আড়ালে তখন ভয়ে কাঁপছে নুপেন আর বক্সিম। অতর্কিত হামলায় বিমূঢ় তারা। আত্মগোপন করতে গিয়ে ছোটোপাটিতে দুটো চায়ের ফাঁকা পেটি ফেলে দিল দুন্দাড় করে। রেল কলোনির মেয়ে নিবু ছোটোখাটো নেত্রী। হাতে লাল পতাকা। হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, 'কমরেডস, ওই দেখুন, ধর্মের পেটি বাতাসে পড়ে।' বলেই হস্টার দিল, 'এখানে কংগ্রেস বাইরে থেকে শুভা এনে লুকিয়ে রেখেছে।' মেয়েটার দাপট দেখে পরমেশ হকচকিয়ে গেল।

সেদিনের কালোকুলো ছোটোখাটো ফ্রকপবা মেয়ে। অববে সবরে চা নিতে আসত পরমেশের দোকানে। পাকা পাকা কথা বলত। দিন কত দ্রুত চলে যায়। দেখতে দেখতে সেই মেয়ে নিবু, ভালো নাম নিবেদিতা, শাড়ি ধরল। স্কুল ফাইনাল পাশ কবল। তারপর হঠাৎই একদিন পরমেশ দেখল মেয়েটা পার্টির কাজে লেগে পড়েছে। পার্টিফাণ্ডের চাঁদা তুলত কৌটো নাচিয়ে। তখন অ্যাগ্রেসনটিস। পার্টির কাজে হাতেখড়ি হচ্ছে। বায়েন টি হাউসেও আসত। বলত, 'কিছু দিন জেহু। চায়ের গুড়ো না কিন্তু। সিকি আধুলি যা হোক। মিনিমাম দুটো আধুলি কি চারটে সিকি। আমাদের পার্টি এবার ইলেকশন লড়বে। দেখুন না কী করে গন্সেন্ট ক্যাপচার করি।'

ইতিমধ্যে পুরসভা হয়ে গেছে। নাম কোদালিয়া কাজিডাঙা মিউনিসিপ্যালিটি। সেটা কংগ্রেসের দখলে। পরমেশ বলল, 'উঃ। হলে ধরতে পারে না, কেউটে ধববে। পুঁচকে একটা পুরসভা দখল করতে পারে না, ওরা করবে গন্সেন্ট।' বলতে বলতে একটা সিকি ঢুকিয়ে দিল কৌটোয়।

'মাত্র চার আনা!'

'আপে দেখি গন্সেন্ট ক্যাপচার কর, তখন আসিস।'

নিবু চমকে দিয়েছিল পরমেশকে। বলেছিল, 'আমাদের পার্টিব এখন স্ট্র্যাটেজি কী জানেন? যেখানে পাবো চুকে যাও। পুজো কমিটি, লাইব্রেরি, ক্লাব, থিয়েটার, কো-অপারেটিভ, মেলা, ইস্কুল কমিটি, নাগরিক সমিতি, ট্যাক্সপেমার্স অ্যাসোসিয়েশন, কলোনি উন্নয়ন, শ্মশানঘাট সংস্কার—'

'শুধু মিউনিসিপ্যালিটি বাদ।'

নিবু বলেছিল, 'প্রত্যেকটা পকেট ভোটব্যাক। এ হচ্ছে নিডল অ্যান্ড ফাল নীতি। ছুঁত হয়ে ঢোকো, ফাল হয়ে বেরোও।'

তিন

কালিদাস মাস্টার শখের জ্যোতিষি করে। তাকে হাড় দেখিয়েছিল দুলু। হুত্বরেখা বিচার। তখনো দুলু জাম্বু হয়নি। এখন ভাবে, ইস কী ছেলেমানুষীই করেছিল। যত্নতো বোগাস। পার্টির লোকেরা জাম্বুর এসব পাষ্ট জানে না। জানাজানি হলে এই নিয়ে কথা উঠতে পারত। কোমরে ভাগ্য ঘনসি

থাকতে পারে, হাতায় ঢাকা কবচ মাদুলি থাকতে পারে। ব্রাহ্মণের ঘরের কমরেডের পৈতে অ্যালাউড, প্রোভাইডেড—কোমরে জড়ানো থাকবে। কিন্তু প্রকাশ্যে হাত দেখানো, ভাগ্য গণনা—এসব চলবে না। যে মানুষ এসব কুসংস্কারে বিশ্বাস করে সে কিছুতেই আর্থমার্ক প্রগতিশীল নয়। রক্ষণশীল প্রতিক্রিয়াশীল ইত্যাদি পক্ষশীল বক্ত তার গায়ে। রক্ত শোধন করতে হবে। দুলু জাম্বু হয়ে প্রথমই একটি প্রগতিশীল কাজ করল বাড়িতে। চ্যারিটির মতো প্রগতিও বিগিন্স অ্যাট হোম। দুলু বাবাকে আলাদা করে দিল। বলল, 'তোমার বউ নিয়ে তুমি যাও। আমাব বউ নিয়ে আমি খাই। হিজ হিজ, হজ হজ।'

এসব অনেক পরের কথা। আগের কথা আগে সেরে নিই।

দুলুর বন্ধুদের একজন চাকরির একটা নতুন উপায় বার করেছে। রবারকলের এক ওভারসিয়বেব মেয়েকে বিয়ে করল বেকার অবস্থায়। বিয়ের পব শ্বশুর ভলাটারি বিটায়ারমেন্ট নিয়ে জামাইকেচাকরিতে ঢুকিয়ে দিল। তার ছেলে নেই। দুলু যখন ওই লাইন ধরবে ধরবে করছে তখন রবাবকল আইন বদল করল। ভি আর নিলে সে জায়গায় চাকরি হবে না। চাকরিরত অবস্থায় কর্মচারীর মৃত্যু হলে তবেই তার নিজের লোকের চাকরি হবে। সেখা গেছে যেখানে ছেলে বা জামাইয়ের চাকরি দরকার সেখানে বাবা বা শ্বশুর বড় অবিবেচক। টাইমলি মরে না। এই শর্তে বিয়ে দেওয়াও উঠে গেছে। পাছে চাকরির লোভে কর্মরত শ্বশুরকে জামাই খুন করে।

হিতেথীরা বলল, 'ববারকল ছাড়া কি কলকারখানা অফিস নেই? সব জায়গায় এক নিয়ম নাকি?' গোপনে বঙ্গ নম্ববে বিজ্ঞাপন দিল তিনটে কাগজে। পাত্রপাত্রীর মার্কেটিং ভালো না। দুলুর মতো পাত্রের মোটেই ডিম্যাণ্ড নেই। একথানা চিঠি এল। রসিকতা না মনেব কথা কে জানে। লিখেছে, 'পাত্রী এক পিসের জায়গায় দু'পিসও দিতে পারি। চাকরি অসম্ভব।'

যার পরামর্শে খরচা করে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল, তাকে ধরল দুলু— 'বুটমট একগাদা পয়সা খবচা করালি আমার।'

সে বলল, 'লিখে দে, আমার চাকরিটাই চাই। পাত্রী একটা না হলেও চলাবে।'

এমন রসিকতা ভালো লাগে না দুলুর। ও মরীয়া হয়ে উঠল। কাছেই ব্যাণ্ডেল জংশন। ভিড়ে গেল ওয়াগন রেকারদেব দলে। গ্রহাবত পুলিশদের সঙ্গে জানপয়চান হয়নি। নতুন মুখ। টর্চের আলো পড়বি তো পড় ওরই মুখে। ভুল বশত প্রথমদিনই বন্দুকের কুঁদোর ঘা দিয়ে হাড় ভেঙে দিল। পরে অবশ্য মাফিয়া-নেতার কাছে ক্ষমা চেয়েছে। বলেছে, 'আপনার লোক জানলে তো পাহারা দিতাম। ভাঙুক না কত ওয়াগন ভাঙবে।' কিন্তু আর সাহসে কুলোয়নি দুলুর।

পাড়ার মেয়ে নিবু তখন চুটিয়ে পার্টি করছে। দুলুব এই দুর্মতি দেখে বলেছিল, 'তুইও দেখছি তোঁর বাবার মতো। টাইমজ্ঞান নেই। টাকা করার কত সহজ রাস্তা রয়েছে। জেহু চায়ের দোকান দিয়ে বসল, আর তুই গেলি ওয়াগান ভাঙতে। কত বললাম, আয় পার্টি কর, শুনলি না। ওয়াগনই ভাঙ আর রাজকোবই ভাঙ, পার্টিব সাপোর্ট লাগবেই।'

ততদিনে নিবুব চেহারা হয়েছে বৃষ্কাঠ। রোদে পুড়ে, জলে ভিজে, গায়ের রঙ হয়েছে কালোজাম। কয়েকদিনের বাসি। আর শ্রোগান দিতে দিতে গলা হয়েছে ভাঙা কাঁসি। সর্বক্ষ ফ্যাস ফ্যাস করছে। উচ্চগ্রামে

না ধরলে কথা বেরোয় না। প্রথমদিকে একবার ই এন টি দেখিয়েছিল। কান-নাক-গলার বিশেষজ্ঞ। তিনি বলেছিলেন, 'ভোকাল কর্ডকে রেস্ট দিতে হবে। না হলে আর শব্দই বেরোবে না। তখন কী করবে?'

নিবু বলেছিল, 'তখন লিখে ছাড়াব।'

পার্টির জন্যে শুধু গলা কি, নিবু প্রাণ দিতে পারে। উঠতি বয়সে সামান্য লাভাণ্য ছিল। বাবা-মা বিয়ের চেষ্টা কিছু কম করেনি। তখন থেকেই স্বরভঙ্গ। তিনবারে হলেও হায়ার সেকেন্ডারি পাশ দিয়েছে। মা বলত, 'পড়ে পড়ে গলা ভেঙেছে।' বিয়ের সম্বন্ধও এসেছে। বিয়ে হয়ে যেতেও পারত। সব হাঁড়ির উপযুক্ত সরা গড়ে রেখেছেন ভগবান। শুধু খুঁজে নেওয়া। কিন্তু নিবুর জন্যেই সেটা হল না। ফ্রকপরা বয়স থেকে পার্টি করছে, কলেজে ইউনিয়ন করেছে। মারামারি ধস্তাধস্তির রেকর্ডও আছে। একবার কলেজের প্রিন্সিপাল আর প্রফেসরদের এক ঘরে তালা দিয়ে আটকে রেখেছিল। সেই থেকে পার্টির ছেলেরা বলে নিবুদি। বিয়ের ব্যাপারে জেদ ধরে বসল, কারো বউ হয়ে অন্য এরিয়ায় যাবে না। ওর এরিয়াতেই ও থাকবে। মা রাগ করে বলত, 'তবে কি পাত্র তোর ঘর করতে আসবে? তুই বিয়ে করতে যাবি? বিয়ে করে বর নিয়ে আসবি? যত ছিটিছাড়া কথা।'

এত করে ফিল্ড তৈরি করেছে নিবু। এ ফিল্ড সে ছাড়াবে না। অনুগামী ছেলেরা নিবুদির জয়ধ্বনি দিল। পার্টির দাদারা তারিফ করল। এমন স্যাক্রিফাইস ক'জন করে? নিবুদি একটা আদর্শ। নিবু-নিবু হয়ে আছে। তুখোড় বুদ্ধি। একদিন মশাল হয়ে জ্বলবে।

দাদারা বলেছিল, 'এখন কাজ করে যাও নিবু, বিয়ের ডের সময় পড়ে আছে। পার্টিতে আইবুড়ো ছেলে কিছু কম নেই। যার-তার সঙ্গে তোমার বিয়ে একটা দিয়ে দিলেই হল। তোমার বাবা-মা রিঅ্যাকশনারি। আদর্শের সঙ্গে আদর্শ জুড়তে হয়, যারা মেড ফর ইচ আদার।'

পার্টি ক্ষমতায় এল।

দাদারা চুপচাপ। আর নিবুর বিয়ের কথা তোলে না। অথচ থেকে থেকে বিয়ের ইচ্ছেটা চাগাড়িচ্ছে। দিনদিন শুকিয়ে আমসি হচ্ছে শরীর। পার্টির ছেলেরা সাইকেলের ক্যারিয়ারে চড়ায় নিবুদিকে। ক্যারিয়ার না থাকলে রড-এ। কারো মোপেড আছে, স্কুটার আছে। তার পেছনেও চাপায়। কিন্তু ওই পর্যন্ত। যতই কমরেড নিবুদি নিবুদি করুক, ওই বৃষকাষ্ট কেউ কাঁধে চড়াবে না। পার্টির কাজে টানার অছিলায় দুলুর ঘনিষ্ঠ হল নিবুদি।

নিবুদি বলল, 'কথাটা ভেবে দেখিস।'

চার

শখের জ্যোতিষী কালিদাস মাস্টারকে কড়কে দিয়েছে দুলু। 'তখন অমল্লা খারাপ ছিল, কোনোদিকে কিছু করতে পারছি না, তাই ডাবলা—তুমি শালা একটি আস্তো ঢামনা। যদি শুনি গাবিয়ে বেড়াচ্ছে—পনেরো বছর আগেই আমি বলে দিয়েছিলাম দুলু চড়চড় করে উঠবে, ভোগা দিয়ে লোক ঠকানো বার করব তোমার।'

কালিদাস ফিউজ হয়ে গিয়েছিলেন। ইস্কুলে ছাত্র ছিল তাঁর।

নড়েডোলা সেই দুলুর জাম্বু হয়েই এ কী পরিবর্তন। একটি আস্ত জাম্বুবান। ভয়ে ভয়ে কালিদাস ওকে আপনি বলতে শুরু করলেন। দুলু ওকে তুমি বলে। তা বলে বলুক। জাম্বুর এখন অনেক ক্ষমতা। ক্ষমতাবান মাত্রই

শুরুজান, তাদের কাছে করজোড়ে নতজানু হয়ে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। স্কুল কমিটিতেও ওদের লোকেরাই সংখ্যা বেশি। এক্সটেনশান আছে, পেনশন আছে, জাম্বুকে একটু তোয়াজ করেই চলতে হয়।

এখন ভাবলে হাসি পায় জাম্বুর।

করকোষ্ঠীর এইসি-তেইসি রে শালা। আতস কাচ দিয়ে হাতের রেখা পর্যবেক্ষণ করা হল খানিকক্ষণ। হাতের পাঞ্জা উপড় করে দেখছে। নখের ওপর আতস কাচ ফোকাস করছে। হাতল লাগানো কাচ এগিয়ে ধরছে, পিছিয়ে ধরছে। কত নকশা। ফোরকাস্ট হল, 'পর্যব্রিশ বছর পর্যন্ত সময়টা খারাপ যাবে।'

খুব আশা আগ্রহ নিয়ে জাম্বু জিজ্ঞেস করেছিল, 'তারপর?'

'তারপর সেটা সয়ে যাবে।' গম্ভীর গলায় কালিদাস বলেছিলেন।

স্থানীয় একটা স্কুলের শিক্ষক। শালা সব বুজুকি। চেরো না কেরোর একখানা বাংলা বই কিনে কেরদানি। হস্তরেখা বিচার করছে। বুড়ো ডাম, এখনো এই প্রিলিমিনিরি জ্ঞানটা হল না যে ভাগ্য রেখায় থাকে না, থাকে হাতে? আপনা হাত জগন্নাথ। সেদিনের সেই জাম্বু ধাপে ধাপে উঠল। একতলা বাড়ি গোড়াসুড়ু উপড়ে ফেলে রাতারাতি দোতলার ওপর আবার একতলা। একদিন কালিদাসকে বাড়ি দেখাতে নিয়ে গেল জাম্বু। কথাবার্তায় আগের সেই চোয়াড়ে ভাব আর নেই। পার্টির মিনি নেতা তখন। সঙ্গে পনে বলল, 'পর্যব্রিশ পেরিয়ে গেছে, মাস্টারমশাই। দেখলেন তো খারাপ সময় আমার সময় না।'

কালিদাস অস্থিতে অস্থিতে চেনেন জাম্বুকে। একটু আমড়াগাছি করে বললেন, 'সবই আপনার মিসেসের কল্যাণে। স্ত্রী ভাগ্যে ধন।'

একটু হাসল জাম্বু। নিবু তার ভাগ্যলক্ষ্মী। এমন বউকে একটু তোয়াজ করতেই হয়। কমরেড নিবুদি নিবুদি করে সবাই। একবার এক ঘরোয়া বৈঠকে জাম্বু বলেছিল, 'কমরেড নিবুদির সঙ্গে আমি একমত।' চাপা কৌতুকের হাসির তরঙ্গ উঠেছিল পার্টির ছেলেমেয়েদের মধ্যে। স্থানীয় বিধায়ক খোকাদা ছিলেন সে বৈঠকে। তিনি পরিস্থিতি সামাল দিলেন, 'পার্টিতে নিবুদি আমাদের সবাইকার দিদি, প্রাইভেট রিলেশন যাই হোক। তাছাড়া, নিবুদি পার্টিতে জাম্বুর আগে এসেছে। সিনিয়র। জাম্বু নিবুদি বলতেই পারে।'

শুধু তোয়াজ। প্রথম দিকে নিবুদি যখন সারাদিন টো টো করে ঘুরছে, পার্টির কাজ করছে, তখন সংসার সামলেছে জাম্বু। স্ত্রী সন্তান দিয়েই খালাস, মানুষ করেছে স্বামী। বিনুক-বাটিতে দুধ খাইয়েছে, কাঁধা বদলেছে, কোলে করে ঘুম পাড়িয়েছে জাম্বু। শিশুপালনে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছিল। এক ছেলে, এক মেয়ে, দু'জনেই জাম্বুকে মা ডাকতে শুরু করল। প্রতিবেশীরা হাসাহাসি করে। তখন আর ধৈর্য রাখতে পারল না জাম্বু। একদিন উত্তম খুশম হয়ে গেল বাড়িতে। পার্টি করা হচ্ছে না শুষ্টির পিণ্ডি হচ্ছে। জাম্বু বলল, 'আমি যদি সারাদিন ছেলেমেয়েই আগলাই তো চাকরি করব কখন।' 'রাখো তোমার চাকরি।' প্রোগান দেওয়া শানানো গলা। এক স্কেন চড়ায় ধরল নিবু। 'চাকরি মানে তো বাস্তব বাস্তব।'

টাইপিস্টের চাকরি জাম্বুর। টাইপ করাকে নিবু বাস্তব বাস্তব বলে।

'তাও তো কিছু একটা করছি।'

'করছ না, নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিয়েছি।'

'তুমি? তুমি আমার চাকরি করে দিয়েছ।'

উদ্বেজনা অস্থির হয়ে উঠল জাম্বু। কিন্তু ও নিয়ে আর কথা বাড়াতে

সাহস করল না। হাটে হাঁড়ি ভেঙেই আছে। শহরের সবাই জানে রসহাটা। বাউগুলে ছেলেটা কোনোক্রমে স্কুল ফাইনাল পাশ করেছে। সেও পঁচিশ ডিরিশ বছর হয়ে গেল। চাকরির বাজার তখনো আজকের মতো এতটা আক্রা হয়নি। তাতেও কিছু একটা জোটটোতে পারল না।

নিবুদের পার্টি ক্ষমতায় এসেছে। ওদের খোকাদা শিক্ষামন্ত্রী হয়েছে। উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী হবে এরকম একটা রটনা হয়েছিল। হলে কলেজ ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত ছড়ি ঘোরাতে পারত। পার্টির ওপর মহলের কয়েকটা নড়বড়ে বুড়োর আপত্তিতে সেটা কেঁচে গেল।

তারা বলল, 'খোকা ভালো অর্গানাইজার হতে পারে, মিছিলে লোক জুটিয়ে সেটাকে মহামিছিল করে দিতে পারে, সবই মানছি। কিন্তু ও তো প্রাইমারি টিচার। স্কুল ফাইনাল, কম্পার্টমেন্টাল। না'না, পাবলিক ট্রিটিসিজম হবে। উচ্চশিক্ষা নেই, সে উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী হয় নাকি।'

রাজ্য কমিটিতে খোকারও মুকব্বি আছে। তারা বলল, 'কেন হয় না? স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাক্তার? কৃষিমন্ত্রীর এগ্রিকালচারে ডিগ্রি আছে? সংস্কৃতি মন্ত্রী নাচ শিখেছে? গান জানে?'

চিফ মিনিস্টার একটা মীমাংসাসূত্র দেন। খোকাও এডুকেশন মিনিস্টার হোক, ব্রাকেটে প্রাইমারি।

তাই হল। নিবুদির পোয়া বারো। খোকাদার ডান হাত ও। স্কেলা সংগঠনে খোকাদার পজিশন নিবুদির জন্যে। লাইব্রেরি দখল করতে হবে, নিবুদি। স্কুল কমিটি দখল করতে হবে, নিবুদি। কো-অপারেটিভ ফ্রেডিট সোসাইটি বহুদিন যাবৎ কতকগুলো প্রতিক্রিয়াশীল বুড়োর কন্ডায়, ইলেকশনে ওদের পরাস্ত করতে হবে, নিবুদি। সোসাইটির ইলেকশনের দিন বারকয়েক ফল্‌স ভোট দিয়ে ধরা পড়ে গেল। পালাবার মুখে বিরোধীরা আঁচল টেনে ধরল। তবু আটকাতে পারল না। টানের সঙ্গে পাকে পাকে ঘুরে পাকসটি মেরে বেরিয়ে গেল। বিরোধীরা হতবাক। রিগিং-এর কী অঙ্ক রে বাবা। ফল্‌স ভোটের ভোট নাবল; হাতে রইল শাড়ি। কো-অপারেটিভ সোসাইটিও পার্টির দখলে চলে এল। এবার নিজেদের লোকেদের ঢালাও লোন পাইয়ে দেওয়া যাবে।

জাম্বু সেই সময় বলেছিল, 'এখন তো তোর পাওয়ার খুব, একটা চাকরি করে দে না আমায়। যে কোনো চাকরি।'

নিবুদি বলেছিল, 'করে দিতে পারি, একটা শর্তে। চাকরি পেলেই বিয়ে করবি বল?'

'নিশ্চয়ই। সেইজন্যেই তো বলছি তোকে।' উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল জাম্বু। বলেছিল, 'হয় একটা চাকরি দে, নয় একটা চাকুরে মেয়ে দেখে দে।'

রহস্যময় ভঙ্গিতে নিবুদি বলেছিল, 'দুই-ই হবে। তুই আমাদের পার্টিতে আয়।'

নিবুদি ওকে পার্টিতে টেনে নিল। মিনিস্টার খোকাদার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। লোকাল অফিসে রোজ দু'বেলা হাজিরা দিতে লাগল। রোজ অফিস খোলা-বন্ধ করার কাজ পেয়ে গেল। নিবুদি তখন আর পার্টি অফিসে বড় একটা আসে না। নেতাজি কলোনির দিকে কাজ করছে। সাক্ষরতার কাজ। কলোনির মধ্যে একটা অশ্বখ গাছের নিচে ছেলেমেয়ে জড়ো করে পড়ায়। শিশুশিক্ষার মুক্ত মেলা। সপ্তাহে পাঁচদিন নিয়ম করে মেলা বসে। সকাল সাড়ে তিন থেকে দশটা। শনি-রবি ছুটি। পার্টি থেকে একটা লেডিস সাইকেল দিয়েছে নিবুকে। বাড়ি বাড়ি থেকে টেনেটুনে এনে বসাতে হত

ছাত্র-ছাত্রীদের। মাঝে মাঝে লজেন্স-বিস্কুট বিলিয়ে ওদের বশ করেছে নিবুদি। কিছুদিন পরে পাউরুটি দেবে, লোভ দেখিয়েছে। এখন তাই ওরা নিজেদের গরজে আসে, পড়ার চেয়ে কোলাহল করে বেশি। সেইটাই মজা। থাকেও শেষ পর্যন্ত। অভ্যাস করিয়ে দিয়েছে নিবুদি। এখন পার্টির জরুরি কাজ থাকলে ছাত্র-ছাত্রীদের বসিয়ে দিয়ে সাইকেলে এক চক্কোর ঘুরে আসে।

একদিন জাম্বু সাইকেল থামাল ওর। বলল, 'কী হল? চাকরি করে দিবি বললি যে?'

'দাঁড়া, আগে আমারটা হোক। তুই চাকুরে বউ চাস বলেছিলি না? চাকরিও হবে বউও হবে।' বলেই সাঁ করে সাইকেল চালিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অশ্বখতলার বিদ্যাসত্র খোকাদার সুপারিশে প্রাইমারি স্কুল হয়ে গেল। নেতাজি কলোনি প্রাইমারি স্কুল। নিবেদিতা তার হেডমিস্ট্রেস। সরকারি আমলারা অনুমোদন দিতে টালবাহানা করছিল। অনারেবল মিনিস্টারকে নোট দিল, ঘর নেই, বাড়ি নেই, স্কুলের একজিস্টেন্টই তো নেই। খোকাদা ডেকে সর্বোচ্চ আমলাকে বললেন, 'ওসব ইনফ্রাস্ট্রাকচার পরে হবে। অত বড় একটা কলোনি, অত ছেলেমেয়ে, তাদের পার্টি শিক্ষাগ্রহী করে তুলেছে, আপনারা তাতে জ্বল ঢেলে দিতে চান?'

'একটা আনহেল্দি প্রিসিডেন্ট হয়ে যাবে স্যাব। বেকাররা পাড়ায় পাড়ায় একপাল পড়ুয়া জড়ো করেই বলবে অনুমোদন দাও, প্রাইমারি স্কুল হবে।'

নতুন মন্ত্রী হয়েছেন খোকাদা, রেখেটেকে কথা বলা রপ্ত হয়নি। বললেন, 'আমাদের পার্টির ওয়ার্কাররা করলে দিতে হবে। চাকরি পাইয়ে দেওয়ার এই একটা রাস্তাই খোলা আছে। এখন ঢালাও দিয়ে যান। পরে স্ট্রিক্টলি বলে দিলেই হবে, সরকারের পূর্ব অনুমতি না নিয়ে কেউ প্রাইমারি স্কুল খুললে নিজ দায়িত্বে খুলবেন।' অ্যাট ইওর ওন রিস্ক।

হয়ে গেল স্কুল। হয়ে গেল নিবুদির চাকরি। হয়ে গেল বিয়ে। পার্টির লোকাল অফিসে এল ম্যারেজ রেজিস্ট্রার। এল নিবুদির অনুগামীরা। এলেন গাড়ির মাথায় গুল গুল করে লালবাতি ঘুরিয়ে খোকাদা। একটু কটর বিপ্লবী তিনি। কাগজে বিয়ের সইসাবুদ হওয়ার পর নবদম্পতিকে বললেন, 'ওদের আশীর্বাদ নাও আগে।' বলে দেওয়ালের দিকে ইঙ্গিত করলেন। চীন-রাশিয়া-জার্মানির কাঁহা কাঁহা জননেতাদের ছবি টাঙানো সেখানে। ছবিতে পা নেই, ফ্রেমের নিচে হাত ঠেকিয়ে কাল্পনিক পদযুগল স্পর্শ করল নিবুদি আর জাম্বু। আসল নাম দুল। পার্টির দিদিকে বিয়ে করে হল জামাইবাবু। জামাইবাবু থেকে জাম্বু। ওইটাই লোকমুখে নাম হয়ে গেল। পরে যখন প্রতিপত্তি বেড়েছে, দূর দূর থেকে উমেদার আসত বাড়িতে। কেউ কেউ জিজ্ঞেস করত, 'জাম্বুবাবু আছেন?' অবশ্য সেসব আরো পবের কথা।

চাকুরে বউ হল, কিন্তু চাকরি অত সহজ না। তলে তলে নিবুদি তদ্বির করছে। জাম্বু বাড়িতে আয়াগিরি করছে। সময়মতো পার্টি অফিস খোলার বন্ধ কবার দায়িত্বও আছে। বাড়িতে কাজের লোক আছে একজন। সুমিত্রার মা। ছেলেপুলের ধাবে ঘেঁষবে না। কথা আছে-খুব। জাম্বুকে সহানুভূতি দেখিয়ে একদিন বলেছিল, পাউটি করা মাস্টারনি বউই যদি বিয়ে করবে, দেখে শুনে বাঁজা বিয়ে করবে তো দাদাবাবু।

ছেলে বড়, বাড়িতে থাকতে পারে। ঠাকুরদা ঠাকুমা আছে বাড়ির পিছন অংশে। নাটিকে দেখেও।

ঝঞ্ঝাট কোলের মেয়েটাকে নিয়ে। ফুড গুলে ফিডিং বটলে ভরে

খাওয়াতে হয়। ওকে রেখে পার্টি অফিসে যাওয়া মুশকিল। ডিসিপ্রিন্ড পার্টি, কোনো ওজর শুনবে না। শহরের পুরসভা দখলের রু প্রিন্ট হচ্ছে অফিসে। দরজা খোলার আগে থেকে লোক জড়ো হতে শুরু কবে। মিনি জেনারেল ইলেকশনের মতো ব্যাপার। অনেক স্ট্র্যাটেজি আছে। দিনরাত কাজ। লেডিস সাইকেলে শহরে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে নিবুদি। যখনই বাড়িতে আসে জাম্বুকে প্রবোধ দেয়, 'আসছে, গোল্ডেন চান্স আসছে। পুরসভা কাপচার করতে পারলে ওটা হবে আমাদের পার্টির আখড়া। তোমার চাকরি এবার হবেই।'

চাকরির কাড়কুড় সাংঘাতিক জিনিস। এক এক সময় মনে হয় মেয়েটাকে কোল থেকে ফেলে দিয়ে পার্টি অফিসে পৌঁড়ে যাই। মেয়ে গেলে আবার মেয়ে হবে, চাকরির চাপ ফসকালে আর আসবে না। মনে মনে বলল জাম্বু। সোজা পথে চাকরি অসম্ভব। পার্টিই শুধু করে দিতে পারে। সেখানেও উমেদার প্রচুর। টাফ কম্পিটিশন। কাজ দেখাতে হবে। জাম্বুর মাথায় একটা বুদ্ধি এসে গেল। কাকে বলে সিনসিয়ার ওয়ার্কার দেখিয়ে দিয়েছিল একদিন।

লোকাল অফিসের দরজা বন্ধ করে গোপন মিটিং হচ্ছে। পুরো এলাকার পার্টির ছোট-বড়ো-মাঝারি নেতারা সবাই হাজির। কাকে কাকে পার্টি কমিশনার হিসেবে প্রার্থী করবে তা স্থির হবে। দলের মধ্যে উপদল অনেক। সবচেয়ে প্রভাবশালী উপদলের নেতা নিবুদি। মিনিস্টার তার মুরুবি। নিবুদি কিন্তু আসেনি। সে গেছে থানায়, ওসি কে ভজাতে। নিবুদির পক্ষে কথা বলছে সমীর। ওর বউকে নিবুদি নেতাজি কলোনি প্রাইমারি স্কুলের চাকরি করে দিয়েছে। সমীরের নাম ওদের ওয়ার্ডের কমিশনার হিসেবে কেউ একজন প্রস্তাব করল। অমনি তেতে উঠল মিটিং। চিংকার করে উঠল বিরোধী উপদল। তাদের নেতা বংশগোপাল বলল, 'এই সেদিন বউ-এর চাকরি হল, আবার কমিশনার? প্রস্তাব নেওয়া হোক ডবল ইঞ্জিন কমিশনার হতে পারবে না।' চৈতামেটিতে কোনো পাশের বাড়িতে ঘুম ভেঙে গেল বাচ্চার। কঁকিয়ে উঠলো মনে হল। সভাপতি বলল, 'চৈতান যত ইচ্ছে চৈতান কমরেডরা, কিন্তু লো ভয়েসে।'

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই আবার কান্নার শব্দ। সভা হল নিস্তব্ধ। ঘরের মধ্যেই কোনো শিশু কাঁদছে। সবাই আশেপাশে তাকাল। কান্নার শব্দ কোথেকে আসছে বোঝা যাচ্ছে না। অতর্কিতে উঠে দাঁড়াল জাম্বু। অফিস ঘরের এক কোণে পতাকা ফেস্টুন উঁই করা। তার পিছন থেকে বের করে আনল বড়সড়ো একটা রেশনের ব্যাগ। ব্যাগ থেকে বের করল মেয়ে। বাড়িতে রেখে আসার জো নেই। সময়ে পার্টি অফিস খুলতে হবে। কোলে করে আনলে 'মা মা' বলে কটাক্ষ করে প্রতিবেশীরা। তাই ব্যাগে করে নিয়ে এসেছে। সঙ্গে বেবিফুডের কৌটো, ফ্লাস্কে গরম জল, ফিডিং বটল। এমন নিষ্ঠাবান কমরেড আগে কেউ দেখেনি। মুখে মুখে রটে গেল কথাটা। বাড়ি ফিরে ভারিফ করল নিবু, 'তুমি তো দেখছি ছুপা রুস্তম। দেখালে বটে। একেবারে জয়-জয়কার পড়ে গেছে পার্টিতে।'

কপাল যখন খোলে তখন এরকমই খোলে। এক থাকায় দোফলা। উঁচু গাছ থেকে খসে পড়া নারকোলের মতো। পরেরবার পুরসভার দখল নিল পার্টি। কমিশনার হবার জন্যে হুড়াহুড়ি পড়ে গিয়েছিল। সব উপোসি ছারপোকা। শেষপর্যন্ত যারা চাপ পেল তাদের বেশিরভাগ নিবুদির লোক। তারা বোর্ড গঠন কবে পুরো প্রশাসনকে আটোঁসাঁটো করতে লেগে পড়ল। আগের প্রতিক্রিয়াশীল বোর্ড উপদলীয় কৌন্দল করেই কাটিয়ে গেছে।

কাজের কাজ কিছুই করেনি। কর্মচারীরা বিক্ষুব্ধ। কাজের চাপ বাড়ছে, অথচ লোক বাড়ছে না। অফিসে টাইপিস্ট দু'জন। তার একজন রিটার্নার করেছে। সে জায়গায় লোক নেয়নি। একজনকে দিয়ে দু'জনের কাজ করিয়েছে। নতুন প্রগতিশীল কমিশনারদের পাশা ব্রজসুন্দর কর্মরত টাইপিস্টকে আলাদা ডেকে বলল, 'আপনারা কি স্নেড? বললেই করতে হবে। দু'জনের কাজ একজনকে দিয়ে করিয়েছে। প্রটেষ্ট করে নি কেন?'

টাইপিস্টটির নাম শীতল চৌধুরী। কোনো কিছুতেই উত্তেজিত হয় না। একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'ব্রজদা, ওরা ধরে ফেলেছিল, আমি আপনাদের স্পিপিং সাপোর্টার।'

'মেশিনে' মাথা রেখে ঘুমোতেন?'

'না, না।' শীতল বলল, 'স্পিপিং পার্টনার বলে না? সেই অর্থে আর কি। ঠাট্টা করে বলত কমরেড শীতল চৌধুরী।'

ব্রজসুন্দর বলল, 'ফুল স্টাফ স্ট্রেন্ট নিয়ে আমরা কাজ শুরু করব। আপনি একটা রিপ্রেজেন্টেশন দিন। আন্তাই।'

কমিশনার তো বলেই খালাস। শীতলের কাছে ব্যাপারটা বেশ শক্ত হয়ে উঠল। আসলে তো একজন টাইপিস্টেরও কাজ নেই। সব ডিপার্টমেন্টে স্ট্যাণ্ডার্ড ফর্ম। হাতে লিখে সারে। বাংলায়। একটা পুরো চিঠি ইংরাজিতে খসড়া করতে পারে এমন কর্মচারী কই! আগের চেয়ারম্যান জরুরি চিঠি নিজে বাড়িতে টাইপ কবে নিতেন। অফিসের টাইপ তাঁর পছন্দ হত না। বলতেন, 'কারেকশন করতে করতে গোটাটাই ফের ম্যানসক্রিপ্ট হয়ে যায়।'

লোকটার ফাণ্ডা ছিল ইংরেজিতে। একবার একটু অয়েল করতে গিয়েছিল শীতল। বলেছিল, 'আপনার ইংরিজি স্যার দারুণ।'

'কী করে বুঝলেন?'

'বুঝব না।' শীতল বলেছিল, 'কম ড্রাফটিং তো দেখলাম না স্যার। আপনার এক-একটা সেটেল। উহু! মানেই বুঝতে পারি না।'

চেয়ারম্যান বলেছিল, 'শীতলবাবু, না বোঝারও একটা আনন্দ আছে, বলুন? পুরসভায় বোধহয় কমপালসরি রিটার্নারমেন্ট হয় না, না?'

শীতল বুঝেছিল তেল ঢাকতে গিয়ে নিজের পায়ের নিচটা পেছল করে ফেলেছে। চেয়ারম্যানটা সাংঘাতিক। কাগজপত্রে কিছু লিখে গেছে কি না কে জানে। ওই ভয়ে ওদের আমলে ওদের দিকে থেকেছে। শুধু শীতল না, বলতে গেলে সবাই। ওরাই তো পুরসভা করল। ডামাডোলের টাইম। সবই নড়বড়ে। যে যার লোকটি এনে বসিয়ে দিল চাকরিতে। ইউনিয়ন হল। প্রথমে একটা কংগ্রেসিদের। শীতলেব কী উৎসাহ। চেয়ারম্যানের ওই চাপা ছমকির পর একেবারে সামনের সারিতে চলে এল। এখন কমিউনিস্টদের আমলে বিপ্রেজেন্টেশন দিতে গেলে কী লিখবে? যাই লিখুক সহকর্মীরা প্যাক দিতে ছাড়বে না। আর একটা চিন্তা অতর্কিতে অবশ করে দিল শীতলকে। ব্রজসুন্দররা সব খবর রাখে। নতুন পুরসভার সব চাকুরেই যে ওদের বিরোধী দলের ছানাপোনা তা জানতে ওদের বাকি নেই। ব্রজদা কি শীতলের কথা বিশ্বাস করল? নাকি তোমো দিয়ে ফাঁদে ফেলার মতলব?

শীতল নিশ্চিত হল। যখন দেখল টাইপিস্ট চেয়ে সজি সজি বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে। অফিস অর্ডারও বেরিয়েছে কর্মীদের জানাতে যে ওই পদের জন্য পুরসভা কর্মচারীদের নিকট-আত্মীয়দের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। কংগ্রেসি ইউনিয়নের চাঙড় খসে গেল। রাতারাতি নতুন ইউনিয়ন গজাল। বাম ইউনিয়ন। শীতল চৌধুরী তার সংগঠক।

আবেদন পড়ল প্রচুর। যথারীতি ইন্টারভিউ হল। আয়োজনের কোনো ত্রুটি নেই। ঝাড়াই বাছাই করে সর্বসম্মতিক্রমে নিয়োগ করা হল জ্যৈষ্ঠকে।

বংশগোপাল এই নিয়ে কথা তুলেছিল পার্টিতে। তার অভিযোগ, পুরসভা দখল করেই অমনি নিজেদের লোক ঢোকানো ঠিক হয়নি।

তর্ক উঠল। ‘দেরি’ করে ঢোকালেই কি সেটা ঠিক হত?’

‘বিষয়টা পার্টির লোকাল অফিসে আলোচনা করা উচিত ছিল। স্বজন পোষণের ব্যাপারে পার্টির একটা নীতি স্থির করা উচিত ছিল।’

‘স্বজন পোষণের নীতি আবার নতুন করে স্থির করার কী আছে! রাম-রাবণের যুগ থেকে ও নীতি স্থির হয়ে আছে। কমরেড মধুসূদন কী বলেছে, মনে নেই?’

‘কমরেড মধুসূদন! আপনি কি ডিস্টিক্ট কমিটির মধু কুণ্ডুর কথা বলছেন? উনি তো বলবেনই। স্বজন পোষণের গুরু।’

হঠাৎ পেছন থেকে একজন বংশগোপালকে সমর্থন করে বলল, ‘স্বজন পোষণেরও তো একটা লিমিট থাকবে। কত ভালো ভালো ক্যানডিডেট ছিল। তাদের বাদ দিয়ে—’

‘সেইজন্যেই কমরেড মধুসূদনের রেফারেন্স দিলাম।’ বলেই বক্তা আবৃত্তির ঢংয়ে বলল, ‘গুণবান যদি পরজন গুণহীন স্বজন, তথাপি নির্গুণ স্বজন শ্রেয় পরঃ পরঃ সদা।’

‘এ তো, মাইকেল। মাইকেল মধুসূদন। কমরেড কমরেড করছেন কেন?’

‘আমাদের নীতির সাপোর্ট করেছেন বলে। লাগসই কোটেশন দ্যাখান, শেক্সপীয়রকে কমরেড শেক্সপীয়র বলে লাল সেলাম দেব।’

আলোচনা অন্যদিকে ঘুরে যাচ্ছে দেখে বংশগোপাল বলল, ‘কমরেড, মনে রাখবেন, পুরসভায় পার্টি রেজুলেশন ভায়োলেট করা হয়েছে।’

সমীর বলল, ‘মোটাই না। প্রথমত যখন রেজুলেশন নেওয়া হয় তখন জ্যৈষ্ঠ-চাকরি করে না। ওদের ডবল ইঞ্জিন বলা যাবে না। আর একটা কথা। রেজুলেশনে বলা হয়েছে কমিশনার করা যাবে না। চাকরি দেওয়া যাবে না কোথায় বলা হয়েছে?’

যারা কমিশনার হতে পারেনি তারাই সবচেয়ে বেশি বিক্ষুব্ধ। তাদের একজন বলল, ‘ঠিক আছে। আমাদের বাড়িতেও বেকার আছে, কথাটা মনে রাখবেন কমরেড।’

আর একজন বলল, ‘এরপরের মিটিং-এ রেশমব্যাগে করে বাচ্চা নিয়ে আসব। সাদা কমরেড হব।’

একটো চ্যাচামেচিই সার হল। নিবুদির দল ভারি। যথাসময়ে পুরসভায় জ্যৈষ্ঠের অভিব্যক্তি হয়ে গেল।

কলক্যাটি নাড়ছে নিবুদি। মিনিস্টার খোকাদার এরিয়ার পুরসভা। বলতে গেলে নিবুদিরই পুরসভা। বিক্ষুব্ধরা বলে, মাদি স্ট্যালিন। সাইকেলে আর কুলুচ্ছে না, মোপেড কিনেছে একটা। মাইনের দিন ছাড়া স্কুলে যাওয়ার সময় হয় না। কাজ বেড়েছে। সদর মহকুমার প্রাইমারি শিক্ষক সংগঠনের নেতা। বন্বন্ করে ঘুরতে হয়। অভিযোগ আসছে নানা ধরনের। খোকাদা ভাবমূর্তি কলুষিত হচ্ছে। প্রাইমারি টিচাররা বড় বেশি স্বাধীনতা নিচ্ছে। চাকরিটাকে নিয়েছে পার্ট টাইম হিসেবে। ধরাধরি করে বাড়ির কাছের ইঁসুলে ঢুকেছে। কেউ ছাত্রদের বসিয়ে জমিতে সার ছেঁটাতে যাচ্ছে, কেউ দু’চার খেপ জাল বেয়ে আসছে। কেউ আবার গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে তবির করছে। বুর্জোয়া সংবাদপত্র তাই নিয়ে নিউজ স্টোরি বানিয়ে লোক

খ্যাপাচ্ছে। গরিবের সরকার, জনপ্রিয় সরকার, বিব্রত হচ্ছে। নিবুদি তাই শিক্ষক সংগঠনের পক্ষ থেকে তার প্রতিকারে ব্যস্ত। প্রতিকার মানে চাপাটাকার ব্যবস্থা। যা করছেন করুন, একটু রেখেচেক। পাবলিক যেন টের না পায়, এইসব সরকারি শিক্ষাসত্র ক্যাডার জিয়নোর চৌবাচ্চা।

আবার পুরসভাও দেখতে হচ্ছে। নিবুদির নিজের লোকেরাই সংখ্যা গরিষ্ঠ। তবু সতর্ক থাকতে হয়। তলে তলে একটা বিরোধিতা তৈরি হচ্ছে। জেলা স্তরে নেতৃত্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতা—খোকাদা আর কার্তিক বড়ালের রেবারেঘির জের। এও দূষণ। জেলের মতো ওপর থেকে নিচের দিকে গড়ায়। অনেক হিসেব করে চেয়ারম্যান করেছে বহিঃবরণকে। নামেরই শুধু বাহার। আসলে কাদার তাল। একটা ম্যাদামারা। বহিঃকে ডেকে নিবুদি একদিন কিছু গোপন পরামর্শ দিয়ে দিল। বলল, ‘আমার কথা না কিন্তু। খোকাদা বলেছে। মিনিস্টার ডিজার্স।’

কয়েকদিনের মধ্যেই কেউ যেন পাম্প দিয়ে জ্যৈষ্ঠকে ফুলিয়ে দিল। আগের বোর্ডের কিছু বশব্দ কেরানি আছে, তারা ইচ্ছে করে ওকে বলে ‘জ্যৈষ্ঠাবাবু।’ আর একজন অমনি পেছন থেকে ফোড়ন কাটে ‘জ্যৈষ্ঠাবাবু কীরে? ডবল পজিটিভ। এ তো ফুটবল বল হয়ে গেল।’ কথার মজায় পেয়ে বসল তাদের। ‘জামরুল রুল’, ‘মোমাছি মাছি’, ‘পাথরবাটির বাটি’, এমনি যার যা মনে আসে বলতে বলতে একজন বলল, ‘তিমিসিল গিল’। অমনি সম্মিলিত ধ্বনি উঠল, ‘গিলে লে গিলে লে।’

চেয়ার চেলে উঠে দাঁড়াল দুলু। হলঘরের মধ্যে তার সিট। একবার ভালো করে দেখল সব সিটের কর্মীদের দিকে। মুহূর্তে সবাই কাজে মনোযোগী হয়ে পড়েছে। ঝুঁকে পড়ে কাজ করছে। একমাত্র পাশের সিটের শীতল চৌধুরী তাকিয়ে আছে জ্যৈষ্ঠের দিকে। পার্টির জামাইবাবু। তোয়াজ করে চলা উচিত। এরা ছুঁচ হয়ে ঢোকে ক্রমে ফাল হয়। শীতল বলল, ‘আপনি বড়বাবুকে বলুন, দুলুদা।’

ভালো কথা, খুব নিচু গলায় বলেছে, তাতেই রেগে উঠল দুলু। চেঁচিয়ে বলল, ‘বাপেয় বয়সী লোক আপনি, দুলুদা দুলুদা করছেন কেন। বেশি অ্যাডভাইস দিতে আসবেন না। বড়বাবুকে বলুন। হ ইজ বড়বাবু।’

একটা তাচ্ছিল্যসূচক ভঙ্গি করে চেয়ারম্যানের ঘরে ঢুকে গেল। হলঘরের সংলগ্ন চেয়ার। চেয়ারম্যান ঘরে বসে টের পেয়েছেন জ্যৈষ্ঠকে—হেনস্থা করছে একদল কর্মচারী।

দুলু ঘরে ঢুকেই বলল, ‘বহিঃবরণ, এ তোমার কী রকম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন।’ খুব শান্ত গলায় চেয়ারম্যান বললেন, ‘আপনি বসুন জ্যৈষ্ঠদা।’

‘বসতে আসিনি।’ দুলু বলল। ‘তুমি যদি এর একটা স্টেপ নিতে না পারো, সাফ সাফ বলে দাও। যা করবার আমি করব।’

বহিঃবরণ ঘরের বাইরে লালবাতি জ্বলে দিলেন। এনগেজড। কেউ যাতে ঢুকে না পড়ে।

উপেক্ষনায় ঝপ করে চেয়ার টেনে নিয়ে এবার বসে পড়ল দুলু। পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরাল। ভুরুতে কৌচ পড়ল বহিঃবরণের। জ্যৈষ্ঠকে বড় বেশি আত্মারা দিচ্ছে পার্টি, মনে মনে ডাবল।

বহিঃবরণ বললেন, ‘আপনি সিটে যান। এ নিয়ে বেশি হইচই করা ঠিক হবে না। ব্যাকডোর ক্যানডিডেট আপনি। এরকম একটু-আধটু হবেই। কতদিন করবে? আস্তে আস্তে সব থিতুয়ে যাবে।’

তেমন জুত হল না। চেয়ারম্যান হয়ে বহিঃবরণ উঁট নিচ্ছে। বাড়ি গিয়ে নিবুকে সব বলল দুলু। নিবু বলল, ‘বহিঃবরণকে আমি দেখছি। কিন্তু

তোমার চাকরি তোমাকে সামলাতে হবে। পার্টি কোনোক্রমে গুঁজে দিয়েছে তোমাকে। এখন লেগে থাকবে না খসে পড়বে সে তোমার ব্যাপার। কাজিডাঙ্গা-কোদালিয়া পুরসভা নতুন মিউনিসিপ্যালিটি। ওটা কর্মক্ষেত্র না, কুরুক্ষেত্র। পার্টির শত্রুদের হয় দলে ভেড়াও, নয় নিকেশ করো।’

নিবুদি দেখল বহিবরণ কেমন যেন অনসুরো গাইছে। চেযাবে বসে বুদ্ধি খুলে গেছে। একটু সতীপনাও করল, ‘ওরা এমন বেআইনি নিয়োগ করলে আমবা যা করতাম, আমাদের বেলায় ওরা তাই করেছে। বরং একটু কমই কবেছে।’

‘কম করেছে!’

‘নিশ্চয়ই। আমরা হলে গলি গালি মে শোর হ্যায়—বলে আকাশ-বাতাস তোলপাড় করে দিতাম।’

নিবুদি আর কথা বাড়ানি। বহিবরণ বিষ্ণুদেবের হাতে খেলছে বোধহয়। বংশগোপালের বাড়িতে বহির যাতায়াত বেড়েছে। হয়ত তোলা দিচ্ছে কার্তিক বড়াল। খোকাদা মিনিস্টার হওয়ার পর থেকে কার্তিকদার বুক জ্বলছে। এক খালুইয়ের কাকড়া। এ ওঠে তো ও দাঁড়া ধরে টেনে নামায়।

নিবুদি কথটা খোকাদার কানে দিল।

খোকাদা ডাকল বহিবরণকে। একজন মিনিস্টার আর একজন চেয়ারম্যান। সেখানে সেখানে কোলাকুলি। সৌজন্যমূলক দু’চারটে কথার পর জাম্বুর কথা উঠল। বহিবরণ বললেন, ‘ওর তো কাঁককাবুড় জ্ঞান নেই। আমার সামনে সিগারেট খায়।’

‘জাম্বু আমাদের কমরেড।’

‘সে পার্টি অফিসে। পুরসভায় ও টাইপিস্ট। এল ডি ক্লার্ক। আমি চেয়ারম্যান। অফিস প্রসিডিওর, ডিসিপ্লিন, ম্যানার্স, ডিসেসি—’

মিনিস্টার কথা শেষ করতে দিলেন না। বললেন, ‘মানছি। এতকাল আমরা বুর্জোয়া সিস্টেমের ওই খুঁটিগুলো উপড়ে ফেলতে চেয়েছি। কোথাও পেরেছি, কোথাও পারিনি। ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে আলগা করেছি। এখনি পাওয়ারে এসেই সেগুলো শক্ত করে ফের পুঁততে গেলে—বুঝতেই পারছ।’

চেয়ারম্যান জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে আছেন।

মিনিস্টার বললেন, ‘জাম্বু কাজেকর্মে কেমন?’

‘অপদার্থ।’

তাহলে তো ভালোই হল। ওকে পার্টির কাজে লাগিয়ে দাও। পুরসভায় দের ইউনিয়ন করুক। ইউনিয়ন যার অফিস তার। বহি, পুরসভাগুলো ছ পার্টির হ্যাচারি। যদি এটাকে আখড়া করে তোলা যায়, তাহলে—হুতাই পারছ।’

চেয়ারম্যান বললেন, ‘আপনি দু’বার ‘বুঝতেই পারছ’ বললেন। আমার একটা উত্তর—‘বুঝলাম না।’

পাঁচ

বাড়ির সামনের অংশটা প্রায় জ্বরদখল করে নিল দুলু। পরমেশ বাড়িটা সাবিত্রীকে দান করে দেবার কথা ভাবছিল। যাতে ন-বউ হঠাৎ এক জলে মাকে না বাড়ির অংশ থেকে বঞ্চিত করে। দুলু বসব করতে কক দানপত্র আর করা হয়নি। তার আগেই একদিন পরমেশ, ‘তোমাদের ঘরটা নাও, সামনের ঘরদুটো আমাদের

পরমেশ বলল, ‘হাঁড়ি পৃথক করেও হল না, এখন বাড়ির ভাগ চাস?’ সাবিত্রী বাপ-ছেলের মধ্যখানে এসে দাঁড়াল। বলল, ‘ওরে আমরা মরলে তো সবই তোর।’

‘সে তো ফিউচার ইনডেফিনিট।’

‘মানে?’

পরমেশ বলল, ‘তোমার ছেলের আর তর সইছে না। ভাবছে অবিবেচকের মতো যদি বেঁচে থাকি!’

বলে হঠাৎ যেন খেপে উঠল। পেশীশক্তি কমেছে, বেশি শক্তি গলায়। বলল, ‘হ্যারামজাদা, বাপ-মাকে খেতে দিস না, কমিউনিস্ট হচ্ছে! গর্ভধারিণী বসে মানিয়ে চলতে পারিস না, দুনিয়ার মজদুর এক হও।’

‘খবদার বলছি পার্টি তুলে কথা বলবেন না।’ ফ্যাসফেসে ভাঙা কাঁসরের মতো গলা। নিবু এসে দাঁড়িয়েছে। সাবিত্রী প্রমাদ গুনল। বউটিকে তার সাংঘাতিক ভয়। পরমেশ মরীয়া। বলল, ‘একশবার বলব।’

‘আমরাও তাহলে আপনার পার্টিকে রেয়াত করব না।’

‘আমার আবার পার্টি কিসের।’ পরমেশ বলল। ‘না ন্যাশনাল পার্টি, না রিজিওনাল পার্টি।’ বলতে পারো ডোমেস্টিক পার্টি। স্বামী-স্ত্রীর পার্টি।

‘ন্যাকামি করবেন না গুরু।’ নিবু বলল তার মার্কামারা গলায়, ‘হাঁড়ি ফাটাব?’

রাস্তায় লোক জড়ো হতে শুরু কবেছে। গৃহযুদ্ধের কৌতুহলী দর্শক। কেচ্ছার মাছি।

পরমেশ তখনো ফুঁসছে। বলল, ‘ওরে আমার হাঁড়ি-চাচা রে। উনি এলেন আমার হাঁড়ি ফাটাতে। দেখি ফাটাও হাঁড়ি।’

স্বামীকে থামাবার জন্যে সাবিত্রী বলল, ‘তোমাদের কি ফাটাফাটি ছাড়া কথা নেই।’

‘নেই-ই তো।’

বউকেও শান্ত করতে চাইল সাবিত্রী। এসব বউ না পারে এমন কন্ম নেই। ডাকসাইটে দজ্জাল। শব্দর-শাশুড়িকে একসঙ্গে বেঁধে কেরোসিন তেলে দেশলাই ঠুকে দিতে পারে। বধূহত্যার উশ্টো কেস। বলল, ‘শত হলেও উনি তোমার শ্বশুর।’

‘আদর্শের কাছে শ্বশুর ভাসুর নেই। উনি আমাদের শত্রুপক্ষের লোক। বিপ্লবকে ল্যাঙ মারছেন। তা না হলে যার ছেলে-বউ বাম রাজনীতি করে সে বুর্জোয়া মুরুবি ধরে? ব্যাবাড়োর দিয়ে ফ্রিডম ফাইটার্স পেনশন আদায় করে?’

কয়েকটা চ্যাংড়া ছেলে নিছদের মধ্যে বলাবলি করল, ‘নিবুদি জাম্বুর বাবাকে বাশু দিচ্ছে। ও বাবা মাদি স্তালিন।’

পরমেশ কেমন চুপসে গেল। ঠিক সেই সুযোগে নিবু বলল, ‘বাড়ির সামনের পোশনিটা আমাদের চাই।’

সারাক্ষণ নিবুই যুঝে গেল। আশ্চর্য চুপচাপ হয়ে গেছিল দুলু। ও অন্য কথা ভাবছিল। রাস্তির মাকে একা ডেকে বলল, ‘কী ঠিক করলে?’

‘দেখি।’

‘দেখি-টেখি না। সামনের দিকটা আমার নামে লিখে দিতে হবে। আমি ডিমলিস করে দেব। জানলা-দরজা কড়িবরগা নোনাধরা ইট সব তোমরা নিও।’

‘নতুন বাড়ি করবি, খোকা?’ খুশি হল সাবিত্রী। বলল, ‘সে কথা বললেই হয়। তোর বাড়ি, তুই-ই তো নিবি।’

ফাংশন করতে হলে একটা উপলক্ষ লাগে। অনেক ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত হল, প্রতিক্রিয়ালীল বুর্জোয়াদের হাত থেকে পুরসভা উদ্ধার করা গেছে, বিজয় উৎসব করা হোক। একটু বোমানান হতে পারে। বোর্ড গঠন করার দু'বছর পর বিজয় উৎসব। খোকাদা বলল, 'কার্তিক বড়াল আবার না রটায়—বহিবরণকে রিমুভ করাটাকেই আমরা সেলিব্রেট করছি।'

ব্রজসুন্দর বলল, 'আগে ঘর গোছাব তবে না উৎসব। পুরসভা হাতে পেয়েই বিজয় উৎসব করলাম, আপনি ভাষণ দিচ্ছেন, এমন সময় খবর এল বোর্ড উল্টেছে, সেটা ভালো হত? বিজয় উৎসবের মাচা উল্টে যেত না?'

সব বিক্ষুব্ধবা এখন জাম্বুর দিকে। অমন যে জঙ্গী বংশগোপাল সেও। সবাইকে কিছু না কিছু পাইয়ে দেওয়া গেছে। পুরসভার তিনটে প্রাইমারি স্কুলে তিনজন বিক্ষুব্ধের স্বজনের চাকরি। একজন কারও কেউ না। জনসেবার খাতিরে তাকে সুপারিশ করেছিল বংশগোপাল। শিক্ষিত দুঃস্থ মেয়ে। পার্টির সিমপ্যাথাইজার। চাকরির পর তাকেই বিয়ে করেছে বংশগোপাল। স্বজন পোষণের বিরোধিতার আদর্শও বহাল রইল, আবার সুযোগ সুবিধাব ভাগও পাওয়া গেল। মার্কসীয়-স্বজন পোষণ।

ভিতরে বাইরে কোথাও আর বিরোধী নেই। অপ্রতিবাদে বহিবরণ চেয়ার ছেড়ে দিল। চেয়ারম্যান হল ব্রজসুন্দর। শূন্যপদ আবিষ্কারের একটা দারুণ ক্ষমতা আছে। কিন্তু শূন্যস্থান পূর্ণ করতে হবে জাম্বুর সঙ্গে পরামর্শ করে। পুরকর্মচারীদের বাম ইউনিয়নের সভাপতি জাম্বু।

বিজয় উৎসবের উদ্দেশ্যেই তার অবস্থানটা সবাইকে জানিয়ে দেওয়া। ভায়াসে মিনিস্টার আর নতুন চেয়ারম্যানের মাঝখানে জাম্বুর চেয়ার। দেখে দর্শক শ্রোতাদের চক্ষু চড়কগাছ। জাম্বু থেকে থেকে পেণ্ডুলামের মতো একবার খোকাদার দিকে একবার ব্রজর দিকে ফিরে অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে কথা বলছে। পুরনো ইউনিয়নের কটর কংগ্রেসিরা সভা বয়কট করেছে। তারা মাত্র কয়েকজন। বাকিরা উদীয়মান সূর্যের স্তাবক। গুলি মারো আদর্শ। বামমার্গী হলে যদি মানুষ কামানো যায় তবে তাই সই। তারাও নিজেদের মধ্যে, বলাবলি শুরু করল, 'জাম্বুর হল কী। এ তো দেখি বৃহস্পতি তুঙ্গে।' একজন ফিসফিস করে বলল, 'শুধু বেস্পতি? বেস্পতি-শুক্ল-শনি-রবি।'

বিশেষ অতিথি সদরের এস ডি ও। প্রশাসনের আমলাদের আসতে একটু দেরি হয়। সভাসমিতি থাকলেই অফিসে কাজের খুব আঠা। এস ডি ও যথারীতি দেরিতে এলেন। ভায়াস থেকে দেখে তরতর করে নেমে গেল জাম্বু। কাছে গিয়ে বলল, 'আসুন—।' স্যার বলবে না পদবী ধরে সম্বোধন করবে ভাবতে একটু সময় নিল। তারপর বলল, 'আসুন মিস্টার মশুল।' মঞ্চের কাছাকাছি এসে গা ঘেঁসে এস ডি ওর কাঁধে হাত রাখল জাম্বু। এস ডি ও একটু অসন্তুষ্ট হলেন। কাঁধ বাঁকালেন। অশ্রুটে একবার বললেন, 'হাত নামান।' জাম্বু হাত আলগা করল, কিন্তু নামাল না। আরো অশ্রুটে বলল, 'আলতো করে রেখেছি। উঠুন। অনারেবল মিনিস্টারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। নিবুদিকে চেনেন তো? আমি নিবুদির রাজবেশ।' মৃদু পোলিটিকাল চাপ।

পুলিশ অফিসাররা দৃশ্যটা দেখল। মিনিস্টারের ডিউটি। দেখল মিনিস্টার নৈবিদ্যের কল্যা। এগিয়ে পিছিয়ে খেলছে শুধু জাম্বু। পুলিশও দেখলেই স্যাঁলুট করা শুরু করল তাকে। একেই বলে বিজয় উৎসব। গাঁটছড়া বাঁধা হয়ে গেল। পুরসভা পুলিশ প্রশাসনে। পি পি।

পরের দিন থেকে জাম্বুর প্রতাপ আরো বাড়ল। তাকে জিজ্ঞেস না করে কেউ কোনো কাজ করে না। ট্রান্সফার পোস্টিং হয় জাম্বুর ইচ্ছেয়। চেয়ারম্যানের ঘবে পা নাচাতে নাচাতে সিগারেট ধরায়। কোন ফাইলে কী অর্ডার করতে হবে তাও বলে দেয়।

পুরসভার উন্নয়ন মূলক কাজের জন্যে বেশ কয়েক লাখ টাকা দিল সি এম ডি এ। পথঘাট হবে। কালভার্ট হবে। কলের জলের ব্যবস্থা হবে। ইট লোহা সিমেন্ট পাইপ ইত্যাদির মহাযজ্ঞ। কৃপাভাজনের বাড়তি পয়সার জায়গায় ট্রান্সফার হল। ডিপ টিউবওয়েল বসবে, পাইপ লেয়িং হবে। প্রচুর কলকল্লা, যন্ত্রপাতি। তার স্টোর্সে গেল বিপুল, জাম্বুর অনুগত। ছিল এল ডি, হল ওয়াটার ওয়ার্কস সুপারভাইজার। পার্টির অনেকেই কণ্ট্রাস্টিরি বাগিয়ে নিল বেনামদারিতে। 'গিলে লে গিলে লে।' বলল টিমটিমে ইউনিয়নের ভাঙা টিম।

নিজের আর সাবিত্রীর জীবনস্বত্ব রেখে বাড়ি দুলুকে দানপত্র করে দিয়েছে পরমেশ। নৃপেনের সঙ্গে পরামর্শ করেছিল পরমেশ। নৃপেন একটু ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে কথা বলে ঠিকই। কিন্তু ফ্যানা মেয়ে নিলে কথাগুলো কিছু মন্দ শোনায় না। নৃপেন বলেছিল, 'পেপারে দেখছ না, পিটিয়ে বাপ মারছে, মা মারছে? আদর করে প্লেটে সাজিয়ে সেডিকিনি ধরল সামনে, একটি তুলে মুখে দিলে, ব্যস, কাৎ। মুখে গ্যাঁজলা উঠে চক্ষুস্থির। এটা হল অহিংসে প্রসেস। মডার্ন পরশুরাম সব। যদি অপঘাতে মরতে বাসনা না হয়, দিয়ে দাও। জীবনস্বত্ব-টক্স বাজে কথা। বাড়ি লিখে দেওয়ার পর পাজা করে বার করে দিলে ঠাকাত্তে কে। ওস্তাদ বাপ-মা হচ্ছে ভাঙা বেতের চেয়ার, পায় লেচকে গেছে, বসা যায় না, খানিক জায়গা জুড়ে থাকে।' পরমেশ আর সাবিত্রী জুড়ে আছে পিছনের ঘরটা। সামনেটা রিনোভেট করবে দুলু। ভেঙে ফেলে নতুন করে তৈরির প্ল্যান। টাকা কিছু আছে নিবুদির অ্যাকাউন্টে। যা প্ল্যান, ও টাকায় সে বাড়ির ভিতও হয় না। কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাঙ্কও পার্টির কল্লায়। সেখান থেকে তিরিশ হাজার টাকা লোন করল দুলু।

বায়েন টি হাউস উঠে গেছে। ভিন্ন ভাতে বাপ পড়শি। ছেলে উকি দিয়েও দেখে না।

নাতি-নাতনি দুটোও আসে না। বাড়িতে পতাকা নিয়ে খেলে। কথায় কথায় বলে, 'কাল মাক্সের দিব্যি।' বিপ্লবীর তেউড়।

এই কমিউনিস্ট পরিবাবের হাত থেকে বাড়ির বেশিটা বাঁচাতে পারে পরমেশ।

দেখতে দেখতে পরের বারের নির্বাচন এসে গেল পুরসভার। পাবলি বিশ্বাস নেই। মুখে সবাই আশ্বাস দেয়। রামকেও দেয় রাবণকে। ভোটটা দেওয়ার সময় কাকে যে ভোট দেবে আর কাকে কেউ বলতে পারে না। সব ছক উল্টে দেবে। একটা যদি ভরাডুবি হয়—ওহু। ভাবলেই আতঙ্ক হয়। সাধ ম পুরিল, সকলই ফুরিয়ে যায় মা। কবি কমলাকান্ত দাঁড়িয়েছিলেন? এমন একটা লাইন গানে আসে কী করে ক্ষমতাসীন বোর্ডের কমিশনারদের আতের কথা। কুড়ি কা. বোর্ড, জনপাণ্ডেক বিরোধী দলের। ওদের তুড়ি মেয়ে উড়িয়ে দেয়। কমিশনাররা। সি এম ডি এর টাকার হরির লুট হচ্ছে। বস্তা বস্তা সি আসছে লরিবোঝাই হয়ে। ওয়াটার ওয়ার্কসের বিপুল, বিপুল বিপুল ব্যাগ নিয়ে অফিস আসে, যাওয়ার সময় স্টোর থেকে সাইফে

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

পাকা করা আছে। ও বাটী দ্বারের নিখোঁচ। মাথলা করে উজ্জ্বল আঁকিয়ে
আঁসছে না ওর আলি মেয়েকে বসছে আঁখ। পালেই জেজ্ঞাকার সিঁট।

পত্রপাঠ লা-জবাব

সম্পাদক সমীপেষু,

‘পত্রপাঠ’র সাথে আমার পিঠ থেকে যাওয়াব ইতিবৃত্ত খুবই অসাহিত্যিক গন্ধযুক্ত। আমি বরাবরই রোগা গোছের। থাকি জলপাইগুড়িতে। গত বইমেলায় শেষদিনে গেছি, আর গাঁজার গান শুনছি (আমার যাদবপুরের বন্ধুরা গাঁজা টেনে সুররসে চুবেছিল কিনা!)। শেষের দিকে কী ভীমরতি হল, সটান গিয়ে ঢুকলাম ‘পত্রপাঠ’ লেখা স্টলটিতে। মোটা নীলবর্ণের কাগজে গন্ধযুক্ত “বিচিত্রা” ও আশখানা পল্লিকাব মাপের বইটা দেখে “জয় মা!” বলে কিনে ফেললাম। দু’বেলা ট্রাইসেপের সাথে মাসল্ ফাইবারের জট ফুলে ফেঁপে যায় নড়াচড়ায় যদি—এই আশায় কোলে করে সোজা বাড়ির পথে। কিন্তু সাহিত্যরস যে এমন “রাম”—এর মতো, তা আগে জানলে এই রামায়ণ কিনতাম আরো গোটা ছয়েক। দেড় দিনে দেড় বছরের পত্রপাঠ শেষ।

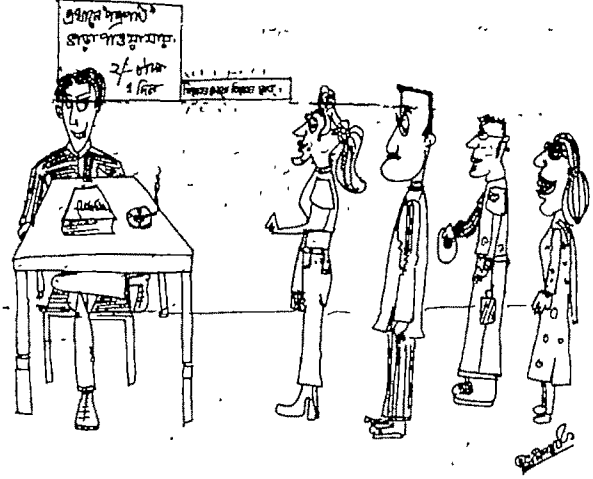
বইটা পাবার পর থেকে শুঁয়োপোকাকার পাতা খাওয়ার মতো পড়েছি। এবার এই জুলাই সংখ্যাটা বন্ধুকে দিয়ে আনিয়েছি। কিন্তু এটা শুনে Seriously খুব খারাপ লাগল যে, এই পত্রিকার কথা কলকাতাতেও অনেকেই জানে না। বোধহয় দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বোঝে না। তারপর যদি এমন Canaan হয়, তবে তো কেল্লা ফতে।

আমি সারা জীবনের মতো এই কাগজে বাগ/বাঘ/বাক্-কে পুষে রাখতে চাই। কত খেসারত দিতে হবে তা জানতে পারলে ভালো হত। প্রথমত আমি “পত্রপাঠ” ৩-৪ মাস পরে পাই বন্ধু মারফৎ। এছাড়া, সেটাও নিয়মিত নয়। জলপাইগুড়িতে ডাকযোগে কি এই পত্রপাঠ পাওয়া সম্ভব? যদি হয়, তবে, দয়া করে নিচের ঠিকানায় একটু জানিয়ে দেবেন, কারণ পত্রপাঠে ছাপলে সেটা আবার হয়ত আমার নাতি দেখে বলবে, “হ্যাঁ, দাদু এটা লিখেছেন সেই ২০০২-এ। এমন বেয়াড়া লেখা দাদু ছাড়া আর কে লিখবে?” তাই সেটা তাড়াতাড়ি জানালে ভালো হয়। আমি সারা জীবনের মতো এই বাঁশ নিতে রাজি আছি। বহুদিন পর এমন সুন্দর মোলায়েম সত্যবাদী বাঁশ পেলাম। এই বাঁশঝাড়ে যেন আমার নাতিও বসে দোল খেতে পারে, এই আশায়—

—অব্রদীপ ঘটক

স্টেশন রোড,

জলপাইগুড়ি।



বসকেনি

বি-এ এম-এ

পাড়ার বয়স্ক হিরুকাঁকা সেদিন প্রাতঃস্মরণ সেরে বাড়ি ফেরার পথে রাস্তায় একটা দোতলা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে গলা চড়িয়ে হাঁক দিয়ে উঠলেন—ওরে ভোলা, এদিকে একবার বেরিয়ে আয় তো।

বাড়ির মালিক ভোলা দস্ত বাড়ির উঠোনেই দাঁড়িয়েছিল। ব্যস্ত হয়ে দু’পা এগিয়ে এসে কাঁচুমাচু মুখে বলল কী বলছেন খুড়ো?

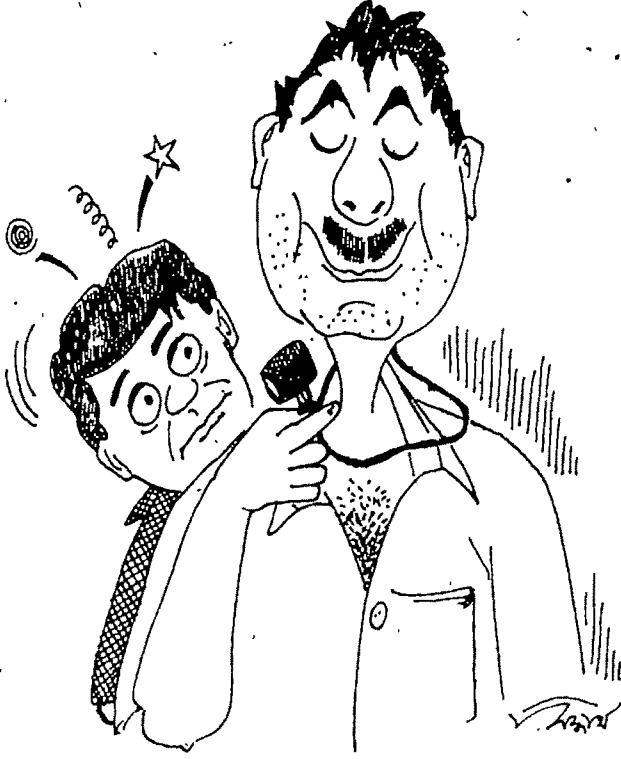
হিরুখুড়ো লাঠিটা তুলে ধরে চোখ পাকিয়ে ভোলাকে বিদ্রূপ করে ভোলাকে বলে উঠলেন—বেশ তো রাতারাতি বাড়িটা বানিয়ে নিলে। তা না হয় মানলাম। কিন্তু কয়েকদিন আগে তোর বাড়ির গেটের নেমপ্লেটে দেখেছিলাম—‘ভোলানাথ দস্ত, বি এ’। আবার এখন দেখছি ‘ভোলানাথ দস্ত, এম এ’। ছোঁড়া, তুই এই এক বছরে বিএ-ই বা পাশ করলি কি করে আবার রাতারাতি এম এ-ই বা পাশ করলি কিভাবে?

ভোলা দস্ত হিরুখুড়োর ধমকে ধতমতো না খেয়ে সহজভাবে বলল, ওঃ, এই কথা খুড়ো? আপনার এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। প্রথম বউটা মারা যাবার পর আমি হয়ে গিয়েছিলাম ব্যাচেলার। আর তাই লিখেছিলাম বি. এ অর্থাৎ ব্যাচেলার এগেন। তারপর এবছর আমাদের গ্রামের খুগ্যা সামন্তের নাটনিকে বিয়ে করে হয়েছি এম. এ, অর্থাৎ ম্যারেড এগেন।

—শিবানন্দ মুখোপাধ্যায়

মাদুলি

অরবিন্দ ভট্টাচার্য



কালো সুতোয় বাঁধা মাদুলিটা গলায় ঝুলছিল। সত্তর্পণে দু' আঙুলে সেটিকে স্পর্শ করে একগাল হেসে বললেন রাগাদা,— মাদুলি। বেশিকরণ মাদুলি।

আমি শুনলাম বশীকরণ। মিটিমিটি হেসে বললাম,—বুড়ো বয়সে কাকে বশ করতে এই মাদুলি ধারণ করেছ রাগাদা? বৌদি তো বশেই আছেন।

—বী যে বলিস! সলজ্জ কণ্ঠে বললেন রাগাদা,—এটা বশীকরণ মাদুলি নয়, বেশিকরণ—ব'য়ে এ-কার—

—সে কি! বিস্ময় প্রকাশ করে বললাম আমি,—এ নামে আবার মাদুলি আছে নাকি? শুনি নি তো।

—আছে বইকি। তত্ত্বসাধন জ্যোতিষার্ণবের নতুন আবিষ্কার। গদগদ কণ্ঠে বললেন রাগাদা,—একেবারে সিওর সাকসেস!

—কিসে?

—সবকিছুতেই। যা বাড়াতে চাইবি তা-ই বাড়বে। রাগাদা উচ্ছ্বসিত

হয়ে বললেন, একেবারে হাতেনাতে প্রমাণ।

রাগাদা ব্যবসায়ী। অবসর সময়ে রাজনীতি করেন। তিনি জানানলেন যে দিন তিনেকের মধ্যে তিনি ভোটবাক্সকে মাদুলি পরাবেন, তাহলে আসন্ন ইলেকশনে তাঁর জয় অনিবার্য।

—আমার পক্ষে যে ভোট পড়বে তার সংখ্যা দ্বিগুণ থেকে তিনগুণ হয়ে যাবে, তুই দেখিস। তুইও একটা মাদুলি নিয়ে নে। দাক্ষণ জিনিস! একেবারে অব্যর্থ ফল, জ্যোতিষার্ণবের গ্যাংবান্টি আছে।

আমি মাথা নেড়ে বললাম, না বাগাদা, আমি কম-বেশি কবণ বা বশীকরণে আগ্রহী নই। আমি ইলেকশনেও দাঁড়াচ্ছি না। মাথাটা মাঝে মাঝে ধরে, বড্ড কষ্ট হয়। বেশিকরণ মাদুলি পরে ওটাকে বাড়াতে চাই না। তবে—মুদু হেসে আমার ইচ্ছে প্রকট করলাম,—তোমার ওই জ্যোতিষার্ণবের কাছে একবার যেতে চাই। বড্ড কৌতূহল হচ্ছে।

—বেশ তো, চল। কালই চল। রাগাদা সঙ্গে সঙ্গে বললেন,—আমি আরেকটা মাদুলি কিনব তোর বউদির জন্য। বাতের ব্যথায় বড় কষ্ট পাচ্ছে বেচারী, নইলে ও নিজেই দেখা করতে যেত জ্যোতিষার্ণবের সঙ্গে।

—বেশিকরণ মাদুলি দিয়ে ওঁর বাতের ব্যথাটা বাড়িয়ে দিতে চাও নাকি? আমি বললাম।

পরদিন দু'জনে গেলাম জ্যোতিষার্ণবের কাছে। কপালে রক্তচন্দনের তিলক কাটা মানুষটিকে ঘিরে বসেছিল অনেক লোক। তার মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই বেশি। সকলেই ভক্তিগদগদ। বোঝা গেল তাবা জ্যোতিষার্ণবের কৃপাপ্রার্থী।

রাগাদা ফিসফিস করে বললেন আমাকে,—এরা সবাই মাদুলি কিনতে এসেছে। আজ বিষুদ্বার তো, মাদুলি আজই সংগ্রহ করে শনিবার ধারণ করতে হয়।

আমাদের পাশ দিয়ে ছুটে এগিয়ে গেল একটা লোক, এবং 'জয় বাবা জ্যোতিষার্ণব!' বলে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করল জ্যোতিষার্ণবকে। তিনি নির্বিকার ভাবে কৃপাদৃষ্টি বর্ষণ করলেন লোকটির উপর।

লোকটি বলল সবাইকে গুনিয়ে,—আপনার মাদুলি অব্যর্থ! আমার ক্ষেতে ধান হয় বিঘাপ্রতি দশ মণ, এবাব প্রায় কুড়ি মণ ধান হয়েছে।

—দেখলি তো, হাতেনাতে প্রমাণ! রাগাদা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন।

—দেখিনি, শুনলাম শুধু। আমি মন্তব্য করলাম—টিভিতে ধানক্ষেতের ছবি দেখিয়ে ওর চেয়ে বেশি পাবলিসিটি স্ট্যান্ট দেওয়া যায়।

—চূপ আস্তে বল। রাগাদা তিবক্ষার করলেন।

একটু পরেই এল আরেকজন, এক কেঁড়ে দুধ নিয়ে। সেও ভক্তি আপ্ত কণ্ঠে জানানলেন যে মাদুলির গুণে তার গোয়ালে দুধের ফোয়াবা ছুটছে। তারই সামান্য পরিমাণ সে জ্যোতিষার্ণবের চরণ ধৌত কববার জন্য নিয়ে এসেছে। বিনা বাক্যব্যয়ে জ্যোতিষার্ণব পা বাড়িয়ে দিলেন।

—এরপর নিশ্চয়ই আরেকজন আসবে তার কর্মক্ষেত্রে উন্নতির সুসংবাদ নিয়ে, আমি চাপা গলায় বললাম, অথবা কোনো ব্যবসায়ী—

বলতে বলতে এসে দাঁড়াল একজন, জ্যোতিষার্ণবের পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বলল, আমার প্রমোশন হয়েছে স্যার।

রাগাদা কটমট করে তাকালেন আমার দিকে। আমি একটা মন্তব্য করতে গিয়েও থেমে গেলাম।

জ্যোতিষার্ণবের সহকারী এক এক করে ডেকে নিয়ে যাচ্ছিল মাদুলি প্রত্যাশীদের। রাগাদা বললেন আমাকে,—একটা টাকা মাদুলির মূল্য বাবদ দিতে হবে। রেডি করে রাখ।

জ্যোতিষার্ণব তখন গুরুগম্ভীর কণ্ঠে ব্যাখ্যা করছিলেন বেশিকরণ মাদুলির অসাধারণ কার্যকারিতার। শ্রোতৃবৃন্দ মন্ত্রমুগ্ধ। আমি বললাম রাগাদাকে,—তুমি আগে ইলেকশনে জেতো, তারপর আমি মাদুলি কিনব।

—হাতেনাতে তিন তিনটে প্রমাণ, তারপরও সন্দেহ! রাগাদা ধমকের

সুরে বললেন,—নে টাকাটা বার কর।

আমি টাকা বার করে বললাম, বৌদির বাতের বেশিকরণের জন্য তুমি যে মাদুলিটা নেবে তার দামটা আমি দিয়ে দিচ্ছি। রাগাদা আপত্তি জানাবার আগেই আমি তাঁর পকেটে গুঁজে দিলাম টাকাটা।

বাইরে বেরিয়ে একটু এদিক ওদিক তাকাতেই এক গাছের তলায় অবিকার করলাম তিন মূর্তিকে।

রাগাদাকে বললাম,—তুমি একটু দাঁড়াও। হাতেনাতে প্রমাণ আমিও পেয়ে গেছি, একটু কথা বলে আসছি।

আমাকে সামনে দেখে তিনজনই হকচকিয়ে গেল। আমি হাসিমুখে প্রশ্ন

করলাম,—যা দিনকাল পড়েছে, সামান্য ওই কটা টাকায় কি তোমাদের পোষায়?

চাষী মাথা নেড়ে বলল,—না। দিন গেলে অন্তত পনেরোটা টাকাও যদি হাতে না পাই—

—কী উন্টোপান্টা বকছিস? চাকুরিজীবী ধমকাল,—তোর তো পাঁচ বিঘে জমি আছে আরামবাগে—

—ওটা আছে বিবাদীবাগে। আমি বললাম,—তোমার গোয়ালটা কোথায়—ফড়েপুকুরে না চাকদায়? গয়লার কাছে জানতে চাইলাম। তার মুখ ছোট হয়ে গেল।

চাকুরিজীবী কাষ্ঠ হেসে বলল,—দাদা, সবই তো বোঝেন, একটু পাবলিসিটি না হলে মাদুলিও বিক্রি হয় না আজকাল।

ফিরে গেলে রাগাদা প্রশ্ন করলেন,—কী জিজ্ঞেস করলি ওদের?

—তেমন কিছু না; আমি বললাম,—চোখের সামনে এতগুলো প্রত্যক্ষ প্রমাণ একসঙ্গে দেখলাম তো, তাই একটু আলাপ করে এলাম।

ভোট জিতবার আশায় রাগাদা দ্বিতীয় বেশিকরণ মাদুলিটিকেও নিজের গলায় ঝুলিয়েছিলেন। বৌদি তাতে রীতিমতো ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। বলেছিলেন,—তুমি হারবে, হারবে, হারবে।

হেরেছিলেন রাগাদা, তাঁর জামানত বাজেরাপু হয়েছিল। আশ্চর্য করে বলেছিলেন আমাকে,—বুঝলি, তোরা বৌদিই আমাকে হারিয়ে দিল। ওভাবে অভিশাপ দিলে কি আর জেতা যায়?

আমি হেসে বললাম,—বেশিকরণ মাদুলিতে কাজ হয় বৈকি। তবে জেতার দিকে নয়, হারার দিকে।

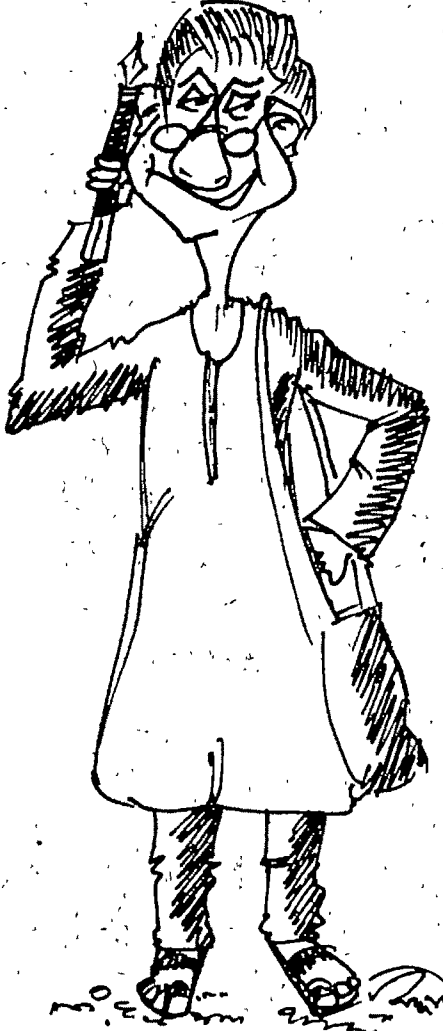
With Best compliments From :

DEEP CONSTRUCTION

69, PURBACHAL ROAD (W)
KOLKATA-700078

শতং বদ মা লিখ

পিনাকী ভাদুড়ী



শতং বদ মা লিখ—এ কথাটা আমরা কোথায় যেন পড়েছিলাম। অনেকবার কেউ না কেউ বলেছে কথাটা। এখন কিন্তু মনে মনে মেনেছি এই বাক্যটা। বাক্যবাগীশ এখন সবাই, সবাই এখন কথা বলে, শুধু শতং নয়, সহস্রং। সংস্কৃত এই বাক্য আমাদের কাঁচাচালতার নিদর্শন। সব বিষয়ে কথা বলাই আমাদের স্বভাব, কোনো বিষয়ে কোনো কিছুই

না লেখাটা আমাদের স্বভাব নয়, অভাব। ক্ষমতার অভাব। তাই যত বলি, তত লিখি না। লিখলেই সব ধরা থাকবে, আর তাতেই ধরা পড়ে যাব আমরা। বড় গলা করে বড় বড় কথা বলি, কিন্তু ছোট ছোট করেও কিছুই লিখি না।

এ ব্যাপারে আমাদের মাস্টারমশাই হলেন রাজনৈতিক নেতারা। এঁরা আসলে অভিনেতা,

তাই শুধু পার্ট বলাই এঁদের কাজ, তাঁদের পার্টস অব্ স্পীচ—এ Rhetoric, যতটা, Prosody ততটা নেই। তাছাড়া অভিনেতা হিসেবেও এঁরা নিরেস, তাই নেতা হিসেবেও নীরস। যার কিছু হয়নি, সে সিনেমায় নামতে যায়। যার সেখানেও কিছু হয় না, সে Sin-এ নামে। সিনেমায় ফেল করলে রাজনীতিতে পাশ করার চেষ্টা করে অনেকে। এঁরা সেই খারাপ অভিনেতা মাত্র, তাই এঁদের বলাকওয়াও জুতের নয়। কথা শুনেলে জুতো মারবেন কিনা ভাববেন, কিন্তু পারবেন না, কারণ এঁদের কৃষ্টি জুতের—আপনার তা নয়—সুতরাং চেপে যাওয়াই ভালো। ভেবে দেখবেন, আজকের নেতারা সকলেই মুখে মুখে বিধান দিয়েছেন, মুখের কথায় প্রফুল্ল করেছেন জনগণকে, জনগণের নামেই জ্যোতির্ময় হয়েছেন। নয়ত বা বুদ্ধিজীবী সেজে জনতাকে বুদ্ধি বানিয়েছেন—তবু কিছুটা লেখেননি। না লিখে এঁরা শুধু Talk দেন, তাতেই নাটক হয়। যা বলেন তা করেন না কেবল তাই নয়, যা বলেছেন তাঁ দরকার হলে অস্বীকার করেন। এ তো আমি বলিনি, কিংবা, এমনটি তো বলিনি। তখন তাঁদের তো তো করার পালা, অথবা পালাবদল। এতেই তাঁদের আমরা প্যালা দিয়ে যাচ্ছি। সেই যে শালা-ভদ্রীপতির মামলার গল্পটা, যেটা সবাই জানেন। শালা নালিশ করেছে যে ভদ্রীপতি আমায় শালা বলেছে। হাকিম তো সব শুনটুনে অবাক, আরে আপনি তো ওর শালাই হন; উনি তো শালা বলতেই পারেন। শালা ঝোঁকে উঠে বলল, 'হুজুর এ শালা সে শালা নয়, এ দস্তুরমতো রাগের মাধ্যম শালা বলেছে।' বুঝুন, এমন দস্তুরনিয়ে কে দর দেবে কে দরদস্তুর করবে এমন মামলার।

আজকের নেতারাও তাই বলেন, এ কথা সে কথা নয়। কাগজে আমাদের নামে যা ছেপেছে, তা আসলে বদনাম দেবে রগেই বানিয়েছে। ও কথা আমাদের মুখে বসিয়ে দিয়েছে ওরা। একেবারে বসিয়ে দিয়েছে আমাদের।

এখন অবশ্য টেলিভিশন হয়েছে, তথাপি তাতেও ভীষণ আপত্তি এঁদের—এটাও কি

বানানো? সাজা দেবার জন্য কি সাজানো? এখনো কেউ বলেনি যে ছবিটা আমাদের, গলাটা আমাদের নয়। ডাবিং করেছে ছবিওলা। তাও একদিন বলবেন এঁরা, তাও একদিন করবেও কেউ। ততদিনের বাকি কত?

যা বলছিলাম; এঁদের বলাবলিই সার, লেখালিখির মধ্যে এঁরা যান না— কারণ এঁরা লিখতে পারেনও না। লেখাপড়া করার সময় এঁরা খুব একটা পাননি। পার্টি এবং পরিবার দেখতে গিয়ে দেশকে দেখার সময়ও জোটেনি এঁদের। অবশ্য এখন দেশ দেখছেন অনেক, মানে বিদেশ দেখতে যান এঁরা প্রায়ই। দেশের পয়সাতেই যান। দেশে যা খাটেন বিদেশে তা পুথিয়ে নেন।

এইরকমই সবাই। কেউ কিছু লিখবে না, শুধু বলবে। বুড়ি বুড়ি মিথ্যে কথা বলবে,—এই আর দু’দিন দেখুন, সব ঠিক হয়ে যাবে। আসলে যা ঠিক হবে তা হল ডাক্তারের ব্যাঙ্ক ব্যালাপ। যতদিন তা না হচ্ছে ততদিন আপনার লাইফকে ব্যালাসে বুলিয়ে রাখবেন। জিনি। যখন দেখবেন আপনার টাকাপয়সা ফুরিয়ে এল, তখন আপনাকেও ফুরিয়ে যেতে দিতে তাঁর দেরি হবে না। এতদিন তিনি প্রেসক্রিপশনটাও লেখেননি, সেটা লিখেছে তাঁর অ্যাসিস্ট্যান্ট। তিনি নিজে সই করেছেন শুধু। বিনিময়ে আপনার সই করা চেক নিতে চাননি, বলেছেন ক্যাশ-ই দিন। তাই সই।

এতদিনে তিনি লিখবেন— এই প্রথম এবং এই শেষ। আপনি শেষ হয়ে গেলে ডেথ সার্টিফিকেটটা লিখে সব শেষ করে দেবেন তখন।

পাড়ার এম-এল-এ-দাকে বা কাউন্সিলারকে ধরে তখন Pauper Cremation করার পারমিশন নেবার জন্য আপনার ছেলেকে ছুটতে হবে। চিনিস্কেলের পরচ জুগিয়ে সংস্কারের খরচ মেটানোর ক্ষমতা আর কই তার? তাদের কাছে গেলেই যে কাজ হবে এমন বলা যায় না। তারা এমন মওকা তাদেরই দেবে যারা তার মোকামে রাজ্য যাতায়াত করে। অথচ সরাসরি ‘না’ বলবে না গোড়ায়। হয়ত ‘হ্যাঁ’-ই বলবে। তবে লিখে দেবে না কিছুই। বলবে, পরে এসো। ওদিকে, ‘তার আর পর’ নেই, গাইতে গাইতে শেষ যাত্রা শুরু হয়ে গিয়েছে ততক্ষণে। এঁরা যদি ‘হ্যাঁ’, বলেন বুঝতে হবে ‘হয়ত’; যদি এঁরা ‘হয়ত’ বলেন, বুঝতে হবে ‘না’—‘না’ এঁরা বলেন না, তবে যদি কেউ ‘না’ বলে ফেলেন, বুঝতে হবে তিনি কোনো রাজনীতিকই নন, অন্তত ঝানু নন তিনি।

এইভাবে যারা লেখেন না, তাঁরা কেউ কিছু লিখে ফেললে সেটা হয় মারাত্মক। তাঁদের হাতের লেখা সকলেরই খারাপ, না লিখে লিখে লেখাতে স্বী আসেনি। বিব্রী সেই লেখা পড়াই যায় না। সেই ডাক্তারের গল্পটা বোধহয় সবাই জানে। একজনের কাছে কে চিঠি দিয়েছে, পড়তে পারছে না কেউ চিঠিটা। কারণ লেখাটা কুৎসিত। কেউ বুদ্ধি-দিল—ওষুধের দোকানের কম্পাউণ্ডারকে দাও, সে পড়ে দেবে—খারাপ লেখা প্রেসক্রিপশনে পড়ার অভ্যাস আছে তার। তাই নিয়ে যাওয়া হল। কম্পাউণ্ডার তখন খুব ব্যস্ত আছে দেখে চিঠিটা টেবিলে রেখে এল সে, বলে এল, রেখে গেলাম, ঘুরে এসে কথা হবে। খানিকটা বাসে ঘুরে এসে টেবিলে দাঁড়াতেই দেখল যে চিঠিটায় দোকানের একটা স্ট্যাম্প মারা, পাশে একটা দাগ মারা মিক্সচারের শিশি রাখা আছে। ওটাকেও প্রেসক্রিপশন ভেবে নিজের মতো করে পড়ে নিয়েছে কম্পাউণ্ডার। এই তো হাতের লেখার অবস্থা। আর এই তো সে লেখা ব্যবহারের এমন দৃষ্টান্ত।

এক্ষেত্রে লেখা তো কমে যাবেই। চিঠিও কেউ লেখে না আর। ও শিল্পটা হারিয়েই গেল। ই-মেল নামে যে তুফান মেল বেরিয়েছে তাতেই

কাজ হয়ে যাচ্ছে সবার। কাগজ কলম নিয়ে পত্র রচনা বোধহয় যাদুঘরের বস্তু হয়ে যাবে। কাগজ বা কলম আর লাগবে না। Paperless Society তৈরি হতে চলেছে, এতে কাগজ শুধু নয়, গাছও বাঁচবে—দূষণ থাকবে না। তবে তেমন দুনিয়া কোনো আল্লাদের বিষয় হবে না। বন্ধুর চিঠি, প্রেমের চিঠি, বেড়ানোর চিঠি—এসব হাতে না লিখলে তাতে কি কণ্ঠস্বরের উত্থান-পতন ভরে দেওয়া যাবে? প্রেম বা বন্ধুত্ব টিকে থাকে তো-হাতের লেখা চিঠিতে—এক একজনের অক্ষরের ছাঁদ এক এক রকম, তা থেকেই ছাদনাতলায় যায় যারা, তারা এখন নির্বিকার e-mail-এ কোনো স্বাদ পাবে কি? প্রেম গড়ে ওঠার একটি সোপান তো এই চিঠি। বন্ধুর সঙ্গে বিদেশ থেকে পত্রালাপেই তো অন্তরালাপ, সেখানে যার শুক, হয়ত শশানযাত্রায় তার সমাপ্তি। নচেৎ শেষযাত্রা তো নিঃসঙ্গ হয়ে যাবে।

অর্থাৎ সেই সব বিখ্যাত পত্রাবলী, যা অনেকে লিখেছেন অনেককে—যার জায়গায় জায়গায় প্রাপক দাগ দিয়ে রেখেছেন নানা মন্তব্য, সে সব

শালা নালিশ করেছে যে ভগ্নীপতি আমায় শালা বলেছে। হাকিম তো সব শুনুটুনে অবাক, আরে আপনি তো ওর শালাই হন, উনি তো শালা বলতেই পারেন। শালা ঝুঁকে উঠে বলল, ‘হুজুর এ শালা সে শালা নয়, এ দস্তুরমতো রাগের মাথায় শালা বলেছে।’

তো আর হবে না? রবীন্দ্রনাথ যদি কারো লেখার পাশে আপন মনে লিখে থাকেন, ‘তুমি কচু জানো’, তা কি আমরা আর পড়তে পাব না? পাব না সেই সব অমর চিঠি যা মৃত্যুর পরেও আমাদের জীবনকে ভাস্বর কবে দেবে? একসময়ে ফোন পাওয়া ছিল দুর্ঘট, এখন না বলতেই লাইন দিয়ে দিচ্ছে, কারণ ক্রমশ এই ফোনের বিল দিতে গিয়েই খালেবিলে ডুবে মরতে হবে সবাইকে—ততদিন ফোন করলেই পেয়ে যাচ্ছি, কথা বলে নিচ্ছি, লিখতে হচ্ছে না একটুও। একশো কথা বলে যাচ্ছি, একটা কথাও লিখছি না। এমন স্বর্গ ছাড়িয়া কোথায় যাইব গো? ছেলেবেলায় পড়া ঠাকুমার বুলির দেশ—রসগোল্লা আর মুড়িমুড়কির এক দর যেখানে, যে স্বর্গে—সেই উপসর্গ উপস্থিত হয়েছে আজ—বিসর্গ হয়ে যেতে দেরি নেই আর।

তবে একটা অন্য দিকও আছে। সেইটেই হল এ বিষয়ের বিষ। একদল আছেন যারা নিয়মিত লিখে চলেছেন। নিরত আছেন লেখনীতে। অনবরত, অবিশ্রাম, অবিরাম। রাজনীতিক বা চিকিৎসক—এঁরা যদি লেখেন কখনো সন্ধানো, তখন স্ক্যামাষেমা করে নেওয়া যায়। কিন্তু এঁদের লেখা যেম্মা করেও, ক্ষমা করা চলে না। অমার্জনীয় এঁদের রচনা, যা শুধু বিধাতাই মার্জন্য করে দেন। এঁরা হলেন আদি এবং অকৃত্রিম বাঙালি সাহিত্যিক। এঁরা সব পারেন, শুধু লিখতে পারেন না। অথচ লিখতে এঁদের হবেই, কারণ এতেই এঁদের নাম হয়ে গেছে যে। এই করেই প্রশাসী পাচ্ছেন এঁরা, আর তো পিছিয়ে যেতেন পারেন না। তাই এঁরা আর কিছু না করে শুধু

লেখেন, কেবল লিখে চলে। যাঁদের লেখা কেউ পড়তে পারে না, এমনকি এঁরা নিজেরাও পড়েন না নিজের লেখা—তবু আর কিছু করতে না পেরেই তো এঁরা লেখক হয়েছেন। যার কিছু হয়নি সে চেষ্টা করে এমন কিছু করতে যাতে কিছুই করতে হয় না। সে তাই রাজনীতিতে নামে, নেমে নির্বাচনেও দাঁড়ায়। দাঁড়াতে গিয়ে পড়ে যায় প্রথম প্রথম, তবু যে মাটিতে পড়ে লোক ওঠে তাই ধরে। নইলে তো সবই ঘাটি। একবার দাঁড়াতে পারলে তো আর চিন্তা নেই তার। তখন চিন্তা তাদের যারা তাকে দাঁড় করিয়েছে। কারণ নিজে সে দাঁড়িয়েই বাকি সবাইকে শুইয়ে ফেলেছে। এখন তো আর তাকে নামানো যায় না। আর তো সে নমনীয় নেই। আপনাদের হয়ে সে কাজ করবে ভেবেছিলেন, আসলে সে নিজের হয়ে কাজ গুছোচ্ছে। রাজনীতিক তাতেই ব্যস্ত, তাই নিয়েই সে কথা বলে, লেখার সময় বা ইচ্ছে বা ক্ষমতা তার নেই। এদের নিয়ে যারা আশা করে তাদের সে আশা তামাশায় বা আমাশায় পরিণত হবেই।

ডাক্তারের কাছেই বা কে আর আশা করে কিছু? যার রোগ সারে তার অপনিই সারে, ডাক্তার তাকে জটিল করে সারে। এদের কাছে যেতে হলে আশা ছেড়ে দিয়েই যেতে হয়, তাই যায় সবাই, এবং এদের হাত থেকে মুচলেকা দিয়ে বেরিয়ে আসে অনেক সময়। এদের কাছে আশা শেষ পর্যন্ত দুরাশা বা নিরাশা হয়েই দেখা দেয়।

কেবল সাহিত্যিকের কাছে কারো কোনো আশা নেই, তাই তাদের কেউ বাধাও দেয় না। ছোটরা যখন খেলা করে তখন তাদের মধ্যে এলেবেলে যারা তারা নিজেরাই দৌড়োদৌড়ি করে, অন্য কেউ তাদের ছুঁয়েও দেখে না। তারা বোঝেও না যে তারা সবার মধ্যে এলেবেলে—তারা এলে বা গেলে কারো কিছু যায় আসে না। লেখকরাও তেমনি, তাঁরা যা লেখেন তা পড়ে না কেউ, পড়লেও ভুলে যায়, ফেলে দেয়। বরং এঁরা দলিল লিখলে পারতেন, সেটা অন্তত কেউ কেউ পড়ত।

শত শত লেখক তবু সাহিত্য লিখে যাচ্ছেন, বাংলা সাহিত্যে তাঁরা এখনো শূন্যকুণ্ড হয়েই আছেন। তাঁরা তাই এখন টেলিভিশনের সিরিয়াল লেখেন। সিরিয়াল কিছু নয়, তবু এই সিরিজের লেখাতেই তাঁদের ধারাবাহিক চর্চা। অন্তহীন সেই অনন্ত দুর্যোগই তাঁদের অসীম এক সীমাহীন

সুযোগ এনে দিয়েছে। যে অভিনয় জানে না সে এই সিরিয়ালে নামে; সেই সিরিয়াল লেখেন সেই লেখক যার লেখার হাত খোলেনি।

শতৎ বদ মা লিখ-র দেশে এঁরাই সেই শতমারী সিরিয়াল লেখক। শয়ে শয়ে এপিসোড লেখেন এঁরা, তবু কিছুতেই এপিটাক লিখে উঠতে পারেন না। তাই শেষও হয় না এইসব ধারাবাহিক বিপর্যয়, প্রতিদিনই যার নতুন পর্যায় দেখা যাচ্ছে।

রাজনীতিকের হাত থেকে যদি বা বাঁচি, লেখকদের হাত থেকে কে বাঁচাবে? কোন ক্রম? যারা বিহাইন্ড থেকে খেলাভাজার খেলা খেলে?

রাজনীতি এবং ডাক্তারি, এ দুটোই এক ধরনের চিকিৎসা। চিকিৎসার সেই রাজনীতি থেকে বাঁচতে গিয়ে যদি লেখকের লেখা পড়েন তবে আপনাদের উপায় কী! লেখক থেকে বাঁচার জন্য আপনাকে আর এক লেখককেই ধরতে হবে। এক পত্রিকার জবাব দিতে যেমন আর এক পত্রিকা বেরোয়। এক দুর্গাপুজো থেকে যেমন আরো অনেক দুর্গাপুজো। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার সেই মতলব শেখাবার রাস্তা বাতলাবার জন্য আর একটা দুর্গাপুজো পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। ততদিনে দেখুন, কে কত বলছে আর কে কত লিখছে। দেখুন, কিন্তু ভুলেও সেসব শুনবেন না, কিংবা পড়বেন না।

পুনশ্চ : সম্পাদক মশাই আমায় জিজ্ঞাস করেছিলেন, এ লেখাটার মানে কি? তাঁকে বলেছি, এর কোনো মানে নেই। মানে নেই বলেই এটা ছাপা হবে, মানে থাকলে ছাপা হত না। আমজকের লেখকদের 'কোন লেখাটার মানে থাকে? তবু ছাপা তো হয়। ছাপাটাই এর money.

পরিশেষ : পুনশ্চের পরে এটুকু যোগ করতেই হল, কারণ আপনাদের বলা দরকার যে এ লেখার মানে না খুঁজে মানে মানে লেখাটা পড়ে ফেলাই ভালো। জগতে সবকিছুর মানে বুঝতে পারাটাই একমাত্র কথা নয়। না বুঝেও যদি মজা পেতে পারেন তবে এই বাজারে রোজ বাজার করতে যাওয়ার দুঃখ ভুলতে পারবেন।

দী. কু. সা-র গল্প

প্রণয়কৃষ্ণ গোস্বামী

‘অচলপত্র’ সম্পাদক দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল কথায় কথায় অনেক মজার গল্প বলতেন এবং নিজেও অনেক মজার ঘটনা ঘটিয়ে থাকতেন। দু-একটি এখানে বলছি।

একবার কলেজ স্ট্রিটে মনোজ বসুর বেঙ্গল পাবলিশার্সের ঘরে বেশ কয়েকজন লেখক বসে গল্প-আড্ডা করছিলেন। এমন সময় তারাশঙ্কর মন্ডোপাধ্যায় সেখানে এসে ঘরে ঢুকলেন না, বারান্দা থেকে মনোজবসুকে বারান্দায় নিয়ে কিছু দরকারি কথা বলে চলে গেলেন। খানিক পরে

দীপ্তেন্দ্রকুমারও ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় গিয়ে মনোজ বসুকে ডাকলেন মনোজবসু উঠে আসতে নিচু গলায় তাঁকে বললেন, ‘কেবল তারাশঙ্কর বাবুরই দরকারি কথা, গোপন কথা থাকতে পারে, আমাদের কি থাকতে পারে না?—এইটাই কথা। আর কোনো কথা নয়।’ বলে দীপ্তেন্দ্রকুমার আর ঘরে ঢুকলেন না। সেদিনের মতো বেরিয়ে চলে গেলেন।

* * * * *

সাহিত্যিক সরোজ রায়চৌধুরীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল কলেজস্ট্রিট মার্কেটের কাছে। দীপ্তেন্দ্রকুমার তাঁকে ডেকে বললেন, ‘সরোজদা, সেদিন আপনার এই নতুন উপন্যাসটার খুব প্রশংসা করছিলেন.... কে যেন, কি যেন... ঠিক নামটা মনে আসছে না এখন।’ অনেকক্ষণ এভাবে কাটিয়ে কপালের ডান দিকে আঙুলের টোকা মেরে মেরে একটু পরে বলে উঠলেন দীপ্তেন্দ্রকুমার, —‘হ্যাঁ, ঠিক, হয়েছে। এবার মনে পড়েছে। দিলখুসা কেবিনের সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন—বইটা খুবই ভালো হয়েছে। আপনাই বলেছিলেন।’



আমাদের লক্ষ্য—কলকাতার শ্রেষ্ঠত্ব
সংস্কৃতি, শিল্পকলা, শিক্ষা,
সাক্ষরতা, সমাজ সচেতনতা,
বাণিজ্যে, শিল্পায়ন—এই সব বিভাগেই

কলকাতার মননের সঙ্গী
কলকাতা পৌরসংস্থা

আপনার সেবায় তৎপর, দিবানিশি নিরন্তর



লবাবী পরটা

মা দুগ্গারে বরণ তো করলেন। হের পর ত খাওন-দাওন একডু ভালো মতেন করতি আইব। তা, আপনোগো কাসালের মতন দশা কি আপনার আছে স্ব'ন দিহি। গোলাভরা ধান, পুকুরভরা মাছ। পইন্চাষ জনে প্যাটি পুইয়া খাইয়াও পূজার দিনগুলোয় হৈসেল খালি করতি পারত না, এহেনে তো পূজায় বউ-এর লগে 'ডিক্সো' পাড়ের ছিঙ্ক শাড়ি, পোলার লগে সাফারি সুট মইয়ার লগে করিশমা স্কার্ট, শাশুড়ির জন্য ঢাকাই জামাদানি, শালিগো লগে হালফ্যাশানের সালওয়ার কামিজ কিইন্তে গিয়া পকেট তো একেরে গড়ের মাঠ কইয়া ফ্যালান। বোনাসু যা কিছু পাইছিলেন হুইলই পেটায় নমঃ। মহাষ্টমী আর মহালবমীর দিন ভালোমন্দ কিইন্যা খাওনের জোর কোহানে। কিন্তু, বাঙ্গালির মন তো। হেই দুই দিন একডু লুচি পরটা খিচুড়ি না হইলে পরানডা কিরকম খুং খুং করে। তাই, হুইলের বাজেটের কথা ভাইব্যা লবাবী পরটা বাননের পোনালিডা কইছি। খাইলে আপনোগো ভিখারি হওনের ভর নাই কিন্তু।

কি কি লাইগব : ময়দা, খানকয়েক ডিম, আলু, ফুলকপি আর আপনার গছন্দমতন খানকয়েক তরকারি, পরিমাণমতন ত্যাল (খরচেব ভয় হইলে বনস্পতি না, দিয়া সইরম্যার ত্যালও দিতি পারেন, কি আর করা যাইব), যি।

রন্ধন পোণালি : লবাবী পরটা অনেকডা মুগ্গলই পরটারই যমজ ভাই। একডা পাস্তরে ডিমকমডা ফুটাইয়া রাহেন। আর একডা পাস্তরে আলু,

হেঁ সেল

ফুলকপি প্রভৃতি তরকারি খবু সক্র সক্র কইয়া কাইট্যা এমন পরিমাণে জল দিবেন যাতে আপনিও শ্যাষ্ হইয়া—না, মানে জলডাও শ্যাষ্ হইয়া যাইব আর তরকারিও সিদ্ধ আইব। হেরপর একডু যি বা ত্যাল ছড়াইয়া দিয়া তরকারিগুলান শুকনা কইয়া ভাইজ্যা লন। হেইবারডি আসল কাম। ময়দাডা মইখ্যা চাকিতে খুব বড় পাতলা কইয়া বেইল্যা হেইবার যি মাখানে চাটতে দ্যান। তাব ঠিক সেন্টাবে, মানে মইখাখানে হেই তরকারি খানিকডা ছড়াইয়া দিয়া হেই ময়দার গোলা থিক্যা কিছুডা ডিম হেই তরকারির উপর দিয়া দ্যান। হেই সময় চামচে কইয়া যি লইয়া পরটার চাবদিকে দিবেন। একপিঠ ভাজা হইলে উইন্ট্যা দিয়া আপনার পিঠ, না না, পরটার অপর পিঠ ভাইজবেন। হেইবারও কিন্তু চামচে কইয়া চাইবদিকে যি দিবেন। ব্যাস্ লবাবী পরটা তৈয়ার। বাংলার শ্যাষ্ স্বাধীন লবাব, সিবাজ উদ্ দৌল্যার স্মরণ কইয়া ঝাইতে থাহেন। দুগ্গাপূজার লবাবী পরটা মানে হিন্দ-মুসলিম মিলনের নূতন কায়দা। বেহেশ্‌হে সিরাজের আত্মা ততক্ষণে ঠোট চাটুতি খাউক।

আলুর নুচি

হেই পদডি ঝাইলে মা দুগ্গাও খুশি না হইয়া পারত্যান না। অষ্টমীর দিন আলুর দমের লগে আলুর নুচি একেরে রাজযোটক। বানাইয়াই দ্যাহেন না।

কি কি লাইগব : আলু (আপনোগো পেরোজন মতন) ময়দা, যি, ডিম, দুখ (ছোটক্ মতন) নেবু, চিনি, লংকার গুঁড়া, টম্যাটোর রস বা সস্।

বাননের পোণালি : আলুগুলান সিদ্ধ কইয়া গরম গরম চট্‌কইয়া লইবেন। হেইবার ময়দাতে সামাইন্য ঘিয়ের মিশেল দ্যান। হেরপর একডুও জল না দিয়া একহান ডিম, একডুহান দুখ কিংবা দুই-একহান আলু বেশি দিয়া ভালো কইয়া মাখেন। হেব লগে একডু নেবুর রস আন্দাজ মতন লবণ, চিনি আর লংকার গুঁড়া মিশাইয়া দ্যান। টোটাল জিনিসডারে মণ্ড বানাইয়া মাখা নুচির মতন বেইল্যা ভাইজবেন। হেরপর আচার আর টম্যাটোর রস বা সস্ দিয়া সাঁটাইতে যা লাইগব না, দ্যাব্তারা অমৃতের হেইরকম সোয়াদ পায় নাই, গেরাস্টি একেবারে।

সাধারণ খিচুড়ি

বাঙ্গালির জেবনডাই দুখ-সুখের চালে-ডালে খিচুড়ি মতন হইয়া গ্যাছে গিয়া। পূজোব কয়দিনও হেই খিচুড়ি থিক্যা মুক্তি পাওনের চ্যাপ্টা করা বৃথা। মা-দুগ্গার মুহে দেবীর না বলিউডের হিরোইনের আদল রইছে, বুইবতেই পাইরবেননি। সুতরাং নিজেরা এবার খিচুড়ি খাইয়া আত্মার শান্তি করেন। পেঞ্চমে হুইলের বাজেটের লগে মানানসই খিচুড়ির তৈয়ারিডা কইয়া লই।

কি কি লাইগব : মুগের ডাল, চাল, জিরা, মরিচ, লংকা, আদা, ধনিয়া, লবণ, ঘি, ত্যাজপাতা, ছোড এলাচ, দারচিনি, ফুলকপি, আলু, ডিম (দরকার হলি পর)।

রন্ধন পোণালি : পেথথমে মুগের ডালডা ভাল কইর্যা ভাইজ্যা সন। হের পর মুগের ডাল আর চাল সমান সমান ল'ন, হাঁড়িতে হের দু'গুনা জল চাপাইয়া দ্যান। আপনে গরম, না না, জল গরম হইলে পর চাল ও ডাল খুইয়া হাঁড়িতে দিয়া দ্যান মুগের ডাল না খুইয়া শুধু বাইছা লইলেই চলব। আপনার মুখে, মাপ কইরবেন, হাঁড়ির মুখে ঢাকা চাপা দ্যান, চাল ডাল আধসিদ্ধ হইয়া যাওনের পর তাতে জিরা-মরিচ বাটা লংকা বাটা, আদা বাটা, ধনিয়া বাটা আর লবণ জলে বেশ কইর্যা শুইল্যা ঢাইল্যা দ্যান। চাল-ডাল সিদ্ধ হইয়া গ্যালেনি ঘি, ত্যাজপাতা, এলাচি, দারচিনি হাঁইচ্যা খিচুড়ির ওপর ছড়াইয়া দ্যান। খানিকড়া ঘি ঢাইল্যা দিয়া নাইড়াচাইয়া খিচুড়ি নামাইয়া দ্যান। আলু আর ফুলকপি দ্যাওনের সাইট থাইকলে ফুটবার কালে বড় বড় পিস আলু আর ফুলকপি দিতে পারেন। ডিমও দিতে পারেন। তয় সিদ্ধ কইর্যা, বুইঝতেই পারছেন, জিবে ঠাকাইলেই খিচুড়ি একত্রে অ-সা-ধারণ লাইগব।

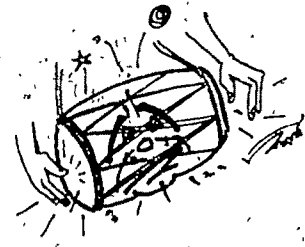
জার্মানি খিচুড়ি

খিচুড়ির কামডাই হইল গিয়া পাঁচ মিশালি। হেইজনি খিচুড়ির যদি বিদ্যাশি নাম হয় তা হইলেও বিচলিত হইবেন না। তার জন্যি জার্মানি খিচুড়ি আপনেনো শিখাইয়া দিই। স্বয়ং হিটলার বা ম্যাক্সমুলার সাহেবও হেই খিচুড়ি চাখলি মানব জনম সার্থক মনি করতেন।

কি কি লাইগব : সোনামুগের ডাল দু'কিলো, চাল পাঁশশ গেরাম, ডিম পনরোহান, ঘি নয়শ গেরাম, চিনিপাতা দই চাইরশ গেরাম, বাদাম দু'শ গেরাম, কিসমিস আর পিস্তা আড়াইশ গেরাম কইর্যা, মিছরি, আদা-বাটা, আদার কুচি, পিয়াজ চাইরশ গেরাম, রসুন, জাফরান, ধনিয়া-ছ্যাঁচা, লংকা বাটা, একডুহান দারচিনি, ত্যাজপাতা, এলাচি, আন্ত গোলমরিচ, জিরা, লবণ, আর জল লাইগব সাত কিলোমতন।

রন্ধন পোণালি : চাল আর ডাল ঝাইরা লন। একহান ড্যাকটিতে কম আঁচে জল, ধনিয়া ছ্যাঁচা, গোলমরিচ, জিরা আর একহান ত্যাজপাতা পঙ্কের এক টুকরা ন্যাকড়ায় পুটলি কইর্যা বাইছ্যা চাপাইয়া দ্যান। জল আদেক আলে ডেকচি নামাইয়া বসান। কিছুক্ষণ পর কিসমিস গুলান আধভাজা কইর্যা তুইল্যা হেই ঘিয়েতে রসুন আর পিয়াজকুচি গুলান লালচে কইর্যা ভাইজ্যা তুইল্যা লন। হেরপর পুবা জাফরান, আদা-বাটা আর লংকা বাটা হেই ঘিয়ে আধভাজা কইর্যা ল'ন। ডিমগুলান-ভাইজ্যা চাল-ডালের আর মশম্মার ওপর ঢাইল্যা কম আঁচে অনবরত নাড়তি থাকেন। চাল ফুইট্যা উঠলে অল্প জল দিয়া নাড়তি থাকেন। চাল ফুইট্যা নরম হলি, লবণ আর আদেক পিয়াজ ভাজা দিয়া আবার কম আঁচে নাড়তি থাকেন। খিচুড়ি সিদ্ধ হইছে বুঝতি পারলি বাকি মশম্মা আর মিছরি খিচুড়ির মন্দি দ্যান এবং বেশ কইর্যা নাইড্যা ঠাণ্ডা জায়গা রাইখ্যা দ্যান। ড্যাকটির মুখে ডাল কইর্যা চাপা দিয়া দ্যান। আড়ালে বইস্যা থাকেন, কহন না ডালা খুইল্যা সব খিচুড়ি হাপিশ হইয়া যায়। যা খোশবাই বাইরইব।

—কাজাল রায়



বোল

সৌরেন বসু

তেরে-কেটে তেরে-কেটে

না-তিন্তা

ট্রেনে-বাসে হাটে-বাটে

গোধরায় শুজরাটে

রেখে যায় মেরে কেটে—

তাই চিন্তা।

তাক-তাক, তাক-তাক

ধিন্ ধা-ধা

আরে বাবা তারা শুধু করে ধান্দা;

গেরুর তলে তলে

জানি কারসাজি: চলে

তারা দেখি শোনবার নয় বান্দা।

তেরে-কেটে তাক-তেরে

ধা-ধিন্-ধা

আরে বাপু করো কেন পরনিন্দা,

বাঁচলে বাপের নাম—ববে জিন্দা।

তেরে-কেটে খেরে-কেটে

তেরে-কেটে তাক

পৌটলা-পুটলি ট্রেনে-বাসে পড়ে থাক

কে জানে কে বোমা রেখে

করে গেছে তাক।

ধা-ধিন্ ধা-ধিন্

ধিন্-ধিন্ ধা—

উন্টেছে ট্রেনে দেখি ইন্জিনটা

উগ্রপন্থী এসে রাইফেল ছুড়ে শেষে

লাশ ফেলে চলে গেল তিন-তিনটা।

তেরে-কেটে খেরে-কেটে

না—তিন্তা

ডুববে না ভাসবে তা করো চিন্তা

দেশকে বাঁচিয়ে তবে নাচো ধিন্ তা

ধিন্-ধিন্ তা

বুঝেছি কি কারে কম স্বা-ধিন্-তাঃ

বিন্টু বিজ্ঞানী

দ্বিবেন্দু দাস



আমি বিন্টুকে পড়াতাম। বিন্টু ক্লাশ টেনে শীষণ টেনেটেনে উঠেছে। তাই আগের মাস্টারকে ভাগিয়ে আমায় রাখা হয়েছে। বিন্টুর বাবা বীরেন। তার বাবা হীরেন। বীরেন প্রাইভেট ফার্মের কোরানি। হীরেন এক্স-আর্মি। দিনরাত কুকুর নিয়ে ঘোরেন। কুকুর তাঁর কাছে নেশা এবং ‘নেশান’। কথায় কথায় বলেন, ছাত্র কুকুর বাবা। তোমাদের ওই

অ্যাম্‌সেশিয়ান ষ্ট্যাক্‌শেশিয়ান নয়। সকাল হলেই
 গিলপিল করে বেরিয়ে পেট ঝেড়ে আসবে আর
 শাঁকে আসবে—তা নয়।

আমি বলেছিলাম, মেসোমশাই আমি তো
জানতাম কুকুরেরা সকালেই প্রাতঃকৃত্য সারে—
আমাদের মতো।

—কে বলেছে হে? ওগুলো কুকুর নয়,
পাগেটিভ।

—সেটা কী যেসোমশাই? গঙ্গানান্যাত্তী
ককর? কর্পোরেশনের ককর?

—এঃ, তুমি দেখছি কিছুই শেখোনি! কোন ক্লাসে পড়ে? বিন-টিকে বী পড়াও? অ-এ আশা?

—আজ্ঞে, আমি ইউনিভার্সিটিতে বিজ্ঞান পড়ি। জ্ঞান-বিজ্ঞান। বিশেষ কোনো বিজ্ঞান নয়।
এ ল্যাম্পের ভোল্টেজ কত। এপেনডিজের পেন অথবা ক্যাশে হয় না কেন। এই সব। জলবায়ু উর্ধ্ববায়ু অশোবায়ু।

—তবে যে সেবার বললে, লাইফ সায়েন্স
পড়।

—আজ্ঞে সব সান্নেহই তো লাইফে লাগে।
দুখে কত জল। রক্তে কত লোহা।

—তোমার মৃত্যু, ব্যাণ্ডের ছাতা।

—ଆଦେଶ ?

—পার্গেটিড মানে জ্বোলাপ। একদল লোক দেখবে বিড়ি টেনে বেগ আনে। একদল লোক বড়ি গিলে বেগ আনে। আর একদল কুকুর নিয়ে সকালে বেরিয়ে পড়বে। ওটা প্রাতঃকর্ম করবে আর উনি ছড়ি হাতে টেরিয়ে টেরিয়ে লক্ষ্য করবেন। কেমন করে কি হয়। লক্ষ্য করলে দেখবে ঐ কুকর্মীট করার আগে কুকুর চলছিল প্রভুর আগে। এবার প্রভু আগে আগে। বেগ। চল ছলো—কামঅন কুকুক। আ-আ-ও-ও। চল না শুয়োর। আবার অফিস বেরোতে হবে।

হীরেন বাবুর চোখে এই হল আম কুম্ভ।
বাদের আমরা রোজ সকালে বাবুদের সঙ্গে
দেখি। এবার শুনুন নিজেরটা সম্বন্ধে তাঁর কী
ধারণা।

—পাটন হচ্ছে জ্ঞাত কমান্ডে। সিয়াকেনে
আমরা যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়তাম, ওর বাবা
তখন সীমান্ত পাহারা দিত। এ দেখতে যত
অসাধারণ ততই অসাধারণ চরিত্রের। জ্ঞাত কুকুর
বাবা। রাজ্যায় কিছু করবে না। ছাদে উঠে কাগজ
পেতে। ঠিক নিজে দেখে একখানা পুরনো
স্টেটসম্যান নিয়ে ছাদে উঠে যাবে।

—কে পেতে দেবে?

—বাসে উঠলে ভাড়া কাটে কে? যুখে

বাদাম পুরে চিবোর কে?

—উঃ, কি সাংঘাতিক! আচ্ছা মেশোমশাই, ও কি ছাদে জল-বালতিও টেনে নিয়ে যায়?

—না। ঐ স্টেটসম্যানই ওর টিসু পেপার। জার্মান স্পেনিয়েল। লোম সাদা। দেশিগুলোকে লক্ষ্য করবে। মেথরের বাচ্চা।

—কিন্তু মেশোমশাই, প্যাটন কোনোদিন চোর ধবেছে?

—ভূমি কি বোকা! ও ধরার আগেই আমি ধরে ফেলি। ও ইশারা করেছে, আমি কাপিয়ে পড়েছি। অবশ্য চোর নয়। সেটা ছিল রেল ডাকাত।

—রেল-ডাকাত?

—শোনোনি। রেলের চড়োনি তো, রেল-ডাকতি, রেল-পুলিশ, রেল-মন্ত্রী।

—চড়িনি?

—রেল-পুলিশের ছদ্মবেশে যাত্রীদের যারা লোটে তারা রেল-ডাকাত।

—তারপর কী হল?

—‘স্যার, আমি-আমি’ বলে চোঁচিয়ে উঠল ব্যাটা। আমার গায়ে ইউনিফর্ম, মাথায় ক্যাপ হাতে ওর কলার। কে আমি? কোথাকার আমি? ঐ ঘুম চোখে হিড় হিড় করে দরজার কাছে নিয়ে গিয়ে চলন্ত ট্রেন থেকে এক ধাক্কা।

—ঘুম চোখে কেন?

—ভদ্রলোক রাতে কী করে? ক্যারাম পেটে? কুল খায়? প্যাটন টিক টের পেয়ে পা দিয়ে আমাকে শূঁতো মারে। ট্রেন ডগ। ইশারাই কাফি। একটাকে ফেলে দিতে সবকটাই হাওয়া। প্রায় পুরো কম্পার্টমেন্টই খালি হয়ে গেল। কম্পার্টমেন্ট ‘বুক’ করে কোথাও অপারেশন যাচ্ছিল। প্রি-প্র্যাক্ট জানি।

—তারপর?

—ঘাড়ে একটু আদর করে প্যাটনকে একটা শোনাপাণ্ডি বের করে দিলাম। তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। অবশ্য ট্রেনটা পরের স্টেশনেই ক্যান্সেল হয়ে গেছিল। কে নাকি গাড়ি থেকে পড়ে গেছে। ড্রাইভার তাকে খুঁজতে গিয়ে ট্রেন হারিয়ে ফেলেছে। তাই ক্যান্সেল। আমি আর প্যাটন নেমে একটা টাক্সা নিয়ে ক্যান্টনমেন্টে। ছোট হলেও দুর্বল ভেবো না। প্যাটন কামড়ায় না, অ্যাকশন করে। ধরলে টুটি ছিড়ে নিয়ে পা দিয়ে শট মেরে মেরে ফুটবল খেলবে। যার টুটি তাকে দেখিয়ে দেখিয়ে খেলবে। ভাবতে পারো!

আমি মাথা নেড়ে ‘না’ বললাম। দু’হাত ভুল প্যাটনকে প্রশ্নাম সেরে পত্রপাঠ কেটে পড়লাম। কুকুর-কাপালিক।

এবার আসি বিন্টুর কথায়। বিন্টু পড়াশোনায় খারাপ, একথা বলা যাবে না। কলার মধ্যে যেমন বিচিক্কা। কলার সব গুণ আছে কিন্তু খন্দের এড়িয়ে চলে। বিচিতেই খেয়ে ফেলল কলটাকে। সেইরকম একটা সাবজেক্টই খেয়ে ফেলল বিন্টুকে। বায়োলজি, বায়োলজিতে ভীষণ আকর্ষণ। কিন্তু ক্লাশ টেনে দশটা সাবজেক্ট আছে। বাকি গুলোর ভবিষ্যৎ অন্ধকার। বিন্টুর যুক্তি শোনা যাক।

—বিন্টু, শুধু বায়োলজি পড়লে হবে? ফিজিক্স-কেমিস্ট্রির কি হবে?

—স্যার, জীব হয়ে জন্মে জড়-জ্ঞানে কি হবে? জীব হল শিব। বস্তু হল বাহ্য। আমি একটু দমে গিয়ে বললাম—তোমার ভূগোল জানা উচিত। দেশ, চাষ, মাটি, এইসব।

চাষের জমি আমাদের নেই স্যার। কোনোদিন হবেও না। আমার দাদুই কোনোদিন লাঙল দেখেনি। তাছাড়া মাটি তো পকেটের ময়লা। রং লাগা, পিনে খাওয়া, তাগ্নি মারা, কোনো হেঁড়া। আজকাল কড়কড়ে আর চোখে দেখা যায়?

ওরে বাবা, পরমহংস বিন্টু। বায়োলজি-অবতার।

—দেশ আর কৈ স্যার। সবটাই তো সীমান্ত। জাতির বুক দিয়ে হাতি চলে গেছে। দেশের পেটে রাজ্য। রাজ্যের পেটে জেলা। সব জলে গেল। কটা লোক তীর-ধনুক নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করে খেবড়ে দিল। জেলার পেটে রাজ্য—ঝাড়খন্ড। কটা পাহাড় নিয়ে পার্বত্য পরিষদ। এবার রাজ্যের পেটে দেশ হবে। জম্মুদেশ, কাশ্মীর দেশ। পরীক্ষায় বসতে বসতে ম্যাপ পাশ্টে যাবে। তখন আমি আপনি দু’জনেই জলে স্যার।

উঃ, আশ্বেদকরের আত্মা বিন্টু। আমি আর সাহস করে ইতিহাসে যাইনি। মোঘলদের ঘোল খাইয়ে ছেড়ে দেবে। পলাশিতে আমগাছের তলায় ভগবান বুদ্ধকে বসিয়ে দেবে। মীরজাফরকে মহেঞ্জদাড়োর শুহায় ঐকে দেবে। ইতিহাসে হাসিসু।

এহেন বিন্টুর মূল আকর্ষণ ডিসেকশনে। শব্দব্যবচ্ছেদে। তবে ব্যাঙের শব্দ। শুনে অবাক লাগে, ওর নিজস্ব ল্যাব আছে সিঁড়ির তলায়। সেখানে ডিসেকশন টেবিল, ডিসেকশন প্যান, ডিসেকশন ইনস্ট্রুমেন্ট—ধারালো চক্চকে ছুরি-কাঁচি। এসব আমরা ইউনিভার্সিটিতে পাই। বিন্টু বাড়িতে করে। ব্যাঙ যে সাপ্নাই দেয় সে এ বাড়িতে আসে না। হীরেনবাবুর মুখে শুনেছি লোকটা কোনোক্রমে প্যাটনের হাত থেকে টুটি বাঁচিয়ে পালায়। আর এমুখো হয়নি। ডিসেকশনিস্ট বিন্টুর সঙ্গে আরও কিছু কথা।

—বিন্টু বায়োলজিতে উদ্ভিদও আছে। নটে শাক, পুই শাক কেটে দেখ না কেন? ওরাও প্রাণী।

মা দেখে। আমার ইচ্ছে করে না। হার্ট, ল্যাস, কিডনি, স্টম্যাক, গলরাদার কিছুই নেই। কেবল পাইপ আর লিক। রস যাচ্ছে, রস লিক করছে। সেখেননি? আধলা মুড়ো, দু’চারটে চিংড়ি না মারলে ছাঁচড়া জমে? চচ্চড়ি খোলে? নিরামিষ, হলে আমাদের বেড়ালগুলো পর্যন্ত ছুঁত না।

—তোমাদের বেড়াল আছে বুঝি?

—ছিল।

—এখন নেই?

—বিজ্ঞানে লেগে গেছে। একটা স্থলা, একটা মা আর চারটে ইনফ্যান্ট। আমি অবাক। বিজ্ঞানে বেড়াল! বেড়ালের গণহত্যা! বিন্টু কেটেকুটে সব দেখছে। ব্যাঙ থেকে বেড়ালে দাঁড়িয়েছে। ভয়ঙ্কর ব্যাপার।

—তা বিন্টু বাড়িতে এ নিয়ে কোনো আপত্তি—

—সাধনার পথে বাধা আসবেই স্যার। রাক্ষস, খোকস, ফণাওয়া সাপ, দাঁতাল বাঘ, বেঁজি, বিছে, লালপিপড়ে, ডাঁস মাছি, এমনকি উই পর্যন্ত এসে টিপি করে দেবে।

—সিদ্ধিলাভ হতে আর কত পথ বাকি? মানুষ পর্যন্ত নিশ্চই?

—না। তারপরও আমাকে চালিয়ে যেতে হবে। শেষ হবে, যখন পাইপের মধ্যে ঐ সব পাব। মানে হার্ট, ল্যাস, কিডনি, মিডনি—

—সে কোন প্রাণী? পাইপ মার্ক? জিরাফ? কুমির? বচ্চন?

—অ্যানাকোন্ডা— বিষ্ণুর এনাকোন্ডা। সোফা-কাম-বেড শিবের গুল টোড়, ও আমার চলবে না।

মরেছে, সৃষ্টি তো রসাতলে যাবে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, সব পথে এসে দাঁড়াবে!

ফ্লাইওভারের নিচে পুনর্বাসন। নেড়িদের নিয়ে শুয়ে থাকো। সকাল হলেই ডমরু, মৃদঙ্গ বাজিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ভিক্ষে করো। একটু দৈকর্মা দে মা। শুভ নাইট দে মা। কটা নাইটি দেমা।

—বিশ্টু বেড়ালের পর কী কাটবে? বাঘ? সেই একজন মালা নিয়ে ধরতে গিয়েছিল বেলেঘাটা থেকে। সেও বিজ্ঞানী।

—আমি স্যার ধাপে ধাপে উঠতে চাই। উন্নততর প্রাণীতে উন্নততর বিজ্ঞান। ভগবান ক্রমশ হাত পাকিয়েছে। ইদুরের পর বেঁজি, বাঁদরের পর মানব, ভাইরাসের পর ভাড়াটে, লিডারের পর প্রোমোটর, মাকৃতির পর স্যানটো।

এরপর আমি একদিন যথারীতি বিশ্টুকে পড়াতে গেছি। দেখি বিশ্টুদের গেটের সামনে অনেক লোকের ভিড়। পাশ কাটিয়ে একটু এগিয়েছি। হঠাৎ হীরেনবাবু উদ্ভাস্তের মতো কোথা থেকে ছুটে এসে আমার হাত চেপে ধরলেন।

—মাস্টার, বড় রাস্তায় প্যাটনকে দেখেছ? হাজরা মোড়ে? মোমিনপুরে? মাঝেরহাটে?

মাথা নেড়ে ‘না’ বললাম। বুঝলাম প্যাটন কোথাও হারিয়ে যাওয়ায় ভদ্রলোক মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছেন। ভিড় থেকে নানা মত দিচ্ছে। কেউ বলছে ছাদটা ভালো করে খুঁজে দেখুন। কেউ বলছে ছোট প্রাণী, চালের ড্রামে একবার দেখুন। কেউ বলছে রাস্তায় এলে টের পেতেন। বাছুরের সাইজের পাঁচটা চরছে এপাড়ায়। ঐ তুলোর পুঁটলিকে একা পেলে কবিরাজি করে খেয়ে নিত।

—তুলোর পুঁটলি। আপনি তো মশাই বাজলুর বক্তা! সবাই মিলে খেয়ে নিত? ইডিয়েটের মতো কথা। পুঁটলি, পাঁটলা। হতচ্ছাড়া কোথায় যে গেল। না বলে আমার বাড়ি চলে গেল? পার্টি অফিসে? মহাজাতি সদনে?

হীরেনবাবুর অবস্থা দেখে দুঃখ হল। কিন্তু আমার কিছু করার নেই। আজ আর পড়ানো হবে না। বিশ্টুর বাবা-মা প্রতিবেশি সবাই প্যাটনকে খুঁজছে। এপাড়া ওপাড়া থেকে খবর আসছে। কোথাও পাওয়া যাচ্ছেনা। ভাবছি এ অবস্থায় কেটে পড়ব, না কুকুর খুঁজব। ভাবছি অমন কমান্ডো কুকুরকে কে হাপিস করবে? টুটি নিয়ে ফুটবল খেলে। নিজের থেকে কোথায়ই বা যাবে। পোষা কুকুরের মালিক ছাড়া আর কেই বা থাকে জগতে? হঠাৎ শিরদাঁড়া দিয়ে একটা টিকটিকি নেমে গেল। বিজ্ঞানে লেগে যায়নি তো? বেড়ালের পর কুকুরের ধাপ। বিশ্টু কোথায়? শুকে দেখছি না। হা ভগবান!

—মেসোমশাই বিশ্টু কোথায়?

—সাতসকালে বাগতি বাগতি জ্বল দিয়ে ল্যাব পরিষ্কার করে কোথায় যে বেরোল। লস্ এঞ্জেলস, বিস্কাচল, স্কীরকদমতলা—। ওরে প্যাটন ফিরে আয়। শূন্য এ বুক ফিরে আয়।

হীরেনবাবু ভেঙে পড়লেন। আমি তৎক্ষণাৎ কেটে গেলাম। পরিষ্কার দেখতে পেলাম বিশ্টুর হাতে কমান্ডোর টুটি। ল্যাবময় রক্ত। ধাপে ধাপে উন্নতি। হাতের কাছে অমন উন্নততর প্রাণী ঘুরঘুর করছে। হার্ট লাস্ কিডনি নিয়ে। বিশ্টু কাল কখন ধরে বিজ্ঞানে লাগিয়ে দিয়েছে। কাটা কমান্ডো। বিশ্টুবিজ্ঞানী।



“রণে বনে জলে জঙ্গলে যখনই বিপদে পড়িবে
আত্মাকে স্মরণ করিও, আমিই রক্ষা করিব।”

—শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীলোকনাথ মন্দির
তেঘরিয়া, বাণ্ডুইহাটি,
কলকাতা-৫৯
কর্তৃক প্রচারিত।



বর্বরের তামাশা : তামাশার বর্বরতা

ফজল আলির ফাজলামি

জন্ম ইন্তক তামাশা দেখতে দেখতে ফজল আলির চুল আর দাড়িতে পাক ধরল। আমরা মেহেববান ফজলকে এক তামাশার সেশে পাঠিয়েছেন। সারে জাঁহাসে আচ্ছা হিন্দুস্তান হমারা, জিস দেশমে গঙ্গা বহতি হয়। ফজলের দিল খুশ। অবিয়ত ভি আচ্ছা। ফজলেব মনে মরচে পড়ে না। দিব্যি আছে। দিনগুলো অস্থুরি তামাকের গন্ধে ম'ম' করে।

ফজল দ্যাখে, গাছের আমড়া চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ে যায় একটা বাচ্চা মেয়ে। গাছের মালিক মেয়েটার হাতের আঙুলগুলো কেটে নেয়। মুখে তার প্রতিহিংসা পরায়ণ জ্বলাদেব হাসি। সে হাসি ছড়িয়ে যায় আসমুদ্র হিমাচল। ঠিক হয়েছে, আচ্ছা হয়েছে, বেশ হয়েছে। চুরি করবে কেন, চুরি করতে নেই, চুরি রুসা মহাপাপ। বাচ্চা মেয়েটার হাত থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরে, চোখের জলে বুক ভেসে যায় তার। দেশসুদ্ধ লোক অবিশ্যি হাসে। সত্যি, তামাশা বটে। তামাশার মতো তামাশা। এ তামাশা দেখতে পয়সা লাগে না। হমারা ভারত মহান, মহান এ দেশের মনুষ্যকুল।

গাছের কয়েক গুণ্ডা আমড়া চুরি করলে চোরের আঙুল কেটে নেওয়া হয়। বাচ্চা মেয়ে, বোকা মেয়ে। চুরি করতে গিয়েছ, কিন্তু চুরির কৌশলটুকু আয়ত্ত কবতে শেখিনি? তোমাকে তো শাস্তি পেতেই হবে। বাচ্চা মেয়ে, তুমি কি জানো পশুখাদ্যের জন্যে বরাদ্দ করা হাজার হাজার কোটি টাকা চুরি করলেও চোরের শাস্তি হয় না? বরং বুক ফুলিয়ে হিন্দি দিল্লি ঘুরে বেড়ায় সে? জনগণ তার গলায় মালা পরিয়ে দেয়? তার নামে জয়ধ্বনি দেয়? যে জয়ধ্বনিতে অস্থির হয়ে ওঠে সেই শিশুরা, ভূমিষ্ঠ হওয়ার জন্যে মাতৃগর্ভে যারা দিন গুনছে! কচি কচি হাতে মাতৃগর্ভের ময়দানে যারা হাততালি দেয়। তামাশা বৈকি। খবরের কাগজে তার ছবি ছাপা হয়, টিভির পর্দায় তার হাসিমুখ দেখা যায়। তার মেয়ের বিয়েতে দেশের নানা প্রান্ত থেকে বড়-ছোট-মাঝারি মাপের নেতারা ছুটে আসে, ধনি্য হয়। বোকা মেয়ে, দ্যাখো, দেখে শেখো। দেশের নিয়ম-কানুন রগু করে। দুঃখ ভালো, তোমার চোখ খুলুক।

পটনা তামোলি গ্রামটি কোথায় ফজল? পান্না জেলায়। সে জেলা কোথায় ফজল? মধ্য প্রদেশে।

এত খোঁজ-খবর কেন ফজল? এই সেদিন সেখানে একটা মস্ত বড় তামাশা হয়ে গেল যে! সব কাগজেই ছাপা হয়েছে সেই তামাশার খবরটা। পাবলিক হেভি খেয়েছে। পঁয়ষট্টি বছরের এক বৃদ্ধা কুটু বাঈ সতী হয়েছে। জ্যাণ্ড অবহায় সজ্ঞানে হাসি হাসি মুখে নাকি স্বামীর সঙ্গে সহমরণে গেছে। বাড়ি বেজেছে। জয়ধ্বনি ধ্বনিত হয়েছে। হাজার হাজার মানুষ পরম বিস্ময়ে সেই স্বর্গীয় দৃশ্যের সাক্ষী হয়েছে। কেউ কেউ জানিয়েছে, তাকে নাকি মরতে বাধা দেওয়া হয়েছিল। ঘরে খিল দিয়ে আটকে রাখা হয়েছিল। কিন্তু অদ্ভুত কাণ্ড! খিল আপনা-আপনি খুলে যায়। মৃত স্বামীর আত্মা তাকে ডেকে



নেয়। কুটু বাঈ সে ডাকে সাড়া দেয়। উদ্ভ্রান্তের মতো ছুটে ছুটে গিয়ে চিতায় ওঠে। একজন পুলিশ অফিসার তার হাত ধরে নিরস্ত করতে চায়। কিন্তু পুলিশ অফিসারের হাত রক্তাক্ত হয়ে যায়। বিমূঢ় পুলিশ অফিসার নাকি সেখান থেকে পালিয়ে বাঁচে। নিম্নকোরা অবিশ্যি ভিন্ন কথা বলে। তারা বলে, কুটু বাঈয়েরা এতই গরিব যে তাদের কুঁড়ে ঘরে কোনো দরজাই নেই। তাই আপনা আপনি খিল খুলে যাওয়ার প্রবৃত্তি ওঠে না। আর পুলিশ অফিসারের রক্তাক্ত হাত? কুটু বাঈয়ের কাচের চুড়ি ভেঙে গিয়ে পুলিশ অফিসারের হাত একটু কেটে ছড়ে যায়। তাতেই দু-এক ফোঁটা রক্ত পড়ে। তা নিম্নকে তো কত কথাই বলে। ওসব বিশ্লেষ করতে নেই। সতীত্বের তেজকে এভাবে খাটো করা ঠিক নয়। তাতে গুনাহ্ হয়।

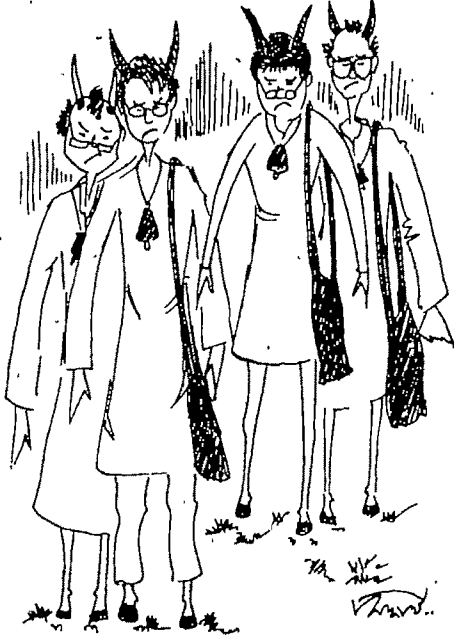
ফজল ইতিহাসে রামমোহন রায়ের সতীদাহ বিরোধী আন্দোলনের কথা পড়েছে। সে তো উনিশ শতকের ব্যাপার। এখন একুশ শতক চলছে। সদ্য বিধবাকে মৃত স্বামীর সঙ্গে একই চিতায় তুলে দেওয়া হবে? প্রশাসন নির্বিকার থাকবে? হাজার হাজার মানুষ মুরগির লড়াই বা বাঁদর নাচ দেখার মতো উপভোগ করবে সেই দৃশ্য? এ যে নিষ্ঠুরতা, বর্বরতা। বন্ধ হবে না এই বীভৎসতা? অন্ধ সংস্কার আর মিথ্যা মোহের দাস হয়ে থাকবে? না না, এমন তামাশা চাই না। চাই না। ফজল আলির চোখে জল। ফজল আলি ফাজলামি ডুলে যাচ্ছে। কসুর মাফ হয়, হে পাঠক।

—ফজল আলি

কালক্রমে কবি-সাহিত্যিকদের বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গেছে যে, সে কে? না, বুদ্ধিজীবী। কার বাড়িতে বাসন মাজো গো পাঁচির মা? না, বুদ্ধিজীবীর বাড়ি!

কলুর বুদ্ধিজীবী বলদ

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়



আমি সাহিত্যিক, আমি কবি। আমি ওসব ব্যাপারে কী জানি। ও-জন্যে তো বিশেষজ্ঞরা রয়েইছে। আর রাজনীতি! ওরেব্বাস রে, ও তো কেউটের লেজ। ও দিয়ে কে কান খোঁচাবে?

বুদ্ধিজীবী বলতে আর যাই বোঝাক, বিদ্বান ব্যক্তি বোঝায় না। চারপাশে কতই তো এম-এ, এম-ফিল। স্তানব্রতী, শিক্ষাব্রতী। ডাক্তার, উকিল, এঞ্জিনিয়ার। মন্ত্রী থেকে উপমন্ত্রী। বিচারপতিরা। এদের কেউ বুদ্ধিজীবী বলে না। পদার্থবিদ, গণিতের গবেষক? কেউ না। সাংবাদিকরা এলেবেলে।

শিল্পী? অভিনেতা? ওদের আবার বুদ্ধি কোথায়? সত্যজিৎ-এর ভেনিস-জয়ের পর থেকে এক-আধজন চিত্র পরিচালক অবশ্য এ পঙ্ক্তিবোজো নিমজ্ঞণ পাচ্ছেন।

সত্যজিৎ রায়ের মতোই, রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পাবার পর থেকেই এই বুদ্ধিজীবীর ঘন্টা কবি-সাহিত্যিকের গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। অ-এ অমদাশঙ্কর দিয়ে তালিকা শুরু হয়। কালক্রমে কবি-সাহিত্যিকদের বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গেছে যে, সে কে? না, বুদ্ধিজীবী। কার বাড়িতে বাসন মাজো গো পাঁচির মা? না, বুদ্ধিজীবীর বাড়ি।

অথচ সামাজিক, অর্থনৈতিক, ঐতিহাসিক ব্যাপারে তাকে লিখতে বলা দূরস্তান, কিছু বলতে বলুন, বলবে, না-না, আমি সাহিত্যিক, আমি কবি। আমি ওসব ব্যাপারে কী জানি। ও-জন্যে তো বিশেষজ্ঞরা রয়েইছে। আর

রাজনীতি। ওরেব্বাস রে, ও তো কেউটের লেজ। ও দিয়ে কে কান খোঁচাবে?

কী-সবেব মধ্যে ওঁয়ারা? থাইল্যান্ডের চাল এল বলে। ওপেন মার্কেট। আর আমাদের গাইতে হবে না 'ও আমাব দেশের মাটি' গানটি, যাতে আছে—

‘তুমি অম মুখে তুলে দিলে

শীতল জলে জুড়াইলে’

এখন থেকে আমাদের পরের প্রজন্মের খাত্তী-মাতা হবে তো থাই-ল্যান্ড।

ওঁরা ‘এসবে’ব মধ্যে যেতে চান না। এইসব রাজনীতির মধ্যে।

ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজ-সংসার, কি রাজনীতি—ওঁরা কিছুই কববেন না। শেষ পর্যন্ত কী বইল তাহলে বুদ্ধিজীবীর জন্য? প্রেম ও রতিক্রিয়া? শুধু তাকে গোর দেবার জায়গাটুকু?

বহুকাল হল ঘানি টানা ছেড়ে দিয়ে এইসব বুদ্ধিজীবী বলদ একটু জায়গায় দাঁড়িয়ে শুধু কুসুদ নাড়িয়ে যাচ্ছে।

বোকা কল, আমরা ভাবছি, ঘানি নিশ্চয়ই ঘুরছে।

নইলে গলার ঘন্টা থেকে টুং টাং কি এমনি ভেসে আসছে!!

পুরুষদলনেও আজ আর কোনো তৃপ্তি নাই। ছারপোকা হননের মতোই আজ তাহা সহজসাধ্য। তাই মণ্ডপে মণ্ডপে দুর্গা কোথাও কার্গিল যুদ্ধে অবতীর্ণা, কোথাও বা বলিউডের নায়িকার মতো আকুলকেশা অর্থাৎ নারীরা যা হইতে চান, তাই।



যা দেবী

তীর্থঙ্কর দাশ পুরকায়স্থ

আজ আর কোনো তৃপ্তি নাই। ছারপোকা হননের মতোই আজ তাহা সহজসাধ্য। তাই মণ্ডপে মণ্ডপে দুর্গা কোথাও কার্গিল যুদ্ধে অবতীর্ণা, কোথাও বা বলিউডের নায়িকার মতো আকুলকেশা অর্থাৎ নারীরা যা হইতে চান, তাই। কল্পনার এই দৈন্য দেখিয়া আমরা আপনার নিকটে আসিয়াছি। শক্তির কোনো উত্তর-আধুনিক রূপ উদ্ভাবন করিয়া ধরিত্রীকে রক্ষা করুন।” এতটা বলিয়া কিছুটা দম নেওয়ার জন্য ইন্দ্র চুপ করিলেন।

শুভ-নিশুভেরা আজ যদি রক্তারক্তি
মারামারি না করিয়া সপ্তাহ জুড়িয়া প্রতিমার
বিসর্জনেই বাহাদুরি সীমাবদ্ধ রাখিতে পারে,
তাহাতে কীই বা ক্ষতি? যানজট ছাড়া
আর কোনো বিপদও দেখি না।

অতঃপর মনিবর কহিলেন, “মহারাজ, পৃথিবীর তিনকাল গিয়া এককালে ঠেকিয়াছে। ধরিত্রী লোলচর্মা বৃদ্ধার মতন হইয়াছেন। তাহার দেহে পুষ্টি নাই, তেজ মরুৎ ব্যোম— সর্বত্রই শক্তির আকাল দেখা দিয়াছে। উপরন্তু পাপের মতো বাক্যরাশি বাড়িয়া উঠিয়া ধরণীর ভার এমনই বিপুল করিয়া তুলিয়াছে যে সেই নখদণ্ডহীনা বৃদ্ধা মহাশূন্যে দিম্বিদিকজ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিয়াও আপন পৃষ্ঠ হইতে সেই বোঝা দূরে নিক্ষেপ করিতে পারিতেছেন না। এমতাবস্থায় শক্তির নবতর আবির্ভাবের আশায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় দেবতাগণ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। কারণ সমুদ্রে বিষ্ণু তখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন। ইহাফে অলসতা বলিলে ভুল হইবে। সমস্যা যখন বিরাট আকার নেয় তখন তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করার মতো মূর্খতা আর নাই। বিষ্ণুও সেইভাবে ক্রমবর্ধমান সমস্যার চাপে কাতর হইয়া ঘুমায়া পড়িয়াছিলেন। দেবগণের ডাকে জাগিয়া উঠিয়া পদ্মপলাশলোচন ব্রহ্মভাবে চারিদিকে চাহিলেন। মধুকৈটভের কথা স্বপ্নবৎ বোধ হইল।

দেবতাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা কবিলে সকলে এত চ্যাচামেচি শুরু করিলেন যে প্রথমে কিছুই কর্ণগোচর হইল না। অবশেষে দেবরাজ ইন্দ্র সকলের প্রতিনিধি রূপে আসিয়া করজোড়ে কহিলেন, “প্রভো! বহুকাল অতিক্রান্ত হইয়াছে। অতীতে যখনই পাপের ভাবে ধরিত্রী কাতরা হইয়াছেন, তখনই শক্তির আবির্ভাব হইয়াছে। পরে ধরিত্রী নিজেই ব্যবস্থা নিজেই করিবেন ভাবিয়া আপনি নিদ্রা গিয়াছেন। সে বিশ্বাস অবাস্তব নহে। দেবী দুর্গার আদলে ঘরে ঘরে নারীরা রণরঙ্গিনী হইয়া উঠিয়াছেন। পূর্বে যখন নারী ছিলেন ঘরের কোণে লজ্জাশীলা তখন দেবী দুর্গার বীরঙ্গনা মূর্তি তাঁহাকে তৃপ্তি দিত। কিন্তু আজ তাঁহার সেই তৃপ্তি নাই। তিনি নিজে আজ এরকম পাঁচটি অসুর নিধন করিতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে, পুরুষদলনেও

তখন স্থিত হাস্যে বিষ্ণু কহিলেন, “দেবগণ। আপনাদের উদ্বেগ আমি বুঝি। তবু, যুগের সহিত মানহিরা নিতে না পারিলে অথবা কষ্ট পাইবেন। সত্য বলিতে কি, মর্ত্যে যাহা চলিতেছে, তাহাতে আমি অশুভ কিছুই দেখি না। আপনাদের কাজ কত কমিয়া গিয়াছে দেখুন। শুটিকয়েক সাধু লোকের জন্য আর মর্ত্যে যাইবার প্রয়োজন নাই। তাহারা দ্রুত নিজেদের ভ্রম সংশোধন করিয়া নিতেছেন। আর দুর্গা প্রতিমার রূপ বদলের কথা বলিতেছেন? তাহারও ভালো দিকটা দেখিলেন না? একটি প্রতিমা বিসর্জনের সাথে কত মাটির খুরি, দড়ি-দড়া, নারিকেলের ছোবড়া পথ হইতে নদীতে বিসর্জিত হইয়া থাকে তাহা দেখেন নাই? ধবধবী ভার ইহাতে কমিবে বই বাড়িবে না। আর শুভ-নিশুভেরা আজ যদি রক্তারক্তি মারামারি না করিয়া সপ্তাহ জুড়িয়া প্রতিমার বিসর্জনেই বাহাদুরি সীমাবদ্ধ রাখিতে পারে, তাহাতে কীই বা ক্ষতি? যানজট ছাড়া আর কোনো বিপদও দেখি না। দেবগণ, মর্তলোককে ধীরে ধীরে মরিতে দিন এবং আপনারাও সুখে নিদ্রা যান।”

এই বলিয়া বিষ্ণু পুনরায় যোগনিদ্রায় অভিভূত হইলেন। দেবতারা নিচে তাকাইয়া দেখিলেন—নতুন বৎসরের দুর্গাপূজা সূচিত হইল।

কল-কাঠি

বিনতা রায়চৌধুরী



সবার যা আছে তা আমার নেই। ভাবলেই মন মেঘাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। অবশ্য সেটা সদর্পে। মানে সব বাড়িতে টিভির কেবল লাইন আছে। আমার নেই। ভাবলেই গিমির মুখ ভারী।

পুজোয় রাম-শ্যাম-যদু-মধু কলকাতার বাইরে ভ্রমণে যাচ্ছে। আমি যেতে পারছি না। ভেবে কর্তার মুখ ভারী।

অফিসে সবাই ডি. এ পাচ্ছে, আমি পেলাম না। ভেবে ক্যাঙ্কুয়াল কর্মীর মেজাজ গরম। কলেজের রুটিনে অন্য অধ্যাপকরা ভালো ভালো ক্রাশগুলো পেয়ে গেলেন, বামাবাবু মনের মতো রুটিন পেলেন না। তাঁর রাগ দেখে কে?

তাই বসে পাশাপাশি বাড়িগুলোতে

লোডশেডিং হয়েছে কিন্তু আমার হয়নি, তাই দেখে কে না আহ্লাদে গলে জল হয়? চেনাশোনা সবগুলো সুগারের রোগী কিন্তু আমাকে এখনো ধরেনি, ভাবলেই কী প্রশান্তি, আহা! গ্যাস অস্থল বুকজ্বালায় সবাই তিতিবিবক্ত কিন্তু পাঁচুবাবু মনে মনে কুলকুলে হাসি। কী মজা, ওদের আছে আমার নেই।

এই রকমই আছে-নেইয়ের তানা-নানায় পঞ্চাননবাবু দিবা একটি গোল খেয়ে গেলেন।

ভাতের পাতে দুধ-রুটি দিয়ে পঞ্চাননবাবুর স্ত্রী ললিতা বেশ বড় একখণ্ড আমসত্ত্ব ফেলে দিলেন তাতে। পঞ্চাবাবু ঈষৎ বিভ্রান্ত, —মরেছে, হঠাৎ আমসত্ত্ব কেন? মনে মনে ভাবলেন, তাহলে কোনো শাড়ি ব দোকানে নিশ্চয়ই রিবেট শুরু

হয়েছে কিংবা নামি হোটেলের ‘রাজভোজ’ ‘মহাভোজ’ ইত্যাদির বিজ্ঞাপন চোখে পড়েছে।

—কি ব্যাপার? সন্দেশের ছায়া ঘন হয়ে ওঠে পঞ্চাননবাবুর গম্ভীর স্বরে। ললিতা কিন্তু আজ ললিতলবঙ্গলতা। মধুর হেসে কেমর দুলিখে বলে উঠল, জানি, তুমি ভালোবাসো।

শুধু আমসত্ত্ব কেন, আবো অনেক কিছুই তো ভালোবাসি। কবে আব খেয়াল থাকে?

আমসত্ত্ব দিয়ে দুধ মাখলেও পঞ্চাননবাবু ভুরু কঁচকে থাকে। পলকে পলকে স্ত্রীর মুখের ভাব কিংবা ভাষা পড়ার চেষ্টা চালিয়ে যান। আর বেশি চেষ্টা করতে হয় না। ললিতা আশ্বাসের সুরে বলেই ফেলে, এখন তো সবাই আছে, শুধু তোমাবই নেই। আমার বন্ধুরা যখন খুশি ‘কল’ করে তাদের স্বামীদের সঙ্গে কথা বলে।

‘কী কল রে মা জননী?’—বলতে গিয়েও টোক গিলে ফেলল পঞ্চানন। স্ত্রীকে ‘মা জননী’ বললে কল না, কিল খেতে হবে। যদিও চেহারাটা মা কেন মাযেরও মা হয়ে গেছে। একদিন ‘যেইসব’ দেখে জীবন আতসবাজির মতো জ্বলে উঠেছিল, এখন ‘সেইসব’ কোথায় যে অন্তর্হিত হয়েছে তা কেবল ওপরওয়ালাই হিসেব রাখেন। মুখ ব্যাজার করে পঞ্চানন আমসত্ত্ব দিয়ে দুধরুটি চিবুতে চিবুতে বলল,—আমি কোনো কল মেশিনের মধ্যে নেই।

—না না, সেই কল নয়।

—তবে কোন কল ললিতে? জলের কল না কলকল্লা?

—ওফ! তুমি বড় বেরসিক। ললিতা ছদ্ম কোপ দেখাল, কিন্তু মুখের হাসি মেলাল না। খুব কাছে এসে ঘাড়ে মুখ গুঁজে অস্ফুটে, প্রায় ফুলশয্যার রাত্রির কথোপকথনের সুরে বলল, তুমি একটা সেল ফোন নাও না গো! আমি যখন খুশি ‘কল’ করব।

—সেল ফোন? মানে মোবাইল ফোন? আমার কী কাজে লাগবে? আমি দশটা-পাঁচটার কেরানিবাবু। বুকপকেটে মোবাইল ফোন? তুমি আর হাসিও না ললিতা।

—তুমি তাহলে নেবে না? গলা গম্ভীর,

চোখ গম্ভীর, ললিতা একটু সবে বসল।

—কী ছেলেমানুষের মতো কথা বলছ? অতগুলো টাকা মিছিমিছি কেন নষ্ট কবব? আর পাবই বা কোথায়?

—পাবে কোথায় আমি জানি না। ধার নাও। তবে মোবাইল ফোন আমার চাই-ই। চোখ পাকিয়ে বলল ললিতা। সেই চোখ আর খাতব কণ্ঠস্বর শুনে পঞ্চাননের গলায় আমসত্ত্ব আটকে গেল।

দুই

সেলফোন নিলেও বন্ধু-বান্ধব কাউকে সেই নম্বরটি দেয়নি। বয়ে গেছে তার। কিন্তু অফিসে যখন-তখন তাব ফোন আসে। কে কবে? কে আবার, যে এই কাঠিটি দিয়েছে, সেই কবে। কল-কাঠি নাড়ানোই তো কাজ তাব।

পঞ্চানন প্রথমে ভাবল ফোনটা ধরবে না। কিন্তু না ধরলে আরো বিপদ, সে তো বেজেরি যাবে, ড্রাব থেকে শব্দটা চারপাশে ছড়িয়ে পড়বে। সহকর্মীরা ছুটে আসবে। হাজার প্রশ্ন। ধুব। চোরেব মতো চুপি চুপি ফোন বাব কবে কানে তুলল,—এই অসময়ে হঠাৎ ফোন কেন?

—হিঃ হিঃ, কোনো কাবণ নেই। আসলে আমি বাপেব বাড়ি এসেছি তো, হিঃ হিঃ।

—বোঝো ঠালা। বাপেব বাড়ি গেছ, সেটা আমাকে মোবাইল ফোনে জানানোব মতো সংবাদ নাকি?

—দূর, তাই নাকি? হিঃ হিঃ, বৌদিদের বুঝি জানাব না। হিঃ হিঃ ওই ওবা আসছে। এইবাব ওরা তোমাকে ধরল।

কটু কবে লাইন কেটে দিল পঞ্চানন। ললিতার হিঃ হিঃ শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল ললিতার বোধহয় মোবাইল ফোন হিস্টরিয়া হয়েছে। তারপর 'তোমাকে ধরল' এমন কবে বলল, যেন ভূতে ধবল।

শুধু ফোনেব লাইন কেটে দিল তাই নয়। একেবাবে সুইচ অফ করে দিল। না হলে এম্ফুনি আবার ললিতা ফোন করে বাপের বাড়িতে চাল দেখাবে। তাবপব বৌদিরা একে একে কথা বলবে। বাবাঃ বিলটা তো তাকেই মেটাতে হবে, নাকি?

কিন্তু ফোন অফ বাখার ফলটা ভালো হল না। রাতে বাড়ি ফেবা মাত্র ললিতা ঝাপিয়ে পড়ল। পঞ্চাননের ওপর অঝোব বর্ষণ চলল,—তুমি কেন ফোনটা বন্ধ কবে বাখলে? ওবা সবাই আমাকে মিথ্যাবাদী ভাবল। তাবপব কণ্ঠবার কল করেছে। প্রতিবারই বলছে, 'সুইচ অফ'। সবাই হাসাহাসি করল। তোমার অমন শযতানি বুদ্ধি কেন?

ঝড় থামলে পঞ্চানন বলল,—আমার ফোনের চার্জ তুলে তোমাব বৌদিদের সঙ্গে গল্প করতে হবে?

—আলবাৎ করতে হবে। ফোনটা নেওয়া হয়েছে কেন? আমি একটু মনের সুখে সবাইকে বলতে পারব, মনের সুখে গর্ব করতে পারব, তাই জন্যই তো?

—আচ্ছা বাবা, আচ্ছা। আর কোনোদিন বন্ধ কবব না। তোমার যখন খুশি... কোনোমতে সামাল দিল পঞ্চানন। নাহলে ঝড়-জল-বজ্র-বিদ্যুৎ—কিছুতেই বন্ধ কবা যাচ্ছিল না।

এরপর ললিতা যখন-তখন 'কল' করত পঞ্চাননকে। পঞ্চানন বলত, এখন তুমি কোথায় ললিতে?

—ওপাশ থেকে জবাব আসত কখনো—আমি মনীষাদের বাড়ি এসেছি। ওরা সিনেমায় যাচ্ছে। ভাবছি আমিও যাব। যাব গো?

কখনো এবকম—এই যে নমিতাদের বাড়ি সবাই আমরা গল্প করছি। তুমি আসবে? আচ্ছা আচ্ছা, বাজ্ঞ ফেলে আসতে হবে না।

এই ধরনেব ফোনে পঞ্চানন বেশি কথা বলে না। শুধু হুঁ হুঁ করে। ও জানে কোনো বন্ধুর বাড়ি গেছে ললিতা। আব তাদের শোনাচ্ছে যে ওর স্বামীব কাছে সেলফোন আছে। ও নিজের মতো করে কথা বলে। অদ্ভুত মানসিকতা। একধরনের পাগলামি ছাড়া কিছুই নয়। কিন্তু শুধু পাগলামি হলে পঞ্চাননের অত হ্যাপা ছিল না। ললিতা আবার যখন-তখন ফোন কবে বায়না করে।

একদিন অফিসের কাজ শেষ করে পঞ্চানন কাগজপত্র গোটাচ্ছে, হঠাৎ ললিতাব কল,—তুমি কি আজ তাডাতাড়ি বাড়ি ফিরবে গো?

এই স্ববগুলো পঞ্চানন চেনে। সে একটু বিবস্ত্র হবে জিজ্ঞাসা করে, আজ কোন বন্ধুব বাড়ি থেকে ললিতা? সবাইকে 'তো জানানো এবং শোনানো' হয়ে গেছে।

—না, কারো বাড়ি নয়। আজ আমাব তিনজন বন্ধু আমাদের বাড়ি এসেছে। তুমি সবাব জন্য টিকেন কাটলেট কিনে নিয়ে এসো। বেশি দেরি করো না, কেমন?

হায বে সেলফোন! বাড়িতে যতক্ষণ ততক্ষণ ফবমাশ, এবার ফোনেও ফরমাশ। তাও বান্ধবীদের সামনে। এখন কাটলেট নিয়ে বাড়ি না ঢুকলে রাতে ললিতার চোখে অগ্নিবর্ষণই শুধু নয়, ওর বন্ধুরা ভাববে পঞ্চানন কী কিপ্টে। এ তো আচ্ছা ফ্যাসাদ বাখল।

কোথায় আজ ভেবেছিল সমীরণের ঠেকে গিয়ে একটু আড্ডা ফাড্ডা মেরে বাড়ি যাবে, তা নয় কাটলেট বগলে করে বাড়ি ফেরো। ইচ্ছে হয় দেয় সেলফোনেব গলা টিপে কিংবা পুকুবে ছুঁড়ে ফেলে। কিন্তু অনেক দাম দিয়ে কেনো। একে হত্যা করতে হাত আর গুঠে না। তাছাড়া বুকে থাকতে থাকতে একটু ভালোবাসাও জন্মে গেছে বোধহয়। সবার থেকে নিজেকে একটু আলাদা লাগে।

সেদিন হঠাৎ অমিতাভেব সঙ্গে দেখা। স্কুল ছাড়ার পর আর দেখা হয়নি। অমিতাভ গাড়ি থামিয়ে মুখ বাড়াল—কি রে পঞ্চানন, কেমন আছিস?

—আবে অমিতাভ যে! বলে শুক করে দু-চাব কথায় যখন জ্ঞানভে পাবল অমিতাভ বড় ডান্ডার হয়েছে তখন এক ধরনের হীনমন্যতার পোকা কুঁচুস কবে মাথাব মধ্যে কামড়াল।

অমিতাভ যখন জিজ্ঞাসা করল—তুই কী কবিস? পকেট থেকে সেল ফোনটা বার করে কাযদা করে কলিত একটা নম্বর ডায়াল করতে করতে বলল, ওই একটা কোম্পানির পারচেঞ্জে আছি। সেলফোনটাই বলে দিচ্ছিল পারচেঞ্জেব কী পোস্টে আছে। অমিতাভ বুঝল না পারচেঞ্জ সেকশনের সর্বকনিষ্ঠ কেরানি পঞ্চাননের সেল ফোনটা আসলে বোয়ের গয়না।

তিন

ললিতার যখন-তখন ফোন করার দৌলতে অফিসের অনেকেই জেনে গেছে যে পঞ্চাননেব কাছে একটা সেল ফোন আছে।

পঞ্চানন কিন্তু স্বীকারই কবল না, ফোনটা ওর। সবাইকে বলল, ফোনটা আসলে ওর পিসতুতো দাদার। সে বাইরে গেছে, তাই ফোনটা পঞ্চাননের কাছে রেখে গেছে। লোকের ঈর্ষাব চোখ তাতে একটু খাটো হল বটে কিন্তু পঞ্চানন বাঁশ খেল অন্য জায়গায়।

অফিস থেকে একদিন বাড়ি ফিরছে। মিনিবাসের জ্ঞানলার ধারে সীট

পেয়ে মনটা ফুরফুর করছে, এমন সময় সেল ফোনের 'কল'। পঞ্চানন জানে ললিতা কারো বাড়ি থেকে তাকে অকারণ ফোন করছে কিংবা কোনো নতুন ফরমাশ। অথবা 'সোজা বাড়ি ফিরবে। কোনো বন্ধুর বাড়ি-টাড়ি যাবে না', কিংবা 'তুমি এখন কোথায়' জাতীয় শব্দচূষন শোনা যাবে। ললিতা আবার ঘড়ি দেখে রাখে, সে কোথায় বলেছিল। সময় আর দূরত্ব মাপে, খেয়াল রাখে মাপের থেকে কত পরে ফিরল। ডুকু তুলে বলবে, এই এইটুকু রাস্তা আসতে এতটা সময় নিলে?

বিরক্ত হয়ে একদিন পঞ্চানন বলেছিল, রাস্তাটা তো আমার স্বপ্নের বন্যে যে 'জামাই যাচ্ছে বলে সঙ্গে সঙ্গে ফাঁকা করে বাখবে।

আজ ফোনটা বেশ কয়েকবার বেজে গেল তাও পঞ্চানন ফোন পকেট থেকে হাতে নিল না। আরো কয়েকবার বাজার পর ফোনটা কানে চেপে প্রচণ্ড আলিস্যি ভরা গলায় বলল,—হ্যাঁ, বলো কি বলছ।

ওপাশ থেকে শোনা গেল,—হোয়াট ননসেন্স, ফোনটা এতক্ষণ ধরছেন না কেন? কায়দা করে সেলফোন নেওয়া হয়েছে, ওদিকে ধরতেও ইচ্ছে করছে না?

বাসের সীট ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল পঞ্চানন। ব্রশ্ত গলায় ডুকুরিয়ে উঠল,—ইয়েস স্যার, হ্যাঁ স্যার, বসেছিলাম তো....না দাঁড়িয়ে আছি তো!

—বসেও ছিলেন আবার দাঁড়িয়েও ছিলেন? বেশ! এবার হাঁটুন দেখি। অফিসে এসে দরকারি চিঠিগুলো টাইপ করে ফাইলিং করে দিয়ে যান।

—মানে? আমি যে বাড়ির দিকে হাঁটছি স্যার। অফিস তো ছুটি হয়ে গেছে স্যার। কাল না হয়....

—এবার উণ্টো দিকে হাঁটুন। অফিস ছুটি হয়ে গেছে তো-কী হয়েছে? আমি তো এখনো অফিসে বসে আছি। ইমার্জেন্সি না থাকলে কি আমি আপনাকে ডাকতাম? সেলফোনটা রয়েছেই তো ইমার্জেন্সির জন্য। যাক গে, চলে আসুন চটপট।

পঞ্চানন তার জানলার ধারের সীটের দিকে গভীর মমতায় তাকাল, সেটি তো উঠে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বেদখল হয়ে গেছে। তর্ক ঝগড়া কিছু না করে পঞ্চানন অফিসে ফিরে চলল।

চার

ললিতার দেওয়া এই অলঙ্কারটি গঙ্গায় ছুঁড়ে দেওয়ার প্রবল ইচ্ছেকে ক্রোনোমতে দমন করল পঞ্চানন। সেলফোনের 'কল' সমূহ তার জীবনকে ইদানীং নরক বানিয়ে তুলেছে। কোথাও সুস্থির হয়ে দু-দণ্ড আরাম করার উপায় নেই, ললিতার শাসন তাকে 'কল' করতে করতে নিয়ে আসবে। কোথায় আছি, কেন আছি, সঙ্গে কে আছে—হাজাব কৈফিয়ৎ দাও। একদিন সেলুনে বসেছিল, ফোনের মধ্যে হয়ত কোনো মহিলাকণ্ঠ শুনে থাকবে। বাড়ি ফিরতেই বাকচাবুক,—তোমার সঙ্গে যে মেয়েটি ছিল সে কে?

—কোথায় মহিলা? আমি তো সেলুনে বসেছিলাম। ভাবলাম চুলটা একেবারে কেটে ফিরব।

—কই, তোমার চুল তো কাটোনি?

—খুব ভিড় ছিল, চলে এসাম। তুমিই তো বললে,—চলে এসো!

—মহিলার গলার আওয়াজ শুনলাম কেন?

—একটা ছোট ছেলেকে তার মা চুল কাটাতে নিয়ে এসেছিলেন। ছেলেটির ব্যথা লেগেছে বলে অনর্থক চ্যাচামেচি করছিলেন। ঠিক তোমার মতো।

—অ্যা, আমি চ্যাচামেচি করি? আমার সবই খারাপ?

—খারাপ কোথায় বললাম? তুমি তো কথাটা শেষই করতে দিলে না। বলতে চাইছিলাম তোমার মতো স্ববসময় ন্যায্য কথা বলেন।

—ও, তাই? বেশ। জ্যোৎস্নার মুখে নুন পড়েছে যেন। ললিতা খুশি হয়ে উঠল।

কিন্তু এভাবে কি পারা যায়!

এর সঙ্গে জুড়েছে বসের বায়নাঙ্কা। ছুটির পরও পথ থেকে ধরে নিয়ে কাজ করিয়ে নিল সেদিন। একদিন আবার ঘরে ডেকে দু-এক কথা বলার পর 'দেখি তো আপনাব সেল ফোনটা' বলে চেয়ে নিয়ে পটাপট দুটো 'কল' করে নিলেন। যাকে বলে কল করে কাঠি দেওয়া।

পুজো এসে গেছে।

এক রবিবার সকালে, ললিতা একখানা লম্বা লিস্ট নিয়ে এসে হাজির। কী কী কিনতে হবে, সব ফর্দ করা। এমনকি শাড়ির পাশে পাশে দোকানের নামও।

পঞ্চানন লিস্টখানা ছুঁড়ে কেলে দিল।

—কী হল? ললিতার মুখ গ্নগ্ন করছে।

—মোবাইল ফোনের বিল দিয়েই আমি এই তিনমাসে ফতুর। কিছু কিনতে পারব না। একটা শাড়িও না।

—মোবাইল ফোনের সঙ্গে আমার পুজো-বাজারের সম্পর্ক কি?

—ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তোমার এই নতুন গয়নাই আমার পকেট খালি করে দিচ্ছে। তাছাড়া কিনতেও দাম নিয়েছে। আমার মতো মধ্যবিত্ত বাঙালির পক্ষে অসম্ভব। পুজোর সময় বরং এটা গলায় ঝুলিয়ে বা কোমরে গুঁজে বেড়িও। বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-মহলে তোমার মান বাড়বে।

খোঁচাটা গভীর-মুখে হজম করল ললিতা।

একটু পবে বলল, ওঁটা যদি বেচে দাও?

—বেচে দেব? তোমার কত শখের কল-কাঠি।

—হ্যাঁ, ও এখন আমার কাছে একঘেয়ে হয়ে গেছে। বরং একটা কাঁধা সিঁচ, একটা ইল্কত আর একটা বোম্কাই আমার চাই-ই। সবাইকে বলেছি, এই তিনটে শাড়ি কেনা হয়ে গেছে।

—তাহলে বলছ, এটা বেচে দিয়ে পুজোর বাজারটা...

—বলছি তো। সেল ফোন একেবারে ফালতু জিনিস একটা।

পঞ্চানন অনেকদিন পর বুক ভরে স্বস্তির লম্বা শ্বাস নিল।

পুজোর বাজার

সনৎকুমার মিত্র

পুজোর সময় কুঁজোরও হয়
বুক চিতানোর ইচ্ছে,
আয় ও ব্যয়ের বিরাট ফারাক
করতে কি তা দিচ্ছে?
শার্ট প্যান্টের দোকানে যাই
বাজেট শুনে দোকানী ভাই
গেঞ্জি এবং লুঙ্গি দিয়েই
বাজেট ফুঁকে নিচ্ছে।

চাপা চাপা কাব্য চলে

বিমান চট্টোপাধ্যায়

‘পত্রপাঠ’-এর একদম শাঁস খেতে গিয়ে, তার ফাঁসে নিজেই ফাঁসেছেন— এমন নাকে-কাঁদা নালিশ প্রায়ই শোনা যায়। কিন্তু শুধুবাত্র গোটা দুই নিরীহ ‘পত্র’ পাঠ করে জীবনের যদি কোনো বিটকেল মুহূর্তে চান করে, সোজা শয্যা নিতে হয়, তবে তিনি কলমবাজ সম্পাদককে তো সন্দেহের চোখে বলবেনই—মশায় আপনার এই আপাত সভ্যভব্য ‘পত্রপাঠ’ নামটি সময় এবং সুযোগ বুঝে, কী ভয়ঙ্কর ‘দুষ্টপত্র’ হয়ে উঠতে পারে—তা কি জানেন?



পাঠক হয়ত ভাবছেন, আমার কথাগুলো কোনো হায়ার করা হৈয়ালি? ব্যাপারটা তবে খুলেই বলি।

আধুনিক কাব্যের কলা-কৌশল নিয়ে অনেক জলঘোলা হয়েছে। কিন্তু খোদ কাব্যের মালিক কবিকে নিয়ে এমন তলঘোলা কেস আমি আগে

শুনিনি। কবিতা অবশ্য আমাবও বন্ধু। নাম—মুঘল মিত্র। ইম্পাত কারখানার কারিগর। রাতজাগা ডিউটিও করেন। চাকরি-সংসার-বাজার-কোঅপারেটিভের সেক্রেটারিগিরি ইত্যাদি সত্ত্বেও চকিশ যশ্টাই কিন্তু কবিতায় লোডেড হয়েই হাসেন রাগেন। চরিত্রে কখনো উড়োখই, কখনো চতুর, কখনো স্বার্থপর, কখনো ফতুর, কখনো আড়িবাজ, কখনো কানে কালা।

কিন্তু কবি-সম্পাদককে পত্র লেখায় কিংবা তাদের পত্র পাঠে যথেষ্ট তুখোড় ও রসিক। হাজার ব্যস্ততায়ও মুঠো মুঠো চিঠি।

সরস বিরস নীরস—নানান টেস্টের গোছা গোছা। যাচ্ছে এবং আসছেও। তুড়ি মারলেই, দশ-বিশ লাইনের রেডিমেড লেটার।

দাড়িতে সাবান ঘষে টানার আগে—খচ্—একটা চিঠি, লেখা শেষ। বাথরুমে ঢোকান আগে, পরনে গামছা, আগের রাতে নেমতন খাওয়া হয়েছে। তার আগে খচ্—একটা শেষ। ভাবুন। ই-মেলের যুগে কী দুঃসাহসিক প্রতিযোগিতা। ‘পত্র’ জিনিসটা এমনই যে, গেলে এবং পেলে, দু’পক্ষই আহ্বাদে আট টুকবো।

লাস্ট তিনবছর খাম-পোস্টকার্ড চোখে না দেখা একতলার প্রতিকেশী গণা দপ্ত শুধিয়েছিল—এত চিঠি। দিনে বারো চোন্দো। লেখেন কিভাবে? ফোনে তো আরো চটপট—? তবে চিঠি কেন?

মুঘল যদু হেসে—কী যে বলেন? ‘পত্রপাঠ’ করা আর ‘ফোনপাঠ’ শোনা কি এক জিনিস? ‘পত্র’ মানে হাসি-কান্না-দুঃখ-ভালোবাসার একটা

সলিড রেকর্ড। লাইফ লং ডকুমেন্ট। আর ফোন? রিসিভার ছাড়লেই রেকর্ড-ডকুমেন্ট ইথারে মিলিয়ে গেল মুহূর্তেই। নয় কি? কোথায় নেতাজি আর কোথায় পেঁয়াজি।

—কিন্তু রোজ এতগুলো করে চিঠি! ধৈর্যেরও তো একটা সীমা আছে? আবার হেসে—তবে আর স্টিল প্ল্যাটের ডিউটি কেন? একেবারে পরপর যা শিখেছি—প্ল্যানিং-অরগ্যানাইজিং-প্রসেসিং ইত্যাদি ইত্যাদি। পার্ট-বাই-পার্ট অ্যান্ড স্টেপ-বাই স্টেপ।

প্রথমে ধৈর্যের প্ল্যানিং। ধরুন, আজকের প্ল্যান—আটটা চিঠি। মামুলি, গুরুত্বপূর্ণ, ভি-আই-পি, ফালতু, খেজুরে, আনন্দের চিঠি, দুঃখের চিঠি, ধান্দা শুছোবার চিঠি ইত্যাদিগুলোকে ভাগ করে নিতে হয় আগে।

—কীসের চিঠি?

—এই কোনটা পোস্ট কার্ডে, কোনটা ইনল্যান্ডে, কোনটা খামে—এই আর কি। তারপর গুরুত্ব অনুযায়ী ঠিকানাগুলোকে খুঁজেপেতে লিখে ফেলা।

খেজুরে চিঠি যাকেই লিখি—চিঠির বয়ান, ভাষা—সব এক। শুধু নাম-ঠিকানা আলাদা আলাদা। এমনকি রেডিমেড চিঠির সম্ভাব্য প্রাপকের নাম থাকে না। তার বদলে লেটেষ্ট শৃঙ্খ—‘প্রীতিভাজনেষু’। ব্যস। পোস্টকার্ড ইনল্যান্ডের লেখা শেষ হলেই শেষ। শুধু খামের চিঠির পার্টস অ্যাসেম্বল করতে হয়। গীয়ার বক্সে গীয়ারের দাঁত বসাবার মতো আগে ঠিকানাগুলো পরপর। তারপর চিঠি লেখা একে একে। এরপর খামের ভেতরে ঢুকিয়ে চিঠি অ্যাসেম্বল করা। এবং ফাইনাল টাচে নাট টাইট অর্থাৎ মুখ আটা। তারপর গোছা গোছা বক্সে গলিয়ে বসে থাকুন। দেখবেন রোজই দু’চারটে করে উড়ে আসছে। উড়ে আসছে কেমন কৃতজ্ঞতা, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা-স্মৃতির দলিল। চিঠি নয়—শ্রেফ দলিল, বুঝেছেন? খুশিমাখা অক্ষর আব খাঁটি বাংলা লাইন। তারিয়ে তারিয়ে চাখুন।

দেখবেন স্বাস্থ্য ভালো হচ্ছে।

আজও কবি মুশল মিত্রের হাতে ফিনিশড প্রোডাক্ট সাতসকালেই একগোছা চিঠি দেখেই কৌতূহল—আজ এত সকালেই? ক'টা লিখলেন?

কাব্যের জমিদার ঢং-এ সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে কলার ওস্টানো হুঁ হুঁ উত্তর,—মাত্র গোটা আটেক। অবশ্য এগুলো আজ লেখা নয়।

—তবে?

—গতকাল রাত্রে। মানে, রাত ন'টার শিফটে ডিউটিতে বেরোবার আধঘণ্টা আগে লেখা।

—আধঘণ্টায় আটটা চিঠি।

—আরো হত। কিন্তু সঙ্গে থেকে লোডশেডিং। লঠনের আলোয় আর কত হবে। চোখের অবস্থা ভালো নয়। ছানি মোটা হয়ে গেছে খুব। সবই ঝাপসা দেখি।

—তার মানে এই চিঠিগুলো অত গুরুত্বপূর্ণ নয়?

মুশল মিত্র চিঠিগুলোকে তাদের মতো মেলে ধরে।—মামুলি, মামুলি, খেজুর, ফের খেজুর, এটা ধান্দা, এটা আনন্দের আর এটা দুঃখের। শেষ দুটোই একটু ধরে লেখা।

—তা, আনন্দ আর দুঃখের চিঠিদুটো কী কেস?

দুঃখের চিঠি যাচ্ছে 'উলুবন' পত্রিকার সম্পাদক মুক্তহীন মণ্ডলের কাছে। আর আনন্দের চিঠিটা 'গোয়ামোগী'-র সম্পাদক ভিখারি ভট্টাচার্যের কাছে।

গণা দত্ত এমন বিদ্যুটে নামফাম শুনে আর এগোবে কিনা ভাবতেই জিভ স্লিপ করে গেল,—এইরকম নাম কেন?

হে-হে—বুঝলেন না—আধুনিক কবিতায় এসব সিদ্ধান্তিক আর্ট। মানে, আসল দর্শনটা প্যাক করা থাকে হেভি বোকা বোকা কথার ভেতর। এই যে আপনার নাম গণা দত্ত। কিন্তু হওয়া উচিত ছিল দাদরা দত্ত। আপনার দৈনন্দিন জীবনধারায় একটা তাল বা লয় খুবই আছে। বিশেষত চলাফেরা ও ব্যবহারে। ব্যবহারে দাদরা তাল।

গণা দত্ত নিজেই কথা এমনতরো শুনে ভাবাচাকা খেয়ে একাকার।

—তার মানে বলছেন আমি তালবাজ?

—আপনি তালবাজও নয়—চালবাজও নয়। বিনয়ের প্যাকিংয়ে মোড়া ফাঁকিবাজ।

—কীসের ফাঁকি?

—আপনি ভদ্র, বিনয়ী। কিন্তু গার্জেনকে ফাঁকি দেন।

—কে গার্জেন?

—বলুন না, মানুষের গার্জেন কে?

—ভগবান।

—না। মানুষের নিজের সৃষ্ট কাব্যদর্শনই হল মানুষের গার্জেন।

গণা দত্ত বুঝলেন, কটা চিঠি লিখলেন, জিজ্ঞেস করে ফেঁসে গেছেন। এখন চলবে। কবিতা বোঝে না বলে থেকে থেকেই খোঁচা খেয়ে একই বিন্ডিং-এ বসবাস করে যেতে হচ্ছে।

মুশল কবি আবার বোঝায়—এই যে আমার সম্পাদক বজ্রা উলুবনের মুক্তহীন মণ্ডল কিংবা গোয়ামোগীর ভিখারি ভট্টাচার্য—শুধু নামের মধ্যেই বিনয় নয়, ব্যক্তিগত জীবনেও যেমন নব্ব, তেমন বিনয়ী। এদের ব্যবহারকে বলা যায়—বিনয়ের বিস্ফোরণ। এই যে, আপনার নাম যদি দাদরা দত্ত হত, দাদরা দত্ত নামে আপনাকে নিয়ে একটা সুন্দর কবিতা হত।

সর্বনাশ! গণা দত্ত এবার প্রমাদ শুনলেন। এসব পাগল কবিদের বিশ্বাস

নেই। সত্যি যদি তাই করে বসে, তবে কাল থেকেই পাড়ার ছেলেরা পৈতৃক নাম ছুঁড়ে ফেলে দাদরা-দা বলে ক্ষ্যাপাবে। একথা ক্রিক করতেই দাদরার তাল কেটে গণাবাবু যেই কাটিতে যাবেন, সঙ্গে সঙ্গে মুখের বাধা,—দাঁড়ান। দুঃখ-আনন্দের চিঠিদুটো শুনবেন না?

গিন্নির অর্ডার মৌরলা। দেরি হলে বাজারে তা শেষ হয়ে যাবে জেনেও গণা দত্ত ঝুলে থাকেন আরো ক'মিনিট। সটকে পড়তে ভদ্রতায় বাধে। হুজুর হোক প্রতিবেশী-কাম-মানী কবি। তাছাড়া অফিসে ঘুম খেতে বিনয়টা মাস্ট। বলে,—বলুন।

—উলুবনের সম্পাদক মুক্তহীনের হঠাৎ স্ত্রী মারা গেছেন। ওর নিজেই এই এখনো অটান পেরোয়নি। সেই খবরে আমার শান্তি কামনা করে একটা দুঃখের চিঠি। আর গোয়ামোগীর ভিখারির বউ অবৈধ প্রেমের জেরে ডিভোর্স হয়ে আপদ গেছে। ছ'মাস একা থেকে আরো কমবয়সী স্ত্রীলোক পেয়ে গিয়ে আবার বিয়ে করেছে ভিখারি। অভিনন্দন জানিয়ে একটা আনন্দের চিঠি।

একপে, পাঠকেরও এই দুঃখ ও আনন্দের চিঠিদুটোর সঙ্গে একটু একাত্ম হওয়ার প্রয়োজন। চিঠিদুটি তাই হুবহু তুলে দিলাম।

শ্রদ্ধাভাজনেষু,

কবি মুশল মিত্র সমীপেষু—

আশা করি কুশলে আছেন। আপনার চিঠির উত্তর দিতে দেরি হল। কারণ আমার জীবনে সম্প্রতি ভয়ঙ্কর বিপর্যয় ঘটে গেছে। একমাস হল, আমার স্ত্রী আমাকে ছেড়ে পরলোক গমন করেছেন। এ শোক আমার পক্ষে ভোলা সম্ভব নয়। ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছি আমি। আপনি তো জানেন, আমার স্ত্রী শুধুমাত্র স্ত্রী-ই ছিল না। স্ত্রী, বন্ধু, এবং স্ত্রীর ওপর আমি ছিলাম সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। ভাবছি, বাকি জীবনটা কাটবে কী ভাবে? সারারাত ঘুম হয় না। ছটফট করি। মাঝরাতে আলো জ্বলে আপনার 'পার্মানেন্ট পেয়ার' কবিতাটা বারবার পড়ি। সাহসনা খুঁজি। উলুবন আগামী পুজো সংখ্যা বেরোতে হয়ত একটু দেরি হয়ে যাবে। আপনার কবিতার আশায় রইলাম।

প্রীতি ও শ্রদ্ধা সহ,

হতভাগ্য মুক্তহীন মণ্ডল

উলুবন।

দ্বিতীয় চিঠি

শ্রদ্ধেয় মুশলদা,

আমার চিঠি না পেয়ে ভাবছেন, পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেছে? আসলে দেরি অন্য কারণে। আগেই শুনেছেন—প্রিয়ার সঙ্গে তিন বছরের মধ্যেই আমার ডিভোর্স। ও ছিল অবৈধ প্রেমে লিপ্ত থাকা নষ্ট মেয়েমানুষ। ভাবছিলাম, বাকি জীবনটা কাটবে কীভাবে?

কিন্তু ছ'মাসের আগেই এবার এমন একজন নারী আমার জীবনে এল, যে নতুন করে আমার আমার পৌরুষকে ভরিয়ে দিচ্ছে। ওর বয়স আরো কম। এবং সক্ষমতাও অনেক বেশি। ফলে, আমার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রস্তুতির কথাও ভাবতে হচ্ছে। আমি এখন আনন্দেই আছি।

যাই হোক, খুশি নিশ্চয়ই? পুজো সংখ্যার কবিতাটি তাড়াতাড়ি পাঠান। শ্রদ্ধা জানাবেন।

ভিখারি ভট্টাচার্য
গোয়ামোগী

গণা দস্তর গালে গিট পাকিয়ে যাওয়া হাসি। মিনমিনে গলায়,—
দু'জনেরই কথা স্ত্রীকে নিয়ে। বেশ মিল আছে। ব'লে, পা বাড়াতে যেতেই
মুখলের এবার প্রায় হুঙ্কারবৎ চড়া গলা—

—কী বললেন? মিল আছে? অঙ্কুৎ ফাঁকা লোক তো আপনি?

—ফাঁকা মানে?

—ফাঁকা মানে, আপনার কাছে মানুষের স্ত্রীর কোনো অস্তিত্ব নেই?
স্নেহ পাশবালিশ? স্ত্রী থাকে না-থাকা সমান? মানে, স্ত্রীর পোস্ট ফাঁকা
সবসময়ই?

—না-না, ফাঁকা কেন হবে? আমার স্ত্রীকে তো আপনি সবসময়ই
দেখছেন?

—আ, দূর মশাই! ও ফাঁকা নয়—মাথায় কিছু ইয়ে— শুনুন,
একজনের বউ চলে গেল, আর একজনের নতুন বউ এল। দুটোর মধ্যে
মিল আছে?

গণা দস্ত বলল, না, তা নেই। মাছ পাব না। যাই।

—দূর! শুষ্টির পিণ্ডি—মাছ। জীবনানন্দ এই মাছকে দেখেছিলেন....।

—সে তো বটেই।

—কী তো বটেই?

—জীবনানন্দ মাছ দেখেছিলেন।

—শুধু মাছ নয়। আরো অনেক কিছু দেখেছিলেন—মাছ, ধান, পাখি,
বনলতা। ওসব আপনার মাথায় ঢুকবে না। শুধু আপনার ভুলটা শুনুন।
দু'জনের চিঠির মিল নয়, দুটোর মধ্যে জীবনের চূড়ান্ত বৈপরীত্য। একজনের
জীবনে পার্মানেন্ট লোডশেডিং আর এক জনের জীবনে ডবল মার্কারি
লাইট।

—হ্যাঁ। ঠিকই। আসি।

—ধুৎ-তেরিকা! আসুন। মানুষ অনুভূতিতেও কন্ট্রাসেপ্টিভ ইউজ
করছে এখন। কিছু বলার নেই।

—কী বললেন? কন্ট্রাসেপটিভ ইউজ?

গণা দস্ত ভাবে, তলে তলে অসভ্য নয় তো লোকটা?

—না, কিছু না।

গণা দস্ত এক পা এগোতেই,—শুনুন, আর একটা কথা। জানবেন, কথা
বলার সময় শব্দচয়ন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

—আচ্ছা, মৌরলা পাব না। আমি যাই।

—যান যান—এক মিনিট। আমাদের পশ্চিম মুখো কোয়ার্টারগুলো
দেখেছেন?

—দেখেছি।

—দূরে শালবন। তারপর দামোদর।

—হ্যাঁ। ও তো রোজই দেখি।

—দিনের শেষে দামোদরের কোল ঘেঁষে সূর্যটা অস্ত যায়। দেখেছেন?

গণা দস্ত বুকে ফেললেন, পায়ে জব্বর গিট পড়ে যাচ্ছে। এবার একটু
শক্ত হয়ে বলেন—হ্যাঁ-হ্যাঁ দেখেছি। বলুন না?

—এবার ধরুন, 'বিকেলের পর এলাকাটা লাল আলোয় ভরে যায়'
কথাটাকে যদি আপনি বলেন—বিকেলের পর এলাকাটা 'রেড লাইট'
এরিয়ায় পালটে যায়, তবে এখানকার শিক্ষিত মহিলারা আপনাকে কী
করবে?

—কী করবে?

—ঝাঁটাপেটা।

—সে তো বটেই।

শোনটা ভাবনাতে পৌছতেই গণা দস্ত আঁতকে উঠলেন। সর্বনাশ!
তারপর কবির হাসি নিয়ে কুলকুচি করা মুখের দিকে এক গ্যাড়ানো চাউনি
মেলে,—আমি তো এমন কথা বলিনি?

—আর বলেননি! শব্দচয়নে গোলমাল হলে মানুষের মৃত্যুও হতে
পারে জানেন? এটা তো সামান্য।

—এবার যাই। বুঝলেন, নইলে মৌরলা পাব না।

—আশ্চর্য! আপনি এখনো যাননি?

ফারদার রিস্ক না নিয়ে গণা দস্ত হাপিস।

বেলা ভাজা তেমন হলে চিঠি যে সাহিত্যের ফুলকো লুচি হয়ে উঠতে
পারে, সেটা নিশ্চয়ই পাঠক খেয়েছেন। কিন্তু মুখল কবির এই চিঠিদুটোর
একটি হাফ ফুলকো হলেও অন্যটি বালকো। মানে, Bitter Alphabet of
Literary Course, যা পাঠকের কাছে বিলম্বীকরণ করে দেওয়া হল নিচে।

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার চিঠি পেয়ে আমি স্তম্ভিত। সাঙ্ক্যার ভাষা হারিয়ে
ফেলেছি। আমি জানি, আপনার স্ত্রী আপনার জীবনকে কতখানি ভরিয়ে
রেখেছিল। আপনার স্ত্রীর মৃত্যু শুধু যে আপনাকেই শোকার্ত করেছে, তা
নয়, ভেঙে দিয়েছে আপনার পত্রিকার লেখক-কবিদের হৃদয়। তিনি ছিলেন
আপনার আদর্শ দহধর্মিনী। আপনি যে মানসিক যন্ত্রণায়, তা আমি হয়ত
ছুঁতেও পারব না। আপনার স্ত্রীর আত্মার শান্তি কামনা করি। দীর্ঘ চিঠির
এ সময়ে আপনাকে ক্লান্ত করবে বুঝি।

প্রীতি ও ভালোবাসা জানবেন।

ইতি

মুখল মিত্র

দ্বিতীয় চিঠি ছিল —

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার আগের স্ত্রী কেটে পড়েছে জেনে স্বস্তি পেলাম। দেবুন,
চরিত্রহীন নষ্ট মেয়েমানুষ বিদায় হয়েছে মানে আপদ গেছে। এতদিনে
আপনার দ্বিতীয় নতুন বউ যে আপনাকে সুখী করেছে, তাতে আনন্দিত।
মানুষের জীবনে যৌনতাকে আপনি শারীরিক ভোগ হিসেবে না দেখে যে
ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উৎস হিসেবে দেখেন, এখানেই আপনার মহত্ব। আপনার
নতুন স্ত্রীকে অভিনন্দন। ভালোবাসা জানবেন।

ইতি

মুখল মিত্র

ঠিক ন'দিনের মাথায় অন্য চিঠির সঙ্গে এই দু'টোরও উত্তর হাজির।
অফিস থেকে ফিরে খাম খুলে চিঠিতে চোখ। হাসিহাসি মুখে পড়া শুরু
করে, শেষ লাইন পড়ার আগেই স্টান মাথা ঘুরে শয্যা। দেখে মুখলবাবু
স্ত্রীও ছুটে এসে চিঠিতে চোখ। তারপর থেকে ওনারও রাত ন'টা পর্যন্ত
রামাবান্না বন্ধ। ধর্মতমে চোখমুখ। চিঠি পড়েছে ছেলেও। তারপরই
কম্পিউটারের ভুল বোতাম টিপে ফেলে, তিনদিনের কাজ ইরেজ হয়ে পুরো
উঠে গেছে। গোটা বাড়ি যেন শোকের সংসার।

এই সময় গণা দস্ত ঘরে আচমকা ঢুকে পড়ে,— আপনাদের ইলেকট্রিকের
বিলটা।

কথা শেষ হল না, সবার লোডশেডিং মুখের দিকে তাকিয়ে ডায়লগে ব্রেক,—কী হল। চূপচাপ সব?

আড়াই মন ভারী জিত নিয়ে মুখলবাবু কথা বলতে পারছেন না। শুধু চিঠি দুটো এগিয়ে দিলেন। গণা দত্ত তা হাতে নিয়ে নিজের কম্পিউটারাইজডু আই বলের নিচে। পারচেজ ডিপার্টমেন্টের দুঁদে ঘুসখোর এবং বিনমী চোখ প্রতিটি লাইন খুঁটিয়ে পড়ছে।

মুখলদা,

আপনার চিঠি পেয়ে ভাবছি, আপনি এতদিন কেমন ভয়তর মুখোশ পরে ছিলেন। আপনার যৌবন চলে যাওয়াতে অন্যের ওপর হিংসে। আমার স্ত্রীকে জীবিত দেখতে চান না—তাই পত্রে তার মৃত্যু ঘটিয়েছেন নিখুঁত লিখে।

আসলে আপনি আপনার 'ঠাট্টানদীর গান' আর 'গাট্টাখেলার মানে' কবিতা দুটির আড়ালে এক 'মিটিমিটে শয়তান'। নষ্ট পরপুরুষে আসক্ত হয়েই কি আপনার স্ত্রী আপনার আদর্শ গিমিটি সেজে আছেন? আপনার এমত গিমিকে জানাই অভিনন্দন। আর হ্যাঁ, আপনি মৃতের আত্মার শাস্তি চাইলেও, আমার স্ত্রী বহু বছর বাঁচবে। উত্তরের আর দরকার নেই। দরকার নেই আব 'গেয়োযোগী'-তে কবিতা পাঠানোরও।

ভিখারি ভট্টাচার্য

চিঠি পড়ে গণাবাবু গ্যাসে সঁয়াকা রুটিব মতো ফেঁপে ঢোল। জ্ঞানের বদলে পাশ্চাত্য জ্ঞান ঝাড়ার জন্যে গালের লুকোনো হাসিতে হেভি আদর বোলাতে লাগলেন। গিমি বললেন,—জ্ঞানেন ঠাকুরপো, চিঠি পড়ে ইস্তক উনার 'অপমান'-এ জুর এসেছে। উঠতে গেলেই মাথা ঘুরে আবার শুয়ে পড়ছেন। ভাবলাম ডাক্তার ডাকি। কিন্তু অপমান থেকে জুর এলে ডাক্তার কী ওষুধ দেবে? আর তেমন ওষুধই বা কোথায়? আমার এক দাদু অপমানে ভুগে হার্ট অ্যাটাকে মারা গিয়েছিলেন। চিরকালই 'জ্ঞান' আর 'মান' নিয়েই তো কারবার?

গণাবাবু প্রায় ছড়া কেটে বললেন—কিন্তু এ চিঠিতে অপমানে জেরবার।

—ঠিক বলেছেন। কিন্তু উনি এত বিনয় করে চিঠি দিলেন, উত্তরে এত নোংরা অসভ্য চিঠি? কোনো কারণই খুঁজে পাচ্ছেন না এই ব্যবহারের।

গণা দত্ত একটু মুকুর্বি ঢঙে,—দাদা, আপনি বলেছিলেন এঁদের ব্যবহার 'বিনয়ের বিম্বেষণ', তাই না?

কৌকানো স্বরে মুখলের উচ্চারণ,—সে তো বলেছিলাম। ছিলও তো তাই।

—কিন্তু চিঠি এসেছে। 'বিনয়ের বিম্বেষণ' নয়, 'অসভ্যতার আস্তরণ'।

—কী আর বলব? জানি না, কেন এই আচরণ।

মুখল কবি গণা দত্তকে এতদিন কাব্যতত্ত্বের অনেক কালমেগ দাবড়ে গিলিয়েছেন। এবার গণা কেরানিও পেয়েছেন যেন কজায়। বললেন,—এমন আচরণ, যেহেতু আপনার অ-কাব্যিক বিচরণ।

'অ-কাব্যিক বিচরণ'! কথটা শুনে, যে লোক উঠতে পাবছিলেন না, তিনি ভিড়ি লাফে উঠেই মারমুখী।

—কী বললেন? আমি অ-কাব্যিক? আপনি কাব্যের কী বোঝেন? বলতে বলতে হাতে হাত ঠোকা। তেড়ে আসা।

—কাব্য বুঝি না—কিন্তু কবিদের চিঠি বুঝি।

—বোঝেন? কী বোঝেন? এই তো দেখছেন, এই চিঠিদুটো পড়ে আমিই বুঝছি না—তো আপনি! রাবিশ।

—বুঝছেন না, কিন্তু বললাম তো, আমি বুঝছি।

মুখল ভু কুঁচকে—বুঝছেন? কী বুঝছেন?

—বুঝছি, যাঁর স্ত্রী মারা গেছেন তাঁকে আপনি লিখেছেন চবিত্রহীন স্ত্রী বিদায় হয়েছে। আপদ গেছে। তাঁর আবার বিয়ে করা বউকে অভিনন্দন।

—মিথ্যে কথা।

এবার ফেলুদার স্টাইলে গণা দত্তের একদম গোয়েন্দা ডায়লগ—

—আচ্ছা, যেদিন আপনি ওই চিঠিদুটো লিখেছিলেন, সেদিন ওই সময় লোডশেডিং চলছিল?

ভাবটা যেন, ফাইল আটকে ঘুরের প্যাচ হকা।

—হ্যাঁ। লণ্ডনের আলোয় লিখেছিলাম। তাতে কি?

—আপনার নাইট শিফট ডিউটি যাওয়ার তাড়া ছিল?

—আমার তাড়া থাকলেও তাড়া নেই কোনো। তাতে কি?

—আপনি চিঠি লেখার ব্যাপারে ওভার কন্ফিডেন্ট?

—অবশ্যই। তাতে কি?

—আপনার সব ব্যাপারেই তাতে কি—না?

—হ্যাঁ। তাতে কি? এই—একি। আপনি দেখছি আমাকে শব্দের প্যাচে ফেলে দিচ্ছেন?

গণা দত্ত বেশ গার্জেনি স্টাইলে বলে, দেখুন, একজন মানুষ দ্বিতীয় বিয়ে করাতে আপনার যেম্নার পাত্র হল। আপনি তাঁর স্ত্রীকে মৃত্যুদান করে পিণ্ডি শাস্তি করে দিলেন।

মুখল কবি এবার কিছুটা ফর্ম ফিবলেন। তারপর আবাব পুরনো ধাঁচে,—দেখুন শব্দ, বাক্য, ফর্ম নিয়ে আমি ছিনিমিনি খেলি। আমাকে জ্ঞান দেওয়াটা আপনার এ বছরের শ্রেষ্ঠ জোক জানবেন।

গণারও গলা আর গান-গান নয়, খুলেছে। জ্ঞানেন তো, ওভার কন্ফিডেন্ট লীডস টু অ্যাকসিডেন্ট। বেশি আত্মবিশ্বাস ভিড়িয়ে মরবেই।

মুখলও হেসে,—আরে মশায়, আমার কারখানার বাস তো সোজা শপের মুখে দাঁড়ায়। রাস্তা পার হতে না হলে আর দুর্ঘটনাব স্কোপ কোথায়? গণা দত্ত বুঝল, কবির মাথায় 'দুর্ঘটনা' বলতে পথ দুর্ঘটনা চুকেছে।

—কিন্তু আপনার চিঠিদুটোকে এতটা রাস্তা পার করাতে গিয়ে দুর্ঘটনাটা আপনিই ঘটিয়েছেন।

—কী হেঁয়ালি করছেন?

—আজকে উত্তর-আসা চিঠিদুটো আপনি ভালো করে পড়েছেন?

—আপনি আমাকে চিঠি পড়া শেখাচ্ছেন?

—তা নয়। আপনার মুখ থেকেই মুক্তহীনবাবু আর গেয়োযোগী ভদ্রলোকের কেসদুটো শুনেছিলাম, মনে আছে?

তারপর চিঠিদুটো তুলে নিয়ে গণাবাবু দুটি চিঠিতে বিশেষ দুটি লাইনকে আঙুল দিয়ে পয়েন্ট আউট করে বলেন, পড়ুন তো?

প্রথমটায় মুক্তহীন মশুল লিখেছে, ভেবেছেন আমি আবার বিয়ে করেছি? দ্বিতীয়টায় ভিখারি ভট্টাচার্য লিখেছে, আপনি মৃতের আত্মার শাস্তি চাইলেও আমার স্ত্রী বহু বছর বাঁচবে।

ধুরন্ধর মুখল কবি অঙ্কে ফেল ছাত্রের মতো ফ্যালফেলিয়ে গণাবাবুকে দেখছেন। বললেন, হ্যাঁ। তাতে কি?

—তাতে কী? আশ্চর্য। মুক্ত মশুলের স্ত্রী মারা গেছে। তো, আপনি ধরেই নিয়েছেন, সে আবার বিয়ে করেছে। এবং একথা আপনি লিখেছেন নিশ্চয়ই?

—কথখনো না। আমি দুঃখ প্রকাশ করেছি।

—তবে কেন সে এমন লিখল? আর ভিখারিবাবুর নতুন বিয়ে। তার দ্বিতীয় পক্ষ বেঁচে থাকে সত্ত্বেও তার স্ত্রীর মৃত আত্মার শান্তিকামনা করে চিঠি দিয়েছেন?

—কথখনো না। আমি বিয়ের জন্যে অভিনন্দন জানিয়েছি।

—তবে কেন এমন অপমান করে চিঠি দিলেন তাঁরা?

—আরে গুপ্তির পিণ্ডি, অবাক কাণ্ড তো সেটাই! ওদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে নিশ্চয়ই।

—অবাক নয়। মাথা খারাপ আপনারই হয়েছে। নইলে এমন কেলো করেন?

—কী কেলো? টোক গৈলে মুঘল কবি।

—অবশ্য এর জন্যে দায়ী গভর্নমেন্টের লোডশেডিং, আপনার কমজোরি শরীর, মানে চোখের ছানি আর অতিরিক্ত ফুটো আত্মবিশ্বাস। এবং ভূষোমাথা লঠনের আলো।

—এগুলোর সঙ্গে চিঠিতে অপমানের কী সম্পর্ক?

—আছে। আপনি চোখে ঠিক ঠিক দেখতে না পেয়ে উদ্যোগ পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন। এর ঠিকানা ওর ঘাড়ে—ওর ঠিকানা এর ঘাড়ে করে বসেছেন। চিঠি চলে গেছে উন্টোপান্টা জায়গায়। আর সম্ভাবণে নিশ্চয়ই নাম ছিল না। ফলে ধরা যায়নি কোনোভাবেই। ফলে এই কেলোর কীর্তি। ফলে এই অপমান। মুক্তহীনের চিঠি গেয়োমোগীর কাছে এবং গেয়োচিঠি মুক্তর কাছে গেছে।

রহস্য ফাঁস হতেই ছেলে-গিমি এক লাফে সামনে। ওনারা রাগবেন না তো কি? সবার ওপরে পণ্ডিত করে। এটা ধরতেই পারেনি।

মুঘল কবি টি টি স্বরে,—আসলে সেদিন লোডশেডিং—।

কথা শেষ হয় না, গিমির আবার হুকার,—চোপ—ঠিকানা লিখতে জানে না—বলে কবি, লোডশেডিং?

গণা দস্তর গাল বেয়ে তখন গিরগিটি হাসি গড়িয়ে পড়ছে। গণার সামনে গিমি আবার অপমান ঢালছে। প্রতিবাদ করে মুঘল বলেন, তুমি কবিতার কী বোঝ?

গিমির আশুন এবার ডবল,—বোঝাচ্ছি। কাল থেকে এ বাড়িতে ‘কব্বে’ লেখা বন্ধ। কব্বে লিখলে হাত কেটে নেব। পুরনো কাগজওয়ালা ডেকে সব বই-খাতা বেচে দেব। কবিতা লিখে লোকের কাছে এত অপমান? ছিঃ।

মুঘল দেখেন গিমি পুরো ম্যাড। গণা দস্ত, একটা লে-ম্যানের সামনে উদ্দাম অপমান! দেখাচ্ছি। একটা ‘অপমান’ নিয়েই গণাকে জরবদস্ত দর্শন ঝেড়ে পটকাব। গিমির উদ্দেশ্যে গণার জন্যে বলেন—জানবে, এটা অপমান নয়। এই সামান্য ‘অপমান’ দিয়ে একটা অসামান্য এবং এই ঘটনার কবিতাটা কিনলাম।

ছেলে পাশে ফুট কাটে, বাবা,—‘কড়ি দিয়ে কিনলাম—দড়ি দিয়ে বাঁধলাম?’

ছেলের মা-ও সঙ্গে সঙ্গে—কেনাচ্ছি।

গণা দস্ত বলে, দাদা, কবিতা কেনা নয়, আপনি অলরেডি বাঁশ কিনেছেন।

—বাঁশ? সে আবার কি?

বাড় খেলেও গণার বাড় কমল না। গণা দস্ত এবার-উন্ট দর্শনকে

আইন দিয়ে পটকাল।

—আপনিই তো বলেছেন চিঠি হচ্ছে সলিড রেকর্ড। পাক্সা ডকুমেন্ট। এবার ওই ডকুমেন্ট কোর্টে দাখিল করে ওনারা পঞ্চাশ হাজার টাকা করে টোটাল এক লাখ টাকার মানহানির ক্ষতিপূরণ মামলা করছে কিনা খবর নিন। আপনি চিঠি লিখে ওদের মৃত স্ত্রী ও নতুন বউকে অপমান করেছেন। মুঘল কবি এ কথার উত্তরে সেই যে চূপ করলেন, আর আজ পর্যন্তই, এই লেখা ছেপে বেরনো তবু, গণা দস্ত জানি, শান্তিতেই পারছেন ডিপার্টমেন্টের ঘুষ খেয়ে যাচ্ছেন। মুঘল নীরব।

*Mazadar Namkin
Aur Mithai ke Lie*

**YASODA
NIMKI
HOUSE**

70/C, Ekdalia Road,
Kolkata-700 019

Phone : 440-5793

Mobile : 98810 91494

ব্যানার্জি দিদিমা

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত



“এই ছোঁড়া এখানে তুই কি করছিস? লস্ এঞ্জেলসের কাছে ডিজনিয়াণ্ডের খোলা কফি শপে বসে কফি খাচ্ছি; এ হেন অপাণ্ডব দেশে যাট উত্তীর্ণ আমাকে ছোঁড়া বলে সম্বোধন করে কে। পিছনে তাকিয়ে দেখি, ব্যানার্জি দিদিমা। এ বয়সে নিজের চুল-চেরা বিচার করাটা উচিত নয়, কিন্তু আমার এই বিরলকেশ মস্ত টাকমাথা পেছন থেকে দেখে এক লহমায় চিনে ফেললেন, এ একমাত্র ব্যানার্জি দিদিমাব পক্ষেই সম্ভব। আমেরিকা সরকারের আমন্ত্রণে সে দেশে গিয়েছি। একটা গালভারী সাংস্কৃতিক উপলক্ষ অবশ্য আছে, তবে সেটা নিতান্তই গৌণ। আসল

হল বেড়ানো, সেইসঙ্গে আমার মতো কিছুটা বাম বা বামা ঘেঁষা মানুষের মগজ খোলাই। পাশে আমার আমেরিকান সরকারের সরবরাহ করা মেম সেক্রেটারি। সে সকাল থেকেই আমার পেছনে লাগে। হোটলে ঠিক সাতটায় ফোন করে সেদিনের কাজ এবং অকাজের ফিরিতি জানিয়ে দেয়, মাঝে মাঝে কান-ঘেঁষা অল্প দামের ইয়ার্কিও মারে। এক মাসের ওপব আছি তো। আমার তরফ থেকে তার প্রতি কন্যা কন্যা ভাবের ওপর তার এই কথার ফাঁকে ফাঁকে যতিচিহ্নের মতো কান-লাল করা মস্করা মাঝে মাঝে আমাকে যথেষ্ট অপ্রস্তুত করে বৈকি। ঙ্গাগিস রং মিশকালো হওয়ার

কারণে কানের বেগুনি হওয়াটি কেউ টের পায় না। সাদা যুবতীটির নাম অ্যানি, আমি তাকে তিন-আনি বলে ডাকি। সকাল দুপুর সন্ধ্যা—তিনবেলা সে যেভাবে আমার অভিভাবকত্ব করে তাতে তিন-আনি-টা অযৌক্তিক নয়। অ্যানি প্রথম প্রথম আমাকে সেন-গাপ্তো বলে ডেকে বলত, “What do you mean by that adjective ‘তিন’?”

বলি, আমাদের দেশে কন্যাসমাদের আগে তিন বসানোটাই নিয়ম।

ব্যানার্জি দিদিমা একেবারে সামনের টেবিলে এসে বসে পড়েছেন। সঙ্গে বছর চম্বিশের একজন। বসেই তাকে দেখিয়ে বললেন, এটা আমার সবেধন নীলমনি ছাওয়ালা। লস্-এঞ্জেলসে ইউনিভার্সিটিতে কিসব হাবিজাবি পড়ায়। দেশে একা একা থাকি তাই শেষ বয়সে এখানে আমাকে মরতে এনেছে। তবে আসার সময় ভুল করে দেশ থেকে গঙ্গাজল আনতে ভুলে গেছি, তাই কিছুতেই আব মরা হচ্ছে না।

পরক্ষণেই নিজের ছেলের বিরত মুখের দিকে তাকিয়ে ঝটিতি প্রসঙ্গ পাশ্চাত্যে বললেন, তোর সঙ্গে এই ছুটিটা কে রে? আব তুই বা এখানে বসে কী করছিস? একবর্ণ ইংরেজি জানিস না। এখানে বেশিদিন থাকলে তো ভুল ইংরেজি বলার চেষ্টা করতে করতে তোতলা হয়ে যাবি।

আত্মাভিমানে একটু ঘা লাগল বৈকি। বললাম—দিদিমা, আমি আমেরিকা সরকারের আমন্ত্রণে দু-মাসের জন্য এ দেশে এসেছি। এই মেয়েটি আমার বডিগার্ড, মানে ইয়ে, আমার সেক্রেটারি, মানে, ছড়িদার।

ছড়িদার বলতে কী বোঝায় তা দিদিমা জানেন। আমরা একবার একসঙ্গে কেদার-বদ্রীনাথগণ গিয়েছিলাম। ব্যানার্জি দিদিমা একজন কিংকর্তব্যবিমূঢ় চরিত্র। তাঁর সঙ্গে যারা থাকবে তারা ক্ষণে ক্ষণে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যেতে বাধ্য।

কেদার-বদ্রী যেতে হরিদ্বার হয়ে যেতে হয়। ঐ পর্যন্ত ট্রেন, তারপর বাসযাত্রা। আগে কেদারে গিয়ে তারপর বদ্রীনারায়ণ। আগে শিব (কেদার) পরে নারায়ণ। ট্রেনে একটা বিশেষ কামরায় আমি, ব্যানার্জি দিদিমা, আরো অনেকে ছিলেন। সব ব্যবস্থা ট্রাভেল এজেন্সির। আমাদের মাতিয়ে রেখেছিলেন দিদিমা। একজন খুব বড়লোক ছিলেন আমাদের মধ্যে। নাম ভুলে গেছি। সকলেই বসাকবাবু বলে ডাকত। বড়ো আঙুল বাদে দু'হাতে আটটা আংটি। একদিন দিদিমা তার দুটি হাত ধরে বললেন—আচ্ছা বসাক, তুমি যে এত টাকা কামাচ্ছ, তা কি এই আটটা আংটি পরার পর? তোমার দেখছি প্রায় সব গ্রহই খারাপ। তোমার তো পথের ভিখারি হওয়ার কথা ছিল। আংটিগুলো পরার পরই বোধহয় তোমার টাকা ও ভুঁড়ি বেড়েছে?

অপ্রস্তুত বসাকবাবু কি আর বলবেন?

চিত্রপরিচালক বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর মা আমার বড়দিদি। বড়দি ও জামাইবাবুও সে যাত্রায় আমার সঙ্গে ছিলেন। দিদিকে বললেন, তোমার ভাইটি কি অ্যাকাউন্টেন্ট? মাঝেমাঝেই দেখি কাগজ বের করে হিসাব লেখে। বললি আমার দিকে তাকিয়ে একগাল হেসে বললেন, আরে পয়সার হিসাব লিখে কী করবি? তীর্থে এসেও যদি টাকা-পয়সার চিন্তা করিস.....

জামাইবাবু মাঝখানে বাধা দিয়ে বললেন, না না, ও একটু লেখটোঁখে, রোজ যা যা ঘটছে তা ডায়েরিতে লিখে রাখছে। ফিরে গিয়ে একটা কাগজে লিখতে হবে কিনা।

দিদিমা বললেন—এই ছোঁড়া, আমার কথা লিখবি তো? দেখিস, লিখতে গিয়ে আমার হেমাসিনী বানান ভুল করিস না যেন। আসলের সঙ্গে অনেক মিথ্যা না বানালে তো তোরা আবার লিখতে পারিস না।

বিধবা দিদিমা সম্ভবত কিছুটা লেখাপড়া জানতেন। ট্রেনে নিরামিষ আমিষের মেশামেশি তাঁর খুব যে পছন্দ হচ্ছিল তা নয়। মাঝে মাঝে খুব বিরক্ত বা বিষন্ন হলে ছড়া কাটতেন—

যত কষ্ট পাইলাম রাম অবতারে।

আর না জন্মিব কভু কৌশল্যা-উদরে।।

কখনো বলতেন, তীর্থ করতে এসেছিস তবু সর্বক্ষণ তোদের কেবল খাই খাই—

তোরা সব ভোজন গোসাই

সর্বক্ষণ শুধু খাই খাই।

একদিন দিদিমা বললেন, সীতারে তোরা আদর্শ বানাস, কিন্তু সীতা একটা হারামজাদি। শুনে ট্রেনের কামরায় সকলেই একটু নড়েচড়ে বসল। আমি বললাম, এটা কী বললেন দিদিমা? দিদিমা মুচকি হেসে বললেন, ঠিকই বলেছি। ও মেয়ের ইচ্ছাই ছিল না লক্ষণ-দেবর সঙ্গে যায়। দেবরের সামনে তো আর বরের সঙ্গে ফস্টিনসি করা যায় না। তাছাড়া যাচ্ছিস তো বনে, তা অত গয়না-টয়না পরে যাবার কী দরকার ছিল রে বাপু? নাকি দিব্যদৃষ্টিতে সীতা আগেই টের পেয়েছিল যে রাবণ তাকে ধরবে? জটায়ু বাধা দেবে, আর তিনি পথের চিহ্ন হিসাবে গয়না ফেলতে ফেলতে যাবেন? বনে গিয়েও সীতার সোনার লোভ। বলে, প্রভু আমায় সোনার হরিণ ধরে দাও—আরেকবার 'হারামজাদি' বলে দিদিমা আর বাক্যটা সম্পূর্ণ করলেন না। পরমুহূর্তেই আবার—তোরা তো বিয়েবাড়ি যাস। গিয়ে মেয়ে দেখিস? তা মেয়েদের দিকে পুরুষের না তাকালে কি চলে। মেয়ে বৌ কিরা কত সময় নিয়ে সেজেগুজে গয়নার দোকান হয়ে সব বিয়ে বাড়িতে আসে। বুঝলি, আমি নাহয় তেমন লেখাপড়া শিখিনি, কিন্তু

লেখাপড়া জানা মেয়েরাও দেখবি নাকে-কানে কিরকম গয়না পরে আসে, আর কেবলি আড়চোখে এ-ওর গয়নার দিকে তাকায়। গয়নার পরিমাণটাও দেখে, শুধু ডিজাইন না।

এভাবে বেশ আনন্দেই কাটছিল কেদার-বদ্রী ভ্রমণের দিনগুলি তারপর একসময় গৌরীকুণ্ডে পৌঁছলাম। এরপর ঘোড়ার পিঠে চড়ে বা ডাঙিতে কেদারের দিকে এগুতে হবে। যাওয়ার দিন সকাল থেকেই দিদিমার একটু শ্বাসকষ্ট শুরু হল। এমনিতে ক্রনিক ইঁপানি নাকি ছিলই। দিদিমার সঙ্গে আমরা ছাড়া আত্মীয় অর্থে কেউই নেই। সঙ্গের ট্রাভেল এজেন্সির ডাক্তার বললেন, এখানেই বিশ্রাম নিন। আর ওপরে না ওঠাই ভালো আপনার।

অগত্যা দিদিমা থেকেই গেলেন গৌরীকুণ্ডে। ফেরার সময় তাঁকে নিয়ে একসঙ্গে বদ্রীনাথে যাব। সুফি, বদ্রীনারায়ণের শেষ অবধি বাস যায়।

ফিরে এসে দিদিমাকে ভালো অবস্থাতেই পেলাম। আবার যখন-তখন ছড়া বলতে শুরু করেছেন। বললেন, তোদের সকলের যদি এককেজি করে পুণ্য হয় তবে যোগ করলে কতকেজি পুণ্য হবে রে? একটন হবে? তোরা যে এত ভারী হয়ে গেলি, বদ্রীনাথে উঠতে কষ্ট হবে না।

যা হোক, ভালোয় ভালোয় তো ফিরে এলাম। হাওড়ায় নেমে দিদিমা তাঁর হাওড়ার শিবপুরের বাসার ঠিকানা দিয়ে বললেন, আসিস, একদিন আমার তিন মেয়েকে দেখে যাস।

মেয়ে? কই তাদের কথা তো একবারও বলেননি, এই এক মাস! এক ছেলেই তো আছে বলে জানতাম। মানে; উনি কথাবার্তার ফাঁকে জানাতেন। সে যে বিদেশে গিয়ে নটবর হয়ে আমেরিকার ইংরেজদের ইংরেজি পড়াচ্ছে, (যার সঙ্গে কিছুক্ষণ আগে ডিজনিল্যান্ডে দেখা হল, এবং এখনো যে আমার সামনে বসে!) তা জানাতেন। গর্বের সঙ্গে প্রচ্ছন্ন বেদনাও মাঝে মাঝে বেরিয়ে আসত। যদি শেষ সময়ে মুখে জল দেবার লোক তিনি না পান!

কেদার-বদ্রী থেকে ফিরে একদিন-সময় করে গেলাম দিদিমার বাড়ি। এখন যেখানে দ্বিতীয় হাওড়ায় সেতু শিবপুরে শেষ হয়েছে, তার কাছেই ছিল বাড়িটা। একতলা, সামনে একটু বাগান। কয়েকটি ফুলগাছ। একটা তুলসীমঞ্চ। গত সন্ধ্যার সঁজবাতটি সরাণো হয়নি। খানিকটা তেল রয়ে গেছে। দরজার দু'ধারে দুটো গন্ধরাজ গাছ ফুলে সাদা হয়ে আছে। গেটের দুটো রেলিং ভাঙা। বাঁদিকে নেমপ্লেট—'কুঞ্জ কুটির'। প্রথম অক্ষর একটা ছিল। উঠে গেছে। কুঞ্জুর আগে 'নি' শব্দটাই থাকা স্বাভাবিক। সম্ভবত গৃহকর্তার নাম নিকুঞ্জই হবে। বোধহয় দিদিমার পরলোকগত স্বামীর নাম? হবেও বা। গেটের ঠিক বাইরে তিনটি মহিলা সারমেয়। রিলে করে সি শাপে বিলম্বিত দরবারীর মতো ঘেউ-উ-উ-উ.... আরে, এরা দেখছি ধামছেই না। ঘেউ ঘেউ করলে বোঝা যেত এরা রেগে ডাকছে। কিন্তু তা তো না। একই সঙ্গে লেজও যে নাড়ছে। ভাবখানা, খুব বড় ওস্তাদের কাছে তালিম নিয়েছি, দেখো কেমন আমাদের গলা ও দম।

একজন মাঝবয়সী মহিলা বেরিয়ে এলেন। বোধহয় কাজের লোক। কাকে চাই-এর উত্তরে বললাম ব্যানার্জি দিদিমাকে চাই। মেয়েটি বলল হেমাসিনী দিদিমা? বললাম, গিয়ে বলুন কেদার-বদ্রীতে একসঙ্গে গিয়েছিল যে সমরেন্দ্র, সে এসেছে।

—কিন্তু এখন তো তিনি খাচ্ছেন। আচ্ছা দাঁড়ান জিজ্ঞাসা করে আসি। দু'মিনিটের মধ্যেই ফিরে এসে বলল, আচ্ছা চলুন ভিতরে। 'চলুন ভিতরে'র আগে 'আচ্ছা' শব্দটি ব্যবহারে বোঝা গেল খাওয়ার সময়

ভিতরে যাওয়াটা কাজের মেয়েটির তেমন পছন্দ হয়নি।

যা হোক, গেলাম ভিতরে। ইতিমধ্যে দিদিমার খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তখননো তিনি আলাদা আরেকটি থালায় আলাদা আলাদা পিণ্ড করে ভাত-তরকারি-মাখা সাজাচ্ছিলেন। বললেন, একটু বোসো, আমার মেয়েদের খাইয়ে নিই। বলেই চৈচিয়ে ডাকলেন “ধলি”—। একটা সাদা কুকুর এলো। অবাক হয়ে দেখলাম, দিদিমা হাতে করে সাজিয়ে রাখা তিনটি পিণ্ড নিয়ে বাচ্চা শিশুকে মা যেমন করে খাওয়ায়, মাখা ধরে ধলিকে খাওয়ালেন। খাওয়া শেষ হতে দিদিমার হাত একটু চেটেও দিল ধলি। দিদিমা বললেন, যা, এবার ‘লালি’কে পাঠিয়ে দে।

কি আশ্চর্য, গেটে বসে থাকা কুকুরের মধ্যে যে লাল, সে এল এবং একইভাবে খেলো। সেই দিসিমা আবার বললেন, যা তো, এবার ‘কালি’কে পাঠিয়ে দে তো মা। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে কালি এলো। তাকে খাইয়ে দিদিমা হাত ধুয়ে তারে টাঙানো গামছায় হাত মুছে বললেন, চল ভিতরের ঘরে গিয়ে বসি। ঢোকার আগে তেমন লক্ষ্য করিনি, গেটের সামনে যে তিনটি সারমেয় আমাকে গাম শোনচ্ছিল, তারা তিনটিই নারী কুকুর, এবং তাদের রং যথাক্রমে—সাদা, লাল এবং কালো।

আমি অবাক হয়ে ভাবছিলাম, ধলি কী করে বুঝে ঠিকঠাক লাল, এবং লাল, কালোকে পাঠিয়ে দিল। পশু আদর বোঝে, মানুষের ভাষাও কি বোঝে? নাকি একই প্রথায় রোজ পরপর সাদা, লাল, কালোকে দিদিমা ডাকেন? দিদিমা বললেন, আমি তো আজ কুড়ি বছর বিধবা। কুকুরগুলির বয়স তিন-থেকে চার। আমার কোনো মেয়ে নেই। তাই রাত্তার ধার থেকে সাদা, লাল, কালো রং বেছে বেছে কুড়িয়ে এনে পুষেছি। অবশ্য কোনোটিই পুরোপুরি সম্পূর্ণ এক রঙের নয়, অল্পবিস্তর অন্য রঙের মিশেলও আছে। ওদের এমন অভ্যাস করেছে, ওদের তুই মাছ-মাংস দে, ছুঁয়েও দেখবে না। দুঃখের কথা কী জানিস, এই তো, বছর দুই আগে ওদের কর্পোরেশনের গাড়ি এসে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। আমি প্রায় হাতেপায়ে ধরাতো বন্ধ্য করে ফেরৎ দিয়ে গেছে। ভাব তো, সব ঠিক থাকলে আমার কত নাতি-নাতনি হত।

আমার বিস্ময় ক্রমশই বাড়ছিল। দিদিমা যেখানে খাচ্ছিলেন, সেখানে বা বারান্দায় কিংবা ভিতরের ঘরের দেয়ালে একটাও দেব-দেবীর ছবি নেই। কেবল রামকৃষ্ণের মতো দেখতে একজনের বিবর্ণ ছবি। বললাম—দিদিমা, দাদুর ছবি নেই? কোন ঘরে আছে, নিয়ে গিয়ে একটু দেখাবেন?

বললেন, না রে, তাঁর কোনো ছবি রাখিনি। মনে যে আছে, তাকে দেয়ালে ঝুলিয়ে কী হবে? কে রোজ ধূপ জ্বালাবে, কে মালা পরিয়ে ফুলগুলি শুধু শুধু শুকনো হবার অপেক্ষা করবে? মৃতজনকে গাছছোঁড়া মৃত ফুল দিয়ে সাজানোর কোনো মানে হয় না। আমার তাই কোনো ঠাকুরঘরই নেই। ঠাকুরঘর হলেই তো ফুল ছিঁড়তে হবে।

হিন্দু বিধবার মুখে একসব শুনে সত্যিই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাচ্ছিলাম। সত্যি, মস্করা-প্রবণ ব্যানার্জি দিদিমাকে তাঁর নিজের পরিবেশে অন্যরূপে না দেখলে বুঝতেই পারতাম না, একই মানুষের মধ্যে কত বিপ্রতীপ বিশেষত্ব থাকতে পারে। একজন ফরাসি দার্শনিক বলেছিলেন, ‘সারা পৃথিবী চেনার চেয়ে একজন মানুষকে পুরোপুরি সঠিক চেনা অনেক বেশি কঠিন।’

সেই ব্যানার্জি দিদিমা বেঁচে আছেন, এবং পুত্রসহ এই মুহূর্তে আমার

সামনে বসে আছেন, এবং ‘এই ছোঁড়া’ সম্বোধন পেছন থেকে ছুঁড়ে দিয়ে আমার মুখে অগাধ খুশি মাখিয়ে দিলেন—ভাবা যায়।

সাহেবদের সঙ্গে, মুখের মধ্যে একটু গড়িয়ে নিয়ে তারপর ধ্বনি ছেড়ে ইংরেজি বাক্যলাপ চালাতে চালাতে জিভ প্রায় অসাড়া হয়ে এসেছে। কোনো খাবারেরই আর টেস্ট পাচ্ছি না। আঃ, কতদিন পরে বাংলা ভাষা।

যাবার আগে ব্যানার্জি দিদিমার ছেলে তাঁদের বাড়ির ঠিকানা দিলেন এবং আমার হোটেলের ঠিকানা, ফোননম্বরও নিলেন। অ্যানি আপাত ভাবলেশহীন মুখে আমার দিকে তাকিয়েছিল। মাঝে দু’বার চোখ টিপল। আমার বয়স অল্প হলে যার একটা অসভ্য মানেও করা যেত। আসলে এবার উঠতেই হবে। দুপুরে আমেরিকাব একজন নামি লেখকের সঙ্গে খাবার কথা। খুব ব্যস্ততার মধ্যে লস এঞ্জেলেসে তিনদিন কাটিয়ে ওয়াশিংটনের দিকে যেতে হবে। সেখানেও ঘুরিচোকুর।

পরেরদিন খুব সকালে দিদিমার ছেলের ফোন এল। বলল, আপনি কি একবার আজ আমাদের বাড়িতে আসতে পারবেন? মা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন এবং আপনাকে দেখতে চাইছেন। কি একটা জরুরি কথা আছে?

বললাম, আমি তো একা কোথাও যেতে পারবনা। দেবি অ্যানিকে জিজ্ঞাসা করে। শিডিউল দেখে অ্যানি বলল, অসম্ভব। আজ রেড ইন্ডিয়ানদের স্মৃতিজড়িত এক গ্রামে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে টাই ও ক্রাট পরা যুবক-যুবতীদের সঙ্গে নৃত্যগীত সহ খাওয়া-দাওয়া পান ভোজন ইত্যাদি।

না, যাওয়া আমার আর হয়ে ওঠেনি। তৃতীয়দিনে রাত প্রায় দুটো নাগাদ ফোন পেলাম ব্যানার্জি দিদিমার ছেলের কাছ থেকে। আধঘণ্টা আগে দিদিমা ওপরে চলে গেলেন। ‘ছেলে বলল, মা’র হার্ট শেষের দিকে খুবই দুর্বল হয়ে গিয়েছিল, সেদিন আপনাকে বলিনি। এই জন্যই আমার কাছে নিয়ে এসেছিলাম। শ্বাস ওঠার সময় আমাকে বললেন, এখানে তো গঙ্গাজল নেই। ওই ছোঁড়াটাকে বলিস, কলকাতার বড়গঙ্গা থেকে জল নিয়ে আগে নিজের মাথায় ভালো করে ছিটিয়ে, যেন দক্ষিণেশ্বরে মায়ের পায়ে বাকি গঙ্গাজলটুকু দিয়ে আসে আমার নাম করে।’

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত আমার অগ্রজ কবি। একদা আমার দু-একটি ছোট অ-গল্প পড়ে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, ‘আমি কবি, তুমি কবিতা লেখো, তাতে আপত্তি করতে পারি না, কিন্তু গল্পই তোমার আসল জায়গা।’

আজ অনুজের পান্টা দেওয়ার সময় এসেছে,—‘আমি কবি, আপনি কবিতা লিখুন, তাতে আপত্তি করতে পারি না, কিন্তু গল্পটাকে এতদিন অবহেলা করে যে অপরাধ করেছেন, সেই পাপের বোঝা আর বাড়াবেন না।’

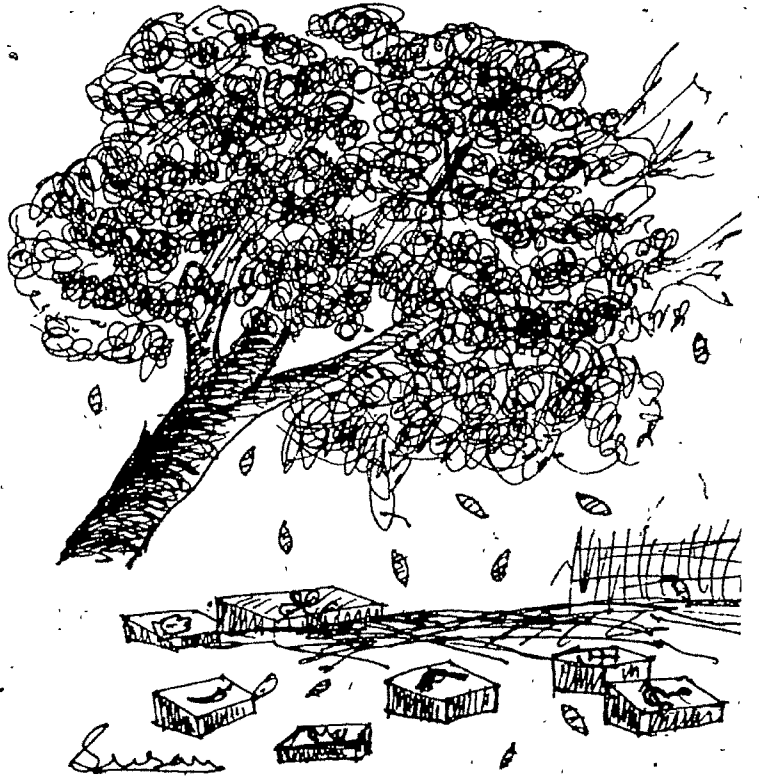
শ্রুততা মার্জনীয়।

—শে. আ.

স্বত্বম্প্রদানক

ক্রান্তিকাল

রাধাপ্রসাদ ঘোষাল



ছোট ছোট ধূসর চোখদুটো ঈষৎ কোচকানো, নাকি দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসাব সঙ্গে তাল রেখে চোখ দু'খানিকে দৃশ্যত তাই মনে হয়। অকিনাশ মুখার্জির ঠোটে বেশ পুরু চাপা হাসি। গড়নে লম্বা, গায়ের রং গাঢ়। এই লোকটিকে তন্মাত্রের অধিকাংশ লোকই চেনে। আজকাল কথা কম বলেন, বললেও অধিকাংশ সময়ই নিজের মনোভাবকে প্রকাশ করেন যেন অপ্রতিভ বা অপ্রস্তুত ভাবে, কিংবা আমতা আমতা করে। হাত নাড়েন কথার মাঝেই অনাবশ্যক ভঙ্গিতে। হয়ত বাইরেটা স্থির আর অন্তরে উৎকণ্ঠা। তবে কি খাঁচার পাখির মতো মন তাঁর কেবল

ঝাপটায়! যদিও খাঁচা বলতে তাঁর কোনো কিছুই নেই, কেউ তাঁকে ধরে বাধেনি কিংবা বাধা দেয় না। এবং বোধহয় এক বিশেষ ধরনের শান্তিতে মন বা হৃদয় তাঁর পরিপূর্ণ হয়ে আছে বহুদিন ধরেই। এই পরিভ্রাণই তো অবিনাশবাবু চেয়েছিলেন। তাই তাঁর শান্তি অনেকটা ক্লান্তি আর বিষন্নতার মতো। কিন্তু এই বিষন্নতা কি মুক্তির জন্য মাঝে মাঝে ব্যাকুল হয়ে ওঠে? মাঝে মাঝে তিনি যেন নিজেই বুঝে উঠতে পারেন না তিনি কী চান। স্বাধীনতা সত্যিই কি তাঁর কাম্য। চারদিককার সবকিছুই যে হাস্যকর আর অবাস্তব মনে হয়। ভয় লাগে নিজেকেই। জীবনটা তাঁর নিঃসঙ্গ ঠিকই কিন্তু অন্তরটাও যে

মাঝে মাঝে জ্বলে ওঠে। হৃদয়টা তো একটা কুমড়া নয় যে তাকে ভাগ করা যাবে। যা কিছু সত্য তা কখনো ইঙ্গিত করে না, সরাসরি দেখায়। ভয় দেখায় ও মনে জাগিয়ে তোলে ভয়ঙ্কর দুশ্কেয় রহস্যকে। তখন বেপরোয়া ভাবে তিনি তাকান আত্মপ্রত্যয় নিয়ে এদিক ওদিক, চোখ দুটো যেন বা আকাশের দিকে চেয়েই কাতরে উঠতে চায়। গলা কেড়ে কেশে নিতে চান অকিনাশবাবু, দেখেন প্রেতায় বিজড়িত গলা থেকে দুর্বলতার আওয়াজ উঠে আসছে সমানে। তার মানে তিনি জানুন, বা নাই জানুন বয়স তাঁকে গ্রাস করেছে। কিছুই কি করার নেই!

হঠাৎ খুঁট করে শব্দ।

লেখা থামিয়ে টেবিল থেকে চোখ তুলে তাকালেন তিনি সূচকিত হয়ে। দেখলেন খোলা জানালার রেলিং বেয়ে একটা বেড়াল এসে ঢুকে পড়ল ঘরে। আর সেই শব্দটাকেই অতখানি বিপজ্জনক ভেবে চমকে উঠেছিলেন তিনি। এখন দৃষ্টিতে বরং স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে এনে কপালের ওপর থেকে ঝুলে পড়া চুল ক'গাছি সরিয়ে দিতে দিতে মসৃণ হাসলেন ছেলেটির দিকে।

বাইশ চক্ষিশের ওই যুবক দেওয়াল ঘেঁষে পেতে রাখা খাটটিতে গুয়ে গুয়ে কি একটা নভেল পড়ছিল। বলে উঠল অস্ফুটে, 'বিড়াল—'

স্বল্পচেনা লোকজনের সঙ্গে কথা বলার সময় আজকাল অবিনাশের কথা আরো আটকে আটকে আসে। জিভের জড়তা যেন বেড়ে যায়। আজ কিন্তু সেই ভাবটাতে যেন ভাটা লাগে, স্পষ্ট কণ্ঠে তিনি বলে উঠলেন, এখানে তোমার কোনো ভয় নেই।

যুবক সঠিক ভাবে এই শব্দকটি শুনতে পেল বোধহয়। বলল নির্ঝঞ্ঝাট স্বরে, জানি। ওরা সবদিক ভেবে চিন্তে নিরাপদ জায়গা বুঝেই আপনার কাছে আমাকে পাঠিয়েছে।

একথা শুনে মুখার্জি খেয়ালখুশি মতো মাথা নাড়তে নাড়তে নিজের মনেই কি যেন বিড় বিড় করে মৃদু চাপা হাসিতে কাঁপতে লাগলেন। তারপর হাসি সামলে, যেভাবে সঠিক গৃহিনী সসপ্যানে উধেলে ওঠা দুধ সামলে সসপ্যানেই ফেরৎ পাঠান সেভাবেই টেবিল থেকে উঠে যুবকের সামনে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, দেখি কি পড়চো?

কুণ্ঠিত হাতে যুবক বাড়িয়ে দিল বইটি। অবিনাশ দেখলেন সমরেশ বসুর সাড়াজাগানো উপন্যাস, মহাকালের রথের ঘোড়া।

যুবক বলল, আপনার সব বইই দেখছি আন্ডার লাইন করে পড়েন। যৌবনের অভ্যাস আর কি। তখন খুব পড়তাম। যেখানেই ভালো লাগত দাগ দিয়ে রাখতাম, আন্ডার লাইন করে নিতাম যেন মহাজীবনের সব নোটেশন। বই কিনতাম তেমনি। কলেজ স্ট্রিটের পুরনো দোকান থেকে দরদস্তুর করে যত পুরনো, দুস্ত্রাপ্য বই। ওই যে দেওয়ালে-র্যাকে সাজানো দেখছি যত বই—

—সব আপনি পড়েছেন স্যার ?

—সব কি আর পড়েছি। পড়ব ভেবেছি, তুলে রেখেছি যত্ন করে। কোনো বই হয়ত তিন-চারবার করে পড়েছি। কত বই উইপোকায় কেটে নষ্ট করে দিয়েছে। বই তো নয়, সেসব যেন জরুরি মামলার নথিপত্র। তোমাকে কী বলব, কিছু বই যেন রক্তের চেয়েও দামি।

বইটি উন্টেপাস্টে দেখলেন অবিনাশ। কুড়ি বাইশ বছর আগের আন্ডারলাইন করা। নিজে আরেকবার পড়ার চেষ্টা করলেন সেই পুরনো কাসুন্দি বইটে,.....'গতকাল রাত্রে তাকে গাড়িতে তোলা হয়েছিল মধ্যরাত্রের কিছু পরেই...।... আজ থেকে সাতদিন আগে প্রথম সে জেল ওয়ার্ডারের কাছ থেকে জানতে পেরেছিল তাকে নাকি অন্য কোনো জেলে নিয়ে যাওয়া হবে...।... জেল কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই ওয়ার্ডারকে এইরকম শিথিয়ে দিয়েছিল। শেখানো মানেই নির্দেশ...।... বন্দীরা সকলেই তার জেলের বাইরের পরিচিত ছিল না। দু'জন ছাড়া। কিন্তু সকলের ওপর একই প্রেমের অভিযোগ ছিল। খুন, জখম, লুণ্ঠ আশুন লাগানো অরাজকতা সৃষ্টি করা। এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রদ্রোহিতা, বলপূর্বক রাষ্ট্রক্ষমতা দখল। সকলের উদ্দেশ্যও এক, অতএব তারা সমধর্মী। যদিও এ বিষয়ে নিশ্চিত ছিল না, সকলেই তারা সমধর্মী, সকলেরই এক উদ্দেশ্য, সকলেই দলের। কথাটা ভাবলেন দাঁতে দাঁতে চেপে বসে। চোখের কোণে অনিবার্য সন্দেহ ধারালো হয়ে ওঠে। বৃকের

মধ্যে বলকিয়ে ওঠে ঘৃণা। কারণ অভিজ্ঞতা বড় তিক্ত। বিশ্বাসঘাতকতা আর ক্ষতির পরিমাণ ভয়াবহ, যার কোনো বদলা নেই। পাহাড়ের জোঁকের মতোই অনেক তথাকথিত সহধর্মীরা ঘাসের সঙ্গে মিশে থাকা মেটে বোরার মতো। এমনকি তার আচমকা ফণাও নেই। হিসিয়ে বা উচিয়ে ওঠে না দুরন্ত ফণা। যে সাপগুলিকে সাহসী দর্পী মনে হয়। এই লাল মেটে সাপগুলো বা ঘাসরঞ্জা পাহাড়ি জোঁকগুলো বাইরের থেকে আমদানি করা দালাল। কর্তৃপক্ষের পোষা, ইশারায় চলে। এরা অজান্তেই ছোবল মারে। এক টুকরো জমি পোনপত কুরমি কোরফা রায়ত হিসব জোগাড় করতে পেরেছিল। সামান্য এক টুকরো, ভূমিহীন কৃষক নাম ঘোচাবার মতো যথেষ্ট নয়। জোতদারদের জমি চাষ করাই ছিল আসল কাজ। তবু চারপুরুষের সেই পরিবর্তনের মধ্যে নিজেকে ফিরে পাবার একটা নতুনের স্বাদ আর উৎসাহ ছিল। ছিল স্থিতি আর অস্থিতির একটা আশা। নেশা না, একটা তৃষ্ণা, জমি চাষ-আবাদ সম্পন্ন গৃহস্থালি। রক্তের মধ্যে এই তৃষ্ণা। ... প্রাণ পণ রাখা লড়াই তাকে বলে। রুহিতন মরার ভয় জ্বলজ্বলি দিয়েছিল এ লড়াইয়ের শুরুতে না। ছেলেবেলায় তীর-ধনুক নিয়ে যখন শিকারখেলায় হারিয়ে যেত বলের মধ্যে, তখন থেকেই বাঁচা মরা সমান ছিল। মারা আর মরা, লড়াইয়ে এটা হল সমার্থক। মারতে হলে যেমন মরতে হয়, তেমনি মারার জন্যই বাঁচতে হয়। রুহিতন জানে। জেনেছে মরা দেখে। বন্ধুদের মৃত্যু দেখে সে বাঁচার দরকার কেন তা জেনেছে। জেলের বাইরে মৃত্যু ছিল সারে সারে। জেলের ভেতরে ছায়ার মতো গায়ে গায়ে। ভয় আর মৃত্যু সমান। দুটোই সে জীবন থেকে খারিজ করেছে। অন্য জেলে নিয়ে যাবার নাম করে চিরদিনের জন্য লোপাট। পুলিশি খতমের এটা একটা পদ্ধতি। এক জেল থেকে আর এক জেলে নিয়ে যাবার পথে, কোনো গভীর জঙ্গলে গাড়ি থেকে নামিয়ে নিয়ে গিয়ে অথবা কোনো খরস্রোতা নদীর পাড়ে— অন্ধকার রাত্রে কোমরের বেষ্ট থেকে খোলা 'চেসর' এর কয়েকটা গুঁড়ম গুঁড়ম শব্দ। ওবা বড় সুখী। কেউ কোনোদিন জানবে না, রুহিতন কুরমি কোন জেলে আছে। রুহিতন কুরমি কোন জেলে? ... একটি ঘোষণা : রুহিতন কুরমি পলাতক ...

খুঁদে খুঁদে ছাপার হরফে শব্দ বা অক্ষরগুলো এত বছর পরেও আজ অবিনাশের চোখের সামনে জ্বল জ্বল করে উঠল। চোখমুখ তাঁর ততোধিক জ্বলে উঠল। কিন্তু বইটি বন্ধ করে তিনি যুবকের দিকে এগিয়ে দিলেন।

যুবক বলে উঠল, বইটাই খুব বেশি পড়া হয়ে ওঠে না। কিন্তু এখানে চব্বিশটা ঘন্টা কি আর এইভাবে কাটে! কাল শুনছিলাম বিবেকের সঙ্গে আপনি আলোচনা করছিলেন এই বইটি নিয়ে, জঙ্গল সাঁওতালের কথাও আমার খুব বেশি জানা ছিল না স্যার। তাই ভাবলাম পড়ে দেখি। আমি অবশ্য খুব ধীরে ধীরে পড়ি—

—হ্যাঁ এখন এই বইটিই তোমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগতে পারে—

—সত্যি কথা বলতে কি স্যার, এই বইটাইয়ের ঠিক আমি যোগ্যও নই, হয়ত অনধিকার চর্চা কবছি—

—তা কেন, পড়তে পড়তে তুমিও যোগ্য হয়ে উঠবে সবাই এভাবেই ...। তাছাড়া যোগ্যতা বিচার করে তবে কে কবে বই পড়েছে? বাজার-বিক্রি হয়, আলু পটলের মতো পয়সা লাগালেই হাতে চলে আসে, তারপর বাড়ির সুদৃশ্য ক্যাবিনেটে সাজিয়ে রাখলেই হল। এভাবেই তো চলে আসছে। তুমি বরং এ ব্যাপারে যোগ্যতা অযোগ্যতার কথাটা তুলে বুঝিয়ে দিলে, তুমি নিজে কিছুটা হলেও অন্য জাতের—

না স্যার, আমি যোগ্য কিসে তা আমার অজানা নয়, নিজের সম্পর্কে আভার বা ওভার কোনোরকম এসটিমেশনই নেই আমার। যা পারি তা পারি, যা পারি না কিছুতেই পারি না। আমার যাবতীয় যোগ্যতা তা, এই যন্ত্রটাকে নিয়েই, বললে যে কোনো সময় তার প্রমাণ দিতে পারি স্যার—

বলতে বলতে সাহসী যুবক বালিসের তলা থেকে ছোট সাইজের একটি রিভলবার বার করতেই অবিনাশের পুরাতন চোখজোড়া দপ্ করে জ্বলে উঠল। কিন্তু নিজেকে সামলে তিনি সতর্ক চোখে এদিক-ওদিক তাকালেন, কেননা শোনা যায় দেওয়ালের ও নাকি চোখ কান থাকে যদিও এই সুরক্ষিত ঘরটি সর্ব অর্থেই সুরক্ষিত, বাড়ির প্রবীণ ফটক এখন থেকে অনেক দূরে, চারদিকে আছে সুউচ্চ পাঁচিলঘেরা বাড়িগারি। মালখানের প্রায় কয়েক কাঠা জায়গা জুড়ে যে মস্ত আদিকালের বাড়ি তার পেছনের দিকের ঘরটাই অবিনাশের পড়াশুনার ঘর। দেওয়াল ঘেঁষে কয়েকটা জঁকানো জারুলগাছ দু'একটি নারকেল গাছও নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। রাতের বেলা, বিশেষত জ্যোৎস্নাবাতে ডালে-পাতায় চিকরিকাটা আলোছায়া জেগে উঠে একটা রহস্যময় পরিবেশ রচনা করে। কে বলতে পারে, পিছনদিককার পাঁচিল টপকে কেউ এসে ঢুকে পড়েছে কিনা বাড়িভারিতে, এসে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে আছে ওই জারুলের কোণে, কিংবা ভয়ানক হলে গাছে উঠে জারুলের ডাল থেকে দৃষ্টি পাঠাচ্ছে এই জানলায়, আড়ি পেতে উৎকর্ষ হয়ে আছে। তাই চোখের ইস্তিতে তিনি যুবককে বোঝালেন, ওটা যেখানে ছিল সেখানেই লুকিয়ে ফেল। কে না জানে এইসব আয়েয়াস্ত্র সাধারণত লাইসেন্সহীন হয়ে থাকে।

কিনা বাকস্বায়ে যুবক সতর্ক হয়ে গেল। গোপন করল নিজের উৎসাহ আর উদ্দীপনাকে। সত্যিই তো সাবধানের মার নেই।

অবিনাশের ইচ্ছা ছেলটির সঙ্গে দু'একটি কথা বলেন। জানতে ইচ্ছে করছে। চব্বিশঘণ্টা কেটে গেছে, যে অজ্ঞাতকুলশীলকে তিনি আশ্রয় দিয়েছেন, প্রিয় ছাত্রের মুখের কথায় তার সম্পর্কে যাবতীয় কৌতূহল সংবরণ করে রেখেছিলেন প্রায় একটা রাত আর পূর্ণ একটা দিন ধবে। তাছাড়া জানাও দরকার বৈকি। সেই খেয়ালে তিনি পুরাতন গ্রামোফোন প্লেয়ারে উদ্ভাদ বিসমিল্লা খানের বেকর্ডখানি চড়িয়ে দিলেন, অমনি গরম হাঁড়িতে যেভাবে চালে ফুট ধরে সেই ঘনায়মান শব্দে গুঞ্জনিত হতে লাগল রাগ মিশ্রপিলু। ধীরে ধীরে সেই রব উচ্চাঙ্গে উত্তীর্ণ হল। এখন ঘরের ভেতর কাছকাছি বসে দু'জন যদি খুব খাটো গলায় আলাপ চাবিতা চালায় তবে তার কোনো রেকর্ড সম্ভব নয়। সঙ্গীতের সুর-তান-লয়ের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবে স্বর।

শুধু ডানা নাড়বে কিন্তু উড়বে না—এই ছক শুরু হল কথাবার্তা। একটা কাঠের টুল হাতে ধরে টেনে অবিনাশ যুবকের সামনে নিয়ে এলেন। বসলেন তার ওপর আলগোছে। কথা পাড়লেন, বুঝলে, মিশ্রপিলু আমার প্রিয় রাগ, লাগছে কেমন?

যুবক বইটি বন্ধ করে শুধালো, কণ্ঠস্বর তার যথেষ্ট সাহসী, আমি কি আপনার সামনে একটা সিগারেট খেতে পারি? আসলে সারাদিন এই ঘরে প্রায় বন্দীর মতোই—

—নিশ্চয়ই যাবে, একটা কেন, দাঁড়াও আমিই দিচ্ছি। এই বলে কয়েক পা হেঁটে নিজের টেবিলটার কাছে গেলেন অবিনাশ। ড্রয়ার টেনে একটা বড় সোনালি প্যাকেট বের করলেন সেখান থেকে। কিংসাইজ গোল্ডট্রেক্স। তারপর যুবকের কাছে এসে এগিয়ে দিলেন প্যাকেটের খোলা মুখটি, এখন

উদ্যত সেই সিগারেটখানি, একটি উদ্যত রিভলবারের চেয়ে যেন অনেক বেশি ধারালো।

ক্ষিপ্রহাতে যুবক প্যাকেট থেকে টেনে নিল সিগারেট। অবিনাশ তাঁর পরে থাকা ফতুয়ার পকেট থেকে লাইটার বের করে ফস করে জ্বালিয়ে তুললেন আগুন। তারপর পুড়তে লাগল দুটি সিগারেট—

ফের উঠে গিয়ে অবিনাশ বড় টিউবখানা নিভিয়ে দিলেন, সুইচ অন করে জ্বালিয়ে তুললেন ছোট একখানা পুণ্ডর পাওয়ারের ডুম। ফলে আচ্ছন্ন আলোয় পরিবেশ অপস্রীয়মান যেন। টুলের ওপর বসতে বসতে তিনি বললেন, এই সিগারেট নিয়ে সুকান্ত ভট্টাচার্য যে কবিতাটা লিখেছিলেন তা তুমি জানো না?

—অন্য একটা জানি—

কিরকম?

—আকাশে আকাশে ধুব তারায়/কারা বিদ্রোহে পথ মাদায়/ভরে দিগন্ত দ্রুত সাড়ায়/ জানে না কেউ—

—লাইনকাটি যে আমাদের 'মুখ্যমন্ত্রীর খুব প্রিয় সে কথা জানতে পারলাম এই কদিন আগে ২৩.৭.২০০২ আনন্দবাজার পড়ে। কী লিখেছে জানো, লিখেছে 'জ্ঞানে না কেউ' লাইনটির জের টেনে 'সত্যি কেউ জানেন'। সুকান্ত ভট্টাচার্যও জানতেন না, জানবার দরকারও তাঁর হত না। তবে কেবল পদ্যে-পয়ারে-অমিতাক্ষরে পাউলিন প্রতিফলিত করাতে হত। তবু বিদ্রোহের একটা আঁচ পাঠকের মনে, বিশ্বাসীর মনে উজ্জ্বল রাখতে হত। কিছুদিন আগে পর্যন্ত তাঁর মহামহিম আত্মপুত্রের প্রিয় পঞ্জিক্তিও ছিল এগুলি। প্রায়শ আওড়াতে। কেমন ছিল তাঁর কাছে বিদ্রোহের চেহারা? বিনা বিচারে আটক রাখার কালা কানুন 'পোকা'কে অর্ডিন্যান্স করে নিয়ে আসা? সত্তরের দশকের কালো দিনগুলি। ফিরে আসতে না দেওয়ার প্রতিজ্ঞাদৃঢ় অঙ্গীকার? হিংসা এবং সন্ত্রাসের হাত থেকে রাজ্যের সুনাগরিকদের সুরক্ষা দেবার সুরাজ? হয়ত? পড়ে?।

—না। খবর কাগজ আজকাল আর পড়তে ইচ্ছে করে না। সত্যি খবর তো আর কোথাও ছাপা হয় না, সব একপেশে, শাসকালের কাছে বোধহয় মাথা বিকিয়ে তবে চলছে ওইসব কাগজ। মাঝেমধ্যে চোখে পড়ে গেলে, উন্টেপাণ্টে দেখি না যে তা নয়। এই রাজনৈতিক পক্ষপাতের কারণে এক ধরনের ইয়লো জানলিজমই চলছে আমাদের এই বাংলায়। বলুন, মিথ্যে বলছি?

অবিনাশ কোনো উত্তর করেন না, শুধু নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকেন যুবকের দিকে, কী যেন দেখতে চান।

যুবক বলে, ওই কবিতার লাইনগুলিও পড়ে শিখিনি। আমাদের কলেজে এস এফ আই-এর ছেলেরা শ্লোগানে ব্যবহার করে, দেওয়াল লেখে। তাই থেকে।

অ্যাসট্রের মধ্যে সিগারেটের শেবাংশ শূঁজে আগুনটা নিভিয়ে দেয় ছেলটি। তারপর এমনভাবে নিশ্বাস নেয় যেন এতক্ষণ দম বন্ধ হয়েছিল। ঘরের মধ্যে বন্ধ হয়ে থাকা ধোঁয়া যেমন জানালা খোলা পাওয়া মাত্র ভর ভর করে বেরোতে থাকে তেমনি একটা আগল খোলা ভাব ওর ঠোঁটের আড়ে উকিঝুকি দিতে থাকে। বোঝা যায় অনেক কথা বলার আছে বলতে চায়। বলতে শুরু করলে দু'একঘণ্টায় শেষ হবার নয়। কিংবা বলেই বা কী হবে, সেটা সেও বোঝে। কিন্তু ফুঁসে ওঠা জ্বালাতোতের মতো যদি পাড় ভেঙে প্রাণন না বেরিয়ে আসতে পারে তবে তারই বা মুক্তি কোথায়?

ঘরের মধ্যে একটা সুচীভেদ্য নৈঃশব্দ, কোনো কথা নেই কারো মুখে। অবিনাশ ভাবছেন, কিংবা স্বগতোক্তির মতো আপনমনেই ততোধিক নৈঃশব্দে আউড়ে যাচ্ছেন, থোকা তুমি ছেলমনুষ, তুমি আর কতটুকুই বা জানবে যে পলিটিক্যাল অ্যাগ্রিগ্রেসন কাকে বলে। রাজনৈতিক আগ্রাসন এক মারাত্মক ব্যাপার। সে কথা অবিনাশ ছাত্রদের পড়াছেন কলেজে, অবসর নেওয়ার আগে পর্যন্ত। তারা সব মুখস্থ করত, পরীক্ষার খাতায় নম্বর পেয়েছে ভালো কিন্তু কজন ছাত্রই বা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে। যদি পারত তবে রাজনৈতিক অঙ্গতার প্রসার কি আর আমাদের দেশে এই পর্যায় পর্যন্ত হতে পারত। তার ওপর কম্যুনিষ্ট অ্যাগ্রিগ্রেসন, সে আরো ভয়াবহ জিনিস। 'স্বাধীনতা, তা যে কোনো ফর্মেরই হোক না কেন, কিংবা নাগরিকের মৌল অধিকারগুলি, সবই ওরা গিলে খেয়ে শুধুমাত্র ছিবড়েটুকু ফেলে রাখে। সেই ছিবড়েতে না থাকে রস না থাকে স্বাদ। দেশীয় সম্ভাবনার সব দিকগুলিকে কুক্ষিগত করে ধীরে ধীরে একনায়ক হয়ে উঠেছে যুগে যুগে। যেখানে ক্ষমতায় থেকেছে কয়েক বছর কায়ম করেছে ফ্যাসিবাদকে। এমন কি পারলে ওরা প্রত্যেকটি পাখিকেও ছেঁটে ডানাহীন পেঙ্গুইন করে সাজিয়ে রাখে দেশের সংসদীয় ব্যবস্থায়। কেন না আজকাল সাফাই গাইতে ওরা নিজেদের সোসাল ডেমোক্র্যাট বলে অভিহিত করছে। থোকা, সাম্প্রতিক খবরাখবর তুমি কতখানি রাখো জানি না, তুমি কি জানো এ রাজ্যের বিগত ২৫ বছরের ইতিহাস লেখার আয়োজন করছে ওরা খোলনলচে সম্পূর্ণ বদলে। এশিয়ান স্টাডিসেন্টারের সঙ্গে রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে ওরা নতুন ইতিহাস লেখাচ্ছে সব পেটোয়া ইতিহাসকারদের দিয়ে। নেতৃত্ব দিচ্ছেন কেন্দ্রীয় ফেরৎ বামপন্থী ইতিহাসবিদ বরুণ দে মশাইকে দিয়ে। এইবার ভাবো, চীন বা রাশিয়ার কম্যুনিষ্ট জমানায় রচিত ইতিহাসগুলির কথা। তার তো না আছে মাথা না মুণ্ড। কোথাও ধড়টাই বেমানাম বেপান্ত। সেই গাঁজাখুবি, পক্ষপাতদুষ্ট বইগুলিকে ইতিহাস জ্ঞানে পড়তে হবে যত কচিকাঁচা হবু ছাত্রছাত্রীদের। এভাবেই গড়ে উঠবে নাগরিকেরা। তুমি আমি প্রতিবাদ করে এই সিস্টেমের বিরুদ্ধে কিইবা করতে পারি। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে একজন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বা জীবনানন্দ দাসের কটা স্ট্যাচু দেখতে পাও তুমি, আর মোড়ে মোড়ে তার বদলে সুকান্ত ভট্টাচার্যের মর্মরমূর্তি কেননা রাজ্য সরকারের সংস্কৃতি দপ্তর কবি ও কবিতাকে মর্যাদা দিয়ে আসছে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই। রাশিয়ায় কম্যুনিষ্ট শাসনের সত্তর বছর ধরেই এভাবে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন লেখক-শিল্পীরা। আজ সোভিয়েত পতনের পর প্রবাদ প্রতীম সমাজবাদের প্রবক্তা ম্যাক্সিম গোর্কিকে আর কেউ পথ প্রদর্শক লেখক বলে সম্মান করে না। বরং লেলিনেব জাবকুল শিরোমণি হিসেবেই বর্জন করা হচ্ছে। আর পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে ওই দীর্ঘকাল ধরে যাদের নিষিদ্ধ করা হয়েছিল সেইসব রচনাকারদেরই রচনা। যাদের মধ্যে অন্যতম হলেন ইসাক বেবল, কবি ডম্‌পি, মাদেলস্তাম, ঔপন্যাসিক আর নাট্যকার বুলগাকভ এবং ইত্যাদি। কত বলব তোমাকে, পারলে ওরা মাথার ওপরকার ওই আকাশটাকেও পাস্টে দিতে চায়। আর এইসব স্বৈচ্ছচার বা স্বৈরাচারের নাম ওরা দেয় সাংস্কৃতিক বিপ্লব।

যুবক চুপ হয়ে বসে থাকে দেওয়ালে পিঠ ঠেসে, হয়ত তখনো বুকের ভেতর গজরাচ্ছে হাজারটা প্রশ্ন। জিজ্ঞাসার জের।

টোবিলের কাছে উঠে গিয়ে কলিং বেলে চাপ দিলেন অবিনাশ। বেশ কয়েকটি ঘর অতিক্রম করে এই ডাক গিয়ে পৌঁছবে রান্স ঘরে। একতলায়

এ বাড়ির পনেরো বিশ বছরের পুরাতন পরিচারিকা সরযু এসে চা দিয়ে যাবে দু'কাপ। উষা সেই চায়ের কাপে নিঃশব্দে চুমুক দিতে দিতে ফের কথা শুরু হতে পারে।

কর্মজীবন থেকে অবসর নেওয়ার বহু আগে থেকেই অবিনাশ প্রকৃত অর্থে যাকে কর্মজীবন বলা উচিত সেখান থেকে 'স্বৈচ্ছায়' অবসর নিয়েছিলেন। তা প্রায় কুড়ি বছর আগেকার কথা। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের নায়ক অবিনাশ মুখার্জি সরে এসেছিলেন খানিকটা বীতশ্রদ্ধায়। মতান্তরে; খানিকটা ক্লান্তি বা প্লানি থেকে। বিয়ে করেননি, হয়ত ফুরসৎ পাননি বলেই। নিজে যে ফিলসফিক্যাল ইউটোপিয়ায় বসবাস করতেন তার সঙ্গে সায়ুজ্যপূর্ণ কোনমেয়ের সাথে আলাপ ঘটেনি হতে পারে, কিংবা ঘটলেও তার পরে মনে হয়েছে ভুল হতে যাচ্ছিল। সরে এসেছেন এভাবে। কেননা বিবাহ মানে তাঁর কাছে Marriage of two identical souls —এভাবেই ভেবেছেন তিনি। ধীরে ধীরে সেই সরে আসা বৃহত্তর গতিপথে ঘুরাবর্ত হয়েছে। স্বৈচ্ছানিবাসনে এসে একাকিত্বের প্রকৃত স্বাদ পেয়েছেন তিনি দেখেছেন তার তুলনা একমাত্র সেই। নিরবচ্ছিন্ন এই একাকিত্বের প্রাচীরে ফাটল ধরানোর চেষ্টা কোনো গোপ্ত্রী দল বা ব্যক্তি যে করেনি তা নয়। অনেকেই এসেছে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও বৈদম্ব্যকে কাজে লাগানোর অভীক্ষায়। যদি ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় কোলাহলের মধ্যে আবার। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয়নি। কলেজ এবং ছাত্রছাত্রী নিয়ে, পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত থেকেছেন অবিনাশ। সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, বিতর্কসভায় গিয়েছেন আগের মতোই বক্তা হিসেবে। আমন্ত্রণে কিন্তু কোনো সমাবেশ থেকে দূরে সরে থেকেছেন। আগুনঝরা কথার পরিবর্তে শীতলস্বরে অ্যাকাডেমিক ভাষণ দিয়েছেন তিনি। রাজনীতির কথা উঠলে প্লেটোর সমর্থনে তিনি বলেছেন Running by the wisest-এর সমর্থনে। কিন্তু বিতণ্ডা এড়িয়ে চলেছেন। কথায় বার্তায় পোশাকে আশাকে, ইঁটাচলায় পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে ওই কাদা ছোঁড়াছুড়ি, হাতাহাতি মল্লযুদ্ধ কিংবা রাজনৈতিক প্যাঁচপয়জার থেকে তিনি অনেক দূরে অবস্থান করছেন। করেছেনও চিরকাল তাই। যখন রাজনীতি বলতে বোঝাত দেশের কাজ তখন ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। যখন দেখেছেন সহকর্মীদের মধ্যে বেনোজল ঢুকে পড়েছে তখন যথেষ্ট সতর্ক হয়ে আড়াল করেছেন নিজেকে। সংরক্ষিত রেখেছেন দৃশ্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বলে। লড়াইয়ে গিয়ে দেখেছেন ধীরে ধীরে তিনি কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন দলে। এল পাওয়ার পলিটিক্সের যুগ। দুর্নীতি বা করাপসান ২.০মারীর আকার নিল। লড়াইয়ে বার বার পরাজিত হতে লাগলেন। সন্ধি বা গোপাষ করার আমন্ত্রণ আসতে লাগল বিজয়ী পক্ষ থেকে। সতীর্থবা অনেকেই ভালোমন্দ বিবেচনা করে সুবিধেমাতো শর্তে বাজি হয়ে গেলেন। কেউ প্রকাশ্যে, কেউ গোপনে। কাউকে বা মার্ভার করে, গুমখুন যাকে বলে, সরিয়ে দেওয়া হল। কেউ হয়ে গেলেন নিখোঁজ। হঠকারিতার পথে না গিয়ে নিজেকে সরিয়ে নিলেন অবিনাশ। আদর্শ নেতা বা জননায়ক নয়, তিনি চেষ্টা করলেন সামান্য একজন মানুষ হয়ে প্রকৃত না হোক অন্তত আপাতভাবে সং জীবন যাপনের পথে ফিরে আসতে। নিজেকে তাঁর এই সবিয়ে নেওয়ায় সবাই আশ্চর্য হয়েছিল বটে, ওজর হিসেবে ডিপ্লোম্যাটিক্যালি অবিনাশ দেখিয়েছিলেন শারীরিক অজুহাত। তাঁকে যারা জানতেন তাঁরা পীড়াপিড়ি করেননি, অব্যাহতি পেয়েছিলেন। বোধহয় দিয়েও ছিলেন সম্যক বিবেচনা করে। কেননা তাঁরা দেখেছিলেন রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্যরপদ কত সহজেই লোকটা ছাড়তে পারে, জেলা সম্পাদকের লোভনীয় প্রস্তাবও

লোকটাকে টলাতে পারেনি। বৃথা চেষ্টা করে কি লাভ, তারচে ঠাণ্ডা হয়ে যদি নিরপেক্ষ অবস্থানে থেকে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়, মন্দ কি। অবিনাশ ক্লাশ নিয়ে পঠন পাঠন নিয়ে ব্যস্ত থাকলেন কিছুকাল। তারপর রিটার্মেন্ট। এইবার প্রায় সর্বক্ষণের তীর্থক্ষেত্র হল তাঁর তেতলার পিছনের কোণে পড়ে থাকা এই নির্জনতর লাইব্রেরি বা স্টাডিয়ামটি। নানা রকমের বই এখানে। অস্কার ওয়াইল্ড, বার্নার্ড শ, রাস্কিন, গান্ধী, টলস্টয়। একালের কডওয়ালের 'স্টাডিস ইন আ ডায়িং কালচার বার্টিগু রাসেলের 'হাজ ম্যান আ ফিউচার' গর্কির 'চাইল্ড'। আরো কত টপিক্যাল বুকস। তার সঙ্গে গ্রামোফোনে বেজে ওঠে যত প্রাচ্য পাশ্চাত্যের মার্গ সংস্কীত, 'ইনস্ট্রুমেন্টালস'। শালিয়াপিনের বেহালা শুনতে ভালোবাসেন বটে কিন্তু বব ডিলান সম্পর্কেও তাঁর কোনোরকম শুচিবাইগ্রস্ততা নেই। নুরজাহান বা রসলুন বাদি তাই পছন্দের শিল্পী। ভালোবাসেন সায়গল, পঞ্চজ মল্লিক, আববাস উদ্দিনের সঙ্গে সময় কাটাতে। দেশ বিদেশের ইতিহাস, সে সব দেশে না গিয়েও যে কোনো পর্যটকের চেয়ে কম জানেন না। লুপ্ত জাতি ও নিপীড়িত নিগৃহীত নিকপায় মানুষের জীবন আলেখ্য। তিনি গোগ্রাসে গিলতে ভালোবাসেন। এককালের বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মী হলেও ভারতবর্ষের রাজনীতিতে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এতকালের মধ্যে তাঁর পক্ষপাত ইন্দীরা গান্ধীর প্রতিই; যদিও সমালোচনা আছে ভুরি ভুরি। সাহস আর মেরুদণ্ডের পক্ষে এতকাল সওয়াল করে লোকটা কীভাবে সবকিছু থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিল এবং থাকতে পারল সেই নীরবতায় অবচল তা রীতিমতো সন্দেহের ব্যাপার। কিন্তু ঘটনা যা তাকে অস্বীকার করে কী লাভ। না, সাধু-সন্ন্যাসী হয়ে বা বৈরাগীর পথে চলে যাওয়াটাকে তিনি কাপুরুষতাই মনে করেন এবং নিজেকে যে নাস্তিক বলে গলা তুলে প্রচার করেন তাও না। নিজেকে বিশ্বাস করেছেন মনে মনে ফলে একাকিত্ব অসহনীয় মনে হয়নি তাঁর কাছে। তাছাড়া স্বৈচ্ছ্য আলোপ আলোচনার জন্য যদি কেউ তাঁর কাছে আসতে চেয়েছেন তাঁদের জন্য দ্বার অব্যাহত রেখেছেন তিনি। শুনেছেন তাদের কথা। মনে করলে নিজের মতামতও ব্যক্ত করেছেন কখনো। যাঁদের শুনে ভালো লাগেনি তাঁরা আর উৎসাহ বোধ করেননি, যাঁদের লেগেছে তাঁদের কেউ কেউ এসেছেন মাঝেমধ্যে। অসমঞ্জ এদেরই একজন। সম্প্রতি এই তরুণ যুবার স্বচ্ছ স্বাভাবিকতা কখনো মুগ্ধ করেছে অবিনাশকে। বয়সে অর্ধেকের চেয়ে কম হলেও এই অসমঞ্জ বন্ধুর মতো এগিয়ে এসেছে তাঁর নিঃসঙ্গ নিরাময়ে। বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনো করেছে। ছেলে স্বভাবতই যুক্তিবাদী। কিন্তু প্রয়োজনীয় আবেগের কোনো অভাব নেই তার মধ্যে। বহুদিন পর এই অসমঞ্জই সেই ব্যক্তি যার সঙ্গে এমনকি রাজনীতি নিয়েও তর্কাতর্কি করে ফেললেন একদিন। পরে এই আলোচনা নিয়মিত হয়ে এল। অসমঞ্জ প্রায় প্ররোচনাতেই বহুকাল পরে লাইব্রেরি ন্যাশনাল, লাইব্রেরিতে আসতে হল অবিনাশকে। সবুজ ঘাসে ছাওয়া মাঠটি, প্রস্তুতিত শীতের গোল ডালিয়া ফুলগুলি কিংবা ক্যান্টিনে বসে কাপের পর কাপ সস্তা চা ততোধিক সস্তা ফ্রি-স্টারহীন ন্যাডা সিগারেট আবার যেন পুরনো নেশায় ফিরিয়ে আনলো অবিনাশকে। নবযৌবনে প্রাণ পেলেন তিনি। একজন একজন করে নতুন নতুন ছেলে-ছেলেকাদের সঙ্গে আলোপ হচ্ছে এভাবেই, কেউ থাকে কেউ ফস্কে যায়। অসমঞ্জের অদ্ভুত এটা যোগাযোগ, বহু লোকজন জানে চেনে, মুখের ব্যবহারটিও তার তেমনি শুভিমধুর। মাঝেমধ্যে সদলবলে চলে আসে ওরা তিনতলার এই স্টাডিয়ামে। কেউ বা গল্প করে ইতালীর চলচ্চিত্রকার ডিসিকার টু উইমেন

নিয়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও নাৎসি নিগ্রহ মোরাভিয়ার উপন্যাসে কেমন ছিল, পরিচালক কীভাবে রিক্রিয়েট করেছেন তার বিষয়ে। কেউবা বলে ওঠে, 'সবেপরি নায়িকা সোফিয়া লোরেন একেবারে সুপার্ব। ইন্টারনাল অ্যাগোনিক চমৎকার কাজে লাগিয়েছেন। হয়ত কেউ তুলল বার্গম্যানের 'দা আইস অ্যান্ড ছাইসপার' কিংবা 'সাফারিংস' ছবির প্রসঙ্গ। সদ্য ক্যালকাটা ফিল্ম ফেস্টিভেল শেষ হয়েছে অবনীমাধব ইংলিশ কাগজে লিখবে রিভিউ আর্টিকল। মনদিয়ে মনোযোগ সহকারে সব শোনে অবিনাশ। একদিন ওদের সঙ্গে নন্দন থিয়েটারে গিয়ে জ্ঞাপানের ছবি 'রেড বিয়াড' দেখে এসেছেন। পরিচালক কুরোসোয়া। বহু আগে এই পরিচালকের বহুখ্যাত ছবি 'সেডেন-সামুরাই' দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়ে একটি ফিল্মক্লাবের মেম্বারও হয়েছিলেন অবিনাশ, মাঝেমাঝেই এইসব ওয়ার্ল্ড ডিরেক্টরদের ছবি দেখতেন। চ্যাপলিনের 'গ্রেট ডিকটোর' বার্তোলুচির 'লাস্ট এম্পারর' এইসব ছবি দেখে বেড়াচ্ছিলেন। কিন্তু রাজনীতির খাতায় নাম লেখানোর ফলে সেই মেম্বারসিপ রিনিউ করা হয়নি আর। ছবি দেখাও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল কাজকর্মের নানা চাপে। নাকি স্বাভাবিক বিয়ে করে স্টেটসে চলে গেলে ছবি দেখায় ভাটা পড়েছিল তাঁর সেকথা আজ আর তেমনভাবে মনে পড়ে না। আসলে এক সময়ের সাংঘাতিক প্রয়োজনীয়, যে কোনো কিছুই কালের নিয়মে পরবর্তীকালে অবাস্তব বা অর্থহীন মনে হতেই পারে। খোদ নোবেল পুরস্কারকেই বার্নার্ড শ'র একবস্তা পটা আলুব তুল্য বলে মনে হয়েছিল। যাই হোক, জীবন কখনোই এক জায়গায় থেমে থাকে না। দমকা বাতাস, ঝড় যে কেউ এসে লম্বভণ্ড করে দেয়। পরিবর্তনের ডেউ তুলে সবকিছু অন্যরকম করে দিতে পারে। দফায় দফায় তেতলায় চা পাঠানোতে অভ্যস্ত হয়ে যেতে হয় পরিচারিকা সরযুকে। কখনো যে সে ট্রেভার্সি চায়ের কাপ আনতে বিরক্ত হয় না তা নয়, তবে একধরনের শুভেচ্ছাও থাকে তাব। বিশেষ করে এ বাড়ির এতকালের পুরনো কাজের লোক হিসেবে বাড়ির প্রতি এক ধরনের মায়ামোহ তৈরি হয়েছে বৈকি। আর সেই জায়গা থেকেই এতগুলো ছেলেছোকরার উপদ্রব থেকেও সে সের্জকাকা অবিনাশের ভালো থাকার উপাদান টের পেয়ে যায় সহজেই। একদিন অনেক রাত অন্ধি আলোপ-আলোচনা চালিয়ে অসমঞ্জই বলে ফেলল, স্যাব, এত বাতে আর বাড়ি না গিয়ে যদি এইখানে ওয়ে যাই খুব কি রাগ করবেন—

তৎক্ষণাৎ অবিনাশ বলে উঠলেন, না না। কিন্তু খাওয়া দাওয়া, দাঁড়াও সরযুকে ডাকি।

—না না তার দরকার নেই। তাকে আবার বিরক্ত করা কেন, সারাদিনের কাজের পর পিসি সবে হয়ত ঘুমোতে গেছে। একরাত না খেয়ে শুয়ে পড়লে এমন কিছু—

—দাঁড়াও তবে, দেখি ওঘরে খাবার টেবিলে আমার জন্য যা ঢাকা দিয়ে গেছে তাই দু'জনে মিলে, রাতে কিন্তু আমি রুটি খাই—

—ঠিক আছে স্যার, তারই দুটো দুটো করে—

—তবে এসো, আগে খেয়ে নেওয়া যাক। পাশের ঘরটাই আমাব শোবার ঘর। এখানে হয়ত দু—একটা মশা লাগতে পারে। মশারীর ঝামেলায় না গিয়ে বরং শুডনাইট বা ম্যাট জ্বলিয়ে দেব। ক্যাল জ্বললে মশা থাকবে না। এসো, খেয়েদেয়ে তারপর গল্পো করা যাবে।

খেতে খেতে অসমঞ্জ বলে উঠল, কিন্তু স্যার এতগুলো ছেলে যার উৎসাহে এদেশে আশ্রয় বন্দীদানে এগিয়ে এল, বলল, চীনের চেয়ারম্যানই আমাদের চেয়ারম্যান সেই মাও জে দংই তো ওদেশে নিজের আদর্শ

তৈরি হওয়া এনাকিস্টদের 'খুলে রাজনীতির শিকার' আখ্যা দিয়ে রেড গার্ডের মুখে গুলি করে উড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সে কথাও তো সত্য।

চূপ করে খেতে থাকেন অবিনাশ। আসলে প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে বিদ্রোহীদের অ্যান্টিসোসাল আখ্যা দিয়ে সাফ করে দেওয়ার রীতি সময় বিশেষে সকলেই ফলো করেছে।

মিস্ত্রিহীন বিশ্বাদ ডায়াবিটিশ সন্দেশ মুখে পুরলেন অবিনাশ। চশমা খুলে চোখ দু'খানি রগড়ে নিলেন। তারপর বললেন, সে কথা তো ঠিকই। ব্যর্থতার বীজ যে কোথায় লুকিয়ে আছে তা উদ্ধার করতে বোধহয় আরো সময় লাগবে আমাদের। টাইম ইজ দ্য বেস্ট হিলার। চীনের পথ বা মাওবাদীদের তখন ভালো লাগেনি বলেই আমরা নিউলি ফর্মড সেই সি.পি.আই.এম-এর সঙ্গে থেকে গিয়েছিলাম। পশ্চিম দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি কিংবা তরাইয়ের ডাকে নকশালবাড়ি আন্দোলনে যাইনি।

হ্যাঁ, নকশালবাড়ি আন্দোলনের সঙ্গে অবিনাশ কখনোই জড়িত ছিলেন না। ১৯৫৭-৫৮ সালে ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য হয়েছিলেন একরকম জেদের বশবর্তী হয়েই। বাবা মুরারীমোহন মুখার্জি ছিলেন কট্টর গান্ধীবাদী লোক। সার্বোদয় নেতৃত্বের প্রতি তাঁর ওই আস্থার প্রসঙ্গে ছেলে অবিনাশের সঙ্গে প্রায়ই তর্কযুদ্ধ চলত। ওই চরকা, আবেদন, নিবেদন নীতি, ভারত ভাগ, এইসব প্রশ্ন জরুরি হয়ে উঠত ক্রমশই। যুবক অবিনাশ আবার অনেক বিষয়ে বাবার মতে মতও দিতেন, মানতেন ভারতবর্ষে গান্ধীজি এক অন্যতম অভ্যুদয়। কিন্তু তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রপীড়িত দেশ, পরাধীনতার শ্লাঘা, তৃতীয় বিশ্ব সুপার পাওয়ার আমেরিকার আগ্রাসন বা আশঙ্কা থেকে নিজেদের সুরক্ষিত করার জন্যই হোক বা নবগঠিত সোভিয়েত ইউনিয়নের তুলে ধরা সাম্যবাদী স্বপ্নের সন্ধানই হোক সোভিয়েত রাশিয়ার বামপন্থী জাগরণে আশ্রুত হয়ে উঠেছিল। এখন যেমন সারা পৃথিবী জুড়েই বামপন্থী শব্দটা গালাগাল হিসেবে ব্যবহৃত হয় এমনটা তখন ছিল না, বরং উন্মোচনাবেই লেখক, শিল্পী, সাংবাদিক থেকে শুরু করে যে কোনো স্বাধীন চিন্তকই নিজেকে বামপন্থী বলে অভিহিত করতেন, সম্মানিত বোধ করতেন, সাম্যবাদী আন্দোলনের শরিক হিসাবে নিজেকে তুলে ধরতে পারলে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা বামপন্থী ভাবধারায় উদ্ভূত। এমনকি জহরলাল নেহেরু পর্যন্ত সরাসরি না হলেও নিজেকে সোসালিস্ট বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কে জানত মাত্র সত্তর বছরের মধ্যে সোভিয়েত খান খান হয়ে ভেঙে মুখ ধুবড়ে পড়বে, খুলে যাবে তার মুখোশ, অন্তঃসারশূন্য বাগাড়ম্বর। ওদিকে চীনের অত্যাচার স্বৈরাচার একনায়কত্বেরই সামিল। কিন্তু তার ভয়াবহ বিপর্যয় তখনো ধরা পড়ে নি। চিন্তাবিদ স্বাধীনচেতা মাত্রই বামপন্থী, সেই প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন যুবক অবিনাশ মুখার্জি। এ তাবৎ ন্যাশনালিস্ট পরিবারে এই প্রথম বামপন্থীর অভ্যুরোধাম। বাবা মুরারীমোহন সরাসরি ছেলেকে বাধা দিলেন না ঠিকই কিন্তু সপারিশদ আত্মীয়-পরিজনরা অবিনাশের এই নতুন ভূমিকাকে ধসে যাওয়া জুভেনাইল ডোলনকুইপ্সি বলেই উদ্বেগ করলেন। অর্থাৎ বাচ্চাদের পাগলামি, তরুণবয়স্ক নিষ্ক্রিয়তা। এই ব্যঙ্গ আশুনে ঘৃণাত্বের কাজ করল। ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টিতে যোগ দিলেন অবিনাশ, মেলামেশা আলাপ আলোচনার পরিধি বাড়ল। কেরলে প্রথম বামপন্থী মন্ত্রীসভাকে বরখাস্ত করা, তিব্বতের গোলযোগ, পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য আন্দোলন ইত্যাদি ব্যাপারে আন্দোলনে অংশ নেওয়ার কারণে প্রথমবার গ্রোণ্ডার হলেন অবিনাশ।

আদর্শগত মতান্তরের কারণে ৬৪ সালে সিপি আই এম দলে যোগ দিলেন অবিনাশ তখনই বন্ধু। সহকর্মীদের একাংশ পার্টির নেতৃত্ব কর্তৃক চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ, চীন-সোভিয়েত আদর্শগত প্রম্নে মধ্যপন্থা নেওয়া, ছাত্র ও শিক্ষক আন্দোলনকে তীব্রতর করার ফলে সংসদীয় পথকে মুক্তির একমাত্র পথ বলে প্রচার—প্রভৃতির ফলে পার্টি নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। আজিজুল হক প্রমুখ নেতাদের সি.পি.আই.এম সম্বন্ধে মোহামুদ ঘটাইল। পার্টি থেকে বিতাড়িত হয়ে ওঁরা ৬৭ সালের নকশালবাড়ির কৃষক অভ্যুত্থানের পথে এগিয়ে গেল। ফলশ্রুতিতে ৬৯-এ সি.পি.আই.এম (এল) পার্টির আবির্ভাব ঘটল। এই সময় কলেজে জয়েন করেছেন অবিনাশ সুতরাং সক্রিয়ভাবে বিদ্রোহীদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করা হয়ে ওঠেনি তাঁর। তাঁদের কেউ কেউ যখন গ্রোণ্ডার হচ্ছেন, জরুরি অবস্থার সময় পালাচ্ছেন জেল কর্তৃপক্ষের চোখে ধুলো দিয়ে তখন অবিনাশের সঙ্গে সেইসব রাজনৈতিক কর্মীদের রীতিমতো যোগাযোগ ছিল। কাছ থেকে তিনি দেখেছেন মেধাবী ছাত্ররা কীভাবে উৎসর্গ করেছে প্রাণ, সকালবেলায় কলকাতার অলিগলিতে কিভাবে পাওয়া যেত চেনা-অচেনার লাশ। রাতের হানা কিংবা পুলিশি তাগুব সবই খালি চোখে দেখেছেন। সমর্থন, বিরোধভাস, স্ববিরোধ—এই তিনের দোলাচলে আন্দোলিত হচ্ছেন বারবার। এমতাবস্থায় '৭৭ সালে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হলে রাজ্য রাজনীতিতে তাঁর ভূমিকা সক্রিয় ও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সরকার পক্ষে থেকেও, সংগঠন করেও নকশালপন্থীদের বন্দীমুক্তি আন্দোলনকে যেমন তিনি সমর্থন জানিয়েছিলেন তেমনি পরবর্তীকালে ওরা যখন মনীষি বা শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের স্টাচু রাতারাতি মাথা উড়িয়ে দিয়ে উগ্র কাশ্মীরনতীর পরিচয় দিচ্ছে তখনো অবিনাশ কিছুতেই তার স্বপক্ষে কথা বলতে পারেননি।

খাওয়াদাওয়া এবং ওঘর থেকে স্টাডিরুমে ফিরে আসার মধ্যকার নির্বাক সময়টুকুতে অবিনাশের ভেতর সেই স্মৃতি ও দাহময়তার যেন নবউন্মেষ ঘটল। কোনো কথা না বলে একখানি মশাতাড়ানো ম্যাট হাতে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে, পিছন অনুসরণকারী অসমঞ্জ।

ম্যাট জেলে ফের নিজের শোবার ঘরে ফিরে আসার আগে শুধু বললেন, যুবক স্থির হও। ভালো করে ঘুমোও আগে রাতটা।

অসমঞ্জর চোখে তখন ঠাণ্ডা হাসি।

—আলো জ্বলবে, নাকি সময়মতো নিভিয়ে নেবে

মাথা নেড়ে সাই জানাল অসমঞ্জ।

অবিনাশ বললেন, অ্যাটাচড আছে। ওই যে এক পান্নার দরজা, কোনো অসুবিধা হবে না তোমার। ঘুমোও। শুভরাত্রি।

এইভাবে অসমঞ্জের সঙ্গে এখানে এসে রাতে শুয়ে শুয়ে গল্পগোছা করেছে ওর বন্ধু বিবেক। অর্থনীতির মেধাবী ছেলে। সেই সঙ্গে যুগসচেতন বটে। এই বিবেকের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা প্রগাঢ় হয়েছে অবিনাশের। গতকাল রাতে সেই এসে ছেলেটিকে এখানে রেখে যায়। বলে, স্যার, গড়বেতা থেকে পালিয়ে এসেছে। পিছন পুলিশ, কটা দিন আপনার কাছে যদি রাখা যায়—

মুহূর্তে বুঝে নিতে অসুবিধে হয়নি অবিনাশের। মনে পড়ে যায় সত্তর দশকের সেই দুর্যোগযুদ্ধের সময়ে এমনি এক সন্ধ্যায় একটি অচেনা ছেলে এসে ঘরে ঢুকে পড়ে কিছুক্ষণ লুকিয়ে থাকতে চেয়েছিল পুলিশের হাত থেকে। কিন্তু তখন মুরারীমোহন জীবিত। সংসারে সেজ ছেলে অবিনাশের ভূমিকাও ছিল গৌণ। পারেননি ছেলেটিকে বাঁচাতে। ঘর থেকে বেরিয়ে

এই গলি ওই গলি ছোটাদৌড়ার মাঝে মিনিট দশেকের আগেই শোনা গিয়েছিল বন্দুকের গুড়ুম আওয়াজ। সেই সাহসিকতাহীন অববেচনার জন্য পরে কতবার অনুশোচনা করেছেন অবিনাশ। অপরাধবোধে ভুগেছেন সে কথা যদি বলে বোধনো যেত। তাই কাল সন্ধ্যায় কোনোরকম দ্বিধা না করে ছোট স্বরে বলে উঠেছিলেন, ঠিক আছে। এখানে কোনোরকম ভয় নেই তোমার। এই বলে সরযুকে ডেকে সামনের ময়রাদোকান থেকে গরম কচুরি আর সিঙাড়া আনিয়েছিলেন।

রাতে বিশেষ কিছু কথা হয়নি ছেলেটির সঙ্গে। সন্ধ্যাবেলা এসে পৌঁছানোর দরুন রাতে মাছের ঝোল আর গরম ভাত আনাতে কোনোরকম বেগ পেতে হল না।

পরেরদিন সকালে পাড়ার গুণধর নাপিত যখন রোজ্জকার মতো অবিনাশের দাড়ি কামাতে এল তখন তিনি বললেন, বহরমপুর থেকে এসেছে। আমার ছোটবোন সুশীলার ছেলে। দাঁও তো গুণধর ওর দাড়ি আর ওই বাহারি চুল কেটে ওকে একটু ভদ্রস্থ করে। আর ছেলেটির দিকে চেয়ে কপট রাগের ভাণ করে ভৎসনার স্বরে বলে উঠলেন, চুলদাড়ি রেখে ইনটেলেকচুয়াল হয়েছ! কিন্তু কবিতা লিখে কি আর পেট চলবে নাকি?

গুণধর নাপিতের হাতযশের কৃপায় ছেলেটির ভোল বিলকুল পাশ্টে গেল। এখন এক লহমায় দেখে কে চিনতে পারে তাকে।

—লোকজন এলে খুব বেশি কথাবার্তা বলার দরকার নেই তোমার, বুঝলে! এমনভাবে চুপচাপ থাকবে যেন কম কথার লোক।

মাথা নেড়ে অবিনাশের আশঙ্কায় সায় জানিয়েছিল ছেলেটি।

অবিনাশ দেখলেন এই তো চেহারার যা হাল হয়েছে তাতে করে একে সঙ্গে নিয়ে দিব্যি বাজারে যাওয়া যায়। কিন্তু যেমন ভাবনা তেমনি কাজ তিনি করেননি। ফলে সারাদিনই ছেলেটিকে ঘরের মধ্যে বসে শুয়ে কাটাতে হয়েছে। বড়জোর বিকেলবেলায় খোলা বারান্দায় ঘুরে বেড়িয়েছে সে। বাড়ি ছিলেন না অবিনাশ। ব্যাঙ্কে টাকা তুলতে যেতে হয়েছিল দুপুর দুপুর। সেখান থেকে কলেজ স্ট্রিটে কী যেন কাজ ছিল। কিন্তু অতিথি ঘরে প্রায় বন্দীদশায় আটকে আছে সে কথা ঘৃণাক্ষরেও ভোলেননি। এক মুহূর্তের জন্যও। ফলে সন্ধ্যার অনেক আগেই এসে পৌঁছলেন। ঘরে ঢুকে দেখলেন অগত্যা সময় কাটানোর উপকরণ হিসেবে বুকর্যাকে সাজিয়ে রাখা বইগুলি নেড়েচেড়ে দেখে দু-একখানি নামিয়ে নিজের খাটে বালিশের ধারে সাজিয়ে রেখেছে ছেলেটি।

নৈশব্দের গোলঘোর ভেঙে অবিনাশই প্রথম কথা বললেন, তোমার নামটা কিন্তু এখনো বলোনি ভায়া।

—নাম আমার সুশোভন। সুশোভন ঘোষ। কিন্তু ওখানে আমাকে সবাই ঢকা নামেই ডেনে।

—মেদিনীপুরের গড়বেতায় তোমার বাড়ি?

—হ্যাঁ, তার কাছাকাছি। একটা অজ গাঁয়ে। নামটা বললে চিনবেন। এই বছরখানেক আগে সেখানে ধন্দুমার কাণ্ড ঘটে গেছে। তদন্তে সি বি আই পর্যন্ত এসে হাজির। ছোট আঞ্জুরিয়া—

—ও, তাহলে তো তুমি অনেককিছুর সাক্ষী। জানা যেতে পারে তোমার কাছ থেকে। সেই তৃণমূল সিপিএম কাজিয়ার বিষয়ে জানো নাকি কিছু? ছিলে সেদিন সেখানে?

—হিলাম মানে গুলিগোলা তো রাতের অন্ধকারে চলেছে। সাতখানা বাড়ি আমাদেরই চোখের সামনে দিয়ে বলতে গেলে উধাও করে দেওয়া

হল টুলির ওপর লাশ ভর্তি করে। তারপর শালের জঙ্গলের মধ্যে হাপিস করে দিল ওরা। সবই তো পড়েছেন কাগজে। দেখেছেন নিশ্চয় টিভিতে। অতিরিক্ত গল্পোকাহিনী রানিয়ে প্রচার হয়েছে ঠিকই কিন্তু সারবস্তুতে তো কোনো ফাঁকি নেই। মুখ্যমন্ত্রী তো প্রথমে স্বীকারই করতে চাননি, পুলিশও তাই, যে ওখানে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। দেওয়ালের গায়ে লেগে থাকা বুলেটের দাগ দেখে রাজ্য পুলিশের বিশেষজ্ঞ মহল কী বলেছিল মনে আছে নিশ্চয়, বলেছিল দেওয়ালের গায়ে ওই চিহ্ন প্রমাণ করে সংঘর্ষ হয়েছিল, কিন্তু হত্যাকাণ্ড হয়েছিল সে কথা কীসে প্রমাণ মেলে যখন নিখোঁজ কারো কোনো লাশ এ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি? যখন তাদের প্রশ্ন করা হল নিখোঁজদের খুঁজে বের করার দায়িত্ব তো পুলিশেরই তখন তারা বলল রাজ্য সরকারের সি আই ডি বিভাগ এ বিষয়ে যা করার সবকিছুই করবে। তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি সাহস করে সদলবলে সেখানে হাজির হয়ে বন্দুকে ব্যবহৃত কার্তুজের নমুনা উদ্ধার না করতেন তাহলে প্রমাণ করাই যেত না যে সরকারের এই বিষয়ে মদত ছিল রীতিমতো এবং পুলিশ শাসকদলের হয়েই এই গণহত্যাকাণ্ডে কাজ করেছিল, কেননা যে কার্তুজ পাওয়া গিয়েছিল তা একমাত্র পুলিশই ব্যবহার করে। ওই নেত্রীর দ্বিগ্ন দরবারের ফলেই সি বি আই তদন্তের ভার নেয়। রাজ্য সরকার তো তীব্র আপত্তি জানায়। কিন্তু সি বি আই দায়িত্ব নিলে কী হবে, স্থানীয় পুলিশ সেই তদন্তকারী প্রতিনিধিদলকে সাহায্য সহযোগিতা না করলে কীভাবে তদন্ত হতে পারে? উপযুক্ত সহযোগিতা না পেয়ে তারা যে হতোদ্যম হয়ে দিল্লি ফিরে গেল। ব্যস, ধামা চাপা পড়ে রইল সবকিছু।

সবই জানা ঘটনা তবু প্রত্যক্ষদর্শীর মুখ থেকে শুনতে শুনতে শুধু ‘হুম’ শব্দ বেরিয়ে আসে অবিনাশের মুখ থেকে। কিছুক্ষণ পরে উনি ফের প্রশ্ন করলেন, স্থানীয় লোকজনেরা?

—তারা কী করবে! কারো কি কোনো স্বাধীন সত্তা আছে? ভয়ে দিক-দিশাহীন তারা মুখে কুলুপ এঁটে ঠুটো জগন্নাথের মতো বসে থাকে কেউ, কেউ সুযোগমতো কেটে গেল, ঝুটঝামেলায় নী জড়িয়ে পড়তে হয় এই ভেবে। যে কথা বলবে তাকেই তো খেসারত দিতে হবে। পার্টির কাছে। আইন আদালত তো এইসব লালদুর্গ থেকে কবেই উঠে গেছে। পার্টি অফিসে ধরে নিয়ে গিয়ে বিচার হবে তখন, জরিমানা দিতে হবে। কিংবা যোষিত মুক্তাঞ্চলের কমরেডরা সব গণ আদালত গড়ে বিচার চালাবেন। সে বড় নৃশংস। এসব মুখে শুনে হবে না স্যর, চলুন না নিজের চোখেই দেখে আসবেন। যে করবে সমালোচনা কিংবা বিরুদ্ধ পার্টি, তাদের ওরা দেশছাড়া কববে; পারলে নির্মূল করে দেবে। সে যদি চাষী হয় তার গোয়াল লুণ্ঠ করে গরু চলে যাবে হাটে। এমনকি মাঝরাতে ঘরে শেকল তুলে বাড়ির পর বাড়ি আগুন লাগিয়ে দেওয়া হবে। ক বছর আগে কেশপুর থানার পঞ্চমী গ্রামে তো তাই হয়েছিল। মনে নেই?

এর কোনোটিই অজানা নয় অবিনাশের। অজানা থাকার কথাও নয়। তবু তিনি শুনতে থাকেন। অত্যাচারিতের মুখ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে বেবিয়ে আসা কান্না-ঘাম-রক্তের কথা কেউ মরমী মন নিয়ে শুনলে, সহানুভূতি ও সহর্মিতার সঙ্গে সঙ্গত করা হয়। যে বলছে সে তখন মনের কথা উজাড় করে বলে কিছুটা সাত্বনা খুঁজে পায়। নিগৃহীত লোক তখন মনে করে যে, না আমি একা নই, আমার পাশেও কেউ আছে। সুখ-দুঃখের কথা মন খুলে বলতে পারার মতো শান্তি, স্বস্তি আর কোথায় আছে? এই পঁচিশ বছর গ্রামবাংলার যে কী হাল হয়েছে তার কিছু কিছু অবিনাশ

জ্ঞানেন বৈকি। কখনো খবরের কাগজে পড়ে জেনেছেন, ইংরাজি কাগজ কেউ কেউ তুলনামূলক সত্যি খবর পরিবেশন করলেও করে থাকে এখনো। বাংলা কাগজগুলো সরকারের খামাধরা, আর হবে নাই বা কেন তাদেরও তো দু'পয়সা করে খেতে হবে। দেশোদ্ধার করতে তো কেউ আসেনি, এসেছে ব্যবসা করতে। অতএব দীর্ঘ আড়াই দশক ধরে যদি কোনো শাসক দল দুর্নীতি, ভোটে জাল-জুয়াচুরি, ভীতি প্রদর্শন, ইলেকশান মেশিনারিকে কাজে লাগিয়েই ক্ষমতায় টিকে থাকে তবে তার উচ্ছিষ্টভোগী কিছু সুবিধাবাদী শ্রেণীর শাসনই তো আসলে কায়ম রইল। সংবাদপত্র বা মাসমিডিয়া তো তাদেরই অন্যতম। এই বছরের পর বছর ধরে যে স্বৈচ্ছাচারী সরকার স্থিতাবস্থায় টিকে আছে তার কল্যাণে ওদেরও পেট ভরে বা বাড়বাড়ন্ত হয়। কারই বা সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়। সুতরাং বাংলার সংবাদপত্রগুলি সরকারি বিজ্ঞাপন পাওয়াব লোভে কিংবা অন্যান্য সুবিধা সুযোগের আশায় শুধু যে আত্মবিক্রি কবেই বসে আছে তাই নয় বরং সরকারি প্রচারযন্ত্র হিসেবেই কাজ কবে যাচ্ছে। ছাপা হচ্ছে একতরফা বিপোর্ট। এমনকি শত বছরের বেশি পুরানো ঐতিহ্যশালী কাগজগুলো তাব সঙ্গে তাল মেলাতে কিছুমাত্র বিবেকের তাড়না বা লজ্জা বোধ কবছে না। বরং অত্র খুলে খামটা নাচ নাচার ব্যাপারে তারা যেন এককাঠি দড়। আর কলমধারী বা বুদ্ধিজীবীদের কথা তো না বললেও চলে। এক বোতল মদ ভেট বা পাবার আশ্বাস পেলেই তারা বর্তে যায়। মূল্যবোধহীন, আত্মস্বার্থবাদী এইসব লিখিয়ে রামায়ণেব বিভীষণের মতোই কিংবা বাবু যত বলে পারিষদ বলে বলে তার শতগুণ। বুদ্ধিজীবী কিংবা চিন্তানায়ক হওয়ার দরকার পড়ে না। আমজনতা, পাঠক সাধারণ—যে কেউ খোলাচোখেই চোখ বুলিয়ে ঠাণ্ডার করে নিতে পারে কোন কাগজ কোন নেতা বা দলের হয়ে গাণ্ডা গাইছে। তবু তা সত্ত্বেও খবর কাগজ না পড়ে কী উপায় বিকৃত বা পক্ষপাতপূর্ণ পরিবেশিত খবর। তবু তা সত্ত্বেও বিকৃত বা পক্ষপাতপূর্ণ পরিবেশিত খবর থেকেও অনুসন্ধানী পাঠক ঠিকই খুঁজে নিতে পারে সারবস্তুটুকু। সুতরাং গ্রামের খবরাখবর রাখেন অবিনাশ। অবসরের পর এই কাগজ-পত্র, পত্রিকা, এই সবই তো সঙ্গী। আগার লাইন করে চলেছেন সমানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে। প্রয়োজনীয় কাটিং রাখছেন খবরকাগজ থেকে। ডায়রিতে নোট রাখছেন নিয়মিত। একেবারে সন, বার, তারিখ উল্লেখ করে। কখনো বা উচিত বন্ধু বা সংসর্গে পড়ে কাঁধে ঝোলা নিয়ে বেরিয়েও পড়ছেন। শিয়ালদা বা হাওড়া থেকে লোকাল ট্রেন ধরে। তারপর পায়ে হাঁটা মাঠের পথ বেয়ে কোনো গ্রামের একেবারে কিনারায়। পৃথিবীটা ছোট আব গোল, ফলে স্বয়ংবৃত্তে ফিরে আসতে দেরি লাগেনি তাঁর। গ্রামোন্নয়ন কথাটি দুবার আপনমনে আউড়ে নিলেই ভেতরে ভেতরে হেসে উঠতে হয়। ফলাও করে এরা প্রচার করে, কৃষি এবং ভূমি সংস্কার নাকি অভূতপূর্ব সাফল্য ঘটিয়েছে। কী সেই সাফল্য? একটু খতিয়ে দেখলে চিত্রটা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যায়। মাস্ট্রীয় তত্ত্ব ও তার প্রয়োগ অনুসারে ভূমি সংস্কার হল, তাই জমির অধিকারী হবে একমাত্র কৃষক, যে নিজহাতে চাষ করবে। এবং মধ্যস্বত্বভোগী মালিকানার বিলোপই হল মার্ক্সবাদী ভূমি সংস্কারের মূলে। কিন্তু এরা কী করল, সেই পূর্বাবস্থাকে রায়তী ব্যবস্থাকে একই রাখল।

রইল সাবেক আমলের সেই ভাগচাষী ও ভূস্বামীরা। শুধু উঠবন্দী কৃষকের যে দশা, তার কিছু পরিবর্তন ঘটল। অর্থাৎ পাট্টা তৈরি হল এই

মর্মে যে ইচ্ছে করলেই আর ভূস্বামী ভাগচাষীকে যখন-তখন উচ্ছেদ করে নতুন কাউকে বিলি-বন্দোবস্ত করতে পারবে না। অর্থাৎ জমির মালিক কিন্তু কৃষক হল না। বরং সেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অনুসরণে ছাড়পত্র পেল চিরস্থায়ী কৃতদাস ব্যবস্থাই। মাস্ট্রীয় উৎপাদন শর্ত কিন্তু এই সংস্কারের পক্ষে কোনোরকম সওয়াল করে না। বরং প্রতিবাদ করে। সেই তত্ত্ব বলছে, জমি হল জননী, কৃষক হল পিতা, আর ফসল হল সন্তান। এই তিনের কাছে মালিক নামের আঙ্গুর জন্তুটি কোথেকে এল? আর যদি জোরজব্ব করে কিংবা কৌশলের আশ্রয়ে এনেই থাকে তাহলে সম্পর্কের গুরুত্বা বৃদ্ধি আর কোথায়। তা তো রীতিমত অশুদ্ধ, অবৈধ বটেই। পঁচিশ বছরের এই শাসকদল কিন্তু এই ব্যবস্থারই রমরমা ঘটিয়ে দাবী করছে, ভূমি সংস্কারে তাঁদের নাকি দিগন্তপ্রসারী অবদান। এরা না বোঝে প্রকৃত বান্ধনীতি। না এরাসমপন্থী। বামপন্থাব নামাবলী গায়ে দিয়ে এরা কিন্তু ফিউডাল সমাজ ও নীতিবই পৃষ্ঠপোষকতা কবে আসছে। আব ভাবতবর্ষ যেহেতু কৃষিপ্রধান দেশ সেহেতু গ্রামোন্নয়ন ছাড়া কোনোকিছুই সম্ভব নয়, একথাটাই বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলি প্রমাণ করেছে বারবার। গ্রাম তাই উত্তরোত্তর দুয়োরাণীর মতো অবহেলা অমর্যাদা ধুকতে ধুকতে ক্ষয়বোলে শেষ হয়ে যাচ্ছে। অত্যন্ত সচেতনতাব সঙ্গে এবং পবিকল্পিতভাবে তাকে শেষ কবে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। ছয়াসুনিবিড় শান্তি নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি আর নেই। এখন মানুষজনও কেমন যেন বদলে গেছে। আসলে জীবন ও সমাজ নিয়ে জেববাব, নাজেহাল। তাবাই বা কী কববে? পুজো, উৎসব-অনুষ্ঠান আর আগের মতো নেই, নেই চট্টীমণ্ডপের মজলিস বা হরিটরের জটলা। এখন শুধু রাজনীতি। প্রতি গৃহ থেকে একজনকে মহামিজিলের ডাকে আসতেই হবে। দিতে হবে পার্টিফাণ্ডে চাঁদা মাসে মাসে। সে ভূমি খেতে পাও বা না পাও। যেখানে যে দাপট, সেখানে অন্য দল করার মানে তোমাকে একঘরে হয়ে থাকতে হবে। ভোট দিতে যাবে কি যেতে হবে না, ওবাই দিয়ে দেবে, সেকথা পঞ্চায়েতের দলেব সদস্যরা বা নেতৃত্ব বলে দেবে। তাব যেন অন্যথা না হয়। আর এসব বড়সড় রাজনৈতিক ব্যাপারে বেশি জলঘোলা বা আলোপ-আলোচনা করে নিজের ও পবিবাবের শান্তি বিঘ্নিত করতে চাইলে পবে কিন্তু পার্টির ঘাড়ে দোষ চাপালে চলবে না। রিলিফ ফাণ্ড বা পঞ্চায়েত এলাকার সুবিধে-সুযোগ তারাই পাবে, চাকরি বা কৃষিলান কিংবা উচ্চফলনশীল বীজ ও যন্ত্রপাতি কেনার টাকা অনুদান হিসেবে তারাই পাবে, যারা পার্টির অনুগত। শান্তিপ্রিয় মধ্যবিত্ত কংগ্রেসিরা এভাবেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। মাথা তুলে দাঁড়াতে দেওয়া হয়নি তাদের। কেউ কেউ গ্রাম ছেড়ে কাজকাজি শহর, মফস্বল বা নগরে উঠে গেছে জমি কিনে দু'কামরা ঘব গুঁথে। ছেলে-ছেকরারা চাষ ছেড়ে চাকরিব সন্ধানে ছুটেছে। স্কুলঘরে, মণ্ডপে এখন পার্টির গোপন মিটিং হয়, রামায়ণ-শিবায়ন-যাত্রা বা ক্লাবের অ্যামেচার গ্রামীণ সংস্কৃতি শাশানে চলে গেছে। মানুষে মানুষে সন্দাব নেই, সবাই একে অপবকে সন্দেহ করে। কে কখন আড়ালে-আবডালে গুনে গিয়ে কানভারী করবে লোকাল কমিটির। ব্যস। জীবন অতিষ্ট হয়ে উঠবে। পদে পদে গ্রামবাসীরা তাই ভীত, সঙ্কস্ত।

সুশোভন চুপ করে ছিল। অবিনাশ বলল, লেখাপড়া ভূমি কতদূর করেছে। নাকি এখনো করছে?

—না। কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম। ঠিকঠাক চললে এইবছর বি এস

সি পাশ করতাম। কিন্তু বাবা মারা গেলে আর হল না।

—কী হয়েছিল বাবার?

—কাশবোগ। বিড়ি বাঁধাব কাজ করত। যোল-সতেবো বছর একটানা। এই কাজ কবাব ফলে তামাকের গুঁড়ো ঢুকে পড়ত। বিড়ি বাঁধার এই কিপদ। খুক্ খুক্ কাশি আব মসলা ঢোকানো পাতাব খোলে। ওই তামাকের গুঁড়ো আর গুঁকনো লঙ্কার গুঁড়ো স্যার একই রকমেব। মা কতবার বলেছিল, ছেড়ে দাও এই কাজ। কিন্তু তারেকটা কাজ জোগাড় না হলে কী করে ছাড়া যায়? আর ছাড়লে ঘব-গেরস্থ চলবে কী কবে। চেষ্টা বাবা করেনি তা নয়, কিন্তু ওই গাঁ-গেরামে কী আজ আর কাজ দেবে বলে বসে আছে। এক মিষ্টি দোকানে বাবা কাজ পেয়ে বিড়িবাঁধার কাজ ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু ছ'মাস যেতে না যেতেই সেই দোকানদার দূর দূর করে খেদিয়ে দিল বাবাকে চোর অপবাদ দিয়ে। আমি সেই ছোট বয়সে বাবাকে যতটা চিনেছিলাম তার মতো ভালোমানুষ আর হয় না। কথা শুনে তো বাবা কান্দন-মাদন হয়ে ঘরে ফিরে এল। ক'দিন কাটল শুয়ে বসে। তারপর আবার সেই সুখেন বায়ের বিড়ির আড়তে যোগাযোগ করতে তারা বলল, আবাহনও নাই বিতাড়নও নাই। যেমন বসে পড়তে সেরেস্তায় মসলা-পাতা-সূতা নিয়ে, বসে যাও। বাবা বলত, বিধিলিপি। মা বলে, আমার কপালে সুখ লেখেনি বাছ। তোর বাপই আর কী করবে। বাবার ইচ্ছে ছিল না, মায়ের শুখেই আমার পড়াশুনো। টেনেটুনে সংসাব কোনোরকমে চালিয়ে পড়াত মা—

—তোমাদের জমিজমা কিছু ছিল না? চাষবাস?

—না। দাদুর দু'চাব বিঘা জমি হয়ত ছিল। কিন্তু মাকে দাদুর অমতে বিয়ে করার পর বাবা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে। দাদুও আর ডাকেনি। তাজ্জড়া সেসব জমির কি আর অবস্থা এক আছে। পার্টি দখল নিয়ে বিঘাদুই নাকি খাস বেনাম ঠাউরে ভূমিহীনদের মধ্যে বিলি-বন্দোবস্ত করে দেয়। বাকি যা আছে জেঠু দখলে রেখেছে। ভূমিহীন কে, কার নিয়ে কাকে দিচ্ছে, সে তর্ক আর কে করতে পারে স্যার?

—অবিনাশ বললেন, এখানে যদি তোমার জন্য ছোটখাটো কোনো কাজ জোগাড় করা যায়, অল্প মাইনেতে তুমি করবে?

—সে আর বলতে স্যাব তবে তো বেঁচেই যাই।

তাহলে তোমার রাজনীতির কী হবে?

—রাজনীতি তো আমি করি না স্যাব, গরিবের কি আর ঘোড়ারোগ সাজে, বলুন? আসলে বললাম না—

—তাহলে পুলিশ তোমাকে তাড়া করছে কেন?

—বলছি তো স্যার, গাঁয়ে যান। দু'মাস থেকে দেখুন, সেখানকার অবস্থাটা কি। রাজনীতি কবার খেয়ালে সাধারণ মানুষ সেখানে খেঁট পাকায় না, যদি কিছু কবে তাঁকে তবে কবে মানসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকার লড়াই। এখন তার নাম যদি রাজনীতি হয় তাব আব কী করা যাবে বলুন। যারা ওই লালপাটি করে তারা বা তাদের আত্মীয় পরিজনরাই সুবিধা-সুযোগ ভোগ করে, যারা করে না তারা সব দিক থেকেই বঞ্চিত। ওই বঞ্চনা ধীরে ধীরে নিগ্রহেব দিকে চলে যায়। ফলে বাকিরাও শান্তি বজায় রাখতেই হোক আর টিকে থাকার কারণেই হোক, তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। তিতিক্ষায় জীবন যন্ত্রণায় যে ক'জন মেকদশ সোজা করে বাঁচতে চায় কিংবা আপোষের পথে না গিয়ে নিজের মতো থাক চায়, তাদের ওরা কখনো বাড়খশী, কখনো তৃণমূল, কিংবা জনযুদ্ধ বলে চিহ্নিত কবে

একটা ছয়াযুদ্ধ চালিয়ে তৃপ্তি পায়, জরী হয় কিংবা বাহাদুরি দেখায়। সেই লড়াইয়ে মাথা বাঁচাতে বাধ্য হয়ে বিরোধীপক্ষেব ভূমিকায় আসরে নামতেই হয় নিপীড়িতদের। হব লড়াই দাও, নয় সবকিছু ছেড়েছুড়ে দিয়ে চলে যাও। সে যাদের যেমন সুযোগ সুবিধা আছে তারা তো পালাচ্ছেই, বারা পারছে না তাদের মধ্যে মার খেতে খেতে একসময় কুখে দাঁড়ানোর প্রবণতা দেখা দিচ্ছে। এখন তেমন গাঁয়ে প্রতি পাঁচজন ছেল-ছোকরাদের ভেতর চাবজনেব কাছেই হয়ত আপনি ছর্রা বন্দুক পাবেন। এসব জোগান দিয়ে ওই পার্টিই তাদের অসামাজিক অপরাধী করে গড়ে তুলেছে। চলছে খুন আর হিংসার রাজনীতি। আপনি তাকে কথবেন কীভাবে, যদি না আপনার কাছেও অস্ত্র থাকে সুতরাং বিরোধীপক্ষকেই সংগ্রহ করতে হচ্ছে ওইসব মারণাস্ত্র। ওদের পার্টিতে থেকেও যারা সুবিধা কবতে পারেনি সেইসব গাঁয়ে খেদানো লোকজনেরা বিক্ষুব্ধ হয়ে গোপনে গোপনে দলের বিরোধিতা করে, দল ছেড়ে আসে। বিরোধীদের হাতে গচ্ছিত অস্ত্র তুলে দেব। কিংবা ওই তৃণমূল, কংগ্রেস বা বিজেপি, যেখানে যার প্রভাব বেশি তাব নেতারা আশ্বাস দেয়, আয় আমাদের সঙ্গে আয়, সবাই মিলে শত্রুর মোকাবিলা কবি। অস্ত্র না থাকে, আমরা দেব। শহর-বাজার থেকে আনতে হবে অস্ত্রশস্ত্র। আর কত কাল পড়ে পড়ে মার খাবি? এইবার জেগে ওঠ। এইসব কথা শুনে অত্যাচারীরা বুকে বল টের পায়, সঙ্গী পেলে মনে সাহস এসে ভর করে তখন অন্য একটি দল ভারী হয়। সেই দল রাজনৈতিক দল কিনা জানি না স্যার, তার নাম শিক্ষিত পণ্ডিত ও হিসেবী লোকজনেরাই যাই দিক না কেন, স্যার একথা বলতে পারি আপনাকে, কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শ বা ইস্তাহারের ওপর ভিত্তি করে তারা জমায়েত হয় না, বরং তারা ধরে নেয় এটা বাঁচার লড়াই। একদিন ওই লালপাটি 'গবিব গবিব ভাই ভাই। সব গবিবেব এক লড়াই', এই স্লোগান দিয়ে যেমন দল ভারী করেছিল। তখনো কিন্তু রাজনৈতিক মতাদর্শ জেনে বা ইস্তাহার পড়ে মানুষ ওই দলে যোগ দেয়নি। অজ্ঞও দেয় না। তাই রাজনীতি করতে কেউ এগিয়ে আসেনা, এসে গিয়ে বুঝতে পারে যে রাজনীতি করা হয়ে গেল। পাকা মাথারা চিনিয়ে দেয়, এটাকেই রাজনীতি করা বলে। তখন আর না মেনে কী উপায়, দু'কদম যখন এগিয়ে এসেছ তখন আর পিছু ফেরার উপায় থাকে না। যে ভয় বা দ্বিধায় পিছু ফিরে চাইবে, তাকে নির্যাতন মরতে হবে। সে না রইল স্থানীয় শাসক দলের সুনজরে, না সঙ্গে পেল যাদের সঙ্গে ভিড় কবেছিল তাদের কেননা তাদের কাছে ততক্ষণে তো ওই পিছুহটা লোকটা হল বিশ্বাসঘাতক। অতএব কোনো না কোনোভাবে সে খতম হয়ে যাবেই। এভাবেই আমি রিভলভার ধরতে শিখি। কিন্তু আপনি শিক্ষিত, বয়সে হয়ত দাদুর মতই হবেন, লোকজন মান্যগণ্য করে, এই আপনাব পা ঝুঁয়ে বলছি স্যার, রিভলভার চালিয়ে আজ অপি কোনো রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটাইনি আমি, নিইনি কোনো নিরীহ লোকের প্রাণ—

—আরে পায়ে হাত দিও না। আমি জানি তুমি সত্যি কথা বলছ। কিন্তু একটা কথা, তাহলে পুলিশ তোমার পেছন কেন?

—তা জানি না স্যার, পুলিশ তো এরকম করে। ধবতে যায় একজনকে, ছুটে বেড়ায় আর একজনের পেছনে। ধরে নিয়ে যায় আরেকজনকে। বিদ্রোহ করাকে দোষ বলে আমি মনে করি না তবু দোষ যদি কেউ করেই থাকে সে বেমানুম উধাও হয়ে যায়। পুলিশকে কলা দেখিয়ে সে নাগালের বাইরে ঘোরাফেরা কবে। অনেক সময় সব জেনেও পুলিশ তাকে না ধরে অন্যকে ধরে নিয়ে যায়। কিংবা আসল দোষীর সঙ্গে তো পুলিশেরও

যোগাযোগ থাকতেও দেখা গেছে। কিন্তু নিরপরাধ যে লোকটি বিনা অপরাধে শাস্তি ভোগ করল, তার কথা তো স্বাধীন দেশের গণতান্ত্রিক প্রশাসন একবার ভেবেও দেখে না!

—তুমি বেশিদূর যে লেখাপড়া করতে পারোনি, তা কিন্তু তোমার কথাবার্তা শুনে মনে হয় না সুশোভন। মনে হয় তুমি তৈরি ছেলে।

—তৈরি যখন স্যার দেখছেন তবে আপনি আমাকে সত্যিকারের কোনো কাজে লাগান।

জবাবে চূপ করে থাকেন অবিনাশ। হয়ত এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে একধরনের অসহায়তা গ্রাস করে তাঁকে। একজন সামান্য কলেজ শিক্ষক ছিলেন। আজ আবার রিটার্ড। কীইবা ক্ষমতা থাকতে পারে তাঁর এইরকম আশুনের ফুলকির মতো একটি ছেলেকে কাজে লাগানোর? আশুনের ফুলকি, সে যে বড়ই অনিশ্চিত, এক্ষুনি পারে ছড়িয়ে গিয়ে চারদিকটা ছরখার করে দিতে। না পারলে কিছুক্ষণ পরে আপনা আপনি নিভে যাবে। কিংবা আপনা আপনি নিভে যাবে। নিভে যাওয়া বলে তো আসলে কিছু হয় না, আসলে তাকে নিভিয়ে দেওয়া হবে।

—স্যার।

—উম্!—নির্বাক ঘুমঘোর থেকে যেন সাড়া দিলেন অবিনাশ। যেন এইমাত্র চোখ খুলে দেখলেন, সকাল হচ্ছে।

যুবক বলছে, একটা ঘটনা বলি স্যার। আমার গ্রাম থেকে কয়েক মাইল দূরে কিছুকাল আগে এক রাতে সি পি আই এম দলের লোকেরা মাঝরাতে হঠাৎ কবে চড়াও হয়। খেজুরি গ্রাম। ওই গ্রাম তখন তৃণমূলের দখলে ছিল, এখন আব নেই। এখন বেদখল। তো মধ্যরাতে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পার্টির লোকেরা গিয়ে দখল নিল। গ্রামে ঘটল অগ্নিসংযোগ, ঘরে ঘরে খড়ের ঝণ্ডা-চাল ছুঁড়নি সব দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। যে যেরকম পারল দৌড়ে গেল। যারা পারল না, ধরে নিয়ে গেল ওরা। তারই মাঝে একদল উচ্ছেদ হওয়া লোক প্রাগভয়ে দু'কিলোমিটার দূরের 'চকবাজার' পুলিশথানায় এসে নালিশ জানাল। নিশ্চিত ঘুম থেকে উঠে অফিস ইনচার্জ অফিসার কী বলেছিলেন শুনবেন?

—কী?

সেই বুড়ো ইউনিফর্মধারী পুলিশের পাকা মাথা অফিসারটি বলেছিলেন, কী আর করবেন! আমিই বা কী করতে পারি? নিজেই অসহায় হয়ে বসে থাকি এখানে, ঝকুমের চাকর। আপনারা বরং ওই দাওয়ায় বসে বসে ভগবানকে ডাকুন। এখানে হস্তা করবেন না।

—এরকমও ঘটে!

—তবু তো ভাগ্য ভালো, লোকটা আপনি-আজ্ঞে করে কথা বলেছিলেন। তুই-তোকারি করবেন। তাবপর ফের নাকে সর্ষের তেল ঢেলে ঘুমোতে শুরু করলেন। এবকম ধুকুমার বিপদের সময় ভগবানকে ডাকো বলা তো এক ধরনের ক্রাইম স্যার। এমন-বস্তুকতাও লোকে করতে পারে?

—দ্যাখো, আমার মনে হয় যে ধরনের কাজকর্মের সামাল দিচ্ছে ওদের জীবনটা কেটে যায়, তার মধ্যে থেকে আর মানুষ থাকা যায় না।

—সে তো ঠিকই। না হলে যখন দাউ দাউ করে আশুন উঠছে গেরস্থ ঘরের মটকা থেকে, যখন গরু-ছাগল দড়ি ছিড়ে দৌড়ে উঠছে, প্রাণভয়ে উড়তে চাইছে গৃহপালিত হাঁস-মুরগি, মদ-মাদী মিলে ঘরকরা করছিল যারা মোটামুটি সুখে, তাদের পড়ি-কি-মরি দৌড়—এমন সময় ভগবানের নাম নিতে বলে যে আহম্মক, সে কি আর জানে না যে বিপদের দিনে ভগবান

ভগবান বলে হাজার চেনালেও ভগবান কখনো সশরীরে উপস্থিত হয় না? বরং যাব আগমন ঘটে, সে হল সর্বনাশ। এ সময় ভগবানকে ডাকতে উপদেশ দেওয়াটা আসলে একটা অশ্লীল প্রস্তাব ছাড়া আর কী?

চূপ থাকেন অবিনাশ, তন্নিষ্ঠ ভঙ্গিটি তাঁর খানিকটা তদাত।

যুবক বলে চলে, সাধারণ গরিব-গুর্বো মানুষ দু'মুঠো ভাতের সন্ধান করবে, একফালি বস্ত্রের জোগাড় করবে, গায়ে মাখার একপলা তেল, নাকি সে ভগবান ভগবান করে সংসার মাথায় করবে? গ্রামবাংলা বা নিম্নবিত্ত বিস্তীর্ণ বাঙালির তো ওই এক উপসর্গ—সব ওপরওলার ওপর ঢেলে ফেলে নিজে বসে থাকে। সর্বনাশ ঘটছে তো এভাবেই, মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে। বেকে গেছে বুক-পিঠ। হাত-পা এভাবেই অসাড়। বিপদ এলে কী করবে না করবে, মাথা কাজ করে না। ঠাকুরঠাকুরের থানে আঁচল বা ধুতি-গামছা পেতে কাঁদতে বসে। উপায় যদি দেখতে পাও তবে হতো দাও মন্দির-মসজিদে। ভগবান ডাকবে তাদের যাদের ভাত-কাপড়ের অভাব মাথা ওপর ছাদের চিন্তা করতে লাগে না, ডান্ডার-বদিই বোলা বা থানা-পুলিশ-মন্ত্রী-আদালত সবই ঠিকঠাক আছে, হাতে আছে প্রচুর সময় আর খবচ করার মতো অটেল টাকা; তারাই করবে পূজোআচ্ছা। পেট্রায় সামিয়ানা টাঙিয়ে, ঢাক বাজিয়ে, খিচুড়ি রেখে গরিবদের ডেকে সোহাগ করবে, কেননা ওই চালচলোহীন লোকগুলোই নাকি নারায়ণ সুতরাং তাদের সার বেঁধে বসিয়ে দাও। ছড়াও ভাত ডাল চাটনি আর কোমর দুলিয়ে ঠাট দেখাও।

রায়শালে মাটির খোলা বা মালসায় ভাজা গরম বালির ওপর ধান ছড়ালে যেমন ফটফটিয়ে বই ফুটতে থাকে, তেমনি উদ্ভাপে কথা বলছিল যুবক। এমন সময় খুব মৃদু শব্দে দরজায় টোকা পড়ল।

মুহূর্তে সচকিত হয়ে উঠল দু'জনই।

অবিনাশ লঘুস্বরে বললেন, তুমি যেভাবে বই পড়ছিল পড়তে থাকো মন দিয়ে। আমি দেখছি কে এল।

দরজা যে ভেতর থেকে ছিটকিনি তোলা বা বন্ধ ছিল তা নয়, শুধু আলগাভাবে ভেজানো ছিল। যে দরজার ওপাশে, ইচ্ছে হলেই সে হালকা ঠেলা দিয়েই ঢুকে পড়তে পারত। কিন্তু ঢোকেনি। শান্ত, উদ্বেজনাইন পায়ে হেঁটে গিয়ে নির্লিপ্ত হাতে দরজা খুললেন অবিনাশ। খুলেই বলে উঠলেন, কী ব্যাপার বিবেক, তোমার তো সকালেই আসার কথা! এখন সন্ধ্যা ফুটিয়ে রাত।

—অনেক কাণ্ড ঘটেছে স্যার। চলুন বসে বলছি। এই বলে বিবেক নামের ছেলটি ঘরে ঢুকতে ঢুকতে অবিনাশের দিকে চেয়ে বলে ফেলল, ওর নাম স্যাব বলাকা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী।

—এসো, বলে মুখ না তুলেও তাকালেন অবিনাশ।

মেয়েটি মৃদু হেসে ঘরে ঢুকল। বিবেক বলল, কেন স্যার, ঢকা কোনো গোলমাল করেছে নাকি?

—না, না, ও তো একেবারে ভেজা বেড়ালটির মতোই সারাদিন চূপ হয়ে ছিল। এই সন্ধ্যার পর দু'একটা কথা বলতে শুরু করবে। যাও কাছে গিয়ে দেখ, কেমন আছে।

বিবেকের কাছে গিয়ে সুশোভন দেখেই প্রথমে একচোট হেসে উঠল, —বাহ! তুমি তো চুলদাড়ি উড়িয়ে দিয়ে বেমালুম ভোল পাস্টে দিয়েছ। দেখে তো মনে হচ্ছে বহাল তব্বিতেই আছ।

ছেলেটি মাথা নেড়ে হাসে। মেয়েটিকে বিবেক বলল, দাঁড়িয়ে রইলে

কেন ওভাবে? ওই সোফায় গিয়ে বসো ভালো করে।

মেয়েটি বেতের সোফায় গিয়ে বসল।

অবিনাশ বললেন, একটু চা খাবে তো?

বিবেক বলল, তা চলতে পারে। দাঁড়ান, আমিই নিচে নেমে গিয়ে সরষু পিসিকে বলে আসি।

—না না তার দরকার কি, বেল বাজলেই এসে যাবে। এই বলে বেল বাজালেন। রাতের এই নিশ্চলতার সুবাদে বেল বাজানোর টিং ক্রিং শব্দ রান্নাঘর থেকে প্রতিধ্বনিত হয়ে অবিনাশের কানে ফিরে এল।

একটু পরে সরষু এসে ফিরে গেল। বিবেক বলল, বলাকা একটু-আধটু ছত্র-রাজনীতি করে কি করে না, বুঝলেন স্যার—

—তা করুক না! কে মানা করেছে? একশোবার করবে। এই বলে প্রশ্ন সূচক হেসে মেয়েটির দিকে তাকালেন। তারপর বললেন সোৎসাহে, সব মেয়েই তো শুনেছি নাকি বলাকা। কিন্তু অগ্নিবলাকা যে, সেই তো স্পেশাল।

বিবেক বলে উঠল, আগে শুনুন কাল কী ঘট হয়েছে। শুনেই না হয় ঠিক করুন, অগ্নিবলাকা হতে আর বাকি আছে নাকি—

—কিরকম?

বিবেক বলল, তুমিই বলাকা বলাকা। তোমার মুখেই ভালো শোনাবে।

মেয়েটি লজ্জায় নিচু হয়ে থাকার বদলে ফেন বলার জন্যই উসখুস করছিল। অন্তত তার চোখমুখ থেকে তেমনি একটা আলোর ছটকোছটকা নাচনাচি করছিল। সে নিজেকে শুষ্ক নিয়ে শুরু করল। এইবার খানিক উত্তেজনা তার চোখ ঠিকরে ফেন মোটা মোটা বৃষ্টির ফোঁটার মত স্ফটিক হয়ে ছড়িয়ে পড়তে লাগল—

—কাল মাঝরাতেই বলতে হবে, খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়েছি আমরা। হাউসিংয়ের সবকটা ফ্ল্যাটই তখন প্রায় ঘুমিয়ে। হঠাৎ আমাদের ফ্ল্যাটের দরজায় প্রথমে টোকার শব্দ। তারপর জোরে কড়া নাড়া। তারও একটু পরে প্রায় দুমদাম করে লাথি মারার শব্দ। মা-বাবা শুনে তো আগেই উঠে বসেছিলেন। আমিও পাশের ঘর থেকে উঠে এসে ওদের ঘরে এলাম। দেখলাম একটা আতঙ্কের ভাব। প্রাথমিক ভয়ের ভাব কাটিয়ে বাবা আমাকে সঙ্গে নিয়ে বললেন, আয় তো দেখি কারা।

আমার বাবা সেম্‌ট্রাল গর্ভমেষ্টের কর্মী, ইউ ডি ক্লার্ক। কিন্তু পাইকপাড়া করিম বক্স রো এলাকাটা ভালো নয়। অ্যান্টিসোসালদের আড্ডা। মাঝরাতে মালমুল খেয়ে ওরা এসে দরজায় ধাক্কাটাকা দিতে পারে। ভেতরে ভয় যাই থাক না কেন আমরা মেয়ে আর বাবাতে মিলে সাহসী হয়ে উঠলাম। অন্তত ভাবভঙ্গিতে সেরকমই। মা রইলেন টেলিফোনের সামনে, বেগতিক দেখলেই থানায় ফোন করবেন তৎক্ষণাৎ এইরকমই একটা প্রস্তুতি। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে তো একটা পাঁচসেলি টর্চলাইটের ফোঁকাসে আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে গেল। সেই আবেশ চোখে হাত দিয়ে ঘসে কাটিয়ে দেখি চারজন খাকি ইউনিফর্ম পরা পুলিশের লোক। সঙ্গে আরো জনাদুই সিভিল ড্রেন্সের লোক। বাবাকে দেখে তারা বলে উঠল, আপনিই নিরুপম চৌধুরী?

বাবা সন্ধিনয়ে বললেন, আশ্চর্য্য হ্যাঁ। কী ব্যাপার বলুন তো?

—বলাকা চৌধুরী আপনার মেয়ে?

—হ্যাঁ, কেন বলুন তো?

আমি বলে উঠলাম, আমিই বলাকা। কী ব্যাপার বলুন দেখি।

আমার কথায় কোনো পাস্তাই না দিয়ে মহিষাসুরের মতো পুলিশটা

বাবার দিকে চেয়ে বলে উঠল কম্যাণ্ড করার ভঙ্গিতে, আপনার মেয়েকে এফুনি আমাদের সঙ্গে থানায় যেতে হবে।

—কেন, কী করেছে ও?

—জনযুদ্ধ গোষ্ঠীর সঙ্গে গুর যোগাযোগ আছে।

—কে বলেছে?

—আমরা বলছি।

—কই, আমরা তো জানি না।

—আমরা জানি।

—আপনারা জানলেই হবে। আমি বাবা, ওইখানে দাঁড়িয়ে গুর মা, আমরা জানি না আমাদের মেয়েকে?

—অতশত জানি না। এই বলে একটা ইয়ং অফিসার গোছের লোক আমার হাত ধরে টান মেরে বলে উঠল, এসো—

আমি হাত বিন্কে ছাড়িয়ে নিলাম। বাবা বললেন, আগে আপনাদের আই কার্ড দেখান। বুঝি আপনারা কে, কোথেকে এসেছেন!

—ইউনিফর্ম পরা চেহারা দেখে বুঝতে পারছেন না, আই ফাইকার্ডে কোনো দরকার নেই।

—অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট আছে? দেখি।

—ওসব লাগবে না।

তাহলে তো এতরাতে আপনাদের কাছে আমার মেয়েকে আমি ছাড়তে পারছি না, সে আপনারা যাই করুন না কেন।

—তাই নাকি—

—হ্যাঁ তাই। তাছাড়া একটি মেয়েকে অ্যারেস্ট করতে আসছেন কিনা ওয়ারেন্টে এটা তো বে-আইনি। মেয়েকে ধরে নিয়ে বেতে এসেছেন এত রাতে এতগুলো পুরুষ মানুষ, একজনও মহিলা অফিসার নেই আপনাদের সঙ্গে?

দর্পিত স্বরে মহিষাসুরটা বলে উঠল, মহিলা অফিসার আনাটা দরকার মনে করিনি। এসো,—বলে জোর করে আরেকবার আমার হাত ধরে টানতে উদ্যত হল লোকটা।

আমি গর্জে উঠলাম, খবরদার আর একবার টানার চেষ্টা করলে আমি চিৎকার করে প্রতিবেশী লোকজনদের ডাকব। এসো তো মা, আমাদের চিৎকার শুনে এই হাউসিংয়ের লোকজনরা বেরিয়ে আসে কিনা দেখি।

বাবা বলে উঠলেন, আমিও জাগাই আমার নেবারদের। দেখি কী করে কিনা ওয়ারেন্টে এত রাতে আপনারা আমার মেয়েকে নিয়ে যেতে পারেন। দেশে কি আইনকানুন বলে কিছু নেই নাকি!

পুলিশের জিপটি যখন এসে দাঁড়িয়েছিল তার শব্দেই কেউ কেউ যে দু'এক ঘর জেগেছিলেন তাঁরা জানালায় উকি মেরে দেখে সতর্ক হয়েই ছিলেন। এখন বাকবিতণ্ডা শুনে সব পাশাপাশি ফ্ল্যাটের দরজা খুলে গেছে। বোঝা যাচ্ছে এই মধ্যরাতে হাউসিংয়ে কিছু একটা অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে। না ডাকতে একে একে বেরিয়ে আসছেন বাসিন্দারা। হাউসিং কমিটির দু'একজন মাথা।

আমাদের উন্টোদিকের ফ্ল্যাটের বাট-বাষটি বছরের হ্যাণ্ডসাম অ্যাথলেট বিক্রম দাস এলেন বুক চিতিয়ে। বললেন ওদের লক্ষ্য করে, মেয়েটিকে এত রাতে নিয়ে গিয়ে কী করবেন আপনারা? এত রাতে হানা দিতে এসেছেন মেয়েপুলিশ ছাড়া! জানেন, এই ইস্যুতে কী ঘটতে পারে?

তেরোর বি ফ্ল্যাটের উকিলবাবু বলে উঠলেন, আদালতে তোলা যায়

আপনাদের। কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে তখন।

এইসব দেশে সেই মহিষাসুর যেন একটু নরম হল। বলল, না মানে একটু আধটু জিজ্ঞাসাবাদ করেই ছেড়ে দেওয়া হবে।

বিক্রমবাবু সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠলেন, হ্যাঁ, সন্তরের দশকে এভাবেই আপনারা সোমেন গুহর বোন অর্চনা গুহকে ধরে এনেছিলেন। সঙ্গে আরো দু'জন মহিলাকে। বলেছিলেন এমনি করেই যে একটুখানি জিজ্ঞাসাবাদ করেই ছেড়ে দেব। কিন্তু কী হয়েছিল তার পর? সেই তিনজন মেয়েকে দড়িতে ঝুলিয়ে অকথ্য অত্যাচার। অর্চনা তো ইনসেসইন হয়েই রইল তারপর থেকে। আপনাদের আমরা জানি চিনি।

উকিলবাবু বললেন, কেন এই তো ক'দিন আগে যে অভিজিৎ সিংহকে মধ্যবর্তে বিনা ওয়ারেন্টে পশ্চিম মেদিনীপুরের পুলিশ ঘর ঘেরাও করে তুলে নিয়ে গিয়েছিল ওই জনযুদ্ধের সঙ্গে যোগাযোগ আছে সন্দেহে, তার কী দশা হল। এখন কাগজ খুললেই তো ওই খবর, ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল ঠিকই কিন্তু সেন্ট্রাল গার্ডমেন্টের ইনকামট্যাক্স অফিসার ওই অভিজিৎকে তিনদিন পরে ইস্টার্ন রেলের দমদম আর উশ্টোডাঙ্গর মধ্যকার লাইনে মাথা কাটা অবস্থায় পাওয়া গেল। বেচারাকে অসম্মানে আত্মহত্যা করত হলে! ছি ছি ছি—

বিক্রমবাবু বলে উঠলেন, ছি-ছিংকারে ওদের কি আর গুণারের চামড়ায় কোনো দাগ পড়ে ভেবেছেন। অভিজিৎ ছাড়াও যে সুবোধবাবুকে তুলে নিয়ে গিয়ে কয়েকঘণ্টা থানায় বসিয়ে রাখার পরে ওই পুলিশই স্বীকার করেছে তাদের ভুল হয়ে গিয়েছিল। ওদের কোনটা ভুল কোনটা ঠিক ওরাই জানে, যখন টনক নড়ে তখন ক্ষমা চেয়ে নিতে আর কতক্ষণ। এই ধরন না নিরুপমদা, যে কৌশিক গাঙ্গুলির সঙ্গে মোবাইল টেলিফোনে যোগাযোগ আছে অভিজিৎয়ের এই সন্দেহে—যেহেতু অভিজিৎয়ের ফোন থেকে কৌশিকের নাম্বার মিলেছিল সেই কৌশিকের হালটাই বা কী হল। রাজাবাজার সায়েন্স কলেজের টিচার ওই কৌশিকবাবু। পুলিশ তাকে তুলে নিল। এখন মানবাধিকার কমিশন কী বলছে, বলছে রিপোর্টে পাওয়া গেছে কৌশিকের ওপর পুলিশি হেফাজতে শারীরিক আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। সঠিক অভিযোগের ওপর ভিত্তি করে অ্যারেস্ট করো কোনো কিছু বলার নেই। কিন্তু কারো সেলফোনে একজনের সঙ্গে কথা হয়েছে, একটা প্রাপ্ত ফোন নাম্বারের ভিত্তিতে একজনের তুলে নিয়ে গিয়ে তার জীবনটা শেষ করে দেওয়া, এ কেমন ধারা চলছে দেশটাতে?

এত কথার মাঝে পড়ে পুলিশগুলো পিছু হটল। বলে গেল, ঠিক আছে, এখন চলে যাচ্ছি আমরা। কিন্তু ওকে ছড়া হবে না এই বলে গেলাম।

ওরা যখন চলে যাচ্ছে তখন বাবা বলে দিলেন, দেখুন দেশে বাকস্বাধীনতা আছে, আছে যে কোনো দল বা পার্টি করার অধিকার। আমার মেয়ে সেইভাবে কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আছে বলে তো আমি জানি না। যদি করেও থাকে তবুও কোনো অন্যায় দেখি না। তাছাড়া জনযুদ্ধ যদি করে থাকে তো এভাবে মধ্যবর্তে হানা দিয়ে তুলে নিয়ে যেতে সদলবলে আসার কী আছে? রাজ্যে তো জনযুদ্ধকে নিষিদ্ধ করা হয় নি। অন্যায়ের বিরুদ্ধে যদি আমার মেয়ে সরব হয়েই থাকে তাতে আমি বরং তাকে উৎসাহই দেব।

চলে গেল ওরা।

আমরা সারাটা রাতই প্রায় জেগে থাকলাম। প্রতিবেশীরা অধিকাংশ দু'একটি সাধারণ কথা বলে যে যার মতো শুতে চলে গেলেন। বাবা

প্রয়োজনীয় ফোন করে পরামর্শ নিলেন অভিজিৎ কারো কারো কাছ থেকে, ঘটনাটা জানিয়ে রাখলেন কাউকে। ঠিক হল আমি কদিন সাবধানে থাকব। নাই থাকলাম ও বাড়িতে। সে রাতেই আমার এক বন্ধুর কাছে চলে গেলাম। তারপর ভোর হয়ে এল। একটু পরেই ফের আসবে, ছমকি দিয়েও ওই পাজি বাহিনী কিন্তু আর এল না, অন্তত আজ এখন পর্যন্ত। অবশ্য যে কোনো সময় এসে পড়তে পারে। একে ওকে ইচ্ছেমতো তুলে নিয়ে যেতে পারে যেমন যাচ্ছে, কিইবা করতে পারি?

এই বলে বলাকা থামল। কিছুক্ষণ সবাই চুপ। সব শুনে অবিনাশ বললেন, সাংঘাতিক।

বিবেক সংগত করল, তাহলেই ভাবুন কেমন দেশে বাস করছি আমরা। এখানে নাকি সংস্কৃতিবান বামপন্থীরা ক্ষমতায় আছে। তারা প্রচার করে এ রাজ্যে নাকি শান্তিশৃঙ্খলা এত ভালো যে ভারতবর্ষের অন্য রাজ্যে সে কথা ভাবাই যায় না।

কিন্তু অবিনাশ সেদিকে না গিয়ে অন্যভাবে বলাকাকে উৎসাহিত করলেন। বললেন, তাহলে এখানে দু'জনকেই দেখা যাচ্ছে প্রধান ভূমিকায়। এখানে যদি অগ্নিবলাকা, তো ওখানে বসে আছে আরেক অগ্নিবালক। এই বলে সুশোভনকে দেখিয়ে হাসলেন।

আলাপ চলল ভালো করে। সরযু এসে চা দিয়ে গেল।

এমন সময় কিরিং কিরিং করে ফোন বেজে উঠল। উঠে গিয়ে রিসিভার তুলে নিলেন অবিনাশ। হ্যালো।

ওদিক থেকে শোনা গেল, অসমঞ্জ বলছি, ভালো আছেন স্যার? অবিনাশের মুখ থেকে বেরিয়ে এল, আর ভালো থাকা!

২

বানার্জী শ নাকি বার্টাগু রাসেল কে যে বলেছিলেন সে কথা মনে নেই অসমঞ্জর; কিন্তু কথা খুব কাজের—After forty man become scoundrel. অন্তত তার খুব কাজের থেকে দেখা কিছু লোক কিংবা অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে বলে, নাকি কথাটা হাড়ে হাড়ে ঠিক।

বয়সে কিছুটা বড় হলেও একই রাজনীতির অংশীদার বোলতা নামের মেয়েটি বলে ওঠে, কখনোই না।

অসমঞ্জ নাম্বার ওয়ান তার্কিকের মতো বলে ওঠে, দেখুন স্যার, গাছের সবুজ পাতাও একসময় হলুদ বিবর্ণ হয়ে ঝরে পড়ে, পচে যায়। তবে কি প্রাকৃতিক শর্ত! মানে সবকিছুকেই একসময় পচে যেতে হবে!

বোলতা বেজে ওঠে তার নিজস্ব নিয়মে;—পচে যাবার কথা ছিল যাদের একমাত্র তারাই পচে যায়, যারা নমনীয় বা ভঙ্গুর। স্বভাবে যাদের আপোষপন্থা তারাই পচবে। কই, লোহা বা পাথর তো পচে না?

সেকথায় না গিয়ে অসমঞ্জ বরং তার নিজের কথার জেরের মধ্যেই ঘুরপাক খেতে লাগল—আমাদের দেশে দেখছি স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় যঁবা শহীদ হয়েছিলেন কিংবা যে কোনো যুদ্ধে অংশ নিয়ে নায়ক বা ইতিহাসে পরিণত হয়েছেন তাঁরা সত্যিই বেঁচে গেছেন। যৌবন তাঁদের মহৎ জীবনের গরিমা দিয়েছে। আমার কী মনে হয় জানেন স্যার, যঁরা বেঁচে থেকেছেন, বেড়েছে বয়স আর তার তালের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তাঁরা প্রায় সকলেই পরবর্তী জীবনে তথাকথিত আদর্শবাদ বা নিজস্ব কমিটমেন্ট থেকে সরে এসেছেন। পার্টি খেয়েছেন। হয়ত বয়স তাঁদের মধ্যে নিরাপত্তাহীন এক দুঃসহ যাতনার সৃষ্টি করেছে। নিজে ভালোমতো

সময়ে তাঁর স্বগতোক্তি-তেই বলে উঠেছেন, আদর্শ করে করে তো এতকাল গেল। কি হলটা কি? কিছু না কিছু করব বলেই না পথে নেমেছিলাম। কিছুতেই কি তবে কিছু হয় না—এই ধন্দের শেষ ফয়সালা হিসেবে হয়ত তাঁরা মেনে নিতে বাধ্য হন তার চেয়ে আখের গোছও। বাড়ি বা গাড়ি কিংবা ব্যবসা।

বোলতা আবার ছল বিষিয়ে দিতে চায়, ও। তাহলে সব শেয়ালেরই এক রা—এই কথাই বলতে চাও?

এইবার অসমঞ্জ বলে, সব বাঘদেরই যে দেখেছি একই রা।

—তাই যদি দেখে থাকো, এবং আর কিছু যদি দেখে না থাকো তবে সেটা তোমার দুর্ভাগ্য বলতে হবে। যে সব লোকদের দেখেছ বা যাদের সান্নিধ্যে এসেছ তারা সবাই ওই রকমেরই। Birds of a feather flock together. তার মানে এই নয় সারা পৃথিবীর সমস্ত পরিণত লোকজনরাই আদর্শ বা তাদের কমিটমেন্ট ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কেরিয়ার গড়তে বেরিয়ে পড়েছে। প্রমাণ হয় না যে আদর্শ ব্যাপারটা একটা অপরিণত মনের খেয়াল বা শুধুমাত্র আবেগ। তুমি যা বলছে তার উল্টো দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে ভুরি ভুরি। জেলখানার মধ্যে বন্দী থেকে গ্যালিলিও তার প্রিয় শিষ্যকে যখন গোপনে তাঁর রচিত খসড়া পড়ে শোনান, উদ্ভুদ্ধ করেন, তখন তাঁর বয়স কত ছিল তা তো জানোই। গান্ধী সর্বস্ব ত্যাগ করে যখন জাতির পিতা হয়ে উঠলেন তখন কিন্তু বয়সে তিনি আসলে পিতামহ। আপনিই বলুন না স্যার মহান্ধারতে শেষ দিকে ভীষ্ম কীভাবে প্রকৃত দেবরত হয়ে উঠেছেন তার ইতিহাস।

অবিনাশ এই টকবালমিষ্টি রাগারাগির মাঝে পড়ে স্মিত হাসেন। কখনো বা সশব্দে হেসে ওঠেন তিনি হো হো করে। বোঝেন এরা দুটিতে আসলে মত ও পথের মাঝে দ্বিধা দ্বন্দ্ব জর্জরিত। জীবিত মানুষ মাত্রই এই দোলাচলে দোল খাবে। ডুববে আর উঠবে। গভীর জলে আঁকুপাকু খাবে, নিশ্বাস আটকে যাবে, যেন দম বন্ধ করে ডলফিনের মতো ভুস করে ভেসে উঠবে উপরিতলে। দু'জনের এই প্রায় মল্লযুদ্ধের মাঝে কিন্তু আড়াল রয়েছে খুব অলঙ্কৃত। তাকে টের পেলে বা বুঝতে পারলে ভালো লাগে। সেই গাঁটছড়াই ওদের একই পথের পথিক করে রেখেছে। নইলে সংসার সাধ আর স্বপ্নের যাঁতাকলে পড়ে একই নদীর দুটি ধারার মতোই ওরা ভেসে যেত যে যার।

রুক্ষ স্বরে প্রতিপক্ষকে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে অসমঞ্জ বলে ওঠে, আমার কথার সমর্থনে জ্যাস্ট, তাজা উদাহরণ দিচ্ছি স্যার, ও যাই বলুক ধোপে টিকবে না। কদিন আগে আনন্দবাজারে ছেপছে একটি বিপোর্ট, তাব মধ্যে ছাপা হয়েছে সি পি এম রাজ্য সম্পাদকের উদ্ধৃতি। সেখানে তিনি বলছেন, 'সে দিনের সেইসব নকশাল নেতারা মূল শ্রোতে ফিরছেন কিছুকাল ধরেই। অসীম চ্যাক্সি বা আজিজুল হকরা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে মূলশ্রোতে ফিরেছেন। আমাদের সঙ্গেই তাঁরা। আর এই ফেরানোর কৃতিত্ব বুদ্ধবাবুরই। অথচ পার্টি ত্যাগ করে একদিন ওই দুই নেতা উগ্র সি পি আই (এম এল) দের সঙ্গে সামিল হয়েছিলেন মতপার্থক্য আর আদর্শের বিরোধ ছিল বলেই। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের সরকার থেকে ষড়তা দূরত্বে ঠিক ততটা দূরত্বেই ওরা সি পি আই এম থেকে থাকতে চেয়েছিল সেকথা সবাই জানা। সিদ্ধার্থবাবু যদি ত্যাগাচার করে থাকেন তৎকালীন নকশাল কর্মীদের ওপর তবে ওই পার্টির প্রতিপক্ষও সমান ভাবেই বিবোধিতা করেছিল। সে ছিল নাকি নকশাল নাশকতা বা নৈরাজ্যের দিন। পরবর্তী স্বরাষ্ট্র বা পুলিশ মন্ত্রী জ্যোতি

বসুই সেদিন নকশালবাড়ির বিদ্রোহী কৃষকদের দমন করতে বাহিনী পাঠিয়েছিলেন। ওই দলের রাজ্য সম্পাদক প্রমোদ দাশগুপ্ত পুলিশি দমন নীতির পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে বিদ্রূপ করেছিলেন, নকশালরা পুলিশের দিকে বোমা ছুঁড়বে আর পুলিশ কি তার জবাবে রসগোল্লা ছুঁড়বে নাকি। খুব জুতসই ব্যঙ্গ, খুব খেয়েছিল বাজারে। ষাটের দশকে নকশাল আন্দোলনে সি আই এর হাতও দেখেছিলেন কিছু পরিষদীয় বাম নেতা। আজ দেখুন ওই মস্তব্যের প্রতিবাদ কিন্তু এখনো পর্যন্ত ওই দুই প্রবীণ নকশাল নেতা করেননি। করবেন কি করে, ঘটনা তো তাই। অসীমবাবুর দল তো ক্ষমতাসীন বামফ্রন্টেরই এক শরিক, ওই সি পি আই এম এর সঙ্গে সমঝোতা করে ওদের প্রার্থী হিসেবে অসীমবাবু ভোট দাঁড়ান। তাঁর যে কোনো সওয়াল তাই বামপন্থী সরকারের পক্ষে। আর হক সাহেব সেই যে জেলখানা থেকে নীলরতন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নজরবন্দী চিকিৎসাধীন ছিলেন সেখান থেকে বেরিয়ে এসে হলেন সংবাদপত্রের কলামিস্ট। বাম সরকারের ধামধারা কাগজগুলিতেই ছাপা হতে লাগল তাঁর কলম। সেই রচনায় বিদ্রোহের আশঙ্কায় ভাষণ বা বিশ্লেষণ থাকলেও সঠিক সময়ে ওই বাম সরকারের পক্ষে সওয়ালই বেজেছে ঠারঠারে। অবশ্য তিনিই বা কি করবেন। রাজ্য সরকারের আবাসন দপ্তরের দেওয়া ফ্ল্যাটে স্ত্রী ছেলমেয়েদের নিয়ে তাঁকে বাস করতে হয়। সুতরাং সারেগার না করে আর উপায় কি। এভাবে ওই দুজন প্রবাদপ্রতীম জঙ্গি নেতা শাসকদের সঙ্গে এই ন্যাকার জনক হাত না মিলিয়ে যদি সুইসাইড করতেন তাহলেও আমরা ভরুণেরা দেওয়ালে দেওয়ালে ফটো বুলিয়ে ধুপধুনা ছেলে ওদের শহীদের মর্যাদা দিতাম। তা না করে দুজনেই সরকারের ধামধারা বুদ্ধিজীবী।

বোলতা কথার মাঝখানে বেজে উঠল সরবে, বুদ্ধিজীবী নয়, বোলো রাজনৈতিক বুদ্ধিজীবী।

—ওই একই হল।

—না। দুটো কথা এক নয়। তালুড়া ইতিহাসে মীরজাফর আছে বলে, পুরাণকথায় বিভীষণ আছে বলে যে আর কোনো বীরের সাহসিকতার কাহিনী সব ধুয়েমুছে গেছে তা তো হতে পারে না।

অসমঞ্জ এই প্রতিক্রিয়ায় মনোযোগ না দিয়ে নিজে যা বলছিল তার মধ্যেই ছোট্ট ছোট্ট করতে থাকে। বুদ্ধবাবুও তো যখন তুলনামূলক ভাবে তকণ ছিলেন, পদত্যাগ করেছিলেন জ্যোতি বসু মন্ত্রীসভা থেকে এই অজুহাতে যে, চোরের মন্ত্রীসভায় থাকব না। কিন্তু কিছুকাল যেতে না যেতেই হিসেবের দৃষ্টিতে ধরা পড়ল, গদি'না থাকলে কিছুই থাকে না। সুতরাং মাথা মুড়িয়ে ফের সেই মন্ত্রীসভায়, তারপর দু'নম্বর পজিশন। শেষে এখন তিনিই কর্ণধার। আজও কি তিনি, কখনো কেন মন্ত্রীসভা ছেড়েছিলেন সেদিন, তার কোনো রকম সঠিক ব্যাখ্যা বা কৈফিয়ৎ জনগণের কাছে দিয়েছেন? কিংবা রাতারাতি কি ওই মন্ত্রীসভা সাধু হয়ে উঠেছিল। যুবক হলে তিনি কি পারতেন এই কাজ করতে। আজ বুদ্ধ-অনিল-বিমান-বিনয় কোজুর-এঁরা সবাই কি তবে আবার ভয় পেয়েছেন? না, বিপ্লবের ভয় নয়। তার কথাও হচ্ছে না। জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্বগিতাদেশ হাতে নিয়েই তো ওঁরা আজ পরিষদীয় গণতন্ত্রের মধ্যে লেনিনের জন্মদিন পালন করছেন। সে কথা ওঁরা জানেন, লেনিনও জানেন। কিন্তু আজ এই সুখের রাজত্বে বসে জনযুদ্ধের ওপর আবার হামলা কেন। তবে কি নির্বাচন বয়কট ও সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসীদের কাছে ক্ষমতা হারানোর আজগুবি ভয়টাই

পাচ্ছেন ওঁরা? বামপন্থীদের দুর্জয় খাটি এই বাংলার মাটিতে চিরস্থায়ী বাম বন্দোবস্তের নিয়মতান্ত্রিক সম্ভাবনাটা খেঁটেঘুটে যেতে পারে এই ভয়ে পুলিশকে লেলিয়ে দিচ্ছেন ওঁরা। নকশালরা তো বরাবরই নিজের নাক কেটে পরের ঘাএ ভঙ্গ করতে ওস্তাদ। ষাটের দশকের শেষের দিনগুলোর কথা মনে নেই? নকশাল গোলযোগের জন্যই তো যুক্তফ্রন্টের সেই সুখের সংসার জ্বরখার হয়ে গেল। জনযুদ্ধের সঙ্গাস যদি উন্নততর বামফ্রন্টের বাড়ী ভাতে ছই ঢেলে আবার কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের অজুহাত রচনা করে? সবে ঘনিয়ে উঠতে শুরু করেছে বাজার অর্থনীতির বঙ্গীয় দিগন্ত, ওই সময় যদি এই রাজ্যে ধনতন্ত্রের স্বার্থরক্ষায় বামেরা ব্যর্থ প্রতিপন্ন হয় তবে আবারও তাদের ক্ষমতাচ্যুতির দাবী উঠতে পারে। এখন আর অতটা সহ্য হবে না। একবার গদিচ্যুত হলে আবার রাত জাগা, রাত থেকে উঠে সংগঠন বা আন্দোলনের কাজ করা, মাইল মাইল হেঁটে মিছিল করা। পিকিটিং অবরোধ তা আর সহ্য হবে না। তাই শুধু স্থিতিবস্থা রক্ষা করাই যথেষ্ট নয়, স্থিতিবস্থাকে আশ্রয় করতে হবে যে তার কোনো বিপদ নেই। বোঝাতে হবে, রাজ্যের বাম শাসকরা স্থিতি স্বার্থেরই প্রহরী, এ কাজে তারা আড়াই দশক ধরে হাত পাকিয়েছে। তাদের চেয়ে যোগ্য পাহারাদার এ তন্মটে মেলাও দুধর। সেই সঙ্গে এই আশ্বাসকে বিশ্বাসযোগ্য করতে নামাতে হবে থাকি উর্দি, তুলতে হবে নকশাল সঙ্গাস নিয়ে তুমুল শোরগোল।

অসমঞ্জ কথা শেষ করা মাত্র বোলতা বলে ওঠে, এতই যদি বোঝো তবে সেরকম রাজনীতির সঙ্গে লেগে আছ কেন, যার ফোরফাদারই বিগড়ে গেছে? জানো তো, যে কোনো দলই পরিচালিত হয় তার পাকা মাথাবাদের নিদেশেই।

অসমঞ্জ বিরক্ত বোধ করে। বলে ওঠে, যা বোঝো না তা নিয়ে কথা বলো কেন?

—এখন যুক্তিতে না পেরে তুমি এসব বলবে আমার জানা ছিল।

সে তোমার যা খুশি জানা থাকতে পারে। দ্যাখো কোনো একটা পুরনো বা ঐতিহ্যশালী দল থেকে হঠাৎ মতান্তর ঘটিয়ে বেরিয়ে আসাই যায়। কিন্তু তাতে লাভ কি? বরং তার মধ্যে থেকে চাপ দিয়ে ভুলক্রটি মেরামত করার উদ্যোগ বোধহয় বেশি বিবেচনার কাজ। আপনি কি বলেন স্যার?

অবিনাশ কিছু বলার আগেই বোলতা বলে উঠল, কথটা শুনতে যত ভালো কাজে যে ততটা ফলপ্রদ নয়, একথা তুমি তো ভালো করেই জানো অসমঞ্জ। জেনেও কেন সেন্সাইড খেলার চেষ্টা করছ?

—মানে?

—মানে যে কোনো নিয়মতান্ত্রিক দলে, স্বাধীনতার কথা বা মতপ্রকাশ এবং পাঁচজনে মিলে আলোচনা অবকাশের কথা যতই ফলাও করে বলা হোক না কেন, হাইকমান্ড যা বলে দেবে কাজে কাজে তাই হয়ে থাকে। যে তার বিরোধিতা করবে তাকে দল থেকে বের করে দেওয়া হয়, কিংবা সাসপেন্ড হয়ে থাকতে হয়।

—তুমি বামপন্থী দলের রীতিনীতি দেখছি জানোই না, ওসব কংগ্রেস দলে হয়ে থাকে।

—ভুল করছ অসমঞ্জ। বামপন্থী রাজনীতি আমি তোমার চেয়ে খুব কম দিন যে করেছি তা কিন্তু নয়। তাছাড়া বারবার নিজেকে বামপন্থী বামপন্থী বলেই বা তুমি কী বোঝাতে চাইছ বা চাপ? কোন দলটা এখন বামপন্থী বলে নিজেকে প্রচার করে না বলো তো? এখন কে বামপন্থী তোমরা? এম সি সি, জনযুদ্ধ, সি পি আই আর এস পি, এস ইউ সি

এইসব পার্টিগুলো, নাকি ওই সি পি এম? সবাই তো একই নামাবলী গায়ে দিয়ে মাঠে নেমেছে। একই জার্সি পরে। যে কাজের সঙ্গে মাক্সবাদের কোনো যোগাযোগই নেই। স্বয়ং মাক্স যদি বেঁচে থাকতেন নির্বাণ তোমাদের কাছে হাতজোড় করে বলে উঠতেন অব্যাহতি পাওয়ার সেই চালু মন্তব্যটা, ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি। যদি যে কোনো একটা দলের কার্যকলাপ কাটাছেঁড়া করা যায় তাহলেই বোঝা যাবে কোন পথে চলছে তাদের দেশোদ্ধার। তোমাদের তো স্বদেশে কোনো ফোরফাদারই নেই, ছিল না কখনো। বলে বলে অভ্যস্ত ছিল যে চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান। সি পি এম-এব উদাহরণগুলো একটু নেড়েচেড়ে দেখ না। মন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী বেশি সাহসী হওয়ার খেসারৎ কিভাবে দিয়েছিলেন তা তো সবাই জানা আছে। অতি সম্প্রতি তাঁর লেখা অকপটে বইটি পড়ে তো আমি স্তম্ভিত। এককাল পবেও দলে সেই ট্র্যাডিশান কিন্তু একই আছে। সেইফুদিন চৌধুরী কিংবা পরে সমীক পুততপুকে দল থেকে বেবিয়ে যেতে হল সংস্কারবাদের কথা বা জিগির তুলে। সংশোধনবাদীদের কখনোই ক্ষমতাবান নেতৃত্ব বরদাস্ত করে না। কোনোকিছু গঠনমূলক করতে চাইলে তোমাকে দল থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। অবশ্য তাবো ঢের হ্যাণ্ড আছে, রাতারাতি বেমালুম হাপিস করে দিতে পারে ওরা। যদি তা না হয় তবে মুক্ত হয়ে নিজের কথা বলতে পারো, যেমন কিছুদিন আগে ত্রিপুরার একদা বামপন্থী মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী চলতি দলের যথেষ্ট নিদেমনন্দ করে প্রশংসা করেছেন মমতা ব্যানার্জির যিনি কিনা রাজ্য সরকারের একমাত্র ভয়ের কারণ। আসলে অসমঞ্জ তুমি জানোই ভালোমতো যে, দল ছেড়ে বেরিয়ে আসার মতো ধক তোমার নেই। কুটোর মতো অস্তিত্বহীনতা হাওয়ায় ভেসে যাবে, এই ভয়ে বেরিয়ে আসতে পারছ না তুমি।

অসমঞ্জ বলে উঠতে চাইল, তু—তু—তুমি—

—আমি তো অনেক আগেই যাতায়াত বন্ধ করেছি। মনেপ্রাণে যাকে মেনে নিতে পারিনি তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকব কেন? থাকলে যে হিতে বিপরীত হয়। দ্বিধাদ্বন্দ্ব আমারও ছিল। কিন্তু মনে হয় ওখানে থেকে আমি যে ভাবে ভাবি সেই কলট্রাকটিভাল কাজ করা যাবে না। নিজেকে চোখ ঠেরে তো লাভ নেই, আমার কাছে এটা পরিস্কার ছিল।

কথা শেষ করে বোলতা নির্বিঘ্নে চূপ করল। টেবিলে রাখা জলের গ্লাস তুলে জল খেল নিঃশব্দে।

অসমঞ্জর মুখেও কোনো কথা নেই। হয়ত বোলতা যা বলেছে তা একেবারে সরাসরি তার হৃৎপিণ্ডে গিয়ে লেগেছে। মুখে হাত চাপা দিয়ে থামিয়ে দিয়েছে যত কথার ভুবড়ি। সত্যিই তো, খুব কি অযৌক্তিক কথা বলেছে মেয়েটা? কিন্তু নিন্তারের উপায় কি, কীভাবে পরিব্রাজ পাওয়া যাবে? নেশা বা এই অবসেসন থেকে কী করে মুক্ত হওয়া যাবে সেই উত্তর খুব সহজ নয়। দায়সারা ভাবে যাই বলা যাক না কেন সেইমতো কাজ করাটা কতটা সমীচীন নাকি হঠকাবিতাই হবে কে জানে। এ পৃথিবীতে কোনোকিছুই তো খুব সহজে করা যায় না। একটা কিছু গড়ে ওঠে বহুদিন ধরে। ভাঙা যেতেই পারে যে কোনো দিন। কিন্তু তার পর?

অবিনাশ এতক্ষণ চূপ করে শুনেছেন সব কথা। উত্তর বোধহয় তাঁর কাছেও নেই। এই দ্বিধাদ্বন্দ্বের মাঝে দিনযাপন একসময় তিনিও করেছেন। তাঁরও অবস্থা বহুব্যবহারই এরকম হয়েছে। পরিস্থিতি হাল্কা করাটা জরুরি। তিনি বললেন, এইবার গরম গরম কথার পর গরম গরম চা কি হতে পারে?

বোলতার মধ্যে কথার কোনো রেশই আর অবশিষ্ট নেই। তেমনি সহজ স্বভাবমতো সে বলে উঠল রহস্য করে, যেমন গরম গরম নিমকির পর গরম গরম চা, তেমনি?

অবিনাশ হেসে হাত নেড়ে ক্যান্টিনের সার্ভিসম্যান গোপালকে ডাকলেন। আধবুড়ো গোপালদা যেমন পুরনো এই লাইব্রেরি ক্যান্টিনে, ততোধিক রসিক মানুষ। গাইতে গাইতে এসে থমকে দাঁড়াল,—এমনই বয়স ছিল সেদিন/ শিয়রে প্রদীপ ছিল মলিন/ তব হাতে ছিল অলস বীণ/ মনে কি পড়ে প্রিয়.....।

অসমঞ্জ বলল, বা গোপালদা তো ভালো গাইয়ে লোক আছে।

গোপালদা উৎসাহিত হয়ে বলে, আর ভাই সেই গলা কি আর আছে?

দুধ চা কেউ খেল না, তিনজনের জন্যই এল শুধু লিকার। এমনিতে অবিনাশ দুধ বা চিনি খান না চায়। অসমঞ্জ বা বোলতাও দুধ চা পছন্দ করল না। নিঃশব্দে চায়ের পর্ব যখন সমাধা হল তখন বাইরে সন্ধ্যার পূর্বাভাস। ঘড়িতে প্রায় ছটা বাজে। ক্যান্টিন থেকে বেরিয়ে তিনজন হাঁটতে লাগল, দু'পাশে ফুলের বাগান, কেয়াবি করা ঝোপ, তার মাঝখান দিয়ে রাস্তা বেরিয়ে গিয়ে মিলেছে একেবারে বেলভেদর রোড ধরে আলিপুর চিড়িয়াখানার দিকে। মাথার ওপর আচ্ছন্ন অন্ধকারে ধোঁয়ার আকাশ। বোধহয় হাওড়া-সুগলির যত বাদুড় সব, যত কাদুড় গঙ্গা ওপারের বাঁশ-বাঁশলি ঝোপঝাড়ে থাকে, সব উড়ে উড়ে বেহালা, ডায়মণ্ডহারবারের দিকে যাচ্ছে। চলেছে সুন্দরবন। ছড়িয়ে পড়বে হয়ত কাকদ্বীপ, নামখানা, গঙ্গাসাগরের এদিকে ওদিকে। বেরিয়েছে যত নিশাচরেরা খাবারের সন্ধানে। এই পড়ন্ত গোখলিবেলায় পৃথিবীর একটি সুন্দর রূপ জেগে ওঠে, জাগায় মানব হৃদয়ের নির্জনতাকে। তারপর অপস্রিয়মান আলো-আঁধারিতে গিয়ে হাবিয়ে যায়। বিবেচক বা কল্পনাপ্রবণ মানুষের এই আবগমুখর মুহূর্তে মনে হতে পারে, এই এত ছোট্টছুটি, ভাব ভাবনা, ওঠাপড়া সবই অর্থহীন, অনিশ্চয়তায় ঢলে পড়ে।

এইখানে দুশো ত্রিশ নম্বরের বাস টার্মিনাস। উঠে বসলেন অবিনাশ। একেবারে বাড়ির কাছকাছি পৌঁছে দেবে এই বাস।

অসমঞ্জ বলল, স্যার আমরা আরো একটু হাঁটি। একটু হাঁটলেই পেয়ে যাব কমনলয়েলথ ওয়ার সিমেন্ট্রি। ওই সমাধিটা আমার খুব ভালো লাগে। গিয়ে দু'জনে মিলে বসে থাকব কিছুক্ষণ।

অবিনাশ বললেন, কাল কি আসছে নাকি?

—হ্যাঁ। দুপুর নাগাদ পৌঁছে যাব। রেডি হয়েই থাকবেন। তারপরই একসঙ্গে বেরোন যাবে।

বোলতা বলে উঠল, কালকেব অভিয়ান আবার কোনদিকে?

অবিনাশ বললেন; হাত খালি থাকলে তুমিও চলে আসতে পারো।

—না না, ওব এসে কার্জ নেই। হাঁটতে হবে অনেকটা। ও একটু আয়েসী, পাববে না। কাল আমরা হাওড়ার ইনটেরিয়রে জুজারশাহ্ নামে একটা মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় যাচ্ছি।

বোলতা ওকে কোনো কথা না বলে অবিনাশের দিকে চেয়ে বলে উঠল, ও আমাকে নিতান্ত সাধারণ একটি মেয়ে করেই রাখতে চায়, দেখলেন তো? ঠিক আছে, যাও তোমরা, আমার গিয়ে কার্জ নেই। আমি না হয় কালকের দিনটা ঘুমিয়েই কাটাব।

অসমঞ্জ বলে ওঠে, ঘুমিয়ে কাটাবে কেন, কাল তোমার স্কুল আছে না? যাবেই বা কি করে?

—কাল তো জন্মষ্টমী।

—তার মানে ছুটি?

—হ্যাঁ, গো মশাই।

—তাইলে না হয় ঘুমিয়েই কাটাও। বিশ্রামও হবে, খামোকা অতটা পথ হাঁটতে হবে না।

বাস স্টপ দিল, দুলে উঠল এবং গতি নিল নিজের নিয়মেই। অবিনাশ হাত নাড়লেন জানলা ধরে। ওদিক থেকে অসমঞ্জ আর বোলতাও হাত নাড়ল বিনিময়ে। দু'দণ্ডও কাটল না, ওদের চোখের বাইরে ঠেলে ফেলে বাস এসে ঢুকল সার্কুলার রোডে। তারপর ছুটতে শুরু করল রেসকোর্স, ভিক্টোরিয়া, রবীন্দ্রসদনকে পাশে রেখে। চলে যাবে শেয়ালদা শ্যামবাজার ডানলপ হয়ে আরও কিছুদূর। জানালার ফাঁকা দৃশ্যপথে তাকিয়ে রইলেন অবিনাশ। দৃশ্যালোকের ছটকোজটকা পটে পড়ছে কিনা তিনিই জানেন, জানেন ভাবনার জাল আপনা আপনি কতখানি বিস্তৃত হচ্ছে।

কে জানে এতক্ষণ হাঁটতে হাঁটতে ওরা আবার তর্ক শুরু করে দিয়েছে কিনা। আজকাল দেখা হলেই দুটিতে কেবল কথা কাটাকাটি করে। আর করবে নাই বা কেন, বোলতা যা চায় তাও তো যে কোনো মেয়েরই ইচ্ছার মধ্যে পড়ে।

বোলতা চায় অসমঞ্জ এবার ওসব ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো ছেড়ে দিয়ে একটুখানি স্বাভাবিক হোক। অসমঞ্জের দিকে তাকিয়ে সে যখন এতকিছু ছাড়তে পেরেছে তখন তারও উচিত দু'জনের ভবিষ্যৎ জীবনের দিকে চেয়ে একটুখানি বাস্তববাদী হওয়া। তাছাড়া যদি পুরোপুরি পটভূমিটা দৃষিত বা কলুষিত না হয়ে উঠত তবে না হয় আদর্শের জন্য কিছুটা স্যাফ্রিনফাইস করেও শান্তি পাওয়া যেত এই যুক্তিতে যে ভালো কাজের জন্য লড়াই দিচ্ছে মানুষটা। তা তো আব নয়, রাজনীতি এখন সবচেয়ে ঘেম্ভাব বিষয়। যে করে তাকে কেউ আর ভালো চোখে দেখে না। কেরিয়ার পলিটিস্ক কথটার আমদানি ঘটেছে, কিন্তু ওখানে কোনো সুস্থ কেরিয়ার হওয়ার নয়, যদি না যিনি কেরিয়ার গড়তে উদ্যোগী হয়েছেন তিনি আপাদমস্তক ধড়িবাঁজ আর দুর্নীতির লোক হন। ওসব নোংরা রাজনীতির থেকে অসমঞ্জকে বের করে সাংসাবিক জীবনে আনতে চায় বোলতা। বলতে চায়, অনেক তো হল, এবার বিয়ে-থা করে একটু স্থির হয়ে বসতে চাই। আমার পরিবারও তাই চায়। বয়সও বাড়ছে। এখনো যদি তোমার স্টুডেন্ট লাইফের হ্যালুসিনেশন না কেটে থাকে তবে সেটা খুব ভালো কথা নয়। তুমি যা নিয়ে আছ, থাকতে চাইছ সেই কাজটা যদি ভালো হয় তবে আমিই তোমাকে উদ্বুদ্ধ করতাম। আমার অসমঞ্জ দশজনের একজন এটা দেখতে আমার চেয়ে আর কার বেশি ভালো লাগবে বলো।

জানেন বোলতা যে অসমঞ্জের কোনো যুক্তিযুক্ত উত্তর নেই। থাকারও কথা নয়, সূতরাং ওম হয়ে বসে থাকতে হয় তাকে।

কিছু বলতে পাবে না অসমঞ্জ, বলতে পারে না রাগ করেও যে, আমার অপেক্ষায় বসে না থেকে তুমি বরং আবো ভালো কিছু ভাবতে পারো। বলতে পারে না, কেন না সে ভালো করেই জানে, খালি চোখেই দেখেছে, বোলতা ইচ্ছে করলে তাকে ছেড়ে কবেই রাজনীতির উচ্চস্তরে পৌঁছে যেতে পারত ছোট চৌধুরীর হাত ধরে। অসমঞ্জের দলের প্রধান সেই। রূপেগুণে সবদিক থেকে আকর্ষণীয় বোলতা তারই কিন্তু আবিষ্কার।

সে ইতিহাসটাও কম ঘনঘটাময় নয়। বোলতা তো ডাক নাম, আসল নাম তার মধুবিমা সেন। লেডি ব্রাবোর্ন কলেজেব মেধাবী ছাত্রী। কলকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে মাস্টার ডিগ্রি করতে এসে পড়ল রাজনীতির খপ্পরে। ছাত্র রাজনীতির মধ্যমণি হয়ে উঠতে তার খুব বেশিদিন লাগল না। ছাত্রদের সঙ্গে এই কলেজ ওই কলেজ কনভেনশনে যেতে হত। কখনো এক জেলা থেকে আরেক জেলায়। এই সময় প্রেসিডেন্সি কলেজ স্টুডেন্টস ইউনিয়ন আয়োজিত এক সেমিনারে বস্তুব্য রাখার সুযোগ পেয়েছিল মধুরিমা। এমনিতে প্রেসিডেন্সি কলেজে নকশালদের প্রভাব বরাবরই বেশি। সেই ষাট সন্তরের সময় থেকেই। কি নেতৃত্বে, কি মেধাবি ছাত্রদের যোগদানে, এই কলেজটির ভূমিকা সবারই জানা। মধুরিমা কিন্তু এস এফ আইয়ের সক্রিয় কর্মী ছিল। অসাধারণ পারদর্শিতা ছিল তার বক্তৃতা বা বিতর্ক করায়। বোধহয় সেই সূত্রেই কোনোভাবে এই সেমিনারে প্রস্তাবিত বক্তা তালিকায় না থেকেও সে বক্তার সুযোগ পেয়েছিল বা করে নিয়েছিল অডিয়েন্স থেকেই। মঞ্চে বসেছিলেন হালফিল নকশাল পুনরুত্থানের অন্যতম প্রধান কমরেড ছোট চৌধুরী। একসময় তাঁর নামে বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খেত। এখন তিনি বিভিন্ন ইংরেজি ডেইলিতে স্বনামে কলাম লেখেন। দু'একখানি বৈপ্লবিক চিন্তাধারার বই লিখেও নাম কবলেছেন। এই দুঁদে নেতার নজরে পড়ল ওই তথ্য দর্শনা মধুরিমা।

মেয়ের চোখে তখন মোহকাজল।

ছোট চৌধুরীর খপ্পরে এসে ঢুকতেই হল তাকে। ছাত্র রাজনীতির দিন তখন প্রায় শেষ, সিজ্ঞথ ইয়ারের পরীক্ষা দিয়ে মধুরিমা আউট গোল্ড স্টুডেন্ট। তার কাছে অফার এল যুবরাজনীতিতে যোগদানের। কিন্তু শর্ত এস এফ আই কিংবা সি পি আই এমের সঙ্গে সবারকম সম্পর্ক ছাড়তে হবে তাকে।

ইতিমধ্যে দেখা গেছে কফি হাউসের টেবিলে ছোট চৌধুরীর সঙ্গে মধুরিমা কিকফির কাপে চুমুক দিতে দিতে রাজনীতির তত্ত্বকথা আলোচনা করতে। পরিমণ্ডলে দাম বেড়ে গেছে তার। এমনি কমরেড স্বয়ং তাকে নিজের গাড়িতে বসিয়ে বাড়ি অফি লিফ্ট দিয়ে দিচ্ছে। একসময় তো শোনা গেল দুজনের নাকি বিয়ে হচ্ছে খুবই শীঘ্রি। কিন্তু ছোট চৌধুরী তো বিবাহিত, সন্তান আছে দুটি। এ ছাড়া বাজারে বদনামও কম নয়। কিন্তু লোকে বলল, সব জেনেও নেই মধুরিমা তাকেই বিয়ে করতে চলেছে, এতে নাকি আখের তার ভালোই হবে। কাগজে কাগজে মেধাবী অরেটর হিসেবে ছবি ছাপা হতে লাগল মধুরিমার। উগ্র বামপন্থী যুব নেত্রী হিসেবে পরিচিত হল সে।

এমন সময় অসমঞ্জ এসে যোগ দিল ওই দলে। সেও ওই চৌধুরী সাহেবেরই কালেকশান।

তখন আর ছোট চৌধুরী মধুরিমাকে ওই নামে ডাকেন না। অল্প আদুরে স্বরে বোলতা বলে ডাকেন। আলাপ করিয়ে দিলেন ছোট চৌধুরী। অসমঞ্জকে বললেন, চেনো তো। এই হল মধুরিমা সেন?

—আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে ভালোই লাগল, অসমঞ্জ বলল।

—কেন?

আপনার মতো একজন সাহসী কমরেডের সঙ্গে কাজ করতে পারলে —অসমঞ্জের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ছোট চৌধুরী বললেন, তোমার থেকে বেশ ছোটই হবে রাণা। এখনো ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে। দারুণ ছেলে। হাড্ডেড পার্সেন্ট অনেস্ট। দেখ, তুমি একে যদি কোনো কাজে লাগাতে পাবো। ব্রিলিয়ান্ট স্কলার।

মধুরিমা দেখল আপাদমস্তক। একটা বুদ্ধিদৃষ্ট তরুণের বলক চেহারায়।

সেইদিকে তাকিয়ে তারপর বলে উঠল, রাণা।

—ওটা আমার ডাক নাম। আপনি বলবেন অসমঞ্জ।

—বেশ তাই হবে।

—আপনার ডাকনামটা কিন্তু ভারী সুন্দর। বেয়ার। এ সচরাচর পাওয়া যায় না।

—তোমার ভালো লাগলে ওই নামেই ডাকতে পারো। দ্বিধাহীন ভাবে মধুরিমা বলল। এরকম কত আলাপই ঘটেছে তার জীবনে। ফ্রি, ফ্র্যাঙ্ক হিসেবে তার কোনো তুলনা নেই। মেয়েলি জড়তা নেই বললেই চলে। বরং কিছুকাল ছাত্র রাজনীতি করে, কথাবার্তায় অদ্ভুত একটা কমাগুঁষ ভাব এসে গেছে।

কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল ওদের মেলামেশা গড়ে উঠেছে ভাই বা বন্ধুর মতো। এতে অবশ্য কমরেড চৌধুরীর আপত্তি থাকার কথা নয়। তিনি সবসময় ইচ্ছে থাকলেও সময় দিতে পারেন না এইসব সহকর্মীদের। কাছাকাছি বয়সের একজন সঙ্গী পেলে মধুরিমা আবো স্বচ্ছন্দ থাকবে, এই ভরসা যখন ছোট চৌধুরী নিশ্চিত এমনি একদিন শুনলেন তাঁর স্নেহন্য রাণা মধুরিমাকে তার ডাকনাম বোলতা বলেই সম্বোধন করছে। শুনে খুব ভালো লাগল না তাঁর। কিন্তু হাবভাবে কোনোরকম প্রকাশ দেখালেন না। শুধু তির্যক চোখে দু'জনকে লক্ষ্য কবলেন। যাকে চলতি ভাষায় বলে মেপে নেওয়া।

বড়বাড়ির ছেলে চৌধুরী। আবির্ভাবকালে অনেকটা কমরেড চারু মজুমদারের কথা মনে করিয়ে দেবে। কিন্তু পরবর্তী কালটায় তাঁর সঙ্গে মেলে না। জমিজমা টাকাপয়সা ঘরপোর কোনোকিছুরই অভাব ছিল না তাঁর। তিনিও এসেছিলেন সংগ্রামের ভেতর দিয়ে গ্রামবাংলা থেকেই। এক কথায় রইস আদমি হয়েও, ছিলেন না তেমনটা। প্রতিটি পদক্ষেপে ছোট চৌধুরীর ছিল দৃঢ়তার ছাপ, বুকে বাঁধা সঙ্কল্পের চাবিকাঠি বন্ধন করে উঠত। এখনকার মতো দামি ও মিহি ধুতি-পাঞ্জাবি তিনি আগে পরেননি কখনো, পরতেন না। ব্যবহার করতেন না উগ্র এই সিগার বা পারফিউম। বেপরোয়া ও সাহসী ছিলেন যেমন, তেমনিভাবেই এসে মুক্তির সংগ্রামে হাতে বন্দুক তুলে নিয়েছিলেন। কেন না বন্দুকের নলই হল ক্ষমতার উৎস। নীতি ছিল, শ্রেণীশত্রুদের খতম করো।

যথা নিয়মেই সংসদীয় গণতন্ত্রকে বজ্রনের ডাক দিলেন তিনি। শুণ্ড সমিতিকে আরো জোরালো করে ভূমিমালিক, শিল্পপতিদের ত্রাস হয়ে উঠলেন। রোজ এক-দুটো লুট বা খুন না কবলে ফেন তাঁর দিনের ভাত হজম হত না।

এইভাবে খুনের রাজনীতিতে তিনি জোয়ার সৃষ্টি করলেন। সেটা কিন্তু ঠিক ষাট অথবা সত্তরের শুরুর কথা নয়, বরং আরো একটু পরের কথা, যখন প্রকৃত বিপ্লবীরা ছত্রভঙ্গ, কেউ আত্মসমর্পণ করে জেলখানায়, কেউ বেমালুম বেপান্তা, ইতিহাস হয়ে গেছেন কেউবা। নকশাল আন্দোলন পুরোপুরি না হলেও যে ব্যর্থ হয়ে গেছে, ক্ষমতাসীন শাসকদল তা প্রমাণ করে দিয়েছে। কিন্তু আশুন তখনো পূর্বোপুরি নেভেনি। তুষাণির আগুনের মতো ভেতরে চাপা থেকে ধিকিধিকি জ্বলছিল। যে কোনো সময় দাউ দাউ কাণ্ড ঘটতে পারে জেনে সতর্ক ছিল পুলিশ ও প্রশাসন। এমন সময় ফের দুর্বীর গতিতে দমকা বাতাসের মতো কারো কারো উত্থান মৃতপ্রায় খুনে রাজনীতিকে উসকে ফেলছিল। কর্তৃপক্ষ চিন্তিত করে দিচ্ছিল যে ওরা অ্যান্টিসোস্যাল—

আসলে উদ্ভাল সেই মাওবাদী জঙ্গি আন্দোলনের পর এবং ১৯৭৭ সালের রদবদলে বামফ্রন্টের ক্ষমতা প্রাপ্তির মধ্যবর্তী সময়ের রাজনীতি এভাবেই চলছিল। সরকার ইতিপূর্বেই নকশাল আন্দোলনের মেরুদণ্ডটা ভেঙে দিয়েছিল। মনোবল হারালেও কেউ কেউ তখনো বিশ্বাস করত যে কোনো সময় ফের রেজারেকশনের সূচনা ঘটতে পারে। সরকারি নির্দেশে পুলিশ খুন-জখম কম করেনি, কিন্তু খুনের রাজনীতির নায়ক হিসেবে পরিগণিত হয়েছিলেন তৎকালীন যুব বিপ্লবীরা। যখন একই পথে ও মতে আত্মশীল বামফ্রন্ট গঠিত হল সেই মন্ত্রীসভাও পূর্বতনের মতো চাইল নকশাল কর্মীরা শাসকদলের কাছে আত্মসমর্পণ করুক। শুরু হল খানা-তন্মাসি, নিগ্রহ, অত্যাচার। নেতৃস্থানীয়দের বলা হল, পুলিশের কাছে ধরা দাও, নয় সরকারের সঙ্গে বফা করে মূল ধারায় ফিরে এসো। তা না হলে অন্তত জঙ্গি আন্দোলন থেকে সবে এসো। নেতাদের অধিকাংশই যখন আত্ম সমর্পণ করল তখন তাঁদের বেয়াড়া অনুগামীদের নিয়ে জাগল বিপদ। যারা সরল সিধে মনে মনে নিল তারা তো ওই আপোষপন্থী নেতাদের সঙ্গেই রইল। যারা এল না তাদের কাউকে গুমখুন করে, কাউকে রাতের অন্ধকারে বন্দুকের মুখে সাক্ষীপ্রমাণ না রেখে পুলিশ দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হল। যারা ধরা পড়ল তারা খুনি হিসেবে ভোগ করল জেল হাজত বা শাস্তি। মাঝখানে যারা রইল, গণ মাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে শাসকদল তাদের অ্যান্টিসোস্যাল বলে চিহ্নিত করে দিল। ধীরে ধীরে তারা পরিণত হল যাকে বলে আগার গ্রাউণ্ড ক্রিমিনালে। কৃষ্ণগরের রমেন সাহা আত্মসমর্পণে রাজি হননি, কিছুকালের মধ্যে অদৃশ্য আততায়ী বা দুষ্কৃতকারীর হাতে প্রকাশ্য দিবালোকে তাঁকে খুন হয়ে যেতে হল। ইতিমধ্যে বন্দী অবস্থায় জেল হাজতের মধ্যে রহস্যজনক ভাবে মৃত্যু হয়েছে অনেক বিপ্লবীর, যাদের মধ্যে কমরেড চারু মজুমদার অন্যতম, সে কথা সকলেরই জানা। সকলেরই জানা, মাঠে-ময়দানে, অলিতে-গলিতে পাওয়া গিয়েছিল বহু বিপ্লবীর লাশ, যাদের মধ্যে কমরেড সরোজ দত্ত অন্যতম। ১৯৭১ সালের ২০ আগস্ট চারু মজুমদার লেখেন, গত ৪/৫ তারিখে মধ্যরাতে পুলিশ কমরেড সরোজ দত্তকে বন্দী করে এবং সেইরাত্তই গোপনে তাঁকে গুলি করে হত্যা করে। চেয়ারম্যান বলেছেন, একটা ভালো কাজ করা কারো পক্ষেই কঠিন নয়, কঠিন কাজ হচ্ছে সারাজীবন ধরে ভালো কাজ করা, কখনো কোনো খারাপ কাজ না করা, সর্বদা জনসাধারণ, ও বিপ্লবের জন্য হিতকর হওয়া, কয়েক দশক ধরে একটানা কঠোর সংগ্রাম করা। এটাই হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন কাজ। কমরেড সরোজ দত্ত ছিলেন এইরকমই একজন। কমরেড, যার সারাটা জীবন বিপ্লবের কাজে ব্যয়িত হয়েছে।

যাঁরা রয়ে গেল তারা সুবিধাজনক শর্তে বামফ্রন্টের অংশীদার হয়ে পড়তে বাধ্য হল। ইতিমধ্যে পার্টির মধ্যে ভাঙন ধরেছে। সি পি আই (এম এল) দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় কমিটির নামে আবার রাজনৈতিক কার্যকলাপ আরম্ভ হল। এই সময় অজিঙ্জুল হক প্রমুখ আবার গ্রেপ্তার হলেন। বাইরে রইলেন ওই ছোট চৌধুরী প্রমুখ কয়েকজন। তখনো ঘোলা জলে মাছ ধরতে শুরু করেননি তিনি, তখনো তিনি বন্দীমুক্তির দাবীতে সোচ্চার, তখনো তাঁর মধ্যে ছিল আদর্শের ছিটফোঁটা। নতির বালাই পরে মুক্ত হলেন অজিঙ্জুল। কানু সন্ধ্যাল ফিরে গেলেন তাঁর ইচ্ছেমতো আয়াসহীন যৎকিঞ্চিৎ জীবনযাপনে। সরকারি সাহায্য নেওয়া হয়ে যাবে বলে শোনা যায় তিনি নাকি বাড়িতে ইলেক্ট্রিক আলোর কানেকশন না নিয়ে এই আধুনিক যুগে বসে লঠনের আলোর লেখাপড়ার কাজ করেন একরকম নির্বাসিতের মতোই। আর ওই

ছোট চৌধুরী বা তাঁর কার্কনকপি যে কখন পড়ে রইলেন তাঁরা অসচ্চরিত্র, লম্পট আর 'মাতাল রাজনীতিকের মতো বেঁচে রইলেন। কাজের কাজ যখন রইল না হাতে তখন কিছু তো একটা করতেই হবে। ফলে গায়ে তাঁরা বামপন্থার নামাবলী চড়ালেন। মুখে যুবকদের বিপথে চালনা করার মতো বুলি।—বিপ্লব কবে আসবে কেউ জানে না, যে কোনো দিন, তার জন্য প্রস্তুত থাকো। প্রস্তুত থাকতে হবে। নকশাল রাজনীতির মৃত্যু নেই। বিপ্লব মরে না।—এইসব আপ্তবাক্য চালিয়ে নিজেদের অস্তিত্বটুকু প্রমাণ করতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন এইসব রাজনীতি করিয়েরা। এক সময় দেখা গেল এই দলে চার-পাঁচটা কি আরো বেশি ফ্র্যাকশন এসে গেল। সবাই নেতা, যে যার আলাদা দল। সব দলেই লোক এসে ভিড় করছে। কিছু কিছু পথপন্থি তরুণের। ওইসব নেতারা আত্মসিদ্ধির কাজে তাদের ব্যবহার কবছে। ভুল বোঝাচ্ছে, বিপথে চালিত করছে। কোনো কোনো তরুণের মধ্যে সন্দেহ জাগলেও ঐতিহাসিক সেই আফিংয়ের ঘোর কাটাতে বা সঠিক বুঝে উঠে ঠিক পথে ফিরতে দেরি হল। কারো বা হল না ফেরা। তাদের না হল জীবন, না হল বেঁচে থাকার সংস্থান। এমনকি ফ্রান্সিসের মধ্যে পড়ে কেউ নেশায় ডুবে গেল, কাউকে বা আত্মহত্যা করে ভুলেব মাসুল গুনতে হল—এমন দৃষ্টান্তও দুস্তাপ্য নয়। কিন্তু তখন 'নকশালকারী' এই হুজুগ চলতে লাগল যুবক-যুবতীদের মধ্যে। কাগজে ছপা হচ্ছে—অজিঙ্জুল, অসীম প্রমুখদের অগ্নিগর্ভ রচনা, কারান্তরালে আঠারো বছরের কাহিনী, বেরোচ্ছে নকশাল আন্দোলন নিয়ে নানান বইপত্র। মহাশ্বেতা দেবী লিখলেন—'হাজার চুরাশীর মা'। এই উপন্যাসের কটতি হল ভালো। গোবিন্দ নিহালনি তাই নিয়ে সর্বভারতীয় ভাষা হিন্দিতে ফিল্ম বানালেন। কেউ কেউ বলল, সমরেশ বসুর জঙ্গল সীওতালের ছায়া অবলম্বন লেখা নভেলটা পড়ে দেখতে পারো। দিব্যেন্দু পালিতের কাহিনী 'সহযোগ' নাকি আসলে ব-কলমে কমরেড সরোজ দত্তের অন্তর্ধানের কাহিনীই। যাই হোক এই পড়ে ভালোমন্দ হাবিজাবি গোত্রাসে গিলতে লাগল তরুণ সমাজ। মনের মধ্যে তার প্রভাব অস্বীকার করার নয়। ছাত্র রাজনীতি মানেই নকশাল করা, সাহসী-ভীতু, সংগ্রামী বা কুঁড়ে, গোপনে আগ্নেয়াস্ত্র বে-আইনি ভাবে বহন করতে লাগল। কেউ কেউ খুঁজে বেড়াতে লাগল, কী করে নকশাল দলে নাম লেখানো যায়, কীভাবে দেখা পাওয়া যায় ওইসব নেতাদের। দীক্ষা ঘটবে কখন।

এ ভাবেই মধুরিমা বা অসমঞ্জরা পেতে রাখা ফাঁদে এসে পা আটকে ফেলল। যখন বুঝল, তখন দেখল উদ্ধারের রাস্তা বন্ধ।

দেখল তাদেরকে নানাভাবে ব্ল্যাকমেইল করা হচ্ছে, দেখানো হচ্ছে ভয়, শাসনো হচ্ছে নানাভাবে। পরম বন্ধুকেও যে মুখ ফুটে বলবে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বা মন্দ, কিংবা বিশ্বাসহীনতার কথা, তাতেও দ্বিধা। কেন না কে ভালো কে মন্দ, কিংবা ভালোমানুষের ছদ্মবেশে কে আসলে আড়কাঠি বা খোচর তাই বা কে বলতে পারে। পচে যাওয়া ফৌড়ার ভেতরে থাকা পুঁজ যেমন যে কোনো ভাবে বেরিয়ে আসতে পারলে বেঁচে যায় তেমনি এক দমবন্ধ করা অবস্থার মধ্যে দিনাতিপাত করতে লাগল ওরা।

সেদিনকার কথা অসমঞ্জ কোনোদিন ভুলবে না।

বাইরে বৃষ্টি হচ্ছিল সমানে। ওরা অফিসঘরে। নানারকম পোস্টার ফেস্টুন লেখা হচ্ছিল সেখানে। সবাই চলে যেতে সন্ধ্যার পর সেসব ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল এখানে ওখানে।

তার আগে ছোট চৌধুরী সম্বন্ধে তার জানাশোনার পরিধিটা ছিল ভাঙ্গা

ভাসা।

—অসমঞ্জ বলল, বোলতা।

—উম।

—আর কতক্ষণ অপেক্ষা করবে, এই বৃষ্টিবাদলার দিন মনে হয় না যে ছেঁড়দা আসতে পারবে।

—না অসমঞ্জ উনি আসবেনই, আর যতক্ষণ না আসছেন আমাকে এখানে ওয়েট করতে হবে।

রাত্রি আটটা সাড়ে আটটা বেজে গেল। অন্যদিন হলে কথা ছিল, আজ এই ঋতুবাদলার রাতে চারদিক ইতিমধ্যেই সুনসান হয়ে উঠেছে। বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখল অসমঞ্জ রাস্তায় একটা ভেজা কুকর কেমন কঁকড়ে মাঝে মাঝে লেজ ঝেঁড়ে নিচ্ছে। অসমঞ্জ একটা সিগারেট ধরালো। বোলতাকে তেমনিই উদ্বিগ্ন লাগছে। আকাশের অবস্থার কোনোরকম উন্নতি নেই। মাঝে মাঝে হাওয়ায় ঝাঁপটা দিচ্ছে। নটা বেজে গেছে কখন।

অসমঞ্জ বলল, বোলতা এককণা চা খাবে?

—নেপাল তো চলে গেল। কে নিয়ে আসবে?

—সে আমিই নাহয় নিয়ে আসছি ওই মোড়ের মাথার দোকান থেকে। নিজে খেয়ে, খুরিতে করে তোমার জন্য। গরম গরম ধোঁয়াওড়া চা খেলে হয়ত স্বস্তি পেতে পারো।

শেষ কথাটায় বোলতা তাকাল অসমঞ্জের দিকে, খানিকটা সহমর্মিতার দৃষ্টি। অন্যদিন হলে হয়ত বলেই ফেলত, না, আমি ভালোই আছি। কিন্তু আজ আর বলল না। সে যে ভালো নেই, এই সত্যটা কিছুদিন ধরেই অসমঞ্জের কাছে ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আর গোপন রাখা গেল না। গোপন রাখতে গেলে নিজেকে সুরক্ষিত রাখা যাবে না এই বুঝে বোলতা বলল, যাও তবে, খুব দেরি করো না আবার।

সিগারেটের কাউন্টার পাটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নামল অসমঞ্জ। ছতা নেই। বৃষ্টির ফাঁটা দু'একটি কিন্তু বড় এবং তীব্র। হাওয়ার দাপটটাই বেশি। প্রায় দৌড় মারার মততায় লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেল অসমঞ্জ।

যখন ফিরল, হাতে গরম চায়ের ভাঁড়, ঢুকতে যাবে অফিসের ঘরে, এমন সময় হাজার সুনল, কে বলেছিল তোমাকে।

দূরে দাঁড়িয়ে আছে গাড়িটা। অসমঞ্জের ওটা দেখে এবং হাজার শুনে বুঝতে অসুবিধা হল না ছোট চৌধুরী এসে পড়েছে ইতিমধ্যে। থমকে দাঁড়াল অসমঞ্জ। দাঁড়িয়ে পড়ল।

হাতের থেকে গরম চায়ের ভাঁড়টা জানলার এক কোণে সাবধানে রেখে শোনার চেষ্টা করল ভেতরকার কথাবার্তার আঁচ।

হাওয়ায় জানলার পর্দা সরে জড়িয়ে আছে লোহার শিকের সঙ্গে। সেই হা হা হয়ে থাকা দৃশ্যপথে ভেতরকার ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠল। তাছাড়া দরজাও খোলা আছে। সুতরাং কোনোরকম রাখঢাক বা গোপনীয়তার প্রশ্ন নেই। তবুও ভেতরে ঢুকতে সাহস হল না অসমঞ্জের। কোনো সিনিয়র কমরেড যখন জুনিয়রকে শাসন করে তখন সেই জুনিয়র যত বন্ধুই হোক না কেন তার মধ্যে মাথা গলাতে নেই। এটাই নিয়ম। অবস্থা স্বাভাবিক হবে, তার আশায় বাইরে দাঁড়িয়ে রইলো অসমঞ্জ।

ভেতরকার কথাবার্তার দ্বিট বৃষ্টির ঝাঁটের মতো গায়ে এসে লাগছে। অসমঞ্জের বুঝতে বিন্দুমাত্র দেরি হয় না যে লোকটা গলা পর্যন্ত মদ গিলে চুর চুর হয়ে স্ক্যাপা মহিষের মতো মাতাল হয়ে ফিরেছে। এখন সামনে

যা পাবে ভাঙতে ইচ্ছে করবে ওর। নেড়িকুত্তার বাচ্চার মতো যাকে পাবে ছুঁড়ে ফেলবে যেন। ইদানীং মদ্যপানের মাত্রা যেন দিনদিন বেড়েই চলেছে। তাই দেখা মাত্র বুদ্ধি করে সবাই ওব সীমানার বাইরে চলে আসে। পালাবার পথ খোঁজে। যেন মানুষ না, একটা ক্ষুধার্ত বাঘ এসেছে। কিন্তু একমাত্র বোলতা পালায় না। বরং তার কাছে দাঁড়িয়ে চোটপাট করতে করতে অনেকবার শাস্ত হয়ে ছোট চৌধুরী ক্ষান্ত দিয়েছে। এই সময় আগে আগে বোলতা উপস্থিত থাকলেও কথা বলত না, শুধু তাকাত বিশ্রীভাবে। তাতেই কাজ হত। কিন্তু আজ যেন লোকটার ওপর শয়তান ভর করেছে।

ছোট চৌধুরী গর্জে উঠল, কী হল, কথা শুনতে পাচ্ছ না?

বোলতা বলল, না। আপনার কথা ঢের শুনেছি। আর শুনব না।

—কী বললে!

—আপনার কথা শুনতে গিয়েই কলেজের চাকরি আমি ছাড়তে বাধ্য হয়েছি। আপনার জন্যই নিজের দিকে তাকাতে পারি না আমি।

—কেন, কী করেছি তোমার?

—সে আপনি বুঝবেন না।

—বুদ্ধিটা তোমার মতো নয় বলে। যাক, বাজে কথা না বাড়িয়ে গাড়িতে ওঠো গিয়ে।

—না।

—যাবে না?

—না।

—ঠিক আছে, দেখছি কেমন করে তোমাকে নিয়ে যেতে হয়।

—জোর করে নিয়ে যাবেন?

—দরকার পড়লে তাই করতে হবে বৈকি।

—আমি কিন্তু চিৎকার করব।

কিসসু লাভ হবে না। কেউ আসবে না। তুমি ভুলে যেও না আমার নাম ছোট চৌধুরী, কমরেড ছোট চৌধুরী।

এই বলে ছোট চৌধুরী এগিয়ে গিয়ে বোলতার হাতটা ধরতে চেষ্টা করলেন কিন্তু পারলেন না, তার আগেই টলতে টলতে পড়ে গেলেন। তারপর আর কিছুতেই উঠে দাঁড়াতে পারলেন না। দরজা দিয়ে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কোনোরকমে উঠে দাঁড়িয়ে জুজু কমরেড বোলতার আঁচলটা ধরে ফেললেন। বোলতা চিৎকার করে উঠল, ছেড়ে দিন। আমি যাব না।

উন্নত মাতাল গর্জে উঠল, তোর বাপ যাবে—

এই বলে হাতখানা ধরে হিড় হিড় করে দরজার দিকে বোলতাকে টানতে শুরু করলেন ছোট চৌধুরী।

আর চূপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না অসমঞ্জ। সে সটান দরজার কাছে ছুটে গিয়ে বঙ্কগঙ্গীর স্বরে ফেটে পড়ল, ছেড়ে দিন ওকে।

—ও তুমি! তুমি এত রাতে এখানে কী করছ?

—এটা পাটি অফিস। অনেক রাত অঙ্গি খোলা থাকে। যে কেউ আসতে পারে।

—তুমি পাটির কে?

—আপনি যা, তার থেকে কোনো অংশে কম কেউ নই।

—ও, বটে। এত স্পর্শ তোমার। দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা। এই বলে কোমরের কাছে হাত পাঠিয়ে একটা রিভলবার বের করলেন চৌধুরী।

ভয়ে আঁতকে উঠে বোলতা কঁকিয়ে উঠল, তুমি চলে যাও অসমঞ্জ। ওকে তুমি জানো না। ও খুনী। বহু খুন করেছে। রক্তপাতে ওর হাত কাঁপে

না। যে কোনো মুহূর্তে ও গুলি করতে পারে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে।

ট্রিগারে হাত দিলেন ছোট চৌধুরী।

সুদূর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল এইবার অসমঞ্জ। পালাল না। আত্মরক্ষার চেষ্টাও করল না। সোজা ঝুঁকু হয়ে কেবল পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল।

হাত কাজ করছে না চৌধুরীর, আঙুল নড়েনা ট্রিগারের গায়ে, কেমন যেন বিশ্বাস ঘাতকতা করছে। সিংহের মতো কেশর ফুলিয়ে, ঝাঁকড়া চুল দুলিয়ে গর্জে উঠতে গেল লোকটা। কিন্তু গলাটা ভাঙা শোনাল, অনেকটা বসে যাওয়া। ফ্যাসফেসে শোনাল।

পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে অসমঞ্জ চৌধুরীর হাত থেকে রিভলবারটা কেড়ে নিয়ে মেরেয় ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিল। বলল, খেলনাটা ফেলে দিন। অসহায় জীব যেমন ফুঁসে ওঠে তেমনি বলার চেষ্টা করলেন ছোট চৌধুরী, ওট্র খেলনা নয়।

দৃঢ় স্বরে বলে উঠল অসমঞ্জ, আজ ওটা খেলনাই কমরেড। সে দিন চলে গেছে। রিভলবারে হাত রাখতে যে সততার প্রয়োজন তা আপনার নেই। বিষহীন টোঁড়া সাপের মতো না ফুঁসে, যান, বসুন চুপ করে। লজ্জা করে না আপনার, একজন মহিলা কমরেডের গায়ে হাত তুলতে?

এই বলে সে বোলতার কাছে এগিয়ে গিয়ে তাকে বলতে গেল, চলে এসো। আমি তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দেব।—কিন্তু সেকথা বলার আগেই বোলতা তার বুকে পড়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

ছোট চৌধুরী হেসে উঠলেন নাটকের ভিলেনের মতো, ও, যা ভেবেছিলাম তাহলে তাই। এত দূর গড়িয়েছে।

বেপরোয়া অসমঞ্জ বলে ওঠে, বেশ হয়েছে।

—আমি তোমাকে দল থেকে সাসপেন্ড করব।

—ক্ষমতা থাকলে করবেন।

—আই উইল কিং ইউ আউট।

—আপনার মুখোশ খসে পড়ছে।

—খবর কাগজে বলে দেবে?

—সবাই জানে। নতুন করে তার দরকার কি? বাকিদের মতো আমরাও আপনাকে ছেড়ে চলে যাব।

—হ্যাঁ যাও। এই মুহূর্তে বেরিয়ে যাও।

—যাচ্ছি, আপনি বরং বসে বসে আরো কয়েক পেগ গিলে নিন।

—বেশ করব খাব। একশোবার খাব। আমি কারো বাপের পরসায় খাচ্ছি না—

—মুখ খারাপ করবেন না বলে দিচ্ছি।

—কেন করলে মারবে নাকি? ফণা তোলা সাপের মতো উদ্যত হয়ে দাঁড়াতে গেলেন চৌধুরী।

অসমঞ্জ বলে উঠল, দরকার পড়লে তাই করতে হবে বৈকি।

এ কথায় কেমন যেন একটু ভড়কে গেলেন কমরেড। মাতাল অবস্থায় পিছিয়ে গেলেন কিছুটা। বলে উঠলেন, ঠিক আছে, দেখা হবে।

—প্রকৃতিস্থ হয়ে বলবেন, নিশ্চয় হবে।

রাস্তার কুত্তার মতো তোমাকে তুলে এনে আমি—

—মুখ সামলে কথা বলবেন কমরেড।

বচসার মাঝে বোলতা বলে উঠল চলো অসমঞ্জ আমরা চলে যাই। এই অসভ্যতার সঙ্গে কথা বলাও বুধা।

ঝড়ের মতো অতর্কিতে ওরা দু'জন অফিসঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল

সেদিন। শাস্ত নিবন্ধন রাস্তায় কচিৎ কদাচিৎ কোনো যানের আলো দেখা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না। বাসের জন্য অপেক্ষা না করে ওরা ট্যাক্সি ধরল একটা। ছুটে লাগল ট্যাক্সিটা, কখনো বা পিছলে কখনো বা হাওয়ায় ঝিক ঝিক করে আওয়াজ তুলে।

ব্যাকসীটে পিঠ এলিয়ে দিয়ে বোলতা অঝোরে কাঁদতে লাগল। অসমঞ্জ কিছু বলল না। কাঁদুক। কানটা জরুরি মনে হল তার।

কিছুক্ষণ পর আপনা থেকে চোখ মুছে নাক টেনে বোলতা বলে উঠল, সরি অসমঞ্জ, আই অ্যাম রিয়্যালি সরি ফর টু-ডেজ ইনসিডেন্টস—

অসমঞ্জ পরিষ্কার মাতৃভাষার বলে উঠল, সরি বা থ্যাঙ্ক ইউ দরকার নেই। আমি জানি, তুমি নিজের সঙ্গে নিজে একটা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছ বেশ কিছুদিন ধরেই। আর তোমাকে কখনো মুখ-ফুটে বলা হয়নি যে আমার মরাল সাপোর্ট সবসময়ই তোমার সঙ্গে।

যথাবিহিত পদ্ধতি মতোই এবং প্রত্যাশিত ভাবেই পরদিন সকালে অসমঞ্জ রিসিভ করেছিল একটি নম্র মোলায়েম গলার ফোন,—রাণা আমি বলছি। কাল রাতের ওই দুর্ঘটনার জন্য আমি সত্যিই লজ্জিত। দুঃখিত। জানি এ ধরনের কাজের কোনো ক্ষমা হওয়া উচিত নয়, তবু তোমার কাছে বলেই চাইতে পারি সহজেই। তুমি একজন সাহসী ও একনিষ্ঠ কমরেড। আরেকজন কমরেডের দুর্বলতার বা প্রবলেম বিহেবিয়র তুমি বুঝে নিশ্চয়। বুঝতেই পেরেছ যে কাল আমি একেবারেই আমাতে ছিলাম না। রোজ্জই ভাবি, আর খাব না। এবার ছেড়ে দেব। কিন্তু জানো তো একটা শয়তান কিভাবে যেন আমাকে ভর করে পাগল করে তোলে। আমি পেগের পর পেগ খেতে থাকি। যেন নিজের বিরুদ্ধেই প্রতিশোধ নিচ্ছি। চরিতার্থ করছি আত্মঘাতী হিংসা—

বুঝতে কোনে অসুবিধার কথা নয়, এ হল সেই ছোট চৌধুরীর স্বাভাবিক রূপ। বহুবার এরকম হয়েছে। প্রচণ্ড দুর্ব্যবহার আর অতি ক্রিয় দুটো মেলানো দায় হয়ে ওঠে। যখন এইসব স্বার্থপর আর আত্মকেন্দ্রিক কম্যুনিষ্টরা রেগে যায় তখন তাদের স্বরূপ বেরিয়ে পড়ে। এরা স্বৈরাচারী, অত্যাচারী শুধু নয়, সাংঘাতিক রকমের প্রবঞ্চনা জানে। মনে পড়ে যাবে যুগশ্লোভিয়ার ডিস্ট্রিক্টর বামপন্থী নেতা নিপীড়নকারী কুখ্যাত চাওসেস্কুর কথা। আবার দরকার মতো এরা ক্ষমা চেয়ে নিতে দ্বিধা করে না, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধবাবুর মতোই। বুদ্ধবাবুর মতো এরা ক্ষণে ক্ষণে রূপ বদলালেও অসমঞ্জের মনে হয়, ওই মাতাল অবস্থাতেই ছোট চৌধুরীদের আসল পরিচয়টা বেরিয়ে পড়ে। এরা যে হায়নার সঙ্গে তুলনীয় তা ওই হাজার থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তখন যা বলে সেটাই তার আসল বক্তব্য। ভদ্র সেজে যা বলে, ধরে নিতে হবে তার সমটাই বানানো। ভদ্র যখন এরা, তখন অবিশ্বাস্য রকমের অমায়িক। যখন দস্যু তখন কালাপাহাড় বা তোরম্যানের মতোই দুর্ধর্ষ। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন ওদের নিজেদের রক্তই কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করে, যখন উচ্চ হবার দরকার, তখনই নিরুপায় ভাবে শীতল হয়ে বসে থাকে। তখন ভারি মায়্য হয় ওই অসহায়তার জন্য। বোধহয় সে মায়্যার বশবর্তী হয়েছে অসমঞ্জ রিসিভারটা ঠক করে ক্রেডেলে নামিয়ে না রেখে শনতে লাগল কমরেডের মিথ্যা ভাষণ।

—হ্যালো, রাণা—মিজ বিলিভ মি। তুমি তো খুব ভালো করে জানো যে আমি ব্যক্তিগত ভাবে এবং দলীয় প্রক্ষে তোমার ওপর কতটা নির্ভর করি। তুমি আমার হাতে তৈরি একটা জিনিয়াস। আমি বা পারিনি তুমি

তা পারবেই পারবে। তোমার সততাকে আমি সম্মান করি। ভয় লাগে, ওয়েলকাম জানাই। তবু জানি, অনেক ক্ষেত্রে আমি লোভের কাছে হেরে গেছি, স্থলিত কোথাও বা, পঞ্চদশ, দুর্নীতি থেকে মুক্ত হতে পারিনি। পারা যায় না রাণা। একদিন হয়ত বুঝবে কিন্তু কোনো শূণ্যই কি আজ আমার অবশিষ্ট নেই? বলা রাণা, সত্যি করে বলা তো, তোমাদের হৃদয়ে আমার জন্য নেতা হিসেবে কি সত্যিই কোনো সমীহবোধ নেই?

কোনো উত্তর দেয় না অসমঞ্জ। এটা তো কিনা মদে মাতলামো। চূপচাপ শুনে যায়। লোকটার জন্য খারাপও লাগে। কি ছিল, আর আজ কী।

অনুনয়, বিনয়, সমর্থন, ছলনা ও কুটচালি সব মিলেমিশে এখন বোঝা দায়, এককালের রাজনৈতিক ত্রাস ছোট চৌধুরীর কণ্ঠস্বর এটি। এ প্রান্ত থেকেও স্পষ্ট দেখতে পায় অসমঞ্জ লোকটার ঝুলে পড়া চোখ, লোলচর্ম ত্বক, নষ্ট হয়ে যাওয়া অবয়ব। ফলে ঘেন্না জাগে রক্তে, সেই রক্ত হাড়ে মজ্জায় শিরায় সঞ্চারিত হয়, সেখান থেকে দূষণ সংক্রামিত হয় মেধায়। একসময় কোনো প্রত্যাশার না করে হালকা হাতে আস্তে ধীরে রিসিভারটা ক্রেডেলে নামিয়ে রাখে অসমঞ্জ। এখন সে যেন পরিব্রাজন চায়।

কদিন গেল দিনের পিঠে। সব যেন স্বাভাবিক হয়ে এল অসমঞ্জের কাছে। ছোট চৌধুরীর সঙ্গে দেখা হয়েছে এর মধ্যে বহুবার। কোনোরকম ক্ষোভ যে কর্মেরেড মনে পুবে রেখেছে তা বাইরে থেকে দেখে বোঝা যায়নি। যায়ও না। কেউ তো কারো মনের মধ্যে ঢুকতে পারে না।

তবে বোলতা আর পার্টি অফিসে যায়নি। রেজিগনেশনও পাঠায়নি। প্রয়োজন বোধ করেনি এসবের। বরং পরীক্ষা, কমপিটিটিভ একজাম দিয়ে যাচ্ছিল একের পর এক। একদিন বলল, স্কুল সার্ভিস কমিশন থেকে একটা কল এসেছে। পেয়েও গেল সে কাজটা।

অসমঞ্জ জানে এর মধ্যে বোলতার বাড়িতে বহুবার ফোন বেজেছে। কিন্তু কী কথা হয়েছে, বোলতা না বললে সে জিজ্ঞেস করে না। দেখা হয়েছে কিনা, হলে কীভাবে ম্যানেজ করেছে লোকটা, তার কাছেও দয়া ভিক্ষে করেছে কিনা, জানে না সে। একদিন বোলতাই বলল, আজ স্কুলে চৌধুরীর স্ত্রী আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। একেবারে নিপাট ভদ্রমহিলা।

—হঠাৎ?

—হাত ধরে বলে উঠল, দয়া করে আমার স্বামীকে ছেড়ে দিন। আমি বললাম, আপনার ধারণা ভুল। আচ্ছা অসমঞ্জ, এত কথা শুনেছ আমার সম্পর্কে, কখনো তো কিছু জিজ্ঞেস করেনি?

—আমার চোখ আছে বোলতা। স্পষ্ট দেখতে পাই তোমাকে। তাছাড়া যদি কিছু বলার থাকে তুমি নিজেই বলবে।

—আমার প্রতি তোমার কোনো অবিশ্বাস নেই?

—সার্ভেনলি নট।

—যদি মনের গহনে কোনো দ্বিধা থেকে থাকে—

মাত্র তোমাকে বলে, দেখে নেব যাচাই করে, ভাবনাটা অমূলক কিনা। ভালোবাসার মধ্যে এই বিশ্বাসটাই তো সব বোলতা।

—একটা কথা তোমাকে বলি, সাবধানে চলাফেরা করবে। চৌধুরী লোকটা একেবারেই আনপ্রিভিষ্টেবল। কেন জানি না, আমার মন কেবলই গুলায়।

—তুমি তো জানো; আমি যথেষ্ট সতর্ক।

—তা জানি, তবু চিন্তা হয়। আমার নিজস্ব বলতে তুমি ছাড়া যে আর

কিছুই নেই অসমঞ্জ—

বলতে বলতে বোলতার চোখে জল চলে এল।

কদিন বাদেই কিন্তু ঘটল ঘটনাটা। বোলতার মন যা বলেছে, একেবারে তাই। রাতের দিকে বাড়ি ফিরছিল অসমঞ্জ। তখন প্রায় রাত এগারোটাই হবে। রাস্তাঘাট সুনসান। বিস্মা পর্যন্ত নেই। একেবারে ফাঁকা রাস্তা। হঠাৎ একটা জিপগাড়ি, বোধহয় পুলিশেরই গাড়ি হবে, হেডলাইটের ফোকাস ফেলল মুখের ওপর। হকচকিয়ে গেল অসমঞ্জ। গাড়িটা তাড়া করল তাকে, ছোটোতে লাগল এলোমেলো চাপা দেওয়ার অহিলায়। ভয় পেলেও ভেঙে পড়ল না সে। হঠাৎ গাড়িটা থেমে গেল ঘ্যাঁচ করে একেবারে তার নাকের ডগায় এসে। মুখ বাড়ালো ড্রাইভারের পাশ থেকে ছোটো চৌধুরী। বলে উঠল, কি, রাণা যে!

—আপনি?

—হ্যাঁ। ভয় পেয়েছিল। দেখছিলাম তোমার ধক কতটা। মাল খেয়েছ নাকি, পা যে টলছে। গাড়ির সামনে যে ভাবে ছুটে ছুটে এসে পড়ে বাচ্ছ— কী ব্যাপার বলা তো, সুইসাইড করবে নাকি?

—মদ আমি খাই না।

—ব্রেভো!

—আর সুইসাইড করার মতো কোনোরকম পাপকাজ তো করিনি।

—তুমি দেখছি চটে যাচ্ছ। ঠাট্টা করছিলাম। জ্যোৎস্না রাত কিনা। এমন রাতে আমার আবার মাথার ঠিক থাকে না। জাত রোমান্টিক কিনা। এসো তোমাকে বাড়ি অঙ্গি ছেড়ে দিই। দেখছিলাম রিক্সার সঙ্গে বচসা করছিল। এত রাতে কি আর যেতে চায়।

নিষ্ঠীক পায়ে অসমঞ্জ গাড়িতে উঠে এল। এসে দেখল সেই পুলিশের টাকাখোর সাব ইনসপেক্টর বসে আছে স্টিয়ারিং-এর পাশে। লোকটা ছোট চৌধুরীর কথায় ওঠে বসে।

গাড়ি স্টার্ট দিল। অসমঞ্জ দেখল বড় বড় বিয়ারের বোতলের মতো, কাল্টিস্পিরিট বা বাংলা মদের বোতল গড়াগড়ি যাচ্ছে পায়ের কাছে। গাড়ির জার্কিংয়ে ঠং ঠং আওয়াজ হচ্ছে। বোলতার কথা মনে পড়ে গেল অসমঞ্জের। যে কোনো সময় বিপদ ঘটে যেতে পারে। সে দেখল যে পথে গাড়ি যাওয়ার কথা সে পথে না গিয়ে উল্টো-পথে ছুটছে।

—কেন দিকে যাচ্ছি? অসমঞ্জের গলায় শান্ত প্রশ্ন, বুকে চাপা ভয়।

—চলোই না। ভয় লাগছে? চৌধুরী হাসে পিঠে চাপড় মেরে।

হঠাৎ ড্রাইভারকে চৌধুরী বলে উঠল, লছমন, গাড়ি রোকো। পিসাব করনা পড়েগা।

ঘ্যাঁচ করে অতর্কিত ব্রেক কষে থেমে গেল গাড়ি। ফুটবোর্ডে পা রেখে নামল চৌধুরী জিপ থেকে। তারপর অসমঞ্জকে বলল এসো সিগারেট হয়ে যাক। বলে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে হাঁচক টান দিয়ে নামিয়ে নিল।

বিপদের জন্য প্রস্তুত ছিল অসমঞ্জ।

নামার সঙ্গে সঙ্গে ছোট চৌধুরী কোমরে গোঁজা কোমরবন্ধনী থেকে রিভলবার বের করে চকিতে অসমঞ্জকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে গেল। আর তৎক্ষণাৎ চোখের নিমেষে হিন্দি সিনেমার পপুলার নায়কের মতো অমিতাভ স্টাইলে অসমঞ্জ ছোট চৌধুরীর হাতটি লক্ষ্য করে সজোরে ডান পা ছুঁড়ে যেন ফুটবলে হাইকিক্ করল। চৌধুরীর হাতের রিভলবার ছিকে গিয়ে পড়ল কয়েক ফার্লং দূরে। দেখামাত্র মদের বড় বোতল হাতে নেমে

এল সেই পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর। ইউনিফর্মের সঙ্গে কোমরবেন্টে বাঁধা আছে আরেকটি আয়োনায়। এই হাতটি অব্যর্থ ছেনে অসমঞ্জ তার উপর কাঁপিয়ে পড়ল।

হতভাষের মতো কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ছোট চৌধুরী থ হয়ে দর্শকের ভূমিকায় এখন। মুখ দিয়ে কথাও সরছে না। কেননা এই বয়সের যুবকদের তিনি কক্ষনো বিশ্বাস করেন না। এরা যা কিছু করতে পারে, এক সময় তিনিও পারতেন।

ঘটলও তাই। হঠাৎ পড়ে থাকা মদের বোতলটি মাটিতে ঠুকে অর্ধেক করে নিল অসমঞ্জ এবং বেকায়দায় পড়ে যাওয়া পুলিশ সাহেবকে লক্ষ করে চালিয়ে দিল। আমূল বিধে গেল বুকে—

এই দৃশ্য দেখা মাত্র দৌড় দিলেন ছোট চৌধুরী। সামনে যেটুকু রাস্তা দেখা গেল তাই বরাবর। পড়ে রইল পুলিশের গাড়ি আর মৃতদেহ। আর রিডলবার। ওই ভাঙা বোতলের অর্ধেক অংশটি ভোজালির মতো অসমঞ্জের হাতে। সে উদ্গাদেব মতো ধাওয়া করল ছোট চৌধুরীকে।

তারপর অন্ধকারে কোথায় কারা কে কিভাবে যেন হাওয়া হয়ে গেল সে রাতে। নইলে আরো একটা হয়ত পড়ে যেত।

অবিনাশকে এই কথা অকপটে বলে অসমঞ্জ জিজ্ঞেস করেছিল, স্যার, সবই বললাম। এখন বলুন, আর কেউ জানে না, শুধু আপনি। আমি কোনো পাপ করেছি নাকি?

অবিনাশ বলেছিলেন ভাগবৎ গীতার সেই শ্লোক। ধর্মযুদ্ধে যে হত্যালালী, সেখানে কোনো পাপপুণ্য নেই। অর্জুন উবাচ এবং শ্রী ভগবান বলিলেন.....।

অবিনাশ শুধু জিজ্ঞেস করলেন, তারপর ওই দস্যু ছোট চৌধুরীকে সামলালে কী করে?

আমাকে কিছুই করতে হল না। একদিন পরে সকালে বেজে উঠল ফোন। ঠাণ্ডা স্বরে যেন নটকের সংলাপ আউড়ে গেল চৌধুরী তার স্বভাবমতো—পরশু রাতে কিছুই ঘটেনি রাণা। অন্তত আমরা জানি না। না আমি না তুমি। বি কুল ইয়াং স্টার। ডোন্ট ফরগেট, উই আর ইন দ্য সেই টিম। কমরেড, ইউ নো, বিগ্গব—

ঠাণ্ডা গলায় ঠাট্টা করে অসমঞ্জ শুধু বলেছিল, দীর্ঘজীবী হবে।

বাস এসে থামল অবিনাশের বাড়ির উন্টোদিকের ফুটে। নেমে দু'কদম হাঁটতেই দেখা গেল বাড়িটা। বাড়িটারি পেরিয়ে রেসিডেন্স কমপ্লেক্স। তারপর সিঁড়ি ভেঙে তিনতলায় নিজের পড়ার ঘরে। দরজা খোলাই ছিল। স্টিরিও চালিয়ে বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে সুশোভন। হ্যাঁ, ঠিক তাই। ক্যাসেটে বাজছে একটা পুরাতন কুমায়ুনী ঠুমকা। বটম পুশ করতেই থট করে বন্ধ হয়ে গেল যন্ত্রটা আর ধড়ফড় করে উঠে বসে সুশোভন বলে উঠল, ও আপনি। চোখ রগড়ে বলল, এই চিঠিখানা এসেছে। পোস্টম্যান দিয়ে গেছে।

৩

রবিবারের সকাল, অবিনাশ সেভ করে ফ্রেশ হয়ে নিলেন। তার আগে সকালের কাগজগুলো উন্টোপাণ্টে দেখেছেন মাত্র। এমনভেই তিনি একটু লেট রাইজার। রাতে ভালো ঘুম হয় না তাঁর। তার ওপর কিসের যেন একটা টেনশন। সকাল অসি যে বিছনায় শুয়ে থাকেন সে কথা ঠিক, কিন্তু ঘুমিয়ে যে থাকেন তা কিন্তু নয়। ভোর কিংবা ব্রান্স মুহূর্তেই চোখ

খুলে যায়। প্রথম উষা জানলা দিয়ে প্রত্যক্ষ করেন তিনি। প্রাতঃভ্রমণের অভ্যাস তাঁর কোনোকালেই ছিল না, আজও নেই। কিন্তু ভোরের আকাশে পাখির ওড়াউড়ি দেখলে বা কুজ্ঞন শুনতে দূরের পথে চেয়ে থেকে আর মন ভরে না, আশ মেটে না যতক্ষণ না বিছনা ছেড়ে ঝুলবারান্দায় কিংবা ছাদে এসে দাঁড়ান। মনটা ভরে থাকে প্রসন্নতায়। কিন্তু আজ কি কারণে যেন তাঁর চোখেমুখে উদ্বেগের মেঘছায়া।

এমন সময় ছোট ভাই অনিমেষের মেজ ছেল জয় এসে জানাল, জেঠু, যাদের আসার কথা ছিল এসেছেন। নিচের ঘরে বসিয়েছি। অপেক্ষা করছেন তোমার জন্য।

—হ্যাঁ, আমি আসছি। বৌদিকে বলো ওদের চা-বিস্কুট দিতে।

—দেওয়া হয়েছে।

পায়জামা পরে খালি গায়েই ছিলেন অবিনাশ। টাওয়েল টেনে ভালো করে মুখ মুছে পাঞ্জাবিখানা গায়ে গলিয়ে নিয়ে বললেন, চলো। হ্যাঁ, চশমাটা দাও তো। ওই যে টেবল ল্যাম্পটার কাছে, মোটা মতো বইটার পাশে। পেয়েছ? দাও।

এই বলে পায়ে একজোড়া স্লিপার গলিয়ে নিয়ে অবিনাশ সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে এসে ঢুকলেন ড্রয়িংরুমে।

দেখলেন বেশ জনা পাঁচ-ছয় লোক বসে। হাত তুলে অবিনাশ বললেন, নমস্কাব।

সবাইকে চেনেন না তিনি। শুধু ময়ূখ বোস আর ট্যারা কার্তিক ছাড়া। দ্বিতীয় জনের আসল নাম গোলাম কার্তিকের। কে জানে কিভাবে নামখানা গড়ে উঠেছে। এ পাড়াবই ডাকবুকে ছেল ছিল, দু'খানা চোখই ট্যারা, তাই লোকে ট্যারা কার্তিক বলে থাকে। এই নামেই ও বেশি পরিচিত। এখন আর ডাকবুকে ছেকরা নেই সে, চেহারাটি ভারিক্টি হয়েছে কিঞ্চিৎ। বয়সে অবিনাশের থেকে অনেক ছোট হলে কি হবে চলে সাদা ছোঁয়া লেগেছে। সে এখন এই লোকাল কমিটির সেক্রেটারি। কিন্তু তার দিকে তাকিয়ে নমস্কার বিনিময় করেননি অবিনাশ, করেছেন দ্বিতীয় জন ময়ূখ বোসের দিকে চেয়ে। তিনি জেলা কমিটির হোমরাচোমরাই নন শুধু, রাজ্য কমিটিরও মেম্বর। সবচেয়ে বড় কথা লোক হিসেবে তুলনামূলক ভাবে ভালো। বাকি যারা সঙ্গে এসেছে সব চালাচামুণ্ডা গোছের।

অবিনাশ বিনীত নমস্কার নিলেন ওদিক থেকেও। বললেন, তারপর ময়ূখদা, আছেন কেমন?

—আর থাকা ভাই, ভালো আর রাখলে কোথায়।

—কেন, আমি আবার কি করলাম, ছপোষা লোক?

—ছপোষা? তবে কি। এই বয়সে আবার বিয়েশাদি করলে নাকি হে—

—না দাদা, সে আর জুটল কই?

—ও তাই বলো। ছপোষা বললে কিনা, আমি ডাবলাম অবিনাশকে আবার সুখে থাকতে ভুতে কিলোলো নাকি। ভাই, একা থাকার যে কি মজা তা তুমি জানোই। আমি পরিবারকে নিয়ে ঘর করি। মানে বহু পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি। বুঝলে কিনা—

এইবার ট্যারা কার্তিক ফুট কাটল, তা যা বলেছেন বোসদা। একেবারে নাজেহাল করে মারলে। এটা দাও, ওটা দাও। সেই চাহিদা মেটাতে হাড়মাস এক হয়ে যাবার জোগাড়। ছা ছা। বিয়ে থা করে সংসার করা কি আর ভদ্রলোকের কাজ।—এই বলে সে একবার অবিনাশের দিকে চেয়ে

মনজোগানো হাসি হাসল।

শুরটা এইরকম হলেও কথা ক্রমে অন্যদিকে মোড় নিল। স্বর একটু গভীর হল বোসের। বললেন, একটা অর্জি নিয়ে যে এসেছিলাম অবিনাশ।

—অবিনাশ তাকালেন তাঁর চোখের দিকে।

—আমাদের ইচ্ছে এবারকার বিধানসভা নির্বাচনে বরানগর কেন্দ্রে তুমি আমাদের প্রার্থী হও।

অবিনাশ চুপ করে থাকেন। দেওয়াল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে থাকা বাইশ চবিবশের ভাইপো জয়ের চোখ কথা শুনে জ্বলজ্বল করে উঠল।

বোস বলে চললেন, জানোই তো অহিভূষণকে পার্টিবিরোধী কার্যকলাপের জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছিল। সেও বেরিয়ে গেল তৎক্ষণাৎ। এখন বিপ্লব রাজনীতি করছে। হয়ত নির্দল হিসেবে দাঁড়াবে। তাছাড়া তার ভাবমূর্ত্তিও ধসে গেছে। ভোট অবশ্য আজকাল আর ভাবমূর্ত্তি দিয়ে হয় না, হয় কে কোন পার্টির টিকেট পেল তার ওপরেই। কাস্তে-হাতুড়ি-তাবা সিঁদল যার, জয় তারই সে তো তুমি জানোই। তোমাকে আমাদের বরাবরের পছন্দ, তুমিই রাজি হওনি। এমন সৎ লোকসেবী ইমেজ এ অঞ্চলে আর কারই বা আছে। তাছাড়া এই মাসের ১৪ তারিখে মহাজাতি সদনে জাতিসমস্যা নিয়ে তুমি যে বক্তৃতা করেছ এইসব তরুণেরা তা শুনে তো একেবারে পাগল। ওরাও তোমাকেই চায়। আমি চাই তুমিও ফিরে এসো। দেশকে আরো শক্তিশালী করো। তুমি হাল ধরলে আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে রাজ্য রাজনীতিতে সময় দিতে পারি।... অত ভাবনাচিন্তার কি আছে? তোমার সব দায়দায়িত্ব আমি নিজের কাঁধে তুলে নিলাম। আর জানোই তো আমার কথা দেওয়া আর কাজ হয়ে যাওয়া একই কথা—

অবিনাশ বলতে গেলেন, কিন্তু দাদা—

—কোনো কিন্তু শুনছি না। এবার জিতিয়ে তোমাকে মন্ত্রী করিয়ে আনবই আমরা, এই প্রতিজ্ঞা করলাম আজ।—এই বলে টেবিল চাপড়ে শব্দ করতে গেলেন তিনি।

শোনামাত্র জয় দৌড়ে বাড়ির ভেতর চলে গেল উৎসাহিত হয়ে। হয়ত এক্ষুনি সবাইকে খবরটা না জানালে তর সইছে না।

স্পষ্ট স্বরে অবিনাশ বললেন, না দাদা।

—না কেন?

—তা কি করে হয়? একদিন যা ছেড়ে এসেছি আদর্শের কারণে আজ আর সেখানে ফিরে যাওয়া যাবে না।

—কিন্তু শোনো তুমি—

—না মমুখদা। আপনি তো জানেন, বিচক্ষণ লোক আপনি, অভিজ্ঞতাও কম নেই। সবাই কি সবকিছু পারে? তাছাড়া বয়স বেড়েছে, গা-হাত-পা একটুতেই ধরখর করে, অধিকাংশ সময়েই শারীরিক দিক থেকে—

—কীইবা তোমার বয়স?

—তাও তো পঁয়ষট্টি হল—

—এ আবার বয়স। আমাদের জ্যোতিবাবুর ৮২ পেরিয়ে—

—কার সঙ্গে কার তুলনা দাদা। আসলে এই বয়সে আর দুশ্চিন্তা বা ধকল কাঁধে নিতে চাই না। বরং মুক্ত আর স্বাধীন থাকতে চাই। আর যে সাংগঠনিক ক্ষমতার জন্য আপনারা আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছেন তা এখন আমার ক্ষমতার বাইরে। লোকজনের সঙ্গে আজকাল ভালোভাবে মিশতেও পারি না। মেজাজ তিরিকি হয়ে ওঠে একটুতেই। যে কোনো কথায় রেগে যাই—

চীনে মাটির প্লেটে কাটা ফল সাজিয়ে জয় ফিবে এসে দাঁড়িয়েছে সবে, টেবিলে সেগুলো সাজিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ফের দেওয়াল ঘেঁসে। জেঠুর কথার শেষ কটি শব্দ তার কানে গেছে, বোধহয় বুঝতে অসুবিধা হয়নি তার।

ঐ সেই অস্পষ্টতা তারপরই জেঠুর দৃঢ় স্বরে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। অবিনাশ বললেন, আমার আশা ছেড়ে দিন মমুখদা।

কিছুক্ষণ সবাই চুপ। তারপর মমুখ বোসই বললেন শেষ কথাটি, তাহলে কথা দাও, আমাদের না হও কিন্তু তোমাব ভূমিকা বা কাজকর্ম যেন আমাদের মাথাব্যথার কারণ না হয়—

—আমি তো সব কিছু থেকেই সরে এসেছি, তা তো কারো অজানা থাকার কথা নয় দাদা।

কিন্তু ইদানীং কানকুখো শোনা যাচ্ছে। হাওয়া বাতাসে কথা গুড়াউড়ি করছে যে তুমি নাকি ফের সক্রিয় হচ্ছে।

হেসে ওঠেন অবিনাশ।

—হাসির কথা নয় ভায়া, তুমি তাহলে আমাকে আশ্বস্ত করছ...

ওরা উঠে যেতেই জয় জেঠুকে চেপে ধরল, কী যে কর না জেঠু! এমন সুযোগ কজনের কপালের জোটে? হাতছাড়া করে দিলে?

সঙ্গেহে অবিনাশ ছোট ভাইপোর পিঠে হাত রাখেন। বলেন, জানিস না রে। ও হল গিয়ে হাড়িকাঠ। একবার মাথা গলালে বলি যে হতেই হবে।

সে কথা কানে গেল না জয়ের। সে নিজের বুদ্ধি-বোধ অনুসারেই বিরক্তির সঙ্গে বলে উঠল, আদর্শ আর আদর্শ। কী দিয়েছে তোমাকে তোমার ওই আদর্শ, বলতে পারো? একটা গালভরা কথা ছাড়া তো আর কিছুই নয়। একালে ওসব আর চলে না। এখন যে কথাটা সবচেয়ে জরুরি তা হল কেরিয়ার।

—সে তোরা কর না, এই বয়সে আমি আর—

—চেঁটা করলেই তুমি মিনিস্টার হতে পারো। বাবা সেদিন মাকে বলছিলেন, তোমার গৌয়ার্দুমিই তোমার সর্বনাশ ঘটিয়েছে।

অবিনাশ কথা না বলে চুপ করে রইলেন। এই প্রায় একরত্তি শিশুর সামনে যেন সত্যিই অপরাধ করেছেন।

জয় বলল, কত করে বললাম জেঠু আমার বিজনেসের ব্যাপারে ইনভাস্টি মিনিস্টারকে একটা চিঠি লিখে দাও। তোমার একটা চিঠিই কাফি। কিন্তু নিজের বা বাড়ির কারো জন্য তুমি কখনো কিছু করবে না। এটা কিন্তু এক ধরনের বোকামি।

অবিনাশ ভাবেন, তাঁর এই বয়সে জ্যাঠামশাইয়ের সামনে দাঁড়িয়ে এভাবে কথা বলাটাকে ধৃষ্টতার চোখে দেখা হত। এখন অবশ্য সময় বদলেছে। কেউ কাউকে রেয়াৎ করে কথা বলে না, বলে সরাসরি। এটার অবশ্য একটা ভালো দিকও আছে। হয় এম্পার নয় ওম্পার। মাঝখানে আর কিছু থাকে না। একটা কথার একটাই মানে হয়। ভাবছিলেন অবিনাশ, সত্যিই কি তিনি ভুল করলেন? যদি করেই থাকেন তো তাতেই বা কি। এ ধরনের অজ্ঞত ভুল তো সারাটা জীবন ধরেই তিনি করে আসছেন। আফশোস বা অনুশোচনা তো কখনো হয়নি। এইসব ভাবনার ফাঁকেই তাঁর চোখের সামনে দিয়ে অস্পষ্ট ভাইপো বাইরে চলে গেল হুঁ হুঁ করে। যাক, যে যায় যাক, অবিনাশ কী করতে পারেন।

কিন্তু বাড়ির অধিকাংশই তো ভাইপো জয়ের মতোই। সারা দুপুর

ধরে চলল সংসারে অবিনাশের সমালোচনা। তিনি নাকি পরিবারের জন্য কিছুই করেননি কখনো। একরকম অপদার্থ হিসেবেই সাব্যস্ত তিনি। আজও সেই কথাটিকেই ওরা নানা ভাবে, ভাষায় বলল সবাই।

সাধারণত ছুটির দিনে একটা নিয়মের প্রবর্তন করেছেন বড় ভাই তামোনাশ। সপ্তাহের অন্যান্য দিনগুলোতে সবাই যে যার কাজ কর্মে ব্যস্ত থাকে, হাঁড়ি একসঙ্গে নেই বন্ধকাল, প্রয়োজনে আলাদা আলাদা ভাবে যে যার রান্না করে নেয়। কিন্তু যতদিন বড়দা বা বৌদি আছেন ততদিনের মতো একটা ব্যবস্থা, বোধহয় একালের যেটা সবচেয়ে বড় সত্য সেই ভাঙন ব্যাপারটাকে রুখে দেওয়া যায় যদি তারই একটা উপায়। সবাই একই সঙ্গে বসে চিরকালের সেই রান্নাঘরের পাশের ডায়নিং হলটিতে রাখা পুরাতন সেশনকাঠের বড় টেবিলে বসে থাকে। দু'বেলাই। সপ্তাহে একটি দিন মাত্র। কিন্তু দেখা গেছে বিধিটাই শুধু পালিত হচ্ছে কোনোরকমে, আন্তরিক হচ্ছে কি হচ্ছে না সে দিকে কারো খেয়াল থাকে না। কোনোরকমে ব্যাপারটা একবেলায় এসে ঠেকেছে। রাতের দিকে টেবিলে খাবার দেওয়া থাকে কিন্তু দু'একজন ছাড়া অন্যরা কেউ আর আসেই না। বড়দা জানেন, যে যার মতো ব্যবস্থা করে নিচ্ছে। প্রথম প্রথম শুনে রেগে ফায়ার হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু পরে যখন বুঝলেন অথবা রেগে উঠলে কোনো সুরাহা হবে না বরং চিব্বাকার চ্যাচামেচিতে হার্টের পেসেন্ট হিসেবে ক্ষতি তাঁরই হবে, তখন আর চিব্বাকার না গিয়ে গভীর দুঃখ পেয়েছিলেন মনে মনে।

খাবার টেবিলে যখন জয় কথাটা তুলল তখনই ঠোটকাটা বলে পরিচিত মেজ ভাই বলে উঠল, অবিনাশ তো চিরকালই এই করেছে। নিজেকে ছাড়া আর কাউকে কি ও কখনো চিনেছে?

খেতে খেতে অবিনাশের মুখের মধ্যে যেন ভাত আটকে গেল মেজদার কথা শুনে। এই এই সময়গুলিতে যা ঘটে তাই ঘটল। বড় বৌদি তাঁর পক্ষ নিয়ে বললেন, এটা তুমি ঠিক কথা বলছ না মেজ ঠাকুরপো। অবু তো তার সবকিছুই নিঃস্বার্থভাবে এ সংসারেই দিয়েছে। চাকরি করে যাবতীয় টাকা তো সংসারেই দিয়েছে। বাড়ির এক একজন ছেলেকেই নিয়ে হয়েছে মানেই তো, অবু ঠাকুরপোই দেবে সিংহভাগ—এটাই তো এ বাড়ির রেওয়াজ। বিয়ে পর্যন্ত করল না।

ছোট ভাইয়ের স্ত্রী সরমা বলল, সেটাই তো বলছি, করলেন না কেন? না দেখলেন নিজেকে—

—সে কথা শুধাবে বলে না সরমা। আর আমরাই বা তাঁর জন্য কতটুকু করতে পারি? কি করছে না করছে খেয়াল রাখি নাকি আমরা? সরযুর হাতেই খায়। সে পরের বাড়ির মেয়ে, কাজের লোক বই তো না। অথচ এ বাড়িতে লোক কি কম আছে। একজন যদি বিয়ে না করেই থাকে তবে তাকে দেখার লোক থাকবে না কেন, যখন সে চিরকাল সবাইকে নিয়েই চলেছে?

বড় ভাইয়ের ছেল দিব্যজ্যোতি বলল, ঠিকই তো। সেজ্ঞাকুর দিকটা তোমরা কেউ ভাবছ না। ওই বারো ভূতের হাটে ওঁর মতো একজন নীতিবান লোক কেনই বা মস্ত্রী হতে ছুটবেন? ঠিকই করেছে তুমি সেজ্ঞাকু। এটাই তোমাকে মানায়। ছাড়ো তো ওদের কথা।

বড়ভাই ভাবী গলায় বলে উঠলেন, কে কি করবে না করবে, এটা তার নিজস্ব ব্যাপার, অন্যেরা সেখানে মাথা গলাবে কেন। খেতে এসেছ খাও দাও উঠে যাও। বাজে ভর্তাকর্কি বাদ দাও।

এই বলে প্রসঙ্গটায় এখানেই যাতে ছেদ পড়ে তার চেষ্টা করলেন

তামোনাশ। আর যেহেতু তাঁর কথার ওপর এ বাড়িতে কোনো কথাই চলে না, সুতরাং খেমে গেল ব্যাপারটা। কেউ হয়ত ভেতরে ভেতরে গজরাচ্ছে। কিন্তু মুখ ফুটে বলার উপায় নেই কোনোভাবে।

তামোনাশ বললেন, অবু, ডুমুরের ছেঁকিটা খেয়ে দ্যাখ, কেউ তো হাতই দিচ্ছে না, তোফা বানিয়েছে সরোজ।

টেবিলে যারা বসেছিল সেই মেয়েদের মধ্যে কেউ নিশ্চয় আড়ালে ঠোট চেপে হাসল। কেননা বড় কর্তা চিরকালই তার বউ সরোজিনী যেটা রাখে সেই পদের দহে আটকে থাকে। বাকিদের যখন মাছ মাংস আলু পটল পেঁপে গাজর কিংবা ভাজ্য মন পড়েছে, তখন ওই আদিকালের ডুমুরের ছেঁকি কে খেতে যাবে, কেনই বা যাবে? সুতরাং ডালনার পাশের ডেকটিতে পড়ে আছে ছেঁকিটুকু।

অবিনাশ বললেন, বড়বৌদির রান্না, মানে, সে কথা কি আর বলতে। মাছ মাংস আর ভালো লাগে না। বৌদি, এরকম ছেঁকি চচ্চড়ি সন্তো বা পাঁচমেশানো ঘাঁট যদি থাকত রোজ, কি ভালোই না হত। আগে আগে মাছের কাঁটা দিয়ে বাড়িতে একটা ছাঁচড়া হত, সে বন্ধকাল খাইনি বৌদি—

তামোনাশ বলে উঠলেন, যা বলেছিল। হ্যাঁ সরোজ, সে সব রান্না কি ভুলেই গেলে নাকি! লাউয়ের খোসা আর হিঞ্জের বড়ি মনে আছে তোমার? এইসব দিয়ে একটা কী অবিস্মরণীয় জিনিস বানাতে।

লজ্জা পেয়ে বড় বৌদি সরোজ বলে ফেললেন, কী যে বলো তুমি।

—কী বলি মানে। অবু কি অস্বীকার করতে পারবে, ছোটবেলা থেকে তোমার হাতের ওই খোড়-বড়ি-খাড়া খেয়ে খেয়েই ও এত নামি লেখক হতে পেরেছে?

এইবার লজ্জা পাবার কথা অবিনাশের। ভালো লাগারও কথা। লেখক হিসেবে নাম করতে তিনি চেয়েছে সত্য কিন্তু তা তো বাস্তবে ঘটেইনি। লেখালেখি করেন, এই পর্যন্ত। একটা চেনা নাম বড় জোর হতে পেরেছে। কিন্তু 'বড় লেখক' কথাটির প্রতি যে তাঁর বরাবরই লোভ। কেউ বললে হাজার অসুখী অবস্থার মধ্যেও মনটা তাঁর ভরে ওঠে। আসলে জীবনের অভিজ্ঞতায় সিদ্ধ অবিনাশের বুঝতে কিছুমাত্র দেরি হয় না যে খেতে বসে ওই অপ্রীতিকর ঘটনাগুলোর জন্য পাছে অবিনাশ মনে কষ্ট পেয়ে থাকেন, তাই লাগব করার জন্য বড় ভাইয়ের এই ওষুধ আর পথ্যের প্রয়োগ। সব বুঝেও ভালো লাগল তাঁর। বড় ভাই বলে কথা, স্নেহ যে অতি বিষম বস্তু, এ সংসারে বারবার তার প্রমাণ রেখেছেন ওঁরা দুটিতে। তাছাড়া নিজের ভাই যাই লিখুক না কেন বড় ভাইয়ের তো মনে হতে পারে—আমার ভাইটিই সবচেয়ে বড় লেখক।

অবস্থা সামাল দেওয়ার অছিলায় ছোট ভাইয়ের স্ত্রী সরমা হেসে হেসে বলে ফেলল, বড় ঠাকুর আগে বলুন, অবিনাশদাকে নিয়ে মডার্ন রিভিউতে যে বড় আটিকেল ছাপা হয়েছে সেটা কি দেখেছেন?

উচ্ছ্বসিত তামোনাশ বেজে উঠলেন দ্বিগুণ স্বরে, তা আর দেখিনি।

—অত বড় ছবিটা ছেপছে কাগজ। যদি কালার করে ছাপত।— বলে মনযোগানো হাসি হাসল সরমা। কারণ, এতে করে যদি ইতিপূর্বের মুখ ফসকে বলে ফেলা ভুলটাকে মেরামত করা যায়, সেই চেষ্টা।

তামোনাশ বললেন, না সরমা। সাদাকালো ছবির ব্যাপারটাই যে আলাদা। রঙের চটক হয়ত থাকে না, কিন্তু পুরনো কালের ঐতিহ্যের একটা রেশ রয়ে যায়। তুই কি বলিস অবু?

অবিনাশ বুঝতে পারেন, তাঁর সমর্থন চেয়ে বড়ভাই তামোনাশ আসলে

বোঝাতে চাইছেন, ভালো ছবিই বলা আর শ্রেষ্ঠ শিল্পসংস্কৃতির নিদর্শনই বলা আমিও কম বুঝি না। আর সমঝদার অবিশ্বাস যদি পাশমার্ক দিয়ে দেন তবে তো আর কথাই নেই।

অবিশ্বাসের চোখেমুখে সমর্থন সূচক হাসি ফুটে উঠল। অন্য সময় হলে তিনি রেমব্রান্টের আঁকা সাদাকালো চিত্রগুলি থেকে জোব করে এক্সপ্রেসনিস্ট, ইমপ্রেসনিস্ট শিল্পীদেরই শুধু নয়, এমনকি কিউবিজম নিয়ে খাঁরাজ করেছেন, সেই সব দালি পিকাসো ধরে ধরে তিনি দেখাতেন সাদাকালোর কী মহিমা, কী মহিমা সরল দুটি রঙের সহজতায় ধরে ফেলেছেন জগৎবিখ্যাত চলন্ত ছবি-করিয়েরা সব। ফেদেরিকো ফেলিনী, ব্রাসোয়া কিংবা আমাদের সত্যজিৎ রায়, স্বত্বিক ঘটকেরা। যত মায়ারহস্য, সব তো ওখানেই, ওদুটি রঙের পটভূমিতেই। বহু রঙের বিন্যাসে তো ড্রামাটাই নষ্ট হয়ে যায়। এমনকি একালের গণেশ পাইনের সাদা-কালোয় টেম্পেরা যে কি আবেদন নিয়ে আলোকিত হয়ে ওঠে, যেন প্রাণকূটুরিতে জ্বলে ওঠে নিভৃত প্রদীপ।—এই কথাগুলি বলার নয়, বোঝাবার নয়, তবু বলতে হয় বারবার। বলে বলে যদি দরজায় করাঘাত বেজে ওঠে, খুলে যায় যাবতীয় বন্ধতা।

মেশের প্রশ্নে তমোনাশের যত পক্ষপাত এই অবিশ্বাসের ওপরেই, ফলে বাকি দু'জন বা তাঁদের পরিবারের বিষয়টা সহ্য হয় না। তাঁদের বক্তব্য—বড়দা তো সবকিছুতে অবদার মহৎ চিন্তার প্রকাশ দেখতে পান।

অবিশ্বাস স্বীকারোক্তির ছল বলে ওঠেন, না না তা হবে কেন, আমারও অনেক ভুল আছে, থেকে যায়। হয়ত অধিকাংশ প্রশ্নই আমার চিন্তাধারার সঙ্গে একেবারে হাল একালের চিন্তাধারা মেলেনা। তখন মনে হয় সত্যি বোধহয় সেকেলে হয়ে যাচ্ছি—

—তাহলেই বোঝো, বোঝাও তোমার বড়দাকে।

তমোনাশ বলে ওঠেন, না অবিশ্বাস সেকেলে তুমি নয়, বরং আমরাই কিছুটা। অযৌক্তিক কোনো কথা কখনো শুনি নি তোমার মুখ থেকে।

ততোধিক উৎসাহে বড়বৌদি সরোজিনী বলে ওঠেন, ঠাকুরপো, তোমার চিন্তাধারার সঙ্গে একেবারে হাল একালের চিন্তাধারা মেলে না বলেই যে তুমি ভ্রান্ত, তারই বা কী মানে আছে?

—না বৌদি, মানে হয়ত নেই, কিন্তু সংশয়ে থাকি আমি। জেরবার হই। অন্তর্দ্বন্দ্ব ভুগি। কোনটা ঠিক কোনটা বেঠিক, ঠাণ্ডার করে উঠতে পারি না। ভয় হয়, অন্যায়ের পথে চলে যাচ্ছি না তো? ধর্মবোধ থেকে পিছলে যাচ্ছি না তো?

তমোনাশ শুনে কিছুক্ষণ চুপ থাকেন, চুপ থাকে সবাই। বড়ভাই তারপর বলে ওঠেন, এখানেই তো আর সবার সঙ্গে তোমার পার্থক্য অবু, বাকি সকলে ভাবেই না ওভাবে। যদি ভাবতাহলে তো আর কোনো সমস্যাই থাকত না।

মাংসের হাড়টিবোনের ফাঁকে এসব দার্শনিক কচকচি শুনতে বোধহয় ভালো লাগছিল না সরমার। তবু শুনছিল সে বা খোলা কানের ভেতর দিয়ে কথাগুলি ঢুকে পড়ে বিভ্রাট সৃষ্টি করছিলই হয়ত। তবু পাছে কেউ আন্ডার এস্টিমেট না করে সেই লোকডয়ে সরমা মুখ খোলেনি। এখন যখন দেখল সবাই চুপ হয়ে আছে কথিত কথাটির মোহবোরে, তখন আস্তে আস্তে টেবিল ছেড়ে উঠল। চিবোনো মাংসের কাঁটা গরুর মতো জাবর কেটে উগরে দিল প্লেটে। সভ্য বা ভাব্যতার বালাই নেই, শুধু দিবা বেঁচে থাকলেই হল। উঠে যাবার সময় অচানক একটা মন্তব্য করে গেল,

সেজলাভাই তো একখানা বিয়ে করলেই পারতেন। ওটাই বোধহয় তোমার ভুল হয়ে গেছে।

এই বলে ঠরঠর করে মুখ ধোবার জন্য বেসিনের দিকে এগিয়ে গেল মেজবউ। এবং কল খোলার ছরছর শব্দ বসে থাকা সবার কানে এসে লাগল। এই পরিবারের অধিকাংশই খাপছাড়া বা অনধিকার বোকা বোকা মন্তব্য করে অন্যকে বিরত করে কিংবা ব্যথা দেয়। প্রমাণ করে নিজেদের ভব্যতাহীনতা বা অধিশিক্ষার জিগির দেখায়।

কিন্তু এই মন্তব্যে বিন্দুমাত্র আমল না দিয়ে সরমাকে লক্ষ্য করে অবিশ্বাস বেসিনের দিকে চেয়ে বলে উঠলেন, টুকলুকে একটু আমার ঘরে পাঠিয়ে দেবে তো সরমা, ওর জন্য বিদেশের ডাকটিকিট জমিয়ে রেখেছি।

কেউ মুখে জোয়ান, কেউ পানমোরি বা আস্ত পান পেলে যে যার ঘরে চলে গেলেন। সরিষা শুধু খাওয়াব টেবিলটি সামাল দিতে ব্যস্ত রইল।

নিজের ঘরে এসে ঢুকতে গিয়েও ঢুকলেন না অবিশ্বাস। সোজা চলে এলেন পড়ার ঘরে। সুশোভন ছেলেটি চলে গেছে দেশে এই কদিন হল। চিঠি এসেছিল বাড়ি থেকে। সেখানে লেখা ছিল, পুলিশ যে ওর পেছনে পড়ে আছে এমনটা নয়, একদিন এসেছিল মাত্র। আর আসেনি তারা। তাছাড়া জানা গেছে, ঢকাকে আদৌ চেনেনা পুলিশ। মানে মুখ চেনা নয়, সুতরাং ঘরে ফিরে আসতেই পারে। এই চিঠি পেয়ে প্রায়-গৃহবন্দী ছেলেটি আনন্দে লাফিয়ে উঠে ব্যাগটি শুষ্কিয়ে নিয়েছিল কয়েক দণ্ডেই। অবিশ্বাসকে সবিনয়ে বলেছিল, আপনাকে কিন্তু আসতেই হবে স্যার আমাদের গ্রামে। ঘুরে ঘুরে সব দেখাব। দেখা দরকার আপনার। আমরা গরিব স্যার, কিন্তু আপনার থাকার সুব্যবস্থা হয়ে যাবে।

অবিশ্বাস সম্মেহে তার মাথায় হাত বেখেছিলেন প্রথমে। তারপর কাছে টেনে নিয়ে বলেছিলেন, তোমার তো বিপদ তাতে আরো বাড়বে।

—কেন?

—যখন লোকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে, এই শব্দে বাবুটি কে, তখন—

—বলব, সম্পর্কে আমার মেসোমশাই হন। শহরের লোক শখ করে গাঁগঞ্জ দেখতে এসেছেন। কে কি করবে? যাকেন তো?

—নিশ্চয়ই যাব।

—চিঠি দিলে উত্তর দেবেন তো?

—দিও।

সেদিন বিকেলের কিছু আগে বিবেক এসে ওকে নিয়ে গেল।

সেই ফাঁকা খাটে একটু 'ন্যাপ' বা দিবানিদ্রায় গড়িয়ে নেকেন কিনা ভাবছেন অবিশ্বাস এমন সময় টেবিলের ওপরে পড়ে থাকা খামটির ওপর চোখ পড়ল তাঁর। ক'বছর আগে হলে, এই চিঠির এভাবে পড়ে থাকার উপায় ছিল। কোন সঙ্গোপনে যে লুকিয়ে রাখবেন ভেবে উঠতে পারতেন না তিনি। খামটি তুলে নিলেন তৎক্ষণাৎ। ইউ এস এ থেকে এসেছে, ক্যালিফোর্নিয়ার দূত। খুলে দেখেছেন আগেই। কোনো চিঠি নেই ভেতরে। শুধু একটি গ্রিটিংস কার্ড। অবিশ্বাসের জন্মদিনের জন্য। এই কার্ডটি আসায় তাঁর মনে পড়ে গেল, হ্যাঁ কদিন আগে তাঁর জন্মদিন গেল বটে। কাউকে জানান না, তাই কোনোরকম শুভেচ্ছার প্রশ্নই থাকে না। আজকাল কী যায় আসে, কবে কখন জন্মেছিলেন না জন্মাননি সেই ক্ষণটিকে মনে রেখে। কিন্তু স্বাভাবিক মনে থাকে যে কারণেই হোক। সুদূর স্টেটস থেকে একনাগাড়ে তিরিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে এই কার্ড এসেছে তাঁর ঠিকানায়। অথচ দু'বছর ছাড়া ছাড়া স্বাভাবিক একবার দশ-পনেরো দিনের

জন্য দমদম বিমান বন্দরে এসে নামে, সেখান থেকে তার শ্বশুরবাড়ি বা বাপের বাড়ি, সব জানা সত্ত্বেও অবিনাশ দেখা করা তো দূরের কথা কোনো যোগাযোগের চেষ্টাই করেননি। ওর বিয়ের পর কলকাতায় এসে বার্তা পাঠিয়েছে, কিন্তু অবিনাশ নিম্পূহ থেকেছেন। এত বছরের মধ্যে গেল তিন বছর কোনো কার্ড আসেনি শুধু। অবিনাশ ভেবেছিলেন, যাক, তাহলে এতদিনে ভুলেছে। ভুলে যাওয়াটাই স্বাভাবিক, কে আর মনে রাখে। তবুও তো ও এতকাল মনে রেখে একটা করে চিঠি, বা কার্ড পাঠিয়েছে এই দিনটিতে। মনে করে নাকি কৃত অপরাধ থেকে উদগত পাপবোধই তাকে প্ররোচিত করেছে পাঠাতে, সে তর্কে যাওয়াটা আজ বৃথা। কিন্তু তিন বছর পরে আবার খামটি এসেছে দেখে অবিনাশের মনে হয়েছিল, হয়ত সত্যি সত্যি যা ভাবা গিয়েছিল তা ঘটেনি, সুখী হতে পারেনি স্বামী বিবাহিত জীবনে। পারলে এই খাম পাঠানো বা চিঠি লেখায় ভাটা পড়তই পড়ত। হঠাৎ বৃকের মধ্যে কোনো কোনো ব্যথা নিশ্চয়ই খুঁ খুঁ করে জেগে যায়, কখনো বা ধুকুমার কাণ্ড বাধিয়ে রসে। যেকথা কাউকে বলার নয়, বুক ফাটে তবু যে মুখ ফোটে না—অতএব খামের ওপর ঠিকানা লিখে তবে যা নিশ্চিতি। কোথাও ঈশ্বর আছেন এই কথা ভেবে নিয়ে আশ্বস্ত হওয়া কিংবা একে একধরনের আশ্বস্তশ্রুতাই বলা যেতে পারে।

এব মধ্যমি টুকলু এসে হাজির,—তুমি নাকি আমার জন্যে স্ট্যাম্প রেখেছ কাকু?

—হ্যাঁ। এই দিচ্ছি। বোসো এখানে।

টুকলু বসল বিছনার একধারে। অবিনাশ খামের ভেতর থেকে কার্ডখানা বের করে টেবিলে ফেলে দিলেন অস্ফুটে কি বলে। বোধহয় বললেন, ইউজলেস।

তার মানে মনের ভেতরে যে হাওয়া-বাতাসের ঝাপটা চলছিল, এর মধ্যে দিয়েই তা চাপা দেওয়া হল। খামটি নিয়ে তার উপরে যেখানে স্ট্যাম্প দু'খানা সঁটা আছে প্রাস থেকে জলের ছিট দিলেন অবিনাশ। মুহূর্ত পরে ঘষে দিতেই স্ট্যাম্প দুটো উঠে এল হাতে। বালকের দিকে বাড়িয়ে দিলেন অবিনাশ।

হাতে নিয়ে টুকলু বলে উঠল, উও হুররে। ইউ এস এন স্ট্যাম্প। খুব ভালো হল। আরো পেলে রাখবে কিন্তু আমার জন্যে। যদি জার্মানি পাও আরো ভালো। আমার স্ট্যাম্প অ্যালবামে জার্মানির কোনো স্ট্যাম্প নেই কিনা—

হেসে অবিনাশ ভাইপোর চিবুকে হাত দিলেন। দৌড়ে নিচে চলে গেল বালক।

অবিনাশ বিছনায় গড়িয়ে নেবার অঙ্কিলায় গা এলিয়ে দিলেন, কিংবা একে শুয়ে পড়াই বোধহয় বলা ভালো। কিন্তু মনের মধ্যে যেন অন্য কোনো বাকবিত্তা গুল্লুরিত হচ্ছিল। একবার শুয়ে শুয়েই হাত বাড়িয়ে ব্রিটিশ কার্ডখানা চোখের সামনে টেনে নিলেন তিনি। কি যেন দেখলেন একদৃষ্টে চেয়ে। দেখার চেষ্টা করলেন। মগ্ন থাকলেন কিছুক্ষণ, যেন মরীচিকা অন্বেষণে। তারপর ধীর পামে বিছনা থেকে উঠে বুক ব্যাক কাম গ্রাণ্ড কেবিনেটখানার কাছে এগিয়ে গিয়ে একখানা ড্রয়ার খুললেন কাঠের হাতলে টম মেরে। পুরো ড্রয়ারখানা খুলে বেরিয়ে এল হাতে, আর তার মধ্যে কয়েকশ' চিঠি আর এমনি ব্রিটিশ কার্ড থরে থরে সাজানো। সব জমানো আছে সযত্নে। যেভাবে ভাঙা খোলামকুটিকেই পয়সা জ্ঞানে মূল্যবান করে শুষ্কি রাখে কোনো বিষয়বুদ্ধিহীন বালক, তেমনি সরল হাতে সেই ঠাসা

চিঠিপত্রের ভিড়ে আরো একটি ব্রিটিশ কার্ড খামের মধ্যে ভরে রেখে দিলেন যত্নবান হয়ে। কে জানে আর কেউ কখনো খুলবে কিনা, কেননা বারবার পুরাতনকে খুলে দেখার অভ্যাস অবিনাশের নেই। ছিলও না কখনো। তাই কেউ যদি কখনো প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে উৎসাহিত হয়ে ড্রয়ারটি খুলে খামের ভেতর কি আছে দেখায় প্ররোচিত হয়, তবেই দ্বিতীয়বার আশ্চর্যপ্রকাশ করতে পারে এই গোপন কাহিনীগুলি। হতে পারে তা বহুকাল পরে—অবিনাশের মৃত্যুরও পরে। অবিনাশের মৃত্যু মানে আর কত বছর, বড় জোর কুড়ি-বাইশ। কিংবা কখনোই হয়ত খোলা হবে না আর, পরবর্তী প্রজন্মের কারো হাতে হঠাৎ পড়ে গেলে অব্যাহত কাগজের তাড়া হিসেবেই বিসর্জিত হবে ডাস্টবিনে। কেননা অর্থ বা টাকা-কড়ির মতো মূল্য যে এই সঞ্চয়ের মধ্যে নেই, সে কথা খালি চোখেও স্পষ্ট। একথা বুঝতে বা মানতে কোনো অসুবিধে হয় না অবিনাশের। তিনি জানেন এ জগতের সবকিছুই নশ্বর, কোনো কিছুই থাকে না। এমনকি এই দেহখানিই যখন সন্দেহের তখন তার গভীরে যে আবেগের ই সি জি আলোড়ন—মহাকালের এজলাসে তার কিইবা দাম, নিছক ছেলমানুবি ছাড়া পাকা মাথার লোকজনেরা তার কিইবা নাম দেবেন।

তবু তিনি সব জেনেও শুষ্কি রাখলেন হয়ত এই ভেবে যে জীবনের নানান তিতিক্ষায় তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছিল একটা শব্দ 'ইউজলেস'। আর এই কথাটাই হয়ত সাতপাঁচ ভাবনার মাঝে তাঁর মনোপীড়ার কারণ হয়ে উঠেছিল। এইসব কথা সবসময় তো আর কেউ সঠিক মানে করে বলে না, বলে ফেলে রাগ বা ক্ষোভের মুখে পড়ে কিন্তু বলার পর দেখা যায় তা আলাদা একটা রূপ পরিগ্রহ করেছে। যা আসলে অনিচ্ছকৃত, যা বলতে চাওয়াই হয়নি। কিন্তু কেউ তো শোনেনি, সুতরাং অবিনাশের শিরঃপীড়ার কারণ কি, কি এমন হল যে উসখুস করতে করতে বিছনা থেকে উঠে পড়তে হল তাঁকে, বিরত করতে লাগল এভাবে। আসলে কেউ শুনতে পাক বা না পাক, অন্তর্যামী অববিধ অস্তিত্বে তাঁর কোনোদিনই আস্তা নেই। কিন্তু তিনি নিজে তো শুনছেন, তাই কী করে অস্বীকার করেন উক্তিটি তাঁর। বোধহয় এই অপরাধ বোধের থেকেই স্বালন ঘটানোর জন্য তাঁকে কর্তব্যপরায়ণ হয়ে উঠতে হয়েছে যেন না উঠলে কার্ডখানি যে অবহেলা ভরে টেবিলের উপর ফেলে রাখা হয়েছে এটা ক্যালিফোর্নিয়া থেকে স্বামী দেখতে পাচ্ছিল।

শুতে শুতে অবিনাশের চোখের কোণে, ঠোঁটের আড়ে বহুকালের ওপরে হতে, বহু পুরাতন, একেবারে বলা যায় মাস্কাতা আমলের এক চিলতে হাসি নদীর জলে ভেসে আসা কুটোর মতোই মুহূর্তে ভেসে মুহূর্ত পরে তলিয়ে গেল কোথায়। সত্যি অনিশ্চিত এই জীবনে যদি দু'একটা অনুভূতিকেও চিরস্থায়ী করে রাখা যেত।

নিজেকে সংযত করেছেন বৈকি অবিনাশ, নইলে আবেগ নামের বিভীষণটিকে বেশি প্রশয় দিলে সে যে কোনো সময় একটা হাস্যাম্পদ কাণ্ড ঘটাতোই পারে। এই বিছনায় শুয়ে তিনি সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন র্যাকে সাজানো আছে উজ্জ্বল বইকানি, যার গোশ্চপ্রেট বাঁধাই স্পাইন্সের ওপর লেখা আছে 'ডিসকভারি অব ইন্ডিয়া'। নেহরুর লেখা এই বইটি খুললে দেখা যাবে এরই দুই পাতার মাঝে রাখা আছে একটা সাদাকালো ফটোর প্রিন্ট। বহুকাল আগেকার কথা। সেই ছবিটি স্বামীর আঠারো বছর বয়সের। কবি বলেছেন, আঠারো বছর কি দুঃসহ। সত্যিই, কিন্তু সয়ে নিয়েছেন অবিনাশ। নারীটি অনেক দূরের ব্যাপার, তার স্মৃতিটাই তো আজ

ফসিল হয়ে গেছে।

কিছুকাল আগেও বইটি খুলে অবশ্যে সবরে দেখতেন অবিনাশ। হ্যাঁ করে তাকিয়ে থাকতেন ভবিষ্যৎ বা সম্ভাবনাময়ী নস্টালজিয়ার দিকে।

এখন আর নয়, পরিহার করেছে ছেলমানুষি। কিংবা অলস স্বপ্নজাল বুনে যেতে আর ভালো লাগে না।

বরং একটা সিগারেট ধরালেন তিনি, তার সাদা ধোঁয়ায় নিজেকে পাখর বলেই মনে হল তাঁর। বহুদিনের জল যেভাবে জমে জমে পাখর হয়, যেভাবে হিমালয়। অবিনাশ বেশ খানিকটা ধোঁয়া গিলে ফেলে অসাবধানে খুক খুক করে কাশতে লাগলেন।

একবার ভাবলেন এতদিন পরে স্বাতীকে একটা উত্তর পাঠালে কেমন হয়। নাটক নভেলে যেমনটা হয়ে থাকে।

পরমুহূর্তে ভাবনাটা ছিড়ে কুটি কুটি করে ফেললেন তিনি, যেন একটা আস্ত পাণ্ডুলিপি। কিন্তু নতুন কোনো লেখার মুখাড়া।

মাঝে মাঝে নিজের কাছেই জানতে চান, সত্যিই কী তিনি দুর্ভিক্ষের ভাবে বোকা? একরোখা? একটা অচল পয়সা!

সিগারেটের মুখে জমে ওঠা ছাই ঝাড়লেন দুই আঙুলে টুইস্ট করে।

কিছু কিছু জিজ্ঞাসা থাকে প্রশ্নাতীত। কোনো দিক থেকে কোনো উত্তর আসে না। বেশি নড়াচড়া করলে ধন্দ শুধু বেড়েই যায়। তবু ভালো লাগে ভাবতে মাঝে মাঝে, অকারণ। অলস শুকনো মস্তিষ্কে এইভাবে রক্ত চলাচল ফিরে আসে। জীবন্ত মনে হয় নিজেকে। বাঁচতে হচ্ছে করে আরো। সেই যে কথা জড়িয়ে যাওয়া, অপ্রতিভ, পরাজিত ভাবটা কেটে যায় যেন আশ্বে ধীরে। কিংবা ওটাকে ভাব না বলে বরং ব্যামো বলটাই শ্রেয়। ভেতরে ভেতরে যেন নবায়ন ঘটায় এইসব তরুণমনস্ক ভাবনাগুলি, গড়ে ওঠে অন্তর্গত ভাবস্বর্ষ। তখন প্রতীত হয় এই সত্য যে যৌবন আসলে চোরাগোপ্তা মানবদেহেই লুকিয়ে থাকে। তাকে জাগাতে পারলে যে কোনো বয়সে তা সর্বোষধির মতো কাজ করে। হয়ে ওঠে জীবনদায়ী।

মনের মধ্যে নড়াচড়া করতে থাকে কথাগুলো। ভাবনাগুলো কেমন যেন। মনে হবে বারান্দায় জীবন্ত কেউ পায়চারি করে বেড়াচ্ছে। হাঁক দিয়ে ডেকে তাকে শুধু ঘরে ঢোকানোর অপেক্ষা।

অবিনাশ ভাবনাগুলো মাঝে মাঝে দু'হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিতে থাকেন, যেভাবে মেঘ সরিয়ে দিলে পূর্ণচন্দ্রের উদয় ঘটে কিংবা যেভাবে কোনো চন্দ্রাহত অমরত্ব লাভ করে ইতিহাস হয়ে যায়।

৪

‘গত ২১ জুন পূর্ণ হল বামফ্রন্ট সরকারের পঁচিশ বছর। রাজত্ব কথাটা রাজার ক্ষেত্রে খাটে, গণতন্ত্রে নয়। কিন্তু বামফ্রন্ট যে প্রতাপে শাসন করল পঁচিশটি বছর তা যে কোনো রাজ্যকেও ছাপিয়ে যায়। পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে অনেকেই বামফ্রন্টকে একহাত নিচ্ছেন। শিল্প, পরিকাঠামো, আর্থিক অবস্থা সবচেয়েই কেমন যেন একটা নড়বড়ে ভাব। শুধু বছর বছর কিছু আশার বাণী, কিছু সক্রিয় ভূমিকার দাবী কিন্তু জীর্ণ পুরাতনকে আঁকড়ে থাকার মরীয়া প্রচেষ্টা। অবশ্য পঁচিশ বছর ভারত তথা বিশ্ব বেশ কিছুটা প্যাঁটেছে। দেশের রাজনীতিতে বা অর্থনীতিতে কাঠামোগত পরিবর্তন এসেছে, প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এসেছে নাকি যথার্থ বিপ্লব। চিঠি লেখা ছেড়ে মানুষ দিনরাত ই-মেল করছে। তাড়া তাড়া কাগজ আর ডাকে পাঠাতে হচ্ছে না, কম্পিউটার মারফৎ সাতসমুদ্র পার হয়ে অদৃশ্য অবস্থায় হাতবদল

হয়ে যাচ্ছে নিমেষে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে খানখান। মহাচীনে ধনতান্ত্রিক জীবন সমাগত। আবার শত শত বাধা বিপত্তির মধ্যেও কিউবা গর্বোদ্ধত, নাকি উন্নয়নশীল। কেরলে চিরস্থায়ী বামপন্থী শাসন আসেনি, এসেছে শুধু পশ্চিমবঙ্গে। চারদিকে পরিবর্তনের এত ঢেউ, তবু রাজ্যের ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি। বামফ্রন্টের আর্থরাজনৈতিক দর্শনে অবশ্য একটা পরিবর্তন হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ পদাঙ্গীন নেতারা স্বীকার করেছেন যে বাজার ভিত্তিক অর্থব্যবস্থার সুযোগ নেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। মূলধন বা পুঁজির দরকার হলে পুঁজিমাণিকদের চটিয়ে লাভ নেই। আর লোকের হাতে ক্রয়ক্ষমতা বাড়ানোটাই আধুনিক অর্থনীতির মূল কথা। পশ্চিম আর দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে যখন ব্যবসার রমরমা, উচ্চশিক্ষার প্রসার পরিকাঠামোয় বৈশ্বিক উন্নয়ন, সবকিছুর সামনে পশ্চিমবঙ্গকে অবশ্যই দুখ মনে হয়। যাটের দশকে পশ্চিমবঙ্গে মাথা পিছু আয় অনেক রাজ্যের তুলনায় বেশ খানিকটা এগিয়ে ছিল। কিন্তু রাজ্যের সামগ্রিক উন্নতির হার বেশ কম হওয়ায় আজ আর পশ্চিমবঙ্গ সে সম্মানের দাবীদার নয়। আশির দশকের গোড়ায় দেশের শিল্পজাত উৎপাদের শতকরা দশভাগের মতো তৈরি করতাম আমরা, আজ করি শতকরা পাঁচভাগের মতো। গত বিশ বছর সংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান বাড়েনি। বেসরকারি মালিকানার ব্যবসায় কর্মচারীর সংখ্যা কমেছে। মাইনে, পেনশন দিতে দিতে সরকার নাকি জেরবার। সরকার সেভাবে রাজস্ব বাড়াতে পারেনি। অন্যদিকে এও শোনা যাচ্ছে, কৃষ শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে খরচা করতে হচ্ছে প্রচুর টাকা। যদিও কেন্দ্রীয় সরকার বছর বছরই বলছে পশ্চিমবঙ্গকে দেওয়া টাকা তারা উন্নয়নখাতে খরচ করতে পারেনি, ফেরৎ এসেছে, সুতরাং বরাদ্দ বাড়ানোর দাবীটাই তো অযৌক্তিক। বামফ্রন্টের বিরোধী কি সমর্থক আজ মোটামুটি একবাক্যে স্বীকার করছেন যে রাজ্য চালানোর পরীক্ষায় অর্থদপ্তর কিছুতেই পাশ নম্বর পাবে না। তাহলে এমনকি কাজ করলেন বামফ্রন্ট যে তাঁরা ভোট-তরুণী তীরে ভিড়িয়ে বার বার মসনদে এসে বসতে পারছেন? বলছেন বা দাবী করছেন, কংগ্রেসি পশ্চিমবঙ্গের গ্রামেগঞ্জে, মফস্বলে, রাস্তায় রাস্তায় ভিখিরি দেখা যেত। ভূমি সংস্কারের কর্মকাণ্ড ছিল না বললেই হয়। জমি অধিগ্রহণ হলেও পুনর্বন্টন হয়নি। চাষীর পাওনাগণ্ডার ওপর সরকারি নজরদারি ছিল না। দারিদ্র্য লুকিয়ে থাকত না, পড়ে থাকত কেবল হয়ে খালিচোখের সামনেই। আরো একটা ব্যাপার, নিচুতলার লোকজনদের তুচ্ছ তাক্সিল্য করার সুযোগ একটু বেশিই ছিল। হাড়ি ডোম বাগদি, এরা পঞ্চায়েত সদস্য হয়ে চড়া আওয়াজে কথা বলবে এটা ভাবা যেত না। শহরে শ্রমিকদের সংগঠন, তাদের মারমুখী মেজাজ অনেক দিনের। কিন্তু কৃষকদের মধ্যে তেমন সংগঠন নাকি গড়ে ওঠেনি। অপারেশন বর্গা বা পঞ্চায়েত ব্যবস্থার ব্যাপক প্রসার সম্পদহীন নিম্নবিত্ত প্রান্তিক ও ভূমিহীন কৃষকদের এক ধরনের নাকি রাজনৈতিক সম্মান বা পদমর্যাদা দিয়েছে। ক্রমে ক্রমে রাজনীতি এবং সরকারি পুনর্বন্টন ব্যবস্থার মধ্যে একটা সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। সরকার গরিবদের দারিদ্র্য মোচনে নানারকম প্রকল্প হাতে নিয়েছে, তা থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে সাধারণ গ্রামীণ মানুষ উপকার পেতে শুরু করেছে। অবশ্য রাজনৈতিক কারণে বোঝার উপায় থাকে না, কেন্দ্র না রাজ্য, কে যে উপকার করেছে তার সঠিক হদিস পাবার উপায় নেই। এইসব দাবী যদি আত্মগর্ভ সমর্থনের জন্য বাঁধা বুলি বা নির্মিত যুক্তি হয়েই থাকে তবুও সব জেনেও কিছুই করার নেই নাগরিকদের।

করতে বা বলতে গেলেই শান্তি বিয়িত হওয়ার আশঙ্কা। ফলে গ্রামের বড়লোক, জ্ঞাতদার বা উচ্চবিত্ত কংগ্রেস নেতার জায়গা নিল পাটি। পাটিতে ব্যক্তির চেয়ে সমষ্টির প্রভাব বেশি হওয়ার কথা। তাহলে গণতন্ত্রের হাওয়া বইতে অসুবিধে হয় না। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কি তা ঘটেছে নাকি উশ্টোটাই ঘটল এই পঁচিশ বছরে। টু শব্দটি করার অধিকার কি কারো আছে? ফলে নূপেন চক্রবর্তীরা যে তাঁদের দালাল পাগল বলে শনাক্ত ও ব্রাত্য হবেন আর বিনয় চৌধুরীরা ‘ঠিকাদারদের দ্বারা ঠিকাদারদের জন্য গড়া ঠিকাদারদের সরকার’ থেকে নিজেদের দূরত্ব বাড়িয়ে স্বেচ্ছাবৃত্ত বিন্মুতিতে লীন হতে থাকবেন, তাতে আর আশ্চর্য কি?

এমন সময় দরজার টোকা। কলম বন্ধ করে টেবিলে রাখলেন অবিনাশ। তারপর উঠে দরজার দিকে যেতে যেতে বললেন, দরজা খোলাই আছে।

তাঁকে গিয়ে আর দরজা খুলতে হল না, তার আগেই বিবেক ঢুকল দরজা ঠেলে, বলে উঠল, আমি স্যার।

—ও, এসো। এই বলে অবিনাশ দেখলেন দরজা খোলার ফলে দেখা ছবিটা। একটু আগে ছদ্মে ক’মুঠি আতপ চাল ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, এতক্ষণে সেখানে প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশটি পায়রা এসে ভিড় করেছে। খুঁটে খুঁটে যাচ্ছে। উড়ে যাচ্ছে চৌটে নিয়ে, ফের এসে বসছে। ওড়াউড়ি বকবকম চলছেই সমানে। সাদা-কালো ঝুঁটিবাধা কত পায়রা।

না বসে বিবেক বলল, আজ স্বাধীনতা দিবস, মনে আছে তো স্যার?

এইবার অবিনাশ যেন খুঁটিয়ে দেখতে চেষ্টা করলেন পায়রাগুলি ঠিক শান্তির পায়রা কিনা। নাকি বারো হাটের ভূত। অবিনাশ চূপ করে চেয়ে থাকেন বহির্দৃশ্যে।

কথাটি তাঁর কানে গেল না ভেসে গেল বুঝতে না পেরে বিবেক আবার বলল, আপনি কিন্তু কথা দিয়েছিলেন স্যার আমার যে কোনো ডাকে আপনি বেরিয়ে পড়বেন। সাধী হিসেবে পাব আপনাকে। না, দল থেকে নয়, ব্যক্তি হিসেবেই ডাকছি আপনাকে। আপনি তো ভালোবাসেন দেশাত্মবোধক গান শুনে, সবিত্তব্রত দস্তের গান। তবে নিন, পায়রামা ছেড়ে ধুতিপাঞ্জাবি পরে নিন।

‘স্বাধীনতা’ এই শব্দটি অবিনাশের ভেতরে কী যেন এক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। বাবা আজ নেই, পরোলোকগত। ক’বছর আগে এমনি এক ১৫ই আগস্টের সকালে তিনি নিচের বৈঠকখানা ঘরে বসে স্কোভে ফেটে পড়েছিলেন উপস্থিত সহকর্মী বা সতীর্থদের সামনে, নবগতদের মুখোমুখি বসে। তার দুদিন আগেই মারা গিয়েছেন পান্না লাল দাশগুপ্ত মশাই। অরবিন্দ, জয়প্রকাশ নারায়ণ আর পান্নালাল দাশগুপ্ত—এই তিনজনই স্বদেশের মুক্তি সংগ্রামে যৌবনে সশস্ত্র হাতিয়ার তুলে নিয়েছিলেন। পরে বৃহত্তর সত্যের সন্ধানে অরবিন্দ চলে গেলেন পশ্চিমবঙ্গী আশ্রমে, জয়প্রকাশ সর্বোদয় আন্দোলনে আর এই পান্নালাল গ্রামস্বরাজ গঠনের ব্রত নিয়ে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত ছুটে বেড়ালেন। কখনো দণ্ডকারণ্যে, কখনো সুন্দরবন বা বীরভূমে। অর্থ, ক্ষমতা, প্রতিষ্ঠা, সাংসারিক সুখের হাতছানি উপেক্ষা করে গেলেন সারাটি জীবন তথাকথিত সামাজিক স্বীকৃতির তোয়াক্কা না করে। প্রচার সর্বত্র চলতি ছজুগের যুগে বসেও গণদেবতার নীরব সাধনার এ এক অবিস্ম্য সাধক। কিন্তু গালভরা বুলির পরাকাষ্ঠা ওই স্বাধীনতা ওঁর মতো নিবেদিতপ্রাণ দেশনায়ককে কেই বা দিতে পেরেছে?

আজ ‘স্বাধীনতা দিবস’ কথাটির সঙ্গে সঙ্গে পুরনো কষ্টস্বর যেন জীবিত

হয়ে উঠল অবিনাশের কর্ণকুহরে। সত্যি কি স্বাধীনতা আছে আর কোনো প্রগেই। কেউ কি স্বাধীন এই দেশে। হাজার রকমের শৃঙ্খলে বাঁধা নয় কি প্রতিটি মানুষ?

ধুতি পরবার দরকার বোধ করলেন না অবিনাশ। বরং পরে থাকা পায়রামার ওপর একখানা কাচা খোলাই পাঞ্জাবি পরে চোখের চশমাখানা ক্রমাল দিয়ে ভালো করে ঘষে ফের নাকের পাটায় লাগিয়ে নিলেন। পায়ে এক জোড়া কোলাপুরি গলিয়ে বললেন, চলো, কোথায় নিয়ে যেতে চাও আমাকে।

গদগদ কণ্ঠে বিবেক বলতে বলতে চলেছে, আজ আমাদের ক্লাবের পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হচ্ছে স্যার। কত বাধা বিঘ্ন শাসনি সামলে যে কাজ করে যাচ্ছে এই ক্লাবের ছেলেরা, তা যদি আপনাকে দেখানো যেত। দেশের সবজায়গাতেই তো এখন অসাম্য, নানারকমের বিভেদ, আমাদের রাজ্যটি তো তার শিরোভাগে। কী আর বলব আপনাকে, আপনি সবই জানেন।

—কী নাম যেন তোমাদের ক্লাবের?

—আজাদ সংঘ। এই সংঘের প্রতিষ্ঠাতা মনোমোহন চ্যাটার্জি ছিলেন খোদ নেতাজি সুভাষের একজন কাছের জন। তিনিই নামটি রেখেছিলেন।

—ও।

—এখন সেক্রেটারি হলেন সোনামুখী হাইস্কুলের হেড টীচার মাখনবাবু। মাখনলাল ঘোষ দস্তিদার মশাই। চেনেন নাকি আপনি?

—না।

—আপনাকে কিন্তু খুব চেনেন, মান্য করেন। আপনার নাম বলতেই বলে উঠলেন, ওহু, ওনাকে কে আর না চেনেন। আপনার ‘সময়, সতর্ক চোখে বইটিও আদ্যো পান্ত পড়েছেন মাখনদা। আপনার সম্বন্ধে বলছিলেন, ওরকম লোকজনের সংখ্যা দিনকে দিন কমে আসছে এটা খুবই সংকটের কথা। আপনার বক্তৃতা ভাষণের কথা তুলে বললেন, এমন সোজা ভাষায় সত্যি কথা বলার সাহস দেখাবার লোকই বা আজ কোথায়?

ক্লাব প্রাঙ্গণের সামনে বিরাট ম্যারাপ বাঁধা হয়েছে, মঞ্চখানিও দেখার মতো। ত্রিঙ্গ পতাকার মাঝখানে ঘাসফুল চিহ্নটি আঁকা। অবিনাশ জানেন বিবেক দাস তুণমূল কংগ্রেস করে, একেবারে সক্রিয় কর্মী বলতে যা বোঝায়। বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার প্রথম পাঁচ বছরে বিরোধী পক্ষ হিসেবে বিধানসভা কক্ষ আলো করে থাকত বিজিত কংগ্রেস। যার সর্বভারতীয় নেতৃত্বে ছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। আসলে বারে বারে এই দলটিও প্রয়োজন মতো গড়াভাঙার খেলায় মেতেছে। আদি কংগ্রেস, বাংলা কংগ্রেস, কংগ্রেস আরস, জাতীয় কংগ্রেস, নব কংগ্রেস এবং ইন্দিরা কংগ্রেস। জোড়া বলদ, গাই বাছুর, হাত—এইসব নানা রকমের প্রতীকে ভোটে লড়ছে তারা। লড়ছে নানা সময়ে। কিন্তু এই বঙ্গ কংগ্রেস বলতে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী যুগে যেমন সম্মগরা ভারতবর্ষে ছিল তেমনটাই বোঝাত। অর্থাৎ কংগ্রেস ছিল স্বদেশীদের একটা সর্বজনগ্রাহ্য সম্মেলন। যদিও গান্ধী, তিলক, নেতাজি, দাদাভাই নওরোজি প্রভৃতি নেতাকে কেন্দ্র করে ভাগবিভাগ ছিল, বলাই বাহুল্য। কিন্তু পরবর্তীকালে, কংগ্রেস যখন রাজনৈতিক দল হয়ে বন্দেমাতরম শব্দটিকে নিজদলের আপু স্লোগানে পরিণত করে তার আগে পর্যন্ত কেউ ‘বন্দেমাতরম’ বললে তার অর্থ আলাদা হত। কংগ্রেস বলতে আজ যাদের বোঝায় তাঁদের বোঝাত না, বোঝাত, যিনি চরকা কাটেন, সর্বোদয় জানেন, দেশের জন্য নিজের প্রাণ তুচ্ছ করেন। কিন্তু রাজনৈতিক দল হিসেবে কংগ্রেস যখন দিল্লির কুর্সি দখল করল তখন রাতারাতি লোকগুলো যে

বিলকুল খারাপ হয়ে গেল তা কিন্তু নয়। বরং প্রথম দশ বছরে পুরনো আদর্শবাদীদেরই প্রভাব বেশি। তারপরে এমন নেতাদের হাতে পরিচালিত হতে লাগল এই কংগ্রেস, যারা দেশের চেয়ে নিজের প্রাণকে ঢের বেশি মূল্যবান মনে করলেন তাই নয়, বরং ব্যক্তিগত চরিতার্থ করার জন্য তাঁরা দেশের ভালোমন্দ বিসর্জন দিলেন। জবাহরলাল নেহরু যে বলেছিলেন, কালোবাজারি দেখলেই তাদের ল্যাম্পপোস্টে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে তার পরিবর্তে তারা নিয়ামক হয়ে উঠল দেশীয় রাজনীতির। ফলে কেরিয়ার পলিটিক্সের জন্ম হল। ঘটল দুষণ, তার সংক্রমণ ও সংবহন শুরু হল। জাতীয়তাবাদী থেকে যে সব ছোট দলের উদ্ভব হল সকলেই তথৈবচ। এমনকি আদর্শ ও সাম্যবাদের ধ্রুয়ো তুলে আনার্কিস্ট বিপ্লবী বলে যে মার্কসবাদী বামপন্থীরা ভিন্ন রবে উচ্চকিত হয়ে উঠেছিল তাদের গায়েও লাগল ব্রষ্ট সময়ের ওই হাওয়া। শুরু হল রাজনৈতিক খেয়োখেয়ি। বিচ্ছিন্নতাবাদ। উগ্রপন্থা বা সাম্প্রদায়িকতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। এদিকে পশ্চিমবাংলায় নকশাল উত্তালতাকে দমিয়ে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এল যখন তখন তারাও উন্নয়নের পক্ষে বড় বড় বুলি আওড়াতে ছাড়ল না। প্রথম পাঁচ বছর এভাবেই কেটে গেল, বিলেত ফেরৎ ব্যারিস্টার জ্যোতি বসুর মন্ত্রীসভা গরিবের পক্ষে জেহাদ ঘোষণা করল। যদিও গরিবি কী জিনিস তা জ্যোতিবাসু প্রমুখরা তার কিছুই জানেন না, এবং মার্কস সাহেবও তাঁর ডাসকাপিটাল গ্রন্থে লিখেছিলেন যে, শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব দিতে হলে তাঁকেও শ্রমিক শ্রেণীরই লোক হতে হবে, হতে হবে ডিক্রাসড। তা হয়নি যখন তখন ওই ‘দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ’ বদলে কালে কালে ‘খাদ্যমূলক বস্তুবাদ’-এ রূপান্তরিত হল স্বাভাবিক নিয়মেই। আরো পরে দ্বিতীয়বার যখন বামফ্রন্ট ক্ষমতা দখল করল, তখন থেকে অন্যতম কাজ হিসেবে গ্রহণ করা হল এক অভিনব প্রকল্প। যেহেতু পশ্চিমবঙ্গ গ্রামপ্রধান রাজ্য, সুতরাং গ্রামে বিরোধী দল কংগ্রেসকে উৎখাত ও নিশ্চিহ্ন করতে হবে। তার জন্য ভীতি প্রদর্শন, উৎকোচ প্রদান, অগ্নিসংযোগ, রাজনৈতিক খুন-খারাপি পর্যন্ত চলতে লাগল। ডাকাতির নামে লুণ্ঠ, খাসবেনাম জমি বন্টন ও বিলি বন্দোবস্তের নামে জবর দখল ও মধ্যবিস্তার উচ্ছেদ—এইসব চলল। লাল ঝাতার সেই দাপটে শান্তিপ্রিয় মধ্যবিস্ত কংগ্রেসিরা পিছু হটল। বামদের নিচুতলার সংগঠন ও কর্মী সংযোজন দেখে তারা ধরেই নিল, এই যে লালবাহিনী, তার প্রভাব ও গতি রোধ করবে কে। শুরু হল সুবিধাজনক পরিস্থিতি গড়ে নিকট শহরে চলে আসা। ওইসব কংগ্রেসিরা মধ্যবিস্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার দরুণ চাকরির সুযোগ শহরেই ছিল। যারা রইল, তাদের সমবে দেওয়া হল—এখানে থেকে মোটামুটি করে খেতে হলে পার্টির কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে। নইলে একঘরে, মাঠের ধান মাঠে পড়ে থাকবে, গরুর গোয়াল গোহাটায় পরিণত হবে, বউ-মেয়েদের ইজ্জতে টান পড়বে, ছেলে-ছেকরারা নিখোঁজ হয়ে যাবে। সুতরাং ভোটের সময় ভোট দিতে যাবার দরকার কি। পারো তো তালে ভাল মেলাও, না হলে বোবা আর কালার জীবন যাপন করো। সুতরাং গ্রাম-বাংলার ক্ষেত্রে ওই শহুরে ‘দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ’ কথাখানা রূপান্তরিত হল অর্ধশিক্ষিত সব পঙ্কায়ত নেতাদের হাতে পড়ে। কাউকে ধরে আনতে বললে দেখা গেল বেঁধে আনা হয়েছে। বেঁধে আনার কথা ছিল যাকে, দেখা গেল তার মাথাটি মেরে ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং রাইটার্স বিন্ডিং বা আলিমুদ্দিন স্ট্রিট থেকে এই ‘খাদ্যমূলক বস্তুবাদ’ যখন গায়েগঞ্জে এসে পৌঁছল তখন দেখা গেল তা কিছুটা পাশ্টে হয়ে গেছে ‘ভাত্যমূলক বস্তুবাদ’। ধীরে ধীরে বিরোধী

পক্ষ হিসেবে আর কোনো অস্তিত্বই রইল না বর্ধমান মেদিনীপুর পুরুলিয়া ঝাঁকুড়া জলপাইগুড়ি বা দিনাজপুর জেলায়। বীরভূম মালদা ২৪পরগণার অবস্থাও প্রায় একই রকম। বাঁচার জন্য ওইসব কংগ্রেসিদের পরবর্তী প্রজন্মের ছেলে-ছেকরারা যারা গায়েই পড়ে আছে, সব সি পি এম-এ এসে যোগ দিল। কমিউনিস্ট হল তারা। নেতৃত্বে এল। মাঝি-বাগদি-নায়েক-কামার-কুমোর-সাঁওতাল এদের সব জায়গা দখল করে নেতৃত্বে এল ওরা। বামফ্রন্ট এভাবে মধ্যবিস্তদের দলে পরিণত হতে লাগল আর এই অভিযানে তাদের পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি জোয়ার আনল। কেননা অবশিষ্ট মধ্যবিস্ত নিম্নবিস্তদের বোঝাতে অসুবিধা হল না যে এই সবকার তোমাদেরই, অতএব, ছেড়ে দে মা লুটেপুটে খাই নীতির বমরমা চলল। আখের গোছানোর কল হয়ে উঠল স্থানীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা। এইভাবে একশ পশাশ বছরেরও পুরনো তথাকথিত বামপন্থা পরিণত হল ‘ভামপন্থা’। কংগ্রেস নিশ্চিহ্ন বা নীরব হয়ে এলে অপশাসনের বিরুদ্ধে লাঠি, টাঙ্কি, হেঁসো, ঝাঁটা হাতে এগিয়ে এল আদিবাসী-মাঝি-বাগদিরা। তাদের এই বিদ্রোহকে চিহ্নিত করা হল ‘ঝাড়খণ্ডী উত্থান’ হিসেবে। এবং যে সরকার এতকাল ধবে ক্ষমতায়, তাদের পক্ষে, মুষ্টিমেয়, প্রায় হাতেগোনা কয়েকজনকে দমন করতে মোটেই বেগ পেতে হল না। এর ফলে কলকাতার সংবাদপত্র কর্মী বা সাংবাদিকরাও পেয়ে গেল কিছু তোফা খবর বা মওকা। নগর কলকাতা বা শহরাকল কিন্তু তখনো কংগ্রেসপ্রধান, কংগ্রেসিরা সেখানে ভোটে জিতে আসেন। গ্রাম দখলের পর তৃতীয় মন্ত্রীসভা শপথ গ্রহণ করলে বামপন্থীরা লক্ষ্য নিলেন, শহরকে কজায় আনতে হবে। শান্তিপ্রিয় ভদ্রলোক ও বিদগ্ধ ঐসব কংগ্রেসি নেতাদের সঙ্গে তলে তলে রণ করে নিল বামফ্রন্ট নামা সুবিধাজনক শর্তে। তাঁদের বলা হল ‘তবমুজ’। দেখতে নাকি সবুজ ঠিকই, কিন্তু কেটে দেখলে ভেতরটা লাল। সবাইকে কিন্তু কিনে ফেলা যায় না, এই ত্রাণিকালে কংগ্রেসে স্থান পেয়েছিল বস্তি থেকে উঠে আসা এক সাধারণ মেয়ে, নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই মেয়েই গর্জে উঠল বিদ্রোহে। বিরোধী পক্ষ আবার সংগঠিত হল তাঁর নেতৃত্বে। তিনি সঙ্গে পেলেন দীর্ঘকালের নিগীড়নের শিকার আমজনতাকে। মন্ত্রীসভাব কর্ণধার জ্যোতি বসুর রাতের ঘুম চলে গেল। ঘরে ঘবে ইষ্টমন্ত্রের মতো ‘মমতা’ নামটি জপতে লাগল বাংলার মানুষ। বাংলার মেয়ে বাঙালির ‘দিদি’ হয়ে উঠলেন। রূপান্তরিত হলেন ‘অমিকন্যা’ শিরোনামে। সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় তাঁরই ছবি, বাম অত্যাচার জর্জরিত এলাকায় ছুটছেন মমতা এই, তো এই ছুটছেন বন্যা বা অমিকনাণ্ডে বিধ্বংস এলাকায়। গণহত্যা যেখানে সেখানে আশার বাণী শোনাচ্ছেন তিনি, নিগূহীতরা বুঝছেন এই লড়াই আসলে ধর্মযুদ্ধ বা ক্রুসেড। তাঁরাও সামিল হতে লাগল মমতাময়ীর নেতৃত্বে। একেবারে ঘবের মেয়ে। সুতরাং নির্লোভ, সৎ আর সাহসি। শুধু বিশ্বাস নয়, ভালোবাসার আশীর্বাদ বর্ষিত হতে লাগল তাঁর মাথায়। সেই মাথাটি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়ার ছক কষতে লাগল ক্ষমতাসীন সি পি এম। পুলিশকে তাঁরা ইতিমধ্যেই তাঁদের আজ্ঞাবাহীতে পরিণত করেছে। সরকারী অফিসার তাদের আদালতকেও প্রভাবিত করতে দেরি লাগেনি। একদিন এক মহামিছিলের ডাক দিয়েছিলেন অমিকন্যা, সেই মিছিলে তাঁর মাথায় ডাঙা দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করা হল। রক্তাক্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হল। কান্নার রোল উঠল বাংলার ঘরে ঘরে। কিন্তু অর্ন্তবাসী যিনি, বলেছিলেন, ‘পরিগ্রানায়চ সাধুনাং কিনাশায়চ দুষ্কৃতাম/ধর্ম সংস্থা নাথায় সন্তবামি যুগে যুগে, তিনিই মুখ তুলে তাকালেন। শত্রুর মুখে

ছাই দিয়ে বাংলার মেয়ে মমতা ফিরে এলেন ঘরে। ডাকলেন একের পর এক জনসমাবেশ, বাংলার মানুষ দশ বিশ লাখ লোক পাঠিয়ে সফল করলেন মমতার প্রতিটি অভিযান। জানালেন সমর্থন। দেখা গেল বাঙালির এতাবত কালের ইতিহাসে এতখানি জনপ্রিয় কোনো 'মাসলিডার' আসেননি। কেন্দ্রে নির্বাচিত লোকসভার সদস্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তুলকালাম কাণ্ড ঘটতে লাগলেন, পরজীকাতর সিনিয়ার কংগ্রেসিরা ভালো চোখে দেখলেন না, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী চিনতে ভুলতে করেননি এই অগ্নিকন্যাকে। দলে গুরুত্ব বাড়তে লাগল তাঁর। তাতে করে আপোষপন্থী সুবিধাবাদী নেতাদের অসুবিধাই হল, তাঁরা যদি আঁটিতে লাগলেন। কংগ্রেস দল যেহেতু পাকমাথা বুদ্ধি কারসাজিতে দক্ষ লোকদের দল সূত্রাং উমিচাঁদ, জগৎশেঠ, মীরজাফরদের তার সিংহভাগে থাকাই স্বাভাবিক। রাজীব গান্ধীর পর কিংবা তার পরে নরসিংহ রাওয়ের সময়ে মমতা বুঝলেন দিল্লিতে অকংগ্রেসিদের ঠেকাতে কংগ্রেস তাকিয়ে থাকে বামপন্থীদের সমর্থনের আশায়, সূত্রাং বাংলায় তিনি গঠন করলেন নতুন দল 'তৃণমূল কংগ্রেস'। দেখা গেল কয়েকজন তথাকথিত নেতা বাদে কংগ্রেসি বলতে যারা ছিলেন তার শতকরা নব্বুইভাগই তাঁর নেতৃত্বে চলে এলেন তৃণমূলে। ভোটে মমতার হাতে গড়া মাত্র মাসকয়েকের সদ্যজাত শিশুদলটিই বিধান সভায় বিরোধীপক্ষ হয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যে দিল্লিতে অটলবিহারী বাজপেয়ী মন্ত্রী সভায় সাংসদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শপথ নিলেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী হিসেবে। সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হয়ে এলে সোনিয়া গান্ধী মমতাকে দলে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে লাগলেন। জ্যোতি বসু প্রমাদ গণলেন, মুখে যা আসে তাই বলতে লাগলেন মমতা সম্পর্কে। যতরকম ভাবে সম্ভব আক্রমণ। মমতাকে প্রথম জীবনে যিনি রাজনীতিতে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, সম্মানের সঙ্গে জয়মাল্য পরিয়ে বরণ করেছিলেন সেই রাজীব গান্ধীর স্ত্রী সোনিয়ার ডাকে সাড়া না দিয়ে থাকতে পারেননি মমতা। তিনি অকৃতজ্ঞ নন। বিধানসভা ভোটের আগে হাই কম্যান্ডের নির্দেশে কংগ্রেস তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধল। বিজেপির সঙ্গেও গ্রহিষ্টি ছিল করতে হল তাঁকে, যদিও তিনি তা চাননি, চেয়েছিলেন বিজেপি-কংগ্রেস-তৃণমূল কংগ্রেস বামবিরোধী সমস্ত ভোট এবারের নির্বাচনে এক হোক। কিন্তু সর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও শর্ত তা হতে দিল না। হলে ফল অন্যরকম নিশ্চয় হত। কিন্তু হল না। কারণ একদিকে প্রায় বাইশ-তেইশ বছরের স্থায়ী ক্ষমতাসীন কম্যুনিষ্টদের নির্বাচনী কুটকচালি, পুলিশ ও ভোটযন্ত্র ব্যবহার, অন্যদিকে চটে যাওয়া কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিশোধমূলক আটঘাট এক হয়ে এ রাজ্যে শাসকদলকে দুর্নিবার করে তুলল। অন্যদিকে হাইকমান্ড বললেও নিচু লেভেলে পচাঘসা পুরনো খেয়োখেরি সর্বশ্ব কংগ্রেস দলের কেরিয়ারবাজরা এক হয়ে লড়াই দিল না, বিশ্বাসঘাতকতা করল। ফলে বিপুল ভোটে বিজয়ী হতে হতে বিপুল ভোটে পরাজিত হতেই হল মমতা বাহিনীকে। অবশ্য বিধানসভার প্রধান বিরোধী দল হল তারাই। ভুল পরিস্থিতি বুঝে ফের কংগ্রেস ত্যাগ করলেন অভিমাত্রী মমতা, ফিরে গেলেন কেন্দ্রে ওই বাজপেয়ী সরকারের সাথী হিসেবে। কিন্তু আর মন্ত্রী সভায় গেলেন না। বরং দ্বিগুণ উৎসাহে নতুন বাংলা গড়ার সংকল্প ঘোষণা করে বাঁপিয়ে পড়লেন রাজ্য রাজনীতিতে ভারতীয় লোকসভার দুই সাংসদ অগ্নিকন্যা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

আজ ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় অবিনাশকে আসতে হয়েছে এদেরই আমন্ত্রণে, অবশ্য রাজনীতি নিরপেক্ষ এক অনুষ্ঠানে অতিথি তিনি।

বিবেক সবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে সেই যে বলে গেল, আর স্যার, একটু বসুন। কই এখনো এল না তো।

উপস্থিত কয়েকজনের সঙ্গে টুকটাক কথাবার্তা অবশ্য চলছেই সম্রাট দেশ-নীতি-পড়াশুনো বা বেকারত্বে নাজেহাল বাংলা প্রসঙ্গ। শিক্ষায় না। প্রথম থেকে রাজ্যটি নেমে এসেছে সর্বভারতীয় কেন্দ্রে সপ্তম স্থানে। চারকা বাকরির টানে মেধাবী ছেলের সব চলে যাচ্ছে দিল্লি মুম্বাই ব্যাঙ্গালোর কিংবা সাগর পারে। এমন কি আম্রহত্যাত্তেও এরা জ্যেষ্ঠ স্ব প্রথম দিকেই। শিল্পায়ন রুদ্ধ, শিক্ষাব্যবস্থা পূর্বদস্ত, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা শোচনীয় জায়গায়, মানুষের জীবনের কোনো নিরাপত্তা নেই, সংস্কৃতিমন্ত্রী বুদ্ধবা মুখ্যমন্ত্রী হয়ে কলকাতা কেন্দ্রিক সংস্কৃতির পীঠস্থান নন্দন করে সেখানে নাচ-গান-বাজনা দিয়ে কার্যত সবাইকে মাতিয়ে রেখেছেন। চুলগুলি তাঁ আরো সাদা হয়েছে, আর ধুতি পাঞ্জাবির গুস্তা যেন কাশফুলের মতে হা-হা করছে।

এমন সময় সবাই ছোট্টাছুটি শুরু করে দিল, সহসাই ছড়োছড়ি পড়ে গেল। অবিনাশ যেখানে বসেছিলেন সেখানে বসে বসেই সমানে রাস্তা দিকে তাকিয়ে দেখলেন একখানি গাড়ি ঢুকছে। সাদা অ্যাম্বুলেন্সের। কেউ আসছেন। কিন্তু ভিড়ের মাঝেই রাস্তা হয়ে গেল আপনা আপনিই। যেমন বাগানোর মাঝখানে দেখা যায় ইঁটের বাঁধানো সরু পথ তেমনি। আর সেই পথ দিয়ে হেঁটে আসছেন যিনি তাঁকে চিনতে কোনোরকম অসুবিধা হল না অবিনাশের, স্বয়ং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দ্রুত চঞ্চল চটপট, যেন সদ্য শৈশব ভেঙে বেরিয়ে আসা একটি মেয়ে।

খবরকাজ টেলিভিশনের সুবাদে চেনা চেহারা। খালি চোখে এই প্রথম দেখলেন অবিনাশ। সস্তা একখানা তাঁতের শাড়িতে আটপৌরে, কিন্তু হলে কি হয় সারা চেহায়ায় এক আপোষহীন উজ্জ্বল গরিমা।

একই ঘরে বসে দু'জন। এখন কিন্তু অবিনাশ প্রায় ব্রাত্য হয়ে গেলেন কেননা তাঁকে একা করে দিয়ে সবাই উঠে গেছে স্টার মমতা ব্যানাজির কাছে। গোল হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে কিংবা শুনেছে তাঁর কথা। হবেই তো। যার নামেই আলোড়ন জাগে জনচিহ্নে তিনি একেবারে শরীরে উপস্থিত যে।

কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে জনসমষ্টির কর্ডন ভেদ করে মমতা উঠে বসে দাঁড়ালেন সোজা অবিনাশের সামনে। সঙ্গে বিবেকও আছে, কানের কাছে মুখ নিয়ে কি যেন বলতেই উঠে এলেন নেত্রী। এসেই যেভাবে আগেকার দিনে বিজয়া দশমীর সন্ধ্যায় একান্নবর্তী পরিবারে ছোট মেয়েটি প্রণাম করত বয়স্কজ্যেষ্ঠদের পায়ে হাত দিয়ে, তেমনি টিপ করে একটা প্রণাম করে ফেললেন মমতা। হাতদুটি ধরে যে তাঁকে ক্রান্ত করবেন, তারই ফুরসৎ পেলেন না অবিনাশ। নিজেই উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন ভদ্রভাবে অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে।

মমতা বললেন, আপনার আশীর্বাদ চাই।

ক'বছর প্রায় এমনি কি একটি অনুষ্ঠানে এক প্রধান বামপন্থী নেতার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছিলেন মমতা আশীর্বাদ নেওয়ার ইচ্ছায়। দুর্ঘটনা বশত সেই নেতাই তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবসু। পরবর্তীকালে বিরোধী কংগ্রেসিরা সেই প্রণামের দৃশ্যটি ছেপে নির্বাচনী পোস্টার করে। প্রমাণ করতে চায় যে আপোষপন্থী ওই জরমুজদের মধ্যেই মমতাও পড়েন। তিনি নতুন কিছু না। আজ আবার—

অবিনাশ অবশ্য নিজেকে বামপন্থী বলে আজ আর মনে করেন না।

বিনয়ে তিনি অনুজ্ঞার হাতদুটি ধরে ফেলে করজোড়ে বলে উঠলেন, একি স্রছে!

—কেন, কী হয়েছে। আপনি প্রবীণ, প্রাজ্ঞ, কত জানেন, দেখেছেন। সেইসব মূল্যবান অভিজ্ঞতা যদি আমার থাকত—! দেবেন আমাকে?

বাক্যহার্য হয়ে যান অবিনাশ। অবিনাশ স্তম্ভিত। এত নিরহঙ্কারী নাধারণ বিনীত এই তথাকথিত দুবিনীত আশুনের পাখিটি। সহসা তাঁর মুখে কোনো কথা সরে না।

মমতা বললেন, চলুন পতাকা তুলতে হবে।

—আমাকে।

—আপনিই এখানে সবচেয়ে প্রবীণ, শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব।

সংসকোচে অবিনাশ বললেন, পোস্টারে যে আপনারই নাম ছাপা হয়েছে উত্তোলক হিসেবে। এত লোক সবাই সেই আশাতেই এসেছেন।

—আপনি থাকতে আমি কীভাবে পতাকা তুলতে পারি দাদা? ছেলবেলায় বাড়িতে যখন পতাকা উত্তোলন হত, দেখেছি বাবা বা কাকা তুলছেন। আমরা তাঁদের সঙ্গে একসাথে বন্দেমাতরম ধ্বনি দিয়েছি।

চূপ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন বিমূঢ় অবিনাশ, দীর্ঘকাল রাজনীতির সঙ্গে বীর প্রতীক যোগাযোগ নেই বললেই হয়। মমতা কিন্তু সেই বিধাইন ভাবেই তাঁর একটি হাত দিয়ে ধরলেন অবিনাশের হাত, এগোতে সাহায্য করলেন। বললেন, চলুন—

পায়ে পায়ে শহীদবেদীর দিকে এগোচ্ছিলেন ওঁরা। মমতা বলতে বলতে চলেছেন, এলাকার ছেলেদের কাছে আপনার কথা শুনেছি বন্ধুবার। আপনার সততাকে আমি সম্মান করি। আমি বিশ্বাস করি, প্রাণ থাকতে একজন প্রকৃত দেশনায়ক কখনো সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকতে পারেন না, তাই আশ করি, বাইরে থেকে দেখে আপনাকে যত নীরবই মনে হোক না কেন, ভেতরে ভেতরে আপনি নিশ্চয় দুর্বীরভাবে গতিশীল। আমাদের সঙ্গে মাঠে নামতে হলে আপনাকে বিব্রত আমি করব না। তবে আপনার হাতে কলম আছে। লেখাপত্রগুলো নিয়মিত পড়ি আমি। আজ এই শুভদিনে কামনা করি আপনার কলম ঘন আশুনের তরবারি হয়ে ওঠে।

বেজে উঠল বিউগল। সেখানে জাতীয় সঙ্গীতের সুর। চারদিকে ধূপ-ধূনার গন্ধ। আকন্দ গাঁদা আর পদ্মের ফুলমালা। বেজে উঠল শঙ্খধ্বনি। উলু দিল মেয়েরা। পতাকা উত্তোলনের জন্য দড়িতে হাতে দিলেন অবিনাশ।

মমতা বন্দোপাধ্যায়ের বজ্রকণ্ঠ বিঘোষিত হল, বন্দেমাতরম—

সমবেত স্বরে ধ্বনিত হল, বন্দেমাতরম!

স্বাধীন ভারত কি—

জয়!

জাতীয় পতাকা কি—

জয়!

নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু কি—

জয়!

গান্ধীজি কি—

জয়!

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ কি—

জয়!

বন্দে-মা-তর-ম—

বন্দোমাতরম!

পতাকা উত্তোলিত হল। মহাকাঙ্গের নিচে মৃদু হাওয়ায় উড়ছে উদ্ভাসিত স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা। মঞ্চ এসে বসলেন অতিথি রা। সমবেত সঙ্গীত শুরু হল এইবার—ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে, বলো বলো সবে।

অনাথ-আতুরদের বস্ত্রদান হবে এইবার। তার সূত্রপাত করলেন মমতা বন্দোপাধ্যায়। ক্লাব সংলগ্ন ঘরে সেই পর্ব চলতে লাগল। এদিকে মঞ্চ শুরু হল অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী সঙ্গীত—মুক্তির মন্দির সোপান তলে, কত প্রাণ হল বলিদান....

মাইকে ঘোষিত হল—সভাপতি মমতা বন্দোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথি অবিনাশ মুখার্জির নাম। একটি ছোট বালিকা এসে ফুল ও মালা দিয়ে বরণ করল দু'জনকেই...

মাইকে ঘোষিত হল পুনরায়, বহু ব্যস্ততার মধ্যেও দিদি এসেছেন। আমাদের মাঝে তাঁকে পেয়ে আমরা ধন্য। আমরা পেয়েছি অবিনাশ মুখার্জির মত মাননীয় ব্যক্তিত্বকে, উপস্থিত আরও গুণীজন ও অনুরাগীদের। দিদিকে চলে যেতে হবে এক্ষুনি। তিনি বলবেন নিশ্চয়ই, তবে তাঁর আগে সংঘের সাধারণ সম্পাদক সুশিক্ষক মাখনলাল ঘোষ দস্তিদার মহাশয়কে দু'কথায় কিছু বলার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

সূচীভেদ্য স্তব্ধতা চারদিকে বিরাজ করছে।

খোলা মঞ্চ হওয়ার কারণে শুধু দু'একটা পাখি এলোমেলো কিচমিচ শব্দে ওড়াউড়ি করছে। দু'একটি বালকের পাওয়া সন্দেশ লাডু আর বাতাসা ভাগাভাগির জিগির শোনা যাচ্ছিল। তাদের ধামানো হল। মাখনবাবু শুরু করলেন।

প্রথাবদ্ধ সম্ভাষণ শেষে স্বাধীনতা দিয়ে শুরু করলেও মাখন ঘোষ দস্তিদারের বক্তৃতা কিন্তু ক্রমশই চলতি রাজনীতির দিকে গতিবদল করল অচিরেই। তিনি যা বলছেন তার মোদা কথা হল—

‘এখন গোটা রাজ্য জুড়ে জনযুদ্ধকে নিয়ে তোলপাড় হচ্ছে। বেলপাহাড়ি, গড়বেতার জঙ্গল থেকে কলকাতার অভিজাত পরিবারের স্ল্যাটবাড়িতে পর্যন্ত সি পি এম জনযুদ্ধের ভূত দেখছে। মোকাশিলায় পুলিশ বাহিনী কোমর বেঁধে নেমেছে। রাজ্যের পাট্টিকে খুশি করতে পুলিশ ধরে আনার জায়গায় বেঁধে আনছে। আবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সি পি এম দলের সম্পাদক তো জনযুদ্ধ মোকাশিলা অভিযানে কর্মীদের অস্ত্র হাতে তুলে নেওয়ার কথা বলেছেন। সব মিলিয়ে এ রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার এমন একটা ভাব দেখাচ্ছে, যেন মনে হচ্ছে রাজ্যের এটাই সবচেয়ে বড় সমস্যা। কিন্তু প্রশ্ন হল, পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে বিপজ্জনক এই জনযুদ্ধের বীজ ছড়াচ্ছে কিভাবে, কেন, তার উৎসই বা কোথায়? তা জানতে হলে চলে যেতে হবে আরো পেছনে। ১৯৯৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে পর্যন্ত রাজ্যের লোকজন জনযুদ্ধ শব্দটার সঙ্গে তেমনভাবে পরিচিত ছিলেন না। এম সি সি, সি পি আই (এম এল) সহ বেশ কিছু সংগঠনের কথা রাজ্যের অনেকেই জানতেন। ২০০০ সালের জুন মাসে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও হুগলী জেলার বিস্তীর্ণ এলাকার সি পি এম যখন তাদের হারানো মাটি ফিরে পেল, তার পর থেকেই বাতাসে ভাসতে শুরু করল এই নামটা। আর ছোট আঞ্জুরিয়ার গণহত্যার ঘটনার পর জনযুদ্ধের নামটা গোটা রাজ্যে যেন ফেটে গেল। অনেকে বলেন, বিরোধী শক্তিগুলিকে দুর্বল করে দেওয়ার এবং বিরোধী দলের জঙ্গি ছেলেগুলোকে বিপথে চালিত করার

জন্যই নাকি সুপরিচালিত পথে জনযুদ্ধকে প্রশাসনের পক্ষ থেকে হাইলাইট করা হয়েছিল। জনযুদ্ধের আগে গ্রামের লোকজনের কাছে এরা নকশাল বলেই পরিচিত ছিল। বাম সরকার ক্ষমতায় আসার পর মেদিনীপুর, বাঁকুড়া জেলায় সি পি এম-এর লাল ঝাণ্ডার দাপট ছিল নিরঙ্কুশ। এক একটি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে ৪৬ বা ৫০ হাজার ভোটে জিততেন বামপ্রার্থীরা। সি পি এমকে চ্যালেঞ্জ জানানোর ক্ষমতা কারোর ছিল না সে কথা জানা। সেই সময়ও মেদিনীপুরে জঙ্গল অধ্যুষিত এলাকায় নকশাল সংগঠন ছিল। বেলপাহাড়িতে কাশীনাথ মণ্ডল সহ কয়েকজন এম সি সি করতেন। কখনো ন্যূনতম মজুরির দাবীতে কখনো কেন্দ্রপাতার দাম নিয়ে আন্দোলন করতেন নয়া গণতান্ত্রিক যুব মোর্চার নামে। আজ আর পড়ে পড়ে মার খাওয়ার দিন নেই বলে একটা লিফলেট বাজারে ছেড়ে গরিব মানুষকে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানানো হয়েছিল। কিন্তু এসবে পাত্তা দেয়নি পুলিশ। কারণ সেই সময় সমস্ত এলাকা জুড়ে চলছিল সি পি এমের লাল ঝাণ্ডার দাপট। এরপর আমরা জানি, ১৯৯৮ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে লাল দুর্গে ফটল দেখা দিল। সি পি এমের কিছু নেতার খেচ্ছচারিতা ও স্বজন পোষণের প্রতিবাদ জানিয়ে দল ছাড়েন কর্মীদের একাংশ। কেউ কেউ দল না ছেড়েই দলের ভেতরে থেকে বিরোধীদের মদত দিতে লাগলেন। তারই পরিণতিতে পঞ্চায়েত ভোটে ভরাডুবি হল সি পি এমের। সেই সময় নবগঠিত এই তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি ক্ষমতা দখল করে নেয় বহু অঞ্চলের। বহু সি পি এম নেতা নাকি গ্রাম ছাড়া হয়ে যান। মাটি ফিরে পাওয়ার জন্য বারবার লড়াই করে, যুদ্ধ চালিয়েও যখন সি পি এম নেতারা গ্রামের দখল নিতে পারছিলেন না তখনই অত্যন্ত কৌশলে নকশাল ব্রাণ্ডটি বাজারে ছেড়ে সি পি এম। যে সি পি এমের নামে গড়বেতা কেশপুরে বাঘে-গরুতে জল খেত সেই সি পি এম '৯৮ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর গ্রামের মানুষের কাছে অচ্ছত হয়ে যায়। গ্রামের লোকজনের সি পি এম নামের আতঙ্ক কেটে গিয়েছিল। ওদের নামে লোক আর তখন হাত জোড় করত না। বরং উণ্টো, হাত উচিয়ে মারতে যেত। এমন এক অবস্থায় সি পি এম ঝুলি থেকে বেড়াল বের করেছিল। যে অসিত সরকার আজ পুলিশের খাতায় 'মোস্ট ওয়াণ্টেড'—সেই অসিত সরকারই ছিলেন সেই সময়কার সি পি এমের তুরূপের তাস। ঠিক এই মুহূর্তে লালগড় গোয়ালতোড়, শালতোড়া, শালবনি, বেলপাহাড়ি এলাকায় সি পি এমের নেতা ও কর্মীদের কাছে অসিত সরকারের মাথার চেয়ে মূল্যবান বস্তু আর কিছুই ছিল না। অথচ এই নকশাল নেতাটিই একদিন এতদ অঞ্চলে সি পি এমকে হারানো মাটি ফিরে পেতে সবচে বেশি সাহায্য করেছেন। এই অসিত সরকার একদা সি পি এমের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। '৮৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে গড়বেতার, সন্ধিপূর অঞ্চলের ৪২ নং গ্রামসভা আসন থেকে তিনি জয়ী হয়েছিলেন। তারপর গোষ্ঠীদ্বন্দের শিকার হয়ে এলাকা ছেড়ে কিছুদিন চুপচাপই ছিলেন। '৯৮ সালের ঘর ছাড়া সি পি এম নেতাদের সাহায্য করতে নকশাল তকমা লাগিয়ে তিনি এলাকা কাঁপাতে ময়দানে নামেন। তার আগে অবশ্য সি পি এম নেতাদের সঙ্গে তাঁর চুক্তিও হয়। কী চুক্তি হয়েছিল সি পি এম ও জনযুদ্ধের মধ্যে তা তুলে দেওয়া যেতে পারে পুলিশ রিপোর্ট থেকেই। পুলিশের কনফিডেন্সিয়াল মার্কা রিপোর্ট বলছে, সি পি এম জনযুদ্ধ নেতা অসিত রায় ও অসিত সরকারের সঙ্গে বারবার যোগাযোগ করে। অবশেষে ২০০০ সালের মে মাসে উভয়পক্ষের মধ্যে এলাকা পুনরুদ্ধারের চুক্তি হয়। তাতে ঠিক হয়, জনযুদ্ধ গ্রাম দখলের

জন্য সি পি এমকে সব রকমের সাহায্য করবে। তার বদলে সি পি এ তাদের গড়বেতা ১নং ব্লকের ১,২,৩ ও ৪ নং অঞ্চলে সংগঠন করতে দেবে। সি পি এম নেতাদের তখন যা অবস্থা তাতে জনযুদ্ধ গোষ্ঠী নেতাদের সব শর্ত মেনে নিয়ে চুক্তি করতে তারা মরীয়া। একদিকে ক্ষমত থেকে উৎখাত হওয়া ঘরছাড়া নেতা ও কর্মীদের চাপ, অন্যদিকে বিধানসভ ভোট। এলাকার দখল নিতে না পারলে বিধানসভা ভোটে সি পি এমে: শোচনীয় ফলাফল হবে, তার ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল গত দুটি লোকসভ নির্বাচনে। তাই রাজ্যের ওই এক মন্ত্রীর প্রয়োজনে ও নির্দেশে উভয়পক্ষে মধ্যে চুক্তি হয়ে যায়। এর পরের ঘটনাগুলি রাজ্যবাসীর জানা। সি পি এম অসিত সরকারের কালো পোশাক বাহিনীর নেতৃত্বে দখল নিত হাতছাড়া যাওয়া গ্রামগুলির। পুলিশ, সি পি এম ও নকশাল বাহিনীর যৌথ অভিযানে তৃণমূল বিজেপির দখলে থাকা গ্রামগুলিতে উড়ল লালপতাকা বাড়ির চালে, মাঠের আলে, গাছের মগডালে লাল ঝাণ্ডা গুঁজে দিয়ে সি পি এম জানিয়ে দিল, গ্রাম এখন তাদেরই দখলে। গ্রামের মানুষ বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যে পরিবর্তন এনেছিল তা বন্ধুকের নল দিয়ে পাণ্টে দেওয়া হল। ইতিহাসের চাকা উণ্টোদিকে ঘুরিয়ে সি পি এম নেতারা দেখিয়ে দিলেন জনগণ নয় বন্ধুকের নলই সমস্ত শক্তির উৎস। এবং গ্রামের দখল নেওয়ার পরই সি পি এম থেমে থাকেনি, বিরোধী পঞ্চায়েত সদস্যদের হুমকি দিয়ে, মারধর করে তাদের সি পি এমে যোগ দিতে বাধ্য করল। পঞ্চায়েতের ক্ষমতা কেড়ে নিল। তথাকথিত জনগণের রায়ে সংখ্যালঘু সি পি এম নিজগুণে ক্ষমতা দখল করে কুরশিতে বসল। আওয়াজ উঠল, ইনকিলাব জিন্দাবাদ। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি দূর হটো। বিরোধী দলের সক্রিয় কর্মী ও তাদের পরিবারগুলো এভাবেই গ্রামছাড়া হল। কোথাও কোনো প্রতিকার না পেয়ে হতাশ তৃণমূল-বিজেপি কর্মীদের অনেকেই সি পি এমের কাছে মুচলেকা দিয়ে গ্রামে ফিরতে বাধ্য হল। আর যারা দেখল সি পি এমের কাছে আশ্রয় সমর্পণের চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়, তারা চলে গেল কালো কাপড়ের আড়ালে। কিন্তু গ্রাম দখলের পর সি পি এম আর চুক্তি মানেনি। জনযুদ্ধকে সংগঠন গড়তে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি সি পি এম না মানায় তারা বদলা নেওয়ার কথা ঘোষণা করল। সি পি এমকে শিক্ষা দেওয়ার কথা মুখে বললেও লোকবলের অভাবে তাদের পিছিয়ে যেতে হল। কিন্তু সি পি এমই জনযুদ্ধের কাছে লোকের যোগান দেওয়ার রাস্তা করে দিল। গ্রাম দখলের পর শাসকদল হিসেবে সব রাজনৈতিক দলগুলিকে নিয়ে শান্তিতে একসঙ্গে থাকার চেষ্টা সি পি এম কখনোই করেনি। বরং গ্রাম থেকে ফের ঘরছাড়া হওয়ার আশঙ্কায় তারা বিরোধী দলের সক্রিয় কর্মীদের গ্রামছাড়া করল। আর ওইসব কর্মীরাও পা দিল কিভাবে যেন জনযুদ্ধের পাতা ফাঁদে। দিশাহীন, নেতৃত্বহীন কিছু তৃণমূল, বিজেপির বেশ কিছু সক্রিয় কর্মী, জনযুদ্ধের সঙ্গে হাত মেলালেই বোধহয় সি পি এম-কে শায়েস্তা করা যাবে এই বুঝে যোগদিল ভালুকবাসার ট্রেনিং সেন্টারে। খোদ সি পি এম নেতা, জেলা সম্পাদক জনযুদ্ধের মোকাবিলায় কর্মীদের অস্ত্র হাতে তুলে নিতে বলেছেন। বলেছেন, জনযুদ্ধকে আশ্রয় দিচ্ছে তৃণমূল-বিজেপি মনোভাব সম্পন্ন লোক। সি পি এমকে খতম করার জন্য জনযুদ্ধকে মদত দিচ্ছে। কিন্তু পুলিশি হয়রানির আশঙ্কা সত্ত্বেও কালো পোশাকের লোকদের তারা রান্না করে খাবার দিচ্ছে। বন্ধুকের ভয়ে? নাকি গ্রামের লোক বুঝে গিয়েছে, গণতান্ত্রিক পথে বিরোধীদের পার্টি করতে আপনারা দেবেন না?

তাত্ত্বিক পথ বন্ধ হয়ে গেলে প্রতিবাদী শক্তি যে বিপথগামী হতে পারে। কথা তো ২৫ বছর ক্ষমতায় থাকা একটা দলের না বোঝার কথা নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তবে কেন এমন সিদ্ধান্ত? অনেকে বলছেন, জনযুদ্ধ যুদ্ধ বলে চিৎকার করে পুলিশকে সামনে রেখে উপক্রমত এলাকায় সি এম বিরোধী শক্তিকে খতম করা নাকি সরকার ও সি পি এম দলেরই কপটিকল্পিত কৌশল। তাই বিরোধী দলের সক্রিয় কর্মী ও পরিবারগুলোর পর ঐটে দেওয়া হচ্ছে আজ জনযুদ্ধের তকমা। তারপর চলছে পুলিশি হনস্থা। স্কুলপড়ুয়া বালক থেকে ৭০ বছরের বৃদ্ধ, কেউ পুলিশি হয়রানি থেকে বাদ যাচ্ছে না। শালবনির জঙ্গল মহলের গরিব আদিবাসী থেকে লকাতার অভিজাত পরিবারের শুদ্ধ অফিসার—সকলকেই তুলে নিয়ে হচ্ছে পুলিশ। রাজার পার্টির নেতাদের খুশি করে কেরিয়ার গড়া ও ভালো পাস্টিংয়ের নেশায় মত্ত পুলিশ অফিসাররা হিতাহিত জ্ঞান হারিয়েছেন। এই অভিজিৎ সিনহার মতো বামপন্থী ঘরানার মানুষটার গায়েও জনযুদ্ধের প লাগানোর আগে পুলিশ ভেবে দেখেনি। দেখার প্রয়োজন মনে করেনি। ইভাবে জনযুদ্ধের ছপ লাগিয়ে বিরোধী এবং দলের মধ্যে বেয়াড়াদের গাম্ভীরা করার বিষয়টা সি পি এমের একটা কৌশল বলে অনেকে মনে করছেন। তাঁদের মতে, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও জালি জেলার বিস্তীর্ণ এলাকায় যে ভাবে সি পি এমের একটা অংশ দলের নেতাদের বিরুদ্ধে জহাদ ঘোষণা করেছিল তাতে চলে যেতে বসেছিল বামফ্রন্ট সরকারের ২৪ বছরের মজবুত ভিত। সি পি এম বিরোধী এই শক্তি যদি রাজনৈতিক খাতে প্রবাহিত হত তাহলে সংসদীয় রাজনীতিতে দলকে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হত। আর সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার মতো সংগ্রামী স্রিহ ওরা হারিয়ে ফেলেছে দীর্ঘদিন শাসন ক্ষমতায় থাকার সুবাদে। তাই বিরোধী শক্তিকে বিপথগামী করে পুলিশ দিয়ে তার মোকাবিলা করার পরিকল্পনা নিয়েছে সি পি এম। আর তাই ছোট আঙুরিয়ার ঘটনার পর থেকেই পুলিশ প্রশাসনের কর্তারা জনযুদ্ধ জনযুদ্ধ বলে প্রচার করে আসছেন। একমাত্র জনযুদ্ধই পারে সি পি এমের মোকাবিলা করতে, এমন একটা প্রচার অত্যন্ত সুকৌশলে করে তৃণমূল ও বিজেপি যুবকদের সেই পথে ঠেলে দিতে চেয়েছে। কেননা জনযুদ্ধ এমন একটা দল, যারা ভেটিযুদ্ধে লড়াই করে না। তাই গদি হারানোর ভয় তাদের কাছ থেকে অন্তত নেই। বিরোধী বা জঙ্গিদের বিপথে পাঠিয়ে বিরোধী শক্তিকে দুর্বল করে দেওয়ার জন্য এটা ওই সি পি এম দলেরই একটা চাল বলে অনেকে ভাবছেন করছেন। মাত্র বছর চারেক আগের তৈরি একটা গোপন সংগঠনকে রাজ্য সরকার যেভাবে ভয়ঙ্কর বিপদ বলে চিহ্নিত করেছে তা অনেকের কাছেই হাস্যকর। আর মানুষের মনে জনযুদ্ধ একটা স্থান দখল করে নিয়েছে। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও জালি জেলার ৪০ হাজার একর বনাঞ্চল সংলগ্ন এলাকার সি পি এম কর্মী ও নেতাদের মনে জনযুদ্ধের আতঙ্ক থাকা বসিয়েছে। জনযুদ্ধ কোথাও সাধারণ, নিরীহ লোকজনের ওপর আঘাত হনছে না। তাদের লক্ষ্য সি পি এম নেতারা। সি পি এম বিরোধী এই শক্তিকে জোর করে পুলিশ দিয়ে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করলে ভুল হবে। বিরোধী শক্তিকে যদি অস্ত্র দিয়ে বছরের পর বছর দমিয়ে রাখা যেত তাহলে জঙ্গরি অবস্থা জারি করেও কংগ্রেস এ রাজ্যের ক্ষমতা থেকে উৎখাত হত না। হিটলারের পতন ঘটত না। চেসেকুরা চিরকালই ক্ষমতায় থেকে যেতেন। সি পি এম নেতারা যেভাবে গুপ্ত ঘাতকের হাতে খুন হচ্ছেন, তা খুবই মর্মান্তিক ও নিশ্চিনী ঘটনা সন্দেহ নেই। কিন্তু কেন তাঁরা খুন

হচ্ছে? কেন বেলপাহাড়ি, লালগড় প্রভৃতি এলাকার ১০৮ জন সি পি এম নেতাকে আজ দেহরক্ষী নিয়ে ঘুরতে হচ্ছে। একবারও কি সে কথাটা ভেবে দেখেছেন সর্বহারা নেতারা! জনগণের বিশ্বাস হারিয়েছেন তাঁরা। ওই সর্বহারার নেতারা আজ সব হারিয়েছেন। ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য যে গণতান্ত্রিক নীতিবোধ তাও হারিয়েছেন। হারিয়েছেন জনগণের আস্থা। আর সব হারিয়ে বন্ধু হিসেবে পাশে পেয়েছে পুলিশকে। যত দিন যাচ্ছে সি পি এম ততই পুলিশ-নির্ভর হয়ে পড়ছে। কিন্তু মানুষের আস্থা হারালে যে পুলিশ বাঁচাতে পারে না একথা তো নাবালকেও বোঝে। শালবনির একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করলে হয়ত কিছুটা বোঝা যাবে বিরোধী শক্তির বিপথগামিতার কারণটা। শালবনিতে তৃণমূল কংগ্রেস করতেন সমর হাতি। গ্রামের পালাবদলের পর তাঁকে সি পি পাটি অফিসে ডাকা হয়েছিল বিচারের জন্য। বিচারে তাঁর জরিমানা ধার্য হয়েছিল তিন হাজার টাকা। অপরাধ, তৃণমূল কংগ্রেস করেন। সি পি এমের বিচার মেনে ওই জরিমানাব টাকা তিনি দিতেও চেয়েছিলেন। কিন্তু পাটি অফিস থেকে বেরহওয়া মাত্র তাঁর ঘাড় পড়ল চালা কাঠের বাড়ি। মুখ খুঁড়ে পড়লেন তিনি। বিভিন্ন হাসপাতাল ঘুরে অবশেষে কলকাতা নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। সেখানেই মারা যান তিনি। হাসপাতালে পুলিশ তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিল, আঘাতের কারণ কি? সমরবাবু বলেছিলেন, গাছ থেকে পড়ে গেছি। মৃত্যুর আগেও তিনি বলে যেতে পারেননি যে মহান মার্ক্সবাদী বন্ধুদের চালাকাঠের ঘায়ে তাঁর স্পাইনাল কর্ডটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। মৃত্যুশয্যা শুয়েও তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, সত্যি কথা পুলিশের কাছে বললে তাঁর স্ত্রী-সন্তানদের আর গ্রামে থাকা সম্ভব হবে না। তাই চিরকালের মতো চলে যাবার আগেও গোপন করে গিয়েছিলেন প্রকৃত সত্যটা। ওই সমর হাতির মৃতদেহটি সংস্কারের জন্য গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। স্বামীর মৃতদেহ দেখেও হাতির স্ত্রী গলা ফাটিয়ে চিৎকার কাদতে পারেননি। ছেলেকে বুকে টেনে নিয়ে ঘরের কোণে ডুকরে ডুকরে তিনি কেঁদেছিলেন। কারণ হার্মাদ বাহিনীর নির্দেশ ছিল, এমন কিছু বলা যাবে না যাতে লোক জনাজানি হয়ে যায়। সমর হাতির স্ত্রী অবাধ্য হননি। গ্রামে থাকার ছাড়পত্র পেতে তিনি নেতাদের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। সেইদিন সমর হাতির যখন সংস্কার হচ্ছিল তখন শাসনের ধারাই এক সি পি এম নেতা গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন। সি পি এমের নেতারা সেদিন বুঝতে চেষ্টা করেননি, সেদিনের গুলি কীসের ইঙ্গিত ছিল.....

ভ্রমলোক ভাষণের পর কিছুটা পরিতৃপ্তি কিছুটা উত্তেজনা মুখে ফুটিয়ে মঞ্চে এসে বসলেন।

ভাষণের এই বয়ান অবশ্য অবিশ্বাসের কাছে অজানা বা নতুন কোনো তথ্য বয়ে আনল না। কেননা এই বিপজ্জনক পরিস্থিতির কথা ক'দিন আগে ২২.০৭.২০০২-এ একটি সংবাদপত্রে ছপা হয়েছে। তারই অনুসারে এই বক্তব্য।

এইবার মমতার নাম ঘোষণা হল। তিনি মঞ্চে উঠে রাজ্যে সার্বিক অবনতি ও অধোগতির উল্লেখ করে, আমরা কতটা পরাধীন হয়ে আছি সেই প্রসঙ্গে বললেন কিছু কথা। সময় বেশি নিলেন না তিনি। তবু যেটুকু বললেন, তাতেই সমবেত শ্রোতাদের ভেতর থেকে হাততালি ও উচ্ছ্বাস দেখার মতো।

মমতা গাড়িতে গিয়ে বসলেন। অবিশ্বাসকে বললেন, আবার দেখা হবে। ভালো থাকবেন, আর দীর্ঘজীবী হোন। আপনাদের মতন পুরনো

লোকজনের যতদিন বেশি থাকেন এই দুঃখের বিরুদ্ধে, সেটা প্রতিবেশকের মতো।

গাড়িতে উঠে গিয়েছিলেন নেত্রী। অবিনাশ এইবার তাঁর হাতদুটি বাইরে থেকে ধরে উৎকর্ষার স্বরে বলে উঠলেন, সাবধানে সতর্ক থাকবেন আপনি, নিজের নিরাপত্তার ব্যাপারে নজর রাখবেন। এ রাজ্যে প্রকৃত বিদ্রোহী তো একজনই; যদি তিনি—

—খোয়া যান। মমতা হেসে সংযোজন করলেন।

অবিনাশ ইতিবাচক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন, কিন্তু মুখে কোনো কথা ছিল না তাঁর।

মমতা বললেন, আপনারা চাইলে আমি আছি, মানুষ চাইলে সংস্কৃতি থেকেও আবার কোনো মমতা উঠে আসতে পারে। ভয় আমার নেই দাদা। রবীন্দ্রনাথের সেই কথটাই বারবার বলব, জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিন্তা ভাবনাইন... ..

গাড়িটি স্টার্ট দিল এবং বেরিয়ে গেল।

মঞ্চের ফের এসে বসতে হল অবিনাশকে। এইবার কোথা থেকে তাঁর পাশে বিবেক এসে ফিসফিসে গলায় বলল, স্যার, কিছু বলবেন তো?

—না না বিবেক। আজ শুনি শুধু।

—কিন্তু স্যার—

—কোনো কিন্তু নয়। প্রকৃত শ্রোতা হতে পারাটাও একটা কাজের কথা। এ কথাটা আমরা একবারটি ভেবে দেখি না।

একে একে বস্তু বস্তু রাখছেন। প্রায় একই কথার চর্চিতচবর্ণ। সেই শাস্ত স্তব্ধতাটি আর নেই। খুচরো হট্টগোল লেগেই আছে। ওদিকে খিচুড়ি রান্না হচ্ছে বড়-বড় লোহার কড়ায়। একটু পরেই শয়ে শয়ে খেতে বসে যাবে। কী একটা তরকারির গন্ধ ভাসছে বাতাসে। মোটামুটি একটা উৎসব মুখের পরিবেশ। একটা অন্যরকম দিন।

মুখে একটা মিষ্টি ফেলে জল খেলেন শুধু অবিনাশ। চা হয়েছে দু'বার। আর কোনো পথে না এগিয়ে বাড়ির পথে হাঁটা দিলেন তিনি। এখন ইতস্তত পায়চারির মতো তাঁর হাঁটাচলার ধরন। কিছুটা ভাবনায় মগ্ন। আবার রীতিমতো সন্নিহিত আছে। ভেতরে যেন একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়ার প্রতিধ্বনি চলছে। মাঝে মাঝে আকস্মিক ভাবের মধ্যেই তাঁর চোখ দু'খানা কঁচকে উঠছে। চশমার হাই পাওয়ার গ্লাসের ভেতর দিয়ে একটু বেশি রক্তস্রাব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বেরিয়ে আসছে, আলো মাটি হাওয়ার মিশে যাচ্ছে। অকারণ হাতখানি নেড়ে নেড়ে যেন স্বগতোক্তির মতো তিনি কিছু বলছেন। আর কাকে বলবেন—নিশ্চয় নিজেকেই—

৫

চোখের দৃষ্টি ঠিক নেই, খানিক ঘোলাটে, মেয়েটি তাকিয়ে আছে শূন্য সকালের দিকে। পাগলির মতো বেশ তার, খানিকটা সজ্জন্ত যেন। বয়স বছর পঁয়ত্রিশ হবে। অবিনাশের সঙ্গে চোখাচোখি হওয়া মাত্র ভয়ে দুয়ারের মধ্যে গাঁথা বাঁশের খুঁটিটাকে সজোরে আঁকড়ে ধরল সে, এইবার সত্যি ভয় পেয়েছে।

সুশোভন বলল, ওর নাম জমিলা বিবি। বছর খানেক আগে বিয়ে হয়ে এসেছিল এই গাঁয়ে। ওর বরের নাম ছিল খালেক। পার্টির সঙ্গে বামেলা হয়েছিল। পরে যখন পার্টি অফিসে ঢুকেই কে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জামসেদ রহমানকে টাঙি দিয়ে কুপিয়ে মেরে ফেলল, সেই পলাতক

সন্দেহলিস্টে খালেকের নাম ছিল। খালেক আর ফেরেনি, তার কী হল তা কেউ জানে না। কিছুদিনের মধ্যে পার্টির লোকজনেরা জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ওদের ঘরে এসেছিল। জমিলা তখন বলে যে, সে জানে না খালেকের খবর, তখন তার ওপর প্রচণ্ড টরচার চলে। আট মাসের গর্ভবতী ছিল ও। নাজি বাহিনী পেটে লাথি মেরে গর্ভপাত ঘটিয়ে দিয়েছিল। আশঙ্কাজনক অবস্থায় ওকে কেশপুর হেলথ সেন্টারে ভর্তি করা হলে তারা চালান করে দিয়েছিল মেদিনীপুর সদর হাসাপাতালে। যারা ধরা পড়েছিল তাদের মেরে রাস্তার মোড়ে মোড়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। খালেকের যা হবার হয়েছে। কেউ বলে সে ফেরার, অন্য কোনো মূলুকে পালিয়েছে। কেউ বলে গুম খুন হয়ে গেছে। লাশও নাকি দেখে এসেছে কে যেন। যাই হোক জমিলা ফিরে এল ঘরে বুড়ি শাণ্ডিঁর কাছে, কিন্তু মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে। তারপর শাণ্ডিঁ মারা গেলে নেমে এল রাস্তায়। ঘরদোর হাটের মতো খোলা থাকে। যখন ইচ্ছা হয় যায়, যখন না হয় এর দুয়ার ওর দুয়ারে ঘোরে। চেরেচিন্তে খায়। একেবারে বদ্ধ উন্মাদ নয় স্যার, আশ্চর্যজনক ভাবে কখনো ওর জ্ঞান ফিরে আসে। তখন খানিকটা স্বাভাবিক, কখনো আবার বিগড়ে যায়।

বীরভূম বর্ধমান দিনাজপুরের পর অবিনাশ এসেছেন মেদিনীপুর চেনা ঘুরে দেখতে। সরজমিন তদন্ত বাকে বলে, না তদন্ত নয়, তা করে কীইবা করতে পারবেন। শুধু খালি চোখে—

পেছন থেকে কে ডেকে উঠল, ঢকা—এই ঢকা—

সুশোভন দেখল বাঁশবনের ফাঁকে একটা অপোগণ্ড দাঁড়িয়ে হ্যা হ্যা হাসছে—

ঢকা হাত নেড়ে ডেকে বলল, আয়, বেরিয়ে আয়।

সে আসতে অবিনাশের সঙ্গে আলামের অখিলায় বলল, ও হল বাঁকা বাগদী। গাঁয়ের যাত্রার দলে বিবেকের গান গেয়ে নাম কিনেছিল স্যার। এখন অবশ্য ওসব যাত্রাগান আর হয় না—

পায়ে হাত দিয়ে বাঁকা প্রণাম করল শহরের বাবুকে।

ঢকা বলল, দু'কলি গান শোনা না বাঁকাদাদা—

সে গেয়ে উঠল—এই দুনিয়াটা ভাই চিড়িয়াখানা মানুষ চেনা দায়/তাই তো বলি ও অবোধ মন মানুষ চিনি কি উপায়/ভোলামন ও ভোলামন....

অবিনাশ তার পিঠে হাত রেখে বললেন, বাহ, বেশ গলা তো তোমার।

সুশোভন বলল, জঙ্গলের দিকে যাবেন স্যার?

—কেন, কি আছে সেখানে—শালপিয়াল?

—না, ছোট আঙ্গুরিয়া। এখনো খুঁজে দেখলে, যাদের পুঁতে দেওয়া হয়েছিল সেই সব হাড়কঙ্কাল মিলতে পারে। যদি যেতে চান, এই বাঁকাদাদা আপনাকে নিয়ে যাবে। এদের পরিবার মার্কামারা সিঁ পি এমের। কেউ সন্দেহ করবে না।

—না না তার দরকার নেই সুশোভন।

—বেশ, তবে চলুন নদীর ধারে যাই। ছোট নদী, খালের মতো। ভোলা লাগতে পারে। এই গাঁ-গেরামে আর কী দেখার আছে বলুন।

—না, তোমাদের গ্রামটা মন্দ নয়। এমন সবুজ সুশীতল গ্রামে কতকাল রাত কাটাইনি। এমন ঠাণ্ডা, শান্ত—

—এতটা শান্ত ছিল না স্যার, শান্তি ফিরে আসার পর শাসনের মতো হয়ে গেছে। দেখছেন না, যে যার নিজেকে নিয়েই থাকে লোকজন। বেশি কথা বলে না। সন্ধ্যারাত্রেই ঘরে ঢুকে পড়ে। কোথায় কোন ফাঁদটি কার

জন্য ওঁৎ পেতে আছে, সে কি আর কেউ জানে? কথায় বলে ভিলেজ পলিটিজ, তার মতো নোংরা জিনিস স্যার.... সন্ধে হলেই দেখবেন আঠারো কুড়ি বছরের ছেল-ছেকরারা সব মদ গিলে বসে আছে। রিক্রিয়েশন বলতে ওই। আর বছর বছর বাচ্চা হয়েই যাচ্ছে। বিপদে পড়লে মা ভবানীর মন্দিরে যাবে সবাই। যাবেন নাকি সেখানে? মানুষ কিন্তু সেই মন্দিরেই রক্তের ছিট লাগাতে ভয় পায়নি। একবার এক দলছুট কর্মীকে, নাম তার ফেলু মিন্দা, কুপিয়ে মারা হয়েছিল এখানে। তার প্রতিবেশী, ছোটবেলা থেকে যার সঙ্গে খেলাধুলো করে বড় হয়েছিল, রাধু নাপিত, পার্টির অর্ডার পেয়ে তাকে কোদাল দিয়ে কুপিয়ে মারতে এল। জিজ্ঞাসা করল, হাঁরে ফ্যালা, শেষ বাসনা কী তোর?

ফেলু ভেবেছিল মা ভবানীর কাছে গিয়ে হাতজোড় করে বন্ধুচোখে মূর্তির পানে তাকিয়ে থাকলেই উদ্ধার হয়ে যাবে।

তাকে আনা হয়েছিল মন্দির প্রাঙ্গণে। বলা হয়েছিল, ডাক এইবার তোর মা ভবানীকে।

ভক্ত যখন চোখ বন্ধ করে জোড়হাতে ধরধর করে মাযের মূর্তির পানে নমস্কার দিল ঠিক তখনই কোদালের বাঁটিটি শক্ত করে ধরে রাধু নাপিত মারল ছেলবেলার সাথীর মাথায়, একেবারে টাকরা বরাবর। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটল। সে যাত্রা রক্ষা করতে পারল না দেখেও গাঁয়ের লোকদের শিক্ষা হল না, বিপদে পড়লেই বুদ্ধি তাদের মাথা থেকে পায়ের গোড়ায় নেমে আসে, ছুটে আসে মন্দির প্রাঙ্গণে। যাবেন নাকি?

মানুষের অধঃপতনের এই দৃষ্টান্তে শিউরে উঠলেন অবিনাশ। ভাবা যায়। অর্ধশিক্ষিত কিংবা অশিক্ষিত মুখ মানুষজন ভয়ভক্তি ভুলে এই হিংসার খেলায় মেতে উঠেছে। মুছে গেছে তার মানবিক পরিচয়, রাজনীতির নামাবলীই হয়ে উঠেছে প্রধান। পারস্পরিক সৌহার্দ্য ধ্বংস হয়ে গেছে। একজন আরেকজনকে নির্ভর তো করতে পারেই না, করে শুধু সন্দেহ। অস্বস্তি এই হানাহানিই এখন কর্মসংস্কৃতির রক্ষাকবচ হয়ে দাঁড়িয়েছে এমনকি মিষ্টিমধুর গ্রামাংলাতেও। এক ধরনের গৃহযুদ্ধ লেগেই আছে।

অবিনাশ বললেন, না সুশোভন, তুমি ভুল করছ, ছেলাটি সব জেনেও যে মা ভবানীর কাছে ছুটে এসেছিল, সে কি শুধু স্বাতন্ত্র্যের হাত থেকে বক্ষা পাওয়ার জন্য ভেবেছে? তা আমার মনে হয় না।

—তবে?

আমরা যেন স্ত্রী-পুত্রকন্যার চোখের সামনে থেকেই মারা যেতে চাই, নির্ভর করি থাকি মৃত্যুর সময় সে পাশে থাক—

—কি জানি স্যার, সবাই এভাবে ভাবে না। তবে এই অলীক দৈবনির্ভরতা মানুষকে পঙ্গু করে দিচ্ছে, সে কথাটাও কি ঠিক নয়?

—হয়ত ঠিক, নয়ত নয়। ঈশ্বর তো আর কিছু নয় সুশোভন, মানুষেরই প্রতিমূর্তি, বিবেকতাড়িত একটি রূপকল্প। মানুষই তাকে তৈরি করেছে। ভেবে নিয়েছে, বিপদের দিনে ওই হবে তার ঠাই।

পায়ে পায়ে এগোচ্ছিলেন ওঁরা, এমন সময় একটি লোক ডেকে উঠল হেঁকে, আরে ঢকা বো।

সে তখনো কাছে আসেনি, আসার উপক্রম করছে মাত্র। সুশোভন হিসহিসিয়ে ওঠে অবিনাশের পানে চেয়ে,—স্যার এই লোকটার সামনে বেশি কথা বলবেন না। সাংঘাতিক লোক। মুখ মিষ্টি। ও আসলে খোচর। যা শুনবে গিয়ে লাগিয়ে দেবে।

লোকটি কাছে আসতে ঢকা বলল, কী স্যাঙাৎ? নজব কি—

স্যাঙাৎ বলল, শুনেছি, দুর্ভাকলার শাঁখারি পাড়ায় কার্ল বাতে আশুন লেগে সর্বনাশ হয়ে গেল। সতেরো ঘর সর্বস্বান্ত।

—কে লাগাল?

—ই আবার কেমন কথা গ। মানুষ আবার মানুষের ঘবে, চালের মটকায় আশুন দিবে নাকি? যদি দেয় সে অপদেবতা। হাওয়ার রূপ ধরে এ ঘরের মটকা থেকে ও ঘরের মটকায় কালপেঁচার বেশ ধরে ওড়াউড়ি করে, আব লক্ষ্যকাণ্ড ছুটে থাকে সেই বেখেয়ালে। পাপ যোলকলা পূর্ণ হলে তবেই না এমনটা হয়! আহা গক-বাছুরগুলির দড়ি ছিঁড়ে দৌড়ে ওঠা, কি মেয়েছেলেদের আর্ডরব, সে দৃশ্য যদি চোখে দেখা যায়! মহেশ্বর ঘোষের হামার ভরা ধান সর্ব পুড়েফুটে ছাই-খই হয়ে গেল চোখের সামনে—

কারো মুখে কোনো কথা নেই। সুশোভন সকালেই শুনেছে খবরটি চা দোকানে বসে। শোনামাত্র অবিনাশকে এসে বলেছে, স্যার যাবেন নাকি দক্ষ গ্রামটি দেখে আসতে? অবিনাশ শুনেছেন স্তম্ভিত হয়ে, হ্যাঁ বা না কিছুই বলেন নি।

দুপুরের রোদ চড়া হয়ে আসতে তা আর গায়ে ধরে রাখা যাচ্ছিল না। ছাতা আনেননি অবিনাশ। ঢকা বলল, তাহলে বাঁকা, এবার তো ঘরের পানে যেতে হবে, নাকি। চ তুই আমার সঙ্গে। স্যার বিশ্রাম করবেন, আমরা দুজনে পাশজালটা নিয়ে গিয়ে ডোবায় নেমে দেখি, কই মৃগেল কিছু আছে নাকি।

ঢকার মা কমলা মেয়ে ভালো। অতিথিকে পেয়ে 'কোথায় রাখবেন, কোথায় বসাবেন' দশাটি দেখে অবিনাশই বলেছিলেন, তোমার মার অভ্যস্ত হবার দরকার নেই। দুয়ারে ওই মাদুরখানা পেতে দিয়ে বরং একটু চা বসও।

সুশোভন বলল, আমাদের তো ঘর ছোট। আপনাব অসুবিধা হবে বুঝে ক্ষুলের পাশে আমার বন্ধু সুদর্শনের বাড়িতে আপনার ব্যবস্থা করেছি।

—না না, আমি এখানেই থাকব। কোনো অসুবিধা হবে না। কিছু ভেবো না তুমি। ঘরের ভেতর একখানা মাদুর পেতে দিও মেঝেতে, তাহলেই হবে।

—না তার দরকার নেই। ভেতরের ঘরে একটা খাট পাতা আছে। যদিও টোঁকি খাট, ভবু আমার শুতে অসুবিধে হয় না যখন, আপনার ছোট হবে না। হয়ে যাবে কোনোরকমে। খাটপাট দিয়ে, নাচা বুলিয়ে একদম পবিত্র করার আশে।

—ও। তাহলে আর চিন্তা কিসের?

নব ঘুরিয়ে রেডিওটা চালিয়ে দিলেন সুশোভনের মা। সেখানে সন্ধ্যা মুখার্জির গান বেজে ওঠে, কে তুমি আমারে ডাকো/অলখে লুকায়ে থাকো/ ফিরে ফিরে চাই/দেখিতে না পাই—

চা-বিস্কুট দিয়ে আরেকটি ছোট সানকি-থালায় মুড়ি-বাতাসা দিয়ে গেল সুশোভনের মা। তারপর ছেলেকে ডাকল ঘরের ভেতর।

অবিনাশ চায়ের কাপে চুমুক দিলেন, বিস্কিট ভেঙে খেতে লাগলেন। মা বললেন, ঢকা, আটাংবুড়িতে মোরগখানা ঢকা দিয়ে রেখেছি। ভাত বসিয়েছি। বাঁশতলাব দিকে নিয়ে গে মেয়ে ছাড়িয়ে কেটেকুটে দে।

—না মা। স্যার মাংস খান না।

—তবে কী হবে?

—তুমি মশলা বেটে পেঁয়াজ কেটে রাখো। আমি আর বাঁকা পাশজাল, নিয়ে গিয়ে আমডবির ডোবায় নামছি।

—সেখানে কি আর মাছ আছে?

—দেখি না! যা পাই, এক-দু'খানা মিললেই চলবে।

—যা তবে। তাড়াতাড়ি কর বাবা। রোদ মাথার ওপর উঠেছে। বাবু এসেছেন আর খাবেন কখন?

—তুমি এক কাজ করো। মুড়ি খাওয়া হয়ে গেলে ভেতরঘরে খাটের ওপর একখানা চাদর পেতে বালিশ দিয়ে দিও। স্যার অনেকখানি ঘুরেছেন পায়ে হেঁটে। হয়ত ক্লান্ত আছেন। একটু গড়িয়ে নেবেন আমরা ফেরা না পর্যন্ত।

অবিনাশ মুখে খানিকটা মুড়ি ভরে ছিলেন, তার মাঝেই বললেন, সেই ভালো। নাকি যাব আমি ডোবার ধারে?

—সেখানে গিয়ে কী করবেন স্যার? ডোবার পাড়ে যত বাবলা ঝোপ, কাঁটায় কাঁটায় একাকার। আপনি পারবেন না। তারচে একটু রেস্ট করুন। মাছ ধরে ফিরে এসে বালতি ভরে জল এনে দেব, স্নান করে নেবেন।

—কেন, পুকুর নেই?

—তা কেন থাকবে না। খুব বড় দিঘি আছে সামনেই, জলও ভালো। একদম কাকের চোখের মতো স্পষ্ট। কিন্তু আপনি কি পারবেন? অভ্যাস না থাকলে—

—না না, পুকুরে স্নান আমি বন্ধাব করছি।

—ঠিক আছে। তাহলে তেলগামছ নিয়ে চলে যাব। একেবারে সামনেই। ডোবা থেকে ফিরে আসি। গড়িয়ে নিন একটু। ক্লান্তিটা চলে যাবে।

একটু পরে অবিনাশ এলেন ঘরের ভেতর। জলের গ্লাস রেখে কমলা চলে গেল। বলে গেল, দাদা, দরজাটা ভেজিয়ে দিন। তাহলে আর আলো ঢুকবে না।

সেইমতো ঘরটি আঁধারমোয়া হয়ে উঠল। কুশাটখানা খুলে ভেতরকার গেক্সিটিও খুলে রাখলেন অবিনাশ। তারপর খাটে এসে শুয়ে গড়িয়ে দেখলেন, নাই, একেবারে মজবুত খাট।

ঘুমের ঘোরে একটু পরেই দু-একটি ছবি দেখতে লাগলেন অবিনাশ। দেখলেন তিনি চলে গেছেন প্রত্যন্ত গ্রামে, জনযুদ্ধ কিভাবে তৈরি হচ্ছে তা দেখতে। হাজার একেবারে ডেরায়—

লঠন আর কুপির আলোয় সেখানে চলছে যেন নতুন পৃথিবীর সামগানের তরঙ্গ। পৌছে অবিনাশ স্তম্ভিত চোখে দেখছেন, শুনছেন, ভাবছেন—

‘নিশ্চিতি রাত। গাঢ় অন্ধকার। বিশালকায় শাল আর শিরিষ গাছগুলো অন্ধকারের দেওয়াল তুলে যেন দাঁড়িয়ে আছে। শেয়াল বা বন্য কোনো জন্তুর হুকার ভেসে আসছে মাঝেমাঝে। কিংবা বিবাক্ত কোনো সাপের হিস হিস শব্দ। হঠাৎ হঠাৎ অন্ধকার ভেদ করে সমুদ্রের ফসফরাসের মতো জ্বলে উঠছে জোনাকিপোকা। এরকম পরিবেশেই জঙ্গলের মধ্যে কোথাও কুপি বা লঠন জ্বলিয়ে জনযুদ্ধের বৈঠক। প্রথমে মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে পারস্পরিক অভিনন্দন—কমরেড লালসোলাম। তারপর বিপ্লব আর শোষণমুক্ত সমাজের গান। সেই গানের ব্যাখ্যা। জঙ্গলের অধিবাসী তারা। বাউরি-ওরাও-মাণ্ডি সম্প্রদায়ের হাড় বেরকরা মানুষগুলো বিশ্বায়নের সঙ্গে ওদের কথা শুনছে। হয়ত ভাবছে এও কি সম্ভব? জঙ্গলের অধিকার থাকবে তাদের হাতে? কিংবা জঙ্গলের নিচে খেতের জল আসবে খাল দিয়ে? পর্নকুটির জলবে আলো? গাছের শেকড়ের বদলে জঙ্গলের মানুষরা পাবে

যথার্থ ওষুধ? আর বালি খুঁড়ে নয়, নলকুপের ঠাণ্ডা জলে তাদের তৃষ্ণা মিটবে? ছেলমেয়েরা শিখবে লেখাপড়া?....

আদিবাসীদের কাছে এই কথা বলেই এখন জনযুদ্ধ গোষ্ঠী বিপ্লবের প্রচার করছে। মূলত অর্থনৈতিক বঞ্চনা আর তার থেকে বেঁচে থাকার লড়াইয়ের বিপ্লব। আর এই বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যেতে জনযুদ্ধারা তিনটি সংগঠন তৈরি করেছে—নারীমুক্তি সংঘ, মজদুর কৃষক সংগ্রাম সমিতি এবং বিপ্লবী যুব লিগ। তবে সাংগঠনিক ভাবে মজদুর কৃষক সংগ্রাম সমিতি বা এম-কে-এস-এস-ই মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলনকে সামনে রেখে বিপ্লবের প্রচার করে আসছে। জঙ্গলের কাঠ কাটার জন্য ঠিকাদারদের কাছে মজুরিবৃদ্ধির দাবীতে এম-কে-এস-এস-ই আন্দোলন শুরু করে। আর এই মজুরিবৃদ্ধির আন্দোলন নিয়েই জনযুদ্ধদের সঙ্গে সি পি এমের স্থানীয় নেতৃত্বের লড়াই। ন্যূনতম মজুরি কত হবে তা স্থানীয় সি পি এমই ঠিক করে দেবে। জনযুদ্ধারা বলছে, যারা কাঠ কাটে তাদের দাবী মেনে ন্যূনতম মজুরির হার ঠিক করতে হবে। এইজন্যই জনযুদ্ধ গোষ্ঠীর ঘোষণা—যারা এই দাবী আদায়ে বাধা দেবে তাদের খতম করো। এই খতমের তালিকা তৈরি হয় জঙ্গলের ভেতর, সংগঠনের ডাকা গণ আদালতে। সাধারণ মানুষের কাছে জনযুদ্ধের নেতারা প্রথমে গোটা পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন। তারপর ঠিক হয় কী কী ধরনের শাস্তি হবে। আগে সামাজিক বয়কটের ডাক দেওয়া হত। একদা রাজ্যের মন্ত্রী, বর্তমানে সি পি এমের বিষায়ক শব্দ মাণ্ডিকে তাঁর গ্রামের মানুষ সামাজিক ভাবে বয়কট করেছিলেন এভাবেই। শব্দবাবু শেষ পর্যন্ত তাঁর গ্রামের বাড়ি ছেড়ে ঝাড়গ্রাম শহরে উঠে এসেছিলেন। কিন্তু এই সামাজিক বয়কটের কোনোরকম সুফল মেলেনি। তাই তাদের পরিষ্কার ঘোষণা, শ্রেণীশত্রুদের আগে খতম করতে হবে। জমি দখল হলেও সরকারিভাবে আদিবাসীদের মধ্যে এখনো বহু এলাকায় পাট্টা বন্টন করা হয়নি। জনযুদ্ধদের আন্দোলনের আরো একটা কারণ এই পাট্টা। জেলা সি পি এম নেতৃত্ব স্বীকার করেছে, যে হারে জমি দখল হয়েছে, তুলনায় জমির পাট্টা বিলি করা হয়নি। এজন্য সি পি এম একটা ‘ক্র্যাশ প্রোগ্রাম’ নিয়েছে। জনযুদ্ধারা আদিবাসীদের মধ্যে প্রচার করছে—এই যে জমির পাট্টা দেওয়া হচ্ছে শুধু শহর লাগোয়া গ্রামগুলিতে। তাও সি পি এমের কর্মীদের জন্য। জঙ্গল এলাকায় নয়। কাজ না পেয়ে বেকারদের মধ্যে যে হতাশা তৈরি হয়েছে তার জেরে জনযুদ্ধ গোষ্ঠী তাদের সংগঠিত করেছে, বলে সি পি এম এবং জেলা প্রশাসন স্বীকারও করেছে। জেলা নেতৃত্ব স্বীকার করেছে বেকার যুবকদের ভুল বুঝিয়ে জনযুদ্ধারা গুপ্ত হত্যার রাজনীতিতে দীক্ষিত করছে। যার মোকাবিলায় সি পি এম ব্যর্থ। ঝাড়গ্রাম থেকে বিনপুর, রেলপাহাড়ি, বাঁশপাহাড়ি, ধুলাবেড়া, শিমুলপাল হয়ে বাঁকুড়া পুরুলিয়ার জঙ্গল এলাকায় জনযুদ্ধের তিনটি সংগঠনই সমানে কাজ করে চলেছে। এলাকায় চিকিৎসা ব্যবস্থা পর্যন্ত নেই। কিন্তুদিন আগে ওই বাঁশপাহাড়িতে চার কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি করা নতুন হাসপাতাল ভবনটি ভেঙে পড়েছে। উদ্বোধনের আগেই নতুন হাসপাতালের এই পরিণতিতে আদিবাসীরা ক্ষুব্ধ। বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে স্বাস্থ্যদপ্তর ভ্রাম্যমান চিকিৎসাকেন্দ্র চালু করলেও এখন তা বন্ধ। সাধারণ মানুষের এই ক্ষোভকে জনযুদ্ধারা কাজে লাগাচ্ছে। কারণ সাধারণ রোগ থেকে শুরু করে সন্তানসম্ভবাদের বাঁশপাহাড়ি থেকে ৬৫ কিলোমিটার পার হয়ে ঝাড়গ্রাম হাসপাতালে আসতে হয়। বহু ক্ষেত্রেই পথেই রোগীর মৃত্যু ঘটে। বেহাল এই স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পাশাপাশি মেদিনীপুর-বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার

জঙ্গল এলাকায় পাকা রাস্তাই তৈরি হয়নি। যেসব স্কুল আছে সবই প্রাথমিক। স্কুলবাড়িগুলিও জরাজীর্ণ। পানীয় জলের সুব্যবস্থা নেই। শিক্ষকও অপ্রতুল। উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়তে হলে ছাত্রছাত্রীদের কয়েক মাইল হেঁটে যেতে হয়। আদিবাসী গ্রামগুলিতে আজও বিদ্যুৎ পৌঁছানি। এই বঞ্চনাই জঙ্গলের পিছনে-পড়া মানুষদের জনযুদ্ধের কাছে এনে দিয়েছে। কারণ জনযোদ্ধারাই আদিবাসী গ্রামে স্কুল খুলেছে। চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে। আদিবাসীছাত্রদের লোকজের স্বীকার করেছে, ওরা তো আমাদের বন্ধু। জেলা পুলিশও বলছে, গভীর জঙ্গলে জনযোদ্ধাদের পক্ষে এভাবে কাজ করা সম্ভবই হত না, যদি না আদিবাসীরা ওদের সাহায্য করত সর্বস্বত্বকরণে।

এইসব যাদের মনে তারাই গাইছে সাম্যের গান, নিশুত রাতে, আগুনের ডালপালা জ্বালিয়ে। সেই শিখায় অগ্নিপুত্র আর কন্যাদের চোখমুখ চকচক করেছে, দেখতে পাচ্ছেন অবিনাশ স্পষ্ট।

হঠাৎ একজন ছোট এসে অবিনাশের বুকে রিভলবার ধরে বলে উঠল উঠুন, উঠে দাঁড়ান।

মনে পড়ে যায় অবিনাশের, আজ ১৪-৭-২০০২, সংবাদ প্রতিদিন কাগজে পড়া এডিটোরিয়াটির কিছু অংশ : “.....দুর্ভাগ্য এই যে ভ্রান্ত পথিকদের পুরোভাগে সাতের দশকের নকশালপন্থীদের মতই কিছু মধ্যবিত্ত শিক্ষিত তরুণের আবির্ভাব ঘটেছে—যাঁরা তাঁদের শব্দে রোম্যান্টিকতার শিকারে পরিণত করেছেন অশিক্ষার অন্ধকারে থাকা গ্রামের কিছু গরিব মানুষকে। শ্রেণীশত্রু হত্যার নাম করে নিরীহ মানুষকে খুন করে অতি সামান্য শক্তি নিয়ে তাঁরা কার্যত এই গরিব মানুষদের সশস্ত্র রাষ্ট্রশক্তির প্রতিহিংসার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। হঠাৎ গরী রাজনীতি ছাড়া এটা আর কী! অবশ্য একথা অস্বীকার করা যায় না যে জনযুদ্ধ গোষ্ঠী তিন রাজ্য অন্ধপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড ছাড়াও আরও দুই রাজ্য বিহার ও ওড়িশ্যার বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের সংগঠন বিস্তার করেছে।.... গরিব মানুষদের শ্রেণীযুদ্ধের নামে খতমের রাজনীতিতে প্ররোচিত করার উদ্দেশ্যটি স্পষ্ট হয়ে যায় ওয়েবসাইটে। মুখ্যমন্ত্রীদের খুনের হুমকির ঘটনায়—”

ধড়ফড় করে বিছনায় উঠে বসলেন শক্তিত অবিনাশ। দেখলেন, না জনযোদ্ধা নয়, সুশোভনের হাতের ঠেলা খেয়ে জেগে গেছেন তিনি। জোরে জোরে শ্বাস পড়ছে তাঁর, ঘামে সর্বশরীর জর্জরিত।

দরজা খুলে দেওয়ার দরুণ ঘরে অন্ধকার আর নেই। সুশোভনের সঙ্গে বাইরে এসে একটি পুরনোকালের পেতলের গাড়ি থেকে জল ঢেলে চোখমুখ ধুলেন তিনি। ঘোর কটিল। এইবার চোখে পড়ল—

সুশোভন বলল, দেখুন স্যার, উঠনের দিকে তাকিয়ে দেখুন। অন্য কোনো মাছ পেলাম না, জালে এইটাই উঠে এসেছে—

বিস্ফারিত চোখে অবিনাশ দেখলেন, উঠনের মাঝখানে একটা মস্ত পাকা হলুদ রঙের মাগুরমাছ ধুলো মাখামাখি হয়ে লেজ কাপটাচ্ছে। তাঁর মনে হল, মাগুরমাছ নাকি একটি কড়সড় স্বর্ণচাঁপা ফুলই হবে। খুশিতে ঠোট খুলে হেসে উঠলেন তিনি।

৬

বোলতা বলল, স্যার, বিপদ হয়েছে।

—কী হল আবার?

—পুলিশ অসমঞ্জ সম্পর্কে খোঁজখবর নিচ্ছে, কী করা উচিত ভেবে পাচ্ছি না আমরা। তাই আপনার কাছে চলে এলাম। কিন্তু ওর খোঁজ করবে

কেন? ও তো অ্যাকটিভ পলিটিক্স থেকে সরে আসতে শুরু করেছে।

অবিনাশ দাঁড়িয়ে থাকা অসমঞ্জের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। বুঝতে তাঁর একটুও অসুবিধা হল না যে বোলতার শেষ কথাটি কোনো শব্দ ভিতরে ওপর দাঁড়িয়ে নেই। বললেন, হিটলারের সূচনা পর্বে যখন ইচ্ছারীরা অত্যাচারের শিকার হতে থাকে, বাকি সমাজ চূপ করে ছিল। ইতিহাস সাক্ষী আছে বোলতা। পরে কিন্তু অন্যরাই রেহাই পায়নি।

এই জাভসত্যটি শুনে বোলতা বা অসমঞ্জ দু'জনেই সচকিত হয়ে ওঠে। আক্রমণ ঘটবে। তার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে বৈকি। এই যে সজ্ঞাসবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বজুড়ে অভিযানের নতুন নতুন রণকৌশল আবির্ভূত হচ্ছে।—ওসামা বিন লাদেন নয়, সাদাম হুসেন নয়, গোটা ইউরোপ এখন মাথা ঘামাচ্ছে একজন ফরাসিকে নিয়ে। সবচেয়ে বড় বিপদ বলে চিহ্নিত করে দেওয়ার পরও আমেরিকার পরম মিত্র ইউরোপ সব ছেড়ে ফরাসি জঁ-মারি-ল্য পেনকে নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে কেন? এই জিজ্ঞাসার উত্তর একটাই, নিউ ইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ধ্বংস করেও ঘাতকরা যেটা পারে নি, একটি বোমা না ছুঁড়েই ল্য পেন সেটা করতে পেরেছেন। ফরাসি ন্যাশনাল ফ্রন্টের এই নেতা ওই দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রথম পর্বে লাফ দিয়ে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসে ইউরোপবাসীর মনে নাৎসি কনসেনট্রেশন ক্যাম্প আর হিটলারীয় কুখ্যাত সেই গ্যাস চেম্বারের স্মৃতি ফিরিয়ে এনেছেন। চূড়ান্ত পর্যায়ের ভোটে জাক শিরাককে হারিয়ে তিনি ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট হতে পারবেন না এটা জানা কথা। কিন্তু ল্য পেনের উত্থানটাই তো ইউরোপীয় হাড়ে কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছে—তাহলেই বোঝা, কে কখন কিভাবে টার্গেট হবে—

—কিন্তু স্যার, অসমঞ্জ বলতে গেল—তাকে ধামিয়ে দিয়ে অবিনাশ বলে উঠলেন, আগে চা খাও দেখি। মাথা ঠাণ্ডা হোক। এই বলে নিজের ফ্লাস্ক থেকে দুটি কাপে গরম চা ঢেলে দু'জনের দিকে এগিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, গণতন্ত্র থাকা সত্ত্বেও সারা পৃথিবী জুড়েই চলছে মধ্যযুগীয় বর্বরতা। তুমি আমি তার থেকে রেহাই পাব কি করে? আসলে এই প্যারাসাইট সিস্টেম মানেই পুলিশ সক্রিয় হবে, সে যেই ক্ষমতায় আসুক না কেন, সেই হবে রাবণ। প্রধান রাজনীতিটি তার হতেই হবে জবরদস্তি। এইসব বিষয়েই একটা বই লিখছি। শুনবে শুরুটা? তবে দাও—দরজাটা ভালো করে এঁটে দাও। এবার কাছে এসে টুলদুটো টেনে নিয়ে বোসো।

আপাতভাবে যেন সজ্ঞস্ত দেখাচ্ছে ওদের। দু'জনেই টুল দুখানিতে বসল। চোখে চশমা লাগিয়ে অবিনাশ পড়তে শুরু করলেন—

ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার গাঁটছড়া বেঁধেছেন এশিয়ান স্টাডি সেন্টারের সঙ্গে। যৌথ এই উদ্যোগের পরিচালনভার পেয়েছেন কেন্দ্রীয় ফেরৎ বামপন্থী ইতিহাসকার শ্রীযুক্ত বরুণ দে মহাশয়। প্রায় শ' দেড়েক বছর আগে অবশ্য লেখক শ্রমি বন্ধিমও আক্ষেপ করেছিলেন এই বলে যে, বাংলা ও বাঙালির কোনো প্রামাণ্য ইতিহাস নেই। আর এককাল পরে ব্রিটিশ ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড হ্যালেট বারবার প্রমাণ তুলছেন, যথার্থ ইতিহাস কোন প্রক্রিয়ায় লেখা সম্ভব কিংবা আদৌ সম্ভব কিনা। ‘What is History’ এই নামে তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল আজ থেকে ঠিক চল্লিশ বছর আগে। তারপর বারবার আলোচনাটি যতই ঘনায়িত হচ্ছে ততই অনুভূত হচ্ছে এই সত্য যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রকৃত ইতিহাস ও ইতিহাসকারের বড়ই অভাব। বিশেষ তেমন একটি দেশ বা রাজ্যে, যেখানে একই শাসক দল বছরের পর বছর ক্ষমতা দখল করে নিজেদের

আধিপত্য কায়ম রেখেছে সেখানে কোনো না কোনো ফর্মে একনায়কত্ব বা স্বৈরাচার মাথাচাড়া দিয়ে উঠবেই। এখন সমস্যা এই যে, বাস্তবের পুনর্নির্মাণের প্রক্রিয়ায় অবধারিতভাবেই ঐতিহাসিকদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি কিংবা মতাদর্শগত অবস্থানের প্রতিফলন ঘটেই থাকে। তথ্যের নির্বাচনেই হোক আর নির্বাচিত তথ্যের বিশ্লেষণেই হোক ইতিহাসকার কখনো নৈর্ব্যক্তিকতা বজায় রাখতে পারেন না। অ্যারিস্টটল বলেছিলেন, Man is Born Political. সুতরাং যে কোনো গবেষণাপ্রসূত রচনা সামনে রাখলেই অভিজ্ঞ চোখ ধরে ফেলতে পারে, কোন পক্ষপাত থেকে তা সিদ্ধ হয়েছে। History repeats itself, অতএব ইতিহাসের বদলে-যুগ যুগ ধরে তৈরি হচ্ছে একের পর এক মতামত, Alternative History, পরিকল্পিত তথ্য।

যেমন সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত হওয়ার ফলে মেগাস্থিনিসের ‘ভারত ভ্রমণ’-এ দেখা যায় আলেকজান্ডারের গুণগান। হিউয়েন সাঙের রচনা থেকে তৎকালীন ভারতবর্ষের যে ছবি পাওয়া যায় তা যৎসামান্যই বরং বিস্তার পায় সম্রাট হর্ষবর্ধনের প্রতি তাঁর পক্ষপাত। আবুল ফজলের আকবর নমা তো শুধুই প্রশস্তির গ্রন্থনা। সেই সময়কার ভারতবর্ষকে নয়, ফ্রান্সোয়া বার্মিয়ারের ‘Travels In The Mogul Empire’ থেকে জানা যায় জাহাঙ্গীর শাহজাহান আলমগীরের ইতিবাচক বিকাশ। তাভারনিয়ের ভারতবৃত্তান্ত পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা জুড়ে তৎকালীন দেশীয় জীবন যাপন, অর্থনীতি, সমাজ, ক্ষয় ও বিপর্যয় আলোচনা না করে আলোকিত করেছে মুঘল রাজ্য সংরক্ষিত মণি-মুস্তো-রত্ন সম্ভার ও বৈভবকেই। পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশেরই যেখানেই শাসক পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে উঠেছে ইতিহাস, নির্মাণ বিনির্মাণ তার অধিকাংশই এইরকম পক্ষপাতপূর্ণ, সেখান থেকে না জানা যায় দেশকে, না জাতিকে। সময় অসময়ের দলিল সেখানে আবেগের মুখে পড়ে হয় কুটোর মতো ভেসে যায়, নয় একাকার হয়ে যায় রহস্যকাহিনীর ঘনঘটাং।

একই শাসক বা দলের বহুকাল ধরে ক্ষমতায় টিকে থাকা তো প্রকৃত ইতিহাস রচনার অন্তরায় হিসেবে কাজ করেই, ইতিহাসকারকে কাজ করতে হলে ওই প্রভুত্বের প্রশংসাই কাজ করতে হয়, নইলে ‘স্বেচ্ছানির্বাসিত’ হতে হয়, যেমন রাশিয়ায় হতে হয়েছিল সলজনিৎসিনকে। প্রত্যাবর্তন শেষে ‘রাশিয়ার চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ সেখানকার কম্যুনিষ্ট রেজিম সম্পর্কে লিখেছিলেন, ‘মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সীমা এরা ঠিক মত ধরতে পেরেছে আমার তা বোধ হয় না, সে হিসেবে এরা ফ্যাসিস্টদের মত। সেই কারণে নাকি সমষ্টির খাতিরে ব্যক্তির প্রতি পীড়নে এরা কোনো বাধাই মানতে চায় না। এখানে জ্বরদস্ত লোকের একনায়কত্ব চলছে। সোভিয়েত রাশিয়ায় সর্বসাধারণের বিচারবুদ্ধিকে এক ছাঁচে ঢালবার একটা প্রবল প্রয়াস সুপ্রত্যক্ষ সেই জেদের মুখে স্বাধীন আলোচনার পথ জোর করে অবরুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে?’

অবগত বাঙালির জানা আছে, নূতন প্রেরণায় উৎসাহিত বাঙালি মানবেন্দ্রনাথ রায় রাশিয়ায় গিয়েছিলেন, এবং একই দলে অধিষ্ঠান করেও এই স্বাধীনতার প্রস্নে লেনিনের সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য হয়েছিল। পদত্যাগ করেছিলেন তিনি। উৎসাহী বাঙালির নিশ্চয় স্মরণে আছে সর্বজনশ্রদ্ধের ডিক্সাসড কম্যুনিষ্ট নেতা জাদিমির ইলিচ লেনিনও বলশেভিক দল লড়াইয়ে জয়ী প্রতিপন্ন হওয়ার অব্যবহিত কালের মধ্যে মেনসেভিক দলের অন্তিম ইতিহাস থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করেছিলেন। চীনের ক্ষমতা

থেকে চিয়াংকাই সেককে উৎখাত করার পর মাও জে দং তামাম চীন থেকে তাঁর স্মৃতি মুছে দিতে উদ্যোগ নিয়েছিলেন এবং সমর্থ হতে তাঁকে কোনোরকম বেগ পেতে হয়নি। চীনা ছাত্রদের জন্য স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে বর্তমানের পঠিত ইতিহাসে তাঁর নাম খুঁজে পাওয়া যাবে না কিছুতেই। ওই মাও জে দং চীনের প্রধান ধর্মমত কনফুসি-বা কনফুসিয়াস অনুগামী ও বৌদ্ধদের ইতিহাস খতম করে দিয়েছেন। উদারপন্থী শ্রমিক নেতা লেচ ওয়ালেসাকে বাধ্য হয়ে পোল্যান্ডের কম্যুনিষ্ট পার্টি পরিত্যাগ করে কম্যুনিষ্ট বিরোধী শ্রমিক সংগঠন সলিডারিটি গড়ে তুলতে হয়েছিল সেখানকার অত্যাচারী কম্যুনিষ্ট সরকারকে গদিত্যত করার জন্য। যুগোস্লাভিয়ায় ক্ষমতালোভী নীতিহীন দুর্নীতিবাজ প্রেসিডেন্ট ও কম্যুনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক চাওসেসকুকে গণ অভ্যুত্থান ঘটিয়ে জনগণ পদচ্যুত করেন। তাঁকে খুঁচিয়ে হত্যা করেছিল উন্মত্ত জনতা। —ঋষি বঙ্কিমের সৌভাগ্য, তিনি চলে গেছেন ভালোয় ভালোয়, তাঁকে প্রত্যক্ষ করতে হয়নি যে তাঁদের স্বপ্ন, কামাধামরক্ত অর্জিত স্বাধীনতার সুফল বাঙালি ভোগ করার সুযোগ পাওয়ার আগেই মাত্র আড়াই দশকের মাথায় তাঁদের সাধের বাংলায় কায়ম হল

আজ রবীন্দ্রনাথ নেই যে, একজন প্রকৃত কলমধারীর দায়িত্ব, কর্তব্য, বিশ্বাসের ওপর দাঁড়িয়ে রচনার পর রচনায় মিথ্যার মুখোশ খুলে দিয়ে সত্যের জয়গান গাইবেন। কেননা লেখকও তো একধরনের ইতিহাসকার। এখনকার বাংলায় লেখক শিল্পী বুদ্ধিজীবী সবাই প্রায় শাসকদলের কাছে আত্মবিক্রি করে বসে আছেন। ইতিহাসকার হবে সত্যনিষ্ঠ, এ ধারণা এখন অপগত। রাজনৈতিক কর্তাদের সুনজর ছাড়া সাফল্য মিলবে না—এই আশুপ্রাপ্তির সম্ভাবনায়, অনুদান পুরস্কারের লোভে ইতিহাস নির্মিত হচ্ছে। তথাকথিত তথ্যনিষ্ঠ ভূয়ো সমাজের ওইসব ইতিহাস পড়ে আগামী প্রজন্ম বা পরবর্তীরা না জানবে দেশকে না কালকে, বরং বিভ্রান্ত হবে, বিপথে পরিচালিত হবে। ভুল, বিকৃত, উদ্দেশ্য প্রণোদিত ছাপা গ্রন্থকেই ইতিহাস ভেবে সর্বনাশের খাদে আত্মবিসর্জন দিতে হবে জাতিকে।

১৯৮০ সালের কিছু আগে থেকেই বিশ্বজুড়ে পুরনো ধ্যান ধারণা ভেঙে পড়ছে। বহু স্বপ্নে, আশায় বুক বেঁধে মানুষ সোভিয়েত গড়েছিল। সেই ইউনিয়ন বা পূর্ব ইউরোপের বহুজাতিক রাষ্ট্রগুলিতে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব আত্মীয়তাবাদের সঙ্কট ও ভাঙন, বিশ্বায়ন ও দুনিয়া জুড়ে কৌম পরিচিতি নির্ভর বা এথেনিক আইডেনটিটি আন্দোলনের জোয়ার রাষ্ট্রিক, বাস্তু ও জাতীয়তার পারস্পরিক সম্পর্কে নতুন করে সমস্যাযুক্ত করেছে।.....

ভারতবর্ষের সামাজিক ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে ফিউডালিজমের ধারণাটাও আমদানি করা ইউরোপ থেকে কিন্তু সেখানে যেমন শব্দটি অনেক ধারণাকে স্বচ্ছ করে তোলে এদেশের ক্ষেত্রে তা ঘটেনি। প্রাচীন, মধ্যযুগ বা আধুনিক ভারতবর্ষের কোনো পর্বই যে সামন্ততন্ত্র আবিষ্কার করা যায়নি একথা বহু অধম ঐতিহাসিক বা সমাজবিজ্ঞানী বার বার বলেছেন যাদের মধ্যে সাম্প্রতিক কালের অমলেশ ত্রিপাঠীর নাম স্মর্যব্য। আবার একটি ফসিল শব্দ ‘বুজোয়া’। তাও ওইসব যডযন্ত্রশীল ইতিহাসকাররা এখনো ব্যবহার করে যাচ্ছেন। ওই ফিউডালিজম, পুঞ্জি, উৎপাদন, বিনিয়োগ, সামন্ততন্ত্র সবই হচ্ছে তথাকথিত সিউডো মার্ক্সীয় তাত্ত্বিক বা ইতিহাসকারদের ইতিহাস রচনার উপকরণ। ওইসব যে এদেশে আসে সে বিষয়ে কেউ সচেতন নন। উল্লেখ করা যেতে পারে ঐতিহাসিক মার্ক্স ব্লকের উদ্বৃতি, ‘Montesquieu’র চোখে ফিউডাল আইনের প্রতিষ্ঠা ছিল

এমন একটি ঘটনা যা দুনিয়ায় একবারই ঘটেছিল এবং আর ঘটবে না।' আমাদের দেশে ফিউডালিজমের প্রবক্তা সম্ভবত পণ্ডিত প্রবর ধর্মানন্দ কোশাষি। মার্ক্সবাদীরা যখন এইসব শব্দগুলি বলেন বা চর্চা করেন তখন দেখা যায় তাঁদের একটি দিকে ঝোঁক, তা হল উৎপাদন ব্যবস্থা। যার মধ্যে একদিকে রয়েছে উৎপাদিকা শক্তি সমূহ অন্যদিকে উৎপাদন সম্পর্ক। সেই যায়গা থেকেই আহুত তথ্যের ভিত্তিতে নির্মিত হচ্ছে শ্রান্ত ইতিহাস। আর আশ্চর্য হতে হয় একথা ভেবেও যে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময় থেকেই ভারতবর্ষে শতকরা দশভাগ লোকও মার্ক্সীয় ভাবধারাকে সমর্থন না করলেও ইতিহাস কংগ্রেসে কিন্তু তাঁদেরই প্রতিনিধির সংখ্যাধিক্য ও প্রভাব। যে সেই মতের বিরুদ্ধে কথা বলবে গর্দান যাবে।....

ইতিহাসকাররা যেহেতু নিজের সর্বনাশ চান না সুতরাং পোট ও প্রতিষ্ঠা ভরাতে প্রকৃত ইতিহাসের দিকে না তাকিয়ে শাসকদলের বলে দেওয়া পথেই হাঁটবেন। কদাপি নতুনকালের ইতিহাসে স্থান পাবে না এই সত্য যে পঁচিশ বছর আগে নিজেদের দলকে গরিবের দল বলে উল্লেখ করে, 'গরিব গরিব ভাই ভাই সব গরিবের এক লড়াই' স্লোগান দিয়ে যে কম্যুনিষ্ট দল ক্ষমতায় এসেছিল আজ পঁচিশ বছর পরে সেই দল আর মেহনতি মানুষের দল নেই। হয়ে গেছে সুখের কোকিল যত মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্তের আখড়া।

কম্যুনিষ্ট শাসন মানেনি দিকে দিকে এই চিত্র। চীনে মাও জে দংয়ের আমলে সাংঘাই বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে মাও-এর স্ত্রী মাদাম জিয়াং জিংয়ের নেতৃত্বে 'সাংস্কৃতিক বিপ্লব' হয়েছিল। তখন পুরনো সংস্কৃতি ও ধ্যান ধারণাকে বদলে দেওয়ার জন্য একদিনে সাংঘাই বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ৭০ হাজার মানুষকে 'প্রতিবিপ্লবী' আখ্যা দিয়ে মাদাম জিয়াং জিংয়ের বাহিনী হত্যা করেছিল। মাও জে দংয়ের মৃত্যুর পর সেই চীনের সরকার ও কম্যুনিষ্ট পার্টি মাদামের বাহিনীকে 'দুষ্টচক্র' আখ্যা দেয় ও তাকে কারারুদ্ধ করে। বিচারে মাদামের মৃত্যুপত্র হয়। আসলে কম্যুনিষ্ট পার্টিতে যে ক্ষমতায় সেই রাবণ, সে সাজাবে লঙ্কাকে তার খেয়ালখুশি মতো। বেজিংয়ের তিয়েনান মেন স্কোয়ারের কথা কেউ কি ভুলতে পারবে কোনোদিন, গণতন্ত্র ফিরিয়ে দেওয়ার দাবীতে অবস্থান আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের যখন চীনের প্রধানমন্ত্রী লি পেন্গের নেতৃত্বাধীন লালফৌজ গুলি চালিয়ে হত্যা করেছিল?

ঘড়িতে এগারোটা বাজে। এক্ষুনি বেরোতে হবে। পড়া থামিয়ে পেপার ওয়েট চাপা দিয়ে টেবিলে রাখলেন অবিনাশ। তারপর বেশ কিছু সংবাদপত্রের কাটিং দেখে দেখে গুছিয়ে রাখলেন ফাইলবন্দী করে, জরুরি লেখাটির হেডিংয়ের নিচে লাল কালির দাগ, কবেকার ছাপা এবং কোন কাগজে তা ভালো করে লিখে লিখে রাখছেন—

ভেইশ বছর খুন চল্লিশ হাজার (বর্তমান ১ ভাদ্র ১৪০৭) ● কলকাতা পুলিশে চার্জি, রজারদের লাখ লাখ টাকার সংবাদ (প্রতিদিন, ২৭-৭-২০০০) ● খুনের রাজনীতি বিপন্ন যৌবন (আনন্দবাজার, ২-৫-০১) ● গরিবের জন্য কে ভাবে আনন্দবাজার, ৪-৩-০১) ● গণনা বলছে, দশ বছর মহানগরে গৃহহীন মানুষ বেড়েছে দেড় গুণ (আনন্দবাজার, ৫-৩-০১) ● ভোট শান্তিপূর্ণ কিন্তু অবাধ কি? (আনন্দবাজার ২৭-৬-২০০০) ● লড়াই বন্ধ তবু আতঙ্কে ঘুম নেই গড়বেতার মানুষের (বর্তমান, ২৭-৩-২০০০) ● বোঝা যাচ্ছে রাজ্যে শান্তির জন্য কারো মাথা ব্যথা নেই (প্রতিদিন, ২২-৭-২০০০) ● নিরপেক্ষ নির্বাচন কি সম্ভব? (আনন্দবাজার, ২ শ্রাবণ, ১৪০৭) ● জনযুদ্ধ

কথব খুনের রাজনীতি, দৃঢ় ঘোষণা বৃদ্ধের (আনন্দবাজার, ১২-৭-২০০০) ● ভুতুড়ে কর্মীদের বেতন দিতে প্রতিমাসে রাজ্যের খরচ ৫০ কোটি (আনন্দবাজার, ৭-৭-০২) ● তিন জেলায় সি পি এম অস্ত্র ছাড়লে বৈঠকে রাজি জনযুদ্ধ (আনন্দবাজার, ১৭-৭-০২) ● অস্ত্র নিয়ে তৈরি পুলিশ, সুপড়বাসীও, উচ্ছেদে হাস্যামা (আনন্দবাজার, ৪-৫-০২) ● দাপুটে নেতা নারায়ণের বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস কারও নেই (বর্তমান, ৬-৫-০২) ● হিংসার জ্বাবে বাম আক্রমণে শান্তি ফিরবে না : মন্ত্রী সুভাষ (আনন্দবাজার, ২৯-৮-২০০০) ● নির্বাচনে সি পি এমের জোচ্চুরি (বর্তমান, ৬-২-০২) ● শৃঙ্খলা ছাড়া কিন্তু দল চলে না (আনন্দবাজার, ৬-১২-২০০০) ● মাইক ফুঁকে জানিয়ে দিল সি পি এম.....

সবাই লাল ঝাণ্ডার তলায় এসো, কেশপুর তৃণমূলীদের তাড়িয়ে গ্রামের পর গ্রাম পূর্নদখল (বর্তমান, ২১-৮-২০০০) ● নেতৃত্বের ভুলে দল দশ বছর পিছিয়ে : মন্ত্রী সুভাষ (আনন্দবাজার, ২২-১০-২০০০) ● প্রায় থমকেই গেছে রাজ্যে শিল্পায়ন, বসুকে চিঠি দিলেন উদ্বিগ্ন সোমনাথ (") ● বুদ্ধবাবুর আচরণ সেই সাম্প্রদায়িকতারই খেলা (আনন্দবাজার, ১২-৭-২০০০) ● জ্যোতিবাবুর গ্রাম বাংলা—এমন দারিদ্র্য ভারতে বিরল (আনন্দবাজার) ● মমতা না বুঝে চলছেন না, এটাই তার বাস্তববাদ (আনন্দবাজার, ১৮-১০-২০০০) ● পশ্চিমবঙ্গে গৃহযুদ্ধ (বর্তমান, ২৮-৬-২০০০) ● জ্যোতদারদের নেত্রী মমতা? কুৎসারই এক নতুন মুখোশ (আনন্দবাজার, ২১-৭-২০০০) প্রতিটি নিউজ ক্লিপিং কিংবা 'জার্নালিস্ট অ্যানালিসিস উইদ ডকুমেন্টস' অবিনাশ একটি একটি করে গুছিয়ে রাখলেন। আরো আছে তাঁর ভাঁড়ারে শয়ে শয়ে। এগুলিই তাঁর যুদ্ধের রসদ। অস্ত্রশস্ত্র বা সাজ-সরঞ্জাম।

কোনো কাজ নেই। অবসরের পর থেকে যাকে বলে চব্বিশ ঘণ্টার বেকার। অবিনাশ নিজেও জানেন আজ আর কোনো কাজেরই লোক নন তিনি। তবু একদিনের রুদ্ধ সময় বাকদবিহসের মতো ডানা ঝাপটাতে থাকে বুকের ভেতর। গোপনে সক্রিয় হয়। অকাজগুলোকেই কাজ বলে তিনি আঁকড়ে ধরেন। পড়াগুলো বা টুকরো লেখা, সে কি কখনো কোনো কাজ হতে পারে, নাকি কেউ এসব খুচরো বাতিকগুলিকে কাজ বলে মেনে নিতে চায়। না চাক, না দিক মর্যাদা, অবিনাশ কিন্তু এইসব খুচখাচকেই শেষ জীবনের সঙ্গীত হিসেবে বেছে নিয়েছেন।

ভুক্তি বিন্ময়ে বলে উঠল বোলতা, তাহলেই দেখ অসমঞ্জ, কাজ করার জন্য যিনি জন্মেছেন তাঁকে কাজ কিছুতেই মুক্তি দিতে পারে না।

অসমঞ্জ চূপ করে থাকে অবিনাশের দিকে চেয়ে। যেন এর সবকিছুই জানা। সে কিছুক্ষণ পর বরং উঠে গিয়ে বুকসেলফে সাজিয়ে রাখা বইগুলি নেড়ে ঘেঁটে দেখতে থাকে—

১। নিউ হরাইজনস ফর ওয়েস্ট বেঙ্গল'স পঞ্চায়েতস,—নির্মল মুখোপাধ্যায় ও দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। ২। ল্যাণ্ড আকুইজিশন কেসেস অব মিদনাপোর,—একটি অপ্রকাশিত রিপোর্ট। ৩। ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টস আণ্ড ইমপ্লিমেন্টেশন রিভিউ,—এইচ এম মাধুর অ্যাণ্ড এস মার্সডেন এডিটেড। ৪। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়ন : এ পথে লাভ কার? —নাগরিক মঞ্চ ১৯৯৬। ৫। পশ্চিমবঙ্গ শিল্প, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৯৭।

ওদিকে বোলতার চোখ বেন ঠেলে বেরিয়ে আসে ক্রোডাক্ত বাস্তবের পরম্পরাহীন খণ্ডচিত্রগুলি দেখতে দেখতে। বাস্তবের উৎস কি, কীভাবেই বা এর সৃষ্টি হল, পরিণতি কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে। সবই যেন এই চেনা লেখাটি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ শৈলীতে অন্তর্গত করে রাখছেন রচিত শরীরে,

যাতে এই বাস্তব বাববার আমাদের সচকিত করে। কিংবা বাস্তবেরই নটকীয় বিশ্লেষণ আমাদের ভাবনাগুলিকে উন্মুক্ত দিতে পারে। চমক আর চিন্তার অবিচ্ছেদ্য সহাবস্থান কখনো বা মানুষের ভেতরকার প্রতিক্রিয়াকে সংহত করে তোলে। এই সব রচনাগুলি যেন দেখাতে চায় কিভাবে প্রথমে ধীরে ধীরে, পরে ক্ষিপ্ত গতিতে ফ্যাসিবাদ ও বামপন্থী ফ্যাসিস্ট শাসন অসতর্ক জনগণকে শৃঙ্খলিত করে। এই ফ্যাসিবাদের অজুহাত, গতি, অছিলা, রূপ, বিন্যাস, ভাব, সময় আর স্থান কিভাবে ঘন ঘন পাশে নবরূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। কখনো তাঁর বাহন অস্ত্র জাঁতিছে, কখনো বর্ণ-গৌরব, কখনো ধর্মীয় মন্তব্য। কখনো চমৎকার হাসতে হাসতে তারা চালায় নিষ্ঠুর নিধন অভিযান।

অবিনাশ বললেন, চলো বেরিয়ে পড়া যাক।

৭

বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে অবিনাশ এগোচ্ছেন বাসটার্মিনাসের দিকে। এমন সময় একটি সফ হোয়াইট রঙের মার্কিট জেন তাঁর সামনে এসে খচ করে দাঁড়িয়ে গেল। যাচ্ছিল গাড়িটি, অবিনাশকে দেখে ভেতরে বসে থাকা মনু দত্তগুপ্ত বলে উঠলেন, আরে প্রফেসর অবিনাশ যে, কোথায় যাবেন? আসুন গাড়িতে উঠে আসুন, আমিই ছেড়ে দিচ্ছি—

অবিনাশ হাত জোড় করে নমস্কার করলেন প্রথমে, তারপর বললেন, ভালো তো? না, এমনি কাছেরি যাচ্ছি, গাড়িতে আর উঠছি না।

—বেশ, তবে বাড়িতে আসুন একদিন, ওপারের ইলিশের ব্যবস্থা থাকবে। হা হা কবে হাসলেন অবিনাশ।

—না মুখার্জি। গুল্লোগাছ হয় না অনেকদিন, আপনাকে দেখাতে নিয়ে যাব বজ্রবজের দিকে আমাদের কোম্পানির সাইট। চমৎকার একখানা বিস্তৃত বানিয়েছে। আর্কিটেকচারখানা দেখে তবেই না বলতে হবে কনস্ট্রাকশন ব্যবসায় আমার ওপর আর কাউকে আপনি বসাবেন কিনা—

এই বলে হাসলেন কোটি কোটিপতি মনু দত্তগুপ্ত। তারপর হাত নেড়ে স্টেট ড্রাইভ নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

অবিনাশ নিম্বুতি পেলেন। আজকাল এইসব বুড়ো, আধবুড়ো পুরনো কুবের লোকগুলোকে পারলে এড়িয়ে চলে। এদের নিশ্বাসে আছে বিষাক্ত হাওয়া, তার চেয়ে ভয়ঙ্কর বেছে বেছে মিশলে চোখে আর মনে ক্লোরোফিল এসে ঢোকে।

ছুটে আসছিল বাসটা, ফার্সি সেভেন-এ। হাত নেড়ে দাঁড় করাতে গিয়ে কণ্ঠকটবের হাতের টানে বাসে উঠে এলেন, একটা সিট খালিও আছে—গড সেভ্‌ড্‌। বসলেন জানলার ধারে। চলছে বাসটা টিকুতে টিকুতে। কখনো যেন যেতেই চায় না। দাঁড়িয়ে পড়ে যেখানে সেখানে, যদি একটা প্যাসেঞ্জার বেশি পাওয়া যায়। না থাকলে স্টপ দাঁড়িয়ে থাকে। ফুর্ক কোনো যাত্রী বলে ওঠে, কি, বাড়ি থেকে ডেকে আনবে নাকি? দাও হাঁক দাও। এত লোক হয়েছে বাসে তবু তোমাদের পেট ভরল না? বাস তবুও তথৈবচ, কণ্ঠকট বা ড্রাইভারের ঘুম ভাঙে না। ওদের ধারণা যেন যাত্রীদের কারো কোনো কাজ নেই, সবাই এই কলকাতা নামের মৃত ফসিল নগরটা ঘুরে দেখতে এসেছে সময়ের ধার ধারে না। সঙ্গে সঙ্গে চার পাঁচজন ফুর্ক যাত্রী এক হয়ে তাকে আক্রমণ করে, গাড়ি বার করেছ কেন, দাঁড় করিয়ে দাও একদিকে, নেমে যাই। দয়া করে নিয়ে যাচ্ছ নাকি? বাসে ওঠা মাত্র তো ভিখিরির মত হাত পাততে চলে আসবে, টিকিট-টিকিট। বাটি নিয়ে রাস্তার মোড়ে চলে যাও।

কণ্ঠকট আর কোনো কথা বলে না, চূপ করে থাকে। ওদিক থেকে ড্রাইভার তাকে ধায়—তোকে কে কথা বলতে বলেছে? বাসটা দাঁড়িয়ে থাকে ভুক্ষেপহীন তারপর চলতে থাকে কোনোদিকে। একজন যাত্রী আরেকজনকে বলছে, মশাই একটাকা দেড়টাকা করে যদি বছর বছর ভাড়া বাড়তে তো বসবাসই দায় হয়ে উঠছে। শালারা বলছে পেট্রলের দাম বেড়েছে, তাই....., কিন্তু গত দশ বছর পেট্রলের দাম বেড়েছে সাড়ে বারো পারসেন্ট আর বাসভাড়া বেড়েছে ছবিবশ পারসেন্ট। তাহলেই বলুন।

একথা শুনে যে যাত্রীটিকে শ্রোতা বিবেচনা করে অভিযোগ শোনানো হচ্ছিল। তিনি বলে উঠলেন, ওসব বাস ইউনিয়নের চেয়ারম্যানদের সঙ্গে মিনিস্টার সুভাষের সাঁট থাকে। ব্যাকডোর দিয়ে মন্ত্রীকে টাকা খাওয়াও। ভাগাভাগি হবে ইউনিয়নের কর্তাদের মধ্যে। তার মাসুল দেবে সাধারণ মানুষ। এদিকে বাসে না উঠে ইটলে মানুষ আগে পৌঁছে যাবে। টিকিটের দাম বাড়ায়, স্বেচ্ছায় দেব আমরা, কিন্তু সার্ভিসটা ভালো হোক। তোলবার সময় যেখানে হাত দেখাবে, দাঁড়িয়ে পড়বে, বেগড়বাই করবে নামানোর সময়। স্টপ পেরিয়ে চলে যাবে, যাত্রী-চিৎকার শুনেও বাবুদের হাঁস নেই। লাটসাহেব কিনা—

বাস এসে যেন পাকাপাকিভাবে দাঁড়িয়ে গেল শিয়ালদা এলাকায়। নড়নচড়ন নেই। এদিকে রাস্তাঘাট যে জ্যামজটে আটকে তাও না। এদের বলেও কোনো লাভ নেই। গায়ে গত্তারের চামড়া, শুধু ভাড়া বাড়ায়—

অবিনাশের কানে আসে এসব কথা। সত্যি ট্রান্সপোর্টের এ-রাজ্যে একেবারে বেহাল অবস্থা। সময়জ্ঞান নেই, পৌঁছে দেবে এইমাত্র, যদি পথিমধ্যে ব্রেকডাউন না হয়। যাত্রীদুর্ভোগের সীমা পরিসীমা নেই। দেবেই বা তারা কোথেকে। একে একে কল কারখানা বন্ধ হয়ে গেল রাজ্যে। শিল্পায়ন নেই বললেই চলে। শুধু বড় বড় বুলি। সরকারি চাকরিতে নতুন নিয়োগ প্রায় বন্ধ না হলেও কমে আসছে। স্বেচ্ছা অবসর নেওয়ার জন্য কর্মীদের গীড়াপীড়ি ছুটিছুটি বাদ। কাজের সময়সীমা বেড়ে গেছে। পুজো বোনাস অর্ধেক হবেই তো কি নিদারুণ অর্থ সংকট চলছে দেশে। ষাটের দশকে ট্রামের ভাড়া দু'পয়সা বেড়েছিল বলে তৎকালীন বিরোধী যুক্তফ্রন্ট দল ট্রাম পুড়িয়েছিল, জ্বালিয়ে দিতে ছেড়েনি বাস। জ্যোতি বসু সরকারে, একদিন পার্টি কমরেডদের সঙ্গে বাসভাড়া সংক্রান্ত বিষয়ে ওই নেতা বসলে বিক্ষোভ ফেটে পড়ছিলেন অবিনাশ প্রমুখরা। একটা বড় ঘরে ডায়ালিসে বসে কথা বলছিলেন—ঐ নেতা, সঙ্গীরা সব নিচে। অডিয়েন্সের মতো আয়োজন। যে যার চেয়ারে বসে। নেতা অবিনাশকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, দেখুন কমরেড, আমি যখন আপনাদের ওই জায়গায় বসতাম তখন আমিও প্রতিবাদ করতাম এভাবেই, যা আপনারা করছেন, করেও ছি তাই। কিন্তু আমি যে চেয়ারে বসে আছি সেখানে আপনাদের কাউকে বসিয়ে দিলে দেখবেন বাসভাড়া না বাড়িয়ে বা ওদের দাবী না মেনে উপায় নেই। সব অচল হয়ে যাবে। তবে হ্যাঁ, দু'পয়সা নাকি বেশ পয়সা—কতটা বাড়বে তা নিয়ে কথাবার্তা হতে পারে। অবিনাশের মনে পড়ে সব, এই ডিকটেক্টর নেতাটিকে তিনি চিনেতেন ভালোই, এখন অবশ্য জনগণও চেনেন। এখন ওই জায়গায় যিনি নতুন মন্ত্রী তাঁর কাজের ধারাটি অবশ্য একরকম নয়, দাপটটিও নেই সেই আদলে। এই যে সম্প্রতি মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কারের প্রসঙ্গে কথা বলে তাঁকে 'ওকথা বলিনি,' বলে পিছু হঠতে হয়েছে। এদিকে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের এবার অর্ধেক বোনাস দেওয়া হবে ঘোষণায় তো জল যোলা চলছেই। শিক্ষকদের টিউশন বা রিটার্নসের বয়স কত হবে তাই নিয়ে এই সরকারকে খেসারত খুব কম

দিতে হয়নি। এখন স্কুলপাঠ্যভেদে মার্জ-লেনিন চুকে গেছেন। সবেমিলে বেহাল অবস্থা। রাজ্য দেউলিয়া হতে বসেছে সে আর কে না বোঝে। আর তার যাবতীয় ঝক্কিঝামেলা সামলাতে হচ্ছে রাজ্যবাসীকে। যেন তাদেরই দোষ যেহেতু তারা এ রাজ্যের বাসিন্দা। সুতরাং তাঁর প্রায়শ্চিত্ত করা। এইসব সাত সাতেরো ভাবনাচিত্তার মধ্যে হঠাৎ বেজে উঠলেন অবিনাশ কণ্ডাক্টরকে লক্ষ্য করে, বাসটা পিজি হসপিটালের সামনে দিয়ে যাচ্ছে তো?

কণ্ডাক্টর ইতিবাচক ঘাড় নাড়লে কি হবে ততক্ষণ আরেকজন যাত্রী বলে উঠেছে স্বতঃস্ফূর্ত স্বরে, হসপিটালে যাচ্ছেন? তা যান। পড়েছেন কাগজে, বিধাননগর শিশু হাসপাতালে গতদিনে ১৪টি বাচ্চর আকস্মিক মৃত্যু হয়েছে?

অবিনাশ জানেন ঘটনাটা। সংক্রমণ থেকে। নাকি সুপার বলছেন, পরিকাঠামো বলতে হসপিটালে কিছু নেই। মন্ত্রী অবশ্য সেকথা অস্বীকার করেছেন পুরোপুরি ভাবে। বলছেন, পরিকাঠামোর কোনো অভাব নেই। এই মৃত্যু, এতগুলি শিশুর মৃত্যু নাকি স্বাভাবিক। সুপারকে প্রেসের কাছে উটোপাশটা মুখ খুলতে নিষেধ করা হয়েছিল গতকাল, আজ তাকে পজিসন থেকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কোনো শিশুর বয়স একদিন, কেউ একমাস বা ছদিন। অন্যান্য মা-বাবারা তাদের ভর্তি করে রাখা বাচ্চাকে হসপিটাল থেকে বিলিঙ্গ করে নিয়ে যেতে শুরু করেছেন। মহামারীর আকার নিচ্ছে সমগ্র ঘটনাটি। তুমুল হৈ-হটগোল চলছে চলছে চাপান উত্তোর। হসপিটাল থেকে হসপিটালে ব্যবস্থা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

অবিনাশ এই আলোচনায় যোগ না দিয়ে চুপ করে আছেন দেখে পূর্ববর্তী তাঁর কথার জের ধরে বলে উঠলেন, পিজি যাচ্ছেন, যান। সে তো কেবল বড়লোকদের আখড়া আর ইনফ্রুয়েন্সিয়ালদের মামাবাড়ি।

এই অভিযোগও মিথ্যে নয়। মারাত্মক অবস্থায় রোগীকে নিয়ে গিয়েও ফ্রি বেড খালি পাওয়ার উপায় নেই। ডি আই পি সুপারিশ না হলে চলে না। রাতে ডাক্তাররা ঠিকমতো ডিউটি তো দেবেনই না, নার্সদের বা অ্যাটেনডেন্টদের সঙ্গে কথা বলা দায়, এত তাদের দৈম্যক বা দাপট। ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন মতো ওষুধ অধিকাংশ সময় হসপিটালে তো থাকেই না। থাকবে কী করে? বিক্রি হয়ে যাচ্ছে সেসব যে ব্যাকডোর দিয়ে। তখন বোগীপক্ষ বাইরে থেকে ওষুধ কিনে নার্স বা দিদিমনিদের কাছে দিয়ে দেয়, যাতে রোগীর ওষুধের অভাবে অবনতি না হয়। দেখা যায় শতকরা চল্লিশ ভাগ ক্ষেত্রে সেসব ওষুধ রোগীর মুখে পড়েই না, কোথায় উবে যায়। ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটগুলি রাজনৈতিক ক্ষমতা বা যোগাযোগ না থাকলে মেলা ভার। ডি আই পি দের জন্য যে উডবার্ণ ওয়ার্ড সুরক্ষিত তাছাড়াও তাঁরা হাত বাড়ান সাধারণের জন্য ওয়ার্ডগুলিতেও। মোটকথা যোগাযোগ, ইনফ্রুয়েন্স না থাকলে ডাক্তারের দেখা মিললেও মিলবে রোগী মারা যাবার পর। এইবার বডি রিলিজ নিয়ে ঝক্কিঝামেলা পোয়াও।

অবিনাশ জানেন এইসব অভিযোগের একবর্ণও মিথ্যা নয়। কিন্তু কী করবে সাধারণ মানুষ। কী করতে পারে। যাদের পরসাকড়ি বা সঙ্গতি আছে তারা হয় নার্সিংহোম দেখে, নয় এ রাজ্য ছেড়ে দিল্লি মুম্বাই ছুটছে। ভেলোর জায়গাটার নাম সুচিকিৎসার জন্য এখন মুখে মুখে। অথচ নামিদামি ডাক্তারই বলো আব যন্ত্রপাতিই বলো কোনোকিছুই কি অভাব আছে এইসব প্রথম সারির হাসপাতালগুলিতে না থাকা উচিত?

বাস এসে দাঁড়িয়ে গেল চাঁদনিচক-ধর্মতলা এলাকায়। যেন দেহ রাখল, এমনভাবে স্টার্ট বন্ধ করে দিল ড্রাইভার।

কিন্তু থামেনি যাত্রী বচসা। কে একজন বলে উঠল, নাও চেলা এবার।

ব্যাকসিটে তিনচার জন লোক আলোচনা করছে আরো রসালো বিষয় নিয়ে। কোনো কাগজ নাকি লিখেছে—সিটি-ইনটাক নেতাদের হোটেল মেয়ে যোগানোর চুক্তির বাস্তবায়ন চলছে সমানে। দীঘার সমুদ্র সৈকতের পাশে ঝাউবনে গণ ধর্মবনের ঘটনা নিয়ে যখন গোটা রাজ্য উত্তাল ঠিক তখনই দীঘা মেচেদা সড়কের পাশে একটি বিখ্যাত হোটেলের থাকা গেস্টদের মনোরঞ্জন জন্ম মহিলা সরববাহের ব্যাপারে চুক্তি হল হোটেল মালিক এবং কর্মীদের মধ্যে। চুক্তির সময় উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সিটি এবং আই এন টি ইউ সি নেতারা। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সম্পাদিত এই চুক্তির ফলে হোটেলগুলিতে অতিথি হয়ে আসা মানুষেরা প্রয়োজন অনুযায়ী স্মার্মিথ এবং তার থেকে আরো বেশি কিছু পাবেন ‘সববরাহ’ করা তঞ্চনীদেব কাছ থেকে।

হাসির কথাই বটে। তারা বলছে আর হা হা হাসছে।

অধিকাংশ যাত্রীই কিন্তু অবিনাশের মতো প্রায় চুপ করে বসে ক্ষণ গুনছে কখন পৌছবে। কথা বলে আর কি হবে।

—কেউ কেউ অবশ্য ভাবে, না বলে বলেই ওদের এত বাড়, পেয়ে বসেছে ওরা। ভাবুন তো মশাই, ভারতের মধ্যে সমস্ত বিষয়ে যে রাজ্যটিব অবস্থা প্রায় সবচেয়ে শোচনীয় তাব নাম পশ্চিমবঙ্গ। ভূণ অবস্থায় শিশুহত্যা থেকে শুরু করে কি বেকাবত্ত, কি করাপসন, এমনকি আত্মহত্যাতেও সেবা। রাগ হয় না বলুন, ইচ্ছে হয় না ফেটে পড়ি?

বাস টার্গ নিলে সবাই চুপ কবে গেল, তাকাল বাইরের দিকে। হয়ত দেখার ইচ্ছে রাস্তাঘাটের হাল কী।

সেই বুড়ো ভদ্রলোক কিন্তু নিজেব মধ্যেই গজরে চলেছেন, বাসে ট্রামে মেলায় দেখছি লোকজন ওদের পার্টির নামে বিবোধগার করেছে চলেছে। শাপশাপান্তি করছে। অথচ ভোটের পরে দ্যাখো ওই ব্যাটারাই জিতেছে। জিতবে না? ওদের সঙ্গে পেবে ওঠে কার ক্ষমতা আছে। দ্যাখো ভোটের লিষ্টেই মেরে রাখে। যাদের ঘরে ভোট নেই, বাদ পড়েছে পাঁচ-সাতজন করে। যাদের আছে তাদের ল্যাণ্ডপাণ্ডা বালকবালিকাটি ছড়া মৃতরাও ভোটের হয়ে আছে এখনো। এমনকি গক ছাগল হাঁস মুরগিবাও সে বাড়িতে ভোটের। তারপর ছাগা ভোট, বুথ জ্যাম, মার্শি ভোটটিং, বাস্তবদল এইসব তো আছেই। আমাদের এলাকার এম এল এর নাম প্রবীণ সেন, লোকে অবশ্য তাকে রিগিং সেন বলেই ডাকে, হা-হা-হা—

বাস কণ্ডাক্টর আর থাকতে না পেরে বলে উঠল, আপনি থামুন তো মশাই। যাদের কথা তাদের কাছে বলুন গে—

কেন বলব না। একশো বার বলব। কথা বলাও মানা নাকি। নাকি কারো ভাষে সোঁটিয়ে আছি গর্তে?

সবাই আহা আহা করে ওঠে। ছেড়ে দিন মশাই। কি আর করবেন একবার যখন নরকে এসে নাম লিখিয়েছি তার থেকে উদ্ধারেব আশা জলাঞ্জলি দিতেই হবে। অশান্তি করে কী লাভ বলেন। তাব চেয়ে চুপ করে যান। শালারা চালাতে ইচ্ছা করলে চালাক, না চাইলে না চালাক। টিকিটভাড়াটা আমরা না হয় ভাবব অন্যথ আতুরকে দান কবে দিয়েছি—

রবীন্দ্রসদনের কাছে এসে পৌছতেই টুপ করে বাস থেকে নেমে পড়লেন অবিনাশ। তারপর দ্রুত পায়ে হাঁটা দিলেন হবিষ মুখার্জি রোড ধরে একেবারে শেঠ সুখলাল করনানি মেমোরিয়াল হসপিটাল লেখা প্রধান গেট দিয়ে।

কিন্তু মেইন বিল্ডিংয়ের সামনে এসে তিনি হঠাৎ হাঁফাতে শুরু করলেন। জটলা দেখলেন। দৌড়ে এল অসমঞ্জ। এল দেবেশ আর বিবেক দু'জনেই। বিবেক বলল, শেষ রক্ষা হল না স্যার—

অবিনাশকে রক্তশূন্য বলে মনে হল। পাথরের মতো চূপ—

বিবেক কাশল একবার গলা বেড়ে, ওই যে ওরা বডি নিয়ে যাবার জন্য

ভেরি—

অবিনাশ তাকিয়ে দেখলেন, কাঁদছে কেউ। কেউ ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা খুলে ম্যাটাডোর ভ্যানটি সাজাচ্ছে ফুল ও ধূপ দিয়ে।

বিবেক বলে উঠল, ভোর সাড়ে ছটায়— ডাক্তারকে ডেকে ডেকেও সাড়া পাওয়া গেল না। অস্ত্রজেনের অভাবেই—

—সে কী! অবিনাশ চোখ ওপরে তুলে আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

অসমঞ্জ বলে উঠল, না স্যার। ঠিক অস্ত্রজেনের অভাবে নয়—

বিবেক বলল, তুমি ভালো জানো? তুমি তো সকাল নটার সময় খবর পেয়ে তবে এলে। আমি ছিলাম সারারাত। রোগীর অবস্থা খারাপ পেশেন্ট পার্টিদের ডাকেনি পর্যন্ত। আসলে যড়যন্ত্র করেই মেয়ে ফেলল ওরা—

—বিবেক সবটাতেই তুমি যড়যন্ত্র দেখতে থাকো। স্যার, সোমনাথবাবু মারা গেছেন মাইন্ড হার্ট অ্যাটাকে। ভয় তাঁর মধ্যে ডিপ্রেসনের সৃষ্টি করেছিল—

বিবেক গর্জে উঠল, মিথ্যে কথা। সোমনাথ রায় ভয় কাকে বলে জানতেনই না। কেন তার নামটাকে রুলুযিত করার চেষ্টা করছ?

অসমঞ্জ ক্রোধে দাঁড়ায়, কী বলতে চাস তুই?

অবিনাশ থামলেন, থামবে তোমরা? নাকি মারামারি করবে এখন নিজেদের মধ্যে। তোমরা পারোও বটে। এই বলে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে দেবশের দিকে চেয়ে বললেন, কোথায় আছেন, নিয়ে চলো তো ভাই একবার আমাকে।

গিয়ে দেখলেন, লোকটা শুয়ে আছে নিখর হয়ে, সাদা চাদর ঢাকা। দেকেশ মুখের ঢাকাটা একবার খুলে ফের ঢেকে দিতেই অবিনাশ মুহূর্তের জন্য দু'হাতে নিজের চোখমুখ ঢাকলেন। এই বয়সে কান্না আর আসে না অন্তরে গরজায়। এই তো পরশুদিন যখন দেখতে এসেছিলেন তিনি, সোমনাথদা হাতদুটি ধরে বললেন, যদি না-থাকি ভাই, ছোট মেয়েটাকে আমার দেখা তোমরা। মা মরা মেয়ে। জানো তো, সেবার কলেজ থেকে ফেরার পথে ওকে তুলে নিয়ে গেল। শারীরিক অত্যাচার হওয়ার পর ও যখন পুলিশের কাছে সবকিছু কবুল করল তার কদিন পরে ফের ওরা চড়াও হয়ে ওর জিভখানা চাকু দিয়ে নামিয়ে দিল দিনের আলোয়। সবার চোখের সামনেই। একটা লোকও তার প্রতিবাদ করস না।

সবই জানেন অবিনাশ। বললেন, কিন্তু আপনাকে তো দিব্যি সুস্থ দেখাচ্ছে দাদা। কেন দুশ্চিন্তাকে মনে ঠাই দিচ্ছেন?

—না ভাই। জানো তো, প্রদীপ নেভার আগে উজ্জ্বল শিখায় জ্বলে ওঠে।

সোমনাথবাবুর সেই কথাটাই তাহলে অন্ধরে অন্ধরে ফলে গেল। বেরিয়ে এলেন অবিনাশ। আর অপেক্ষা না করে, উপস্থিত আত্মীয়দের জেলেমেয়েদের সাধুনা বা সহনুভূতি সূচক কথা না বলে অযথা, মাথা নিচু করে ফের চত্বর থেকে বেরিয়ে এসে বাস ধরলেন।

এবার আর হৈ হল্লা কানে এল না তাঁর। বাসের সিটে জায়গা না পেয়ে দাঁড়িয়েছিলেন প্রথমে, একজন উঠে গেলে বসলেন। তারপর কিসের যেন চিন্তায় বা ভাবে বিভোর থেকে কখন এসে পৌঁছে গেলেন বাড়িতে।

সোমনাথ রায় একজন দৃঢ় ও সচ্চিন্ত মানুষ ছিলেন। মুহাম্মান হয়ে রইলেন তিনি।

অনেকক্ষণ কেটে গেছে, সংবিত ফিরল, যখন সরযু এসে সুইচ টিপে

আলো জ্বালিয়ে দিল। বলল, কী হয়েছে সেজদা? নটা বেজে গেছে, ঘরে আলো জ্বালানি, তুমি যে ফিরেছ সে কথাও কাউকে জানতে দাওনি—

—শরীরটা ঠিক ভালো মনে হচ্ছে না।

—কেন?

—না, এমনি। তুই এখন যা। আমাকে একা থাকতে দে।

সরযু চলে গেলে অবিনাশ ফের চূপ করে শুয়ে রইলেন শুধু রাতের ডুম লাইটখানা জ্বলে।

এমন সময় কিরিং কিরিং ফোনের আওয়াজ। উঠে গিয়ে ধরলেন, হালো —। বলছি—

ওদিক থেকে জেলাকমিটির পার্টি সম্পাদক বললেন।

অবিনাশ বললেন, না, আমি তো এমন কিছু করিনি যাতে আপনি আমাকে বলতে পারেন। পূর্ববৎ নীরবতাই আমার সঙ্গী।

ও প্রান্ত থেকে কী কী কথা আসতে লাগল—

অবিনাশ বললেন, বক্তৃতায় আমি এসব বলিনি, কেনই বা বলতে যাব, আমি বলেছি, উই আর পাসিং ইনটু দ্য ডেনজারাস টাইম থু আউট দ্য ওয়ার্ল্ড। যিনি বলছিলেন তিনি আরো কি কি বলেই চলেছেন।

অবিনাশ বললেন, দাদা, আমার শরীরটা আজ ঠিক ভালো নেই। পরে কথা হবে। রাখছি। এই বলে প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করে রেখে দিলেন রিসিভার।

৮

দিন তিনেক পরে খবরটা জানাজানি হল। খবর কাগজে ছাপা হয়েছে বড় করে, ছবি দিয়ে। অসমঞ্জ ছুট এল প্রথমে। সঙ্গে বোলতাও আছে।

তমোনাশ মুখার্জি ভাবলেশহীন চোখে বসেছিলেন বৈঠকখানার দাওয়ায়। অসমঞ্জ বাড়ির মুখে ঢুকেই জিজ্ঞাসা করল, কী করে হল?

তমোনাশ বললেন, আমি কিছু জানি না ওই সরযুকে জিজ্ঞাসা কর।

একটু আগে বিবেক এসে ফিরে গেছে।

অসমঞ্জ বলল, মিসিং স্কোয়াড, মর্গ ঘুরে দেখা হয়েছে? পুলিশকে জানালেন কখন?

তমোনাশ বললেন, পুলিশ এসেছিল সদলবলে।

সরোজিনী বললেন, ওঁর শোবার ঘর আর স্টাডিরুম ভালো করে দেখে গেছে পুলিশ। তেমন কিছু পায়নি যার ভিত্তিতে অনুসন্ধান এগোতে পারে।

এতক্ষণে সরযু বলল, তন্নতন্ন করে খুঁজেছে। আমি ছিলাম তখন।

বোলতা বলল, কী করে ঘটল এমনটা, বলো তো সরযু পিসি। কাগজ পড়ে তো কিছু বোঝার উপায় থাকে না। কেউ লিখেছে অ্যালজাইমা থেকে ওবলিভিয়ন।

অসমঞ্জ বলল, —অবিনাশ মুখার্জির নাকি সিজোফ্রিনিয়া ছিল। একটা প্যারানয়েড সেইপ। অ্যালজাইমা থেকে যে বিন্মৃতির কথা তুমি বলছ তা অসম্ভব। আমি ষতটা জানি—

—আমি বলছি না, ওঁর মেডিকেল রিপোর্টে নাকি তাই পাওয়া গেছে।

তমোনাশ বললেন, না না, ওসব কাগজে গালগল্পো ছাপা হয়েছে। কিছু ছিল না। থাকলে আমরা জানতাম না? ক'মাস আগে খাদিমকর্তা পার্থ রায় বর্মণকে অ্যাবডাকশন করে নিয়ে গিয়েছিল বেমালুম, তার আগে এক্সাইডের সত্য মুখার্জিকে। সে রকম কিছু যদি—

অসমঞ্জ বলল, কিন্তু স্যারকে কেন অ্যাবডাকশন করতে যাবে? করে কি

লাভ। সে রকম মুক্তিপণ দাবী করেও যদি কোনো হুমকি আসত, তাও না হয় বোঝা যেত। তাও তো আসেনি, নাকি?

তমোনাশ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, না।

বোলতা বলল, আচ্ছা এমন কি হতে পারে, স্যার স্বেচ্ছায় সব ছেড়েছুড়ে—

সরোজিনী বললেন, তা কেন হবে। এখানে তার কীসের অভাব ছিল?

তমোনাশ বললেন, কই কখনো তেমন ভাব প্রকাশ করেনি অবু।

সরযু বলল, হতেও পারে। বৃহস্পতিবার সারাদিন টানা বৃষ্টি আর ঝড় ছিল, জানোই তো।

অসমঞ্জ বলল, হুম!

—সারাদিনই সেজদা ঘরে বসে লেখাপড়ার কাজ করেছে। সন্ধ্যাবেলায় যখন বৃষ্টি একটু ধরে এল তখন এখানে লোডশেডিং। পায়জামার ওপর একখানা ঘরে পরা শার্ট গলিয়ে চম্পল পায়ে দিয়ে বেরলো দেখলাম। বলে গেল, চা করে আন তো। আমি এফুনি আসছি।

সবাই চুপ হয়ে জানা গল্পই আবার শুনছে।

—সেই যে গেল, তো গেলই। আজ অঙ্গি দেখ না—বলতে বলতে ডুকরে কেঁদে উঠল সবযু।

অসমঞ্জ বলল, কোনো আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে?

বোলতা বলল, কী যে বলো তুমি, উনি কি আত্মীয়বাড়ি গিয়ে বসে থাকার লোক?

তমোনাশ বললেন, খোঁজার কোনো ক্রটি রাখিনি ভাই। যে যেখানে ছিল, চেনা-পরিচিত। বিবেক ছেলটোও প্রাণ হাতে করে ছোট্টাছুটি করেছে। এমনকি মেদিনীপুর আর গড়বেতা থেকে ফিরে এসেছে কাল, সেখানে যদি—

একটা ফোন এল কিরিং করে। কেটে গেল।

ফের এল, কিরিং কিরিং কিরিং...

সরযু দৌড়ে ধরতে গেল। ধরা মাত্র ডিসকানেকশান হয়ে গেল। সে বলল, অসমঞ্জের দিকে তাকিয়ে, এরকম একটা ফোন রোজই আটদশ বার আসছে আর ধরার আগেই কিংবা পরপরই কেটে যাচ্ছে। কেমন বিরক্ত লাগে বলো দেখি—

সবই চুপ। বোকার মতো সরযু কেঁদে কঁকিয়ে উঠল বোলতার দিকে চেয়ে,— দিদি গো, সেজদা আবার ফিরবে তো, নাকি—

তমোনাশ রেগে ধমকে দিলেন তাকে, থাম তো তুই। কেঁদে কি হবে, হ্যাঁ? কাঁদলেই ফিরে আসবে—

বোলতা নরম চোখে তাকায় এই অধশিক্ষিতা পরিচারিকার দিকে।

অসমঞ্জ বলল, ডায়রি বা এফ আই আর করা হয়েছে থানায়?

সরোজিনী বললেন, সে কি আর করতে বাকি আছে ভাই।

—আচ্ছা জেঠিমা, ওঁর কি কোনো বড় রকমের শত্রু ছিল কখনো?

—শত্রুতা তো লোকে করে থাকেই ভাই কিন্তু তেমন কেউ কই শুনি নি তো কখনো।

তমোনাশ বললেন, থানা থেকে আজও দু'বার ফোন এসেছে। কিন্তু সবই ইউজলেশ। সব অকর্মার বাসা।

তারপর আবার সবাই চুপ করে গেল। যেমন মাঝে মাঝে নেমে আসছে অচিন নৈস্কন্ধ। কী কথাই বা হবে, সব তো হয়ে গেছে।

৯

প্রায় মাসখানেক কেটে গেছে। এমনি একদিন দুপুরবেলা বোলতা ক্লাশ

নিয়ে টিচার্স কমনরুমে ঢুকে দেখল সবযু বসে আছে।

বিস্মিত স্বরে বলে উঠল, সরযু পিসি—

তোমাব সঙ্গে একটু কথা ছিল ভাই—

সরযুকে নিয়ে মধুরিমা অন্য একটা ফাঁকা ঘরে গিয়ে বসল। সার সার-বেঞ্চ পাতা। ঘর খালি। তারই একটিতে বসে বলল, কী ব্যাপার বলো দেখি?

শাড়ির আঁচলের খুঁট থেকে একখানি ভাঁজকরা ইনল্যাণ্ড লেটার বোলতার হাতে দিল সে। বোলতা খুলে দেখল। সরযুকে লেখা, গত সপ্তাহের তারিখ। লিখেছেন অবিনাশ—

খুশিতে উছল উঠে বোলতা সরযুকে জড়িয়ে ধরে।

সরযু বলে, পড়ে দ্যাখো।

বোলতা পড়তে থাকে—সরযু, নিজের ঠিকানায় কাউকে না লিখে তোকে তোরই বাড়ির ঠিকানায় লিখছি, কারণ সেটাই নিরাপদ মনে হল। আশা করি বাড়ির সকলেই ভালো আছে। আমি ভালো আছি। চিন্তা করিস না, কিন্তু বিপদের মধ্যেই আছি। এর বেশি এখন লেখা যাচ্ছে না। পুলিশ আসতে পারে, আমার ঘর বা স্টাডিরুমও তছনছ করতে পারে। ওই ঘরে খাটের নিচে বসানো একটা লুকানো ড্রয়ার আছে, তোর জানার কথা। সেই ড্রয়াবে আমাব লেখা নতুন বইটির পাণ্ডুলিপি প্রায় চারশো পৃষ্ঠার মতো ফাইলবন্দী হয়ে আছে। ওটা ওরা খুঁজছে। আমাদের বাড়ি নিরাপদ জায়গা নয়। তুই ওটা নিয়ে সতর্কতার সঙ্গে বোলতার কাছে দিয়ে আসবি। অসমঞ্জ, বিবেক বা দেবেশ—এদের কাউকে দিবি না। আমি হয়ত আর কিছুদিনের মধ্যেই ফিরে যেতে পারব। যদি পারি তবে বোলতার কাছ থেকে চেয়ে নেব। যদি না পারি তবে তার উপযুক্ত ব্যবহার বোলতাই কবতে পারে। সে সাহস ওই মেয়ের আছে, আছে বুদ্ধি, একথা বিশ্বাস করি। রচনার মর্যাদা সে বোঝে। তুই এই চিঠি বোলতাকে দেখাবি, দাদা, বৌদিকে দেখানোব দরকার নেই। শুধু বলবি দৃষ্টিশ্রুতা না করতে। খোঁজ করারও দরকার নেই। ঘোলাজল খিতিয়ে আসুক। আমি নিশ্চয় ফিরব, আমার স্টাডিকমটি তোর দায়িত্বেই রইল। ভালো বই বা একটি কাগজও যেন খোঁয়া না যায়। চিন্তা করিস না, সবাই ভালো থাকিস। চিঠিটি পড়ে বোলতা সরযুর হাতে দিল।

সরযু এগিয়ে দিল দড়ি বাঁধা একটা তাবড়া ফাইল। ঈশ্বরের প্রসাদ বা অঞ্জলি দেওয়ার ফুল যেমন লোকে পুজারীর কাছ থেকে দুইহাত এক করে আঁজলা ভরে নেয়, তেমনি ভাবেই বোলতা ফাইলটি নিল, কোনো প্রশ্ন না করেই। তারপর সরযুকে বলল, চলো পিসি, ক্যান্টিনে বসে চা খাওয়া যাক। এখানে খুব ভালো সিঁজাড়া কচুরি করে। খাবে গরম গরম।

শারদীয় পরবর্তী সংখ্যাটি নভেম্বর-ডিসেম্বর যৌথ সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হবে। এই সংবাদে যাদের হৃদযন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়ছে তাঁদের জন্য সংবাদ-চিকিৎসা

পত্রপাঠ, পুজো সংখ্যা ছাড়া কখনো যৌথ সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হলেই গ্রাহকদের পুনর্নবীকরণও একমাস পিছিয়ে যাবে। অতএব পাঠকদের লোকসান হবার কোনো রাস্তাই নেই।

* এই চিকিৎসা সম্পূর্ণ ক্রিমুল্যে। ভবিষ্যতেও এর জন্য কোনো মূল্য ধার্য করা হবে না।

আমার ছোটভাই কমিউনিস্ট হয়েছিল। এক বন্ধুর বউকে ফুসলে এনে বিয়ে করেছিল। আমি একটু গুঁইগাঁই করেছিলাম। আমাকে বলল, তুই কি বুঝবি— ‘যৌথ খামার’? ভাইয়ের সেই যৌথ খামার এখন ভাইয়ের বসের খামারে চরছে। ভাই অফিস থেকে ফিরে ‘স্বামী অভেদানন্দ’ পড়ছে আর রুটি করছে।

লালা

দিব্যলোচন কলমধারী



পু কুরের মাছকে কড়ায় ছাড়লে যেমন হয়, আমার তেমনি হয়েছিল ইকুলে ভর্তি হয়ে। একদিন একটা ছুলা এসে আমাদের চোকির তলায় একটা ছানাকে মেরে হাড় চিবিয়ে চলে গেল। ওই ঘটনায় আমি একটু অ্যাবসেন্ট মাইণ্ডেড হয়ে পড়লাম। সেই ফাঁকে ছোড়দিদা আমাকে কুমুদিনী ইকুলে ভর্তি করে দিয়ে এল। নগদ পঁচিশটা টাকা খরচা করে ছোড়দিদা আমার অমন সর্বনাশ যে কেন করেছিল তা আজ বুঝতে পারিনি।

এবার লোলোর মায়ের কথা বলি। বলা খুবই রিক্স। তাই লিখি। উচ্ছের আড়তদারের মেয়ে। হাটের ছোর হাতুড়ির মতো। পাড়ার দাদা, থানার দারোগা—কাউকে তোয়াক্কা করে না। ছোটবেলায় ছ’দিন ইকুলে গিয়েছিল। হেড দিদিমনির আঁচল দিয়ে দিদিমনির গলায় প্যাচ লাগিয়ে ইকুল ছেড়েছে। চোদ্দ বছর বয়সে আমাকে বধ করতে এল। আমার বাবাই সাজিয়ে নিয়ে

বলার মধ্যে বলেছিলাম, তোমার কড়ে আঙুলটা কী সুন্দর! এ রকম কড়ে আঙুল জীবনে দেখিনি। তারপর ফুলশয্যা ছেড়ে দু’দিন উঠতে পারিনি। স্যালাইন চলেছে।

এলেন। আমরা গ্রামের ছেলে। কুড়ি বছর বয়সের যৌবনে তখন হাজাকের আলো। খামচে লম্পো করে দিল। বলার মধ্যে বলেছিলাম, তোমার কড়ে আঙুলটা কী সুন্দর! এ রকম কড়ে আঙুল জীবনে দেখিনি। তারপর ফুলশয্যা ছেড়ে দু’দিন উঠতে পারিনি। স্যালাইন চলেছে। সেই থেকে আমি অবশিষ্ট যৌবন শুটিয়ে গার্ডার দিয়ে রেখে দিলাম। ঝাপসা প্লাস্টিকে পুরনো অ্যাডমিট কার্ড, গ্যাসের কাগজ যেমন থাকে।

এর বছর চারেক বাসে লোলো হল। ল্যাংচাচ্ছে। এই বারো বছর বয়সে হাঁটছে না হামাগুড়ি দিচ্ছে, তা বোঝা যাচ্ছে না। বাবার গার্ডার দেওয়া

যৌবনের দোষে ছেলের স্প্যাসটিক হল। অনেক চেষ্টা করেছে। জাগতিক, অতিজাগতিক, ভৌতিক, আধাভৌতিক, গ্রহ, ধূমকেতু, অশ্বগচ্ছা, ফেণ্ডই, মোষবলি। কিছুতেই কিছু হল না। এমনকি চারবেলা ইবদুফ উচ্ছের রসও ফেল মেরে গেল। উন্টে আমার টয়লেটে বিদ্যুটে গন্ধ হয়ে গেল। ডাক্তার বলল, উচ্ছের পারঅক্সাইড। বীরাম্পন থেরাপি করতে হবে। সেটা কি? ছ’মাস তলপেটে চন্দনকাঠ ঘষুন। যাকে বলে ‘ভায়োলেন্ট রাবিং’। আমি শুরু করলাম। আমার তলপেট ধসে যাবার জোগাড়। মাঝে মাঝে বিস্তী হাততালি দিয়ে ফেলছি। আগমনী সুর। আমার কলঘরের কেচ্ছা হলঘরে আসার আগেই রণে ভঙ্গ দিলাম।

মা ছোটভাইকে জন্ম দিতে গিয়ে মারা গিয়েছিলেন। বাবা আমাকে বিয়ে দিতে গিয়ে গেছেন। লোলোর মাকে দেখতে গিয়ে উচ্ছের বরফি খেয়ে ফিরলেন। তারপর যখন বেরোলেন তখন শ্মশানে গেলেন। মেয়ের বাবাকে কথা দিয়ে এসেছিলেন। তখন আমাদের মধ্যে বাবার দেওয়া কথা অমান্য করার রেওয়াজ ছিল না। এখন হয়েছে। ছেলেকে না জানিয়ে গৃহশিক্ষককে কথা দিয়ে এসে পাশের বাড়ির রায়মশায় সেদিন ছেলের হাতে পড়ে গেলেন। সে কী আড়ং ধোলাই! উঠানে ফেলে বুকের ওপর কুচকাওয়াজ। পাড়ার প্রতিটা বাড়িতে রায়বাবুর আওয়াজ গেছে। কে আবার পরদিনই সেই ছেলেকে মূল্যবোধ বোঝাতে এসেছিল। তাকেও প্রচুর মূল্য দিতে হয়েছে। রিক্সায় এসে অ্যাম্বুলেন্সে ফিরতে হয়েছে। আমার ছোটভাই কমিউনিস্ট হয়েছিল। এক বন্ধুর বউকে ফুসলে এনে বিয়ে করেছিল। আমি একটু গুঁইগাঁই করেছিলাম। আমাকে বলল, তুই কি বুঝবি— ‘যৌথ খামার’? ভাইয়ের সেই যৌথ খামার এখন ভাইয়ের বসের খামারে চরছে। ভাই অফিস থেকে ফিরে ‘স্বামী অভেদানন্দ’ পড়ছে আর রুটি করছে। আমার ছেলেকে নিয়ে চিন্তা নেই। ডান-বাম কোনোদিকে ভিড়তে পারবে না। এদেশে অনুপ্রবেশকারীদের পুনর্বাসন হয়। স্প্যাসটিকের হয় না। বোজা নালা সোজা করতে কোটি টাকা বরাদ্দ হয়। স্প্যাসটিকের লালা বন্ধ হয় না। আসলে লালা দিয়ে নোট গোনা যায়। কিন্তু নোট দিয়ে লালা মোছানো যায় না।

সাহিত্য দুঃসংবাদ

তিলোত্তমার বসুধারা রসধারা

তিলোত্তমা মঞ্জুন্দার নামক জনৈক লেখিকা সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছেন। আনন্দবাজার গোষ্ঠী এই আবিষ্কার-গৌরবের অধিকারী। তাঁহার রচনায় আনন্দবাজার গোষ্ঠীর পত্র-পত্রিকায় একেবারে ঝাঁড়ঝাড়ির বান ডাকিয়াছে। মাস দেড়েক পূর্বে তিনি দেশ পত্রিকায় “বসুধারা” নামক একটি ধারাবাহিক উপন্যাস রচনা সমাপ্ত করিয়াছেন। এই উপন্যাসের খাঁজে খাঁজে এত রস যে, ইহাকে রসগোল্লার পেঁদায় একটি কড়াই বলিলেও চলে। আনন্দবর্ধন কিংবা অভিনব গুপ্ত এমন আনন্দবর্ধক ‘রসময়ীর রসিকতা’ আবিষ্কার করিতে পারেন নাই।

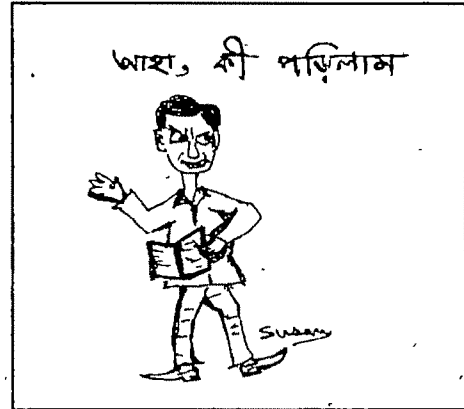
একদা বটতলার সাহিত্য বলিয়া একপ্রকার বস্তু ছিল, তাহা পড়িয়া নবীনরা উচ্ছন্ন-যাইত এবং প্রবীণেরা প্রচ্ছন্ন যৌবনাবাগে টাল খাইতেন। বৃদ্ধদের বসুর রাতভোর বৃষ্টি ও সমরেশ মজুমদারের প্রজ্ঞাপতি বা বিবর-এ কেহ কেহ বটতলার ভূতকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। এবং কোনো কোনো প্রাচীনপন্থী এই আশঙ্কায় ছিলেন যে বটতলার ভূত কোনদিন না জাগ্রত হইয়া পড়ে। কিন্তু তাঁহাদিগের দৃষ্টিভঙ্গির আর কারণ নাই। এই লেখিকার কলম-নিঃসৃত ধারা দেখিয়া শুধু বটতলা কেন, কেওড়াতলা শেওড়াতলা—সকলেই মুক্তকণ্ঠে হইয়া নিরুদ্দেশ পাড়ি দিবে। কালীমন্দির হইতে শিবমন্দির, শয়ন মন্দির হইতে সিনান মন্দির—সর্বত্রই দেহরস ও বৌনরসের যে প্রাবন বহিয়াছে, প্রলয়কালে সমুদ্রও বুঝিবা ততটা পারিবে না। ইহাকে আদিরস বলিলে ভুল হইবে, ইহা একপ্রকার খাদিরস; সম্পূর্ণ দেশীয় প্রণায় প্রস্তুত কিনা। উঠতি তরুণ-তরুণীদিগকে রসাতলে যাইবার জন্য আর অঙ্ককারে নিষিদ্ধ পর্ণোগ্রাফি কিনিতে হইবে না। এবং উৎসাহী প্রবীণের আর কবিরাজি মৃত সঙ্ঘীবনীও দরকার পড়িবে না।

এক তালেবর লেখক নাকি মস্তব্য করিয়াছেন—দারুণ লিখেছে। ভালোই তো। আমরা যা করতে পারিনি ও তা করে দেখাচ্ছে। তাঁহাকে তালেবর না বলিয়া কেহ কেহ তালকানা বলিতেছেন। আমরা এই নিম্নকদিগের চরম নিন্দা করি।

গুনা যাইতেছে লেখিকা শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় আর একটি

উপন্যাস ছাড়িয়াছেন। তাহা নাকি আরো সরেস। পড়িবার দুর্ভাগ্য এখনো হয় নাই। সে না হউক, একটি পড়িয়াই আমরা বিলম্ব লেখিকার ভক্ত হইয়া পড়িয়াছি। কবে ঘরে ঘরে তাঁহার ছবি পূজিত হইতে দেখিব— সেই অপেক্ষায় আহা আরো ত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠ যাত্রার দশা যাহাকে বলে। আহা, কতদিন পরে একজন আসিয়াছেন। ভক্তবৃন্দ আইস, আমরা সোম্মাশে ‘হরিবল’ দিই।

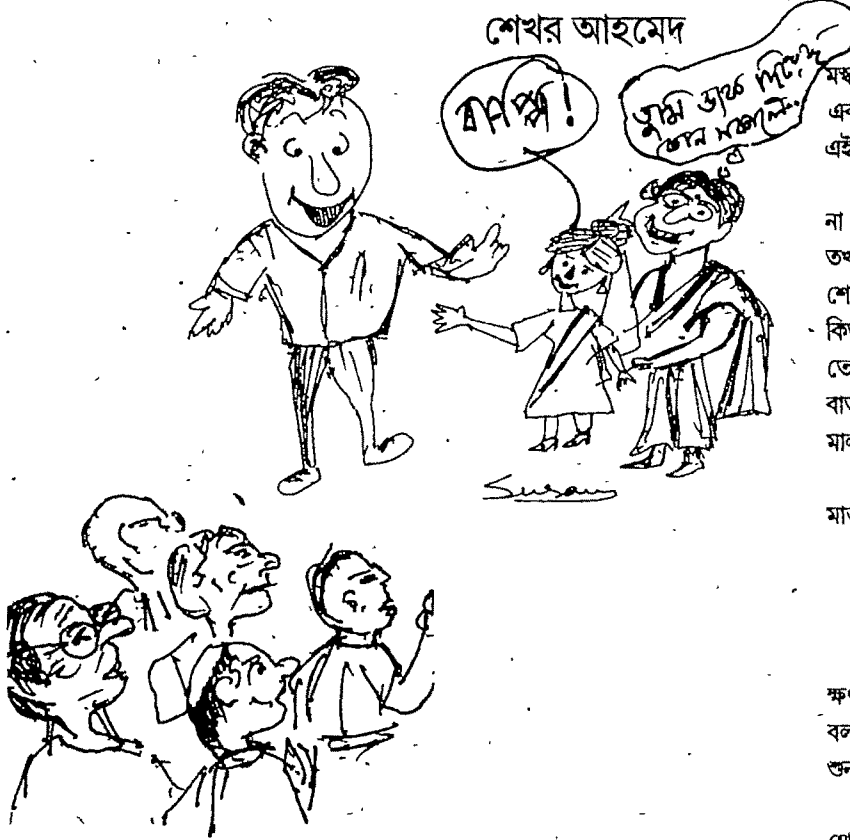
—ভূতলেন্দু ভৌমিক



তিনি দেশ পত্রিকায় “বসুধারা” নামক একটি ধারাবাহিক উপন্যাস রচনা সমাপ্ত করিয়াছেন। এই উপন্যাসের খাঁজে খাঁজে এত রস যে, ইহাকে রসগোল্লার পেঁদায় একটি কড়াই বলিলেও চলে।

(এই পত্রপত্রটি পড়িয়া কমপক্ষে ১০০টি হ্যাণ্ডবিল ছাপীয়া আপনার প্রতীবাসি ও বন্ধুবান্ধব মোহলে কিম্বা ইন্সটেশনে জাতদিগের মধ্যে বিলি করিবেন। অমুক গেরামের অমুক এইটি পাঠ করিয়া ১০০০ কপী পত্রপত্র ছাপীয়া বিলি করেন। জাতদীনের মাথায় তিনি লটারীতে ৫ লক্ষ টাকা পুরস্কার পান। অমুক খুব দ্রুত ছিলেন, এখন গাড়ী-বাড়ী করিয়াছেন। তমুক বিবাসি তমুক এই পত্রপত্র পড়িয়া অবহেলা করিয়া ফেলিয়া দেন। তিনদীনের মাথায় তাঁহার পুত্র সাপের কামোড়ে মারা যায়। বুঝিয়া কাজ করিবেন।)

১০ম বিচ্ছেদ বার্ষিকী



শেখর আহমেদ

বাপ্পা!

সুখ ডাঙা দিচ্ছে

মক্ষরা। আর থেকে থেকে চেপে ধরা সামস্তকে—
একটু ঝেড়ে কাশো তো বাপু! অ্যাদিন বাদে কেন
এই আয়োজন?

এতজনের সম্মিলিত আক্রমণে সিটিয়ে যান
না মোটেই, আবারও সেই মিটিয়ে হাসেন সামস্ত।
তখন নুটু বাঁড়ুয়ে কিঞ্চিৎ ঢলা গলায় বললেন,
শোনো সামস্ত, মাল খাব, মাল খেয়ে টালও খাব,
কিন্তু খাবারটা খাব না। তোমার যদি জেদ থাকে
তো আমাদেরও আছে। যতক্ষণ না কারণটা
বাতলাচ্ছে—না, যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ, তব
মাল, ইয়ে, খুড়ি, খাদ্য না করিব গ্রহণ—

চড়েছে। নেশা চড়েছে। কথায় বলে সব
মাতালের এক রা। অমনি শুরু হল চারধারসে—

—খাবো না খাবো না—

—যতক্ষণ না বলবে তুমি—

—খাবো না খাবো না—

একবারে কেসনের সুর। নরসুন্দর এই
ক্ষণটিরই প্রতীক্ষা করছিলেন। দু'হাত তুলে
বললেন,—সায়লেঙ্গ সায়লেঙ্গ। এতই যখন
শুনতে চাও তোমরা—

গ্লাসের তলানিটা গলায় ঢেলে বেয়ারার হাত
থেকে আর একটা গ্লাস নিয়ে শুরু করলেন,—
হ্যাঁ, চিঠিতে লেখা ছিল শুধু আনন্দানুষ্ঠান। কিন্তু
বন্ধুগণ, এ আসলে মহানন্দানুষ্ঠান।

ভাব এসে গেছে নরসুন্দরের। গলায় যাত্রার
আবেগ—মুস্তির আনন্দ। পরাধীনতার নাগপাশ
থেকে মুস্তির আনন্দ—

বাধা পড়ল। গজেন চৌধুরী বললেন, বাওয়া,
ক'পেগ চড়াচ্ছ রোজ? পরাধীনতার নাগপাশ?
তুমি কি ভারতবর্ষ হয়ে ফিরিসি জমানায় ফিরে
গেছ?

নরসুন্দর ব্যঙ্গটাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে
দিলেন,—ব্রিটিশ জমানায় সবাই অসুখী ছিল না।
আমার দাদু ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। কিন্তু দাস
প্রথা! আঃ সে দাসত্ব যে আর ঘোচবার নয়। সেই
দাসত্ব থেকে মুক্তি। আহা মুস্তির কী আনন্দ!

বগলা ঘোষ একটা প্রণ পকৌড়া চিবোতে
চিবোতে বললেন, তুমি নিজেকে বিকিড়ি
কড়েছিলে? আমি পনরোটাকা নগদ লইয়া পুত্র
পৌত্রাদিক্রমে— তোমার দাস হইলাম।

এ লাহি ব্যাপার। পেলায় একখানা সোডার
পেটি নিয়ে ঢুকল মোড়ের
পানদোকানের ছেলেটি। টেবিলে
বোতল-টোতল সাজিয়ে রাখা হয়েছে। বিশাল
ড্রয়িং রুমের ওদিকের কোনায় খাবারের ব্যবস্থা।
ক্যাটারার বয়-রা সাজাচ্ছে। অতিথি-অভ্যাগত
আসার পর স্পিরিট স্টোভ জ্বালিয়ে গরম করবে।

মোটা মুটি জনা চম্বিশেক লোককে চিঠি
পাঠানো হয়েছে ক্যুরিয়ারে। নরসুন্দর সামস্তের
এটুকুই মনে আছে। কিন্তু কাকে কাকে? সেটাই
মনে করতে পারছেন না। আলাদা একটা লিস্ট
করে রাখলে ভালো হত। আজকাল কিছুই আর
মনে থাকে না। মূলত পুরনো দিনের বন্ধু-বান্ধবকেই
বলা হয়েছে। বন্ধুর তো শেষ নেই। শুধু প্রথম
থেকে শেষ পর্যন্ত তাদের নামাবলী স্মরণ করা
পাহাড়চুড়োয় চড়ার মতোই বন্ধুর। সামস্ত সাহেব
টাকে হাত বুলিয়েও পাঁচজনের বেশি নিমন্ত্রিতের
নাম মনে আনতে পারলেন না।

প্রথম ঢুকলেন বটকেষ্ট চাকলাদার। হাতে
একগোছ ফুল। সামস্ত সাহেবকে দেখে ছলকে
উঠলেন,—কী ব্যাপার হে নরু? অ্যাদিন বাদে!!
তোমার নেমস্তম্ভপত্রে তো বাপু কিছুই লেখা
নেই। কী কারণ, কী বেষ্টাস্ত? বলি মোচ্ছবটা
কীসের, অ্যা?

নরসুন্দর মিটিয়ে হাসলেন—কারণ একটা
হলেই হল। ব্যাস। মোদ্দা কথা, অনেকদিন পর
মনটা একটু খুশি খুশি—

—কীসের খুশি এত অ্যা? বলি খুশি কীসের?
বলতে বলতে ঢুকলেন নুটু বাঁড়ুয়ে, অম্বিকা
পান্তর আর খগেন খাঁড়া।

কিন্তু না, বিষয়টা আর ভাজেন না নরসুন্দর।
শুরু হয়েছে বেয়ারার চক্কোর। হাতে হাতে
পানীয়ের গ্লাস। অনেকেই 'খাই না, খাব না' তন
ধরে শেষে 'তা একখাত্রায় পৃথক ফল করা উচিত
নয়, দাও একপান্তর তব' বলে গলাস হাতে।
মেজাজ একটু একটু শরিফ। গুঞ্জন। গপ্পো।

নরসুন্দরের ঠোটে সেই টারানো হাসি,—এ দাস সে দাস নয় যে নিজেকে বিক্রি করবে। ব্যারিস্টারি করে যা মাল কামিয়েছি তাতে তিন পুরুষ ঠ্যাণ্ডে ঠ্যাণ্ড তুলে বসে থাকতে পারবে। কিন্তু এ দাসত্ব? আহা, তোমবাও যে দাস, মুক্তির আনন্দ তোমরা কী বুঝবে?

গলা ঝেড়ে পোশাক-আশাক ঠিকঠাক করে প্রায় উত্তম কুমারের ঢঙে বলে উঠলেন নরসুন্দর — বন্ধুগণ, আজ থেকে দশ বৎসর আগে এমন দিনে আমি আমার স্বীব হাত থেকে মুক্তি পাই। তিনি ব্রিটিশের ভারত ত্যাগের মতোই মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে আমাকে ত্যাগ করে যান। আজ আমার দশম বিচ্ছেদ বার্ষিকী।

বটকেষ্ট চাকলাদার বিষম খেলেন,—বিচ্ছেদ বার্ষিকী! বলি, সেটা কি আনন্দ করার বিষয়।

নরসুন্দর চড়েছেন। উরুতে থাপড় মেরে বললেন, আলবাত। তোমাদের আনন্দ বউয়ের দাসত্ব। আমার আনন্দ দাসত্ব মুক্তিতে। বউয়ের ভয়ে যাবা সিটিয়ে থাকে এ আনন্দ যন্ত্রে তারা ভয়ে আসতে চাইবে না জানতাম। সেই জনোই আগে থেকে বলিনি। ভেবে ভালো লাগছে যে এতজনের মধ্যে আমিই সেই সাহসী পুরুষ, যে বুক বাজিয়ে বলতে পারে—বউ হঠাৎ দেশ বাঁচাও—
—বা—প্লি।

একটি ষোলো সতেরো বছরের ফুটফুটে মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। পিছনে স্বয়ং সামন্ত-গৃহিনী। হাসি হাসি মুখ। বিগলিত পুলকিত আলোকিত ভাব।

নরসুন্দরের চোয়াল ঝুলে পড়ল, আমতা আমতা করলেন,—তু-তু-তুই। তু-তোরা খু-খবর পেলি কী করে?

মেয়ে রিণিকে ঐরা সকলেই দেখেছেন, তবে ফ্রক পরা বয়সে। মেয়ে ছুট্ট এসে নরসুন্দরের বুক ঝাপিয়ে পড়ে বলল, খুব ভালো হয়ে গেছে তুমি। তুমিই চিঠি দিয়ে নেমন্তন্ন করলে, আবার তুমিই জিঞ্জেস করছ...

গিন্নি একগাল হেসে বললেন, এ আর নতুন কথা কি! তোর বাপী চিরকালই ভালোনাথ।

—এতক্ষণে—বগলা তাঁর হেঁড়ে গলায় ঘোষণা করলেন—পূর্ণ হল আসর। বৌদি না হলে পার্টি চলে।

লজ্জায় নুয়ে পড়ে সামন্তগিন্নি মিহি সুরে বলে উঠলেন, তা ভাই, আপনাদের নিয়ে পার্টি, মানে আপনাদেরই ডাক। সে কি উপেক্ষা করবে থাকতে পারি। ওটার কথা বাদ দিন,—ও ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। দেখুন না, চিঠিতে নাম লিখেছে যমুনা দাস। তিরিশ বছর হল সামন্ত হয়েছি। এখন আবার নতুন করে দাস।

দরদিত গৃহিনী দু'চোখে পরম মমতা নিয়ে স্বামীর দিকে হেঁটে গেলেন।

নরসুন্দর শুধু নিজের কপালে একবার করাঘাত করলেন। মনে মনে নিজেকে জ্বাল, বাঁদব, উল্লুক, গাডল—এরকম গোটা দশেক গাল দিলেন। ইস্! এমন ভুলও কেউ করে! ডায়েরি দেখে ঠিকানা লিখতে গিয়ে এ নামটা কি করে লেখা হয়ে গেল! যমুনলাল দাস লিখতে গিয়ে যমুনা দাস। দাস!! খাল কেটে কুমির। আবার দাসত্বের শৃঙ্খল! গলা শুকিয়ে কাঠ। চোঁ চোঁ করে প্রায় গোটা গ্লাস মদ এক নিঃশ্বাসে শুষে নিলেন। পিছন থেকে ধ্বনি উঠল—
প্রি চীয়ার্স ফর যমুনা বৌদি

—হিপ্ হিপ্ স্বরে!!

আর সেই স্বর ছাপিয়ে যমুনাবৌদির মিহি গলা বজ্রপাতকে লজ্জা দিয়ে ফেটে পড়ল বেয়ারার ওপব—ভোলা! সাহেবের গ্লাস খালি হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছিস না!! খালি বসে বসে মাইনে খাওয়া! লোকটাকে অযত্নে অযত্নে তো মেরেই এনেছিস—

প্রথম ধমকেই ভোলার হাত থেকে ট্রে ছিটকে মাটিতে। গ্লাস ভেঙে মদ গড়িয়ে একাকার।

নুট্ট বাঁড়জ্জো বললেন, শুভ অনুষ্ঠানে একটু ভাজুর ভালো লক্ষণ। হ্যাঃ, এতক্ষণে বাড়িটা তার চরিত্র ফিরে পেয়েছে। দশ বছর পরে পুনর্মিলন। চাট্টিখানি কথা। ওরে পাশাপাশি দাঁড় করা— ছবি তোলা—ফ্রপ তোলা—
ইস্! দুটো মালা যদি থাকত!—

নরসুন্দরের চি টি আপত্তি খড়কুটোর মতো ভেসে গেল। গিন্নি এগিয়ে আসছেন তাঁর দিকে আর তিনি বন্ধুদের কাঁধে ভাসতে ভাসতে এগোচ্ছেন তাঁর দিকে— যেন ফুটবলে হ্যাট্রিক করে এলেন এইমাস্তর!

RUPAKAR DEVELOPER'S PRIVATE LIMITED

4/4, Netaji Nagar
Kolkata-700 040

পত্রপাঠ জবাব

জবাব দিচ্ছেন : দ্বিতীয় সুগ্রীব



- আপনাদের সম্পাদক মাঝে মাঝেই দেখি নাম দেখেন শে. আ. শেষে যে একটা 'ল' আছে—সেটা লিখতে ভুলে যান বুঝি?

—আদিত্য কর, বনছগলী, বরাহনগর

- এরকম ভুল মানুষ মাত্রেরই হয় ভাই। এই যে আপনার পদবীর আগে 'শু'-টা লিখতে ভুলে গেছেন, তারজন্যে কিছু মনে করেছি আমরা?

- অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত বলেছেন আমলাদের ব্যয়বরাদ্দ সংকোচন করা হবে। সত্যিই হবে?

—কুশালকান্তি গুহ, বেলঘরিয়া

- মহাপুরুষদের বাণী নিয়ে প্রশ্ন তুলতে নেই। আর অর্থমন্ত্রীর কথার অর্থ খুঁজতে যাওয়াই তো মহাপাপ।

- আমীর মেয়ের বয়স তেরো। হাজারবার বারণ করা সত্ত্বেও আলমারিতে লুকিয়ে রাখা বইগুলো বের করে লুকিয়ে লুকিয়ে পড়ে। আচ্ছা, প্রাপ্তবয়স্ক হবার আগে এগুলো পড়লে ক্ষতি হবে না ওর?

—স্বপ্না দাস, বালী, হাওড়া

- আপনি কোন বয়সে বইগুলো প্রাপ্ত হয়েছিলেন?

- আপনারা ভ্রাম্যন্তরবাদে বিশ্বাস করেন?

—সুকুমার পান, মেদিনীপুর

- হ্যাঁ, করি। হিটলার মরে বুশ হয়েছেন।

- আমি বিজ্ঞানের ছাত্র। নিউক্লিয়ার ফিজিক্স কোথায় ভালো পড়ানো হয় বলতে পারেন?

—চন্দন হাজরা, আরামবাগ

- রাষ্ট্রপতি ভবন। নয়াদিল্লি।

- ঠাকুর বলতেন, পাকি থাকবি পাকাল মাহের মতো, গায়ে পাক মাখবি না। সম্পাদক কি জানেন।

—দীপক বিশ্বাস, বাঁকুড়া

- হ্যাঁ, খুবই জানেন সেইজন্যে নিজের চারদিকে তাল তাল পাক সাজিয়ে রেখেছেন, নিজে তো আর মাখতে পারেন না, ঠাকুরের বারণ, আপনারা এলে মাখাবেন বলে।

- এবার পুজোয় কোথাকার ঠাকুর সবচেয়ে জীবন্ত মনে হবে?

—অদিতি সামন্ত, কলকাতা-৭৩

- ঠাকুরবাড়ির। সকলেই ঠাকুর এবং জীবন্তও বটে।

- নরেন্দ্র মোদীকে মুখ্যমন্ত্রী না বলে অনেকেই মুখ্যমন্ত্রী বলে সম্বোধন করছেন। আপনাদেরও কি সেই মত?

—কামরুজ্জামান বিশ্বাস, মালদা

- না, আমাদের মতে তিনি তুর্কমন্ত্রী। তুর্কীর চেয়েও সাংঘাতিক।

- আমার স্বামী একজনের সঙ্গে প্রেম করে। সে যা হোক, এতদিন মেনে নিচ্ছিলাম। কিন্তু এখন তিনি আবার তাঁকে সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে আসা শুরু করেছেন। এবং হুকুম—চা করো তো। কী করা যায় বলুন তো?

—সোনালী সেন, বর্ধমান

- আপনার প্রেমিককে দু-একদিন বাড়িতে ডেকে আনুন, কঠি থাকা কালীন সময়ে। এবং তাঁকে শুধু এটুকুই হুকুম করুন—একটু বাইরে যাও তো।

রাশি চক্ৰ

জ্যোতিষসান্নী সৌভাগ্যদমন মহারাজ

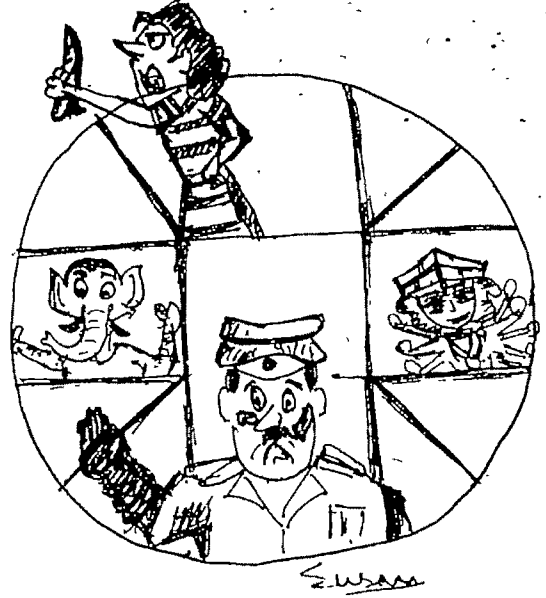
স্পেশ্যাল পুলিশ রাশি : স্পেশ্যাল পুলিশ বলে কলকাতায় এক প্রজাতি আছে। পূজোর সময় রাস্তার মোড়ে মোড়ে তাঁদের খাড়া করে দেওয়া হয়—রাস্তা পারাপারকারী পাবলিককে খাতানোর জন্যে। এঁদের ঢাল-তলোয়ার কিছুটি নেই। এবার পূজোর দর্শকসূরের কনুই-গুতোয় এঁদের কারো কারো পাজরভঙ্গ যোগ আছে। এবং অতি সতর্কট্রাফিক সার্জেন্টের অন্যত্র মনোবোণের সুযোগে জনগণ-হস্তে আপন হস্ত ভঙ্গ হবার চমৎকার সম্ভাবনা দেখা যায়।

মা দুর্গা রাশি : মা দুর্গার ভাগ্য এ মাসে বড়ই অযোগ্যমী। প্যাণ্ডেল বানাতে-বানাতেই পূজো কর্তৃপক্ষ ফতুর হওয়ার ফলে বহু ক্ষেত্রে মায়ের কপালে 'চালকসার বদলে কাঁচকলা'র মতো খাবার ছুটবে। এবং সেও সন্তানদের মদের চাট হিসেবে লো-পাট হওয়ার বিলম্ব সম্ভাবনা আছে। তবে মাতা দশকরজোড়ে সন্তানদের স্তুতি করলে মায়ের কিঞ্চিৎ মাংস-পরোটা কপালে জুটতে পারে। এই সময়ে হাত থেকে অস্ত্র খসে যাওয়ায় অসুর সুযোগ বুঝে খাঁড়া তুলতে পারে। তবে সন্তানদের তুষ্ট করতে পারলে তাদের পেটোই অসুরকে খাঁড়া সমেত তাড়া করে দক্ষিণ দূয়ার দেখিয়ে দেবে।

পত্রিকা সম্পাদক রাশি : এবার পূজো সংখ্যার বাজার মন্দ। 'দেশে' পাঠক তলানিতে। এমনকি উদ্যম-কখন সঙ্কেত। তখন আনন্দ-র ভাবনা নতুনভাবে ভাবতে হয়। আরএকটু গরম-গরম। আরএকটু লুডু-লুডু। কিন্তু পাঠকগ্রহ অযোগ্যমী হওয়ায় কিনবে না বিশেষ। তবে ছেপে আনন্দ পাবেন সম্পাদক। তত্ত্বের প্রয়োগেই তো সাফল্য আসে।

গণেশ রাশি : বাঙালির গণেশ-ঘূষে গণেশদাদার ডায়েরিয়া হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায়। তথাপি গণেশজি তাঁর প্রতি বাঙালির ভক্তির ঢল দেখে কৃপা বশত সিন্দুক ভরে দেবেন। কিন্তু তাঁর ডি-হাইড্রেশন শুরু হবে তখনই, যখন দেখবেন, তাঁকে প্রদত্ত ভক্তদের নেটিগুলি জ্বাল।

রোমিও রাশি : একে হোমিও রাশিও বলা যায়। বাইরে থেকে বিন্দু, ভেতরে কলজের সিঁদু। মেয়ে-পাগলা রোমিওদের এ মাসটা



ভালোয়-মন্দয় মেশানো। যাদের দেখে সিটি মারা যায়,— 'ওলে ওলে' করা যায়, মন্দর মধ্যে তাদের লৌহসম জুতোর ঘায়ে প্রথমে মস্তক বিদীর্ণ যোগ, তৎপরে সেই সুদর্শনা হাসপাতালে এসে অনুতাপ-প্রকাশ কালে হৃদয় বিদীর্ণ যোগ, তৎপরে ছাদনাভা যোগ, তৎপরে গৃহশিখর হতে কাকচিল বিতাড়ন যোগ, তৎপরে... তার আর পর নেই, নেই কোনো ঠিকানা.....

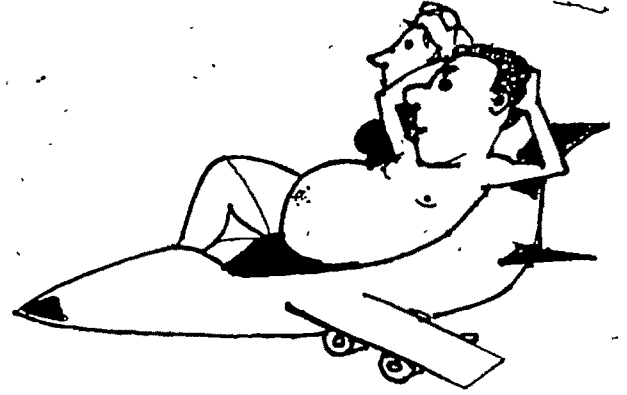
শারদীয় কবি রাশি : এ মাস আপনার জীবনের চরমপ্রাপ্তির মাস। হলই বা মাত্র দশখানি 'কচি' পত্রিকার পূজো সংখ্যায় কবিতা প্রকাশ। কচিরাই তো দামি এখন। আনবিক বোমাকে পিছনে ফেলে এখন পারমানবিক বোমার যুগ। আপনি আরো কচি পত্রিকায় ছাপুন। তারপর আরো কচি—আরো কচি—শেষে ছাপার কচকচি ছেড়ে খাতার পাতা। তখন নিজেই পড়ুন, নিজেই শুনুন। সেইসব কবিতাগুলি, যেগুলির মানে আপনি ছাড়া আর কেউই বোঝে না। যেমন—ধরিত্রী তোমারে আমি বাসিয়াছি ভালো/এটো বাসনের মতো কলতলা ঝরণা-সঙ্গমে.....তখন পাশের বাড়ির ধরিত্রী নামের ঠিকে ঝি-র আপনার প্রেমে পড়া ছাড়া উপায় কি? আর আপনার জীবনে, হাজার হোক, শেষ পর্যন্ত প্রেম তো এলো!!!

জবর থ বর

মানুষ না সাপ

হি দি ছবির অশেষ কল্যাণে, ডারউইন খুড়োর বিবর্তনবাদকে মর্তমান কলা দেখিয়ে দিয়ে রূপোলি পর্দায় বহুবার হিরোদের বাঁচাতে ফনাতোলা সাপ-এ পাশ্টে গেছেন শ্রীদেবী-মন্লাকিনীরা। মা মনসা বোধহয় এবার ভেবেই রেখেছিলেন, শুধু সিনেমার পর্দা বা বেহুলা-লখিন্দর পালা-কেন, এই ধরাধামে রক্ত-মাংসের মানুষকেও সাপ বানিয়ে দিলে দোষ কি? চাণক্য পণ্ডিত তো অর্থশাস্ত্রে বলেই গেছেন, অসৎ, খল মানুষের কথাবার্তার মধ্যেও সাপের হাইডোজের বিষ আছে। একবার কাছে এসেছ কি মরেছ। তাই বর্ধমানের জোভরাম মহকুমার আলিসা গায়ের মহাদেব হাঁসদার ওপরই বোধহয় শিবঠাকুরের সৎমেয়ের দয়া হল।

এর আগে অবশ্য বহুবার সাপের মাংস দিয়ে দিব্যি জলযোগ করেছেন মহাদেব। মাঠে একদিন ধান কাটার সময়ই চিহ্নিত। খড়ের গাদা থেকে তেড়ে এসে একটি গোখরো ছোবল মারল মহাদেবকে। মনসার বাপের নামে নাম মহাদেব-এর। তিনিই বা কম যান কিসে! 'দু'হাতে পাকড়ে ধরলেন মা মনসার পেয়ারের বাহনকে। বসালেন সাপের ঘাড়ে এক কামড়। নিজে তো বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হাসপিটালে ডাক্তার হলেনই, তার সঙ্গে নিজের দাঁতের জোরের জলজ্যোত্স্ব প্রমাণ দেখাতে ঘাড়ভাঙা সাপটিকেও নিয়ে এলেন হাসপাতালে একটা মাটির পাত্রে করে। শিবের বরে দিব্যি বেঁচেবর্তে রয়েছেন তিনি। কিন্তু তাঁর দাঁতের বিষে সাপটি সেই রাঙেই ধরাধামের মায়্যা ত্যাগ করেছে। রাখে শিব, মারে কে। মহাদেববাবু বুকের পাটা ফুলিয়ে বলেছেন, এবার থেকে তিনি আরো বেশি করে সাপভাজা খাবেন।



সরকারি 'ডিম' খানা

প্রাথমিক স্কুল-শিক্ষকদের বেতন আর যুগ যুগ ধরে আটকে থাকা পেনশন ক্রিয়াকর করতে গিয়ে রাজ্য সরকারের তহবিলে জোড়াতালি পড়বার দশা। তার ওপর আবার স্কুলগুলোতে দুপুরবেলায় বাচ্চাদের জন্য খাবার বা মিড-ডে মিল-এর বন্দোবস্ত করা? পাগল না মাথাগোল? এই তো বছর কয়েক আগে পড়ুয়াদের জন্য দুপুরের খাবারের বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। শেষমেঘ দেখা গেল, খাবার সাপ্লাই দেওয়ার জন্য অনুদানের টাকাটা মাস্টারমশাই আর স্কুল সেক্রেটারিদের অসীম সৌজন্যে পকেটস্থ হওয়ার সুবাদে ছাত্রছাত্রীদের বরাতে পোকাধরা পাউরুটি আর কাকুর মেশানো ভাতই জুটছে। তবে এবার খোদ ব্রিটেনের প্রবাসী ভারতীয় ডাঃ সিদ্ধার্থ মুখার্জি এবং তাঁর বন্ধু তথা সমাজসেবী দেবকীকুমার মুখার্জি দেখিয়েছেন প্রাইমারি স্কুলের দুপুরের খাওয়ার ব্যবস্থা করাটা টাকা-পয়সার দিক দিয়ে কোনো সমস্যাই নয়। শুধু স্টুডেন্টদের দু'টো করে সেদ্ধ ডিম দিলেই তাদের পেটে ক্যালরি গিজগিজ করবে। এই সেদ্ধ ডিম খেলে ছেলেমেয়েরা প্রত্যেকে দরকারি ৩০০ ক্যালরি করে শক্তি পাবে। ডাক্তারি ক্ষেত্রে বৈটেমুটে দেবকীবাবু আর সিদ্ধার্থবাবু আরো জানিয়েছেন, সেদ্ধ ডিমের ১০০ শতাংশই ছাত্রীছাত্রীরা হজম করে ফেলবে। মুখে ঘা আর রাতকানা রোগও দূরে পালাবে তাদের কাছ থেকে। এর মধ্যেই বীরভূম আর বাঁকুড়ার প্রাথমিক স্কুলে এই ডিমখানা মিল-এর আশাতীত সাফল্যও পেয়েছেন মুখার্জিরা। এই ডিম-মিল এর কল্যাণেই স্কুলগুলোতে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা তিনগুণেরও বেশি হয়ে গেছে। রাজ্য অর্থদপ্তর প্রাথমিক শিক্ষকদেরকে বেক্সা টাকা মিটিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে যতই বোড়ার ডিম দেখান না কেন, এই 'পুষ্টি' প্রকল্পের কল্যাণে প্রাথমিক স্কুলগুলোতে যে পুষ্টি বন্যা বইবে, তাতে আর সন্দেহই নেই।

পাহাড়চুড়ায় শাদি

জীবের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি হলে তার আত্মা নাকি সশরীরে ভায়া কৈলাস পর্বতের বরফচূড়া ডিঙিয়ে স্বর্গে অথবা নরকে গিয়ে থিতু হয়। অন্তত ধর্মশাস্ত্রে তাই তো বলে থাকে। কিন্তু টক-ঝাল-মিষ্টি দাম্পত্য জীবনের শুরুতেই একেবারে একরম উপরে পৌছে যাওয়া যেতে পারে? তাও বিয়ের বেনারসি আর বিয়ের পর হনিমুন-এর খরচের টাকার কথা ভেবে মনে মনে নয়, একেবারে রক্ত-মাংসের শরীরে? 'চীনের জিনজিয়াং যুব বিবাহ পরামর্শ সংস্থার' অতি উৎসাহী কর্মীরা নবদম্পতির জন্য সেই মহাপ্রস্থানের উচ্চতম পথে যাওয়ার সুব্যবস্থাই করেছেন।

সংস্থার সদস্য-সদস্যারা এই মর্মে নোটিশ জারি করেছেন—যেসব শক্ত কলজ্ঞেওয়ালা আর ডাকাবুকো দম্পতি আছেন, তাঁরা এবার থেকে অনায়াসে সুমদ্রতল থেকে ৫,৪৮০ মি. উঁচু এভারেস্ট পাহাড়চূড়াতে গিয়ে মালাবদলের কাছটা সেরে ফেলতে পারবেন। কোনো বাড়ি ভাড়া করে বা ব্যাক্সোয়েট হলে গিয়ে অতিথি-অভ্যাগতদের ডেকে বিয়ার-হাইস্কি-মটন-কেক না খাওয়ালেও চলবে। অবশ্য দুনিয়ার এই মগডালে চড়ে শাদি করার জন্য ট্যাকের জোর কম হলে চলবে না বলে জানিয়েছে সংস্থাটি। বিয়েপাগলা দম্পতিদের দিতে হবে ১৬,০০০ চিনা ইউয়ান মুদ্রা বা ৯৬,০০০ টাকা। এভাবেস্টে উঠে বিয়ের চুমু দেওয়া-নেওয়ার আগেই যদি দম্পতিরা চম্রবিন্দু হয়ে যায়, সেজন্য তাদের পিঠি ও শ্রোতের খরচা হিসেবে জীবনবীমা-র খরচও ধরা আছে এই টাকার মধ্যে। এভারেস্টে উঠতে গেলে দম্পতিদের প্রথমে গাড়িতে করে তিব্বতের রাজধানী লাসা-তে আসতে হবে। অ্যান্ডিন এভারেস্টে দেব-দেবীদের বিয়ের প্রোগ্রাম হত। দেবতার মুখ বদলাতে মতে শাদি করতে আসেন কি না—সেটাই এখন দেখার বিষয়।

ওজনই ডোবাল

কুমড়ো পটাশ সুকুমার রায়ের 'আবোল-তাবোল'-এর পাতা ছেড়ে বাস্তব দুনিয়াতে থাকলে তার এরকম উদ্ভাস্তর দশা হত কিনা বলা শক্ত। তবে দেহে চর্বি জমিয়ে কুমড়ো পটাশ হলে যে কত খানে কত চাল সেটা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছেন দুই ভাই-বোন মাটি ম্যাকলাফলিন এবং আদ্রিয়া কেইজার। দু'জনের ওজন এমনই বর্ডারলাইন পেরিয়ে গেছিল যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাউথ ওয়েস্ট এয়ারলাইন্সের প্লেনে তাঁদের সিট দেওয়া তো দূরের কথা, দূর দূর বলে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। মাটি আর আদ্রিয়া অনেক কাকুতি-মিনতি করেছিলেন। তখন তাঁদের বলা হয় এরোপ্লেনে আরো একটা অতিরিক্ত আসন সংরক্ষণ করার জন্য। তাঁদের দু'জনের বরবপু এতই বিশাল যে বিমানের সাড়ে ১৮ইঞ্চি লম্বা সিটগুলো তাঁদের দেহের ভারে ফেটে চৌচির হয়ে যেতে পারে।

মাটি আর আদ্রিয়া অবশ্য ছোড়নেওয়ালা পার্টি নন। তাঁরা জোর গলায় বলেছেন, ইণ্ডিয়ানা অন্ডি প্লেনে আসা পর্যন্ত তাঁদেরকে একবারও বিমান সংস্থার কর্মকর্তারা মুখ ফুটে বলেননি যে তাঁদের ওজনের জন্য প্লেনের হাঁসফাঁস দশা, অতিরিক্ত সিট-এর জন্য টিকিট কিনতে হবে। নিউ মেক্সিকোর দিকে যাওয়ার সময়ই তাঁদেরকে এই ওজন-দার সংবাদটি দেওয়া হয়। বিমান সংস্থা থেকে অবশ্য সাফাই গেয়ে বলা হয়েছে—সংস্থার প্রতিনিধি তাঁদেরকে ইচ্ছে করেই হয়ত অতিরিক্ত সিটের কথা বলেননি; যা ওজন তাঁদের দু'জনের!!

—কৌশিক রায়

N. C. DAW & Co.

Gun Makers

Since 1835

9, B. B. D. BAG (EAST)

KOLKATA-700 001

220-6643/4317

Re-মেকি লেখা

উৎপল চক্রবর্তী

স্বপ্নে যে কুললক্ষ্মী আমাকে দেখা দেবেন, এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

প্রথমে চিনতেই পারিনি। প্রায় সিনেমা তারকা, ক্যালেশোরের ছবি থেকে যেন উঠে এসেছেন, মনু হাস্যমুখে এসে দাঁড়ালেন।

সসঙ্কোচে অপ্রতিভ মুখে বললাম, — নমস্কার। আপনি?

অত্যন্ত সুরেলা গলায় উনি বললেন, — কুললক্ষ্মী।

—কুললক্ষ্মী?

এবার দ্বিতীয়ত, আমি ভাবলাম তাহলে আর্ট ফিল্মের কোনো অভিনেত্রী বোধহয়। অন্যান্যদের তো চিনি। তারপর হঠাৎই বিদ্যুৎচমকের মতো মনে হল, —কুললক্ষ্মী, মানে মাইকেলকে বিনি—

বাধা দিলেন হাত তুলে। হাসিটা আর একটু প্রসারিত করে, —ঠিক তাই।

—বলেন কি।

আমি বিষ্ময়ে এমন ভড়কে-মাই যে ঐ দুটো শব্দ ছাড়া কিছুক্ষণ আর বাক্যস্মৃতিই হয় না।

ভারতের মতো পঞ্চাশ বছর ধরে উন্নতশীল, কখনোই উন্নত নয়, এই আমি চল্লিশ বছর ধরে লেখক হব-হব, কখনোই লেখক নই, সেই আমাকে কিনা...ওঃ। অভাবিত সৌভাগ্যে আমি মুহূর্তমান হয়ে পড়ি। আমার ন্যাজে-গোবরে অবস্থা দেখে তাঁর দম্মা হয়। বরাবরই এরকমটাই দেখা গেছে, সেই মাইকেলের আমল থেকেই বলতে কি। বরাভয় মুদ্রায় ডান হাতটি তুলে হাসিটা আরো এক ইঞ্চি মতো বাড়িয়ে বললেন, ওরে বাছ—

পুলকে আমার শরীর কঁপে উঠল। অহো! এভাবে তিনি মাইকেলকেও সম্বোধন করেছিলেন। আপনা থেকেই কৃপাপ্রার্থীর মতো হাত জড়ো করলাম।

—তোর খুব দুঃখ তাই না?

সে আর বলতে। এই ধরাধামে কার দুঃখ নেই। পৃথিবীটা যেন দুঃখের ভ্যারাইটি স্টোর্স। এক একজনের এক একরকম দুঃখ। সব মাল স্টক করা আছে। ঘাড় নেড়ে বললাম, —আজ্ঞে,

খুব দুঃখ।

—কিসের দুঃখ, কিসের ক্রেশ—

তিনি মাইকেল থেকে দ্বিজেন্দ্রলালে গেলেন। তাঁকেও দেখা দিয়েছিলেন নাকি। যদিও দ্বিজুবাবু সে বিষয়ে কিছু লেখেননি তবু সন্দেহ হল।

—লেখকহবার জন্য খুবই পরিশ্রম করছিস তাই না?

পুনর্বীর আমার ঘাড় নড়ল।

—অথচ লেখক হিসেবে কেউ তোকে চেনে না।

এবারও সম্মতিসূচক উত্তরের ভার দিলাম ঘাড়কেই।

—বেশ। তাহলে তোকে কয়েকটা উপদেশ দিই। মধুকে যেমন দিয়েছিলাম। আমি শশব্যস্ত ভঙ্গিতে বললাম, —আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন। বসুন।

—না রে, বসব না। আমাকে আরো কয়েক জায়গায় যেতে হবে।

আরো কয়েকজনকে দেখা দিতে হবে।

আমি যথেষ্ট চিন্তিত হলাম এ হেন উদারতায়। আরো অনেকে যদি কৃপা লাভ করে তবে তো ঘোর কম্পিটশন। পেরে উঠব কি। বিশ্বায়নের কৃপায় এ দেশের যেমন নাভিস্বাস উঠছে তেমনই হবে না কি। শক্তিত গলায় বললাম, তাহলে—

কুললক্ষ্মী তো। চট করে বুঝলেন কী বলতে চাই। বরাভয় মুদ্রা অকম্পিত রেখে বললেন, —ভয় নেই রে। প্রত্যেককে আলাদা আলাদা ব্যবস্থাপত্র দেব।

শুনে ভারি আনন্দ হল। বিগলিত মুখে বললাম, —তাহলে আমি কী করব বলুন।

—বলছি। এক গেলাস জল খাওয়া তো। সেই কবে থেকে তোদের মতো অবোধদের কাছে বকবক করে গলা শুকিয়ে গেছে।

—জল খাবেন?

অভাবিত এই চাওয়ায় আমি যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হই, কিংকর্তব্য বিমূঢ় বোধ করি। মাইকেল শুনেছি মদ্যপায়ী ছিলেন। তিনি কি অক্ষার

করেছিলেন কে জানে। সসঙ্কোচে বলি, —জল না অন্য কিছু? মানে আমি তো...বরং কোল্ডড্রিংকস... আজকাল তো—

—না রে পাগলা। আমি বিদেশি জিনিস পছন্দ করি না। মধুকে তো বলেছিলাম, তোর মনে নেই? সেই মাতৃকোষে রতনের রাজি—খাঁটি জলই দে। বরং আজকাল যে বোতলের জল পেটরোগা তোরা খাস—সেটাই বরং খেয়ে দেখি।

বোতলটা এনে তাঁর হাতে দিতেই পপ-নায়িকারা যে ভাবে কর্ডলেস মাইক মুখের সামনে ধরে, অবিকল সেরকম ভঙ্গিতে জলপান করে বললেন, তুই এতদিন কী কী লিখেছিস?

তালিকাটি আমার বেশ দীর্ঘই। প্রায় আধ-হাজার কবিতা, কেজি দুয়েক ওজনের গোটা পাঁচেক উপন্যাস, ডজন দশেক গল্প।

অকুতোভয়েই তার ফিরিস্তি দিলাম। শেষে 'দেবদাস' শাহরুখ খান স্টাইলে অত্যন্ত দুঃখী-দুঃখী মুখ করে বললাম, —এত করেও কিছু হল না।

—হঁ।

এতক্ষণ পরে কুললক্ষ্মীকে একটু চিন্তিত দেখাল। উদ্বিগ্ন গলায় বললেন, এই হাজার কৰ্মা লেখা কি ছাপা হয়েছে?

—না না, কে ছাপাবে? দুটো কবিতার বই, একটি গল্পের বই একটি উপন্যাস বের করেছি কিম্বাণ বিকাশ পত্রের সুবাদে।

—সেটা আবার কি?

—ডিটেলস্‌টিক জানি না। তবে ওটা কিনলে ছ'বছর পর টাকা ডবল হয়।

—ইস্। মধুর আমলে থাকলে বেচারাকে আর বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে ধার করতে হত না। তা, বইগুলো লোকে কিনেছে? পড়েছে?

—খেপেছেন নাকি। আজকাল বই কেউ কেনে? যারা কেনে তারা কি পড়ে? অত সময় কই? সারাদিন পেটের ধান্দা। সম্ভ্রায় টি ভি। যাদের বড়লোক বলে তারা এসবের ধার ধারে

না। আসলে গরিব আর বড়লোক কেউ বই ছোঁয় না। মধ্যবিত্তরা প্রাণপণে বড়লোক হবার চেষ্টায় আছে।

ফলে—এইরকম অবস্থা।

কুললক্ষ্মীর সুন্দর মুখে বিষাদ ফুটে উঠল। বেশ লক্ষ্মীছাড়া ভাবই দেখা গেল বলতে কি!

এছাড়া ধকন,—তার ধর্তব্যের আওতায় আরো তথ্য আমদানি কবিনি, বই কেনে না বলে উপহার দিতে হয়। বিখ্যাত লেখকদেরই দিতে হয়। কিন্তু তাঁরা নিজেরাই বোধহয় নিজের বই পড়েন না; পড়লে অত রসি মাল বাজারে ছাড়তে কুণ্ঠিত হতেন। ফলে বইগুলো জলাঞ্জলি দিতে হয় একরকম, জলের দরেও বিকোয় না। আর সমালোচকদের কথা যদি বলেন—

তাকে অবশ্য বলার সুযোগ দিই না। আমিই বলতে থাকি,—তাঁরা বিখ্যাতদের বই ছাড়া আর কারো বই পড়েনই না। আর পড়লেও এক কলমও লেখেন না। লিখলেও জানেন, যে সব পত্রিকার সঙ্গে তাঁদের টিকি বাঁধা তারা ছাপাবে না। টিকিতে টান পড়বে তাঁদের। টিকিট কাটতে হবে অচিরাৎ।

—এমনই দুরবস্থা??

কুললক্ষ্মী অকুল পাথারে পড়েন। দ্বিতীয় বাক্স রচনায় উৎসাহ পান না। আমিও যারপরনাই নিরুৎসাহ বোধ করি। আমারও আর বাক্য ব্যয়ে উৎসাহ থাকে না।

কুললক্ষ্মী বিশেষ ভাবিত অবস্থায় কিছুক্ষণ নীরব থাকেন। আমি শঙ্কিত হই। এমন দুরবস্থার কথা শুনে যদি উনি অস্তর্হিত হন, বেমালুম মিলিয়ে যান বাতাসে, তাহলে হঠাৎ ছয়ড় ফুড়ে আমার এই সৌভাগ্যেব আবির্ভাবও হাওয়া হয়ে যাবে। মন্ত্রীসের মতোই তিনিও সর্বজ্ঞ, এই বিবেচনা করে তাঁকে তুষ্ট করার অভিপ্রায়ে বলি,—আপনি তো সবই জানেন। জেনেই তো আমার কাছে দয়া করে এসেছেন। এখন বলুন, কী করি আমি।

কে না জানে ভোজনে জীব তুষ্ট, ভজনে শিব। কুললক্ষ্মীর মুখের বিষাদভাব কেটে যায়। আবার দিব্যকান্তি ফিরে আসে সেখানে। হাস্যোজ্জ্বল মূর্তিই দেখা যায় ফের। আমার গ্রহের ফের কাটে।

—বেশ। বেশ বলেছিস। এ সব অবশ্য জানি আমি। এই সঙ্কট থেকে উদ্ধারের পথও জানি।

—বলুন, বলুন—

আমিও উৎসাহে চাগিয়ে উঠি। উপদেশাবলী টুকে রাখাব বলে খাতা-কলম বাগিয়ে বসি।

কুললক্ষ্মী বৈদিক যুগের রহস্যময় হাসি ফোটান টোটে,

—শোন, পথ একটাই। সেটা হল রিমেক!

—রিমেক!

আমি বাক্যহারা বোধ করি।

—সে তো ইদানীং গার্নে হয়।

—কেন হয়?

কুললক্ষ্মী কে স্টার থেকে এবার যেন ব্যাবিস্টারের মতো লাগে!



—কেন হয়, মানে,

নতুন কিছু দিতে পারে না বলে পুরনো কাসুদি ঘাটে।

—ঠিক! নতুন

কিছু দিতে পারে না বলে রি-মেকই সম্বল। মেকিই বলা যায় তাকে—

কুললক্ষ্মী বলতে থাকেন, এই মেকি জিনিসেরই আজকাল কদর। দেখছিস না, যে শিল্পীর গান বিমেক করা হচ্ছে, সেই মূল শিল্পীর বাজার দর নেই? কোনো কোনো ক্ষেত্রে অতি দরিদ্র অবস্থায় তাঁরা মারাও গিয়েছেন। কিন্তু রিমেক কারিগরবা দু'হাতে পয়সা কামাচ্ছেন।

—তা বটে!

—তুইও তাই কর।

—অ! মি!

সাহিত্যে? সেটা কীভাবে?

—ওরে বাছা, মাতৃকোষে রতনের রাজি, এ ভিখারি দশা তোর কেন তবে আজি—

হব্ব মাইকেলকে যেমন বলেছিলেন, তেমন ভাবেই আমাকে বললেন,—সাহিত্যে তো রিমেকই চলছে রে যুগের পর যুগ ধরে। সেই প্রেম, সেই বাৎসল্য, সেই দাম্পত্য কলহ, সেই বিরহ, সেই বিদ্রোহ, সেই পরকীয়া, দখায় দখায় সেই শতকিয়া।

—তা ঠিক।

—কিন্তু এই রিমেকে এলেম লাগে। এক প্রেমই এক একজন এক এক রকম ভাবে লেখে। চমকপ্রদ অভিনব কিছু না হলে তা লোকেব কদর পায়

না। যার ক্ষমতা আছে সে পারে। অন্যরা মরে।

—কিন্তু—দ্বিধাযুক্ত গলায় আমি বলি,—আমার কি সে ক্ষমতা আছে?

নিজের প্রতি ঘোরতর সন্দেহে আমি হত্যাভয় হয়ে পড়ি।

—আমারও তাই মনে হয়,—কুললক্ষ্মী মরার উপর খাঁড়ার ঘা দেন,—
তোর সে ক্ষমতা নেই। তুই বরং সরাসরি রিমেক কর।

—সরাসরি রিমেক। সেটা কিরকম?

কুললক্ষ্মী জবাব না দিয়ে ফের বোতলমুখী। কিছুক্ষণ পর নব বলে
বলীয়সী হয়ে বললেন, সেটা হল, অতীতের বিখ্যাত লেখকদের লেখা
রিমেক কর।

আমার হৃৎকম্প শুরু হয়। স্বেদ কম্প ইত্যাদি দেখা দেয়।

—বন্ধিম থেকেই শুরু কর। কুললক্ষ্মী বন্ধিম কটাক্ষ হানেন,—ওঁর
বিষবৃক্ষই আবার লেখ। বিষবৃক্ষই রোপন কর তুই।

—কিন্তু লোকে তো বলবে নকল! চুরি। ডাকাতি। রাহাজানি।
জানাজানি হলে কেউ কি সে লেখা ছাপবে?

—আলবাৎ ছাপবে! তুই লিখবি বিষবৃক্ষ, ব্র্যাকেটে ‘নব নব রূপে’।
তোর পছন্দমতো চবিত্রগুলো আধুনিক করে দিবি। ধ্রুপদী থেকে একপদী।
একঠ্যাঙে দাঁড় করাবি। চপলতা আনবি। লোকে যেমন খায় আজকাল।

—কিন্তু একঠ্যাঙে দাঁড় করালে আমিও তো ঠ্যাঙানি খাব। আমাকেও
শেষে এ একপদী হতে হবে না কি?

—নারে পাগল! শুনছিস সেকালের গায়কদের অত সুন্দর গলার কাজ
কেমন স্টিম রোলার চালিয়ে ফ্ল্যাট করে দিচ্ছে এ কালের গায়করা? মার
খাচ্ছে কেউ? মার মাং কাট কাট করে চলছে সেই ক্যাসেট। এ অগভীরতাই
ওদের অ্যাসেট। এটাই কর। এই তো পথ! তোরা সিদ্ধিলাভ হবেই। লেখক

হিসেবে তুই নতুন পথ দেখাবি। পথিকৃৎ হবি তুই।

—সত্যি বলছেন?

আমার সন্দেহ যায় না। এমন কাণ্ড করলে এই দেহকাণ্ড ছেড়েই না
চলে যেতে হয়, এমন সংশয় জাগে। আমি শেষের সে দিনের ভয়ঙ্কর
অবস্থার কথা ভেবে ঘেমে উঠি।

কুললক্ষ্মীর কপালেও ঘাম দেখা দেয়। অনেকক্ষণ বকবক করার জন্যে
অথবা বৈপ্লবিক একটি ভাবনা পাচার করার ফলেই কিনা কে জানে। ঈর্ষ
ক্রান্ত লাগে তাঁকে।

—আমি যাই এবার। তুইও এগিয়ে যা। আমি চারা দিয়ে গেলাম। এর
আর চারা নেই। বেচারাদের জন্যই এই চারা। লাগিয়ে দে। বিষবৃক্ষে ছেয়ে
যাক দেশ! চলি। তোরা জয় হোক।

বলতে না বলতেই উধাও কুললক্ষ্মী। আমি কুলকুল করে ঘামতে
থাকি। বোতলের দিকে হাত বাড়াই। এককোঁটা জলও আর তাতে নেই।
তেষ্টায় বুক ফাটে তবু মুখ ফোটে না। চি টি আওয়াজ বেরোয়।

ক্রমে সেই আওয়াজের জোর বাড়তে থাকে। শেষে সরাসরি কানে
তীরের মতো ঢুকে যেতেই ঘুম ভেঙে যায়। খড়মড় করে উঠে বসি। আর
চোখে ‘ড়ে একটা ছুঁচো বিচিত্র আওয়াজ মুখে ঘরময় ছোটাছুটি করছে।
আমার মতো লেখকদের ভেতরে কোঁচার পশুন বাইরে ছুঁচোর কেন্দ্রন দশা
দেখে বিষবৃক্ষের কথা মনে পড়ে যায়।

তবে কি সত্যিই লিখব। সেই বন্ধিমের বিষবৃক্ষ, নাকি, ইতিমধ্যেই
চতুর্দিকে সে বিষবৃক্ষ বেড়ে উঠেছে?

স্বপ্নে কুললক্ষ্মী ঠিক কী বলে গেলেন?

শিক্ষা প্রগতি সমাজসেবা অসাম্প্রদায়িকতা

পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতি

৩০/৩, আলিমুদ্দিন স্ট্রিট (চারতলা)

কলকাতা-৭০০ ০১৬

ফোন : ২৪৪-৭৫৬৯



OPEN UNIVERSITY OF ALTERNATIVE MEDICINES

Charter of Council of Alternative Systems of Medicines (Estd : 1985)
[Incorporated with the Act XXVI of 1961 of Govt. of West Bengal.
by virtue recognised by the Dept. of Health and family Welfare (Govt. of West Bengal)]

DIRECT ADMISSION 2003 SESSION

All Diploma & Degree Courses Accredited with

World Association of Universities & colleges (U.S.A.)

Chancellor :

Prof. Dr. Pradip Kr. Biswas, Ph.d., D.Sc. Professor & Researcher in
Alternative Medicines, Alternative Universaile pour La Paix Par La
Connaissance (Statute of UNESCO, ONU, UNICEF)

The University offers Diploma, Degree & Postgraduate Courses (Regular & Correspondence) in : Compound Homoeopathy (D.C.H.M.S., B.C.H.M.S.), Indo Allopathy (D.I.A.M.; B.I.A.M.) Yoga (Dip. Yoga), Naturopathy, (N.D.), Acupuncture (D.Acu., B.Acu.), Bach Flower Remedies, Electro Homoeopathy, Biochmic, Magneto Therapy, Physiotherapy (D.P.T., B.P.T.) Dental (B.D.A.S., L.D.A.S.) & M.D. (A.M.), Ph.D., D.Sc. etc.

Eligibility : For Diploma : 10 +, For Degree : 10+2 (Sc.) or Graduate in any system.

For Postgraduate Degree [M.D.(A.M.)] : any recognised medical qualification.

Age : No bar, **Duration :** Diploma -2 years + 6 months, Degree - 3 years + 6 months
Clinical training, Post Graduate degree -2 years. Practising registration [R.M.P.(A.M.)]
also given on experience basis.

**Successful Students Can Practice Throughout India,
Established as per article 19(6) Constitution of India**

Form & Prospectus available by hand of Rs. 100/- or by regd. Post Rs. 150/-

THE MEDICAL COLLEGE OF ALTERNATIVE MEDICINES

2. Canal Street, Moulali, (Entrance : Convert Road)
Kolkata - 700014 • Phone : 246-5037, Fax : 471-2164

**SEATS
LIMITED**

নাস্তিকের পূজা

সুনাত গঙ্গোপাধ্যায়

বয়সে এখনো তরুণ হলেও কলকাতার চিকিৎসক মহলে এখন ডাঃ সমীর রক্ষিতেব খুবই নামডাক। ছাত্রজীবনে শল্যচিকিৎসা শিক্ষায় তাঁর গুরু ছিলেন স্বনামধন্য ডাক্তার স্বরূপ গুপ্ত, যিনি এক সময়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানের আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো দীপ্যমান ছিলেন। অসাধারণ প্রতিভাশালী হলেও তাঁর কোনো উদ্ভাবিকারী ছিল না। তাঁর সমস্ত দক্ষতা সঙ্গে নিয়েই তিনি পবলোকে চলে যান। শল্যবিদদের খ্যাতি যেন গায়ক বা অভিনেতাদের খ্যাতির মতোই ক্ষণস্থায়ী। জীবৎকালে অসাধারণ সুনাম অর্জন করলেও মৃত্যুর পর তাঁদের প্রতিভা কখনো কেউ বেশিদিন মনে রাখে না। তার ছাত্রল্যান্ড উদাহরণ হলেন স্বরূপ গুপ্ত। তাঁর

নাম একদিন সকলেই জানত, আজ শুধু কয়েকজন চিকিৎসাবিদ ছাড়া তাঁকে আর কেউ মনে রাখেনি। যদিও চিকিৎসা-বিজ্ঞানে তিনি কোনো চিরস্থায়ী অবদান রেখে যেতে পাবেননি, তবু চিকিৎসাশাস্ত্রের সঠিক প্রয়োগে তাঁর দক্ষতা ছিল অপরিমিত, রোগীরা উপসর্গ দেখে তার রোগ নির্ণয়ের সহজাত ক্ষমতা তাঁর আয়ত্তাধীন ছিল। রোগীর মানসিক ধরন, বোগেব প্রকৃতি ও বহিরেব আবহাওয়া দেখে তিনি ঘণ্টা ও মিনিট গুনে, অপারেশনের সময় নির্ধারণ করতেন এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বোগ নিরাময়ে সফল হতেন। জীবৎকালে তাঁর সব উক্তিই ছিল আত্মবিশ্বাসে ভরা, তিনি যা বলতেন তা জোব দিয়েই বলতেন, তার মধ্যে কোনো দ্বিধা বা সংশয় থাকত না।

তবে ব্যক্তিগত জীবনে অতিবিক্ত আত্মশ্রুতির জন্য তিনি জনপ্রিয় ছিলেন না এবং এইজন্যই তাঁর খ্যাতি আজ আর সর্বজনবিদিত নয়। পৃথিবীর অনেক শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের মতোই তিনি ছিলেন কট্টর নাস্তিক। প্রথম যৌবন থেকে যিনি জীবিত ও মৃত মানুষদের দেহ ব্যবচ্ছেদে অভ্যস্ত ছিলেন এবং মনুষ্যদেহের অভ্যন্তরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হাতড়েও যিনি ধর্মতত্ত্বে উদ্বিগ্নিত 'আত্মা' নামক বস্তুটিকে খুঁজে পাননি, তাঁর পক্ষে ধর্মভীক হওয়া খুবই অস্বাভাবিক ছিল। মনুষ্যদেহের জটিল মস্তিষ্ককোষ ও স্নায়ুজালিকাকেই তিনি আত্মার পরিপূরক বলে মনে করতেন। অনেক মনীষীদের মতো নিজেব নাস্তিকতায় অননুতপ্ত থেকেই তিনি দেহত্যাগ করেন।

তাঁর শত্রুদের মতে, ডাঃ গুপ্ত তাঁর জীবনে অনেক নীচতাব পবিচয়ও বেখে গিয়েছিলেন যা তাঁর খ্যাতিকে স্নান করে দিয়েছিল। কিন্তু এগুলিকে তাঁর চবিরের বিপবীতমুখিতার নিদর্শন বলে ধবে নেওয়াই ঠিক হবে। তাঁর উন্নত মানসিকতার স্বরূপ বুঝতে না পেরে কিছু নির্বোধ ও হিংসুটে লোক এই আপাত বৈপবীত্যেব ভিত্তিতে তাঁর প্রতি অবিচাব করে তাঁর চরিত্রহননের চেষ্টা কবেছিল। শল্যচিকিৎসায় ডাঃ গুপ্তের পাবদর্শিতা প্রস্ভাতীত ছিল। তাই তাঁর শত্রুরা তাঁর অস্বাভাবিক আচরণ ও খামখেয়ালিপনাকেই তাদের আক্রমণেব নিশানা বানিয়েছিল। কোনো কোনো দিন কেতাদুবস্ত সাজপোশাকে তিনি সাদ্ধতেন পাক্কা সাযেব, আবার কোনো কোনো দিন তাঁর পরনে থাকত আধময়লা পাঞ্জাবি-পায়জামা। কোনো কোনো দিন তিনি তাঁর চেষ্টারে আসতেন তাঁর দামি বিলিতি গাড়িতে আবার কোনো কোনো দিন পায়ে হেঁটে। কোনোদিন ব্লগিদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার হত রক্ষ ও উদ্ধত আবার কোনোদিন নম্র, ভদ্র ও শিষ্টাচারসম্মত। কোনো কোনো সময়ে তিনি ছিলেন অমিতব্যয়ী, আবার অন্য সময়ে কৃপণ। তাঁর স্বভাবের এই পরস্পর বিবোধিতা তাঁকে এক বিতর্কিত চরিত্র করে



তুলেছিল। আপাত দৃষ্টিতে মানুষ ছিল তাঁর কাছে ঘৃণার পাত্র। কারণ তিনি ভিতর বাহির সব দিক থেকে তাদেব সত্যিকারের চেহারা দেখেছিলেন। একদিকে যেমন তিনি ছিলেন নীতিনিষ্ঠ ও ন্যায়পরায়ণ, অন্যদিকে তিনি ছিলেন সুরসিক ও বাকপটু। ডাঃ গুপ্ত শুধু কৃতী শল্যচিকিৎসকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন দূরদর্শী কূটনীতিবিদ। নিজেদের স্বয়ংক্রিয় তাঁর যেমন গভীর আত্মবিশ্বাস ছিল, তেমনই রোগীদেরও ছিল তাঁর ওপর অগাধ আস্থা ও নির্ভরতা।

হাসপাতালে ডাঃ স্বরূপ গুপ্তর যত সহকারী ছিল তাদের মধ্যে ডাঃ সমীর রক্ষিত ছিল তাঁর স্নেহভাজনদের অন্যতম। হাসপাতালে ‘হাউস সার্জন’ হয়ে যোগ দেবার আগে ডাঃ রক্ষিত ছাত্র হিসেবে কালীঘাটে একটি পুরনো ভাঙা বাড়িতে থাকত। তার জন্ম হয়েছিল দরিদ্র পরিবারে। কিন্তু দারিদ্র্যের ভারে নিষ্পেষিত হয়ে সে নিখাদ কঠিন হীরের টুকরো হয়ে বেরিয়ে এসেছিল। কঠিন পরিশ্রম ও জীবন সংগ্রামের আওনে পড়ে তাঁর চরিত্রে এসেছিল প্রশ্রুত সত্যতা ও দৃঢ়তা। সে হয়ে উঠেছিল এক স্পষ্টবাদী কর্তব্যনিষ্ঠ তরুণ। কিন্তু বন্ধুদের জন্য সময় ব্যয় করতে ও নিঃস্বার্থভাবে সাহায্য করতে সে ছিল অকৃপণ। সে নির্ভয়ে খুশিমনে তার দারিদ্র্যকে বহন করত, কিন্তু কোনোদিন কারো কাছে অর্থ সাহায্য চায়নি। তার এইসব গুণাবলীর সঙ্গে পরিচিত হয়ে ডাঃ গুপ্ত তাকে সহকারী হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন এবং তখন থেকেই তার সুসময়ের শুরু। ডাঃ গুপ্ত যখনই তাঁর বড়লোক রোগীদের বাড়ি থেকে ডাক পেতেন, তিনি সমীরকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। সেখানে সমীরের ভাগ্যেও মোটা দক্ষিণা ছুটত। তাছাড়া বসকাতার অভিজ্ঞতা সমাজের আচার ব্যবহার ও অনেক গোপন রহস্যও তার গোচরে আসত। এক কথায় ডাঃ গুপ্ত সমীরকে ডাক্তারি পেশায় দীক্ষা দিলেন আর সমীরও তাঁর একান্ত অনুগত হয়ে উঠল। ডাঃ গুপ্ত সমীরকে তাঁর পেশার অনেক গোপন তথ্য শিখিয়ে দিলেন, আর সমীরও তাঁর সব বিচিত্র চালচলনে ক্রমে ক্রমে অভ্যস্ত হয়ে উঠল।

একদিন সকাল নটার সময়ে কালীঘাটের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সমীর দেখল তার মাস্টারমশাই ডাঃ গুপ্ত কালীমন্দিরের ভেতর ঢুকে যাচ্ছেন। তিনি হেঁটে হেঁটে রাস্তা পার হয়ে চারদিকে তাকাতে তাকাতে যাচ্ছিলেন—যেন কোনো নিষিদ্ধ পন্থীতে ঢুকছেন। কৌতূহল চাপতে

না পেরে সমীর তাঁর পিছু নিল, কারণ তার ধারণা ছিল যে, ডাঃ গুপ্ত দেবদেবীতে বিশ্বাস করেন না। সে দেখল, ডাঃ গুপ্ত হাতে ফুল ও মিষ্টি নিয়ে খালি পায়ে মন্দিরের ভেতর ঢুকছেন একজন পাণ্ডাকে সঙ্গে নিয়ে। সমীরও তাঁর পিছু পিছু গিয়ে দেখল তাঁর মাস্টারমশাই—যাকে সে এতদিন কট্টর নাস্তিক বলে জ্ঞানে এসেছে—তিনি কালী প্রতিমার সামনে নতজানু হয়ে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করছেন। তারপর দেখল, তিনি দাঁড়িয়ে উঠে পাণ্ডার হাতে প্রণামী দিলেন। তারপর মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে ভিথিরিদের পয়সা বিতরণ করলেন। তারপর ছুতো পায়ে দিয়ে রাস্তা পার হয়ে তাঁর গাড়িতে উঠলেন। তাঁর গভীর ও একাগ্র চালচলন দেখে মনে হচ্ছিল যেন তিনি হাসপাতালে কোনো গুরুতর অসুস্থ রোগীকে ‘অপারেশন’ করছেন।

এই দৃশ্য দেখে সমীর হতভম্ব হয়ে গেল। এই সাতসকালে একলা, কোনো সঙ্গী না নিয়ে তার মাস্টারমশাই ভক্তিভরে পুজো দিয়ে গেলেন—এটা তো কৌতূকের ব্যাপার হতে পারে না। ব্যাপারটা একটু গভীরভাবে অনুসন্ধান করে দেখতে হবে, সে ভাবল। কিন্তু তার মাস্টারমশাইয়ের গতিবিধির ওপর সে গোয়েন্দাগিরি করেছিল—একথা সে কাউকে বলতে পারল না।

পরদিন হাসপাতালের কাজকর্মের শেষে ডাঃ গুপ্ত সমীরকে একটি রেস্টোরাঁয় নৈশভোজে ডাকলেন। খাওয়ার পর মিষ্টিমুখ করার আগে সমীর তাদের আলোচনাকে একটু ঘুরিয়ে ধর্মকর্মের প্রসঙ্গে এল এবং মন্দিরে পুজোপাঠ করাটা অর্থহীন অনুষ্ঠান বলে মন্তব্য করল।

“ওধু অর্থহীন?” ডাঃ গুপ্ত ফুঁসে উঠলেন, “পুজোপাঠ যাগযজ্ঞ, এগুলো হল বুদ্ধিরকি। মানুষকে ঠকানোর ধান্দা। পুজো আর ধর্মের নামে যত রক্তপাত হয়েছে, পানিপথ আর পলাশির যুদ্ধেও এত রক্তপাত হয়নি। পুজো হল মানুষকে শোষণের ফন্দি। আব এর ফাঁদে পড়ে প্রতারিত হয় শুধু নির্বোধ নিরক্ষর দরিদ্র জনসাধারণ।” মনের মতো একটা বিষয় পেয়ে ডাঃ গুপ্তর মুখে যেন ঝাঁ ফুটছিল এবং নাস্তিকের তুণে যত অস্ত্র আছে সবই তিনি প্রয়োগ করলেন এবং ধর্ম নিয়ে অনেক ঠট্টাতামাশা করলেন।

সমীর মনে মনে ভাবল, ইনিই কি সেই ধার্মিক ভদ্রলোক যাকে কাল সকালে কালীঘাটে ভক্তিভরে পুজো দিতে দেখেছিল? না তিনি অন্য

কোনো লোক? আর দু’জন যদি একই লোক হয়, তবে উনি কি নিজের ধর্মবিশ্বাসের কথা চেপে গিয়ে তার সঙ্গে ভণ্ডামি করছেন? কিন্তু ডাঃ গুপ্তকে সে তো অনেক দিন থেকে অন্তরঙ্গভাবে চেনে, তিনি তো এতদিন ধরে তার সঙ্গে সমস্ত বিষয়ে খোলাখুলি ভাবে আলোচনা করে এসেছেন। তাব মধ্যে ছলনা বা কপটতাব পরিচয় সে তো কোনোদিন পায়নি। সমীর সেদিন এই বিষয়ে আর কোনো কথা বলল না।

আস্তে আস্তে মাস তিনেক কেটে গেল। সমীর এ বিষয় নিয়ে আর খোঁজখবর করেনি, যদিও ঘটনাটা কঁটার মতো তার মনের মধ্যে গেঁথে ছিল। একদিন হাসপাতালের আর এক প্রবীণ ডাক্তার সমীরের সামনে ডাঃ গুপ্তর হাত ধরে তাঁকে প্রণাম করলেন, “বন্ধু, আমি ওনলাম কিছুদিন আগে তুমি কালীঘাটের মন্দিরে গিয়েছিলে? সেখানে তুমি কী করছিলে?”

ডাঃ গুপ্ত বললেন, “আমার এক পুরনো বন্ধুর অনুরোধে আমি সেখানে গিয়েছিলাম মন্দিরের এক পুরোহিতের চিকিৎসা করতে।”

তাঁর বন্ধু এই উত্তরে সন্তুষ্ট হলেন কিন্তু সমীর হল না। কারণ সে তো স্বচক্ষে তাকে পুজো দিতে দেখেছিল।

সমীর ঠিক করল, সে মাস্টারমশাইকে নজরে নজরে রাখবে। সে ঠিক করল, ডাঃ গুপ্তকে যেদিন সে কালীঘাটের মন্দিরে ঢুকতে দেখেছিল, তার ঠিক এক বছর বাসে একই দিনে একই সময়ে সে আবার কালীঘাটে যাবে। যদি ডাঃ গুপ্তকে সে আবার সেখানে দেখতে পায়, তাহলে এ ব্যাপার নিয়ে আরো কিছু গবেষণা করতে হবে। কারণ ডাঃ গুপ্তর মতো মানুষের চিন্তায় ও কাজে এত বৈপরীত্য থাকবে—তা ভাবা যায় না।

এর মধ্যে সমীর অন্য হাসপাতালে বদলি হয়ে গেল। সে আর ডাঃ গুপ্তর সহকারী বইল না। তবুও পনের বছর একই দিনে একই সময়ে সে কালীঘাটের মন্দিরের কাছে গিয়ে গা ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ঠিক নটার সময়ে সে দেখল, ডাঃ গুপ্তর গাড়ি এসে রাস্তার ধারে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে নেমে ডাঃ গুপ্ত আস্তে আস্তে হেঁটে মন্দিরের চত্বরে ঢুকলেন। তিনি যে ডাঃ গুপ্ত ছাড়া আর কেউ নন, সে বিষয়ে সমীরের আর কোনো সন্দেহই রইল না। নামি হাসপাতালের প্রধান শল্যচিকিৎসক, বিশ্বাসে কট্টর নাস্তিক, কিন্তু কাজে ধর্মোচাৰী! রহস্য যেন ঘনিয়ে

আসছে। পূজো দিয়ে ডাঃ গুপ্ত চলে যাবার পব সমীব মন্দিরের ছুতো রাখাব জায়গায় গিয়ে সেখানকার লোকটিকে জিজ্ঞেস করল, ডাঃ গুপ্তকে আগে কখনো দেখেছে কিনা।

লোকটা বলল, “আমি তো এখানে কুড়ি বছর ধরে আছি। তাব মধ্যে প্রতি বছরই আমি ঐ ভদ্রলোককে একবার কবে এখানে আসতে দেখেছি। আমাকে উনি প্রচুর বখশিসও দেন।”

মন্দিব থেকে বেবিয়ে আসতে আসতে সমীব ভাবল, কুড়ি বছর ধরে প্রতি বছর ডাঃ গুপ্ত এখানে এসেছেন। এ রহস্য তো দুর্ভেদ্য বলে মনে হচ্ছে।

ইতিমধ্যে ডাঃ গুপ্তের সঙ্গে সমীরের বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠলেও তাঁব চরিত্রের এই বিচিত্র দিকটির সম্বন্ধে আলোচনার কোনো সুযোগ সে পায়নি। শেষ পর্যন্ত প্রায় বছর সাতেক বাদে, আবার একদিন কালীঘাটের বাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে সমীব ডাঃ গুপ্তকে মন্দিরে ঢুকতে দেখল। এবাবে সমীর ভাবল, আর দেরি নয়, আজকেই সে এই রহস্যের কিনারা করবে। সে ডাঃ গুপ্তব পিছন পিছন হেঁটে মন্দিরের ভেতর ঢুকে তাঁব পাশেই হাঁটু গেড়ে বসল এবং একই সঙ্গে পূজো দিল। ডাঃ গুপ্ত তাকে দেখলেন, কিন্তু মুখে কোনো বিষয় প্রকাশ কবলেন না।

মন্দিব থেকে বেরোবার সময়ে হাঁটতে হাঁটতে সমীব ডাঃ গুপ্তকে জিজ্ঞেস কবল, “স্বকপদা, আপনার এই বকধার্মিকতাব রহস্যটা আমাকে আজ খোলসা করে বলবেন কি? আপনাকে আমি বাব ভিনেক দেখেছি এখানে পূজো দিতে। আপনার মতামত ও আচরণের মধ্যে এই ভয়ঙ্কব গায়িমলের কাবণটা কি? আপনি ঈশ্ববে বিশ্বাস করেন না, কিন্তু কালীঘাটে নিযমিত পূজো দেন। আজ আপনাকে আমার প্রশ্নের উত্তর দিতেই হবে।”

“আমি হলাম অনেক বিড়ালতপস্বী বাজ্জনৈতিক নেতাব মতন—বাইরে ধার্মিকের মতো চেহারাব কিন্তু ভেতবে ভেতবে কট্টর নাস্তিক।” ডাঃ গুপ্ত বললেন।

“এসব বলে কথা এড়ালে চলবে না।” সমীর বলল, “আপনার নিযমিত কালীঘাটে পূজো দেওয়ার পেছনে নিশ্চয়ই কোনো গূঢ় কারণ আছে। সেইটাই আমি জানতে চাই।”

ডাঃ গুপ্ত বললেন, “তুমি আমার বখদিনের বন্ধু। আমাব এখন দিন ফুবিযে এসেছে, তাই

তোমাব কাছে সব কথা খুলে বলতে বাধা নেই। তাহলে আমাব জীবনের গোড়াব দিক থেকে গুঢ় কবতে হবে। চলো, আমবা কোথাও গিয়ে বসি।”

গাড়ি তখন আলিপূব রোড দিয়ে ‘উড়ল্যাণ্ডস্ নার্সিং হোমে’র দিকে যাচ্ছিল। তাঁবা ‘হটিকালচার গার্ডেনে’র পাশে এসে গাড়ি থামালেন, তাবপব গেট দিয়ে ঢুকে বাগানের ভেতব একটা ভালো জায়গা দেখে বসলেন। তারপব ডাঃ গুপ্ত তাঁব জীবনকাহিনী বলতে গুঢ় কবলেন—

“আমার ছেলেবেলা অসম্ভব দাবিদ্দের মধ্যে দিয়ে কেটেছে। তুমিও গবিবেব ছেলে ছিলে, কিন্তু আমাব দুরবস্থাব কথা তুমিও কল্পনা করতে পাববে না। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, অর্থাভাব—সববকম দুঃখকষ্ট আমি কৈশোবে সহ্য কবেছি। এমনকি পবনের জানা-ছুতোও অনেক সময়ে আমাব ছিল না। আমি একা থাকতাম। আমাব স্পর্শকাতব বদমেরজার্জি স্বভাবের জন্য আমাব কোনো বন্ধুও ছিল না। আমার বাবা—যিনি সফঃস্বলে থাকতেন—সামান্য কিছু পকেটখরচা ছাড়া আমাকে আব কিছু পাঠাতে পাবতেন না। রুটিব দোকান থেকে দুদিনের বাসি কটি সস্তায় কিনে জলে ডুবিয়ে খেয়ে আমি দুপুরের খাওয়া সাবতাম। বাত্রেব খাবার খেতাম একদিন অতব—পাইস হোটেল গিয়ে। হেঁড়া জামা আর ছুতো পরে আমি ঘূবে বেড়াতাম। বড় হোটেল বেস্তোরীওলোর দিকে তাকিয়ে আমি ভাবতাম, জীবনে কোনোদিন কি ওগুলোয় ঢুকতে পাবব? রাত্রে পড়াওনাব জন্য আমি যে বাতি জ্বালাতাম, তাব তেলের খবচ ছিল আমাব খাবাব খবচের থেকে বেশি। দীর্ঘদিন আমি এই কষ্টকব সংগ্রাম চালিয়েছি, কোথাও থেকে আমি সমবেদনা পাইনি। পয়সার অভাবে আমার বন্ধুও জোটেনি। সেই নাবকীয় সামাজিক অবস্থা থেকে আমি তখন ওপবে ওঠার চেষ্টা করছিলাম, আমাব এই অস্তিত্ব থেকে বেরিয়ে এসে জীবনে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করাব জন্য আমি জ্ঞান আহবণের চেষ্টায়। টাকা আমার ছিল না। আজকে আমার যে সব বড়লোক ‘পেশেন্ট’রা আমাব অত্যধিক ‘ফী’-এব জন্য অভিযোগ করে তাবদেব আমি দেখতে, চাই আমাব সেদিনকার অবস্থায়—যখন আমি সেই শহরে ছিলাম একা, কপর্দকহীন, বন্ধুহীন, আব আমার দুটো হাত ছাড়া আমাব আব কোনো সম্পদ ছিল না। সমীর, মাঝে মাঝে তুমি আমার যে ব্রহ্ম ও তিস্ত মূর্তি দেখেছ তা সমাজের উপর মহলের স্বাধিপবতা ও সংবেদনহীনতার নগ কপ

দেখে। আমার দানিদ্ৰ্য ও পববর্তীকালে আমাব সাকল্যাব মধ্যে তাবদেব ঘৃণা, ঈর্ষা ও অপবাদ সাংঘাতিক বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মাঝারি মাপেব মানুষেবা প্রতিভাবান মানুষদেব ওপবে ওঠাব পথে যে বাধাব সৃষ্টি কবে তাব বিবন্ধে আমাকে প্রতি পদে লড়াই করতে হয়েছিল। বন্ধু, আমার জীবনেব এইসব তিস্ত অভিজ্ঞতা আমাকে গুধু ঈশ্বরে অবিশ্বাসী করে তোলেনি, মানুষেব প্রতিও অবিশ্বাসী কবে তুলেছিল।

“বাই হোক, ডাক্তাবি ছাড়া জীবনে আব কোনো বৃত্তি অনুসরণ কবব না—এই অদ্ভুত খ্যাপানি আমাকে তখন পেয়ে বসেছিল। হাড়কাটা লেনের সেই বস্তিতে থেকে ডাক্তারি পবীক্ষাব জন্য আমি তৈরি হচ্ছিলাম, কিন্তু আমার পকেট ছিল কপর্দকশূন্য। আমাব মনে একটা ক্ষীণ আশা ছিল যে আমাব বাবা হয়ত কিছু টাকা ছোঃগাড কবে শেষ মুহুর্তে দেশ থেকে আমাকে পাঠাবেন। কিন্তু সে আশা সফল হল না। একদিন অনেক রাত্রে যখন আমি বাসায় ফিরলাম, ঠিক সেই সময়ে আমার প্রতিবেশী জগন্নাথও ফিরে এল। সে ছিল পেশাম ঠেলাওয়ালাব, আমাব পাশেব ঘবে থাকত। দীর্ঘদিন ধরে পাশাপাশি ঘবে থেকে আমাবা পরস্পরের বন্ধু হয়ে উঠেছিলাম। যদিও সে ছিল আমাব থেকে বয়সে অনেক বড়। সে আমাকে খবর দিল যে বাড়িওয়ালাব সাবাদিন ধবে আমাব খোঁজ করেছেন, পাচ মাস বাড়িভাড়া বাকি থাকার জন্য তিনি আমাকে কাল সকালেই বাসা ছেড়ে চলে যেতে বলেছেন। জগন্নাথকেও তিনি চলে যেতে বলেছেন, কাবণ বস্তির সামনে তিনি ঠেলা বাখতে দবেন না।

শুনে আমাব মাথায় যেন বজ্রাঘাত হল। সকালে উঠে নতুন বাসা আমি কোথায় খুঁজতে যাব? আমার বাস্ত্র বিছানা ও ডাক্তারি বইপুস্তর নিয়ে কোথায় গিয়ে উঠব? তাব ওপর সামনে পবীক্ষা, নষ্ট করাবাব মতো সময় আমার নেই। এই সব সমস্যার কথা ভাবতে ভাবতে আমার চোখে জল এসে গেল। দুর্ভাবনায় সাবা রাঙির আমাব ঘুম হল না।

“পরদিন সকালে উঠে বাসি কটি দিয়ে আমি যখন প্রাতরাশ সারছি, তখন জগন্নাথ এসে তার দেহাতি বাংলায় আমাকে বলল, তুমি হলে লেখাপড়া জানা বড়মানুষ, আর আমি মুখ্যস্থায় গরিব লোক। কিন্তু তোমাব অবস্থা তো দেখছি আমার থেকেও খাবাপ। শোনো, বাইরে আমার একটা ঠেলা আছে, সেই ঠেলায় তোমাব ও

আমার সব মালপত্র ধরে যাবে। তুমি যদি চাও, তাহলে আমরা দু'জনে মিলে পথে বেরিয়ে আমাদের দু'জনের মাথা গোঁজার মতো নতুন কোনো ঠাই খুঁজে নেব।

‘তোমাকে অনেক ধন্যবাদ, জগন্নাথ’, আমি বললাম, ‘কিন্তু তুমি তো আমার অবস্থা জানো না। আমার পকেটে এখন পাঁচটা টাকাও নেই।’

‘জগন্নাথ হাসিমুখে বলল, ‘আমার কাছে কিছু টাকা আছে, যা আমি ঠেলাভাড়ার পয়সা থেকে জমিয়েছি।’ এই বলে সে পকেট থেকে একটা শতজীর্ণ চামড়ার মানিব্যাগ বার করল। তাই থেকে সে তার ও আমার বকেয়া বাড়িভাড়া বাড়িওয়ালাকে চুকিয়ে দিয়ে এল। তারপর আমাদের দু'জনের মালপত্র ঠেলাগাড়িতে তুলে ঠেলতে ঠেলতে আমরা দু'জন রাস্তা দিয়ে হেঁটে চললাম। পথে যত সস্তা বাসা বা বস্তিবাড়ি চোখে পড়ল, সব জায়গাতেই খোঁজ নিতে লাগলাম। এমন করে দুপুর গড়িয়ে গেল, কিন্তু আমাদের সাথে কুলায়, এমন কোনো থাকার জায়গা খুঁজে পেলাম না। রাস্তায় ঠেলা রেখে একটা পাইন্স হোটেলে আমরা কিছু খেয়ে নিলাম। জগন্নাথই পয়সা দিল। শেষ পর্যন্ত সন্দের দিকে তালতলাব এক পুরনো বাড়ির একতলায় সিঁড়ির নিচে একটা ছোট ঘর আমরা পেয়ে গেলাম। বাড়িভাড়াও সাধের ভেতরেই। সেখানেই আমরা উঠলাম। রাতে আবার বাইরে যেতে গেলাম। সেখানে জগন্নাথ আমাকে বলল, এতদিন ঠেলা চালিয়ে সে হাজার দশেক টাকার মতো ব্যাঙ্কে জমিয়েছে। তার স্বপ্ন হল— সেই টাকা দিয়ে সে একটা পুরনো টেম্পো কিনবে তাবপর সে ঠেলাগাড়ি ছেড়ে দিয়ে টেম্পো চালাবে। তার জন্য গাড়ি চালানো সে ইতিমধ্যে শিখে নিয়েছিল। তখন আমিও তাকে আমার স্বপ্নের কথা বললাম। সে আমার এত কাছের মানুষ হয়ে উঠেছিল যে তার কাছে আমি আমার হৃদয় উজাড় করে দিলাম। তাকে বললাম—আমার স্বপ্ন হল ডাক্তারি পাশ করে ‘সার্জন’ হওয়া, যার ফলে আমি আমার দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পাব আর আমার মতো গরিবদের সাহায্য করতে পারব। আমার কথা শুনে জগন্নাথের চোখমুখ যেন বদলে গেল। সে বলল, ‘তোমার টাকার প্রয়োজন আমার থেকে বেশি, বড় হওয়া তোমারই বেশি দরকার।’ বাইশ বছর ধরে সে ঠেলা চালিয়েছিল। আমার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য তার এতদিনের জমানো টাকা দিয়ে আমাকে সাহায্য করতে সে প্রতিশ্রুত

হল।’

কথা বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে ডাঃ গুপ্ত এয়ারে সমীবেব হাত চেপে ধরলেন, বললেন, ‘আমার ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য যে টাকা আমার দরকার ছিল, তা সে নিজের জমানো টাকা থেকে দিয়েছিল। জগন্নাথ বুঝেছিল যে, আমার জীবনের একটা মহৎ লক্ষ্য আছে, আমার মেথাকে প্রযুক্তি করার প্রয়োজনীয়তা তার নিজের আর্থিক প্রয়োজনের থেকে বেশি। সে আমাকে যেন ‘দস্তক’ নিল। আমাকে ‘ছোট ভাই’ বলে ডাকতে শুরু করল। আমি যখন লেখাপড়া করতাম, সে এসে চুপ করে বসে আমায় দেখত। আমার খাবার পয়সা না থাকলে খাবার কিনে এনে দিত, বই কেনার পয়সা না থাকলে বই কিনে দিত। সে তার হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ আমাকে উজাড় করে দিয়েছিল। তাকে ভালোবাসার মতো কেউ ছিল না, শুধু ছিল তার পোষা একটা নেড়ি কুকুর, সে-ও মারা গিয়েছিল। সে আমার কাছে মাঝে মাঝে সেই কুকুরটার গল্প করত, আর জানতে চাইত—তার আত্মার শান্তির জন্য ঈশ্বরের কাছে পুজো দিলে তিনি নেবেন কিনা। সে বলত, তার কুকুরটা ছিল সত্যিকারের ধার্মিক, দশ বছর ধরে সে তাব সঙ্গে কালীঘাটের মন্দিরে যেত, মন্দিরে পুজোর সময়ে স্তোত্রপাঠ ও ঘণ্টাধ্বনি হলে চুপ করে মন দিয়ে শুনত, আর তাব পাশে বসে চোখ বুঁজে মুখ উঁচু করে যেন প্রার্থনা করত।

‘আমার মতো একজন নিঃস্ব নিঃসঙ্গ মানুষকেও জগন্নাথ মাযের আদরে প্রতিপালিত করল। আবার আমাকে শ্রদ্ধার আসনেও বসাল। সে আমার ফাইফরমাস খাটত, ভোরবেলা পড়াশুনোর জন্য আমাকে জাগিয়ে দিত, ঘর পরিষ্কার করত, আমার বাতি সাফ রাখত। সে জানত তার উদ্দেশ্য ছিল মহৎ, তাই তার আচরণও ছিল মর্যাদাপূর্ণ।

‘আমি যখন ডাক্তারি পড়া শেষ করে হাসপাতালে শিক্ষার্থী হয়ে যোগ দিলাম, তখন আমাকে হোস্টেলে গিয়ে থাকতে হল, আমাকে বিদায় দেবার সময় সে খুব কান্নাকাটি করল। কিন্তু আমার ‘থিসিস’ তৈরি করাব জন্য যে টাকার দরকার, সেটা দিতে পাবে সে মনে সাধুনা পেল। আমি ছিলাম তার গর্বের পাত্র। আমার যখন কাজ থাকত না, তখন সে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসত। আমার ‘থিসিস’ যদি তুমি পড়ে থাকো, তাহলে হয়ত লক্ষ্য করেছ যে, সেটি তাকেই উৎসর্গ করেছিলাম।

‘ডাক্তারি পেশা শুরু করার কয়েক বছর পরে আমার জমানো টাকা থেকে একটি নতুন টেম্পো কিনে আমি একদিন জগন্নাথের ধার শোধ করতে গেলাম। আমি আমার টাকা এভাবে নষ্ট করেছি বলে সে প্রথমে খুব রাগ করল, কিন্তু তাব এতদিনেব স্বপ্ন সার্থক হওয়াব জন্য সে মনে মনে খুশিও হল। চোখ থেকে জল মুছে তার টেম্পোর দিকে তাকিয়ে সে বলল, নতুন গাড়িটা খুব সুন্দর হয়েছে। কিন্তু আমার জন্য এত টাকা খরচ করা তোমার উচিত হয়নি। ‘এই বলে সে আমাকে জড়িয়ে ধরল। আমার সাফল্যে সে দারুণ খুশি হয়েছিল। কিন্তু সে কোনোদিন বলেনি যে এ সব কিছুর জন্য তাব কাছে আমি ঋণী। তবু দু'জনেই মনে মনে জানতাম যে, জগন্নাথের সাহায্য না পেলে আমার লক্ষ্যে আমি সফল হতে পারতাম না। সে আমার কল্যাণের জন্য নিজেকে নিঃশেষ করে দিয়েছিল।

‘কিন্তু নতুন টেম্পো চালানোর সুখ জগন্নাথ বেশিদিন উপভোগ করতে পারেনি। সে যক্ষ্মারোগে অসুস্থ হয়ে পড়ল। আমি সাবরাত তার শয্যার পাশে জেগে বসে থাকতাম। অসুখ থেকে আমি তাকে সারিয়ে তুললাম। কিন্তু দু'বছর বাদে সে আবার অসুস্থ হয়ে পড়ল। চিকিৎসা বিজ্ঞানের এত উন্নতিও আমার যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও তাকে আমি বাঁচাতে পারলাম না। ডাক্তার-হিসেবে সাফল্যের শিখরে ওঠার শেষ ধাপ পর্যন্ত আমি তাকে কাছে পেতে চেয়েছিলাম, কারণ আমি ছিলাম তারই সৃষ্টি। সেই সৃষ্টির সার্থকতা দেখিয়ে আমি তাকে সুস্থী করতে চেয়েছিলাম, আর আমার হৃদয়ে যে কৃতজ্ঞতার আগুন জ্বলছিল তাকে প্রশমিত করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তা হল না।’

ডাঃ গুপ্ত থেমে একটু দম নিলেন। গভীর আবেগের ছাপ তাঁর মুখে পড়েছিল। তারপর আবার বলতে শুরু করলেন, ‘জগন্নাথ—আমার দ্বিতীয় পিতা—আমার কোলে মাথা রেখে মারা গেল। তার হৃদয়ে ছিল পবিত্র ধর্মবিশ্বাস। সে মা কালীকে নিজের মাযের মতো ভালবাসত ও পুজো করত। নিজে গভীরভাবে ঈশ্বর-বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও আমাব নাস্তিকতা সম্বন্ধে সে কোনোদিন কোনো মন্তব্য করেনি। মৃত্যুশয্যায় শুয়ে সে শুধু চেয়েছিল, প্রতি বছর তার মৃত্যুদিনে কালীঘাটের মাযের মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে আমি যেন তার আত্মার শান্তি কামনা করি। তার দুঃখ ছিল, তার জীবনে সে পুরোপুরিভাবে ঈশ্বরে

নিবেদিত প্রাণ হতে পারেনি। স্বর্গ বলে যদি সত্যি কিছু থাকে, সেখানে তার জায়গা না হলে আর কার হবে? তার শেষযাত্রায় আমিই ওধু তার সঙ্গী ছিলাম। শ্মশান থেকে ফেরার পবে আমার জীবনের একমাত্র শুভাকাঙ্ক্ষীর ঋণ শোধ করার কথা আমি ভাবতে থাকলাম। জগন্নাথ বিয়ে করেনি, তার কোনো বন্ধু বা আত্মীয়ের কথাও আমি জানতাম না। তার মৃত্যুশয্যায় তার আত্মার শান্তির জন্য জগন্নাথ খুব দ্বিধাভরে যে অনুরোধ করেছিল, তার অন্যথা করার কোনো অধিকার আমার ছিল না, যদিও সে সম্ভ্রানে কখনো চাইত না যে আমি তার ঋণ শোধ করি।

“তার পর থেকেই প্রতি বছর জগন্নাথের মৃত্যুর দিনে কালীঘাটে গিয়ে পুজো দিয়ে আসি, তাব আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করি। আমি মা কালীকে বলি যে, সে যদি জীবনে কোনো পাপ করে থাকে, তবে তার প্রাপ্য শাস্তি তুমি মৃত্যুর পরে আমাকে দিও, যাতে জগন্নাথের আত্মার অক্ষয় স্বর্গলাভ হয়।” আমার মতো নাস্তিকের পক্ষে এর থেকে বেশি আর কী করা সম্ভব?

* * * *

ডাঃ গুপ্তর শেষ সময়ে সমীর তাঁর শয্যাপাশে

ছিল। কিন্তু এই বিখ্যাত শল্যবিদ শেষ জীবনেও তাঁর বিশ্বাসে অবিচল ছিলেন কিনা তা সে জোর করে বলতে পারে না। ধর্মবিশ্বাসীদের ভাবতে ভালো লাগবে যে, ইহলোকে যেমন জগন্নাথ তাঁর জন্য জীবনে সার্থকতার দ্বার খুলে দিয়েছিল, তেমনি পরলোকেও সে তাঁর জন্য স্বর্গের দ্বার খুলে দাঁড়িয়ে থাকবে।

[ফরাসি কথাসাহিত্যিক অনরে দ্য বালজাকের বিখ্যাত ছোটগল্প “La Messe de l’Athee” অবলম্বনে।]

With Best compliments From :

ROYAL CONSTRUCTION

9/D, R.K. Chatterjee Rd.

KOLKATA-700042.

Contact : Mr. Bratin Sarkar, Footballer
442-2425

সাহিত্যের স্বাভাবিকতা

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়



নিজদের জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা এখনকার মানুষের কর্ম নয়। পরনির্ভরতা যত কমছে, পরজীবনের প্রতি কৌতূহল আমাদের তত বাড়ছে। গ্রামাঞ্চলে লেখাপড়া না-জানা মানুষ, শহরের গায়ে-গতরে খেটে খাওয়া মানুষ সময় পেলেই এ-ওর বাড়ি যায়, এর মামা ওর পিসের খবর করে। মহিলারা নিরপরাধ মুখে পাশের বাড়িতে গিয়ে শাকের ঘণ্ট বা নারকোল নাড়ু দেবার ছলে সে বাড়ির হালচাল জেনে আসে। গিমির পেট থেকে খবর সংগ্রহ কবে। বাড়ির যুবতী মেয়েটিকে দেখতে না পেয়ে প্রশ্ন করে, সে কোথায় গেল। ছুকছুক করে গন্ধ শুঁকে আন্দাজ করতে চায়, এ বাড়িতে কাল রাত্রে মদের আড্ডা বসেছিল কিনা।

এর কারণ, নিজের একটা জীবন বড় একঘেয়ে। সেখানে কোনো বৈচিত্র্য নেই। নিরন্তর অভ্যাসে প্রেম আছে কি নেই বোঝা মুশকিল। যারা আপিস-ইশকুলে যায়, তাদের একটা বাহির-জীবন আছে। কিন্তু যারা সংসারে বন্দী মেয়েমানুষ, তাদের কৌতূহল মেটে কী করে। এই অবস্থান

থেকেই খবরের কাগজের জনপ্রিয়তা এসেছে। একটা কাগজে অনেক খবর থাকে। খুন, ভ্রম, হত্যাকাণ্ড, ধর্ষণ, বাক-বিতণ্ডা, রাজনীতির কূট-কচালি। আবার খেলা, নাটক, সংস্কৃতি, নাচগান—তারও খবর আর সমালোচনা থাকে। রসালো প্রচ্ছদ নিবন্ধ থাকে আকর্ষণীয়। পেট ভরে যায়।

যারা লেখাপড়া জানে, তারা এর ওপর গল্প-উপন্যাস পড়ে। গল্প-উপন্যাসে কী থাকে? পবেব ঘরের ঘটনা, কাণ্ড-কারখানা, দুর্ভোগ আর রসের কথা। রোগ, শোক, বিবাহ, জন্ম-মৃত্যু, নর-নারীর সম্পর্ক নিয়ে আলাপ-আলোচনা। যে সব জীবন সম্বন্ধে আমার কোনো জ্ঞান নেই, যেমন, খুব বড়লোক জমিদার, শিকারী ফুর্তিবাজ মদ্যপ, লম্পট, আবার অভিজাতী, খুনি-ডিটেকটিভ চক্র—প্রেমিক-প্রেমিকা, এদের খবরাখবর আমরা গল্প-উপন্যাসে পাই। কাল্পনিক হলেও সে রচনা উপভোগ্য। যে লেখক যত উপভোগ্য কাহিনী রচনা করেন তিনি তত বেশি জনপ্রিয়।

এখন বই পড়ার নেশা একটু টাল খেয়েছে টিভির কল্যাণে। সেখানেও সংবাদপত্র আর গল্প-উপন্যাসের খোরাকই থাকে আরো জীবন্তভাবে। লোকে অভিনয় করে দেখায়। সেখানে দূর-দূরান্ত দেশের মানুষের কথা, জীবজন্তুর কথা, পাহাড়-পর্বত বনানীর ছবির সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে থাকে। তবু বই পড়ার মধ্যে যে নির্জন উপভোগ্য, তা টিভিতে নেই। টিভি প্রোগ্রামে কোনো নিষ্পত্তি নির্বাচন নেই। যা দেখাবে, তাই দেখতে আমি বাধ্য। আব উপবস্ত সেখানে থাকে বিজ্ঞাপনের উৎপাত, যা সহ্যের অতীত।

বলছিলাম উপভোগ্য কাহিনীর কথা। যে লেখক যত বেশি উপভোগ্য কাহিনী রচনা করেন, তিনি তত বেশি জনপ্রিয় হন। সে কাহিনী যদি অলীক, কাল্পনিক, আজগুবি হয় তাতেও কিছু যায় আসে না, যদি উত্তেজক পদার্থ কিছু থাকে। ক্রাইম বা অপরাধ একটা উত্তেজক পদার্থ। ভায়োলেট বা হিংসা, বীভৎসতা আব একটা উত্তেজক পদার্থ। ভয় একটা উত্তেজক পদার্থ। এইসব উপাদান এখন সাহিত্যে প্রবেশ করেছে। কিন্তু সাহিত্যের প্রধান গুণ এখনো তার স্বাভাবিকতা; যে ঘটনা জীবনে প্রতিদিন না ঘটলেও ঘটতে পারে, তার সম্ভাবনা আছে, সেই ঘটনার বর্ণনা ও বিশ্লেষণ। যাতে আমি আমার জীবনের সঙ্গে তুলনা করতে পাবি। আমার স্বপ্নের সঙ্গে মেলাতে পারি। আমার আদর্শের সঙ্গে যার বিরোধ নেই।

নর-নারীর প্রেম ও যৌনতা বিষয়ক আলোচনা এখনে প্রাসঙ্গিক। প্রতিটি সংসারে বাবা-মা, দাদা-বৌদি, দিদি-স্বামীবাবু, ঝি-চাকর আছে। বালক-বালিকা বাদ দিলে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবনে যৌনতা আছে। সে যৌনতার আড়াল আছে। তা সর্বসমক্ষে প্রকাশিত নয়। কারণ প্রকাশিত হলে তাব সৌন্দর্য নষ্ট হয় বলে লোকেদের ধারণা। আবার আধুনিক মনোবিদদের অভিমত হচ্ছে যে, সাহিত্য সত্যের উন্মোচন ঘটাবে এবং জীবনের অনেক সত্য, সাধারণ মানুষের চোখের আড়ালে, বেডরুমে, বাথরুমে, নির্জন নদীতীরে, জঙ্গলে ঘটে—তার বিবরণও সাহিত্যের পক্ষে

জরুরি। তাই কালক্রমে বেডরুমের আর বাথরুমের ঘটনা ও দৃশ্য সাহিত্যে প্রবেশ করেছে। স্ত্রী-পুরুষের নগ্ন দেহের আলোচনা এখন মানুষ পড়ছে। সহ্য করছে। সেই সঙ্গে পড়ছে কামকলার ইতিবৃত্ত। বিবাহিত নয়, এমন স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে যৌন মিলনের কাহিনী—তার বিশদ বর্ণনা ও বিশ্লেষণ। তার বিভিন্ন বৈচিত্র্য আবাদন করছে সাহিত্যের পাঠক। টিভির দর্শক ততটা নয়। কেননা ছবির বর্ণনা ভাষার বর্ণনাব চেয়ে একশোগুণ অধিক উত্তেজক। আড়াল থাকলে সে বস্তু অশ্লীল হবে না।

সাহিত্যে অশ্লীলতা চলবে না, কেন না দেশে অশ্লীলতা বিরোধী আইন আছে। সেটি হল ভারতীয় দণ্ডবিধি—২৯২ ধারা এবং সেই ধারায় আনীত যাবতীয় মামলার বিচারকদের বায়।

সংক্ষেপে সে বিষয়ে একটু আলোচনা করব।

অশ্লীলতা কী? নর-নারীর নগ্নতার বিবরণ অশ্লীল নয়, যদি তা শিল্পের অন্তর্গত হয়। যদি কোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রকাশ করতে মানুষের দেহের বিশেষ বর্ণনা দিতে হয়, বা কোনো বিষয় শিক্ষা দিতে দেহের ক্রিয়াকলাপ উন্মোচিত করতে হয়, তাহলে তা-ও অশ্লীল বলে গণ্য হবে না।

যদি কোনো ধর্মীয় উদ্দেশ্যে অনাবৃত নরনারীর দেহ ও দেহক্রিয়া ব্যবহার করা হয় বা যদি কোনো প্রাচীন মন্দিরের মধ্যে বা স্মৃতিসৌধের গায়ে উন্মোচিত রসলীলার রেখাচিত্র বা রঙিন চিত্র বা ভাস্কর্য থাকে, তাহলেও তা ব্যতিক্রম বলে গণ্য হবে।

এছাড়া সরকারি নীতি অনুযায়ী দেশে বহুদিন ধরে জন্মনিয়ন্ত্রণ, যৌনব্যতির প্রতিকার, এইডস রোগের নিবারণ জনিত প্রচার-পুস্তিকা বিতরণ করা হচ্ছে। বড় বড় বিজ্ঞাপন বেরোচ্ছে হোর্ডিং-এ, দেয়ালচিত্রে। মানুষকে সাবধান ক'বা হচ্ছে, যৌনব্যভিচার জনিত বিপদে যেন জড়িয়ে না পড়ে। এমনকি, কোথাও কোথাও বিনামূল্যে কন্ডোম অবধি বিতরণ করা হচ্ছে, তার ব্যবহারবিধি শিখিয়ে দেওয়া হচ্ছে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। স্কুল-কলেজে যৌন শিক্ষা চালু হওয়ার কথা উঠেছে, যা আগে ছিল না। এখন যৌন জ্ঞান অনেক উন্মুক্ত, আজ থেকে কুড়ি-পঁচিশ বছর আগেও যা ছিল না।

তিনটি মামলায় সুপ্রিম কোর্ট যে রায় দিয়েছেন, সেই রায় অনুসারে

অশ্লীলতা এখন নির্ধারিত হবে। প্রথম মামলা, রঞ্জিত উদেশী (১৯৬৫), দ্বিতীয়টি চন্দ্রকান্ত কল্যাণদাস কাকোদকর (১৯৬৯) এবং তৃতীয়টি হল, সমরেশ বসু বনাম অমল মিত্র বা প্রজাপতি মামলা। এব আগে এ বিষয়ে শেষ কথা বলেছিলেন জাস্টিস কক্‌বার্ণ—হিক্লিনের মামলায় (১৮৬৮)। ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট তাঁর রায়ের মূল বক্তব্য সমর্থন করেছে। সেই মূল বক্তব্য হল—

অভিযুক্ত গ্রন্থ বা গ্রন্থের অংশ তখনই অশ্লীল বলে গণ্য হবে যখন সেখানে বর্ণিত দৃশ্য বা বিবরণ “is likely to deprave and corrupt those whose minds are open to influences of this sort and into whose hands the book is likely to fall.” অর্থাৎ পাঠকের নৈতিক চরিত্র কলুষিত ও দূষিত করবে, এমন অংশ তার মধ্যে থাকা দরকার। এটিও আপেক্ষিক প্রশ্ন। প্রজাপতি মামলায় দু'জন বিশিষ্ট সাহিত্যিকের সাক্ষ্য নেওয়া হয় এবং তাঁরা অভিমত দেন যে, উক্ত উপন্যাসের নগ্নতার বিবরণ কোনো পাঠকের নৈতিক চরিত্র কলুষিত করবে না।

আব একটি শর্ত আছে। সেটি হল, একটি প্রকাশিত বস্তু অশ্লীল বলে গণ্য হবে যদি “it is lascivious or appeals to the prurient interest” ...। এখানে lascivious শব্দের অর্থ হল—কামোদ্দীপক। আর prurient শব্দের অর্থ হল—বিকৃত কামনার পীড়ন। অর্থাৎ উপস্থিত কারণ বিনা, প্রস্তুতি বিনা, কৃত্রিমভাবে লেখক সেই গ্রন্থে যদি এমন কিছু ঘটনার বর্ণনা করেন, যা কামোদ্দীপক, বা যা বিকৃত কামনার পীড়ন আনে, তবে তা অশ্লীল বলে গণ্য হবে। মূল কথা দাঁড়াচ্ছে যে, যে বস্তু অস্বাভাবিক, ইচ্ছাকৃত, কুরুচিকর এবং পাঠককে বিচলিত কবে, তা ২৯২ ধারায় দণ্ডনীয়।

দণ্ড কী? প্রথমবার এই অপরাধ করলে অপরাধী পেতে পাবে দু'বছর হাজতবাস এবং দু'হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা। পুনর্বার এই অপরাধ করলে হাজতবাস হতে পাবে পাঁচ বছর অবধি এবং জরিমানা পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত।

অভিযুক্ত হতে পারে লেখক, প্রতিকার সম্পাদক, গ্রন্থের প্রকাশক ও বিক্রেতা, যার থেকে পাঠক ওই বিতর্কিত প্রকাশনা সংগ্রহ করে। এবং তার বিজ্ঞাপনদাতাও।

অতএব, সাধু সাবধান।

পত্রপাঠ দুঃসংবাদ

আমাদের সম্পাদককে সম্পাদক-ব্যাংমো এবং মুদ্রণ বিভাগকে (কম্পিউটার-স্ক্যানার-প্রিন্টার—গুণ্টিসুন্ধ) মুদ্রণ-ব্যাংমোয় ধরিয়েছে।

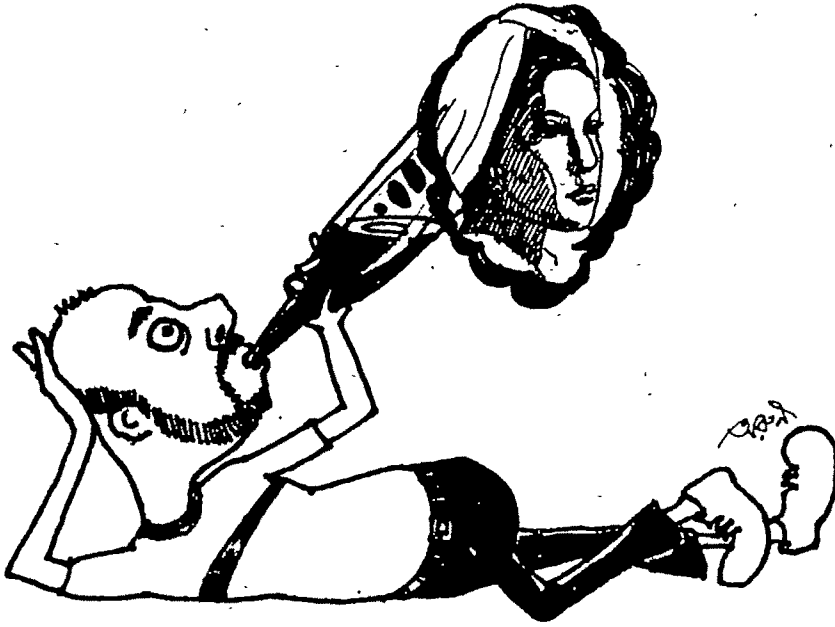
উভয়েই বিলম্ব কাত্ হইয়াছেন, খাড়া হইতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইবে, কেননা ব্যারাম সহজ নহে। এ কারণে পত্রপাঠ শারদীয়-পরবর্তী সংখ্যাটি নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০০২ যৌথ সংখ্যা রূপে প্রকাশিত হইবে। এ সম্বাদে পাঠককুল অনুগ্রহ পূর্বক কাত্ না হইয়া সম্মুখে যাহা পাইবেন তাহা ধরিয়েই খাড়া থাকুন—এই নিবেদন।

বিধিবিহীন সতর্কীকরণ :—প্রয়োজনে তিলেক টাল খাইতে থাকুন কিন্তু তিলোত্তমাকে ধরিয়ে বটতলা আবাহন করিবেন না।

নীতিবাক্য :—বটতলা অপেক্ষা গাছতলা শ্রেয়।

স্বপ্ন পরিচয়

কল্যাণ মজুমদার



সারাদিন বিচ্ছিন্নি কাটছে।

সকালে বাসে ওঠার মুখেই চটির স্ট্যাপ ছিঁড়েছিল। সারাক্ষণ সেই ছেঁড়া চটি পায়ে আগলে নামার মুখে ফিল্মের মাহমুদের মতন একটা থ্যাভডামুখো লোক বেকায়দায় কনুই দিয়ে পাঁজরে ছাঁকা মারল। হুমড়ি খেয়ে পড়ার থেকে গোটা শরীরটা (পাজামা-পাঞ্জাবি জড়িয়ে চটি সহ পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি) খাড়া করে বলতে গেলাম—দাদা প্রাক্তিসটা ব্যারেটোর ওপর করলেই ভলো হত না? যাবেন নাকি যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে?

আমি বলার আগেই লোকটা দাঁতের ফাঁকে থুথু কেটে বাতাসে হাঙ্কা স্প্রে করল, আর বাসটাও ছাড়ল। মনের ক্ষোভবিশুদ্ধ বাঙালির মতন বুকের মধ্যে জাগিয়ে রেখে লোকটাকে নিষ্কৃতি দিলাম। ভাবলাম কোনো-না-কোনো ভাবে তার কাছে ফলী ছিলাম। শোধ দিয়ে গেল।

কিছু করার নেই। ইন্দিরা গান্ধী সরণির চুমু-খাওয়া তরুণীর গালের মতন ফুটন্ত কৃষ্ণচূড়ার বৈভব পিছনে রেখে চলে আসি গ্র্যান্ডের কাছে। দুপুরের মধ্যে দুপুর পুড়ছে। যাই বেড়িয়ে আসি সুইজারল্যান্ড—এইরকম সরল চিন্তায় আত্মস্ত ভঙ্গিতে হেঁটে গেলাম ছোটেলের কাছে। গেটের উল্টো দিকে হাতির পায়ের মতন থামের পাশে

ঠেঁতুলবিচির মতন দাঁত বের করে কালো দাড়িওয়ালা লোকটা বেহালায় বাজাচ্ছে—কহোনা প্যার হ্যায়। মনে মনে গর্জন করি—ব্রাডি ফুল্‌স! কেন যে এদের এখানে অ্যালাউ করা হয়!

যেন 'এক্ষুনি কাউন্টার থেকে রয়েল সুইটের চাবি চাইব—এমন স্বচ্ছন্দ পায়ে লাউঞ্জে ঢুকে পড়লাম। গেটে ক্লাউনের মতন দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা, স্পষ্ট দেখেছি, আমার দিকে এক পলকও তাকাযনি। তবু মুখে বুকের মতন হাসি ছুঁয়ে ঘাড় ভাঁজ করলাম। আর একটু ঝুঁকলেই এয়ার ইন্ড্রার 'মহারাজা'। বন্ধু শিখিয়েছিল, এমন করতে হয়।

ভিতরে ঢুকেই মনে হল সুইজারল্যান্ডে এসেছি। (বাপের জন্মেও জানি না, ও জায়গাটা কীরকম) শরীরে কী আরাম! আঃ, সুখ আমার পোষা।

রুমালে মুখ মুছে এদিক-ওদিক তাকিয়ে চেনা মুখ দেখলাম না। কী করা যায়? বিয়ার খেলে হত। এক টিন দেড়শো টাকা, ভাবতেই বিয়ার-বাসনা হাওয়া। ধুর শালা, এ দেশে বসবাস করে সুখ নেই। লগুনে এক টিন বিয়ার পঞ্চাশ পেন্স, মানে, পঁয়তেরিশ টাকা। (যেন আমি কত লগুন গেছি; অল বকওয়াস!)

—এই যে সাংবাদিক।

পরিচিত স্বর। স্বরটা এমন যে একবার শুনলে সাবা জীবনে আর ভোলা যাবে না। যদি না বহেরা হয় কেউ। নেসকাফের শূন্য কৌটোয় পাথরের টুকরো ঝাঁকালে যেমন কনসার্ট বাজে, পীতাম্বর সামস্তুর কণ্ঠও তাই।

বললাম, সামান্য ভুল হল। প্রাক্তন শব্দটা জুড়ে দিন।

আকর্ণ হাসলেন পীতাম্বর। কালো হাঁড়ির ওপর চুনের দাগের মতন ভাঙাচোরা দাঁতগুলো বীভৎস দেখায়। আমি বোঝার চেষ্টা করি, উনি কি রসস্থ। দু'চোখে পানের পিকের আভাস আছে

মনে হল। বললেন, কী যে বলেন। সাংবাদিক-সাংবাদিকই। প্রাক্তন আবার কি।

বললাম, এখন আর নেই। কাগজ বন্ধ হয়ে গেছে, জানেনই তো। শার্ট নেই, তার আবার পকেট!

হিকহিক হাসলেন পীতাম্বর। শালা, মর্কট। না, উদ্‌বিড়াল। মস্ত নেতার প্রশস্ত চামচে, আমাদের কাগজের ডাইরেক্টর ছিলেন। এখন বোধহয় 'জন্ম নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা পরিষদের' চেয়ারম্যান। শয়তানের হাফবাচ্চা।

দাঁতের ফাঁকে টুথপিক খুঁতে খুঁতে বললেন, কী করছেন আজকাল?
—যা করাচ্ছেন। বেকারি।

চমকে উঠলেন পীতাম্বর,—বেকারি খুলেছেন নাকি। কই শুনি নি তো। আমাকে বললে—

ইচ্ছে হল ওঁর মুখে চড় মারি। শালা তামাসা করার আর সময় পেল না?

ঐ চড়ের অভ্যুত্থানেই কেটে পড়ি। বিয়ারের জন্য খানিকটা দুঃখ বুকে পুষে অ্যাকাডেমির দিকে চলি।

সুইজারল্যান্ড থেকে নিমেষে সাহায্য।

আর্ট কলেজের সামনে গাড়িতে উঠছিলেন শিল্পগুরু। আমাকে দেখলেই তাঁর বাৎসল্যরসের আধিক্য ঘটে। গাড়িতে না উঠে বললেন, এই রোদ্দুরে কোথায় যাচ্ছ?

সেয়ানা শয়তানের মতন বিনীত হেসে বললাম, কোথাও না। এখানেই ঘুরছি।

শিল্পগুরু বললেন, তোমাদের কাগজ তো বন্ধ।

—আজ্ঞে।

ইস, কাগজের জন্য কী দরদ! তিনমাস ঘুরিয়েও একটা ইন্টারভিউ দেননি।

—কী করছ আজকাল?

বলব না বলব না করেও বলে ফেলি, আজ্ঞে উন্নততর বামফ্রন্টের আমলে উন্নততর পশ্চিমবঙ্গের জন্য উন্নততর মানুষ চাই। তাই রাস্তায় রাস্তায় হেঁটে লাফিয়ে দেখছি, কতটা উঁচু হতে পারি।

বাক্সি রেখে বলতে পারি, গুরুজি এই উত্তর প্রত্যাশা করেননি। আমার মুখে তো নয়ই। তাঁর যে আমার প্রতি অসীম বাৎসল্য!

রাগবেন না কী করবেন বুঝতে না পেরে তিনি আমার দিকে কটমট করে তাকালেন। তারপর হঠাৎ বেমক্সা হেসে উঠলেন শব্দ করে,— তোমরা ইয়ংম্যানরা এমন করে কথা বলো, মনে হয় যেন রেগে আছ সারাক্ষণ।

আমি ফের বিনয়ে মাথনের মতন গলে যাই,—না, স্যার, আসলে ওয়েদার—যা গরম!

মাথা নেড়ে গুরুজি বললেন, ঠিক বলেছ। অসহ্য গরম—আমার আবার এসিটা খারাপ। আচ্ছা চলি—এসো একদিন—

গাড়িটা হাঁসের মতন দুলতে দুলতে বেরিয়ে গেল। আমি পকেটের শেষ 'জাদু' দু'আঙুলের ফাঁকে রেখে জনৈক পথচারীর দিকে হাত বাড়াই,—আগুনটা—

জোর টানে 'জাদু'র মায়া ফাঁকা বুকে মমতার মতন ছড়িয়ে পড়ে। রাস্তার ওপারের সবুজে রৌদ্রের হলুদ। বাতাসের ঈষৎ বিলি কটায় আচমকা শরীরে রোমাঞ্চ লাগে—এক পলক গায়ের লোম খাড়া হয়ে ফের নেতিয়ে পড়ে। বেশ লাগে আমার। বেকার জীবন খুব খারাপ না। কোন

এক বিদেশি কবিতায় আছে না, যে, স্রেফ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে যায় চঞ্চল চরাচর সে-ও নাকি কিছু কাজ করে। কী কাজ করে? আমার মতন?

কোথায় যাব ভেবে না পেরে উদ্দেশ্যহীন পা বাড়াতোই দুটো চোখ নিশ্চল আটকে গেল এক শ্বেতাঙ্গিনীর উগ্র দেহে। 'আটকে গেল' কথাটা ভুল। আসলে ট্র্যাপিংয়ের নিপুণ খেলোয়াড়ের মতন ঝাঁপ দিয়ে জড়িয়ে ধরল রমণীয় নারীটিকে। আমি ভীষণ সৌন্দর্য কাতর। কিছুতেই চোখ ফেরাতে পারি না। নারীটি বোধহয় আর্ট গ্যালারি থেকে বেবিয়ে এসেছেন। সঙ্গীর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। পীবরতনু বাতলায়, যেন পূর্ব ইউরোপীয়। রাশিয়ান? চেক? হাঙ্গেরিয়ান? শব্দগুলো নাড়াচাড়া করতে হাঙ্গেরি শব্দটা আমার ভালো লাগে যায়। এই নারী নিশ্চিত হাঙ্গেরিয়ান। না হলেও আমি তাকে সে দেশের নাগরিকত্ব দিলাম। আমিও হাংগ্রি এবং অ্যাংগ্রি। ধ্বনি সাদৃশ্য বা অনোমেটপিয়ার জন্য নয়। ওর সুন্দর স্তনদুটো আসল কিনা, ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছিল। রক্তাক্ত ঠোঁটে ঠোঁট ডোবালে আমারও রক্ত শুঁবে নেবে কিনা, জানার তীব্র তাড়না বোধ করি। ভালো লাগলে ফুল ছোঁয়ার নিয়ম আছে, পছন্দের রমণীকে স্পর্শ করার কানুন নেই। না পারার হতাশায় আমার কানের দু'পাশের রগ দপদপ করে। আমি আরো গাঢ় ভাবে নারীটিকে দু'চোখ দিয়ে চেটে নিই। ইচ্ছে হয় গিয়ে বলি, আমাকে পুষবে? তোমার পায়ের কাছে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকব। শুয়ে শুয়ে হাওয়ায় ফুলে ওঠা স্কাটের বলয়-গহনে সুনিশ্চিত ব্রহ্মাণ্ডও দেখা যাবে। অর্জুন কখনো এই বিস্তারপ দেখেনি। মহাভারতে কোথাও লেখা নেই।

সমস্ত ভুবন কালো করে সে নারী সরে গেল চোখের আড়ালে। অসহ্য লাগে। কোনো ভালো দৃশ্য, ভালো প্রিয় কোনোকিছুই দীর্ঘস্থায়ী হয় না। জীবনের এই রহস্যটাও বুঝতে পারি না কিছুতেই। চাকরিটা কি তাই গেল।

অগত্যা হেঁটে চলি 'নন্দনের' দিকে। বাংলা অ্যাকাডেমিতে কিছুটা অলংস আড্ডা যদি দেওয়া যায়।

হঠাৎই কাগজের প্রাক্তন সম্পাদক সলিল পুততুণ্ডর মুখোমুখি। ধড়িবাজ লোক। চলতি কথায় 'পাখোয়াজ'ও বলা যায়। এর মধ্যেই সরকারের তথ্যবিভাগে বড় পোস্ট জুটিয়ে ফেলেছেন। বললেন, কোথায় যাচ্ছ?

সহসা সবাই আমার গম্ভীর বিষয়ে খুব উদগীর হয়ে পড়েছে। বেকারের জন্য করুণা, নাকি রৌদ্রদগ্ধ পথিকের প্রতি মানবিক মমতা? ভাবলাম বলি, জাহামাম। জায়গাটার ঠিকানা জানা নেই বলে বলা হল না।

সলিল নিজেই বললেন, তোমাকে বলেছিলাম সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা করো। শুনে না। কী লাভ হল? এখনো দেখা করলে পারো। আমি যাচ্ছি রাইটার্সে। চলো আমার সঙ্গে।

ভীষণ রাগ হয় আমার। ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে কারো সঙ্গে কথা বলতে চাই না। আমি কেন দেখা করতে যাব? বেকার বলে আত্মসম্মান বিক্রি করিনি। (অবশ্য এ দ্রব্যটির আদৌ কোনো দাম আছে কিনা সে বিষয়ে মোটেই নিঃসন্দেহ নই) ভাবি, দেব নাকি বাসের সেই মাহমুদ মার্কা লোকটার মতন থুথু স্প্রে করে।

সামাজিকতার দায় আছে। একদা সহকর্মী। বললাম, সলিলবাবু, আপনারা হলেন লাইসেন্সধারী বারবণিতা। আমি তা নই।

কথাটা আমাদের খুবই চালু। সাংবাদিকতা মানেই গণিকাবৃত্তি। সেজন্য সলিল রাগলেন না। তবে বুকের মধ্যে কিছু রোষ নিশ্চয় চাগিয়ে উঠেছিল। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন, তুমিও তো তাই ছিলে দু'দিন আগে। এখন কি তিলক কেটে সতী সাজছ?

অকপটে বলি, না। সতী সাজছি না। রাস্তায়ও দাঁড়াচ্ছি না।

এবার সলিল যথার্থই ক্ষুণ্ণ হন। তাঁর চোখ কঁচকে যায়। ভুরু ভেঙে কপাল ফালি ফালি। বিদ্রূপ করে বললেন, তবে কি হাফ-গেরস্ত?

ওঁকে রাগাতে পেরে আমার খুশি লাগে। নিজের মনে কুলকুল হাসি। ঠোটে তার বিজ্ঞাপন ঐকে বলি, তাও না। আমি হচ্ছি কল গার্ল। ফ্ল্যাট সাজিয়ে বসে আছি। অর্থখালা নিয়ে এসো, অথবা সমাদরে আমন্ত্রণ করো। নিজে থেকে কারো কাছে যেতে পারব না। সলিলবাবু, বারনারীরও মর্যাদাবোধ থাকে। কথাটা মনে রাখলে ভালো করবেন।

কিছুক্ষণ কোনো কথা বললেন নী সলিল। খুটিয়ে আমাকে যাচাই করে নিতে চাইলেন। হয়ত ভাবছিলেন, আমি সুস্থ আছি কিনা। তাঁর বহুদিনের ধারণা, আমার মস্তিষ্কে কিঞ্চিৎ জিঁট আছে। অবশেষে মৃদু হেসে বললেন, নাঃ, তোমার মেজাজ ঠিক নেই দেখছি। পাগলামিটা বেড়েছে।

কঠোর মুরুবিমার্কা প্রশ্ন থাকলেও অন্তর্গত তিস্তার স্বাদ বুঝতে ভুল হল না। উনি পাকা খেলোয়াড়, আমিও কম যাই না। বললাম, যা গরম পড়েছে। এই ওয়েদারে পাগল না হয়ে পারা যায় না।

ওকে ফুটপাথের ওপর রেখে আমি দ্রুতপায়ে কয়েক কদম এগিয়ে যাই। যেতে যেতে নিজের কথাগুলোই বিশ্লেষণ করি। পরপর দু'বার ওয়েদারের দোহাই দিলাম কেন? গরম সত্যিই পড়েছে। আকাশ গ্র্যানিট পাথরের মতন নিরেট। এই বিশিষ্ট গরমে মানুষের মেজাজ ঠিক থাকে না। গরমকালেই মানুষ বেশি রাগারাগি করে। যেন বাইরের দুসহ উষ্ণতা শিরা-স্নায়ু-ধমনীতেও প্রবাহিত হয়। আমারও কি তাই হচ্ছে? এই তো সুইজারল্যান্ড বেড়িয়ে এলাম। সেখানেও ঠিক টের পেয়েছি, মাথার মধ্যে একটা খঁকি কুকুর ওঁৎ পেতে আছে। কখন ঝাঁপাবে, সে নিজেও জানে না।

গলায় কাছে ব্রটিং পেপারের স্বাদ। শুকনো বিবাদ। রবীন্দ্র সদনের সীমানায় ঢুকে পড়লাম। কয়েকজন চেনা ছেলে আড্ডা জমিয়েছে। পায়ে পায়ে এগিয়ে আমিও জমে গেলাম।

কতকাল আড্ডায় মজে ছিলাম খেয়াল নেই। আচমকা, একেবারে আচমকা একটা শিল্পের ওপর চোখ স্থির হয়ে গেল। এ এক আশ্চর্য শিল্প। কোথায় ছিল এতদিন? কোন মহাদেশে? জীবনানন্দের 'সে' কবিতায় গভীর মেয়েটিকে গণেশ পাইন আঁকলে যে শিল্প হতে পারে—এ সেই শিল্প।

মেয়েটি অল্প দূরে অন্য দুটি মেয়ের সঙ্গে কথা বলছিল। মুখ আমার দিকে। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে আমি ভুবে গেলাম। আমি নিশ্চিত, আজ এই মুহূর্তে এখানেই আমার আসার কথা ছিল। এখানেই ডুবুরির মতন ভুবে যাওয়া ছিল নিয়তির বিধান। পরিষ্কার বুঝতে পারি, এর দেখা না পেয়েই রবীন্দ্রনাথ লিখতে বাধ্য হয়েছিলেন—‘আমারে যে ডাক দেবে—’, ইত্যাদি।

তৎক্ষণাৎ আমার মনের সমস্ত কথা টেলিপ্যাথিতে ট্রান্সমিট করতে থাকি—ও মেয়ে, আর দূরে নয়, চলে এসো এই বাহ স্টলে। কী চাপ তুমি? সমস্ত নিসর্গ তোমাকে দেব। স্বর্ণভবন কেড়ে নেব তোমার জন্য। পুরো মিলিনিয়াম পার্ক শুধু তোমার আমার।

স্পষ্ট দেখলাম মেয়েটি ঠিক তিনবার গভীর-গভীরতর চোখে তাকাল আমার দিকে। কনফার্মড হয়ে গেলাম, আমার বার্তা যথাস্থানে পৌঁছে গেছে। দারুণ উৎসাহে আমি এস এম এস বার্তা পাঠাই—আমার স্বপ্ন, আমার আর্তি, আমার আকাঙ্ক্ষা, আমার জীবন। মেয়েটি আমার দিকে চেয়ে

হাসল। চিৎকার করি আমি, ইউরেকা-ইউরেকা। আর্কিমিডিস এত উল্লাসের ঠিকানাই জানত না। তবু থ্যাঙ্ক আর্কিমিডিস, তোমার উল্লস উল্লাসের জন্যই শব্দটার সঙ্গে পরিচয়।

আমার সঙ্গের ছেলেরা কী বলছিল শুনছিলাম না। আমি ক্রমাগত এস এম এসে পাঠিয়ে যাই হৃদয়-নিংড়ানো বার্তাবলী।

মেয়েটি আমার দিকে এগিয়ে আসে। এগিয়ে আসে আমারই দিকে। আমি দেহমন একাগ্রভাবে গাণ্ডীবের ছিলার মতো টানটান করি। কাছে এসেই রেডিয়েশন ছড়াব।

আরো এগোতেই গণেশ পাইনের ছবি চিত্তামণির ভাস্কর্য হয়ে যায়। কী শরীর। কী রেখা! উরুর ভাঁজে জড়িয়ে যায় সমৃদ্ধ প্রকৃতি, পায়ের তলায় শিহরিত ভূমিতল। বৃক্কের বেতবে পুঞ্জিত দুনিয়ার সব কোমলতা, মমতা, উষ্ণতা, নীড়ের নিবিড়তা। নিজের শরীর থেকে রেডিয়েশন ছড়াতে ছড়াতে ফের এস এম এস পাঠাই—ও মেয়ে, তুমি জেনো আমরা মেড্ ফর ইচ আদার। ইংরেজি ‘কিউ’র পাশে ‘ইউ’ হয়ে পাশাপাশি থাকা আমাদের ভাবিতব্য। তুমি এসো—তোমার বৃক্ক মুখ বেধে তীব্র দহনের ছালা জুড়াই।

মুহূর্তে মেয়েটিকে ছুঁয়ে দেখার, তার বৃক্ক মুখ রাখার তীব্র বাসনা আমার সারা সত্ত্বয় আলোড়িত। আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় উন্মুখ এক অনবদ্য বর্ণিল স্পর্শের পিপাসায়। হায়, এই পৃথিবীতে সমাদর করেও কোনো অপরিচিত নারীকে স্পর্শ করার নিয়ম নেই। কেন নেই? একটু ছুঁলে ক্ষয়ে যাবে কিছু? আমার চেতনার ছলন্ত তৃষ্ণা মেটাবার কোনো মানবিক দায়িত্ব নেই ওর? আমি বাড়াবাড়ি করব না, কথা দিচ্ছি। কসম খেয়ে বলতে পারি কোনো বয়োভা বেলেগাপনা করব না। শুধু একবার ওর নীড়ের আশ্রয়ে মুখ গুঁজে শীতল নিক্কতায় অবগাহন করব। নির্বাসনে পাঠাব শরীরের মনের সব যন্ত্রণা, সব বিক্ষোভ, পরিব্যাপ্ত রৌদ্রের প্রদাহ।

একজন একলা মানুষের কোনো অধিকার নেই পৃথিবীকে নিজের মতন সাজাবার। সুতরাং মেয়েটি ধীর পায়ে আমাকে তীক্ষ্ণ চোখে পরখ করে চলে গেল। আমার হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠে গলায় আটকে যায়। তারপর সব ফাঁকা—পাঁজরের আড়ালের ধূ ধূ শূন্যতায় ছলন্ত বাতাসের অব্যাহ ছোট্ট ছুটি।

আমি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠি। চিৎকার করে বলতে চাই, ও মেয়ে, তুমি যেও না—যেও না। তুমি গেলে এই মুহূর্তেই ছািলিয়ে দেব যা কিছু দৃশ্যমান, লহমায় লশভণ্ড করে দেব রাস্তাব ট্র্যাফিক, নিষিদ্ধ করে দেব মানুষের হাসি, ফুল ফেটি। উপড়ে ফেলে দেব বৃক্কের ছায়ার প্রতিমা। আমি আরো সাংঘাতিক কিছুও করতে পারি। যেতে পারি মানবাধিকার কমিশনেও। পারি না?

বিশুদ্ধ বাঙালি আমি। কিছুই করি না। নতুন একটা ‘জাদু’ ছেলে ফুসফুস ভরিয়ে ফেলি ধূসর ধোঁয়ায়। বিষন্ন নায়কের ঔদাস্যে বললাম, তুমি আমার কাছে ঋণী রইলে, মনে রেখো। কথা ছিল একদিন তোমাকে ঋণী রেখে আমি চলে যাব। কিন্তু তোমাকে শোধ করতে আসতে হবেই।

এবারে সোজা চলে এলাম কফি হাউসে। মালোটভ ককটেলের বদলে হাতে নিলাম ঠাণ্ডা পানীয়। আপাতত স্মৃতির হিমঘরে জমা থাক পৃথিবী উন্টে দেবার পরশুরাম স্পৃহা। পাকস্থলি শীতল হলে স্তিমিত হয় স্নায়ুর উত্তাপ। ফের চালু রাজা-উজির মারার পবিত্র ক্রিয়া।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা। সন্ধ্যা ছাড়িয়ে বিষন্ন রাত। কে রাখে সময়ের হিসেব। সময় এখন গিঁজবাপোলের গরু। কিছুতেই চলে না। চললেও নজরে

আসে না। অথচ ঘাড়ের ওপর সিন্দবাদের উপস্থিতি ঠিক অনুভবে ধবা পড়ে।

রাত নটা নাগাদ ফাঁকা রাস্তায় একা একা টহলদারি করতে গিয়ে মনে পড়ে বহুকাল অরুণের সঙ্গে দেখা হয়নি। অরুণের কথা মনে পড়তেই দুপুরের বিয়ারের তৃষ্ণা ফিরে আসে। ওর স্টকে কিছু না কিছু থাকেই—বিয়ার কিংবা হইস্কি। যাই, টেনে আসি কিছুটা। এসবের বোতলবন্দী থাকাটা কান্নের কথা নয়। মাল টানলেই সাফ হবে মাথাটা। খুবই পুষ্তিকর মনে হয় চিঙটা। ভাবতেই মাথায় রিমঝিম নূপুরের বিলম্বিত রণন।

অরুণের বাড়িটা ছোট গলির শেষ মাথায়। প্রতি রাতেই সেখানে অন্ধকারের মেলা। নিস্তন্ধ মেলা। পা দিলেই মনে হয় যেন পৃথিবীর প্রথম রাত্রিতে হাজির হয়েছি। চেনা রাস্তা। খোশ মেজাজে গুণগুণ সুর ভাঁজার কসরৎ করে এগিয়ে যাই। দু'পাত টানলেই মেজাজ হবে শরীফ। ততক্ষণ 'ছলকে তেরে আঁখোসে'—

—অরুণ—অরুণ—বাড়ি আছিস?

অভ্যাসমতো অন্ধকারে কয়েকবার ডাকাডাকি করলাম। কোনো সাড়া নেই। বন্ধ দরজার কড়ার ঘটাং ঘটাং শব্দে অন্ধকাব চিরে ফেলি চিঠি ছেঁড়ার মতন। ফেব ডাকি, অরুণ—অরুণ—

ওভাবে পায়ের শব্দ বাজে। দরজার ছিটকিনি খোলার শব্দ। সেই সঙ্গে সদ্য জ্বালা আলোর আভাস। দরজা খুলতেই আলটপকা একদলা আলো আমার চোখে লাফিয়ে পড়ে। অন্ধকারে আবো অন্ধকার দেখি।

—মামা বাড়িতে নেই। আপনি—

অসমাপ্ত বাক্যের অন্তর্গত প্রশ্নটা বুঝতে পারি। ততক্ষণে দৃষ্টি ফিরে পাই। এক মুহূর্ত। তারপর আবার অন্ধ হয়ে যাই। আমার সারা সত্তা আত্নানাদে ককিয়ে ওঠে।

এ তো সেই মেয়ে। অবিকল। কোনো ভুল নেই। ফ্লোরেন্স নাইটস্‌ল কী এই স্বরে কথা বলতেন?

আবার কানে এল—মামা একটু পরেই আসবেন। আপনি ভিতরে এসে বসুন।

আমি তখনো ভাবছিলাম, কপাল কুণ্ডলা কি এর চেয়েও মধুরভাবে বলেছিল, 'পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ?' মনে মনে বলি, এত তাড়াতাড়ি তুমি স্বপ্ন শোধ করে দিলে মেয়ে?

আমার নিজেকে ভীষণ অসহায়, নিদারুণ নিঃস্ব লাগে। কোনোমতে বলি, না, থাক। এখন আর বসব না। অরুণকে বলবেন, আমি এসেছিলাম।

বলে আর দাঁড়াইনি। দ্রুত মিশে যাই অন্ধকারে। পিছনে কাচের চুড়ি ভাঙার মতন শব্দের ঢেউ—কী নাম বলব?

আমি ফিরেও তাকালাম না। কেন মনে হল, ঘুরে দাঁড়ালেই দেখব, আমার সর্বনাশ প্রদীপ হাতে দাঁড়িয়ে।

আমার কোথাও আর স্বপ্ন নেই। এইমাত্র শেষ স্বপ্নটা—শেষ সন্ধ্যা অন্ধকারে হারিয়ে এলাম।



সর্বমঙ্গলদায়িনী
তুমি মা দুর্গা
তুমিই জগজ্জননী

ক্যে'জ মেডিক্যাল
পরিবারের আপনজন

Dey's

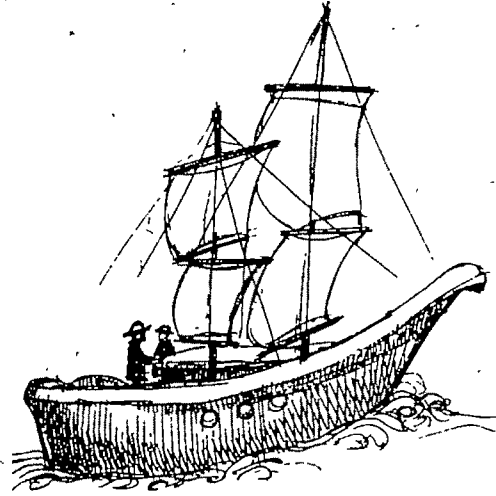
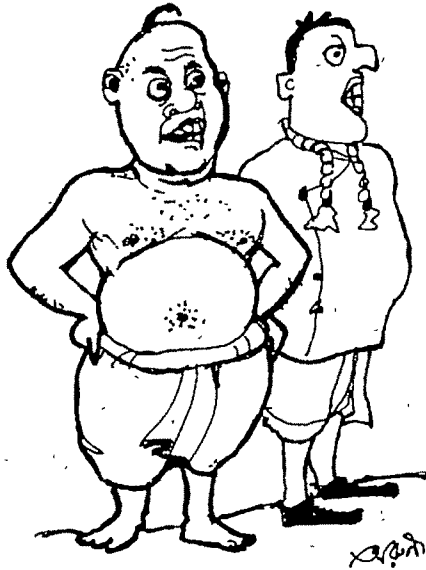
ক্যে'জ মেডিক্যাল
যাদের যত্নই আপনাব আছা



বিদেশ থেকে উচ্চশিক্ষা নিয়ে এদেশে ফিরে আসা কৃতী বাঙালির সংখ্যা অনেক। এই উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে যাওয়াকে কেন্দ্র করে জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল একসময়। বিদেশ থেকে ফিরে এদেশের মাটিতে পা দিয়েই তাঁরা পেয়েছিলেন দুর্ভাবহার। কালাপানি পার হয়েছে, অখাদ্য খেয়েছে—এই অজুহাতে প্রায়শ্চিত্ত ছাড়া ঘরে উঠতে পারবে না—এই সমাজ-বিধান তাঁরা পেয়েছিলেন। এই নিয়ে শুরু হয়েছিল দেশব্যাপী ‘সমুদ্রযাত্রা’ আন্দোলন। সময়সীমা মোটামুটি ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে থেকে ১৯০০ খ্রীস্টাব্দ। এই সময়ে তৈরি হয়েছিল অনেক দল। পক্ষে-বিপক্ষে হয়েছিল অসংখ্য সভা। রচিত হয়েছিল অসংখ্য প্রবন্ধ ও গ্রন্থ। ১৮৯৪ খ্রীঃ (৭ভাদ্র) ‘সোমপ্রকাশ’ পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়েছিল—“মাঁহার বিলাতে গিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতেছেন, তাঁহাদিগের অর্থ ও মানসস্ত্রম বাড়িতেছে...এখন যতই বিদ্য থাকুক না, বিদ্যাশিক্ষার জন্য উত্তরোত্তর অনেকেই ইংলণ্ডে যাইবেন, হিন্দু সমাজ আর তাঁহাদিকে বাঁধ দিয়া রাখিতে পারিবেন না।”—উচ্চশিক্ষার সেই ধারা উচ্চ থেকে উচ্চতর হয়েছে। প্রথম যুগের কঠিন অবস্থার মুখোমুখি হয়ে সমাজপতিদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সেই অকথিত ইতিহাসের প্রতিবেদন এইটি। —সম্পাদক।

উচ্চশিক্ষা সমুদ্রযাত্রা প্রায়শ্চিত্ত

হরিপদ ভৌমিক



হিন্দু কলেজের ডিরোজিওর ছাত্ররা ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিল। ১৮৩২ খ্রীস্টাব্দে জানুয়ারি তারিখে ‘সমাচার দর্পণ’ পত্রিকা ঐ কথাটি স্বীকার করে লিখেছেন—“ড্রোজু নাস্তিকরূপে খ্যাত হইয়াছিলেন, এজন্য তাঁহার দ্বারা হিন্দু কলেজের অনেক ছাত্র ভ্রষ্টমতি হইয়াছে...ড্রোজু সাহেবের উপদেশে যে কএক জন বালক নষ্ট হইয়াছে তাহারা বিপদগ্রস্ত হইল...ঐ অবোধেরা মাতাপিতার বাক্য হেলন করিয়াও ড্রোজুর আজ্ঞানুবর্তী হইয়াছিল ইহাতে কেহ জ্ঞাত্যাত্তরও হইয়াছে।”

এই সংবাদ প্রকাশের অনেক আগে থেকেই ডিরোজিওর ছাত্ররা রক্ষণশীল বন্ধন মুক্ত করতে চেষ্টা শুরু করেছিল। একটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। হিন্দু কলেজের এক ছাত্রকে

নিয়ে তার বাবা একদিন সকালে কালীঘাটে গিয়েছিল মায়েব পূজো দিতে। মা-বাবা প্রণাম করলেও ছেলেটি কালী মাকে প্রণাম না করে বলল শুভ মর্নিং ম্যাডাম।

বাস। সকলে বুঝল সর্বনাশের পাথর তাদের মাথায় পড়েছে। এই ঘটনায় ছেলের মা-বাবাকে সমাজপতিরা ছেড়ে দিল না। এই ঘটনার বিবরণ দিয়ে ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই মে তারিখে সমাচার দর্পণ পত্রিকায় লেখা হল—“কলিকাতার একজন গৃহস্থ আপন পুত্রকে সঙ্গে লইয়া জগদম্বার দর্শনে কালীঘাটে আসিয়া...অষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন কিন্তু উক্ত গৃহস্থের সুসন্তানটি প্রণাম করিলেন না ব্রহ্মাদি দেবতার দূরাবস্থা যিনি তাঁহাকে ঐ বালীক বালক কেবল বাক্যের দ্বারা সম্মান রাখিল যথা শুভ মর্নিং ম্যাডাম। ইহা শ্রবণে অনেকেই শ্রবণে হস্ত দিয়া পলায়ন করিয়ায় কোনো ভদ্র ব্যক্তি

নিবারণ করিয়া কহিলেন, ক্ষান্ত হও, এখানে রাগ প্রকাশ করা উচিত নয়। তাহাতে ঐ ব্যালীকের পিতা আক্ষেপ করিয়া কহিল ‘ওরে আমি কি বক্কারি করে তোরে হিন্দু কলেজে দিয়াছিলাম যে তোর জন্যে আমার জাতি মান সমুদায় গেল।’

এর মধ্যে প্রেসিডেন্সি কলেজ ও মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার পর দেশীয় মানুষের কাছে উচ্চশিক্ষার দরজা খুলে গেল। গোড়াতে অবশ্য কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজে দেশীয় হিন্দুরা ভর্তির সুযোগ পায়নি—“যৎকালে কলিকাতায় মেডিক্যাল কলেজ সংস্থাপিত হয়, হিন্দুরা ইংরাজি চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষার্থ সহসা ঐ কলেজে ভর্তি হইতে পারেন নাই। তাহাব পর বিদ্যাশিক্ষার জন্য বিলাত গমনের দৃষ্টান্ত দেখুন।” (সোমপ্রকাশ ৭ ভাদ্র ১২৯১)

উচ্চশিক্ষা, বিশেষ করে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা এদেশে প্রচলন করার দাবী ওঠে। বলা হয়েছিল, যোগ্যতায় দেশীয় মানুষেরা কম নয় সুতরাং এদেশেই সিভিল সার্ভিস চালু করা হউক, কিন্তু তা করা হয়নি। ইংরেজরা স্বদেশিদের জন্যই বিলেতে এই শিক্ষা রেখে দিলেন বলে মন্তব্য করা হয়েছিল—“স্বার্থপর স্বজাতির উপকার প্রত্যাশী সাহেববাও সেই প্রকার অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া আপনাদিগের হীনাভিপ্রায়ের চরিতার্থ সাধনার্থ এতদেশীয় ব্যক্তিদিগের উন্নতির পথে কষ্টকরোপন করিয়াছেন, তাহাদিগের অনুরোধক্রমে কর্মকাণ্ডিদিগের পরীক্ষা প্রদানের পূর্বতন নিয়ম কিছুই পরিবর্তন হয় নাই, এতদেশীয় কৃতবিদ্য ও উপযুক্ত ব্যক্তিগণ সিভিল সম্প্রদায়ভুক্ত সাহেবদিগের প্রাপ্তিযোগ্য উচ্চতর কার্য্য সকল প্রাপ্ত হইতে পারিবেন বটে, কিন্তু তাহাদিগকে বিলাতে গিয়া পরীক্ষা প্রদান করিতে হইবে।” (সংবাদ প্রভাকর ১৭ই কার্তিক ১২৭০)

সিভিল সার্ভিস

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার বিষয় একটি লেখা ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ছাপা হয়েছিল। একালে বসে সেকালের বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানাটা কঠিন তাই সেকালের লেখা থেকেই জ্ঞানা যাক সিভিল সার্ভিস বিষয়টি।

সিভিল সার্ভিস

পূর্বে সিভিল কর্মচারীদিগকে প্রতিযোগিতার পরীক্ষা প্রদান করিয়া কর্মে নিযুক্ত হইতে হইত না। ভদ্র বংশ হইতে কতক লোক নিবাসন করিয়া লইয়া তাহাদিগকে কিছুদিন হেলিবরি কলেজে শিক্ষা প্রদান করা হইত এবং তাহারাই শেষে সিভিল কর্মচারী হইয়া এদেশে আসিতেন। ১৮৫৪ অব্দে এই নিয়ম রহিত করিয়া সাধারণ প্রতিযোগিতার পরীক্ষা গ্রহণের নিয়ম প্রবর্তিত হয়। তদবধি সর্ব সাধারণ লোকের পক্ষে সিভিল সার্ভিসের দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে। উক্ত বর্ষে স্যার চার্লস উড....১৮৫৮ অব্দ পর্যন্ত এই নূতন প্রবর্তিত পরীক্ষা গ্রহণের ভার ইণ্ডিয়া বোর্ডের হস্তেই ন্যস্ত ছিল। উক্ত অব্দে ইণ্ডিয়া বোর্ডের তৎকালিক সভাপতি লর্ড এলিনবরা এই পরীক্ষার ভার ইংলণ্ডের সিভিল সার্ভিস কমিসনরদিগের হস্তে সমর্পণ করেন। তাহার ভারতবর্ষীয়দিগেরও এই পরীক্ষা প্রদানের সম্ভাবনা কল্পনা করিয়া তাহাদিগকে ১৮৫৯ অব্দের বিজ্ঞাপনীতে এ বিষয়ের উল্লেখ করেন। তাহার বলেন —“ইহা বিলক্ষণ সম্ভব যে ভারতবাসীয়েরাও এই পরীক্ষা প্রদানার্থ অনতিদীর্ঘ কাল মধ্যেই প্রস্তুত হইবে। এমনকি আমরা অবগত হইতে পারিয়াছি যে, তাহাদিগের কোনো কোনো যুবক এদেশে আসিয়া এই পরীক্ষাদানের উপযোগী উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতেছেন।” ভারতবর্ষীয়

মেডিকেল সার্ভিসে একাধিক ব্যক্তি উত্তীর্ণ হওয়ায় তাহাদিগের সমস্ত পরিমাণে আশাও জন্মিয়াছে। গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষার পরীক্ষায় এ দেশীয় ছাত্রদিগের যে পরিমাণ সুবিধার সম্ভাবনা আছে, তাহাদিগের তাদৃশ নাই, কিন্তু এই অসুবিধা তাহাদিগের সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় অধিকতর ব্যুৎপত্তির দ্বারা অনেক পরিমাণে নিরাকৃত হইতে পারে। কমিসনরেরা তাহাদিগের বিজ্ঞাপনীতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপনার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, এই বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপিত হওয়ায় ভারতবর্ষীয় ছাত্রগণ ইংলণ্ডীয় যুবক মণ্ডলীর সহিত সিভিল সার্ভিসের প্রতিযোগিতার পরীক্ষা দানে পারগ হইবার উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিতে সমর্থ হইবে।

১৮৫৯ অব্দে বোম্বাই নিবাসী একজন পার্সী সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দানার্থ প্রস্তুত হন। কিন্তু তাহার পরীক্ষা দানার্থ উপস্থিত হইবার অল্প কিছুদিন পূর্বে পরীক্ষার্থীদিগের বয়সের উর্দ্ধতন সীমা ২৩ বৎসর হইতে ২২ বৎসর করা হয়। সুতরাং তিনি পরীক্ষা দান করিতে অসমর্থ হন। ১৮৬২ অব্দে আর একজন পার্সী পরীক্ষা প্রদান করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তিনি কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। ১৮৬৩ অব্দে শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই পরীক্ষায় কৃতকার্য হইয়া সিভিল সার্ভিসে প্রথম প্রবেশ করেন। কিন্তু তিনি উত্তীর্ণ হইবার অব্যবহিত পরেই সিভিল সার্ভিস কমিসনারেরা কতকগুলি নূতন পরিবর্তন করেন, তদ্বারা এ দেশীয় লোকদিগের সিভিল সার্ভিস প্রবেশ করার পথে কতক পরিমাণে কষ্টকর নিষ্ফল করা হয়। পূর্বে সংস্কৃত ও আরব্য ভাষায় নম্বর ৫০০ শত ছিল। এই সময়ে কমাইয়া ৩৭৫ নির্দেশ করা হইল, অথচ গ্রীক ও ল্যাটিনের নম্বর পূর্বে ৭৫০ই রহিয়া গেল। পূর্বে পরীক্ষার্থীদিগের বয়সের সীমা ২৩ বৎসর ছিল, পরে ২২ করা হয়, এই সময়ে তাহা আরও কমাইয়া ২১ বৎসর করা হইল। সংস্কৃতের নম্বর না কমাইলে ১৮৬৪ অব্দে শ্রীযুত মনোমোহন ঘোষ উত্তীর্ণ হইতে পারিতেন। ১৮৬৫ অব্দে লণ্ডন ইণ্ডিয়ান সোসাইটি এই অন্যায়াচরণের বিষয় ভারতবর্ষের তৎকালিক স্টেটস্ সেক্রেটারি অরল দি গ্রে এণ্ড রিপণের নিকট উপস্থিত করেন, কিন্তু তিনি ইহার এই উত্তর প্রদান করেন যে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার তিনি বিশেষ কারণ দর্শন করিতেছেন না, যাহা হউক এইরূপ অন্যায়াচরণ সত্ত্বেও ক্রমে ক্রমে ৮/৯ জন ভারতবর্ষীয় এই পরীক্ষা প্রদান করিয়া সিভিল সার্ভিসে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরে আর ছয় জন বাঙালি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ১৮৬৯ অব্দে শ্রীযুত রমেশচন্দ্র দত্ত, বিহারীলাল গুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উত্তীর্ণ হন এবং তন্মধ্যে রমেশচন্দ্র দত্ত দ্বিতীয় হইয়াছিলেন। তৎপরবর্ষে শ্রীযুত আনন্দরাম বড়ুয়া পরীক্ষায় কৃতকার্য লাভ করেন। তাহারপর ১৮৭১ অব্দে শ্রীযুত কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত এবং ১৮৭২ অব্দে শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ দে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সিভিল কর্মচারী নিযুক্ত হইয়াছে।” (নববার্ষিকী। পরিশিষ্ট ৫/ ১২৮৭)

সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ কেন

জাহাজে চড়ে বিলেতে যেতে কালাপানি পার হতে হয়েছে এবং যবনের হাতে খাবার খেতে হয়েছে সুতরাং বিলেত থেকে যারা উচ্চশিক্ষা নিয়ে দেশে ফিরল, সমাজপতিরা বললেন তাঁদের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। পক্ষে বিপক্ষে চলল শাস্ত্রানুযায়ী ব্যাখ্যা। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় (১৭ই কার্তিক ১২৭০) লেখা হল—

“জাহাজারোহন পূর্বক বিলাত গমন করিলে এতদেশীয় ব্যক্তিগণ

ধর্মশাস্ত্রের বিধান মতে স্বজাতি শ্রেণী হইতে বহিষ্কৃত হ'ন, অন্য লোকের কথা দুবে থাকুক। তাহার পরমাঙ্গীয় পরিবারেরাও তাঁহাব সহিত আত্মব ব্যাহার রক্ষা করিতে পারেন না। হিন্দু শাস্ত্রেব এই বিধান উৎকৃষ্ট কি নিকৃষ্ট এই স্থলে আমবা তাহাব বিচার করিতে ইচ্ছা করি না, যে দেশে যে প্রথা, বহু কালাবধি প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, বিশেষতঃ এদেশে প্রচলিত প্রথাব সহিত যখন ধর্মশাস্ত্রের বিশেষ সংযোগ দেখা যাইতেছে, তখন তাহা অতিক্রম করা বড় সহজ কার্য্য নহে।”

‘সমুদ্রযাত্রা’ নিয়ে তখন ভারতবর্ষ ব্যাপী আন্দোলন তৈরি হয়েছিল রক্ষণশীল হিন্দু সম্প্রদায় যে সব কারণ দেখিয়ে বিলেত প্রত্যাগত যুবকদের সমাজে গ্রহণ করেনি সেগুলি হল :

(১) ‘সমুদ্রযাত্রা’ শাস্ত্রানুসারে নিষিদ্ধ। কারণ বৃহৎ নারদীয় পুরাণকার ‘সমুদ্রযাত্রা স্বীকারঃ কমণ্ডলু বিধারণঃ’ ইত্যাদি বনে কলিযুগে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ বলিয়া গিয়াছেন।

(২) সমুদ্রযাত্রা করিতে হইলে স্নেহের যানে আরোহণ কবিতে হয়।

(৩) সমুদ্রযাত্রার প্রথা প্রচলিত থাকিলে স্নেহ দেশে গত্যাত ও অবস্থান করিতে হয়।

(৪) স্নেহভোজ্য ভোজন। সমুদ্রপথে যাত্রা কবিয়া পৃথিবীর নানা স্থানে গমনাগমন করিতে হইলে হিন্দুকে নিষিদ্ধ খাদ্য ভক্ষণ করিতে হইবে।

(৫) বিলাত বা ইউরোপের কোনো দেশ হইতে যাহারা ভারতে প্রত্যাগত হইয়াছেন, তাঁহাদিগেব দ্বারা দেশের কোনো উপকাবই সাধিত হয় নাই। সুতবাং মিছামিছি সমুদ্রযাত্রার আন্দোলন করিয়া বিলাত প্রভৃতি স্থানে যাইবাব চেষ্টা করিয়া ফল কি?

(৬) ইয়োরোপ প্রত্যাগত ব্যক্তিদিগের দ্বারা হিন্দুর সমাজ বিপ্লব সাধিত হয়, সুতরাং সমুদ্রযাত্রার প্রথা প্রচলিত থাকা উচিত নয়।

(৭) স্বীকার কবি সমুদ্রযাত্রার দ্বারা আমাদিগের ঐহিক উন্নতি সাধিত হইতে পারে, কিন্তু ঐহিক উন্নতি যখন মিথ্যা এবং পারত্রিক উন্নতিই সত্য, তখন মিছামিছি উন্নতিব নিমিত্ত সমুদ্রযাত্রার প্রয়োজন কি?

(৮) ইয়োরোপাদি স্থান হইতে প্রত্যাগত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রস্তুত নহেন।

যাঁরা সমুদ্রযাত্রাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন তাঁবা উপরের আটটি আপত্তিকে তথ্য ও যুক্তি সহযোগে খণ্ডন করেছিলেন। ১২৯৯ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর রবিবার আলবার্ট হলের এক সভায় রক্ষণশীল সমাজের ঐ কারণগুলি কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ঋগ্বেদ, মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্যের সংহিতা, বামাযণ, মহাভাবত, সংস্কৃত প্রাচীন মুচ্ছকটিক, রত্নাবলী নাটক, বরাহপুবাণ, বৌদ্ধ গ্রন্থ, গ্লিনি, মেগাস্থেনিস, ফাহিয়েন, হিউয়েন সাঙ, বর্ণিও, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী প্রমুখের লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন প্রাচীনকাল থেকে আমাদের দেশে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ ছিল না। বিরুদ্ধ পক্ষের প্রধান আপত্তি সম্পর্কে দেবেনবাবু বহু শাস্ত্রীয় তথ্যাদি দিয়ে স্ফিচার কবে বলেছেন—ব্রাহ্মণ বধের মতো মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্তের উদ্দেশ্যে প্রাণ বিসর্জনের জন্য যে সমুদ্রযাত্রা, কলিযুগে তাব প্রয়োজন-নাই বলে বৃহৎ নারদীয় পুরাণে ঐ শ্লোক লেখা হয়েছে। শিক্ষা বা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধতা বলেননি, সুতরাং প্রথম কারণটি ঠিক নয়। মিথ্যা শাস্ত্রের বন্ধনবদ্ধিতে সমাজকে আবদ্ধ করে রাখলে অমঙ্গলও অবসাদে সমাজ দিন দিন মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হবে, হিন্দুত্ব রাখতে গিয়ে মনুষ্যত্বের মূলে কুঠায়াঘাত করতে হবে। একথা শাস্ত্রকারেরা কখনো কোনো জায়গায়

বলে যাননি।

দ্বিতীয় আপত্তিও গ্রহণযোগ্য নয়। কাবণ হিন্দুব বিলুপ্ত সৌভাগ্যেব যদি আবাব উদয় হয় এবং হিন্দুবা নিজেরা জাহাজ নির্মাণ করে সমুদ্রযাত্রা কবতে পারেন স্নেহ যানে আরোহনের প্রয়োজন নাই। তাছাড়া দেশেব মধ্যে যে নৌকা, জাহাজ, বেলগাড়ি কোনটি হিন্দুব তৈরি? কত মুখোপাধ্যায় বন্দ্যোপাধ্যায়েব সন্তান মান্দালয়, রেঙ্গুন প্রভৃতি শহর হতে চাকবি করে ঘরে প্রত্যাগত হলে কোনো সমাজবন্ধকদের আপত্তি শুনতে পাই না। সিংহল এমনকি আন্দামান পর্যন্ত আপত্তি নাই, আর যেই আরব সাগর পার হয়ে জাহাজখানা সুয়েজ ক্যানেলে প্রবেশ করে অমনি ‘প্রায়শ্চিত্ত কর’ এই নিনাদে চারিদিক কম্পিত হতে থাকে। বলি প্রায়শ্চিত্তটা কি সুয়েজ ক্যানেলেব ধারে চূপ করে বসে থাকে, আর জাহাজে হিন্দু আরোহী দেবতে পেলেই অমনি তার ঘাড় গিয়ে লাফিয়ে পড়ে?

সমুদ্রযাত্রার আটটি কারণের শাস্ত্রীয়তা সম্বন্ধে যে সব কথাব উল্লেখ করা হল তা থেকে এটিই প্রতিপন্ন হচ্ছে যে, আপত্তিকরীবা বৃহৎ নারদীয় ও আদিত্য পুবাণেব যে দুই বচনকে অবলম্বন করে সমুদ্রযাত্রাকে শাস্ত্র বহির্ভূত ব্যাপাব বলে প্রচার করছেন, সেই দুই বচনেব অর্থ তেমন নয়, তবে সমুদ্রযাত্রা অশাস্ত্রীয় হল কেমন করে?

সমুদ্রযাত্রা : সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের মত

এই সময় শোভাবাজার বাজবাটিতে সমুদ্রযাত্রা বিষয়ে এক সভা হয়। অক্ষয়কুমাব দত্ত তাঁব ‘প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্য বিস্তার’ গ্রন্থে (পৃঃ ২০৯) বলেছেন ঐ রাজবাটিব “সভাস্থ প্রায় সকল লোকেই সমুদ্রযাত্রা ন্যায ও শাস্ত্র সম্মত বলে মত দেন। পণ্ডিতাগ্রগণ্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, তারাকনাথ তর্ক বাচস্পতি ও কাশীরাম ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ বলিয়াছেন যে ‘বৃহন্নারদীয় ও আদিত্য পুরাণে যাহা লিখিত আছে তাহাতে কলিযুগে সমুদ্রযাত্রা কমণ্ডলু ধারণ, অসবর্ণ-বিবাহ গোমেধ, দেবরদ্বারা সন্তান উৎপাদন, বিধবা বিবাহ এই সকল ধর্ম কর্ম নিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু বিদ্যা, ভ্রমণ, বাণিজ্য বা বাজকার্য্যেব নিমিত্ত সমুদ্রযাত্রা কবিতে কোনো প্রতিবন্ধক নাই। ধর্মার্থেই সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ হইয়াছে।”

মহাবাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবকে লেখা এক চিঠিতে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও সমুদ্রযাত্রীকে সমাজে গ্রহণ করার মত দিয়েছিলেন। (সঞ্জীবনী পত্রিকা ২৩ শ্রাবণ ১২৯৯) চিঠিটির অংশবিশেষ নিচে দেওয়া হল—

অশেষ গুণসম্পন্ন শ্রীযুত বিনয়কৃষ্ণ দেব

আশীর্বাদভাজনেষু—

“আপনি আমাকে যে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কবিয়াছেন, ধর্মশাস্ত্র ব্যবসায়ীরাই তাহার উপযুক্ত উত্তর দিতে সক্ষম। আমি ধর্মশাস্ত্রব্যবসায়ী নহি, এবং ধর্মশাস্ত্রবেত্তার আসন গ্রহণ কবিতেও প্রস্তুত নহি। তবে সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে যে আন্দোলন উপস্থিত, তৎসম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিবার আমার আপত্তি নাই।

প্রথমত শাস্ত্রের দোহাই দিয়া কোন প্রকাব সমাজ সংস্কার যে সম্পন্ন হইতে পারে, অথবা সম্পন্ন করা উচিত, আমি এমন বিশ্বাস করি না। ..আপনারা সমুদ্রযাত্রাব সম্বন্ধে শাস্ত্রেব বিধান সকল অনুসন্ধান দ্বাবা বাহির করিয়া সমাজকে তদনুসাবে চলিতে পরামর্শ দিতে ইচ্ছা করিতেছেন। কিন্তু সকল বিষয়েই কি সমাজকে শাস্ত্রেব বিধানানুসারে চলিতে বলিতে সাহস করিবেন? ধর্মশাস্ত্রেব একটি বিধি এই—ব্রাহ্মণাদি শ্রেষ্ঠ বর্ণের পরিচর্য্যই শূদ্রেব ধর্ম। বাঙ্গালাব শূদ্রেরা কি সেই ধর্মাবলম্বী? শাস্ত্রের ব্যবস্থা

এখানে চলে না।...বাস্তবী সমাজ প্রয়োজন মতে ধর্মশাস্ত্রের কিয়দংশ মানে। প্রয়োজন মতে অবশিষ্টাংশ অনেক কাল বিসর্জন দিয়াছে, এবং সেইরূপ প্রয়োজন বুলিলে অবশিষ্টাংশ বিসর্জন দিবে। এমন স্থলে ধর্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা খুঁজিয়া কি ফল? আমার নিজের বিশ্বাস যে, ধর্ম সম্বন্ধে এবং নীতি সম্বন্ধে সামাজিক উন্নতি (রিজিজিয়াস অ্যাণ্ড মরাল রিজিনিরেশন) না ঘটিলে, কেবল শাস্ত্রের বা গ্রন্থ বিশেষের দোহাই দিয়া সামাজিক প্রথা বিশেষ পরিবর্তন করা যায় না। আমার প্রণীত কৃষ্ণচরিত্র বিষয়ক গ্রন্থে ইহা আমি সবিস্তারে বুঝাইয়াছি। আমি উপরে বলিয়াছি যে, সমাজ দেশাচারের অধীন; শাস্ত্রের অধীন নহে। এই দেশাচার পরিবর্তন জন্য ধর্ম সম্বন্ধীয় এবং নীতি সম্বন্ধীয় সাধারণ উন্নতি ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। এই সাধারণ উন্নতি কিয়ৎ পরিমাণে ঘটিয়াছে বলিয়াই এই আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। এই উন্নতি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইলে সমুদ্রযাত্রায় সমাজের কাহারও কোনো আপত্তি থাকিবে না। কাহারও আপত্তি থাকিলেও সে আপত্তির কোনো বল থাকিবে না। দেখিতে পাই যে, যাঁহার অর্থ ও অবস্থা সমুদ্রযাত্রার অনুকূল তিনিই ইচ্ছা করিলেই ইউরোপ যাইতেছেন। সমুদ্রযাত্রা শাস্ত্রনিষিদ্ধ বলিয়া কেহ যে যান নাই, ইহা আমার দৃষ্টিগোচরে কখনো আসে নাই। তবে ইহা স্বীকার করিতে আমি বাধ্য যে, যাঁহারা ইউরোপ হইতে ফিরিয়া আসেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এক প্রকার সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া আছেন। কিন্তু তাঁহাদের কি আমাদের সমাজের দোষে, তাহা ঠিক বলা যায় না। তাঁহারা এদেশে আসিয়াই সাহেব সাজিয়া ইচ্ছাপূর্বক বাঙ্গালী সমাজের বাহিরে অবস্থিতি করেন। বিদেশীয় ব্যবহার দ্বারা আপনাদিগকে পৃথক রাখেন। যাঁহারা ইউরোপ হইতে আসিয়া সেরূপ আচরণ না করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অনায়াসে হিন্দু সমাজে পুনর্মিলিত হইয়াছেন। ইউরোপ হইতে প্রত্যাগত মহাশয়েরা সকলেই দেশে ফিরিয়া আসিয়া হিন্দু সমাজ সম্মত ব্যবহার করিলে, সাধারণতঃ তাঁহারা পরিত্যক্ত হইবেন, একথা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না।

পরিশেষে আমার এই বক্তব্য, সমুদ্রযাত্রা হিন্দুদিগের ধর্মশাস্ত্রানুমোদিত কি না, তাহা বিচার করিবার আগে দেখিতে হয় যে, ইহা ধর্মনিমোদিত কি না? যাহা ধর্মনিমোদিত, কিন্তু ধর্মশাস্ত্রে বিরুদ্ধ তাহা কি ধর্মশাস্ত্রে বিরুদ্ধ বলিয়া পরিহার্য? অনেকে বলিবেন যে যাহা ধর্মশাস্ত্রে সম্মত, তাহাই ধর্ম, যাহা হিন্দুদিগের ধর্মশাস্ত্রে বিরুদ্ধ তাহাই অধর্ম। এ কথা আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। হিন্দুদিগের প্রাচীন গ্রন্থে এরূপ কথা পাই না। মহাভারতে কৃষ্ণোক্তি এইরূপ আছে—

ধারণাধর্মমিত্যা হর্দ্যমো দারয়তে প্রজ্ঞাঃ।

যৎ স্যাদ্ধারণ সংযুক্তং স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ।

(কর্ণপর্ব, একোন সপ্ততিতমোহধ্যায়, ৫৯ শ্লোক)

ধর্ম লোক সকলকে ধারণ (রক্ষা) করে এই জন্য ধর্ম বলে। যাহা হইতে লোকের রক্ষা হয়, ইহাই ধর্ম নিশ্চিত জানিবে।

যদি মহাভারতকার মিথ্যা না লিখিয়া থাকেন, যদি হিন্দুদের আরাধ্য ঈশ্বরবতার বলিয়া সমাজে পূজিত কৃষ্ণ মিথ্যাবাদী না হন, তবে যাহা লোকহিতকর, তাহাই ধর্ম। এই সমুদ্রযাত্রা-পদ্ধতি লোকহিতকর কি না? যদি লোকহিতকর হয়, তবে ইহা স্মৃতিশাস্ত্র-বিরুদ্ধ হইলেও কেন পরিত্যাগ করিব?

আমি এইরূপ বুলি, ধর্মশাস্ত্রে, যাহাই আছে, তাহাই হিন্দুধর্ম নহে। হিন্দুধর্ম অতিশয় উদার। স্মার্ত ঋষিদিগের হাতে—বিশেষতঃ আধুনিক স্মার্ত

রঘুনন্দনাদির হাতে—ইহা অতিশয় সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। স্মার্ত ঋষিগণ হিন্দুধর্মের স্রষ্টা নহেন, হিন্দুধর্ম সনাতন—তাঁহাদিগের পূর্ব হইতেই আছে।

অতএব সনাতন ধর্মে এবং এই ধর্মশাস্ত্রে বিরোধ অসম্ভব নহে। যেখানে সেরূপ বিরোধ দেখিব, সেখানে সনাতন ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করাই উচিত। ধর্মে এবং হিন্দুধর্মে কোনো বিরোধ আমি স্বীকার করিতে পারি না। ধর্মের সঙ্গে হিন্দুধর্মের যদি কোনো বিরোধ থাকে, তবে হিন্দুধর্মের গৌরব কি? উহাকে সনাতন ধর্ম বলিব কেন? এরূপ বিরোধ নাই। সমুদ্রযাত্রা লোকহিতকর বলিয়া ধর্মনিমোদিত। সুতরাং ধর্মশাস্ত্রে যাহাই থাকুক, সমুদ্রযাত্রা হিন্দুধর্মনিমোদিত।”

কলিকাতা,

২৭ জুলাই, ১৮৯২

আপনার একান্ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী

শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সমুদ্রযাত্রা : কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মত

“হিন্দুর সমুদ্রযাত্রা” আন্দোলন সম্পর্কে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর “সমুদ্রযাত্রা” প্রবন্ধে লিখেছেন—

“বাংলাদেশে সমুদ্রযাত্রার আন্দোলন প্রায় সমুদ্র আন্দোলনের তুল্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সংবাদপত্র এবং চটি পুঁথি বাক্যোচ্ছ্বাসে ফেনিল ও স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে—পরস্পর আঘাত প্রতিঘাতেরও শেষ নাই।

তর্কটা এই লইয়া যে সমুদ্রযাত্রা শাস্ত্রসিদ্ধ, না শাস্ত্রবিরুদ্ধ। সমুদ্রযাত্রা ভালো কি মন্দ তাহা লইয়া কোনো কথা নহে। কারণ যাহা অন্য হিসাবে ভালো অথবা যাহাতে কোনো মন্দর সংস্রব দেখা যায় না, তাহা যে শাস্ত্রমতে ভালো না হইতে পারে একথা স্বীকার করিতে আমাদের কোনো লজ্জা নাই।

যাহাতে আমাদের মঙ্গল, আমাদের শাস্ত্রের বিধানও তাহাই, একথা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি না। তাহা যদি পারিতাম, তবে সেই মঙ্গলের দিক হইতে যুক্তি আকর্ষণ করিয়া শাস্ত্রের সহিত মিলাইয়া দিতাম। আগে দেখাইতাম অমুক কার্য আমাদের পক্ষে ভালো এবং অবশেষে দেখাইতাম তাহাতে আমাদের শাস্ত্রের সম্মতি আছে।

সমুদ্রযাত্রার উপকারিতার পক্ষে ভুরি ভুরি প্রমাণ থাক না কেন, যদি শাস্ত্রে তাহার বিরুদ্ধে একটিমাত্র বচন থাকে, তবে সমস্ত প্রমাণ ব্যর্থ হইবে। তাহার অর্থ এই, আমাদের কাছে সত্যের অপেক্ষা বচন বড়, মানবের শাস্ত্রের নিকট জগদীশ্বরের শাস্ত্র ব্যর্থ।.....

আমাদের ধর্মবুদ্ধিকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া, যে লোকাচারকে তাহার স্থলে অভিযুক্ত করিয়াছি, সে আবার এমনি মুঢ় অন্ধ যে, সে নিজের নিয়মের সংগতি রক্ষা করিতে জানে না। কত হিন্দু যবনের জাহাজে চড়িয়া উড়িয়া, মাদ্রাজ, সিংহল ভ্রমণ করিয়া আসিতেছে—তাহাদের জাতি লইয়া কোনো কথা উঠিতেছে না, এদিকে সমুদ্রযাত্রা বিধিসংগত নহে বলিয়া লোকসমাজ চিৎকার করিয়া মরিতেছে। দেশে শত শত লোক অশাস্য ও যবনাম খাইয়া মানুষ হইয়া উঠিল, প্রকাশ্যে যবনের প্রস্তুত মদ্যপান করিতেছে, কেহ সেদিকে একবার তাকায়ও না, কিন্তু বিলাতে গিয়া পাছে অনাচার ঘটে এজন্য বড় শঙ্কিত। কিন্তু যুক্তি নিষ্ফল। যাহার চক্ষু আছে তাহার নিকট এ সকল কথা চোখে আঙুল দিয়া দেখাইবার আবশ্যক ছিল না। কিন্তু লোকাচার নামক প্রকাণ্ড জড়পুস্তলিকার মন্তকের অভাৱে তো মস্তিষ্ক নাই, সে একটা নিশ্চল পাষণপাত্র। কবকে ভয় দেখাইবার নিমিত্ত গৃহস্থ হাঁড়ি চিত্রিত করিয়া শস্যক্ষেত্রে ঝাড়া করিয়া রাখে, লোকাচার

সেইরূপ চিত্রিত বিভীষিকা। যে তাহার জড়ত্ব জানে সে তাহাকে ঘৃণা করে, যে তাহাকে ভয় করে তাহার কর্তব্যবুদ্ধি লোভ পায়।....

আমাদের যদি এরূপ মত হয় যে, সমুদ্রযাত্রায় উপকার আছে, মনুর যে নিষেধ বিনা কারণে ভারতবর্ষীয়দিগকে চিরকালের জন্য কেবল পৃথিবীর একাংশেই বদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহে, সেই কারাদণ্ডবিধান নিতান্ত অন্যায় ও অনিষ্টজনক, দেশে বিদেশে গিয়া জ্ঞান অর্জন ও উন্নতিসাধন হইতে কোনো প্রাচীন বিধি আমাদেরকে বঞ্চিত করিতে পারে না, যিনি আমাদের এই সমুদ্রবোত্টিত পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন তিনি আমাদের সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণের অধিকার দিয়াছেন—তবে আমরা কিছু শুনিতে চাহি না, তবে কোনো প্রোৎসাহও আমাদেরকে ভয় দেখাইতে, কোনো লোকাচার আমাদেরকে নিষেধ করিতে পারে না।

বীথও ভাঙিয়াছে। কেহ শাস্ত্র ও লোকাচারের মুখ চাহিয়া বসিয়া নাই। বঙ্গগৃহ হইতে সন্তানগণ দলে দলে সমুদ্রপার হইতেছে, এবং ক্ষীণবল সমাজ তাহার কোনো প্রতিবিধান করিতে পারিতেছে না। সমাজের প্রধান বল নীতিবল যখন চলিয়া গিয়াছে, তখন তাহাকে বেশিদিন কেহ ভয় করিবে না। যে সমাজ মিথ্যাকে, কপটতাকে মার্জনা করে, অর্থগুপ্ত অনাচারের প্রতি জানিয়া শুনিয়া চক্ষু নিম্নলন করে; যাহাব নিয়মের মধ্যে কোনো নৈতিক কারণ, কোনো যৌক্তিক সংগতি নাই, সে যে নিতান্ত দুর্বল। সমাজের সমস্ত বিশ্বাস যদি দৃঢ় হইত, যদি সেই অখণ্ড বিশ্বাস অনুসারে সে নিজেব সমস্ত ক্রিয়াকলাপ নিয়মিত করিত, তবে তাহাকে লঙ্ঘন করা বড় দুরূহ হইত।

যাহারা শুভ বুদ্ধির প্রতি নির্ভর না করিয়া শাস্ত্রের দোহাই দিয়া সমুদ্র যাত্রা করিতে চান, তাহারা দুর্বল। কারণ তাহাদের পক্ষে কোনো যুক্তি নাই—সমাজ শাস্ত্রমতে চলে না।।...

কিন্তু হায়! আমরা সমুদ্রপার না হইলেও মনুর সংহিতা অন্য জাতিতে সমুদ্রপার হইতে নিষেধ করিতে পারে নাই। নূতন জ্ঞান নূতন আদর্শ, নূতন সম্ভেদ, নূতন বিশ্বাস জাহাজ বোঝাই হইয়া এদেশে আসিয়া পৌঁছিতেছে। আমাদের যে গোড়াতেই ভ্রম। সমাজরক্ষার জন্য যদি আমাদের এত ভয়, এত ভাবনা, তবে গোড়ায় ইংরেজি শিক্ষা হইতে আপনাকে সযত্নে রক্ষা করা উচিত ছিল। পর্বতকে যদি মহম্মদের নিকট যাইতে নিষেধ করো, মহম্মদ যে পর্বতের কাছে আসে তাহার উপায় কী। আমরা যেন ইংলণ্ড না গেলাম কিন্তু ইংরেজি শিক্ষা যে আমাদের গৃহে গৃহে আসিয়া প্রবেশ করিতেছে। বীথটা সেই তো ভাঙিয়াছে। আজ যে এত বাকচাতুরী, এত শাস্ত্র-সম্বানের ধূম পড়িয়াছে, মূলে আঘাত না পড়িলে তো তাহার কোনো প্রয়োজন ছিল না।।...

এখন যতদিন এই শিক্ষা চলিবে এবং ইহার উপর আমাদের জীবিকা-নির্বাহ নির্ভর করিবে, ততদিন যিনি যেমন তর্ক করুন, শাস্ত্র মতভাষায় যতই নিষেধ ও বিভীষিকা প্রচার করুক, বাঙালী সমুদ্রপার হইবে, পৃথিবীতে সমস্ত উন্নতিপথের যাত্রীদের সঙ্গ ধরিয়া একত্রে যাত্রা করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিবে।”

সমুদ্রযাত্রা আন্দোলন-

এই সমুদ্রযাত্রা আন্দোলন শুধু বাংলাদেশে নয়, সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী শুরু হয়েছিল। বোম্বাইতে বিলেতযাত্রীদের সমাজে গ্রহণের জন্য প্রথম

আন্দোলন শুরু করেন অনারেবল বিশ্বনাথ মাণ্ডলিক মহাশয়। মাদ্রাজে স্যার রঘুনাথ রাও প্রমুখ বিলেতযাত্রীদের বিনা প্রায়শ্চিত্তে সমাজে গ্রহণ করেছিলেন। এই সময় বিলেতযাত্রী মুসলমান যাত্রীদেরও একঘরে করা হত। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ২৮ সেপ্টেম্বর তারিখে প্রেসিডেন্সি কলেজের এক মুসলমান ছাত্র কলকাতা মুসলিম সমাজগৃহে ‘কুসংস্কারের প্রাদুর্ভাব’ বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তিনি বিলেতযাত্রীর প্রায়শ্চিত্ত সম্পর্কে বলেন—“এদেশের লোকেরা ইউরোপের সীমায় পদার্পণ করা দূরে থাকুক, কালাপানি ও সুএজখাল পার হইলেই জাতিভ্রষ্ট হন! হিন্দুবা বরং শাস্ত্রের দোহাই দিয়া নিদ্রুতি পাইতে পারেন, মুসলমানদিগের এ বিষয়ে কুসংস্কার কেন?”

“তিনি এই স্থলে আরব, তুরস্ক ও মিসরবাসী মুসলমানদিগের সভ্যতাব বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন—” তাহাদিগের অনেকে ইংলণ্ড গমন ও ইউরোপীয়দিগের সহিত একত্র আহার করিয়াও জাতিভ্রষ্ট হন নাই।” পরে এই বক্তৃতা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল এবং ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ নভেম্বর তারিখের (পৃঃ ৭-৮) সোমপ্রকাশ পত্রিকায় এই নতুন পুস্তকের সমালোচনা প্রকাশিত হয়।

শেষ পর্যন্ত শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে বিলেত যাত্রার স্রোতকে আটকে রাখা সম্ভব হয়নি। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বিলেতযাত্রীর একটা হিসেব (সোমপ্রকাশ ৩০ নভেম্বর ১৮৬৩, পৃঃ ৪৩) দেওয়া হচ্ছে—

জাতি	ভ্রমলোক	ভ্রতা
পারসি	৪৫	১৫
হিন্দু	২০	৮
মুসলমান	৯	৩

এই একশ জনের মধ্যে ৮০ জন বোম্বাইয়ের, ৮ জন পাঞ্জাবের, ৮ জন কলকাতার ও জন মাদ্রাজের এবং একজন সিংহলের লোক। ভারতবর্ষের কোনো শ্রেণীর মানুষকেই বিলেতযাত্রার আটকে রাখা যায়নি, কারণ, এই যাত্রায় নিজেদের উচ্চশিক্ষা ও দেশের স্বার্থ জড়িত ছিল। বিলেতযাত্রী যত বেড়েছিল, প্রতিপক্ষ দল তত দুর্বল হয়ে পড়েছিল। উচ্চ শিক্ষার জন্য বিলেতে গিয়ে তাঁরা কোনো অপরাধ করেননি—এই কারণ দেখিয়ে অনেকেই শেষে প্রায়শ্চিত্ত করতে রাজি হননি। রক্ষণশীল সমাজের ৮ম আপত্তি ছিল প্রায়শ্চিত্ত। এ সম্পর্কে সমুদ্রযাত্রাকে বীরা সমর্থন জানিয়েছিলেন তাঁদের বক্তব্য হল—

“যদি আমরা পৃথিবীর নানা স্থানে ডাকাতি করিবার নিমিত্ত কিংবা আর কোনো অসৎ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত স্বেচ্ছাদিগের জাহাজে যাত্রা করিতাম, তাহা হইলে না হয় একদিন দোষের কথা হইতে পারিত। কিন্তু যখন আমি আপনাকে অধিকতর শিক্ষিত উপযুক্ত করিবার জন্য কিম্বা স্বদেশের ও স্বজাতির সেবা করিবার জন্য যাত্রা করিতেছি, তখন স্বেচ্ছাদিগের জাহাজে আরোহন দোষাবহ ব্যাপার—একথা কোনরূপেই যুক্তিযুক্ত নহে। সুতরাং প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজনীয়তা কোন অংশেই দেখা যাইতেছে না।”

(হিন্দুর সমুদ্র যাত্রা, পৃঃ ৩৯, দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।)

এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে, বিদ্যাসাগর মহাশয় বিলেতযাত্রীদের সমাজভুক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে ভারত সংস্কারক পত্রিকায় (২৯ আগস্ট ১৮৭৩ শুক্রবার পৃঃ ২৩৭) লেখা হয়েছিল—

“সমাচার চন্দ্রিকা শুনিয়াছেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ইংলণ্ডগামী যুবকদিগকে সমাজভুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উৎসাহকে ধন্যবাদ।”

সমুদ্রযাত্রা : প্রায়শ্চিত্ত

বিলেত থেকে ফিরে এসে প্রায়শ্চিত্ত করে আবার সমাজে উঠেছেন এমন ঘটনা অনেক ছিল। বোঝার সুবিধের জন্য একটি উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে। ডাক্তার উপেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন। কলকাতার সিমুলিয়ার রাম দত্তের পৌত্র, শ্রীকৃষ্ণ দত্তের পুত্র, কলকাতা কোর্টের জজ রসময় দত্তের ভাই উপেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে জন্মগ্রহণ করেন। ছ'বছর বয়সে পাড়ার হিন্দু বিদ্যালয়ে বাংলায় পড়াশুনা শুরু করে, চার বছর পর ইংরেজি শিক্ষার জন্য হেয়ার স্কুলে ভর্তি হন এবং এখানে থেকেই ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করেন। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন এবং শিক্ষা শেষে এল. এম. এস উপাধি পান। মেডিকেল কলেজের প্রধান অধ্যক্ষ কোট সাহেবের বিশেষ আগ্রহে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে উপেন্দ্রকৃষ্ণ ডাক্তারি পড়তে বিলেত যান। বিলেতে পরীক্ষায় পাশ করে সম্মান সূচক ডিগ্রি সহ এডিনবরা হাসপাতালের কর্তৃত্বভার পান। এখানে তাঁর এক সাহেব বন্ধুর অনুরোধে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ২৯ এপ্রিল তারিখে তাঁর শ্যালিকাকে বিয়ে করেন। বিয়ে হল বটে, কিন্তু দীর্ঘদিন দু'জনের মনের মিল রইল না। এ প্রসঙ্গে 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় (২৭শে বৈশাখ, শকাব্দ ১৮১৬) ঘটনার বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে—

“বিবাহের পর প্রথম প্রথম গেল একরূপ মন্দ নয়; কিন্তু শেষে কেমন হইতে লাগিল। হাজার হউক সাদায় কালার মিশিবে কেন? দত্তজার সহিত মেমসাহেবের একটু গোলমাল চলিতে লাগিল। বিবি আহেলী বিলাতী, দত্তজা অসভ্য ভারতবাসী। বিবি সভ্য মিস্ দত্তজা কালা বাঙ্গালী। বিবির মতিগতি আচার ব্যবহার একরূপ, দত্তজার আচার ব্যবহার ঠিক তাহার বিপরীত। দত্তজা পিতৃ পিতামহ চালিত ধারা অনুসারে পত্নীর উপর কর্তৃত্ব করিতে যান। বিবির কোমল প্রাণে তাহা সহ্য না; বিবি চাহেন বিলাতী আইনের মর্যাদা রক্ষা করিতে, স্বামীর গাইডেন্স হইতে। কাজেই দুজনার ভালরূপ বণিবনাও হইল না। দত্তজা একটু বিরক্ত হইলেন, এবং বিশেষ ব্যথিত হইলেন। এইরূপ গোলমাল হওয়ায় তিনি তাঁহার স্ত্রীকে সেখানে রাখিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন।

দত্তজা স্বদেশে আসিয়া বিলাত ফেরত অহিন্দুর ন্যায় আলহিদা (আলাদা) বাড়ী ভাড়া করিয়া ডাক্তারী করিতে লাগিলেন। অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার পশারও হইল মন্দ নহে। কিন্তু এখানে আসার কিছুদিন পরেই তাঁহার স্ত্রী জানি না কি ভাবিয়া কলিকাতায় আসিয়া বিলাতী গৃহিনীর ন্যায় একেবারে তাঁহার বাড়ী অধিকার করিয়া বসিল। তিনি আইন অনুসারে কিছু বলিতে পারিলেন না, কারণ সে তাঁহার বিবাহিতা পত্নী, কাজে কাজেই তাহাকে জায়গা দিতে হইল। দত্তজা মহাশয় নিজ বুদ্ধির দোষে যে অন্যায়ে কাজ করিয়া ফেলিয়াছিলেন, এই সময় হইতে তাঁহাকে বিশেষরূপে তাহার ফলভোগ করিতে হইয়াছিল। বিলাতী বিবি বিলাত ছাড়িয়া ভারতে আসিল বটে, কিন্তু পাশ্চাত্য হাবভাব কিছুমাত্র বিস্মৃত হইল না। পরস্ত তাহার প্রতাপ দিন দিন বাড়িতে লাগিল। কিন্তু দত্তজা ঋণ কাটিয়া কুমীর ঢুকাইয়াছেন; এখন আর চারা নাই। কাজে কাজেই তাঁহাকে সমস্ত সংস্থার করিয়া থাকিতে হইল। কিছুদিন এইরূপ মনোবিবাদের পর তাঁহার পত্নী বিলাতী সভ্যতার মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্য হউক, কিংবা অন্য কিছু বিলাতী মতলবেই হউক, স্বামীকে 'ডাইভোর্স' করিবার জন্য আদালতের সাহায্য গ্রহণ করিলেন।”

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে জুন মাসে বিবাহ ভঙ্গের জন্য কলকাতা হাইকোর্টে

অভিযোগ আনা হল এবং ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে মোকদ্দমা একতরফা শেষ হয়ে যায়। বিচারকের নির্দেশ অনুসারে দত্তবাবু তাঁর স্ত্রীকে সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা এককালীন দিয়ে সম্পর্ক শেষ করেন। এর পর দত্তবাবুর পুত্রেরা মামাদের ওরিয়েন্ট উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক শেষ হয়ে গেলে উপেন্দ্রবাবু বাগবাজারের পশুপত্তিনাথ বসু, শ্যামবাজারের ভূপেন্দ্রনাথ বসু এবং নিমতলার শিবকৃষ্ণ দত্ত প্রমুখের কাছে আবার হিন্দুধর্ম গ্রহণ ও সমাজে প্রবেশের ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

এঁদের পরামর্শে উপেন্দ্রকৃষ্ণ শোভাবাজার, পাথুরিয়াঘাটা, জোড়াবাগান, সিমলা, ইস্টালী, নিমতলা, চোরবাগান, গোয়াবাগান, শ্যামবাজার, গটলডাঙ্গা, জোড়াসাঁকো, বামাপুকুর, গরানহাটা, পানিহাটি, হোগলেকুড়ে, টালা, খড়দহ, শ্যামপুকুর, দরমাহাটা, কুমারটুলি, বাগবাজার প্রভৃতি অঞ্চলের ৯৬ জন দলপতির অনুমতি নিয়েছিলেন। অনুমতি নেবার আগে তাঁদের সকলের কাছে আলাদা আলাদা ভাবে চিঠি লেখা হয়েছিল। চিঠিটি নিম্নরূপ—

শ্রী হরিঃ শরণং

পরম পূজনীয় শেখ শাহ্মাধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিদ্বজ্জনগণ মহাশয়
শ্রীশ্রীচরণেশ্বর—

সম্মানপূরঃসর নিবেদনমিদং

কোন কায়স্থযুবক বিদ্যাভাসের নিমিত্ত ইংলণ্ড দেশে (বিলাত) গমন করেন। তথায় মোহবশতঃ স্বেচ্ছকন্যার রূপে মোহিত হইয়া স্বধর্মত্যাগ পূর্বক তাহার পাণিগ্রহণ করিয়া সম্ভানোৎপাদন স্বেচ্ছায় ও অন্যান্য অভক্ষ্য ভক্ষণ প্রভৃতি শাস্ত্রগর্হিত কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। পরে মোহ দূর হওয়ায় স্বেচ্ছকন্যার সহবাস প্রভৃতি সমস্ত অকার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে অন্ততঃ হইয়া যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত করিতে ইচ্ছুক আছেন। অতএব যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্তেব্য ব্যবস্থা দিতে আজ্ঞা হয়, ইতি।

শোভাবাজার বাজবাটা, নিমতলার দত্ত, পাথুরিয়াঘাটার ঘোষ, রামবাগানের মিত্রবাড়ি ও কলকাতার অন্যান্য কায়স্থ, কুলীন ও সমাজপতিদের সহযোগিতায় ডাক্তার উপেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত বা ডাঃ ইউ কে দত্ত ৮ই বৈশাখ ১৩০১ তারিখে প্রায়শ্চিত্ত করে সমাজে ওঠার অনুমতি পেয়েছিলেন। অনুমতি পেয়ে উপেন্দ্রকৃষ্ণের দাদা প্রায়শ্চিত্তের চিঠি বিলি করে আমন্ত্রণ করেছিলেন—

যথা বিহিত সম্মান পূরঃসর সানুনয় নিবেদন মেতৎ—

আগামী ৮ই বৈশাখ শুক্রবার মদীয় মধ্যম সহোদর শ্রীমান উপেন্দ্রকৃষ্ণ দত্তের প্রায়শ্চিত্ত ও দীক্ষা উপলক্ষে মধ্যাহ্নে ব্রাহ্মণ ভোজন ও অপরাহ্ন বেলা ৫ ঘটিকার সময় পুরাণ পাঠাদি হইবেক। অতএব মহাশয় সবান্ধবে সভাস্থলে সমবেত হইয়া পাঠ শ্রবণ এবং জলপান করিয়া কৃতার্ণ করিবেন। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম। ইতি

কলিকাতা

অনুগ্রহকাম্বিণ

৭নং রাজা গুরুদাস স্ট্রিট

শ্রীসুরেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত দাস্য

রামবাগান

৫ই বৈশাখ ১৩০১

পণ্ডিতবর জীবানন্দ, শ্রীমাসাগর একমুখমহোপাধ্যায় দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ব্যবস্থানুসারে মস্তক মুণ্ডন, গঙ্গাস্নান প্রায়শ্চিত্ত মন্ত্রোচ্চারণ করে উপস্থিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কায়স্থ সকলকে জলপান করিয়ে সমাজে ওঠেন।

এই ঘটনার সংবাদ 'ইংলিশম্যান' (২৩ এপ্রিল ১৮৯৪), 'হিন্দু পেট্রিয়ট' (২৪ এপ্রিল ১৮৯৪), 'অমৃতবাক্সার' (২৪ এপ্রিল ১৮৯৪), 'স্টেটসম্যান' (২৪ এপ্রিল ১৮৯৪), 'হিতবাদী' (১৫ বৈশাখ) 'সংবাদ প্রভাকর' (২৭ বৈশাখ ১৮৬১ শকাব্দ), তত্ত্ববোধিনী (জ্যৈষ্ঠ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৫, ১৮১৬ শক) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

প্রায়শ্চিত্ত ছাড়া সমাজে গ্রহণ

ইংরেজি ১৮৭১, বাংলা ১২৭৮ সনের ২৮ ভাদ্র তারিখের 'সুলভ সমাচার' পত্রিকায় একটি ছোট্ট সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল—

“এবার যে তিনজন বাঙালি বিলাত হইতে সিরিলিয়ান হইয়া আসিয়াছেন, বাবু শ্যামাচরণ মল্লিকের সাতপুকুরের বাগানে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করা হইবে। আমাদের প্রস্তাব যে সকল বাঙালি এক হয়ে তাঁহাদিগকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করেন।”

হ্যাঁ, চমকে দেওয়ার মতো সংবাদ। যেখানে প্রায়শ্চিত্ত নিয়ে হৈ চৈ চলছে সেখানে বিনা প্রায়শ্চিত্তে 'বিশেষ সম্মান' দেখাতে অভ্যর্থনা সভা। এককথায় 'নাগরিক সম্বর্ধনা'। এই অসাধ্য কাজটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১২৭৮ সালের ২৫শে আশ্বিন মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাতটায় বাবু শ্যামাচরণ মল্লিকের দমদম সাতপুকুরের বাগানবাড়িতে। ২৫শে আশ্বিন তারিখে 'সুলভ সমাচারে' বলা হয়েছে—

“শ্রীযুক্ত বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত, বিহাবীলাল গুপ্ত এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সিরিলিয়ান হইবার জন্য বিলাতে গিয়াছিলেন। তাঁহারা তিন বৎসরকাল সেখানে থাকিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া তাঁহাদের আত্মীয় বন্ধুগণ যেমন আনন্দ সাগরে মগ্ন হইয়াছেন, ভারতবাসী সমস্ত লোক তদ্রূপ আনন্দলাভ করিয়াছেন। শুনিতেছি তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রসিদ্ধ বাবু শ্যামাচরণ মল্লিকের সাতপুকুরের বাগানে কলিকাতার সভাপ্ত ভদ্রলোকে অদ্য রাতি ৭টার সময় একটা সভা করিবেন। আমরা অন্তরের সহিত অনুরোধ করিতেছি সে সময়ে যেন সমস্ত নগরবাসী উপস্থিত হইয়া উৎসাহ বর্জন করেন।”

অভ্যর্থনা উপলক্ষে সাতপুকুরের বাগান বাড়িতে প্রায় চারশ বিশিষ্ট নাগরিক উপস্থিত ছিলেন। যে অভ্যর্থনা সঙ্গীতটি সেখানে গাওয়া হয়েছিল তা এখানে উদ্ধার করে দেওয়া হল—

রাগিনী—বেহাগ, তাল—আড়াঠেকা,

এস এস বন্ধুগণ।

তোমরা ভারত মাতার হৃদয় নন্দন।

এসেছি আমরা সব, করিতে আনন্দোৎসব

আলিঙ্গন করি তায় করি অভ্যর্থন।

পিতা মাতা ছাড়ি ঘরে, যাই যে জলধি পারে,

শিখিলে বিবিধ বিদ্যা করিয়ে যতন;

শরীর করিয়ে শীর্ণ, পরীক্ষায় হয়ে উত্তীর্ণ,

ইংরাজ ছাত্র সমাজে পাইলে সম্মান।

রমেশ সুধীর অতি, বিহারী প্রশান্তমতি,

সুরেন্দ্র মিষ্ট আলাপে প্রিয় সর্বস্থান,

দেখিতে তোমাদের মুখ, সকলে অতি উৎসুক,

তায় হেথা আনন্দেতে সবার আগমন।

দুঃখিনী ভারতমাত। মলিনা অতি অনাথা,

কৃতবিদ্যাগণ তাঁব সাধুনার স্থান

দেশ তাহাকে ছাড়িয়ে, বিলাস মস্ত্রে ভুলিয়ে,

বিদেশীয় বেশ ভূষা কর না গ্রহণ।

তোমাদের শুভস্মরি, সবে আশীর্বাদ কবি,

সুখেতে থাকিয়ে কর দেশের কল্যাণ;

ধর্ম্মেতে থাকুক মতি, বিচারে হক সুখ্যাতি

ভারতমাতার দুঃখ করহে মোচন।।

অভ্যর্থনা সঙ্গীতের পর 'দেশীয় কনসার্ট দলের বাদ্য হইয়াছিল।' এরপর সকলকে বাবু মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এবং রাজা কৃষ্ণমিত্র 'রাসায়নিক বাজি' দেখিয়েছিলেন। বিরোধী সামাজিক দল এতে যোগ দেননি। ১লা কার্তিকের (১২৭৮) 'সুলভ সমাচার' এ সম্পর্কে বলেছে—

“অভ্যর্থনা উপলক্ষে প্রায় তিন চাবি শত ভদ্র বাঙালি উপস্থিত ছিলেন। কেবল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার কয়েকজন অভিমানী সম্ভ্রান্ত ও জমিদার ব্যতীত আর সকলেই প্রায় এ বিষয়ে যোগ দিয়েছিলেন।”

বিলেতযাত্রী বঙ্গসন্তানদের অন্তর ও বহিঃস্ব গুণ্ডিকরণের জন্য একদিকে গোবর খাওয়ানো ও মস্তক মুণ্ডন করে গঙ্গাস্নানের মাধ্যমে প্রায়শ্চিত্তের ঘটা চলছিল, সে সময় বিনা প্রায়শ্চিত্তে দমদমে তিন বিলেতযাত্রীকে শাবদোৎসবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নাগরিক সম্বর্ধনা দেবার জন্য বাংলার সামাজিক আন্দোলনের ইতিহাসে ২৫শে আশ্বিন (১২৭৮) মঙ্গলবার তারিখটি অবিস্মরণীয় হয়ে আছে।

WITH BEST COMPLIMENTS FROM :

HOWRAH MILLS CO. LTD.

“HOWRAH HOUSE”

135, FORESHORE ROAD, (SOUTH)
RAMKRISTOPUR, HOWRAH-711 102

PHONE

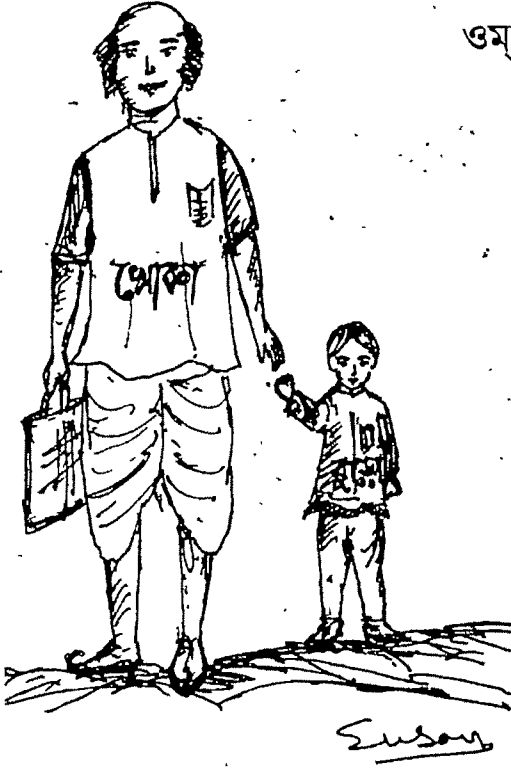
OFF : 660-1446/2302/2748/4159

FAX : 91-33-660 1447

E-mail : shreehrt @ giascl01.vsnl.net.in

নামসংকীৰ্তন

ওম্বিকা গুপ্তা



যায় আসে না।

মনুষ্য পদবাচ্য জীবদের যায় আসে। নাম, সুনাম, কুনাম, দুর্নাম, বদনাম, মানুষের চৈতন্যকে স্পর্শ করে। হয়ত একটু বেশিই করে আমাকে। শুধু নিজের নাম বলে নয়, তেমন তেমন পরের নামেও আমার স্পর্শকাতরতা কিছু কম নয়।

ঘাটালের গুপীকাকাকে শেষ দেখেছি গত শতকের তিরিশের দশকের শেষাংশে। ইতিমধ্যে পিতৃবঙ্কু সবাদে অমন অনেক নেপুকাকা, ফুলেকাকা, নগেনকাকা, খগেনকাকার কোলে উঠেছি গাদ ঘাট, শিজবেড়ে, বাঁকড়ো, পাঁশকুড়ো, সজনেহাটি, কুস্টে, হাঁসখালিতে শৈশবে, কৈশোরে। আজ মনেও

বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই ওই অস্থায়ী নেমটাগগুলি ন্যাজ্য কারণেই খসে পড়ার কথা। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে পড়ে না। আঠার মতো চিপকে থেকে বেশ লজ্জায় ফেলে বুড়ো-বুড়ি খোকা-খুকু নামধারীদের। আমি অন্তত কমপক্ষে এমন জনা পাঁচেক খোকা, খোকন, বড় খোকনকে চিনি যাদের বয়স, বালাই ঘাট, এখন ঘাট ছুই ছুই!

নাম আমাকে স্পর্শ করে। অল্পবিস্তর সবাইকেই করে বলে আমার বিশ্বাস। এমনকি গোলাপ বাগিচার বাইরে শেক্সপীয়ারকেও করত বলেই আমার ধারণা। উইলিয়াম শেক্সপীয়ারের জীবদ্দশায় তাঁকে যদি কেউ ক্রিস্টোফার মার্লো বলে ডাক দিতেন সে ডাকে নাট্যকার সাড়া দিতেন বলে আমার প্রত্যয় হয় না। দেবদেবীর কুলপঞ্জিতে গোপালও যে গোবিন্দও সে। কিন্তু সেই সুবাদে নোনাপুকুরের গোপালবাবুকে তো আর হাটখোলার গোবিন্দবাবু বলে ডাকা যায় না। আর ডাকলেই বা শুনছে কে। অথচ এমন শেক্সপীয়ার পণ্ডিত (নাকি মার্লো-ফ্যান?) আছেন যারা হ্যামলেট, ম্যাকবেথের রচয়িতাকে মার্লো বলেই ডাকাডাকি করেন। ডাকুন, শেক্সপীয়ার সে ডাকে কবরের মধ্যে হয়ত একটু উশ্টে গুতে পারেন কিন্তু সাড়া দেবার প্রশ্নই ওঠে না।

নাট্যকারের গোলাপ বিষয়ক উক্তিটি যুক্তিপূর্ণ, কিন্তু ওটি ওই উদ্ভিদ রাজ্যেই প্রযোজ্য। মনুষ্য রাজ্যে ঠিক ধোপে টেকে না। গোলাপকে যেটুকুল বলে ডাকলেও পুষ্পরাজ্যের সুবাস কিছু কম মিষ্টি হয় না, ঠিক। কিন্তু গোলাপের নাম যে গোলাপ, সেটাই কি গোলাপ জানে? জানে না। সে ক্ষেত্রে যেটুকুল, গাঁদাফুল, যাই বলা হোক না কেন গোলাপ তাতে চোখে সর্বেফুল দেখবে না। নামে কেন, চৈতন্যহীন উদ্ভিদ জাতদের কিছুতেই কিছু

পড়ে না কাউকে। নগেন খগেনের মুখ ভেসেই ওঠে না মানসপটে। কিন্তু গুপীকাকাকে ভুলতে পারিনি।

কারণ গুপীকাকার পোশাকি নামের সম্মোহনী আকর্ষণ আজো আমায় ভুলতে দেয়নি মানসটাকে। নাম নয় তো, যেন 'বৈষ্ণব' পদাবলীর সুললিত চরণ : গোপীপদ বদন্ত পদরেণু দাস। বিদ্যাপতি নাকি চণ্ডীদাস।

এমনি আরো একটি 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো' নামের সংস্করণ চমৎকৃত করেছে আমাকে। ভদ্রমহিলা ছিলেন গোপেল স্কুলের শিক্ষয়িত্রী, শ্যাম সোহাগিনী এমিলিারানী বিশ্বাস।

নামের কাব্যময়তার ওপর একটা গল্প শুনিয়েছিল আমায় আমার এক হাস্যরসিক বন্ধু। মাদ্রাজের জি, পি, ও-তে দক্ষিণী যুবক মানি-অর্ডার ফর্ম ভর্তি করার প্রয়োজনে পাশের বাঙালি তরুণটির কাছে কলমটি চান। ফর্মটি ভর্তি করতে ভদ্রলোকের সামন্যই সময় লাগল, কিন্তু নিজের নামটি লেখা এবং সেই ক্ষুণ্ণ বোধে বোধ সময় নিলেন দক্ষিণী যুবকটি। হতবাক বাঙালি তরুণ কিছুটা কৌতুহলী হয়েই নাম জিজ্ঞেস করেন ভদ্রলোকের।

: যুনোসোয়ামী সুবারমানাইয়া ভেনকট রমন আই আব! আপনারা?
: রবি দে।

বেশ কুণ্ঠিত হয়েই জবাব দেয় বাঙালি তরুণটি। কেমন যেন ছোট

মনে হয় নিজেকে রবি দে'র।

অমন একটা বাজখাঁই নামের পর ঠুনঠুনে রবি দে মিঁয়ে যাওয়া মুড়ির হাদ এনেছিল ওর জিভে। কিন্তু দক্ষিণী ব্রাহ্মণের কাছে বঙ্গপুঙ্গব হার স্বীকার করে কী কবে। জয়াপ্রদা, জয়ললিতা, শ্রীদেবী, পদ্মিনী—দক্ষিণী মেয়েদের হাঙ্কা, হাঙ্কা, পাতলা আকারের নামগুলি উঁকি দিয়ে গেল রবি দে'র মনে, আর সেই সঙ্গেই মাথায় খেলে গেল দুটু বুড়িটা।

: আপনাদের স্ত্রীলোকের নামও কি বেশ লম্বা-চওড়া?

এবার যেন একটু লজ্জিত হয়েই ভদ্রলোক মাথা নাড়ালেন।

: কেন, আপনাদের?

এবার হাতি যেন বাঘকে শুঁড়ে পাকিয়ে ধরেছে। তচ্ছিন্নের হাসি হেসে রবি দে আবৃত্তি শুরু করে দিলে—

‘শ্রীমতী’ পাখি সব করে রব/ রাত পোহাইল/ কাননে কুশুমকলি/ সকলি ফুটিল/ বাখাল গরুর পাল/ লয়ে যায় মাঠে/ শিশুগণ দেয় মন/ নিজ নিজ পাতে।

পুরো কবিতাটি শেষ করে রবি দে ‘দেবী’ যুক্ত করে ক্ষান্ত হলো।

নতুনই বসিকতা। কিন্তু শিকধ্বজ শকটবক্ষ বাগচি, বীরধ্বজ বিরাটবক্ষ বাগচি, কপিকবজ কপাটবক্ষ বাগচি ভাত্তরয়ও কি গল্পকথা?

ধ্বজধারীদেব সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয়টা ঠিক হয়েও হয়ে ওঠেনি। ত্রায়ীর নাম আমি প্রথম শুনি। প্রয়াত বন্ধু সঞ্জিত ধরের মুখে, চড়কভাঙ্গার উৎকর্ষ দাস চক্রবর্তীর বৈঠকখানা ঘরে। আমাকে সন্দিক্ষ দেখে ও আশ্বাস দিয়েছিল, ভুবৈশ্যেশ্বর বাগচিবাড়িতে নিয়ে গিয়ে ও আমায় স্বচক্ষে ধ্বজা উড়ানো দেখিয়ে আনবে। যাওয়া হয়নি আমার, কারণ ও নিজেই হঠাৎই একদিন অর্ন্য এক কৈলাসে চলে গেল কাউকে কিছু না বলেই।

আখড়ায় বাঠম-বোঁছুমীরা কৃষ্ণনামের নামতা পাঠ করেন বলে পরের মুখে শুনেছি, নিজের কানে শোনা হয়নি। কিন্তু বিকল্পে, একসময় প্রায় বোম্বাই ওনেছি একটি বিশেষ নামের ব্যাকরণ কৌমুদী সম্মত সোচ্চার বিন্যাস।

: ভূ আপনাং যেসাং তে, বহুব্রীহি তৎপরে দ্বিগু, প্রতিবসতি স্ম যোগে অতীত, স্ত্রী লিপে অ, ভূপেশ।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে ডাক দিচ্ছেন মামা ভাঞ্জে। অর্থাৎ আমার বড়দাদা ভূপেন গুপ্তের (সি পি আই নেতা নন)।

প্রেসিডেন্সি কলেজে সহপাঠী ছিলেন দু’জনে। একসঙ্গেই কলেজ যেতেন। সমযটা গত শতকের তিরিশ দশকের মাঝামাঝি।

সংস্কৃতভাষা নই অতএব ভূপেশ শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ বা গঠন বিন্যাসের নির্ভুলতার দায়িত্ব আমার নয়। কৌতুকীটুকুই আমার কাছে উপভোগ্য।

ঠাকুর-দেবতারের সবকিছুই বেশি বেশি। নামও। কেউ ঠাকুর একারই অস্তিত্বের শতনাম; না কাসীর নামডাকও কিছু কম নয়। প্রতি দেব-দেবীর গড়পড়তা যদি পঞ্চাশটি করেও নাম থেকে থাকে, তাহলে তেত্রিশ কোটি ইনুটা পঞ্চাশ অর্থাৎ—থাক, ক্যালকুলেটরটা ঠিক হাতের কাছে নেই আর অঙ্কে আমি লবত্কা। মোদাকথা, যে শুচ্ছের নাম। যতদূর জানি, বাংলা শব্দকোষে অত শব্দই নেই।

অত না হলেও ব্যক্তি প্রতি দুটি করে নাম মানুষেরও বরাদ্দ। পোশাকি নাম এবং আটপৌরে বা ডাকনাম। কারুর কারুর আবার বাশ নামও থাকে। সর্বসাকুল্যে তিনটে। অবশ্য ছদ্মনাম, বেনাম আমি ধর্তব্যব মধ্যে আনছি

না। কিন্তু অনেক সময় সমস্যাটা দাঁড়ায় ডাকনামকে নিয়ে। ডাকনাম সাধারণতই মূল পোশাকি নামের অপভ্রংশ রূপ। যেমন পঞ্চানন থেকে পঞ্চা বা পাঁচ। কিন্তু হাজার হোক ডাকনাম তো, কাছে কাছেই পঞ্চা-পাঁচুর পোশাকি নামের মতো কোনো আইনি সমর্থন বা স্বীকৃতি নেই। ফলে অপভ্রষ্টামির দাপটে ওই পঞ্চা বা পাঁচুই বিকৃত হতে হতে পেঁচো, পচু, পচা এমনকি শেষ পর্যন্ত পচাডেই গিয়ে দাঁড়ায়। নামের পচন ধরে এমনি ভাবেই। আমি অনেক মলয়কে ‘মেলো’ হয়ে পরে মাল হতে দেখেছি। গোবিন্দ থেকে গবা আর হাবল থেকে হাবা হয়ে যায় অনেকেরই।

ডাকনামের আরো কতকগুলো উটকো ঝামেলা আছে। যেমন ধরুন, থোকা থোকন বা খুকু খুকি দিয়ে বহু-বাচ্চা-কাচ্চাই ডাকনামের যাত্রা শুরু হয়। বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই ওই অস্থায়ী নেমট্যাগগুলি ন্যাজ্য কারণেই খসে পড়ার কথা। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে পড়ে না। আঠার মতো চিপুকে থেকে বেশ লজ্জায় ফেলে বুড়ো-বুড়ি থোকা-খুকু নামধারীদের। আমি অন্তত কমপক্ষে এমন জনা পাঁচেক থোকা, থোকন, বড় থোকনকে চিন্তা-যাদের বয়স, বলাই যাট, এখন যাট ছুঁই ছুঁই!

আরো একটা ঝামেলা আছে। কেউ কেউ তাঁদের ডাকনামের জনপ্রিয়তায় এতই স্বনামধন্য হয়ে যান যে তাঁদের আইন সম্মত, কেতা দূরন্ত পোশাকি নামের আর পাওয়াই পাওয়া যায় না। কৃষ্ণচন্দ্র দে নামটি কটা লোকেই রা জানত। কিন্তু কানাকেষ্ট? মার্কিন প্রেসিডেন্ট কার্টার এবং ব্রিটেন তাঁদের পোশাকি ক্রিস্চাল নাম জেমস এবং উইলিয়ামকে জলাঞ্জলি দিয়ে আটপৌরে নাম জিমি কার্টার ও বিল নামেই পরিচিত ছিলেন। সরকারি ভাবেও। যতদূর জানি বা দেখেছি (লেখকের সঙ্গে অল্প হলেও পরিচয় ছিল অঙ্ক গায়কের) কেউবাবু তাঁর কানাকেষ্ট পরিচিতিতে বিশেষ ক্ষুব্ধ ছিলেন না।

সে তো হল, কিন্তু পঞ্চাননবাবুরা কি তাঁদের নামের পচন নাকে রুমাল দিয়ে সহ্য করেন? করেন হয়ত বাধ্য হয়েই। ডাকনামের ওপর তো কারুর খুব একটা অধিকার নেই! ওটা একরকম পাবলিক প্রপার্টি। তা না হলে ফটাকেষ্ট, নেগোশুগু, খুনে রসিদ—তাদের বিশেষণ ধন্য নামগুলো চাকু, পাইপ গান, পেটো না চালিয়ে নির্বিবাদে মেনে নেবেই বা কেন?

সত্যি কথা বলতে কি ডাকনামের ডাকা-ডালার যেন শেষ নেই। এই-ত কদিন আগেই দিনদুপুরেই বলব, নিজেদের দোরগোড়ায় যে ডাকতিটা করে বসল ডাকনাম, তার কোনো নজির ইতিহাসের পাতায় আছে বলে জানি না। জন্মে ইস্তক নাম ছিল কলিকাতা। মুঘল দরবারের দলিল দস্তাবেজেও নামটা উর্দু আরবি হলেও পাওয়া যায়। লোকে অবশ্য কথায় কথায় বলত কলকাতা। ফিরিসিরা বলত কালকাটা। আবার আসানসোল পেরোলেই কলকাতা!

আসলে এই সেদিন পর্যন্ত কলিকাতাটাই পোশাকি নাম ছিল। যেমন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা পৌরসভা, কলিকাতা ইত্যাদি..... ইত্যাদি। কথায় কথায় অবশ্য সবাই কলকাতাই বলত যেমন এখনো বলে। হাজার হোক ডাকনাম তো একটা থাকা চাই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, গ্রামে-গঞ্জে, বিশেষ কবে নদীয়া জেলায়, গেরসুই হোক আর চামাভূয়োই হোক, কথায় কথায়ও কলিকাতাই বলে এখনো। কৃষ্ণনগরকেও এরা আমাদের মতো কেউনগর বলতে রাজি নয়। কৃষ্ণনগরই বলে সবসময়। শ্রীরামপুরের লোকেরা ‘সেরামপুর’ বলে বলুক, উত্তরপাড়ার বাসিন্দারা ‘ওতোরপাড়া’ বলেই আমোদ পেলে পাক, কিন্তু গোয়াড়ি কৃষ্ণনগরে মানুষ কেউনগরের খার ধারে না মোটেই।

অথচ কিছু করিতকর্মা বিদগ্ধ বাঙালি পরম উৎসাহে কলিকাতাকে ক্যালক্যাটার সঙ্গে সহমরণে চড়িয়ে কলকাতাকেই কথ্য, পাঠ্য সব বুলিতেই দিব্যি বরণ করে নিলেন। মুখে কারুর রা বেরল না। বেকলেও যে কিছু হত তা অবশ্য নয়। এই যে পূর্বের পাত্তা নেই অথচ পশ্চিমবঙ্গ। কই, এ নিয়ে তো কল্পাব্যক্তির কোনো উচ্চবাচ্য করতে দেখছি না। উত্তর না থাকলে দক্ষিণ কোথায়, পূর্ব না থাকলে পশ্চিম কোনদিকে। আমাদের কি দিগ্দিগ দিকজ্ঞানটুকুও নেই এতই দিশেহারা আমরা।

বুগটাই নাম বদলের। বিশেষ করে রাস্তাঘাটের। আর সমস্যাটা ওইখানেই। প্রয়াত প্রান্তঃস্ববর্ণীয়দের সম্মানার্থে তাঁদের রাস্তায় দাঁড় করানোর পুরনো রেওবার্টা ইদানীং হিড়িকে দাঁড়িয়ে গেছে। শহরের প্রায় সবকটি সর্বাঙ্গি এখন স্মরণীয়দের স্মরণার্থে। আর এই সর্বাঙ্গি দিয়েই আমাদের বিশ্বাসের যাত্রা শুরু। মনমোহন সিং তো অনেক পরে এলেন। তাঁর অর্ধমুদ্রকে আসার আগেই আমরা দেশের প্রয়াত হোমরা চোমরাদের সঙ্গে বিদেশে বিগত মুকুটবিশ্বে সম্মানিত করেছি রাস্তায় রাস্তায়। উদাহরণ : শেখপীর সর্বাঙ্গি (থিয়েটার বোড), হো চি মিন্ সর্বাঙ্গি (হারিংটন স্ট্রিট) লেলিন সর্বাঙ্গি (ধর্মতলা স্ট্রিট)।

কিন্তু সমস্যাটি-তো শেখপীর, শেলি বা লেনিন-স্ট্যালিনকে নিয়ে নয়, সমস্যাটি হয়েছিল আমার পাঁচ-সাত বছর বাদে কলকাতায় ফিরে হারিংটন স্ট্রিটে ফুলপিসিমাং ওখানে যাওয়া নিয়ে। আর থিয়েটার রোডে বকুলদির সঙ্গে একবার দেখা করে আসা নিয়ে। রাস্তাই নেই, তো বাড়ি খুঁজব কোথায়! মিনিবাসের নেহাৎই ছোকরা কণ্ডাক্টর একটু বিরক্ত হয়েই জানিয়েছিল যে থিয়েটার-টিয়েটার যা হয় সব রবীন্দ্রসদনে, বা মঞ্চলোকে

হয়। তা কোথাকার টিকিট আমার—শিশির, নজরুল না মধুসূদনের? তিনটে তিন দিকে। রবীন্দ্রসদন হলে নামিয়ে দিতে পারে, আড়াই টাকা ভাড়া।

তিরিশ বছর কানপুরে এলগিন মিলে কাজ করার পর কলকাতায় ফিরে নাস্তানাবুদ হতে হয়েছিল এক প্রবীণ কলকাতাবাসীকে ডালহাউসি স্কোয়ারে যেতে। জগুবাঙ্গারের মোড়ে দাঁড়িয়েছিলেন ভদ্রলোক ট্রামেব অপেক্ষায় (মেট্রোপূর্ব যুগে)। যাবেন হাইকোর্ট। ট্রাম আসছে যাচ্ছে। সবই এসপ্লানেডমুখে নয়ত বিবাদী বাগ। আধঘণ্টা পর্য্যন্ত মিনিট দাঁড়িয়ে থাকার পর ভদ্রলোক পাশের লোকটিকে আমতা আমতা করে জিজ্ঞেস করলেন—

আজকাল কি ট্রাম ডালহৌসি যায় না?

: যাবে না কেন? ওই তো সামনেই বিবাদী বাগের ট্রাম। উঠে পড়ুন।

উঠেটাও হয়, কপালে ভোগান্তি থাকলে দিম্বি থেকে বাই বোড আমার গাড়িটা এসেছিল। বকুলবাগানে ট্রাফিক দপ্তরে গেলাম গাড়িটা এখানে রেজিস্ট্রার নতুন নম্বর প্লেটের আর্জি নিয়ে। ওনারা বললেন, ব্রাবোর্ন রোড অফিস থেকে ইন্টার-স্টেট টোলার প্রাপ্য অর্থ দিয়ে রসিদ নিয়ে আসতে। উত্তম কথা। কিন্তু আব বোকা বনতে আমি রাজি নই। ব্রাবোর্ন বোডের বর্তমান পরিচিতি কী সেটা জানা দরকার। একটু ছোট্ট ছোট্ট করতে হল। শেষপর্যন্ত কর্পোরেশনের পূর্ত বিভাগের বেকর্ডবাবুর কাছ থেকে নামটি পেয়ে গেলাম।

গাড়ির কাগজপত্র নিয়ে একটা ট্যাক্সিতে উঠে বসলাম।

: বিপ্রবী ত্রৈলোক্য মহারাজ সর্বাঙ্গি চলুন।

: সেটা কোথায় দাদা? পূর্ব না পশ্চিম মেদিনীপুর?

For all kind of Medicines in reasonable Price

M/S LIFE LINE

117, Ekdalia Road
Kolkata-700 019

চরণ বৈরাগীর ইকড়ি মিকড়ি

কলকাতা ও গণেশ ঠাকুর



দুটি নিরীহ প্রশ্ন।

এক) ভারতের সবচেয়ে অসভ্য জনগোষ্ঠী
কী নামে পরিচিত?

দুই) ভারতের সবচেয়ে জংলি শহরের নাম
কি?

প্রশ্নদুটির উত্তর জানলেই পাঠকদের মধ্যে
যে প্রতিক্রিয়া হবে, তাই প্রমাণ করবে উত্তরের
যাথার্থ্য।

প্রথম প্রশ্নের উত্তর—বাঙালি।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর—কলকাতা।

রে-বে করে তেড়ে উঠে বৈরাগী কে
'জ্যোৎস্নেব সিন্ধা দেবার আগে দয়া করে একটু
ভাবুন। ভাবুন সভ্যতার সংজ্ঞা কী। তারপর
নিজেকে প্রশ্ন করুন, ঐ সংজ্ঞা অনুসারে আপনি
এবং আপনার আশেপাশের প্রিয়-পরিজন
কতখানি সভ্য। প্রতিদিন বাসে-টেনে মানুষ যে
আচরণ করে, তাব মধ্যে সভ্যতার লেশমাত্রও
থাকে না। এই যে ষ্ট দিন আগে একজন ডাক্তারকে
বন্য সুখে চাঁদা-করা আড়ং দেওয়া হল, তাকে

কি কোনোভাবে সভ্যতা সম্মত বলা যায়? যে
কোনোদিন ব্ল্যাক ডায়মন্ড বা কোলফিল্ড
এক্সপ্রেসে চড়ে দেখুন। মনে হবে, প্রাচীন
আফ্রিকার জঙ্গল থেকে আসা কিছু প্রাণী বিকলাঙ্গ
বাংলা ভাষায় কথা বলে নিজেদের চূড়ান্ত
অসভ্যতা জাহির করছে। অন্য পরে কা কথা—
ডি আই জি নজরুল ইসলামের দু-দুটি ব্যক্তিগত
অভিজ্ঞতা, যা সব কাগজে বহুল প্রচারিত, ভেবে
দেখুন! কোনো সভ্য সমাজে এমন সম্ভব?
কোনো সভ্য মানুষ ঐ ভাষায় একজন বুদ্ধিমান
লেখক ও উচ্চপদস্থ সরকারি অফিসারকে
অহেতুক, কেবল পেশি-আত্মফালনে, হেনস্তা
করতে পারে? না, এগুলো স্ট্রে সারমেয়র কীর্তি
নয়। এটাই প্রাত্যহিকের স্বাভাবিক দর্পণ।

যে কোনো সরকারি অফিসে যান, মনে হবে,
হয় হাটে নয়ত ফুটবল মাঠে হাঙ্গির হয়েছেন।
শব্দনাদ এত উচ্চ। অফিসে কেন কেলাহল-
কলবব? শুনলেই বোঝা যায়, কর্মসংস্কৃতি শব্দটি
এখানে পরিহাসের বস্তু। একই অবস্থা যে কোনো

ভারতীয় ব্যাঙ্কে। 'ওরে চা দিয়ে যা'—
ক্রিম্যারেসের খাতাটা—'। সবাই যেন স্ট্রিট কর্ণারে
মিটিং করছেন। কেন, প্রশ্ন করলেই এমন
খ্যাংকালো জবাব, কানমলে আপন মনে প্রতিজ্ঞা
করতে হয়—আর নৈব নৈব চ। পাশের বিদেশি
ব্যাঙ্কে ঢুকুন। সব এদেশীয় মানুষ। পরিচ্ছন্ন
বাংলায় কথা বলেন। এমন স্বরে যে, পাশের
টেবিলে শোনা যায় না। তারকা-অর্থচিত, অর্থাৎ
সাধারণ হোটেল-রেস্তোরা-মধুশালায় যান, মনে
হবে হটমালার দেশে এসেছেন। এঁদের গলায়
সাইলেন্সের লাগানো যায় না?

সম্প্রতি পুরী ও হরিদ্বারে কিছু বঙ্গপুকষের
বর্বরোচিত অসভ্যতা প্রত্যক্ষ করে লজ্জিত চিত্তে
ভেবেছি, এদের লাদুলেব গুপ্তস্থান কোথায়।

কলকাতার শ্মশানগুলোয় ঢুকলে মনে হবে,
যেন পিকনিক স্পট। চিংকার, নোংরা, আবর্জনা।
এবং লাইন। দিল্লি-বোম্বের শ্মশানগুলো শুধু
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নই নয়, যথার্থ স্তব্ধ, শান্ত,
শোকপুরী। 'হবি বোলো'র বিকট উল্লাসধ্বনি
হরিবলু তো বটেই, মৃতের প্রতি চরম অশ্রদ্ধারও।
বোধবুদ্ধিরহিত বঙ্গকুলকে কে বোঝাবে।

একটা সময় ছিল যখন সারা ভারতে!
বাঙালিকে মার্জিত সুসংস্কৃত ভদ্র মিত ও মৃদুভাষী
সম্ভজন জাতি বলে মান্য করা হত। এখন
'বাসু' 'বং' 'বাস্তা' ইত্যাদি তাচ্ছিল্যই বাঙালির
লগাটভূষণ।

কলকাতা শহরের কথা আর কী বলা যায়।
যে শহবে নিয়ম না মানাই নিয়ম, যে শহরে
কোনো অনুশাসনই প্রযোজ্য নয়, সেখানে
জঙ্গলের অরাজকতা ছাড়া আর কী ঘটা সম্ভব।
বাস মিনিবাস কোথায় থামবে, কতক্ষণ থামবে,
বা আদৌ থামবে কিনা, সম্পূর্ণ চালকের মর্জি-
নির্ভর। সাবা দেশের অটো-ব্যবস্থা এখানে অচল।
অটোর নিয়ম যেমন দুনিয়ার বাইরে, তার
প্রয়োগও ন্যূনতম শৃঙ্খলার বাইরে। আব জনগণ?
যখন-তখন যেখান দিয়ে খুশি রাস্তা পারপারের
গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগে সকলেই এক-
একজন ট্রাফিক পুলিশ বা নিমাই ঠাকুর যেভাবে
হাত তুলে নেচে-নেচে চলে। সচেতন জনতা,

সভাতার শৃঙ্খলা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অচেতন। অথচ গায়ে একটু স্পর্শ লাগলেই ধুকুমার কাশ। গণ ধোলাই। পথ অবরোধ। অথচ কলকাতার পথ দূর্ঘটনার ৯০ শতাংশ ঘটে পথচারীর অসভ্য বিশৃঙ্খলা বশত। একই অবস্থা ফুটপাথের। ফুটপাথ তুমি কার? —যার দখলে তার। হকার উচ্ছেদ নিয়ে কত নাটকীয় আরব্য রজনী কেটে গেল। অবস্থা যথাপূর্বং। হকার অন্য-শহরেও আছে, কিন্তু কলকাতা যেন শুধুই হকার নগরী। এটা সিটি অফ জয় না, সিটি অফ পরাজয়। আ সিটি অফ জায়েন্স। এমন জংলি শহর কোথাও পাবে নাকো তুমি—

এই পর্যন্ত দেখে তুবড়িকবি ছয়ছাড়া তুখোড় বলল, বৈরাগীদা, আপনাতর কলকাতার বিরুদ্ধতা করা বাতিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমালোচনা ভালো, কিন্তু কনস্ট্রাক্টিভ হওয়া উচিত। সমাধানের সূত্র বাতলান কিছু।

—সমাধান? এই শহরে? শিবেরও অসাধ্য। কারণ, রাজনৈতিক ইচ্ছার সভ্যতাবাদ। মন্ত্রী, মেয়র সারা বছরে অসংখ্যবার হিন্দি-দিব্বি, ইউরোপ-আমেরিকা যাচ্ছেন। দেখতে তো পান সেইসব শহরগুলো। তাঁদের সামান্য লজ্জাও হয় না? জাগে না আত্মধিকার? নিদেন সামান্য অনুশোচনা?

না। হয় না। হবে না। কেন না, সবই তো গণেশায় নমঃ। যে কোনো দিক, যে কোনো বিষয় নিয়ে বলুন, বাসের শৃঙ্খলা বা হকার, দুর্ঘটনা বা রাস্তা সাফাই/সারাই সর্বত্রই গণেশের বাহন চুকচুক করছে। তাই যদি না হবে, মন্ত্রী-মেয়র-মেয়রপারিষদের চক্ৰমকে দেহ, আভরণের অহমিকার বারফটাই, কোটি কোটি টাকার পুজো বাজেটের 'ধামাকার' বজ্রনাদের গোপন রহস্য কী?

রহস্য কিছু নেই। পুজো মশুপে দুর্গাজি থাকেন বটে, তবে আসলেই অটল গণেশজি। সাহিত্য-সংস্কৃতি-সঙ্গীতেরও ধামাকা দেখছেন না? পুজো সংখ্যায় একজনেরই একডজন উপন্যাস, দু'ডজন গল্প, তিনডজন কব্ধে,

আরো ডজন কয়েক ভ্রমণ-কাহিনী, নাটক, পুরাচর্চা। চার ক্যাসেটে তিনডজন গান গাইছেন গায়ক। কেউ শুনুক বা না শুনুক। শব্দ দূষণ ঘটে ঘটুক। কিন্তু গণেশজি তো তুষ্ট থাকছেন। তাঁর বাহন কুটুস করে না কাটলেই হল।

তুবড়ি-কবি তুখোড় বলল হচ্ছিল, কথা কলকাতা নিয়ে, আপনি তার মধ্যে আবার সাহিত্য-সঙ্গীত আমদানি করলেন কেন?

—কারণ বাঙালিরা যে অহঙ্কারে ডগমগো—কলকাতা ভারতের সাংস্কৃতিক রাজধানী! অ্যানাদার বকওয়াশ! কোনো সং সাহিত্য পত্রিকারই পাঠক নেই। পত্র-পত্রিকা চলে না। প্রকাশক শুধু সেই গোব্দা উপন্যাসই ছাপতে ইচ্ছুক, যা জন-গণেশ পাশ্চাত্যের মতো খারে। কিংবা গরম কচোড়ি। ভুজিয়া-আগ্রাসনে সন্দেহ-দইও শীঘ্রই যাদুঘরে স্থান পাবে। 'রক্ষা-বন্ধন' আর 'কড়োয়া-চক্রে'র ব্রতচারিণীদের সংখ্যা কী পরিমাণ বেড়েছে, তার পরিসংখ্যানের জন্যে স্বর্ণবিপণিতে খোঁজ করলেই জানা যাবে, 'মঙ্গলসূত্রে'র চাহিদা বঙ্গনারী মহলে কত। লক্ষ্মীর আরাধনা উঠেই গেছে। বেড়েছে, বাড়ছে গণেশ-পূজা। আরো বাড়বে। কেননা, চাঁদি কা জুতিকা তেজারত তাহাদের দখলে। যেমন কলকাতার ফুটপাথ। সবই ও গণেশায় নমঃ।

বাঙালি পূর্বপুরুষদের পদাঙ্ক 'এপিং' করে আরো অসভ্য হবে। কলকাতা হবে আরো জংলি জঙ্গল। শুধু অপেক্ষা, দুর্গাপুজোর বদলে কবে শুরু হবে গণেশ-ভজনার মাস-হিস্টরিয়া।

নির্বাক ছয়ছাড়া তুখোড়কে বললাম, কিছু বলছ না যে।

তুবড়ি-কবি বলল, কুমিরের অশ্রু কে মোছায়, জানতে বড় সাধ হচ্ছে। বললাম, গণেশের ভুড়িটা একটুও কমে না কেন, জানতে হচ্ছে হয় না?

পত্রপাঠের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কর্মণে করি
পত্রপাঠ এগিয়ে চলুক ভার্যে অপ্রতিহত গতিতে

আন্তরিক অভিনন্দন ও হার্দিক ভালোবাসা সহ

বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী

বেলঘরিয়া, কলকাতা

PRATIMA SISTER BUREAU

129, Motilal Nehru Road,
Kolkata - 700 029

☎ 476 9973
475 2181
461 1732



PRATIMA SISTER BUREAU

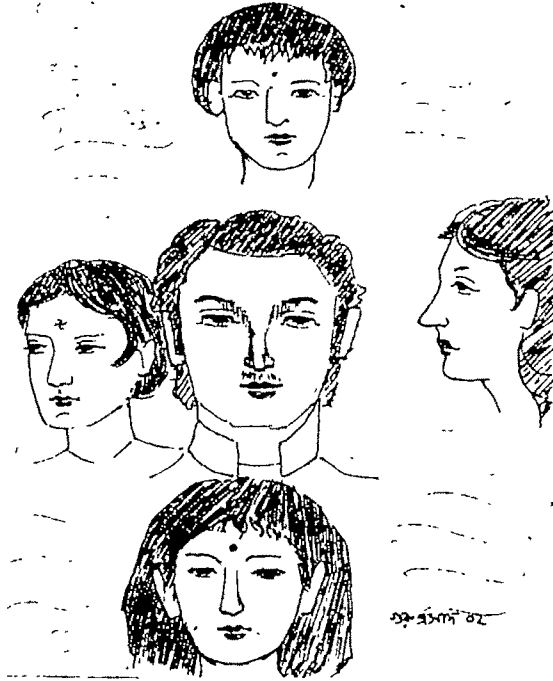
80/1G, Kankulia Road
Kolkata - 700 029

☎ 461 1732
475 2181
476 9973

★ AYAH
★ SISTER
★ AMBULANCE
★ PHYSIOTHERAPY

আমার পাড়ার মেয়েরা

শঙ্করলাল ভট্টাচার্য



একেকটা জানালা, একেকটা বারান্দা যেন একেকটা সিনেমার পর্দা আমার। সেখানে মনিং শো আছে, ম্যাটিনি-ইভনিং নাইট শো-ও আছে। আমি বেলায় বেলায় একেকটা ছবি দেখি একেক পরদায়। আমার ছাদের একেক আলসেয় ভব দিয়ে দাঁড়িয়ে। আমার নায়িকারা কেউ সোফিয়া লোরেন, কেউ সুচিত্রা সেন, কেউ কিংবা ওয়াহিদা। একেক বেলায়, সন্ধ্যা দুপুর কি বিকেলের বোদেব একক লাইটিঙ্গে, একক মেজাজে আমি পাই আমার নায়িকাদের।

আমার দু-দুটো। বিলিতি নায়িকা, বাকিরা দিশি। আমাকে এখনো সিনেমা হলের অ্যাডান্ট ফিল্মে ঢুকতে দেওয়া হয় না। কিন্তু আমার এই ছাদের ব্যালকনি সিটের থেকে দিনের পর দিন আমি নানা বস্তুর প্রাপ্তবয়স্ক ছবিতে মজে আছি। ঠিক এই মুহূর্তে আমার সামনে আমার নায়িকা মার্লিন ওয়াটসন, যার আমি নাম রেখেছি

সোফিয়া লোবেন।

মার্লিন এইমাত্র ওর বব সিরিলের সঙ্গে একপ্রস্থ ঝগড়াঝাটি, হাতাহাতি করে ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। ফরসা মুখটা ওর রাগে গোলাপি হয়ে আছে, কান্নাকাটির জন্য চোখদুটো ফোলা-ফোলা। মুখে বিড়বিড় করে কী-সব বলতে বলতে হন-হন করে ছুটছে মোড়ের দিকে। সিরিল একবার বারান্দায় এসে গর্জন করে ডাকল, মার্লিন। ডোন্ট গো। লেট মি এক্সপ্লেন। কিন্তু কে শোনে কার কথা।

এই মুহূর্তে থেকে বলা যায় মার্লিন কিছুক্ষণের জন্য আমাব বান্ধবী হয়ে গেল। সিরিল যেই মুখের স্বল্প সিগারেট রাগের মাথায় 'সিট।' বলে ছুড়ে ফেলে ঘরের ভেতরে ঢুকে গেল, আমি মার্লিনকে আমার হৃদয়ের মধ্যে আঁটোঁসাঁটো করে পুরে ফেললাম। আমার মনের ভেতরের ফিল্ম থোজেক্টরটা ভাঁ করে চালু হয়ে গেল।

পরিষ্কার কবে বলি বরং—মার্লিনকে আমার ভীষণ ভালো লাগে। কী সুন্দর গোলাপি ফরসা রং! লাল টুকটুকে ঠোঁট! সোনালি চুল ঘাড় অঙ্গি গড়াচ্ছে; চোখে মেমসাহেবি-চাউনি (অ্যাংলোরা মেমসাহেব বই কি!) হিলাহিলে শরীর দুলিয়ে ঝট্‌ঝট্‌ হাঁটা; আর আমাকে দেখলেই একগাল হেসে 'হাও আব ইউ, নিটু?' সন্ধ্যাধন, সবকিছু আমাকে ভেতবে ভেতবে পাগল করে দেয়। মনে হয় ছুটে গিয়ে ওকে জাপটে ধবে একটা চুমু দিই ওর বব সিরিলের কায়দায়।

হ্যাঁ, সিবিলের এইসব চুমু আমি দেখি একেক সন্ধ্যায় ছাদের পাড়ার ঘর ছেড়ে সামনের আলসেতে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। প্রায় খেয়েই ফেলে যেন বউয়ের মুখটা ওই পেটুক সায়েব। আমার শরীরের ভেতরটায় কীরকম-কীরকম যেন করে। মনে হয় হৃদপিণ্ডটা লাফাচ্ছে। একটু একটু লজ্জা করে, বেশ মজাও পাই, আবার কীরকম একটা দুঃখও হয়।

অ্যাংলো সায়েব-মেমদেব বোধহয় লজ্জাটিক্কা কম। জানলা হাট করে খুলে কেউ ওইসব করে। অবিশ্যি রাতেরবেলায় অন্ধকারে ছাদে দাঁড়িয়ে কে কী দেখল, তাতে কী আব এসে যায় ওদের?

কিন্তু আমার এসে যায়। অত সুন্দরী কাবো গা থেকে একটা একটা করে কেউ জ্বালা খুলে নিলে আমার ভয়ানক বিপদ হয়। আমাব শরীর কোঁপে-কোঁপে ওঠে, হাতের তালু ঘামে, মাথা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়, সেখানে জমা পড়া সাবদিনের, পড়াওনা করুবেব মতো উবে যায়। ভাবনা হয়, মা বা কাকা এ সব জানলে কী সর্বোনাশ! অথচ সাপুড়ের বাঁশি মতো দৃশ্যটা দূলে দূলে আমার মনেব ভেতরের জেগে-ওঠা সাপটাকে মস্তমুগ্ধ করে রাখে। আমি জাযগা ছেড়ে নড়তেও পারি না। একেক দিন এমন মনে হয়েছে, হাঁটুর নিচ থেকে পা দুটো আমার কেউ কেটে বাদ দিয়ে দিয়েছে।

তবে সেই সন্ধ্যায় যেদিন সিবিল মার্লিনের

বড়িসটাও খুলে নিয়ে ওর ওই দুখের মতো সাদা বুক মুখ ঘষতে লাগল, আমি ভয়ের চোটে ছাদের অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে দুদাড় করে পালিয়ে গিয়েছিলাম। যেন ভূত দেখেছি। আর পড়বি তো পড়, গিয়ে সটান রাঁধুনি বড়াঁকুরদার সামনে। সে আমার ওই অবস্থা দেখে ভড়কেই গিয়েছিল। আমার দু-কাঁধ ধরে ঝাঁকিয়ে দিয়ে, বললে, 'কী হইয়েসে তুমার সাহিব? ভূত দেখিয়েসো নাকি?' আমি ব্যাপারটা চাপা দেওয়ার জন্য বললাম, 'না, না, কিছু না। সিঁড়ি অন্ধকার তো, ভয় খেয়ে গেছি।' বড়াঁকুরদা আমার দুই চোখে চোখ ফেলে বললে, 'আলবাৎ কুসু দেখেছো। কতো বড় চোখ হইয়েসে তুমার।' শেষে রাগের মাথায় বলেই ফেললাম, 'হ্যাঁ, তাই হয়েছে। আমি ভূত দেখেছি।'

আর এই এখন যে সিরিলের সঙ্গে ঝগড়া করে বেরিয়ে গেল মার্লিন, আমি চিলেকোঠার পড়ার ঘরে ঢুকে মনের ভেতরের প্রোজেক্টর চালিয়ে ওই দৃশ্যগুলো দেখা শুরু করব। মনের দগদগে ক্ষতের মতো দৃশ্য সব। যার কিছুই ভোলা যায় না। কেবল সিরিলের জায়গায় পুরুন্টা হয়ে যাব আমি। আমি তখন একটা একটা করে জামা খসান মার্লিনের শবীর থেকে, শেষে বেরিয়ে আসবে ওর ওই দুখসাদা বুক, 'আর.....'

'নিতু! নিতু! নিচ থেকে প্রবল হাঁক কাকার। আমি উত্তর ফরলাম, যাই কাকা। বলে নামতে লাগলাম ছাদের সিঁড়ি বেয়ে। আর ভেতরে ভেতরে গজরানি আমার, 'নাঃ! এ জীবনে শান্তি বলে কিছু নেই। নিজের মতো একটু থাকব, তার জো নেই!'

কিন্তু কাকার সামনে পড়ে একেবারে থমকে গেলাম। কাকার মুখ কী গম্ভীর। কেমন ব্যথা-ব্যথা ভাব। আমি ভাবতে লাগলাম, কী এমন দোষ করেছি যে কাকার এত কষ্ট হল। আমি চূপ করে পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম।

কাকা বলল, তোমার বন্ধুরা আজ দুপুরে শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। ওদের মা আজ দুপুরে তোমাকে ওদের ওখানে খেতে যেতে বলে গেলেন। তুমি যেও।

আমি বুঝেই উঠতে পারলাম না কাকা 'বন্ধুরা' বলতে কাদের কথা বলছে। পাড়ায় আমার বন্ধু বলতে কি কিছু কম আছে? তাই জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কাদের কথা বলছ কাকা?

কাকা বলল, কাদের আবার? তোমার ওই ডব্বল আর ভোম্বলের কথা। মুগালিনী বলছিল, ওদের বাবা মারা যাওয়ার পর থেকেই সংসাবে অভাব লেগেছে। ওদের তাই মামাবাড়িতে থেকে পড়াশুনার ব্যবস্থা হয়েছে। আজ দুপুরে ওদের মামা এসে নিয়ে যাবেন ওদের।

ভেতরটা অসম্ভব মোচড়াতে শুরু করল। একটা কান্না কাঁদতে ইচ্ছে হল। মুখ ফসকে বেরিয়ে এল, মামাবাড়ি কোথায়?

কাকা বলল, আসামের কৈলাশ শহরে।

আমার ভেতরটা ভেঙে খানখান হয়ে গেল। ডব্বল আর ভোম্বল তাহলে চলে যাবে? আমার ওই নিত্যদিনের সঙ্গীরা না থাকলে কাদের সঙ্গে পুজোর সকালে শিউলি কুড়াতে যাব? কাদের সঙ্গে ভিড় বাড়া' গিয়ে রথের মেলায়? দেশলাইয়ের টেলিফোন বানিয়ে কাদের সঙ্গে মনের কথা কইব? কাদের সঙ্গে দুপুরবেলায় বসে 'অনুরোধের আসর' শুনব? কে আমাকে প্রশ্ন করবে, 'আচ্ছা নিতু, তুই তো ইংরেজিতে পণ্ডিত। বল তো, ইংরেজিতে 'প্রেমিক' শব্দের মানে কী?'

মনে আছে ওদের এই প্রশ্নটার উত্তরে বলেছিলাম, 'লাভার'। তাতে দিগ্গজ ডব্বল বলল, ধ্যাৎ! সেদিন দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে শুনলাম উকিল

বংশীকাকা বলছে প্রেমিকের ইংরিজি 'প্রস্টিটিউট'। আমি তখন ভয়ঙ্কর তচ্ছিল্যের কণ্ঠে শুনিতে দিয়েছিলাম, তোমার মাথা আর বংশীকাকার মুণ্ড। প্রস্টিটিউটের মানে হল খারাপ স্ত্রীলোক।

তখন ভোম্বল মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলল, তা হলে তো ঠিকই হল। প্রেম তো খারাপ স্ত্রীলোকেরাই করে। তাই না?

আমি আর কথা বাড়াইনি। শুধু মনে মনে বললাম, মূর্খদের জ্ঞান দিয়ে লাভ নেই। যা জেনেছে তাই জানুক।

আর এখন সেই মূর্খদের জন্যে প্রাণ কাঁদছে আমার। কাকাকে বললাম, ঠিক আছে, যাব।

সকাল কেটে দুপুর হতে যে কত সময় লাগল ভগাই জানে। বইয়ের পাতা উন্টেছি আর ডব্বল-ভোম্বলের কথা ভাবছি। মান করছি আর ওদের মুখদুটো চোখের সামনে ভাসছে। আর তারপরেই ওদের দুই দিদি লালিমা আর গরিমার মুখ। আমরা শট করে ডাকি লিমা আর রিমা বলে। ভাবছিলাম কে আর এরপর ওদের জন্য সুচিহ্ন-উত্তমের ছবির ম্যাটিনি শোয়ের টিকিট কেটে এনে দেবে। কে ওদের জন্য পাড়ার জগদদার হোপনাট ফাংশনের সিট ধরে রাখবে। কে ওদের কাছে ফুটকার পয়সা চাইবে। কে আর আমাকে ওদের বাধুরমের দরজার ফুটোর সামনে বসিয়ে বলবে, দিদিরা চান করছে। দেখবি?

আমি সেই ফুটোতে চোখ রেখে যেন স্বর্গ চলে গেলাম। লিমা আর রিমা চান করছে, একজন আরেকজনের গায়ে সাবান মাখাচ্ছে।

তখন ভোম্বল আমাকে ঠেলা মারল, সর্ সর্ আমি একটু দেখি। আমি সরতেই ভোম্বল সেখানে ফিট হয়ে গেল। আমি সরে এসে দেখি ভোম্বল মুখ গুঁজে সিঁড়িতে বসে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী হল তোর আবাব? ও মুখ তুলে বলল, দিবি গেলে বল, এ কথা কাউকে বলবি না?

আমি বললাম, কোন কথা?

—এই যে আমরা ফুটো দিয়ে সব দেখি।

—সে কী! তোরা রোজ দেখিস নাকি?

—না তো! কী? খুব ভালগে দেখতে। কী হয়েছে, নিজেরই দিদি ওরা!

আমি বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে সায় দিলাম, ঠিকই তো! নিজের দিদি ওরা।

দুপুরে ভাত আর মাংস খেয়ে ভোম্বল তার ডব্বলের সঙ্গে শেষবারের মতো বসলাম গিয়ে ওদের কলেরগানটা পাশে। ভাইদের জন্য দিদিবা একটা ছোট উপহার এনেছে আজ। একটা নতুন রিলিজ হওয়া রেকর্ড। পাশের ঘরে মাসিমু অঝোরে কাঁদছে দুই ছেলের জন্যে। ফের কবে বাড়ি আসবে কে জানে!

লালিমা রেকর্ডটা চাপিয়ে দিল কলেরগানে। পাশে বসে গরিমা যন্ত্রে দম দিয়ে বাচ্ছে। হঠাৎ ঘরের কান্নায় ভরা নীরব হাওয়ার মধ্যে পান্নালাল ভট্টাচার্য গেয়ে উঠলেন, 'মা, আমার সাধ না মিটল, আশা না পুরিল, সকলি ফুরিয়ে যায় মা।' আর এবার হুড়হুড় করে চোখ বেয়ে ধারা নামল আমার।

এপিঠ-ওপিঠ দু'পিঠ দু'বার করে চালিয়ে রেকর্ডটা টিনের বাস্কে ভরে এরপর দু'ভাই মামার হাত ধরে বহুদিনের জন্যে বেরিয়ে গেল বাড়ি ছেড়ে। আমি রাস্তার মোড় অঙ্গি ওদের পাশাপাশি গেলাম, তারপর 'যাই বে।' বলে চোখ মুছতে মুছতে ছুটে লাগলাম বাড়ির দিকে।

সন্ধ্যাবেলায় আলতো পায়ে ফের গেলাম ভোম্বল-ডব্বলদের বাড়ি।

দেখি সারা বাড়িতে আলো জ্বলছে, বাকি সব অন্ধকার। যে ঘরে আলো সেখানে চুপ করে বসে জানলার বাইরে অন্ধকার দেখছে লিমা। আমার পায়ের শব্দে চট্কা ভাঙতে মাথা ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করল, কে, নিতু? এসেছিস?

বললাম, আর সবাই কোথায়?

লালিমা বলল, শিবমন্দিরে পুজো দিতে গেছে।

—তুমি গেলে না?

—না রে, কিছু ভালো লাগছে না। খুব কষ্ট হচ্ছে। বললাম, আমারও খুব কষ্ট হচ্ছে লিমা। লালিমা বলল, জানি। সব ব্যাপারেই তো তোর একসঙ্গে থাকতিস।

বললাম, সে আর বলতে। কত খারাপ কাজই না করেছে আমরা একসঙ্গে।

লালিমা চমকে উঠল।—খারাপ কাজ! কী খারাপ কাজ করেছিস তোরা?

আমি মাথা হেঁট করে বসে রইলাম। লিমা ফের শুধোল, কী খারাপ কাজ? বল আমাকে, আমি কাউকে বলব না।

বললাম, সে তো তুমি বলবে না। কিন্তু ক্ষমা কবে দেবে বলো?

লিমা বলল, হ্যাঁ রে বাবা দোব। নে, দিলাম।

আমি আমতা আমতা করে বলা শুরু করলাম,—আমি ভোম্বল আর ডম্বল তোমাদের দেখেছি....

লিমা এবার রীতিমতো উদ্ভিগ্ন—কী দেখেছিস আমাদের?

—তোমাদের চান করতে দেখেছি।

গমের মতো রং লালিমার, তাতে সূর্যডোবার ছটা লাগল যেন। ও চোখদুটো বন্ধ করে বসে রইল চুপচাপ। কিন্তু আমি আর থামতে পারছি না। বলছি চলছি, আমরা দরজার ফুটো দিয়ে তোমাকে রিমাকে সাবান মেখে খেলা করতে দেখেছি।

লিমা সব শুনেও সেই চুপ মেরে আছে। তারপর হঠাৎ আমার মাথাটা এক ঝটকায় ওর মুখের কাছে টেনে নিয়ে গালে একটা চুমো দিল। দিয়ে বলল, যাঃ। কাউকে বলিস না। ক্ষমা করে দিলাম।

আমি ফের আমতা আমতা করে শুরু করলাম, আর তো তোমাদের ওভাবে দেখতে পাব না....

লালিমা হঠাৎ ওর টেপফকের পিছনের বোতামগুলো পটপট করে খুলতে লাগল।

তাকিয়ে দেখেই যাচ্ছি তো দেখেই যাচ্ছি, সাধও মেটে না, কথাও ফোটে না। আর লালিমা একনজরে দেখে যাচ্ছে আমার চোখদুটো।

হঠাৎ যেন একটা ঘোরের মধ্যে উঠে এসে লালিমা বলল, আমি এখান থেকে চলে গেলে তোর কষ্ট হবে?

আর আমি নিজেই ধরে রাখতে পারলাম না। লিমার খোলা বুকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে সিরিলের চঙে মুখ ঘষতে ঘষতে বললাম, না না, তোমরা সবাই এভাবে ছেড়ে চলে গেলে আমি কাদের নিয়ে থাকব?

আমার গলাটা ভেঙে এসেছিল। লিমা আমার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলল, নে ছাড়। মা-রা এসে পড়বে কোনসময়।

২

আমার ম্যাটিনি শোয়ের নায়িকারা দিনদিন সংখ্যায় বাড়ছে। আমি চিলেকোঠার ঘরে বসে খেয়াল রাখি, মার্লিনদের পাশের ফ্ল্যাটের টম্পা

কখন লরেটো থেকে ফিরে ওদের বসার ঘরের কাচের শার্সি খুলে নিচে তাকাবে মাথায় বাস্র নিয়ে ঘোরা কেক-প্যাটিজের জন্যে। ও তখন হাত নাড় আমার, আমিও হাত নাড়ি।

একদিন এরকম প্যাটিস কিনছি আমরা, হঠাৎ ও বলল, নিতুদা তুমি ইস্কুল যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছ?

বললাম, তা কেন? এখন তো আমার গরমের ছুটি চলছে। আরো এগারো দিন আছে।

টম্পা বলল, তারপর তো তুমি পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে।

বললাম, তাতে তোর কি অসুবিধা?

—না, মা বলছিল তুমি ইংলিশে খুব ভালো। আমার কয়েকটা পড়া যদি দেখিয়ে দাও।

—কী পড়া?

—দুটো কবিতা?

—কী কবিতা?

—ওয়ান্টার ডি লা মেয়ার-এর দ্য লিসনার্স আর উইলফ্রেড ওয়েন-এর 'স্ট্রেঞ্জ মিটিং'।

আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, তোদের এসব কবিতা পড়ানো হয়? ও বলল, বা রে। আমরা কি বাচ্চা আছি নাকি?

—তা হলেও....

—কেন, তোমার কাছেও কবিতা লাগছে?

বললাম, তা না। তবে জানিস কি, এই দুটো কবিতাতেই ভূত আছে?

হঠাৎ হাতে প্যাটিজ নিয়ে খিলখিল করে হাসতে লাগল টম্পা। বলল, সেইজন্যই অ্যাভয়েড করছ? কেন, তুমি তো দিবা রাতের বেলায় ছাদের ঘরে একলা পড়ো। তোমার তো আর ভূতের ভয় নেই!

আমতা আমতা করে বললাম, কিন্তু তুই পারবি আমার ওই ছাদের ঘরে গিয়ে পড়ে আসতে?

কিরকম সিটিয়ে গেল টম্পা,—জানি না। মাকে জিজ্ঞেস করতে হবে। কেন, তুমি পারো না আমাদের বাড়ি এসে পড়াতে?

বললাম, না। তোদের পাশের ফ্ল্যাটের সিরিলটাকে দেখলে আমার মাথা গরম হয়ে যায়।

টম্পা অবাক হয়ে বলল, সে আবার কি! ও তো খুব ভালোমানুষ। টিপি কাল অ্যাংলো ইন্ডিয়ান নয়। ওর সঙ্গে তোমার আবার কি হল?

বললাম, কিছু না। তবে ও মার্লিনকে মারে। আমার একদম এটা পছন্দ না।

টম্পা বলল, তাহলে আমাকে পড়াতে চাও না। তাই তো?

—তাহলে তাই। বলে আমার হাতের প্যাটিজটাও ওর হাতে ধরিয়ে দিয়ে চলে এলাম।

মার্লিনের কাদতে কাদতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়া আমার চোখের সামনে ভাসছে। ভাসছে ডম্বল-ভোম্বলের মামার হাত ধরে কলকাতা ছেড়ে চলে যাওয়ার দৃশ্য। ভাসছে লালিমার খোলা বুকে। একটা গোটা বছর গড়িয়ে গেছে, কিন্তু দৃশ্যগুলো এতটুকু পুরনো হয়নি। ইতিমধ্যে লালিমা বিয়ে হয়ে উত্তরপাড়া চলে গেছে। হঠাৎ এক সকালে পায়খানায় মাথা ঘুরে পড়ে গিয়ে কাকা দেহরক্ষা করেছেন। বাবার মৃত্যুর পর কাকাই মাথার ওপরে ছিলেন। সেই তিনিও চলে গেলেন। মা বলেছে, সামনের বছর থেকে আমি বোর্ডিংয়ে থেকে পড়ব। এই এতকিছুর মধ্যে আমি শান্তি পাই

নানা ইংরেজি বই পড়ে আর নানা বারান্দায় আর জানালায় আমরা সেফিয়া লোরেন, সুচিত্রা সেনদের দেখে। কিন্তু এদের কারো সঙ্গেই প্রায় আমি মিশতে পারি না। শুধু একটা বছরেই আমি কী ভীষণ বদলে গেছি।

আমি জ্ঞানতাম, আমার ছাদের ঘরে এসে পড়তে বললে টুম্পা আসতে পারবে না। আমাদের এই মধ্যবিত্ত পাড়ায় সঙ্কের অঙ্ককারে একলা কোনো মেয়েকে কোন মা ছাড়াই একটা ছেলের কাছে পড়া বুঝতে? আর যতই হালফ্যাশানি হোন না কেন টুম্পার মা, তিনি বেশ ভালোই জানেন, তাঁর মেয়ে সুন্দরী, উঠতি বয়স, আর আমার ইংরেজি বিদ্যের ওপর ওর দুর্বলতা আছে। ইংরেজিতে ভালো হলে আমাদের পাড়ায় সাতখুন মাফ। এ পাড়ায় যার অঙ্কের মাথা সব থেকে বেশি, সেই নির্মলেন্দুকে নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। কিন্তু ইংরেজিতে কেরামতি থাকলেই হল। মাঝেমাঝে আমি যখন মার্গিনের সঙ্গে ইংরেজিতে কথা কই। টুম্পার মা, গজার বাবা, তিলকের কাকা দিব্য পাশে দাঁড়িয়ে মাথা হেলিয়ে শোনেন। একদিন তো তিলকের কাকা বলেই দিলেন, বাঃ! বেশ বলছ তো ইংরেজি। হবে না? তোমার বাবা ইংরেজিকে তো মাতৃভাষাই করে ফেলেছিলেন। কী দারুণ প্লিড করতেন কোর্টে দাঁড়িয়ে। সে সব শোনা আছে। তুমি নিশ্চয়ই বাবার ওকালতির লাইনেই যাবে?

আমি হ্যাঁ-না, কিছু না বলে সরে এসেছিলাম। তবু টুম্পা বলেছিল বলেই কিনা জানি না, গত তিন-চার দিন আমি পড়ার ফাঁকে ফাঁকে ওয়েন আর ওয়ান্টার ডি লা মেয়ারের কবিতাদুটো পড়ি। সঙ্কের অঙ্ককারে একলা বসে যখন ওয়েনের স্ট্রেঞ্জ মিটিং থেকে পড়ি—

I am the enemy you killed” my friend.
I knew you in this dark : for so you frowned
Yesterday through me as you jabbed and killed.
I Parried; but my hands were loath and cold.
Let us sleep now....”

কিন্তু ডি লা মেয়ারের ‘লিসনার্স’ থেকে পড়ি।

“Is there anybody there? said the Traveller,
Knocking on the moonlit door,

And his horse in the silence champed the
grasses

of the forest’s ferny floor.....

আমার মনে হয় এক নির্জন, ভৌতিক অঙ্ককারে জায়গা করে নিয়েছি আমি। আমার এই চিলেকোঠার ঘর তখন আর ঘর থাকে না, তেপান্তরের মাঠ হয়ে যায়। আমার গায়ের লোম দাঁড়িয়ে যায়, আমি মৃত্যুর পরপারে কোনো জগতের স্বাদ পাই। মনে মনে তখন ধন্যবাদ দিই টুম্পাকে এই কবিতাদুটোর কথা পাড়ার জন্য। আমার স্বর্গত বাবা আর কাকার জগতে চলে যাই আমি ছাদের অঙ্ককারে ভর করে। আমি চাই না কেউ আমার নির্জনতাটুকু ভেঙে দিক।

ওয়েন আর ডি লা মেয়ারইই পড়ছিলাম যখন, দরজার শিকল বাজিয়ে কে আওয়াজ দিল যেন। উঠে গিয়ে দরজা খুলতেই দেখি টুম্পা। হাতে বই।

বললাম, কী ব্যাপার টুম্পা? এরকম সময়ে এখানে?

—কী করব, তুমি তো পড়াতে গেলে না।

—তোর মা জানেন?

—মা-ই তো বলল, ও আসবে না। তুই পড়াটা দেখে নিয়ে আয়। বললাম, ভেতরে আয়।

ও ভেতরে ঢুকে আমার ঘরটা চোখ ঘুরিয়ে দেখতে লাগল। তারপর বলল, বেশ ঘর তোমার। ভূতের কবিতা পড়ার পক্ষে আইডিয়াল।

আমি ভেতরের আড়ষ্ট ভাবটা কাটানোর জন্য বললাম, ওসব ছাড়। বই খোল।

টুম্পা আমার ডি লা মেয়ারের কবিতার খোলা পাতটার দিকে চোখ ফেলে বলল, আমি কি খুলব? তুমিই তো খুলে বসে আছ!

আমি হেসে বললাম, তা পড়াতে গেলে নিজেকে একটু ভৈরি হয়ে নিতে হয় না?

এবার টুম্পার হাসির পালা। বলল, তাহলে তুমি জ্ঞানতে আমি আসব? বললাম, হ্যাঁ।

ও জিজ্ঞেস করল, কী করে?

বললাম, সে তুই বুঝবি না।

ও ক্ষেপে উঠল, কেন, আমি কি কচি মেয়ে নাকি?

এবার আমি ধমক দিলাম, তুই পড়বি, না এইসব বাজে বকবি?

টুম্পা তাড়াতাড়ি বই খুলে ফেলল। তারপর একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, না, তুমি দেখছি ভালো মাস্টারমশাই হবে।

আমি ফের গর্জালাম, আবার।

আর তক্ষুনি লিসনার্স-এর শেষ দুটো লাইন মুখস্থ আউড়ে আমাকে স্তম্ভিত করে দিল টুম্পা—

“Tell them I came, and no one answered,
“That I kept my word,” he said.”

কথাগুলো আউড়ে মুখ নিচু করে টুম্পা বসে রইল আমার পড়ানো সুনবে বলে। আর আমার মগজের মধ্যে সবকিছু তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল। শেষে কোনোমতে বললাম, হঠাৎ এই লাইনদুটো মুখস্থ বলার মানে কী?

মুখ না তুলেই টুম্পা বলল, সে তুমি বুঝবে না। তুমি পড়াও বরং।

আমি এবার সরাসরি কবিতায় চলে গেলাম। বললাম, কবিতার পরিবেশটাই আসল। পরিবেশটাই কবিতা। ধ্বনির মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা নিস্তব্ধতার কবিতা। তাঁদের আলোর মায়াবী মুহূর্তায় ধরা এক অশরীরী জগৎ। সে জগতেরই দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে কড়া নাড়ছে কবিতার নামক, পর্যটক। মানুষের জগতের এক প্রতিনিধি সে, সংলাপ তৈরি করতে চাইছে জীবনের ওপারের নীরব শ্রোতাদের সঙ্গে....

হঠাৎ একটা গান বেজে উঠল কাছেই, আর আমাদের নীরব পরিবেশে অশরীরীদের আহ্বানে ছেদ পড়ল। ঘরের পেছনের জানলা দিয়ে দেখি রেডিওগ্রামে এলভিস প্রেসলির গান চালিয়ে নাচ প্র্যাক্টিস শুরু করেছে আমার আরেক নারিকা লোরেন সুইন্টন।

চমকে উঠেছিল টুম্পাও। মুখের সামনে থেকে বই নামিয়ে জিজ্ঞেস করল, ওটা কী শুরু হল নিতুনা?

আমি সংক্ষেপে উত্তর করলাম, ক্যাবারে নাচের রিহাসাল।

ও জিজ্ঞেস করল, কে নাচছে?

বললাম, লোরেন সুইন্টন।

ও বিশ্বাসের সুরে বলল, ওই সুন্দরী অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানটি? যার মা ক্যাবারে নাচে?

বললাম, সবই তো জানিস দেখছি। তা হলে জিজ্ঞেস করছিস কেন?
ও আমার পাশে সরে এসে জানালার বাইরে চোখ মেলল, আমি একটু
দেখি নিতুদা।

আমি ঝাঁঝিয়ে বললাম, তুই কি এই করতেই এসেছিস তাহলে?
পড়বিটা কখন?

—সে নাহয় আবার আসব। দেখি তো আগে।

ও লোরেন সুইটানকে দেখতে লাগল, আর আমি ওকে। টুম্পাকে
এভাবে কখনো দেখিনি। ফ্রকই পরে আছে, কিন্তু এক পূর্ণ যুবতীর রূপরেখা
ছড়িয়ে পড়েছে সারা শরীরে। আমার নিজের তাকানোতে নিজেরই কেমন
লজ্জা হতে শুরু করল। আমি ওর থেকে চোখ সরিয়ে ওর মাথার ওপর
দিয়ে লোরেনকে দেখব বলে চোখ চাললাম। আর যা ভয় করেছিলাম
ঠিক তাই। ঘরের জানলা হাট করে খুলে একটা ব্রা আর জামিয়া পরে
নাচছে সুন্দরী যুবতী মেমসাহেব। আর সেইটাই পর্দার সিনেমার মতো
দেখছে এই ছুঁড়ি।

আমি গর্জন করলাম, টুম্পা জানলা বন্ধ কর।

ও অম্মল সারল্যে প্রশ্ন করল, তুমি পড়ার বাহানা করে এইসব দ্যাখো।
বললাম, পড়ার বাহানা করে দেখি না। পড়তে পড়তে দেখি।

টুম্পা জানলা বন্ধ করতে করতে বলল, অসভ্য মেয়ে কোথাগর।

আমিও ছাড়বার পাত্র নাই, বললাম,—আর তুমি খুব সভ্য। পড়ার
নাম করে এসে ওইসব দেখছ।

ও মুখ ভেঙচিয়ে বলল, বেশ করেছি দেখেছি। ফের দেখব। বলে
জানলা খুলতে গেল ও।

আমি তৎক্ষণাৎ হাত বাড়িয়ে ওর হাতটা চেপে ধরলাম, নাঃ।

কিন্তু এ কী! ওর গায়ে তো আগুন বইছে। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম,
তোর কি জ্বর হয়েছে?

তখনো ওর উষ্ণ হাতটা আমার হাতে চাপা। ও থরথর করে কাঁপতে
কাঁপতে বলল, হ্যাঁ, ওষুধ দাও।

আমি এক ঝটকায় ওকে বুকুর কাছে টেনে নিয়ে ওর ঠোঁটে চুমু
দিলাম। ও ওর দুটো হাত দিয়ে আমার মাথাটা ওর মুখের ওপর চেপে
ধরল—আই লাভ ইউ নিতুদা। আই লাভ ইউ।

আমি আন্তে আন্তে ওর বুক স্পর্শ করলাম। কি অপূর্ব অনুভূতি।
ফিসফিস করে কানের কাছে মুখ নিয়ে বললাম, আলো নিভিয়ে দেব?
ওর মুখ ভেসে যাচ্ছিল ঘামে। চোখ বন্ধ। বলল, দাও।

আমি লাইট নিভিয়ে ওর জামাটা খুলতে লাগলাম। ও ভয়ে ভয়ে
জিজ্ঞেস করল, এবার কী করবে তুমি? বললাম, বড়রা যা করে। ওর
ভয় বোধহয় বাড়ল, জিজ্ঞেস করল; কোনো ক্ষতি হবে না তো আমার?
কোথেকে এক অন্ধ বিশ্বাস জন্মাল আমার, বললাম, ধুর! কিছু হবে
না।

ওর সব জামা খুলে ফেলেছি। নিজের পরনের প্যান্ট-শার্টও ছুঁড়ে
ফেলেছি। ওকে জড়িয়ে ধরে সারা শরীরে আদর ঢেলে দিছি; এক অদ্ভুত
পাগলামির মধ্যে ডুবে গেছি আমরা। হঠাৎ টুম্পা বলল, নিতুদা আন্ধ থাক।

আমি উদ্বিগ্ন হয়ে অপরাধীর মতো জিজ্ঞেস করলাম, কেন কী হল?
ও অন্ধকারে ওর জামা খুঁজতে খুঁজতে বলল, মা বলেছিল এই ঘরটার
ওপর নজর রাখবে।

বললাম, তো কী হয়েছে? অত দূর থেকে ছাদের এই ঘরের ভেতরে

কী হচ্ছে দেখা যায় নাকি?

ও জামা পরা শেষ করেই ঘরের আলো জ্বালিয়ে দিল। বলল, কিন্তু
আলো তো দেখা যায়।

এক মুহূর্তে আমার সব রোমাঞ্চ মাথায় চড়েছে। আমি দুদাড় করে
জামাপ্যান্ট গলিষে পিছনের জানলা ধাক্কা মেরে খুলে ডি লা মেয়ারের
বদলে ওয়েনের কবিতা ‘স্ট্রেঞ্জ মিটিং’ খুলে বললাম। টুম্পা ওর জায়গায়
বসে কবিতার পাতা খুঁজতে লাগল ওর বইয়ে।

আমার ভেতর থেকে কে যেন ঠেলে বার করে আনল কথাগুলো—
টুম্পা, তোকে ‘স্ট্রেঞ্জ মিটিং’ বা আজব সাক্ষাৎ পড়াবার কথা ছিল। আর
কী এক আজব সাক্ষাৎ হয়ে গেল আমাদের।

টুম্পা লাজুক স্বরে বলল, আমার ঠোঁটে কোনো দাগ নেই তো, নিতুদা?
বললাম, না।

—গালে?

—না।

—কোথাও নেই?

—যদি থাকে সেটা হয়ত মনে। সেখানে কেউ দেখতে পাবে না।

—তুমিও না?

আমি সিঁড়িতে কাদের পায়ের শব্দ শুনলাম। কেউ বা কারা উঠে
আসছে। অথচ টুম্পার প্রশ্নেরও উত্তর দেওয়া হয়নি। এই কদিনে ‘স্ট্রেঞ্জ
মিটিং’-এর আগাগোড়া আমার মুখস্থ। টুম্পার প্রশ্নের জবাব দেব বলে
পড়তে শুরু করলাম—

Courage was mine, and I had mystery

Wisdom was mine, and I had mastery:

Into vain citadels that are not walled.....

Even with truth that lie too deep for tajnt.

I would have poured my spirit without stint.

But not through wounds; not on the cess of war.

কবিতার পঙ্ক্তির যে কী মানে হয় তা বোঝার বয়স হয়ত হয়নি
টুম্পার। কিন্তু কবিতার এইসব কথা হঠাৎ এক অন্য মানে নিয়ে, প্রায়
আমার নিজের কথা হয়ে ওর কিশোরী মনে দোলা দিল। কিছু না বলেও
মনে হল যেন সব বোঝাতে পেরেছি এক লহমায়।

ঠিক তখন আমাদের কাজের লোক বুড়িমাকে নিয়ে দরজায় এসে
দাঁড়ালেন মাসিমা। টুম্পার মা। একগাল হেসে বললেন, আমি উঠতে
উঠতেই শুনতে পাচ্ছিলাম তোমার পড়ানো। কী সুন্দর! তুমি মাঝেমধ্যে
ওকে একটু ইংরেজিটা পড়িয়ে দিও না। ওর খুব উপকার হয় তাহলে।

আমি প্রায় তোতলামি করতে করতে বললাম, দেখি। ওর তো মাথা
খুব ভালো, চট করে বুঝে যায়। তবে তবো আমি তো সামনের বছর
থেকে বোর্ডিঙে থেকে পড়ব...তখন?

মাসিমা সামলে দিলেন, সে ঠিক আছে। তোমার মতো কারো
গাইড্যান্স পেলে ও এই ক’মাসেও অনেক ধরে নিতে পারবে। আজকালকার
টিউটরদের কথা জানেই তো, পড়ানোর নামে ইয়ার্কি ফাজলামি। টাকার
শ্রদ্ধ।

আমি এতক্ষণে একটু সামলে নিয়েছি। বললাম, তবে মাসিমা, ওকে
এইখানে এসেই পড়তে হবে। আমি তো কোথাও যাই না।

মাসিমা বললেন, বেশ তো! এ তো বেশ ভালো ঘর পড়াশুনোর পক্ষে।

কোনো অসুবিধে নেই।

বলে ঘরটার ভেতরে একটা পাক দিলেন মাসিমা। তারপর হঠাৎ জানলার পাশে এসে থমকে দাঁড়ালেন। চোখদুটো ওঁর একটু একটু করে বড় হতে লাগল। বিকিনি পরে উদ্ভাসভাবে নেচে চলেছে লোরেন। গ্রামে গান বাজছে টোনি ব্রেণ্ট-এর 'সামওয়ান এল্‌স ইজ ইন ইওর আর্মস টু-নাইট'।

মাসিমা জানলাটা বন্ধ করে দিলেন। তারপর মেয়েকে বললেন, এসো টুম্পা। তারপর ওর হাত ধরে হুঁ হুঁ করে বেরিয়ে গেলেন। বুড়িমা সব দেখে বলল, বউটা রেগে গেল মনে হচ্ছে। কী হল আবার?

আমি বিরক্তির সঙ্গে বললাম, জানি না। কে বলেছিল আসতে।

৩

সময় কী করে কেটে যায় ভগবান ছাড়া কে আর জানতে পারে। সেই যে মাসিমা টুম্পার হাত ধরে বেরিয়ে গেলেন আমার পড়ার ঘর থেকে, ঠিক তখনই মনে হয় আমার ওই নিজস্ব সিনেমা হলের সব আলো জ্বলে উঠল। খেল খতম।

টুম্পা আর পড়তে আসেনি তারপর। শুধু শুনেছি এর-ওর মুখেও বলেছে আমি নাকি খুব ভালো পড়াতে পারি। তাহলে আর পড়তে এল না কেন কেনোদিন? এর কোনো উত্তর পাইনি; লজ্জার মাথা ঝুয়ে কখনো জিজ্ঞেস করতেও যাইনি। কেবল যেদিন বোর্ডিঙে থাকতে যাব সেদিন অধীর আগ্রহে তাকিয়েছিলাম ওদের জানলার দিকে। দেখা গেলে হাত ন্যড়ব বলে। সারাদিনে একটুবারের জন্যও জানলাটা খুলল না কেউ।

মাসিমার সেই হেঁটে যাওয়ার পর থেকে নানা জানলায়, নানা বারান্দায় কে কখন দেখা দিচ্ছে তার হৃদিস রাখিনি। আর আজ তিন বছর পর হায়ার সেকেন্ডারির ফাইনালের পড়া করব বলে ফের এসে উঠেছি আমার চিলেকোঠায়।

ঠিক আজ উঠিনি, ক'দিন ধরেই উঠেছি। শীতের দুপুরের রোদ কীভাবে আকাশ বেয়ে এধার থেকে ওধার হয় সব খেয়াল করি বই পড়তে পড়তে। বইয়ের পাতার ওপরই কীভাবে একটু একটু আলো বদলায় তা আমি ধরতে শিখে গেছি।

টুম্পারা বছরখানেক হল পাড়া ছেড়ে আলিপুরে উঠে গেছে। আর বছর দুই হল নতুন বাড়ি করে আমাদের বাড়ির উল্টোদিকে কয়েকটা বাড়ির পর এসে উঠেছেন ডক্টর চন্দ্রকান্ত সেন। দিদি বলছিল ওর মেয়ে রানী নাকি এই বয়সেই ফাটাকাটি সুন্দরী। আমি সব শুনে চূপ মেয়ে থেকেছি, স্কুল ছাড়ার পরীক্ষার তিন মাস আগে মেয়েদের সৌন্দর্য নিয়ে আমার মাথা ঘামানোর সময় নেই। মনে মনে বলেছি, এক সুন্দরীর পাল্লার পড়ে ঢের শিক্ষা হয়েছে আমার।

আর আজ সেই রানীর এক চিঠি হাতে করে নিয়ে এসেছে বুড়িমা। বলেছে, ওই সেন ভাস্কর্যের মেয়ে রানী লিকেচে গো। তুমি উত্তর দিলি আমি পৌঁছে দূবো।

চিঠিটা হাতে করে নিয়ে ছাদের ঘরে এসে পড়তে গিয়ে আমার দম আটকে যাওয়ার দাখিল। সে লিখেছে—

কী বলে সম্বোধন করব জানি না। ক'দিন হল তোমাদের ছাদে তোমাকে ঘোরাঘুরি করতে দেখি। কিন্তু তোমাদের কথা শুনে আসছি অনেকদিন ধরে। এ পাড়ায় যে আমার বেস্ট ফ্রেন্ড ছিল, সেই টুম্পার কাছে। ও চলে যেতে তাই বড় একলা লাগে। ওরও লাগত, তুমি বোর্ডিঙে চলে যেতে।

বলেছিল তুমি কী সুন্দর পড়িয়েছিলে দুটো ইংরেজি কবিতা।

টুম্পার কথায় বুঝতে পারতাম ও তোমায় ভালোবাসত। ও বলত তোমার প্রিয় আধুনিক গান মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'আমি এত যে তোমায় ভালবেসেছি'। ঠিক বললাম তো? এই গানটা আমারও খুব প্রিয়। তুমি যদি একদিন ওয়েন আর ওয়াশটার ডি লা মেয়ারের কবিতা দুটো আমায় পড়ে শোনাও তাহলে ওই গান আমি তোমায গেয়ে শোনাব। তবে তোমার ওই চিলেকোঠায় নয়, আমাদের এই বসার ঘরে। আমার অঙ্ককার আর ভূতে বড় ভয়।

যদি আসো তাহলে বুড়িমার হাতে একটা চিঠি দিও।

—রানী

জানি না কী উত্তর লিখব এর। এর উত্তর দেওয়া তো প্রেমে পড়ে যাওয়ার সামিল। পরীক্ষার মুখে কি আমি এই করব।

চিঠিটা একটা পুরনো ব্যাথা আর-একটা নতুন রাগও খুঁচিয়ে তুলেছে। পুরনো ব্যাথা হল টুম্পার স্মৃতি আর নতুন রাগ হল আমার চিলেকোঠার প্রতি রানীর ষোঁচ। কেন, কী দোষ করেছে আমার চিলেকোঠা? এখান থেকে লোরেনের নাচ দেখতে পাওয়া যায়, এই তো? নিশ্চয়ই টুম্পার কাছে শোনা কথা এ সব। তাতে বয়ে গেল আমার। আমি অভিমানের বশে চিঠিটা দুমড়ে মুচড়ে ফেলে জানলা খুলে-লোরেনের নাচের অপেক্ষায় রইলাম।

কতক্ষণ বসেছিলাম এভাবে খেয়াল নেই; শেষে লোরেনের নাচ শুরু হল ক্রিস্টিয়ানার গানের সঙ্গে। আমি মেয়েটিকে দেখে বিষ্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। কি অপূরণীয় সুন্দরী আর লস্যমরী হয়ে উঠেছে মেয়েটি এই তিন বছরে। দিদি বলছিল ও পড়াগুলো ছেড়ে দিয়ে ফুলটাইম ক্যাবারে ডান্সার হয়েছে। নাম নিয়েছে লালিয়াস লোলা। কলকাতা তো বটেই, সারা ভারতের নাকি ওর জুড়ি নেই। আর কিছুদিন পরই ও দিল্লির ইন্টারকন্টিনেন্টালে পাড়ি দেবে।

আমি স্তম্ভিত হয়ে লোরেনকে দেখছি; ওর নাচের সঙ্গে একের পর এক বেজে যাচ্ছে প্যাট বুন, ফ্র্যাঙ্ক সিনাট্রা, জিম রিভস; কিন্তু আমার মগজে ক্রমাগত বেজে চলেছে ওই একটাই গান—'আমি এত যে তোমায় ভালবেসেছি'। বুঝতে পারছি না সাহেবদের ওই গানে না লোরেনের সৌন্দর্যে না মানবেন্দ্রর গানে মনটা ভিজে জল হয়ে যাচ্ছে। জল আসছে চোখেও, যেন প্রেমে পড়ছি।

শেষে দড়াম করে জানলা বন্ধ করে লজিকের বই খুলে বসলাম। এভাবে চলাতে থাকলে আমার পরীক্ষা ডকে উঠবে। নিকুচি করেছে ওই রানীর। আমি ওকে চিনি না, আর চিনে কাজও নেই। সেই তো টুম্পার মতো এক ঝড় বয়ে মিলিয়ে যাবে মহাকাশে। তার চেয়ে চাচা আগুন প্রাণ বাঁচা।

আমি লজিকের সিলোজিসমে ডুব দিলাম। কিন্তু চোখের পাশটা সমানে খুঁচুচু করে যাচ্ছে। রানী কি খুব কষ্ট পাবে?

হাত নিসপিস করছে কলম তুলে একটা চিঠি লেখার জন্য। কিন্তু মনের কোণে সারাক্ষণ ভয়। নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করছি, নিতু, তুমি কি প্রেম করার জন্যই অ্যান্ডিন পর নিজের ডেরায় ফিরে এলে?

হাত আর মন একই সঙ্গে পাখর হয়ে গেল।

৪

আমার হাতে ল্যাঞ্চ রোস্টের প্রেট ধরা, ডান হাতে ফর্কটা দিয়ে একটু

একটু ছিঁড়ছি আর খাচ্ছি। ঘরভর্তি সাহেব-মেম, দু-তিনটে লগুন প্রবাসী বাঙালি দম্পতি। যার বাড়িতে এসে উঠেছি লগুনে সেই নির্মলদা আর ওঁর চোদ্দ বছরের মেয়ে সোনালি একে একে সবার সঙ্গেই আলাপ করিয়ে দিয়েছে। মাইনে যেমন-তেননই হোক, লগুনে আজও দেখছি অধ্যাপকদের সম্মান এখনো আছে। নইলে ইংরেজির তরুণ অধ্যাপক বলে যেই সাহেব-মেমদের সামনে আমাকে দাঁড় করাচ্ছেন নির্মলদা, 'অমনি একটা সন্ধিয়া সমীহ ফুটে উঠছে সবার চোখমুখে, 'ওহ রিয়েলি! দ্যাটস গ্রেট!' তারপরেই লাগোয়া প্রশ্ন, 'হোয়াট ডু ইউ টিচ?' তখন যেই বলছি 'ইংলিশ লিটারেচার' তখন আরেকপ্রহ্ন পুলকিত সমাদর, 'ওহ দ্যাটস মার্ভেলাস!' আর এতে সবচেয়ে বেশি আনন্দ পাচ্ছে সোনালি, যার চোদ্দতম জন্মদিন এটা।

যখন আলাপ হচ্ছিল একে একে সবার সঙ্গে, তখন হাতে সবার বিয়ার কিংবা হুইস্কি ছিল। এখন সবার হাতে সোনালির নিজের হাতে রাখা ল্যাম্ব রোস্ট। যে পদের ফরমাশটা কলকাতা থেকে টেলিফোনে ওর কাকা আমার সহকর্মী রানা-র করা। রানার জোরাজুরিতেই বলা চলে বাউণ্ডস গ্রিনে নির্মলদাদের বাড়িতে এসে উঠেছি। রানা বলেছিল, যাচ্ছিস তো বাবা ব্রিটিশ কাউন্সিলের কিপুটে স্কলারশিপে। টাকাটা বাঁচা, একটু পাবে বসে বিয়ার টিয়র খা। দু-চারটে বইটাই কেন, ক্যাবারে ফ্যাবারে দ্যাখ। দেখতে দেখতে ছ' সপ্তাহ কেটে যাবে। আর আমার ভাইঝিটি একটা রত্ন। আমি খাইনি, তবে শুনেছি, দুর্ধর্ষ ল্যাম্ব রোস্ট রাঁধে। ডোন্ট মিস্ দ্যাট।

সেই ল্যাম্ব রোস্ট চাখতে চাখতেই আমার কেবলই মনে পড়ছে উপস্থিত তরুণ দম্পতির ওই আগুনের মতো সুন্দর বউটার মুখ।

কেবলই মনে হচ্ছে, কোথায় দেখেছি যেন! নিশ্চয়ই কোথাও দেখেছি। কিন্তু কিছুতেই মেলাতে পারছি না। শেষে হল ছেড়ে দিতে বসেছি এই স্তোক দিয়ে, আসলে সুন্দরী বলেই এরকম চিনি-চিনি ভাব করছি। এই মুখ এই প্রথমই দেখলাম।

দেখছি সবারই খাওয়া হয়ে গেছে, সবাই একে একে নিজের নিজের প্লেট নিয়ে কিচেনের সিন্কে গিয়ে ধুয়ে দিচ্ছে। এ দেশে কাজের লোকের চাপ নেই, নিজেরটা নিজে করাই নিয়ম। নেমন্তন্নও। সবশেষে আমি উঠলাম প্লেট ধোলাই করতে। বাকিরা সুইট ডিশ খাওয়া চালু করে দিয়েছে; একজন মহিলা পিন্নানোয় বসে 'কে সেরা সেরা' গানের সুর তুলতে শুরু করেছিল। সিন্কে সামনে একা দাঁড়িয়ে অন্যমনস্কভাবে আমি প্লেটে পাউডার ঘষছি।

হঠাৎ পিছন থেকে একটা সুরেলা অথচ অভিমাত্রী মহিলা কণ্ঠ ভেসে এল—আমার চিঠির উত্তর কিন্তু পাইনি।

আমি মুহূর্তের মধ্যে ঘুরে দাঁড়িয়ে দ্রুত, কিচেনের দরজায় ফ্রেমআটা মা-দুর্গার ছবির মতো দাঁড়িয়ে ওই কুঁড়ি, যার পরিচয় নিয়ে এতক্ষণ ভেবে মরছি।

আমি সত্যি সত্যি হকচকিয়ে গেছি। কীসেব চিঠি? কার চিঠি? কেন? হঠাৎ এই চিঠির কথা উঠেই বা কেন? ভদ্রমহিলা আমাকে ঠিক শনাক্ত করতে পেরেছেন তো?

আমি তোতলাতে তোতলাতে বললাম, আমার কি আপনাকে চিঠি দেওয়ার কথা ছিল?

যুবতী বলল, দেওয়া না-দেওয়া আপনার মর্জি। কিন্তু আপনি তো চিঠির কথা মনেই করতে পারছেন না!

আমি ফের তোতলাচ্ছি, কিন্তু.....কিন্তু.....

যুবতী বলল, অবশ্য বারো বছর হয়ে গেল তো। ভুলে যাওয়াই স্বাভাবিক।

আমি ফের অবাক হয়েছি,—বা-রো বছর।

—হ্যাঁ, তা তো হয়েইছে। তাতে একটা গান শোনানোর কথা ছিল...

ওহু, তাই তো! গানের কথা উঠতেই চিলেকোঠার সন্ধের কথা, বুড়ির বয়ে আনা চিঠির কথা, মানবেন্দ্রর 'আমি এত যে তোমায় ভালোবেসেছি'-র কথা আর ওই চিঠির প্রেরিকা রানীর কথা.....বস্তুত স্কুল জীবনের ওই সময়কাল সব কথা বন্যার তোড়ের মতো মনের বাঁধ ভেঙে মাথার মধ্যে গোলমাল পাকাতে শুরু করল। আমার হাত-পা দুইই অচল হয়ে গেছে, গলা বন্ধ হয়ে আসছে। তার মধ্যেই কোনোমতে উচ্চারণ করলাম, রানী!

রানী হাসল, বাকা ছবির মতো ধার তাতে। আমি 'আই শুনুন!' বলে কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ হাত থেকে প্লেটটা ছিটকে মাটিতে। পড়ে চৌচির হয়ে গেল। 'কী হল! কী হল!' করে ছুটে এল সোনালি। আমি লজ্জায় সিঁটিয়ে গেছি দেখে আমাকে আশ্বস্ত করল, তুমি কিছু ভেবো না কাকু, একটা-দুটা ভাঙাভাঙি ইজ ওড ফর দ্য পার্টি। আমি নিরুপায় হয়ে বললাম, তা বলে কি পৃথিবীর সব ভাঙাভাঙির দায়িত্ব আমার।

প্লেটের টুকরোগুলো মাটি থেকে কুড়োতে কুড়োতে সোনালি বলল, যারা মানুষের মন ভাঙে তারা সবকিছুই ভাঙতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

হে ভগবান! এই চোদ্দ বছরেই মেয়েটা এতশত জ্ঞান আর শিখল কোথেকে! সোনালি বিন-এ প্লেটের খণ্ডগুলো ফেলছিল, আমি খুব নজর দিয়ে দেখতে লাগলাম ওকে। আর একটু একটু করে ওর ওই কিশোরী মুখে ফুটে উঠতে দেখলাম বারো বছর আগের এক কিশোরীর মুখ, যার নাম ছিল রানী। রানী সেন। যে আমায় একটা চিঠি লিখেছিল, যার উত্তর দেওয়া হয়নি আজও। স্বভাবদোষে সেই কিশোরী মুখটিকে ভালো করে মনে গেঁথে রাখতে পারিনি। ইয়ত সে সুযোগও পাইনি; কলেজে উঠতেই তো পাড়া ছেড়ে অন্যত্র উঠে গেলাম আমরা। তারপর আর ক'বারই ওই পাড়ামুখো হয়েছি আমি।

আমি আস্তে আস্তে সোনালিকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের ওই রানীদি কি এখনো গানটান করে?

সোনালি অবাক হয়ে গেল যেন—গান? জানি না তো উনি গানটান করেন কি না? জিজ্ঞেস করব?

আমি আর কিছু বললাম না। সোনালি হাত ধুয়ে কিচেন থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, তুমি চলে এসো কাকু। তোমাকে আইসক্রিম সার্ভ করব।

হাতে সুইট ডিশ নিয়ে এবার আমিই জটলার মধ্যে ঝুঁজে বার করলাম রানীকে। পাশে ওর ডান্ডার বর অমিত। বললাম, তবুও ভালো যাওয়ার মুখে আপনাদের সঙ্গে আলাপ হল।

অমিত বলল, নির্মলদার কাছে খুব শুনেছি আপনার কথা। এখন আলাপ হয়ে আবার ভালো লাগল। একদিন আসুন না আমাদের ওখানে, আমি আপনাকে পিক করে নেব। চাইলে নিটোল বাঙালি রান্না খাওয়াতে পারি আপনাকে। রানী ইজ আ গ্রেট কুক।

আমি বললাম, রান্নাটান্না ঠিক আছে, তবে আপনার গিমি এক আখটা গান শোনালে যাওয়ার টান আরো বাড়ত।

অমিত এবার সত্যিই অবাক হয়ে গেছে—গান। আপনি কী করে জ্ঞানলেন বানী গান জানে?

বেকায়দায় পড়ে আমি আশ্রয় চেষ্টা করলাম কথা ঘোরানোর,—

আসলে.....আসলে ওঁকে দেখেই মনে হয় ভালো গান জানেন।

এবার উত্তর করল, রানী, জানতাম। সব ভুলে গেছি। গান শোনানোর মতো লোক তো চাইলেই পাওয়া যায় না!

বললাম, কেন, অমিতবাবু?

অমিতই প্রতিবাদ করল, আর বলবেন না মশাই, যা কাজের শিডিউল এখানে! নিজেও এককালে একটু-আধটু রবীন্দ্রসঙ্গীত করতাম। সব চুকেবুকে গেছে।

বুকে বল সঙ্কর করে বললাম, গিনিও কি বাংলা রবীন্দ্রসঙ্গীতের দিকে?

অমিত বলল, না না ওর গলায় দারুণ বাংলা আধুনিক খেলত। লতা, গীতা, সন্ধ্যা, হেমন্ত, শ্যামল, মানবেন্দ্র—

মুখ ফুটে অকস্মাৎ বেরিয়ে এল, বাঃ! অপূর্ব। তারপর একটু থেমে কাঁপা কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা মানবেন্দ্রের 'আমি এত যে তোমায় ভালবেসেছি, গানটা কি'—

আমার কথার মতোই কিরকম এক সুরেলা অভিমাত্রী কণ্ঠে বলে উঠল রানী, না, ওই গানটা কখনো তোলা হয়নি নীতিনবাবু।

আমার হাতের আইসক্রিমের প্লেটটা যেন আরো ঠাণ্ডা হয়ে গেল। বুঝলাম গলাটাও বসে যাচ্ছে। রানী আমার চোখ থেকে চোখ সরিয়ে পার্টির অন্যদের দেখতে শুরু করল। এক-আধবার হাতঘড়িও দেখল। যেন এক্ষুনি চলে যেতে হবে।

আমি অমিতকে, একটু আসছি, বলে সরে এসে কিচেনের দরজা দিয়ে পিছনের বাগানে গিয়ে তারার অন্ধকারে দাঁড়ালাম। কৈশোরের ছাদের সেই অন্ধকারগুলো ভিড় করে আসছে মনের ওপর। ফিকে একটা সুরের ধ্বনি বেরিয়ে আসছে পার্টিরুম থেকে; সেই মহিলা পিয়ানোয় এবার ধরেছেন 'মাই ফেয়ার লেডি'র সেই গান' আই কুড হ্যাভ ড্রাম্‌ড্‌ অল নাইট, অ্যাণ্ড ইয়েট বেগ ফর মোর, আর একটু একটু করে আমার মগজে ছড়াচ্ছে একটা বাংলা আধুনিক প্রেমের গান, যেটা কিশোরী রানীর কণ্ঠে আমার শোনার কথা ছিল। শোনা হয়নি।

৫

একটা ক্লাশের পর একটা পিরিয়ড ব্রেক ছিল। আমি বেয়ারা সঞ্জীবকে এক পেয়ালা কফির অর্ডার করে একটা সিগারেট ধরিয়ে বসলাম লেকচারার্স রুমে। সবে দু-তিনটে টান দিয়েছি সুখ করে, হঠাৎ পায়ে মৃদু স্পর্শ কিসের। চোখ তুলে দেখি, প্রশাম সেরে উঠে দাঁড়াল তিস্তা।

‘তখনো ঠিক সোজা হয়ে দাঁড়ায়নি, আমি হাত বাড়াতোই ওর মাথাটা পেয়ে গেলাম। মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিয়ে বললাম, থাক থাক, এখানে আর অত প্রশাম ট্রানামের কী আছে। তারপর একটু থেমে জিজ্ঞেস করলাম, তা, কী ব্যাপার বলো?’

বড় বুদ্ধিমত্তী এই মেয়ে ক্লাশে এমন সব প্রশ্ন করে সময় সময়, তা ওর বি এ সেকেন্ড ইয়ারের তুলনায় ঢের মেচিওর্ড। ওই প্রশ্নগুলো করা ছাড়া ওর গলার শব্দ বিশেষ একটা শোনা যায় না। ওর চেহারার মতন স্বভাবও কিরকম একটা স্নিগ্ধ নির্জনতা লুকিয়ে আছে। হয়ত অস্পষ্ট বেদনুও।

তিস্তা চাপা স্বরে বলল, স্যার, মা-র খুব ইচ্ছে আপনি শেক্সপীয়রের পেপারটায় আমায় একটু প্রাইভেট টিউশন দিন। অনেক বলেছি মাকে যে আপনি প্রাইভেট করেন না, তবু মা ঠিক বুঝতে চাইছে না।

কথাটা ভুল না। প্রাইভেট টিউশন ব্যাপারটাতেই আমার ঘোর আপত্তি। কলেজে পড়াচ্ছি; কিন্তু তার বাইরে প্রাইভেট, নোট সাপ্লাই করে পয়সা কামানোকে আমি পাটোয়ারি ছাড়া অন্য কিছু ভাবি না। কলেজের বাইরের সব সময়টাই আমার নিজের; বই পড়ব, গান শুনব, চাইলে একটা উপন্যাস লিখব। কিন্তু নোট সাপ্লাই নৈব নৈব চ।

কী যেন একটা বলতে যাচ্ছিলাম, তার আগেই তিস্তা বলল, মা বলেছিল মা আপনাকে চেনে।

জিজ্ঞেস করলাম, কী নাম তোমার মা-র? কোথায় থাকো তোমরা? তিস্তা প্রশ্নের উত্তরের বদলে একটা খাম দিল আমার হাতে। তাতে ছোট্ট একটা চিঠি। আমি পড়তে শুরু করলাম—

প্রিয় নিতুভাই,

আশা করি কুশলে আছ। তোমার পড়ানো আর বিদ্যার সুনাম সব সময়ই শুনতে পাই। তিস্তা তো তোমার পড়ানো নিয়ে কী পাগলামিই না করে। বলে, স্যার নিশ্চয় আগের জন্মে অক্সফোর্ডের সাহেব অধ্যাপক ছিলেন। আমি শুনি আর খুব গর্ব হয় আমার। তুমি প্রেসিডেন্সিতে পড়ছ সে খবর পেয়েছিলাম, কিন্তু সেই কলেজেই তুমি ডাকসাইটে প্রফেসর হয়েছ শুনে যে কী ভালো লেগেছিল তা বলে বোঝাতে পারব না।

আমার এই একটাই মেয়ে তিস্তা। বই ছাড়া ওর আর কোনো বস্তু নেই। ক'বছর আগে তোমার জামাইবাবুর একটা স্টোক হয়ে গেছে। একটা দিক পড়ে গেছে বেচারির। আর্লি রিটায়রমেন্টে আছেন ভদ্রলোক। কাজেই সংসাবে অভাব না থাকলেও হাজার দেড় হাজার টাকা দিয়ে মেয়েকে প্রাইভেট টিউশন দেওয়ার সেই সচ্ছলতা নেই। তিস্তার কিন্তু বড় আকাঙ্ক্ষা একটা ফার্স্টক্লাশ পায়। সেজন্যে তোমার কাছে পড়ার বড় বাসনা ওর। তাই তুমি যদি দিদির মেয়েটাকে স্নেহ করে একটু সময় দাও, বড় আনন্দ পাই।

তোমার জামাইবাবুর অসুস্থতার পর থেকে উত্তরপাড়াব এই সাহেব বাড়ির উঠোন ছেড়ে কোথাও যাওয়া হয় না আমার। কিন্তু তুমি যদি ভালোবেসে এই দিদিটাকে একদিন দেখতে আসো, বড় শান্তি পাব। তিস্তাকে যদি একান্ত পড়াতে নাও পারো একবারটি অন্তত আমাদের দেখতে এসো। ঈশ্বর তোমায় অনেক খ্যাতি, সম্মান আর দীর্ঘ জীবন দিন, এই প্রার্থনা করি।

ইতি তোমার

লালিমা

চিঠিটা পড়তে পড়তে বুকেন্ন ভেতর একটা অব্যক্ত ব্যথা টনটনিয়ে উঠল। আমি চিঠি পড়া শেষ করেই তিস্তার মুখের দিকে তাকালাম। তাই তো! সেই গমের মতো গায়ের রং। সেই টানা টানা বড় বড় চোখ। গালো সেই টোল। সেই লাঙ্গুক হাসি। এমনকি চুলের বিনুনি আর শাড়ি পরারও সেই একই ঢং।

আমি চিঠিটা পাট করে ভরে পকেটে রেখে বললাম, তিস্তা তুমি সামনের সপ্তাহ থেকে মঙ্গল আর শুক্রবার সন্ধ্যা ছটায় আমার বাড়ি চলে এসো। এই নাও ঠিকানা।

তারপর কী একটা ভেবে ফের বললাম,—কিন্তু তিস্তা, সন্ধ্যা আটটা-সাতটা আটটার পর তুমি উত্তরপাড়া ফিরবে কী করে?

বোধহয় এই প্রশ্ন তিস্তা এত জোরেইর সঙ্গে জবাব দিল, না স্যার,

ও আমি পারব। এত কিছু তো দূর নয় উত্তরপাড়া। কত বাস, কত ট্রেন।
মার একটু চিন্তা হবে ঠিকই। কিন্তু মা-ই তো চাইছে।

তিস্তা ফের টেবিলের তলা থেকে আমার পা খুঁজে বার করে প্রণাম করল। আমি বললাম, থাক, থাক। তারপর গলাটা আরেকটু নামিয়ে—
মাকে বলবে কোনোরকম মাইনে দেওয়ার চেষ্টাও যেন কবা না হয়। তা
হলেই পড়ানো বন্ধ।

তিস্তা হাসল, ওর ওই মায়ের মতো লাজুক চোরা হাসি।

কি করে, কী করেই যে সময় কেটে যায়। আজ তিস্তার সেকেণ্ড পার্টের
রেজাল্ট বেরিয়েছে। প্রথম পার্টে মাত্র নম্বরের জন্য ফাস্টক্লাশ মিস
করেছিল বেচারি। দ্বিতীয় পার্টে সব মেকআপ করে সিগ্নাটিফোর পার্সেন্ট
নিয়ে ওভারল ফাস্টক্লাশ। তবে ফাস্টক্লাশ সেকেণ্ড। ওর ওপরে শুধু
দীপ্তিময় বসু।

কলেজ থেকে বাড়ি ফিরেই শুনি—বৃন্দা বলল, তিস্তা ফোন করেছিল
ফাস্টক্লাশ সেকেণ্ড হয়েছে। একটু পরেই দেখা করতে আসছে। তুমি
বেবিয়ে যেও না কিন্তু।

আমি গা ধুয়ে পাঞ্জামা-পাঞ্জাবি চাপিয়ে সব এসে বসাব ঘরে বসেছি।
তিস্তা ঢুকল, বিরাট মালপুত্র বগলে নিয়ে। আমি অবাক হয়ে বললাম,
এসব কী রে, তিস্তা? তিস্তা ওর বস্তাটিস্তা আমার পায়ের কাছে রেখে,
প্রণাম সেরে বলল, কিছু না।

বললাম, কিছু না, তো এ সব বগলে করে আনলি কেন?

তিস্তাকে এখন তুই করেই বলি, ও-ও স্যর-টার বেড়ে ফেলে ডাকে
মামু। ও বলল, মামু এ সব মা-র কীর্তি, আমি কিস্যু জানি না।

দেখতে দেখতে খোলা থেকে বেরুলো আমার ধূতি, পাঞ্জাবি, সুট
লেন্থ। বৃন্দার জন্য শাড়ি এইচ এম টি ঘড়ি আর আমাদের কন্যা নন্দিনীর
জন্য একডুকের খেলনা। সেই সঙ্গে ভীমনাগের সন্দেশ।

বৃন্দাও ঘরে ঢুকে এতসব দেখে হতবাক। আমি বললাম, তিস্তা, তোকে
পড়ানোর জন্য কোনো টাকার কথা হয়নি। তাহলে এ সব করতে গেল
কেন তোর মা?

তিস্তা বলল, মামু, আপনাদের কোনোকিছুর প্রয়োজন নেই ঠিকই।
কিন্তু মারও তো কিছু দিতে ইচ্ছে করে।

আমি চুপ মেরে গেলাম। বৃন্দা বলল, দাঁড়াও, তোমাদের কফিটা করে
আনি।

ও চলে যেতে তিস্তাকে বললাম, ইয়ারে, বাবা কেমন আছেন?

ও বলল, বাবা ঠিকই আছে। মা ভালো নেই।

উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলাম তার মানে। কী হয়েছে লিমার? তিস্তা
বলল, আমাকে নিয়ে দৃষ্টিস্তা।

—তোকে নিয়ে দৃষ্টিস্তা। কেন, ফাস্টক্লাশ পেয়েছিস বলে?

—না, সৌম্যকে বিয়ে করতে চাই বলে।

—সৌম্য কে?

—ফিলোজফির সৌম্য। গতবার এম এ পাশ করেছে।

—তাতে কী হল?

—ছেলেটার চালচলো নেই। মা-র ভীষণ আপত্তি।

জিজ্ঞেস করলাম, চাকরি করে?

তিস্তা মাথা নিচু রেখেই বলল, কলেজ টিচার্স প্যান্ডেনো নাম উঠেছে।

এখনো পোস্ট পায়নি।

—তাহলে?

—আপনাকেই বোঝাতে হবে মাকে।

—মা কী বলে?

—বলে, তোর জন্য অনেক কষ্ট করেছি জীবনে। ছোটর থেকেই কষ্ট
করছি। তোরও কষ্ট দেখলে মরে যাব।

বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল আমাব। লালিমাব কষ্ট তো আমি
নিজেও দেখেছি। হে ভগবান, ওই কষ্ট যেন তিস্তার ওপর না গড়াই।
বললাম, সৌম্য ছেলে কেমন?

তিস্তা বলল, অপূর্ব। তবে সেস কম। নাহলে উচ্চ মাধ্যমিকের স্ট্যাণ্ড
করা ছেলে ফিলোজফি পড়তে চায়? এ দেশে ওই সাবজেক্ট নিয়ে অধ্যাপনা
ছাড়া কিছু জোটে?

—কেন, অধ্যাপনা খারাপ পেশা? আমি করি না?

—ও-ও আপনার মতোই বলে—জীবনে টিউশনি করব না, নোট
বেচব না।

—তাহলে শুধুই পড়াবে?

—আর বলে, শঙ্করাচার্য নিয়ে গবেষণা করবে।

আমার বুকের ভেতরটা হ-হ কবে উঠল ব্যাথা। জীবনে কত বাসনা
ছিল, কান্ট-এর দর্শন নিয়ে গবেষণা করব। পড়াতে পড়াতে কীভাবে সময়
চলে গেল। ইংরেজির লোক হয়েও দর্শনের ওপর এই মোহ আমার কাটল
না অ্যাদিনেও। টিউশনি .যে করি না তার একটা কারণও দর্শন পড়ার
জন্য সময় বাঁচানো।

আবার আনন্দও সৌম্যর কথা ভেবে। আজকের এই র‍্যাট্ রেসের
দিনেও একটা ছেলে শঙ্করাচার্য নিয়ে পড়তে চাইছে। আমার চট্কা ভাঙল
তিস্তার কথায়, মামু, আপনি মাকে বোঝাবেন?

বললাম, বোঝাতে পাবব কি না জানি না। তবে চেষ্টা কর।

কফি আর খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকে বৃন্দা বলল, তোমরা হঠাৎ গম্ভীর
হয়ে গেলে কেন? ফাস্টক্লাশ সেকেণ্ডও মন ভরছে না?

আমি কফির পেয়ালা হাতে নিতে নিতে পরিবেশ হাঙ্কা করার জন্যে
হিলি সিনেমার চালে বললাম, সমস্যা গম্ভীর হ্যাঁ।

রাতে শুয়ে আছি, চোখে ঘুম নেই। একটু আগে বেডল্যাম্প জ্বলে
একটা নীরস বই পড়ে ঘুম আনানোর চেষ্টা করেছি, কাজ হয়নি। পাশ
ফেরার বহর দেখে মনে হচ্ছে বৃন্দারও চোখে ঘুম নেই। বোধহয় তিস্তার
সমস্যা এখন আমাদের দু'জনের ওপরই ভর করেছে। হঠাৎ গুনি অঙ্ককারে
বৃন্দার গলা, সব শুনে ওর সমস্যা?

বললাম, শুনলাম তো। দেখি ওর মা-র সঙ্গে কথা করে।

বৃন্দা বলল, লাভ নেই।

—কেন?

—সমস্যা যে মেটার নয়।

—কেন, ছেলে কি খারাপ?

—চমৎকার ছেলে। ফুসফুসটা খারাপ। লিমাদিব আসল আপত্তি
ওঁইখানে। তিস্তা চেপে গেছে।

—ফুসফুসের কী হল আবার?

—সাসপেন্ডেড প্রুরিসি। কিছুদিন হল ধরা পড়েছে।

—এই বয়সে যন্ত্রা?

—ছেলেটা যে বাল্য থেকে অপৃষ্ঠিতে ভুগছে। বাবা নকশাল, মা নকশাল। আশুরগাউণ্ডে থেকে থেকেই তো সংসার করেছে। ভালো চাকরি খুঁয়েছে। ছেলেটার বোধহয় ভালো করে দুখও জোটেনি কোনোদিন। পিসিমার কাছে বড় হয়েছে।

—তা তুমি এত সব জানলে কোথেকে?

—তিস্তার কাছেই শুনেছি। যাক্গে, তুমি এখন ঘুমোও। কাল দশটায় ক্লাশ আছে, মনে আছে?

আমি অঙ্ককার ঘরের মধ্যে আরো গভীর এক অঙ্ককার পথ হাতড়াতে হাতড়াতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম, খেয়াল নেই। ঘুম ভাঙল চা নিয়ে বৃন্দার ডাকে, ওঠো, সাড়ে ছটা বেজে গেছে।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে কি ভাবছিলাম জানি না, বৃন্দা স্টেটসম্যানটা নিয়ে এসে আমার সামনে রাখল। কাজগটা উলটে-পালটে দেখারও উৎসাহ পাচ্ছি না। শুনি বৃন্দা বলছে, আচ্ছা, প্লুরিসি সারে না?

আমি হেসে ফেললাম, কী যা তা বকছ। চিকিৎসা হলোই সারবে। কথা হচ্ছে, সে জন্য পয়সা লাগবে।

বৃন্দা বলল, সেটাই তো কথা। বেকার ছেলে, কোথায় পাবে?

বললাম, আর শুধু তো চিকিৎসা নয়, ভালো পথ্যও চাই।

হঠাৎ বৃন্দা বলল, আচ্ছা তুমি পারো না ওকে এই সাহায্যটা করতে?

আমি হাসলাম—টাকা তো সব তোমার কাছেই থাকে, তুমিই তো ভালো জানো আমার কতটুকু কি সম্বল। মাস গেলে আরো দু-আড়াই হাজার টাকার কমিটমেন্ট তো ইয়ারকি নয়।

—তা ঠিক। বলে আরেক কাপ চা আনতে উঠে গেল বৃন্দা। আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম, আমার শরীরে হঠাৎ এক অদ্ভুত উত্তেজনা ছড়াচ্ছে। তিস্তার সমস্যার একটা কিনারার আশা যেন দেখতে পাচ্ছি সহসা। বলতে গেলে তিস্তাই হৃদিসটা দিয়ে গেল নিষ্চের অজ্ঞাঙ্কে।

ও চা নিয়ে ফিরতেই আমি সাবধানে বাতলে দিলাম, বৃন্দা, বাড়তি দু-তিন হাজার কিন্তু সমস্যা হওয়ার কথা নয় আমার কাছে।

কথার মাথাযুগ্ম ধরতে না পেরে ও বলল, কীরকম?

—কেন, প্রাইভেট টিউশানি?

—টিউশানি। তুমি টিউশানি করবে, যাতে তোমার এত ঘেলা? আমার স্কুলের টিউশানিও ছাড়িয়ে দিলে যে কারণে।

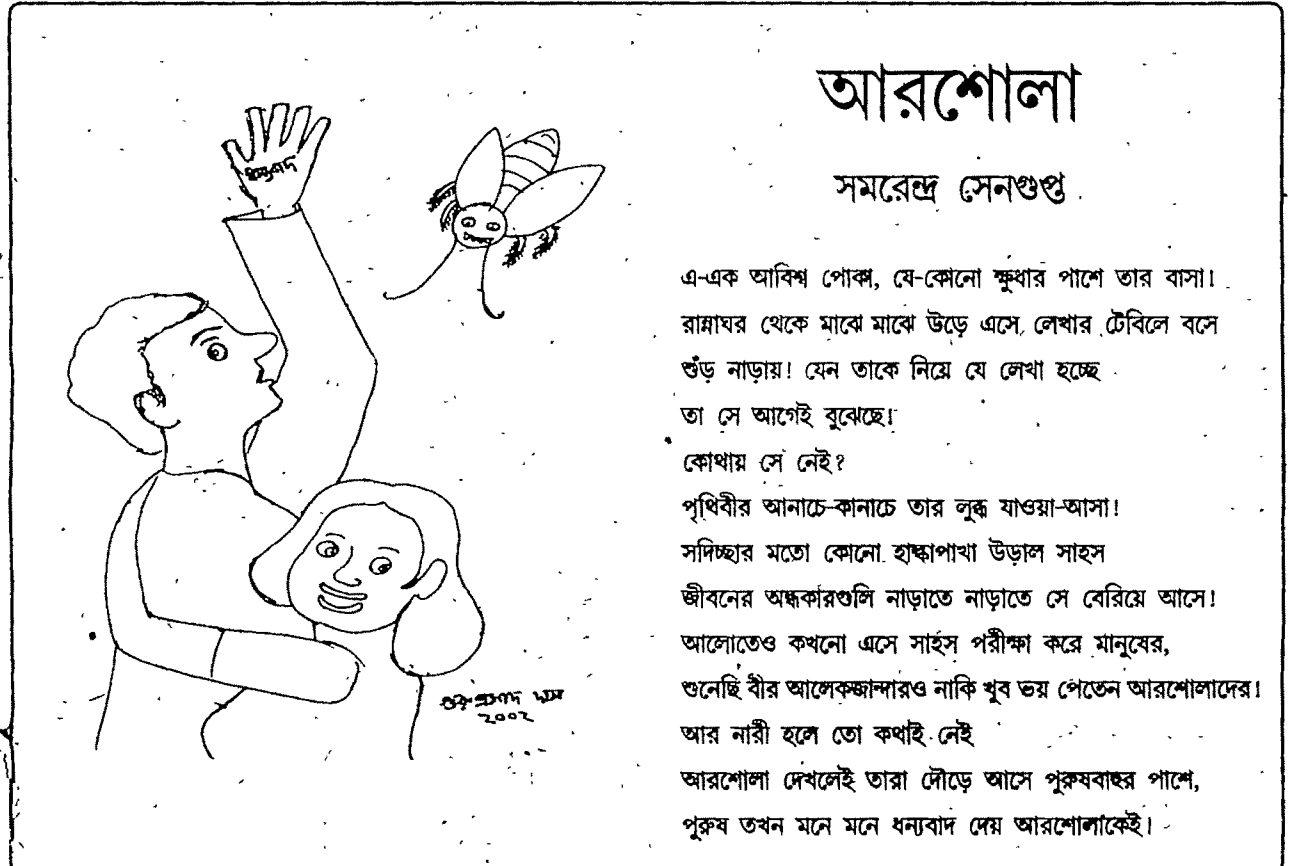
বললাম, প্রয়োজনে। প্রয়োজনে মানুষ সব করে। কথায় আছে না, অল ইজ ফেয়ার ইন লাভ অ্যান্ড ওয়র। প্রেম ও যুদ্ধে সবই বলিদান দেওয়া চলে। আমি নাহয় ছ-আট মাস কি এক বছরের জন্য আমার নীতিকেই উৎসর্গ করলাম।

বৃন্দা বলল, তো এই নীতিবর্জন যুদ্ধ না প্রেমের জন্য?

বললাম, প্রেম। তিস্তার প্রেম।

মনের ভেতর খেলে গেল দূর অতীতের দুই বছর দিদির জন্য ক্ষণকালের এক প্রেমের স্মৃতিও। লালিমার খোলা বুকে শিশুর মতো রেখে-এক স্বপ্নের স্বাদ।

ঠিক সময় জানালা দিয়ে দিনের প্রথম রোদ্দুর এসে বৃন্দার মুখে পড়ে ওকে উজ্জ্বলিত করে তুলল।



আরশোলা

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

এ-এক আকিঞ্চ পোক, যে-কোনো ক্ষুধার পাশে তার বাসা।

রান্নাঘর থেকে মাঝে মাঝে উড়ে এসে, লেখার টেবিলে বসে

শুঁড় নাড়ায়! যেন তাকে নিয়ে যে লেখা হচ্ছে

তা সে আগেই বুঝেছে।

কোথায় সে নেই?

পৃথিবীর আনাচে-কানাচে তার লুক্ক যাবুয়া-আসা।

সদিচ্ছার মতো কোনো হাঙ্কাপাখা উড়াল সাহস

জীবনের অঙ্ককারগুলি নাড়াতে নাড়াতে সে বেরিয়ে আসে।

আলোতেও কখনো এসে সাইস পরীক্ষা করে মানুষের,

শুনেছি বীর আলেকজান্দারও নাকি খুব ভয় পেতেন আরশোলাদের।

আর নারী হলে তো কথাই নেই

আরশোলা দেখলেই তারা দৌড়ে আসে পুরুষবাহুর পাশে,

পুরুষ তখন মনে মনে খন্যবাদ দেয় আরশোলাকেই।

হায়দ্রাবাদে পিটে

নবনীতা দেব সেন

পিটে গেছে হায়দ্রাবাদে
করবে বলে ফায়দা
—“এটা সেকেন্ডারবাদ”
বললে তাকে প্যায়দা

পিটে শুনে অবাক ভারি,
বসল খুলে ম্যাপটা—
পাকিস্তানে ‘হায়দরাবাদ’
দেখল সোজাসাপটা—

....“এই দেখলুম ‘হায়দরাবাদ’
ইস্টিশানেই লটকানো
এর মধ্যেই নামটা কখন
পাকিস্তানে সট্‌কালো?”



কার্টুন : সুশান চন্দ্র ভূঁইয়া



आ





এই তো আজকের মা। সময়ের দাম জানেন।
সুবিধাও তাঁর কাছে দামী। ভাল-মন্দ দেখেই চেনেন।
ওঁর জন্য নিরাপত্তা সবার আগে। ওঁর পরিবার
নির্ভর করে ওনার ওপর। আর ওনার পুরো ভরসা

ইডেন



✓ করা যেন

✓ রাতে রান্না শেষে বানার আর রেওসেটার নকশি মেখে বন্ধ করুন ✓ গ্যাসের গন্ধ পেলে সাথে সাথে সমস্ত জ্বলন্ত জিনিসকে বেসুন, বানার আর রেওসেটারের ঢাকি বন্ধ করে দিন ✓ বিমাইগ্রেশন অনুমোদিত রান্নার ডিউব ব্যবহার করুন, দু'খ আত্মর গ্যাস্টে ফেলুন ✓ আগে মেশমাই জ্বলে তারপর বানারের ঢাকি খুলুন

✗ করা যেন না

✗ গ্যাস সরঞ্জামের কাছাকাছি কোন খোলা আঁচন বা দাহ্য পদার্থ রাখবেন না ✗ গ্যাসের গন্ধ পেলে কোন ইলেকট্রিক সুই ছাঁবেন না ✗ নিজে কোন মেরামতির চেষ্টা করবেন না - সাহায্যের জন্য সবসময় আপনার ডিস্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টরকে ডেকে



ইডেন লোকালে চাইলেই পাবেন। আপনার নিকটতম ইডেন পরিবেশকের সাথে যোগাযোগ করুন।

সাদাকে সাদা ও কালোকে কালো বলার একমাত্র সহর্ষ মাসিকপত্র

নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০০২
৩য় বর্ষ।। ৪-৫ সংখ্যা

প্রপাঠ

বিদায় নেবার জন্য নয়

দাম : ৮ টাকা

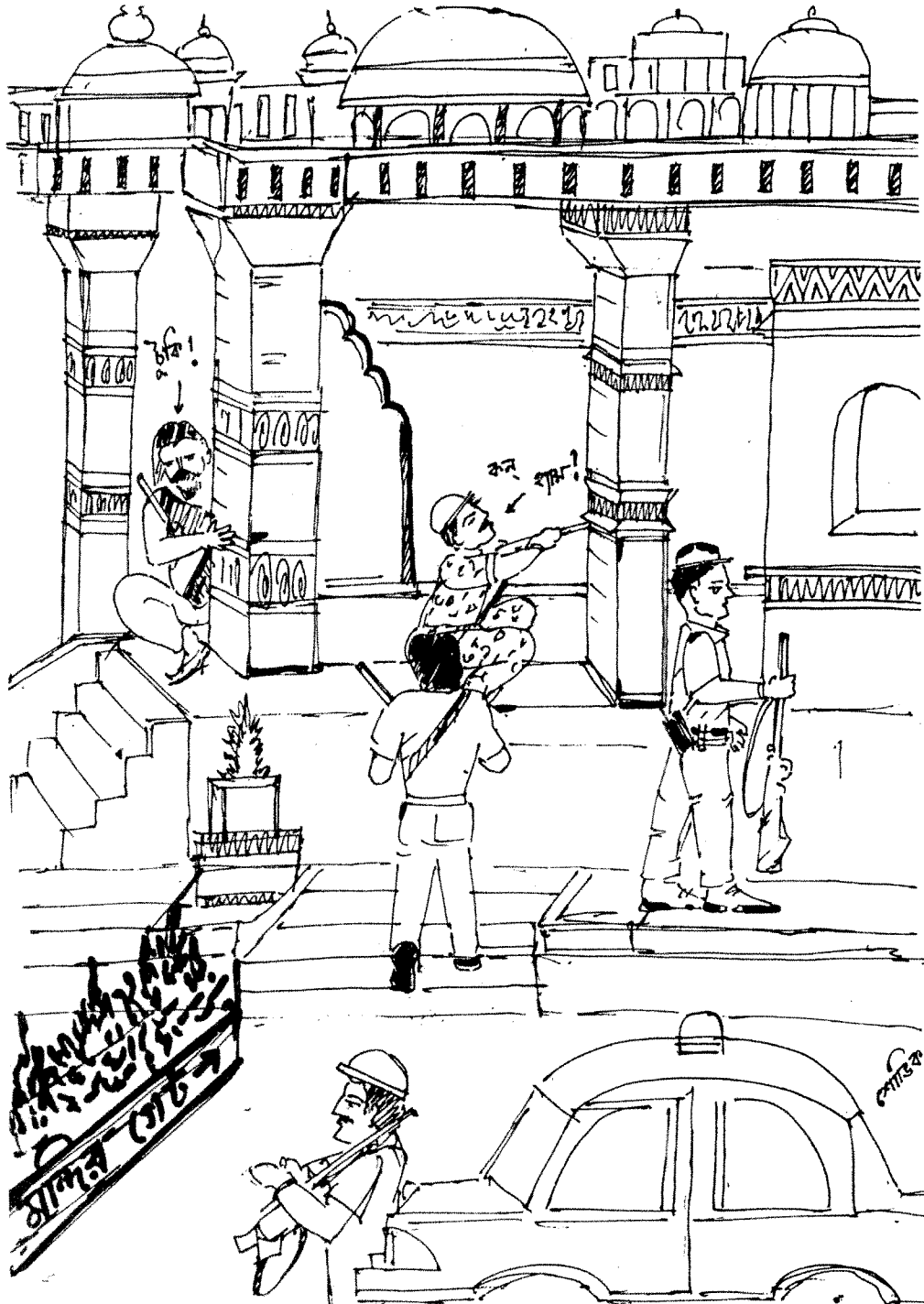
কাউকে হাসানোর কাগজ
কাউকে ফাঁসানোর কাগজ

এলোমেলো করে দে মা
লুটেপুটে খাই



০২
০২
০২

ঠাকুরঘরে টু-কি খেলা



এগিয়েগিয়ে করে দে মা

সাদাকে সাদা ও কালোকে কালো বলার একমাত্র সহর্ষ মাসিকপত্র

গুটেগুটে খাই

নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০০২

৩য় বর্ষ ॥ ৪-৫ সংখ্যা

দাম : ৮ টাকা

কাউকে হাসানোর কাগজ
কাউকে ফাঁসানোর কাগজ

বইপাঠ

বিদ্যায় নেবার জন্য নয়

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী • তারাপদ রায় • সমরেশ মজুমদার • শঙ্করলাল ভট্টাচার্য

সম্পাদক : শেখর আহমেদ

পরিচালন সমিতি : ডাঃ তুষারকান্তি রায় • প্রদ্যোত কুমার মিত্র • বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী • অঞ্জনা দত্ত • ডঃ শুভাশিস নিয়োগী • শতীন মিত্র



৬, ১১

সমাজ এবং প্রশাসনের খোপে খোপে গুঁৎ পেতে আছে নেপোরা। টালমাটাল দশা এলেই এরা ঝাপিয়ে পড়ে দৈ মারার জন্যে। এই নেপোদের আমরা বিলক্ষণ চিনি, কিন্তু 'চিনি' বলতে ভরসা পাই না। একেবারে মুখোশসুদ্ধ টান দিয়েছেন সমরেশ মজুমদার ও চরণ বৈরাগী তাঁদের নিয়মিত কলমে।

১৪

এক জন্মেছিলেন মাইকেল মধুসূদন। তিনি রামায়ণের কাহিনী নিয়ে নতুন ভঙ্গিমায় মহাকাব্য লিখে ঢের ঢের গানমন্দ খেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি অমর হয়েছেন। আর এক জন্মেছেন পিনাকীশঙ্কর চৌধুরী। 'জন্মিলে মরিতে হবে', তবে আর বিলম্ব কেন—এই ভবে, এই হিন্দু-হিড়িকের ধুম্মার লগ্নে, মরবার, এবং অবশ্যই গুপ্তিসুদ্ধ পত্রপাঠকে মারবার তাল করেছেন। এই সংখ্যা থেকে শুরু হল তাঁর ধারাবাহিক মারণোপন্যাস—মারায়ণ।

সম্পাদকীয় □ ৩ পত্রপাঠ জবাব □ ৪ সংবাদ দুঃসংবাদ □ ৮ রসকেলি

□ ১২, ৪৮ টারার চোখে □ ২২, ৩৫ নাট্য সুসংবাদ □ ২৩ চলচ্চিত্র সুসংবাদ

□ ৩৩ জবর খবর □ ৩৯ হেঁসেল □ ৪১

পুরনো কাসুদি :

কুমীরের বাপের শ্রাদ্ধ

যোগীন্দ্রনাথ সরকারের রচনা থেকে □ ৫

প্রচ্ছদ কাহিনী :

ক • সমরেশ মজুমদার □ ৬

লুট পড়েছে লুটে নে • চরণ বৈরাগী □ ১১

রসকাব্য :

আমি কবি যত চামারের • মৈনাক মিত্র □ ১০

অথ সর্দারজি বার্তা • দিগম্বর দাশগুপ্ত □ ১৩

আমড়াগাছি বিষয়ক • গোবিন্দ গোস্বামী □ ৪৬

রসগদ্য :

সঙ্কোচন • অচিন্ত্য কুমার চক্রবর্তী □ ১৩

উচ্চবিস্ত • দিব্যেন্দু দাস □ ২৪

সহধর্মিনী সমাচার • প্রবীর হালদাব □ ৩০

নদীয়ার গঙ্গাপ্রাপ্তি • দিব্যালোচন কলমধারী □ ৩২

আশয়-বিষয় • দেবপ্রসাদ কুমার □ ৪২

জয়হিন্দ • আইভান হো হো □ ৪৩

দেশের কাজ • বাসুদেব রায় □ ৪৭

ধারাবাহিক রসোপন্যাস :

মারায়ণ • পিনাকীশঙ্কর চৌধুরী □ ১৪

গল্প :

পাত্রসুন্দর • শ্রীপর্ণা বসু সেনাপতি □ ২৫

ভীমরতি' • প্রশবকুমার চক্রবর্তী □ ৪৪

রসনাট্য :

ইন্টারভিউ • সনৎকুমার মিত্র □ ৩৪

নিবন্ধ :

আমার জীবনে 'অন্নদাশঙ্কর' • প্রশবেন্দ্রনাথ ঘোষ □ ৩৬

প্রচ্ছদ : গুরুপ্রসাদ দাস

অলঙ্করণ : গুরুপ্রসাদ দাস • সুশানচন্দ্র ডুইয়া • শোভিক বসু রায়

• কুটুস

কর্ম সহায়ক : অচিন্ত্য কারক

শেখর আহমেদ কর্তৃক ১০ জে, ফার্ন বোড (গ্রাউণ্ড ফ্লোর), কলি-১৯ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন : ৪৪০-৩৮০৩ (সকাল ৮-১০টা, রাাত্রি ১০টা পর্ব)

সম্পাদকীয় দপ্তর : (সন্ধ্যা ৫-৩০ থেকে ৮-৩০) ১০ বি, ফার্ন বোড, কলি-১৯, মুদ্রণ : দেবী সারদা প্রেস, ৩০এ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলি-৯



কালীঘাটে ব্রাহ্মের ওপর নন্দাটের
সদ্ব্যপ্তি স্থানিতে কি পাণ্ড...

সম্পাদকীয়



ঘোল-করতাল

বাজার যে বেশ এলোমেলো হইয়া উঠিয়াছে, ইহাতে কোনো সন্দেহই নাই। যে যাহার মতো লুটিয়া লইতেছে, ইহাতেও তিলমাত্র সন্দেহ নাই। ইউনিয়ন বাবাজি দিগের লুটিবার ধুম দেখিয়া বেওসায়ীগণ পরিব্রাহি চিৎকার করিয়া সরিয়া পড়িতেছে। সঙ্গীতের হাল ফ্যাশন দেখিয়া হেমন্ত-মানবেন্দ্র-পান্নালাল-সতীনাথ প্রমুখের অমর আত্মাও 'মরিতে পাইলে বাঁচি' জপিতেছে। প্রকাশকগণ সাহিত্য ছাড়িয়া পর্ণোগ্রাফির ব্যবসা ফাঁদিতেছেন। ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল, সঙ্গীতমেলা, বইমেলা ইত্যাদির দৌলতে কিছু সদ্যশৃঙ্গ ও বিগতশৃঙ্গের কপালে বোদ্ধার শিরোপা জুটিয়া যাইতেছে। ওদিকে এলোমেলো গুজরাটের ঘুর্ণি হাওয়ায় দাঁও মারিতে ব্যস্ত মোদীজি। খোল-করতাল লইয়া যে যাহার মতো আসরে নামিয়া পড়িয়াছেন। দৃষ্টি আরো প্রসারিত করিলে নজরে পড়িবে—বুশ সাহেব ইরাকের মাথায় থাবা তুলিয়া ঝোড়ো ঝাপ্টা মারিবার জন্য ছটফট করিতেছেন। বেশ জমিয়া উঠিয়াছে দেখিয়া মৃতের বোরখা ছাড়িয়া লাদেন সাহেবও গা-ঝাড়া দিতেছেন....

কেবল পত্রপাঠেরই কিছু হইল না। সম্পাদক মশায় মাথার ঘাম পায়ে ফেলিতে ফেলিতে প্রায় পুকুর বানাইয়া ফেলিয়াছেন। তথাপি ঘোলা জলে মাছ ধরার কিংবা এলোমেলো হাওয়ায় হাতড়াইয়া ঈঙ্গিত বস্তুটি খপ্ করিয়া বাগাইবার কায়দাটি রপ্ত করিতে পারিতেছেন না। তা, সেজন্য আমরা দুঃখিত নহি। সরটুকু তাঁহারা খাইতে থাকুন, আমরা ঘোল পাইলেই খুশি। কালের অমোঘ নিয়মে তাঁহাদিগের অনেকের মস্তকেই ঘোল ঢালিবার প্রয়োজন হইবে কি না।

পত্রপাঠ জবাব

জবাব দিচ্ছেন : দ্বিতীয় সুগ্রীব



● পুজো এলে কাশ দোলে, মন ভোলে দুখ/ পুজো এলে ঘুরিবার সুখ/ খাওয়া-দাওয়া, সোনারোদ দেখা/ শিউলির রূপ দেখি একা/ চেয়ে দেখি ওরা দেশে সাথে/ পত্রপাঠেতে মন মাতে...

—অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলেপাড়া লেন, কলকাতা-১৪

□ অনেক হয়েছে গলা সাধা/ কত দিলে থামবেন দাদা।

● আমার মনে হয় “বসুধারা” পড়ে সম্পাদক পাগল হয়ে গেছেন। তা না হলে স্বপ্নময় চক্রবর্তীর “মদন-মোনালিসা” শারদীয় সংখ্যায় সূচীপত্র থেকে বাদ পড়ত না। আপনিও একটি পোস্টমডার্ন উপন্যাস লিখুন, “রতিধারা” নামে।

—কণিমা দাস, বি-জেমাবী, বর্ধমান

□ সকলি তেনাবই ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তিনি

তেনার লেখা তিনিই লেখেন, আমরা পয়সা দিয়ে কিনি।

স্বপ্নময় দুঃস্বপ্ন দেখে ছিটকে গেছেন রিং-এব বাইরে

এখন বাজার সেই লেখিকার, কোথাও আর কিছু নাই রে।

অনুরোধের ধাব ধাবেন না, আপনা থেকেই লিখেছেন ফের

শোনা যাচ্ছে, মবল ইন্তক এমন কেতাব লিখবেন ঢের ঢের।

সেই মাল ছেড়ে, পয়মাল কাণ্ড।—অন্যের লেখা পড়তে চাচ্ছে

ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছে হলেই তোমার ফাঁসি অনিবার্য।

● সম্পাদক মশায়কে একদিন দেখেছি সায়েন্স সিটিতে একজন ভদ্রমহিলার সঙ্গে ঘুরতে। এটা কি লজ্জার কথা নয়?

—শর্মিলা অর্ণব, বেলেঘাটা, কলকাতা

□ খুবই লজ্জার কথা ম্যাডাম। আপনার চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা সম্পাদককে বলে দিয়েছি—তিনি যেন এর পর থেকে কোনো অ-ভদ্র মহিলার সঙ্গেই ঘোরাঘুরি করেন।

● সব কাজ ছেড়ে ‘পত্রপাঠ’ করতে কে আপনাদের মাথার দিবি

দিয়েছিল?

—অকণিমা সান্যাল, খড়গপুর, মেদিনীপুর

□ সব কাজ ছেড়ে এই নিয়ে মাথা ঘামাতেই বা কে আপনাকে মাথাব দিবি দিয়েছিল?

● আদবানি-নরেন্দ্র মোদীর রথ ঘোড়ায় টানে না কেন?

—বীরেন্দ্র শূব, শ্যামবাজার, কলকাতা

□ টানবে কি করে? হাসি থামলে তবেই না।

● রাষ্ট্রপতি হতে গেলে কি বিজ্ঞানী হতে হয়? মানে, এ পি জে আব্দুল কালামকে দেখে.....

—সইফুদ্দিন শেখ, পিয়ারডোবা, বাকুড়া

□ জৈল সিং-এর সময় ‘জ্ঞানী’ হলেই চলত। কালাম সাহেবে বেড়ে হয়েছে ‘বি-জ্ঞানী’। আর একটু বেড়ে কবে ‘অল্পজ্ঞানী’র টার্ম আসবে, সেদিকে আমরা তীক্ষ্ণ নজর রাখছি; এলেই আমরা আমাদের সম্পাদককে প্রার্থী বাড়ী করব।

● ত্রেতাযুগে বংশীধারী প্রমিস কবে গেছিলেন, ভারতে অনাচার বাড়লেই তিনি রে রে করে ফিরে আসবেন, বদমাশদের পিণ্ডি চটকাবেন। এখনো তাঁব দেখা পাওয়া যাচ্ছে না যে।

—অশোক কুণ্ডু, মালদা

□ ফুটবল কিংবা হকি খেলার মাঠে গেলেই দেখতে পাবেন।

● ওধু আরব নয়, রাশিয়া-আমেরিকাতেও কত তেল। আমাদের স্টকে কিছু নেই?

—মন্টু দে, মানকুণ্ডু, হুগলী

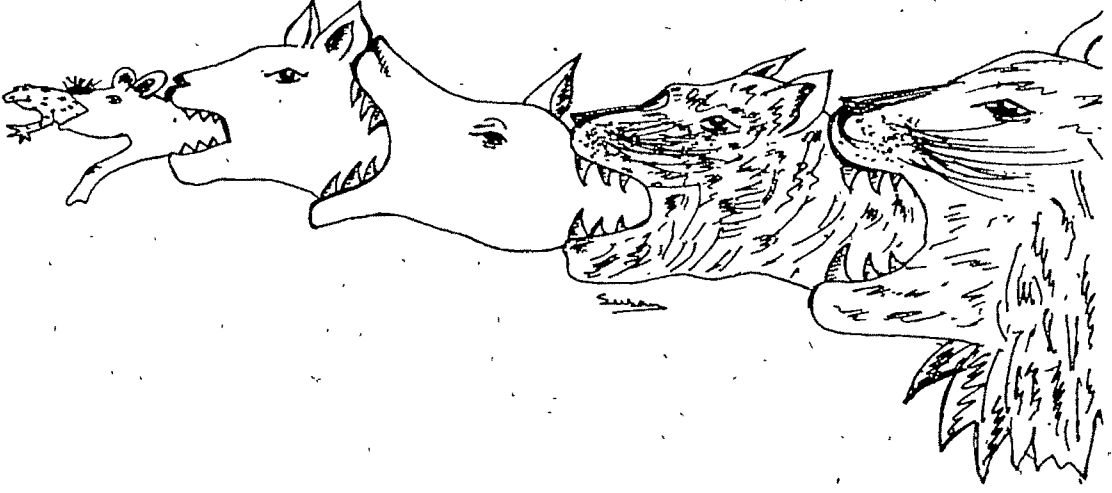
□ এব পায়ে ওর পায়ে দিতে দিতেই খরচ হয়ে গেছে। ভাঁড়াবে তেল না থাক, তেল দেওয়াব কম্পিটিশনে কিন্তু আমরা....

● অন্যের নিদেমন্দ করাব একটা সীমা থাকা উচিত। আপনাদের কপালে দুঃখ আছে।

—ইভা নাগ, কলকাতা-৬৭

□ বাঁচালেন। চোখ কান হার্ট লিভার হাত পা বুক পেট—বাকি সব সুখে ভাসবে জেনে নিশ্চিত হলাম।

পুরনো কাহিনী



যোগীন্দ্রনাথ সরকারের রচনা থেকে

কুমীরের বাপের শ্রাদ্ধ

কুমীরের বাপের শ্রাদ্ধ। বন থেকে দলে দলে পশুরা সব ফলার খেতে এসেছে। সিংহ, বাঘ, চিতা, শিয়াল, বিড়াল, ইঁদুর, ব্যাং—কেউ বাকি নেই। কুমীরের বাড়ির সামনে মস্ত উঠানে শামিয়ানা ঝাটানো হয়েছে। তার নীচে একদিকে সকলে বসেছে, আর-এক দিকে পুকতঠাকুর আসন পেতে বসে, মাথা নেড়ে, টিকি দুলিয়ে কুমিরকে মন্ত্র পড়াচ্ছেন। শ্রাদ্ধের ঘটা দেখে কে। এদিকে বেলা ক্রমে বেড়েই চলেছে। শেষে পুরাত যখন আসন ছেড়ে উঠলেন, তখন দুপুর বাজতে আর দেরি নেই। এত বেলায় কারো মুখে একবিন্দু জলও পড়েনি। আহা, শুকনো ঠোঁট চাটতে চাটতে বেচারাদের গলা পর্যন্ত শুকিয়ে উঠেছে।

ইঁদুরের পেটের জ্বালা বড়ো বেশি। আর থাকতে না পেরে ব্যাংটাকে ধরে সে টপ করে গিলে ফেলল। ব্যাপার দেখে বিড়াল তো চটে লাাল। ফলার খেতে এসে এরকম অভদ্রতা! রাগে পুঁথি এমন খেপে উঠল-যে, টুটি ছিঁড়ে ইঁদুরকে ভদ্রতা না শিখিয়ে কিছুতেই ছাড়লে না।

তখন শিয়াল দেখলে হিসেব মতো বিড়ালের মাংসে এখন শুধু তারই দাবী। সে দাবী কড়ায়-গুণায় আদায় না করে সেই-ই বা ছাড়বে কেন!

এইবার চিতাবাঘের পালা। সে ভাবলে, 'আমি ভদ্রতাও জানিনে, দাবী-দাওয়াও বুঝিনে, আমি শুধু ধরব আর টুটি ছিঁড়ব। এই ভেবে শিয়ালকে জাপটে ধরে সে যা করলে তা বোধ হয় না বললেও চলে। চিতার কাশ দেখে বাঘ একেবারে আশুন। যত চুনোপুঁটি মজা লুঠবে, আর সে বসে বসে উপোস করবে? বটে!—এরপর বাঘ যখন ফলারে মন দিলে, তখন

চিতার ল্যাজের ডগাটুকুও বাদ গেল না!

পশুরাজ সিংহ আড়চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে সব দেখছিলেন। ফলারের ব্যবস্থা দেখে শেষে তিনিও মেতে উঠলেন! এর পর বাঘটাকে ছিঁড়ে-কুটে শেষ করতে তাঁর আর কতক্ষণ!

কুমীর এতক্ষণ কোথায় লুকিয়েছিল, পশুরাজ খাওয়া দাওয়া সেরে বসে আছে, এমন সময় সে এসে হাজির। ব্যাপার দেখে কুমির মহাশুশি। এই তো আসল ফলার! একেবারে হেউ-ডেউ কাশ! আয়োজন এমন প্রচুর যে, কারো একটা কথা বলবার জো-টি নেই!

কুমির ভাবলে, ভোজের ব্যাপার চুকেছে, এখন আমি নিজের জোগাড় দেখি। এই ভেবে পশুরাজকে সাপটে ধরে সে আপনার প্রকাশ মুখের মধ্যে ফেলে দিলে। রাজা অনেক আপত্তি করলেন বটে, কিন্তু সবই মিছে। খিদেয় কুমিরের পেট চুপসে এতক্ষণ আমসি হয়েছিল, এখন সেটি ফুলে একেবারে ঢাকই জ্বালা! তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে, পেটে হাত বুলাতে বুলাতে সে শুড়শুড়ি টানতে লাগল।

ব্যাপার দেখে পুরুতমশাই হতভম্ব। ভাগ্যে তিনি ফলার খেতে আসেননি! ফলারে এলে তাঁর আজ কী দশাই না হত। তিনি ডালে ডালে লাফ মারেন আর ভাবেন :

কুমিরের বাড়ি নেমন্তন্ন সহজ কথা নয়,

বিনা আয়োজন সবাই পরিতুষ্ট হয়।

যার পেটেতে যত ধরে, করলে উদরসাৎ,

যার পেটেতে যত ধরে, করলে উদরসাৎ,

ঝড়তি-পড়তি খেয়ে কুমির পেটে বুলায় হাত।

অকপটে



সমরেশ মজুমদার

লুটেরা

সেদিন একটি সমীক্ষা করেছিলাম। পরিচিত দশজন মানুষকে প্রশ্ন করেছিলাম যে যদি তাঁদের কিছু টাকা দেওয়া হয় তাহলে তাঁরা তাঁদের বাঁ হাতটি চেনে বেঁধে রাখা একটি ক্ষুধার্ত বাঘের মুখের সামনে রাখতে পারবেন কি না। বাঘটি এমন ভাবে বেঁধে রাখা হবে যাতে সে কোনোভাবেই ব্যক্তির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে না পারে এবং একমাত্র ওই হাতটি ছাড়া অন্য অঙ্গ স্পর্শ করতে না পারে। দশজনের মধ্যে একজন এ ব্যাপারে মন্তব্য করেননি। ন'জন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, টাকার পরিমাণ কত? আমি পাঁচ হাজার বললে সবাই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। টাকার অঙ্ক দশ থেকে পঞ্চাশে পৌঁছেলে মন্তব্য শুরু হল—বাঘটা যদি হাতটা খেয়ে ফেলে, তাহলে সারা জীবন অঙ্গহীন হয়ে থাকতে হবে। পঞ্চাশ হাজারের মধ্যে হয়ত বিশ হাজার যাবে চিকিৎসা করতে। তিরিশ হাজারের জন্যে অঙ্গহীন হওয়ার কোনো মানে হয় না। আমি তখন টাকার অঙ্ক বাড়াতে লাগলাম। দেখা গেল, তিন লক্ষ পেলে পাঁচ জন, পাঁচ লক্ষ পেলে দু'জন, দশ লক্ষ পেলে একজন এবং শেষতম ব্যক্তি রাজি হলেন বিশ লক্ষ টাকার বিনিময়ে হাত খোঁয়াতে। তখন আমার শর্ত হল, বাঘের মুখের সামনে হাত নিয়ে গেলেই হবে না, বাঘ যদি হাত আক্রমণ করে তবেই টাকাটা পাওয়া যাবে। তাঁরা জানালেন, বাঘ যদি বৈষ্ণব হয়ে যায় তাহলে তাঁরা তাকে এমন উত্সাহ করবেন যে সে হাতের মাংস কামড়াতে বাধ্য হবে।

অর্থাৎ তিন থেকে কুড়ি লক্ষ টাকার বিনিময়ে দশজনের মধ্যে নয়জন মানুষ নিজের হাত খোঁয়াতে রাজি। এ ক্ষেত্রে মানুষের লোভ পর্যায়ক্রমে চেহারা বদলেছে। এক হাজার টাকা ঘুষ দিতে চাইলে যে অফিসার উপেক্ষা করতে পারেন তিনি দু'লক্ষ টাকা ঘুষ পেলে কি করবেন তা বোঝা যাচ্ছে না।

সেদিন আমার বন্ধু বলছিলেন, তিনি এক-কার্টুন বিদেশি সিগারেট

কিনেছিলেন কিন্তু তার ছ'টি প্যাকেটের হদিশ পাচ্ছেন না। তাঁর সন্দেহ চাকরকে এবং পনের ছহরের ছেলেকে। তাঁর স্ত্রী তাঁকেই দোষী করলেন—সতর্ক হয়ে না রাখলে তো এই অবস্থা হবেই। শেষ পর্যন্ত যখন প্রমাণ পেলেন ছেলেই প্যাকেট সরিয়েছে, তখন তাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে গিয়ে শুনলেন, ওর সামনে প্যাকেট ফেলে রেখে তিনি ওকেই লোভী করে তুলেছেন।

কথাটা আমার মনে ধরল। আমাদের যার যা আছে তা যদি আমরা আমাদের ট্যাকে বা শরীরের অন্য কোথাও তালচাবি দিয়ে না রাখি তাহলে দোষ তো আমাদের। সেটা কবার পর দেখতে হবে, অন্য লোকজন অসতর্ক আছে কি না। থাকলেই হাতিয়ে নাও। 'ছবি করতে চাই' বলে এন এফ ডি সি-র কাছে যখন টাকা চাইব তখন নিজের জন্যে কত সরিয়ে রাখব তা আগে থেকে ভাবতে হবে। চল্লিশ লাখ বাজেট দিয়ে অর্ধেক ছবি শেষ

পেতে পেতে আপনি এমন অভ্যস্ত হয়ে
গেছেন যে, ভাবছেন, অবসর নেওয়ার
পর যদি আরো কয়েক বছর এক্সটেনশন
পান তাহলে মেয়ের বিয়ের সময়
বিন্দুমাত্র পরিশ্রম করতে হবে না।

করে যদি বলি, সং শিল্পের জন্যে এবং দরবৃদ্ধির কারণে আব কুড়ি লক্ষ টাকার দরকার, তখন, আমার নামের পাশে যদি এ বি সি ডি থাকে, তাহলে এন এফ ডি সি-কে টোক গিলতেই হবে এবং টাকাটা আমি পাব। একই ব্যাপার সরকারের পয়সায় ছবি করার সুযোগ পেলে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের টাকায় ছবি করতে গিয়ে আগে ফ্ল্যাট বুক করেছেন, এমন পরিচালক সম্ভবত আছেন। কয়েক বছর আগে হঠাৎ উদার হয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার উপেক্ষিত লেখকদের অনুদান দিয়েছিলেন বই ছাপতে। ছাপার জোয়ার চলেছিল। যে বই ছাপতে দশ হাজার লাগে তার পৃষ্ঠাসংখ্যা কমিয়ে পাঁচ হাজারে ছাপা হয়েছিল। হাজার কপি ছাপার চুক্তি হলেও পাঁচশোর বেশি ছাপা হয়নি।

একে ঠিক লুটপাট বলা যাবে কিনা জানি না তবে লুটপাটের একটা নমুনা সেদিন দেখলাম। চব্বিশ ঘণ্টার বন্ধ ডাকা হয়েছিল। তাতে সব

ট্রেন বাতিল। হঠাৎ ডাকিয়েরা উদার হয়ে সেটাকে বারো ঘন্টায় নামিয়ে আনতে সন্ধ্যা ছটায় বন্ধ শেষ হল। সমস্ত ট্রেনের টিকিট আগেই বাতিল হলেও রাতের ট্রেনগুলো ঠিক সময়ে আবার যাত্রা শুরু করবে বলে স্থির হল। ট্রেন ফাঁকা। শেষ সময়ে খবর পেয়ে যেসব যাত্রী স্টেশনে উপস্থিত তাদের দিকে তাকিয়ে প্রবল ভাবে মাথা নেড়ে চলেছেন। ট্রেন ফাঁকা অথচ বলে চলেছেন সিট নেই, বর্ধমানের যাত্রীরা নাকি সিট বুক করেছেন। শেষ পর্যন্ত তিনি রাজি হলেন এই শর্তে, ওই এলোমেলো পরিস্থিতিতে তাঁকে লুটেপুটে খেতে দিতে হবে।

এলোমেলো করে দিলে লুটেপুটে খাওয়া সম্ভব হয়। দেশে যখন যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়, সরকার থাকে না, সংসার যখন কর্তাবিহীন তখন মানুষের ইচ্ছে

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের টাকায় ছবি করতে গিয়ে আগে ফ্ল্যাট বুক করেছেন, এমন পরিচালক সম্ভবত আছেন।

হয় নিয়ম ভাঙার। এটা বুঝি। সব থাকা সত্ত্বেও কিছু মানুষের অদম্য বাসনা লুটেপুটে খাওয়া। এই খাওয়ার পদ্ধতি আবার নানান রকম। আপনি নামি পত্রিকার গল্প-সম্পাদক। আপনি ইচ্ছে করলে একজন তরুণ লেখকের গল্প ঘন ঘন ছাপতে পারেন। দেখা যাবে, আপনি যখন ছুটির সময় অফিস থেকে বেরুচ্ছেন তখন পাঁচ-সাতজন তরুণ লেখক আপনাকে ঘিরে রয়েছে। আপনি কফিহাউস বা রেস্টুরেন্টে বসলেন, ওবাও সঙ্গী হল। বয়স্ক ব্যক্তি হিসেবে বিল মেটানো আপনার কর্তব্য কিন্তু ওরা তো সেটা কিছুতেই

হতে দেবে না। আপনার ভালো আঙ্গির কাপড় চাই, ওরা এনে দিচ্ছে। সকালে যারা বাড়িতে হাজির হয় তারা শুধু আপনার ইশাবার জন্যে প্রস্তুত, সঙ্গে সঙ্গে বাজার করে এনে দেবে। এগুলো পেতে পেতে আপনি এমন অভ্যস্ত হয়ে গেছেন যে, ভাবছেন, অবসর নেওয়ার পর যদি আরো কয়েক বছর এক্সটেনশন পান তাহলে মেয়ের বিয়ের সময় বিদ্যুত্বে পরিগ্রহ করতে হবে না। লুটেপুটে খাওয়ার এটাও একটা পদ্ধতি।

শেষ করি একটা গল্প দিয়ে। ভদ্রলোকের বাজ্রে খরচ করার অভ্যাস ছিল না। ওঁর স্ত্রীর চোখে উনি কপ্পাস। একটা টাকাও মহিলা ভদ্রলোকের নজর এড়িয়ে নিতে পারতেন না। মধ্যবয়সে এসে ভদ্রলোকের পদোন্নতি হওয়ায় এমন কিছু সঙ্গী পেলেন যারা সন্দের পর ক্লাবে সময় কাটান। তাঁদের সঙ্গে পেতে ভদ্রলোক মদ ধরলেন। অভ্যেস না থাকায় অল্পেই বেসামাল হয়ে যেতেন। বাড়ি ফেরার পর টাকা-পয়সার ব্যাপারে হুঁশ থাকত না। পরদিন সকালে ব্যাগ খুলে হিসেব মেলাতে পারতেন না। ভাবতেন ক্লাবেই খরচ করেছেন। স্বামী মদ ধরার পর মহিলা খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। প্রথমে ভেবেছিলেন আত্মীয়-স্বজনদের জানাবেন। কিন্তু এলোমেলো হয়ে বাড়ি ফেরা স্বামীর মানিব্যাগ হাতে পেয়ে সেই ইচ্ছে উবে গেল। মনে মনে বললেন, 'রোজ এরকম এলোমেলো হয়ে এসো গো, আমি একটু লুটেপুটে খাই।'

মুশকিল হল, স্ত্রীরা খেয়ে হজম করতে পারেন না। বাপের বাড়ির লোকজন এত উপহার পেতে লাগল যে খবরটা ভদ্রলোকের কানে পৌঁছতে দেরি হয়নি। তৎক্ষণাৎ টাকার বদলে ডেবিট অথবা ক্রেডিট কার্ড মানিব্যাগে রাখতে শুরু করলেন ভদ্রলোক। তখন মহিলার আফশোষ, 'থাকলে তো লুটব, এলোমেলো হয়ে লাভ কি আমার!'



কার্টুন : শোভিক বসু রায়

সংবাদ দুঃসংবাদ

সংবাদপত্র খুললে তার কোনটি যে সংবাদ আর কোনটি বিজ্ঞাপন আর কোনটি কাকৈ কুমিরছানার মতো উঁচু করে তুলে ‘হিরো’ বানানো ‘নিউক্লিয়ার’ পণ্ডিতমতা বা বোঝা দায়। বিশ্বহিন্দু পরিষদের রথযাত্রা বানচাল হওয়ার খবরটি সংবাদ প্রতিদিন গত ১৮ নভেম্বর তারিখে প্রথম পাতার শীর্ষে রঙিন ছবি দিয়েই ছেপেছে। এবং ঠিক একই উচ্চতায় পাশাপাশি রঙিন ছবি দিয়ে আর একটি সংবাদ ছেপেছে, যাকে ঠিক সংবাদ নয়, ‘সং’ বলাই সঙ্গত হবে, এবং এ সুবাদে সংবাদ প্রতিদিনের কোনো ভক্ত পাঠক তার প্রিয় সংবাদপত্রটিকে যদি ‘সং প্রতিদিন’ নামে ডাকে, তাহলে সেটাও খুব অসঙ্গত হবে না।

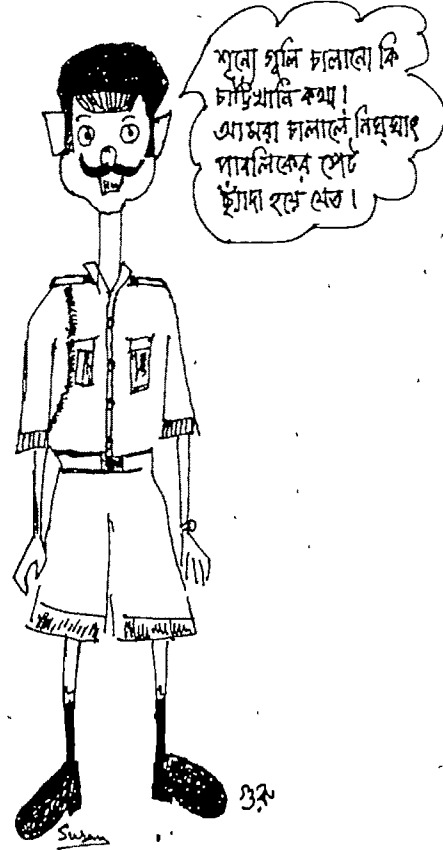
ছবিটিতে প্রদর্শিত দু’জন সং-এব একজন ১৪ বছরের নাদুস নুদুস ইজাজ আহমেদ, অপটু পরিচালকের প্রথম ছবির অপটু অভিনেতার মতো সিলিংয়ের দিকে বন্দুক উচিয়ে দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে পোজ নিয়েছেন। অন্যজন তস্য পিতা বেওসায়ী মহম্মদ নঈমুদ্দিন ততোধিক আড়ম্বরণে বাঁহাতে দরজা ও ডানহাতে রিভলবার ধরে গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে। ছবির নিচে ক্যাপশন—অকুতোভয় বাবা, সাহসী পুত্র।

সংবাদের শিরোনাম—“ষোলো ডাকাতকে রুখলেন বাবা ছেলে।” স্টাফ রিপোর্টার Solo কিংবা ষোলোয় খুবই আস্থাবান। এই বাপ-ব্যাটাকে প্রচারের আলোয় ষোলো আনা চুবিয়ে না তোলা পর্যন্ত তাঁর স্বস্তি নেই।

মোকদ্দমাটা কি? না, এই ব্যবসায়ী বড়লোকেরা শেক্সপীয়র সবণিব একটি বহুতল ফ্ল্যাটবাড়িতে থাকেন। কে জানে বাড়িটিও ষোলোতলা কিনা। ষোলোপ্রিয় সাংবাদিক তা জানাননি। তবে ঘটনাটি দু’দিন আগে বেছে বেছে ১৬ তারিখে ঘটে ষোলোকলা পূর্ণ করে দিয়েছে।

নিচের দারোয়ানদের বেষ্টে ডাকাতরা চারতলায় গিয়ে নঈম সাহেবের ফ্ল্যাটের দরজা ভেঙে ঢোকে রামাঘরে। টেলিফোনের লাইন কাটে। একটি ড্রয়ার ভেঙে বারো হাজার টাকা (হায়, ষোলো নয়!) লুট করে। তখনো একটি বন্ধ ঘরে বাপ-ব্যাটা নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন। এবপার পাশের দুটি ঘর ডাকাতরা ‘ড্রোলপাড’ করে। এতক্ষণের পর পিতাপুত্রের নিদ্রাভঙ্গ না হওয়াটা খুবই ঝারাপ দেখায়। অতএব তাঁরা ধীরেসুস্থে শয্যা ত্যাগ করলেন। দু-জনেই বেলগাছিয়ার নর্দার্ন রাইফেল ক্লাবের সদস্য। কিন্তু মাত্র ষোলোজন ডাকাতের জন্যে কমান্ডার ইন চীফ বাবা তো আর গুলি ছুঁড়তে পারেন না। সে যে মাছি মেরে হাত গন্ধ করা। কিংবা বলা যায় না, বাবার মতো জাঁদরেল বন্দুকবাজ স্বয়ং গুলি চালালে হাত ষোলোজন ডাকাতের জায়গায় বত্রিশজন ডাকাত মারা পড়বে। অনর্থক প্রাণহত্যা? ছিঃ। পাপ হয় না তাতে? এতএব বন্দুক ধরলেন ছেলে আর বাবা, বাবা তো নয়, যেন সামরিক অফিসার; তাঁর ভাষায়—“শোওয়াব ঘরের দরজা ভেঙে ওরা ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করবে আমি ইজাজকে গুলি চালাবার নির্দেশ দিই।”

অমনি বাপ কা বেটা—কী কবল? গোটা চারেক ডাকাতকে ধরাশায়ী করল? কী মুস্কিল, তারা তো দরজার ওপাশে। বেটা প্রবল বিক্রমে “তিন রাউন্ড শূন্যে গুলি চালায়।” একমাত্র ওঁবাই জানেন বন্ধ ঘরে শূন্যে কী করে গুলি চালানো যায়। যাই হোক, গুলির শব্দ শুনে ডাকাতরা ব্যাকটু



শুন্যে গুলি চালানো কি
চাটখানি কথা!
আমরা দালাল নিদ্দার
পারলিঙ্ক স্টেট
ইদাদ হাফে এত।

প্যাভেলিয়ন। আব সাংবাদিক আর পুলিশ-কর্তারা মার্চ টু ইজাজ সাহেবকা ফ্ল্যাট।

বীবত্ব বলে বীবত্ব। মুখোমুখি হওয়া মাথায় থাক, কনে বউদের, থুড়ি ডাকাতদের মুখটুকুও দেখা হল না। না খেলেন ডাকাতদের হাতে মাংস, না মারলেন ডাকাতকে। তবু এই সংবাদ অথবা দুঃসংবাদ পত্রটির মতো এই ঘটনা ‘নজির বিহীন’।

যে রাজ্যে বাড়িতে ডাকাতি হলে এড়িয়ে গড়িয়ে একজন সাবইন্সপেক্টর হাজিরে দেন, এবং কোন কোন জিনিস খোঁয়া গেছে বদলে কোন কোন জিনিস খোঁয়া যায়নি বরং যার মধ্যে অবৈধ গন্ধ আছে, তাই খুঁজে বাড়িওয়ার টুটি চেপে ধরেন, সেই রাজ্যেই লাইন লাগিয়ে ছুটলেন বেনেপুকুর, শেক্সপীয়র সরণি থানার ওসি, ডিসি উদ্ভব এবং ডিসি মধ্য। তা উত্তর মেরু যখন এলেন, দক্ষিণমেরুই বা না এসে থাকেন কী করে? উত্তর-দক্ষিণ দু-জনেই নঈম সাহেবের বিশেষ ঘনিষ্ঠ। স্বভাবতই কলকাতা পুলিশ এমন গিনেসবুক-মার্ক ‘সাহসিকতার’ জন্যে বাপ-ব্যাটাকে পুরস্কৃত করার কথা বিবেচনা করছে।

আজকল চোর-ডাকাতকে ভয়-দেখানোর জন্যে শ পাঁচেক টাকায় খেলনা-পিস্তল বিক্রি হয়, যা থেকে জবরদস্ত আওয়াজ আব আওয়াজ

যেয়ো। সে সব কেনে গরিব মানুষরা। তাদের সাধ্য কি, ওই উত্তর-দক্ষিণের ত্রিসীমানায় বেঁধে!

আসলে পুলিশ বাহিনী ক্রমশই অহিংসমন্ত্রে দীক্ষিত হচ্ছে। অহিংস অস্ত্রেও। প্রাণহানি ঘটেনি (মানে, হার্টফেল করে বাপ-বেটা পটল তোলেনি) বলেই এই পুরস্কার। ডাকাতরাও কি কম অহিংস! হাড়ির খবর না নিয়ে তো কেউ ডাকাতি কবতে যায় না! তা, ঘরে বন্দুক-পিস্তল আছে জেনেও তারা কিছুটা সঙ্গে নেয়নি, নিয়েছিল ফুলের মালা আর চন্দনবাটা, দরজা খুললেই বাপ-ব্যাটাকে পরাবে বলে।

বাপ-ব্যাটা দরজা না খোলায় খুব নিরাশ হয়েই সম্ভবত তারা ফিরে গেছে!

পুলিশের সঙ্গে নঈমুদ্দিনের গলায়-গলায় সমাচারটি জানা গেছে, কিন্তু সংবাদ প্রতিদিনের কস্তাদের সঙ্গে এই সংদের পিরিত কিংবা ব্যবসা কিংবা বিজ্ঞাপনদাতা-কামধেনু সম্বাদটি আমরা জানতে পারিনি। পুরো খবরের অর্ধেকের বেশি জুড়ে নঈমুদ্দিনের বেণুসায়ী পরিচয়, তাঁর গদি কোথায়, কোথায় কোথায় তাঁর আড়ত, তাঁর ছানাপোনারা কোন কোন নামি ইস্কুলে নাম লিবিয়েছে—এইসব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বর্ণনা করা হয়েছে। সংবাদ প্রতিদিন সংবাদপত্র ভগতে একটি ‘নিঃশব্দ বিপ্লব’ ঘটিয়ে ফেলেছে। সকালে উঠে পাঠক খবরের কাগজটি খুলে দেখবে, তার প্রথম পাতায় কোনো খবরই নেই, পুরো পাতা জুড়ে একটি রঙিন বিজ্ঞাপন। তখন পত্রিকাটির নাম হয়ে যায় ‘বিজ্ঞাপন প্রতিদিন’—আপনা থেকেই।

সংবাদ কিংবা বিজ্ঞাপন প্রতিদিন আর একটি নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটাতে চলেছে। তা হল, ধারাবাহিক বিজ্ঞাপন। পরদিনই, তাঁদের দৈনিকের ক্রোড়পত্র মহাসাগর না মহানগর কী একটা বের করেন, তার প্রথম পাতায় আবার একটি খবরের ছতোয়, তার এক তৃতীয়াংশ জুড়ে (মনে রাখবেন, পৃথিবীর তিনভাগ জল, একভাগ স্থল; এবং একভাগ খবর কিংবা নঈমুদ্দিন

ও তস্যপুত্রের খবরটিই সেই স্থল) নঈমুদ্দিন ও জুনিয়র নঈমুদ্দিনকে প্রশংসার ব্লাস্ক চিট ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

যারা তাদের বাড়ি ডাকাতি করতে গেছিল, তাদের সর্দার পার্ক সার্কাসের অমব মল্লিক ও ইউসুফ। ‘সংগঠিত ডাকাতির ক্ষেত্রে এই দুই ডাকাত সর্দারের জুড়ি মেলা ভার!... অপারেশনে বাধা পেলে, এমনকি প্রত্যক্ষদর্শীর সামনে পড়ে গেলে গুলি করে খুন করতে এরা বিদ্মুদ্র ভাবনায় পড়ে না।’ প্রতিবেদক সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় একটি ফুটনোট লিখতে ভুলে গেছেন। তা হল, এরা গুলি চালায় বটে, তবে তা তাদের পরমপ্রিয় স্বর্ণভিষ প্রসবকাষী নঈমুদ্দিন সাহেব ও তাঁর পরিবারবর্গ বাদে। সে যাই হোক, এনারা একটি শুভদিন দেখে নঈম সাহেবের সচিত্র বিজ্ঞাপন, থুড়ি, সংবাদ ছাপার তোড়জোড় করেন। পুলিশের ওসি, এসি, ডিসি, কমিশনার, ডি এস পি, ডি আই জি, ডি জি, বি এস এফ, র‍্যাফ, আর্মি-নেভি-এয়ারফোর্সের কর্তারা, মায় ইন্টারপোল, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড, আই এস আই, সি আই এর কর্তারা দল বেঁধে অভিনন্দন জানাতে নঈম সাহেবের আবাসধন্য বহুতলের সামনে অ্যাটেনশন হয়ে লাইন লাগাতে থাকুন। ইত্যবসরে আমরা এই ডাকাত-বন্দনাটি গাইতে পারি—

এমন ডাকাত কোথাও খুঁজে পাবে না কোণে ভাই রে

কপাল খুলে যাবে যদি এমনি ডাকাত পাই রে!

নঈম সাহেবদের কাছে আমাদের সবিনয় প্রার্থনা : আপনাদের পরম শুভার্থী এই ডাকাতদেরকে পুরস্কারের ব্যবস্থাটা লুকিয়ে চুরিয়ে করবেন না। আমরা যেন সেই মহান দৃশ্য দেখে চক্ষু সার্থক করতে পারি। এবং, আশা করা যায় সং প্রতিদিন আপনাদের কল্যাণে তাদের একটি রঙিন ছবি প্রথম পাতায় ছাপবে। ক্যাপশন হবে—ভীত ডাকাত-সর্দার, সজ্জন্ত সাকরেন্দরা।

—ভূতলেন্দু ভৌমিক

কাটুন : সুশান ভূইয়া



আমি ফেউ যত চামারের

মৈনাক মিত্র



আমি ফেউ যত চামারের আর ভোটোরের
আর ক্যাডাবের
ঘুঘু ছাতারের
আমি ফেউ সব দাদাদের।

আমি ফেউ যত মদের আর ধন্দের;
বিবেক-পোকার দ্বন্দের যত সন্দের তরে ভাই
সময় কোথায় পাই!

প্রিয়া মাগে ভাই ডিস্কোর থেক
বন্ধুরা মাগে 'মাল'

পাতালপুরীর আমচা চামচা
তোলা না পাইলে তুলিবে পিঠের ছাল
দুরন্ত হৃদি মদের দোকানে বাঁধা যে পড়িতে চায়
নেহারি আলসে স্কচ রাম জিন—
পয়সা নাই যে হয়।

মনের বাসনা পুরাতে মাখাই
এর-তার পায়ে তেল
এর কাছে আর তার কাছে খেলি
কুচুটেপনার খেল
লুকানো লাদুল সদর্পে ধরি তুলে
মিথ্যে ক'ব না, মাঝে মাঝে যায় আপনার কাছা খুলে।

নোনাধরা ভাঙা জানালায় বুঝি
পেঙ্গির ছায়া নাচে
আমার প্রেমের অশ্বভিষ
ঝোলে দেখি গাছে গাছে।
দীপহীন রাতে সেই ডিম হতে
বেরোয় ঘোড়ার ছানা
তাই দেখে আমি, কী আর বলিব,
আত্মসে আটখানা।
সে ছানাগুলিরে ধরিবে যে চাল কই
নেতাদের আর দাদাদের তরে ক্ষতি রচিবার কাজে
ভীষণ ব্যস্ত রই।

আমি ফেউ ভাই চামারের আর ভোটোরের
আর ক্যাডাবের
ঘুঘু ছাতারের
আমি ফেউ সব দাদাদের।

চামারের মতো চামড়া ছাড়াই
ক্যাডাবের মতো ডাঙাই
কোন সে অজানা শ্রেণী শত্রুকে
বোমা মেরে করি ঠাণ্ডাই।
কাছা খুলে দিয়ে কোন সে মিছিলে
গলা ছিঁড়ে ফেলি চৈচিয়ে
কোন জমায়েতে নেচে নেচে গিয়ে
জনগণেশের পিলে চমকাই ভাই
লেংচিয়ে।

সারা দুনিয়াকে উদ্ধার করি, রাজা মারি আর
খাল কেটে রসাতল বানাই
ভগ্ন ভাগাড়ে চামারের নাতি
আপন হস্তে কামড়ায়—
সেইখানে আমি নাই।

দইয়ের হাঁড়িতে সমানে জিভ চাটিয়ে যাচ্ছে বেওসায়ীবন্দ—তারাও এখন বামাসক্ত।
তাই উদাস তাচ্ছিল্যে পি. এফ গ্রাচুইটি বোনাস না দেওয়ার ‘স্বর্ণকমল’ শিরোধার্য
করে চালিয়ে যাচ্ছে একটাই অনুশাসন—ঝোলাও তাল/ ব্যাগ তুলে পালা।

চরণ বৈরাগীর ইকড়ি মিকড়ি



লুঠ পড়েছে, লুটে-নে

সকালে খবরের কাগজ খুললেই প্রত্যহ চোখকে পীড়িত করে কয়েকটি পৌনপুনিক সমাচার। ব্যাঙ্ক অফিস এবং অধুনা পৌরসভায় ডাকাতি, পণবন্দী খেলা, তোলাবাজদের ঝামেলায় এবং অবশ্যই খুন—নানাবিধ খুন। সিপিএম-তৃণমূল, আর এস পি-সিপিএম, সিপিএম-জনযুদ্ধ, কামতাপুরী ইত্যাদি ইত্যাদি। পুলিশ জানায়—সব তদন্ত চলছে। দুষ্কৃতীদের ধরা না গেলেও, যাবে। অনেকেই অবশ্য বছরের পর বছর নো-পাঁজ থাকে পুলিশের ঘোষণায়। যদিও তাদের দিবি নিজ ঘরেই শোয়া-বসা অব্যাহত। আরো কিছু খবর প্রায়ই জনচক্ষু এড়িয়ে যায়—পুলিশের ছিনতাইবাজি, পুলিশের

ডাকাতি। নতুন সংযোজন—পুলিশের অবরোধ।

এ সবই কলকাতায়। পশ্চিমবঙ্গে। পশ্চিম বছর ব্যাপী লাগাতার বামপন্থী সঙ্কীর্ণতাবাদের “মরাদ্দানো”। সঙ্কীর্ণতা আসলে সঙ্কীর্ণতা হবে। চিন্তার, দৃষ্টির সত্যানুভবের। বস্তুত কালো ও অন্ধ না হলে এমন নির্লজ্জ বগল বাজানো দেউলিয়া সরকারের ব্যাপক মনন-দেউলিয়াপনার পক্ষেও লজ্জাজনক। নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময় এমন সম্ভাবনার সামান্যতম সঙ্কেতও কেউ দেয়নি। তাহলে হল, কেন?

আইন-শৃঙ্খলার লুপ্তি, কোষাগারের হাফকার, হলদিয়ার মাকাল প্রসব, দুর্গাপুরের কবন্ধপ্রাপ্তি ও আই টি নিয়ে ইটভাটা মার্কা কুমির-কুমির

খেলা—একসঙ্গে, যাকে বলে যুগপৎ, এমন বিপর্যয় কনসার্টের মহান কলাকার কে বা কারা? আরে, বৈরাগীরও নাস্তা হতে কিছু সময় লাগে। আর এ যে দেখা যাচ্ছে পলক না পড়তেই লেঙ্গুটি লোপাট! চব্বিশ বছর ধরে পলা-কবি-নীলা ধারণের মতো বামপন্থীর কর্মনাশা প্রোগ্রাম সর্বত্র বুজুকি ভাষণে আর রাধা নাচছে না। নাচবেও না। কেন নাচবে? ফ্যালো কড়ি ধরো লাল শালু—তেমন মুখ নয়কো কালু।

তবে নেপোরা খুব খুশি, মানে উদাসমুখর। পুজোব মণ্ডপে পাড়ায়—সর্বত্র একটাই প্রার্থনা: এমন সুদিন যেন বজ্রায় থাকে; হঠাৎ যেন ফিউজ না হয়। দুর্গা-কালী-জগদ্ধাত্রী-কর্তিক-ফেটু-নটে—সারা বছর মহোৎসব চলেছে চলবে। বাম জমানা মানে নিত্য পুজোর জমানা। পুজো পুজো পুজো চাই/ পুজো করেই খিচতে চাই! অথবা, গুতো গুতো গুতো দাও/ কাছা খুলে মাল কামাও।

এই নেপোদের চেনে? চেনে তো বটেই, তবে হয়ত সম্যক জানেন না। প্রধান নেপো তেনারা—যারা শ্রেষ্ঠ সংগঠিত দুষ্কৃতি, ঘুষখোর, লুঠেরা ও খুনি—পুলিশ বাহিনী। পুলিশের সর্বস্তরে এখন উদ্বাহ নৃত্য—ভজ বামপন্থী, হও বামপন্থী... যে জন বামপন্থা ভজে সে হয় আগা খান রে। দলে দলে দ্বন্দ্ব, নেতায় নেতায় ফন্দী, এর বন্দীকে সে ছাড়ায়, তার বন্দীকে এ—এমন লুঠের মওকা ঔর কভি নহি মিলেগা, কঁহী নহি মিলেগা।

আর এদেবই ডেপুটি হিসেবে জ্ঞানকবুল করে দাপিয়ে যাচ্ছে সো-কল্ড সমাজ বিরোধীরা। যারা পছন্দের দলীয় দাদার কাছে সমাজ সেবক। যেমন দুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও তার সাগরেদরা। রাজদেও গোয়ালার লাজলজ্জাহীন বারফটাই হস্তিত্বি টিভিতে প্রভূত ভাবে দীপিত। কলকাতার দিদি তাঁর আদরের ভাইদের জন্য চব্বিশপত্র টন দরে ছাপিয়ে রেখেছেন বোধহয়। জনতাব চাপে

পুলিশ ধরলেই স-সার্টিফিকেট দীর্ঘ বিবৃতি। ঘেরাওয়ের দাওয়াই তো আঁচলের খুঁটে বাঁধাই আছে। স্বপ্ন পূরণের জন্য চেয়ার জবর-দখল কবায় 'সুপার ডক্টরেট' কীর্তি বহু পূর্বে বিরচিত। হুডুম তোলার জন্য এমন উদ্যোগ ময়দান কোথাও খুঁজে পাবে নাকো, হ্যাঁ!

দইয়ের হাঁড়িতে সমানে জিভ চাটিয়ে যাচ্ছে বেওসায়ীবন্দ—তারাও এখন বামাসক্ত। তাই উদাস তাচ্ছিল্যে পি এফ, গ্রাচুইটি, বোনাস না দেওয়ার 'স্বর্ণকমল' শিরোধার্য করে চালিয়ে যাচ্ছে একটাই অনুশাসন—ঝোলাও তালা/ ব্যাগ তুলে পালা। ডানলপ, শওয়ালেস তো আকাশ থেকে পড়েনি। এই সঙ্গে অবশ্য স্বনিযুক্ত 'কালিদাস' শ্রমিক-নেতাদের কথাও মনে রাখা উচিত। যারা নিজেরা পরশ্রমজীবী (আসলে 'পিম্প') বলে কর্মীদের উৎপাদন না করে উপভোগের উদ্দামতায় উদ্ভুদ্ধ হতে উদ্দীপ্ত করে। যেহেতু নেতা, তাই কাণ্ডজ্ঞানহীন হতেই হবে। সেই সঙ্গে দেয়ালের লেখা পড়ার অক্ষরজ্ঞানশূন্যও। কিন্তু এদের বমবমা এই বামাবর্তে ছাড়া অন্যত্র কি সম্ভব? যে-কোনো সর্বভারতীয় 'বন্ধে' শুধু কলকাতাই বন্ধা থাকে, সারা দেশ সচল ও সক্রিয়। কারণ? কলকাতার চেতনা সম্পন্নতা! কুন্ডায়ও হাসে না!!

ভজ বামপন্থী, হও বামপন্থী, লহ
বামপন্থার নাম রে, যে জন বামপন্থা
ভজে সে হয় আগা খান রে।

দিগ্নি দূর-অস্থ—জানি। তবু দুব থেকেই টুকটি দেখতে দোষ কি। হবুচন্দ্র নীলামণ্ডলার লে লে বাবু, যা লেবে তাই পাবে বাবু, ধরলেই পাবে/ বাদ যাবে না, ফাঁক যাবে না—এমন আদর্শ ভোক্তাবাজি কোনো 'সবকার' দূরে থাক সাঁইজিও দেখাতে পারবে না।

কয়লাখনি কি সার ফ্যাঙ্করি, পাঁচতাবা হোটেল কি ব্যাঙ্ক, সঞ্চার যোগাযোগ থেকে পরিবহন, ভূতল ও গগনবিহারী—সব—স—ব—ই লে লে বাবুর ফর্দে আছে। ইউ টি আই ধসে কোটি মানুষের বুকের বায়ু শুষে নিয়েছে। ষড়যন্ত্রীমশাই দেশের অস্বাস্থ্য ঘটিয়ে বিদেশমন্ত্রী হয়ে গেলেন (জোয়ানদের কফিন নিয়ে কালোয়াতি খেলার কথা এই কলমে আগেই লিখেছি)। আর কি কখনো, কবে এমন সুসময় হবে। বাঙ্গাল, সুখবাম—নানা নামে নানা বেশে বারোবারেই দইয়ের হাঁড়ি চেটেপুটে সাবড়াচ্ছে।

আর এক দঙ্গল নেপোর কথাও ভোলা যাবে না। এঁরা হলেন মহামান্য সরকার বাদশার মান্যতর জামাই আই এ এস, আই পি এস। আসলে আই সি—ইম্মরালি করাণ্ট। কারো কারো মতে ওদের ইন্সটেন্টাইন পর্যন্ত করাণ্ট। সন্টলেকের জমি-বাড়ির আর ব্যক্তিগত বিস্ত বৈভবের দুর্গন্ধেই বোঝা যায়। এঁদের সন্তানেরা প্রায় অব্যতিক্রমী নিয়মে বিলেত-আমেরিকার স্থায়ী পড়ুয়া।

কেন না আই এ/পি এস-এ নাম উঠলেই নাকি গুঁদের সরকারি নিবাসে কুবের মশাই লক্ষ্মীর কুঞ্চি প্রতিষ্ঠিত করেন, যা পি সি সরকারের "ওয়টার অব ইণ্ডিয়ার" মতো রূপিজ অব ইণ্ডিয়ার অফুরন্ত জোগান দিয়ে যায়। যেতে বাধ্য। কারণ ষড়যন্ত্রীরা তো অনেকেই কলমের বদলে কোদাল বা

বল্লমে হাত পাকিয়ে দেবীলাল বা বাবড়িমাতা হয়েছেন। যাট-সত্তর দশকের মন্ত্রীমণ্ডলের তালিকার সঙ্গে এখনকার তালিকার গুণগত শিক্ষাগত পর্যালোচনা করলেই বোঝা যাবে ক্ষমতার অলিন্দে এখন কোন স্তরের মানুষের লক্ষ্যবস্তু। ঠিক সেই অনুপাতেই বেড়েছে ঘুষ জোচ্চবি লুঠপাট। এমনই চলবে। মাঠে।

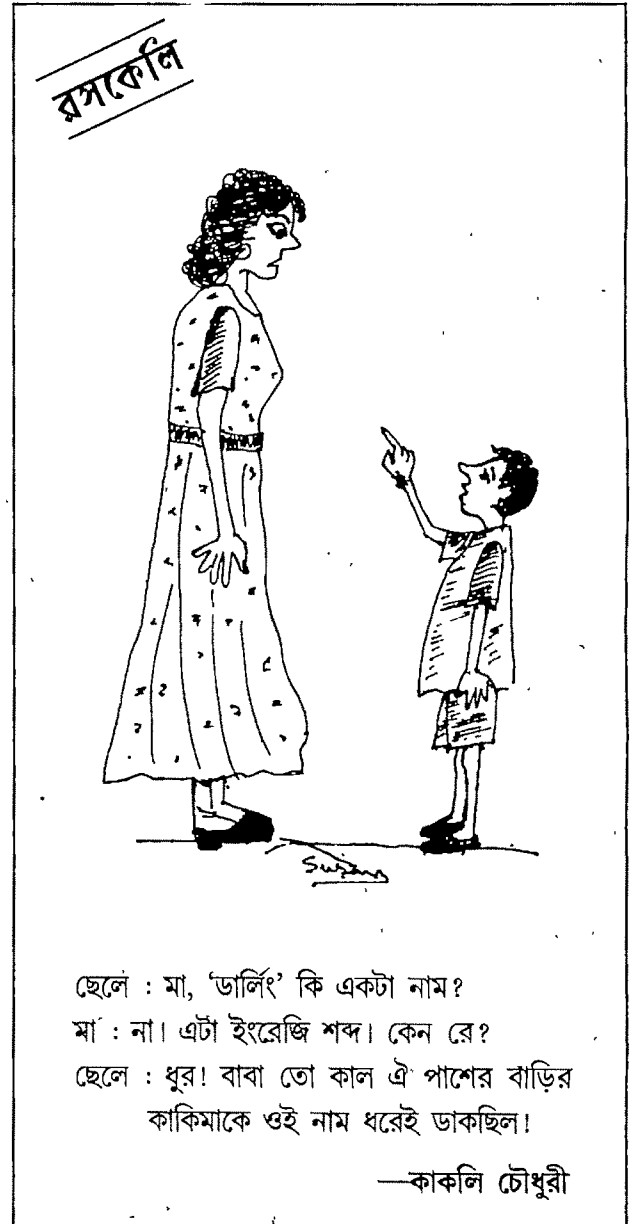
শাড়ি জামা গেরুয়া সবুজ বা লাল

হাতে রাখো ছোরা

দেশ ছুড়ে লুঠ পড়েছে লুঠ চলেছে

লুটে নেগো তোবা—

যদি এতেও না শানায়, সদ্য পরীক্ষিত গুজরাট মডেল রিপোর্ট করলেই
কেলা ফতে।



সঙ্কোচন

অচিন্ত্যকুমার চক্রবর্তী

এখন সর্বত্র সঙ্কোচনের হিড়িক। স্বভাবতই খবরের কাগজে সঙ্কোচন খবরের ছড়াছড়ি। কর্মীসঙ্কোচন চাই। আর তাই ছাঁটাই। বাদ দিন আর শুধু বাদ দিন। বাদ দিতে হবে, না হলে সব বরবাদ। একদিন হয়ত সত্যি সত্যিই কনের বিয়েতেও বর বাদ হয়ে যেতে পারে।

শুধু লোশ কমাতে হবে না। সুদ কমাও। পি এফ-এ হাত পড়েছে। সুদের হার ৯%। বারো থেকে কমে কমে নয়। এপ্রিল ফুল! চোখে সর্বেফুল।

বাড়িতে অবশ্য বহুদিন থেকেই সদস্য সঙ্কোচন শুরু হয়েছে। পিসি, কাকু নেই। বাবা নেই। মা থেকেও নেই। ঠাই নাই ঠাই নাই ছোট সে ফ্যাট। তাই ঠিকানা বৃদ্ধাশ্রম। নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি। হাম দো হামারা এক। একসময়ে এই দেশের এক মহিলা প্রধানমন্ত্রী অনেকবার চেষ্টা করে চেষ্টা করে বলেছিলেন—মা স্বস্তীর কপার যেন বাড়াবাড়ি না হয়। তখন সবাই অমনোযোগী ছাত্র। এখন লাইগেশনের লম্বা লাইন। পুলিশের লাঠিচার্জ।

এখনকার কমপ্লান বয়রা সব একাই একশ। গিমিকে দেখলে শতপুত্রের জননী মনে হয়। আহা বেচাবা! হাতে সময় নেই। কর্তার সঙ্গে খিটিমিটি। টাকা কম। বাজেট কমাও। কর্তার টিফিনে আলুভাজা, পরোটা নেই। সঙ্কোচন। শুধু শুকনো মুড়ি। অফিসের সহকর্মীর সাথে খেতে খেতে কথা—অন্যকিছু খেলে পেটে সয় না, তাই।

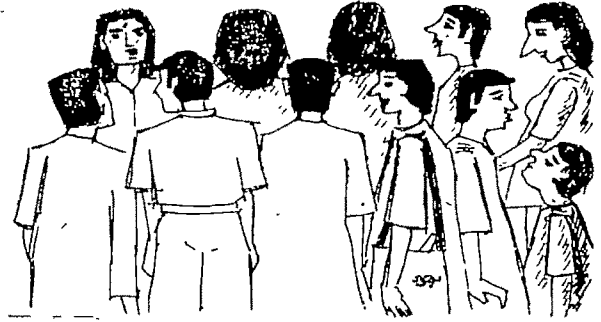
এখন কমপিউটারের যুগ। ইন্টারনেটের যুগ। সময় সঙ্কোচনের যুগ। দুরত্ব কমাও। লম্বা চিঠি? বোগাস! সময় কোথায়! টেলিফোনে আলাপ, প্রেম। অনুষ্ঠান কবে বিয়ে? না-না কক্ষনো না। ফালতু। অতবড় অনুষ্ঠান। না না। রেজিষ্ট্রি? চলতে পারে। না, মেয়ে রাজি নয়। দূর, ছাড়ুন তো! সবচেয়ে ভালো লিভ টুগেদার। কিছুদিন আমি তোমার, তুমি আমার। তারপর 'কে কার। কে কাব। ছাড়াছাড়ি। আবার অন্য কোথা, অন্য কোনখানে....

শর্টকাট চাই। অত বড় বই! না না, পড়া যাবে না। নোটস দিন স্যার। আর একটু ছোট স্যার। সঙ্কোচন চাই। কেটে কেটে ফতুয়া হয়ে গেল। হ্যাঁ, এবার ঠিক আছে স্যার। তবে লিখতে পারব না স্যার। একটু জেরক্স করে নি। ওরে বাবা! আবার সঙ্কোচন—না না, অতগুলো পারব না স্যার। হ্যাঁ, এই কটা মনে হচ্ছে—যাই একটু চেষ্টা করে দেখি এই পর্যন্তেগুলো মনে রাখতে পাবি কি না!

সঙ্কোচন সর্বত্র। পাত্রপাত্রী বিজ্ঞাপনে আটাশের তরুণী মেরেকেটে তেইস প্রাস। চুলও ছাঁটাই। বাংলা গান ভালো লাগে না। স্বত্বিকের গান। বাড়িতে সিঁহেসাইজার। গানের মাথটুকু থাক। বাকিটুকু গো হেল। মেয়ে পাড়ার ফাংশানে অন্তর্ভুক্তীতে পূবস্কার নিয়ে এসেছে। ড্যাড সেলিব্রিট করছে। আচ্ছ পাটি। পার্টিতে ব্রিডলেস আন্টিদের হাতে রঙিন পানীয়।

পেটমোটা রচনাবলী কাচবন্দী। সামনে দাঁড়িয়ে ছবি তোলা হয়েছে। উপন্যাসগুলো কখনো পড়া হয়নি। সময় কোথায়? একটু ছোট করলে হয় না? অবশ্য ছোটগল্প এক পৃষ্ঠা পড়তেই ঘুমে চোখ জড়িয়ে যায়। ধুর, এর

বই পড়ারো
নোটস দেওয়া হয়।



চেয়ে টিভি ঢের ভালো। নো জোগাড় নো কামেলা, ফার্স্টক্লাস সিরিয়াল। দু'শ পৃষ্ঠার বই তিরিশ মিনিটে শেষ।

দেশে কি বক্সসঙ্কটও চলছে? নাকি এখানেও সঙ্কোচন! বোধহয়! আধুনিক! ম্যাক্সি—মিডি—মিনি—মাইক্রো.....! কোথায় ঠেকবে? কাপড়-চোপড় দূর হঠাৎ! পরছি না, পরব না! জয় মা দিগম্বর! হে কৃষ্ণ, এবার তুমি কী করবে?

অথ সর্দারজি বার্তা

দিগম্বর দাশগুপ্ত

এক এক করে পাঁচ কন্যার পরেও আবার কন্যা হলে সর্দারজি পায় না ভেবে জানায় খবর কী যে বলে। তবুও সব আত্মীয়দের জানিয়ে দিল মিথ্যে করে পাঁচটি মেয়ের পরে এবার পুত্র আমার আসলো ঘরে। খবর পেয়ে আনন্দেতে আসল ছুটে আত্মীয়জন। সবার মুখে হাসির ছোঁয়া, ঘরে যেন খুশির প্রাণ। দেখতে এসে কোলে নিয়ে আদর করে জনে জনে ঘর ভরে যায় খেলনাপাতি, পোশাক-আশাক আর বাসনে। মুখ দেখে কেউ বলে, এ তো 'বাপের মতো কপালখানা' কেউ বলে, 'দেখ, চোখ দুটোতে বাপের আদল বোলো আনা। হাতের পায়ের গড়ন ও রঙ সেও পেয়েছে বাপের কাছে সবকিছুরই মধ্যে ছেলেব বাপের ধরন ছড়িয়ে আছে।' সবাই যখন বলছে এসব ঘটল তখন কাণ্ড মজাব পিসির কাপড় ভিজিয়ে দিলে, রয় কি বাকি কারো বোকাব... সবাই তখন ধরল চেপে—কারগটা কি মিথ্যে বলার? সর্দারজি মুচকি হেসে বললে তুলে জামার কলার—'আরে বাবা, সবকিছু কি পেতেই হবে বাবার কাছে? কিছু তোমার পেতেই পাবে—এতে কী আর বলাব আছে?'

ব্যাপার দেখে আমার তো যাকে বলে হেডে
খান্ডার। মানে আর কি, মাথায় বজ্রাঘাত।
এদিকে প্রভুর আহ্বান, দেরি হলে অসম্ভুট
হবেন। ওদিকে ঢেকির বেগড়বাই। কেস
কেলেক্কারিয়াস। আমি তো শা—মানে আর
কি যাকে বলে পুরো নার্ভাস।

মারায়ণ

পিনাকীশঙ্কর চৌধুরী



পূর্বকথা

গোলোক—১

মনে মনে প্রভুর হইল অভিলাষ
এক অংশে চাবি অংশ হইবে প্রকাশ।
—কৃষ্ণিবাস।

স্কীরোদ সমুদ্রে অনন্তনাগের বিড়িপাকের
উপর গা এলিয়ে দিয়ে তারই ফনায় হেলান
দিয়ে অনন্ত শয়নে শুয়ে আছেন স্বয়ং নারায়ণ।
পাশে বসে নারায়ণী তাঁর পায়ে ম্যাসেজ করছেন।
শুদ্ধ ভাষায় পদসেবা। করছেন তো করছেন,
করেই চলেছেন। সত্য ত্রোতা দ্বাপর পার হয়ে
কল্লিযুগও প্রায় শেষ হতে চলল। নারায়ণীর
ম্যাসেজ কবা আর শেষ হয় না। যেমনই অনন্ত
শয্যা তেমনই অনন্ত ম্যাসেজ। কতদিন কত
বছর পার হয়ে গেল তার খবর কে রাখে।
নেহাৎ নারায়ণের ঘরে কোনো ঘড়ি পাঁজি নেই
তাই মাস রছরের হিসেব রাখা সম্ভব হয়নি।
তবু কল্লিযুগ আর মনুবদলের হিসেব ধরলে
বেশ অনেক কালই হয়ে গেল।

নারায়ণীও তো বয়স হয়েছে। কত আর

পারেন। একটু আধটু আলস্য আসে বই কি।
মাঝে মাঝে একটু ঘুমও ধরে। নারায়ণী নারায়ণের
নজর এড়িয়ে টুক করে একটা ছোট্ট হাই তুললেন।
নারায়ণী লুকোলে কি হবে, এই ছোট্ট হাইটুক
কিন্তু নারায়ণের নজর এড়াল না। যতই হোক
তিনি তো নারায়ণ। সমস্ত বিশ্বের সবকিছুর
উপর তাঁর কড়া নজর। মহাকাশে মহানক্ষত্রের
মহাবিস্ফোরণ থেকে ক্ষুদ্র পৃথিবীর অঙ্গরাজ্য
বঙ্গদেশে অতিক্ষুদ্র মশকদংশন পর্যন্ত সবকিছুই
প্রতিনিয়তই প্রতিফলিত হচ্ছে তাঁর নখদর্পণে।
কাজেই তিনি নারায়ণীর এই ছোট্ট ফাঁকিটুক
ধবতে পারবেন না, তাই কি কখনো হয়?

নারায়ণ মুচকি হেসে বললেন,—দেবী, তুমি
বেশ পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছ। আমার মনে হয়
তোমার এখন একটু বিশ্রাম নেওয়া দরকার।

নারায়ণী মুখ কঁচকে বললেন—হুঁ। আমার
আবার বিশ্রাম। আমি বিশ্রাম নিলে তোমার
পদসেবা কে করবে ওনি।

—কিছুদিনের জন্যে এই কাজের ভারটা
অন্য কারো ওপর অর্পণ করা যেতে পারে।

নারায়ণী ফৌস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে

বললেন—বুঝছি। আমার পদসেবা তোমার
আর ভালো লাগছে না। আমি বুড়ি হয়ে গেছি
তাই আমার হাতের সেবা তোমার এখন এক্ষেত্রে
লাগছে। তাছাড়া তোমার মনের কথা কি আব
আমি বুঝি না? তোমার এখন মন টেনেছে সেই
বিদ্যেধরীর দিকে। আমাকে ঘুম পাড়িয়ে তুমি
এখন কিছুদিন সেই বিদ্যেধরীকে নিয়ে থাকতে
চাও।

এই সেরেছে। নারায়ণ বলতে চাইলেন কী
আর নারায়ণী বুঝলেন কী। নারায়ণ চেয়েছিলেন
দেবীর প্রতি সমবেদনা জানিয়ে তাঁকে আরাম
দিতে আর দেবী ওটাকে ধরে নিলেন বিদ্যেধরীর
প্রতি নাবায়ণের টান। যাকে বলে উন্টা বুঝলি
রাম।

রাম নারায়ণের নিজেরই এক অবতাবেব
নাম। সে নাম একবার নিলে শতকোটি ভূত আর
সহস্র কোটি পাপ একসঙ্গে বাপ বাপ করে
পালাতে পথ পায় না। যদিও সে নামের শরণ
নেবার কথা মর্ত্যবাসীদের, নারায়ণের নয়, তবু
নারায়ণীর ঝাপড় খেয়ে নাবায়ণকে নিজের
অজান্তেই সেই নামের শরণ নিতে হয়। একেই

বলে কপাল।

নারায়ণ মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। নারায়ণী বিদ্যেধরী বলতে বোঝাতে চাইছেন সরস্বতীকে। এই হয়েছে এক বিপদ। অনন্তকাল ধরে চলেছে লক্ষ্মী-সরস্বতীর কৌদল। সরস্বতী নারায়ণীর বোন। সম্পর্কে নারায়ণের শ্যালিকা। মহিলাটি অশেষ গুণবতী। নিজের চেষ্টাতেই অনেক লেখাপড়া শিখেছেন। কোনো বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে পড়াশুনা করতে হয়নি। দেবগুরু বৃহস্পতি ছিলেন তাঁর গৃহশিক্ষক। সেই গুরুকুল বিদ্যাতেই টাইটুধুর। মহিলার মাথা এতই চোখা আর বুদ্ধি এতই তীক্ষ্ণ যে কোনো পড়াই একবারের বেশি দু'বার দেখিয়ে দিতে হয়নি। টপ টপ সব কিছু শিখে নিয়ে সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী হয়ে সর্বজ্ঞানের অধীশ্বরী হয়ে বসে আছেন।

সরস্বতীর বিদ্যাশিক্ষা সম্পূর্ণ হয়ে যাবার পর নারায়ণ তাঁকে একটা চাকরি নিতে বলেছিলেন। চাকরি বলতে যেমন তেমন কলমপেয়া চাকরি নয়। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁকে ভালোরকম সম্মানদক্ষিণা দিয়ে দেবলোকের গ্রন্থাগারের প্রধানা গ্রন্থাগারিক করে দিতে চেয়েছিলেন। কিংবা সরস্বতী চাইলে একটা নতুন বিশ্ববিদ্যালয় খুলে তার আচার্য্যও করে দিতে রাজি ছিলেন। নারায়ণের মনে মনে ইচ্ছে ছিল, দেবী যদি একটা চাকরি নেন তবে একটা ভালো পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন। যতই হোক, বড় জামাইবাবু হিসেবে নারায়ণই তো তার অভিভাবক। সরস্বতীর তো কোনো বাবা নেই। দেবতাদের সাধারণত কোনো বাবা-টাবা হয় না। আর সে রকম কোনো বাবা থাকলেও তিনি তো তাঁর দৈবীশক্তি খাটিয়ে কিংবা স্বর্গীয় তেজকে পুঞ্জীভূত করে স্রেফ শূন্য থেকে একটি মানস-সন্তানের জন্ম দিয়েই খালাস। এরপর বাবা হিসেবে তিনি আর সেই সন্তানের দেখভালের দায়িত্ব নিতে আগ্রহী থাকেন না।

নারায়ণ দায়িত্ব নিতে রাজি হলে কি হবে, ওদিকে লেখাপড়া শিখে সর্বজ্ঞানের অধীশ্বরী হয়ে সরস্বতীর মাথা ঘুরে গেল। নারায়ণের অনুরোধ, বৃহস্পতির উপদেশ, ইন্দ্রের প্রস্তাব—কিছুই মানলেন না। তিনি গৌঁ ধরে বসে রইলেন—চাকরিও করবেন না বিবাহও করবেন না। চাকরি নিয়ে দশটা-পাঁচটা অফিসে হাজিরা দেওয়া কিংবা লক্ষ্মীর মতো বিয়ে করে গৃহবধু হওয়া কোনোটিই তাঁর পোষাবে না। বিয়ে করলে একমাত্র কাজ হবে অনন্তকাল ধরে স্বামীদেবতার পদসেবা করে যাওয়া আর চাকরি নেওয়া গণেশের অবস্থা তো চোখের সামনে দেখতেই পাচ্ছেন। কুবেরের ঘরে খাতা লেখেন আর মাইনে হিসেবে পান তাঁর ইন্দ্রের জন্যে কিছু খুদ। এর মধ্যে গণেশ তো কিছুদিন পাঁচটাইমও খেটেছেন। প্রথম চারটে বেদ মুখে মুখে চলে যাবার পর ছাপরে এসে বেদব্যাস যখন পঞ্চম বেদ মহাভারত রচনা করতে গেলেন তখন সেটা লিখে রাখার দরকার হল। কে লিখবে? লেখার ভারটা গিয়ে পড়ল গণেশের ওপর। বেদব্যাস মুখে বলে যাবেন আর গণেশ সেটা লিখে নেবেন। তার মানে স্টেনোগ্রাফারের চাকরি। দেবতা হয়ে শেষ পর্যন্ত মানুষের চাকরি। ছা।

শেষ চেষ্টা হিসেবে নারায়ণ সরস্বতীকে বোঝাতে গেলেন—তাহলে তুমি সারা জীবন কী করবে? দেবী হিসেবে তোমার জীবন তো অনন্ত।

—আমি বিনা পারিশ্রমিকে ভুলোক দুলোক দেবলোক মর্ত্যলোক—সর্বলোকে জ্ঞান বিতরণ করে বেড়াব। আর অবসর সময়ে বীণা বাজাব।

—কিন্তু দেবী, দেবলোকে কেউ তো বিদ্যাশিক্ষার ধার ধারে না। তারা সব মহাপণ্ডিত হয়েই জন্মায়। অন্তত নির্জেরা তাই মনে করে। জন্মের

সময় যা শিখে এসেছে তার বাহিরে তারা এক চুলও নড়বে না। নতুন করে কিছু শিখবেও না। তাদের তুমি আর কী জ্ঞান দেবে?

—ঠিক আছে। আমি মর্ত্যলোকেই শিক্ষা বিস্তার করব। তারা তো শিখবে। মর্ত্যে এমনিতেই একটা প্রবাদ আছে—কেউ মায়ের পেট থেকে কিছু শিখে আসে না। সুতরাং করে-কন্মে খাবার জন্যে আমার কাছে শিক্ষা গ্রহণ করতে তারা বাধ্য।

—কিন্তু দেবী, সেক্ষেত্রে তো তোমাকে সারাক্ষণ মর্ত্যলোকেই ঘুরে বেড়াতে হবে। তুমি দেবলোকের বাসিন্দা। দেবলোক ছেড়ে মর্ত্যলোকে থাকতে হলে সেখানকার শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষায় তোমার যথেষ্ট কষ্ট হবে। মর্ত্যলোক তো দেবলোকের মতো পুরোপুরি বাতানুকূল নয়।

—তার ব্যবস্থাও আমি করে নেব। সারা বছর ধরে আমি কিছুই শেখাব না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বছরের শেষে পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। ছাত্ররা সারা বছর ধরে খেলাধুলা রাজনীতি রকবাজি—ধর্মঘট এইসব করে বেড়াবে আর পরীক্ষার আগের দু'মাস শুধু পাশ করার জন্যে কিছু নোট মুখস্থ করবে। আমি ওই দু'মাসই মাত্র মর্ত্যলোকে থাকব। তাতেই হবে। বছরের বাকি দশমাস আমি উদয়শিখরে বসে টুং টাং করে বীণা বাজাব।

অতিজ্ঞানবতী সরস্বতীর সঙ্গে কুট তর্কে নারায়ণ পারলেন না। সরস্বতীকে তাঁর ইচ্ছেমতো কাজ করতে দিতেই হল। সরস্বতী যা চেয়েছিলেন সেইমতো ব্যবস্থাই চালু হল। আজও সেটাই চলছে।

সরস্বতীর এই ধিস্পিনা নারায়ণীর একদম সহ্য হয় না। নিজে আইবুড়ো অবস্থায় থাকতেন পাতালে একেবারে অসুস্থস্পন্দ্য হয়ে। সমুদ্র মছনের সময় ভাই মৈনাকের কাতুকুত খেয়ে উঠে এলেন। এসেই নারায়ণের ঘরগী। সেই থেকে একাগ্র চিন্তে নারায়ণের পদসেবা করে চলেছেন। সরস্বতীর ব্যাপারগুলোকে তিনি বলেন, জগু। কৃষ্টির নাম করে সরস্বতী মর্ত্যলোকে যা করে বেড়াচ্ছে তার তাড়া তো মাইক-যন্ত্রের কল্যাণে মাঝে মাঝে বৈকুণ্ঠেও এসে নাড়া দিচ্ছে। ম্যাগো। সেসব গানের কী সুর, কী ভাষা। শুনে গা বমি বমি করে। নিজের বোন হলে কি হবে সরস্বতীকে তিনি একদম সহ্য করতে পারেন না। আর নারায়ণ যে সরস্বতীর জ্ঞানবিদ্যায় এত মুগ্ধ সেটাও নারায়ণীর সহ্য হয় না। তাই সুযোগ পেলেই তিনি নারায়ণকে সরস্বতীর নাম করে খোঁটা দেন। আজও দিলেন।

নারায়ণীর কাছে এরকম খোঁটা খাওয়া নারায়ণের অভ্যাস আছে। এ ব্যাপারে নারায়ণ নারায়ণীকে একটু অনুরাগ মিশ্রিত প্রশ্রয়ই দিয়ে থাকেন। আহা বেচারা। কারকে আঘাত করার জন্যে ওর হাতে অস্ত্র বলতে তো কিছুই নেই। এক হাতে পদ্ম আর অন্য হাতে কাড়ির কাঁপি নিয়ে মর্ত্যলোকের সন্তানদের কেবলই অন্ন বিতরণ করে যাচ্ছে। মর্ত্যবাসীরা একবার মা মা করে ডাকলেই আর রক্ষে নেই। দেবীর অন্তর করুণায় বিগলিত হয়ে যায়। কারকে কোনো রকম আঘাত করার কথা ভাবতেও পারেন না। রাগ অভিমান আদর আদার বলতে যা কিছু সবই ওই নারায়ণের ওপরে। মাঝে মাঝে কিছু খোঁটা দিয়ে আনন্দ পান। নারায়ণীর এই মধুর অত্যাচারটুকু নারায়ণও হাসিমুখেই সহ্য করেন। নারায়ণীর খোঁটা দেওয়া কথটার উত্তরে মুচকি হেসে বললেন—না, তা কেন। তোমার বিশ্রাম কালে আমার সেবা করার জন্যে তুমিই একজন দাসী ঠিক করে দাও।

নারায়ণী বজ্ঞার দিয়ে উঠলেন—ঠিকে কাজের লোক আমার একদম পছন্দ নয়। ঘড়ি ধরে আসবে ঘড়ি ধরে যাবে। তার ওপরে আবার ট্যান্ডস ট্যান্ডস করে কথা শোনাবে। ওসব আমি সহিতে পারি না। তাছাড়া আমি

ঘুমিয়ে থাকলে কোনটা কি হাতসাফাই করে তারই বা কী ঠিক আছে?

নারায়ণ মনে মনে হাসলেন।—ওয়ে তো আছি সাপের বিড়িপাকের ওপরে। চারদিকে শুধু জল আর জল। এখানে হাতসাফাই করার মতো আছেই বা কি আর নেবেই বা কি। কোথাও কিছু নেই, তবু সন্দেহ। এটাই স্ত্রী জ্ঞাতির ধর্ম। শাস্ত্রে এইজন্যেই বলেছে—স্ত্রীয়াশ্চরিত্রম্ ইত্যাদি ইত্যাদি। যাকগে। ওসব কথা মনে ভাবাও পাপ। মুখে বললে তো আর সেখতে হবে না। স্কীরোদ সমুদ্রের জল তোলপাড় হয়ে যাবে। নারায়ণ ওসবের ধার দিয়েও গেলেন না। মুখের ভাষায় অনেকখানি মাখন মাখিয়ে বললেন—দেবী, তোমার পরিশ্রম লাঘবের উদ্দেশ্যেই আমার এই কথা বলা। এখন তোমার অভিরুচি।

নারায়ণী এবার নরম হলেন। বললেন—পদসেবা করতে আমার বিন্দুমাত্র কষ্ট হচ্ছে না। তবে বয়স হয়েছে বলে মাঝে মাঝে কোমরটা একটু কনকন করে ওঠে। মাঝে মাঝে একটু পরিবর্তন হলে একটু ভালোই লাগত। তা হ্যাঁগো, অনেক দিন তো একভাবে চলছে। চলো না কিছুদিন কোথাও একটু বেড়িয়ে আসি। জল-হাওয়ার পরিবর্তন হলে শরীরটা সারবে আর মনটাও ভালো লাগবে।

নারায়ণ বললেন—দেবী, বেড়াতে যাবার জায়গা বলতে তো আছে একমাত্র মর্ত্যলোক। সেখানে ত্রেতাযুগে একবার গেছিলাম রাম হয়ে, তারপর দ্বাপরে গেছিলাম কৃষ্ণ হয়ে। পুণ্যভূমি আর্যাবর্তের লোকেরা আজও সেই রাম আর কৃষ্ণের নাম নিয়েই আছে। শুধু তাই নয়, আমার মানবজন্মের জন্মস্থান নিয়েও মাঝে মাঝে হৈ হৈ বিবাদ-বিসম্বাদ ধুন্ধুমার কাণ্ড ঘটিয়ে দিচ্ছে। অবস্থা এতই জটিল যে এখন আমি যদি মানবজন্ম নিয়ে পৃথিবীতে যাই তবে আমাকেও ওইসব ধুন্ধুমারের সামিল হতে হবে। ওদিকে আবার একেই তো মর্ত্যভূমি আমাদের কাছে পুরনো হয়ে গেছে, তার ওপর অবস্থারও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। পুণ্যভূমি এখন আর সে পুণ্যভূমি নেই, মর্ত্যলোকবাসীরা এখন আর দেবতা-টোবতাদের ততটা রোয়াত করে না। যে কোনো মুহুর্তে একটা কেলেকারি হয়ে যাওয়া বিচিত্র কিছু নয়।

নারায়ণী বললেন—সেকি গো? তোমার মনে এরকম ভয়, ঢুকে যাওয়া তো ভালো কথা নয়। তুমি জগদীশ্বর, তোমার ভয়ই বা কি আর চিন্তাই বা কি? তুমিই তো মর্ত্যলোকে গিয়ে বলে এসেছ—যদা যদা হি ধর্মস্য—আবো কী কী যেন সব? যার মানে দাঁড়ায়, যখনই মর্ত্যলোকে বদমাইস বেড়ে যাবে তখনই তুমি জন্মগ্রহণ করে তাদেরকে শাস্তোস্তা করবে। তাহলে এখন পিছোচ্ছ কেন? তোমার এরকম ভয় শোভা পায় না।

নারায়ণীর কথায় নারায়ণ একটু লজ্জা পেলেন। মনে মনে ভাবলেন, নারায়ণীর কাছে বেক্ষাস কথাটা বলে ফেলা ঠিক হল না। এবার থেকে কথায়বার্তায় আরো সাবধান থাকতে হবে। অবস্থা সামাল দেবার জন্যে কথা ঘুরিয়ে বললেন—আমি তো আমার কথা ভেবে চিন্তিত হচ্ছি না, আমি চিন্তিত হচ্ছি তোমার কথা ভেবে। কলি যুগে আর্যাবর্তের সমাজে নারীর অবস্থান এবং ভূমিকা আর আগের মতো নেই। অনেক বদলে গেছে। তুমি আগের দু'বারের একবার জনক রাজার মেয়ে আর একবার বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের মেয়ে হয়ে জন্মেছিলে। এ যুগে তো রাজ-রাজড়া বলে কিছু নেই। তাছাড়া যে যত বড়লোকের বাড়ির মেয়েই হোক না কেন সে যুগের মতো আরামে গান গেয়ে মালা পরে পালকে শুয়ে দিন কাটাতে পারবে না। আজকাল একদিকে যেমন পুরুষদের সমান মর্যাদা তেমনি নারীদেরও

পুরুষদের মতো সমানে ইস্কুল-কলেজে পড়াশুনা করতে হয়, পরীক্ষায় পাশ করে ডিগ্রি নিতে হয়, অফিস-কাছারি কল-কারখানায় কাজ করতে হয়। মানবী জন্ম নিলে তোমাকেও ওইসব করতে হবে।

ইস্কুল-কলেজের কথাটায় নারায়ণ ইচ্ছে করেই জোর দিলেন। তিনি জানেন এইখানটায় নারায়ণীর বিশেষ দুর্বলতা আছে। ইস্কুল-কলেজে পড়া মানেনি তো সেই ছোটবোনের তাঁবেদারি। হলই বা মানবী জন্ম, তাই বলে সরস্বতীর শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেওয়া, সেটা নারায়ণীর সইবে কি? নারায়ণীর মন বোঝার জন্যে নারায়ণ একটু থামলেন। কিন্তু নারায়ণী বিশেষ আমল দিলেন না। নারায়ণের গল্প শোনার জন্যে চোখ বড় বড় করে তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন।

নারায়ণ বলে চললেন—এর চেয়েও বড় কথা হল এই যে, কলি যুগে আর্যাবর্তের মানুষের নীতিবোধ ন্যায়-নিষ্ঠা একেবারে তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। নারীর সম্মান বলতে সেখানে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। বাস্তবঘাটে যত্রতত্র সুযোগ পেলেই এখন নারীর শ্রীলতাহানি হয়ে যাচ্ছে। তার জন্যে স্থান-অবস্থানের বিচার নেই। সিনেমা হল রেন্টোরা রেলস্টেশন ইস্কুল-কলেজ এমনকি মন্দির পর্যন্ত বাদ যাচ্ছে না। সকালবেলা খবরের কাগজ খুললেই দেখবে তার আগাপাশতলা এইসব কেচ্ছা-কেলেঙ্কারিতে ভর্তি। ত্রেতা যুগে রাবণ তোমাকে ইলোপ করে নিয়ে গিয়ে লঙ্কায় অতদিন আটকে রাখল, কিন্তু শ্রীলতাহানির কোনো ব্যাপারই ছিল না। আর আজকাল যে কোনো জায়গায় নারীর ইচ্ছত লুঠ করা তো পাঁচমিনিটের মামলা। সত্যি কথা বলতে কি, ত্রেতায় ছিল একজন রাবণ, কলিতে হিন্দুস্তানে ঘরে ঘরে রাবণ। বিশেষ করে আমি যখন তোমার কাছে থাকছি না তখন আশঙ্কা তো যোলো আনার জায়গায় আঠারো আনা।

নারায়ণের কথার মধ্যেই নারায়ণী যে হাতদুটো দিয়ে নারায়ণের পদসেবা করছিলেন সে দুটো চেপে বসে গেল তাঁর পায়ে। নারায়ণী তোতলাতে শুরু করলেন—সে-ককি গো! ততুমি থ-থাকবে না কেন? তুমি কি মর্ত্যলোকে গিয়ে আমাকে ছেড়ে অন্য কারো সঙ্গে জীবন কাটিয়ে আসবে নাকি? তাহলে আমার দরকার নেই বাপু মর্ত্যলোকে বেড়াতে যাবার। আমি এই বেশ আছি। এখানেই থাকব।

নারায়ণ নারায়ণীকে প্রবোধ দিয়ে বললেন—দেবী তুমি আমাকে ভুল বুঝছ। তোমার কি মনে নেই যে মর্ত্যলোকে বিচ্ছেদটাই আমাদের লীলা? প্রথমে বিচ্ছেদ, তারপর দুষ্কৃতীর নিধন, শেষে আমাদের মিলন। আমরা এইরকম ভাবেই মর্ত্য লীলা করে এসেছি। সুতরাং নিশ্চয় এবারেও তাই হবে। তা যদি না হয় তবে তো লীলা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

এরপর নারায়ণ চোখে একটু কানাত মেরে বললেন—মাঝে মাঝে একটু-আধটু বিরহ শরীব-স্বাস্থ্যের পক্ষেও ভালো। মনের পক্ষে তো বটেই। এখানে অনন্তশয্যায় আমরা তো পরস্পরকে স্পর্শ করেই আছি। মতলীলায় গিয়ে একটু ছাড়াছাড়ি হলে আমার মনে হয় আমাদের প্রেমটা আরো প্রগাঢ়ই হবে।

কথা শুনে নারায়ণী একটু লজ্জা লজ্জা গলায় আদরের ধমক দিয়ে বললেন—যাও। মুখের আর আগল বাঁধন বলে কিছু নেই। বয়স কত হল খেয়াল আছে? নেহাৎ ছেলপুলে হয়নি, তাই। নাহলে তো নাতিপুতি, তাদের নাতি আর তাদের পুতিতে ঘর থৈ থৈ করত।

নারায়ণের মশকরায় নারায়ণী মুখে হাসি ফুটল। আর নারায়ণীর হাসি মানে তো উদয় দিগঙ্গনে নবরঞ্জনছটা। সেই ছটায় সব অন্ধকার দূর হয়ে

গেল। সৃষ্টি আলোকিত হয়ে উঠল। সব আশঙ্কা সব সন্দেহ ফুৎকারে উড়ে গেল। নারায়ণীর হাসিতে নারায়ণও প্রফুল্ল। বললেন—তাহলে সেই ব্যবস্থা করি। নারদকে ডেকে আমাদের মর্ত্যলোকে যাবার ব্যবস্থা করতে বলি। নারায়ণীর অনুমতি নিয়ে নারায়ণ নারদকে স্মরণ করলেন।

গোলোক-২

এইরূপে বৈকুণ্ঠে আছেন গদাধর।
হেনকালে চলিলা নারদ মূনিবর।।
বীণায়ন্ত্র হাতে কবি হরি গুণগান।
উত্তরিলা গিয়া বৃন্দী প্রভু-বিদ্যবান।।

—কৃষ্ণিবাস।

ঘণ্টাখানেক পরে নারদ 'নারায়ণ নারায়ণ' করতে করতে এসে উপস্থিত হলেন। এতক্ষণ অপেক্ষা করে নারায়ণ একটু অধৈর্য হয়ে উঠেছিলেন। নারদকে দেখে বললেন—বৎস নারদ, তোমার এত দেরি হল যে? আগে তো এত দেরি হত না। তখন স্মরণ করা মাত্রই চলে আসতে। আরু কী হল? তুমি কি ঘুমিয়ে পড়েছিলে? নাকি আমার আহ্বান তোমার কাছে পৌঁছতে দেরি করেছে? আমার নির্দেশ তো আলোকের বর্গগতিতে শক্তির আধারে যাতায়াত করে। তার তো দেরি হবার কথা নয়। তাহলে কি আমার অজ্ঞাতে কোথাও কোনো বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে? আভূমি দণ্ডবৎ হয়ে নারদ বললেন—অপরাধ নেবেন না প্রভু, আমি ঘুমিয়ে পড়িনি, আপনার আহ্বানও আমি সঙ্গে সঙ্গে পেয়েছি। কিন্তু তবু যে আমার আপনার কাছে পৌঁছতে দেরি হয়ে গেল তার কারণ আমার এই বাহনটির গুণগোল। টেকিটা বহুদিনের পুরনো হয়ে গেছে। কলকজাগুলো মাঝে মাঝেই খ্যানা কিচ্ কিচ্—বলেই নারদ দু'হাত দিয়ে নিজের নাক-কান মলে নিয়ে বললেন—মানে আর কি, একটু গড়বড় হয়ে যায়। এই তো, আপনার আহ্বান শুনে টেকি চালিয়ে আলোর গতিতে আসছিলাম; চন্দ্রলোকের কাছাকাছি এসে মাঝ আকাশে হঠাৎ গৌঁ গৌঁ শব্দ করে মেশিনটি বেলিয়ে—বলেই নারদ আবার জিব কেটে নাক কান মলে বললেন—মানে আর কি বন্ধ হয়ে গেল। ব্যাপার দেখে আমার তো যাকে বলে হেডে থান্ডার। মানে আর কি, মাথায় বজ্রাঘাত। এদিকে প্রভুব আহ্বান, দেরি হলে অন্তঃস্থ হবেন। ওদিকে টেকির বেগড়বাই। কেস কেলেকারিয়াস। আমি তো শা—মানে আর কি যাকে বলে পুরো নার্ভাস। শেষে কোনোরকমে জোড়াতালি দিয়ে টেকি চালু করে তারপর এখানে এসে পৌঁছলাম।

—তা তো পৌঁছলে। কিন্তু বৎস নারদ, তোমার কী হয়েছে? তোমার মুখ দিয়ে এত অশাস্ত্রীয় অসংযুক্ত কথা বের হচ্ছে? আগে তো এরকম ছিলে না।

গলবস্ত্র হয়ে নারায়ণকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করার জন্যে নারদ বস্ত্রের খোঁজে নিজের দেহের এদিক-ওদিক হাতড়ালেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় নারদের উদ্ভাসে খানকয়েক রুদ্রাঙ্কের মালা ছাড়া আর কিছুই পরা নেই। শেষে নারদ হাতের বীণায়ন্ত্রটিকেই গলবস্ত্রের মতো করে ঘাড়ের কাছে তুলে ধরে নারায়ণের পায়েব কাছে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লেন,—অপরাধ নেবেন না প্রভু, আজকাল পৃথিবীর ভাষাই এইরকম হয়ে গেছে। সবাই এরকম ভাবেই কথা বলে। ক্রমাগত তাই শুনে শুনে হঠাৎ হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে ওই ভাষাটাই বেরিয়ে পড়ছে। আপনি আমায় ক্ষমা করুন প্রভু।

অন্য যে-কেউ গুরুকম উপড় হয়ে শুয়ে পড়লে ক্ষীরোদ সমুদ্রেব জলে তলিয়ে যেত। কিন্তু নারদ তো, তাই ডুবলেন না। বরং নারায়ণের কৃপা আদায়ে সক্ষম হলেন। নারায়ণ প্রশংসার হাসি হাসলেন। নারদ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

—তোমার টেকিবাহনের কথা কী বলছিলে?

—আপনি তো জ্ঞানেন প্রভু, আমার টেকিবাহনটি খুবই পুরাতন হয়ে গেছে। তাই এর যন্ত্রপাতি মাঝেমাঝেই অচল হয়ে পড়ছে। কিন্তু সেগুলো বদলাতে পারছি না, কারণ বাজারে অনুযঙ্গ যন্ত্রাংশের বড়ই অভাব।

—অনুযঙ্গ যন্ত্রাংশের অভাব কেন?

—প্রভু, পৃথিবী থেকে টেকি প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আজকাল টেকিতে কেউ ধান ভানে না, চিড়েও কোটে না। টেকির সেই স্বর্ণযুগ আর নেই। সে যুগে টেকি ছিল মানব জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, তা সে সামাজিক জীবনই বলুন আর গার্হস্থ্য জীবনই বলুন। গ্রামের মেয়েদের কুট-কচালি, রাজনীতি, লাগানি-ভাঙানি সবই হত ওই টেকির ঘরে। টেকি মানুষের এতই প্রিয় ছিল যে ঠাকুরঘরের সঙ্গে সঙ্গে 'টেকিঘরে চাঁদোয়া' কথাটাও চালু ছিল। টেকির ওপর যেমন একদিকে চলত মেয়েদের আলতা পরা পায়ের নৃত্য তেমনি অন্য দিকে পুরুষদের হাতেও টেকি তার অতুল গরিমা নিয়ে শোভা পেত। টেকি দিয়ে ধাক্কা মেরে ডাকাতরা যেমন জমিদারবাড়ির দরজা ভেঙে ডাকাতি করত তেমনি আবার ওই টেকি ঘুরিয়ে ডাকাত তাড়িয়ে একটা লোক টেকি উপাধি পেয়ে গেছিল। সেই লোকটার নাম আশানন্দ টেকি।

কিন্তু দুঃখের কথা কি বলব প্রভু। দেশে বিদ্যুতের কলে ধান ভানা, গম ভাঙা চালু হয়ে এখন টেকি লোপাট। এখন টেকি তার স্বকায়্য বর্তমান নেই। যা আছে তা শুধু ওই নামটুকুতেই। তাও আবার সে নাম কোনো সদর্থে ব্যবহার হয় না, যা হয় সবই ওই কদর্থে—উপহাস করে।

টেকিকে অশ্রদ্ধা দেখিয়ে লোকে বলে—টেকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। কাজের কথার মধ্যে কেউ কোনো অবাস্তব কথা বললে লোকে বলে—ধান ভানতে শিবের গীত। কটাফটা যে টেকিকেই তা বুঝতে পারছেন প্রভু। কোনো নিকট আত্মীয় গোপনে কারো কোনো ক্ষতি করলে লোকে বলে, ঘরের টেকি কুমির। মন্ত বোকা হাঁদাকাত উজ্জ্বলদের লোকে যেমন বলে 'বুদ্ধির টেকি' তেমনি যারা সব কাজে গুণবলেট পাকায় তাদের বলে 'অকমার টেকি'। এমনকি ভুতের ভয়ে যখন কারো বুক টিপ টিপ করে তখন লোকে বলে—বুকে টেকির পাড় দিচ্ছে। চিন্তা কবে দেখুন প্রভু, কোথায় মামার সেইসব অকাল কুখ্যাণ্ড কেলে কিছুত-কিমাকার খিদমতগারগুলো আর কোথায় আমার এই পবিত্র টেকি। দুটোর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করা কি মানুষের উচিত কাজ হয়েছে?

এছাড়া আরো আছে প্রভু। বাজে অনাবশ্যক জিনিস বোঝাতে লোকে বলে ট্যাক কুলো। আরো আক্ষেপের কথা কি বলব প্রভু, বলতে লজ্জা হয়, আপনাব দশ অবতারের সঙ্গে মিলিয়ে লোকে আবার একাদশ অবতার আবিষ্কার করেছে। সবচেয়ে নিকর্মার কুঁড়ে লোকদের তারা 'টেকি অবতার' বলে ডাকে। টেকির কি সাম্প্রতিক বেইজ্ঞত। কিছুদিন আগে পৃথিবীর একজন নামকরা লেখক লাঠির দুঃখে লিখেছিলেন—হায় লাঠি, তোমার সে সুদিন গিয়াছে। এখন তো লিখতে হয়—হায় টেকি তোমার সে স্বর্ণযুগ খতম!

এখন বিপদ হয়েছে এই যে, টেকি লোপাট হবার ফলে টেকির অনুযঙ্গ

যন্ত্রাংশের উৎপাদনও বন্ধ হয়ে গেছে। আমি এখন আমার টেকি চালু রাখার জন্যে যন্ত্রাংশ পাচ্ছি না। আমার ভাড়াতে পুরাতন যা-কিছু অবশিষ্ট ছিল তাই দিয়ে কোনোরকমে জোড়াতালি দিয়ে কাজ চালিয়েছি। কিন্তু সেগুলো শেষ হয়ে গেলে যে কী করব ভেবে পাচ্ছি না।

নারায়ণী এতক্ষণ চুপচাপ টেকির হেনস্থার কাহিনী শুনছিলেন। এবারে মুচকি হেসে বললেন—বাবা নারদ, ওই এক টেকি আর কতদিন চালাবে? ওটাকে বিদেয় করে এবার একটা আধুনিক দ্রুতগতি সম্পন্ন উৎক্ষেপক জোঁগাড় করে নাও। চেপেও আরাম পাবে, ঝামেলাও কম হবে।

নারদ নারায়ণীকে প্রশাম করে বললেন—মা-জ্ঞানী, আপনি অতি উপাদেয় কথাই বলেছেন। প্রভুর আশীর্বাদে এখন অতিদ্রুত সম্বরণশীল নানা ধরনের উৎক্ষেপণযান বাজারে আছে। সেগুলিতে চেপে আরামও আছে, ঝামেলাও কম। সে সব যানের বর্তমান নাম হল ‘রকেট’। কিন্তু মা-জ্ঞানী, আপনি বোধহয় জানেন না, কলি যুগে রকেট জোঁগাড় করা এক দুর্ভাগ্য ব্যাপার। আজকাল আর সে অবস্থা নেই যে, ধ্যানে পিড়দেব ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করলাম আর উনি দুম্ করে আমাকে একটা রকেট দিয়ে দিলেন। আজকাল রকেট জোঁগাড় করতে অর্থের প্রয়োজন হয়। সে অর্থ না স্বর্গলোকের স্বর্ণমুদ্রা, না পুণ্যভূমির রজতমুদ্রা। অবশ্য এখন পুণ্যভূমিতে রজতমুদ্রা নেই, অবস্থাও খুবই দুরবস্থা, যা আছে তা কেবল লৌহমুদ্রা, স্বেফ স্টিলের টাকা। তা সে লৌহমুদ্রায় রকেট কেনা যাবে না। রকেট কিনতে যে বস্তুটির প্রয়োজন তার নাম ‘ডলার’।

—ডলার কি জিনিস? আমার ঝাঁপিতে তো ও জিনিস নেই। আমার ঝাঁপিতে নেই অথচ সম্পদ হিসেবে গণ্য হয়, সেটা কী জিনিস হতে পারে?

—আছে মা আছে। আপনার ঝাঁপিতেই আছে। তবে একটু অন্য রূপে। পুণ্যভূমিতে যা লৌহমুদ্রা বা টাকা তারই আন্তর্জাতিক রূপ হল ডলার। আন্তর্জাতিক বাজারে টাকা দিয়ে ডলার কিনতে হয়। সেই ডলার দিয়ে রকেট কেনা যায়। বর্তমানে পুণ্যভূমির যা করণ অবস্থা তাতে এক-একটি ডলার কিনতে অনেক অনেক টাকার প্রয়োজন। অত টাকা জোঁগাড় করার ক্ষমতা তো নেই।

নারায়ণী অবাক হয়ে বললেন—বলো কী নারদ! সামান্য ডলার জোঁগাড় করার ক্ষমতা তোমার নেই? এ কি হতে পারে? সত্যি ব্রহ্মা দ্বাপরে তুমি কত সাংঘাতিক সাংঘাতিক অঘটন ঘটিয়েছ, আর এই কলিতে তুমি বলে দিলে তোমার ক্ষমতা নেই?

—মা-জ্ঞানী, কলিকাল অতি ঠ্যাদোড় কাল। একালে মানুষের মনে দেবদ্বিজে কোনো ভক্তি নেই। সে যুগে আমার মুখে হরিগুণগান শুনে কত নরপতি তাদের কোথাগার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। তখন আমার সে সব ধনরত্নের কোনো প্রয়োজন হত না, তাই নির্ভর না। এখন ধনরত্নের প্রয়োজন হয়েছে কিন্তু এখন কেউ আর কিছু দেয় না। যাদের হাতে অঢেল টাকা আছে তারা সবাই আপন আপন টাকা শুধু লুকোতেই ব্যস্ত। এসব টাকা তো সংপথে উপার্জিত সাদা টাকা নয়, জাল-জোচ্চুরি ঘুষ আর স্বজ্ঞার কেলেকারির হাত ধরে আসা কালো টাকা। দেশের সরকারের কাছে এসব টাকার হদিস প্রকাশ হয়ে গেলে তার দরশন যে আয়কর দিতে হবে তাতে সেই টাকার অধিকাংশই ধসে যাবে। তাই সবারই ধান্দা, কী করে সরকারের চোখকে ফাঁকি দিয়ে এই টাকাকে ডলারে পরিবর্তন করা যায় আর সেই ডলার বিদেশি ব্যাঙ্কে মজুত করা যায়। এইসব নানা ধান্দায় তারা দিনরাত এতই ব্যস্ত থাকে যে দানধ্যান দয়া-দাক্ষিণ্যের কথা ভাবার সময়ই পায়

না।

ওদিকে আবার যাদের কিছু দেবার মন আছে তারা নিজেরাই খেতে পায় না। তাদের দানের পরিমাণ আর কত হতে পারে? দশ পয়সা বিশ পয়সা, কিংবা বড় জোর একটা টাকা। এখন আমি যদি কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটে বসে হরিনাম করতে থাকি তবে গামছায় দু-দশ পয়সা যা পড়বে তাই জমিয়ে রকেট কিনতে গেলে কল্প কেটে যাবে। সত্যি বলতে কি, মানুষের মনে আর ভক্তি-শ্রদ্ধা ন্যায়-নীতিবোধ কিছুই অবশিষ্ট নেই। প্রভুত বর্ষদিন আর মর্ত্যলীলা করছেন না, তাই লোকশিক্ষারও বালাই ঘুচে গেছে।

নারায়ণ নারদের মুখের কথাটা লুফে নিয়ে বললেন—ঠিক বলেছ নারদ। আমি ঠিক ওই কথাটা বলার জন্যেই তোমাকে স্মরণ করেছিলাম। নারায়ণীর একবার মর্ত্যভূমিতে যাবার খুব সাধ হয়েছে। সেই ব্রহ্মা যুগে রাম-সীতা আর দ্বাপর কৃষ্ণ-রাবণী হয়ে যাবার পর আর তো যাওয়া হয়ে ওঠেনি। তাই ভাবছি একবার ওখানে যাব। এখন কিভাবে যাওয়া যাবে সেটা তোমাকেই ঠিক করতে হবে নারদ। তুমি ব্যবস্থা করো, আমরা যাতে মর্ত্যভূমিতে গিয়ে কিছু লীলা করে আসতে পারি।

রূপ দেখি বিহুল নারদ চান ধীরে।

বসন তিতিল তাঁর নয়নের নীরে।।

—কৃত্তিবাস।

নারায়ণের মুখে এ হেন এক মহা আনন্দকর কথা শুনে নারদের তো আর খুশির সীমা পরিসীমা নেই। কথাটা কানে যাওয়া মাত্র তাঁর সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। স্বাস্থ্য বেদ কম্প শিহরণ নামের যতগুলো উপসর্গ প্রকাশ হওয়া সম্ভব তার সবগুলোই এক এক করে হতে লাগল। প্রভু স্বয়ং মর্ত্যভূমিতে লীলা করতে যাবেন। একি একটা সাধারণ কথা। শুনলেই ধাত ছেড়ে যাবার জোঁগাড়। ভাবের আবেগে নারদ কেঁদেই ফেললেন। কাঁদার সময় চোখ দিয়ে যতই জল গড়াতে থাকে, নারদ সেটা নিজের খুতির খুঁটি দিয়ে মুছতে থাকেন। শেষে গোটা খুতিটাই ভিজে যাবার জোঁগাড়। এইরকম বেশ কিছুক্ষণ চলার পর নারায়ণ আস্তে আস্তে ধাত হইলেন।

আত্মীম প্রশ্ন হলে নারদ নারায়ণকে বললেন—এ অতি উত্তম কথা প্রভু। আপনি ইচ্ছা করলে কী না হতে পারে? এখন সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আপনি পুণ্যভূমিতে যাবেন। কিছু লোকশিক্ষা দেবেন। কিছু শুশা-বদমহিসকে পিটিয়ে ঠাণ্ডা করে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন করবেন। তারপর আবার এখানে ফিরে আসবেন। এটাই হবে আপনার কলিযুগের লীলা।

নারায়ণী বললেন—সেকি নারদ, তুমি শুধু তোমার প্রভুর কথাই বললে। আমার কথা তো বললে না? আমি যাব না?

নারদ বললেন—নিশ্চয় যাবেন মা-জ্ঞানী। আপনি সঙ্গে না গেলে তো পৃথিবীতে প্রভুর লীলা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। প্রভুর মর্ত্যলীলার একটা উদ্দেশ্য যেমন লোকশিক্ষা তেমনি আর একটা উদ্দেশ্য হল নবভাব।

নবভাবের ব্যাপারটা নারায়ণী সঙ্গে সঙ্গে ধরতে পারলেন না। জিজ্ঞাসায় চোখে নারদের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। কিন্তু নারদ ওদিকে নিজের মুখে জ্ঞানীর নবভাবের কথা বর্ণনা করতে পারেন না। তাই তিনিও লজ্জা লজ্জা চোখে চুপচাপ নারায়ণের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। ভাবটা এই যে, প্রভু, নবভাবের ব্যাপারটা জ্ঞানীকে বুঝিয়ে দিয়ে আপনি আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করুন।

নারদের আবেদনটা নারায়ণ বুঝলেন। নারায়ণীকে উদ্দেশ্য করে বললেন—দেবী, নবভাবের ব্যাপারটা...ওই যেটা একটু আগে বলেছি, সেটাই। এখানে আমরা সর্বদাই পরস্পরকে স্পর্শ করে বসে আছি। বিচ্ছেদ বা বিরহের কোনো বালাই নেই। তাই আমাদের প্রণয়ও একই রকম অবস্থায় আছে। এবং বৈচিত্র্য হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু প্রশ্ন জিনিসটা এমন একটা ভাব যা বাধা অতিক্রম করে বৃদ্ধি না পেলে এবং বৈচিত্র্যের আবাদ না পেলে পূর্ণরূপে বিকশিত হয়ে উঠতে পারে না।

মর্ত্যলীলায় গেলে আমাদের বিচ্ছেদ ঘটবে। তার ফলে আমাদের প্রণয় একেবারে গোড়া থেকে...মানে আর কি...একেবারে পূর্বরাগ থেকে শুরু হবে। মিলনের আগে থাকবে বিরহ। রামলীলায় রাবণ সীতারাপিনী তোমাকে অপহরণ করার পর আমাদের বিরহ শুরু হয়েছিল। আর কৃষ্ণলীলায় আমি নিজে কৃষ্ণলীলাপিনী তোমাকে অপহরণ করার পর হয়েছিল আমাদের বিরহের অবসান। মোটকথা, আমার সঙ্গে মর্ত্যলীলায় গেলে তোমাকে একবার অপহরণ করা হবেই। তা সে রাবণই করুক কিংবা আমিই করি। নারদ সেইসব কথাগুলোই বলতে চাইছে। কিন্তু লজ্জায় বলতে পারছে না।

নারায়ণের কথা শুনে দেবী কিছু না বলে নারদের দিকে চেয়ে একটু প্রশ্নের হাসি হাসলেন, যার অর্থ দাঁড়ায়—ওহে বৎস নারদ, তোমার পেটে পেটে এত! মুখটি তো করে রেখেছ যেন ভাজা মাছটি উটে খেতে জানো না।

নারায়ণ নারদকে প্রশ্ন করলেন—আচ্ছা নারদ, এবারে কোন লীলাটা করলে সুবিধে হবে? রামলীলা না কৃষ্ণলীলা? তোমার কি মনে হয়?

নারদের মাথায়, সেই সঙ্গে পেটেও, ধুরন্ধর বৃদ্ধি। তাঁর মনে পড়ে গেল, দ্বাপরে ভগবানের কৃষ্ণলীলার সময় তিনি খুব একটা পান্ডা পাননি। কেন না, ততদিনে পৃথিবীতে নারদের মহিমা অনেক কম এসেছে। তাই বললেন—প্রভু, আপনার পক্ষে রামলীলাটাই এখন জমবে ভালো। আমি দেখতে পাচ্ছি, অদূর ভবিষ্যতে রামজন্মভূমি নিয়ে পুণ্যভূমিতে একটা মারদাস্তা হুলস্থূল কাশ বেধে যাবে। তার মানে পৃথিবীতে রামের প্রাসঙ্গিকতা অনেক বেড়ে যাবে। সেদিকে থেকে বিচার করলে আপনার রামলীলা করাই উপদেশ কাজ হবে। একেবারে তৈরি জমি পেয়ে যাবেন।

কূট বুদ্ধিতে নারদের কাছে স্বয়ং ভগবানও শিশু। নারদের খোলাই প্রক্রিয়ায় নারায়ণের মগজ পুরো সাফ। তিনি নারদের যুক্তি মেনে নিয়ে সম্মতি সূচক মাথা নাড়লেন। আর নারায়ণীর তো কথাই নেই। একেত্রে নারায়ণের ইচ্ছাই তাঁর ইচ্ছা। বৈকুণ্ঠ ছেড়ে মর্ত্যলোককে বেড়াতে যাবেন, সেই আনন্দেই তিনি মশগুল।

খোলাই প্রক্রিয়াটাই এমন যে যে, বস্তুটিকে খোলাই করা হবে সেটিকে একবার উপরে তোলা হবে আবার পরমুহূর্তেই আছাড় দিয়ে নিচে ফেলা হবে। এক্ষেত্রে নারদ নারায়ণের মগজটিকে খোলাই করছেন। একবার উপরে একবার নিচে।

নারায়ণ যখন রামলীলায় সম্মতি জানিয়ে মৃদু হাস্যে মাথা নাড়ছেন, আর নারায়ণী আত্মদে গদগদ হয়ে উঠছেন তখনই নারদ একটি পটকা ফটালেন। বললেন—কিন্তু প্রভু, একটা জায়গায় একটু যেন খটকা লাগছে। ত্রৈত্য আপনি এক অংশে চার অংশ হয়ে জন্মেছিলেন রাজা দশরথের তিন রানির গর্ভে। কলিযুগে তিন তো দূরের কথা, কোনো হিন্দুর দুই স্ত্রী হলেই হিন্দু বিবাহ অইনে তার জেল হয়ে যায়। সুতরাং...অবশ্য ইসলাম

ধর্মের লোকদের চারটে পর্যন্ত বিবি হতে পারে। তা আপনি প্রভু নিশ্চয় ইসলাম ধর্মে জন্ম নিতে চাইবেন না। ইসলাম ধর্মের লোকেরা ওইসব লীলাটিলা মানে না।

নারায়ণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন—তাহলে?

ডোবাতেও নারদ, আবার ভাসাতেও নারদ। এবারে নারদ স্মিত হেসে বললেন—চিন্তা নেই প্রভু। আপনার মর্ত্যে যাবার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েই আছে। অযোধ্যা নগরে দশরথ নামে এক অতি ধনাঢ্য ব্যক্তি আছেন। অবস্থাবিশেষে তাঁর তিন স্ত্রী এবং তিন স্ত্রীর কারোরই সন্তান নেই। আপনি চার অংশে সেই তিন মহিলার গর্ভেই জন্মগ্রহণ করবেন।

নারায়ণের সন্দেহ তবু যায় না। বললেন—কিন্তু তুমি যে এইমাত্র বললে কোনো লোকের একের বেশি স্ত্রী হলেই তার কারাগার বাস হয়ে যায়। দশরথের তাহলে তিন স্ত্রী হল কী করে? তার মানে কি ওই তিন স্ত্রীর দৌলতে দশরথ এখন কারাগারে বন্দী? তার মানে আমাকে কৃষ্ণের মতো কারাগারেই জন্ম নিতে হবে? তাহলে তো ঘুরেফিরে রামলীলার বদলে কৃষ্ণলীলাই হয়ে গেল। তোমার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না নারদ।

নারদ বললেন—না প্রভু, দশরথ কারাগারে নেই। টাকার জোরে উনি বেশ বহাল তবিয়েতেই আছেন। ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছেন, কাজ-কারবার করছেন। প্রভু, কলিযুগে পুণ্যভূমিতে টাকায় সবকিছু হয়। পুণ্যভূমির বর্তমান নাম হয়েছে হিন্দুস্তান। হিন্দুস্তানের বর্তমান অবস্থার কথা একটু বর্ণনা করি। দয়া করে অবধান করুন।

হিন্দুস্তানে এখন চলছে গণতন্ত্র। গণতন্ত্রে রাজা বলে কেউ নেই, আছে মন্ত্রী। মন্ত্রীর রাজা নয় কিন্তু রাজার বাড়া। আগে প্রজার হিতসাধনের জন্যে রাজাদের একটা দায়িত্ব থাকত। সেইসঙ্গে অন্য দেশের রাজা এসে তাকে হত্যা করে রাজ্য কেড়ে নেবে, এরকম একটা ভয়ও থাকত। এখনকার মন্ত্রীদের ওসব বালাই নেই। দেশের জনগণ মরল কি বাঁচল তাতে মন্ত্রীর কিছু আসে যায় না। আর অন্য কেউ এসে তাকে হত্যা করবে, সে ভয়ও খুব একটা নেই। লক্ষ লক্ষ সরকারি টাকা খরচ করে তারা নিজেদের জন্যে দেহরক্ষীর ব্যবস্থা করে নিয়েছে। এইসব দেহরক্ষীদের বলে এস পি জি কম্যান্ডো গার্ড। অনেককে আবার গ্ল্যাকসিও বলে। এইসব দেহরক্ষীর ঘেরাটোপের মধ্যে মন্ত্রীরা বেশ নিশ্চিন্তেই বসবাস করে আর দিনরাত লম্বা লম্বা ভাষণ দেয়। তবে ভয় যেটা আছে সেটা হল পাঁচ বছর পরে ভোটে হেরে গদি হারানোর ভয়। কেন না প্রতি পাঁচ বছরে একটা করে নির্বাচন হয়। সেই নির্বাচনে হেরে গেলে আর মন্ত্রী থাকে যায় না। গদি হারালে মন্ত্রীর আর কিছু থাকে না। ছোবড়া হয়ে যায়। তাই যেন তেন প্রকারেণ মারদাস্তা জ্বাল-জ্বাচুরি কারচুপি করে ভোটে জিতে গদি রক্ষা করার জন্যেই তারা সদা তৎপর। মন্ত্রীদের দারুণ ক্ষমতা। পারে না এমন কাজ নেই। আমি দশরথের কথা বললাম। তিনি মন্ত্রী নন, কিন্তু কাজে তার চেয়েও এককটি সরেস। কারণ উনি ধনাঢ্য ব্যক্তি। হিন্দুস্তানের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ওঁর আখের চাষ। সেই সুবাদে দেশের চিনি লবির উনি একজন হোমরা চোমরা। ওঁর ইস্তেই দেশে চিনির দাম ওঠানামা করে আব সেখানেই চলে কোটি কোটি টাকার খেল। তাই মন্ত্রীরা সবাই ওঁকে তোয়াজ করে চলেন। এ হেন একজন লোকের একটা স্ত্রী হল কি তিনটে স্ত্রী হল তাই নিয়ে মাথা ঘামাতে গেলে যে কোনো লোকের ঘাড়ের ওপর একটা নয়, তিনটে মাথার দরকার হবে। আপনি ওঁর পুত্র হয়ে জন্মালে লোকে

আপনাকে রাজপুত্র বলবে না ঠিকই, তবে আদরযত্ন আর লোকের স্যালুট যা পাবেন, রাজপুত্রও তা পায় না।

স্যালুট জিনিসটা নারায়ণের কাছে অজানা বস্তু। নারদকে জিজ্ঞেস করলেন—স্যালুটটা কী জিনিস?

—প্রভু, সত্য ত্রৈতা দ্বাপরে স্যালুট বলে কোনো জিনিসের অস্তিত্ব ছিল না। ওটা কলিযুগে শ্বেতদ্বীপ থেকে আমদানি করা হয়েছে। আগের যুগে যে কোনো দেবতাকে সম্ভট করার জন্যে লোকে নমস্কাব বা সান্ত্বাস প্রণাম করত। সেইসঙ্গে পুষ্পাঞ্জলিও চলত। এখন তার বদলে এসেছে স্যালুট। এতে হাত পা মাথা শরীর কিছুই বিশেষ নাড়াতে হয় না। শুধু হাতের কায়দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই প্রণাম জানানো যায়। আর তাতেই কাজ হাসিল। স্যালুট পেলেও আনন্দ কিছু কম হয় না। স্বর্গের দেবতারা মানুষের স্যালুট পেয়ে খুব খুশি। আপনি মর্ত্যলোকে গেলে নিজেই সেটা দেখতে পাবে প্রভু।

এরপর আর একটা কথা আছে। আপনি ত্রৈতায় অনেক কিছুত কিমাকার রাক্ষসদের বধ করেছিলেন। সে রকম রাক্ষস দেশে আর নেই। রাক্ষস অবশ্য আছে। আগের চেয়ে বেশিই আছে। তবে তারা সবাই আছে মানুষের রূপ ধরে। তাদের দেখা পাবার জন্যে লঙ্কায় যেতে হবে না। হিন্দুস্তানের ভিতরে যত রাক্ষস আছে তাদেরকেই ঠেঙিয়ে শেষ করতে পারবেন না—

নারদের লম্বা ভাষণে বাধা দিয়ে নারায়ণ বললেন—তা কি করে হবে? লঙ্কায় না গেলে, সাগর বন্ধন না করলে, আমার রামলীলার অর্ধেকটাই তো অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

—প্রভু, ত্রৈতায় যে সপ্তদ্বীপ নিয়ে জম্বুদ্বীপ গঠিত ছিল, লঙ্কাদ্বীপ ছিল তারই একটা অংশ। কিন্তু কলিযুগে এসে জম্বুদ্বীপ যখন হিন্দুস্তান হয়ে গেল তখন লঙ্কাদ্বীপও বেরিয়ে গিয়ে একটা আলাদা রাষ্ট্র হয়ে গেল। এখন হিন্দুস্তান থেকে কেউ গিয়ে লঙ্কা আক্রমণ করলে সেটা পররাজ্য আগ্রাসন বলে গণ্য হবে। জ্ঞাপিতপুঞ্জের মাধ্যমে পৃথিবীর বাকি সব দেশ মিলে সেই আগ্রাসন প্রতিহত করার জন্যে যুদ্ধ আরম্ভ করে দেবে। সেটা তো একটা যাচ্ছেতাই কাণ্ড হয়ে যাবে। যাকে বলে ফ্লজিনসিনিহিলিপিলিফিকেশন।

নারায়ণী বললেন—ওটা আবার কী কথা বললে নারদ? ওটা কোনদেশি ভাষা? কথাটার অর্থই বা কি?

—মা-জননী, এটা হল শ্বেতদ্বীপের ভাষা। এর অর্থ হল, যাচ্ছেতাই বিতর্কিচ্ছিরি মারহাব্বা লে-হালুয়া ধরনের একটা কাণ্ড। ধরুন, পৃথিবীর সব দেশ যদি একসঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে তবে সেটা যা কাণ্ড হবে, তার কাছে কোথায় লাগে লঙ্কার যুদ্ধ কিংবা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। যুদ্ধে আমাদের প্রভুর হার হবে না ঠিকই, তবে সে যুদ্ধে আইসা সব মারণাস্ত্র ব্যবহার হবে যে তিন মিনিটেই পৃথিবীর অর্ধেক লোক সাবাড় হয়ে যাবে। আর বাকি অর্ধেক লোক সাবাড় হতে লাগবে মেরেকেটে আরো পাঁচ মিনিট। যুদ্ধশেষে প্রভুর মহিমা কীর্তনের জন্যে কিংবা লোকশিক্ষা প্রসারের জন্যে আর কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। প্রভুর মর্ত্যলীলা একেবারে ভুল, যাকে বলে সুপার ডুপার ফ্লপ।

এটাও নারায়ণীর কাছে একটা নতুন কথা। কিন্তু নারদকে আর খাঁটানো উচিত হবে না মনে করে চূপ করে রইলেন।

নারদ এরপর নারায়ণের দিকে ঘুরে বললেন—আর সাগর বন্ধনের কথা যে বলছেন প্রভু, কলিযুগে বিজ্ঞানের বলে চারিদিকে সাগরের ওপর

বড় বড় বাঁধ দিয়ে এত জায়গায় সাগর বন্ধন হয়েছে যে ও কাজটায় আর তেমন কোনো কৃতিত্ব নেই। তাছাড়া আপনি সে কষ্ট করতে যাবেনই বা কেন? বর্তমানের ধারা অনুযায়ী সরকারি খরচে কোনো একটা সেচ পরিকল্পনায় মস্ত মস্ত বাঁধ জলাধার তৈরি হবে; আপনি গিয়ে ফিতে কেটে সেটা দেশবাসীকে উৎসর্গ করে দেবেন। ব্যস, পুরো কৃতিত্ব আপনার।

নারায়ণ বললেন—এরপর আছে বানর সৈন্যের ব্যাপার। বানর তো এখন একটা প্রায় অবলুপ্ত প্রজাতির পর্যায়ে চলে গেছে। এখন যুদ্ধের জন্যে যথেষ্ট বানরসৈন্য পাওয়া যাবে তো?

—হ্যাঁ প্রভু, তার কোনো অভাব হবে না। হিন্দুস্তানে বানর বখেট আছে। তবে ওই কথা, তারা সবাই আছে মানুষের বেশে। রাস্তাঘাটে মাঝেমাঝেই শোনা যায়, একজন আর একজনকে বলছে—কী বাঁদরামো করছেন মশাই?—তাব মানে ওরা পরস্পর স্বজাতিকে চিনে ফেলোছে। বানরের কোনো অভাবই নেই। তবে একটু যাঁ অসুবিধে তা হল এখনকার বানররা তখনকার বানরের মতো অতটা সভ্য-ভদ্র বা শালীনতাবোধ সম্পন্ন নয়। আর সেসব বানরদের আপনি সৈন্য নামেও পাবেন না। তাদের এখন অন্য নাম। ক্যাডার, চামুচা—এইসব। এদেরকে পার্টিমেম্বার বা পার্টি সভ্যও বলা হয়। কিন্তু নামে সভ্য হলে কি হবে, কাজে খুবই অসভ্য।

নারায়ণ বুঝে গেলেন কলিযুগের মর্ত্যলীলা ত্রৈতায়ুগের মতো অতটা সহজ হবে না। দুটো-একটা গোঁজ এখানে ওখানে লেগে যেতেই পারে। কিন্তু স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা নারায়ণের তো তাতে ভয় পেলে চলে না। বিশেষ করে সেরকম কোনো ভয়ের ভাব নারদের সামনে প্রকাশ করাও ঠিক হবে না। তাই নারদকে আর দীর্ঘ ভাষণ দেবার সুযোগ না দিয়ে বললেন—তাহলে তুমি বলছ আমি দশরথের পুত্র হয়েই জন্মাচ্ছি?

—হ্যাঁ প্রভু। সে ভদ্রলোকের বয়স এখন যাট পার হয়ে গেছে। কোনো পুত্রসন্তান হয়নি। মনের দুঃখে আছেন। এখন একসঙ্গে চারচারটি পুত্রবে মুখ দেখলে তো আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাবেন।

নারদের কথা শুনে নাবায়ণী মুখে আঁচল চাপা দিয়ে খুক খুক করে হেসে উঠলেন। নারদ জিজ্ঞাসার চোখে তাঁর দিকে তাকাতেই তিনি বললেন—বলো কি নাবদ, যাট বছরের বুড়োর ছেলে? তাও একসঙ্গে চার-চারটে? দেশের লোকেরা সামনে সাহস না করলেও পিছনে তো তোমার প্রভুকে অকাল কুখ্যাতি বলে উপহাস করবে।

—সে আপনি ভাববেন না মা-জননী। কেউ কিছু ভাববেও না, বলবেও না। আজকাল লোকের সব বয়সেই ছেলে হতে পাবে। ছেলের জন্মতে আজকাল বাবার ভূমিকা প্রায় নেই বললেই চলে। ডাক্তাররা কায়দা কানুন করে যে কোনো সময় যে কোনো লোকের ছেলে করিয়ে দিতে পারে। ত্রৈতায় প্রভু জন্মেছিলেন দশরথের তিন রানিকে পায়ের খাইয়ে। সে পায়ের উঠে এসেছিল যজ্ঞকুণ্ড থেকে। কিন্তু যজ্ঞ করলে ছেলে হবে, এসব কথা আজকাল আর লোকে খুব একটা বিশ্বাস করে না। তাছাড়া দশরথ যেরকম বানু ব্যবসাদার, পয়সা খরচ করে যজ্ঞ করার বান্দা সে নয়। পৃথিবী থেকে যজ্ঞ প্রায় উঠেই গেছে। পৃথিবীতে শেষ যজ্ঞ হয়েছিল অষ্টগ্রহ সম্মেলনের ঠালায়।

অষ্টগ্রহ সম্মেলনের ব্যাপারটা সৃষ্টিকর্তা হিসাবে নাবায়ণের জানা থাকলেও, যেহেতু সেই যাগযজ্ঞে নারায়ণীর নামে কোনো ভোগ উৎসর্গ করা হয়নি, তাই নারায়ণী ব্যাপারটা জানতেন না। জিজ্ঞেস করলেন—অষ্টগ্রহ সম্মেলনটা কি?

নারদ বললেন—সে এক মজার ব্যাপার। জ্যোতিষীরা একবার গণনা করে বলে দিল যে, অমুকদিন চন্দ্র-সূর্য মিলিয়ে আটটা গ্রহ পৃথিবীর সঙ্গে একই রেখা বরাবর এসে যাবে। তাতে মহাপ্রলয় ঘটে যেতে পারে। সর্বনাশ। এখন উপায়? পণ্ডিতেরা বিধান দিলেন, যজ্ঞ করতে হবে। ব্যস, আর যায কোথায়? রে রে করে সব লোক লেগে পড়ল যজ্ঞ করতে। চারদিকে হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপার। বিরাট বিরাট প্যাণ্ডুল বেঁধে যজ্ঞস্থলী তৈরি হল। সেখানে হাজার হাজার ভক্তের সমাবেশ। কয়েক হাজার মণ ঘি পুড়ে গেল। কয়েক লক্ষ সাধু-সন্ন্যাসীর ভরপেট ভোজন হল। কয়েক কোটি মাদুলি তাবিজ বিক্রি হল। মাদুলি পরেই তারা মহাপ্রলয় থেকে রক্ষা পাবে। ওদিকে আবার অতিপ্রগতিশীল বিজ্ঞান-মনস্ক হিন্দুস্তানি যারা যজ্ঞে বিশ্বাস করত না তারা সেই রাতে ঘর ছেড়ে মাঠে গিয়ে তাঁবু খাটিয়ে খাটিয়ায় শুয়ে রইল। তাদের ধারণা ছিল, অষ্টগ্রহ সম্মেলনে পৃথিবীতে ভূমিকম্প হবে। ঘরের ভিতর শুয়ে থাকলে ঘুমের মধ্যেই ঘর চাপা পড়ে মরতে হতে পারে। বাইরে তাঁবু খাটিয়ে শুয়ে থাকলে অস্ত্র সেটার হাত থেকে বাঁচা যাবে।

তারপর যখন অষ্টগ্রহ সম্মেলনের দিনটা পার হয়ে গেল অথচ কিছুই হল না, তখন যজ্ঞস্থলী ভোঁ ভোঁ। ঝাঁটের ধুলোর সঙ্গে আস্তাকুড়ে মাদুলি কবচের পাহাড়। আব হিন্দুস্তানি পণ্ডিতরা গর্ব করে ঘোষণা করল—আমরা যজ্ঞ করেই অষ্টগ্রহ সম্মেলনের বিপদ থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করলাম। বা রে আমরা! তাদের এরকম আত্মপ্রাধার মূলে অবশ্য ছিল প্রভুরই উপদেশ। ঝাপরে কৃষ্ণলীলায় উনি শিখিয়ে এসেছেন—

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নম্ সম্ভবঃ।

যজ্ঞান্তবন্তি পর্জন্যে যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ॥

অর্থাৎ কিনা যজ্ঞ করলেই সব হবে। পাপ থেকে মুক্তি তো বটেই, অষ্টগ্রহ সম্মেলনের কবল থেকেও মুক্তি।

নারায়ণ বললেন কলিকালে এসে নারদের বেশি কথা বলার অভ্যাস হয়েছে। বড় ভাজ্য ভাজ্য করে। সুযোগ পেলেই ভাষণ। এক কথার উত্তরে দশ কথা। আর হবে না-ই কেন? শুকে তো পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াতে হয়। সেখানে সাবা দিনরাত নেতাদের যেরকম ভাষণ শুনছে তাতে অভ্যাস খারাপ হয়ে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। আমি শুনলে কি জানি আমারও তাই হত। নারদকে ধামিয়ে দিয়ে বললেন—তাহলে তুমি কী করতে চাও?

নারদ বললেন—প্রভু, দশরথের তিন গিমিতে পায়ের খাবেন না। এ যুগের মেয়ে তো, দুধের জিনিস মুখের কাছে ধরলে বমি করে ফেলবেন।

ওঁরা ছোটবেলায় খান আইসক্রিম আর বয়সকালে খান নানা ব্রাশের ঠাণ্ডা পানীয়। তার ওপরে আবার ওই তিন কন্যা যা আলট্রা মডার্ন তাতে ওঁরা পানীয় বলতে বোঝেন খাঁটি স্কচ জাতীয় কিছু। এখন প্রভু, আপনার যদি স্কচের মধ্যে ঢুকতে আপত্তি না থাকে তবে অনুমতি করুন, ওঁদেরকে সেটাই খাওয়ানোর ব্যবস্থা করি।

স্কচের নামে নাকে আঁচল ঠাপা দিয়ে নারায়ণী বললেন—আমি বাবা ওঁসব পারব না। আমি ওই আগের বারের মতো মাটি ফুঁড়েই উঠব। ত্রেতায় জনকরাজা সন্তান কামনায় যজ্ঞ করে সেই যজ্ঞস্থলীতে হল কর্ষণ করে আমাকে পেয়েছিলেন। কলিযুগে লোকেরা যদি যজ্ঞটক্স নাও করে, অস্ত্রত ধান গম চাষ করার জন্যেও তো তারা লাঙল টাঙল চালায়। তারই কোনো এক ফাঁকে মাটির ভেতর থেকে টুক করে উঠে পড়ব।

একটু আগে নারায়ণী নারায়ণকে অকাল কুখ্যাপ্ত বলায় উনি ভোম মেরে গেছিলেন। এখন উন্টো কার্নিক মারার সুযোগ পেয়ে সেটার পুরো

সদ্যব্যহার করে নিলেন। বললেন—দেবী, তুমি যদি লাঙলের ফলায় মাটি থেকে উঠে আসো তবে কলিযুগের ঠোটকাটা ফাজিল রকবাজ ছোকরারা তো তোমাকে ভুঁইফোড় বলেন উপহাস করবে। নারীজন্ম গ্রহণ করে সে উপহাস সহ্য করতে পারবে তো?

নারায়ণ আর নারায়ণীর মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব উপস্থিত হওয়াব আশঙ্কায় উদ্ভিগ্ন হয়ে নারদ ভাড়াভাড়ি বললেন—মা-জননী, কলিযুগে মাটি ফুঁড়ে জন্ম নেওয়া সম্ভব নয়। যার লাঙলের ফলায় আপনি উঠে আসবেন তাকে পুলিশের হাঙ্গামায় পড়তে হবে। আর পুলিশের হাঙ্গামা যে কী জিনিস, সেটা যে পড়েছে সেই হাড়ে হাড়ে বোঝে। কলিযুগে হিন্দুস্তানে একটা প্রবাদ চালু আছে—বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, পুলিশে ছুঁলে ছত্রিশ ঘা। মা-জননী, লাঙলের ফলার মুখে আপনাকে লাড করে আপনার মর্ত্যলীলায় পিতার খুব আনন্দ হবে ঠিকই, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সে আনন্দ দড়কাচা মেরে যাবে। পুলিশ এসে এমনি উৎপাত আরম্ভ করবে যে তাদের মুখ বন্ধ করার জন্যে ঘুষ দিতে দিতেই আপনার মর্ত্যপিতার ভিটেমাটি চাটি হয়ে যাবে। আপনাকে রাজনন্দিনীর মতো বিলাস-ব্যসনের মধ্যে রেখে পালন করার রেশমতেই টান পড়ে যাবে। তাই ওই চিন্তাটা ত্যাগ কবতে হবে।

নারায়ণী বললেন—তাহলে আমি কিভাবে জন্মাব?

নারদ মাথা চুলকে বললেন—মা-জননী, আপনাকে আমি বাস্কে পুরে রেললাইনের ধারে ফেলে দিয়ে আসব। সেখানে কোনো একজন মহান ব্যক্তি আপনাকে কুড়িয়ে পাবেন।

এইটুকু বলার পরেই নারদের বুদ্ধি খুলে গেল। বললেন—ওহো না না, আপনাকে বরং আমি হাসপাতালে জঞ্জাল ফেলার জায়গায় রেখে দিয়ে আসব। সেখানে তিনটে কুকুর আপনাকে আবিষ্কার করবে। ব্যাপারটা খুবই বিশ্বাসযোগ্য হবে এই কারণে যে, হাসপাতালে সদ্যপ্রসূত জ্যাড্ড বাচ্চাকে মরা বলে আস্তাকুড়ে ফেলে দেওয়া আজকাল আকচাং হচ্ছে। আব সেখানে যদি কুকুর আপনাকে আবিষ্কার করে তবে পুলিশেরও বামেলা পোয়াতে হবে না। পুলিশ কুকুরের নামে কোনো কেস নেয় না, কারণ কুকুর পুলিশকে টাকা খাওয়াতে পারবে না। যারা টাকা খাওয়াতে পারবে না পুলিশ তাদের কেস নেয় না। হাসপাতালের আস্তাকুড় থেকে আপনি যাবেন কোনো অনাথ আশ্রমে। সেখান থেকে কোনো ধনী বিপত্নীক নিঃসন্তান ভদ্রলোক আপনাকে দত্তক নিয়ে নেবে। ব্যস, সব কিছু পরিষ্কার।

নারদের এরকম একটা জরবদস্ত পরিকল্পনার কথা শুনে নারায়ণী একেবারে চমৎকৃত হয়ে গেলেন। খুশি খুশি গলায় বললেন—ঠিক আছে, আমি রাজি। বলেই খেয়াল হল, কোনোরকম বায়নাঙ্কা না করে নাবদের কথায় রাজি হয়ে যাওয়াটা ঠিক হল না। পুরুষজাতির কোনো কথা এক কথায় মেনে নেওয়া কোনো স্ত্রীজাতির উচিত নয়। এতে দেবীর মহিমা ক্ষুণ্ণ হয়। তাই বললেন—তবে বাপু আমাব আর যে তিন বোনের সঙ্গে রামের তিন ভায়ের বিয়ে হবে, তাদের একটা করে আধুনিক নাম দিতে হবে। মাণ্ডবী, ঋত্বিকীর্তি, উমিলা—এসব পুরনো পচা নাম চলবে না। আমার নামের সঙ্গে মিলিয়ে ওদের নাম দিতে হবে। যেমন ধরো—গীতা নীতা ললিতা—এইরকম।

নারদ বললেন—মা-জননী যদি তাই ইচ্ছা, তবে সেটাই হবে। তবে এও বলি মা-জননী, আপনি যে নামগুলো বললেন ওগুলোও কিন্তু পুরনো হয়ে গেছে। এখন আধুনিক নামের ধারা অন্যদিকে দিয়ে বইছে।

নারদের এরকম জ্ঞান-দেওয়া কথায় নারায়ণীর চটে যাওয়াই উচিত।

কিন্তু নাবায়ণী নারদকে প্রকৃতই স্নেহ করেন। শুধু তাই নয়, এখন তো নারদের ব্যবস্থাপনাতেই তাঁর মর্ত্য ভ্রমণ হবে। তাই নাবদকে ধমক দেওয়া বুদ্ধিমত্তীর কাজ হবে না। মুখে একটা আলতো হাসি ফুটিয়ে রেখে নারায়ণী বললেন—তাহলে এখনকার আধুনিক নামগুলো কিরকম?

নারদ ঘাড় তুলকে বললেন—মা-জ্ঞাননী, সেসব নাম তো আপনার সামনে উচ্চারণ করতেই আমার সঙ্কোচ হচ্ছে। তবু আপনি জ্ঞানতে চাইছেন, তাই বলি, আপনার ওই সীতা নামের সঙ্গে মেলানো নামের উদাহরণ এইরকম—চেন্না, গৌত্তা, ভোঁতা, বেপাঙ্গা....

নারায়ণী ভোম মেয়ে গেলেন। নারদ বুঝলেন, এবারে কেটে পড়ার সময় এসেছে। কথা ঘুবিয়ে বললেন—তাহলে আদেশ করুন, আমি এখন মর্ত্যে যাই। সেখানে একজন বাস্মীকির সন্ধান করি। সন্ধান পেলেই আপনাদের খবর দেব। আপনারা পরিকল্পনামতো মর্ত্যলোকে চলে যাবেন।

নারায়ণী প্রশ্ন করলেন—বাস্মীকির আবার কী দরকার। তার জন্যে আমরা অপেক্ষাই বা করব কেন?

নারদ বললেন—মা-জ্ঞাননী, ওটাই আসল কথা। বাস্মীকিই তো আপনাদের মর্ত্যলীলার কথা লিখবে। সে না লিখলে আপনাদের জীবনকাহিনী

প্রচার হবে কেমন করে? আর প্রচার না হলে তো আপনাদের লীলামাহাত্ম্য অজ্ঞাতই থেকে যাবে।

নারায়ণ-নারায়ণী দু'জনেই সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লেন। নারদ দু'জনকেই সাষ্টাঙ্গে প্রশাম পূর্বক সুঁই করে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

মর্ত্যলোকে বেড়াতে যাবার আনন্দে নারায়ণ গলা ছেড়ে গান ধরলেন—
রঘুপতি রাঘব রাজা রাম—

নারায়ণী ধুরো ধরলেন—পতিত পাবন সীতা রাম—

বৈকুণ্ঠলোকে এই শেষবারের মতো রামধন গেয়ে নেওয়া। একটু পরে নারদ এসে খবর দিলেই তো নারায়ণকে ঢুকতে হবে স্বর্গের বোতলে আর নারায়ণীকে নিকার-বোকার পরে সদ্যোজাত বাচ্চা সেজে গুঁয়া গুঁয়া করে কাঁদতে হবে।

অর্থাৎ একজন হয়ে যাবেন ন্যাপী লিকার (Nappy Liquor) আর অন্যজন পরবেন ন্যাপি (Nappy)।

(চলবে)

ট্যারা চোখে

নাম কেবলম

আমাদের ডি টি পি অপারেটর শুধু কম্পিউটারের কাজে নয়, সম্পাদনার কাজেও ক্রমশই দক্ষ হয়ে উঠছেন। হবেনই তো। সারাক্ষণ সম্পাদকের গায়ে গায়ে থাকা। পুজো সংখ্যার গন্ধমাদন বোঝা নিয়ে একা এবং অধিতীয় সম্পাদক সেই রাত্তিরে খাবি খাচ্ছেন। একবার নিজের লেখা লিখছেন, একবার প্রফ, একবার পেজ মেক-আপ, একবার সূচীপত্র....

অথচ এই রাতের মধ্যে কাজ শেষ করে ফেলতেই হবে। সম্পাদকের মাথা ঘুমে ঝুকছে। অপারেটরও বেজায় ধুকছে। সকাল হয়-হয়। হঠাৎ কম্পিউটার স্ক্রিনে 'সাহিত্য দৃঃসংবাদ' পাতাটিতে একটি মারাত্মক ভুল চোখে পড়ায় চোখ থেকে ঘুম উড়ে গেল অপারেটরের—“সমরেশ বসুর প্রজাপতি বা বিবর....”

সমরেশ বসু! বসু? সে আবার কে? লেখক যিনি, তাঁর নাম তো সমবেশ মজুমদার। শুধু লেখক নন, গোড়া থেকে পত্রপাঠ-এর সম্পাদকীয় উপদেষ্টাও বটে। না, সমরেশ নামেব অন্য কোনো লেখকের অস্তিত্বই নেই। আহা, বেচারী সম্পাদক! এত তাড়াহুড়োর মধ্যে এতবড় মারাত্মক ভুলটা চোখ এড়িয়ে গেছে। ভাগ্যিস!

সঙ্গে সঙ্গে অপারেটর সংশোধন করে দিলেন—“সমরেশ মজুমদারের প্রজাপতি বা বিবর....”। সম্পাদককে জাগালেন না। বড্ড ধকল যাচ্ছে লোকটার ওপর দিয়ে। ঘুমোচ্ছে, একটু ঘুমোক।

সমরেশ মজুমদার প্রজাপতি বা বিবর নামে
কোনো উপন্যাস লেখেননি? না হয় আমরা
তাঁর কাছে আবেদন করব, এত বই লেখেন
তিনি, বইদুটোও লিখে ফেলুন।

পাঠক! আপনারা নিশ্চয় আমাদের অপারেটর মশায়ের সঙ্গে একমত। না হয়ে থাকলে ক্রমশ হয়ে যাবেন। কী বলছেন, সমরেশ মজুমদার প্রজাপতি বা বিবর নামে কোনো উপন্যাস লেখেননি? নাহয় আমরা তাঁর কাছে আবেদন করব, এত বই লেখেন তিনি, এই বইদুটোও লিখে ফেলুন। মেক কিংবা রিমেক।

গঙ্গালাভের পর সমরেশ বসুর খড়কুটো—‘গঙ্গা’ কিংবা ‘প্রজাপতি’, ‘বিবর’—এব মতো খানকয়েক বইয়ের নাম, বই নয়। বইমেলায় তাঁর খেলা শেষ। বইবাজার তাঁর ওপরে ব্যাজার। এই রিমেকেব যুগে, শুধুমাত্র পূর্বনো সিনেমার নামটুকু নিয়ে তাতে যখন একালের নাচন-কৌদন ডিসুম-ডিসুম ঠেসে দেওয়া যাচ্ছে, তখন একালের লেখকরাই বা কেন পিছিয়ে থাকবেন? ওই ওই নামের বইগুলো ভাগাভাগি কবে লিখে ফেললেই সমরেশ বসু নামের ভূতের বোঝাটা আর অজ্ঞত বইতে হয় না।

—শে. আ.



যে বছর আমার খোকা ইস্কুলে নাম লেখাল সে বছর থেকে ভোটের লিস্টে আমার নাম কাটা গেল। এখন আমরা নাবালক বাপ-বেটা। কালকেতু রাজার রাজপাটের মানুষগুলোও রাজনীতিতে ছিল নাবালক। না সৈন্য, না সামন্ত, না সুন্দরী, না সুরা। রাজত্বের সীমানাটা পর্যন্ত অজানা।

নাট্য সুসংবাদ

জোট সরকারে যেমন মাঝে মাঝে
জোট ছাড়ার হুমকি থাকে, এ পালায়
মাঝে মাঝে তেমন সঙ্গীত ছিল।

ফুল্লকেতুর পালা

মা মঙ্গলচণ্ডীর আশীর্বাদে কালকেতু ব্যাধরাজ্য হয়েছিল। ইলেকশন কমিশনের আশীর্বাদে আমি নাবালক হয়েছিলাম। যে বছর আমার খোকা ইস্কুলে নাম লেখাল সে বছর থেকে ভোটের লিস্টে আমার নাম কাটা গেল। এখন আমরা নাবালক বাপ-বেটা। কালকেতু রাজার রাজপাটের মানুষগুলোও রাজনীতিতে ছিল নাবালক। না সৈন্য, না সামন্ত, না সুন্দরী, না সুরা। রাজত্বের সীমানাটা পর্যন্ত অজানা। সেই সুযোগে প্রতিবেশী কলিঙ্গরাজের আগ্রাসন। উদ্দেশ্য লিঙ্গসেবা, রাজত্ব বিস্তার নয়। এর মধ্যে কখন ভাঁড় দত্তকে সে চর করে পাঠিয়েছিল কালকেতুর সভাসদ বেশে। যমরাজের চর যেমন সবকারি হাসপাতালে সুপার বেশে ঘোবে। কিন্তু রাজা কালকেতুব ছিল লোকশক্তি। প্রথম দিন থেকেই সে ছিল গুর্জরবাসীর হৃদয়ের রাজা। অস্ত্রাগারকে শয্যাগার করে কালকেতু যে কালদর্শিতার নিদর্শন রাখে তা আজও ভীষণ প্রাসঙ্গিক। আজকাল প্রতিরক্ষা খাতে যা খবচ বেড়েছে তাতে দেশবাসীর প্রাণরক্ষা করাই কঠিন হয়ে পড়েছে। প্রতিবেশীরা সব ছদ্মবেশী। কিন্তু খেটে খাওয়া মানুষ না চায় যুদ্ধ, না বোঝে বাজেট। তারা চায় সেই রাজব্যক্তি যে তাদের খিদে মেটায়। তাই গুর্জররাজ্যের গবিবরা রাজার পাশে দাঁড়িয়ে হারিয়ে দিল কলিঙ্গরাজকে। বন্দী কালকেতুকে কলিঙ্গ থেকে উদ্ধার করে আনল সবাই মিলে।

ফুল্লকেতুর পালায় এই ছিল মূল বক্তব্য। এর অতিরিক্ত যা ছিল তা কমেডি। আগাগোড়া বসে চোবানো ছিল নাটকটা। মধ্যযুগের হতদরিদ্র ব্যাধসমাজের গল্পকে যে এভাবে টক-মিষ্টি করা যায় তা না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। পালাকাব্য রূপপ্রসাদ চক্রবর্তী নিঃসন্দেহে বসিক মানুষ। কালকেতুর পাট দেবেশবাবু বেশ করেছেন। দেবেশবাবু রাঘব বটে



চিত্র নিমাই ঘোষ

চৌধুরীও বটে। নাযকও বটে, সহকারী নির্দেশকও বটে। ব্যাধ-বৌ ফুল্লবার নামভূমিকায় সুকৃতি একজন কৃতী অভিনেত্রী। ভদ্রমহিলাকে সাজঘরেও বিহার্সাল কবতে দেখেছি। 'ন্যাড়া' 'বন্ধা' 'শিবে'রা তখন মেকআপ নিয়ে ফিল্টার উইলস টানছিল আর পাযচারি কবছিল। এ পালার দ্বিতীয় মূল চরিত্র ফুল্লবার সাবলীল কমেডি ভীষণ উপভোগ্য। অন্যদিকে অষ্টাখুড়াব (সুভাষ ভট্টাচার্য) আড়ষ্টতা তালভঙ্গ করছিল।

জোট সরকারে যেমন মাঝে মাঝে জোট ছাড়ার হুমকি থাকে, এ পালায় মাঝে মাঝে তেমন সঙ্গীত ছিল। হুমকির মতোই হঠাৎ। সুব রচনায শুভেন্দু মাইতি সাধারণ। রূপসজ্জায় অতুল সাহা অতুলনীয়। নেপথ্য নায়ক তারাপদ মুখোপাধ্যায়। বাংলা নাটক নির্দেশনায় কুমার রায়েব কুমাবত্ব সেই কবে ঘুচে গেছে। এখন তিনি এ কাজে 'বাপ' হয়ে গেছেন। তবে মধ্যে ভিড় কমিয়েও এ পালা করতে পারত বহুরূপী।

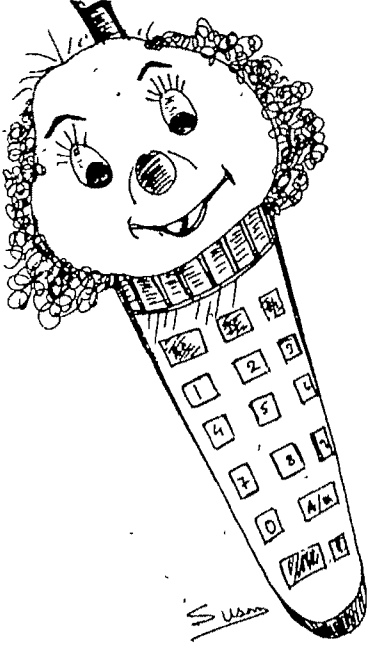
—দিব্যেন্দু দাস

এর মধ্যে কখন ভাঁড় দত্তকে সে চর
করে পাঠিয়েছিল। কালকেতুর সভাসদ
বেশে যমরাজের চর যেমন সরকারি
হাসপাতালে সুপার বেশে ঘোরে!

হ্যালো সঞ্জমিত্রা, আমাদের প্লেনটা হাইজ্যাক হয়েছে। হাইজ্যাকার তোমার বয়স্কেণ্ড। বলছে আমি লাফ দিলেই সবাইকে মুক্তি দেবে।

উচ্চবিত্ত

দিব্যেন্দু দাস



দুধের দাঁত উঠলে ঘাড় শক্ত হয় মানুষের। গলায় টাই উঠলেও হয়। ঘাড়ের তেল-মবিল পকেটে নেমে যায়। উচ্চবিত্ত। তখন চটকবে এদিক ওদিক তাকানো যায় না। যেন কানের পাশ দিয়ে হাইড্রেন বইছে। হাউ ভার্ট! (বাংলায় 'ম্যাগো')! অ্যাটাচি দুলবে না। দুললেই এলেক্ট। মাস্টিনেশানাল খাটি। এমনভাবে অ্যাটাচি বইতে হবে যেন ভেতরে গন্ধমাদন আছে। হাঁটার মধ্যে দ্রুততা চাই। নইলে ফেরিওলা। চলায় ছন্দ চাই। নাপিতের কাঁচি। বন্দ ডিঙোনো চলবে না। পাশ কাটিয়ে যেতে হবে। বাজারের থলে ছুঁতে নেই। ডিস্গাস্টিং! থলে পেছন আসবে। ফলোয়ার। অক্সিজেন কিনতে হয়। জুলাই মাসে ফুলকপি। ডিসেম্বর টেডস। কুমড়ো নিষিদ্ধ। শাক আগে চলত। রোটোরিক্রাবের মেসারশিপের পর শাক বন্ধ। এখন তো শাকপাতা যারা খায় তাদের সেবা কবাব সময়। মেসারে খেয়ে নিলে মানুষে খাবে কি? কে ওদেব দেখবে? কে করবে পবিত্রাণ? এই আমবা—চক্রধারী। হিউম্যানটেবিয়ান প্রজেক্টে ঠাসা জীবন। দয়াব তুবডি। ব্রাইণ্ড স্কুলের ছাত্রদের জন্য ম্যাড্রিক শো। বুপডিবাসীদের জন্যে ফ্লাই-অ্যাশ ব্রিক। উচ্ছেদ প্রফ। পেডমেন্ট চাইশ্দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। দাঁউদ আব দস্ত। সবকটাকে মোবাইল নম্বর দেওয়া আছে। কল মি ইন এনি ড্যাম প্রবলেম। টবলেটে থাকলেও দৌড়ে আসব চেকবই চাপা দিয়ে।

উচ্চবিত্তে ট্রাম-বাসে ওতা দুবে থাক, ধবব ধবব ভাবটাই চলবে না। মানুষ মালগাড়িতে যায়। উচ্চবিত্তের কারপুল। মাসভাড়া করা সুমো। লো

ভাইব্রেশন্। চ্যাটার্জি। চট্টরাজ আর ববিতা। আবাব চ্যাটার্জির উকতে তা দিতে দিতে যায়। ডিভোর্সির তবলা। সঙ্গে গুনসদীত। আমাব বেলা যে যায়—। চট্টরাজ মাঝে মাঝে ড্রাইভারকে সতর্ক করে দেয়। ও ভাই, আই লাভ মাই ইন্টিয়া, সামনে দেখে চালাও।

গলার স্বর ভারী হতে হবে। ডায়েল ভাঁজা গলা। আচমকা পাতকুয়ায় পড়ে গেলে অমন স্বর শোনা যায়। তবে উচ্চবিত্তে, আর্তনাদ নেই। বাবাগো, মাগো নেই। মেরে ফেস্বে রে নেই। কেলিয়ে দিলে বে নেই। 'আউট' আছে। পা মচকে গেলেও যা, ঘাড়ের ওপব গাছ-খসা ডাব পড়লেও তা। আ-আ-আউট। চিড়িয়াখানার ছোলা। হাতিও খায়। হনুমানও খায়।

ফ্রেণ্ড থাকা মাস্ট। বাপ-মা-ভাই-বোনকে টাইটানিকে চড়িয়ে দিতে হবে। এখন কেবল হাসব্যাপ-ওয়াইফ অ্যাণ্ড ফ্রেণ্ড। উচ্চবিত্তের বন্ধু উচ্চতর বিত্তের হতে হবে। তোমাব ট্রাক থাকলে বন্ধুর ট্রেন থাকতে হবে। কবিবাজি হায়েব চে বড় হবে। চ্যাটার্জির বন্ধু মেঘর। চট্টরাজের বন্ধু কমিশনার। ববিতাব বন্ধু বিডিও। তবে সব পত্রমিতালী। অন্যদিকে চায়ীর বন্ধু কেঁচো। পেপাবওলার বন্ধু সাইকেল। উচ্চবিত্তে হাঁচি নিষিদ্ধ। নাক ঝাড়া, নাক খোঁচানো এসব চলবে না। দেখবে উচ্চতমবিত্তে গেলে মানুষ নাকে তুলো গুঁজে শুয়ে থাকে। মাদার কতদিন ক্যাথিড্রালে শুয়েছিলেন। আমাদের গুপিবাবু ম্যানেজার হয়ে রাজধানী ধরে দিল্লি গেল। ফিসপ্লেট ফসকে নাকে তুলো গুঁজে ফিরে এল। গুপিবাবু উচ্চতমবিত্তে গেল। হাঁচি হল নিম্নবিত্তের রুমফ্রেশনার। উচ্চবিত্তে হাঁচলেই হেরে যাওয়া উকিল, মাব খাওয়া টিটি। ফ্যাক্ ফ্যাক্ করে হাসিও চলবে না। গরর মতো নির্বিকার হতে হবে। ভবা হাটে দু'খালা গোবর ফেলে চলে গেল। মানুষ হাটে এসে লংল্যাম্প শিখে বাড়ি গেল। জ্যোতিবাবুকে মনে আছে? হাঁচি, হাসি, মায় হাঁ করতে কেউ দেখেছে? কিন্তু ট্রাম পোড়াতে দেখা গেছে। কী ক্যারিশমা!

আর চাই যোগযন্ত্র। সেলফোন। পাজরের ভেতরে-বাইরে মেশিন। বাইবেরটা বিগডালে কম্যুনিকেশন 'গ্যাপ। ভেতরেরটা বিগডালে যমরাজের পপকে জানে ক'ঘন্টা—'। উচ্চবিত্তে সেলফোন মাস্ট। রণে, বনে, জলে, জঙ্গলে যখনই বিপদে পড়বে আমাকে টিপবে। হ্যালো হনি, বাবাব অশৌচ চলছে। কদিন তোমাব ওখানে খাবো। হ্যালো সঞ্জমিত্রা, আমাদের প্লেনটা হাইজ্যাক হয়েছে। হাইজ্যাকার তোমাব বয়স্কেণ্ড। বলছে আমি লাফ দিলেই সবাইকে মুক্তি দেবে। কী বিপদ। যাত্রীরা সবাই মিলে আমাকে চ্যাংদোলা কবে নিয়ে যাচ্ছে। নিচে টাইটানিকের আটলান্টিক। কী যে হচ্ছে কি বলব! এক স্ত্রী ও তার বয়স্কেণ্ড বেবে বাবা-মাব কাছে ফিরে যাচ্ছি!

পাত্রসুন্দর

শ্রীপর্ণা বসু সেনাপতি

নিচের চৌটটা একটু ভিতরের দিকে ঢোকানো তো দেখেছেনই। সবাই এক কথাই শুধোয়— মেয়ের মুখে কোনোদিন কোনো ব্যর্থ প্রেমিক ঘুষি মেরেছিল কিনা



আমার মেজদাকে নিয়ে বেশ ভালোরকম গাড্ডাতেই পড়েছি। মনে হচ্ছে বয়েস বাড়ার সঙ্গে তেনার মাথার সবকটা ক্ষু আন্তে আন্তে আলগা হয়ে আসছে। দিবি মেজদা ছিল ইলেকট্রিক সাজ-সরঞ্জামের ব্যবসা নিয়ে— কোন বাছের প্যাকেটে দস্তপুকুর ঝলমল বাস ফ্যাক্টরির নামের ওপর ফিলিপস কোম্পানির লেবেল লাগাতে হবে, তামার তার আর প্লাগ সুইচেব 'এ' মার্ক কোয়ালিটি পাস্টে বাড়ির গোড়াউনে উই করা দশ নম্বর পার্টস ভবতে হবে, খদ্দবকে হাসিমুখ দেখিয়ে কিভাবে দশ হর্স পাওয়ার মোটরকে একশ হর্স পাওয়ারের মোটর বলে চালাতে হবে—এইসব আর কি।

বাপ-মা দু'জনেই এপারের মায়া কাটিয়ে পরলোকের বৃদ্ধাশ্রমে চিরস্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার পর থেকেই মেজদার মনে হয়েছে তার এই বোনটিকে এবার ভালোয় ভালোয় পাত্রস্থ না করতে পারলে, অর্থাৎ কিনা আমার নেগেটিভ

কুমারী জীবনকে কোনো মুখপোড়া যদু-মধুর পজিটিভ জীবনের সঙ্গে অবিলম্বে যুক্ত না করতে পারলে তিনি মরে গিয়েও টালার জল আর পাবেন না। আমার বাকি দুই দিদি এর মধ্যেই বিবাহের বাস-টার্মিনাসে লটবহর নিয়ে নেমে গেছে। এবার আমাকেই শুধু সাতপাকের গুণগোলে ঝোল খাওয়ানোটা বাকি!

—পাত্রস্থ আবার কি মেজদা? বাড়িতে তো পেতলের, টিনের, কাঁসার, মাটির—নানা সাইজের নানা ডিজাইনের পাত্র আছে। আমাকে কোন পাত্রটায় রাখবে শুনি?

—ওরে মনু, তোর বয়েসটাই বেড়েছে। বুদ্ধিটা এখনো কিশোর গার্টেনের গণ্ডিতে আটকে আছে।

ধমকের চোটে মেজদার নাকের ডগা থেকে কালো ফ্রেমের হেডপন্টিত মার্ক চশমাটা খুলেই যাচ্ছিল প্রায়,—তোরা মেয়েরা হলি গিয়ে জলের ধারার মতো। কখন যে কোনদিকে মতি হয় তার

ঠিকঠিকানা নেই। রয়েছিস হয়ত বালিগঞ্জে, মন উড়ে চলে গেল সেই রাজস্থানে। খাচ্চিস হয়ত বনগাঁ স্টেশনের মিস্ট্রির দোকানে মাছিবসা কাঁচাগোলা, মন উড় উড় করছে—কখন গিয়ে হলদিরাম ভুজিয়াওয়ালার সিঙ্গাড়া খাব। তোদেব মতো মেয়েদেরকে ধরে রাখার জন্য, মানে পাত্রস্থ করার জন্য একটা মানানসই পাত্র তো দরকার। তাই উপযুক্ত পাত্রের খোঁজে চারদিকে টুঁ মেরে বেড়াচ্ছি। আব কদিন গ্লি ফোরের ছেলেমেয়েগুলোকে ভুলভাল ইংরেজি বাংলা পড়াবি বল তো? এই তো সেদিন শুনছিলাম 'ম্যান' শব্দটাকে বলছিছ অ্যাডভার্স, বাংলা পড়াতে গিয়ে মহর্ষি বাম্প্রীকিকে বলছিছিলি, লব-কুশের পিসেমশাই। আসলে তুইও বিয়েব জন্য ছটফট করছিস।

—এত তাড়াতাড়ি গর্দান নামিয়ে কি হবে মেজদা? সেই স্বপ্নরবাড়ি গিয়ে তো হাত পুড়িয়ে উঁটাচ্ছড়ি রাঁধতে হবে। তারপব আবার খেতে

বসে বর, দক্ষাঙ্গ নন্দ আর শাওড়ি একযোগে তরঙ্গাগান শুরু করবে—হ্যাঁগা, বউমা। বলি বাপের বাড়িতে কি কোনোদিন রান্নাঘরমুখো হওনি নাকি? যা রৈখি সব নুনে পোড়া। বাজারের যত হলুদের গুঁড়ো ছিল সব ঢেলে দিয়েছ তরকারিতে। চোখের আন্দাজও নেই নাকি তোমার বাপু!

—ঘরে বসে ওসব সাতপাচ ভাবলে চিরকাল তুমি আইবুড়োদের সিট্টেই বসে থাকবে ঠাকুরকি।

আমার ডানলোপিলো সদৃশা, কলকাতার বেকবাগান নিবাসী মেজবৌদি পান চিবোতে চিবোতে এগিয়ে এলেন—বলি, বয়েসটা কত হল সেটা খেয়াল আছে তোমার? নাইন্টিন সেভেন্টি ফোরের জন্ম বলে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডে লেখা আছে। আসলে তো তুমি তিরিশ প্রাস। কুমারী জীবন থেকে রিটার্ন করার জন্য ভি আর এস না নিলে বাকি জীবনটা রাস্তাঘাটে, পার্কে, ব্যালকনিতে ছোড়া ঘুঘুকে দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে হবে।

সদর দরজার সামনে সুকতলা ক্ষয়ে যাওয়া জুতোছোড়া দেখেই মালুম হল, পাশের বাড়ির বিষ্ণুমামা এসেছেন। পোস্ট অফিসে ব্যাগ বাঁধা ছাড়াও বিষ্ণুমামার তিনটি পেশা কাম নেশা বর্তমান; পাড়ার কোন বৌদি কোন ঠাকুরপোর সঙ্গে ম্যাটিনি শো-তে “স্বামী কেন ঝাড়ুদার” সিনেমা দেখতে গেছে তার সুলুক-সন্ধান খুঁজে বের করা, বিবাহযোগ্য “কন্যা” সমা মেয়েদের জন্য পিলে চমকানো পাত্রের সম্বন্ধ আনা এবং সপ্তাহে মিনিমাম তিনবার হইন্সি রাম, অর্থাভাবে ফুলুরিকাকুর ঠেক-এর খেনো আর তাড়ি ধারে গিলে মামির চোন্দুটি উদ্ধার করা আর ছেলেকে বাংলা কবিতার বই থেকে ইংরেজি গ্রামারের টেন শেখানো। তবে মিথ্যে বলব না—বিষ্ণুমামার কল্যাণেই দুই দিদির বিবাহ নামক বোটের পুল পার হওয়া সম্ভব হয়েছে।

—আরে নির্মল! অত ভাবলে তো তোমার ব্রাডসুগার আর প্রেশার এমনিতেই পাঁচতলা ছাড়িয়ে যাবে।

যা ভেবেছি তাই; মামা সাতসকালেই হাঁড়িয়া গিলে লালচোখ হয়ে বকবক করছে—মনুর বিয়ের সম্বন্ধ আমি এই আনছি বলে। এমন পাত্র আনব যে গোদরেজের শো-কেসে সাজিয়ে রেখে দিতে হবে।

—ভাবি কি আর সাথে মামা। সম্বন্ধ তো আনলেন বেশ কয়েকটা। মেজদার বিলাপ এবার ঘরময় ছড়িয়ে পড়ে, —সবকটা পাত্র আর তাদের বাপ-মা-রা আগে এসে হাভাতের মতো লুচি-মুরগি আর দই মিষ্টি, থাম্‌স আপ-এর ওপর হামলে পড়ে। যেন সাতজন্মে খেতে পায়নি। হবু পাত্রপক্ষকে গাণ্ডেপিণ্ডে সংকার করতে গিয়েই আমার মানিব্যাগের ডায়েরিয়া হয়ে যাওয়ার দশা। মনুর নিচের ঠোঁটটা একটু ভিতরের দিকে ঢোকানো তো দেখেছেনই। সবাই এক কথাই শুধায়—মেয়ের মুখে কোনোদিন কোনো ব্যর্থ প্রেমিক ঘুবি মেরেছিল কিনা, নয়ত মেয়ের ঠোঁটে কি প্লাস্টিক সার্জারি করা হয়েছে। আজকাল আবার দেখতে আসা পার্টির মনুকে ইংরেজি আর অঙ্ক থেকে মাস্টিপ্‌ল চয়েস প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে। আমি আপত্তি জানালে দাঁতো হেসে বলে, নির্মলবাবু, মেয়ে দেখাটা হচ্ছে প্রাথমিক বাছাই, মানে প্রিলিমিনারি এগজামিনেশন। সমস্ত চাকরির প্রিলিমিনারি টেস্টে ইংরাজি আর অঙ্কের ওপর কয়েশটন থাকে। মনুকে তো জানেনই। স্কুলের পরীক্ষাতে ইংরাজিতে হায়েস্ট মার্কস পেয়েছিল তিরিশ, চার নম্বর গ্রেস দিয়ে। লোয়েস্ট নম্বর দুই। পাত্রপক্ষ চোখ ডাব ডাব করে ওকে প্রশ্ন করলে এমনিতেই ও ঘাবড়ে যায়। নাঃ, কী যে করি।

—যাকগে, চিন্তা ছাড়া বাওয়া! বিষ্ণুমামার নেশাটা আরো জমজমাট হয়ে আসছে বোধ হল, —এবার যে ছেলে দেখছি না মনুমায়ের জন্য, একেবারে সাতঘাটের জল থেকে ছেঁচে তোলা মাল। চারটে সাবজেক্টে এম এ পাশ দিয়ে দিয়েছে। বংশের একমাত্র ছেলে। ‘সংবাদ এইমাত্র’ কাগজ পড়ো তো? ওই কাগজের সহ সম্পাদক। গত মাসে মমতা ব্যানার্জির বিরুদ্ধে গা জ্বালানো সম্পাদকীয় লিখে ছিন্নমূল যুবদলের সৌজন্যে তিনটে হাসপাতালের এমার্জেন্সি ওয়ার্ড ঘুরে এসেছে। কাউকে ছেড়ে দেয় না। কলমের ধার নয় তো, যেন ডবল ক্লুরের প্যাঁচ।

—রত্নটি কে?

কে আবার। আমাদের পোস্টমাস্টার মশাই-এর সুপুত্র কিংগুক। মাথায় অবশ্য চুল কিছুটা কম।

—মাথা গড়ের মাঠ হলেও কোনো ব্যাপার নেই। পাত্র লুজ ক্যারেক্টার না হলেই হল।

সকাল হতেই পিসিমার বিবটি টেনশন। গত পরশু রাতে উনি নাকি স্বপ্নে দেখেছেন, আমার পরলোকগতা মা এবং স্বয়ং মা কালী, দুইজনে এসে একবাক্যে বলছেন—তুলসী, এই পাত্রই মনুর বিয়ে হওয়ার শেষ খব্দে; এরপর আর কোনো আশা নেই। বাকি জীবনটা মিস বা কুমারী শ্রীপর্ণা লিখে চলতে হবে। উচ্ছেদাস্তার পোস্টমাস্টারের একমাত্র ছেলেকে যদি তোমার ভাইবির বলদ না বানাতে পারো তাহলে আর মনুকে কোনোদিনই লাল বেনারসি পরতে হবে না, গায়ে হলুদের পেস্টও মাখতে হবে না। অতএব, শুভস্য শীঘ্রম্।

সাতসকাল থেকে পিসিমা আমাকে তাই চাষার বলদের মতো ঠেলতে শুরু করেছেন। সেই হবু পাত্র হতচ্ছাড়া কিংগুক না হিংগুক, সে নাকি গৌ ধরেছে, পাত্রী যদি শাড়ি না পরে সামনে আসে তাহলে দেখাশোনা করে কোনো লাভ নেই।

—তাকে বলিহারি যাই মনু। —পিসি ঘরে ঢুকেই মুখ স্বামটা দিয়ে বলল, —খিসি মেয়ে হয়েছিস, এখনো শাড়ি ঠিকমতো প্যাঁচ দিয়ে পরতে পারিস না? তাদের ওই এক কি ঢং হয়েছে। খোঁটার মতো লাগে। ঠুং, জন্মতিস আমাদের সময়ে। চোখ ফুটতে না ফুটতেই শাড়ি পরা শুরু করতে হয়েছিল। খোমটা দিয়ে রাখতে হত আধহাত খানেক। না দেখতে পেয়ে কতবার সামনের দেয়ালে ধাক্কা খেয়েছি। শাড়ির খুঁটে আঙুল জড়িয়ে গিয়ে ঠ্যাং মচকেছে কতবার। তবুও বাপু শাড়ি পরা ছাড়িনি। —আলমারি থেকে একটা ভাঁজ করা নীল শাড়ি এগিয়ে দিল পিসি। শাড়ির ভাঁজ খুলতেই পিং পং বলের মতো গোটা পাঁচেক ন্যাপ্থালিন বল ফটাফট বেরিয়ে এসে পায়ের কাছে বসে থাকা পোষা স্পিঞ্জ কুকুর ভুলুর ঘাড়ে মাথায় গিয়ে লাগল। কেঁউ কেঁউ করতে করতে চম্পট দেওয়ার সময় ভুলুর মুখ দেখে মনে হল—বিয়ের পর সংসার-গিন্নির টেনিসকোর্টে গলটপালট হতে থাকা স্বামীদের হরানিটা ও হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছে।

—নে, এই নীল শাড়িটা পরে নে। পিসি বলল, স্বপ্নে অর্ডার পেয়ে তোর মা যখন মুখজোদের বাড়ির ডোবা থেকে কালীমায়ের মূর্তিটা পেয়ে গোয়ালঘরের পিছনে মন্দির বানায় তখনই মা স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেছিলেন, ওরে বাতাসী, মনুর বিয়ে সিঁওর করতে হলে নীল শাড়ি পরিয়ে পাত্রের সামনে নিয়ে আসিস। তুই তো এর আগে কোনোদিনই শাড়ি পরতে চাসনি। এবারটি লাস্ট চান্স। এবার তোকে শাড়ি পরতেই হবে।

—তোমাদের নাড়ুগোপাল পাণ্ডুরটিকে মা কালী কিছু নির্দেশ দেননি

কী জামাকাপড় পরে পাত্রীর সামনে আসতে হবে? রাগে গা জ্বলে গেল আমার। কী পরে আসবে হতভাগটা? লুঙ্গি, না হাফপ্যান্ট? এসেই তো আগে লুচি-মাংস খেয়ে পেট বোকাই করবে। কথা আর বলবে কী করে?

—নে নে, এঁড়ে গল্প মতো তক্কো করিস না তো। পুরুষ মানুষ হল হিরের আংটি। ব্যাকাই হোক, আর সোজাই হোক কিস্সু আসে যায় না।

—হিরের আংটি না কচু। শুকনো ঘুঁটের দামও ওই ছুঁচোটীর থেকে ঢের বেশি। আমি আর না বলে পারলাম না।

—থাক, আব কষ্টমো করতে হবে না। শোন, ছেলের সামনে কি ভাবে যাবি বলে দিই। পটলগাছি প্রাইমারি স্কুলের মাসে পঁচিশ দিন অ্যাবসেন্ট থাকা ট্যারা সুশীল মাস্টারের মতো জ্ঞান দিতে শুরু করল পিসিমা,—খুব ধীরেসুস্থে, শুনে শুনে পা ফেলে পাত্রের সামনে চেয়ারে গিয়ে বসবি। খবদার পাত্রের দিকে কখনো তাকাবি না। মাথাটা নামানো থাকবে। যা যা জিজ্ঞেস করবে ঠিকঠিক জবাব দিবি। ভুলেও যেন বেফাঁস কথা বলে ফেলিস না। তাহলে সব মাটি। পায়ের গোছ যেন শাড়ির বাইরে বেরিয়ে না থাকে। ঢেকেচুকে বসবি।

—তার চেয়ে বলো না পিসি, একটা বোরখা পর। আমি কি তালিবানদের মেয়ে নাকি? যত্নসব।

শাড়ি নিয়ে প্রাণপণে ধস্তাধস্তি করছি। এই সময় হালুয়া মস্তানের হাতে সর্বস্বান্ত হয়ে যাওয়া জগবন্ধু মুদীর মতো হাঁপাতে হাঁপাতে যেমে নেয়ে মেজদা ঘরে ঢুকে ধপাস করে বিছানায় বসে পড়ল।

—কী হল মেজদা? আমি একটু ভড়কে গেলাম। —ইলেকট্রিক বাল্বের প্যাকেটে ভুল লেবেল মেরেছ? নাকি গোয়ালঘর থেকে গরুগুলো মুরগির মাংসের গন্ধে দড়ি ছিড়ে ভেগেছে?

—দূর মুখপুড়ি! মেজদা খেকিয়ে উঠল বাস ফেল করা অফিসবাবুর মতো,—ভোর মাথায় গোবর কবে যে ঘুঁটে হবে। গরু কোনোদিন মুরগির মাংস খায় নাকি! হাঁপাচ্ছি ছেলের বাপ চলে এসেছে দেখে। এই বলে আমার হাতে দশকর্মা ভাণ্ডারের মতো একটা প্রায় ফুট দশেক ফর্দের মতো কাগজ দিয়ে বলল, এই দ্যাখ। ওই গাডলমুখো পোস্টমাস্টার এই ফর্মটা হাতে ধরিয়ে দিল। পরের সপ্তাহে এটা ফিলআপ করে দিয়ে আসতে বলেছে।

—কী লেখা আছে ফর্মে? বিয়েতে কোন কোম্পানির স্কুটার, কোন সাইজের জুতো, কতগুলো নমস্কারি শাড়ি, ক'হাঁড়ি দোকানের টক দই দিতে হবে তার ফিরিস্তি? আমি একটু রেগেই জিজ্ঞেস করলাম।

—আরে সেগুলো তো আছেই। মেজদার হাঁপানি আরো বেড়ে গেল,—ফর্মে আরো কী কী ফিলআপ করতে হবে বলছি, দ্যাখ।

এই বলে দাশ রায়ের পাঁচালি পড়ার মতো মেজদা গড়গড়িয়ে পড়ে গেল। পাত্রীর বয়স কত, মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডে ক'বছর কমানো আছে। পাত্রীর থ্যালাসেমিয়া, হাঁপানি, টিটেনাস বা মাথার কোনো ব্যামো আছে কিনা। কলেজে বা প্রাইভেটে পড়ার সময় পাত্রী কোনো শিক্ষকের সঙ্গে ইয়ে করেছে কিনা। করলে সেই শিক্ষক/শিক্ষকদের স্থায়ী ঠিকানা এবং কোন নম্বর। ডান হাতে না বাঁ হাতে লেখে। ডাক ছেড়ে কান্দে না ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্দে। কী রীতিতে পারে—ইন্ডিয়ান চাইনিজ, না মোগলাই। ভূতের গল্প না প্রেমের গল্প পড়ে। সপ্তাহে ক'দিন সিনেমাতে যায়। একসঙ্গে কতগুলো কাপড় কাচতে পারে। ঝগড়া করার অভ্যাস আছে কিনা। দিনে মাথা থেকে কতগুলো চুল ওঠে। রক্তের গ্রুপ কি। হাইলি জুতো না প'রে হাইট কতটা। হেঁটে ক'মাইল যেতে পারে। আরো অনেকগুলো আছে।

সবকটা বলতে গিয়ে আমার জিভ শুকিয়ে আসছে।

আমি চুপ করে থাকতে পারলাম না। মুখঝামটা দিয়ে মেজদাকে বললাম, কেন, অত প্রশ্নের ফোয়ারা কীসের? পাত্র কি কার্তিকের পিসতুতো ভাই নাকি যে সব কিছু ওনাকে জানাতে হবে? ঈঃ, নিজের ছেলেকে গিয়ে দেখ—আমাশা, সর্দি, খোস-পাঁচড়ার ডিপো। ছাত্রী পড়াতে গিয়ে নিজে কতগুলো মেয়েকে কোলে বসিয়েছে তার গোনামন্তি নেই। ওর বাপকে বলো অত প্রশ্ন যেন সেপ্টাল জেলের ছিঁচকে চোরগুলোকে গিয়ে করে।

—অমন বেকো বসিস না রে মনু। কিংগু ক হাঁদারামটা বংশের একমাত্র সলতে। বুলে পড়, বুলে পড়। ওর কোলবালিশ মার্কা বোনটাও নাকি গুনছি কোন একটা লরির মালিক ছোকরার সঙ্গে লাইন মারছে। এই নিয়ে ওদের বাড়িতে হেভি গ্যাঞ্জাম। ছেলোটা ভোঁদা আছে। বোনটা সিন থেকে আউট হয়ে গেলে বুড়োবুড়িকে বগলদাবা করে স-অ-ব কজা করে নিতে পারবি। আমি গিয়ে দেখে এসেছি। দু'খানা দু'তলা বাড়ি। বিশাল জমিজমা, টিউবওয়েল, ট্যাপ ওয়াটার, চারদিকে পাঁচিল। ছাদে আবার দোলনা আছে। দিবা দুপতে পারবি। কিংগুককেও দোলাতে পারবি—দোদুল দুল, দো-দুল দুল, পোস্টমাস্টারকে বানাবি ফু—ল। নে নে, চল। সব তোকে দেখবে বলে বসে আছে।

দোতলার বারান্দায় ওনারা সব বসে খচর মচর করে মুরগির ঠ্যাং আর লুচি চিবোচ্ছেন। কিংগুক হতচ্ছাড়ার বাপকে দেখে গা-পিস্তি জ্বলে গেল আমার। আর খাব না, মাকাল ডাক্তারের বারপ আছে—বলতে বলতে অলরেডি বুড়ো পেটে দশটা লুচি আর সাত পিস মুরগির মাংস চালান করে দিয়েছে। আমাকে দেখেই এমন মুখভঙ্গি করল যেন তিন গ্রাস নিমপাতা থানকুনি আর কালমেঘের রস বেস্ট জোর করে গিলিয়ে দিয়েছে। জুলজুল করে মুখের দিকে চেয়ে পোস্টমাস্টার মশাই-এর মুখ দিয়ে একটাই শব্দ বেরোল,—“ঈঃ!”

—ভালো আছেন তো? আচ্ছা কোথায় যেন দেখেছি আপনাকে?

পাত্র কিংগুকের এই বেয়াড়া প্রশ্ন শুনে চিহ্নটিকে ভালো করে দেখলাম। মাথায় গড়ের মাঠ কি, এ তো দেখছি একেবারে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন। শুধু টাকের চারদিকে ঘিরে শনিগ্রহের বলয়ের মতো কিছু চুল রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে কিছু পাকা চুলের গোছাও চোখে পড়ল। ছেলে সত্যিই কার্বাইড দিয়ে পাকানো মনে হচ্ছে। টাকের চুলগুলো অবশ্য সব এসে জমেছে নাকের নিচে। ইচ্ছে করলেই সাইকেলের হ্যাণ্ডেলের মতো গৌফজোড়া ধরে বুলে পড়া যাবে। বাপ ছেলে দু'জনেরই দেহটা বাংলা বর্ষামালার ‘খণ্ড ত’-এর মতো। লুচি-মাংস গেলার পর ভুঁড়িদুটো মনে হল আরো সামনে এগিয়ে এসেছে। কিংগুকের দেহের উপরের দিকটা মনে হল এক খাবড়া মেয়ে কেউ ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়েছে।

ছেলের প্রশ্ন শুনে দু'কুঁচকে তাকিয়ে আছি দেখে ছেলের বাপ উত্তর দিল। যথারীতি ফোকলা দাঁতের ফাঁক থেকে কয়েকটা হাড়ের টুকরো ছিটকে এল। একটা আর একটু হলে আমার খাবড়া নাকে এসে হিট করছিল।

—এই প্রশ্নটা করা কিংগুকের মুদ্রাদোষ, মামনি। ও যাইই সাক্ষাৎকার নিতে যায় তাকেই এই প্রশ্নটা করে। গত সপ্তাহে সোনাগছিতে মেয়েদের পাড়ার একজন মাসির আর শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে নেতাজির মূর্তির সামনে বসে থাকা একজন পাগলের ইন্টারভিউ নিতে গিয়ে কিংগুক এই প্রশ্ন দিয়েই শুরু করেছিল।

যা ভেবেছি তাই। কিংগুকের পাশ থেকে ওর হৃদয়মুখো ছোট বোনটা

কটমট করে আমার দিকে তাকাচ্ছে। ছুঁড়িটার গাল দুটো দেখে মনে হচ্ছে দুটো পাঁচটাকা দামের মালপোয়া মুখে ভরে রেখেছে। মাঝে মাঝে আবার চোখ বেকিয়ে তাকাচ্ছে। ভাবখানা এমন, তোমার মতো ময়লা রং-এর মেয়েকে আমার দানাব বিয়ে করতে বয়েই গেছে। আমার গায়ের রংটা দেখেছ, একেবারে আগমার্কা ঘি়ের মতো। আমার সঙ্গে ছোঁড়াগুলো লাইন মারবে না তো কি তোমার মতো পেড়ির সঙ্গে মারবে?

বিষ্টকাকু আজকে পাত্রপক্ষের গাইড হওয়ার খাতিবে জল একটু বেশিই খেয়ে ফেলেছেন মনে হচ্ছে। তিনি খিমুতে খিমুতে বললেন, বাওয়া কিংগুক, একেবারে নিকে নাও, শ্রীপার্ণার মতো মেয়ে তুমি দেড় লাখে একটাও খুঁজে পাবে না। বাড়ির ওপরতলা থেকে নিচেরতলা নামলেই ওর পায়ে ব্যথা করে। পাড়ার কোনো ছোকরাকে চেনা তো দূরের কথা, তাদের নামই ও জানে না। কাঠের আঁচেও রান্না করতে পারে, আবার গ্যাসেও রাঁধতে চোকস। সেই ছোটবেলা নাকে সিগনি ঝরার বয়স থেকে দেখছি তো! দশটা প্রশ্ন করা হলে একটা উত্তর দেয়। তোমাদের বাড়ি গিয়ে সংসারের সব কাজেই ও অলরাউণ্ডার হয়ে উঠবে। আমার কথা যদি মিথ্যে হয় তাহলে উচ্ছেদাঙ্গার হাটের মধ্যে সঙ্কলের সামনে জুতো খুলে আমার দু'গালে পটাপট, পটাপট করে মারবে।

কিংগুক এবার তার হলুদ ছোপ ধরা বত্রিশপাটি দাঁত বের করে হাসল,—‘হেঁ হেঁ স্-সে তো হ-হল। এবার এ-একটু ভ-ভিতরে ঢুকতে হ-হচ্ছে?’

মালটা বলে কি? কোথায় ঢুকবে? কী জন্য ঢুকবে? চোর-ছাঁচড় বাটপাড় নয়ত? ঘরের মধ্যে ঢুকে কোথায় কি জিনিসপত্তর আছে দেখে গেল। কাল হয়ত ওর চ্যালাচামুগুরা এসে সব ফাঁকা করে দিয়ে চলে যাবে।

—অত ঘাবড়ে যাওয়ার কিছু নেই গো দিদিভাই। কিংগুকের বোনটা ইনিয়িং বিনিয়িং বলল, আসলে দাদার যা কাজ প্রত্যেকেরই অন্তরঙ্গ সাক্ষাৎকার নেওয়া, যাকে বলে এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউ। ওই জন্যে ও তোমাকে ঘরের মধ্যে ডেকে নিয়ে গিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করতে চায়।

আড়ালে আমাকে নিয়ে গিয়ে কোন প্রেমের বাণী শোনাতে কে জানে? আমি তাড়াতাড়ি বললাম, না না। যা বলবার এখানেই বলা হোক।

মেজদার রেগেমেগে আমাকে বোধহয় ভিতরে যেতে বলছিল, তখন কিংগুকই হাত তুলে ভ্যাবার মতো হেসে বলল, ন-না ঠিক আছে। উ-উনি য-যখন, ব-ব-ব-”

বুঝছি। পাত্রবাজির জিভ এখন আলটাকবায় সেটে গেছে। পিঠে দুটো জম্পেশ থাবড়া বা মাথাতে দুটো রাম চাঁটি মারলে তবেই যদি আবার জিভটা কথা বলা স্টার্ট করতে পারে। কিংগুকের বাপ বলল,—কোন্ড ড্রিঙ্কস যে গ্রাসগুলোতে দেওয়া হয়েছে সেগুলো দেখছি প্রি এক্স রাম-এর স্ট্যাম্প মারা। বাড়িতে মদ্যপানটান চলে নাকি?

মেজদার মুষ্ঠা একটু ঝুলে পড়ল। বিষ্টমামার সৌজন্যে মাঝেমাঝেই তাস খেলতে খেলতে গলাতে একটু ঢালার অভ্যাস আছে মেজদার। আর গ্রাসগুলো প্রায় সবকটাই বিষ্টমামার সৌজন্যে প্রাপ্ত।

অবস্থা হাতেব বাইরে চলে যেতে পারে দেখে পিসিমা তড়বড়িয়ে বলে উঠলেন, না-না ওসব নেশা-টেশার চল এখাডিতে মোটেই নেই। মা কালী স্বপ্নে দেখা দিয়ে একবার বলেছিলেন এ বাড়ির কেউ মদ্যপান করলেই তাঁর অভিশাপে ক্যান্সার আর গেষ্টেবাতে ভুগবে। তুমি ভেতরে গিয়ে শ্রীপার্ণার সঙ্গে একলা কথা বলতে পারো, বাবা কিংগুক, আমরা কেউ কিছু

মনে করব না।

গুরুজনের আদেশ। অগত্যা ঘরের মধ্যে গিয়ে বসতে হল। কিংগুক অবশ্য একা ঘরে ঢুকল না, সঙ্গে ওর ধুমসোপানা বোনটাও আছে। কে জানে, কিংগুকের কথার ইঞ্জিন মাঝে যদি ফেল মেরে যায় তবে ও-ই হবত গিয়ার মেরে দাদাকে চালু করে দেবে।

—বুঝলে তো! স্-সাংবাদিকতা করি। ওইজন্য স্-সবাইকে প্রশ্ন করার বদভ্যাসটা আছে আর কি।

বাটাচ্ছেলে যেন সাংবাদিক হয়ে কৃতার্থ করে দিয়েছে। মেজদাকে বলেছে মাসে নাকি ছ’ হাজার কামায়। সব গুল! যা পায় তা দিয়ে বিয়ের বেনারসি শাড়ির আন্ধেকটাও কেনা যাবে না।

—ক-কি? চ-চশমাটা দে-দেখে নিশ্চয়ই ভাবছেন আমার চোখে পাওয়ার খ-খুব বেশি? এটাতে এ-একদম পাওয়ারই নেই।

আমি আর থাকতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার তাঁহলে কোনো পাওয়ারই নেই বলছেন? একদমই পাওয়ারলেস?

—ন-না-না, প্-পাওয়ার নেই কে বলেছে? কিংগুকের ড্যাবা ড্যাবা চোখদুটো যেন মাথার খুলির মায়া ত্যাগ করে বাইরে ছিটকে বেরিয়ে আসতে চাইছে—খু-খুব কম পাওয়ারই আছে। ও-ওটা হল গিয়ে জি-জি-জি....

দাদা ব্রেক ফেল করে যাচ্ছে। হোঁৎকা বোনটা এবার কথার স্টিয়ারিং ধরল,—জিরো পয়েন্ট ওয়ান সিঙ্গ! দাদার সব পাওয়ার হল কলমের ডগায়। এই তো সেদিন অ্যায়সা লেখা লিখল, বড়বাজাবের আলুরাম কাঁথাওয়ালার সাত পুরুষের ব্যবসাক্ষেত্র থেকে চোরাই লোহালকড় আর নানা গোলমেলে জিনিস খুঁজে পাওয়া গেল। আলুরাম এখন জেলের যানি টানছে আর ছাড়া পেয়ে দাদাকে কিভাবে বাঁশ দেওয়া যায় তার হয়ত ছক কষছে।

সাংবাদিকদের দেখলেই আমার অ্যালার্জি চলে আসে। দশ পকেটওয়া ট্রাউজার্স, সবকিছুতে নাক (এবং কান) গলানো এবং গবগবিয় হাভাতের মতো লাঞ্চ টাইমে মুরগির ঠ্যাং চিবানো। শুনেছি সাংবাদিকদের মধ্যে নাকি অনেকেই একটু আধটু লালজল সেবন করে থাকেন। গার্লফ্রেন্ডদের সঙ্গে এনাদেব সম্পর্কটা একটু ইয়ের মতো না হলে নাকি স্মাগলার ডনদের গলায় প্রশংসার মালা পরিয়ে গাছের মগডালে পৌছে দেওয়া যায় না। আবার নেতাজি গান্ধীজিদের কার কি চরিত্রের দোষ ছিল সেটাও নাকি পেটে জল না পড়লে খুঁজে বের করা যাবে না।

—ব-বুঝতেই পারছেন, একটু আধটু ইংরেজি প্-পড়িয়ে থাকি। বলে কিংগুক এমন হাঁ করে দম নিল যে গোটা তিনেক মাছি অনায়াসে জেট প্লেনের মতো ডাইভ মেরে ওর পেটে ঢুকে যেতে পাবে।

—সেই সূত্রে অ-অনেক হে-হেভি দেখতে মেয়েকে প্-পড়াতে হয়। তা ব-বলে যেন কখনোই ভাববেন না আমার স্-সঙ্গে কোনো ছাত্রীব লটার পটরের সম্পর্ক আছে। আমি বেদ উ-উপনিষদের উপদেশ ম্-মেনে চলি কিনা। আমার কাছে গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক হল গিয়ে বা-বা-বা.....

কিংগুক, রামছাগলেব মতো ব্যা-ব্যা করা শুক করেছে দেখে বেজার মুখে ওর বোনটা দাদার কথার পাদপূবণ কবে দিল,—বাবা আব সঙ্কানের সম্পর্ক। দাদা কোনোদিন মুখ তুলে মেয়েদের দিকে তাকায় না। যখনই কোনো মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে হয় তখন মেয়েদের নিচের দিকে, মানে পায়ের দিকে তাকিয়ে কথা বলে, বুঝলে দিদিভাই?

বুঝব না আবার। ব্যাটা বিড়াল তপস্বী, মেয়েদের পায়ে দিকে তাকাবে না তো কি। তা না হলে মাথায় আর পিঠে হাই হিল জুতোর খাপড় কতটা জোরালো ভাবে পড়বে সেটা ওর মালুম হবে কী করে। আর প্রেম! কোন হতভাগিনী ওর সঙ্গে পিরিত করতে আসবে? কোনো মেয়ে হয়ত আসতে পারে, তবে কিংগুকের মাথার মরুভূমিতে দিন কয়েক হাত বুলিয়ে মটনচপ মাংস কোবরেজি খেয়ে গঙ্গার ঘাট ভিক্টোরিয়া নিকোপার্ক চক্কর মেয়ে আর নিউ এম্পায়ার মেট্রোতে ড্রেস সার্কলে সিনেমা দেখে পিছনে দু'টো চাঁটি মেয়ে ভেগে যাবে।

—ব্যাড়িতে তো আমাদের ক্-কেউই নেই। শৃ-শুধু আমার বাবা-মা। ব-বোনের তো দিন কয়েক পরে বিয়ে হয়ে যাবে। আমরা চ-চাই যে আ-আ-আ.....

এবার আবার কিংগুকের বোন দাদার জ্যাম হয়ে যাওয়া কথাকে উদ্ধার করল,—আমরা চাই যে আমাদের সংসারে পূত্রবধু হয়ে যিনি আসবেন তাঁকে আমাদের মা-বাবার দেখাশোনা করতে হবে। মানে বাবা-মায়ের সাথে তো কথা বলার লোক নেই। দাদা বাইরে বাইরে চক্কর মারে। আমাকেও ট্রাভেল ট্রারিজম নিয়ে কোর্স করার জন্য এদিক-সেদিকে বোরাঘুরি কবতে হয়। বাবা-মা আবার দু'জনেই বাতের পেশেন্ট। সেই জন্যেই একটু দেখাশোনা করা আর কি....

আদিখ্যাত। তুমি মাল যে ট্রারিজম কোর্স নিয়ে কতটা নেকাপড়া করে বুঝতেই পারছি। বোরাঘুরি মানে তো ওই ছোকরাটার লরিতে, থুড়ি ট্যাক্সিতে করে ঢলাঢলি করতে করতে গোটা কলকাতা ট্রার করে বেড়াও। তোর বাপ-মায়ের ব্যথা তো আমার দায় পড়েছে। ষ্টু। বিয়ের পর কোথায় তোর ওই গোবর গলেশ দাদাটাকে দিয়ে পদসেবা করাও, তা না, বুড়োবুড়িদের পায়ে গরম সেক দিতে হবে?

চুপটি করে আছি দেখে কিংগুক আবার দাঁত বের করল,—আ-আমাদের বিয়েতে দ-দাবীদাওয়া কিছুই নেই। শুধু আমাকে একটা ক্যা-ক্যা-ক্যা.....

ক্যারাম বোর্ড দেওয়ার কথা বলছে নাকি ব্যাটা। ওর থেকে আমি ঢের ভালো ক্যারাম খেলতে পারি। ফুলশয্যার রাতেই ওকে নিল গেম-এ মাত করে দেব। ওর বোনটা আবার আমার ভুল শুধরে দিল, আসলে দাদার একটা এস এল আর ক্যামেরা কেনার বহুদিনের ইচ্ছে। বিপোর্টিং করতে এখানে সেখানে যেতে হয় তো। ক্যামেরাটা সঙ্গে থাকলে ওর সঙ্গে আর একস্ট্রা ক্যামেরাম্যান থাকার দরকার নেই। অবশ্য ছবি তোলাতে দাদাব হাত এখনো পাকেনি। সেদিন ওর ফোকাস ফ্রি ক্যামেরাতে আমার ছবি তুলেছিল। ডেভেলাপ করার পর দেখা গেল সবই ঠিক আছে। শুধু আমার মাথার ছবিটাই ওঠেনি।

ছুটোটা নিজের দাঁত মাজার ব্রাশটাই বোধহয় ভালো করে ধরতে পারে না। ক্যামেরার শাটার কি করে টিপবে কে জানে। ক্যামেরা দিয়ে ওরু। এবার আস্তে আস্তে ফর্দ খুলতে শুরু করবে—ক্যামেরার টেলিফোনে লেপ, স্ট্যাণ্ড, কমপক্ষে একটা ফ্রিজ, একটা ছোট রঙিন টি ভি, একটা গৌদরেজ আলমারি—এসব আর কি!

নাঃ, আর পারা যায় না। কিংগুকের তো তৌতলা ভাষণ বহুক্ষণ শুনেছি। এবার একটু ব্রেক কষাতে হচ্ছে। না হলে ব্যাটার বক্তৃতি আর বন্ধ হবে না। ওর কুমড়োমার্কি ছোটবোনটাকেও জব্দ করা দরকার।

আমি এবার ধীরে ধীরে মুখ খুললাম,—হুঁ, আপনার কথা সবই

শুনলাম। বুঝতেই পারছেন—এ যুগটা হল ছেলে-মেয়ে পাশাপাশি চলার যুগ। এ ওকে মাধ্যম চাঁটি মেয়ে চলে যাবে, সেটা হতে পারে না। সুতরাং, প্রস্তাবিত পাত্রী হিসেবে আমারও কিছু বলার আছে। দেখবেন, চোখ উল্টে আবার মৃগী রোগীর মতো ফিট হয়ে যাবেন না যেন।

বোনটার খোবড়া একটু বুলে পড়ল আমার কথা শুনে। কিংগুকেরও অবস্থা দেখলাম তথৈবচ। চোখগুলো দেখলাম তাক্সব হয়ে কোটর ঠেলে বেরিয়ে আসছে। যেন পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্যের কথা শুনছে।

—ফুলশয্যার রাতে নতুন বৌ-কে আংটি বা কানের দুল দিতে হয় পাত্রকেই। বাবা কিংবা মামা-মেসোর থু হলে চলবে না। অনেক সময় ফুটপাথের রোশডগোশড বা কুড়ি টাকার ইমিটেশন দিয়ে পাত্ররা মেকআপ দিতে চেষ্টা করে। সেটা হলে হবে না বলে দিচ্ছি কিন্তু।

—আ-আংটি। ম-মানে মিনিমাম দু'হাজার! কিংগুকের শুকনো গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোল।

—এরপর আছে অষ্টমঙ্গলা। আমি-বললাম, মেয়েকে বাপের বাড়িতে বরকে নিজে নিয়ে আসতে হবে। ওই সময় বাপের বাড়ির প্রত্যেককে নতুন শাড়ি, ধুতি আর জামাপ্যান্ট দিতে হবে। এসপ্লান্ডেডের মেট্রো সিনেমার সামনে বিক্রি হওয়া ঘাট কা ইমপোর্টেড মাল ঝাড়লে চলবে না।

কিংগুকের মুখটা এখন এত বেশি হাঁ হয়ে গেছে, ইচ্ছে করলে গোটাকয়েক ম্যালেরিয়ার মশা তাদের হোল ফ্যামিলি নিয়ে ভিতরে সঁধিয়ে যেতে পারে।

—নতুন শাড়ি? মানে চার ইনটু ওয়ান, আর জ-জামাপ্যান্ট.....

বুঝতে পেরেছি, চার ইনটু ওয়ান মানে আমার চার দিদিব কথা বলছে। জামাপ্যান্টের হিসেব করতে গেলে ওকে ক্যালকুলেটর নিয়ে বসতে হবে। মেজদা, বড়দা বাদে জ্যাঠাতুতো দাদারা আছে। তাদের গণ্ডদুয়েক ছেলে। আর বৌদিদের কথা তো বলাই হয়নি।

—এটুকু শুনেই ভির্মি খেলে চলবে না মশাই। আমি একটু পেচিয়ে পেচিয়েই বললাম, হানিমুন বা মধুচন্দ্রিমা বলে একটা ব্যাপার আছে। সেই বাঁধা গৎ-এর ধ্যান্ডেড়ে মুকুটমণিপুর বা বকখালি বা দাঙ্গিলিং নিয়ে গিয়ে ফেললে চলবে না। সাউথ ইন্ডিয়ান মাদুরাই বা কোরালার কোভালাম সী বিচ না হলে হানিমুন জমে নাকি? তবে হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে ক্লাশে গুতোপ্তি করে যাওয়া আমার পোষাবে না। ফার্স্ট ক্লাশ এ সি চেয়ারকাব চাই।

আমার কথা শুনেই কিংগুক 'আঁক' করে একটা শব্দ করল। এরপর বুকে হাত চেপে ধপ করে মাটিতে বসে পড়ল। খাবি খেতে খেতে বোনকে বলল, ওরে, আ-আমার ম-মাথাটা মনে হচ্ছে ধ-ধড় থেকে খ-খুলে বেবিয়ে আসবে। একটু জ-জ্বল দে শিগুগির। এত টাকা ম-ম্যানেজ করতে হলে আমাকে হা-হাটে দ-দশবার বিক্রি হতে হবে।

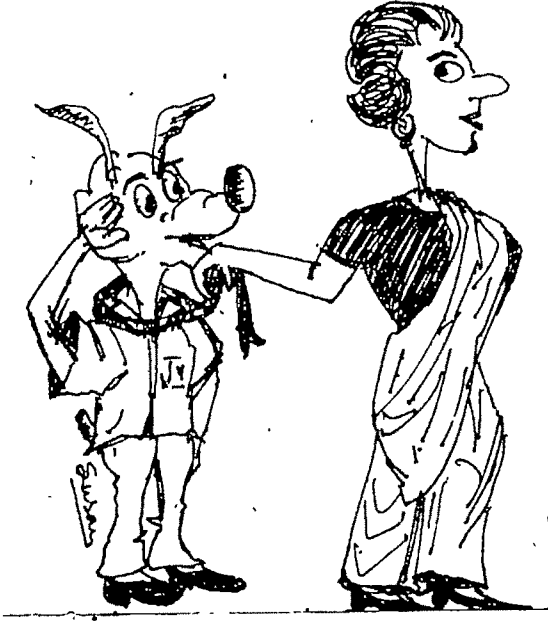
—এখনো তো ব্যাক ব্যালান্সের কথা বললাম না। আমি ছেড়ে দেওয়ার পাত্রী নই,—কমপক্ষে লাখ দু'য়েক টাকা আমার নামে ফিল্ড ডিপোজিট করে রাখতে হবে। কখন কোথায় রিপোর্টিং করতে গিয়ে আপনি টেসে যান তার ঠিক নেই। সেজন্যই.....

কিংগুক ততক্ষণে টাক চেপে ধরে 'মেঝেতে লম্বা হয়ে পড়েছে,—ওরে মনু, থামা।

মেজদা হাঁ হাঁ করে দৌড়ে এল,—এখানে ব্যাটা পটল তুললেই চিঙ্গি। সবাই হাতে হাতকড়ি। ফুলের মালার বদলে দড়ির মালা পরতে হবে!!

সহধর্মিনী সমাচার

প্রবীর হালদার



অবসরপ্রাপ্তদের আসরে বিয়ের প্রসঙ্গ উঠতেই রসিকরঞ্জনবাবু বলে ওঠেন, 'হে নরগণ, বিয়ে করা মানেই 'বিশ্বস্ত বানর হওয়া'। অ্যাব্রিভিয়েশন বি-বা-হ।

শ্যামাকান্তবাবু বলেন, বেড়ে বলেছেন রসিকরঞ্জনবাবু। শুভদৃষ্টির আগে মালা বদলানোর জন্য গলা বাড়ানোটা হল গিলোটিনে গলা দেবার নামাস্তর। বিয়ের রাতে সোনাব নেকলেসটি দু'লিয়ে নববধূ পতিদেবতার গলদেশে যে বরমালাটি ঝুলিয়ে দেয়, সেটাই বিবাহোত্তর জীবনে লর্ড কর্ণওয়ালিশের বন্দোবস্তের মতো চিরস্থায়ী অদৃশ্য বকলেশ রূপে কাজ করে। অষ্টমঙ্গলার পর অষ্টপ্রহর একজন ম্যারেডম্যান হল ঠিক যেন একটি পোষা ডোবারম্যান।

সুখময়বাবু বলেন, ঠিক বলেছেন, আমিও আপনার সাথে একমত। একেবারে এক খোলার বাদামের মতো। একদিন সানাইয়ে পুরবীর মিষ্টি সুর শুনতে শুনতে পরমানন্দে সাতপাক ঘুরে নবোঢ়া নরজাহানটিকে ঘরে তুলেছিলাম। দাম্পত্য জীবনের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় আঠাশ বছরের পুরনো গিমির কণ্ঠে সে সুর এখন বজ্রপাতের নিষেধি ঘোষণা করে চলেছে। প্রথম জীবনে মনে হত, আমরা যেন মেড ফর ইচ্ছা আদার। একেবারে সরাসরি সালানীর শায়েরীর মতো, 'চমনমে ইখলাতে রঞ্জে বুঁসে বাৎ.বনতি হয়। হামহি হাম হয় তো কেয়া হাম হয়। তুমহি তুমহো তো কেয়া তুম হো।' মানে হল—বাগানে যে ফুল ফোটে, রং আর সুরভি মিলনেই তার সার্থকতা। তেমনি আমাদের দু'জনের মিলনেই আমাদের চরম মূল্যায়ন, আমাদের জীবনের পূর্ণতা। একা আমি তো অসম্পূর্ণ। একা তুমিও নেহাৎই মূল্যহীন। আমরা তখন দু'জনে যেন দাম্পত্য জীবনের গঙ্গাজল ভরা

কোষাকুধী। আর এখন শুধুই কষাকষি। এখন বুঝেছি—স্বামীসেবা, পতিভক্তি, পতিপ্রেম দ্রুততম উদ্বায়ী বস্তু। যার বাষ্পীভবন কর্পূর এবং স্পিরিটকেও দস্তুরমতো লক্ষ্য দেয়। এখন আমি নিতান্ত এক নরমাংসের পিসার হেলানো মিনার। গিমির মাশালি অর্ডারের আগেই ঘাড়টাকে সবসময় হ্যাঁ বাচক অ্যাপ্লে কং করে থাকি। সাথে কি অনেক আগে আমার মাথার চুলগুলো পেকেছে? ওগুলো যে সন্ধি-পতাকা। শুভতার মাঝে পং পং করে উড়ে বলে—সন্ধি চাই, শান্তি চাই।

সদানন্দবাবু বলেন, শ্বশুরালয় থেকে আমিও একটি প্রলয়ের দেবীকে স্বগৃহে সংস্থাপন করেছিলাম। এমন খানদানি বউ আমদানি করা দুর্লভ ব্যাপার। ঠিক যেন মহাভারতের অম্বা। নৈব স্ত্রী ন পুমানিহ। নারীজন্মে তার যেমা ধরে গেছে। তিনি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নিকুচি করে সার্থক পুরুষ হতে চান। 'স্ত্রীভাবে পরিনির্বিম্বা পুংস্তার্থে কৃত নিশ্চয়া।' একেবারে নারী লক্ষ্মীবাস্তির জামি। ভাবটা যেন, আগে তোমবা, পুরুষেরা, আমাদেরবে মরা স্বামীর চিতায় ঠেলে পাঠিয়েছ সহমরণের দোহাই পেড়ে। এবার তোমাদেরকে জ্যাস্ত পুড়ে মরার হাত থেকে বাঁচাবে কে? তাই জীবনের কড়াইতে নিরন্তর সাঁতলে চলেছে। কিন্তু বলাও দায়। পুরুষ রাগলে প্রলয় নাচন। আর নারী কুপিতা হলে একেবারে দশমহাবিদ্যার আসল রূপ দেখিয়ে লাস্ট সিন ড্রপ করবে। মহালয়া শোনানি? জাগো দুর্গা জাগো দশ প্রহর গারিনী। তার ক্রোধ নিবাপিত করার একটাই মন্ত্র। দেহি পদপদ্মব মুদাবম্। আমি ভাই ইহুদি প্রবাদবাক্যটা মেনে চলি, It is better to live in a corner of the house top than to share a specious house with quarrel some wife.

প্রাণবল্লভবাবু বলেন, স্ত্রীয়াশচরিত্রম্ দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ। বিয়েব আগে ভাবতাম WIFE কথাটির অর্থ হল Wonderful Instrument For Enjoyment. কিন্তু এখন তার সংজ্ঞা পাশ্টেই হয়েছে Worries Invited For Ever. সুতরাং জ্বলতে তো হবেই। তেনারা বিয়ের পরেই সাপের মতো খোলস পান্টাতে শুরু করেন। পতিকে নতি স্বীকার না করিয়ে তাঁদের গৃহপূজা শুদ্ধ হয় না। মাথা তুলতে গেলেই ঝাপড় খাবে। ফেমিনিস্টের ঝাপড়। কে বলে দাসপ্রথা উঠে গেছে? যতই প্রেম করে বিয়ে করো না, জেনে রাখো কুইদাস, তোমাকেও হতে হবে ক্রীতদাস।

বলহরিবাবু বলেন, তা তো হবেই। এখন উইমেন্স লিভ-এর যুগ। সেদিনের অবলা বালিকারা এখন ফেমিনিজমের পতাকা ওড়াচ্ছে। মুখে মহাবিপ্লবের খড়কুটো। নারী আন্দোলন। নারীমুক্তি। নারী জাগরণ। নারী উন্নয়ন। নারীদিবস পালন। আরো কত কি। নারীবাদী অবিবাহিতারা একটু আধটু লাফাক-ঝাঁপাক, ক্ষতি নেই। কিন্তু এয়েতীরা অতি বাড় বাড়বে কেন? সতী-সাবিত্রীরা আজ যেন এক-একজন বিদ্রোহী সীতা। মানব না লক্ষণের গণ্ডি। কেন মানব? আগে ছিল মাতৃতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা। বৈদিক যুগে বারো বছরের ব্রহ্মচর্য সেরে শিষ্য যখন স্বগৃহে ফিরত তখন আচার্য

তার সমাবর্তন ভাষণে প্রথমেই বলতেন—মাতৃদেবো ভব। পরম ব্রহ্মের উপাসনাতেও আগে মা। হুমের মাতা চ পিতা হুমের। তাই কাজ নেই কাজিয়ায়।

বিপদভঞ্জনবাবু বলেন, ওদের সাথে ষ্ঠেরেখে যাওয়াটা ভীষণ রিকি ব্যাপার। সাক্ষাত দেবী দশভুজা। সবসময় অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত। হাতা, খুঁটি, চাঁটু, বেলুনি, বাঁটি, নারকেল-কোরানি, কুরুষ-কাঠি, উলের কাঁটা থেকে মায় বাঁটা, ঝুল-ঝাড়নি, উনুন-খোঁচানো শিক ওদের হাতের কাছে সবসময় মজুত। বেশি কিছু বলতে গেলে কাঁটা চামচ দিয়ে দু'চোখ তুলে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র বানিয়ে দেবে। অবশ্য ওরা নিজেরা কোনোদিন গান্ধারীর মতো চোখে ব্যাণ্ডেজ বাঁধবে না।

হংসধ্বজবাবু বলেন, গান্ধারী! আহা কী পতিব্রতা! স্বামীর অন্ধত্বের জন্য নিজে সারাজীবন চোখে কাপড় বেঁধে রেখেছিল। আর আমার অর্ধাঙ্গিনী তো আমার চোখে একফোঁটা আইড্রপ দিতেই চায় না। বলে, 'ভগবান তোমার হাতদুটো দিয়েছে কীসের জন্যে? নিজের চোখের ওষুধ নিজেই দাও। চোখে ছানি বাধাতে কে বলেছে? শুধু 'চোখে দেখতে পাই না' বলে কাজ না করার ফন্দি। পতিব্রতা এখন শুধু শাস্ত্রের পাতায়। আর্তাত্তে মুদিত হুঁটা প্রোষিতে মলিনা কৃশা। মৃত্তে স্রিয়তে যা পতৌ সা স্ত্রীজ্ঞেয়াপতিব্রতা।

বংশীধরবাবু বলেন, মানে?

হংসধ্বজবাবু বলেন, পতি কাতর হলে যিনি কাতরা হন, পতি হুঁট হলে যিনি হুঁটা হন, পতি বিদেশগত হলে যিনি মলিনা ও কৃশা হন, পতি মৃত হলে যিনি সহমৃত হন, তিনিই পতিব্রতা।

ফাটা ডিমের কুসুমগলার মতো নগেনবাবুর অষ্টদশচ্যুত মাড়ির ফোঁকর গলে ইলিক-বিলিক হাসি চুইয়ে পড়ে। বলেন, এখন মূল্যবোধের জগতে শীর্ষাসন চলছে। মাথা পায়ের দিকে। পা মাথার দিকে। সব উল্টো। উল্টো ভাবুন।

বৈকুণ্ঠবাবু বলেন, আমি তো মশাই আমার হৃদয়েশ্বরীটিকে কিছুতেই বুঝতে পারি না। মিষ্টি কথায় যেন সূর্যের ঘরে মাখন। গলে একাকার। কিন্তু মুখ ফসকে কিছু বললেই দাবানল।

পতিতাপানবাবু বলেন, সাথে কি Whately বলেছেন, Woman is like the reed which bends to every breeze, but breaks not in the tempest.

নিত্যগোপালবাবু বলেন, এ যুগে পতি-নির্যাতন এখন ক্লাসিক পর্যায়ে চলে গেছে। চন্দ্রমুখীরা আগেই মারমুখী হয় না। স্নো পয়জনে একটু একটু করে প্রাণবায়ু কাড়তে থাকে। বিয়ের পরেই টার্গেট—স্বামীর কুবেরের ভাণ্ডারটি। তাদের মুখের দুইঞ্চি হাসিতে তখন দু'হাজার ফিট গভীর ষড়যন্ত্র। স্বামী যখন ভাবছে, 'ওগো বধু তোমার পরশ যেন মিষ্টি ফুলের রং', সেই সময় নববধূটিও ভাবছে, 'ওগো প্রাণনাথ তুমি মোর স্বপ্নের কামধেনু'। তারপর শুধু দোহন আর দোহন। কুড়াল ছাড়া যেমন বাঁশের গিট ফাটানো যায় না, তেমনি পুষ্ট টাকার বাঁশিল ছাড়া নববধূর মন ভুঁষ্ট করা যায় না। বিয়ের পর স্বামীই সবকিছু। স্বশুরবাড়ির কাছ থেকে দূরে থাকলেই বাঁচা যায়। সাতপাকের কড়া মাঞ্জায় স্বামী-ঘুড়িটিকে স্বশুরবাড়ি থেকে ভোকাট্টা করে চলে গড়ি নিউক্লিয়াস সংসার। স্ত্রী একটু শিক্ষিতা হলে কিছুতেই তার ইগোটাকে ইগনোর করতে পারে না। তখন স্বশুরবাড়ির লোক আনকালচারড। তারা সব গোবরের দলা, আর স্বামী-দেবতাটি শুধু

সেই গোবরের পদফুল। তারপর বিয়ের ফটোতে যত ছাতকুড়ো পড়তে থাকে, সংসারের কষ্টটি ততই একছত্র মালকিন হতে থাকে।

পুলিনবাবু বলেন, এটাই তো জীবনের হ্যাফা। হ্যাফ না ধরিয়ে দিলে তারা কীসের Better-half? Better-half-এর সাথে তেত্রিশ বছর ঘর করার পর বুকেছি How much they bitter are! অবশ্য Helen Rowland -এর কথা যথেষ্ট প্রণিধানযোগ্য—A man seldom discovers that he hasn't married his affinity until his wife begins to get crow's feet around the eyes. অর্থাৎ কিনা একজন মানুষ কদাচিৎ আবিষ্কার করতে পারে যে সে বিবাহিত, যতক্ষণ না তার সহধর্মিণীটি চোখ পাকায়।

বিধুভূষণবাবু বলেন, ছোটবেলা থেকে আমার স্বপ্ন ছিল কবি হব। মস্ত কবি। যাকে বলে যশস্বী কবি। অশ্রুংলিহ স্মৃতির চূড়ায় বসে পা দোলাব। যেখানে যাব, বীদরখেলা দেখানোর মতো আমাকে ঘিরে থাকবে অটোগ্রাফ শিকারীর দল। কিন্তু তার আগেই গিমির শিকার হয়ে আমি খাঁচায় পোরা বন্যপ্রাণী হয়ে গেছি। গিমির কাছে কবিতা অচ্ছুৎ। যেন কুষ্ঠ রোগ। আমার লেখা কবিতার খাতা অনেকদিন আগেই বড়ছেলের দুখ গরম করে পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গেছে। গিমি অবশ্য মহাখুশি হয়েছিল তার জ্বালানি খরচ কিছুটা সাশ্রয় হবার জন্য। আগে যখন কবিতা লিখতাম তখন গিমির সে কী হুম্কার! বলত, বাজার থেকে দোকান-পাতা আনতে বললে তুমি তেজপাতা আনো। লবণ আনতে বললে লবঙ্গ আনো। মাথাব্যথার অবুধ আনতে বললে পেটব্যথার অবুধ আনো। ঠিক জিনিস আনবে কী করে? মাথার মধ্যে কুমির মতো দিনরাত কবিতার লাইন গিজগিজ করছে। মনে রাখার জিনিস তো আউটলাইন হবেই। ওসব কবিতা-ফবিতা লেখা চলবে না। আর দাড়ি রেখে তুমি শুধু স্কোউরোবার পয়সাই বাঁচাতে পারবে। রবীন্দ্রনাথের র-এর পুটকিও হতে পারবে না। তাছাড়া ঘুমের ঘোরে তোমার ওই খরখরে দাড়িতে হাত পড়লে সজ্ঞার পিঠে হাত দিয়েছি ভেবে দুঃস্থলে আমার ঘুম চটে যায়। সেই থেকে আমি বেলেমাছ। এই রিটার্ডার্ড লাইফে আমাকে কোনো সাহিত্যসাভাতেও যেতে দেয় না। বলে, একগাদা ছুগে-পাগল লোকের মাঝে মাগনা বগবকম না করে ঘরে বসে বিড়ি বাঁধো। তাতে বিড়িশিল্পের উন্নতি হবে। ঘরে দুটো উপরি পয়সাও আসবে। তোমার ভিক্ষার পেনসনের টাকায় পানসুপারি কেনা যায় তো জর্দা কেনা যায় না। যন্ত্রণা মশাই, যন্ত্রণা।

বিরূপাক্ষবাবু বলেন, লর্ড বুদ্ধ বলেছেন Pain is the outcome of sin.

বিধুভূষণবাবু বলেন, পাপ তো করেছি। বিয়ে করাটা কি পাপ নয়? এখন বুঝি, মেয়েরা বিয়ের পর মাথায় সিঁদুর পরে কেন। ওটা হল রেড সিগনাল। সতর্কবার্তা। মাথায় বিভাজনের লালবর্ডার দিয়ে সবসময় মনে করিয়ে দেয়—তুমি তোমার বাবা-মার কক্ষপুটে থাকা জীবনের বর্ডার অতিক্রম করে আমার সীমানায় চলে এসেছ। So your punishment is must. এখন মাঝেমাঝে মনে হয় আত্মহত্যাি ভালো।

জনার্দন বাবু বলেন, সে কি। মৃত্যু তো জীবনের চরমতম নিষ্ঠুরতা। বিধুভূষণবাবু নাইটল্যাম্পের মতো স্রিয়মান হাসি হাসেন। বলেন, মৌৎ কিংনিহি সঙ্গদিল হায় মগর জিন্দগিসে তো মেহেরবা হোগী। মৃত্যু যতই নিষ্ঠুর হোক না কেন, জীবনের থেকে অনেক বেশি হৃদয়বান হবে।

রমণীমোহনবাবু বলেন, শাস্ত্রে কিন্তু আছে 'স্ত্রী পুং বচ প্রভবতি যদাত্তি গেহং বিনষ্টম'। অর্থাৎ যে গৃহে স্ত্রীলোক পুরুষের মতো প্রভাব বিস্তার করে,

সে গৃহ খুব তাড়াতাড়ি বিনষ্ট হয়।

তীর্থপতিবাবু বলেন, নারী-আন্দোলনে শাস্ত্রের পাতা শুধু ঠোঙা বানাতেই লাগে। যান না ওদের কাছে শাস্ত্রের কথা বলতে। তখন বুঝতে পারবেন ট্রেনের ওভারহেড তারে কারেন্ট বেশি, না জিহ্বায়। একবার হিসহিস আরম্ভ করলে অহর্নিশ ছোবলে শুধু বিষ আর বিষ। কোনো অ্যান্টিভেনাম সিরামে কাজ হবে না।

মুরারীবাবু বলেন, আসলে আমরা সবাই নির্ধাত। নারী-নির্ধাতনের খবরটাই শুধু সবার চোখে পড়ে। কিন্তু নির্ধাতিত পতিদের মরফিয়া ইন্জেকশন দিয়ে যদি এক জায়গায় গাদা মেরে রাখা হয়, তাহলে সেই গাদার চূড়া এভারেস্টশৃঙ্গ ছাড়িয়ে যাবে। অতঃ কিম?

বিপ্লবকেতনবাবু বলেন, নারী-নির্ধাতন সমিতির মতো আমাদেরও নির্ধাতিত পতি-পরিষদ কিনা পতি-নির্ধাতন প্রতিরোধ মঞ্চ গড়ে তোলা দরকার।

শান্তিপ্ৰিয়বাবু বলেন, সব গুনলাম। প্রস্তাবটাও ভালো। কিন্তু ভূত-

বাংলোয় আলো জ্বালাবে কে? কার বাড়িতে অফিস বসবে? কার বাড়িতে সভা-সেমিনার হবে?

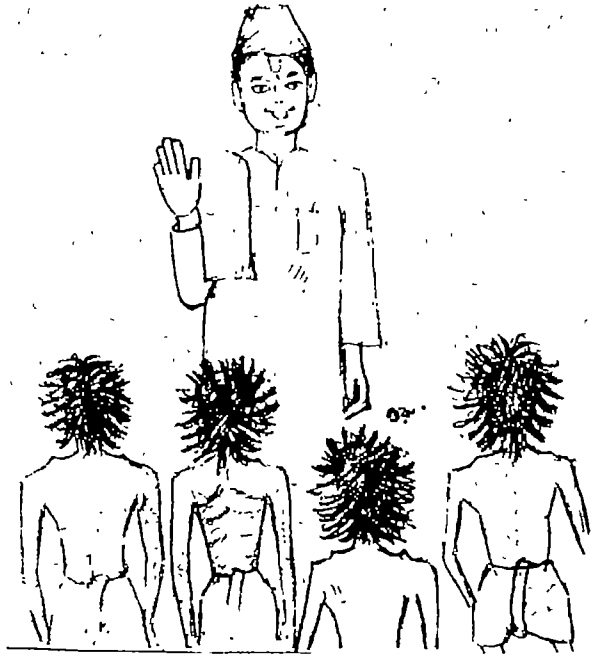
সবাই এ কথায় এ-ওর দিকে তাকিয়ে থাকেন। কারো মুখে কোনো কথা নেই। যেন শোকসভায় শোকজ্ঞাপন পর্ব চলছে। জীবন্ত পিরামিডদের মাঝে হঠাৎ সহাস্যে গানুবাবু গান গেয়ে ওঠেন, দোষ কারো নয় গো মা, আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা...

সত্যব্রতবাবু বলেন, ধন্যবাদ গানুবাবু। আসলে আমাদের জীবনে এখন শ্যামাসঙ্গীতের বিকল্প কিছু নেই। সংসারের শ্যামা মা-রা আমাদের মতো মহাদেববাবুদের বুকে উঠে মুখের মধ্যে জিভ রেখে এখন রকড্যান্স নাচছে। তাদের আদর করে “তারা মা” না ডেকে উপায় নেই। ওদের এবং আমাদের যুগপৎভাবে সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে হলে শ্যামাসঙ্গীত ছাড়া উপায় নেই। বারুদ ঠাণ্ডা থাকতেই তার সামনে তারস্বরে গান ধরুন—সকলই তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি, তোমার কর্ম তুমি করো মা লোকে বলে করি আমি। সকলই তোমার ইচ্ছা....

নদীয়ার গঙ্গাপ্রাপ্তি

পুঞ্জের সময় আমরা যেমন ছেলে-বৌ নিয়ে ঠাকুর দেখতে যাই, সেচমন্ত্রী চাট্রি সেক্রেটারি নিয়ে বর্ষার সময় তেমনি ভাঙন দেখতে যান। চলো, ভাঙন দেখে আসি। উঃ কি সুন্দর ভাঙছে দেখ! ধস করে কাঠা খানেক চলে গেল জলে। ছবি তোলো, ছবি তোলো। রমা-সোমাদের দেখাব।

গর্ভবহর গঙ্গার পাড়ে প্যাণ্ডেল বেঁবে ছটার চড়ে সেচমন্ত্রী গণেশ মণ্ডল মশাই নদীয়া গেছিলেন ভাঙন দেখতে। ঠাণ্ডা খেতে খেতে গরিবের মাথায় প্রকৃতির ডাঙা মারা দেখলেন। এক এক করে ধসে যাচ্ছে গরিবের বংশ। সর্বস্বান্ত। ভাঙছে মালিপোতা। ভাঙছে পুমুলিয়া, ভাঙছে বয়রা, ভাঙছে মেখিডাঙা, শান্তিপুর-ফুলিয়ার স্টিমারঘাট। ভাঙছে চাঁষ, ভাঙছে চাঁষীব শিবদাঁড়া। কানাউচু অ্যালুমিনিয়ামের থালা নিয়ে রেডি হাজাব হাজাব কুঁক, তাঁতি, দিনমজুর। নতুন পেশা হবে ভিক্ষা। ছেঁড়া শাড়ি পরা শিখছে শাড়ি-ক্ষেতের মা-বোনেরা। মাসে একদিন স্টেজ প্রাক্টিশ। স্টেশন থেকে স্টিমারঘাট। ছেঁড়া শাড়ি আর হাতে থালা নিয়ে অন্নভিক্ষা। মঞ্জুর হয়ে আছে ৪২ লক্ষ টাকা। প্রজেক্ট-ভিক্ষা। ২০০১ সালে ইরিগেশনের দেওয়া টাকায় জেলা পরিষদ চাল ভাল মজুদ করছে। ভিথিরি ভোজন হবে। গঙ্গায় দেওয়ার চেয়ে জীবসেবা ভালো। বর্তমান বিধায়ক অজয় দে প্রমাণ দিলেন তথ্য দিয়ে। তিনবছর আগে ফুলিয়ার বয়রার জন্যে ৪৬ লক্ষ টাকার কাজ হয়। তা গঙ্গা সময়মতো এসে নিয়ে চলে গেছে। সরকার বাহাদুর ফুলিয়ার কৃতিবাসে বাঁশের খাঁচা করে ভাঙন আটকাবার চেষ্টা করে। গঙ্গা হেসে মরে। গোটা নদীয়াটাকে টার্গেট করে ফেলে। ইতিমধ্যে শান্তিপুর পৌর এলাকার বজ্রঘাটে গঙ্গা ১৫০ ফুট সরে এসেছে জনবসতির দিকে। এখন যেখানে গঙ্গা, সেখান থেকে দশ-বিশ ফুটের মধ্যেই পৌরসভাব



পিচমোড়া প্রধান সড়ক। দু'পাশে ঘন বসতি, সম্পত্তি। আবার একবার ভাঙন দেখতে আসবেন সেচমন্ত্রী। এবার উপশম নিয়ে। প্যাণ্ডেলে ঠাণ্ডা খেতে খেতে, বলে যাবেন—নদীর এপার ভাঙে ওপার গড়ে এই তো বিধির খেলা।

—দিব্যলোচন কলমধারী

চলচ্চিত্র সুসংবাদ

গৌতম-অপর্ণা-ঋতুপর্ণ-মৃণাল সেনের একঘেয়েমির পরে

নতুন ছবির হাওয়া কি এল?

পিনাকী ভাদুড়ী

অনেকদিন হয়ে গেল, বাংলা ফিল্মে গৌতম-অপর্ণা-ঋতুপর্ণের তাসের দেশ চলছে। মৃণাল সেন এতদিন রাজ্যসভার বৃদ্ধাশ্রমে গিয়েছিলেন, আমরাও হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিলাম। নইলে ‘অন্তরীণ’-এর মতো ছবিতে, তিনি যে ক্ষুধিত পাষণ পড়েননি বা পড়লেও বোঝেননি, তা আমাদের জানতে হত না। কিন্তু রাজ্যসভা ছেড়ে তিনি পুনরায় নিজের সাম্রাজ্যে (পড়ুন, ‘আমাব ভুবন’) ফিরে এলেন। তাঁর সেই ভুবন অবশ্য চিত্রভবন থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। ভাগ্যিস, নইলে হয়ত দেখতে হত ছবিটা।

এই পটভূমিকায় অঞ্জন দাশের ‘সাঁঝবাতির রূপকথার’ ছবিটি বাংলায় নতুন হাওয়া বইয়ে দিতে চেয়েছে। ছবির কাহিনী লিখেছেন কবি জয় গোস্বামী, সূত্রাং স্বাভাবিক ভাবে কাহিনীটি কাব্যগুণে সমৃদ্ধ। এমন একটা ছবিকে চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত করার কথা ভেবেছেন পরিচালক, এই তথ্যটাই যথেষ্ট আগ্রহ, এবং সেইসঙ্গে আশঙ্কাও জাগিয়েছিল। বলতে বাধা নেই, পরিচালক এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং আশা জাগিয়েছেন।

চলচ্চিত্রে এই কাব্যময়তাকে ধরবার জন্য পরিচালক ক্যামেরা সঞ্চালনেরই সাহায্য নিয়েছেন। নিয়ন্ত্রণ করেছেন শট ডিভিশন। টুকরো টুকরো দৃশ্য সংস্থাপনে বাস্তবের অপেক্ষা কথকতার সঙ্গে মিলিয়েছেন রূপকথার তথাকথিত অবাস্তব সম্ভাবনাকে। অনেক দৃশ্যের কথাই বলা চলে; পূজারিণী প্রদীপটির শরীরী আবির্ভাব এবং এক সময়ে সেই শরীরের স্বাভাবিক তিরোভাব; নিঃসঙ্গ কল্প-মেয়েটির নিরুপায় বিবাহ সম্পর্ক এবং নায়িকা টুকুনের তার জন্য অসহায় ক্ষোভ ইত্যাদি অনেক দৃশ্যের কথাই বলা চলে। সেই সঙ্গে বলা চলে কাহিনীর টার্নিং পয়েন্টে দীপুপিসির শাড়িতে আঙুন লাগার সিকোয়েন্স। চমৎকার তোলা হয়েছে দৃশ্যটি। একটি অবৈধ সম্পর্ক শারীরিক মানসিক ট্রাজেডির উপকরণ হয়ে দাঁড়াল পরিচালনার কৌশলে।

কাহিনী নির্বাচনে পরিচালক যে গৌতম-অপর্ণার মতো (হু)বীরত্ব না দেখিয়ে এমন গল্প চিত্রভাষায় প্রকাশ করতে চেয়েছেন, এইটাই ছবিটির সর্বপ্রধান প্লাস পয়েন্ট।

তবে এক বিহব্দেই বসন্ত সূচিত হয় না, তাই ছবির মাইনাস পয়েন্টের কথাও বলতে হয়। এদিকে নজর দিলে পরিচালক ভালোই করবেন।

ছবিটি অতিরিক্ত দীর্ঘ হয়েছে। অজুত বিশ থেকে ত্রিশ মিনিট ছোট হওয়া দরকার ছিল। এইজন্যই অনেক দৃশ্য ও সংলাপ রিপিট হয়েছে। কাহিনীটি নিজেই কাব্যিক, এজন্য আলাদা করে কবিতা পড়াটা অপ্ৰয়োজনীয় মনে হবে। অনর্থক ক্যামেরা মুভমেন্টও দৃশ্যটিকে বাঁচাতে পারেনি। কাহিনী বিন্যাসে পিতা ও কন্যার একে অন্যের উপরে নির্ভরশীল সম্পর্কটি ভেঙে যায় যে দৃশ্য সেটির চিত্রায়ণ যে ভালো, একথা আমরা আগেই বলেছি।

সেই সঙ্গে এও বলতে হচ্ছে যে দৃশ্যটি নিয়ে আসা উচিত ছিল আরো অনেক আগেই। পরিচালক কেন এটি ধরতে পারেননি সেটা আমরা ধরতে পারলাম না। ছবির রাশ প্রিন্ট তো নিশ্চয় দেখেছিলেন তিনি। সেখানেই ব্যাপারটা তাঁর বুঝতে পারা উচিত ছিল। সম্ভবত নিজের কাজের উপরে মায়া পড়েছিল এতটাই যে ছবিটি কেটে ছেঁটে ছোট করতে তিনি পারেননি। ফেস্টিভ্যালের যাবার আগে সেই কাজটুকু তিনি করবেন কিনা তার উপরেই নির্ভর করছে তাঁর চিন্তাধারার পরিণতি ও পরিমিতির উদ্ভরণ।

অঞ্জন দাশের ছবির কথা বলতে গিয়ে গৌতম-অপর্ণা-ঋতুপর্ণ-মৃণাল সেনের নাম করেছি আমরা। এবারে আরেকজনের কথা বলি। অঞ্জন দাশের

মৃণাল সেন এতদিন রাজ্যসভার বৃদ্ধাশ্রমে

গিয়েছিলেন, আমরাও হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিলাম।

নইলে ‘অন্তরীণ’-এর মতো ছবিতে, তিনি যে

ক্ষুধিত পাষণ পড়েননি বা পড়লেও বোঝেননি,

তা আমাদের জানতে হত না।

নেমসেক আরেকজন অঞ্জনও আছেন চিত্রজগতে। এই দুই দল দু’ভাবে বাংলা ছবিকে ডোবাচ্ছেন। তাঁদের দল ভারী, আর কে না জানে, এ যুগে দলের হুজুগই বড়। আপনি ‘কোন দলে’, এ কথার উত্তরে ‘কোনদলে’ বলেই পার পাবেন না আপনি, সুযোগমতো দল বদলও করতে হতে পারে।

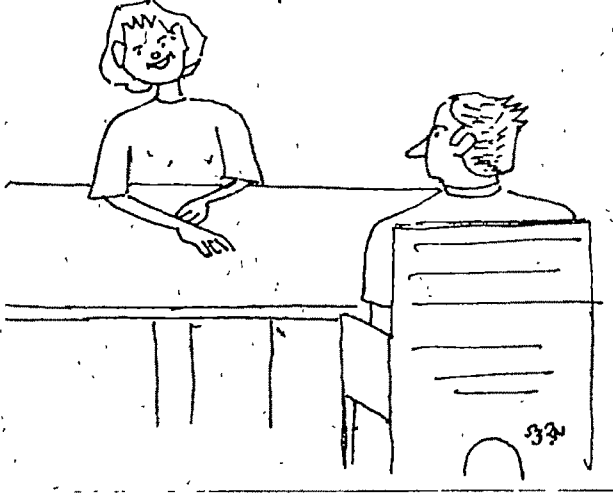
অঞ্জন দাশ কী করবেন তা তাঁকেই ঠিক করতে হবে। এটুকু ঠিক যে ছবিতে নতুন জানলা খুলতে চাইছেন তিনি তা আমরা বলেছি। অবশ্য আরেকবার আরেকটি রূপকথার আশ্রয় তিনি নেবেন না নিশ্চয়—এটুকু বোঝার মতো বুদ্ধি তিনি নিশ্চয় ধরেন।

গৌতম-অপর্ণা-ঋতুপর্ণের প্রিটেনশন থেকে প্রিভেনশনের চেহারাটা আমরা দেখলাম। মৃণাল সেনের রিটায়ারমেন্ট এর পরে নিশ্চিত হবে কিনা তা বলতে পারি না। অনেকের আশিতেও বুদ্ধি খোলে না। বিশেষত এদেশে স্ট্রচারে করে না বার করলে কেউ বেরোয় না; অগত্যা নতুন পরিচালক এলেই একমাত্র টাটকা হাওয়ার ঝলক এসে লাগে।

অঞ্জন দাশ সেই হাওয়া এনেছেন—নিজের ছবিকে বারে বারে পর্যবেক্ষণ করার পরেই তিনি নতুন ছবিতে হাত দেবেন, এবং নিজেকে রিপিট করতে চাইবেন না—এ কি বড় বেশি চাওয়া হবে?

ইন্টারভিউ

সনৎকুমার মিত্র



- মে আই কাম ইন স্যার?
- ইয়েস, কাম ইন।
- গুড আফটারনুন স্যার।
- গুড আফটারনুন। টেক ইওর সীট।
- থ্যাংক ইউ স্যার।
- হোয়াট'স ইওর নেম?
- মালবিকা দত্ত।
- ম্যারিটাল স্টেটাস?
- সিথি দেখে বুঝতে পারছেন না?
- আপনি যখন বাংলায় শুরু করলেন, তাহলে আমরা বাংলাতেই কথা বলতে পারি।
- অ্যাক্স ইউ উইশ স্যার।
- আবার ইংরেজি কেন?
- না, মানে ইন্টারভিউতে...
- যদি ইন্টারভিউ না হত তাহলে বাংলায় কথা বলতেন তো?
- হ্যাঁ, তাহলে তো বাংলায় বলতামই। আরো অনেক কিছু বলতাম।
- কী বলতেন?
- বলব কেন? আপনি কি আমার বন্ধু? আপনি তো ম্যানেজিং ডিরেক্টর। আমার বিগ বস। আমি একজন চাকরিপ্রার্থী। তাই মনে রাগ হলেও মুখে বলতে পারছি না।
- রাগলে আপনাকে ভারী সুন্দর দেখতে লাগে।
- এটা কিন্তু আপনি বিগ বসের মতো কথা বললেন না।
- আমি তো বিগ বস থাকতে চাইছি না। বন্ধু হতে চাইছি।
- তাহলে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

- হ্যাঁ, করতে পারেন।
- একবার চারজন ভদ্রলোক একঘণ্টা ইন্টারভিউ নিয়েছেন। তারপরে আবার আপনি ইন্টারভিউ নিচ্ছেন কেন? এটা অত্যাচার।
- ওঁরা তো দশজনের ইন্টারভিউ নিয়েছেন। তার মধ্যে থেকে তিনজনকে সিলেক্ট করেছেন। আপনি প্রথম হয়েছেন। আমি ফাইনাল ইন্টারভিউ নিচ্ছি। কারণ আমিই তো অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দেব। একবার দেখে নেওয়া উচিত কানা-খোঁড়া কি না?
- কী দেখলেন?
- দেখা তো এখনো শেষ হয়নি।
- শেষ করুন।
- এ দেখা শেষ হবে না।
- মানে?
- মানে, আপনি এত সুন্দর যে—
- শুনে খুব ভালো লাগল। তাহলে চাকরিটা পাচ্ছি তো?
- চাকরি একটা পাবেন হয়ত। কিন্তু শর্তহ্যাশ শেখেননি কেন?
- আসল কথা হল প্রাইভেট সেক্রেটারির চাকরিই করতে হবে, এরকম কোনো ইচ্ছে তো আগে ছিল না। তাই...
- আগে ছিল না। মানে, এখন ইচ্ছে হয়েছে?
- সত্যি কথা বলব?
- বলুন।
- এখন ইচ্ছে হয়েছে, এ কথা বললে একশোভাগ সত্যি কথা বলা হবে না।
- তার মানে?
- বাধ্য হয়ে অ্যাপ্লাই করেছি।
- বাধ্য না হলে কোন পোস্টে অ্যাপ্লাই করতেন? ডিরেক্টরের পোস্টে?
- ঠিক বুঝতে পারলাম না। ডিরেক্টর পোস্ট চাওয়ার যোগ্যতা আমার আছে কি?
- যোগ্যতা বিচার করবে অন্য লোক। ইচ্ছে আছে কি না, এটা বলবেন আপনি।
- সকলেরই ইচ্ছে থাকে রাজা বা রানী হওয়ার। আমিও ব্যতিক্রম কিছু নই।
- অত ঘুরিয়ে বলতে হবে না। তার মানে ইচ্ছে আছে।
- আপনি ঠাট্টা করছেন স্যার।
- তোমার সঙ্গে কি আমার ঠাট্টার সম্পর্ক? সরি, আপনার সঙ্গে কি আমার ঠাট্টার সম্পর্ক?
- না-না, 'তুমি' করেই বলুন। আমি তো আপনার চেয়ে অনেক ছোট।
- অ্যাপ্লিকেশনে আপনি, মানে তুমি, যে বয়স লিখেছে সে অনুসারে

তুমি আমার চেয়ে মাত্র পাঁচ বছরের ছোট।

—তার মানে আপনার বয়স মাত্র বত্রিশ?

—হ্যাঁ। কেন, বয়স বেশি মনে হচ্ছে?

—একটু বেশি মোটা হয়ে গেছেন। মনিং ওয়াক করেন না? একটু ডায়েট কন্ট্রোল করুন। তাহলে আপনাকে আরো সুন্দর দেখতে লাগবে।

—তার মানে এখন আমাকে দেখতে বিক্রী লাগছে?

—আমি কি তাই বললাম?

—ঘুরিয়ে তো তাই বললে। সোজা বাংলায় একটা কথা বলো, আমাকে তোমার পছন্দ হয়?

—খুব পছন্দ হয়। আপনি তো দেখতে সত্যি সুন্দর। আর তাছাড়া আপনি কত সুন্দর কথা বলেন। শুধু একটু ওজন কমালে আপনাকে না.....

—তুমি দাবিত্ত নেবে?

—মানে?

—মানে, তোমাকে এ চাকরিটা দেওয়া যাবে না।

—কেন?

—ঠিক করলাম তোমাকে ডিরেক্টর হিসেবেই নেব।

—মানে?

—মানে, তুমি যদি রাজি থাকো, তাহলে তোমার কেসটা চেয়ারম্যানকে দিয়ে, মানে বাবাকে দিয়ে অ্যাক্সপ্ত করিয়ে নেব।

আপনি প্রথম হয়েছেন। আমি ফাইনাল ইন্টারভিউ নিচ্ছি। কারণ আমিই তো অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দেব। একবার দেখে নেওয়া উচিত কানা-খোঁড়া কি না?

—কেন?

—তাহলে তোমাকে মালবিকা দস্ত থেকে মালবিকা চৌধুরী হতে হবে।

—মানে?

—মানে বোঝার মতো বয়স তোমার হয়েছে, বুদ্ধিও আছে। তবুও বলছি আমি তোমাকে—

—যাঃ, সত্যি?

—হ্যাঁ, সত্যি।

—কিন্তু আমার বাবা-মায়ের মত?

—সে সব আমার ওপর ছেড়ে দাও। আমার বাবা তোমার বাবা ও মায়ের কন্সেন্ট নিয়ে নেবেন।

—দিলাম।

—তোমার হাত দাও।

—এটা অফিস।

—এটা ম্যানেজিং ডিরেক্টর-এর চেইমবার। বইরে লাল আলো জ্বালিয়ে দিলাম। অর্থাৎ এখন কেউ ভেতরে আসবে না। এ ঘর এখন শুধু তোমার আর আমার.....

ট্যারা চোখে



“অ্যাকশন-ব্রত” মুখার্জি

কলকাতা পুরসভার চেয়ারে মাত্র বছর দুইয়েক বসেছেন। তবুও তাঁর কর্মকাণ্ড এতই ব্যাপকভাবে শ্রবণের কাগজের হেডলাইন বানাচ্ছে যে তা দেখলে সুরত মুখার্জির মহামান্য পূর্বসূরী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস আর নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুও নিজেদের লজ্জা ঢাকতে বিবাকী হতেন। কলকাতার মহাভাগ্যবান মহানাগরিক এবার আদালত খেয়ে লেগেছেন এস এস কে এম হাসপাতালের সুপারিন্টেন্ডেন্ট, ডাঃ দেবদ্বৈপায়ন মুখোপাধ্যায়ের গণেশ কী করে গুণ্টানো যায় তার সু-ব্যবস্থা করতে। তৃণমূলী বোন মমতার টালির বাড়িতে গিয়ে ভাইফোঁটা নেওয়ার পর আরো এলেম বেড়ে গেছে আমাদের মাননীয় পৌরপ্রধানের। তিনি তাঁর বশব্দ হনু-অনুচরদের নিয়ে এস এস কে এম হাসপাতালে সুপারের অনুমতির পরোয়া না করেই তাঁর ঘরে ঢুকে পড়েছিলেন। “অনেক অনুরোধ করা সত্ত্বেও” সুপাব যখন সুরতর স্ট্যাম্প লাগানো, থুড়ি পাঠানো, রোগীকে ভর্তি করেননি তখনই পৌব প্রধানের মেজাজ খিটড়ে গেছে। তিনি সাংবাদিকদের সামনে বুক বাজিয়ে বলেছেন, ওই নচ্ছার সুপারকে ধরে দু’গালে দুটো থাপড় মারা দরকার। ব্যাটার এত বড় সাহস—আধমরা রোগীকে হাসপাতালের দুয়ার থেকে ফিরিয়ে দেয়। সুরতও পুরোপুরি অ্যাকশনে নেমে পড়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর বারণ থাকা সত্ত্বেও তিনি, এস এস কে এম হাসপাতাল থেকে জঞ্জাল তুলে ফেলা বিলকুল বন্ধ করে দিয়েছেন। রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তর এস এস কে এম কাশু নিয়ে কী ব্যবস্থা নিল, তাতে সুরতর বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। উন্টেতিনি জানিয়ে দিয়েছেন, হাসপাতাল-সুপারের টিলে হয়ে যাওয়া ক্ষুণ্ণলো টাইট দেওয়াই এখন তাঁর কাছে একমাত্র ব্রত। সুপারকে নির্বাসনে না পাঠিয়ে সুরত জলস্পর্শও করতে চান না। তাঁর কাছে এই সময়ে কলকাতার অনাচে কানাচে বাচ্চা পাড়তে থাকা ম্যালেরিয়ার মশারা আর কলেরা রোগের দাপাদপি ততটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়। সুপাবকে টাইট দেওয়াই এখন তাঁর প্রধান ফাইট।

—শ্রীপর্ণা বসু সেনাপতি

আমার জীবনে অন্নদাশঙ্কর

প্রণবেন্দ্রনাথ ঘোষ

২৮শে অক্টোবর ২০০২ সালের অপবাহুবেলায় অন্নদাশঙ্কর রায় ৯৯ বছর বয়সে লোকান্তরিত হলেন। বাঙালির মুক্ত চিন্তা, বাঙালির বিবেক যেন ঘুমিয়ে পড়ল। আবার কবে জাগবে এবং জাগ্রত হয়ে বাঙালি তথা ভারতীয়দের, বিশ্ববাসীকে জাগাবে কে জানে? সাহিত্য সংস্কৃতি ইতিহাস দর্শন ও সমাজবিদ্যায় এমন পারঙ্গম লেখক চিন্তানায়ক এখন দুর্লভ। তাঁর বহুমুখী বচনার বিচার করবেন গুণমুগ্ধ পাঠক ও সমালোচক। অন্নদাশঙ্কর কিভাবে, কত সরসতায় নবীন লেখকদেব লেখায় উদ্বুদ্ধ করতেন সে কথা জানাবার জন্য এই স্মৃতিকথার অবতারণা।



আজ থেকে ৩৮ বছর আগে বার্লিনে (তখন পশ্চিম) অন্নদাশঙ্করের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। আমি তখন পশ্চিম বার্লিন সরকারের প্রশাসনিক বিভাগে শিক্ষানবীশী করছি। ১৯৬৩ সালে জুন/জুলাই মাস নাগাদ সাহিত্যিক ভবানী ভট্টাচার্য সতীক বার্লিনে গিয়েছিলেন জার্মান সরকারের আমন্ত্রণে। কোনো একটি ভোজসভায় শ্রী

ভট্টাচার্য ও তাঁর জার্মান গাইড শ্রীমতী ভেমানের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তার কিছুদিন পর সেপ্টেম্বর/অক্টোবর মাস নাগাদ (সেটা ছিল সে বছর দুর্গাপূজোর অষ্টমীর দিন) শ্রীমতী ভেমান আমাব অফিসে ফোন করে জানান যে, একজন ভারতীয় লেখক জার্মান সরকারের আমন্ত্রণে বার্লিনে পরিদর্শনে এসেছেন। আমি যদি তাঁকে সঙ্গ দিয়ে সব দেখিয়ে বেড়াই তাহলে শ্রীমতী ভেমানের কাজটা একটু সহজ হয়ে যায়। আমি তো সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলাম। সাহিত্যিকের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার থেকেও আমার বড় আকর্ষণ—সরকারি টাকায় দু'দিন রাজসিক আহার হবে আর গাড়ি চড়ে পশ্চিম আর পূর্ব বার্লিন ঘুরে বেড়াব। একটু বুদ্ধি খরচ করে বার্লিনের ভারত মজলিসে এ খবরটা জানালাম না। তাহলে ওরা এই সাহিত্যিককে হেঁ মেরে নিয়ে নেবে আর আমার রাজসিক ভোজটা মাঠে মারা যাবে।

শ্রীমতী ভেমান জানালেন যে পরের দিন সকাল নটা নাগাদ ঐ সাহিত্যিক জনৈক মিস্টার রায়কে নিয়ে তিনি বার্লিনের বিখ্যাত রাস্তা ক্যু ডামের একটি হোটেলে আমার জন্য অপেক্ষা করবেন। আমি অফিস থেকে ছুটি নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে সেখানে হাজির হলাম। হোটেলের লাউঞ্জে চুকতেই চোখে পড়ল অদূরে ছিপছিপে দীর্ঘদেহী এক ভদ্রলোক বসে আছেন। চোখের দৃষ্টি সমুজ্জ্বল কিন্তু একটু আবিষ্ট। আমাকে দেখেই হাত তুলে নমস্কার করে বললেন, আমার নাম অন্নদাশঙ্কর রায়।

আমি তো নাম শুনে অভিভূত। হাসব না কাঁদব বুঝে উঠতে পারলাম না। এত বড় একজন মনীষীর সঙ্গ আমি একান্তভাবে পাব, এ তো আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া। দেশে থাকলে কি এমন একান্ত সঙ্গলাভ, এমন একান্ত আলাপচারিতা সম্ভব হত?

বললাম, আমি বাংলা সাহিত্যের ছাত্র। আপনার লেখার সঙ্গে আমি পরিচিত।

উনি আমার বার্লিনের অভিজ্ঞতা, জার্মান সমাজ-জীবনের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। আমি ছোট্ট একটি মন্তব্য করলাম, খুব সাবধানে। বললাম, দেখুন জার্মানরা যত বড় পণ্ডিতের, দার্শনিকের জ্ঞাত হোক না কেন, ইংরেজদের সঙ্গে কুটবুদ্ধিতে পেরে উঠবে না। এরা সহজ সরল, তাই বোধহয় একটু বোকা-বোকা।

শুনে শ্রী রায় হো হো করে হেসে উঠলেন। আমাদের তখনো চায়ের পর্ব চলছে। শ্রীমতী ভেমান তাঁদের সম্মানিত অতিথিকে আমার হাতে তুলে দিয়ে দিবা দু'দিন অঘোষিত ছুটি উপভোগ করতে চলে গেলেন। যাবার সময় তিনি আশ্বাসবাণী দিলে গেলেন—যত খুশি খাও, যেখানে খুশি যাও। একটি পয়সা লাগবে না। শুধু বিল সই করে দিলেই হবে।

আমি বার্লিন সরকারের বৃত্তিভোগী শিক্ষানবীশ। কতই বা বৃত্তি পাই? বার্লিনে থিয়েটার হোটেল রেস্তোরাঁর ছড়াছড়ি। আমার রসনা যেমন অতৃপ্ত

চোখও তেমনি। এমন মওকা কি ছাড়া যায়? কথায় কথায় জার্মান মেয়েদের কথা উঠল। বললাম, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে একটি বিশেষ বয়সীমার লোকস্কয়ের ফলে যুবতী অর্থাৎ বিবাহযোগ্য মেয়েদের সংখ্যা বেড়ে গেছে। তাই যে কোনো মূল্যে স্বামী জোগাড় করার জন্য মেয়েরা উঠেপড়ে লেগেছে। জার্মানরা সাধারণভাবে রক্ষণশীল। কিন্তু এই প্রতিযোগিতায় নীতি নৈতিকতার বাঁধ ভেঙে গেছে।

আমার কথা শুনে একটু হেসে অমদাশঙ্কর মহাভারতের কিছু ঘটনার উল্লেখ করলেন। তখনই বুঝলাম আপাত গম্ভীর হলেও শ্রী রায়ের প্রগাঢ় রসবোধ আছে। অতএব আলাপ জমতে দেরি হল না।

মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য আমি শ্রী রায়কে নিয়ে হোটেল হিলটনে গেলাম। বাপের জন্মেও আমার এরকম হোটেলে ঢোকার রেশ্ত হবে না। এখন তো লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন। অতএব যত পারো খাও, পান করো। অমদাশঙ্কর দেখলাম মিঠাহারী। কিন্তু আমি তো “একদিন কা সুলতান”, তাই মোগলই অর্ডার দিলাম। পানীয়ের বেলায় উনি ফলের রস দিতে বললেন। আমিও তাই চাইলাম। আমার বন্ধুরা ঠাট্টা করে বলত—জার্মানিতে এলে অথচ জার্মান বীয়ার খেতে শিখলে না। আমি ছা-পোষা, মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। যে দেশে চার আনা বড় পাইট বোতলের এক বোতল আপেল জুস পাওয়া যায় সেখানে কোন দুঃখে বীয়ার খাব?

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর আমরা বার্লিনের দু-তিনজন লেখক-লেখিকার সঙ্গে দেখা করে সন্ধ্যার সময় পূর্ব বার্লিনে গেলাম। ঢুকলাম আমেরিকান সরকারের চেকপোস্ট দিয়ে। সেখানে দেখি চারজন আমেরিকান সৈনিক জমিয়ে তাস খেলছে। আমাদের দিকে একবার তাকিয়ে তাদের সঙ্গে তাকিয়ে মাথা নেড়ে যাবার অনুমতি দিয়ে আবার তাস খেলায় মশগুল হল।

সন্ধ্যায় থিয়েটারে হলে ঢোকার সময় একটা মজা হল। যে বন্ধুর কাছে ওভারকোট জমা রাখতে হবে তিনি কাকুতি-মিনতি করছেন, আমরা যেন পশ্চিম জার্মান মুদ্রায় দাম দিই। এর কারণ ছিল। সরকারিভাবে তখন দুই জার্মানি মুদ্রার বিনিময় হার ১=১ হলেও, বাজারে পূর্ব জার্মানি মুদ্রার তুলনায় পশ্চিম জার্মানি মুদ্রার দাম বেশি। শ্রী রায় বললেন, দাও প্রণব, মহিলা যা চাইছেন দাও। দেখছ না ওর পোশাকের কী অবস্থা।

থিয়েটারে যাবার আগে বিকেলের দিকে আমরা মৃত বীর রুশ সৈনিকদের স্মরণে নির্মিত স্মৃতিসৌধগুলি দেখতে গেলাম। এটা Conducted Tour। যেখানে নিয়ে যাবে সেখানেই যেতে হবে। জায়গাটা পূর্ব বার্লিনের Treptow অঞ্চলে। তখন প্রায় সন্ধ্যা নেমে এসেছে। পূর্ব জার্মানির গাইড খুব ফলাও করে রুশ সৈনিকদের বীরত্বের কাহিনী শোনাচ্ছে। শ্রী রায় আমাকে ফিসফিস করে বললেন, প্রণব, একটা চাপা কান্না শুনতে পাচ্ছ?

আমি বললাম, কই, না?

এ জার্মান মেয়েদের চাপা কান্না। একটু ভালো করে কান পাতলেই শুনতে পাবে।

হঠাৎ গাইডের কথার মাঝখানে রসভঙ্গ করে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, বার্লিন যুদ্ধে বহু জার্মানও তো প্রাণ দিয়েছে। তাদের স্মৃতিসৌধ কোথায়?

গাইড এরকম বেয়াড়া প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না, আমতা আমতা করে কিছু বলার চেষ্টা করে থেমে গেল।

পরের দিন অমদাশঙ্কর বার্লিন ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলেন। আমি

যথারীতি শ্রুত টেম্পেল হোফ এয়ারপোর্টে তুলে দিতে এসেছি। প্রেন ছাড়তে দেরি আছে। আমরা লাউঞ্জে বসে কথা বলছি। উনি জিজ্ঞেস করলেন, কিছু লেখালেখি করছ? তুমি তো বললে বাংলার ছাত্র।

আমি সবিনয়ে বললাম, না এখনো কিছু লিখিনি। কিন্তু কী লিখব?

শ্রী রায় ভরসা দেওয়ায় মতো বললেন, কেন, এদেশে তোমার অভিজ্ঞতার কথা। জার্মান সাহিত্য-সংস্কৃতির ওপর একটু পড়াশোনা করো। চোখ-কান খোলা রেখে এদের লক্ষ্য করো। তারপর লেখো।

কথায় কথায় প্রেন ছাড়ার সময় হয়ে গেল। উনি বিদায় নিয়ে Security Control- এর দিকে এগিয়ে গেলেন। আমি তাঁর চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রইলাম। হঠাৎ দেখি শ্রী রায় পিছন ফিরে দ্রুত পায়ে আমার দিকে আসছেন। আমি ভাবলাম হয়ত কিছু ফেলে গেছেন। উনি ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, আজ যে বিজয়া দশমী। এসো কোলাকুলি করি।

তারপর এক মুহূর্তও দেরি না করে গেটের দিকে চলে গেলেন।

আমি শ্রী রায়ের কথা শিরোধার্য করে হোটেলের ফিরে সাব্বারাত ধরে তাঁর দু-দিনের বার্লিন ভ্রমণ লিখে ফেললাম। এক কথায় ওঁরই প্রেরণায় আমার বাংলা লেখার হাতেখড়ি হল। “দেশ” পত্রিকায় যখন তাঁর ঐ সময়কার ভ্রমণবৃত্তান্ত ধারাবাহিকভাবে “ফেরা” নামে প্রকাশিত হল ঠিক তার আগের সংখ্যায় আমার লেখাটি মুখবন্ধ হিসাবে “অমদাশঙ্করের সঙ্গে বার্লিনে দু-দিন” নামে প্রকাশিত হয়েছিল। আমেরিকার প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডির ঐতিহাসিক বার্লিন ভ্রমণ আমি প্রত্যক্ষ করেছিলাম। ১৯৬৩-র ২২শে নভেম্বর কেনেডি আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। সেদিন সমস্ত রাত মশাল জ্বালিয়ে বার্লিনবাসীরা শোকসজ্জাপন করে, তাও প্রত্যক্ষ করেছি।

অমদাশঙ্করের দেওয়া সাহসে ভর করে এই অভিজ্ঞতার কথাও পরবর্তীকালে দেশে ফিরে প্রকাশ করেছি।

একটি সঙ্কটময় মুহূর্তে অমদাশঙ্কর আমার মনের জ্বালা জুড়িয়েছেন। বিষয়টি মজারও বটে। দেশে ফিরে ১৯৬৪-র ডিসেম্বরে আমি বিশ্বভারতীতে জার্মান ভাষার অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করি। শ্রী রায় তখন শান্তিনিকেতনে থাকেন। আমার বিকালে ক্লাশ। ক্লাশে যাবার পথে প্রায় প্রতিদিনই ওঁর সঙ্গে দেখা হয়। উনি প্রতিদিন বিকেলে উত্তরায়ণে টেনিস খেলতে যেতেন। একদিন বিকেলে ক্লাশে যাচ্ছি, ওঁর সঙ্গে যথারীতি দেখা। আমাকে ডেকে বললেন, প্রণব, শুনছি তুমি নাকি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যাবার চেষ্টা করছ? ওখানে কত টাকা মাইনে পাবে? তুমি এখানে যা মাইনে পাও তাতে তোমার যদি শান্তিনিকেতনের মতো জায়গায় না চলে তাহলে ঐ মাইনেতে দিল্লিতেও তোমার চলবে না। তুমি বাংলার ছাত্র, জার্মান শিখেছ, জার্মানির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গভীর যোগ ছিল। রবীন্দ্রভবনের লাইব্রেরিতে সেসব আছে। লাইব্রেরিয়ান শোভনলালকে (শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়) বলো, সে তোমাকে সবরকম সাহায্য করবে। তুমি শান্তিনিকেতনে থেকে যাও। জার্মান সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করো। এখানে যা সম্পদ আছে তা কাজে লাগাবার চেষ্টা করো। তোমার ভালো হবে।

আমি দিল্লি যাবার চেষ্টা ত্যাগ করলাম। শোভনলালদার সঙ্গে দেখা করে অনেক পুঁথিপত্র ও তথ্যের সন্ধান পেলাম। সেগুলি অবলম্বন করে দীর্ঘ তিন বছর পরিশ্রমের পর লিখলাম—জার্মানিতে রবীন্দ্রনাথ। পুস্তিকাটি রবীন্দ্রনাথের জার্মানি ভ্রমণের অন্যতম তথ্যবহুল রচনা হিসাবে পাঠক মহলে গৃহীত ও স্বীকৃত হল।

এরপর ১৯৭৪ সালে এল মহাকবি গেটের ২২৫তম জন্মদিন। রবীন্দ্রনাথ কিশোর বয়স থেকেই মহাকবি গেটের বিশেষ ভক্ত ছিলেন। ১৭ বছর বয়সে ‘ভারতী’ পত্রিকায় (কার্তিক, ১২৮৫) “গেটেও তাঁহার প্রণয়িনীগণ” প্রবন্ধে লিখেছিলেন—“যে ব্যক্তি মৃত্যুকাল পর্যন্ত একজনের পব আর একজনকে ভালবাসিয়া আসিয়াছিলেন ও ভালবাসা পাইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহার প্রেমের কথা আর কত বলিব। তাঁহার ছিয়াত্তর বৎসর বয়সের সময় মাদাম জিমোনৌস্কা তাঁহার প্রেমে পড়েন।

গেটের এই প্রেম কাহিনী সমুদয়ে পাঠকেরা যে মহাকবি গেটের হৃদয় জানিতে পাবিবেন মাত্র তাহা নহে—প্রেমের বিচিত্র মূর্তিও দেখিতে পাইবেন।”

গেটের জন্ম ২৮শে আগস্ট ১৭৪৯ ও মৃত্যু ২২শে মার্চ ১৮৩২ সালে। গেটের জন্মদিনে আমি আমার ক্লাশে মহা উৎসাহে এই মহাকবির ঘটনাবলী জীবনের উল্লেখ করে তাঁর প্রেমময় হৃদয়ের কথা বলছি, এমন সময় আমারই ক্লাশের এক বন্ধু ছাত্র প্রতিবাদ কবে বলল, স্যার, আপনি গেটের যে প্রশংসা গাইছেন তা কি সব সত্য? আপনি আঙ্কের অমুক পত্রিকার রবিবাসরীয় ক্রোড়পত্রে প্রকাশিত গেটে সংক্রান্ত প্রবন্ধটি পড়েছেন? একবার পড়ে দেখুন, আপনি যেভাবে গেটের চবিত্ত বর্ণনা কবলেন তার সম্পূর্ণ বিপরীত কথা লেখা আছে।

আমি তো ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে লজ্জায় অধোবদন হয়ে আমার বলা থামিয়ে পড়াতে লাগলাম। ক্লাশ শেষ হলে লাইব্রেরি থেকে পত্রিকাটি নিয়ে দেখলাম মহাকবি গেটেকে একজন কামুক নাবী-মাংস লোলুপ, উচ্ছৃঙ্খল কৃতঘ্ন মানুষ হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। লেখক জার্মান প্রবাসী একজন বাঙালি, যিনি প্রতিবছর একবার করে কলকাতায় এসে বাজাব গরম করে যান। মিডিয়াব জোরে ইনিই সম্প্রতি জার্মানদের দেওয়া গেটে পুরস্কার পেয়েছেন। প্রবন্ধটি পড়ে ক্ষোভে, দুঃখে লজ্জায় মাথা নত হয়ে গেল।

মহাকবি গেটের ২২৫তম জন্মদিনে এই কি বাঙালির শ্রদ্ধা নিবেদন, যে কবির শততম মৃত্যুদিনের সভায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পৌরোহিত্য করেছেন?

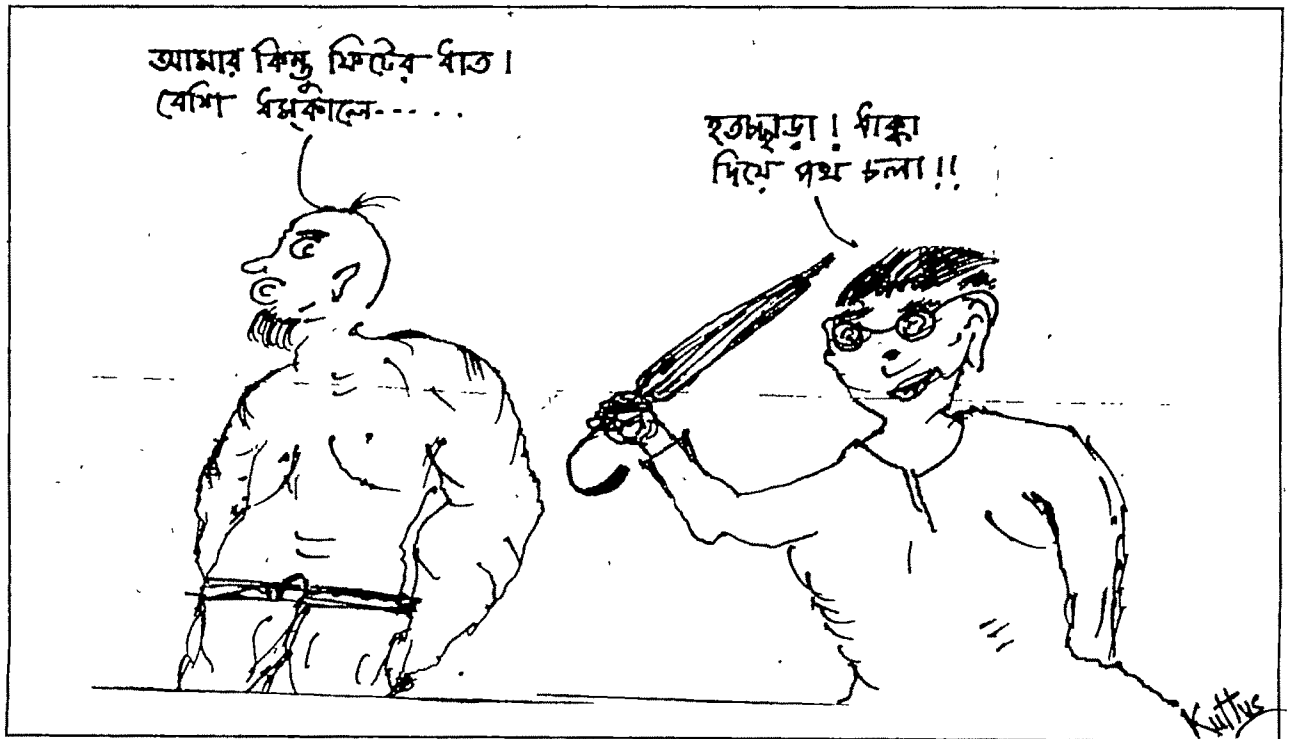
কিভাবে যে এই লেখার প্রতিবাদ করব তা ভেবে পেলাম না। বিষয়টা অমদাশঙ্করকে জানিয়ে প্রতিবাদের পথনির্দেশ চাইলাম। উনি বললেন, যদি সত্যিই প্রতিবাদ করতে চাও তাহলে তুমি নিজে মহাকবি গেটের জীবনী লেখো। কাজী আব্দুল ওদুদের পর আব কেউ গেটের পূর্ণাঙ্গ জীবনী লিখেছেন বলে মনে হয় না। গেটে জীবনে বহু নারীর সঙ্গ লাভ করেছেন, কিন্তু কোথাও বাঁধা পড়েননি। তাঁর জীবনে প্রত্যেকেই কিছু না কিছু প্রভাব ফেলে গেছে। তুমি কিছু বাদ দেবে না। তোমাব লক্ষ্য হবে গেটে নামের এই সুন্দর ফুলটি কোন মাটি থেকে রস আহরণ করে হয়ে ফুটে উঠেছিল তা দেখানো।

আমাব দৃষ্টি খুলে গেল। আমি লেখা আরম্ভ করলাম।

ভবানীপুর থেকে শ্রীমতী বেখা চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত “আভা” পত্রিকা এই লেখা ধারাবাহিক ভাবে ছাপতে সম্মত হল। ভাগ্যক্রমে এই পত্রিকার কপি অমদাশঙ্করের কাছেও যেত। তিনি যত্ন সহকারে আমাব লেখা পড়তেন। যখনই শান্তিনিকেতনে দেখা হত তিনি উপদেশ দিতেন, কোন অংশটি বাড়তে হবে ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে একটি মজার কথা উদ্ভূত।

মহাকবি গেটেকে একসময় ফ্রাউ ফন স্টাইন নামে একজন তিন সন্তানের জননী গভীবভাবে আকর্ষণ করেন। এঁদের প্রেমবন্ধন নিয়ে আমাব মনে কেমন একটা সংশয় দেখা দিল। এ কি সম্ভব? কী করে প্রেম হতে পাবে? লেখা বন্ধ রেখে ছুটলাম অমদাশঙ্করের কাছে। উনি স্বভাবসিদ্ধ ভাবে হো হো করে হেসে বললেন, তিন সন্তানের জননী হলে প্রেমে বাধা কোথায়?

নিশ্চিত হলাম, তিন সন্তানের জননী হলেও প্রেম বাধা মানে না। এবং বলাই বাহুল্য, আমাব লেখার বাধাও দূর হল।



জবর থ বর

শান্তি

অদৃবদর্শী দূরদর্শনের চ্যানেলে চ্যানেলে এখন হরেক লীলা। বাংলা এখন চালু করেছেন একটি খাণ্ডামো—জ্যাম্জমাট। পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে তেনারা কুইজের আসর বসচ্ছেন, না না, দাঁড় করাচ্ছেন, একেবারে রাতার ওপরে। যাকে বলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। ঢাঙাপানা এক যুবক কাঁধে আক্ষরিক অর্থেই ঝোলা নিয়ে গ্রন্থ ধরছেন। উত্তর দিতে পারলেই উপহার। ঝোলা থেকে বেরুচ্ছে আলপেন লিঙ্গে লজ্জেল্লুসের প্যাকেট কিংবা বয়াম, বৈদ্যনাথ চ্যবনপ্রাশ—আরো কত কি। একটাও ইংরেজি শব্দ উচ্চারণ না করে টানা একমিনিট বাংলায় কথা বলার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়লেন। বাচ্চা-বুড়ো জনা আষ্টেক কেউ ‘প্যাণ্ডেলে’, কেউ ‘প্যাণ্টে’ গোস্তা খাওয়ার পর সেই দুঃসাহসিক কাজটি করতে পাবলেন এক যুবক। আর সঙ্গে সঙ্গে ঢাঙাবাবু ঝুলি থেকে বের করে আনলেন অসামান্য উপহার—একটি চিরকুট—ছ-মাস হিন্দুস্তান টাইমস পড়ার। শেষ এক মিনিটে একটিও ইংরেজি শব্দ না বলার অপরাধে। এবার গেলো ছ’মাস ধরে ইংরেজি-তিস্ত বটিকা! মোক্ষম দাওয়াই যাকে বলে।

নারী-প্রহার

নারী-নির্ধাতন চলবে না। নারীর নির্ধাতন চলবে। বিন্ টিকিটের পুরুষ যাত্রীকে পাকড়ানো চলবে, নারীকে নয়। বরং নারীরাই টিকিট চেকারকে পাকড়াবেন, আঁচড়ে কামড়ে দেবেন। এমনই ঘটনা ঘটে গেল ১৬ই নভেম্বর শনিবার সকালে দমদম স্টেশনে। টিকিটহীন যাত্রীদের মামারবাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্যে ইদানীং ‘চেতনা’ নামের একটি বা দুটি রথ, মাফ করবেন, কামরার খাড়া থাকে। শনিবারও তাই ছিল। বিন্ টিকিটের জন্য বিশেষভাবে খ্যাত বনগাঁ লোকাল দমদমে দাঁড়ালে জয়ন্তী বিশ্বাস নামের এক রমণী অন্যদের সঙ্গে ধরা পড়েন। নারীবাদের হুজুগ নাকি যুগ চলছে নাকি। একে নারী তায় পরের বাড়ি কাজ করে খান—তাঁর ওপরে জুলুম? সইব না সইব না। টিকিট চেকার তো ভালো মানুষের পো, তিনি ঝাপিয়ে পড়লেন আর.পি এফ কর্মীদের ওপর। কিন্তু আর পি এফদের বুদ্ধি কম। তাঁরা পাণ্টা দিয়ে জয়ন্তীর চেতনা জাগ্রত করবেন বলেই বুকি বা তুলে দিলেন ‘চেতনা’-য়। অমনি চেতনা জাগ্রত হল জয়ন্তীর সঙ্গিনী ও জনগণের। রেল অবরোধ, ইট-পাথর, টিকিট কাউন্টার ভাঙচুর, দার্জিলিং মেলের এ সি কামরা ভাঙা..... এতেই ক্ষান্ত নয় গণআন্দোলন ব্যাপ্ত হল নিচের মেট্রো স্টেশন অঞ্চিও। ড্রাইভার, গার্ড, কাউন্টারের কর্মী—একধাবসে সবাই ‘চাচা আপনার প্রাণ বাঁচা’। ‘চেতনা’-র চেতনাও লুপ্ত হয় হয়। সেও দিলে পগার পার। অবিশি: বেলেব এক অফিসার সাফাই গেয়েছেন ‘চেতনা’ মোটেই পালায়নি, কর্মোপলক্ষে মধ্যমগ্রাম স্টেশনের দিকে রওনা হয়েছিল।

হয়ত বা এখানকার উত্তম-মধ্যম এড়াতেই।

—সচতুর শুপ্ত



পুনঃ অ্যারেস্ট ভব!

পশ্চিমবঙ্গে বাম-গণতন্ত্রে ‘ব্যক্তি স্বাধীনতা’ নামে একটি গালভবা বস্তুর বারংবার নাম নেওয়া হয়। সেটা সফল না হলে পরলোকবাসী (যদি থেকে থাকে) লেনিন ট্রটস্কি মার্কস প্রমোদ দাশগুপ্ত মুজাফফর আহমেদের বাসি আত্মারা নির্ধাৎ বদহজ্জে ভুগতেন। তবে বুদ্ধদেবের জমানাতে ছিটকে চোর আর মানিব্যাগের ‘অপারেটর’ নাসিম ভুলেও ইয়াদ করতে পারেনি, একমাত্র তার জন্যই এ রাজ্যে পুলিশতন্ত্র তার নিজের ব্যক্তিস্বাধীনতাকে মহানির্বাণের রাস্তায় পাঠিয়ে দেবে।

মুচিপাড়া থানা থেকে নাসিমকে ধমকি দিয়ে বেকসুব খালাস করে দেওয়া হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গেই, শুভ কাজে আর বিলম্ব নয়—এই মনে করে সেই রাতেই শ্রদ্ধানন্দ পার্ক আর অরুণা সিনেমাহলের কাছে একজন পথচারী ব গলার নলির কাছে ছুরি ধরে হার আংটি নিয়ে ভো কাটা দিয়েছিল নাসিম। আগেরদিনই নিউ মার্কেট থেকে হার ছিনতাই করতে গিয়ে পুলিশচাচাদের জালে ফেঁসে গেছিল সে তা, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই সেই খাকি চাচার আবার নাসিমের ধান্দাবাজিতে নাক গলাবে, তা কি জানত! ফলে, আবার নাসিমকে তার পুরানা শশুবালা, মুচিপাড়া থানার লক্ষ্যআপে ফিরে আসতে হল। এত তাড়াতাড়ি.সাধের চোর-জামাইকে যতীপুছো না করে পুলিশ কি আর ছাড়ে?



গটআপ কিডন্যাপ কেস

হাতখরচা বা পকেটমনি হাত করার জন্য, অর্থাৎ ক্লাশে সামনের বেঞ্চের শীলা বা রূপাকে আইক্রিম খাওয়ানোর জন্য অথবা মেট্রো সিনেমাতে 'মুভি' দেখাতে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাপের কাছে নানারকম বায়নাঝুঁকি বা অজুহাত দেখাতে ওস্তাদ আজকালকার ছেলেপিলেরা। তবে এদের থেকে হাওড়ার শিবপুরের বি কে স্কুলে ক্লাস নাইনে পড়া সতেরো বছরের সুমন্ত দাস অনেক কাঠি এগিয়ে। স্কুল ফাইনাল না পেরোলে কি হবে, টাকা আদায়ের ছক কষতে বুদ্ধির ফাইনাল এর মধ্যেই পেরিয়ে গেছে মগজকে বুদ্ধির সতেরো প্যাঁচ খাওয়ানো সুমন্ত।

দুর্গাপুজোর আগে বেশকিছু মালকড়ির দরকার ছিল সুমন্তর। সঙ্গে একটু মস্তি না থাকলে কি হয়? সেজন্য সুমন্ত তার কাকার বাড়ির ভাড়াটের ছেলে সাত বছরের সাগরকে অপহরণ করে বসল। হিন্দি সিনেমার ভিলেনগিরির সমস্ত ফর্মুলা মেনে সুমন্ত সাগরকে লুকিয়ে রেখেছিল সাঁকরাহিলের কাছে আন্দুলে। মাঝেমাঝেই ফোনে সাগরের কাকা ও বাবাকে ১০,০০০ টাকা মুক্তিপণ দেওয়ার ধমকি জানাচ্ছিল সুমন্ত। কিডন্যাপ করার পর অপহরণকারীদের ডিমাণ্ড হয় মিনিমাম লাখখানেক টাকা, সাধারণত। এত কম টাকাতে রফা হচ্ছে দেখে সন্দেহ হয় পুলিশের। টেলিফোনে গলা অনেকটা সুমন্তের গলার স্বরের সঙ্গে মিলে যাচ্ছিল। একবার চেপে ধরতেই সুমন্তের সুমতি ফিরে এল। সে হার্ডমাত করে কেঁদে বলল— 'স্রেফ 'মজাশু'। এবপর সুমন্ত নিজে যে হাইব্রিড মজাশু দেখেছে, তো বলাই বাহুল্য। মজাশু নয়, দোজাশু।

হাট সেভার!

ফাঁসির দড়ি গলায় পরে জিভ বের কবে খাবি খেতে খেতে যমের দক্ষিণ দুয়ারে যেতে হবে শুনেই ভয়ে সিকিভাগ হয়ে যায় অনেক কয়েদী। তারা তো আর স্কুদিরাম-ভগত সিং-দামোদর হরি চাপেকার নয় যে ফাঁসিতে লটকানোর কথা শুনেই আনন্দে ঘুমোতে শুরু করে! ফাঁসির দড়ি থেকে এ যাত্রা খুব সম্ভবত রেহাই পেতে পারত ইরানের খুনি আসামি; ৫৫ বছরের মোহাম্মদ হাদি।

আশিশ, কোকেন, চরস-এর বে-কানুনি কারবার করতে গিয়ে একজন খদ্দেরের সঙ্গে বচসা লাগে হাদির। তবে উমর পাঁচপনকি, দম হারকিউলিস কা। ঝগড়া মাত্রা ছাড়াতেই হাদি ছুরি দিয়ে পেট ফাঁক করে দেয় তার সেই খদ্দেরের। বিচারে ফাঁসির হুকুম। লটকে যাওয়ার আগে হঠাৎই কলজেটার ধুকপুক প্রায় বন্ধ। বেইশ। ফাঁসির ফাঁস দেখেই। ফাঁসির হুকুম তখনই তুলে নেওয়া হয় তার ওপর থেকে। তাকে চালান করে দেওয়া হয় শোমেইনি শহরের প্রধান হাসপাতালে। তার মানে এই নয় যে, যমের হাত ফসকে ফিরতে পারলে মাথায় পাগড়ি চাপিয়ে হাদি আর একটা শাদি করতে বেরবেন। হৃদয় একটু ঠিক হলেই ফাঁসির দড়িতে আবার লটকানো হবে হাদিকে।

নেশাটাই ডোবাল

পাতিপুকুর বা বোসপুকুরের দিশি মালের দোকান থেকে ধারে "এ কেলাশ" খেনো বা চুমু গিলে যেনারা রাস্তার পাশে, নর্দমার ধারে অথবা রিক্সাস্ট্যাণ্ডেব পিছনে ভরদুপুরে অকাতরে নাক ডাকিয়ে ঘুমান, তেনাদের পক্ষে এই খবরটা দিব্যি খাসা বর্শে চলতে পারে। ইউরোপের অস্ট্রিয়া দেশের শহর গ্রাজ-এ এরকমই একজন "স্বদেশী জল"প্রিয় মানুষের দুর্ভাগ্যের (নাকি জেল-ভাগ্য?) খবর পাওয়া গেছে।

গ্রাজ শহরের একটি ব্যাঙ্ক থেকে সবাইকে "চেষ্টার" দেখিয়ে চমকে দিয়ে নগদ ক্যাশ নিয়ে চম্পট দিয়েছিল বছর তেরিশের এই ডাকাতটি। হাতে একগাদা টাকা। একটু "সেলিব্রেশন" না করলে হয়? তাই রাস্তার ধারের দিশি মদের দোকান থেকে এক বোতল স্থানীয় পানীয় "গ্যাপস্" চুকচুক করে মেরে দিল ডাকাতটি। তারপরই তার আর পা চলল না, বলাই বাহুল্য। "গ্যাপস্"-এর আমেজ ডাকাতটিকে এমনই শরাবী বানিয়ে দিল যে লোকটি আর নিজের, মানে আগে থেকে ঝেড়ে দেওয়া গাড়িতে একঘুম না দিয়ে পারল না। নেশাতে বুদ্ধিনাশ হয়। গাড়িতে দুটো আলাদা নাশ্বারস্ট্রেট লাগানো ছিল। সামনে আর পিছনে। পথচারীদের তাই দেখে সন্দেহ হল। তার ওপর গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো নেশাখোর ডাকাতের পাশে পাওয়া গেল মদের ফাঁকা বোতল আর একটা গুলিভরা পিস্তল। পুলিশ যখন এসে তাকে পাকড়িয়ে শ্রীঘরে নিয়ে যাচ্ছিল তখনো লোকটির রসনিদ্রা ভঙ্গ হয়নি। কলকাতা পুলিশের কর্মকর্তারা এ শহর ব্যাঙ্ক ডাকাতির হিড়িক রুখতে ব্যাঙ্কের পাশে দিশি মালের দোকানের এজেন্সি খোলার ব্যবস্থা করে দেখবেন, এমনই শুভব।

—কৌশিক রায়



দুগ্গাপূজা-লক্ষীপূজা-কালীপূজা তো কাইট্যা কুইট্যা গেল। তা এই অশ্বম কাঙ্গালকে মনে রাইখ্যা পূজসংখ্যার ছাপানো রেসিপিগুলান টেরাই করছিলেন তো হয়লে? আশা করি, মা পেটুকেষরীর অসীম দয়াতে আপনেকোর কেউই নিচয় হেই খাবারগুলান খাইয়া হাসপাতালে ভর্তি হন নাই, বা প্যাণ্ডেলে না ঘুইয়া পটল তুলেন নাই। যাউক গিয়া, হেইবার শীত আইয়া পড়ছে, হাওয়া আপিস জানান দিছে—শীত আমাগো এক্কেরে কাঁকড়ার মতন কাঁক কইরা ধরব। হেই জনি কাঁকড়ার তরকারির রন্ধন পোণালীটা দিলাম। খাইয়া দ্যাহেন দিহি ক্যামন লাগে।

কাঁকড়ার তরকারি

কি কি লাইগুব : মাঝারি মাপের ছয়হান কাঁকড়া, দুইডা কুচানো পিয়াজ, আদা বাটা এক চা-চামচে, রসুন এক কোয়া, লঙ্কাগুঁড়া দুই চা-চামচে, ধনিয়া বাটা এক চা-চামচে, লবণ হলদি আর ত্যাল পরিমাণ মতন।

রন্ধন পোণালী : পেখমে কাঁকড়াগুলানের খোলা ছাড়াইয়া ভাল কইরা ধুইয়া লউন। কড়াইতে ত্যাল দিয়া তাতে পিয়াজের কুচি ভাল কইরা ভাইজ্যা তাগরে ধনিয়া পাতা, রসুন দিয়া ভালমতন কইরা পিইয়া, মানে কইয়া, লঙ্কাগুঁড়া, লবণ, হলদি আর কাঁকড়াগুলান দিয়া ভাল কইরা নাড়াচাড়া কইরা রাহেন। হেরপর জল দিয়া টিম্যা আঁচে ঢাইকা বসাইয়া রাহেন। বিশ মিনিট পর নামাইয়া দেইখ্যা লউন আপনার ভিতর, থুড়ি, কাঁকড়ার ভিতর ঝোল ঢুইকা কিনা। কড়াইডা নামাইয়া কাঁকড়ার ওপর একটুহান একনধরি যি ছড়াইয়া দিবেন, গরম মশলাও দিতি পারেন। আয়েস কইরা খান। কাঁকড়া যদি জানতি পারে তার হেইরকম উপাদেয় ছেঁরাদ হইত্যাছে, তাইলে সেও ছানাপোনা লইয়া খাইতে চলি আসবে।

বাইগনের কোনো গুণ নাই, হেই কথা একদম কইবেননি। শুধুমাত্র বাইগন পোড়া, লঙ্কা আর পিয়াজ দিয়া খাইতে হে-কি জব্বর লাগে। তাইলে বাইগন সইরয্যা খাইলে তো চোখে সইরয্যাফুল না দেইখ্যা জিবে স্বর্গের ছোঁয়া পাইবেন!

বাইগন সইরয্যা

কি কি লাইগুব : কুলি বাইগন দশহান, পস্তু, কাঁচা লঙ্কা বাটা দুই

হেঁ সৈল

চা-চামচে, টম্যাটু একহান, সইরয্যা বাটা দুই চা-চামচে, লবণ ও পরিমাণ, মতন ত্যাল।

রন্ধন পোণালী : বাইগনগুলানরে পেখমে বোঁটা সমেত লঙ্কা কইরা চিইয়া (আলাদা কইরবেননি য্যান), লবণ মাখাইয়া লালচে কইরা ভাইজ্যা লউন। পরে ওই ত্যালেই টম্যাটু কুচি, সইরয্যা লঙ্কা পস্তু বাটা, লবণ ও জল দিয়া আঁচে বসাইয়া রাহেন। একবার ঢাকা খুইল্যা দেইখ্যা সামান্য চিনি দিয়া দিবেন। ঝোলটা প্রায় শুকাইয়া, পিরিতের মতন মাখো মাখো হইয়া বাইগনের গায়ে লাইগ্যা গ্যালে নামাইয়া লউন। ধনিয়া পাতা কুচি কইরা বাইগনের ওপর দিয়া দিতি পারেন। হেইবার ভাত আর রুটির লগে বাইগন-সইরয্যার চৌদ্ধগুণ্টিব উদ্ধার কইরা দ্যান। হেঁ পদটি খাইয়া দুই চক্ষে সইরয্যার ফুল দ্যাখবেন না বটে, তবে আপনার গিমি আপনেকেরে রোজ বাইগন কিনতে বাজারে পাঠাইলে আপনার মানিব্যাগ সইরয্যার ফুল দ্যাখলেও দ্যাখতে পারে।

কচুরিরে আপনারা হয়লেই কইয়া খাহেন—এক্কেরে নিরিমিষি খাবার। কাউর লগেই প্যাঁচাল নাই গিয়া। আলুর দম অথবা কুমড়ার ঘাঁটের লগে কচুরির পিরিত আপনার কাছে কি-ই বা আর কম! রাস্তা-ঘাটে হয়ল দুকানেই তো হেই ভালবাসা দেইখ্যা খাহেন আর খাইয়াও খাহেন। তয় হেইবার ফিস্‌ফিস্‌ কইরা আপনেকো কানে ফিশ, মানে মাছ দিয়া কচুরি করনের পোণালীটা কইয়া দিই। না হইলে ‘মাছে-ভাতে বাঙ্গালি’—হেই কথাডা সত্য হইল কি কইরা কন দেহি।

ফিস কচুরি

কি কি লাইগুব : ভেটকি বা বড় কই মাছ দুইশ পইনচাস্ গেরাম (শুধু পইনচাস্ গেরাম আনবেননি, তা হইলে গিমির হাতের ঝাঁটার বাড়ি আছে), এক চাম্‌চা আদা বাটা, হাফ চাম্‌চা রসুন বাটা, দুই চা-চাম্‌চা নেবুর রস, দ্যাড় চা-চাম্‌চা লঙ্কাকুচি, ধনিয়া গুঁড়া এক চা-চাম্‌চা, ময়দা, লবণ, চিনি, সাদা ত্যাল—এক কাপ ত্যালের যা দাম, বাইপ্রে।

রন্ধন পোণালী : পেখমে মাছের পেটিগুলান সিদ্ধ কইরা কাঁটাগুলান ছাড়াইয়া লন। ত্যাল প্যানে দিয়া আদা বাটা, রসুন বাটা আর মাছ সিদ্ধ দিয়া লাড়াচাড়া করেন। হের পর লঙ্কাকুচি, ধনিয়া গুঁড়া, নেবুর রস, লবণ আর চিনি দিয়া পুর তৈয়ার করেন। ময়দাতে আইচ্ছা কইরা ময়ান দিয়া, লবণ মিশাইয়া ভাল কইরা মাইখ্যা লউন। লেচি গড়তে খাহেন। তাতে পুর দিয়া ব্যাইল্যা লউন। এর পর তো ভান্ডতে হইবই।

দ্যাখবেন, মাছের কচুরি খাওনের জন্যি কি লঙ্কা লাইন লাইগ্যা যাইব। যারা খাওনের চান্‌স্ পাইব না তাদের বুক বিনা ত্যালে, শুধু হিংসায় ভাজাভাজা হইতে থাক্‌ব।

—কাঙ্গাল রায়

যেমন তারা পদ রায়। কোনো এক রম্য নিবন্ধে তিনি লিখেছেন
যে চুরি করতে করতে তাঁর এমনই বদভ্যাস হয়ে গেছে যে শেষ
পর্যন্ত তিনি এখন তাঁর নিজের লেখা থেকেই চুরি করছেন।

আশয়-বিষয়

দেবপ্রসাদ কুমার



শি রোনাম কি উন্টো হয়ে গেল? অর্থাৎ বিষয়-আশয়, যেটা প্রচলিত, তার বদলে আশয়-বিষয় কেন? তবে কি ভুল লিখলাম? হয়ত বা তাই। সারাজীবন ভুলের মাশুল দিয়ে হঠাৎ আজ সঠিক পদক্ষেপ নেব—এমন ভাবটাই অন্যায়। তবুও ভাবতে হয়। চলন্তিকা, এ টি দেব বা সুবল মিত্র আশয় সম্বন্ধে একমত—অভিপ্রায়। যদিও একাধিক অর্থ দেওয়া আছে। অর্থ (টাকাকড়ি) একাধিক বা অনেক হতে পারে কিন্তু আমার তো বকখালির সবেধন পণ্যকুটিরের মতোই ট্যাকখালি। অনেকেই বলেন যে হাওয়ায় টাকা উড়ছে। কিন্তু ধরার কায়দা জানি না। জানলে হাছতাশ করতে হত না। কিন্তু বৃথা পরিতাপে লভ্য তো অষ্টরস্তা; সুতরাং রণে ভঙ্গ দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। হেঁপোরোগীর কফের মতো আটকে থাকা বুদ্ধি এবার খুলেছে—মানে, আমায় পালাতে হবে। শাস্ত্রেই তো লিখেছে—যঃ পলায়তি স জীবতি—যে পালায় সে-ই রক্ষা পায়। আমার কিন্তু রক্ষা নাই, যেহেতু আমার একটি আশয় বা অভিপ্রায় আছে। অভিপ্রায়টি কিন্তু অসাধু। সাধুর বিপরীত অর্থ অসাধু। সাধু ভাষায় না লিখে অসাধু বা চলিত ভাষায় রম্য রচনা লেখা। কিন্তু রম্য রচনার ওপর এমন পক্ষপাত কেন? গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, নাটক—এবা কী অপরাধ

করল? না, অপরাধ কিছু করেনি বা এরা আমার কাছে অচ্ছুৎ নয়। পক্ষান্তরে আমিই ওদের কাছে অচ্ছুৎ। কর্দকহীন হয়বদন নায়কের কাছে সুরাপা, সুশিক্ষিতা লঘুপক্ষ প্রজাপতি সম নায়িকারা যেমন অধরা বা তাদের অধরসুখা পান যেমন দিবাস্বপ্ন। প্রবন্ধ, কবিতা রচনা (তা সে যতই অখাদ্য হোক) আমার কাছে আমার একমাত্র করালবদনা স্ত্রী সম, নাগালের মধ্যে যে কাঙ্ক্ষিতা না হলেও বঞ্চিত করে না।

ভূমিকাকে আরো একটু রবারের মতো টানতে ইচ্ছে কবছিল কিন্তু ছিঁড়ে যাওয়ার ভয়ে তাকে আপাতত ক্ষ্যামা দিলাম। আসল বিষয়ে আসা যাক। সেটা হচ্ছে বিষয়। অর্থাৎ রম্য রচনার বিষয় নির্বাচন। এই বিষয় নির্বাচন খুব একটা কঠিন নয়—কঠিন হচ্ছে নির্বাচিত বিষয়কে বাগানো। ধরা যাক কোনো একজন পাণিপ্রার্থী শূঁতখুঁতে যুবকের কনে পছন্দ হল। তবুও সেই যুবকের বিয়ে আটকে গেল। কারণ কনাই বরকে খরিজ করে দিল। বিষয় নির্বাচনের এই বিষয়ে নিশ্চয়ই আর বিশদ হওয়ার প্রয়োজন নেই।

কালি কলম মন—লেখে তিন জন। আমার কালি কলম বা মন সবই আছে। কিন্তু এই তিন ঠাইকে এক করা “ভাই ভাই ঠাই ঠাই”—এর মতোই ভয়ঙ্কর বিষয়। বিষয় নির্বাচন করি এবং ভাবি কী লিখব এবং কীভাবে? ভাবনায় কোনো গলদ নেই। কিন্তু লিখতে বসলেই সব ওলট পালট হয়ে যায়। ভাবা এক লেখা আর। লেখার সাধ আছে কিন্তু সাধে কুলোয় না। এর জন্য এলেম দরকার। একটা কাজ করলে হয় না। “সাধ করে বৈষ্ণব হ’তে, প্রাণ যায় মচ্ছব দিতে”—এইটা কি একটা বিষয় হতে পারে না? মহা বিপদ। এ বাবদে দু’কদম এগোই তো তিন কদম পিছিয়ে আসি। তাহলে গন্তব্যে পৌছব কেমন করে? পৌছবার উপায় বাতলে দিয়েছে গোপাল ভাঁড় এবং এই সরস কাহিনীর পুনরাবৃত্তি হবে চোরাই মালের নামান্তর। তবে চুরি করে ধরা না পড়লে সোনায় সোহাগা। রম্য রচনা মূলত হাস্যরসের আধার এবং হাস্যরস পরিবেশনে চৌর্যবৃত্তি নতুন কিছু নয়। বহু দিকপাল সাহিত্যিক এ কর্ম করেন এবং সেটা কেউ কেউ স্বীকারও করেন। যেমন তারা পদ রায়। কোনো এক রম্য নিবন্ধে তিনি লিখেছেন যে চুরি করতে করতে তাঁর এমনই বদভ্যাস হয়ে গেছে যে শেষ পর্যন্ত তিনি এখন তাঁর নিজের লেখা থেকেই চুরি করছেন। আমিও যদি আমার লেখা থেকে চুরি করি তবে কেমন হয়? মন্দ হয় না। কিন্তু একটু অসুবিধা

আছে। অসুবিধা হচ্ছে, লেখক হিসেবে যাদের কোনো পরিচিতি নেই, অপ্রাসঙ্গিক হবে কিনা সেটা পাঠকের বিবেচ্য, (পাঠক! তোমার লেখা পড়বে কে হে?) বিখ্যাত লেখকের লেখায় এমনও দেখা যায় যে প্রসঙ্গক্রমে তিনি লিখেছেন—“মল্লিখিত অমুক গল্প দ্রষ্টব্য”। এখানে কোনো ঝামেলা নেই। কারণ তাঁর সেই গল্প বহুপঠিত। কিন্তু আমি যদি লিখি, আমার অমুক লেখা দ্রষ্টব্য, অথচ আমার সেই লেখা কোথাও ছাপা হয়নি! আমি তো আমার সেই লেখা কেউ ছাপবে না ধরে নিয়ে কোনো পত্রিকাতেই পাঠাইনি। পশুশ্রম কে আর সাধ করে করতে চায়?

এই পশুশ্রম বাবদে দু'একটা রসিকতার কথা মনে হওয়ায় তার উল্লেখ করার লোভ সামলাতে না পারার জন্য আগাম ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, এর গুণগত মান যেহেতু নিকৃষ্ট।

(১) বলাইবাবু ভোট দিতে যাচ্ছেন এবং বলাই বাচ্চ্য যে বলাইবাবুর প্রার্থীর পরাজয় অবশ্যস্বাভাবী। নিমাই জানে যে বলাই ভোট দিতে যাচ্ছে। তবুও সে বলল, “কোথায় যাচ্ছিস বলাই?” বলাই বলল, “পশুশ্রম করতে।”

(২) ডাক্তারি পরীক্ষায় প্রমাণ হয়ে গেছে যে অজিতের মায়ের খুব ইচ্ছে যে তিনি নাতির মুখ দেখে তবে চিতায় উঠবেন। মেয়ে দেখা চলেছে। এই রকম ভয়াবহ অবস্থায় অজিত রসময়ের কাছে জানতে চাইল, “কী করা যায় বল তো রসময়?”

অগ্রপশ্চাৎ বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে রসময়ের তাৎক্ষণিক জবাব—
“কেন পশুশ্রম করবি?”

রম্য রচনার বাসনায় আমিও পশুশ্রম করে যাচ্ছি। পেটে বিদ্যে থাকলে পরিশ্রম সফল হত। অনেকদিন আগের কথা। একজন গৈরো লোক গেছে শহরে। ময়রার দোকানে জিলিপি খেয়ে সে অবাক। সে বা তার গ্রামের লোক জিলিপির নামই শোনেনি, খাওয়া তো দূরের কথা। যাই হোক, সে মনে মনে ভাবল যে তার গ্রামের লোকদের জিলিপি তৈরি করে খাইয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দেবে। সেইজন্য সে জিলিপির কারিগরের কাছে থেকে জিলিপির উপকরণ এবং প্রস্তুত প্রণালি জেনে নিল। যাকে বলে হাতে-কলমে শিক্ষা। গ্রামে ফিরে এসে ঢাকডোল পিটিয়ে গুটিবর্গকে তার চারপাশে একত্রিত করে জিলিপি ভাজার উপক্রম করল। জিলিপি তৈরির সময় সে লক্ষ্য করেছিল যে কারিগর একটা টুলের ওপর বসে একটা ফুটো পাত্রে উপকরণ ঢেলে দিয়ে ফুটোটা আঙুল দিয়ে টিপে ধরে ভাজবার সময় কোমরটা দোলাচ্ছে। সে কারিগরের কোমর দোলানিটাই খেয়াল করেছে কিন্তু জিলিপি ভাজার সময় যে ফুটো থেকে আঙুলটা সরিয়ে নিতে হয় সেটা বেমানম ভুলে গেছে। আর গলদটা সেইখানে। নিজে যখন সে জিলিপি ভাজতে বসেছে, কোমরটাই শুধু দোলাচ্ছে— ফুটোটা আঙুল দিয়ে চেপে রেখেছে। তা হলে জিলিপি আর কী করে ভাজা হবে? পশুশ্রম বই আর কিছু না।

এই বকমের গল্প ইয়ার-বন্দিদের কাছে অঙ্গভঙ্গি সহকারে বলার জন্য। লিখতে গেলেই চিন্তির। কারণ, তাকে করতে হবে আকারে ক্ষুদ্র, প্রকারে প্রাঞ্জল। লেখার ক্ষেত্রে তো অঙ্গভঙ্গির কোনো অবকাশ নেই। এলেমের ফুটোটা কোথায় কতটা টিপতে বা মুক্ত করতে হবে সেটা অজ্ঞাত থাকায় রম্য রচনা সার্থক না হয়ে পশুশ্রমে পরিণত হয়— যা হল আমার। প্রেমানন্দে পাঠক বলুন—সন্দেহ নেই, সন্দেহ নেই, সন্দেহ নেই তাই। নটে গাছটি মুড়োল না, কিন্তু আমার কথাটি ফুরলো।

জয়হিন্দ

আমরা যতই এগিয়েছি ততই হাঙ্কা হয়েছি। একটা সময় ছিল, যখন গাধার মতো বোঝা বয়ে বেড়াতে হত। বোমের বোঝা। আত্মসম্মানবোধ, দেশাত্মবোধ, মূল্যবোধ, সৌজন্যবোধ। ভিড় বাসে হাঁচি পেলে চাপতে হত। বাবাদের পিণ্ডি দিতে হত। বিজয়া দশমী করতে যেতে হত। স্বাধীনতা দিবসে পতাকা টাঙাতে হত। মাছ-মিষ্টি নিয়ে লোকের বাড়ি যেতে হত। কেউ এলে লুচি-ওমলেট দিতে হত। খবরের কাগজে সিনেমার পাতা কেটে রাখতে হত। ছেলেপুলেরা দেখে। ধর্ম্মের মানে ‘কুমারীপূজা’ বলতে হত। শ্রীলতাহানির মানে ‘শৃঙ্গার’ বলতে হত। ছোটশৃঙ্গ। নন্দাঘুটি, পীরপাঞ্জল, আবু—। সেকালে রাস্তায় মারামারি দেখলে ছাড়িয়ে দিতে হত। সবাই মিলে

ই-মেল, লক্-আপেই বিচার সেরে ফাঁসি দেওয়া যায়। ই-বিচার। আলিবাবাও হিউম্যান, চোরেরাও হিউম্যান, হিউম্যান রাইটের কী আসে যায়?

ছাড়াতে গিয়েও মারামারি লেগে যেত। যে দু'জন শুরু করেছিল তখন তারাই ছাড়াত। তারই মধ্যে দেশাত্মবোধক শ্লোগান উঠল—

করেদে ইয়া মরেদে

ছাড়াতে এলেই মারেদে।

এখন আমরা কত হাঙ্কা! স্পাইডারম্যান। রাতদুপুরে এ ছাদ ও ছাদ করা যায়। শিক্ষকের বাড়িকে নিষিদ্ধপল্লী ঘোষণা করা যায়। কলেজস্ট্রিটে নতুন পুরাতন সার্টিফিকেট কেন্দ্রবোচা যায়। নবীনখুড়া এখনো শিয়ালদা থেকে শ্যামবাজার হেঁটে যান। ঐ দূরত্বে চিঠি পাঠালে ভায়া ব্রক্সও হয়ে যায়। ই-মেল, লক্-আপেই বিচার সেরে ফাঁসি দেওয়া যায়। ই-বিচার। আলিবাবাও হিউম্যান, চোরেরাও হিউম্যান, হিউম্যান রাইটের কী আসে যায়? এখন টেলিফোনে কোলাকুলি করা যায়। ভূ তোলা মতো ভূণ তোলা যায়। বাড়িওলার হরকোপ দেখে ভাড়াটে কব্বে উঠছে তা বলা যায়। সতীদাহ এখন অচল। গোধরা সচল। মানুষকে ‘সংখ্যালঘু’ বলা যায়। ই-সুমাবি। গভীর রাতে উচ্ছেদ ভালো হয়। দাদাঠাকুরের খাল বলে কথা। প্রশাসন বেসরকারীকরণ করা যায়। ‘ডু ইট নাই’। মাছের বাজারের মধ্যে আইসক্রিম চটতে চটতে ঘোরা যায়। আধুনিক ফ্ল্যাটে লিফটের মতো গোনা লোক। দেশ থেকে মা-বাবা এলে মোক্ষদাকে দিয়ে ‘বাড়ি নেই’ বলা যায়।

টেকনোতে টেকনোতে সংসার ছেয়ে গেছে। শোবার ঘরে ক্যামেরা ফিট করে অফিসে বসে বউ-নজর রাখা যায়। ডাইভারের ডোপ টেস্ট করে পেট্রলের হিসেব মেলানো যায়। মেয়ে যুবতী হলে রোজ রাতে দুধের সঙ্গে একটা করে বড়ি। অবান্ত্রিতকে বেড়ে দেওয়া যায়। ছেলে যুবক হলে ‘ঘোর উন্মাদ’ বলে একটা সার্টিফিকেট করা। যুবকদের নাভির নিচে দুর্ঘোধান। তাই আইনের ডাকবাক্য তৈরি। ‘ইয়োর অনার’, পাগলে জাস্টে ধরতে পারে, কিন্তু মিশাইল উৎক্ষেপ পারে না। এখন স্বাস্থ্য বাঁচানোর কত মেশিন বেরিয়েছে। স্বাস্থ্যই সম্পদ। বাকি সব ‘পোস্ট অফিসে। এম. আই. এস। মাসে একবার দেখা হয়। যেন বড় ছেলে ক্লাইভ-হত্যার দায়ে আলিপুর জেলে বন্দী। মাসে একবার দেখে আসতে হয়। এখানে ভালো আছিস বাবা। বাইরে কত বেকার। আবার পরাধীন হলে ডুই প্রথম প্রেসিডেন্ট হবি।

জয়হিন্দ।

—আইভান হো হো

ভীমরতি

প্রণবকুমার চক্রবর্তী

খোদ বড়বাবুই হাসতে
হাসতে বলেছিলেন,
দেখুন ওসব কিছু না।
এলাকায় নতুন বাড়িঘর
করলে ক্লাবের ছেলেরা
অমন কিছু চায়। এটা এক
ধরনের সোসাল র্যাগিং।



হঠাৎ রাখহরিবাবু হাঁউমাউ করে কেঁদে উঠলেন। কান্নার আওয়াজ শুনে বৌ-ছেলেরা যে যার কাজ ফেলে ছুটে আসে ব্যাপারটা দেখার জন্য।

ছেলে-বৌ সবার মনে একটাই চিন্তা—কী হল? কেউ গুলি করে পালায়নি তো?

দিনকাল যা হয়েছে। সর্বত্র মস্তান আর তোলাবাজদের দৌরাহু। যা খুশি তাই করে বেড়াচ্ছে। এত টাকা দিতে হবে। না দিলেই গুলি। প্রায় দিনই শবরের কাগজে একটা দুটো এ রকম ঘটনা থাকবেই। কমা তো দূরের কথা, দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। সবাই এ ব্যাপারে একে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাতেই ব্যস্ত। কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার লোক পাওয়াই ভার।

চরুদেবী রাখহরিবাবুর স্ত্রী। ধরকমার কাজেব থেকে ইদানীং রান্নাটা করতেই বেশি ভালোবাসেন। ছুটির দিন। ছেলেরা বাড়িতে। তাই ঐ সময় রান্নাঘরে বেশ ভালো করে মাংস কবছিলেন। হঠাৎ স্বামীর আর্তনাদ শুনে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। কান্না-জড়ানো গলায় বলেন, ওরে লব, ওরে কুশ, দ্যাখ তো বাবার কি হল?

নিশ্চয় সেই ছোকরাগুলো টাকা পায়নি বলে হামলা করেছে। কত করে বলেছিলাম, বাড়ি যখন এখানে করছ, তখন ওদের সাথে ঝামেলায় যেও না। ওরা সব পারে। ঝামেলা না করে বরং একটু কমিয়ে সমিয়ে কিছু টাকা দিয়ে দাও। তা আমার কথা কি শুনবে? এখন দ্যাখ কি হয়ে গেল।

রাখহরিবাবু বরাবরই একটু ভাবিকি চালের লোক। রাশি গণ্ডীর। কথাবার্তা কম বলেন। অন্যের কথা শোনে কি শোনে না, একমাত্র ভগবানই জানেন। তবে বেশি ক্ষেত্রেই নিজে যা মনে করবেন, যা ভাববেন, তাই করবেন। নিজের মত অন্যের ওপরে চাপিয়ে দিতে একেবারে সিদ্ধ ব্যক্তিত্ব। এর অবশ্য একটা কারণও আছে। দীর্ঘদিন পুলিশে চাকরি করেছেন। কত চোর ডাকাত বদমাইসদের শায়েস্তা করেছেন। কেউ ট্যা-ফৌ করতে পারেনি। কোনো ঝামেলা হয়নি। আজ শেষবেলায় রিটায়ারের পর এই সব উটকো ঝামেলা। তাও আবার বাড়ি করা নিয়ে। অসম্ভব। কয়েকটা ছোকরা এসে টাকা চাইবে, বলবে—এলাকায় বাড়ি করে শান্তিতে থাকতে হলে তোলা দিতে হবে। অদ্ভুত

ব্যাপার! কেউ দেখার নেই? বলার নেই?

রাখহরিবাবুর পক্ষে ওসব অন্যায্য অত্যাচার মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি। ছোকরাদের মুখের ওপরে বলেছিলেন, ওসব খান্দাপানি এখানে চলবে না। পথ দ্যাখো। একটা পয়সাও দেব না। তোমাদের যা করার করে নিও।

ওরাও স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বলেছিল, ঠিক আছে। দেখা যাবে। আমরাও থাকব, আপনিও এখানে থাকবেন।

চারুদেবী তখনই স্বামীকে বুঝিয়ে বলেছিলেন—ঠিক আছে, তুমি এখন রিটায়ার করেছ, বয়স হয়েছে। একা একা পথেঘাটে চলাফেরা করবে। তাছাড়া ছেলেরাও তো এখন তোমার ভাবা দরকার। মস্তানদের সাথে ঝামেলা পাকিয়ে শেষতক খুব একটা লাভ হবে না। কেউ পাশে দাঁড়াবে না। কিছু অল্পসল্প দিয়ে ওদের সাথে মিটমাট করে নাও।

কে কার কথা শোনে। স্ত্রীর কথায় আরো চটেছিলেন। ক্ষমার ছেড়ে বলেছিলেন, তোমরা আমায় ক্রিমিনালের সাথে কনস্রোমাইজ করতে বলছ? ওটা করার থেকে আমার মরে যাওয়া

দের ভালো। আমি পারব না। যা হবার হবে। আমি এর শেষ দেখে ছাড়ব।

চারুদেবী সেদিন আর কিছু বলতে সাহস পাননি। কিন্তু ভবিষ্যতের একটা অজানা ভয় আর আতঙ্ক তাঁকে সর্বক্ষণ তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল। ঈশ্বরকে ডাকা ছাড়া আর কি উপায়। একমাত্র তিনিই সব গুনবেন। উত্তর দেবেন না, কিন্তু কাউকে লাগানি-ভাঙানিও করবেন না।

রাখহরিবাবুও ব্যাপারটা সহজে ছেড়ে দিতে রাজি নন। অনেক ভেবেচিন্তে একদিন থানায় গিয়েছিলেন। বড়বাবুর সাথে দেখাও করেছিলেন। নিজের পরিচয় দিয়ে বলেছিলেন সমস্ত ব্যাপারটা। একটা বিহিতও চেয়েছিলেন। কিন্তু মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। খোদ বড়বাবুই হাসতে হাসতে বলেছিলেন, দেখুন ওসব কিছু না। এলাকায় নতুন বাড়িঘর করলে ক্লাবের ছেলেরা অমন কিছু চায়। এটা এক ধরনের সোসাল ব্যাগিং। ভয় পাবার মতো ব্যাপার নয়। পাড়ার লোকজনের সাথে কথা বলে মিটিয়ে নিন।

—আপনি একজন থানাব বড়বাবু হয়ে এসব কি বলছেন? এত বড় অন্যায় মেনে নিতে হবে? দেশে কি আইন-কানুন সব শেষ হয়ে গেছে?

রাখহরিবাবুকে উত্তেজিত হতে দেখে বড়বাবু হাসতে হাসতে বলেন— আপনি অযথা উত্তেজিত হচ্ছেন। ব্যাপারটা তা নয়। আমি আপনার অভিযোগে আশ্রয় করে দিতে পারি। কিন্তু পরের হেপাটা তো আপনাকেই সামলাতে হবে। কারণে অকারণে আপনাকে, আপনার ফ্যামিলিকে জ্বালিয়ে মারবে। থানা, পুলিশ কতক্ষণ আপনাকে সামলাবে?

মনের দুঃখে রাখহরিবাবু সেদিন বাড়ি ফিরে এসেছিলেন। বুঝেছিলেন, কিছু হবার নয়। লড়তে গেলে নিজেকেই লড়তে হবে। কেউ সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে না। সবাই নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত।

—জানো চারু, আমার এখন নিজেরই ভাবতে লজ্জা লাগছে যে আমি এই পুলিশেই চাকরি করতাম। থানার বড়বাবু তোমার মতোই কথা শোনালো। বলল—আপনাকে তো এলাকায় থাকতে হবে। ঝামেলাটা মিটিয়ে নেওয়াই ভালো। আমি কিন্তু ছাড়ব না।

সেই লোকের আর্থনাদ। শুনে বাড়ির ভিতর থেকে সবাই ছুটে আসে ব্যাপারটা দেখার জন্য।

ছুটিব দিন। ছেলেরা ঘরে বসে খেলা দেখতে ব্যস্ত। ক্রিকেট খেলা। ভারত-পাকিস্তানের। বেশ জমে উঠেছিল। শতীন আর সৌরভের ব্যাটিং। বাইরে রাস্তাঘাট সব ফাঁকা। গাঁ গাঁ শব্দে টিভি চলছে। প্রত্যেকটা বাড়িতেই যেন কানপুরের মাঠের উত্তেজনা। লব-কুশের ঘরেও ক্রিকেট-আগুন তখন টগবগ করে ফুটছে।

ঠিক সেই মুহূর্তেই বাইরের থেকে আর্থনাদ। লব-কুশ কান খাড়া করে উঠে দাঁড়ায়। এ তো বাবার কান্না।

বন্ধ ঘরের দরজা খুলে আসতেই ওদের মার সাথে দেখা। মাও হস্তদস্ত হয়ে বাইরের ঘরের দিকে ছুটে যাচ্ছে আর সমানে বলে চলেছে—কত করে বলেছিলাম, ওদের সঙ্গে ঝামেলা করো না। কোনো লাভ হবে না। কিছু না দিলে ওরা ক্ষতি করে দেবে। অল্পসল্প দিয়ে মিটমাট করে নিলে আজ এমনটা হত না। উশ্টে উনি থানায় গেলেন। কিছুতেই বুঝতে চান না যে এখন সেই পুলিশ নেই। নেতারা না বললে কিছুই করবে না। নিষর্তি ছোঁকরাগুলো জানতে পেরেছে যে উনি থানায় গিয়েছিলেন।

—জেনেছে তো বটেই। মায়ের কথার পিঠে লব বলে, তিন-চারদিন

আগে শান্তিাবু আমাকে বাবার থানায় যাবার কথাটা বলেছিলেন। অ্যাডভাইস করেছিলেন ব্যাপারটা নিয়ে অযথা কচলা-কচলি না করে, ক্লাবের বড়দের সাথে পাড়ার কমিশনারকে নিয়ে বসে মিটিয়ে ফেলাই ভালো। বাবাকে কথাটা বলতেই তড়াং করে রেগে উঠলেন। উশ্টে শুনিয়ে দিলেন—তোদের আমার ছেলে ভাবতেও এখন লজ্জা লাগছে। কয়েকটা ফুটকে ছোঁড়কে এত ভয়!

বাইরের ঘর থেকে আর কোনো আওয়াজ আসছে না। মাত্র একবারই আর্থনাদ হয়ে থেমে গেছে।

তাহলে এতক্ষণে সব শেষ হয়ে গেছে। সব্বারই এক চিন্তা।

বিছানার উপরে উপুড় হয়ে পড়ে আছেন। একহাতে টেলিফোনের বিসিভার, অন্যহাতে নিজের মুখটা ঢাকা। একেবাবে নিঃশব্দ। আশেপাশে কোথাও রক্তের চিহ্ন নেই। গুলিটুলি যে হয়নি এটা পরিষ্কার।

তাহলে কি ছোঁকরাগুলোর সাথে টেলিফোনে কথা বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে চিংকার করে কেঁদে উঠেছিলেন? আর সঙ্গে সঙ্গে হার্ট কোলাপ্স করে গেছে?

—তোমাব কি হল গো? চারুদেবী ঘরে ঢুকেই স্বামীর উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েন। টেনে চিং করে শুইয়ে দেন। রাখহরিবাবুর দু'চোখ দিয়ে সমানে জল গড়িয়ে পড়ছে। দৃষ্টি উদাস।

মাথায় গায়ে হাত দিয়ে শরীরের উষ্ণতা বোঝার চেষ্টা করলেন। না, গা তো গরমই আছে।

লব বাবার বাঁ হাতটা টেনে নিয়ে নাড়িটা বোঝাব চেষ্টা করে। নর্মাল, হার্টবিট ইক্স অল রাইট। একটা শক হয়েছে। কুশ টেলিফোনের রিসিভারটা নিজের হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ হ্যালো হ্যালো করে বুঝতে চেষ্টা করে কোথা থেকে কলটা এসেছিল। কে করেছিল।

কিছুই জানা সম্ভব হল না। লাইন কেটে গেছে। না, যা ভেবেছিল তেমন কিছু হয়নি। ঠাকুর রক্ষা করেছেন।

কুশ ডাক্তার মিত্রকে ফোন করে আসতে বলে। লব রান্নাঘরের দিকে ছুটে যায় গরম দুধ আনতে। চারুদেবী স্বামীর পাশে বসে মাথায় গায়ে হাত বোলাতে থাকেন।

একটু বাদেই রাখহরিবাবু আবার হাঁউমাউ করে উঠলেন, ঠিক আগের মতোই।

চারুদেবী জিজ্ঞেস করেন, তোমার হল কি? শরীর কি খারাপ করছে? না। মাথা নেড়ে জবাব দেন রাখহরিবাবু।

—ওরা কি তোমাকে টেলিফোনে প্রেট করেছে?

রাখহরিবাবু মাথা নেড়ে বলেন, না।

—তা হলে?

রাখহরিবাবু আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। আর একপ্রহ কেঁদে নিয়ে বললেন—লক্ষ্মণ আর নেই।

—কী বলছ?

—হ্যাঁ। সত্যিই। একটু আগে নাইরোবি থেকে ফোন এসেছিল। লক্ষ্মণের ওখানকার এক বন্ধু জানান—লক্ষ্মণের অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। মারা গেছে।

চারুদেবী বিচলিত হয়ে উঠলেন। লক্ষ্মণ ছোট দেবর। রাখহরিবাবুর থেকে প্রায় পনেরো-ষোলো বছরের ছোট। স্বপ্ন-ব-শাওড়ি মারা যাবার পরে একরকম পুত্রস্নেহেই ওকে মানুষ করেছেন। কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ

করে নাইরোবিতে ও আর অর্জুন চলে গেছে। তাও প্রায় ছ'সাত বছর। দু'বছর পর পর একবার মাসখানেকের জন্য আসত। বছর চারেক আগে বেশ জাঁকজমক করে বিয়ে দিয়েছেন। বর্ধমানের দত্তবাড়ির মেয়ে। বছর দেড়েকের একটা ছেলে। গতবছর পুষাণের অনগ্রাশনে দু'জনের যাবার কথা ছিল। পাশপোর্ট ভিসা সবই হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ স্বামীর পা ভাঙতে আর যাওয়া হয়নি। এবারে ফান্সে লব-কুশের বিয়েতে ওদের আসার কথা। বাচ্চাটাকেও দেখা হয়নি। ঐ সময় দেখা হবে। কিন্তু এ কি হল?

স্বামী মনের অবস্থা আন্দাজ করতে পারেন। ছোট ভাই। ভীষণ শক পেয়েছেন।

—অমন করছ কেন? একটু শান্ত হও। কি আর করা যাবে। সবই ভগবানের মার। চারুদেবী স্বামীকে জোর করে সাধুনা দেবার চেষ্টা করেন।

কুশ যেন বোবা হয়ে গেছে। যেন পাথরের মূর্তি। পাশে দাঁড়িয়ে মা বাবার দিকে নিম্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ভাবতেই পারছে না ছোটকা মারা গেছে। দিন সাতেক আগেও টেলিফোনে কত কথা হল। কত ইয়ারকি, ফাজলামি। বলল বিয়েতে এসে খুব মজা করবে। বরযাত্রী গিয়ে আসার মাতিয়ে দেবে।..... এসব কী শুনছে সে! বুকের মধ্যে থেকে একটা চাপা কান্না ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

লব এক গ্লাস গরম দুধ এনে বাবার হাতে দিয়ে বলে—এটা খেয়ে নাও।

—ফাজলামি হচ্ছে। রাখহরিবাবু চিৎকার করে ওঠেন—ভাইটা ওখানে মরে পড়ে আছে, আর আমি এখানে বসে গরম দুধ খাব?

দুধ ছুঁড়ে ফেলে দেন। গ্লাস ভেঙে দুধ ছড়িয়ে পড়ে সারা মেঝেতে।

রাখহরিবাবু আস্তে আস্তে বলেন—সব আত্মীয়-স্বজনকে খবরটা জানিয়ে দাও।

মহুর্তের মধ্যে বাড়ি জুড়ে শোকের ছায়া। আতঙ্কের পরিবেশ থেকে শোকের পরিবেশ। মানুষ ভাবে এক, হয় আর।

বিকেলের দিকে কাছেপিঠের আত্মীয়-স্বজন, পাড়ার লোকজন এসে ভিড় করেছে। সমবেদনা জানাচ্ছে। রুমা-ঝুমার বাবা-মাও এসেছে। ওদের মনে একটাই আশঙ্কা, বিয়েটা না ভেঙে যায়।

—বুঝলেন সনাতনবাবু, ভাবছি লব-কুশের বিয়েটা একবছর পিছিয়েই দেব। হাজার হোক ছোটকাটা একবছর তো অশৌচ মানতেই হবে।

সনাতনবাবু সম্মতি জানান, ঠিকই তো। শাস্ত্রীয় বিধান তো মানতেই হবে।

রাখহরিবাবুর ইচ্ছা লব-কুশই ছোটকাটার কাজটা করবে। অত ছোট বাচ্চাকে দিয়ে শ্রাদ্ধশাস্তি না করানোই উচিত। লক্ষ্মণের শবুর রবিবাবুকে এটা জানানো উচিত। ওঁদের মত নেওয়া একান্ত প্রয়োজন। টেলিফোনে লাইনই পাওয়া যাচ্ছে না। বন্যার জন্য সব অকেজো হয়ে বসে গেছে। কাউকে বর্ধমানে যেতে হবে। লব বর্ধমানে যাবে আর কুশ বোকারো গিয়ে দিদি-জামাইবাবুকে নিয়ে আসবে।

হঠাৎ মাঝদুপুরে টেলিফোনটা বিশ্রিভাবে চিৎকার শুরু করল। রাখহরিবাবু শুনতে পাচ্ছেন, কিন্তু ধরছেন না। কেমন যেন কঁকড়ে গিয়েছেন। একটা ভয় ভয় ভাব। আবার যদি কোনো বাজে খবর শুনতে হয়।

পাশের ঘর থেকে টুম্পা এসে ফোনটা ধরে। টুম্পা রাখহরিবাবুর

নাতনি। বোকারো থেকে ফোনে খবর পেয়েই এসে গেছে। লবকে আর পাঠাতে হয়নি।

—হ্যালো, কাকে চাই?

ওপার থেকে কী কথা হল, টুম্পা ভূত দেখার মতো চিৎকার করে উঠল— সে কি!..... কে বলছেন? ছোট দিদুন? নাইরোবি থেকে?

ছোটদিদুন....নাইরোবি! চারুদেবী তাড়াতাড়ি এসে নাতনির হাত থেকে বিসিভারটা ছিনিয়ে নেন।

—রিকি? হ্যাঁ, বলছি। ছোট....কি বললে..পড়ে গিয়েছিল? বোঝো, বোঝো একবার। তোমার দাদা 'পড়ে'—কে শুনেছেন 'মরে'। তাই নিয়ে বাড়ি শ্মশান।...হ্যাঁ?...হ্যাঁ, সে আর বলতে? নিভে বিছানায়, চৌদিকে খবব...দাও, আগে ছোটকে দাও, দাদার সাথে কথা বলুক....

চারুদেবী ঘুরে তাকালেন। চোখমুখ লাল। রাখহরিবাবু ভাবলা মেরে শুনছিলেন। চারুদেবীর এমন মূর্তি দেখে আরো সিটিয়ে রিসিভারটা নিতে গেলেন। আর তখনই চারুদেবীর গলায় যেন বাজ ডাকল—ভীমরতি!!!

রাখহরিবাবুর হাত ছিটকে রিসিভার এবং স্বয়ং রাখহরিবাবুও ঢকাস্ করে উল্টে বিছানায়।

আমড়াগাছি-বিষয়ক

গোবিন্দ গোস্বামী

নিজেই নিজের বেজায় তারিফ করি
ভাড়াটে লোক হাততালি দেয় সভায়
চলছে চলুক 'গটআপ' মাতব্বারি
স্তাবক আছে ভাইনে এবং বায়ে।

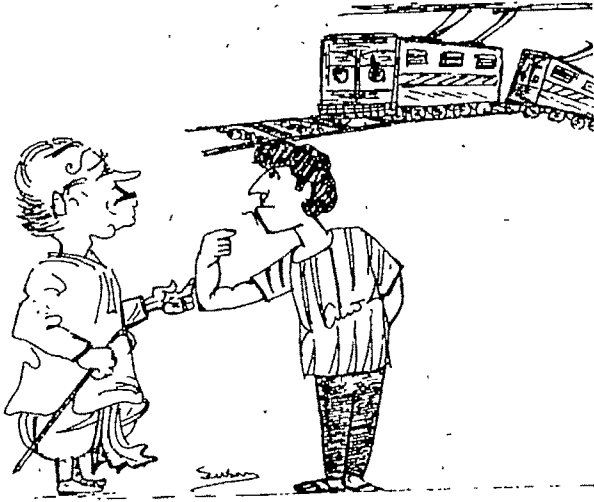
গোদার পায়ে একটু মাথা হেঁট
অন্ধকারে গন্ধ শুঁকে শুঁকে
দানে পানে গোপন থালায় ভেট
দেখবে কখন লাইনে গ্যাছো ঢুকে।

ঈর্ষাকাতর হতচ্ছাড়ার দল
চিরটাকাল চিম্টি কাটে পাছায়
ওসব ব্যথায় কমলে মনের বল
শুছিয়ে নেয়া হবেই তখন দায়।

মধ্যমণি থাকতে হলে সেজে
ঘোঁট পাকিয়ে বাধাও না হইচই
হ্যাঁচকা টানে নইলে কখন কে যে
কেড়েই নেবে আমড়াগাছির মই।

দেশের কাজ

বাসুদেব রায়



বৃদ্ধের বয়স নব্বই ছুই ছুই। মাথায় সাদা শনের মতো চুল। চোখ কোটবে ঢুকে গেছে। দু-চোখ বেয়ে টপটপ কবে জল ঝরছে তো ঝরছেই। দূর থেকে সিগারেট হাতে এক ছোকরা মাঝে মাঝে গল গল কবে ধোঁয়া ছড়ায় মুখ থেকে। কী যেন মনে হতে ছোকরা বৃদ্ধর কাছে এগিয়ে এল।

বৃদ্ধ ছোকরাকে দেখে কিছু বলার চেষ্টা করল। ছোকরা বৃদ্ধের কথা বেশ মন দিয়ে শোনার চেষ্টা করে। বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করে— তোমার নাম কি বাবা?

ছোকরাটি হেসে বলে—উপেক্ষা সেন। আমি একটু ছোটখাটো কাজ করি।

—সবাই তো কাজ করে। তুমি কী কাজ করো? দেশের কাজ করো কি?

—হ্যাঁ, সামান্য করি বটে।

—বটে কেন? বলো 'করি'।

ছোকরা বৃদ্ধর কথায় সায় দিয়ে বলে— হ্যাঁ করি।

—এই তো ভালো কথা বললে। এবার শোনো আমার কথা। তোমরা তো বলছ দেশের কাজ করো। কিন্তু এ খবর তো রাখো না—দেশটা একেবারে গোলায় গেছে।

বুড়ো আরম্ভ করে আর ছাড়ে না ছোকরাকে!—আর কত ভাগ করবে তোমরা? একবার হিন্দুস্তান ভেঙে পাকিস্তান বানালে। এতে কার কি লাভ হল? ক'জন বড় মানুষ ঘুরেফিরে মসনদ দখলের খেলায় প্রতিবছরই আমাদের নিয়ে ছেলেখেলা কবে। ভোট এলে আমাদের মাঠেঘাটে ডেবে মাইকে ঝাঁড়ের মতো বিকট চিৎকার করে। এ বলে আমরা দ্যাখ; ও বলে আমরা দ্যাখ। হান করেঙ্গা, ত্যান করেঙ্গা। আর যেই ভোটপর্ব মিটল অমনি অস্তরঙ্গা—ঘোড়াব ডিম পাড়েন্সা। এই দ্যাখো না, ঘিসিং বলে একটা লোক দেশটাকে চিচিং ফাঁক করতে চাইছে। মাঝে মাঝে হুক্কার দেয় গোখাল্যাঙ কি জয় বলে। কাশ্মীর তো বোজাই জ্বলছে পুড়ছে। রোজ সেখানে খতম হচ্ছে মানুষজন। সবসময়ই গরম গরম ভাব। যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা। বলি এসব হচ্ছেটা কি?

বুড়ো লোকটারই বা কি দোষ দেব? চোখে দেখতে পায না, কানে শুনতে পায না। আবাব হাঁটুর ব্যথা নিয়েও কাজ করে যাচ্ছে। কানা-খোঁড়া সাতগুণ বাড়ি বলেই শুনছি। সেই জন্যেই তো এত বুটবামেলার মধ্যেও দেশটাকে কোনোরকমে চালিয়ে যাচ্ছে। বাচ্চা মেয়েটার জন্যে বড্ড কষ্ট হয়। একা ঘরে-বাইরে কত আর লড়বে? দুঁদে নেতারাও তাকে ভুজুং-ভাজুং দিয়ে বিপথে চালিত করছে। ওইটুকু দুধের বাচ্চা আর কত সইবে? একদিকে বুড়োখাড়ি কংগ্রেস অন্যদিকে মাছ-ভাতে দীক্ষিত, শিক্ষিত কম অনিষ্টকারী দল। মেয়েটা যে পথে যেতে চায়, সে পথেই সাঁড়াশি আক্রমণ। মারও খেল কয়েকবার। তবুও মেয়ের জেদ—দেশের জন্যে সে একটা কিছু করবেই। আর এঁটুকু দুধের বাচ্চার আশ্বাসটুকু মানা যায় না? মেয়েটার বাইরে আশুন দেখলে কি হবে, ভেতরটা একেবারে কচি তালশাঁসের মতো স্নেহ-বিগলিত কল্পনা। তবে ওর জেদটাই চিন্তায় ফেলে দেয়। কখন কী যে কবে বসবে, আগে থেকে আঁচ পাওয়া বড় মুষ্কিল।

অত বড় মাপের লোক বেটিকে বোঝে বলেই সেদিন দেশের চাকা সচল রাখতে রেলের চাকাটাই ওকে দেখভাল করতে দিয়েছিল। রেলটা দেওয়ার আগে বলেছিল—রেলটা সচল রাখিস বেটি। তবে কেউ যদি বৌ-এর সঙ্গে ঝগড়া করে রেলের এসে মাথা দেয় তাকেও যেন ক্ষতিপূরণ দিয়ে বসিস না। একে তো রেলের কোনো আয় নেই, দেনায় চলছে.... মেয়েটা দায়িত্ব নিল সব জেনেও নেই। কিন্তু নিজের গোঁয়ারত্বের জন্যে সেই রেলের চাকাতেই মাথা দিল.....

বুড়ো একটু কেশে নিয়ে ঝললে—দেশের জন্যে আমিও কাজ চাই, আমার বাপ-ঠাকুরাণ্ড দেশের জন্যে কাজ করে গেছে। তাই আজও আমার

চোখে ঘুম নেই। বড় বেশি ভাবনায় মরছি। জানো খোকা।

একটু থেমে বলে, তোমাকে খোকা বলছি বলে কিছু মনে করো না। তুমি আমার নাতিব বয়সী। আমার ঠাকুর্দা, তার ঠাকুর্দার আমলেই রেল তৈরি হয়েছিল এদেশের মাটিতে। আমাকে নিয়ে তিন পুরুষ হয়ে গেল। রেলের দেড়শো বছর বয়স হল। বোম্বে ও কলকাতাতেই প্রথম রেল তৈরি হয়েছিল। তারপর তো দড়ির মতো ছড়িয়ে পড়েছে সাবা দেশ জুড়ে। বেশিরভাগটাই তো ইংরেজরা করে গেছে। তোমবা কি জানো হাওড়ার স্টেশনের জমিটা আমার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা দিয়েছিল? আগে ওখানে বনবাদাড় ছিল। কলাচাষও হত। এমন জমি তাও দিয়ে দিয়েছি। শরৎবাবু আবার দেশে রেল তৈরিতে খুশি হননি। শ্রীকান্তর তিন নম্বর খণ্ডে রেল তৈরিতে ভয়ের কথা জানিয়েছেন। রেলগাড়ি চালিয়েই নাকি মানুষের ঘরদোর থেকে ধান-চাল লুণ্ঠ করে নিয়ে যাবে ইংরেজরা। কিন্তু আদপে তা ঘটেনি। বরং এখনই বেশি ভয়। রেল নিয়ে যা খেয়োখেরি শুরু হয়েছে তা সামাল দেওয়া তো ছাড়, সবাই মাঠে নেমে পড়েছে রেল নিয়ে।

আমাব ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা বলতেন—দ্যাখ, রেল আমাদের সম্পত্তি, যতই খড়িবাজ ইংরেজরা তৈরি করুক, রেল আমাদের মঙ্গলের জন্যেই। রেল নিয়ে ধান্দাবাজি করা চলবে না। আর সেই রেল নিয়ে যত কাণ্ড হাজিপুর না ধানবাদে! ইংবেজরা তো এমনটি করেনি। সে জন্যে আমার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দার এক বন্ধু কবি আবেগে লিখে ফেলেছিল—

পুরাতন কীর্তি যত

সকলি হয়েছে হত

নতুন যা কিছু সব বিজাতি স্থাপিত।

হক কথা। আমরা কী করেছি দেশের জন্যে? গদির জন্যে যা করেছি তার মতো আর ন্যাকামি হয় না। আর আজ রেল নিয়ে যে কামড়া-কামড়ি করছি তার জন্যে কোনো লজ্জাও নেই নেতাদের। আমরা রেল নিয়ে চক্রান্ত ববদান্ত করব না। আমার সাফ কথা—আমরা চাই রেল যেমন চলছে, চলুক।

দেশের অনেক কিছু ভাগ হয়েছে। এমন একটা অবস্থায় পড়েছে, মা-বাবাও ভাগ হচ্ছে। দেশ তো দূরের কথা। আমার ঠাকুর্দা আমাদের সবাব বাবা, জাতির বাবা বাপুজিকে বলেছিল, তোমার কথামতো সবকিছুর ভাগকে মেনে নিয়েছি, কিন্তু আমার নাতি-পুত্ররা মেনে নেবে কিনা বলতে পারছি না। তাদের বাপ-ঠাকুর্দার সম্পত্তি নিয়ে কেউ ফায়দা লুটুক তা তারা চাইবে কিনা জানি না।

হ্যাঁ, চেষ্টা যে করিনি যোগ্য নাতি হিসাবে তা বলব না। এই দ্যাখো আমার বয়সও হয়েছে অনেক। জহবদাকে বলব বলব করেও বলা হয়ে ওঠেনি। সেও কেটে পড়ল। শাস্ত্রীকে তেমন চিনতাম না। তবে জহরদার মেয়ে ইন্দিরা, মানে আমাদের ভাইব্বি, আমাদের মনের কথা বুঝেছিলেন বলেই গণিভাইকে রেল চালাতে দিয়ে বুদ্ধিমতীর মতো কাজ করেন। গণিও আমাদের ভাইব্বির আশীর্বাদ নিষে—বাংলার রেল বাংলার বেল, বাংলার মতো জঞ্জাল সরিয়ে নব-নব সব কাজ করেছে। কিন্তু মাঝে মরারজি ভাই 'ছেড়ে দে মা কৈদে বাঁচি'—কোনো রকমে গদি আগলে রাখতে ব্যস্ত থাকার ফলে তাঁকে আর কিছু বলারই ফুরসতই মিলল না।

আর জ্যোতির কথা বলো না। সারা জীবন গরিব মুখ্যস্থায় মানুষগুলোকে মাঠে গরু-ছাগলের মতো ডেকে এনে তাদের কানে কী যে ফুসমস্তর ঢুকিয়ে দেয়, তা কে জানে না? জ্যোতিকেও বলেছি। সে খালি বলে কেন্দ্র রাজ্যের

হাতে অধিক ক্ষমতা দিক—তারপর দেখা যাবে। বেচাবি কোমরের ব্যথা নিয়ে রাজ্যপাট ছেড়ে এসব আর ভাবতে চাইল না। এখন আমি প্রায় আমার ঠাকুর্দার, তার ঠাকুর্দার সব চ্যানেল গুলিয়ে ফেলেছি। এখন যদিবা আমাব একমাত্র ভরসা ছিল পটোপাড়ার বাচ্চা মেয়েটার ওপর, কিন্তু তার অবস্থা আমার চেয়েও খারাপ। তাই এখন কারো উপর ভরসা না রেখে আমি জনগণের কাছে আবেদন করে জানাতে চাই যে যদি সত্যিই রেল ভাগাভাগি হয়, তাহলে আমাদের হাওড়া স্টেশনের জমি সব ফিবিয় দেওয়া হোক। আমরা বেলবোর্ডেও থাকতে চাই না। কত বছর হয়ে গেল। এর জন্যে আমরা অনেক ক্ষতি সয়েছি। এখন ওখান থেকে সবকিছু উচ্ছেদ করে আমাদের প্রপিতামহের প্রপিতামহের জমি ফিরিয়ে দাও। আমরা আবার কলা চাষ করব। আমাদের গিয়েছে রেল দুঃখ নেই, আবাব তোরা কলা খা। আমরা রেল চাই না মা—ভিক্ষেয় কাজ নেই, কুকুব সামলাও। জোন নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা নেই। পেট নিয়েই আমাদের ভাবনা। দেশের, যা অবস্থা—সব রাজাই আজ উলঙ্গ হয়ে পড়েছে। কে কার কাছা সামলায়।

রসকলি

নর্তকী

কবি কালিদাসের বাস উজ্জয়িনী নগরীতে। সেখানকাব অনন্ত রূপযৌবনবতী শ্রেষ্ঠ নর্তকী বসন্তলতিকা।

একদিন বসন্তলতিকার মনে সাধ জাগল, কবি কালিদাসের সঙ্গে সাক্ষাত আলাপ করতে হবে। কিন্তু কী করে তা সম্ভব? তাঁর কাছে আসেন শ্রেষ্ঠীগণ, নৃপতিগণ, কিন্তু কবির ত্যা আসেন না! তাই বসন্তলতিকা ঠিক করলেন, কবি ব্রাহ্মমুহুর্তে সরোবরে স্নান করতে যান, তিনি স্নান সেরে উঠলেই তাঁকে দেখা দেবেন।

বসন্তলতিকা প্রস্তুত হয়ে ব্রাহ্মমুহুর্তে যাত্রা কবেছেন। দূরে দেহরক্ষী ও পরিচারিকারা অপেক্ষা কবছে। বসন্তলতিকা এগিয়ে এসেছেন। কবি স্নান সেরে সূর্য প্রণাম কবছেন। সূর্যোদয়ের আগেই সূর্যপ্রণাম। সূর্য এবারে উদ্ভিত হবে। কবি প্রণাম সেরে সরোবরের সিঁড়ি বেয়ে ধ্বংসপাথরের বাঁধানো ঘাটে উঠে এলেন। বসন্তলতিকা কবিকে হঠাৎ আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন। আচম্বিতে এমন ঘটনায় কবি কিঞ্চিৎ বিমুঢ় হয়ে পড়লেন। তিনি পেছনদিকে মুখ ঘোরালেন।

বসন্তলতিকা আলিঙ্গন শিথিল করে সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, শুনেছিলাম মহাকবি কালিদাস পরম বসিক ব্যক্তি। এখন দেখছি আর পাঁচজন সার্থারণের সঙ্গে তাঁর কোনোই প্রভেদ নেই।

নিজেকে তক্ষুনি সামলে নিয়ে কালিদাস বসন্তলতিকাকে বললেন,—সুভগে, সুনিতম্বিনী, আদৌ তা নয়। আমি শুধু একবার পেছন ফিরে দেখে নিলাম, তোমার সমুচ্চ সুগোল কুচদ্বয় আমার বক্ষ ভেদ করে পৃষ্ঠদেশে বহির্গত হল কি না?

—প্রণয়কৃৎ গোস্বামী

বাজার মন্দা। একটা দাপ্তর বান্ধলে হয় না!



With Best Complements From :

HI-RISE NIRMAN UDYOG (P) LTD

P-15, India Exchange Place, Extn
Todi Mansion, 10th Floor
Kolkata-700 073

Developers, Contractor, Engineers.

সাদাকে সাদা
ও কালোকে কালো
বলার
একমাত্র
সহর্ষ মাসিকপত্র

জানুয়ারি ২০০৩

প্রপাঠ

৩য় বর্ষ।। ৬ষ্ঠ সংখ্যা

বিদায় নেবার জন্য নয়

দাম : ৮ টাকা



কাউকে হাসানোর কাগজ
কাউকে ফাঁসানোর কাগজ

নিউইয়ারের
ইয়ার্কি

স্বাক্ষর

গৃহ নির্মাণ এবং পুনর্নির্মাণের জন্যে দৃষ্টিভঙ্গি
থেকে মুক্ত হোন। ভাবছেন, আপনার সীমিত
সামর্থ্যে কীভাবে বাড়ি তৈরি করবেন? অথবা
পুরনো আবাসটিকে করে তুলবেন নতুনের
মতো? ছোট বড় সব ধরনের প্রকল্পেই, অর্থের
অপচয় নয়, আপনার অর্থের সাস্থ্যের দিকে
লক্ষ্য রেখে আমরা কাজ করি। দায়িত্ব পাশে
ও সত্য রক্ষাই আমাদের ধর্ম—

সনৎ চক্রবর্তী

ই সি টি পি

থানা — তিলজলা

কলকাতা - ৭০০ ০৭৮

দূরভাষ : ২৪৪২-৩৯১৩

৯৮৩১২-৫৩৫৯৩

নিউইয়ারের ইয়ার্কি

জানুয়ারি ২০০৩ ॥ ৩য় বর্ষ ॥ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

দাম : ৮ টাকা

কাউকে হাসানোর কাগজ
কাউকে ফাঁসানোর কাগজ

সাদাকে সাদা ও কালোকে কালো বলার একমাত্র সহর্ষ মাসিকপত্র

পত্রপাঠ

বিদায় নেবার জন্য নয়

এ বারে প্রচ্ছদ কাহিনী নেই। প্রচ্ছদই প্রচ্ছদের কাহিনী। যে জন জ্ঞানো বুঝহ সন্ধান। এসে গেছে নিউ ইয়ার। ইয়ার-দোস্ত মহলে চোত্র মেজাজ এখন। নতুন বছরে আশা যে একেবারেই নেই তা নয়, তবে যতদূর দেখা যায় বেশিটাই ফরসা। এ শহরে হিড়িক যা পড়েছে তাতে শিশুবর্ষ কিংবা নারীবর্ষর খাচে ২০০৩ কে যৌনবর্ষ বলছেন কেউ কেউ। হিন্দুদের গুজরাটি ডেউ দেখে আমাদের দাদারা মুখে কুলুপ এটেছেন আপাতত। এবং এমন ঢের বিষয়েই। তবে কি যৌনবর্ষ? ভাগ্যি ভালো, মুখে কুলুপ না এঁটে নিউইয়ারের আশা-ফরসার ও ফরসার কিঞ্চিৎ ইয়ার্কিতে মেতেছেন আমাদের লেখককুল। ইয়ার্কি মারতে গিয়ে চরণ বৈরাগী ঠেকা দিয়েছেন যৌনর পক্ষে, সমরেশ মজুমদার কেটেছেন চিমটি, পিনাকী ভাদুড়ী মেয়েছেন নিউইয়ারের কাছায় টান, সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য আট থেকে আশি সকার ভবিষ্যৎ ফরসা করে ছেড়েছেন, অমিতাভ সান্যাল এবং জ্যোতিষসাস্ত্রী মশায় আবার জুড়ে দিয়েছেন রাজনীতিকদের ন্যাজ ধরে টানাটানি। সব মিলিয়ে যাকে বলে হলুদুলস। স্থূল কথা—স্থূল হইতে সাবধান।

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা : নীরঞ্জননাথ চক্রবর্তী • তারাপদ রায়
• সমরেশ মজুমদার • শঙ্করলাল ভট্টাচার্য

সম্পাদক : শেখর আহমেদ

পরিচালন সমিতি : ডাঃ তুষারকান্তি রায় • থ্যদ্যোত কুমার মিত্র •
বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী • অঞ্জনা দত্ত • ডঃ শুভাশিস নিয়োগী •
শচীন মিত্র

পুরনো কাসুন্দি : ইংরাজী নববর্ষ • ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত □ ৮

রসকাব্য : মিছি-মিছিলের গান • ভগলু বাঁড়জো □ ৫ রায়লা • উদয়
বন্দ্যোপাধ্যায় □ ৪১

গল্প : রাথেকেশরের একটি দিন • মিতা নাগ ভট্টাচার্য □ ২৫ দ্বিতীয় পক্ষ
• দিব্যেন্দু দাস □ ২৮ বৃহৎ • দিব্যেন্দু দে □ ৩৭ কুইজ না
হ ইজ • কাকলি চৌধুরী □ ৪৪

নিয়মিত কলাম : অকপটে : নিউ ইয়ারের ইয়ার্কি • সমরেশ মজুমদার
□ ৬ চরণ বৈরাগীর ইকড়ি মিকড়ি : যৌনতার উপসংস্কৃতি • চরণ
বৈরাগী □ ১০ তারাপদ রায় ও গঙ্গারাম • তারাপদ রায় □ ১৭
কড়চা ২০০৩ : গবুচন্দ্রের দাওয়াই • অমিতাভ সান্যাল □ ৪৫

ধারাবাহিক রসোপন্যাস : মারায়ণ • পিনাকী শঙ্কর চৌধুরী □ ২৯

নিউইয়ারের ইয়ার্কি : নিউ ইয়ারে FEAR কি? • সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
□ ১২ নিউইয়ারের আশা-ফরসা • পিনাকী ভাদুড়ী □ ১৮

রস রচনা : সিংহসহিষ্কার গোবিন্দ • দিব্যালোচন কলমধারী □ ২২
হাজার রাজার বাজার • অলোক বসু □ ২৩ বাস্তবশক্তি
• আইভান হো হো □ ৩৬ বিশেষণের চোলিকে পিছে • শরদিন্দু
কর □ ৪০

নিয়মিত বিভাগ : সম্পাদকীয় □ ৩ পত্রপাঠ জবাব □ ৪ পত্রিকা সমাচার
□ ১৫ পুরুষ মহল □ ১৬ জবর খবর □ ২০ হেঁসেল □ ৩৫
মহিলা মহল □ ৪২ চলচ্চিত্র দুঃসংবাদ □ ৪৩ পথঘাটের
কিসসা □ ৪৭ রাশি চক্রের □ ৪৮

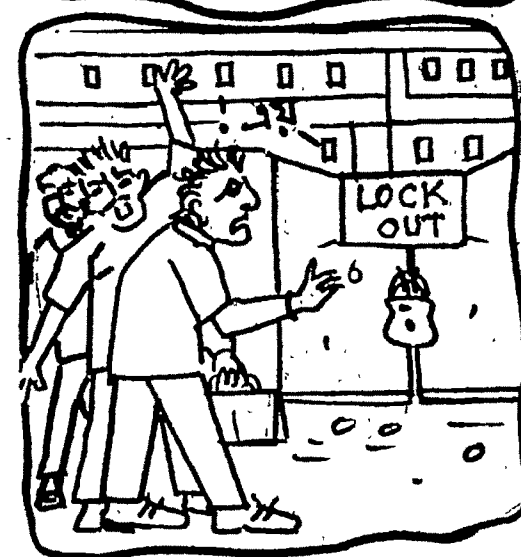
প্রচ্ছদের ছবি : শোভিক বসু রায়

অলঙ্করণ : গুরুপ্রসাদ দাস • সুশানচন্দ্র ভূঁইয়া • কুটুস
• শোভিক বসু রায়

কর্ম সহায়ক : অচিন্ত্য কারক

চাকরি পাওয়া

কার্টুন :
শোভিক
বসু রায়



সম্পাদকীয়



নববর্ষের আশাভাষ্য

ইংরেজি নববর্ষের আশা আমাদের বিপুল। আমরা আশা করিতেই পারি যে আরো কিছু কল-কারখানা সদরে তালা ঝুলাইয়া ধাতব শব্দের উৎপাত হইতে জনগণকে মুক্তি দিবে। রক্ষা পাইবে পরিবেশ। শিক্ষক-অধ্যাপকদিগকে মাহিনার বদলে একদা রেশন-ব্যবস্থায় চিনির ডিউ-স্লিপের আদলে বকেয়ার ডিউ-স্লিপ ধরাইয়া দেওয়া হইবে। আশা করিতে পারি, তন্ত্র-মন্ত্র-যন্ত্র ইত্যাদি নানাবিধ যথেষ্টাচারের আখড়া যত্রতত্র গজাইয়া উঠিবে এবং তথাকথিত ‘মিনিমাম প্রাইভেসি’ কথাটির মস্তকে পাদুকা প্রহার করিয়া মনুষ্য ও পশুর মধ্যে প্রভেদ ঘুচাইতে পারিব; হাজার হউক ম্যান ইজ বেসিক্যালি অ্যানিম্যাল। অগ্রণী পত্র-পত্রিকাগুলি সাহিত্যে পর্ণোগ্রাফির মিশেল আবো বেশি ঘটাইয়া উৎসাহ বর্ধন করিবে। মোড়ে মোড়ে সাইবার কাফেগুলি যথেষ্ট যৌনতা দর্শন করাইবার বরাত গ্রহণ করিবে। চলচ্চিত্র আবরণ উন্মোচনে আরো বেশি প্রয়াস পাইবে।

মহামান্য মমতাদেবী দেশের প্রান্তে প্রান্তে গুজরাত মডেল ও মোদী লাইনের ব্যাপারে মৌনীমাতা থাকিয়া মোদী ও তস্য প্রভুদিগের হাত শক্ত করিতে ব্যস্ত থাকিবেন। বুদ্ধবাবু কর্মসংস্কৃতির বিষয়ে প্রবলতর সদিচ্ছা প্রকাশ করিবেন এবং ঘটমান সংস্কৃতি বিষয়ে ধ্যানমগ্ন বুদ্ধের ন্যায়ই মৌন থাকিবেন।

যৌন এবং মৌন বিষয়ক এরূপ সহস্র লীলায় বঙ্গ তথা ভারতবর্ষ যে নিউইয়ারটিকে সমুদ্র করিবে—সে বিষয়ে অধিক কথন বাঙ্ল্য মাত্র। লীলা হইল আত্মদনের বিষয়, বলিয়া বুঝাইবার নহে। আসুন আমরা হরিবোল দিয়া সেই হরিবল লীলাসমুদ্রে ডুববার উজ্জ্বল করি।

পত্রপাঠ জবাব

জবাব দিচ্ছেন : দ্বিতীয় সুগ্রীব



● শুনেছি লাভেনকে নাকি পাওয়া গেছে? কোথায় বলতে পারেন? একটা অটোগ্রাফ নিয়ে আসবেন।

—শিখা সানু, আজাদফটক, কলকাতা

□ নিয়ে তো আসব, কিন্তু সশরীরে? না ফটোগ্রাফ হয়ে?

● কিছুদিন আগে একটি সাপে-কাটা ছেলেকে ভেলায় চাপিয়ে স্বর্গপথে যাত্রা করানোর জন্য নদীতে ডাসিয়ে দেওয়া হয়। একটা কোন যুগ বলতে পারেন?

—প্রশান্ত সিন্হা, ইছাপুর, উঃ ২৪ পরগণা

□ হুয়ুগ।

● স্বর্গের ঠিকানাটা দেবেন কি? খুব দরকার।

—মণিকা দাস, শান্তিনগর, কুচবিহার

□ মর্গের কাছাকাছিই হবে।

● আপনাদের পত্রিকা থেকে 'মহল' জিনিসটাই সম্পূর্ণ গায়ের করে দিলেন কেন?

—মৌমিতা চক্রবর্তী, কলকাতা-১৮

□ এখন 'আমি আর তুমি'-র একটিলতে ফ্ল্যাটের যুগ। ওসব বাতিকে ভালো নয়। প্রথমে বলবেন মহল চাই, তাবপর বাইজি, তারপর শবাব, তারপর সাকি.... শেষে জেলখানায় গিয়ে থাকি।

● কথাসিঙ্গী শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, "বড়প্রেম শুধু কাছেই টানে না, ইহা দূরেও ঠেলিয়া দেয়।" তবে কি আপনার পত্রপাঠের প্রতি আমার বড় প্রেম আমাকে পত্রপাঠের কাছ থেকে দূরে ঠেলে নিয়ে যাবে?

—বাদল চৌধুরী, কলকাতা-৬৬

□ পত্রপাঠ তব্বী শ্যামা শিখরদশনা হলে কারো সাধ্য ছিল না।

● অটলজি এত থেমে থেমে কথা বলেন কেন? হাঁপানি আছে নাকি?

—বিপ্লব সিন্হা, বর্ধমান

□ প্রতি বাক্যের আগে মনে মনে দশবার 'জয় শ্রীরাম' জপে নেন, পাছে বেক্স কিছুর বেরিয়ে যায়।

● মন্ত্রীসের এত দপ্তর আছে, একজন উদ্ভাদ-মন্ত্রী করলে হয় না?

—রাজীব সরকার, মেটিয়ারজ, কলকাতা

□ আরো একজন।?

● ভগবান দেখতে কেমন? মানে বড়ো নাকি, কচি, অথবা যুবক—কোন্ টাইপের বলতে পারেন?

—কাকলি চৌধুরী, কলকাতা-৬৬

□ আর কোনো পাত্র খুঁজে পেলেন না?

● দর্শন শাস্ত্র পড়ে কী লাভ হয় বলুন তো?

—মৌসুমী সরকার, বামদাসহাটি, বীরভূম

□ দৃষ্টিশক্তি কমে, কিন্তু চিন্তাশক্তি বাড়ে। অবশ্য সেটা খুবই চিন্তার বিষয়।

● আমি গৌফহীন, 'মাকুন্দ' অথচ ব্যক্তিত্বময় মানুষ ভীষণ পছন্দ করি। এতে আমার মামি, বোনেরা খুব ক্ষাপায় আমাকে বলে, তোর ডাণ্ডে মাকুন্দ বর জুটবে না। আমার বিশেষ আর্জি আপনাদের সুনজরে এইরকম কোনো পাত্র আছে কি?

—সুইটি, কলকাতা-১৯

□ আপনার দাড়িগোফ কি খুবই বেশি?

● সাইকোলজি নিলেই কি লোকে পাগল হয়?

—মালবিকা, ময়নাগড়, মেদিনীপুর

□ না, পাগল হবার পরেই নেয়।

● পত্রপাঠ নামটা শুনলেই কেমন চিটি চিটি গন্ধ বের হয়। কেন বলুন তো?

—মৌমিতা দে, বামদাসহাটি, বীরভূম

□ আপনাদের হকার কি কাগজে আতর মাখিয়ে বেচে?

● আদবানীর গৌফটার জন্য মাঝে মাঝে খুব দুঃখ হয়, বেচার।। পুরোটো যদি সাফ কবে দেন তাতে দোষটা কি শুনি?

—মনিমালা, নিউআলিপুর, কলকাতা

□ তাহলে আপনি কী নিয়ে দুঃখ করবেন?

মিছি-মিছিলের গান

ভগলু বাঁড়ুজ্যে



হরিপদ রোজ দুপুর বেলায়
দু'টাকার মুড়ি-ছোলাভাজা খায়—
তারপরে এক ডাঁড় চা এবং সুখটান সিগারেটে,
(আহা) হরিপদ খায় খেটে।

পূজিপতি তবু মরার বদলে
নেতাদের সাথে বসে ছবি তোলে,
খবর কাগজে তা দেখে হরির সবকিছু যায় খেঁটে
(তবু) হরিপদ খায় খেটে।

কখনো কখনো হয় না টিফিন—
টিফিনে মিছিল থাকে যে যে দিন;
আধঘন্টার বিপ্লবী হয়ে হরিপদ যায় হেঁটে
(হো হো) হরিপদ খায় খেটে।

কে কার শত্রু, কে যে কার দিকে
সবকিছু যেন হয়ে যায় ফিকে,
ফিকে হয়ে আসে পতাকার লাল, তাল শুধু যায় কেটে
(আহা) হরিপদ খায় খেটে।

এত যে প্রোগান, ছুঁড়ে দেওয়া হাত
ক্যামেরা স্বার্থ যায় না নিপাত?
কমে না তো কোনো জিনিসের দাম বেড়ে যায় যা বাজারে?
(তবু) হরিপদ খায় খেটে।

তাল কেটে যায়, তবু কাটে কাল
হরিপদদের ফেরে না কপাল
পালে পালে শুধু হেঁটে যেতে হয় ঠুলি চোখে, খালি পেটে
(হো হো) হরিপদ খায় খেটে।

যত গালাগালি খায় রোজ রোজ
পূজিপতি—যদি রাখত সে শোঁজ,
হরিপদ ভাবে, নিশ্চয়ই ব্যাটা মরে যেত বুক ফেটে
(হঁ হঁ) হরিপদ খায় খেটে।

পেট খালি আর কানভরা বাণী
কেরানির মুখে দৈন্যের গ্লানি
সে গ্লানি কাটবে কবে আর মতাদর্শের ট্যাবলেটে?
হরিপদদের খেতে হবে খেটে খেটে।

আমি তল্লে গিয়েছি, ব্রিটিশ পাবে গিয়েছি ওর লেখার মাধ্যমে। এই শীতে কোন-
কোন প্রায়-বিবসনা সুন্দরী কোন নাচ নাচবেন তার বিশদ পড়ে অভিজ্ঞ হয়েছি।

অক প টে



সমরেশ মজুমদার

নুইয়ারের ইয়ার্কি

বঙ্গবন্দোপাধ্যায় আমাদের বন্ধুবান্ধব। আনন্দবাজারের পাতায় ওঁর লেখা পড়ে অনেককে বিরূপ মন্তব্য করতে গুনেছি। ওঁর লেখায় যৌনতার গন্ধ পান তাঁবা, গন্ধ না বলে সুডসুডি বলাই ভালো। একটি ব্যাপক প্রচাৰিত দৈনিক কাগজে স্ত্রীলতার সীমা ছাড়ানো লেখা কী কবে ছাপা হয়, এটা তাঁদের প্রশ্ন।

বঙ্গবন্দেব হাতে লেখা আছে। তাঁর শব্দের ব্যবহার এবং ক্ষেত্র বিশেষে প্রয়োগ দেখে আমি মুগ্ধ হই। আমবা যেখানে আলু বেগুন আর কাটাপোনা নিয়ে সমস্যার পোকা বাছছি ও তখন উচ্চবিস্তদের ফেনিল, স্বপ্ন-স্বপ্ন জীবনের গল্প শোনাচ্ছে। বাহ।

স্ত্রীল অস্ত্রীলতাব মধ্যে টীনের দেওয়াল তো ভেঙে চুরমার। সাম্প্রতিক একটি উপন্যাসেব পাঁচশ পাতার মধ্যে একশ পাতায় যে যৌনজীবনের বিবরণ তা আমাদের তরুণ বয়সে গোপনে বিক্রি হওয়া মলাট বিহীন 'লাল কাঁচুলি' জাতীয় বইকেও শিশু বানিয়ে দিয়েছে। যেহেতু বাকি চারশ পাতায় সাহিত্য রয়েছে তাই ওই একশকেও স্ত্রীল বলতে হবে। পত্রিকায ছাপা হওয়ার সময় বা বই বেবিয়ে গেলেও কাউকে মন্তব্য করতে গুনছি না। যেসব পাঠক ওই উপন্যাসের ছাপা-সময়ে পত্রিকা বাড়িতে রাখতে না পেয়ে বন্ধ করেছিলেন তাঁবা ছাপা শেষ হলে আবাব হকারকে বলেছেন দিয়ে যেতে। যেহেতু রঞ্জন দৈনিক কাগজে লিখছেন এবং ফিচারকে সাহিত্য বলতে অনেকের আপত্তি তাই মেম সুন্দরীদের বানী নেশাকে নিয়ে কলকাতায় উচ্চমার্গের রেস্তোরাঁ নিশিবাসব বা নৃত্যশালাব আলো-আঁধারি যা রঞ্জন একেব পর এক তাঁর কলমে

ফুটিয়ে চলেছেন তাকে মেনে নিতে বাঙালি পাঠককুল প্রকাশ্যে পারছেন না।

আমি মফস্বল থেকে এসেছি। নাইট লাইফ অফ প্যারিস বা ইভনিং ইন লণ্ডন পড়ে মনে হত কলকাতার রাত-জীবন নিশচয় ওইরকম। এতগুলো বছর রাত কাটিয়ে যে কলকাতাকে দেখেছি তা হল ভিখিরিব বা খন্দের না পাওয়া মান বারবণিতার কলকাতা, সারারাত ধরে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আসব ফুটপাতে দাঁড়িয়ে বা বসে শোনা কলকাতা, যার আগাগোড়াই নিরামিষ। বঙ্গবন্দেব লেখায় এই প্রথম আমিবের সন্ধান পেলাম। একসময়ে পকেটে রেস্তা থাকলেও এই

উপন্যাসের পাঁচশ পাতার মধ্যে একশ পাতায় যে যৌনজীবনের বিবরণ তা আমাদের তরুণ বয়সে গোপনে বিক্রি হওয়া মলাট বিহীন 'লাল কাঁচুলি' জাতীয় বইকেও শিশু বানিয়ে দিয়েছে। যেহেতু বাকি চারশ পাতায় সাহিত্য রয়েছে তাই ওই একশকেও স্ত্রীল বলতে হবে।

কলকাতাকে পাওয়া যেত না, কারণ বিনোদনের এই উপকরণ তখনো এই শহরে আসেনি। যাদের দুঃসাহস থাকত তারা লাল-এলাকায় ঢুকে পডত চুপিসাড়ে। আমি একজন অর্থবানকে জানি যিনি ওখু মদ খাওয়ার জন্যে লাল এলাকায় যেতেন। সেসময় বাড়িতে মদ খাওয়ার কথা ভাবা যেত না। পার্কস্ট্রিটের বারগুলোর সাহেবী কেতায় ভদ্রলোক স্বস্তি পেতেন না। পঁচিশ বছর ধবে পান করতে লাল এলাকায় গিয়েও একটিবাবও বমবীর শরীর স্পর্শ করেননি। শুনে আমি চমকে উঠতেই উনি নিম্নস্বরে বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, ওরা খুব রেগে যেত। বলত, অপমান করেছে। সত্যি, ব্যাপারটা অস্ত্রীল।'

দ্বিতীয়বার চমকেছিলাম। বারবণিতাদের সঙ্গে সময় কাটিয়ে তাদের স্পর্শ



বাঙালির অবস্থা সেই
বিধবা যুবতীর মতো, যে
প্রাকৃতিক নিয়মে
ঋতুমতী হয় কিন্তু যাকে
জোর করে আলোচালের
ভাত দিয়ে নিরামিষ
তরকারি খেতে হয়।

লেখার মাধ্যমে। এই শীতে কোন কোন প্রায়-বিবসনা
সুন্দরী কোন নাচ নাচবেন তার বিশদ পড়ে অভিজ্ঞ
হয়েছি।

কেউ কেউ নিশ্চয়ই বলবেন, এগুলো কি ভালো?
বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে মেলে? রুচিতে আটকাচ্ছে না?
এর জবাব একটাই। এসব বাদ দিয়ে আমি কী করতাম?
চব্বিশঘন্টা রবীন্দ্রনাথ পড়া বা শোনারও তো একটা
ক্লাস্তি আছে। টিভিতে চোখ বেশিক্ষণ রাখা যায় না।
তাহাড়া বাঙালির অবস্থা সেই বিধবা যুবতীর মতো, যে
প্রাকৃতিক নিয়মে ঋতুমতী হয় কিন্তু যাকে জোর করে
আলোচালের ভাত দিয়ে নিরামিষ তরকারি খেতে হয়।
তত্ত্ব বা ব্রিটিশ পাবে যাওয়ার জন্যে যে টাকা পকেটে
থাকা দরকার তা আমাদের নাই বা থাকল, রপ্তানের
লেখায় সেই রসালো গল্পো পড়ে মজতে ক্ষতি কি।

গতকালই এক বন্ধুর বাড়িতে অনেকদিন বাদে গিয়েছিলাম। সন্দের
পর। বন্ধু বললেন, 'কী খাবেন? হুইকিতে অসুবিধে নেই তো?' বন্ধুর
মা সামনে বসেছিলেন। বাঙালির অন্তত পচিশভাগ শিক্ষিতজন বাড়িতে
পান করেন, তাই রাস্তায় মাতাল দেখা যায় না বলে কেউ আবিষ্কার
করেছিলেন।

আমাকে নিরুত্তর দেখে বন্ধুর মা ভেতরে যাওয়ার জন্যে পা বাড়িয়ে
ধমকালেন,—'রাস্তায় ধারে ঘর তো, খেতে খেতে বেশি জোরে কথা
বলবে না।'

না করাটা ওদের চোখে অশ্লীল কাজ। অর্থাৎ যেখানে যা স্বাভাবিক তা না
করলে কি অশ্লীল বলা যায়? দুই তরুণ-তরুণীর বিয়ে হল। ফুলশয্যার রাতে
তরুণ বলল, 'দ্যাখো, আমরা সারাজীবন শুধু হৃদয় বিনিময় করে যাব, বন্ধু
হয়ে থাকব কিন্তু শরীরের ব্যবহার করব না।' তাহলে স্ত্রী কি তাকে উদ্ভাদ
বলে ডাববে? আর কে না জানে, শেয়ানা উদ্ভাদরাই অশ্লীলতার জনক।

তা যাক, রপ্তানের লেখায় আমি সেই স্বপ্নের ভুবনেব খোঁজ-খবর পাচ্ছি।
এই খবরটা রাজকাপুব দিয়েছিলেন সিনেমার মাধ্যমে। তার নায়ক মানেই
চালচলোহীন বেকার যুবক। যে স্বপ্ন দেখতে চায়। প্রতিটি ছবি সেই স্বপ্ন
হরণের গল্প। একমাত্র 'মেরা নাম জোকারে' সেই স্বপ্ন শেষ পর্যন্ত ভেঙে চুরমার
হয়। রাজকাপুরের ছবি দেখলেই, আমি যা হতে পারব না, তা কেউ হচ্ছে,
দেখে ভারতবাসী পুলকিত হয়েছে। সেই 'আওয়ারা' 'চারশ বিশ' থেকে 'ববি'
বা 'মেরা নাম জোকার', সর্বত্র তিনি একটি না একটি দৃশ্য রাখতেন যেখানে
রমণীর শরীরের অনাবৃত অংশ নিষ্পাপ ভঙ্গীতে দেখানো হত। ভারতবাসী
তা দেখে পুলকিত হলেও অশ্লীল বলে চ্যাপাত না। তা রপ্তান ওই একই কাজ
করে চলেছে তার লেখায়। আমি তত্ত্ব গিয়েছি, ব্রিটিশ পাবে গিয়েছি ওর

পত্রপাঠ-এ লেখ্য পাঠ্যের বিষয়ে

দুয় করে পত্রপাঠ-এর পক্ষ-উপদ্রষ্ট লেখাই পাঠ্য। গভীর প্রেমের
পদ্য কিংবা চোখের জাপে ভাসবার গদ্য পাঠ্যের পদ্য পদ্য প্রেক্ষাপটকে
পত্রপাঠ-বৃত্তিতে পদ্ধতিগত হস্ত দেবেন না। এখন ইচ্ছে অপনয়-
অপনয়।

পুরনো কা সুন্দি

দীর্ঘায়!



ইংরাজী নববর্ষ

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

চাঁদ ছিল বাণ ধরি দীপ্তি গেল তার।
 বিনিময়ে হয় তথা পক্ষের সঞ্চার।*
 এই অবনীর করি কত হিতাহিত।
 একায় একাসে ছিল সবার সহিত।।
 নিরম্ন বায়াম দেব ধরিয়া বিক্রম।
 বিলাতীয় শকে আসি করিল আশ্রম।।
 খৃষ্টমতে নববর্ষ অতি মনোহর।
 প্রেমানন্দে পরিপূর্ণ যত শ্বেত নর।।
 চারু পরিচ্ছদযুক্ত রম্য কলেবর।
 নানা দ্রব্যে সুশোভিত অট্টালিকা-ঘর।।

চাঁদ-১, বাণ-৫, পক্ষ-২। ১৮৫১ সালের পর ১৮৫২ সালের নববর্ষ।

নববর্ষ মহাহর্ষ ইংরাজটোলায়।

দেখে আসি ওরে মন আয় আয় আয়।।

শিবের কৈলাসধাম আছে কত দূর।

কোথায় অমরাবতী কোথা স্বর্গপুর।।

মানমদে বিবি সব হইলেন ফ্রেস।

ফেদরের ফোলোরিস ফুটিকাটা ড্রেস।।

শ্বেত পদে শিলিপার শোভা তায় মাখা।

বিচিত্র বিনোদ বস্ত্রে গলদেশ ঢাকা।।

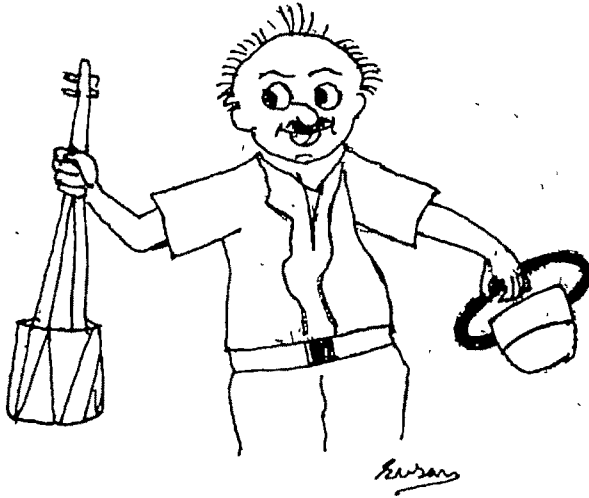
মানমদে বিবি সব হইলেন ফ্রেস।
ফেদরের ফোলোরিস ফুটিকাটা ড্রেস॥
শ্বেত পদে শিলিপার শোভা তায় মাখা।
বিচিত্র বিনোদ বস্ত্রে গলদেশে ঢাকা॥

চিক্ চিকুণি চারু চিকুরের জ্বালে।
ফুলের ফোয়ারা আসি পড়িতেছে গালে॥
বিড়ালাকী বিধুমখী মুখে গন্ধ ছুটে।
আহা তায় রোজ রোজ কত রোজ ফুটে॥
সুপ্রকাশ্য কিবা আস্য মৃদুহাস্য-ভরা।
অথরে অমৃত-সুধা প্রেমক্ষুধা-হরা॥
গোলাপের দলে বিবি গড়িয়াছে চিক্।
অনঙ্গ ভ্রমররূপে মাগে তথা ভিক্॥
মনোলোভা কিবা শোভা আহা মরি মরি।
রিবিগ উড়িছে কত ফর্ ফর্ করি॥
ঢল ঢল ঢল ঢল বাঁকা ভাব ধরে।
বিবিজ্ঞান চ'লে যান লবেজান ক'রে॥
ধন্য ধন্য ক্ষুদ্র জীব ধন্য তুমি মাছি।
তোর মত গুটি দুই পাখা পেলে বাঁচি॥
সুখে ভাসি শুভকাক্তি দম্পতি হেরিয়া।
ভন্ ভন্ ডাক ছাড়ি বদন ঘেরিয়া॥
উড়ে গিয়া ফুঁড়ে বসি বগীর উপরে।
সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যাই গিরিজার ঘরে॥
খানার টেবিলে বসি করি খুব ভুল।
এঁটো করা সেরির খেলাসে দিই ছল॥
কখন গাউনে বসি কতু বসি মুখে।
মাঝে মাঝে ভিজ্জে গায় পাখা নাড়ি সুখে॥
নববর্ষ মহাহর্ষ ইংরাজটোলায়।
দেখে আসি ওরে মন আয় আয় আয়॥
শিবের কৈলাসধাম আছে কত দূর।
কোথায় অমরাবতী কোথা স্বর্গপুর॥
সাহেবের ঘরে ঘরে কারিগুরি নানা।
ধরিয়াছে টেবিলেতে অপরাধ খানা॥
বেরিবেষ্ট সেরিবেষ্ট মেরিবেষ্ট যাতে।
আগে আগে দেন গিয়া শ্রীমতীর হাতে॥
কট্ কট্ কটাকট্ টক্ টক্ টক্।
ঠন্ ঠন্ ঠন্ ঠন্ ঢক্ ঢক্ ঢক্।
চপ্প চপ্প চপ্প চপ্প চপ্প চপ্প চপ্প।
সুপু সুপু সুপু সুপু সপ্প সপ্প সপ্প॥

ঠকাস্ ঠকাস্ ঠক্ ফস্ ফস্ ফস্।
কস্ কস্ টস্ টস্ ঘস্ ঘস্ ঘস্।
হিপ্ হিপ্ হ্র রে ডাকে হোল ক্লাস।
ডিমার ম্যাডাম ইউ টেক্ দিস্ গ্লাস॥
সুখের সখের খানা হ'লে সমাধান।
তারা রারা রারা রারা সুমধুর গান॥
গুডু গুডু গুম্ গুম্ লাকে লাকে তাল।
তারা রারা রারা রারা লাল লাল লাল॥
আয় লোভ চল যাই হোটেলের সপে।
এখনি দেখিতে পাবি কত মজা চপে॥
গড়াগড়ি হড়াছড়ি কত শত কেক্।
যত পান সসে খাও টেক্ টেক্ টেক্।
সেরি চেরি বীর ত্রাণি ওই দেখ ভরা।
এককিন্দু পেটে গেলে ধরা দেখি শরা॥
করি ডিম আলুফিস ডিসপোরা কাছে।
পেট পুরে খাও লোভ যত সাধ আছে॥
গোরার দঙ্গলে গিয়া কথা কহ হেসে।
ঠেস মেয়ে ব'স গিয়া বিবিদের ঘেসে॥
রাজমুখ দেখে বাবা টেনে লও হ্যাম্।
ডোন্ট ক্যার হিন্দুয়ানী ড্যাম্ ড্যাম্ ড্যাম্॥
পিড়ি পেতে বুঝো লুসে মিছে ধরি নেম্।
মিসে নাহি মিস খায় কিসে হবে ফেম্?
সাড়ীপরা এলোচুল আমাদের মেম্।
বেলাক নেটিভ লেডি শেম্ শেম্ শেম্॥
সিন্দুরের বিন্দু সহ কপালেতে উক্তি।
নসী, ফশী, ক্ষেমী, রামী, যামী, শামী, গুক্তি॥
ঘরে থেকে চিরকাল পায় মহাদুখ।
কখন দেখে না পর-পুরুষের মুখ॥
এইরূপে হিন্দুয়ানা শুদ্ধাচার রেখে।
না পায় সুখের আলো অন্ধকাবে থেকে॥
কোথায় নেটিভ লেডী শুন শুন সবে।
পশুর স্বভাবে আর কত কাল রবে?
ধন্য রে বোতলবাসি ধন্য লাল জল।
ধন্য ধন্য বিলাতের সভ্যতার বল॥
দিশী কৃষ্ণ মানিনেক ঋষিকৃষ্ণ জয়।
মেরিদাতা মেরিসুত বেরি গুড বয়॥
ঈশ্বর-পরম-প্রেম স্পর্শ করে যাকে।
ধর্মার্থম্ ডেদাভেদ জ্ঞান নাহি থাকে॥
যা থাকে কপালে ডাই টেবিলেতে খাব।
ডুবিয়া ডবের টবে চ্যাপেলেতে যাব॥
কাঁটা ছুরি কাজ নাই কেটে যাবে বাবা।
দুই হাতে পেট ভরে খাব থাবা থাবা॥
পাতরে খাব না ভাত গো টু হেল কাল।
হোটেল টোটেল নার্শ সে বরম্ ভাল॥
পুরিবে সকল আশা ভেব না রে লোভ।
এখনি সাহেব সেজে রাখিব না স্কাভ॥

চরণ বৈরাগীর

ইকড়ি মিকড়ি



মৌনতার উপসংস্কৃতি

কিছুকাল, সম্ভবত এক দশকেরও বেশি আগে অপসংস্কৃতি শব্দটির অবলীল অপব্যবহারে প্রভূত নর্ভন-কুর্দন দেখা গেছে। এখন সেটা চাপা আছে। না, বলা উচিত তার উৎসাহ ঘটিয়ে জবর দখল করেছে উপসংস্কৃতি। এর কোনো ব্যাকরণ নেই, সবকুছ চলতা হ্যাম। কুছ ভি হো সক্তা। মাঝে মাঝে কিছু মানুষ মৃগী রোগীর মতো শ্রীল-অশ্রীল নিয়ে ছটফটিয়ে ওঠেন। কিন্তু প্রকৃত অশ্রীলতা সম্পর্কে স্পিক্টি নট। একেবারে মৌনীবাবা।

কলকাতায় নির্বাসনা বৃত্তান্ত ভিখারিনী, বেওয়ারিশ মৃত-চাটা কুকুর ও কাক, ও-মুতে মাখামাখি শিশু, ভিক্ষার্থী ছিন্নবস্ত্র কিশোর, উদ্ভিন্নমৌবনা ফ্যাশন শোর মডেল, স্বল্পবসনা গায়িকা, নায়িকা, 'তন্ত্র'মস্ত্রে অটেল ফুতির নিশিকুটুপ গায়ে গায়ে ঘষাঘষি করে চলে। এর মধ্যে কার কাছে কোনটা শ্রীল কোনটা অশ্রীল সে তো নিজস্ব রুটির বা মনপসন্দের ব্যাপার। বৈরাগীর চোখে প্রথমে উল্লিখিত দুইসহ ছবিগুলিই অশ্রীলতম। এই অশ্রীলতা চোখেব নয়; সামাজিক ও রাষ্ট্রিক অশ্রীলতা।

সম্প্রতি আইনজীবীরা রাজ্য জুড়ে ধর্মঘট করছেন। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকে আখাখা কলা দেখিয়ে বলছেন, কর্মবিরতি চলছে, ধর্মঘট নয়। সিটি-ইনটাক্রা তো এসব শব্দের দুর্ব্যবহার করে-করে কবে-কবে শূয়ারের কিমা

বানিয়ে ছেড়েছে বহু আগেই। তবে বে-আইনজীবী তো, এঁরা পেশাগত দক্ষতাতেই 'টিউবলাইট'। এই নির্লজ্জ সম্প্রদায়ের বর্তমান ব্যবহারের কদর্য অশ্রীলতা 'নীল' ছবির অসভ্যতাকেও লজ্জা দিচ্ছে। কিন্তু চারদিকে ব্যাপ্ত মৌনতা। নিঃশব্দ।

এই বে-আইনজীবীদের দাবী—কোর্ট ফি কমাতে হবে—যাতে জনগণ আইনের আশ্রয় সুলভে নিতে পারে। কোর্ট ফি দেয় মক্কেলরা। উকিলবাবুরা তার ওপরও নানা অজুহাতে 'উপরি' নিয়ে থাকেন (মুতবি/ পিওন/ পেশকার নামে)। ১৯৭০-এর পর এবারের কোর্ট ফি বহুগুণ নাকি বাড়ানো হয়েছে। উকিলবাবুদের ফিকত বেড়েছে এই সময়ে তা নিয়ে তাঁদের মুখে কুলুপ। কোর্টে হাজির না হয়ে, একটি শব্দও উচ্চারণ না করে, শুধু মামলা লিস্টেড ছিল বলেই মক্কেলের কাছা খুলে নেবার অশ্রীলতা দর্শনের দুর্ভাগ্যও এই বৈরাগীব আছে।

কালীঘাটে কালীমূর্তির হাত পা জিভ

কান প্রতিদিন নীলামে বিক্রি হয়।

এর চেয়ে ভয়ঙ্কর অশ্রীলতা আর

কিছু হতে পারে কি? সোনাগাছিতেও

এমন নারীঅঙ্গ নীলাম ঘটে না।

কর্মবিরত বিগদ্ধ বে-আইনজীবীদের মার্গদর্শন অনুযায়ী ভবিষ্যতে ডাক্তাররাও ওষুধের দাম বাড়লে চিকিৎসায় বিরত থাকবেন। বইয়ের দাম বাড়লে শিক্ষকরাও শিক্ষাদানে বিরত থাকবেন। কাপড়ের দাম বাড়লে দর্জিকুল হরিমটর করবেন। দাহকাঠের দাম বাড়লে শ্মশানে আর আগুন জ্বলবে না। কফিনের দাম বাড়লে কবরখানায় তালা ঝুলবে। কিন্তু কর্মীদের বেতন বাড়বে। ডাক্তার-উকিলের ফি সোনার বুটিকের আকর্ষণে রোনান্ডোর মতো উর্ধ্বশ্বাস হবে।

এই উপকৃতির মধ্যে কে কোথায় দু'লাইন বে-আইন লিখল তা নিয়ে সংকীর্তন করা অহেতুক সময় ও শক্তিক্ষয় মাত্র। এই বিষয়ে সম্পাদকের সঙ্গে বৈরাগীর অসহমত জানাতে দ্বিধা নেই। লেখক নিজের ইচ্ছা বা বীক্ষা অনুযায়ী

লিখবেন। পাঠক পড়বেন তাঁর রুচি ও পছন্দমতো। অপছন্দের লেখা পাঠের জন্য কারকে জবরদস্তি করার কথা জানা নেই। মানুষের রুচি পছন্দ বিভিন্ন। তা নিয়ে কোনো 'ফতোয়া' দেবার অধিকার কারো নেই। থাকা উচিতও নয়। কেউ মৌনবাদী হলে, কেউ মৌনবাদী হতেই পারে—যতক্ষণ তা প্রচলিত আইন-বিরুদ্ধ না হয়। অবশ্য আইন-টাইনও উপসংস্কৃতির সহায়ক মাত্র। কাগজে টিভিতে মদ ও সিগারেটের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ। অথচ সরকার কোটি কোটি টাকা রোজগার করছে শুদ্ধ বাবদ। অকাতরে অকারণে সেসব সেবনও চলছে। তবু পাড়ায় মদের দোকানের লাইসেন্স দিলে ঢপের প্রতিবাদ চলে। স্কুল-কলেজ-মন্দিরের কাছাকাছি নাকি মদের দোকান বা মদিরাসেবা চলবে না। মুম্বাই, চেন্নাই, দিল্লি, ব্যাঙ্গালোর কি ভারতের বাইরে? ওখানকার ছেলেমেয়েরা কি সকাই উচ্চমে গেছে? উপসংস্কৃতির পশ্চিবঙ্গীয়ারা কালিদাসী ডিমে তা দিয়ে চোঁয়া টেকুর তুলে ওসব শহরে ছেলেমেয়েদের পাঠাবার জন্য লাইন দেয় কেন?

কাপড়ের দাম বাড়লে দর্জিকুল হরিমটর
করবেন। দাহকাঠের দাম বাড়লে শ্মশানে
আর আগুন জ্বলবে না। কফিনের দাম
বাড়লে কবরখানায় তালো বুলবে।

যদি কারো মনে হয় বৈরাগী মাদকতা, ধূমপানের পক্ষে ওকালতি করছে, তবে যারপরনেই ভুল ভাববেন। বৈরাগী বে-আইনজীবী নয়। উপসংস্কৃতির ঢাকীও নয়। বৈরাগী মনে করে জাতি হিসেবে বাঙালির সাবালক হবার সময় হয়েছে। নখরাবাজি, ন্যাকামি ছেড়ে সত্যিকারের একবিংশ শতকের উপযুক্ত হবার অভ্যাস করা প্রয়োজন। বাড়িতে ইংরেজি মিডিয়াম, এম টিভি, এফ টিভি, জীবনযাপনে বাঙালি সতর্কভাবে ত্যাগ করে শুচিবাইগুস্ত টোলের ঠাকুরের মতো ঘোমটার আড়ালের খ্যামুটা বন্ধ হোক। বৈরাগীর চোখে এগুলো ঢের বেশি অঙ্গীলতা। যৌন অঙ্গীলতা তাজিল্য করা সহজ-সরল। কিন্তু সামাজিক অঙ্গীলতা প্রতিনিয়ত শাইলকের পাওনা আদায় করে যায়।

কালীঘাটে কালীমূর্তির হাত পা জিঁড় কান প্রতিদিন নীলামে বিক্রি হয়। এর চেয়ে ভয়ঙ্কর অঙ্গীলতা আর কিছু হতে পারে কি? সোনাগাছিতেও এমন নারীঅঙ্গ নীলাম ঘটে না। পুজোর নামে ভাসানের মিছিলের উৎকট অঙ্গীলতার কথা লেখা নিছক পশুশ্রম। একসময়ে প্রতি প্রভাতে অভব্য আর্তনাদ শুনে ঘুম ভেঙে ওঠার অভ্যাসে বাধ্য হয়েছিলাম। কাছেই ছিল জেদি মাইকে হুন্না তোলা অমায়িক মসজিদ।

এই রাজ্যের তথাকথিত শিক্ষিত সচেতন বিপ্লবসেবীদের দু'হাতের আঙুলে নানারঙের টুনিবাক্সের অসহনীয় অঙ্গীলতা প্রতিনিয়ত দেখতে হচ্ছে। কাগজে টিভিতে ফেস্টুই বা সিদ্ধবান জ্যোতিষী বৃজরুকদের লুণ্ঠন-অঙ্গীলতাও মৌনতায় সয়ে যাচ্ছে। এখনো বিশ্বাস হয়, মাদুলি পাখর খারণ করলে সন্তান উৎপাদন সম্ভব? গাছের মাটি খেয়ে রোগমুক্তি?

সভ্য জীবন থেকে এইসব অঙ্গীলতার অবসানের জন্য মৌনতা নয়, মুখরতা আবশ্যিক। বেআক্সেলে বচন-বিরতি নয়, সদস্ত সদর্শক উচ্চনাদ মর্মকৃতি—সুস্থ সংস্কৃতির ভিন্নতর অনুবাদ।



সম্পাদকের সংখ্যেদ বচন

বৈরাগী মহাশয় সম্পাদকের সহিত অসহমত পোষণ করিয়াছেন— ইহাতে কোনো আপত্তিই থাকিতে পারে না। তিনি সম্পাদককে প্রায় দেহ-বিমুখ সন্যাসীর দলে ফেলিয়াছেন; দুঃখ এখানেই। বলিতে দ্বিধা নাই, যৌন রচনা কিংবা চিত্র কিংবা স্বল্পবসনা তব্বী দর্শনে তাঁহার রক্ত মৌন থাকে না, আর পাঁচজন যুবর ন্যায় ধমনীতে চঞ্চল হয়। যাঁহারা 'তন্ত্র' মতে চলিতে চান তাঁহারা চলুন, প্রাপ্তবয়স্ক নর-নারীর স্বাধীন জীবন-উপভোগে আপত্তি তোলা কোনো দুরভিসন্ধিও সম্পাদকের নাই। সম্পাদক বিনয় চিত্তে এটুকুই স্মরণ করাইতে চাহেন যে, যাহার অঙ্গ অনুকরণই আমরা আমাদের আধুনিক বেদ বলিয়া ধন্য হই, সেই পশ্চিমের খারায় রাস্তায় আলিসনরত যুবক-যুবতীর দৃশ্য দুর্লভ নহে, কিন্তু ওই পর্যন্তই। প্রকাশ্য ও গোপনের সীমারেখাটুকু তাঁহারা ভুলেন না। পশু ও মনুষ্যে তথায় একাকার ঘটে নাই। নাসি ফ্রাইডের উজ্জেক ফ্যাশ্যাসি কিংবা দ্য পাল জাতীয় গ্রন্থকে কেহ সাহিত্য বলিয়া ঢাক পেটান নাই। অধিক বিক্রয়ের আশায় যদি সাহিত্যপত্র ও প্রকাশক, প্রযোজক ও পরিচালক তাঁহাদের সাহিত্য-শিল্পে একেবারে আদি ও অকৃত্রিম মিশেল দিতে শুরু করেন, এবং একদল পোষ্য দু'হাত তুলিয়া সেগুলিকে যুগশ্রেষ্ঠ সাহিত্য ও শিল্প বলিয়া ঘোষণা করিতে থাকেন তবে প্রতিবাদ করা যাইতেই পারে। স্বাধীনতা ও যথেষ্টাচারে প্রভেদ ছিল, আছে এবং থাকিবেও। যাহার যাহা ভালো লাগে বলিলে সফট নীরো অথবা আরব্য রজনীর সেই বাদশাহ-র মতো স্বাধীনতাও লোকে চাহিতে পারে। অগ্নি আপন ঘরে শিখা বাড়াইলে বৈরাগীরও বৈরাগ্য উড়িয়া যায়।

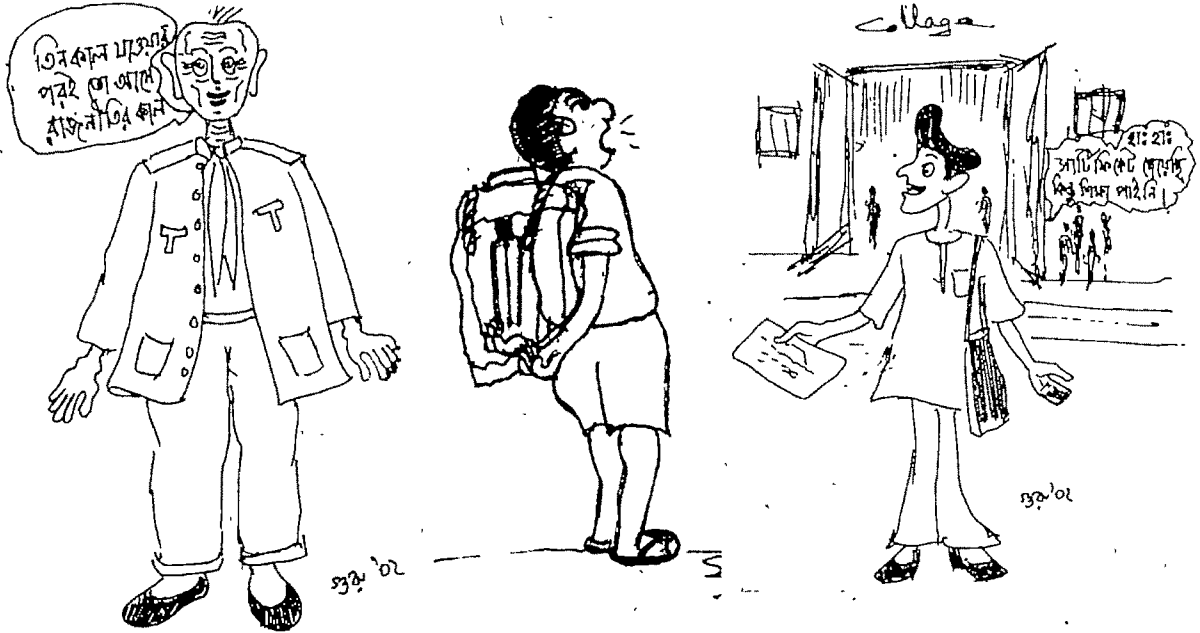
আশা করি, বৈরাগী মহাশয়ের বিরাগ ইহাতে বাড়িবে না। পরবর্তী সংখ্যায় রাগের বোকা সুদ-সমেত নামাইবার সুযোগ তো তাঁহার রহিলই।

—শে. আ.

কৃষিজীবী বাবাদের অভিযোগ—এরা না পেল চাকরি, না পেল
সেরকম বিদ্যে—বরঞ্চ হারান জমিতে ফিরে আসার মন আর গতির।

নিউইয়ারে FEAR কি?

সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য



কালিদাসের রাজবৎ উন্নত ধনিনিব অনেক ঢাকঢোল পিটিয়ে ২য় সহস্রাব্দ এল। কত আশা কত আকাঙ্ক্ষা। তারপর দুটি বয় এল। গেল। আর ক'টি নববর্ষ 'দুয়ারে দাঁড়িয়ে'। এবার কিন্তু সেই গ্রীক পুরাণের প্যাণ্ডোরার খোলা বাস্তু দিয়ে আশা-পাশি ফুরুৎ—সব আশা ফুরস। রবি ঠাকুর একটা লেখায় বলেছেন—'আশা করিয়া থাকাই একটা নেশা। সে নেশাও ঘুচে গেছে। বিশ্বায়ন ঘটেছে শুধু জ্বালা আর যন্ত্রণার রাজনীতির রাজনীতি সমাজনীতি অর্থনীতির বিশ্বায়নের ব্যাপারে তাবড় তাবড় পণ্ডিত ও পাণ্ডাদের পাণ্ডিত্য আর ক্রিয়াকলাপ বোঝার ক্ষমতা আমাদের নেই। শুধু দেখছি আমাদের দেশের শিশুর শৈশব নেই, যুবকদের যৌবন মপগত বার্ধক্যের সৌন্দর্য বেশিটা বৃদ্ধাশ্রমে তিরোহিত। কিছুটা রাজনীতির পাকেন সঙ্গে লেগে থেকে অস্তিত্ব রক্ষায় ব্যস্ত।

রবি ঠাকুর বলেছিলেন—'জগৎ পারাবারের তীরে শিশুরা করে খেল। আমাদের দেশের অধিকাংশ শিশুই আজ আর খেলা করার সুযোগ পায় না। শহরে ও গায়ে খোলা জায়গা প্রায় শেষ। প্রমোটার আর প্রজ্ঞা—দ্বী রাজনীতি বিশাবদদের যুগ প্রচেষ্টায় কংক্রিটের চিলেকোঠা আর তথাকথিত সর্বহামাদের জমি পাইয়ে দেওয়ার ঘটনা প্রবহমান।

লুই ক্যারল শিশুদের স্বপ্ন দেখা চোখের কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, 'Child of the pure unclouded brow, and Dreaming eyes of Wonder' আমাদের দেশের শিশুদের চোখ থেকে স্বপ্ন অদৃশ্য। শহরে ২ থেকে ৪ বছরের শিশুদের দেখা যায় ভোরবেলায় ব্যস্ত মায়ে হাত ধরে কাঁদতে কাঁদতে অথবা চোখ মুছতে মুছতে ছোট্ট পিঠে একটা টাউস ব্যাগের বোঝা নিয়ে ছুটছে কৃষ্ণবর্ণের অথবা ফিকে সাদা বর্ণের দেশি মেমদের ইংরিজি মিডিয়াম স্কুলে। তারপর ক্রান্ত দেহে পেছনের ব্যাগের ভারে কুঁজো হয়ে যখন মায়ের হাত ধরে বাড়ি ফেরে, তখন সব স্বপ্ন শূন্য বিলীন। তারপর খাওয়া-দাওয়া শেষে একটু বিশ্রামের পরই শুনল—ম্যাডাম বা ম্যাম এসে গেছেন কোচিং দিতে। কোচিং শেষে সাজগোছ আরম্ভ হয়ে গেল। এখন যেতে হবে আঁকার স্কুলে অথবা নাচ-গান শিখতে। ফিরে এলে তখন শরীর আর মনের কী থাকে! এদের দূরবস্থার কথা বললে, মা-বাবারা বলেন—কী যুগ পড়েছে দেখছেন না, সবদিকে চৌকস না হলে দাঁড়াতে কি কবে?

এ তো গেল শহরের মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তদের কথা। শহরে গবির বাড়ির শিশুদের আর এক অবস্থা। কচি হাতে মায়ের সঙ্গে কাজ করে অথবা একটু বড় হলে রাস্তায় গাড়ি ধোয় নাহলে বস্তিতে বস্তিতে গজিয়ে ওঠা নানা ধরনের

ছোট কারখানায় ঢুকে পড়ে। বাকিগুলো বাপে-তাদানো মায়ে-খেদানোদের দলে ভিড়ে গিয়ে দাদাদের কাজে লেগে পড়ে। বড় ছোট সব বাড়ির ছেলে-মেয়ের এই অবস্থা। স্বপ্ন দেখবে কখন?

গ্রামাঞ্চলের গঞ্জ এলাকায় শহরেরই অন্ধ অনুকরণ। গ্রামের ভেতরে শিশুদের দূরবস্থা আরো করুণ। ভালো অবস্থার যারা, তারা শহরে ও গঞ্জে চলে যায়। আর বাকি যারা থেকে যেতে বাধ্য হয়, তাদের শিশুরা দলাদলি আর মারামারির মধ্যেই বড় হতে থাকে। শিশুতোষে স্বপ্নের রং লাগবে কখন? তাদের মন এমন করেই নষ্ট হয়। তাই এদেশে শিশুর শৈশব নেই।

২য় মহাযুদ্ধের একজন জ্বরদস্ত্র নামক চার্লিস একবার যুদ্ধের মধ্যে রেডিওতে বলেছিলেন 'There is no finer investment for any country than putting milk into babies'

'শিশুদের মুখে দুধ জোগানোর মতো কাজে যে বিনিয়োগ করা হয় তার মতো আর কোনো সার্থকতার বিনিয়োগ সারা দুনিয়ায় নেই।'

বুঝুন—লোকটাকে যখন হিটলারের মতো হাড্‌হিম করা দানব শক্তিরূপের সঙ্গে পাঞ্জা কষতে হচ্ছে তখনো দেশের শিশুদের মুখে খাঁটি দুধ তুলে দেওয়ার কথা তিনি ভোলেননি। আমাদের দেশে কার দায় পড়েছে এসব কথা ভাবতে? ফলে শহরে, গ্রামে-গঞ্জে কোথাও শিশুদের জন্য পানযোগ্য দুধ নেই, অবিশুদ্ধ জলজাতীয় যে সাদা বর্ণের তরল পদার্থ দুধ বলে চলে এদেশে, তাতে শৈশবের স্বপ্ন আসে না। গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র ঘরের শিশুদের কাছে সেই দুধও দুর্লভ। শুধু দুধ কেন, সব আহাৰ্য্য সম্বন্ধে সেই একই কথা। এসব নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবার নেই, যে যার সে তার। তবু দেশটা চলছে। অনাথ শিশুর দল মাথা ছাড়াই মাথায় বড় হচ্ছে, শৈশবের কোনো আশ্বাদনই তাদের ভাগ্যে জুটল না। স্বপ্ন-দেখা শৈশবের আনন্দবোধই তাদের হল না। পড়াশুনা, খাওয়া-দাওয়া—সবখানেই যেখানে গরমিল, সেখানে শিশুর শৈশব জাগবে কোথা থেকে? শৈশব গেছে।

শৈশব গেল। এবার যৌবনের কথা। এ দেশে যুবকদের যৌবন আজ সম্পূর্ণ অবসিত—একবারে শেষ। শ্রেয়সীমার বলেছিলেন, 'The Passionate Pilgrim'—'Youth is full of plesance, age is full of care'। যৌবনের সেই Plesance, সেই আনন্দ এখানে কোথায়?

এদেশের বিচক্ষণ বুড়োরা পুরনো মর্যাদা-ফর্যাদা ছেড়ে দিয়ে লম্বা দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে রাজনীতির জগতে নিজেদের টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে।

গ্রামের দিকে তাকানো যাক। ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড় শ্যামল সবুজে ঘেরা সেই কবিতার শান্ত বাড়লার গ্রামের যুবকদের মধ্যে কোথাও আজ যৌবনের চিহ্ন দেখা যায় না। আজকাল গ্রামে অনেক স্কুল কলেজ হয়েছে। ষাটটি বেচেও চাকরির আশায় সেসব জায়গায় ছুটেছে ওরা ভিগ্নি নেবার আশায়। জীবনে চলবার মতো বিদ্যা দেবে, এমন বিদ্যালয় সেখানে কোথায়? অশিক্ষিত হয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে তারা না ঘরকা না ঘাটকা। কৃষিজীবী বাবাদের অভিযোগ—এরা না পেল চাকরি, না পেল সেরকম বিদ্যে—বরঞ্চ হারাল জমিতে ফিরে আসার মন আর গভর।

হতাশাগ্রস্ত এই যুবকদল তাদের ক্ষয়ে যাওয়া যৌবনকে তুলে দিচ্ছে

রাজনৈতিক ধান্দাবাজ দাদাদের হাতে আর নাইয় অন্ধকার জগতের মাতকরদের অনুগ—সেবায় এবং নিষিদ্ধ নেশায়।

অন্যদিকে গ্রামের অশিক্ষিত যুবকদল কিছু পেয়ে যাবার প্রত্যাশায় ভিড় করছে সেই রাজনৈতিক ধান্দাবাজ দাদাদের দরজায়, যারা তাদের নিয়োগ করছে অঞ্চল দখলের 'জাতীয় সংগ্রামে'। সমস্ত গ্রাম আজ ব্যর্থ যৌবনের হাথাকারে ভরা।

শহরের জীবনেও যৌবনশক্তির অপচয় প্রায় একই রকম। সেখানে কেরিমার তৈরির ইদুরদৌড়ে অন্ধভাবে ছুটে চলেছে প্রায় সকলেই। তাদের মনের সঙ্গে মিলিয়ে যথার্থ জ্ঞান দেবে—এমন বিদ্যালয় প্রায় দুর্লভ। তাই ব্যর্থ যৌবনের হাথাকার শোনা যায় মদের ঠেকে, 'পান্ডি'খোরদের বৈঠকখানায় আর মতলববাজ রাজনৈতিক দাদাদের কেন্দ্রের আশড়ায়।

রবি ঠাকুর বলেছিলেন, 'ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা, ওরে সুবজ ওরে অবুজ, আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।' এ দেশে এখন যৌবন বলেই যখন কিছু নেই, তখন নবীন আর সবুজ আসবে কোথা থেকে? নিজেরাই যেখানে মরা হয়ে গেছে, তারা আবার বাঁচাবে আধমরাদের? আমাদের দেশে যুবক আছে, কিন্তু যৌবন নেই। রবি ঠাকুরের দেখা যৌবনভরা যুবকরা এদেশ থেকে হারিয়ে গেছে।

অনাথ শিশুর দল মাথা ছাড়াই মাথায় বড় হচ্ছে, শৈশবের কোনো আশ্বাদনই তাদের ভাগ্যে জুটল না। স্বপ্ন-দেখা শৈশবের আনন্দবোধই তাদের হল না।

বিগত শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত দেশে বিদেশে বুড়োদের একটা মর্যাদার আসন ছিল। ভাইটম্যান একসময় চনমনে যুবাদের উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন।

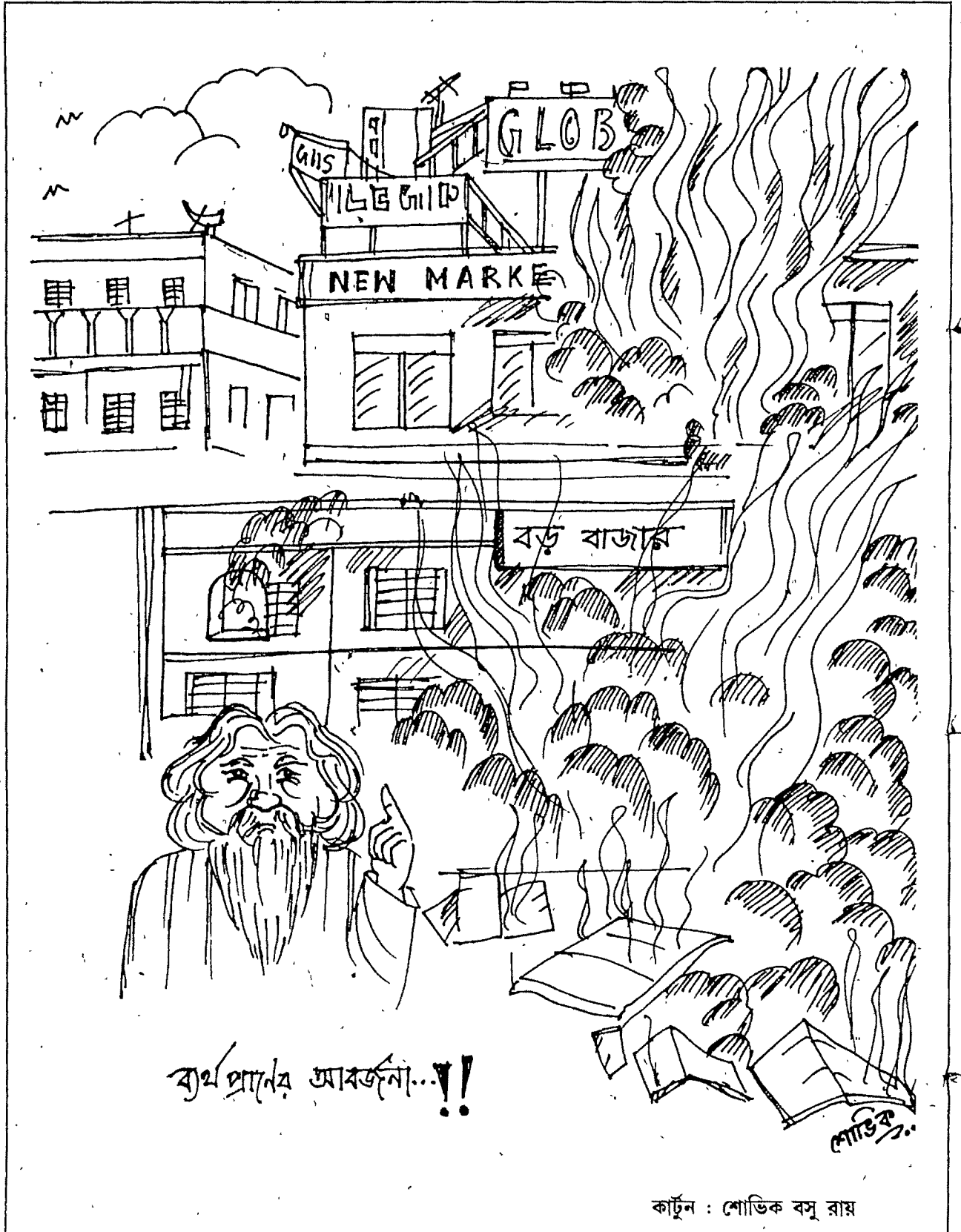
'Do you know that old age may come after you with equal grace, force, fascination?'

আমাদের দেশে বৃদ্ধদের সেই Grace, সেই মর্যাদা আজ আর নেই। পরিবারে আজ তারা ফালতু বুড়ো। তাদের স্থান আজ বৃদ্ধাশ্রমে। এদেশের বিচক্ষণ বুড়োরা পুরনো মর্যাদা-ফর্যাদা ছেড়ে দিয়ে লম্বা দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে রাজনীতির জগতে নিজেদের টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। এই জগতে সে গোলগাল মুখে বেশ Bloody Bloody, অর্থাৎ রক্তিম-রক্তিম মুখকান্তিতে এখনো সমাসীন থাকতে পারছে। পারিবারিক জীবনের বন্ধনার জুলা মেটাচ্ছে এখানে পাক তৈর করে। যে সৌম বার্ষিক্য একদিন দেশের বিবেককে ধরে রেখেছিল আজ আর সে এ দেশে নেই। অস্ত্রে গেছে সে গৌরবশাশী। অজএব আশাটা কোথায়? সব মিলিয়ে নববর্ষের সব আশা ফরসাই।

কালিদাস 'রঘুবংশ' মহাকাব্যের এক স্থানে বলেছিলেন—

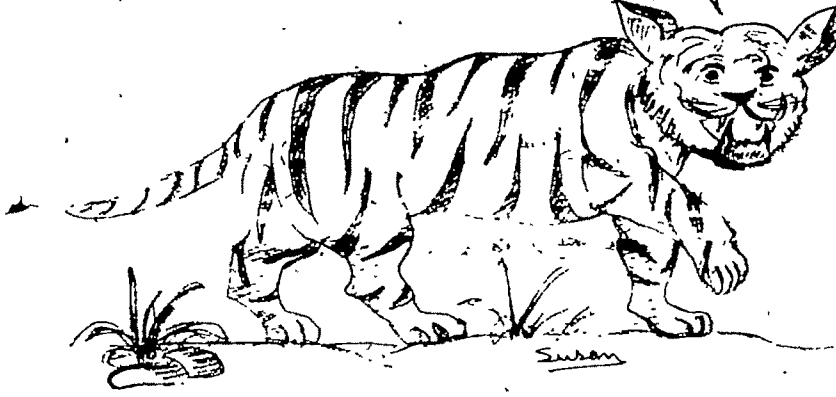
প্রতিকার বিধানামায়ুষঃ সতি শেষে হি ফল্যায় কল্পতে—অর্থাৎ যতক্ষণ আঁমু থাকে ততক্ষণ চিকিৎসা করা সম্ভব। আমাদের দেশ-জননীর প্রাণ এখনো একটু ধুকধুক করছে। আজকের বুড়ো রাজনীতিবিদরা যদি সেই পুরাতন সৌম বৃদ্ধদের কথা স্মরণ করে মুমূর্ষু দেশ-জননীর প্রাণরক্ষায় একটু স্বার্থহীন চেষ্টা করেন তাহলে হয়ত আবার আশা-ভরসার উদয় হতে পারে।

তেমন নিউইয়ার কি কোনোদিন ইয়ার্কি মারতেও মুখ বাড়াবে? তবু আশা। ক্ষীণ আশালতা। 'খন্য আশা কুহকিনী'।



পত্রিকা সমাচার

কবিতা খাব! কবি খাব!!



‘কয়েকজন’ সম্পর্কে

‘কয়েকজন’ পত্রিকাটি শ্রীমতী মিনতি বায়ের। মিনতি রায় আবার তারাপদ রায়ের। এ রকম একটি পত্রিকা সম্পর্কে রায় দিতে গিয়ে পদে পদে তাড়া খাবার ভয় থাকে। সুতরাং পিঠি বাঁচাতে একজন নয়, দু’জনে ভাগাভাগি করে লিখছি। কপালে মন্দ কিছু ঘটলে তা অদ্ভুত ভাগাভাগি হয়ে যাবে।

‘কয়েকজন’ পত্রিকার দাম দশ টাকা। পৃষ্ঠা কমবেশি ছোটগ্লিশ, লম্বা সাত ইঞ্চি, চওড়া পাঁচ ইঞ্চি, ধপধপে গায়ের রঙ। তবে ব্র্যাক এণ্ড হোয়াইটের বনেদিয়ানা আছে। দুটো স্টেপলাবের পিন দিয়ে বাঁধানো। সর্বপ্রথমে একটা মিশমিশে কুকুরের ছবি দিয়ে পত্রিকা শুরু। শেষ হয়েছে তারাপদ রায়ের ফোন নম্বর দিয়ে। ভবিষ্যতে এই পত্রিকা যাতে বন্ধ না হয় তার জন্য মিনতি বায়কে মিনতি করা যেতে পারে ঐ নম্বরে। মাঝখানে অপূর্ব, অসামান্য দুটো বিজ্ঞাপন। এরকম বিজ্ঞাপন আজকাল আর সচরাচর দেখা যায় না।

প্রথমে বলি ‘বিপাশা পেটসে’র কথা। কি মোটা, বাঁকা বাঁকা কালোকালো অক্ষর। তাব নিচে সর্ব সর্ব করে গড়িয়াব ঠিকানা। বিপাশা বুকশ ও তারপিনেব স্টিকিস্ট! উফ্ ভেবে লোম খাড়া হয়ে যাচ্ছে। লেডি বংবাজেব বিজ্ঞাপন! ধন্যবাদ ‘কয়েকজন’কে—এবকম একটি লোমহর্ষক বিজ্ঞাপন পঠককে উপহাস দেবাব জন্য।

এরপর আসি ‘সান এক্টাবপ্রাইড’ প্রসঙ্গে।

সারা দেশে যখন সাম্প্রদায়িকতা বিবাক্ত নিঃশ্বাস ফেলেছে, তখন খানেনদের বিজ্ঞাপন চেপে সস্ত্রীতির পরিচয় দিয়েছে ‘কয়েকজন’। এই বিজ্ঞাপনে খানেনরা বেশ খানদানি ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে, মনখানেক মর্যাদা নিয়ে। তারাপদরাব দাঁড়ালে অনেকটা ঐ রকম দেখায়। একটু গ্যাপ দিয়ে খানেনব কামখানদার সংক্ষিপ্তসার। ‘সরকারি’ কন্সট্রাক্টর ও ট্রান্সপোর্টার। সম্ভবত ট্যান্ডি ও জিপগাড়ির সাহায্যে ইখার কা মাল উখার করেন এরা। নইলে মাত্র ‘কয়েকজনে’ এ বিজ্ঞাপন জোগাড় করা অসম্ভব ব্যাপার। কোথায় কৃষনগব আর কোথায় বিধাননগব।

এই পিলে চমকানো বিজ্ঞাপনদুটি ছাড়া পত্রিকার প্রথম অংশে আছে কিছু ব্যক্তিগত চিঠি। দুর্গানগর, শিয়ালডাঙা, চম্পাহাটি, কাঁথি, বড়তাজপুৰ, লবণহুদ ইত্যাদি থেকে। সন্দেহ হয়, ওই ওই জায়গায় নতুন নতুন পাগলা গারদ গজিয়েছে কিনা।

চিঠিপত্রের পরে আসছে কবিতা। ঐ সব জায়গা থেকেই কবিবা পাঠিয়েছেন। বেশ তা দিয়ে দিয়ে লিখেছেন কবিবা। আব একজন তারিয়ে তারিয়ে ছেপেছেন সেওলি। কবি দীপক কর লিখেছেন সাত-সকালে একটা রাস্তার কুকুর কড়া নেড়েছে কবির বাড়িতে। কবি সোমভাট বায়টোপুবী ট্রাকেব পেছনে নতীত খাজছেন। কবি মুজিবব আনসাবি ফকিব প্রাপ্ত দিয়ে ঘাম মেছ। দেখিয়েছেন। বিজয়লক্ষ্মী টোপুবী শনির ডাক কবিতায় ডেকে ওনিয়েছেন।

কবিতা ওক হয়েছ তাবাপদ বায়ব কবিতা

দিয়ে। তিনি এই বলে কবিতা-ভীতদের আশ্বস্ত করেছেন—

“এ বাঘিনী পদ্য ছাড়া কিছুই খাবে না,
পদ্য হোক গদ্য হোক কবিতা হলে তো
চমৎকার
এ বাঘিনী কবিতার রক্তমাংস ছিড়ে ছিড়ে
চেটেপুটে খাবে।”

এতেও যারা আশ্বস্ত হতে পারছেন না, তাঁদেরকে এই বলে শেষে পরম নিশ্চিত্ত করেছেন—

“কবিতার ঝালঝোল দিয়ে
এ বাঘিনী কবিকেও খাবে।”

হ্যাঁ, এরপর খুশি মনে অকৃতোভয়ে বাস্তব হাঁটতে পারেন। কোনো বিপদ নেই।

এতদ সত্ত্বেও নির্ভয়ে ‘কয়েকজন’-এ কবিতা লিখেছেন সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, প্রমোদ বসু, দীপক লাহিড়ী, মলয় গোস্বামীরা। এঁদের সাহসের তাবিত্ব কবতে হয়। বাঘকে ভয় না করুন, বাঘিনীকে ভয় করেন না—এমন মানুষ তো দেখি না। হতে পারে পদ্যাকারে তারাপদ রায় প্রদত্ত সমাচার তখনো তাঁদের কাছে পৌছয়নি।

দীর্ঘদিন ‘কয়েকজন’ নিরুদ্দেশ থাকায় সদ্য আমেরিকা ফেবত কুপিত তারাপদ বায়ব কথা বলতে গিয়ে ধীরেন ওগু মশায় বলেছেন যে তাব বায় কুপিত হয়েছে—

“এতদিন আমেরিকান বায়ু সেবন কবে এসেছেন, এখন আমেরিকান বায়ু ও ভারতীয় বায়ু সংঘাত এক ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে।”

শেষ লেখাটি তারাপদ বায়ের। তাতে সানন্দে জানিয়েছেন, এই সংখ্যাটি ‘২০০১ সালের পূজোর সময় প্রকাশিত হওয়াব কথা ছিল।’ (যাক, এ আর এমন কি দেবি!) এ পত্রিকা বছরে চাবটি বের করতে গেলে ঢেব ঢের যাচ্ছেতাই লেখা ছাপতে হয়। কিন্তু তাতে তিনি বাজি নন—

“পরিচিত যাচ্ছেতাই লোকদেব যাচ্ছেতাই লেখা ছেপে থাকি, যে কোনো ব্যক্তিব নয়।”

যাচ্ছেতাই-লেখকদের বৃক্বেব পাটা থাকলে ‘ওক্ওক মেঘ’ কষ্টস্বব ও পর্বতপ্রমাণ ব্যক্তিত্বেব (দেহেও বাট, মনেও বাটে) সঙ্গে পরিচিত হওয়াব দঃসাহস দেখাতে পারেন। অবশ্যই, ফলাফলেব জন্যে প্রতিবেদকবা দায়ী নন. হ্যাঁ!!

—দিব্যালোচন কলমধারী ও
কাব্যটকেল কবিরাজ



পুরুষ মহল

‘গাঁক গাঁক’ বিভাগ

সামলাচ্ছেন : উন্মাদন দলপতি

[উন্মাদন দলপতি মশায় সাময়িকভাবে উন্মাদ হয়ে যাওয়ায় (কাউকে বলবেন না, সে এক উন্মাদিনীর পাল্লায় পড়ে) পুরুষ মহল এতদিন মরুভূমি হয়েছিল। এখন তিনি রাঁচি থেকে কাশি হাঁচি ঘামাচি ইত্যাদি সুস্থতার যাবতীয় লক্ষণ সহকারে ফিরে আসায় দপ্তরের ভার পুনরায় তাঁর হাতে সমর্পণ করা হল। তবে রাঁচি কর্তৃপক্ষ একটি অনুরোধ সহকারে তাঁকে প্রত্যর্পণ করেছেন—রাঁচিতে তাঁর আসনটি যেন শূন্য না রয়। প্রশ্রুতদের মধ্যে থেকে কেউ একজন এগিয়ে আসবেন—এমন আস্থা আমাদের আছে। হে বীর, পূর্ণ করো। —সম্পাদক]

● পত্রপাঠ-এর প্রতি আমার বিশেষ ক্ষোভ আছে। কেন, আপনারা মেয়েদের এত তোলা দেন কেন? তাদের জন্যে ‘মহিলা মহল’। অথচ একটি সংখ্যায় ছাড়া ‘পুরুষ মহলে’র অস্তিত্বই নেই। আমার তো মনে হয় আপনারা নারীদের অসুর-সলনী দশভুজা রূপে গোপনে পূজা করেন। কথাটা ঠিক কিনা?

—শ্যামল আচার্য, কলকাতা-৭৩

□ একদমই ঠিক নয় রে ভাই। নিজের বউ ছাড়া আর কাউকেই আমরা অসুর-সলনী মনে করিনে।

● আমার প্রশ্নের হাই। আর যার সঙ্গে ঘর বাঁধতে চলেছি, সেই প্রেমিকা মাথাগরম খুবই। বিয়ের পর কি খুব সমস্যা হবে?

—পানু সমাদ্দার, জঙ্গীপুর, মুর্শিদাবাদ

□ নাঃ, কোনো সমস্যাই হবে না, যদি বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলাটা আগে দায়ের করে তারপর বিয়ের পিড়িতে বসেন।

● আমি জেলে আছি। রাজনৈতিক কারো। আমার বউ অবশ্য আমার মুক্তির জন্যে লাগাতার লড়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমার একটা নতুন বউ পেতে খুব ইচ্ছে করছে। জেল থেকে বেরোনের পর তেমনকিছু কি সম্ভব?

—নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, প্রেসিডেন্সি জেল

□ আপনার নাম কি নেলসন ম্যাণ্ডেলা? আফ্রিকার জঙ্গলেদের শেষে কলকাতার জেলে ট্রান্সফার করা হয়েছে? সে যাই হোক, আপনি ভরসা করতে পারেন, আফ্রিকার জঙ্গল আর কলকাতার মধ্যে ফারাক ক্রমশই কমে আসছে।

● আমি যাকে ভালোবাসি সেই মেয়েটি একটু পাগলী-পাগলী। তবু তাকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারব না। কিন্তু দিনকয়েক আগে একটা কথা

শুনে পিলে চমকে গেল। কে একজন নাকি কবিতা লিখে শাসিয়ে রেখেছে যে পাগলীর সঙ্গে সেই জীবন কাটাতে। এ আবার কী কথা! বলা-নেই কওয়া নেই, মাঝখান থেকে ছুঁ করে ঢুকে পড়ে ...কী করি বলুন তো?

—দাণ্ডু বসুরায়, বিজয়গড়, কলকাতা

□ কিছু করতে হবে না। পাগলের কথায় পাগলী কবে ‘পেত্যম’ করেছে?

● যে মেয়েটিকে ভালোবাসি, সেদিন সে বলেই ফেলল, তার শরীরে এডুস আছে। শুকে বাদ দিয়ে আমি নিজেই ভাবতেই পারি না। ঠিক করেছে, তবু ওকেই বিয়ে করব। ভুল করেছে?

—ঐতম বাগচী, কলকাতা-৪

□ মোটেই না। মেয়েরা বহুবছর ধরে সহমরণে গেছে। এবার কিছুদিন তোমাদেরও যাওয়া উচিত। এটা বেশ ভালো উপায়, বেশ ভালো।

● বাবাকে নিয়ে খুব ঝগড়াটে পড়েছি। বাবা কবিতা লেখে, (যদিও কোথাও তা ছাপা হয় না, এমনকি কবিতা শোনার ভয়ে বাবার বন্ধুরাও আমাদের বাড়ি আসে না।) খুব ইচ্ছে তাঁর, আমি বাংলা পড়ে দ্বিধ্বজ্যী কবি হব। আমি কিছুতেই রাজি নম, বাবাও অনড়। আপনিই বলুন, বাংলায় অনার্স, এম এ করে চাকরি জুটবে?

—মেহমুদ মণ্ডল, বারুইপুর, দঃ ২৪ পরগণা

□ জুটবে; চিড়িয়াখানায়।

● আমি একজন নবীন অধ্যাপক। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের। আমার সদ্য পরিণীতা স্ত্রী এবার রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনার্স পরীক্ষা দেবে। আচ্ছা, আমি যদি তাকে একটু পড়াই-উড়াই, সেটাও প্রাইভেট টিউশন বলে গণ্য হবে?

—নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, কলকাতা-১৯

□ অবশ্যই। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটাই তো প্রাইভেট।

● শাস্ত্রে বলেছে, স্ত্রী চরিত্র দেবতারাই বোঝেন না, মানুষ কোন ছার। —কথাটা কি আপনি বিশ্বাস করেন?

—পরমেশ পাত্র, আসানসোল, বর্ধমান

□ না করে উপায় কি। যে আমাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে তার পদবীই যে বিশ্বাস।

● আমি একটু বেশি খাই। তাই একটু মোটা। আর একটু নাক ডাকে, আর ভুড়িটা একটু বড়। আর একটু কুঁড়ে। একটু বেশি ঘুমোই। বন্ধুরা বলে, আমার কপালে বউ জুটবে না। সত্যি?

—বনবিহারী সেন, ডানলপ, কলকাতা

□ কে বলেছে? ঠিক এই এই লক্ষণ ও গুণসমৃদ্ধ একটি পাত্রী আমাদের হাতে আছে। একেবারে রাজঘোটক।

তারাপদ রায় ও গঙ্গারাম

তারাপদ রায়



সেদিন সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, আমেরিকা থেকে দেশে ফিরে আসার সময় প্লেনের জানলা দিয়ে আমি আন্তর্জাতিক তারিখ-রেখা অর্থাৎ International Dateline দেখেছি কিনা।

দেশে ফিরে আসার সময় প্লেনের জানলা দিয়ে আমি আন্তর্জাতিক তারিখ-রেখা অর্থাৎ International Dateline দেখেছি কিনা।

আমি তাকে বললাম, তোমাদের বাড়ি তো নদীয়া জেলায়। কোনোদিন কর্কটক্রান্তি রেখা দেখেছ?

গঙ্গারাম কি বুঝল কে জানে, আমাকে বলল, সামনের শনিবারই দেশের বাড়ি যাব। কর্কটক্রান্তি রেখার ফটো তুলে এনে আপনাকে দেখাব।

গঙ্গারাম দু'সপ্তাহ পরে আজ কয়েটা ফটো হাতে করে এসেছে। আমাকে দেখাল। বলল, এই দেখুন আকাশের গায়ে কর্কটক্রান্তিরেখা। কৃষ্ণনগর শহর থেকে কিছু দূরে ফাঁকা মাঠের মধ্যে তুলেছি।

কাল্পনিক কর্কটক্রান্তি রেখার ছবি দেখে বিস্মিত হলাম। একটু ভালো করে দেখে বুঝতে পারলাম, ওগুলো Telegraph-এর তার। গঙ্গারাম কায়দা করে ছবি তুলে এনেছে। এর মধ্যে একটা Telegraph-এর Post ধরা পড়ে গেছে ক্যামেরায়।

জোচ্ছুরি ধরা পড়ায় গঙ্গারাম লজ্জিত হবে, এই ভেবে এবার আমি তার বিদ্যা যাচাই করতে গেলাম। তার নাম দিয়ে শুরু করে। তাকে বললাম তোমার নাম যে গঙ্গারাম, তুমি কি এর সমাস এবং ব্যাসবাক্য বলতে পারো?

গঙ্গারাম বলল, অবশ্যই, এই বলে সে গড়গড় করে বলে যেতে লাগল গঙ্গা ও রাম গঙ্গারাম, গঙ্গাকে রাম গঙ্গারাম, গঙ্গা হইতে রাম পর্যন্ত গঙ্গারাম, গঙ্গা ও রামে সমাহার গঙ্গারাম।

এইরকম আঠারো উনিশটা সে মুখে মুখে বানিয়ে ফেলল। তার মধ্যে 'যিনি গঙ্গা তিনিই রাম' পর্যন্তও আছে।

সে গড়গড় করে বলে যেতে লাগল গঙ্গা ও রাম গঙ্গারাম, গঙ্গাকে রাম গঙ্গারাম, গঙ্গা হইতে রাম পর্যন্ত গঙ্গারাম, গঙ্গা ও রামে সমাহার গঙ্গারাম।

এক এক করে আমার মনে সন্দেহ দেখা দেয় গঙ্গারাম লেখাপড়া জানে কি না। জানলেও তার দৌড় কতদূর। সাধারণভাবে বি-এ, এম-এ পাস, স্নাতক বা স্নাতকোত্তর কত লোকই তো আছে। আমি ভালোভাবে জানি এদের অধিকাংশই নাম সই করা শেখার পর আর লেখাপড়া করেনি। ডিগ্রি টিগ্রিগুলো এমনি এমনি পেয়ে গেছে।

গঙ্গারামের একটা ডিগ্রি আছে। ভালো ডিগ্রি। সেই ডিগ্রির দৌলতেই সে করে খাচ্ছে। কাজকর্ম করছে। কিন্তু তার বিদ্যেবুদ্ধি নিয়ে এক এক সময় আমার খটকা লাগে। এই তো সেদিন সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, আমেরিকা থেকে

নিউ ইয়ারের আশা-ফরসা



পিনাকী ভাদুড়ী

তথাপি নিউইয়ার নিয়ে হৈ হৈ করতে আটকাচ্ছে না। অনেক শবের ওপরেই গড়ে উঠছে উৎসব। আশাও নেই, ভরসাও নেই। তবে উল্লাস আছে, হেসে নাও দু'দিন বৈ ত নয়।

তাই একবার হোটলে গিয়ে গান শুনতে শুনতে ডিনার খাই। বাড়িতে নিয়ে আসি কেক পেস্টি। বাজারে যে আলু বেচে সেও কেক নিয়ে বসেছে। আলুও কিনুন, কেকও কিনুন। সাহেবদের পিঠেপুলি। কিনে দেখলেন, এরা আধসিদ্ধ আলুর মতোই। কামড়ানো যায় না, দুমড়ানোও যায় না। এই কেককে কিক করলে ফুটবলও খেলা যায়।

যথারীতি এমন কেক কিনে বাড়িতে হাসির পাত্র হলেন আপনি। আপনার বউ বলল, চিরকাল সংসারের লায়ামিটিটিই রয়ে গেলে। কথটা ঠিক, কোনোদিনই কোনো এবিলিটি আপনি দেখাতে পারেননি। বড়দিনে তাই বড় লজ্জা পেতে হল।

বউকে ছেড়ে বন্ধুদের দলে ভিড়তে চাইবেন আপনি। ছেলেবেলার কোনো ইয়ার এখন আর পাশে নেই। হয় তারা মরেছে, নয়ত সরে গেছে এদেশ থেকে। তবু নিউইয়ার এলেই সেই রাত বাবোটোর ডেপু বাজে, যেমন বাজত ছেলেবেলায়। এখন অবশ্য তেঁপু শুনে মনে হয় শিঙে বাজছে। কার জন্যে বাজছে? বাজছে আপনার আমার সবার জন্যে। একসময়ে যা বাজত আশা, আজ তাই বাজে আশঙ্কায়। শুধু নিজের জন্যে নয়, দুনিয়ার জন্যেই আতঙ্ক। একটা নিউইয়ার আসে, with Renewed Terror

এখন আর শরীরে সে তাকৎ নেই, মনেও নেই উৎসাহ। উৎসব তাই নিয়মরক্ষা, নামবক্ষা মাত্র। তথাপি উৎসবের একটা টান আছেই। টানটান হয়ে থাকতে হয় সেই উত্তেজনায়। বড়দিন থেকে নিউইয়ারের মধ্যে পালা করে অন্তত চিড়িয়াখানা এবং বোটানিকসে যেতেই হয়। এ সময়ের তীর্থযাত্রা এই দুটোই। বেখেলহেম জেকজালেম নয়, এরাই এ শহরের তিথি মেনে চলে। চিড়িয়াখানায় লোকে দু'বাব যায়। একবার বাবার হাত ধরে, আরেকবার ছেলের হাত ধরে। মাঝখানে একবার প্রেমিকা কিংবা বৌয়ের হাত ধবেও যায় হয়ত। এখানে আমরা জন্তু দেখি নাকি জন্তুবা আমাদের দেখে, কে বলতে পারে?

তবে এই সময়ে চিড়িয়াখানার জন্তুরা সৈঁধিয়ে যায় খাঁচার ভিতবে, ত্রিসীমানায় কোনো চিড়িয়াও থাকে না। ওরা তো জঙ্গলেও এত ভিড় দেখেনি। এত জন্তু নেই সেখানেও, যত জন্তু রয়েছে মানুষ সেজে এখানে।

বোটানিকসেও পায়ের খুলোয় গাছের রং এই ক'দিন সবুজ থেকে ধূসর হয়ে যায়। তবু ঠিক এই সময়েই যেতে হবে এখানে। নইলে মান থাকে না যে—গার্ডেনে যাবেন না? শুনলেই বুঝবেন, বোটানিকসের কথা হচ্ছে। গার্ডেন বললে আবাব জু-গার্ডেনও বোঝায়। যখন আপনি গার্ডিয়ান, তখন বাড়ির সবাইকে গার্ডেনে নিয়ে যাবার দায়িত্ব তো আপনারই। যদিও এই ক'দিনে ঠিক কত লাখ মানুষ পায়ের খুলো ওড়তে যায়, তার হিসেব নিলেই আপনার অ্যাঙ্কমা হয়ে যাবে। এই কদিন Zoo'র নাম শুনলেই আমি জুজুর ডয় পাই।

ছেলেবেলায় রাস্তার ধারে একবার জুয়া খেলতে গিয়েছিলাম। জুয়া বলে বুঝিনি তখন, খেলা বলেই জেনেছিলাম। অনেকগুলো ঘর কাটা আছে, তাতে লেখা আছে নানা নম্বর। যে-কোনো একটা নম্বরে বাজি ফেলতে হবে—পার্শেই ঘুঁটি চেলে বাজির বলে উঠেছিল—এঃহ, ফর-সা। এই শুনেই তৎক্ষণাৎ আবার পয়সা দিয়ে বলেছিলাম, আরেকবার বলো ভাই, ফরসা। শুনি একবার। আমার মা-ও আমাকে ফরসা বলতে পারে না। কোন ভরসায় বলবে?

সামনে নিউ ইয়ার। নতুন বছরে আশা-ভরসা তো নেই আর, আশা এখন পুরোদস্তুর ফরসা। সেই ছেলেবেলায় জীবনের জুয়া যেমন ফরসা হয়েছিল, এখন এই বারবেলাতেও জুয়ার জীবন তেমনই ভরসাহীন। প্রতিদিনই, প্রতিদিকেই ভাঙচুর।

আমাদের এখনো দুটো নববর্ষ আছে। একটা ইংরেজি, আরেকটা বাংলা। একটা মদের, অন্যটা গাঁজার। জানুয়ারিতে মদ খেয়ে বেদম, বৈশাখে গাঁজায় দম। নিউ ইয়ার কিন্তু নববর্ষের চেয়ে কুলীন। নববর্ষ যেখানে চৈত্র সংক্রান্তিতে শুরু, দু'দিন মাত্র তার মেযাদ, নিউ ইয়ার সেখানে বড়দিন থেকেই চালু হয়ে যায়। সাতদিন ধরে তার হৈ হৈ, তাব হুমোড়। সায়েববা চলে গেলেও তাদের দিনযাপনই এখন অনেক মোসাহেবদের জীবনশ্রুতি। তাই বড়দিনের বড় আসর আমাদের কাছে অনেক বড়। যদিও প্রতি বড়দিনেই ছোট হয়ে আসছে জীবনের দিন। তাছাড়া প্রতিফলনেই এখন খানখান হয়ে যাচ্ছে জীবনের দাম, প্রাণের মূল্য। কে কবে কোথায় কখন আতঙ্ক দিয়ে চমকে দেবে, থমকে যাবে কাব ঘুঁটি, তা কেউ বলতে পারে না।

খ্রিস্টকে মেরেছিলাম একদিন, এখন মারছি খ্রিস্টানকে। কখনো মুসলমানকে, কখনো হিন্দুকে।

পয়লা বৈশাখে লোকে যায় কালীঘাটে, তারপরে রেসের মাঠে কালীবাড়ির প্রসাদ বিলিয়ে দিয়ে ফেরে। বড়দিনে আর পয়লা জানুয়ারিতে অবশ্যই যে দুটি তীর্থের কথা বলেছি, তার খবর সবাই জানেন। এ কদিন রেসের মাঠও থাকে, বেশ বড় করেই থাকে। বছরের শেষ বাজি দিয়েই নতুন বছরের প্রথম বাজিমাং করার চেষ্টা। এখানেই অনেকের কিস্তিমাং হয়ে যায়। এখানেই হেরে গিয়ে কিস্তিতে কিস্তিতে হারের খার শোধ করা শুরু হয় বড়দিন থেকে নিউইয়ারে। হারসের যেভাবে বাড়ছে তাতে হিউম্যান রেস নিশ্চিহ্ন হবে কি না, এমনটি এবারের নিউইয়ারে কোনো অ্যাস্ট্রলজিক্যাল প্রেডিকশন এখনো নেই, তবে টেনশন নিশ্চয় আছে। নচেৎ অ্যাস্ট্রলজির এমন বাড়বাড়ন্ত কেন? নতুন বছরে ভাগ্যগণনা করে দুর্ভাগ্যের ছলনাকে এড়াবার উপায় খুঁজছে সবাই। যত কঠিন হচ্ছে দিন, যত দীনহীন হচ্ছে মানুষ, তত কপাল খুলছে জ্যোতিষীর। টেলিভিশন খুললে রোজই কোনো না কোনো জ্যোতিষ্মানকে আবির্ভূত হতে দেখবেন। প্রত্যেকেই জানে আপনার কী হবে, শুধু আপনি জানেন না যে, যা হবার তা জ্যোতিষীরই হবে। আপনার যত হবে না, তত হবে ওর। এ বছরকে মুছে নতুন বছরের ভরসা জোগাবে সে, যা আসলে ফরসা। বছরে বছরে এ-ই হয়, এমনিই হয়। প্রতি বছরেই আমরা মরি, নতুন বছরে বাঁচব বলে। তাই প্রত্যেকবার একই প্রবন্ধনায় ভুগি। তবু সাধ মেটে না, আহ্বাদ যায় না। মনে হয়, ও বছরে হয়নি, এ বছরে হবে।

বাড়িতে বসে রাতভোর দূরদর্শনের দুর্দশা দেখে প্রত্যেকবার হতাশাই, তবু এবারও তাই দেখতেই বসব আবার। এসব দেখতে না বসলে তো পথে বসতে হয়। অনুষ্ঠানগুলো এমন যে, দেখে অবাক হতেই হয় এই ভেবে যে, এমন জিনিসও কেউ ভেবে বার করতে পারে। ভারি মজার মজার চুটকি। যারা হাসাতে আসে, তারা নিজেরাই হাসে। দর্শক হাসে বলে মনে হয় না। তবু এই-ই আমাদের নিউইয়ারের নিউরোবিন। নিউ কিছু তো জানা নেই আর।

তবে আপনার বউ জানে। বড়দিনের আগেই সে বড় বড় চোখ ঘুরিয়ে বলে রেখেছে, পয়লা জানুয়ারি দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে যেতে হবে। ঐদিন সেখানে কল্লতক। আসলে ওটা কল্লনাভরু। প্রায় জ্যোতিষের মতো সব মনস্তান্মনা পূর্ণ হবে এখানে। এই কল্লনা করেই যাওয়া, এই জল্লনাতেই নিউইয়ারের ইয়ার্কি। ইংরেজি বছরের প্রথম তারিখে বাংলা বর্ষের এই মিশ্রণ ইংরেজি কায়দায় বাংলা খাবার মতো। সচকিত হতে হবে, হতে হবে পুঙ্খানুপুঙ্খ। ন্যাশানাল থেকে ইন্টারন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশনে প্রোমোশন। বড়দিনে যীশুখ্রিস্ট, নিউইয়ারে রামকৃষ্ণ—কৃষ্ণ হবার মতোই ব্যাপার। রাত বারোটায় গির্জায় বেজেছে মা মেরির জয়ধ্বনি। রাত পোহালেই মা-কালীর সামনে উচ্চনিদান। কে বলে আমরা অবিশ্বাসী? আমাদের অবিশ্বাস আমাদের নিজেদেরই ওপরে। অফিসে মোসাহেব, বাড়িতে মেমসাহেব—এদের হাতে পড়েই নিজেদের ওপরে বিশ্বাস ঘুচেছে। সব ধর্মেই তাই আশ্রয় খুঁজি। বড়দিনে মাতি, নিউইয়ারে লাফাই, কালীঘাটে যাই, দক্ষিণেশ্বরে কাঁদি। কে প্রশ্ন দেবে, কে দেবে আশ্রয়—কে দেবে তার হৃদিস? প্রতিবারই সেই একই খেলা আমাদের, প্রতিবার সেই একই লীলা ঈশ্বরের। এবারও তাঁর মুখ ফিরিয়ে রইলেন তিনি। ষটয়ের হাতেই ফিরে আসতে হল।

এইরকম নিউইয়ারের এক পিকনিকে প্রেমে পড়েছিলুম। সে আমার প্রথম প্রেম নয়, তবে এই মেয়েটির সঙ্গে প্রথম। এই প্রেমে পড়ে আর উঠতে পারিনি। এখনো বেঁধে মার খাচ্ছি তার হাতে।

ঈশ্বরও তাঁর দক্ষিণমুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। তার কারণ এ নয় যে, ভগবানে আমাদের বিশ্বাস নেই, আসলে ভগবানই আর আমাদের বিশ্বাস করেন না।



কিংবদন্তী সেতার-বাদক বিলয়েত খান তাঁর প্রয়াত পিতা আর এক কিংবদন্তী সেতারী এনায়েত খানের নামে একটি ফাউন্ডেশন করে এক টুকরো জমির জন্যে মাত্র তিনবছর দরবার করছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে। এবং, ভাবা যায়, মাত্র তিন বছরের দরবারীতেই তাঁর রাগ মাথায় চড়েছে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য দিশি রাগ সামলাতেই জেরবার, এসব বিলায়তী রাগের কথা ইতিপূর্বে নাকি তাঁর কানেই পৌঁছয়নি। রেগেমেগে বিলায়েত খান হুঙ্কার ছেড়েছেন—আগামী দু'মাসের মধ্যে সাড়া না পেলে তিনি এই সঙ্গীতকেন্দ্র বন্ধকে ব্যঙ্গ করে ব্যাঙ্গাঙ্গোরে করবেন। বঙ্গজন এতেই খুশি। বঙ্গাল আর ব্যাঙ্গাল কি আলাদা হল? বঙ্গ আর ব্যঙ্গে তফাৎটা কি শুনি? আর ব্যাঙ্গা? সে তো বঙ্গের ব্যঙ্গত্বতো ভাই বই নয়। এতেই শান্তি। কিন্তু না, শেষ অব্দি বুদ্ধবাবু এগিয়ে এসে বিলায়তী ক্রোধ প্রমথন করেছেন। জমি পাবেন বিলায়েত। আর প্রায় তার সঙ্গে-সঙ্গেই ফুঁসে উঠেছেন সবচেয়ে জবরদস্ত সেতারী পণ্ডিত রবিশঙ্কর;—তিনি কেন জমি পাচ্ছেন না। এক সেতারীই আমাদের প্রিয় নেতার ঘুম কেড়ে নিচ্ছে। এরপর শরীরের সঙ্গে ন্যাজের মতো হাজির হবে সরোদ। তাহার প্রবল দাবী কে করিবে রোধ? তারপর সানাই ...নাঃ। আর কাজ নাই। বুদ্ধ শরণ বলে হাজার চেম্বলেও আর তাঁর নাগাল পাওয়া যাবে না। রাজ্যপাট ছেড়ে নির্ধাৎ বুদ্ধদেব সন্যাসী হয়ে যাবেন, একেবারে সত্যিকারের বুদ্ধদেবের মতোই।

—ভূতলেন্দু ভৌমিক

দিনেরবেলাতেই যখন দিব্যি খাওয়া যাচ্ছে তখন রাতে কেন আঁা, রাতের
আঁাধারে? কোন দুঃখে? পুলিশ কি অন্ধকার জগতের ঘুঘুখোর, খুড়ি জীব?

জবর থ বর

নিমইনিয়া মেয়ে

অধ্যাপনা করে থাকতেন মহিলা। সুখেই ছিলেন। হঠাৎই ভূতে
কিলোলো। যে সে ভূত নয়, একেবারে আনকোরা, এমনকি নিমগাছের
মগডালে বসে থাকে ভূতও নয়, একেবারে ডালপালা পাতানাতা সমতে স্বয়ং
নিমভূত। সেও আবার অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে। সুদূর ব্রিটেনের হ্যাম্পশায়ার
থেকে তাঁর এক বন্ধু স্বেফ টেলিফোনের মাধ্যমে এই কিস্তিত কাণ্ডটি
ঘটিয়েছেন। মধুর জিনিসে বোধকরি তাঁর বেজায় অরুচি জন্মে গেছিল। তাই
তেতো নিমের দৈত্যে হাসি দেখার জন্যে তিনি মুম্বাইয়ে প্রমীলা সুদর্শনাকে
ফোন করলেন। জানতে চাইলেন নিমতারত বৃত্তান্ত। ভূ-ভারতে এমন বিদ্যুটে
প্রশ্ন কেউ করতে না পারুক, না-ভারত থেকে করাই যায়।

নিমোনিয়া হলে কথা ছিল। কিন্তু নিম? প্রমীলা সুদর্শনা অথৈ জলে। বাড়ি
ফিরে বাবার কাছে নিম-মাহাত্ম্য শুনে থ। তারপর, না, তিনি নিমগাছের
মগডালে চড়ার আগেই নিমগাছ বাসা গেড়েছে তাঁর মাথায়। বিশ্বময় নিমগান
করবেন বলে কলেজের চাকরিটিও ছেড়েছেন। ইতিমধ্যে চীন ঘোরা হয়ে গেছে
তাঁর। সীমিত প্রচারে পরিতৃপ্ত হয়নি তাঁর নিমিত হৃদয়। ক'জন চিনেছে আজও
নিমের আঁতের কথা? তাই বসিয়ে দিয়েছেন বিশ্বনিম সম্মেলনও। এবং তাঁর
ধারণা, ভারতের শুয়ে পড়া অর্থনীতি স্বেফ নিমগাছে ঠেকা দিয়েই আবার
উঠে দাঁড়াবে। নিমাই সন্যাসিনীর জয়জয়কার এখন। সারা দুনিয়াকে নিম না
গিলিয়ে তিনি খামবেন না।

প্রধান-পত্নীর প্রাধান্য

বৃশদাদার মোটাসোটা ন্যাজটা ধরে খালি টনি ব্রেনার প্রচারের আলোয়
আসবেন আর তাঁর এক এবং অধিতীয়া মহিষী শেরি ব্রেনার অন্ধকারে আঁতুল
চুষতেই থাকবেন,—মামাবাড়ি নাকি? ম্যাডাম শেরি এক নানাদেশে জেলখাটা
দাগী মডেলের সঙ্গে মাথো-মাথো সম্পর্ক জমিয়ে নিয়েছেন। বন্ধু এই স্বামী,
না না, আসামির সাহায্যে ম্যাডাম বেদম সন্তান দুটি ফ্ল্যাট কিনে ফেলছেন।
বিনিময়ে জিগরি দোজ-এর জন্যে বিচার-ব্যবস্থায় প্রভাব খাটিয়েছেন ম্যাডাম।
কিন্তু সরকার এসবের কিছুটা জানেন না। জানেন না, কে সেই বিজু তা-
ও। আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়ার মতো ব্রিটেনেও জেল খেটেছে এই শেরি-
প্রিন্স ফস্টার। কিন্তু সরকার তাঁর বিরুদ্ধে মামলা বা আইনি অভিযোগ সম্পর্কে
কিছুই জানেন না। খোদ প্রধানমন্ত্রীর গিপি বাঁকে আগলাচ্ছেন, সেই ফস্টারকে
বিপাকে ফেলতে গিয়ে কে আর নিজের স্টার খারাপ করতে চায়। সব দেশের
ধড়িবাজ বদমায়েশরা এখন থেকে প্রধানমন্ত্রীর বউয়ের নেকনজরে পড়ার
জন্যে কম্পিটিশন লাগাবে বলে বিশেষ-অস্ত্র মহলের ধারণা। শুধু ভারতের
বদমায়েশরাই হতাশ। তাদের 'শায়েশ' কিছুতেই পূরণ হবার নয়। হায়,
আমাদের প্রধানমন্ত্রী যে বউই নেই।



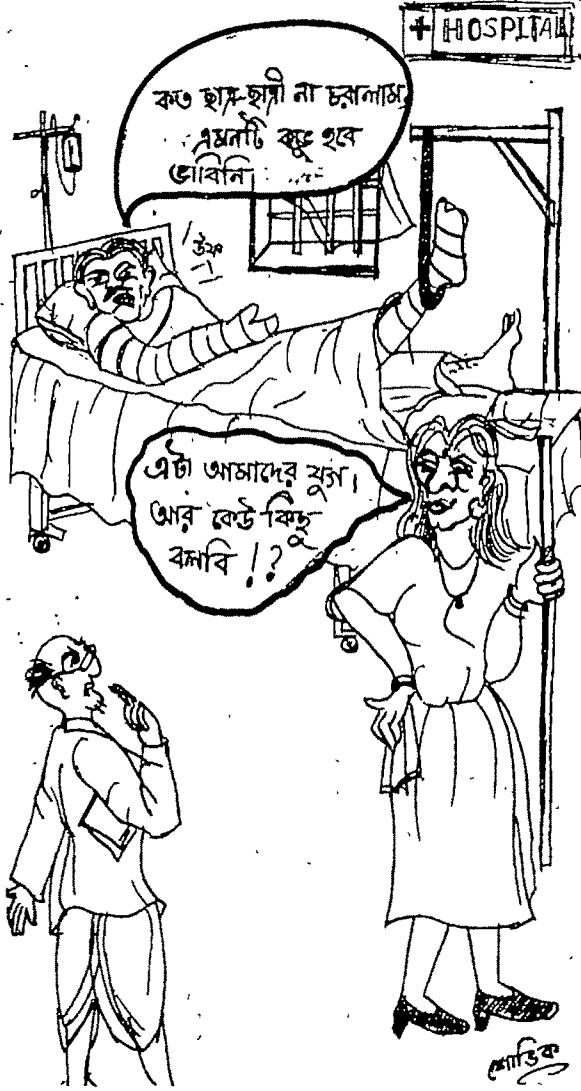
বাঘাহারী বীর

বাঘেদের পক্ষে বড়ই দুঃসংবাদ। কিন্তু দক্ষিণরায় রক্ষে করেছেন। ভাগ্যিস
তাদের সমাজে খবরের কাগজ পড়ার চল করেননি। নইলে সৌন্দরবন আর
ডুমার্স জঙ্গলের বাঘসমাজে মড়াকামা পড়ে যেত। সঞ্জয় লোহার আর সুজিত
লোহার নামে দুই ভাই ডুমার্সের জঙ্গল টুড়ে মধ্যাভাবে গুড়ং-এর মতো
ব্যস্তভাবে একটি চিতাবাঘিনীকে জবাই করে তিনদিন ধরে গুস্তিসুজু খেয়েছেন।
এতে নাকি তাঁরা সন্তুষ্টি বাঘের মতোই বলশালী হবেন। ডুমার্সের যাবতীয়
বাঘ আতঙ্কে দেশান্তরী হবার আগেই অবশ্য লোহার ভ্রাতৃযুগল পাকড়াও
হয়েছেন বাঘের বাবার হাতে, যাকে বলে পুলিশ।

ঐতিহ্য

নিউজিল্যান্ডে গিয়ে, 'নিউ' অভিজ্ঞতা হয়েছে ভারতীয় ক্রিকেটার বীরেন্দ্র
শেহবাগ এং হরভজন সিংয়ের। তাঁরা আমাদের ঐতিহ্য মেনে একটু ময়লা-
ঝুলনা স্তুতো নিয়ে গিয়েছিলেন সঙ্গে। ঐতিহ্যকে মাথায় রাখতে গিয়ে মাথায়
বিদেশের জুতোর বাড়ি পড়বে—এ কি আর তাঁরা জানতেন? নগদ হাজার
পাঁচেক করে টাকা দিয়ে মাথা বাঁচাতে হয়েছে। এরপরে আরো দিতে হবে।

হাজির হতে হবে আদালতেও। ধুলো-কাদা, ময়লা-আবর্জনা, বস্তি, মুক্ত শৌচাগার, নাকে রুমাল-চাপা হাসপাতাল, ফাইলের চেয়ে বেশি গুজনের ধুলো-সমৃদ্ধ সরকারি দপ্তর—এতসব গৌরবে সমৃদ্ধ ভারতীয় দুই নায়কের মর্মব্যথা কিছুতেই বুঝলেন না নিউজিল্যান্ড সরকার। মুখকে কে বোঝাবে, মেরা ভারত মহান, আমাদের আবর্জনাও মহান!



পাহাড়িয়া পিটুনি

ছাত্র ঠ্যাঙানো মাস্টারের কথা কে না জানে? মাস্টার ঠ্যাঙানো ছাত্রও ইদানীং দুর্লভ নয়। কিন্তু ছাত্রী? আজ্ঞে, তাও তৈরি হয়ে গেছে। এমন বিশ্বচমকানো কাণ্ডটি ঘটেছে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে। সিকিম থেকে ডুগোল পড়তে আসা সোনম ডোমা লেপচা ডুগোল বিভাগের কার্টোগ্রাফার কৃষ্ণেন্দু

গুপ্তকে এমন খোলাই দিয়েছেন যে কৃষ্ণেন্দুবাবুকে হাসপাতালের শয্যা চিৎপাত হতে হয়েছে। পাহাড়িয়া পেটাই খেয়ে তাঁর হাড়গোড় যাকে বলে নড়বড়ে হয়ে গেছে। অবশ্য স্নীলতা হানি হয়নি। মেয়েরা পুরুষকে ঠ্যাঙালে স্নীলতা হানি হয় না। কৃষ্ণেন্দুবাবু নাকি পাহাড় তুলে কথা বলেছিলেন। সোনমের বড়ই লেগেছে তাতে। অবশ্য তার পরই বিশ্বভারতী থেকে বিতাড়ন। ডুগোল ছেড়ে ডু-পর্যটনে নয়, পাহাড়েই ফিরে গেছেন সোনম। যাওয়ার আগে শুধু হাড়ে হাড়ে টের পাইয়ে গেছেন পাহাড়ী মেয়ের হাড়ের জোর, যার দাপটে কৃষ্ণেন্দু গুপ্তর হাত-পায়ের জোড় খুলেই যাচ্ছিল প্রায়।

জলীয় খানা

‘সিদ্ধ’ কথাটা সম্ভবত অসিদ্ধ ডাক্তার বিমল ছাদের কাছে। অথবা শব্দটার সঙ্গে আলাপই হয়নি এই ভদ্রলোকের। হৃদরোগ থেকে দূরে থাকার এক হৃদয় বিদারক রাস্তা তিনি আবিষ্কার করে ফেলেছেন। তা হল, দু-একটি ব্যায়াম এবং তেলের বদলে জল দিয়ে রান্না করা খাবার খাওয়া। অতীতসাহী এই জলাসক্ত ডাক্তার দেশময় ঘুরে ঘুরে তাঁর জলীয় প্রেসক্রিপশন করে বেড়াচ্ছেন। শুধু দাওয়াই বাতলানোই নয়, জলেব রান্না খাবার গিলিয়েও বেড়াচ্ছেন লোককে (যারা পালাতে পারছে না আর কি। কান্না চেপেই গিলতে হচ্ছে তাদের)। তিন-তিনখানা জলাশর্ষ বইও তিনি লিখে ফেলেছেন। বানিয়েছেন ক্যাসেট এবং ভি সি ডি-ও—যারা তাঁর খপ্পরে মাথা বাড়াচ্ছে না, তাদের কাছ থেকেও যদি কিছু প্রশামী জোটে। খোদ কলকাতাতেই নাকি শ’ আষ্টেক রোগী তাঁর তত্ত্বাবধানে জলে ভাসছে। জীবনটা যখন শেষ অবধি জলেই যাবে, তবে আগে থেকেই জলকলি শুরু করা যাক এই জোলো ডাক্তারের সঙ্গে।

কথা কম

সম্প্রতি একটি দৈনিকপত্র পুলিশের গাড়ির ছবিটি সহ একটি সংবাদ-বোমা দেশলাই কাঠি ধরিয়েছে যে কলকাতার রাস্তায় রাতনুপূরে প্রহরারত পুলিশ পণ্যবাহী গাড়ি থামিয়ে ঘুষোৎসবে মাতে। এই সাংবাদিক সম্ভবত দিনকানা। দিনেরবেলাও যে এনারা করাল হস্ত বিস্তার করেন। দিনকানা বলেই বোধহয় সাংবাদিক মশায়ের নজরে পড়েনি তা। হাজার হাজার লোকের যা হামেশাই নজরে পড়ে, কারো কারো ক্ষেত্রে তা দিব্যি ‘নয়ন সম্মুখে তুমি নাই’ হয়ে যায়। যেমন আমাদের পুলিশ কমিশনার। পুলিশ ঘুষ খায়? রাম রাম। জীবনে এই প্রথম শুনলেন তিনি। অবিশ্যি দিনের পুলিশ নয়, রাতের পুলিশ। এবং প্রথাগত একটি আপত্তিকার প্রচার করে দিলেন—রাতের আঁথারে পুলিশের ঘুষ খাওয়া চলবে না, চলবে না। দিনেরবেলাতেই যখন দিব্যি খাওয়া যাচ্ছে তখন রাতে কেন আঁথারে, রাতের আঁথারে? কোন দুঃখে? পুলিশ কি অন্ধকার জগতের ঘুষখোর, পুড়ি জীব?

দিনেরবেলা তো আর পুলিশ ঘুষ খায় না! থাম? কে বলেছে? বাজারে মশা নিরোধক কিছু ক্রিম আছে। গায়ে মাখলে মশা ইঞ্চি তিনেক ওপর দিয়ে চলে যায়, বসতে পারে না কিছুতেই। পুলিশ কস্তুরাও তেমনি দুঃসংবাদ নিরোধক ক্রিম চোখ আর কানে লাগিয়ে থাকেন। জোর করে খেবড়ে না দিলে তাঁরা এসব দেখতেও পান না, শুনতে পান না। এখন, যতক্ষণ না কোনো দৈনিকপত্র লিখেছে যে দিনের কলকাতার রাস্তাতেও পুলিশ পেট ভরে, মাপ করবেন, প্রাপ্তবয়স্ক ঘুষ খায়, ততক্ষণ পর্যন্ত নগরপাল সায়বে সে নিয়ে কিছুটি বলবেন না। কথা কম, কাজ বেশি।

—পরম্ব সংবাদদাতা

সিহুসাইজার গোবিন্দ

দিব্যালোচন কলমধারী



প্রথমে ঠিক হল গান শেখাব। গানে মন উদার হয়। অনেক সময় ভাড়াটে উঠে যায়। মানুষ শেষ বয়সে আঠালো হয়ে যায়। সহজে সরে না। বিকট গানে অনেক সময় কাজ হয়। তাছাড়া গান গাইলে হার্ট জোরালো হয়। দাদুর আমলের গাইয়েরা সবাই বহাল আছে আজও। সেই সন্ধ্যা, সেই আরতি, সেই শ্রাবস্তী, সেই আরতি, সেই অরুন্ধতী, সেই মাদ্রা.....

অথচ সেইসময় যারা ছবি করতে তারা সবাই ছবি হয়ে গেছে। তানু রবি, বিকাশ, অনুপ, উত্তম—। এখন খোকাকে কোথায় ভর্তি করি? বাণীচক্র? নাঃ, বাণীকে এখন কেউ 'বদার' করে না। এখন যে যার নিজস্ব বাণী। নিজেও 'ফলোয়ার' নয়। মুখ্যমন্ত্রীর বাণী "ডু ইট নাউ"। কিন্তু সীমাহীন 'নাউ' নয়। শিলান্যাস পর্যন্ত 'নাউ'। তারপর 'নেভার'। ত্রিজের আশায় আশায় নদীতে ব-দ্বীপ গজিয়ে গেল। কার্ল মার্কস সরপি। বঙ্গোপসাগর বাইপাস। আমার দূর সম্পর্কের এক শালা গাইনি। তার বাণী—আপনার গাই, আমাদের চিন্তা। আবার কিজাপন দেয়। এখানে যত্ন সহকারে বংশে বাতি জ্বালানো ও হাতি চালানো হয়।

তাছাড়া ওই চক্র ট্রক সেকেন্সে। গোলার দিন শেষ। এখন স্লিম। স্লিম ফিগার, স্লিম স্যালারি, স্লিম এসি. স্লিম সেন্টালিটি। এবার স্লিম হাতিও দেখতে পাওয়া যাবে। গাছকাটা চলছে। এখন সার্কেলের সময়। সাইবার সার্কেল। ঘন্টা পিছু দশ টাকা দিয়ে বিশ্বপ্রেম।। চ্যাটিং। ই-মেল। বরানগর থেকে বাটনগর চিঠি যাবে। ভায়া ব্রান্সাও। ওধু শ্রাবস্তীর চিঠি পোস্ট অফিস

ঘুরে যায়। পেলে কি পেলে না কিছু এসে যায় না। একটা গোড়ের মালা দিয়ে একটা গোটা পাঁঠা খেয়ে যাবে, প্রেবক চায় না। ড্রাইডার সার্কল। গাড়ি যার, তেল তার নয়। যে মালিক একথা মানে না তাদের নামের হিটলিস্ট তৈরি ও প্রচার। ডোডার লেন মিউজিক সার্কল। সোদপুর স্টেশন রোড। জলের ট্যাঙ্ক বাস স্টপ। অনাশ্রুত শিক্ষক মণ্ডলী দ্বারা পরিব্রাজিত। অমর্ত্য সেনের ভিসিয়ায় সার্কল। জন্ম জন্মান্তর কী করে ভিথিরি থাকা যায় তার ফর্মুলা।

ডোডার লেনেই খোকাকে ভর্তি করলাম। টাকাপয়সা বাদে আর কি কি লাগবে ভাই? সিহুসাইজার? সেটা আবার কি? সিহুসাইজার কাপড় পরে আসতে হবে? টেরাকোটা? লিঙ্গ পরিবর্তন? ওহো—ইস্ট্রিমেন্ট। আসলে আমরা তো হারমোনিয়াম পর্যন্ত জানি। আমার দুই মামা স্টেশনে বসে বাজাতেন। পাট টাইম ভিথিরি ছিলেন। এখন দিনকাল পান্টেছে। সুর এখন কত সাইজ হয়ে গেছে। রমার ব্রাউজ। আচ্ছা ভাই, প্রথমে একজোড়া রাবিশ ভাড়া দিয়ে শুরু করলে হয় না? খিদিরপুরের বাসে শিশুদের বাজাতে দেখেছি। প্রফেশনাল। আসলে খোকা তো, এখন ছোট—। হ্যাঁ। ছোট থেকেই বড় জিনিস ধরে নেওয়া ভালো। বালক কৃষ্ণ পর্বতাসুরকে ধরে গলা টিপে দিয়েছিল। আমাদের পাশে বাড়ির মেয়ে কমকি দু'বছর পর মাধ্যমিক দেবে। এর মধ্যে দু'বার শাখা-পলা ধারণ করে এসেছে। ওর ভাই রমেন টিফিনে ইঁকো খায়। তার পরেরটা চোখে ছানি নিয়েই জন্মেছে। তাছাড়া প্রতিভা আর পয়সা সামান্য হলেই প্রকাশ পাবে। বয়সের অপেক্ষা করে না। ব্যাটাছেলের গলায় সোনালি চেন থাকলেই বড়লোক। ডান হাতে ঘড়ি পরলেই রংবাজ। সকালবেলা তাড়া খাওয়া গরুর মতো জগিং করলেই একজিকিউটিভ। জোড়া চিমনির মতো হাফপ্যান্ট পরে বাজারে গেলেই বিজনেস ম্যান। ওণ ওণ করতে করতে মরা ইলিশ শূঁকে রেখে দাও। মাছপটিতে মনু ছাবরিয়া তুমি। বাঙালির ধারণা কি খারালো রে বাবা।

খোকা 'বাবা' 'বাবা' করে উঠল। কী হল খোকা? খোকা বলল, ভুল জামগাম টিক দিলে। রোবিন্দ নয় গোবিন্দ সঙ্গীত হবে। ভর্তির ফর্মে ভুল। 'সরি' বলে শূঁধে নিলাম। খোকা যে ভক্তিসঙ্গীতির ভক্ত তা তো রমা বলেনি। খোকাকার সঙ্গীত সাধনা শুরু হল—

দুরন্ত ঘুরি এ' লেগেছে পাক

এই জীবনে শুধু মাল খাওয়া যাক,

মাল খাওয়া যাক.....

আমার ভুল ভাঙল। এ তো ভক্তি নয়, এ তো ভীমরতি! এ গোবিন্দ সে গোবিন্দ নয়। সিহুসাইজার গোবিন্দ। খোকাকে দু'বার 'ডোডার' হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছিলাম। বংশধরে ব্র্যাকমেল করল—

শোনো মা বলি তোমায়—

বাবা রোজ মাসির কাছে যায়.....

এখন শালিদের সঙ্গে সম্পর্ক শিকের তুলে ভয়ে ভয়ে থাকি। কখন কী যে হয়।

হাজার রাজার বাজার!

অলোক বসু

দূরদর্শনের ঘোষিকা বিশেষ ধাক্কা মেয়ে
মেয়ে অনুষ্ঠানসূতী ঘোষণা কবছিলেন।
মাঝে মাঝে, বিশেষ শৈলী-বশত বাংলা

ভাষা কিনা সন্দেহ হচ্ছিল। বেশকিছু কথাবার্তা
মুখের ভেতর কেমন যেন সংস্কৃতি-মনস্ক ভাবে
সেঁধিয়ে যাচ্ছিল। ঘোষণার মধ্যে মমতাস্বরের
ব্যাগে আর মহম্মদ আলির বল্লিং-এর বিশেষ তফাৎ
দেখা (শোনা!) যাচ্ছিল না! ভঙ্গীয় উচ্চারণটি খুব
চেনা চেনা মনে হচ্ছিল। কর্তা বুঝছিলেন—কোথায়
গুনেছেন। ইদানীং কন্যারক্কটি বেড়ে ওঠার মুখে
সবকিছু উচ্চারণের মতো টিভিও ভক্ত। সাপ ব্যাঙ
ঘাস— সব দেখে সুযোগ পেলেই। এইরকম
ভঙ্গীয় উচ্চারণে মেয়ে বাংলা আর ইংরেজি পড়ে
থাকে। মেয়ের সেই ধাক্কা মেয়ে মেয়ে পড়া বুকে
বড়ই ধাক্কা দেয়। বাংলা ভুলছে, ইংরেজিও শিখছে
না। উচ্চারণের আতলামিতে উচ্চ ভাবের রণ। কে
জানে তাঁর কানের দোষ না মেয়ের টানের দোষ?

কন্যা ইদানীং সঙ্গীতচর্চাও করে থাকেন। ঐ যে
রবীন্দ্রসঙ্গীত। আরে, অত সুরেলা সুমিষ্ট গলাটা
কেমন চেপে দিয়েছে দ্যাখো!

—কেন রে মেয়ে? ঐ দাড়িওলার গান গাইলেই
বুঝি আসল গলা চেপে দিতে হয়?

—কিন্তু গানের আশ্ৰি যে এভাবে বলে দিয়েছে।
স্কুলের দিদিমণিও (বুড়ি আন্টি!) বলেছে—খবরদার
ছোট ছোট উত্তর লিখেবে না। বেশি না লিখলে নম্বর
দেওয়া হবে না কিন্তু!

—তা বাবার নাম জিজ্ঞেস করলে কি এক
কথায় উত্তর দেওয়া যাবে, নাকি চোদ্দো—পুরুষের
নাড়ি ধরে টানাটানি করতে হবে?

আবার বইয়ের ভাষায় উত্তর দেওয়া চলবে না।
নতুন নতুন শব্দে উত্তর লিখতে হবে।

তা, মেয়ে জিজ্ঞেস করছিল—বাবা আর মা'র বদলে কী নতুন শব্দ লেখা
যায়?

—না রে মা! বাবা-মা'র বদল কি আর হয়?

—কিন্তু আশ্চি যে নম্বর দেবে না!

—না দিক। এক আশ্চির জন্য বাবা-মা'র পরিবর্তন কোনো কাজের কথা
নয়।

মেয়ে আরো বলে—চিঠিপত্রে How are you লেখা চলবে না। ওসব



নাকি Old-fashioned ।

তা'বলে লোককে 'কেমন আছে' জিজ্ঞেস করা যাবে না। কে জানে, কুশল
সংবাদ জিজ্ঞাসা করাই বুঝি Old fashioned !

মেয়ে একদা কোন পরীক্ষায় চারশো নিরানব্বই নম্বর পেলে কে জানে,
বুঝি আশ্চির উত্তর মনের মতো হয়নি। কিন্তু বিপদের সম্ভাবনা নাকি অন্যদিকে।
মুখপাতলা বাবাকে মেয়ে সাবধান করে দিল— কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবে
এক নম্বর কম পাঁচশো। খবরদার চারশো নিরানব্বই বলো না!

—কি করি বল, আমার যে সাদা মনে কাদা নেই। তবে কিনা যে

ব্যাটসম্যান নিরানকুইয়ে আটকে যায় আর যে সেধুরি করে, তফাৎ অনেকই। কেবল এক নম্বরের জন্যই কত কিছু। এখানে আন্টি আর ওখানে আস্পায়ার।

তা স্কুল বলতে বলতে আরেক কথা মনে পড়ল। পাড়ার বিত্তজোঁঠার গল্প। বাবার বন্ধু।

বাবাদের স্কুল শুরু হবার আগে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হত। বিত্তজোঁঠার বোধহয় গানের গলা তেমন ভালো ছিল না। তাই সেই জাতীয় সঙ্গীতের মাঝে মাঝে জেঠু গোয়ে উঠত—ছি ছি এস্তা জঞ্জাল। ছি ছি এস্তা জঞ্জাল...

বাবার সে বন্ধু বহুকাল আগে দেহ রেখে স্বর্গ কিংবা নরকের ঠেকে। কিন্তু কে জানে জাতীয় সঙ্গীতের মাঝখানে এরকম একটা লাইন গাওয়ার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে জাতীয় সঙ্গীত অবমাননার মামলা রুজু করা উচিত কি না? বাবার সেই বন্ধু বিত্তজোঁঠার আরো কিছু গল্প ছিল। রেলের গল্প। তাতে বোঝা যায় যে কু-বিক-বিক রেলের গাড়ি মানেই শুধু মমতাময়ী-নীতিবাগীশদেব পারম্পরিক তর্জা আর কাজিয়া নয়। গ্রামের স্টেশন। এক-দেড় ঘণ্টা অন্তর ট্রেন আসত। বিত্তজোঁঠার বাড়ি থেকে দেরিতে বেরনোর জন্য ট্রেন ফেল হত। কখনো কখনো বা ছুটতে হত। মাঝে মাঝে ট্রেন লেটও হত। গার্ড, স্টেশন মাস্টার সবাই বিত্তজোঁঠাকে খুব ভালোভাবে চিনে গেছিল। একদিন ট্রেন আসছিল দেখা যাচ্ছিল। দূর থেকে দেখে বিত্তজোঁঠা দৌড় লাগল। গার্ড বিত্তজোঁঠাকে দেখতে পেয়ে ট্রেনটা একটু আটকে রাখল। বিত্তজোঁঠাকে সে বিলম্ব চিনত। কিন্তু স্টেশনে পৌঁছেও বিত্তজোঁঠা আব ট্রেনে ওঠে না। গার্ড বলল,—কই বিত্তবাবু, উঠুন—

—না—আপনি চলে যান—বিত্তজোঁঠা নির্বিকার চিন্তে উত্তর দিয়েছিল—আমি দেখছিলাম আমার স্পীড ঠিক আছে কিনা।

তা এইভাবে অনেকে অনেক কিছু দেখে নেয়। যেমন বিদ্যাসাগর মাঝে মাঝে নুনভাত খেয়ে পুরনো অভ্যাস ঝালিয়ে নিতেন। কেউ কেউ ধনী-টর্না দিয়েও পুরনো অভ্যাস ঝালিয়ে নেয় বটে।

তা রেলের অনেকে অনেক অনেক জায়গা পার হয়। বেড়াল পার করার গল্পে রেলের সাহায্য নিলে বোধহয় সম্প্রতি অটোয় যেতে যেতে এ কাহিনী শুনতে পাওয়া যেত না। অটোতে দুই মহিলার মধ্যে বেড়াল পারের গল্প হচ্ছিল। বোধহয় কোনো কারণে গল্পের বেড়ালটি বিশেষ উপদ্রবের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই বুঝি তাকে কোনোভাবে পার করার প্রয়াস হয়েছিল। কিন্তু একদিন দরজা খুলে মহিলাটি বেড়ালটিকে দেখে বলে ওঠেন—ওমা, চুই!

তৃতীয় বোকাসোকা সাতপাঁচ না ভাবা সহযাত্রীর মুখনিঃসৃত তাত্ত্বিক প্রশ্ন ছিল—বেড়ালটা তখন কি বলল?

তা অনেকে অনেক কিছু বলে। বাঙালি বেড়াল বিহারী বেড়াল হয়ে গেলেই আর রেল বিভাজনের দরকার পড়ত না বোধহয়।

অটোর কথায় গড়িয়াহাটের অটো সার্ভিসের কথাও মনে পড়ল। ইদানীং গড়িয়াহাট ওভারব্রিজ হবার পরে গড়িয়াহাট অটো চালকরা খুব স্বাধীনতা ও খেচ্ছাচারিতার পূজাবী হয়ে উঠেছে। অবশ্য বেশি ঘুরপথে যেতে হচ্ছে বলে তাদের যুক্তিও আছে। ফলে তারা পুরো সিলেবাস শেষ না করে ঢাকুরিয়া কি গোলপার্ক অবধি এসে ক্যাশ কোর্স কবে পালিয়ে যাচ্ছে। ভাড়া গোলোযোগ সে সব নিয়ে।

—গড়িয়াহাট কিন্তু যাবে না—

সেয়ানারা অটোয় উঠে তবেই জিজ্ঞেস করে কোথায় যাবে। নাহলে এ জিজ্ঞেস করার ফাকে কেউ ঠিক উঠে পড়ে।

পৃথিবীটা তো গোল, তাই গোলপার্ক ঘুরে এলেই চলবে। আর গোল পৃথিবী ক্রমশ ছোট হয়ে হাতে আসছে। তাই গোল পার্কও ছোট হয়ে এল।

চিকাগোর মহাসন্যাসী বুকের ওপর দু'হাত জুড়ে দাঁড়িয়ে সব দেখে যাচ্ছে।

অটোয় উঠে অনেকরকম শিক্ষালাভও হয়। অটোযাত্রীদের কথাবার্তায় শোনা যায়, কাছেই যেন রীতিমতো লাইসেন্স প্রাপ্ত মদিরা-বিপনির উৎপাতনের জন্য নানান আদোলন চলবে—না— বা ষাটালের পাশে মাতাল হবার বন্দোবস্ত চলবে না। বরং তার পাতাল-যাত্রার ব্যবস্থার জন্য তার চাতালে বসে সংস্কৃতি-মনস্ক ধনী। নানান জনপ্রতিনিধি নিজস্ব পদস্থলন বেমালুম ভুলে কেউ চেয়ারে বসেন, কেউ তালা লাগান, কেউ দূরদর্শন অভিনাযী সুদূর প্রসারী ভাষণ দেন ইত্যাদি।

কেউ কেউ বলছে—এতে এত নড়াচড়ার কি আছে কে জানে। সবাই জানে বাচ্চারা পোলিও খায়, বড়রা জলীয় খায়। কর্তাকে গিমি সহনশীল হয়ে বলেন—খাইও, কিন্তু টলিও না। নায়ক দর্শনীয়ভাবে বিজ্ঞাপন দেন—মজা যোলাও আনা। কিন্তু মজা কী করে হবে, মালখানা খুললেই যে ডুলোখোনা বাপ।

নানান কাজের কথায় কাজের লোকের কথাও বলা যাক। গিমি গজগজ করেন। যদিও বোরেন না, মানুষ ছোট, বড় কেউ নয়। তবুও তাঁর অসন্তোষের কারণ,—নাম আর খুঁজে পেল না? যত্নসব।—হয়েছে কি, কাজের লোকের নামকরণ বিচ্ছিন্ন রকমের ভাড়া। সকালে কলিংবেল বেজে উঠলে গিমি অন্যমনস্কভাবে বলে ওঠেন—কে?

—আমি মহারানী।—প্রভাতকালীন সপাট উত্তর।

ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়কের নাম মহারাজ হলে আপত্তি নেই; কিন্তু তারই কাজের লোকের নামই বা কেন হবে মহারানী?

কিন্তু তাব মহারানী সত্যিই মহারানী। অনেক বরাদ্দ কাজের ক্ষেত্রে সময়-সংক্ষেপে সে ঘোষণা করে—আমি পারবুনি।

গিমি মাইনে কাটতে পারে না ভয়ে। যদি এহেন মহারানীও একদিন বলে বসেন—আমি আর কাজ করতে পারবুনি!

মনে হচ্ছিল আমিও আর লিখতে পারবুনি। কিন্তু কি যে এক দেবদাসীয় স্বপ্নসংলাপ লিখতে ইচ্ছে হল।

স্বপ্ন সংলাপ :—

দিলীপ কুমার শাহরুখ খানকে কহিলেন—

শুনিতেছি তুমি নাকি কামাল কবিয়াছ। সাবাস্!

তোমারও ম্যানারিজম রহিয়াছে, আমারও ছিল।

সুচিত্রা সেন ঐশ্বর্য রাইকে কিছু কহিয়াছেন

বলিয়া শোনা যায় নাই। তবে তাঁহার কন্যা

কেহ পার্বতী চিন্তা করেন নাই বলিয়া তাঁহার

কোনো গৌরা আছে কিনা তাহাও জানা

যায় নাই। বিজ্ঞাপনের ভাষায় তিনি মনে মনে

কহিয়াছিলেন কিনা কে জানে—আমার মেয়ে

আফটার অল্!

ভারতীয় বৈজয়ন্তীমালা বোধহয় বেচারী অম্বনা আমেরিকান মাধুরী দীক্ষিতকে ধর্তব্যের মধ্যে আনেন নাই। তিনি একদা ঐ ছবির প্রধানা নায়িকা ছিলেন বলিয়া দাবী কবিয়া সহনায়িকার পূবস্কার প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন।

উপসংহার : তবে ভারী সব বদমাশ কু-লোকে কহিতেছে কি হিন্দি সিনেমার সর্বশ্রেষ্ঠ চন্দ্রমুখীর ভূমিকাটি নাকি শ্রীমতী ভানুরেখা গণেশনই পারিতেন।

রাখেকেশের একটি দিন

মিতা নাগ ভট্টাচার্য



রাখেকেশর আজকাল কোনো ব্যাপার নিয়ে বেশিক্ষণ ভাবতে পারেন না। কোনোকালেই খুব ভাবনা-চিন্তা পোষায় না। দুই ছেলে এক মেয়ে নিয়ে তিনি মোটামুটি খুশি। স্ত্রী শ্যামা ভালো মেয়ে। অত্যন্ত পক্ষে চাহিদাময়ী নয়। ঋগড়া করার প্রবণতা কম। মোটামুটি আপোষকামী। কখনো সখনো ফোস করে বটে। তবে বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। ছেলেমেয়েরাই বরং এ নিয়ে সে নিয়ে তাঁকে ঝামেলায় ফেলে। তবে সে ঝামেলায় তিনি খুব কিছু বিব্রত হন না। আজকালকার ছেলেমেয়েরা বড় বেশি ডাকাবুকো। বড়দের অত্যাচার ভয় করে চলার ব্যাপার নেই। সবসময় এই চাই নয়ত সেই। তাঁদের সময় হাতখরচ আর পেতেন কোথায়? এ টিউশনি করে বা মায়ের কাছ থেকে। অথচ এখন? রীতিমতো মাস গেলে হাতখরচ দিতে হয়। তাঁদের সময় প্রেম কথাটা এত সহজ ছিল না। এখন তো আর লুকিয়ে চুরিয়ে প্রেম নয়। রেস্টুরেন্টে বসে খাওয়া দাওয়া ইত্যাদি। খরচ নেহাৎ কম নয়।

যাক, বেঁচেছেন। তাঁদের সময় প্রেমিকাদের নিয়ে অত ভাবনা ছিল না। তবে পয়সারও প্রয়োজন হত। আর পয়সা অত খরচ কবতে ভালো লাগে না....

—বাবা, তাড়াতাড়ি স্নান করে এসো। মায়ের রান্না হয়ে গেছে।

—তোর মাকে বলিস তো ছানাটা এ বেলাতেই দিয়ে দেম যেন।

—হয়েছে হয়েছে। তোমার ছানা রেডি। এখন স্নানটি সারা।

—জলটা ঠিকমতো গরম করছে তো?

স্নান করতে গিয়ে একটু বিরক্তই হলেন। দূর বাবা, এত গরম করে কেউ? মগের পব মগ জল ঢেলে তা পছন্দসই হল। কোনোদিনই কোনো কাজ তাড়াতাড়ি করে করেন না। আজও ব্যতিক্রম নয়। প্রায় পঁয়ত্রিশ মিনিট ধরে স্নান সারলেন। না, সাবানের কোনো অনুপ্রবেশ নেই, শ্যাম্পুও নয়। ওসব তিনি ব্যবহার করেন না। ভাত খেতে বসেই

বিরক্ত হলেন। মুসুরি ডালটা মোটেই জুতের হয়নি। ঘন হওয়া উচিত ছিল। মিষ্টিও কম। মাছেব ঝোলে বড় ঝাল।

—এ্যাই শ্যামা, একটু চিনি দাও তো।

—চিনি দেওয়াই আছে।

—নয় একটু গুড়ই দাও।

এবার শ্যামার গলা শোনা যায়।

—ব্যাপারটা কি তোমার? ছানায় আব কত গুড় চিনি খাবে?

—ছানায় চিনি কে চেয়েছে? ঝোলে চিনি দাও।

না, অবাক হবার কিছু নেই। রাখেকেশর শাক তরকারি মোটেই পছন্দ করেন না। তা আবার ঝাল হলে তো কথাই নেই। তিনি যথেষ্ট চিনি প্রয়োগ করে খেয়ে থাকেন। চিনি এবং গুড়ের প্রতি তাঁর অসীম প্রীতি।

সন্তরোষ বয়স, সুগাবের বালাই নেই। লোকে সুগার সুগাব কবে হেদিয়ে মরে। রাখেকেশর সে সবার মধ্যে নেই। তবে হ্যাঁ, কাশিটা বড় জ্বালায়।

সবিতা, মানে ছোট মেয়ে, তারই একমাত্র বিয়ে বাকি। সে নাকি বিয়ে করবেই না। না করলে কিছু বলার নেই।

তাঁদের অবর্তমানে সে যদি বৌদিদের নিয়ে থাকতে পারে তো থাকুক না। দুই ছেলের বিয়ে দিয়ে ফেলেছেন। বড় মেয়েটিও ভালোই আছে। সবচেয়ে প্রিয় সন্তান। কিন্তু জামাই বড় একবগুগা। এ নিয়ে একটু মনটা অশান্ত হয় বটে তবে বেশিক্ষণ নয়।

জীবনে মানুষের কত আকাঙ্ক্ষা থাকে। রাখেকেশরের খুব কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষা কখনোই নেই। ছেলেমেয়েরা মানুষ হোক এটা চেয়েছেন। দু'হাতে পয়সা উপার্জন করুন বা না করুন, অমৌক্তিক খরচে তিনি নারাজ। এই যেমন ট্রেনে টিকিট কাটা। কেন বাপু। দেশের সরকারের দায়িত্ব রেলগাড়ি চালানো। মানুষ তাতে চডবে, ভালো কথা। অত টিকিট কাটার হায়া কে নেয়? চেকারের হাতে পড়েছেন তিনি। কুছ পবোয়া নেই। ঠিক বেরিয়ে এসেছেন।

“রেলের স্টাফ”, নতুবা “এই রে, ফেলে দিলাম।” এমন কত কি। একবার তো ভালো

বিপদেই পড়েছিলেন। ছেলে-মেয়েদের নিয়ে চলেছেন হাবড়া। হাবড়ার লোকেরা গোবোচারা। ও লাইনের চেকারকে কাঁচকলা দেখানো কোনো ব্যাপার নয়। হাবড়া লোকালে উঠেছেন। নিরুপদ্রবে। বেশি ভিড়ও নেই। হঠাৎ করেই কালো কোট। শ্যামারও চোখমুখ লাল লাল। শ্যামা তো জ্ঞানেন স্বামীর কাছে টিকিট নেই। কী লজ্জায় যে পড়তে হবে। হৃদয়পুরে এই কাণ্ড। টিকিট চেকার এগোচ্ছেন। শ্যামা ঠিক করে নিয়েছেন তিনি কিছু বলবেন না। নাঃ বিকার নেই রাধেকেশরের।

—আর বলবেন না দাদা, এদের নিয়ে পথে চলা যায়? যাব শিয়ালদা, হাবড়ার লোকালে বাচ্চা নিয়ে উঠে পড়েছে। এন্টুনি নেমে যাব দাদা।

ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। শ্যামার সরল মুখ—ভ্রলোক সদাশয় বটে। কিছুই বললেন না। আজকাল নাকি লাল গাড়ি, চেতনা রথ কি সব হয়েছে। তোয়াক্কা করেন না। কে ধরবে তাঁকে? ওসব অনেক দেখা আছে।

হ্যাঁ। মাঝে মাঝে একটা ইচ্ছে হয়। কোথাও বেরিয়ে পড়া। ঘুরেছেন কম বয়সে। না, তাও রেলের পথে। নিজে রেলের চাকরি করেননি। তাতে কি? বন্ধুর কাছ থেকে জোগাড় হয়ে গেছে সেটিও। বোম্বে দার্জিলিং, পুর্বা, আবার কি। বাঙালির এই তিন জায়গা দেখা হলোই যথেষ্ট।

খাওয়ার পর একটু ঘুমোবেন। কিন্তু বড় নাতির হাঁকডাকে তা হবার উপায় নেই।

—ও দাদু। গল্প বলো না। আজ নতুন গল্প বলতেই হবে।

নাতিদের সঙ্গে একটা বিষয়ে রাধেকেশরের বড় লেগে যায়। তারা দেখবে নাচ গান সিনেমা। রাধেকেশরের একটাই নেশা। খবর শুনবেন। দুনিয়ার খবর না রাখলে চলে? সকালের খবর কাগজটি নিয়ে আঁতিপাতি করে পড়েন। কাউকে ছাড়বেন না। খেলার বিষয়ে খবর বা আগের দিন টিভিতে শোনা খবরের বিস্তারিত জানান ইচ্ছে। রাধেকেশর তো পেপার বগলদাবা করে বসে আছেন। তাঁকেই জিজ্ঞেস কবে নিতে হয়। বড়ছেলে অনিলের তো এমনটাই হয় কতবার—

—বাবা একবার দাওদিকি ফার্স্ট পেজটা।

—দাঁড়া দাঁড়া, আর একটু দেখে নি।

—আরে কালকে যে বাস অ্যান্ড্রিডেটটা হল, কেমন করে হল? বলো দেখি, পড়ছ তো অনেকক্ষণ ধরে।

গভীর মুখে পেপার ফেরত দিলেন। মুখে কিছুই বলতে পারলেন না। ছেলের বউরাও মাঝে মাঝেই বিরক্ত হয়। —বাবা সারাদিন পেপার নিয়ে বসে থাকেন অথচ কোনো খবর জিজ্ঞেস করলে মুখে কথা নেই।

শ্যামা এমনত মানুষটিকে নিয়ে কম অসুবিধা পড়েননি। তবু চলেন আর কি।

রাধেকেশর যা চান, যা ভালোবোঝেন তাই-ই করেন। মাঝে একবার খুবই নেমন্তন্ন খাবার ইচ্ছে হয়। অথচ দীর্ঘদিন কোনো নেমন্তন্ন পাচ্ছেন না। ২১শে অক্টোবর সেবার যেন ঘরে ঘরে বিয়ে। বেশ কিছু নেমন্তন্নর উড়ো খবর এল। শেষ পর্যন্ত বাড়ি বয়ে এল না একটাও।

একশে অক্টোবর সুসন্ধ্যায় ভালো করে পারিপাটি খুঁটি পরে বেরিয়ে পড়লেন। শ্যামনগরে নেমে পড়লেন। দুটো বাড়িতে ঢুকে পড়ে আবার বেরিয়ে এলেন। তৃতীয় বাড়িতে ঢুকতে না ঢুকতেই সিন্ডের পাঞ্জাবি পরা এক যুবক খুব তৎপর ভাবে এগিয়ে এল।

—আসুন আসুন মেসোমশায়... এই কফি, এদিকে। ভাববার অবকাশ নেই। তাড়াতাড়ি করে কফি নিয়ে ফেললেন।

—আমার আরাব ঠাণ্ডা কশিটা বাড়ে। ফার্স্ট ব্যাচেই...

—হ্যাঁ হ্যাঁ কোনো চিন্তাই নেই। আমি আপনাকে ঠিক ডেকে নেব।

রাতে টেকুর তুলে শুতে গিয়ে শ্যামার মুখোমুখি।

—কি গো, এত সেজেগুজে কোথেকে ঘুরে এলে?

—আরে আমার সেই যে এক বাবু ছিল না। কাল বলবখন। খুব বেশি খাওয়া হয়ে গিয়েছে।

রাধেকেশরের আর একটি অভ্যাস আছে। পেট পরিষ্কার রাখার অভ্যাস। দিনে কম করে ছ' সাতবার যাবেনই। পেট একটু ওড়ুড় করল তো একুবার ঘুরে আসবেন, হোক বা না হোক। জীবনে এই একটা জায়গা যেখানে কেউ তোমাকে বিরক্ত করবে না। কোনো সুখ-দুঃখের কথা শোনাতে বসবে না। অহেতুক কোনো ঝামেলাও স্পর্শ করতে পারে না এ সময়। নিরিবিলা।

বড়মেয়ের বাড়িতে নাকি অশান্তি। রাধেকেশর প্রতিবাদ কবতে চান। ছেলেদের আপত্তি। তারা গা বাঁচিয়ে থাকতে চায়। —ওদের ব্যাপার ওরা বুঝুক। তুমি এর মধ্যে যেও না।

ওদের ব্যাপার মানে? তাঁর মেয়ে ফেলনা নাকি? কিন্তু সবদিক বিবেচনা করে চুপ থাকতে বাধ্য হন। আজকাল ছেলেরা বউরা সব যেন কেমন কেমন। তাঁরা তো বাবা-মাকে বড়ই মানতেন। অথচ এরা? নিজেদের যে কী মনে করে। যাক, মনকে ভারাক্রান্ত করবেন না। ছোটছেলের মেয়ের মুখেই শুনলেন।

—দাদু জানো, যা চেকিং হচ্ছে না, অনেক লোককে ধরেছে। যার টিকিট থাকবে না তাকে যেখানে সেখানে নিয়ে যাবে।

—তাই নাকি রে? এ তো ভারি মজার কথা। না রাধেকেশর দেরি করবেন না। এ মাসে একটু হাত টানাটানিও যাচ্ছে। শ্যামা কদিন ধরেই বলছে কোথাও বেড়াতে যাওয়া যাক। সে একঘেয়েমিতে আর পারছে না। কিন্তু না। অন্তসব ঝামেলা নিয়ে বের হওয়া সম্ভব নয়। রাধেকেশর একদিন বেলাবেলি দেখে একাই বেরিয়ে পড়লেন।

—যাচ্ছে কোথায়? ট্রেনে করে গেলে টিকিট কেটো বাপু। খুব চেকিং দিচ্ছে। বুড়ো বয়সে...

রাধেকেশর হাত গলিয়ে বের হতে জানেন। আপাতত কল্যাণী যাবারই ইচ্ছে হল। বড় পিসিমা থাকেন। তাঁর কাছেই ঘুরে আসবেন। যতসব ফালতু কথা। কোথায় চেকিং? চেকিং থাকলে বোকাই যায়। পৌনে এক। কল্যাণী সীমান্তেই উঠে বসলেন। কাকিনাড়ায় ট্রেন ঢুকতেই একটু যেন সোরগোল।

—লাল গাড়ি। লালগাড়ি আছে দাদা।

সজাগ হলেন। ট্রেন ঢুকে পড়েছে। অনেকদিন পর বেরিয়েছেন।

—দাদু আপনার টিকিটটা?

—না বাবা কাটতে পারিনি। ট্রেন এসে গিয়েছিল।

—ফাইন দিতে হবে।

—দ্যাখো বাবা, আমি রিটার্ড মানুষ। ফাইন কোথেকে দেব?

কোনো কথাই শুনবে না।

—যাবেন কোথায়?

—কল্যাণী।

তাঁর মতো আরো অনেকেই। লাল গাড়িতে চাপানো হয়েছে। এখন ট্রেন কোথায় যাবে কে জানে। বাড়িতে চিন্তা করবে এই যা। নইলে মন্দ কি। বিনা পয়সায়...। সারাজীবন তো এই সুযোগই খুঁজে এসেছেন।

কোনার দিকে তাঁরই মতো বসে ভ্রলোক এদিকে তাকিয়ে রয়েছেন। অপ্রস্তুত হাসি। আলাপের ইচ্ছে যেন।

—ভুজুং-ভাঙ্গুং দিয়ে বের হতে পারলেন না?

—না মশাই, পয়সার ব্যাগ নিয়ে বের হতে ভুলে গেছিলাম। এখন কি যে ফ্যাসাদে পড়লাম।

—কোথায় যাবেন? কৃষ্ণনগরে নেমে বাসে করে যেতে হবে অনেকটা। ওখানেই আমাদের আশ্রম। যাবেন নাকি?

এ সব আশ্রম টাশ্রম কখনো যাননি বাথকেশর।

—ট্রেন তো যাচ্ছে ওদিকেই।

মনে মনে স্থির করলেন বিনা পয়সায় হলে চলোঁই যাবেন।

—আমাদের আশ্রম কিন্তু ভারি সুন্দর। চলুন, ভালো লাগবে।

—না না, আমি অজানা অচেনা মানুষ, তারপর সঙ্গে পয়সাকড়ি তেমন নেই।

—আরে ভবঘুরেদের জন্যই তো। সামান্য প্রণামী দেবেন। ওতেই চলবে।

মনে মনে কেমন লোভ হয়। বাড়িতে নাতি-নাতি ছেলে-বউদের চটাস চটাস কথা। যে যার মতো চলছে। কেমন যেন ছাড়াছাড়ি সবাই। গেলে হয়। কিন্তু শ্যামা যে চিন্তা করবে। কোনোদিন কোথাও রাত্রিযাপন করেন না। ওরা যে ভাবতেও পারবে না।

এরকম ঘোরের বশেই বুঝি রাথেকেশব চলে আসেন আশ্রমে। এসে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হচ্ছে।

খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গেছে রাথেকেশবের। মনে মনে বেশ মজা পাচ্ছেন। ছেলেরা কেবলি ভাবত বাবা কোথাও একা একা যেতে পারে না বাবা কিছু পাবে না। এই তো বেশ আছেন রাথেকেশব।

—চলুন একটু বাগান করি। এখানে সকলেই বাগানের কাজ করেন সকালে।

দুপুরে খাবার পর যার যার খালা খোওয়া। মন্দ লাগছে না। বিকেলে

চা বলতে লিকার চা। সন্দের দিকে বাড়ি বাড়ি করতে থাকে মনটা। সন্ধ্যারতি পূজোপাঠ কোনোদিন করেননি। নামগান শেষে সকলেই পয়সা ফেলছে। চারদিকে চেয়ে দেখলেন কেউ লক্ষ্য করছে কিনা। কুড়ি পয়সা ফেলে দিলেন। সম্যাসী বলেছিলেন প্রণামী দিতে। এই-ই যথেষ্ট। কিন্তু কেমন এক অস্বস্তি হয়। ফেবার জন্য মন ছটকট করছে। চলে তো যাবেন। যদি ডোনেশন টোনেশন চেয়ে বসে?

ঘাবড়াও মাং। ‘সামনে অনেক খরচ’ বলে কেটে পড়বেন। কেমন রাগ হয় নিজের ওপর। কেন যে ফালতু ফালতু এখানে আসতে গেলেন। এখন পয়সা গচ্চা না গেলে হয়।

—ও মশায়, চলে যাব আজ।

—এই ভরসাক্ষেয়? নানা, কাল দুপুরে।

—নাহ্ একুনি রওনা দেব। সব তো সঙ্গে ছ’টা দশ।

ভদ্রলোক ডাবাচাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ডাবাচাকা খেলেই ভালো। এই অবস্থাতেই সরে পড়বেন।

না, খরচা হয়নি। মাঝে একটা দিন বৈচিত্র্যে কাটিয়ে এসেছেন।

—আরে কেশরদা না? ছিলেন কোথায় মশাই? এদিকে আপনাকে নিয়ে হৈ চৈ।

মনে মহাকৃতি নিয়ে ফিরছিলেন। কিন্তু বাড়ি ফিরেই মেজাজ খিচড়ে গেল।

—আমরা এদিকে পেপারে, পেপারে টি ভি তে....

—সে তো অনেক টাকার ব্যাপার। কী দরকার ছিল?

এদিকটা তো ভাবেননি রাথেকেশব। তাঁর সংসারের প্রচুর টাকা যে তাঁর খামখেয়ালিতে ফালতু খরচ হয়ে গেল। ইস!

রসকলি

বি এ পাশ

কয়েকদিন গত হইল, গোপাল বি এ পাশ করিয়া তাঁহার গ্রামের বাড়িতে ফিরিয়াছেন। তাঁহার গ্রামে এই প্রথম কেহ বি এ পাশ করিল। পাশের দৌলতে গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠ সকলেই গোপালকে লইয়া তাই খাতির করে, কাছে ডাকে, আদর-যত্ন করে। এমনকি গ্রামের সকল মেয়ের বাবারাও গোপালকে লইয়া জামাই-জামাই ভাবিয়া থাকেন।

কিন্তু এই গোপালবাবু একদিন বড় ঝামেলায় পড়িলেন।

একদিন গোপালের সস্তর বছরের ঠাম্মা ঠাম্মার নাতিকে পরীক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন। ঠাম্মা একদিন তাঁহার বি এ পাশ নাতিকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন, ‘আচ্ছা বাবা গোপাল, যদি তিনটে কলার দাম ৩ টাকা ৩০ পয়সা হইয়া থাকে, তাহলে পাঁচটা কলার দাম কত, আর তিনটির দামই বা কত হইবে? গোপাল এই প্রশ্নের উত্তর মুখে মুখে দেওয়ার পাত্র নহেন।

তখন সকাল দশটা। দশটা হইতে তিনি তাঁহার অঙ্ক কষিতে শুরু করিলেন। ততক্ষণে তাঁহার ঠাম্মা স্নান সারিয়া, খাওয়া-দাওয়া এবং বিবিধ কর্ম করিয়া তাঁহার নাতিব নিকট আসিলেন। তিনি দেখিলেন, তাঁহার নাতি সমগ্র খাতাটি অঙ্ক কষিয়া শেষ করিয়াছেন। গোপাল এবার কতকগুলো চক লইয়া, শুকনো ঠনঠনে মাটির বারান্দায় অঙ্ক কষিতে শুরু করিলেন। বাবান্দাও অঙ্ক অঙ্ক শেষ হইল। ঠাম্মা ততক্ষণে তাঁহার কার্যে ব্যস্ত

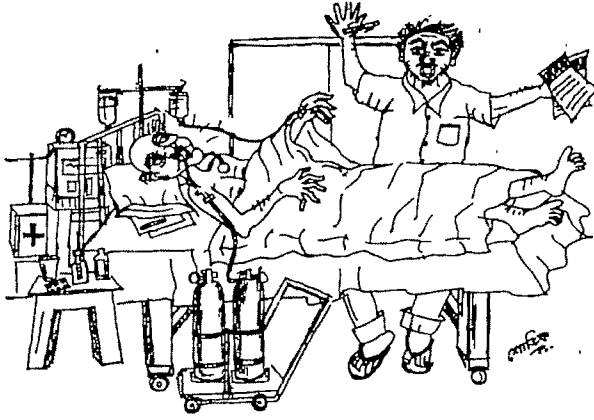


রহিলেন। বেলা আরোটা বাজিল। গ্রীষ্মের টাক-ফাটা, মাঠ-ফাটা রৌদ্রে গোপাল অঙ্ক কষিবার নিমিত্ত উঠানে নামিলেন। তিনি আপন মনে অঙ্ক কষিয়াই চলিলেন। এদিকে তাঁহার সমগ্র শরীর হইতে ঘামের বৃষ্টি উপ উপ পড়িতে শুরু করিল। তবুও গোপাল ছাড়িবার পাত্র নহেন। এদিকে পাশপাশি এ-বাড়ি সে-বাড়ি হইতে পাঁচ-দশজন গোপালকে এমনতর কার্য করিতে দেখিয়া গোপালের নিকট আসিলেন। এমন সময় গোপালের নিকট তাঁহার ঠাম্মা আসিলে তিনি কান্দো কান্দো স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘ঠাম্মা, পাকা কলা না কাঁচা কলা?’ ঠাম্মা হাসিয়া বলিলেন, ‘বুঝিয়াছি তোমার অঙ্কের দৌড় এখন স্নান সারিয়া খাইতে আইসো, তোমার মা ভাত বাড়িয়াছে।’

—প্রবীর মণ্ডল

দ্বিতীয় পক্ষ

দিব্যেন্দু দাস



গণ,

রোজ একবালতি মাটা তোলা হইলি ও তৎসহযোগে গরুর স্যানাড সঁটাইয়া নিজধর্মে চুনকালি করিয়া বসিয়া আছ। মনসাভক্ত পিতাকে মেম বিবাহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া পত্র ছাড়িয়াছ। তার উত্তরে তোমায় জানাই, তোমার আর এমুখে হইবার প্রয়োজন নাই। তোমার অনুজ ভানুকে আমার একমাত্র ওয়ারিশ করিয়া দেহরক্ষা করিব। এই বাড়ি, পাতকুয়ো, তোমার মা ও ইলেকট্রিকের মিটার সমেত দু'ঘর ভাড়াটে ভানুর নামে করিয়া যাইব। কবরডাডার দু'কাঠাও ভানুর হইবে। তুমি দয়া করিয়া 'আচার্য' উপাধি ছাড়িয়া 'গান্ধ্যান' বা ঐ প্রকার কিছু রাখিও। আজ হইতে তোমার গোত্র 'আলম্যান' পরিবর্তিত হইয়া 'হনুমান' হইল। ইতি—

তোমার প্রাক্তন পিতা।

ফিল্ডেলকিয়ায় দাদার ঠিকানায় এ চিঠি ছেড়ে দিলাম। দাদা জন্মাবধি অভিমানী, বাবাকে এ চিঠির উত্তর করবে না। আসবেও না। দাদা যাবার পরপরই বাবার ডানদিক পড়ে যায়। এখন বাবা কেবল বামপন্থী। কেন্দ্র করে না দিলে নিজে থেকে কিছু করা অসম্ভব। ওদিকে দাদা দ্বিতীয় চিঠিতেই মেম বিয়ের কুপ্রস্তাব করল বাবাকে। আমিও সুযোগ বুঝে উত্তর ছেড়ে সম্পর্কের গোড়ায় নোড়া মেরে দিলাম। ভাগ্যভাগির সন্তাবনা ভাগিয়ে বাবার সম্পত্তির গোটা ভাগটাই আমার করে নিলাম। এখন দরকার শুধু বাবার সইমারা উইল। কিন্তু মরার সন্তাবনা না থাকলে বাস্তব উইল করে না। শেষ হচ্ছে নাকি শেষ শয্যায় করতে হয়।

এর মধ্যে বাবা কখন কিডনিতে পাথরের সেভিসে একাউন্ট খুলেছিল। ধরা পড়তেই ডাক্তার বলল, আপনার বাবার পেটে মাউন্ট আবু মশাই, উপড়োতে গেলে পেশেন্ট উপড়ে যাবে।

একেই বলে সন্তাবনার জন্ম। জোনাকির যুবক মাস্টারমশাই ক'মাস হল মাইনে নিচ্ছে না। একটা সন্তাবনার জন্ম হল। হরিদাসের বাড়ি আর কারখানা

মিলিয়ে এ-মাসের ইলেকট্রিক বিল এসেছে পঁয়ত্রিশ টাকা। একটা সন্তাবনার জন্ম হল। কাজের মাসি বলল, বৌদি, কাল মমতা সারা পিতিবী বন্দ ডেকেচে গো—। একটা সন্তাবনার জন্ম হল। শীতের মুখে পথের ধারে দুটো কুকুর দু'মুখে হয়ে সারাদিন দাঁড়িয়ে আছে। পনেরোটা সন্তাবনার জন্ম হল। আমি ডাক্তারকে সাহস দিলাম—

আপনি ছুরি-কাঁচি নিয়ে লেগে পড়ুন। শয্যাশায়ী হওয়াই বাবার শেষ ইচ্ছে। এদিকে বাবাকে বললাম, জানি না তোমাকে ভালো করে ফিরিয়ে আনতে পারব কিনা। হাসপাতালে যাবার আগে উইলটা করে যাওয়াই ভালো। বাবা বলল, আমি হাসপাতালেই যেতে চাই না রে।

অসুবিধায় পড়ে বললাম, পাথরে তোমার মৃত্যু নেই বাবা। তুমি নিশ্চই সুস্থ হয়ে ফিরে আসবে। শুধু যাবার আগে...

বাবা বলল, তাহলে না হয় ফিরে এসেই উইল করব। ধীরেসুস্থে। মাকে বল স্ট্রোকেশ শুছিয়ে দিতে।

অপারেশন টেবিল থেকে নেমে বাবা সোজা কোমায় চলে গেল। যে জিনিস গুহায় হলে ধ্যানযোগ, ফুটে হলে মালযোগ, সেই জিনিসই হাসপাতালে হলে কোমা। আছে, আবার নেই। চাঁদার সিজনে গেরস্তের মতো। গায়নির চরিত্রের মতো। আরো উদাহরণ আছে। ভাড়াটেবউ এসে একটু হিং চাইল।—তোমার কাকু কাবুল থেকে এখনো ফেরেনি বাছা। পাশের বাড়ির পিসিমা একটু হাতুড়ি চাইল।—আপনার ছেলের মনে একটা মৌচাক ধরেছিল পিসিমা, সেটা ভাঙতে গিয়ে হাতুড়ি ভেঙে গেছে—।

আমি একটা উইল তৈরি করে বাবার পাশে চব্বিশ ঘণ্টা বসে রইলাম। বাবা ফিরলেই আগে সইটা সেরে নেব। একটা সাঁড়াশি পাঞ্জাবির পকেটে রেখেছি। সই হয়ে গেলেই বাবাকে আবার কোমার গাড়িতে তুলে দিয়ে বাড়ি চলে যাব।

টানা চারদিন বসে মনে মনে বাবাকে ডেকে যাচ্ছি। প্রথম প্রথম 'বাবা' 'বাবা'। তারপর 'বুড়ো' 'বুড়ো'। শেষে 'বজ্রাং', 'বিটকেল', 'বিষাক্ত', 'বেইমান', 'ব্যভিচারী', 'বেহিসাবী'....। পাঁচ দিনের মাধ্যম বাবা চোখ মেলে চাইল। আমাকে দেখেই অতি ক্ষীণ গলায় বলল, ভানু রে, আব বোধহয় বাঁচব না। আমি তাড়াতাড়ি উইলটা বাড়িয়ে দিলাম—বাঁ হাতেই সইটা মেরে যাও বাবা।

বাবা বলল, ডান হাতে করে সিদ্দকে রেখে দিয়েছি।

গুনে চমকে উঠলাম আমি।—দাদাকে অর্ধেক দিলে নাকি?

বাবা ধীর গলায় বলল, সাতের এক ভাগ।

—কেন? সাতের এক কেন বাবা?

—আমার একটা দ্বিতীয় পক্ষ আছে বে। বরানগরে। মা আর পাঁচ মেয়ে। জীবনে ওদের কিছুই দিইনি বাবা। সব দিয়ে তোদের মানুষ করেছি। যাবার সময় ওদের আর বঞ্চিত করব না।

গুনে কাঁপতে কাঁপতে আমিই কোমায় চলে গেলাম।

মারায়ণ

পিনাকীশঙ্কর চৌধুরী



(পূর্ব প্রকাশিত-র পর)

মর্ত্যলোক—১

যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী
ভারতবর্ষ
সেদিন বিধে সে কি কলরব সেকি মা ভক্তি
সেকি মা হর্ষ।

—দ্বিজেন্দ্রলাল।

পূণ্যভূমি আর্যাবর্তের এখন নতুন নাম হয়েছে।
হিন্দুস্তান। এই দেশটা জম্বুদ্বীপের একটা অংশ।
পৌরাণিক পণ্ডিতদের মতে সমস্ত পৃথিবীটা
সপ্তমহাদ্বীপে বিভক্ত। এই মহাদ্বীপগুলোর নাম
ছিল—জম্বু, প্রক্ষ, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক, পুরুষ আর
শাল্মলী। সপ্ত মহাদ্বীপ আজও নিজের নিজের

জায়গায় অটল হয়ে বসে আছে ঠিকই তবে
তাদের সেই পৌরাণিক নামগুলো এখন আর
নেই। নামগুলো বদলে গিয়ে এখন হয়েছে—
এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা,
দক্ষিণ আমেরিকা, সুমেরু আর কুমেরু।

সপ্ত মহাদ্বীপের পৌরাণিক নামগুলো ছিল
এক একটা জিনিসের নাম ধরে ধরে। যেমন
জামের নামে জম্বুদ্বীপ, প্রক্ষ অর্থাৎ কিনা পাকুড়ের
নামে প্রক্ষদ্বীপ, কুশবাসের নামে কুশদ্বীপ, কোঁচ
অর্থাৎ বকের নামে ক্রৌঞ্চদ্বীপ, শাক অর্থাৎ
সেণুনের নামে শাকদ্বীপ, শাল গাছের নামে
শাল্মলী দ্বীপ আর পুরুষ মহাদ্বীপের নাম হয়েছে
যে পুরুষ থেকে সে পুরুষ সারস পাখিও হতে
পারে আবার সাপ হওয়াও বিচিত্র কিছু নয়।

মুনি-ঋষিরা নাকি বলে গেছেন যে এই সাত

কোনটা? কে বলতে পারে?

পণ্ডিতরা কোনো উত্তর দিতে পারেন না।
পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়া করতে লাগলেন।
গোপাল কোথা থেকে একটা বাঁশ নিয়ে এসে
রাজার সামনে পুঁতে দিয়ে বলল—এইখানটা।

পণ্ডিতরা সমস্তবে প্রতিবাদ করলেন—কী
করে তুমি একথা বলছ?

গোপাল বলল—মেপে নাও।

পৌরাণিক পণ্ডিতরা নিশ্চয় গোপালের চেয়ে
বেশি বুদ্ধি ধরতেন। তাঁরা জানতেন যে জম্বুদ্বীপকে
ভুবনকমলের মধ্যকোষ—অর্থাৎ কিনা পৃথিবীর
মধ্যস্থান বলে রায় দিলে, তাতে আপত্তি করার
লোক খুঁজে পাওয়া সেযুগে দুঃসাধ্য ছিল। আবার
শুধু সেযুগই বা বলি কেন, এযুগেও ওই কথাটায়
আপত্তি করার লোক খুঁজে পাওয়া সমান দুষ্কর।

মহাদ্বীপের মধ্যে
জম্বুদ্বীপটির অবস্থান
ভুবন কমলের
একেকোষে।
এর চারদিক ঘিরে
বাকি ছ'টি মহাদ্বীপ।

সে তো হতেই
হবে। সেইসব
পুরাণকার মুনি-
ঋষিরা সবাই যে
ছিলেন জম্বুদ্বীপের
লোক। যে কোনো
লোকই তার নিজের
জায়গাটিকে পৃথিবীর
মধ্যস্থান বলে ভাবে।
তা সেযুগই হোক বা
এযুগই হোক।

একটা এযুগের
ঘটনা মনে পড়ে
গেল। মহারাজ
কৃষ্ণচন্দ্র বাজসভায়
প্রশ্ন রাখলেন—
পৃথিবীর মধ্যস্থান

কেন? পৃথিবীটা কমলালেবুর মতো গোল প্রমাণ হয়ে যাবার পর এখন যে কোনো লোক যে কোনো জায়গায় খুঁটি পুঁতে বলে দিতে পারে—এটাই পৃথিবীর মধ্যখান। কথাটাকে মদত দিচ্ছে জ্যামিতির সূত্র। তাই এটাকে কাটান করা যাবে না।

জম্বুদ্বীপটি ছিল আবার নয় অংশে বিভক্ত। সেই নয়টি অংশ হল ভারত কিংপুরুষ হরি রমণক হিরণ্ময় কুরু ইলাবৃত ভদ্রাশ্ব আর কেছুমাল। এগুলি ছিল এক একটি বর্ষ। বর্ষ মানে অবশ্য বছরও নয় বর্ষও নয়। বর্ষ মানে হল দেশ। ভারতবর্ষ মানে ভারতদেশ।

আন্দাজ করা যেতে পারে জম্বুদ্বীপের এই নয়টি বর্ষ ন'জন রাজচক্রবর্তী'র নামে হয়েছে, যারা এক একটি বর্ষকে শাসন করতেন। ভারতবর্ষ নাম হয়েছে রাজচক্রবর্তী ভরতের নামে। এ ভরত রামের ভাই ভরতও নয় কিংবা ভরত নামে এদেশে যত নেতা জন্মেছে এবং মরেছে তারাও কেউ নয়। এ ভরত দুমন্ত-শকুন্তলার ছেলে ভরত।

জম্বুদ্বীপে ছিল জম্বু নদী। সে নদী এখন আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। তবে ভারতবর্ষে আছে গঙ্গানদী। আর এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত ছিল সিদ্ধনদ। সিদ্ধনদ এখন আর ভারতবর্ষে নেই। কিন্তু ভারতবর্ষের নামটা হিন্দুস্তান হবার পেছনে এই সিদ্ধনদের অবদান যে শতকরা একশ ভাগ সেটা এখন একটা ইস্কুলের ছাত্রও জানে।

সবাই জানে ভারতের নদীমাড়ক সভ্যতা বিস্তার লাভ করেছে উত্তর পশ্চিম দিক থেকে। ওই অঞ্চলে প্রথম অধিবাসী ছিল দ্রাবিড়রা। পরে আর্যরা এসে তাদের দক্ষিণে হটিয়ে দিল। আর্যদের পিছে পিছে এল শক হুন কুষাণ পাঠান মোগল গ্রীক, আরো অনেক জাতি। এরা সবাই এসেছিল পামীর মালভূমি পার হয়ে হিমালয়ের সঙ্কীর্ণ গিরিপথগুলির ভিতর দিয়ে। পাহাড় পার হয়ে সমভূমিতে পৌঁছে প্রথমেই তাদের চোখে পড়ল বিশাল সিদ্ধনদ। সিদ্ধ কথটা মুখে মুখে হয়ে গেল হিন্দু। সেই হিন্দু থেকেই হিন্দুস্তান। আর যে পাহাড় পার হয়ে তারা এসেছিল সেটা হিন্দুকুশ।

এরপর এল ইউরোপীয়নরা। কিন্তু তারা গিরিপথ দিয়ে এল না। তারা এল সমুদ্রপথে। তাদের মুখে আবার হিন্দু থেকে হিন্দু আর তাই থেকে ইউরোপ।

এইসব সকলের জানা কথাগুলো আবার নতুন করে বলার কিছু নেই। ভারতবর্ষে বিদেশিরা তো শুধু উত্তর-পশ্চিমের গিরিপথ আর দক্ষিণ-পশ্চিম দক্ষিণ-পূর্বের সাগরপথ দিয়েই আসেনি। কিছু কিছু বিদেশি তো উত্তর-পূর্ব দিক দিয়েও ঢুকছিল। ইতিহাসের প্রবাহগতিতে এদিক থেকে আসা তাই কিংবা মঙ্গোলীয়ানরা ভারতের পশ্চিম কিংবা দক্ষিণ দিকে এগিয়ে যেতে পারেনি। যদি পারত তবে ভারতের নামটা হিন্দুস্তান না হয়ে হম্পুবটও হয়ে যেতে পারত।

ভারতের উত্তর-পূর্ব দিকের বিরাট নদীটার নাম এদেশে ব্রহ্মপুত্র হলেও গোড়ার দিকটায় তিব্বত অঞ্চলে এর নাম ছিল সম্পু অর্থাৎ পবিত্র। তাই মঙ্গোলীয়ানরা ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তার করলে সম্পু কথটা লোকের মুখে মুখে হয়ে যেত হম্পু। পূর্বদেশের লোকেরা এমনিতেই স-কে হ উচ্চারণ করে। আর আরবী বা উর্দুতে যেমন বাসস্থান বোঝাতে স্থান কথটা ব্যবহার হয় তেমনই তাই-দের ভাষায় বাসস্থানকে বলা হয় বড় বাচ বট। তাদের বাসভূমি তাইবট আর তা থেকেই তিব্বত তিব্বত। সেই একই রকম অর্থ এবং শব্দ বিন্যাস করে ভারতবর্ষের নাম হয়ে যেত হম্পুবট বা ওইরকম একটা কিছু।

তা সে যাকগে। যে ঘটনা ঘটেনি তার জন্যে চোখের জল ফেলে লাভ নেই। ভারতবর্ষের আধুনিক নাম হিন্দুস্তান। আর সেটাই মেনে নেওয়া গেল।

যীশুখ্রিস্টের জন্মের প্রায় সাড়ে উনিশশো বছর পরে দেশের লোকগুলো ইউরোপীয় শাসকদের এদেশ থেকে তাড়াবার তাড়ায় মাথা গরম করে

নিজেদের মধ্যে মারামারি আরম্ভ করে দিল আর তার ফলে দেশটা দু'ভাগ হয়ে গেল। একভাগ হিন্দুস্তান অন্যটা পাকিস্তান।

আরবী ভাষায় পাক মানে নাকি পবিত্র। তাই পাক-ই-স্তান মানে হল পবিত্রভূমি। কিন্তু ওদিকে ইংরেজি ভাষায় আবার ওই পাক (Puck) কথটার মানেটা খুব একটা সুবিধের নয়। Puck মানে হল Evil spirit, দুষ্টভূত বা দুষ্ট ছেলে। দেশটার জন্মের পর থেকে এই সময় পর্যন্ত পাকিস্তানের শাসকরা যা করে এসেছে আর করে চলেছে তাতে করে বোধহয় ওই 'দুষ্টভূত' কথটাই তাদের পক্ষে বেশি যুতসই হয়।

সে তো গেল এক কথা। কিন্তু মজাব কথাটা হল এই যে, যে সিদ্ধনদের নামে দেশটার নাম হিন্দুস্তান, দেশ ভাগাভাগির সময় সেই নদটাই থেকে গেল হিন্দুস্তানের বাইরে। ভাগাভাগির সূত্রটা বোধহয় এইরকম ছিল যে—একদল নেবে নামটা, অন্যদল নেবে আসল নদটা। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডব আর কৌরবদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে টানাটানির সময় যেমন হয়েছিল—পাণ্ডবরা পেয়েছিল শ্রীকৃষ্ণকে আর কৌরবরা পেয়েছিল শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণী সেনাকে।

এর কিছুদিন পরে আবার পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে গেল বাংলাদেশ। তারা নামও পেল না নদও পেল না। তবে তাতে তাদের দুঃখ নেই। সিদ্ধনদ না পেলেও গঙ্গানদীর পূণ্য সলিলে তারা হাবুডুবু খায়। পূণ্য সলিলের অবশ্য একটা অসুবিধে হল এই যে সে সলিল যতই পূণ্য হোক না কেন মুখে ঢুকে গেলে কিন্তু নাকানি চোবানি খাওয়াতে কিছু কম যায় না। এমনকি লাশও ভাসিয়ে দিতে পারে। আর সেটাই হয়ে আসছে বছরের পর বছর।

এ ছেন তিন ফালি হয়ে যাওয়া ভারতবর্ষে যে ফালিটার নাম হিন্দুস্তান তারই উত্তর দিকে তমসা নামে একটা পূণ্যতোয়া নদী আছে। নামে পূণ্যতোয়া হলে কি হবে কামে শূন্যতোয়া। চাষের জমিতে জল দেওয়া আর জলবিদ্যুৎ তৈরির নামে এখানে ওখানে বাঁধ বেঁধে নদীর জলস্রোতের বারোটা বাঁজিয়ে দেওয়া হয়েছে। নদী এখন আর আপনবেগে পাগলপা বা নেই। 'মরুপথে হারাল ধারা' হয়ে গেছে। তবে হ্যাঁ, বর্ষার সময় যখন লকগেটগুলো খুলে দেওয়া হয় তখন সেই শূন্যতোয়াই হয়ে যায় বন্যাবোয়া। বন্যার জল তোড়ে বইতে থাকে আর সবকিছু ধুয়ে মুছে নিয়ে বেরিয়ে যায় মাঠ ঘাট ডুবিয়ে ঘরবাড়ি ভাসিয়ে মানুষজন পণ্ডপ্রাণী মেরে। সে এক হৈ হৈ রৈ রৈ ভৈরব কাণ্ড।

বিশেষ কোনো একটা নদী বলে নয়। এই কাণ্ডটা হিন্দুস্তানের সব নদীতেই হয়। সে নদীতে লকগেট থাকলেও হয় না থাকলেও হয়। বন্যাই যদি না হল, বন্যার তোড়ে মানুষজন গরুমহিম বাড়িঘর সবকিছু যদি ভেসেই না গেল তবে আর হিন্দুস্তানি নদী কি? তফাতের মধ্যে শুধু এইটুকুই যে লকগেট না থাকা নদীতে বন্যা হয় প্রকৃতির খেয়ালে আব লকগেট থাকা নদীতে বন্যা তৈরি করে মানুষ। জেনে বুঝে।

হিন্দুস্তানি নদীতে এইরকম এক একটা বন্যা শেষ হয়ে যাবার পর শুরু হয় আরেক বন্যা। টাকার-বন্যা, নেতাদের ভাষণের বন্যা, অফিসারদের টার-এর বন্যা। বন্যাত্রাণ বাবদ সরকার থেকে অনুদান দেওয়া হয় কোটি কোটি টাকা। সেই টাকার বখরা নেবার জন্যে শুরু হয়ে যায় নেতা চামচা অফিসার ঠিকাদারদের লুটপাটের মোচ্ছব। ওয়াদের চলে মোচ্ছব আর যাদের ঘরবাড়ি ভেসে যায় তারা মুখে বা হাতের বুড়ো আঙুলটি পুরে দিয়ে চেয়ে চেয়ে সেটা দেখতে থাকে।

পিতৃপুরুষের সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধের মতো এইসব অর্থশ্রাদ্ধ প্রতিবৎসর নিয়ম করে হয়। তাতে প্রতিবৎসরই কিছু বেচারি-হিন্দুস্তানি নিয়ম করে মরে আর কিছু রইস হিন্দুস্তানির আমানতের টাকা, লকারের সোনা আর বিদেশি

ব্যাধি ডলারের শ্রীবৃদ্ধি হয়।

ওইসব শ্রাব্দ শ্রীবৃদ্ধির বৃগুস্ত আজকের প্রতিবেদনের প্রতিপাদ্য বিষয় নয়, তাই ওই প্রসঙ্গে এখানেই দাঁড়ি টানছি। তার চেয়ে আসুন তমসা নদীর ধারে দাঁড়িয়ে তার শোভা নিরীক্ষণ করি।

আমরা যেখানটায় দাঁড়িয়ে আছি সেই জায়গাটা প্রকৃতির অকুপন দাক্ষিণ্যের গুণে বড়ই মনোমুগ্ধকর। নদীর ধার বরাবর একটা সুন্দর বাগান। বাগানে অনেক ফল-ফুলের গাছ। ফলের গাছে ফুল, ফুলের গাছে ফল সবই হয়। বিধাতার বিধান। ফল ছাড়া ফল নেই, ফুল ছাড়া ফল হয় না। বড় থেকে ছোট সব গাছেবুই ওই ব্যবস্থা। অবশ্য বনস্পতি বাদে। বনস্পতিতে নাকি ফুল ছাড়াই ফল হয়। মনু বলে গেছেন—অপুস্পাঃ ফলবন্তো যে তে বনস্পত্যঃ স্মৃতাঃ।

বাগানের মধ্যে খানকয়েক মাটির ঘব। মাটির ঘর, খড়ের চাল, নিকানো দাওয়া, ঝাঁটানো উঠান। উঠানের একপাশে তুলসি মঞ্চ, চারপাশে গুলঞ্চর বেড়া। সবকিছুই পরিপাটি সাজানো। ছবির মতো পরিচ্ছন্ন ছিমছাম স্বর্গীয় পরিবেশ। এরকম একটা বাসস্থানকে আগেকার দিনে লোকে বলত তপোবন। আজকাল তপোবন কথাটা চালু নেই। আবার বাগানবাড়ি বললেও বড্ড খেলো শোনায়। বলা যাক আশ্রম।

এই আশ্রমটা এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের। একাই থাকেন। বৌ-বাচ্চা নেই। ভদ্রলোক চুল-মাড়ি কামান না। আশ্রমের অন্য গাছ-গাছালির মতো চুল-মাড়িগুলোও ইচ্ছেমতো বেড়েছে। তবে গাছের সঙ্গে ওদের তফাৎ এই যে,

যে সিঙ্কনদের নামে দেশটার নাম হিন্দুস্তান,
দেশ ভাগাভাগির সময় সেই নদটাই থেকে
গেল হিন্দুস্তানের বাইরে। ভাগাভাগির সূত্রটা
বোধহয় এইরকম ছিল যে—একদল নেবে
নামটা, অন্যদল নেবে আসল নদটা।

গাছে ফুল ফোটে ফল ধরে। কিন্তু দাড়িতে ফুলও নেই ফলও নেই। তবে গাছের ডালে যেমন পাখি বাসা সেইরকম ওই লম্বা লম্বা চুল-মাড়িতে খুঁজলে দু-একটা উকুন—না সম্মানীয় লোকের সম্বন্ধে এরকম কথা বলা উচিত নয়। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে চুল-মাড়ি পেকে সাদা হয়ে গেছে। পাকা চুল-মাড়িতে ভদ্রলোককে সাধু-সম্যাসীর মতো দেখায়। দেখতে সাধু-সম্যাসী, কাজেও তাই। উনি কোনো অফিসে দশটা পাঁচটা হাজির দিয়ে কলমও পেনে নেন না, কোনো কারখানায় শিফটের ডিউটিতে মেশিনও চালান না। রোজগার বলতে ওই বাগানের ফলমূল আর কিছু থাইভেট টিউশনি। থাইভেট টিউশনি বলতে অবশ্য অল্প ইংরেজি শেখানো কিংবা পরীক্ষার সময় সাজেশন বিক্রি নয়। উনি ওঁর ছাত্রদের শেখান যোগা ভ্যাস আর সেইসঙ্গে কিছু জাপানি জুজুৎসু।

যোগাভ্যাসের সঙ্গে জাপানি জুজুৎসু জিনিসটা ঠিক খাপ খাওয়ার কথা নয়। কিন্তু একেত্রে খেয়ে গেছে। কারণটা যথাসময়ে প্রকাশ করা যাবে। ভদ্রলোক বাইরের কারো সঙ্গে খুব একটা মেলামেশা করেন না। কারো

সাথেপাচে থাকেন না, কোনো প্যাচে তো একেবারেই না।

না, ভুল বললাম। প্যাচে যে একেবারেই নেই তা নয়। একটু নিশ্চয় আছে। তবে সেটা কোনো মারপ্যাচও নয়, ল্যাজে খেলার প্যাচও নয়। ওঁর প্যাচ হল জুজুৎসুর প্যাচ।

জুজুৎসু হল একটা জাপানি কায়দা। জাপানি ভাষায় জু মানে ভদ্র আর জুৎসু মানে দক্ষতা। দুয়ে মিলে ভদ্র দক্ষতা। অর্থাৎ এই কায়দায় খালি হাতেই প্রতিপক্ষের এমনকি সশস্ত্র প্রতিপক্ষেরও মোকাবিলা করা যায়। এর অন্তর্নিহিত কৌশলটা হল হঠাৎ আক্রমণে অবাক না হয়ে যাওয়া। The best defence against a surprise attack is not to be surprised. সেইসঙ্গে কায়দা করে প্রতিপক্ষের ক্ষমতা এবং ওজ্জন—দুটোকে তারই বিপক্ষে ব্যবহার করা। সে সব করতে গেলে প্যাচ খেলার দরকার তো আছেই। সেই জন্যেই বলা হয় জুজুৎসুর প্যাচ। উনি ছাত্রদের সেটাই শেখান।

সেইসঙ্গে মুখচোখ চুলদাড়িতে ঢেকে রেখে ভদ্রলোক যেন অনেকটা লুকিয়ে থাকার মতো থাকেন। এরকম লুকিয়ে থাকার কারণ একটা আছে। যোগাভ্যাসের সঙ্গে জুজুৎসুর খাপ খাওয়ার মতো এরও একটা পুরনো ইতিহাস আছে।

পূর্বকথা

মর্ত্যলোক -২

মুক্তবেণীর গঙ্গা যথায় মুক্তি বিতরে রঙ্গে।

আমরা বাঙালি বাস করি সেই বাঙালি ভূমি বঙ্গে।।

—সত্যেন্দ্রনাথ।

তমসা নদীর ধারে আশ্রম বানিয়ে চুলদাড়িতে মুখচোখ ঢেকে যে ভদ্রলোকটি বাস করেন, যৌবন বয়সে, কিংবা বলা যায় তরুণ বয়সে তিনি ছিলেন একটি নামি গুপ্তাদলের দামি পাণ্ডা। দামি এবং সেই সঙ্গে পুলিশের খাতায় দাগিও বটেন। তবে সেটা এখানে নয়। এখান থেকে অনেক দূরে, বঙ্গদেশে।

বঙ্গদেশটা আবার কোথায়?

গঙ্গাদেবী যখন স্বর্গ থেকে লাফ দিয়ে পৃথিবীতে নামলেন তখন কতিন পাথরে আছড়ে পড়ে হাতেপায়ে যাতে চোট না লাগে তার জন্যে গদি পেতে দেওয়া হয়েছিল। সেই গদিটা ছিল শিবের জটা। কথিত আছে শিবের জটার নরম গদিটি গঙ্গাদেবীর এতটাই ভালো লেগে গেছিল যে তিনি নাকি ওখানেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ওদিকে আবার পৃথিবীতে গঙ্গাদেবীকে খুব দরকার। তাই শেষ পর্যন্ত শিবের জটার গদি ছিঁড়েঝুঁড়ে গঙ্গাদেবীর ঘুম ভাঙিয়ে তাঁকে পৃথিবীতে নামিয়ে আনা হল। এই কাজটি করেছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ইঞ্জিনিয়ার ভগীরথ। এই ভগীরথই অনেক কষ্ট করে অনেক পাহাড় মাটি কেটে গঙ্গাকে বইয়ে নিয়ে গেলেন সাবা উত্তর ভারতের ওপর দিয়ে। গঙ্গানদী শেষ পর্যন্ত গিয়ে মিলল বঙ্গোপসাগরের সঙ্গে। যে অঞ্চলে এই মিলটা ঘটেছিল সেই দেশটার নামই বঙ্গদেশ।

সংস্কৃতে বঙ্গ ইংরেজিতে বেঙ্গল। দেশটার নাম যে ইংরেজিতে বেঙ্গল সেটা সব বাঙালিই জানে। কিন্তু বাংলায় দেশটার যে কী সেটা কেউই জানে না। জানবে কী করে? বাংলায় যে দেশটার কোনো নামই নেই। ওনতে অবাক লাগলেও কথাটা সত্যি।

আপনি যার নাম জানেন না তাকে খোকা বলে ডাকতে পারেন, সোনা বলে ডাকতে পারেন, আবার চাঁদু বলে ডাকলেও আপত্তি কিছু নেই। বঙ্গদেশেরও সেই অবস্থা। যে যা খুশি সেই নামে ডাকে। দেশটার নাম বঙ্গদেশ ছিল বোধহয় সেই মহাভারতের যুগে। তারপর পাণ্ডবরা চলে গেছে

মহাপ্রস্থানে আর বঙ্গদেশ নামটাও চলে গেছে চির নির্বাসনে। এখন বঙ্গ কথাটা আছে শুধু হিন্দুস্তানের জাতীয় সঙ্গীতে। কিন্তু হিমাচল যমুনা গঙ্গা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ। কিন্তু সে বঙ্গটা কোথায়? ম্যাপে তো বঙ্গ বলে কোনো দেশের নাম খুঁজে পাওয়া যাবে না। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি। স্রেফ ভ্যানিশ। ম্যাপহীন মাপহীন দেশ।

ইতিহাস খুঁজলে দেখা যায় কোনো এক সময় দেশটার নাম হয়েছিল গৌড়। তবে কেউ কেউ বলে সেইযুগে এদেশের লোকেরা গুড় তৈরি করে বিদেশে রপ্তানি করত। হরেক রকম গুড়। আশের গুড় তালের গুড় খেজুরের গুড়। আঠা গুড় চাঠা গুড় মাঠা গুড়। বোলা গুড় ঘোলা গুড় তোলা গুড়। গুড় করেছে গৌড় বঙ্গ আদিম সভ্যদেশ। ... সেই গুড়তেই মিশ্রি করে, ধন্য হল মিশর ওরে, সেই গুড়তেই করল চিনি চিনি যে অবশেষ। কথাটা ছন্দের জাদুকর সত্যেন দত্তের।

গৌড়ের সেই রমরমার দিন হর্ষবর্ধনের আক্রমণে মাঝপথেই শেষ হয়ে গেছিল। সেই আক্রমণেই গুড় তৈরির সব কারখানা ছারখার। না হলে গৌড়বাসীরা নারকেল থেকে কিংবা তুলসি থেকেও গুড় বানিয়ে বসত। ভগবানের অশেষ কৃপা যে শেষ পর্যন্ত সেটা আর হয়ে ওঠেনি।

একেকবারে অব্যবহৃত কালে দেশটার নাম পাওয়া যায় বাংলা। কিন্তু ডাক্তার কি পরিহাস। হিন্দুস্তান থেকে পাকিস্তান আলাদা হয়ে যাবার সময় এই বাংলার একটা বৃহত্তর অংশ পাকিস্তানে চলে গেছিল পূর্ব পাকিস্তান নাম নিয়ে। আবার ওই পূর্ব পাকিস্তানটাই পাকিস্তান থেকে আলাদা হবার সময় নাম নিয়ে নিল বাংলাদেশ। সেটা ভারতের তথা হিন্দুস্তানের বাইরে। তার মানে যে বাংলাটা হাজার বছর ধরে ভারতের মধ্যে ছিল সেটা কোনোরকম রপ্তানি-অনুমতি ছাড়াই, এমনকি একটি পাইপের পর্বন্ত বিদেশি মুদ্রা অর্জন না করেই বিদেশে রপ্তানি হয়ে গেল।

বাংলাদেশ নামটা হাতছাড়া হয়ে যাবার পর বাংলার যে অংশটা হিন্দুস্তানে আটকে রইল সেখানকার লোকেরা প্রথমে কিছুদিন খুব তড়পাল।—ওরা কেন আমাদের বাংলাদেশ নামটা নিয়ে নেবে? ওরা একাই কি পুরো বাংলাদেশ? আমরাও তো আছি। কিন্তু সেসব তড়পানি হালে খুব একটা পানি পেল না। হিন্দুস্তানের বাকি অংশের লোকেরা সেসব চিৎকারে খুব একটা কান দিল না। চিৎকারটা আস্তে আস্তে মিিয়ে গেল। ব্যাপারটা সবাই মেনে নিল। আর হিন্দুস্তানে থাকা বাংলার লোকেরা তাদের নিজের দেশের নাম নিয়ে নিল পশ্চিমবঙ্গ।

সেখানেও কপাল পোড়া। তুমি যাও বঙ্গে কপাল যায় সঙ্গে। বাংলায় যদি নাম হল পশ্চিমবঙ্গ তো ইংরেজিতে ওয়েস্ট বেঙ্গল আর হিন্দিতে পশ্চিম বংগাল। সব রাজ্যের প্রতিনিধিদের নিয়ে রাজধানী দিল্লিতে যখন কোনো সভা বসে তখন বঙ্গদেশের প্রতিনিধিদের জন্যে নির্ধারিত আসনে বড় বড় হরফে লেখা থাকে হয় ইংরেজিতে ওয়েস্ট বেঙ্গল নয়ত হিন্দিতে পশ্চিমবংগাল। পশ্চিমবঙ্গ কোথাও লেখা থাকে না।

শুধু কি তাই? প্রথম অক্ষরের ক্ষমপর্যায় হিসেবে যখন বিভিন্ন রাজ্যের বক্তাদের তাদের বক্তব্য রাখার জন্যে ডাক পড়ে তখন নামের প্রথম অক্ষরটি ইংরেজিতে ডাব্লু হবার সুবাদে পশ্চিমবঙ্গের ডাক পড়ে সবার শেষে। বেচারী পশ্চিমবঙ্গ। সবার পিছে সবার নিচে সবহারাদের মাঝে। ততক্ষণে সভা শেষ হবার মুখে। মহামান্য সভারা আর কারো বক্তৃতা শোনার মুডে নেই। সবাই উসখুস করছে কখন লাঞ্চ ব্রেক হবে।

দেশটার নাম নিয়ে হিন্দুস্তানিদের এই চোর-পুলিশ খেলাটা বন্ধ করার জন্যে কোনো বঙ্গবাসী বীরকে আজ পর্যন্ত কোনো প্রতিবাদ করতে শোনা যায়নি। প্রতিবাদের যুক্তি তো দেওয়া যেতেই পারে। উত্তর প্রদেশ তো

ইংরেজিতে নর্থ প্রভিন্স হয় না, মধ্যপ্রদেশ তো ইংরেজিতে মিডল প্রভিন্স হয় না। তাহলে পশ্চিমবঙ্গ ওয়েস্ট বেঙ্গলই বা হবে কেন অথবা পশ্চিমবংগাল বা হবে কেন? আর পাঞ্জাবের পূর্বাংশ, যেটা নাকি এক সময় পেপসু বলে খ্যাত ছিল সেও তো তার খোলস ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পাঞ্জাব হয়ে গেছে। তাকে এখন পূর্বপাঞ্জাব বলে ডাকে কোন বাপের ব্যাটা।

গ্রামের একটা ছেলের নাম ভজ্জহরি। একদিন কয়েকজন তার বাড়ি গিয়ে বাইরে থেকে ডাকছি—ভজ্জা আছিস? তার মা তেড়ে বেরিয়ে এসে ঝাপড় লাগাল—কে আমার ভজ্জকে ভজ্জা ভজ্জা বলে ডাকছিস রে। অশিক্ষিত চাষী বৌয়ের যতটুকু বোধজ্ঞান, বাঙালি আতেলদের সেটুকুও নেই।

বঙ্গদেশের লোকেরা জলে কাদাম মানুষ। গঙ্গানদীর জল আর তার পলিমাটি। থাকার ইচ্ছে ছিল দুধে ভাতে। ঈশ্বরীর প্রার্থনাও ছিল সেটাই—আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে। কিন্তু সে বাড়ি ভাতে ছাই। দুধভাত তো দূরের কথা নুনভাতই জোটে না। কারো কাছে কোনো সুসংবাদ পেলে বাঙালিরা বলে—তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। ওই দুটো জিনিসই যা-একটু সস্তায় পাওয়া যায়। বাংলার বাইরে অন্য হিন্দুস্তানিরা (বাঙালিরাও অবশ্যই হিন্দুস্তানি) এ অবস্থায় বলে—তেরা মুহুমে ঘি শক্কর। অর্থ বুঝতে অসুবিধে হবার কথা নয়। হিন্দুস্তানিরা তো মুখে ঘি আর চিনি জুগিয়ে দিল। এদিকে বাঙালির শুভকামনায় মুখে যে দুটি বস্ত্র চড়ানো হল তার কোনোটিই খাদ্য হিসেবে উপাদেয় তো নয়ই বরং খুবই অশুভ। মুখে ফুল আর চন্দন দুটোই দেওয়া হয় মরা লোককে। যখন সে আর লোক থাকে না, লাশ হয়ে যায়। বোঝা লোক যে জানো সন্ধান।

আসলে বঙ্গবাসীর সহজ সরল সত্য বর্ণনাটা হল—তৈল মাখা স্নিগ্ধ-তনু নিদ্রারসে ভরা, বহরে ছোট মাথায় বড় বাঙালি সন্তান। একটাই গুণ। বড্ড ঘুমায়। সত্যি নাকি। বলে লোকে ঘুমায় বলতে বলতে। জাগায় কার বাপের সাধ।

বঙ্গবাসীরা মাঝে মাঝে জেগে ওঠে না যে তা নয়। জেগে ওঠে। আর জেগে উঠেই তুলকালাম বাধিয়ে দেয়। ঘুম থেকে জেগে উঠে তুলকালাম বাধিয়ে দেওয়া অবশ্য বঙ্গবাসীদের কোনো খাশ কপিরাইট নয়। পৌরাণিক কাল থেকেই এটা একটা হিন্দুস্তানি পরম্পরা।

প্রলয়কালে স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু কারণ-সমুদ্রে অনন্তনাগকে শয্যা রূপে বিস্তৃত করে ষোণনিদ্রায় নিদ্রিত ছিলেন। মধু আর কৈটভের অত্যাচার-ভীত হয়ে ব্রহ্মা অনেক কাকুতি-মিনতি করে তাঁর ঘুম ভাঙলেন। ঘুম থেকে জেগে উঠেই বিষ্ণু মধু আর কৈটভের সঙ্গে বাধিয়ে দিলেন যোরতর যুদ্ধ। সেই যুদ্ধ নাকি চলেছিল পাঁচ হাজার বছর ধরে। কী সাংঘাতিক। তার পরের ঘটনা তো সকলোই জানে। বিষ্ণু দুই অসুরকে তাঁর জন্তুখার উপরে রেখে সুদর্শন চক্র দিয়ে কেটে ফেললেন। আর তাদের মেদ থেকেই সৃষ্টি হল পৃথিবী। যে জন্যে পৃথিবীর আর এক নাম মেদিনী।

এ যুগে রিপ ভ্যান উইঙ্কলও কুড়ি বছর একটা পাহাড়ের ওহাম ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু ঘুম ভেঙে উঠে ভেমন কিছু করতে পারেনি। উঠে তার ঘুমিয়ে থাকা কুড়ি বছরে তার নিজের গ্রামটার পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে, না পেলে বেশ ঘাবড়ে গেছিল। বোধহয় এইজন্যেই যে লোকটা হিন্দুস্তানি ছিল না। হিন্দুস্তানি হলে হয়ত একটা মার মার কাট কাট লাগিয়ে মিত।

যুগ পরম্পরায় কোনো কোনো মহিলা অসময়ে ঘুমিয়ে পড়েই কিছু কিছু কেলোর কীর্তি বাধিয়ে বসেছিলেন। ত্রেতার অযোধ্যাপুরীতে সীতা দেবী যখন পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা তখন একদিন মেয়ে মহলে বসে গল্প করতে করতে তাঁর অন্যান্য জা এবং সখীদের অনুরোধ ফেলতে না পেয়ে মাটিতে খড়ি

দিয়ে রাবণের ছবি এঁকেছিলেন। সেই অবস্থায় তাঁর খুব ঘুমও ধরেছিল। অলস শরীরে মাটিতেই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। “গর্ভবতী নারীর হাই ওঠে সর্বক্ষণ। সদাই অলস সীতা ভূমিতে শয়ন।”—(কুন্তিবাস)। আর শুলেন তো শুলেন সেই নিজের হাতে আঁকা রাবণের ছবির পাশেই। কপাল গুণেই সেই সময়েই রাম এলেন জেনানা মহলে। রামকে আসতে দেখে অস্ত্রপূরিকারা ‘সবাই দুদ্ধাড় করে পালিয়ে গেল। ওদিকে সীতাকে ওই অবস্থায় দেখে রামের মনে ঘোর সন্দেহ দানা বাঁধল। —“সীতা পার্শ্বে দেখে রাম রাবণ লিখন। সত্য অপমণ মম করে সর্বজন।।” (কুন্তিবাস)। একটু আগেই দূত মুখে শুনেছেন এতদিন রাবণের ঘরে কাটিয়ে এসেও সীতা অপাপবিদ্ধা আছেন কিনা তাই নিয়ে প্রজারা কানামুখ্য করছে। কথাটাকে রাম প্রথমে খুব একটা আমল দিতে চাননি। কিন্তু সীতাকে ওই অবস্থায় ঘুমিয়ে থাকতে দেখেই তিনি মনে মনে ইতিকর্তব্য ঠিক করে ফেললেন—সীতাকে ত্যাগ করবেন। জনম দুখিনী সীতা জ্ঞানতত্ত্ব পারলেন না তাঁর কী অপরাধ।

এসব তো গেল হিন্দুস্তানি মহিলাদের ব্যাপার। ওদিকে আবার ঠিক উল্টোটা ব্যাপারও হয়েছিল এক অহিন্দুস্তানি মহিলার ক্ষেত্রে। রাতেরবেলা ঘুমিয়ে না পড়ার দৌলতে তিনি প্রাণে বেঁচে গেছিলেন। বেগমদাদের এক খলিফা বেগমকে তাঁর নিজেরই এক সেনাপুরুষের সঙ্গে আপত্তিকর অবস্থায় দেখে ফেলার ফলে এতই ক্ষিপ্ত হয়ে গেছিলেন যে, সেই দণ্ডে বেগম আর সেই সেনাপুরুষের মুণ্ডু তো নিশেনই সেই সঙ্গে ঠিক করলেন তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যায় একটি করে মহিলাকে শাদি করবেন আর পরদিন সকালেই তাকে কেটে ফেলবেন।

কি সাংঘাতিক অবস্থা! প্রতিদিন সন্ধ্যায় আমীর ওমরাহদের ঘর থেকে একটি করে সুন্দরী কন্যা ভেট আসে আর পরদিন সকালে তার মৃত্যু। এ যেন সেই একচক্রা নগরে বকরাঙ্কসের খাবার জন্যে এক একদিন এক একটি ঘর থেকে লোক পাঠানোর মতো অবস্থা। রাজ্যময় হাহাকার।

একচক্রা আর বাগদাদ। হাহাকার দু’দেশেই। তবে দু’দেশের দুটো ঘটনার মধ্যে পার্থক্য একটু ছিল। একটু নয়, অনেক। একচক্রার ঘটনাটা ছিল রাক্ষসকে খাবার যোগানোর ব্যাপার। যাকে বলে রাক্ষুসে কারবার। কিন্তু বাগদাদের ব্যাপারটা অন্যরকম। সঙ্কল্প বিয়ে, ফুলশয্যা, প্রেম-প্রেম খেলা। তারপর রাতের কাজকর্ম। আর সকাল হলোই কোতল। এরকম ঘটনা শুধু মানবজাতির ইতিহাসেই নয়, পৃথিবীর সমগ্র প্রাণীকুলের ইতিহাসেই বিরল।

বৈজ্ঞানিকরা বলেন এক প্রজাতির মাকড়সা আছে যাদের রমণক্রিয়া হয়ে যাবার পর স্ত্রী মাকড়সা পুরুষ মাকড়সাটাকে খেয়ে ফেলে। ওই একটি প্রজাতির ওই একটিই উদাহরণ। বাদশাহের কাজটাও অনেকটা ওইরকম। তবে বাদশাহের সঙ্গে মাকড়সার তফাৎ এইটুকুই যে এক্ষেত্রে হত আর হত্যাকারীর লিঙ্গ বিপরীত।

বাদশাহের এই পাগলামোর হাত থেকে সেদেশের লোকেরা কী করে রক্ষা পেয়েছিল সেটাও এক ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কাহিনী আর কাহিনীটিকে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ করে তুলেছে শেক্সপীয়ারের একটি ঘুমিয়ে না পড়ার ঘটনা। এক মহিলা সারারাত জেগে বাদশাহকে এমন গল্প শুনিতে গল্পের মাঝখানেই সকাল করিয়ে দিলেন যে গল্পের শেষটুকু শোনার জন্যে তাকে হত্যা করা একদিন পিছিয়ে দিতে হল। সেই একই কায়দায় পরের রাতও সকাল হল একটা গল্পের মাঝপথে। মৃত্যুদণ্ড পিছিয়ে গেল আরো একদিন। এই করতে করতে পার হয়ে গেল এক হাজার রাত। শেষ পর্যন্ত বেগমের মৃত্যুদণ্ড মকুব হয়ে গেল।

যেহে জেগে থাকার ফলেই প্রাণ রক্ষা। শুধু প্রাণ রক্ষাই নয়। সেইসঙ্গে সৃষ্টি হল এক মহান সাহিত্য কীর্তি। আরব্য উপন্যাসের সহস্র রজনীর গল্প।

সুতরাং ঘুমিয়ে থাকটা একেবারে মুখের কাজ। তাই বিশ শতাব্দীর অর্ধেকটা পার হয়ে আরো কয়েকটা বছর ঘুমিয়ে পার করার পর বঙ্গদেশের বাঙালিরা হঠাৎ জেগে উঠেছিল। জেগে উঠেই এক তুলকালাম কাণ্ড। জবরদস্ত আন্দোলন। তার নাম হল নকশাল আন্দোলন। সে এক অদ্ভুত মারামারি। নকশাল বাড়িনামের একটা গ্রামে কিছু কৃষক তীর চালিয়ে জমির মালিককে মেরে ফেলল। ব্যস! শুরু হয়ে গেল নকশাল আন্দোলন। দেশের সব শ্রেণীশত্রুকে খতম করে তারা নাকি সর্বহারাদের জন্যে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করবে।

প্রথমে কাটা হল কিছু পাথরের মূর্তির মুণ্ডু। দেশের লোকেরা এখানে ওখানে রাস্তার মোড়ে আর পার্কে কিছু মনীষী মহাপুরুষদের মূর্তি বানিয়ে রেখেছিল। রেখেছিল তাদের স্মৃতিকে সম্মান জানানোর জন্যে আর পরবর্তী প্রজন্মকে তাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে। নব্য আন্দোলনকারীদের চোখে এটা হল একটা প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্ত। তাই প্রথমেই কাটা হতে লাগল তাদের মুণ্ডু। পরপর মুণ্ডু কাটা হয় আর বাঙালি মনীষীরা লাইন দিয়ে হয়ে যেতে থাকে এক একটি কপিল। রাজা’না হরোঁ রাজা।

এই করে করে নব্য আন্দোলনকারীরা হাত পাকাল। তারপর কাটা শুরু হল আসল মুণ্ডু। প্রথম চোটে খতম হল কিছু মাঝারি মাপের নেতা, তারপর কিছু অধ্যাপক জাতীয় বুদ্ধিজীবী। আর গ্রামের দিকে কিছু কিছু জমির মালিক। তারপর খতম ডালিকাটা পুলিশ অফিসার থেকে কনস্টেবল হয়ে নামতে নামতে পাড়ার মুদি দোকানি পর্যন্ত পৌঁছে গেল।

তমসা নদীর ধারে আশ্রম বানিয়ে
চুলদাড়িতে মুখচোখ ঢেকে যে ভদ্রলোকটি
বাস করেন, যৌবন বয়সে, কিংবা বলা
যায় তরুণ বয়সে তিনি ছিলেন একটি
নামি গুণ্ডাদলের দামি পাণ্ডা।

গোলে হরিবালের মধ্যে রোজ নতুন নতুন নকশাল জন্মাতে লাগল। যে-ই একটু ছোরা চালাতে শিখেছে কিংবা পেটো বাঁধতে পারে সে-ই বলে আমি নকশাল। শ্রেণীশত্রু নিধনের উদ্দেশ্য নিয়ে দল বেঁধে লেগে পড়ে। বেশিরভাগেরই বয়স কুড়ির নিচে। ওরাই তো বোঝে বেশি। শ্রেণীশত্রু নিয়ে বড় বড় নেতারা বড় বড় তাত্ত্বিক উপদেশ দেয়। খুৎশ শালা। মারো গোলা। অতসব তত্ত্বকথা বুঝতে যেতে বয়েই গেছে। উসব বুঝতে গেলে তো মাইরি পড়াশুনা করতে হবে। তার চাইতে পাড়ার ন্যাপাদা, নুলোদা, ল্যাংচাদারা যা বোঝায় সেটাই ঠিক। যার সঙ্গে বনবে না সেই শালা শ্রেণীশত্রু।

পাড়ার ছেলে ভালো চাকরি পেয়ে সুট বুট করে অফিস যায়, সে শ্রেণীশত্রু। অধ্যাপক ক্লাশে পড়াতে পড়াতে অন্য ধরনের কিছু মতামত প্রকাশ করে ফেলেছে, সে শ্রেণীশত্রু। পাড়ার দোকানদার ধারবাকিতে মাল না দিলে সে শ্রেণীশত্রু। পাড়ার পুজোয় চাহিদা মতো যে চাঁদা দেয় না সে শ্রেণীশত্রু। একদিন বাড়ির কাজের মেয়ে গোপালের মা বাবুর কাছে এসে কঁদে গড়িয়ে

পড়ল—ওগো বাবুগো, আমাদের বাঁচাও। পাড়ার নেতাই বলেছে সে নকশাল হয়েছে। আমি নাকি শ্রেণীশত্রু, সে আমাকে খতম করবে। অপরাধ? নেতাই বিড়ি খাবার জন্যে গোপালের মায়ের কাছে দুটো টাকা চেয়েছিল। গোপালের মা তাকে সেটা দেয়নি।

নকশাল আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল মালিক মজুতদারদের মুণ্ডু কাটার শ্লোগান দিয়ে। মালিক মজুতদার হলেনই সে শ্রেণীশত্রু। সেই যে একজন লিখে দিয়ে গেছে—“তেরোশ সালের মধ্যবর্তী মালিক মজুতদার, মানুষ ছিল কি? জবাব মেলে না তার”। “ইনসপিরেশন”টা নাকি সেইখান থেকে। সব মালিক মজুতদারদের খতম করতে হবে। হৈ হৈ করে নব্য আন্দোলনকারীরা কাজে নেমে পড়ল। কিন্তু কাজে নামার পর দেখা গেল মালিক মজুতদারদের গায়ে আঁচড়টিও লাগল না।

যারা মালিক মজুতদার হয়েছে তারা এমনি এমনি হয়নি। অনেক ঘাটের জল খেয়ে অনেক বাঁশে খাচ্চা খেয়ে অনেক পোড় খেয়ে তারা মালিক মজুতদার হয়েছে। তারা রীতিমতো ঘোড়েল। নকশাল নামের একদল আন্দোলনকারী সদ্য গৌফ ওঠা কয়েকটি পাম্প খাওয়া কিশোর এসে বলবে—ওহে মালিক মজুতদার মশাই, দেশের উন্নতির স্বার্থে তোমার মুণ্ডুটি কাটা হবে, আর অমনি সেই ভদ্রলোক নিজের পেয়ারের মাথাটি সহ গলাটি বাড়িয়ে দিয়ে ‘কেতখ’ হয়ে যাবে, এতটা দখীচি-মার্কা দর্শন তাদের জন্যে নয়। তাই দুটো একটা লাশ পড়ে যাবার পরেই তারা সাবধান হয়ে গেল। টাকা খাইয়ে পাড়ায় উন্টে নকশাল তৈরি করে ফেলল। তাদের উপর ভার রইল যেন কড়া নজর রাখে যাতে বেপাড়ার নকশাল এ পাড়ায় ঢুকতে না পারে। মাঝে মাঝে নকশাল আন্দোলনের নামে পাড়ায় যেসব বোমাবাজি হল সেগুলো ওই ভাড়া করা নকশাল আর ভাড়া খাওয়া নকশালদের মধ্যে। তাতে যা দু-চারটে লাশ পড়ল সেগুলো হল ওদেরই আপোষের লাশ। মালিক

মজুতদাররা জানালার পান্না খুলে সেগুলোই দেখতে লাগল। আহা কি অপূর্ব দৃশ্য! জানালার ফোকর দিয়ে বিল্বব দর্শন।

কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে সেটা নাকি বাংলার নবজাগরণের যুগ। কী রকম জাগরণ? ঐযুগে কোনো মহামানবের উত্থান হয়নি। বড় সাহিত্য শিল্প কৃষ্টি কিছুই সৃষ্টি হয় নি। শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে গেছে। সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় বাঙালিদের জায়গা এক নম্বর থেকে নামতে নামতে শেষের দিক থেকে দু’নম্বরে গিয়ে ঠেকেছে। সরকারি হাসপাতালগুলি স্বীকৃত হয়েছে যমালয়ে যাবার প্রধান প্রবেশ পথ হিসেবে। স্বাস্থ্যক্ষেত্র নামের এইসব জাঁকজমক ওয়াল প্রতীষ্ঠানগুলিতে আর সবই আছে শুধু স্বাস্থ্যসেবা বাদে আর তার চারিদিক ঘিরে নাসিং হোম নামের চোষণকেন্দ্রগুলি চালিয়ে যাচ্ছে তাদের রমরমা কারবার। সরকারি অফিসে ঘুষ ছাড়া কাজ হয় না। কলকারখানা একটার পর একটা বন্ধ হয়েছে। সেখানে এখন বেকার শ্রমিক ছাড়া আর কিছুই উৎপাদন হয় না। আর সেই সুবাদে গজিয়েছে শ্রমিকনেতা নামে কিছু ভুইফোড় ভণ্ড নেতা।

তবুও এটা নব্য জাগরণের যুগ। কী করে? দ্যাখোনি গণচেতনা কেমন ধড়ান্ড করে বেড়ে চলেছে। ইস্কুল কলেজে লেখাপড়া চলেয় গেছে কিন্তু প্রসেসনে লোকের অভাব হয় না। অফিসে অফিসে বন্ধ আর ঘেরাওয়ার ছড়াছড়ি। কিন্তু গণতান্ত্রিক অধিকারে কেউ হাত দিতে পারে না। সমাজে নীতি-নৈতিকতা সব ছলাঞ্জলি গেছে ছেলে বাপকে মানে না ঠিকই কিন্তু নেতাকে তো মানে। সেটাই পরম প্রাপ্তি।

তমসা নদীর ধারে আশ্রম বানিয়ে সন্ন্যাসী সেজে লুকিয়ে বসে থাকা আমাদের এই ভদ্রলোকটি সেই ডামাডোলের যুগে, তখন বয়সে তরুণ, ছিলেন, ওই শতভঙ্গ বঙ্গদেশের নব্য আন্দোলনকারীদের একজন।

(ক্রমশঃ)





আর বলবান না, অ্যান্ধিন তো আরাম করে আপনাদের রান্নাবান্না খাইয়া খাইয়া পেট খারাপ হইয়া গেল। এ বছর যা ঠাণ্ডা পইড়্যাছে তাতে করে আপনাদের রান্না খাইয়া আর পেট খারাপ হবার ভয় নাই। তাই এবার শীতের শাকসব্জি আর মাছ নিয়া কিছুর রান্না আপনাদের জন্য করছি। অবশ্যি খাওয়ার জন্য কষ্ট কর্যা একটু বাঁকুড়া আসতে হব্যা। তাহলে এখন রান্নাটা শুরু কইয়া দেই, কী বলেন?

বেগুনের তরকারি

কি কি লাগব্যা : বেঁটাসুঙ্কু চারফালা কইর্যা ফাড়া বেগুন, খাদিওলা বেঁটাতে যেন লেগে থাকে। আলাদা হইয়া যাবে না। বেগুন লাগবে ২৫০ গেরাম। ত্যাল মাঝারি পোলা ২ পোলা। রসূল ১ চামচ, আদা আখ চামচ, মেথি ইকটুকু, জিরা ইকটুকুখানি, সরষে ১ চামচ, কুচি কুচি পঁয়াজ ১০০ গেরাম, ধুনে গুঁড়ো ছুটু চামচের ২ চামচ, লঙ্কা গুঁড়ো ছুটু ১ চামচ, নুন, তেঁতুল, গুড় বা চিনি আন্দাজ মতন।

যে ডাবে কইরব্যা : ইকটুকু হলুদ ও নুন দিয়া বেগুনগুলো সিদ্ধ করতে হব্যা। মোটামুটি সিদ্ধ হয়া গেলে লামিয়ে লিতে হব্যা। ধুনে ও লঙ্কাগুঁড়া জলে ভিজিয়ে রেখে, ত্যাল গরম করে রসূল ভেজে, মেথি, জিরা এবং সরষে দিতে হব্যা। ফোড়নের গন্ধ বেরোলে পঁয়াজ দিয়ে অল্প অল্প আগুনে ভাঁজতে হব্যা। আরও ১ মাঝারি চামচ ত্যাল দিয়া ত্যাল আলাদা না হওয়া পর্যন্ত মশলাগুলো ভাজতে হব্যা। এর মধ্যে বেগুন মশলার মধ্যে ছেড়ে দিতে হব্যা এবং নুন আন্দাজ মত দিতে হব্যা। বেগুনগুলো উলটু পালটু কইর্যা উন্টে দিতে হব্যা। ফুটন্ত জল, তেঁতুল জল, গুড় বা চিনি গুর মধ্যে দিতে হব্যা। তারপর শুধু গগাপপ.....।

হেঁসেল

টোম্যাটো মূল্যাকুটাওনি

কি কি লাগব্যা : পাকা বিলাতি ২৫০ গেরাম। তাওয়ায় ভাজা ধুনে গুঁড়ো ছুটু চামচের ২ চামচ। খিতো করা রসূল ১০ থেকে ১২ কাঁই। গোলমরিচ ছুটু চামচের আখ চামচ। জিরা আখ চামচ, শুকনো লঙ্কা ৬টা। রাইন্যার জন্য নারকোল ত্যাল ২ মাঝারি চামচ, কারিপাতা ১টি ডাল, জল ৬ কাপ, ধুনে পাতা এক আঁটি, হিং লাগব্যা একটুকু।

যে ডাবে কইরব্যা : ধুনে, জিরা, খেঁতো করা রসূল, গোলমরিচ, শুকনো লঙ্কা। মশলাগুলি ভালো কইর্যা শিলে বেটে লিতে হব্যা। গরম নারকোল ত্যালের সঙ্গে সর্ষে ও কারিপাতা ফোড়ন দিয়ে শিলে বেটে রাখা মশলা ত্যালে দিয়ে কম আগুনে ইকটুকুখানি লেড়েচেড়ে লিন। বিলাতি দিয়া ঐ মশলাটি ভেজে লিয়ে ৬ কাপ জল দিন, ফুটলে পরে ধুনে পাতা ও হিং দিন। পরিবেশন করবার আগে সমস্তটা ছেকে লিয়ে তারপর পরিবেশন করা যেতে পারে।

মাছের পান্নাস

কি কি লাগব্যা : ছুটু করে ফাড়া মাছ ৫০০ গেরাম। ধুনে গুঁড়ো ১ চামচ। লঙ্কা গুঁড়ো আখ চামচ, হলুদ গুঁড়ো ছুটু চামচের ১ চামচ, গোলমরিচ গুঁড়ো সামান্য, রসূল ২ কাঁই, খোলাই ভাজা মেথির গুঁড়ো ইকটুকু। নারকোল ত্যাল ২ মাঝারি চামচ, সর্ষে আখ চামচ, লঙ্কা করে কাটা পঁয়াজ আখ কাপ, লঙ্কা করে কাটা আদা আখ চামচ, লঙ্কা করে কুচানো রসূল আখ চামচ। মাঝখান থেকে চেরা কাঁচালঙ্কা ৩টি, কারিপাতা একটি ডাল, জল দেড় কাপ, তেঁতুল ইকটুকু।

যে ডাবে কইরব্যা : ধুনে গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, গোলমরিচ গুঁড়ো, রসূল খোলাই ভাজা মেথির গুঁড়ো ভাল করে বাইট্যা রাখেন। ত্যাল গরম করে সর্ষে ফোড়ন দিন। পঁয়াজ, আদা, রসূল ও কাঁচালঙ্কা দিয়া ইকটুকু লাড়াচাড়া করেন। বাটা মশলাগুলো ওতে দিয়া টিমে আঁচে ভাজুন এবং মশলাগুলো বাদামি হয়া এলে কড়াইতে জল দিন এবং তেঁতুল দিন। ফুটতে থাকলে মাছের টুকরাগুলান ছাইড্যা দিন এবং খোল ঘন হওয়া পর্যন্ত ফোটিহিতে থাকুন তারপর লামিয়ে লিন। পরিবারের সকলে দাওয়ায় চাটাই পেত্যা বসে পড়ুন।

—মিঠু কারক

বাস্তবশান্তি

অইতান হো হো



স্বাধীনতার বা! প্রকৃষ্টিশ চনছে!

শিক্ষক হয়েছে। শুধু চক্-ডাস্টার নিয়ে চবে বেড়ানোর দিন শেষ। খালা, বাটি, খুলি, জটা, কমশুলু, হারমোনিয়াম, খুলি, ত্রিশূল নিয়ে ফুটপাতে বসতে হবে।

বুদ্ধ শরৎ গচ্ছামি

তিনমাস বেতন গচ্ছামি।

এতে ছাত্রের সঙ্গে শিক্ষকের সামাজিক ব্যবধান কমে যাবে। এক কাপে দু'জনে দুধ খেয়ে হাতধরাধরি করে ইঙ্কুলে যাবে। তারপর তত্ত্ব পাঠ শুরু। ধনতত্ত্ব ভালো নাকি সমাজতত্ত্ব ভালো। বাঁ দিক দিয়ে বাজারে ঢুকবে, নাকি ডান দিক দিয়ে ঢুকবে। খোকার এই সিদ্ধান্তের ওপর দাঁড়িয়ে আছে বিশ্বব্যাপী শ্রমজীবী মানুষের ভবিষ্যৎ। ডানদিকের পথ ধনতত্ত্ব, বামদিকের পথ সমাজতত্ত্ব। আর রাতের অন্ধকারে আগুন ধরিয়ে ঢোকা প্রোমোটরতত্ত্ব। ভোগবাদই ধনতত্ত্ব। ভগবানবাদও তাই। মহাদেব হিমালয়ে বসে হেরোইন টানছে। ভোগী ভগবান। সতীর বাবা প্রতিবাদ করতে গিয়ে খুন। সেবাদল পাঠিয়ে মহাদেব তার বাড়ি ভাঙচুর করে। একমাত্র বামহাতি সমাজই পাবে পৃথিবীতে শান্তি আনতে। বামহাতেই ভাইফোঁটা। বামহাতেই জলশৌচ। মনে রেখো, মহাদেব নাচলে থলয়, কিন্তু বুদ্ধদেব নাচলে ফেংগুই। বাস্তবশান্তি।

বি চিত্রভাবে বহন করাই বিবাহ। কাঠি-আইসক্রিম! বিয়ের কয়েক বছরের মধ্যেই কাঠি। মশা কামড়ানোর মতো মাংসও রইল না। মিস্টার মমি। কানদুটো খোপার জন্তুর মতো লম্বা। নাভির নিচে ফাঙ্গাস। কেউ ফিরেও তাকায় না। ওদিকে আইসক্রিম তখন আইসবার্জ। যাই, একটা জাহাজ ডুবিয়ে আসি। এর মধ্যে কখন লোডশেডিংয়ের মতো আচমকা বংশবিস্তার হল। বেবিফুড-রাফস। দিনে শান্ত, রাতে মাওবাদী। পাড়ার লোক সন্ধে থেকে আন্তিক—

হরি দিন তো গেল সন্ধে হল

পার করে পাড়াকে।

সন্ধে গড়িয়ে রাত বাড়লে—

শালা মাথায় তুলছে বাড়ি—

হারি আপ হরি।

ক' বছর যেতেই খোকার শিক্ষার বয়লারে কমলা দিতে হবে। বড় হয়ে যেন কাল ঈর্কস হয়। বড় ইচ্ছে বাপ-মায়ের—ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার। ফ্যা-ফ্যা। এখন দিনকাল পাণ্টেছে। ব্যাঙ্কে চিঠি আর পোস্ট অফিসে টাকা। টু দি ব্যাঙ্ক ম্যানেজার, তিনচাকা সাইকেল কিনব। স্বনিযুক্তি প্রকল্পে ধার দাও। ছেলে উচ্চশিক্ষার জন্যে ডুটানের জঙ্গলে যাবে। ধার দাও। গ্রাম থেকে একগাছি কচি মাংস আরবে পাঠাব। আদিম কারবারে ধার দাও। ম্যানেজারের উত্তর। টু দি অ্যান্ড্রিকাস্ট, রাতের বেলা আমার ফ্ল্যাটে দেখা করো। কথা হবে।

বাবুরা নতুন স্কুল খুলছেন। বানতলা-কেশপুর্নে প্রাকটিক্যাল হবে। গোমরায় এক্সকরসন হবে। অ্যাডিশনাল পেপার যোড়া কেনা, নরবলি, যৌথ উদ্যোগে চুরি। দাও খোকাকে ভর্তি করে। অবৈতনিক ইঙ্কুল। এখন আবার অবৈতনিক



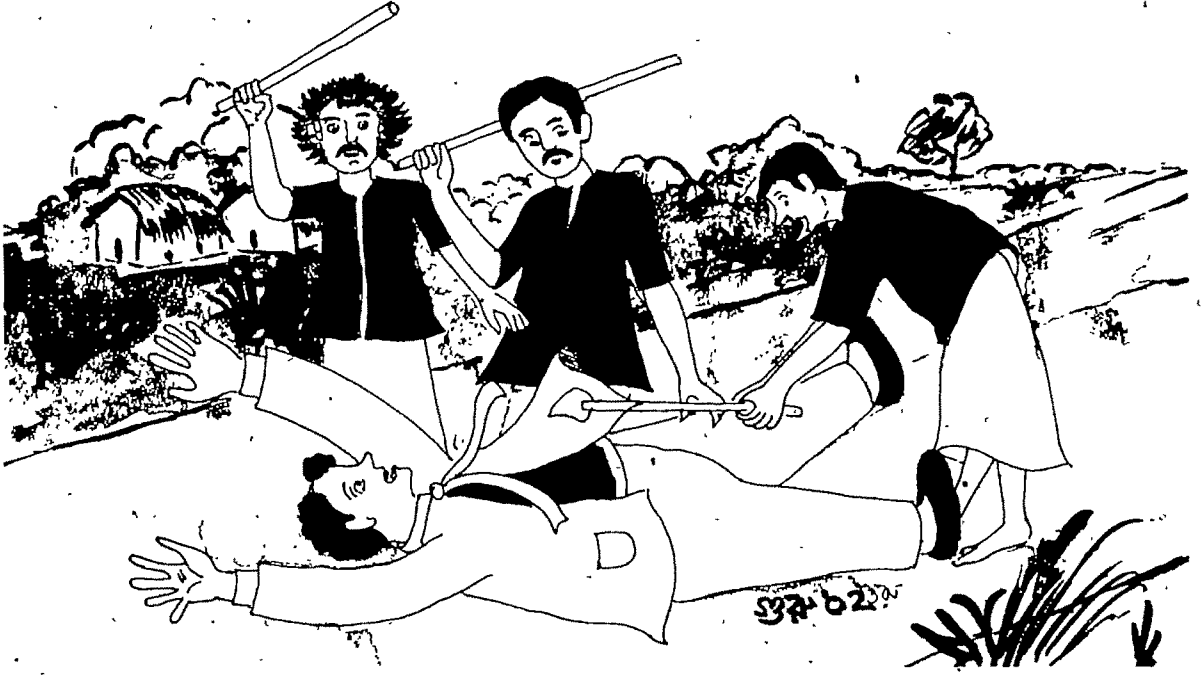
—এ বছর ডাইফোঁটায় দিদি আমায় একশো পদ খাইয়েছে।

ভাবতে পারেন?

—মেয়ের পদের কাছে এ কিছুই নয় ভাই।

বৃহৎ

দিব্যেন্দু দে



মোটা চেহারার বেটে ভদ্রলোক ফুটপাথের এক কোণে অস্বাস্থ্যসেবার কালো কাচ উঠিয়ে সিগারেট ধরাল। এমন ভয়ঙ্কর তার মুখচোখ যে কোনো বিদেশি যদি চট করে তাকে দেখে ফেলে তবে মনে হবে এ শহরে একটা ভীষণ গৃহযুদ্ধ বেধে গেছে। যদিও সেই ভয়ঙ্কর হাবিজাবি বলিরেখা সম্বলিত মুখে এমন এক কামুক বিপ্লবী সামর্থ্য এসে হাজির হয়েছে যাকে ঠিকঠাক প্রকাশ করাই তার সমস্ত যন্ত্রণার কারণ। যেন জীবনের প্রতি কোনো মোহ না রেখেই তাকে জীবন সম্পর্কে ভাবতে হবে। যেন তার জীবনে অনিশ্চয়তার যন্ত্রণা এত প্রবল যে সমস্ত কিছুই তাকে করে তুলেছে জগতের প্রতি দীর্ঘকাতব। প্রতিটি মানুষ তার চোখে বিক্রয়যোগ্য। এবং এই ভাবনা তার এতই বলশালী যে নিজেকে সে মহাপুরুষ ভেবে বসে আছে। যা কিছু তার নিজের বিবেকের কাছে যন্ত্রণাদায়ক সে সমস্ত কিছুকেই সে তার মহান কর্তব্য বলে মনে করে।

বড় রাস্তাটাব কথা ভাবতেই সে একটু পরিতৃপ্তির সন্ধান পেল। তারপর সোজাসুজি তাকাল রাস্তার ওপর ফুটপাথে দাঁড়ানো মেয়েগুলোব দিকে।

জীবনের এই অত্যাশ্চর্য স্ফূর্তিউপকরণগুলি তার হৃদয়ে একধরনের মহৎ যৌন বিষাদের আবির্ভাব ঘটায়। হে মহাকাল! এই সব ছোটখাটো ইচ্ছেগুলোই তো মনুষ্যের ঐশ্বরিক শক্তি। একই সঙ্গে আরাম এবং বেদনার দৃষ্টিতে সে চেয়ে রইল।

রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় বাস চলাচল কমে এসেছে। সারাদিনের ধূলো থিতিয়ে পড়েছে রাস্তার গায়ে। ওখানে যারা দাঁড়িয়ে রয়েছে তাদের অধিকাংশই বিগত যৌবনা মাংসের জুপ। যাদের বয়স কম তারা দামি খন্দের পাকড়ে সটকে পড়েছে। বাদবাকি যাদের ভাগ্যে কিছুই জোটেনি তাবা ফুটপাথের রেলিং-এ হেলান দিয়ে ট্রান্সিক পুলিশের সঙ্গে গল্পে মশগুল।

লোকটি অপার্থিব দৃষ্টিতে মেয়েগুলোর দিকে তাকিয়ে। হঠাৎ করে দেখলে মনে হবে তার দৃষ্টি যেন এক নাবালকের নিষ্পাপ কৌতূহল।

একটা রাজনৈতিক মারামারিতে দুপুরবেলা এই মনোহরণকারী কামোদ্দীপক বাস্তাটাই রথক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। ভাঙা বোতল, লাঠি, পতাকা এখন পুরনো যুদ্ধের জঞ্জাল হয়ে ফুটপাথের এক কোণে পড়ে আছে। আশেপাশের দোকানে নিয়ন

আলো। কাপ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। চারমাথার মোড়ে আবছা আলো। গাড়িটা গুটিগুটি পামে ট্রামলাইন পেরিয়ে ওপাশের ফুটপাথের দিকে এগিয়ে গেল।

সমাজে অর্জিতদের দলে চলে যাবার পর যে ধরনের অনুভূতি ও রক্ষণশীলতা ভাবভঙ্গিতে দেখা যায় সেবকম ভাবে সে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে রইল। যে পুলিশের গুলিতে আজ দুপুরেই এই চৌরাস্তায় চারটে লাশ পড়ে গেছে সেই পুলিশকেও লোকটি পোকামাকড় মনে কবে। উত্তরের নিরিবিলি গলিঘুঞ্জি থেকে যেসব স্বাস্থ্যবান সফলো বেরিয়ে দক্ষিণ শহরতলির বড় বড় রাস্তার সামনে দাঁড়ায় তাদের মনে যদিও এক ধরনের আধ্যাত্মিক অনিরাপত্তা বোধ সবসময় কাজ করে যায়।

ফুটপাথের লাইটপোস্টে কোলানো লাল রঙের ফেস্টুনটার তলায় এসে গাড়িটা দাঁড়িয়ে গেল। একজন ধলধলে মধ্যবয়স্ক নর ইতিমধ্যে গাড়ি মধ্য এসে পড়েছে। পুরুষটির কাছ থেকে একধরনের বিশেষ নির্বাক ইশারা পেয়েই মহিলাটি তার দিকে এগিয়ে গেল। যন্ত্রচালিতের মতো খুলে গেল গাড়ির ফুটপাথের দিকের দরজা। যেন নিজের গাড়িতেই উঠছে এমন ভঙ্গিতে মহিলাটি

অতি পরিচিতের মতো চেপে বসল। একটুক্ষণ গাড়িটা ফুটপাথের ধার ঘেঁষেই চলল। তারপর গতি বাড়িয়ে দক্ষিণ শহরতলির দিকে হারিয়ে গেল।

মেয়েটার শরীর থেকে যেন তেল ঝরে পড়ছে। তার গায়ে আটোঁসাতো কমলা রঙের ব্লাউজ। কোমরটার স্লিভ আর ট্রাইসেপের মধ্যবর্তী জায়গাটা সুললিত মেদের বিস্ময়ে তৈরি। কাঁধে ব্রেসিয়ারের স্ট্র্যাপ উন্টো হয়ে মাংসে গেঁথে গেছে। ছেনালদের মতো উঁচু করে মাথার চুল বাঁধা। যার ফলে ঘাড়ের ওপরে মিশ্র রোমবলয় আবিষ্কৃত হয়েছে। লোকটি এতক্ষণে বুঝল মহিলাটি বেশ বডসড়। গাড়ির ভেতরকার অন্ধকারেও ওর চেহারার আয়তন স্পষ্ট হয়ে তার চোখে ধরা দিল। মহিলার শরীর যৌনতায় পরিপূর্ণ হলেও ওকে সুন্দরী বলা যায় না কিছুতেই। ওর অনাসুপ্তি গাধার মুখটা বাদ দিলে বাদবাকি কামোদ্দীপক এক কথায়। যে দেশের মানুষের গড় উচ্চতা পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চি এবং ওজন বিয়াল্লিশ কেজি, যে বিশ্ব প্রদেশে সূর্যালোকে শরীর ঘামিয়ে যায় সেখানে এই কামিনী কী যে মাননসই। সন্তায় তাকে যারা দিব্যদৃষ্টি দিয়ে দেখে কেবল তারাই জানে।

মেয়েটির নাক ততটা তীক্ষ্ণ নয়। বরং কিছুটা গোল জামফলের মতো। কপটি দুটি মাংসল। এবং নিঃশ্বাস প্রবাহ তাকে কিছুমাত্র বিচলিত করে না। মুখের কিছু বিচ্ছিন্ন ভাব, ছেনালি বা নিজেকে প্রদর্শনের কোনো কোনো চকিত মুহুর্তে তারা অদ্ভুত ভাবে কেঁপে ওঠে। এইমাত্র একটুখানি ফুঁসে ওঠার মতো নড়েচড়ে আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল।

দুপুরের রোদে অকারণে পাড়াগাঁয়ে পুকুরের বুকে ফেঁচাবে জলের ঢেউ খেলে যায়, পূর্বদিকে ক্ষয় পাওয়া ঘাটের গায়ে বটগাছ স্থিতধী যেমন আনড়ে থাকে, তেমন হাসিটি তার মুখে লেগেছে দিব্য। মধ্যবয়সের কপট চাক্ষুশ্য এই হাসিটির শোভা বিস্তার করে। ভাবটা এমন যে, ফুলের মতো সহজ করে ফোটার স্পর্শ ছিল, গর্ব ছিল ফুটে ওঠার।

বৃহৎই সুন্দর। কথাকটি গিলেটিনের কাঁটা দিয়ে ওর বুকে খোঁচা দিয়ে লিখে দিতে ইচ্ছে হল লোকটির। সে এখন মেয়েটিকে জাপটে ওর শরীরের মধ্যে হাত চালিয়ে দিয়েছে। দমবদ্ধ মঞ্চমলের ট্রেনের কামরা ওর হাতের মধ্যে। চোখ বন্ধ করে গতিকে টের পাওয়া যায় না। কেবল নিঃশ্বাসের ওপরে ওঠে নিচে নামে।

মেয়েটির চোখ স্থির। তিমি মাছের মতো ও দু'চোখে দেখবার যেন আর কিছুই বাকি নেই। যেন তারা শান্ত স্বস্তি জ্ঞানপীঠস্থ। এইসব স্পর্শ কত যুগ ধরে লেগে আছে তার গায়ে। এর অস্বাভাবিকতায় একটুও কণ্ঠিত নয় মেয়েটি।

লোকটি প্রথমে নরম আঙুল বুলায়। যেভাবে মুরগির পিঠের ওপর কসাই আলতো আরামের আঙুল চালিয়ে দেয়। তারপর হঠাৎ শক্ত মুঠোয় চেপে ধরে। তীব্র শিরশেণে অভ্যস্ত মুরগির পা দুটো টান টান হয়ে যায়, সমস্ত শরীর কেঁপে ওঠে। মেয়েটার কিন্তু রা নেই। কেবল মুখের ছেনাল হাসিটা দিব্য জ্বলছে। নদীর ওপারে অন্যসব যা কিছু ঘুমিয়ে পড়েছে তার নিঃশ্বাস এপারে শোনা যায়।

লোকটির নাম সনৎ। উত্তরের কোনো উচ্চাঙ্গ মধ্যবিত্ত পরিবারে তার জন্ম। তার চরিত্রের উল্লেখযোগ্য দিক হল, বহিরঙ্গে সে আধুনিক দূর্বিনীত উদার ভাবাপন্ন, তার উদারতা সংবাদপত্রের পাতায় প্রতিষ্ঠিত উদারতা। মনের দিক থেকে সে আধা যুক্তিবুদ্ধির প্রাচীনপন্থী। কাম এবং প্রতিহিংসা তার জীবন ধারণের দুটি প্রক্রিয়া। সনৎ মজুমদার তার সামাজিক সক্ষমতার বশে প্রতিহিংসাশ্রিয়। কাম তার প্রতিহিংসার উদ্দীপক। “বৃহত্তর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করো” সনতের জীবনের সাফল্য মন্ত্র। এই মন্ত্রে সৌন্দর্যতত্ত্বের বিকৃত রূপ দর্শিত হয়েছে কিনা সে বিষয়ে তার সম্যক ধারণা নেই। ন্যায় অন্যায়ের প্রশ্ন বড় জটিল প্রশ্ন। সেসব শিক্কে উঠুক।

শহর জুড়ে সম্প্রতি যে হলিয়াটা জারি হয়েছে সেটা সম্পর্কে সনৎ সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিল। সরকারি ঐ আদেশে বলা হয়েছে যে শহরের কিছু পাঁচতারা হোটেল, নির্দিষ্ট অফিস, ক্লাব কিংবা প্রতিষ্ঠান ভিন্ন অন্য কোথাও প্রকাশ্যে যৌন আচরণ দণ্ডনীয় অপরাধ। এই ধরনের নিয়মের সম্পূর্ণ সমর্থক সনৎ মেয়েটাকে নিয়ে নির্মীয়মান ফ্ল্যাটবাড়িটার দিকে এগুচ্ছিল। এমন নয় যে একজন শিক্ষিত রুচি সম্পন্ন মহিলা তাকে সঙ্গদান করতে পারে না। কিন্তু শিক্ষা এবং রুচির স্বাভাবিকতাই তাকে আকৃষ্ট করে অশিক্ষা এবং কুরুচির অস্বাভাবিকতার দিকে। ছিমছাম গ্লাসে সাজানো মদ্যপানের চেয়ে বোতল উচিয়ে ঢুক্ ঢুক্ করে গেলাতাই আগ্রহ বেশি তার।

সনতের কালো কাচঘেরা সাদা অ্যান্ড্রাসাডার “উৎসব অ্যাপার্টমেন্ট” নামক নির্মীয়মান বারোতলা বাড়িটার তলায় দাঁড়িয়ে গেল। বহুকাল ধরে বাড়িটার কাঠামো জানালা-দরজা বিহীন হয়ে পড়ে রয়েছে। বাইরের দিকে প্রাস্টারহীন ইটের গায়ে কালো জলের দাগ। একদিকে ঝুলছে বিশাল চটের ত্রিপল। চারতলার উপরের বারান্দায় লেখা, ‘প্রমত্তে : সনৎ কম্মার মজুমদার’। হোড়িটার রঙ খসে গিয়েছে। গ্রাউণ্ড ফ্লোরের একদিকে রাজনৈতিক দলের অফিস অন্যদিকে ওপরে ওঠার সিঁড়ি। আর বাড়িটার ভেতরে না ঢুকলে বোঝা যাবে না অসমাপ্ত বহিরঙ্গের ভেতরে এমন একটা বিলাসবহুল রাজপ্রাসাদ লুকিয়ে রয়েছে। কোথা থেকে ভেসে আসা কড়া গাঁজার গন্ধ শূকতে শূকতে লুকনো লিফট বেয়ে সাত কিংবা আটতলার উঠে এল সনৎ। সঙ্গে মাংসের তাল মহিলাটি। যার কাপড়গুলো বেশ কিছুটা অসামাজিক ভাবেই অগোছালো। পরিপাটি গোছানো একটি ঘরে মহিলাটিকে ঢুকিয়ে দিয়ে সনৎ কী একটা কাজে আরো দু'তলা উঁচুতে উঠে গেল। সেই সুযোগেই আইনের রক্ষাকর্তারা বাড়িটাকে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ঘেরাটোপে নিয়ে নিল।

নেশায় আচ্ছন্ন দশ-বারোজন ভ্রমলোককে সমাজ বিরোধী তকমা দিয়ে পুলিশের ভ্যানে বসিয়ে দেওয়া হল। দুশো পুলিশের দল বৃহৎকায় ছয়-সাতটা মেয়েকেও বার করে আনল বাড়িটার মধ্যে থেকে। বড়বাবুর সঙ্গে জিপে চেপে বসল তারা।

সনৎকুমার মজুমদারকে সময় দেওয়া হল পনেরো মিনিট। পুলিশ অফিসার ঠাণ্ডা ঘবটায় দাঁড়িয়ে সনৎকে একটা কাগজ দেখালেন। সনতের অপরাধের বিস্তারিত ব্যাখ্যা তাতে লেখা। “তোমার ওপর অস্বাভাবিক প্রদর্শন করো।” সনৎ ফ্যাকাশে মুখে অফিসারের দিকে তাকিয়ে রইল। দৈর্ঘ্যে প্রহুে অফিসার সনতের চেয়ে লম্বা-চওড়া। এখন তাকে দেখাচ্ছে যেন গিল্পিগি।

“আপনাকে সসন্মানে পালিয়ে যেতে পনেরো মিনিট সময় নির্দিষ্ট করা হয়েছে। দয়া করে আমাদের সঙ্গে কোমাপরেট করুন।” অফিসারটি বললেন।

সনৎ কাগজটা হাতে ধরে দাঁড়িয়ে। যেন বিশ্বাসই হচ্ছে না কেউ ওর বুকে কাঁটা দিয়ে লিখে দিতে পারে—“কর্তব্য পরায়ণ হও।”

অফিসার বললেন, “প্লিজ স্যার।”

কাগজটা হাতে গুটিয়ে সনৎ বেরিয়ে গেল। অন্ধকারে তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। অফিসার ঘড়ি ধরে পাল্লা পনেরো মিনিট অপেক্ষা করে রইলেন। তারপর তীক্ষ্ণ স্বরে শিস দিয়ে উঠলেন। রাতের অন্ধকারে জকরি অবস্থা জারি করে সাইরেন বাজিয়ে পুলিশের গাড়িটা ছুটে লাগল। বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করে পঁচিশ জন পুলিশের একটা দল বহুতল বাড়িটার চারপাশে মোতায়েন করা হল। এবং শহরের কিছু বিশিষ্ট পল্লীতে অসময়ে অল্লীলভাবে বাজতে লাগল গোপন নম্বরের টেলিফোন।

“বডসড় মহিলাটি প্রকৃত সুন্দরই বটে।” বললেন পঙ্কজেশ বুদ্ধি। তাঁর কথায় মনে হল এই ধরনের চর্বি সমেত সুন্দরীরা রাস্তাঘাটে প্রচুর থাকা সম্ভব হাড় আর চামড়া সর্বত্র বিশ্বসুন্দরীদের ডিড় তাকে ব্যথিত করে তুলেছে।

—জানবে বৃহৎ নারীরাই জগৎকে নিয়ন্ত্রিত করে। তিনি বললেন।

লাল টুপি পরা কালো ধূসর লোকটি এবার মুখ খুলল। যেন আসল কথা বলার জন্য প্রস্তুত হল,— আপনাকে ও সম্মান করে চলে। আপনাকে রক্ষা করার জন্য ও নিজেকে বলি দিতে প্রস্তুত।

পঙ্ককেশ বৃদ্ধের মুখের রেখাগুলি আলগা হল একটু,—বৃহৎকে রক্ষা করাই ক্ষুদ্রের কাজ। ব্যক্তি মানুষের ভুল হতে পারে, তাই বলে সংগঠন তো আর ভুল নয়। একটি বৃহৎ বৃদ্ধের তলায় ছোটখাটো আগাছাগুলি নিরাপদে থাকে। আমি তো চেয়েছি ও ওর মতো থাক। ওকে কি আমি রক্ষা করিনি? কিন্তু ও আমার প্রাণ্য সম্মান আমাকে দেয়নি।

বেঁটে লোকটি পঙ্ককেশের বাঁ হাতের ওপর নিজের হাতটা রাখল। তার আঙুলি পরা মোটা তৈলাক্ত আঙুলগুলি নিস্পিশ করছে।

—সে মার্জনা ভিক্ষা করে। আপনার কাছে সে আত্মসমর্পণ করেছে।

—কিন্তু সমস্ত দায় তাকে স্বীকার করতে হবে। সে কি জানে না সমাজে যেমন তার মতো তিমিমাছ আছে তেমনি তিমিসিলও রয়েছে? এই সংবাদপত্রগুলোই ধরো না। আমাকে তো গিলে হজম করে নিল। অথচ এর স্বাধীনতার জন্য আমি কী না করেছি। কে বড় কে ছোট, বুদ্ধিমান মানুষ যদি এটা গুলিয়ে ফেলে।

বেঁটে লোকটি বৃদ্ধের দু'চোখে চোখ রেখে ধাতু হল,—আপনার বিরুদ্ধে কোনো স্বীকারোক্তির প্রসঙ্গ ওঠে না। ওব নিরাপত্তা এ জন্যই প্রয়োজন।

বৃদ্ধ পঙ্ককেশ বেঁটে লোকটির মুঠো থেকে তাঁর হাত ছাড়িয়ে নিলেন। তারপর তাঁর দু'পাশে, যেখানে কথা বলার সময় কব ওঠে, সেই প্রান্তদুটো টান টান করে মুছে দিলেন,—ওকে বলো কিছুদিনের জন্য গা ঢাকা দিতে। উত্তরের কোথাও। সংবাদপত্রগুলো তবে ওকে নিয়ে মেতে উঠবে। তাতে ওর মুক্তি সহজ হবে।

কথা বলার সময় মনে হল বৃদ্ধের চোখদুটো কাচের মতো স্থির।

বেঁটে লোকটি বিড়বিড় করে আরো সব কি বলতে লাগল। গরুর কানের কাছে মুখ নিয়ে মাছি যেভাবে কৃতজ্ঞতা জাহির করে।

মাঝরাতের অন্ধকার ঘরে মনে রাখবার মতো শেষ একটি কথাই বললেন ঐ জ্ঞানবৃদ্ধ,—ওকে বলো চিরুনি-কাঁটা আমার বৃকেও খোঁচা দিয়ে লিখে রেখে গেছে—“ন্যায় পরায়ণ হও।” জগতের প্রতিটি বৃহত্তর বৃকেই তা লেখা থাকে। বৃহৎ তাই মহৎ হয়ে ওঠে।

সম্প্রদায় সাদা অ্যাডাল্ডারে তখনো বসে আছে সনৎ।

বহুক্ষণ অপেক্ষার পর কালো বেঁটে লোকটির জিপগাড়ি সনতের গাড়ির গা ঘেঁষে দাঁড়াল। ফলকনামা হাতে লোকটি নেমে এল। গাড়ির কাচ তুলে মিনিট পাঁচেক বাক-বিতণ্ডা চলল। কে যে কাকে কী বোঝাতে চায় কিছুই বোঝা গেল না। দেখা গেল শহর ছাড়িয়ে বাইপাস দিয়ে উল্লসাসে ছুটে চলেছে সনতের গাড়ি।

লোকশূন্য রাস্তার ছুটে ছুটে কোথায় যেন সকাল হয়ে গেল। আলো রাস্তাঘাট মানুষজন সব দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে একটা মফস্বল শহর। তার লোকজন, গৌরো চোঁচামেচি। পাড়া-গাঁ, রাস্তা, বাজার, ট্রেন লাইন, লুকোবার জায়গা। বৃহত্তর পক্ষে লুকোনোটা বরাবরের অস্বাচ্ছন্দ্যের বিষয়।

জন বিস্ফোরণে পূর্ণ গ্রামের রাস্তার খানাপ্রাথমিক বিপর্যয়টাকে টেনে নিয়ে এল। নিয়ন্ত্রণ হাবিয়ে গাড়িটা একদিকে হেলে পড়ল। তারপর একটা ভ্যানগাড়িকে বাঁদিকে কাটিয়ে রাস্তার ডানদিকের বাঁক ঘোরার মুহূর্তে আত্মহত্যা এক পথচারী উইংসের ওপর মুখ খুঁড়ে পড়ল। চোয়ালের ডানদিকটা এক লহমায় শরীরের বাদবাকি অংশ থেকে আলাদা হয়ে বুকে পড়ল। প্রচণ্ড ঝাঁকুনির সঙ্গে কালো কাচের ভেতর থেকে চোয়ালহীন একটি মানুষের রক্তাক্ত

মুখ চকিতে দেখতে পেল সনৎ। সমস্ত অনুভূতি, বোধ, চেতনা মুহূর্তে বিমূর্ত হয়ে গেল তার কাছে। লোকটা তীক্ষ্ণ বেগে ছিটকে পড়ল রাস্তার পাশে খোলা ড্রেনে। রোমাঞ্চশূন্য প্রকৃত আতঙ্কে বিমূর্ত হয়ে পড়ল সনৎ।

গাড়িটা রাস্তার একপাশে হেলে পড়েছে। ড্রাইভার চেঁচা করছে স্টার্ট করতে। ইঞ্জিনের ঘড়ঘড় আওয়াজে একটা ঘড়ঘড়ের পূর্বাভাস জেগে উঠল সনতের মনে। “সুমোরের বাচ্চা।” দাঁতে দাঁতে কষে রগড়ে উঠল সনৎ। ফোর্থ গিয়ারে গাড়ি ফেলে খন্দগুলোকে অতিক্রম করতে চাইছে হতচকিত চালক।

বড়সড় একটা থান ইট সেই ফাঁকে উড়ে এসে পড়ল গাড়ির পেছনের কাচে। নিজেকে বাঁচাবার জন্য নিচু হতেই গাড়ির সামনের কাচে বাঁশের আওয়াজ। কারা, যেন দরজাগুলো ধরে টানছে। সামনের সিটে ড্রাইভার শুয়ে পড়েছে। যন্ত্রচালিতের মতো গাড়িটা আরো কিছুদূর গড়িয়ে গেল। তারপর থম্ মেয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

ঘড়ঘড়। ঘড়ঘড়। জন্তুর মতো হামাগুড়ি দিয়ে উঠে বসল সনৎ। ডানদিকে দরজাটা খুলতেই চারটে হাত তাকে টেনে নামিয়ে নিল।

ভারতবর্ষের দরিদ্র জঙ্গলিত এক গ্রামের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে সনতের গাড়ি। আদুল গায়ে লুঙ্গি, পরা রোগাপটকা লোকগুলো ঘিরে ধবেছে গাড়িটাকে। রাস্তা একধারে বাঁশবন, চায়ের দোকান, কাদা মাঠ। অন্যদিকে মাটির ঘর আর বর্ষার ভিজে ঝড়। ন্যাংটো শিশু আর ঘোমটা টানা মেয়েদের ভিড়। জায়গাটায় কেমন একটা সৌন্দর্য গন্ধ।

সর্বশক্তি দিয়ে ওদের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল সনৎ। মুহূর্তেই ঝটকা দিয়ে মুক্ত হতে চাইল। চিতাবাঘের মতো লোকগুলোর হাতে পায়ে কামড়ে দিতে লাগল। সেই সঙ্গে তারস্বরে চিৎকার করতে লাগল। লোকগুলো বুঝতে পারছে না ওর ভাষা। ওর যুক্তি, বোধ, ক্ষমতা এবং বিশালত্ব। চাইলে এই গ্রামটাকে নগদে কিনে নিতে পারে সে। কে বোঝাকে জানোয়ারের দলকে। ওদের সমষ্টিগত উত্তম-মধ্যমে ব্যক্তিত্বের কোনো স্থান নেই। বৃহৎ-এর যে মহৎ উদ্দেশ্য “ন্যায়পরায়ণ হও”, সে কথা চিরুনি-কাঁটা দিয়ে কেউ ওদের গায়ে লিখে দেয়নি।

সনতের বিশাল চেহারাটা খানিকক্ষণের মধ্যেই যখন বাস্তবের একপাশে রক্ত আর কাদায় মাখা আবর্জনা হয়ে গেল তখন মনে হল ওদের বৃকে লেখা রয়েছে—“বৃহৎকে ঘৃণা করো”।

‘পত্রপাঠ’-এর যে গ্রাহকরা নবীকরণ করবেন
তাদেরকে আমরা ভরী হাতেই সম্মরণ করতে বাধ্য
হলাম। এর কদর্থ প্রই যে, আর তাদেরকে
‘পত্রপাঠ’ পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না। প্রক্রে ‘পত্রপাঠ
বিদায়’ ভাবে ভুল করবেন। আদায় চিকঠাক হলে
বিদায়ের প্রশ্নই ওঠে না। আদায়ের দায় আমাদের
হলেও টান্দা প্রদায়ের দায় আপনাদেরই। আপাতত
‘পত্রপাঠ দায়রা’ আদালতের প্রটাই রায়।

বিশেষণের-চোলি কি পিছে

শরদিন্দু কর



ছেলেবেলায় বাবা মাঝে মাঝে আমাকে বলতেন গাথা।

কি করব, মাথায় বুদ্ধি কম ছিল আর সেটা সামাল দিতে আমাকে পড়াশুনার জন্যে বেশি খাটতে হত। ভালো ছেলেরা যা এক মিনিটে বুঝে নেয় আমার বুঝতে তিন মিনিট লাগত। তখন গাথার মতো খেটে দিনরাত পড়াশুনা করতাম।

তবু ওই ‘গাথা’ কথাটার মধ্যে একটু গৌরব ছিল। বুদ্ধি কম থাকলেও পরিশ্রমী বলে স্বীকার করে নেওয়া হত।

কাকা বলতেন—হনুমান।

লাফিয়ে ঝাপিয়ে গঙ্গায় সাঁতার কাটা, তরতর করে নারকেল গাছে চড়ে গরমের দুপুরে ডাব পেড়ে আনা কিংবা পূজোর সময় পাড়ার পূজোর প্যাণ্ডুল বাঁধতে বাঁশের মাথায় উঠে যেতে পারতাম অন্যায়সে। তখনো অস্ত ডেকরেটারদের ভিড হয়নি। আপনা হাত জগমাখ।

লাফঝাপ দেওয়ার সব কাজগুলো ঝটপট করতে পারতাম বলে কাকার

ওই স্নেহের বিশেষণটি মাথা পেতে নিতাম।

দিনকাল বদলে গেছে। আমি বুঝতে পারিনি।

শ্রীমতী যখন একদিন বলল, তুমি একটি টিউব লাইট, তখন আমার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। অর্থাৎ আমি অন্য আলোর চেয়ে আয়তনে দীর্ঘ, আলোর ছটাও দীপ্ত নীল।

কিন্তু কথাটুকু তিনি শেষ করলেন এইভাবে:

—তুমি কোনো কথা একবারে বুঝতে পারো না। তিনবার কী কী করো।

এত বুঝতে দেরি হয় কেন? টিউব লাইট যেমন সুইচ টিপলেই জ্বলে ওঠে না, তিনবার অস্তত দপ্ দপ্ করে তারপর জ্বলে, তুমিও সেইরকম। এক চালে তোমার মাথায় কিছু ঢোকে না।

আমার উজ্জ্বল মুখ ফিউজ হয়ে গেল।

পরের বাক্যটি শুনতে হয় মেয়ের কাছ থেকে—তুমি একটি টেলিফোন।

টেলিফোনের ওপর সাদা ধপধপে জাপানি টেলিফোনটির দিকে তাকিয়ে

ওই বিরতিটুকু তোমার অফিস টাইম।

যার ওপরে মায়ের তেমন হাত নেই।

টিভির বিজ্ঞাপন পছন্দ না হলেও যেমন

লোকে মেনে নেয় সেইরকম মা তোমার

অফিসের সময়টুকু মেনে নিয়েছে।

ভাবলাম মেয়ে টেলিফোন ধরে বন্ধুদের সাথে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলে; ওটি নিশ্চয় ওর খুব সোহাগের বস্তু। আমিও সেইরকম প্রিয়জন।

মেয়ে কথা শেষ করে—বাবা, তুমি নিজের মধ্যে কিছু রাখতে পারো না। যা বলব সঙ্গে সঙ্গে তা মায়ের কানে তুলে দাও। অরিন্দমদার সাথে নন্দনে গিয়েছিলাম ভালো মুভি দেখতে, সে কথা কি মাকে না বললে তোমার ঘুম হজিল না? যা কিছু বলি সব অন্যপারে সাথে সাথে চালান করে দাও মায়ের কাছে—টেলিফোনের মতো।

আমার আশার টেলিফোন ডেড হয়ে যায়।

সেদিন রাতে ইন্টারনেট ধাবা থেকে কি সব দেখে ছেলে বাড়ি ফেরার সময় দরজার সামনে দেখল আমি ফিরছি হাতে ব্যাগ ঝুলিয়ে। ঘরে ঢুকেই ছেলে বলে উঠল, বাবা তুমি একটা টেলিভিশন।

তখন মনে ভ্রূপ্তি এল। চকচকে কালো ক্যাবিনেট, ফ্ল্যাট স্ক্রিন, ঝকঝকে ছবি, তিনশো ওয়াটের গমগমে আওয়াজ—ভালোভাবে বোঝাতে হলে হোম থিয়েটার। ভাবলাম, মেয়ে আর মেয়ের মা আমাকে বোঝে না। ছেলে ঠিক

চিনেছে। পুত্র গর্বে বুক ফুলে উঠল।

ছেলে বলে উঠল— বিজ্ঞাপনের বিরতিটুকু বাদ দিয়ে সকাল-সন্ধ্যা তুমি বাজার, নাহয় লব্ধি, নাহয় ওষুধের দোকান—আজ ছোটমাসির বাড়ি বালীতে, কাল শালকিয়াতে বড়মামার কাছে, পরশুদিন গড়িয়াহাটে আদি বিষ্ণুপুরী কিংবা বৌবাজারে চুনি ম্যানসনে। কখনো দেখলাম না তুমি নিজের মতো করে গান গুনছ, বই পড়ছ কিংবা তোমার প্রিয় বেলুডমঠে যাচ্ছ।

তবু উজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে থাকি যে, পুত্র আমার ভালো লাগার জিনিসগুলো জানে এবং সেগুলোর জন্যে যে সময় পাই না তাও বোঝে।

—তোমার অনেক কিছু আছে কিন্তু কিছুই নিজের ইচ্ছায় করতে পারো না। মায়ের হাতে রিমোট কন্ট্রোল। তোমাকে যে চ্যানেলে ঠেলবে তুমি তখন সেইখানে পৌঁছে যাবে।

কীপ আশা নিয়ে বললাম—কী একটা যেন বিজ্ঞাপনের বিবতি বলছিল না?

—হ্যাঁ। ওই বিরতিটুকু তোমাব অফিস টাইম। যার ওপরে মায়ের তেমন হাত নেই। টিভির বিজ্ঞাপন পছন্দ না হলেও যেমন লোকে মেনে নেয় সেইরকম মা তোমার অফিসের সময়টুকু মেনে নিয়েছে।

অফিসে আমার একটু সুনাম আছে। স্মৃতিশক্তি ভালো, নানা ধরনের তথ্য আমার নখদর্পণে। মার্কেটিং থেকে ইনকাম ট্যাক্সের জটিল নিয়ম নিয়ে কেউ প্রশ্ন করলে চটপট উত্তর দিতে পারি।

অফিসটা একদিন আবো ঝাঁকচককে হল।

সেন্ট্রাল এসি, কাচের ঘেরাটোপে প্রত্যেকের আলাদা টেবিল, ভালো কোম্পানির কুশন আঁটা রিভলভিং চেয়ার, অ্যাকোয়া ফিস্টোলের শুদ্ধ জল, চায়ের বদলে কফি। নতুন জি এম এসেছে হিন্দি সিরিয়ালের তরুণদের মতো স্মার্ট। প্রথমদিন এসেই সকলের সঙ্গে পরিচয় পর্ব শেষ করে হাসতে হাসতে নির্দেশ দিল—আমাকে কেউ স্যার বলবে না। এটাই প্রজেক্ট কালচার। সবসময় শুধু নাম ধরে ডাকবে। মাথা ঝুঁকিয়ে বিনয়ী ভঙ্গিতে বললেন, আমি মনীশ, ওনলি মনীশ।

আনন্দিত মুখে উঠে দাঁড়িয়েছি এই উত্তর আধুনিকতা প্রাপ্ত উদারতাকে চিয়ার্স জানাব বলে, হাত তুলে মনীশ বললেন, আপনার সম্বন্ধে আমি কোয়ারি করেছে। আপনি এই অফিসের তথ্যকেন্দ্র—আই মিন পি সি। পাবশোনিয়াল কম্পিউটার। এই না হলে বিশ্বাসন।

নিজের পি সি বিশেষণে পরম উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম। সার্থক মনে হল নিজেকে।

তখনই পকেট থেকে বেড়াল বেরিয়ে এল। আমার দিকে তজ্জ্বী তুলে নতুন জি এম বললেন, আপনি পি সি হলেও, মনে রাখবেন, আমি এখানে মনীশ, আমার হাতেই সর্বক্ষণ থাকবে মাউস।

পি সির কৌলীন্যের ফানুস নিমেষে ফুটো করে দিল মনীশের মাউস।



র‍্যাপ্পা

উদয় বন্দ্যোপাধ্যায়

হঠাৎ সেদিন কপালজোবে ভূতের রাজার দেখা পেলাম।

সাহস করে এগিয়ে গিয়ে ঠুকে দিলাম ডজন সেলাম।

র‍্যাক্ষাসায় বেঁই বুঝেছেন ধরা তিনি পড়েই গেছেন,

আমি বললাম, “ভয় নেই স্যার, একখানা গান গাইতে এলাম।”

তানপুবাটা বাগিয়ে নিয়ে সম্মুখে তাঁর বসে গেলাম।

র‍্যাক্ষা বললেন, “গান শোনাবে? বেশ, তা শোনাও, কেমন সে গান।”

ভরসা পেয়ে লাগিয়ে দিলাম ভৈরবীতে সপাটে তান।

বিরক্তিতে নাড়িয়ে মাথা র‍্যাক্ষা বললেন, “কী গাও যা তা?”

‘র‍্যাপ্পা’ শুনে রাজা বেহুঁশ!

ওন্টায় চোখ, কথা হারায়;

অনেক কষ্টে জ্ঞান ফেরে যেই,

বলেন তিনি—“বাঁচাও আমায়!”

গুপীর গলায় যে গান মানায়, যে সে গাইলে পায় কি তা প্রাণ?

গানের গুঁতোয় মাববে নাকি? ভূতের কি নেই বউ-সজ্জা?”

মুণ্ডে পড়ি, তবুও বলি, “বলুন তবে, কী শোনাব?”

র‍্যাক্ষা বললেন, “একটা কিছু গাও না, শুনেই কাজে যাব।”

আমি বললাম, “বেশ মহার‍্যাক্ষা, অন্য কিছুই শোনাব আজ।”

র‍্যাপের সঙ্গে টপ্পা জুড়ে দিলাম গেয়ে; যে যাই ভাবো,

র‍্যাক্ষার চোখে পড়ার এমন সোনার সুযোগ আর কি পাব?

‘র‍্যাপ্পা’ শুনে রাজা বেহুঁশ। ওন্টায় চোখ, কথা হারায়;

অনেক কষ্টে জ্ঞান ফেরে যেই, বলেন তিনি—“বাঁচাও আমায়।”

লক্ষ্মীটি ভাই গানটা থামাও; বর নেবে তো? যা খুশি চাও...”

কী চাওয়া যায় ভাবছি, হঠাৎ মোরগ ডাকে কানেক কাছে—

মোরগ কোথায়, গিমি! বলে, বাজল ক’টা খেয়াল আছে!!



মহিলা মহল

‘ফিস ফিস’ বিভাগ

পরামর্শ দিচ্ছেন : প্রাণঘাতিনী দেবী

[দীর্ঘদিন ধরে তোমাদের সমস্যা জন্মে জন্মে প্রায় পাহাড় হয়ে উঠেছে। পরামর্শ দিতে পারিনি বলে আমি অত্যন্ত মর্মপিড়ায় ভুগছি। আসলে হয়েছিল কি, আমার মোহে পড়ে (জানতুম না এমন মাথামোটাও আছে!) একজনের প্রাণ যাবার জোগাড় হয়েছিল। বলতে লজ্জা করে, তিনি আমাদের দপ্তরেরই এক দপ্তর-সম্পাদক (দ্রষ্টব্য : পুরুষ মহল)। পুরুষ নির্যাতনের অভিযোগে জেলে যাওয়ার ভয়ে এতদিন গা-ঢাকা দিয়ে ছিলুম। এখন তাঁর ঘোর কেটেছে (কেটেছে বলেই মনে হয়!) দেখে আবার প্রকাশ্যে আসতে ভরসা পেয়েছি। তোমাদের এমন সমস্যায় ভুগতে হয়নি তো এর মধ্যে?]

—প্রা. ঘা. দে.

● আমার বয়েস ৬০ বছর। আমার কস্তার ৮০। হালে তিনি পাড়ায় রটিয়ে বেড়াচ্ছেন—আমি নাকি তাঁর ওপর অষ্টপ্রহর নির্যাতন করি। আচ্ছা, বলা তো ভাই, জোয়ান বয়েসে কিছু করলুম না, এই বুড়ো হাড়ে নির্যাতন চালাচ্ছি? খুব দুশ্চিন্তায় আছি। আচ্ছা, উনি মামলা করলে কি আমায় জেলে যেতেই হবে?

—শ্যামাসিনী পাল, কলকাতা-৭৭

□ (এ-হে-হে, প্রথম চিঠিতেই যে ব্রহ্মোসিস!) না মাসিমা, আপনি জঙ্গ সায়েবকে বুঝিয়ে বলবেন সোয়ামীর ঘরে এতবছর জেলখাটার পর আর নতুন জেলের দরকার কি। যাবজ্জীবন তো সেই রুবে কোনকালে এখানেই নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

● আমি নাচতে ভালোবাসি, কিন্তু নিজে নাচতে পারি না। আচ্ছা, নাচতে না জানলে কি নাচানো যায় না?

—পম্পি পাত্র, উত্তর দিনাজপুর

□ কে বলেছে? নাচের ইস্কুলের বদলে নাচানোর ইস্কুলে ভর্তি হয়ে যাও। তার অবশ্য একটা আটপৌরে নাম আছে—মডেলিং। কতটা মড তুমি? জন্মদিনের পোশাক আর মৃত্যুদিনের পোশাকে ভেদ রাখো না তো?

● আমি একজনের প্রেমে পড়েছি। তাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করতে পারব না। তিনি আমাদের সেলাই-দিদিমণি। তাঁর ধমকানো দেখলে পুরুষও লজ্জা পায়। কিন্তু তাঁর দাড়ি-গোফ নেই। আচ্ছা, আমার যিনি স্বামী হবেন তাঁর কি দাড়িগোফ থাকতেই হবে?

—নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, কলকাতা-২৯

□ সেলাই-দিদিমণি সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ আছেন। তাঁর অবশ্য বিস্তর দাড়ি-গোফ আছে। তাঁর কাছেই পরামর্শ নিও। তিনি বেশ কাঁখা করে বুঝিয়ে দিতে পারবেন।

● আমি আমার মামাতো দাদার প্রেমে পড়ে গেছি। হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলাম, আমার মাসতুতো বোনও তার প্রেমে পড়ে গেছে। তারপর কালকেই জানতে পারলাম, আমার পিসতুতো বোনও তার প্রেমে পড়ে গেছে। খুব হতাশা লাগছে প্রাণঘাতিনীদি।

—গুলশানারা খাতুন, মুর্শিদাবাদ

□ খুড়তুতো বোন? জাঠতুতো? পাড়াতুতো? এদের আর কত দেরি? তোমার দাদাটি কি মুম্বাইয়ে থাকেন? তাঁর নাম কি শাহরুখ খান?

● আমার সমস্যাটা খুব জটিল প্রাণঘাতিনীদি। রাগে চোখ বুঁজলেই স্বামীর জায়গায় প্রেমিক শুয়ে পড়ছে। বিয়ের আগে যা হয়ে গেছে গেছে। স্বামীকে আমি যে-কোনো মূল্যে ফিরে পেতে চাই। কী করব?

—আরতি নাগ, ঋড়গপুর, মেদিনীপুর

□ কী আর করবে, স্বামীর পরিবর্তে প্রেমিকের পাশে শয্যা রচনা করো। চোখ বুঁজলেই স্বামী এসে যাবে।

● আমি বি কম ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি। দেখতে সুন্দরী বলে সবাই। বিপদ হয়েছে দু'গালে দুটো মোক্ষম টোল নিয়ে। কোনো সহপাঠীর দিকে তাকালেই সে ভাবে, তাকে হেসে আপ্যায়ন করছি। সে-ও চোখ মট্‌কায়। কাছে ঘেঁষার চেষ্টা করে। আচ্ছা, প্লাস্টিক সার্জারি করে কি টোল উড়িয়ে দেওয়া যায়?

—সোনিয়া সেন, যাদবপুর, কলকাতা

□ উড়িয়ে দেওয়া? ছি ছি, ওসব তো জঙ্গীরা করে—ত্রিজ উড়িয়ে দেওয়া, ট্রেড সেন্টার উড়িয়ে দেওয়া—তুমি বরং টোল ট্যান্ড চালু করো। ক্যান্টিনে ফিস ফ্রাই দিয়ে শুরু করে অফরে চিকেন তন্দুরি। তারপর আর একটু উঠলেই দেখবে চোখ মট্‌কানোর বদলে সট্‌কানোর দিকেই ঝুকছে তারা।

● আমার চেয়ে চারবছরের ছোট এঁচোড় পাকা মাসতুতো ভাইটি অনেকদিন ধরেই আমাকে বিরক্ত করছে। সুবিধে করতে না পেয়ে বাবাকে হুমকি দিয়েছে যে আমি যদি তাকে বিয়ে না করি তাহলে তার মায়ের সঙ্গে বাবার পূর্বতন কেছা সে আমার মায়ের কাছে ফাঁস করে দেবে। বাবা আমার হাত ধরে মিনতি করছেন ওই ত্যাঁদোড়কে সামলাতে। বাবাকে খুব ভালোবাসি। কী করি বলুন তো?

—সোনম সাহা, কলকাতা-৯

□ বিধে বিষ্কর। তুমি তোমার মাসিকে বলো, তাঁর ছেলেটিকে তিনি আঁচল-বন্দী করুন, নইলে তোমার বাবার সঙ্গে তাঁর পূর্বতন প্রণয়-কাহিনী তুমি মেসোর কর্ককুহরে পৌছে দেবে। চিন্তা একটাই—পুরনো ঘা খুঁচিয়ে তোলায় তোমার মাসি আর বাবা দু'জন দু'জনের দিকে হাঁটি পা পা না গুরু করেন। মরুকণে, তুমি তো রক্ষা পেলে?

চলচ্চিত্র দুঃসংবাদ

একজন আরেকজনের পিঠ চুলকে দিচ্ছে। এই আশায় দিচ্ছে যে সে-ও একদিন পাল্টা চুলকুনি পাবে। সর্বত্র তাই সাধারণ চর্মরোগের অসাধারণ মহামারী দেখা দিয়েছে। মিডিওক্রিটিই এখন সবচেয়ে সুলভ।

মিডিওক্রিটির মতো এমন সুলভ ক্রিটিক আর কে



আপনি যদি মুগাল সেনের 'আমার ভুবন' ছবিটি দেখতে চান তবে দেখার আগে বা পরে ছবি সম্পর্কে মুগালবাবুর ব্যাখ্যাটা শুনে নিলে ভালো করবেন। এর ব্যাখ্যা তিনি টি ভির পর্দায় বা সংবাদপত্রে দিয়েছেন। সেগুলি দেখতে পেতে অসুবিধে হবে না। পরীক্ষার সময়ে যেমন টেক্সটের সঙ্গে নোটস পড়তে হত, সেইরকম আর কি। নোটস ছাড়া টেক্সট তো বোঝাই যেত না। অনেকে তো টেক্সট পড়তই না, সরাসরি নোটস পড়ে নিত।

মুগাল সেনের বেলাতেও ব্যাখ্যাটা জেনে নিলেই হয়। তাতে অন্তত ছবি দেখাব ইনস্যানিটি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। ছবি দেখে যা আপনি কিছুতেই ধরতে পারছেন না, যেমন হঠাৎ একটা বড়সড় বিস্ফোরণ কেন খামোকা দেখানো হল, পরিচালক তার চমৎকার ভাষা দিয়েছেন, উইথ রেফারেন্স টু দি কনটেক্সট। টেক্সটের ঝামেলা এড়াতে গেলে এইটাই যথেষ্ট। বিস্ফোরণ যেমনই হোক না, ছবির জীবন যথাবিহিত আছে। অটুট আছে তাদেব ভুবন।

এই বস্তাপচা গল্প, যা কয়েক কোটি বার কেউ না কেউ বলেছে, তথাপি যাতে কখনোই বিশ্বাস রাখা যাচ্ছে না, আর সেই কাহিনীটা মুগাল সেন বলতে পারবেন এমন আশা করার মতো ইনসেন আমরা নই। কিন্তু ক্রমাগত ইনসিনসিমার ছবি তুলে তিনি কী বোঝাতে চাইছেন? একটি মুসলমান জনজীবন দেখাতে দেখাতে আকস্মিক এক হিন্দু বর্ষীয়ানকে খাপছাড়া ভাবে তাদের মধ্যে যতটা হৈ হৈ করে ঢুকিয়েছিলেন, তার চেয়েও বেশি স্তিমিত ভাবে তাকে বার করে নিতে হল ছবি থেকে। তা না হলে দর্শকই বেরিয়ে

যেত, এমনই তালকানার মতো দৃশ্যটি তৈরি। পুরো ছবিতেই একটা দেউলেপনার 'দুরাবস্থা' (!) রয়েছে। যে জীবন পরিচালক দেখেননি, সেই জীবনযাপনের জীবনদর্শন পর্দায় প্রদর্শন করবেন, এমনটিই তিনি চিরকাল ভেবেছেন এবং সেইজন্যই তাঁর ছবি চলে না। ছবির পায়ে ঢাকা লাগানো থাকলেও চলত না, বরং ভেঙে পড়ত সেই চক্রান্ত।

আসলে সমগ্র দেশে এবং সমাজে এবং পৃথিবীতে মিডিওক্রিটির জয়জয়কার চলছে। তারই ফায়দা লুটছে সবাই। একজন আরেকজনের পিঠ চুলকে দিচ্ছে। এই আশায় দিচ্ছে যে সে-ও একদিন পাল্টা চুলকুনি পাবে। সর্বত্র তাই সাধারণ চর্মরোগের অসাধারণ মহামারী দেখা দিয়েছে। মিডিওক্রিটিই এখন সবচেয়ে সুলভ।

বাংলাদেশে একসময়ে স্টুডিওবোকারে চড়ে প্রযোজক ছবি তুলতে যেতেন। আজ স্টুডিও বোকার, তাই স্টুডিওবোকারও আর নেই। পরিবর্তে আছে মিডিমার মিডিওকার অনুশীলন। যে যা নয়; সে আজ তাই করে। যার ছবি তোলার কথা নয়, হাতে ব্যাগ নিয়ে মাল ফেরি করাই যার পক্ষে প্রশস্ত ছিল, সে জায়গা বদলালে যা হয় তাই হচ্ছে। ছবিও হচ্ছে না, হলও সে ছবি ফেরি করা যাচ্ছে না কিছুতেই। পঞ্চম শ্রেণীর ছবি না বানিয়ে প্রথম শ্রেণীর দোকানদারি করাই শ্রেয়, এই কথাটি কে কাকে বোঝাবে? ঐ পঞ্চমই তো এখন ফাঁকা মাঠে খেলতে নেমেছে, তাতেই জুটছে হাততালি। ছবির জাঁড়ার ফুটো, তাতে তালি দেবার কেউ আসেনি এখনো। শাস্ত্রে বাণপ্রস্থের নির্দেশ ছিল, তা কেউ মানেনি বলেই বানের জল সবচেয়ে না দেশ থেকে।

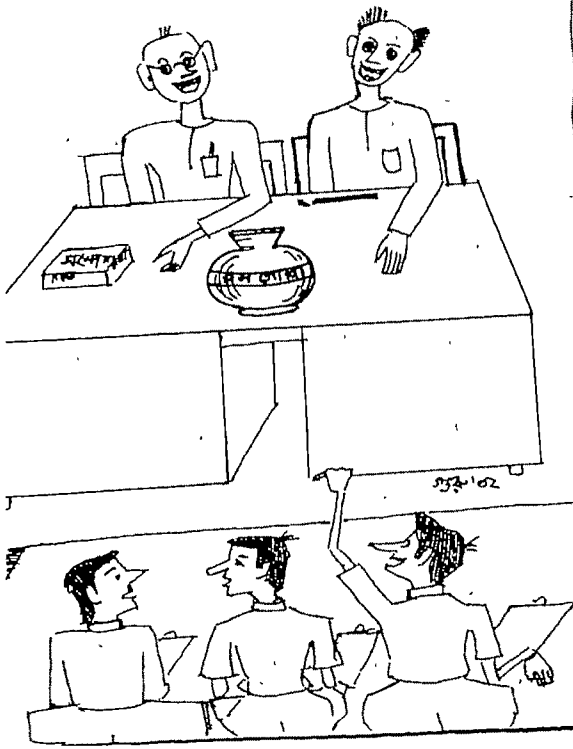
জীবনের নকল-নবিশি শুধু Noviceয়ের মতো নকল করার আগে জীবনেরই শিক্ষানবিশি প্রয়োজন। তার অভাব ঘটেছে বলেই 'আমার ভুবন' ছবিতে বেসিক স্কিলও অনুপস্থিত। দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে যদি পর্বান্তর বোঝায় তবে ইঞ্জুয়াল টাইম-ল্যাপ্সের সিকোয়েন্সও এতে নেই, সেখানেই কোলাঙ্গ করেছ ছবি, ছবি শেষ হবার অনেক আগেই। অবশ্য এসব বোঝবার ক্ষমতা ছিল কেবল সুকুমার বায়ের। 'না বুঝবি' তো মগজে তোব গজাল মেরে গোঁজাব'। তিনি নেই, সুকুমার বৃত্তিও আর নেই।

ছবির একমাত্র চমৎকার উপাদান, 'মম চিন্তে নিতি নৃত্য' এই গানটি। তার একমাত্র কারণটিও চমৎকার, এ গানটি মুগাল সেন লেখেননি। বা লিখতে যাননি। তাহলে নরক গুলজাব হত, বয়ের গুলজাব এসেও বাঁচাতে পারতেন না।

—পিনাকী ভাদুড়ী

কুইজ না হু ইজ!

কাকলি চৌধুরী



এইভাবে প্রথম রাউণ্ড শেষ হয়ে এল দ্বিতীয় রাউণ্ড। এবার একটু দেব-দেবীর দিকে ভক্তি উছলে পড়তে লাগল এবং তখনকার বিখ্যাত নর-নারীর অর্থাৎ দেব-দেবীর। জীবনকেছাড়া অর্থাৎ একেবারে নাড়ীনক্ষত্র যেন টেনে বার হতে লাগল।

প্রশ্ন করা হল,—মহাদেব কেন পার্বতীকে বিয়ে করলেন?

কেউ কেউ চেষ্টা করল।

কিন্তু না, হল না। কোনো উত্তরই সঠিক নির্বাচিত হল না।

এরপর আবার গুটিকয়েক কোশ্চেন করা হল। সীতাকে রামচন্দ্র কতবার 'I love you' বলেছিলেন? মা মনসার চোখ একটা কানা কেন? তখন কি অপারেশনের ব্যবস্থা ছিল না? দেবতাদের হাঁচি পেলে রুমাল কি তারা

সীতাকে রামচন্দ্র কতবার 'I love you' বলেছিলেন? মা মনসার চোখ একটা কানা কেন? তখন কি অপারেশনের ব্যবস্থা ছিল না? দেবতাদের হাঁচি পেলে রুমাল কি তারা ব্যবহার করত? ইন্দের উপপত্নী কটা ছিল? সরস্বতী কেন শুধু বীণা বাজায়, অর্গাস্টারও তো বাজাতে পারত।

পাড়ার রসিক ক্লাবে একটি প্রাণঘাতী কুইজ প্রতিযোগিতা হচ্ছে। ভেতরের ঘর লোকজনের চলাচলে, কথাবার্তায় গমগম করছে। পাশের ঘর থেকে কিসের ভুরভুরে মিষ্টি গন্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। প্রতিটি প্রতিযোগীর কাছে জলের বোতল ও একটা করে গোলাপ ফুল রাখা আছে। দর্শক উপচে পড়ছে। লাইট, ক্যামেরা চারদিকে ফ্ল্যাশ মারছে।

সহসা মাইকে ঘোষণা—সমস্ত প্রতিযোগীকে প্রস্তুত হতে বলা হচ্ছে। আমাদের প্রসঙ্গ এইবার শুরু হবে।

সবাই একটু নড়েচড়ে বসল। ঘোষণা করা হয়েছিল পুরস্কার হিসেবে একহাঁড়ি রসগোল্লা ও একবাক্স নলেনগুড়ের সন্দেশ দেওয়া হবে।

প্রথম রাউণ্ড প্রশ্ন শুরু হল,—পৃথিবীতে কটা পুকুর আছে?

প্রশ্ন শুনে প্রতিযোগীদের মধ্যে কয়েকজন প্রথমেই বিবম খেল। তাড়াতাড়ি জলের বোতল থেকে কয়েক টোঁক জল খেয়ে সামলালো কেউ কেউ। কয়েকজন আনন্দাজে কিছু বলল, কিন্তু তাদের উত্তর নাকচ হয়ে গেল।

এরপর আবার শুরু হল। কতটা নিচে পাতাল?

কোনো উত্তর নেই। অনেকেই ঘামতে লাগল। এইরকম যদি আরো ডজন খানেক প্রশ্ন করা হয় তবে তাদের ভাগ্যে আর মিষ্টির হাঁড়ি জুটবে না।

ব্যবহার করত? ইন্দের উপপত্নী কটা ছিল? সরস্বতী কেন শুধু বীণা বাজায়, অর্গাস্টারও তো বাজাতে পারত।

এইসব প্রশ্ন শুনে অনেকে প্রতিযোগী আর থাকতে না পেয়ে উঠেই পড়ল। সবাই অভিযোগ, গালমন্দ করতে লাগল। তবুও মিষ্টির লোভ দেখিয়ে তাদেরকে অধিকর্তারা ঠাণ্ডা করলেন।

এরপর তৃতীয় ও ফাইনাল রাউণ্ড। একেবারে অন্তরীক্ষে চলে গেল প্রশ্নগুলি। প্রশ্ন হল, চাঁদে গর্ত কটা?

একজন প্রতিযোগী বলেই বসল, আপনারা কি এই পৃথিবীর লোক নাকি রাঁচি থেকে পালিয়ে এসেছেন, নাকি পাগলা কুকুরে কামড়েছে?

হলঘরে হাসির রোল। অধিকর্তারা তৎক্ষণাৎ ওই প্রতিযোগীকে রীতিমতো নোটিশ দিয়ে বাইরে পাঠিয়ে দিলেন।

তৃতীয় রাউণ্ডেও প্রত্যেক প্রতিযোগীর ফল দাঁড়াল শূন্য। ফলে সকলে লোভনীয় মিষ্টির মায়া কাটিয়ে অচিরেই হলঘর ত্যাগ করল।

কিন্তু না, এ নলেনগুড়ের সন্দেশ ও রসগোল্লার হাঁড়ি কিন্তু বৃথা গেল না। দেখা গেল, এ লোভনীয় দুর্লভ মোহিনী খাদ্যসামগ্রী অধিকর্তারা বেশ আয়েস করে গোম্বাসে গিলছেন। প্রতিযোগিতাষ তাঁবাই তো জিতেছেন।

কড়া ২০০৩

অমিতাভ সান্যাল



গবুচন্দ্রের দাওয়াই

হ বুচন্দ্রের জমিদারিতে নিদারুণ সম্ভট উপস্থিত। রজকোষে অর্থ নেই। অথচ মানুষগুলানের কি খাই-খাই। পচিশ বছর ধরে অবিরাম লাগাতার খেয়েও খাই-খাই যায় না। বদহজম হয় না। উদুরী কলেরা জলাভঙ্গ আত্মিক—কিছুই হয় না। লব্ধকর্ণের মতো ইস্টিলের কণ্ঠাল বা হারমনি হজম করে বেমালুম। মানুষ জন্মায় শুধু। মরে না। শিশু মৃত্যু, যুব-যুবতী মৃত্যু, শ্রীচ মৃত্যুর হার এখনো কি নৈরাশ্যজনক!

হবু মহাসম্মেলন আহ্বান করেছেন। সেখানে তাবড় তাবড় উল্লাট ব্যক্তিত্বরা উপস্থিত। শিক্ষামন্ত্রী নবু, সংস্কৃতিমন্ত্রী কভু, শিল্পমন্ত্রী খগেন, কৃষিমন্ত্রী নগেন সভা আলো করে বসে রয়েছেন। বোঁয়ারা মিনারেল ওয়াটার রেখে গিয়েছে। সবাই উসখুশ করছেন। বিরিয়ানি আর বাটার চিকেন, রেশমি কাবাব আর আইসক্রিম কখন আসবে?

হবু গলা খাকারি দিলেন,—এই মুখ্যসচিব, অর্থমন্ত্রী কই? ওকে ডাকো। যত নস্টের গোড়া তো ঐ লোকটাই। ওকেই বিধান দিতে হবে। ইস! গুরুতে কত বড় বড় কথা। আমি অর্থনীতির ম্যাস্টার। আমি এম. আই. টির হ্যান। আমি হ্যানোর ত্যান। ক্যাচকলা। কচুপোড়া। হাবেভাবে যেন সুপার ফিল্মস্টার। তাও যদি মাথুরী দীক্ষিত বিয়েতে নেমন্তন্ন করত। মাকড়সার মতো গায়ের রঙ। হাঁসেব মতো চক্কিশ ঘণ্টা প্যাক প্যাক। এটা সব জানে, শুধু অর্থনীতি জানে না। নেহাৎ পাবলিক আমাদের পোষা আর এদেশে বিরোধী বলে কিছু নেই। থাকলে কী হত বল দেখি। একটা হস্তীমূর্খের জন্যে আমরা ন্যাজে-গোবরে হতাম না!

অর্থমন্ত্রী বগলে মণখানেক কাগজ নিয়ে ঘবে ঢুকলেন। হবু একে একেবারেই পছন্দ করেন না। পারলে আজই পাছায় জাম্পেশ একখানা লাথি কষাতেন। কী দুর্দৈব! লাথি কষাবার উপায় নেই। হবুর বাপ হরু একে খুব ডালোবাসতেন কিনা, তাই। বাহাদুরে বুড়ো আজও বেঁচে। অতএব লাথির যে রিফ্লেক্স অ্যাকশন হবে না, বলা যায় না।

হবু বললেন, এবার বলো দেখি গবুচন্দ্র, রাজকাষের এই হাল হল কী করে? আমার আশেপাশে আরো দু-ডজন রাজ্য। বে-হাল দেখে সবাই হাসে। আমার বাপটা তো শিল্পের পিণ্ডি মোক্ষমরূপে চটকে কেটে পড়েছে। ডিন রাজ্যের বণিকেরা এখানে আসবে ভেবেছ নাকি?

গবু দাঁড়ালেন। ফাইলপতর টেবিলে রাখলেন। চশমা মুছলেন। তারপর বললেন, তেজীর পর মন্দা হল অর্থনীতির নিয়ম। সনাতন নিয়ম। এবার মন্দা কাটাতে হবে। প্রশ্ন হচ্ছে, কী করে কাটাবে? একটা সমবেত প্রচেষ্টা দরকার। এসব আমার একার কাজ নাকি?

হবু এসব তত্ত্বকথা শুনে পুনরায় হুঙ্কার হলেন। তারপর বললেন, থামো থামো। ওসব অনেক শুনেছি। সপ্তাহে একদিন করে স-পারিষদ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে যাও। ওখানে লেকচারবাজি করো গিয়ে বরং। এখানে ব্যাখ্যা শোনাও। তুমি তো আমার বাপের আমল থেকে অর্থমন্ত্রী। তা, এই দপ্তরের এমন হাড়ির হাল হল কী করে?

অর্থমন্ত্রী পুনরায় চশমা মুছলেন। প্রেসমেন ও উওমেনদের দেখলেন। তারপর বললেন, জঁহাপনা, আমরা আর ওরা কি এক? আলু আর আলুবাখরা কি এক হল? আপনার বাপের আমলে পাবলিক কনফিডেন্স কিনতে বা আলিশান পার্টি অফিস-বানাতে বা পাইয়ে দিতে কত খরচ হয়েছিল ভাবুন দেখি? পরিকাঠামো নির্মাণ করেই না জনকল্যাণ, কী কন? মানুষগুলানকে এমনভাবে কেনা হয়েছে যে তারা আব কথাটি কইবে না। আপনার খুড়াও ক্রীত হয়েছেন। তাঁর দৃষ্টি অতঃপর আর বিকৃত হবে না। এভাবেই তো বছরের পব বছর ধরে রাজস্বের নব্বই শতাংশ অনুৎপাদনশীল কাজে ব্যয়িত হয়েছে। এই হল গিয়ে আমাদের জনমুখী ঘাটতিশূন্য বাজেট। উৎপাদন ছাড়া আয় হয় নাকি?

হবু বললেন, তাইলে কি হবে এখন? অবস্থা সামাল দেবে কী প্রকারে?

গবু পুনরায় চশমা, ক্যামেরামেন, উওমেন...। বললেন তারপর,—সিম্পল ওয়াটসন। ভেরি সিম্পল। আমি প্ল্যান অব অ্যাকশন তৈরি করেই এনেছি। অপারেশন গোলগাঙ্গা। পড়ে শোনাই?

কত বড় বড় কথা! আমি অর্থনীতির
মাস্টার! আমি এম. আই. টির হ্যান! আমি
হ্যানোর ত্যান! ক্যাচকলা! কচুপোড়া!
হাবেভাবে যেন সুপার ফিল্মস্টার! তাও
যদি মাধুরী দীক্ষিত বিয়েতে নেমন্তন্ন করত।

হবু আধশোয়া হয়ে বললেন, পড়ো। শুনি তোমার গোলগাল অপারেশনের কথা।

গবুর অপারেশন শুক হল। তিনি বললেন,—হে নরাধিপ! এতদিন পাবলিকের পেটের কথা না ভেবে অনেক বেশি খাওয়ানো হয়েছে। বাজারে বেশি টাকার ফ্রো এলে যেমন রিজার্ভ ব্যালেন্সের অর্থনৈতিক দাওয়াই, তেমনি বঙ্গের মানুষজনের পেট বাঁচাতে নয়! ব্যাশন এক অবধারিত প্রক্রিয়া। পাবলিকের পকেটে এখন মেলা বাড়তি টাকা। রাজকোষে এভাবেই টাকা ফিবে আসবে। অভাব (১) পেট্রোল-ডিজেলের ওপর ফি বছর দু'বার করে লিটার পিছু একটাকা সেস (২) গ্যাস সিলিন্ডার পিছু পাঁচ টাকা হাবে সেস (৩) রাজ্যের মধ্যে ছোট বড় মাঝারি সেতু পেরোলোই টোল (৪) কেবল কোম্পানিগুলির ওপর পনেরো শতাংশ কর (৫) সাইকেল, রিক্সা, অটো, বাস চললেই মুভমেন্ট ট্যাক্স। তবে স্কুটার নয়। (গবুর কন্যা-জামাতা স্কুটার খুব ভালোবাসেন।) (৬) স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়লেই পড়ুয়া ফি যথাক্রমে দশ কুড়ি ও ত্রিশ টাকা আদায় করা হবে। (৭) অতিকায় লবি রাজ্যে ঢুকলে পাঁচ টাকা ও বের হলে দু'টাকা, (৮) দার্জিলিং। মিরিক, দীঘা ইত্যাদি কুড়িটি স্থানে পর্যটন কর ধার্য হবে। (৯) ফ্ল্যাট হলেই প্রমোটার কনস্ট্রাকশন কাম প্রফিট ট্যাক্স দেবেন। (১০) প্রাইভেট স্কুলগুলিকে প্রতি মাসে হাজার টাকা

দিতে হবে। (১১) মাস্টারদের টিউশন কববার অধিকার ফিরিয়ে দিয়ে টিউশন লব্ধ অর্থের ত্রিশ শতাংশ হেডমাস্টারের মাধ্যমে বোর্ড অফিস বা পার্টি অফিসে জমা দিতে হবে। (১২) রাজকর্মচারীদের কৃচ্ছসাধন করতে হবে। মহার্ঘভাতা বন্ধ। মোবাইল হাতে মস্তানি দেখানো বন্ধ। চারজন এক্সিকিউটিভের একটি গাড়ি বরাদ্দ হবে এখন থেকে। (১৩) স্ট্যাম্প ফি, কোর্ট ফি বাড়বে আশি শতাংশ। (১৪) লাইসেন্স ফি পাঁচশ শতাংশ বাড়বে (১৫) জল ব্যবহারের জন্য কর বসবে।

একটু হাঁপ নিতে থামলেন অর্থমন্ত্রী। ঢকঢক করে এক বোতল মিনারেল ওয়াটার হাওয়া করে দিলেন। উর্দি পরা বাহকেরা সুগন্ধীয় ক্রে নিয়ে ঢুকছে। মন্ত্রীর খিদে পেয়েছে জব্বাব। তবে তাঁর বক্তৃত্তে যে শেষ হয়নি এখনো।

হবুচন্দ্র নিরামিষাশী। তাই বিবিয়ানিতে মন নেই তাঁর। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু গবু, কৃচ্ছসাধনের সবটাই যদি পাবলিকের তবে আমরা কী করব? আফটার অল, একদা আমরাও তো পাবলিক ছিলাম। পাবলিক থেকে পাবলিক ফিগার হলে নিদারুণ ইম্পর্টেন্স বেড়ে যায়। তবু আমরা যদি কিছু করে না দেখাই, তবে ইমেজ থান্ডা খাবে না?

গবু বললেন, ধীরে রজনী, ধীরে। গোলগাঙ্গার গল্পো তো শেষ হয়নি এখনো। আমরা যেহেতু মন্ত্রী বা দেশ-সেবক, আমাদের জন্য অন্যরকমের ব্যবস্থা। সে সবের প্রকৃতি এই রকম:—(ক) মন্ত্রীদের নিয়ে অনুষ্ঠান করতে গেলে ফুলের মালা বা বোকের বদলে শুধু গোলাপ ফুলের পাপাড়ি (খ) মুখ্যমন্ত্রীর হাতে, পকেটে আনলিমিটেড মোবাইল থাকলেও মন্ত্রীরা চারটের বেশি মোবাইল রাখতে পারবেন না। মোবাইল ও টেলিফোন বিল বাবদ অর্থ দ্বিমাসিক দশ হাজার এক টাকার বেশি হওয়া অব্যাহত। তবে যেসব মন্ত্রীর ছেলে-মেয়ে ব্যাস্কালোর, পুনে, বা বিদেশে থাকে তাঁরা মাসে পনেরো দিন দশ মিনিট করে কথা বলবেন। (গ) মন্ত্রীর বাড়িতে চাকর-বাকরের সংখ্যা ছয় ও সেবাবত পুলিশ কনস্টেবলের সংখ্যা দশের বেশি হবে না। (ঘ) মন্ত্রীবা সভা-সমিতিতে গেলে উত্তরে বেলডাঙা ও দক্ষিণে বেলদা, পশ্চিমে আসানসোল ও পূর্বে সীমান্ত অন্ধি শুনে শুনে ছয়টি গাড়ি নিয়ে যেতে পারবেন, যদিও মুখ্যমন্ত্রী যথারীতি একুশ গাড়ির মিছিল কবে রাজ্যের সর্বত্র নাচানাচি কববেন (ঙ) রাজ্যে এখন সন্ত্রাসের পবিত্রেশ কিনা, তাই মন্ত্রীদের নিরাপত্তার স্বার্থে অস্ত্রবক্ষকের সংখ্যা যথারীতি পঁচিশ থাকবে, তবে মন্দিরে কোনো হামলা হচ্ছে না ভেবে নিয়ে মন্দির থেকে নিরাপত্তা সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। (চ) মন্ত্রী-বাড়ি ব মাননীয় মহিলারা ব্যক্তিগত কাজে সরকারি গাড়ি ব্যবহার করতেই পারেন তবে লাল আলো না জ্বালানোই শ্রেয়। বা বিধেয়।

হবু দাওয়াইয়ের ব্যাখ্যান শুনে মুগ্ধ হলেন। তাঁর মস্তমুগ্ধ ভাব ক্রমশ চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হল। তিনি কথঞ্চিৎ বিমর্ষও হলেন। তিনি কেন এতদিন গবুকে গব্যস্তাব ভাবতেন? তিনি হুকুম করলেন, ওহে, আমাদের গবুকে দু-প্লেট বিরিয়ানি দাও। সাথে চারপিস বাটার চিকেন।

প্রেসমেন ও উওমেন ইতিমধ্যেই কুড়ি-বাইশ প্লেট সাফ করে দিয়েছেন। আহা, এর সাথে যদি একটু 'ইয়ে' পাওয়া যেত—কী ভালোই না হত তাহলে। সি. এম স্কিষ্ট ওয়ানিং দিয়েছেন—কোনো অবস্থাতেই যেন মিটিংয়ের নিগলিতার্থ পাবলিক না হয়। তাহলে সব ব্যাটার সরকারি বিজ্ঞাপনে হ্যাভিকেন বুলবে। কাগজে ছবি বার হোক। টি-ভিতে অর্থমন্ত্রীর মুখ দেখানো যেতে পারে। হেডিং হতে পারে,—'জনকল্যাণে মন্ত্রীদের সমবেত শপথ। বাঙলাব ভাগ্যাকাশে নব সুখোদয়।'

অর্থমন্ত্রী বারো ঘন্টার বারোয়ারি বাবদ তিনলক্ষ তিন হাজার তিনশো ত্রিশ টাকার বাজেট হস্তদিতে 'পাস' করে দেবার কথা দিলেন। অতঃপর সভা শেষ।

পথঘাটের কিসসা



কাট কাট

সেদিন মঙ্গলবারের বিকেল ছিল। কলেজ থেকে নিউআলিপুর স্টেশনের মাঝে একটা ছোট গলি পড়ে। অনেক ইঞ্জিন সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে বলে ভয়ে ভয়ে রেললাইন পবে হতে হয়। রোজকার মতন আমি ঐদিক দিয়ে যেতে গিয়ে দেখি ভীষণ ভিড়। পুলিশ, লোকজন দাঁড়িয়ে রয়েছে। দূর থেকে দেখি একটা মেয়ে সাদা কাপড়ে ঢাকা। শুয়ে আছে বেললাইনের মধ্যে, চারপাশে রক্ত ছোটানো। ক্যামেরা ও মাইক্রোফোন সামনে। আমাব আব বুঝতে বাকি রইল না কি ঘটেছে। আতঙ্কে সাততাজাতা ডি দৌড়ে পেরিয়ে যেতেই পিছন থেকে হুস্কার—কাট! কাট!!

সর্বনাশ, এরা জঙ্গী নাকি? ভয়ে অবশ হয়ে প্রায় পড়ে যাচ্ছিলাম। তখন শুনতে পেলাম—“হতচ্ছাড়া মেয়ে। ছোটার আর জায়গা পেলি না? ঠিক ক্যামেরার সামনে দিয়ে। দিলি তো শটটা মাটি করে!!”

—কাকলি চৌধুরী

উনিও তো....

রাত সওয়া এগারোটা। ঠাণ্ডার সময়। বাইক চালিয়ে ছেলোট গড়িয়াহাট উড়ালপুলের নিচে দাঁড়াল। দাঁড়িয়েই আছে। গাট্টাগোটা চেহারা। চঞ্চল চোখে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। খুবই সন্দেহজনক। কর্তব্যবত পুলিশ কনস্টেবলের ফুরুর কঁচকে উঠল, উগ্রবাদী নয় তো? এফুনি হয় তো ব্রিজসুদ্ধ ওড়ুম!! ভেবে নিজের শিরদাঁডাতেই হুড়ুম ঠুকে যায় আব কি। তবু কর্তব্যে তো অবহেলা করা যায় না। কাপতে কাপতে এগোলেন পুলিশবাবু,—এখানে দাঁড়িয়ে কেন, কী কারণে?

যুবক ঘেলাটে মুখ ঘোরাল পুলিশের দিকে। খানিকক্ষণ জরিপ কবে ঠাণ্ডা স্বরে বলল, একজনকে খুঁজছি।

পুলিশবাবুব নাকে এক পবিচিত গন্ধ ঝাপটা মাবল। একেবারে নীতিজ্ঞানের গোড়ায়। ধমকে উঠলেন তিনি—একি! মদ খেয়েছেন? আপনি তো ইনটক্সিকেটেড! বাইক চালাচ্ছেন কেন?

—চালাচ্ছি না তো। দাঁড়িয়ে আছি।

—ইনটক্সিকেটেড হয়ে বাইক নিয়ে বেবিয়েছেন কেন?

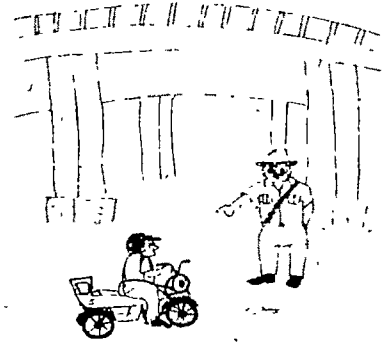
—ডাক্তারবাবুকে খুঁজতে। সূট কবে বেবিয়ে এসেছেন। যাবেন শ্যামবাজার। এখন ট্যাক্সি পেলেন কিনা।

—কেন, সূট করে বেরিয়ে এলেন কেন? উনি তো ডাক্তার, চোর তো নন।

—উনিও যে ইনটক্সিকেটেড হয়ে আছেন।

—অ্যা!!

পুলিশবাবু বিস্ময়ে থ'। তিনিও ইনটক্সিকেটেড হয়ে পড়বেন শেষে—বোধহয় এমন আশঙ্কা হল তাঁর। শান্তিটাক্তি দূরে থাক, ভড়িঘড়ি আঁতুল বাড়িয়ে বললেন—বাড়ি যান। বাড়ি যান!!



দুখ-বিষয়ক মুখবোধ

ভোববেলা গাড়ি নিয়ে বেরোনো তাঁর অভ্যাস। মর্নিক ওয়াক নয়, মর্নিং ড্রাইভ। আবার একা গেলে ঠিক পোষায় না। একজন সঙ্গিনী থাকে সঙ্গে, তিনি তিন-বছরের বন্ধু-কন্যা পিঙ্গি। কোলে নিয়ে একহাতে তাকে এবং অন্যহাতে সিমারিং সামলান বন্ধুবর্। সেদিন ঘুবতে ঘুবতে চলে গেলেন বাটা। গাড়ি থীবে চালাতে হয়। ফিবতে ফিবতে বেলা গডাল যথেষ্ট। খিদেয় চেম্বাতে ওক কবেছে বাচ্চাটি। বন্ধুবর ইতিউতি উকিঝুকি মারতে মাঝতে চালাচ্ছেন। এ খিদের দাওয়াই একটিই। যদি সন্ধান পাওয়া যায়।

হঠাৎই আবিষ্কার হল। ঘরের মধ্যে বাচ্চাকে বুকেব দুখ খাওয়াচ্ছেন এক মহিলা। গাড়ি থেমে গেল। বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে বাবু দবজায় হাজির,—বৌদি!

মহিলা ডেকেচুকে বসেছেন,—কে আপনি? কী চাই?

—আমাকে চিনবেন না। বাচ্চাটার বড খিদে পেয়েছে। একটু—

—বিস্কুট?

—না না—

—সদেধ?

—না না—

—তবে?

—আসলে অন্য কিছুই ও খাবে না। ওই—ইয়ে—আপনার বাচ্চাকে যা খাওয়াচ্ছিলেন—

—কী! অসভ্য কোথাকাব, বদমায়েশ!—চিৎকার কবে উঠলেন ভদ্রমহিলা।

তাবপব কে জানে কি ভেবে ফিক করে হেসে ফেললেন। হাত বাড়িয়ে বললেন, ঠিক আছে, বাচ্চাটাকে আমার কোলে দিয়ে আপনি একটু বাইবে গিয়ে দাঁডান।

ভদ্রলোকের পরিচয়? না বলা যাবে না। তিনি পত্রপাঠ-এব একজন কস্তাবাক্তি কিনা!

—মৈনাক মিত্র

রাশি চক্ৰ

জ্যোতিষসাত্রী সৌভাগ্যদমন মহারাজ

অটল বিহারী রাশি : মোটামুটি অটল থাকতে পারবেন। তবে নব বলে বলীয়ান মোদীগ্রহ মধ্যে মধ্যে অবস্থান পরিবর্তন করার ফর্পল ষ্ট্রুটর পীড়া মাথায় চড়তে পারে। বক্তৃতা দেবার কালে দুটি বাক্যের মাঝে নিদ্রাভ্যাস কমাতে উপকার পাবেন।

মলিতকৃষ্ণ রাশি : কলির কৃষ্ণ হিসেবে নববর্ষ ভালোই যাবে। তবে প্রেমের বাঁশিতে যুদ্ধের সুর বাজাতে গিয়ে মাঝে মাঝে বেসুরো বাজতে পারে। স্বপ্নের জন্যে কস-মার্ক গাফ ও হোয়ার উইডিং-এর মাধ্যমে কৃষ্ণোচিত চূড়া বাগাতে পারলে উপকার পাবেন। স্বরাষ্ট্র সংঘাত খুব বেশি না হলেও স্বদল সংঘাত শতদলে বিকশিত হবার সম্ভাবনা আছে।

মমতা রাশি : নবীন শীতে গলা ভাঙার ধ্রুবযোগ। ফলে গলাবাজির সাময়িক বিরতি। তবে 'হে মার্কস রক্ষে করো' দশার সরকারের নানান প্রলাপ আপনার প্রোট লোশনের কাজ করতে পারে। তৎক্ষণাৎ মোশান প্রাপ্তি। প্রকাশ্যে ঘাসফুল ও অপ্রকাশ্যে পদ্মফুলের ছাপ গ্রহণ টোটকার কাজ দিতে পারে।

তোপাডিয়া রাশি : গুজরাট ছাড়া সব জায়গায় হিন্দুদের ধুমো টোপাট হয়ে যাচ্ছে বলে আশা হারাবেন না। আশায় মরে চাষা, সন্যাসী কখনোই নয়। যদিও বঙ্গ গ্রহ আপনার ক্ষেত্রে খুবই বঙ্গ তবু এই বঙ্গেই শাসনকর্তা স্বয়ং বুদ্ধদেব এবং শাসন প্রত্যাশী তথাগত। শুনে পুনরুজ্জীবিত হবেন যে খোদ কলকাতায় আপনার নামে 'তেঘরিয়া' বলে একটি জায়গার পত্তন হয়েছে। প্রবল প্রতাপে বাবা লোকনাথ সেখানে বিরাজ করছেন। জয় বাবা লোকনাথ, জয় বাবা তেঘরিয়া, জয় বাবা তোপাডিয়া—এরূপ সোপান-যোগ লক্ষ্য করা যায়। যে কোনো মুহূর্তেই আপনার প্রার্থনা তথাস্ত হতে পারে, অবশ্য স্বপ্নে।

অসীম রাশি : তলানি-সম্বল কোষাগার আপনার মস্তিষ্ক কোষে তীব্র বেদনার সম্ভার করতে পারে। তথাপি সদন্ত বুলি পরিত্যাগ না করাই বিষয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী নিজের উদ্দেশ্যে 'সীমার মাঝে অসীম তুমি' মন্ত্রটি প্রত্যহ উষাকালে বিশবার জপ করলে মনোবল অটুট থাকবে।



সোনিয়া রাশি : সোনার দাম উর্ধ্বমুখী হলেও সোনিয়ার মূল্যহ্রাস যোগ লক্ষ্য করা যায়। গুজরাট পরীক্ষায় হিন্দুগ্রহের অবস্থান আপনার কর্মক্ষেত্রে নড়বড়ে থাকায় আপনার রাজনীতি-রেখা বিপরীতগামী হয়েছে। একটি ভারতীয় নীলা ও ইতালীয় লালার শরণাপন্ন হওয়া বিষয়।

বুদ্ধদেব রাশি : নিউইয়ারের প্রথম দিনটিতেই আপনার কর্ম-সংস্কৃতি রসাতলগামী হওয়ার অন্ত-যোগ আছে। তবে মোটর ভেহিকেলস্, সাব-রেজিস্ট্রী অফিস ইত্যাদি কর্মক্ষেত্রে কর্মের বান ডেকে যাবে। অফিস বন্ধের নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হওয়ার দেড়-দু'ঘণ্টা পর পর্যন্ত উৎকোচনীলা অব্যাহত থাকবে। হস্তে মাইক্রোফোন ও কণ্ঠে নিরন্তর ভাষণ ধারণ করলে এমন কর্মসংস্কৃতি দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়তে পারে।

দম্বর রাশি : দু-চারটে লোক-লস্কর কলে পড়েছে কিংবা পটকে গেছে বলে দুশ্চিন্তার কোনো কারণই নেই। যেখানে-সেখানে দু-একজন আত্মঘাতী পাঠিয়ে সগুণি আত্মঘাতী হওয়ার যে মহান ব্রত, তা নতুন বছরে বেশ জাঁকিয়ে উঠতে পারে। পাটকেল সামলাতে না পারলেও ঢিল ছোঁড়ার তাকতের অভাব হবে না। আপনার মস্তিষ্কে অধিক ক্রোধ ও হস্তে কালাশনিকত ধারণে দেশব্যাপী সংখ্যালঘু মুসলিমদের সর্বনাশের রাস্তা নিকটবর্তী হতে পারে।

বইয়ের মলাট দেখে কিনবেন না।
বইয়ের ছাপাই দেখে কিনবেন না।
বইয়ের বাঁধাই দেখে কিনবেন না।
বইয়ের বিষয় দেখে কিনুন।

সমরেশ মজুমদার যেখানে বেপরোয়া, ছেড়ে কথা কননি কাউকেই, 'কইতে কথা বাধে'নি একাতিলও

অকপটে ৩৫

পত্রপাঠ-এ কে না লিখেছেন সরস গল্প! মনোজ বসুর অপ্রকাশিত রসের গল্প থেকে শুরু করে
শক্তিপদ রাজগুরু, বুদ্ধদেব গুহ, দিব্যেন্দু পালিত, নবনীতা দেব সেন, সমরেশ মজুমদার, সন্দীপন
চট্টোপাধ্যায়, কণা বসু মিশ্র.... এমনকি কবি-গল্পকাররাও—সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, শরৎকুমার
মুখোপাধ্যায়, মন্দাক্রান্তা সেন—মলাট নয়, মলাটের অভ্যন্তরে এঁরা রসের অবগাহনে

পত্রপাঠ সহর্ষ গল্পসংগ্রহ ৩৫

পত্রপাঠ প্রকাশন

১০জে, ফার্ম রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৯

ফোন : ২৪৪০-৩৮০৩ (সকাল ৮-১০টা, সন্ধ্যা ৫-১০টা)

৯৮৩০০-৫২১৮২ (শুধুমাত্র পুস্তক সংক্রান্ত বিষয়ে 'পত্রপাঠ' পত্রিকা সংক্রান্ত নয়)

পরিবেশক : নবজাতক প্রকাশন, এ৬৪ কলেজস্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা-৭

প্রাপ্তিস্থান : লেখা প্রকাশনী, ৫৭ডি কলেজস্ট্রিট, কলকাতা-৭৩

নতুন বাড়ি বানাতে চান? কিংবা বহুতল? আপনার
অন্তর্বিম্বিত ক্যার্টটিকে করে তুলতে চান বাক্যকে,
একেকবারে নতুন? নাকি পুরনো বাড়িটির ডোলা বদলে
ডাক লাগিয়ে দিতে চান সকাফকে? ডাবাছেন কার
শরণাপন্ন হবেন? না জেনে কোনো ঠগের দ্বারস্থ হয়ে
ঠকতে হবে না তা জায়ে? সেজন্যে আপনার অবশ্যই
জানার প্রয়োজন—

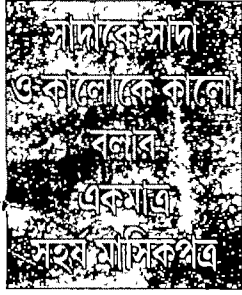
নিশ্চিত দীর্ঘস্থায়ী সুদৃশ্য গৃহ কিংবা বহুতল
নির্মাণের জন্য পরিপূর্ণ বিশ্বাস এবং নির্ভরতার প্রতীক

তাজেল শেখ

২৮ বি, যোগেন্দ্র গার্ডেন্স

কলকাতা - ৭০০ ০৭৮

দূরভাষ : ২৪৪২-৮৪২৪



ফেব্রুয়ারি ২০০৩

ঐপাঠ

৩য় বর্ষ।। ৭ম সংখ্যা

বিদায় নেবার জন্য ন

দাম : ৮ টাকা



কাউকে হাসানোর
কাগজ
কাউকে ফাঁসানোর
কাগজ

নাংরা জলের বই-তরলী
বই-তরলী বাইবে কে

গোমড়া মুখে আর থাকা নয় । দারাত বছরের শনি-মজার আগাম বায়না করে যাত ।

মাত্র ১২০ টাকা দিয়ে অপ্রাচীর এক বছরের সড়ক গ্রাহক
হোন । আর সঙ্গে নিয়ে যান একটি সুন্দর দেওয়ান ঘড়ি

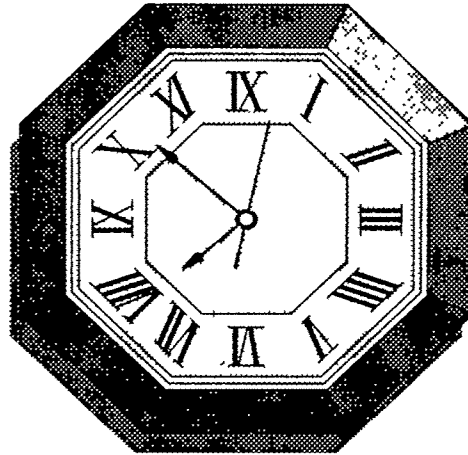
একদম



উপহার ষ্টক থাকা পর্যন্ত ।
পেতে চাইলে কালকের জন্যে
অপেক্ষা করবেন না ।
চলে আসুন আজই ।

বইমেলা ষ্টল নং :

এস-২৯৪



হাসানোর জন্য আমরা দায়ী ফাঁসানোর জন্যে নয় ।

প্রদর্শন

১০বি, (অথবা ১০জে) ফার্ম রোড,
কলকাতা-৭০০০১৯, ফোন : ২৪৪০-৩৮০৩

নোংরা জন্মের বই-ভরণী

বই-ভরণী বাইবে কে?

ফেব্রুয়ারি ২০০৩ ৥ ৩য় বর্ষ ৥ ৭ম সংখ্যা

দাম : ৮ টাকা

কাউকে হাসানোর কাগজ
কাউকে ফাঁসানোর কাগজ

সাদাকে সাদা ও কালোকে কালো বলার একমাত্র সর্ব সাসিকপত্র

পত্রিকা
বিদায় নেবার জন্য নয়

পুরনো কাসুন্দি : ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পাঁচুঠাকুর' থেকে □ ৪

রসকাব্য : পরচড়া-পড় • দিগম্বর বজ্রওয়ালা □ ১১ কাঙালি • সৌরেন বসু □ ৩৫

গল্প : গডেট • প্রবীর মণ্ডল □ ১৭ একটি ধোঁয়াটে গল্প • পিনাকীশঙ্কর চৌধুরী □ ১৮

নিয়মিত কলাম : অকপটে : পারভাটেড উইপোকারা • সমরেশ মজুমদার □ ২২ চরণ বৈরাগীর ইকড়ি মিকড়ি : বই নেবে-গো—বাংলা বই • চরণ বৈরাগী □ ১২ তারাপদ রায় ও গঙ্গারাম • তারাপদ রায় □ ৭ কড়চা ২০০৩ : সাংস্কৃতিক বিপ্লব • অমিতাভ সান্যাল □ ৪১

ধারাবাহিক রূপোপন্যাস : মারায়ণ • পিনাকী শঙ্কর চৌধুরী □ ২৮

বই-ভরণী : বঙ্গ ভারতীর রঙ্গদর্শন • সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য □ ৩৪ বই-ঠগী গল্প • পিনাকী ভাদুড়ী □ ৪৪

রসনাট্য : ঠাট্টা • সনৎকুমার মিত্র □ ৪৬

রসগদ্য : ডায়াবেটিস • মনোজিৎ বিশ্বামিত্র □ ২১ আবার বাঁচি • দিব্যেন্দু দাস □ ২৭ হাজার রাজার বাজার • অলোক বসু □ ৩৬ শীতকাল • আইভান হো হো □ ৪৩

এছাড়া : বিচিত্রা • দিব্যালোচন কলমধারী □ ১৫ সং-এর যোগ্যতা • শরদিন্দু কর □ ২৬ চিরকালের কৌতুক • কাকলি সরকার □ ৩৯

নিয়মিত বিভাগ : সম্পাদকীয় □ ৩ কার্টুন □ ২, ১০ পত্রপাঠ জবাব □ ৮ সাহিত্য দুঃসংবাদ □ ৯ পথঘাটের কিসসা □ ১৪ ট্যারা চোখে □ ১৬ জবাব খবর □ ২৪ রাশি চক্রের □ ৩৩ হৈসেল □ ৪০ পুরুষ মহল □ ৪৭ মহিলা মহল □ ৪৮

প্রচ্ছদের শ্রবি : শোভিক বসু রায়

অলঙ্করণ : গুরুপ্রসাদ দাস • শোভিক বসু রায় • সুপর্ণা মণ্ডল

কর্ম সহায়ক : অচিন্তা কারক

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা : নীরঞ্জননাথ চক্রবর্তী • তারাপদ রায়

• সমরেশ মজুমদার • শঙ্করলাল ভট্টাচার্য

সম্পাদক : শেখর আহমেদ

পরিচালন সমিতি : ডাঃ তুষারকান্তি রায় • প্রদ্যোত কুমার মিত্র • বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী • অঞ্জনা দত্ত • ডঃ শুভাশিস নিয়োগী • শচীন মিত্র



পারভাটেড উইপোকারা ২২

শেখর আহমেদ কর্তৃক ১০ জে, ফার্ন বোড (গ্রাউণ্ড ফ্লোর), কলি-১৯ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন : ২৪৪০-৩৮০৩ (সকাল ৮-১০টা, রাতি ১০টা পর)
সম্পাদকীয় দপ্তর : (সন্ধ্যা ৫-৩০ থেকে ৮-৩০) ১০ বি, ফার্ন বোড, কলি-১৯, মুদ্রণ : দেবী সারদা প্রেস, ৩০এ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলি-৯

সুসংস্কৃতি দপ্তর
সম্পাদকপদে পুস্তক প্রকাশক

সুন্দরী সুবর্তী
এক্সপ্লোরেশন

বটতলা গ্রন্থাগার লেখক চিহ্ন। লেখিকা অগ্রগণ্য।
(সোনাছাথে সোনাগাছি উপন্যাস লিখিলে পুরস্কারের গ্যারান্টি)



শোভিক

কার্টুন : শোভিক বসু রায়

সম্পাদকীয়



বই-তরণীর কথা

বৈতরণী পার হওয়া সহজসাধ্য নহে। গরুর ন্যাজমাত্র ভরসা। এক এবং অদ্বিতীয়। পর্যাপ্ত পরিমাণ খড়-ভূষি ঘাস-বিচালি জোগাইলে গরু যখন দুগ্ধভারাবনত বাঁটও ধরিতে দেয় তখন ন্যাজ কি আর ধরিতে দিবে না? অবশ্যই দিবে। বৈতরণীর কাল-জলে হাবুডুবু খাইতে খাইতেও গরুর উপরে এই নিশ্চিত ভরসা করা যায়। কিন্তু বই-তরণী? সেটি যে বড় আদিম জলে ভাসিতেছে। আদিরসের তরঙ্গ তথায় উথাল-পাথাল। আর কি মজা, তরণীটি ফুটা হইয়াছে, দমকে দমকে উঠিতেছে আদি রসধারা। আঁজলা ভরিয়া বই-ব্যাপারীগণ খরিদারকে আহ্বান করিতেছেন। বই-বিমুখ নাইট ক্লাবাসক্ত, ইণ্টারনেটের নীল ছবিতে মগ্ন বাবুরা নাকি তবেই মুখ ফিরাইবেন। এই বটতলা-কামরস পাতায় পাতায় মাখিয়া অতঃপর বই-সোনা গাছতলায় দাঁড়াইবে। কামসূত্র কিংবা সচিত্র যৌন-বিজ্ঞানের এইরূপে প্র্যাকটিকাল হইবে। আদিম আদম সাহেব লজ্জাজ্ঞান লাভের পর আচ্ছাদন খুঁজিয়াছিলেন। আমাদিগের বই-তরণীর যাত্রীগণের দিব্যজ্ঞান লাভ হইয়াছে। তাঁহারা তাই আচ্ছাদন উন্মোচনে মাতিয়াছেন। আমাদিগের কোনো জ্ঞানই নাই, পাড়ে দাঁড়াইয়া তরণীটির সলিল সমাধি-যাত্রা লক্ষ্য করিতেছি। হে পাঠক, উহাদের জন্য দুই বিন্দু অশ্রুপাত করিও, নিজেদের জন্যও বটে।

পঞ্চানন্দ মুমূর্ষু দেহে জীবনসঞ্চার করিবে, পৃথিবী নিষ্কত্রিয়া করিবে,
অর্থাৎ যাহারা পত্রিকার গ্রাহক হইয়া মূল্য না দেয়, তাহাদিগকে খুব—
খুব শক্ত—আরও শক্ত—আশীর্বাদ করিবে। দীর্ঘায়ুৰস্ত!

পুরনো কাসুন্দি

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পাঁচুঠাকুর’ থেকে



তামাসা নয়

এই ত ভবেব হাটে রসের পসরা মাথায়
উপস্থিত হওয়া গেল। এই ত ভবসাগরে
বঙ্গিল পানসী ডাসান গেল। এই ত
ভবের ঘনিতে আশ্রয়-ঘোড়ন করা গেল। এই ত
ভবের অসারে নামা গেল। এই ত ভবলীলা আরম্ভ
হইল! এখন দেখা যাউক—তোমারই এক দিন,

কি আমারই এক দিন।

পঞ্চানন্দ বাহিব হইল, লোক-সমাজে এই
অলোক-সামাজিক—অলোক-সামান্যই বলিতাম,
কিন্তু তাহা হইলে অনুপ্রাস ভঙ্গ হয়—এই অলোক-
সামাজিক বস্তিকা এখন নয়নানন্দদায়িনী হইবে,
তদ্বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই। কিন্তু লোকে
জিজ্ঞাসা করিতে পারে, এ আলোক কতদিন
অস্তরে ভারত উজ্জ্বল করিবে? সূর্য্য প্রতিদিন

উদিত হন, কিন্তু সূর্য্যের আলোক অতি তীব্র—
“অসূর্য্যাম্পশ্যরূপা!” চন্দ্র ক্রমে ক্রমে কলা-
প্রদর্শনপূর্ব্বক মাসে একবার মাত্র পূর্ণমাত্রায় আশ্রয়-
বিকাশ করেন; তদভিন্ন পুরাতন কাহিনী অনুসারে
চন্দ্রে কলঙ্ক আছে। নিত্য নৈমিত্তিক গৃহস্থের
প্রদীপ—

“সুবর্ণ-দেউটি যথা তুলসীব মূলে”—

মিট মিট করিয়া জ্বলে, বাতাসে নিবিয়া যায়,
এবং ঠিকা ধবাইবার সময়ে দীপ-ছায়া উপস্থিত
হয়, তবে এ আলোক কেমন?

এ আলোক কেমন? গভীরভাবে এই গুরু
প্রশ্নের উত্তর দিতে আমবা বাধ্য। এ আলোক—
বলিয়াই ফেলি—এ আলোক করাল কাদম্বিনীর
অস্ত্রবিদ্যাবিধী সৌদামিনী—সদৃশ, ভৈরবী শ্যামার
সমর-রঙ্গকালীন হাসির মত। ইহাতে জগৎ চকিত
হইবে, স্তম্ভিত হইবে, ঘন বিকম্পিত হইবে,
মোহিত হইবে! ভয়ে বিহুল হইবে, অথচ আনন্দে
অধীর হইবে। তবে আমাদের মুখে এ কথা শোভা
পায় না। না-ই পাইল, লেখা ত জমিয়া গেল।
যাহা হইবে, তাহা হইবে। অদৃষ্টবাদ, কাবণবাদ,
বিবাদ, বিসম্বাদ কিছুতেই তাহার প্রতিবাদ হইবে
না।

অসময়ে যে বন্ধু, সেই বন্ধু—“শ্মশানে চ
যন্তিষ্ঠতি সং বান্ধবঃ।”—পঞ্চানন্দ সেই অসময়ের
বন্ধু, পঞ্চানন্দ সেই শ্মশানবন্ধু। ষড়দর্শনের লোপে
ভারতে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছিল; ঔরস পুত্রের
অভাবে আবণ্ড একাদশ প্রকার পুত্রের ব্যবস্থা
মনুষ্যহত্যায় আছে; সেই জন্য ষড়দর্শনের অভাব
দুরীকরণ জন্য বঙ্গদর্শন আর্য্যদর্শন শ্যাম-দেশোদ্ভব
যমজ ভ্রাতাব ন্যায় কিঞ্চিৎ অগ্রা পশ্চাৎ পরাতলে
অবতীর্ণ হইলেন। এখন তাহাদেবও অস্তিমদশা—
মুখ ব্যাদান করেন বটে, কিন্তু সে খাবি-খাইবার
জন্য, আর কি নীবব থাকিবার সময়? অতএব উঠ,
বন্ধুগণ উঠ! জাগ ভারতের হিতব্রত, জাগো!—
পঞ্চানন্দ স্বয়ং উপস্থিত। (এখানে বুঝিতে হইবে)
—অতএব উপস্থিত।

পঞ্চানন্দ মুমূর্ষু দেহে জীবনসঞ্চার করিবে, পৃথিবী নিঃশ্বাসিত্রিয়া করিবে, অর্থাৎ যাহারা পত্রিকার গ্রাহক হইয়া মূল্য না দেয়, তাহাদিগকে খুব—খুব শক্ত—আরও শক্ত—আশীর্বাদ করিবে। দীর্ঘায়ুৰন্ত।

“বঙ্গ-দর্শন” প্রভৃতি সাময়িক পত্র; সেই জন্য মাসে মাসে দেখা দিবার আশ্বাস দিয়াছিল। পারে নাই, কারণ বাঙ্গালী—স্বীজাতি। স্বীজাতির এমন প্রতিজ্ঞা থাকে না। প্রথম প্রথম দুদিন দশ দিন; তাহার পরে—ভগবানকি হাত। পঞ্চানন্দ স্বীলোক নহে।

পঞ্চানন্দ দুঃসময়ের বন্ধু, সেই জন্য অসাময়িক, যখন ফুরসৎ, তখনই সাপ্লাৎ।

পঞ্চানন্দের দর্শনী—যেবার যেমন মজিঙ্গা। আধুনিক “দর্শন” সমূহের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কেহ কেহ দিয়া থাকেন; সে শ্রেণীর লোককে এই মাত্র বলা যাইতেছে যে, তাহারা যখন চব্বিশ মাসে বৎসর গণনা করিয়া পরিতুষ্ট তখন পঞ্চানন্দকেও যাহা ইচ্ছা দিয়া রাখিতে পারেন, অগ্রাহ্য হইবে না।

এখন আশীর্বাদ করি, এই শুক্তির মুক্তা, দেবতার ইন্দ্রে, নন্দনের পারিজাত, স্নেহের পঞ্চানন্দ—দীর্ঘজীবী হইয়া নিজের আয়ুর্বুদ্ধি, যশোবুদ্ধি এবং অর্থবুদ্ধি ও সর্ব সমৃদ্ধির কামনা করিতে রহুন।—এমেন্।

ভূমিকা

নন্দ উবাচ।

হরিতে হর, হরে হরি,

দুই দেহ এক আত্মা ভিন্ন কভু নয়।

দুই আত্মা এক দেহ ভিন্ন কভু হয়?

অতএব হরি হর দুয়ে এক, একে দুই; পঞ্চানন্দ তৎৎৎ।

তথাপি রূপভেদে উপাসনাভেদ; অবতারভেদে লীলাভেদ; সেই জন্য—নন্দেরও ভূমিকাভেদ আছে। এ ভেদে যিনি ভয় পাইবেন তিনি চৈত্র মাসের কেহ নন, চৈত্র মাস তাহার কেহ নয়; সকের জলপান, সাড়ে আঠার ভাজা, চণক-চূর্ণ, চাল-কলাই ভাজ্য তাহার অধিকার নাই। তিনি দন্তহীন বৃদ্ধ, চর্কণরসে বঞ্চিত। যখন দুর্ভিক্ষ জন্য আর্তনাদ-পুরসের আমরা অশ্রুপাত করিব, তখন চক্ষের সেই জলের দু-ফোটা, তাহারা পাইবেন। ইহার অধিক প্রত্যাশা করিলে—যাও, কিছু নেহি মিলে গা।

শুকদেব গোস্বামী লায়েক হইয়া, তাহার পর ভূমিষ্ঠ হন; আর বাঙ্গালার গ্রন্থকারগণ মৃত্যুর পরে বিদ্যাভাস আরম্ভ করেন; আমরা দুয়ের বাঁরা। আমাদের যে কিছু বিদ্যা বুদ্ধি, তাহা জন্মগ্রহণের পর উপাধিকৃত; এবং আমাদের যে শিক্ষা, তাহা মৃত্যুর পূর্বেই সমাহিত হইবে।

পঞ্চানন্দ লিখিবেন কি সম্পাদিবেন, সূত্রাং অগত্যা এই প্রশ্ন উঠিতেছে। বঙ্গোজ্জ্বলোজ্জ্বলা সমুদায় পত্র-পত্রিকাতেই বাঙ্গালার সমস্ত প্রধান প্রধান লেখক লিখিয়া থাকেন; এমতাবস্থায় ঈশ্বর বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত, বঙ্কিম চাট্টো, সেক্সপিয়ার, গেটে, এমার্সন্, কার্লাইল এবং রাজা রামমোহন রায় এই কয়েকজনকে লেখকশ্রেণীতে বেতন দিয়া নিযুক্ত করিয়া আমরা আসরে অবতীর্ণ হইলাম। ইহাতে কেহ দুঃখিত হইবেন না। সত্ত্বেই যাহাতে লেখকসংখ্যা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, তাহার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে; “শকুন্তলাগৃহের” বাহিরে যে শাদা ফর্দে খুলিয়া রাখা হইয়াছে, তাহা আমাদেরই; সেখানকার অনুগ্রাহকবর্গ তথাকার স্ব স্ব কার্য সম্পাদনাত্তর সেই ফর্দে নাম লিখিয়া যাইবেন; আমরা তাহাদের বেতনের বন্দোবস্ত করিয়া

তদ্বিগ্নের দ্বারা রচাইব।

পঞ্চানন্দের এক কলম অর্থাৎ এক লেখনী লিখিলে দুই টাকা দেওয়া যাইবে; যাহাদের লেখা পত্রস্থ হইবে, তাহাদিকে দেওয়া যাইবে না, যাহারা বেতনের জন্য পীড়াপীড়ি করিবেন, তাহাদের লেখা লওয়া যাইবে না। পঞ্চানন্দ কখন দেউলিয়া পড়িবে না, বুক ঠুকিয়া এ কথা ঘোষণা করা যাইতেছে।

এবারে যে যে প্রবন্ধ হইল, তাহা পাঠ-সাপেক্ষ; সূত্রাং তৎসমস্তের গুণ গান করিয়া পঞ্চানন্দ জঘন্য আত্ম-তৃপ্তিসাধন করিতে পরাজুখ। এতদ্ভিন্ন পঞ্চানন্দ অতিশয় লাজুক, সেই জন্য প্রথম মজলিসে গলা ছাড়িয়া গান গাহিতে চাহেন না। এবারে নিদামের নব-জলদ-সঞ্চার, করকানির্ঘোষ, অশ্বিনিসম্পাত, বিদ্যাক্রম, এবং কদাচ শিলাবর্ষণে পর্যবসান। কিন্তু আগামী বারে প্রাবৃটের মুঘলখার, ধরিত্রী-কন্দম-চর্চিতবপু, দর্দুরের স্বরসাধন ও গায়রহ মনোহার্যের প্রাচুর্য বিদ্যমান দেখা যাইবে। ঈশ্বর বিদ্যাগাসর ওজোময়ী সীতার বনবাসের চন্দ্রে “মনসার ভাসান,” রামমোহন রায় “কুলবালার বিষম জ্বালা,” বঙ্কিম চাট্টো “স্বী-পুরুষের জাতিভেদ কত দিন হইয়াছে এবং তাহা উন্মুলনের উপায় কি?” প্রবন্ধ দিতে প্রতিশ্রাব করিয়াছেন। অপর শুভ কিম্বিকিমিত্তি।

পঞ্চানন্দের আত্মচিত্র

অবতরণিকা

অনেকগুলি কারণের বশবর্তী হইয়া আমাকে আত্মজীবন-বৃত্তান্ত লিখিতে এবং প্রকাশ করিতে হইয়াছে; জীবনীতে প্রবেশ করিবার আগে, সেই কারণগুলি ব্যক্ত করা আবশ্যিক বলিয়া বোধ হইতেছে।

প্রথম কারণ, আমার অনিচ্ছা। আমার বিশ্বাস যে, ছাপার অক্ষরে, পুস্তকের আকারে, দোকানদারের মাথায়, ফেবিওলার বোচকায়, বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জল-খাবারের ঘরে, আমার এই আত্মচিত্রিত গৌরব বিকীর্ণ করিবে; আমার বিশ্বাস যে, উই কি ইন্দুর যদি শত্রুতা না করে, ক্ষিত্যপ্তেজোমরুধ্যাম

জন স্টুয়ার্ট মিল নামক এক ব্যক্তি

ধরাধামে জন্মগ্রহণ করেন; কিন্তু

কেবল জন্মগ্রহণে পরিতুষ্ট না

হইয়া মৃত্যুগ্রহণ পর্যন্ত করেন।

যদি বাদ না সাধে, তবে আমার এই অতুলকীর্তি যুগে যুগে বর্তমান রহিয়া কালের গোল-করাল রসনাকে লালায়িত করিতে থাকিবে; অথচ কখন তাহার শোরাহ হইবে না। গ্রন্থ পঠিত হইলে ক্ষম পায়, ক্রমে লয় পায়; প্রথমে মলাট যায়, তার পর সেলাই যায়, ক্রমে জীর্ণ শীর্ণ, ছিন্ন ভিন্ন। কোন কোন গ্রন্থকার এই শোকজনক, লজ্জাজনক, ঘৃণাজনক ভাবে নিজকীর্তি বিস্মস্ত-এবং কালের করালকবলে কবলিত হইতে দেখিয়াও সন্তুষ্ট হন সত্য; কিন্তু অনেকেরই ভাগ্য অন্যরূপ। আমার সাধ থাকিলেও শক্তি নাই। সেইজন্য আমার অনিচ্ছা, এবং এই অনিচ্ছা নিতান্ত বেগবতী বলিয়াই এই আত্মচিত্রের

প্রশ্নোত্তর

প্রকাশ। শতকরা নিরানব্বই খানি পুস্তকের ভূমিকা খুলিয়া দেখ, আমার বাক্যের যথার্থ্য সপ্রমাণ হইবে।

পুস্তক লিখিতে ইচ্ছা নাই, লিখিলে ছাপাইতে ইচ্ছা নাই, কিন্তু নাচার, বন্ধুবান্ধব নাছাড়, তাঁহাদের অনুরোধে পুস্তক বাহির করিতে হয়। আমার বন্ধুবান্ধব নাই, কেবল অনিচ্ছাটুকু আছে। সেই জন্য এ জীবন বৃত্তান্ত সহস্র সহস্র দীন-দুঃখীর ভরণপোষণ জন্য সংসারে অগ্রসর হইল। কতক্ষণে আমার মত মহানুভবগণের প্রকাশ প্রবৃত্তি জন্মিবে, এই উদ্দেশ্যে কাগজওয়ালা ছাপাওয়ালার প্রভৃতি কত কত ওয়ালা, তীর্থের কাকের মত হা-প্রত্যাশ করিয়া বসিয়া আছে,—যখন এই কথা আমার মনে হয়, তখন চক্ষে জল আইসে; ইহারা কেহই দাম পাইবে না, সুতরাং নালিশবন্দ হইবে, এই আশ্বাসে কত কত নিরাশ্রয় উকীল, মোস্তাফিজ, দালাল, দাগাবাজ, ছোট বড় আদালতে নিয়ত পরিভ্রাম্যমাণ হইতেছে—এ চিত্র যখন আমার অন্তরে উদ্ভিত হয়, তখন আমি নিজমহত্ত্ব অনুভব করিয়া অশ্রুপাত করি; তাহার পর ইহারা মামলা জিতিয়া দেনার দায়ে আমাকে ধরিতে আসিবে—এই কল্পনায় যখন আমার মস্তিষ্ক আন্দোলিত এবং সঞ্চালিত হইয়া উঠে, তখন আমি ভাবী ভয়ে কান্দিয়া ফেলি। তথাপি আমার অনিচ্ছা, এবং সেই অনিচ্ছা হেতু এই প্রকাশ।

দ্বিতীয় কারণ, বিদ্যাভূষণ ভায়া (১)। জন স্টুয়ার্ট মিল নামক একব্যক্তি ধরাধামে জন্মগ্রহণ করেন; কিন্তু কেবল জন্মগ্রহণে পরিতুষ্ট না হইয়া মৃত্যুগ্রহণ পর্যন্ত করেন। তিনিও—অর্থাৎ মিল—আমার মত আত্মচারিত লেখেন, কিন্তু তাহা ইংরেজীতে। বিদ্যাভূষণ ভায়া নিঃস্বার্থভাবে বাঙ্গালা ভাষায় সেই আত্ম-চরিত্রের অনুবাদ করিয়াছেন; কেহই সে অনুবাদ পড়ে না, কেহই সে অনুবাদ কেনে না, তবু স্বার্থত্যাগ এমনই বস্তু, মিল এখন বাঙ্গালা অক্ষরে অমর। হনুমান অমর বর লাভ করিয়া নানা মূর্তিতে আমাদের কাছে জ্বালাতন করিতেছেন; দাঁতখিচোন, আঁচড়ান, কামড়ান,—ভয়ে কথাটি কহিবার যো নাই। আমার এই সৌভাগ্য হইবে না বলিয়া আশঙ্কা আছে; কিন্তু আমার নাম অমর হইতে পারে না, ইহা তোমাকে কে বলিল? অফ্রিকার মরুভূমে, নায়াগারার জলপ্রপাতে, আল্পসের উজ্জ্বল শিখরে, স্নোজের সঙ্গীর্ণ খালে; চীনে তাহারে; ফ্রান্সে, জর্মানীতে, মাদ্রিডে, সেন্টপিটার্সবর্গে (২),—এই ত্রিভুবনে আমার জন্য একটিও বিদ্যাভূষণ নাই, ইহা কোন্ প্রাণে বিশ্বাস করিব? তবে, বল দেখি, আমি যদি না লিখিয়া রাখি, তবে সে বিদ্যাভূষণটির দশা কি হইবে? অগত্যা আমাকে আত্মচারিত লিখিতে হইতেছে।

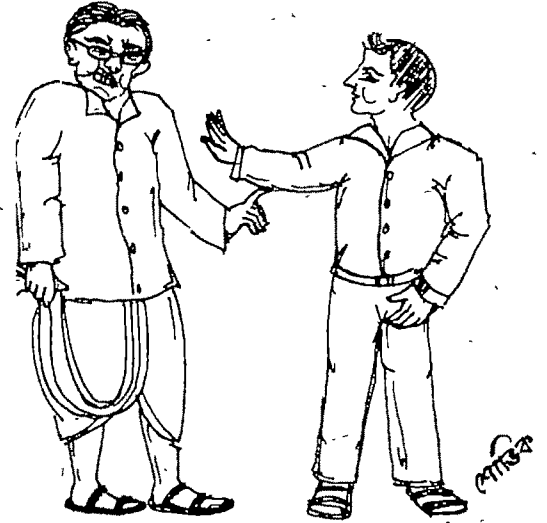
তৃতীয় কারণ, সাফ পরোপকার। প্রকৃতিতে প্রকৃত মাধুরী নাই, প্রকৃত সৌন্দর্য্য নাই, অনেকে এই বলিয়া আক্ষেপ করেন। সেই দুঃখে কল্পনা দেবীর উদরে, বক্ষিমচন্দ্রের মস্তকের ঔরসে, কতকগুলি মাধুরী এবং সৌন্দর্যের উৎপত্তি; পূর্ণচন্দ্রের (৩) উপর সেইগুলি লালন-পালনের ভার। কিন্তু আমি মাধুরীর অবতার, সৌন্দর্যের রূপ। এই আত্মচারিত লিখিলে বক্ষিমচন্দ্রের মাথা বাঁচিবে; পূর্ণচন্দ্রের নরকষাটা ঘুচিবে, সাধও মিটিবে। বিলাতের এক মেম বিজ্ঞানের ক্ষোভ নিবারণ উদ্দেশ্যে ব্যবচ্ছেদ জন্য নিজ মৃতদেহ উইল করিয়া যান; পূর্ণচন্দ্রের ক্ষোভ নিবারণ জন্য আমি এই আত্মচারিত দান করিলাম। উইল করা অপেক্ষা দান করায় মাহাত্ম্য অধিক।

তিন কারণের উল্লেখ করিলাম; আরও তেত্রিশ কোটি আছে; কিন্তু আমার বিচারে সেগুলির কথা তুলিবার দবকার নাই।



প্রশ্ন। (গ্রন্থকারকে বন্ধু) কেমন হে, তোমার বই কাটছে কেমন?

উত্তর। উই আর ইঁদুর—বিলক্ষণ।



প্রশ্ন। “সাহিত্যসভা” কাহাকে বলে?

উত্তর। একটা বস্তুতে ছেলে; পড়াশুনায় মন নাই; আত্মটুকু বিলক্ষণ; চিঠিপত্র ছাপাইয়া দরখাস্ত করে, ডিস্কা করে, অভিনন্দন দেয়, শেষে ধরা পড়ে।

(১) যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

(২) রুশিয়ার রাজধানী, বর্তমান নাম—লেলিনগ্রাড।

(৩) পূর্ণচন্দ্র বসু, যাঁহার “কাব্য-সুন্দরী”তে বক্ষিমচন্দ্রের উপন্যাস ঘটতি ক্রী-চরিত্রের বিস্তারিত সমালোচনা আছে।

তারাপদ রায় ও গঙ্গারাম

তারাপদ রায়



গঙ্গারাম বিমান সংস্থার
কাউন্টারে মুখ গলিয়ে
বলল, স্যুটকেস দুটো
ব্যাঙ্কে যাবে। আর ব্যাগ
দুটোর মধ্যে একটা
টোকিওতে একটা
সানফ্রান্সিসকোয় যাবে।

বৎসারান্তে একবার ছেলের কাছে যাই। জায়গাটা প্রশান্ত মহাসাগরের ওপারে—সুদূর মার্কিন দেশে। ক্যালিফোর্নিয়া নামক স্বর্গরাজ্যে। এখন তো ব্যাপারটা নিয়মিত হয়ে গেছে। লোকে আর বিশেষ কৌতূহল দেখায় না। রড়জোর খোঁজখবর নেয় আমি ও মিনতি কলকাতায় আছি কি না। আজকাল আমার অনুগত ভাই এবং শ্যালক ছাড়া বিমানবন্দরে Seeoff করতে কেউ আসে না। তাছাড়া ব্যাপারটা খরচার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। পঁচিশ টাকা না পঞ্চাশ টাকা কত যেন প্রবেশ দক্ষিণা দিতে হয়।

বিদেশ যাওয়ার মুখে ৫০/- তো আর ৫০/- থাকে না। সেও হয়ে যায় এক ডলার কিন্না পৌনে এক Pound. মানসিকভাবে তখন তার মূল্য যথসামান্য।

তবুও বিমান বন্দর পর্যন্ত গঙ্গারাম আমার সঙ্গী হয়েছিল। রওনা হবার দিন গাড়িতে মালপত্র তোলার সময় দেখি গঙ্গাবাম এসে হাজির। মালপত্র গাড়ির পেছনের ডিকিতে সাজাচ্ছে। আমার তো ভক্তের সংখ্যা বেশি নেই, তাই গঙ্গারামের আগমনে ভালোই লাগল। কিন্তু ভদ্রতা করে বললাম, তুমি আবার কষ্ট করে এলে কেন?

গঙ্গারাম বলল, চলুন না যাই, আপনাকে ঠিকমতো তুলে দিয়ে আসি।

গতবছর তো মালপত্র হারিয়ে বিতর্কিত্তিরি কাণ্ড করেছিলেন।

বিমান বন্দরে পৌঁছে কি এক কৌশলে গঙ্গারাম আমাদের সঙ্গে বিমান সংস্থার কাউন্টার পর্যন্ত পৌঁছে গেল। আমাদের সঙ্গে দুটো বড় স্যুটকেস আর দুটো ব্যাগ, এছাড়া দু'জনের সঙ্গেই হাতব্যাগ ইত্যাদি আছে। তা, সেগুলো তো সঙ্গেই থাকবে। কেবল বড় ব্যাগগুলো বিমানের পেটের মধ্যে যাবে। গঙ্গারাম বিমান সংস্থার কাউন্টারে মুখ গলিয়ে বলল, স্যুটকেস দুটো ব্যাঙ্কে যাবে। আর ব্যাগ দুটোর মধ্যে একটা টোকিওতে একটা সানফ্রান্সিসকোয় যাবে।

গঙ্গারামের কথা শুনে আমি তো অবাক। বিমান সংস্থার কর্মচারীরা তথৈব চ। গঙ্গারাম তখন নিজেই নিজেকে ব্যাখ্যা করল, গতবছর তো এই রকমই করেছিলেন। চকিতে আমার মনে পড়ল—ঠিক তাই। তিন জায়গায় না হলেও গতবছর দুটো ভিন্ন জায়গায় আমার মালপত্র চলে গিয়েছিল। বিদেশে এসে সব উদ্ধার করতে যথেষ্ট হাল্কা হয়েছিল।

গঙ্গারামের বক্তব্যের মানে বিমান সংস্থার কর্মীরাও বুঝতে পেরেছিল। তাঁরা হেসে বললেন, 'না না, সব ঠিকঠাক যাবে। আমরা ঠিকমতো ট্যাগ লাগিয়ে দেব।

সত্যি এবার সব মালপত্র ঠিকঠাক গিয়েছিল। গঙ্গাকে জীবনে এই একবার ধন্যবাদ জানিয়েছিলাম।

পত্রপাঠ জবাব

জবাব দিচ্ছেন : দ্বিতীয় সুগ্রীব



● আমার পিসু, বাবা, মেসো, কাকা, দাদা প্রত্যেকের মাথায় বেজায় টাক আছে। তা দেখে আমার মাঝেমাঝে ভাবী ভয় হয়। ওদের প্রত্যেকেরই ভালো টাকাপয়সাও রয়েছে। শুনেছি টাকা থাকলেই টাক হয়। ভবিষ্যতে যদি আমি টাকা রোজগার করি আমারও কি টাক গজাবে?

—টিকি দাস, মালদহ

□ কথাটা উল্টো। আগে টাক, তারপর টাকা। লেগে পড়ুন জয় মা বলে।

● অনেক পত্রিকাই তো বিজ্ঞাপন, স্কুল আর্টিক্যাল, বিভিন্ন পছা অবলম্বন করেই বেশ হস্টপুস্ট হয়েছে, তবে শুধু পত্রপাঠই কেন এত রোগা, পাতলা? কী দিলে মোটা হবে?

—বাবিন, কলকাতা-১৯

□ লোকে বোগা হওয়ার জন্যে লাখটাকা খরচ করছে, জিম-এ যাচ্ছে...উঃ। আপনি কি শত্রুপক্ষের লোক?

● আপনাদের সম্পাদকের সাহস তো কম নয়। তিনি পত্রিকায় অন্যান্য মান্য ব্যক্তিদের সম্পর্কে যেভাবে সমালোচনা করছেন তাতে আর কিছুদিন বাদেই জেলের ঘানি, চোখের পানি এবং চোখ রাঙানি তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে। তিনি যেন অবিলম্বে পরনিন্দা, পরচর্চা বন্ধ করেন এবং নিজেকে নিয়েই যেন বেশি মাথা ঘামান। অন্যথায় বিপদ হবে।

—শ্যামল দাস, হুগলী

□ আপনি কোন জঙ্গি বাহিনীর?

● 'Old is gold'— কথাটা সত্যি?

—সাগরিকা সাহা, সস্তোষপুর

□ কথাটা খুবই goldমেল

● বিরহ না মিলন কার আকর্ষণ বেশি?

—বিনায়ক বসু, চন্দননগর, হুগলী

□ ওই দু'জনের ছবি না দেখলে কিছু বলা যাচ্ছে না।

● আপনারা কোন জাতের বলুন তো?

—সেখ মোমিন, মেদিনীপুর

□ বঙ্গভ্রাতার শিবোমণি।

● আমি চেষ্টা করে, ওষুধপত্র খেয়ে ওজন কমিয়েছি। কিন্তু ৬০ থেকে মাত্র ৫০-এ। পত্রপাঠ কী খেয়ে এমন রোগা থাকতে পারে।

—কিংগুক পাত্র, কুচবিহার

□ ঘেঁফ পাঠকের গালমন্দ।

● 'চোখের বালি' আর 'চোরাবালি'-র মধ্যে পার্থক্য কি?

—অভয় কর, জলপাইগুড়ি

□ প্রথমটা রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন। সেটা আছে আপনার বইয়ের তাকে। আর দ্বিতীয়টা আপনারই তৈরি, আছে আপনার পায়ের নিচে।

● আপনারা আমার ঘর-সংসার ভেঙে দিতে বসেছেন। পত্রপাঠ পড়ে আমার বউ আমাকে বাপ ভুলে গালমন্দ করছে, মুখ ঝামটা দিচ্ছে, চড়ঘুঘি লাগি—বলতে গেলে আর কিছুই বাকি নেই।

—নরোত্তম রায়, কলকাতা-১২

□ দয়া করে এই সুসংবাদটা আমাদের বউদেরকে জানিয়ে দেবেন না।

● কবিতা কারা লেখে?

—জাহানারা খাতুন, বারুইপুর, দঃ ২৪ পরগণা

□ যারা কিছুই করতে পারে না, এমনকি কবিতা লিখতেও।

● আপনারা যে এতদিন রাঁচিতে বন্দি ছিলেন তাতে কোনো সমেই নেই। কিন্তু প্রশ্ন—কেমন ছিলেন?

—সুহাস ঘোড়াই, সাঁওতালডিহি

□ খুব ভালো ছিলুম। আপনাদের পাল্লায় অন্তত পড়তে হত না। আবাব ফিরে যাব ভাবছিলুম, কিন্তু রাঁচির ওপর যে টান আপনার দেখা যাচ্ছে.....

এরা যারা বুক-পাবলিশারের নলচে আড়াল করে বুক-টুক তো নসি, ব্রা-প্যাণ্টি পর্যন্ত খুলে ফেলে আরো ভেতরের মাল পাবলিশ করতে শুরু করেছে তাদের কোন নামে ডাকব?

সাহিত্য দুঃসংবাদ

একেবারে হাড়কাটা গলি, এইসব মলাটে দেখিয়ে পকেট কাটার আদিম আয়োজন। সাহিত্যের ভড়ং করে এদের হাফ-গেরস্তপনা।

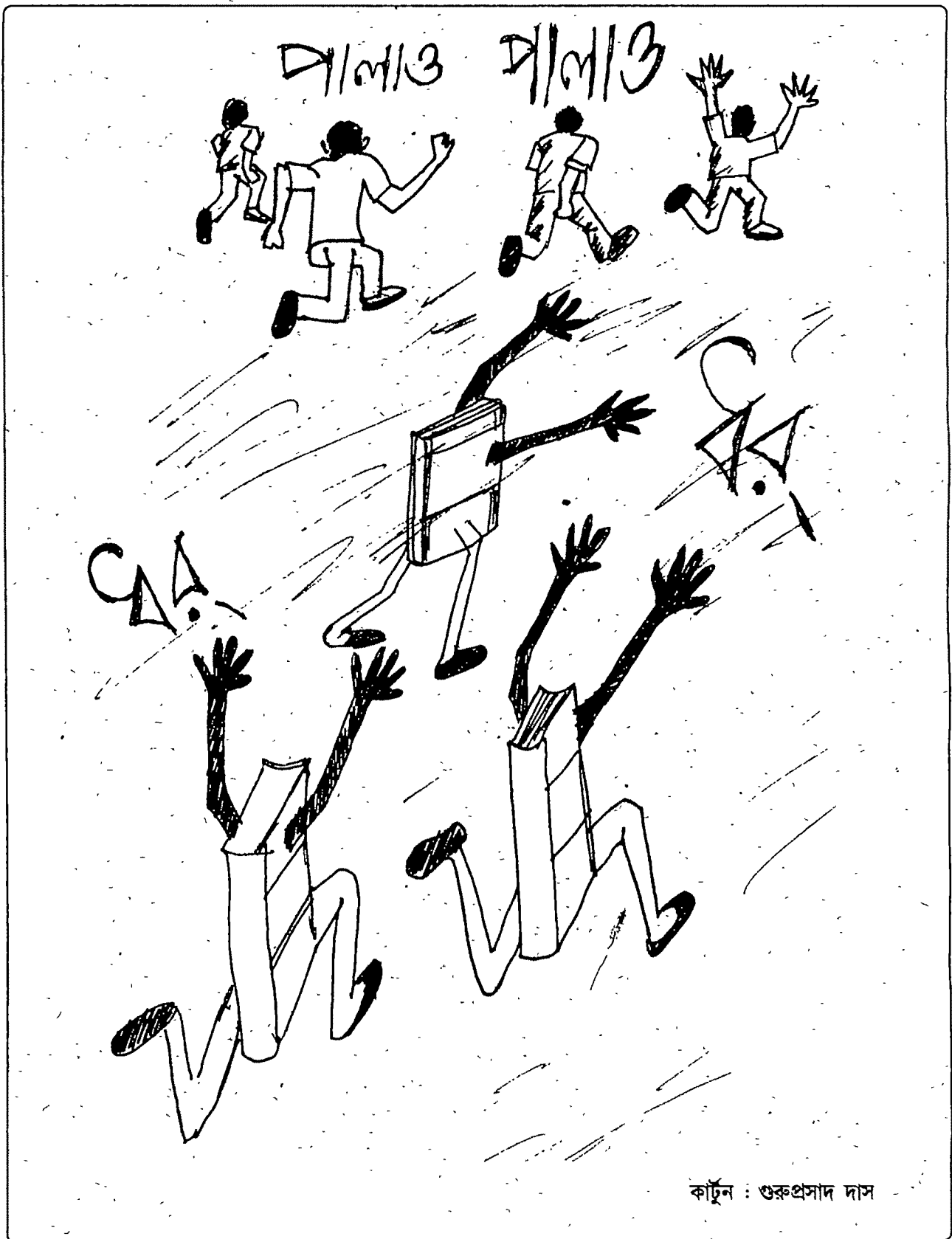


বই পাড়ার Sex-Pure পাবলিয়ার্ডেরা

যাঁড়ের কথায় যাবার আগে স্কুলজীবনের কথাটা বলে নিই। কোন মহাপুরুষের কী অবদান স্যার জিঙ্গেস করছেন। ক্রাস ফাইভ, সেক্সন এ। রোল নম্বর ২৭-কে স্যার জিঙ্গেস করলেন—মহাবীর কী করেছিলেন? রোল সাতাশ হচ্ছে গৌতম, সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল—স্যার, মহাবীর যৌনধর্ম প্রচার করেছিলেন। পরে এ নিয়ে গৌতমকে কম খ্যাতিপাইনি, ওর নামই দিয়েছিলাম 'মহাবীর'। কিন্তু বইপাড়ার সেইসব 'পাবলিয়ার্ড' যারা বইকে উচ্ছৃঙ্খলিতের রূপ দিতে সক্ষম হয়েছেন তাদের কী নাম দেব? গৌতমের সেটা ছিল স্লিপ অফ টাং, আর এখন এরা যারা বুক-পাবলিশারের নলচে আড়াল করে বুক-টুক তে, নসি, ব্রা-প্যাণ্টি পর্যন্ত খুলে ফেলে আরো ভেতরের মাল পাবলিশ করতে শুরু করেছে তাদের কোন নামে ডাকব? কলেজস্ট্রিটের Sex-Pure? না কি পাবলিয়ার্ড? এদের সংখ্যাই দেখি দিন দিন বেড়ে চলেছে। আগে যে যৌনতার বই বইবাজারে ছিল না তা নয়। ছিল। তাদের নাম ছিল 'যৌন বিজ্ঞান', 'সচিত্র যৌন বিজ্ঞান', 'দেহে এলো যৌবন' আর ফুটে হলদে সেলোফেনে মোড়া 'কোকশাত্র' বা 'উতল রজনী'। কিন্তু সাহিত্যের ছদ্মবেশে এইসব 'অজস্র এক অসভ্য রজনী'রা ছিল না। এখন আবার বাংলায় ঠিক জমছে না, কাঙ্ক্ষিত মেড ফরেন লিকারের মতো সাহেবদের লেখা বইয়ের ইচ্ছেমতো রগরগে অনুবাদ চলছে। এক 'পাবলিয়ার্ড' তে ওধু এইসব মাল বিক্রি করবেই লাল হয়ে গেল। আমাদের বছরকার কুম্ভমেলা 'কলকাতা পুস্তক মেলা'-য় এখন এরাই খিকখিক করছে দেখতে পাই। বইমেলায় খন্দের টানার জন্যে এদের স্টল একেবারে ট্রান্সপারেণ্ট, সব কাচের দেয়াল ঠেস দিয়ে রয়েছে—নানান গড়নের নিতম্ব, স্তন, যোনির প্রকট ইশারা। একেবারে

হাড়কাটা গলি, এইসব মলাটে দেখিয়ে পকেট কাটার আদিম আয়োজন। সাহিত্যের ভড়ং করে এদের হাফ-গেরস্তপনা। বইমেলায় আগে আগে এদের বিজ্ঞাপনে খন্দের ডাকা শুরু হয়। সে কী ভাষা। দুই সাহিত্যিকের নামে একটা জোক্‌স বাজারে ছাড়া আছে, একজন প্রবীণ, আরেকজন যুবক। প্রবীণ সাহিত্যিকের বারান্দায় বসে গল্পগুজব চলছে। পাশেই মেয়েদের স্কুল। স্কুলের সময় তো রাস্তা দেখতে দেখতে প্রবীণ সাহিত্যিক নবীনকে বললেন—বুঝলে, এখন এই বয়সেও এসব দেখলে কান গরম হয়ে ওঠে। শুনে অবাক হয়ে নবীনটি বললেন—ও, আপনি বুঝি 'ওটা'কে কান বলেন? তা, এইসব পাবলিয়ার্ডদের জিঙ্গেস করা দরকার তারা 'ওটা'কেই বই মনে করে কি না। বেশ কয়েক বছর আগে সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় কয়েকজন প্রকাশকের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছিলেন—সেখানে দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যবসাসর্বস্ব এক প্রকাশককে বলেছিলেন, তাহলে আর 'প্রকাশক' নয়, এখন থেকে আপনাকে 'বইওলা' বলব। তো, এদের কী বলব—'বাইওলা'? টিভিতে হিন্দি সিনেমায় যখন নায়ক-নায়িকার নাচ দেখি তখন ওদের কোমর ও নিতম্বের উপর্যুপরি ওঠানামা দেখে মনে হয় এর চেয়ে এরা প্যাণ্টের জিপার খুলে আর শালোয়ারের দড়ি খুলে আসল কাজটাই করুক, সেটা কম অশ্লীল। এইসব পাবলিয়ার্ডদেরও বলতে ইচ্ছে করে—অত ঘোরপ্যাচে না গিয়ে হলুদ সেলোফেনে মুড়েই না হয় আপনাদের ছাপা Sex বিক্রি করুন আব বইমেলায় ওইসব বইয়ের সঙ্গে ফ্রি দিন 'শিলাজিত' 'মদনানন্দ মোদক', 'ফটি প্রাস' বা 'পৌরুষ জীবন'-এর ক্যাপসুল।

—স্বামী কমলানন্দ অবস্থত



পরচড়া-পড়

শ্রী দিগম্বর বস্তুওয়ালা ও টিপ্পনী দেবীর যুগলফন্দি

॥ শ্রী দিগম্বরের প্রশ্নাম ॥

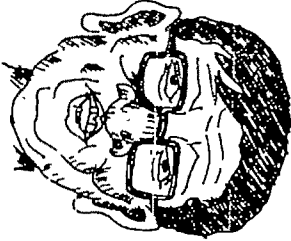
ওঁ নমো পরচর্চাদেবায় পত্রপাঠহিতায় চ।
সুমুগ্ধিতায় উড়ো থৈ গোবিন্দায় নমো নমঃ॥
খান্না দেয়ং খান্না পায়ং লাপান্তা উপসম্ভব।
আহি চং সুন্দরীবক্ষ বামচক্ষু মারো হরিঃ॥

॥ টিপ্পনী দেবীর প্রশ্নাম ॥

Kiss নাও বাসুদেবায় আকাদেমি নন্দনে চ।
অশেষ ক্রেশ ভালোবাসায় গোবিন্দকে নমো নমঃ।
হে ডিস্ট্রে করুণাসিন্ধো ডেনিমগন্ধ পাঞ্জাবিতে।
সাক্ষাস রজনীকান্ত হ্রতিক-সানি নমোহস্ততে॥

॥ শ্রীশ্রী পরচর্চার নয়ছয়োস্তর দশ নাম ॥

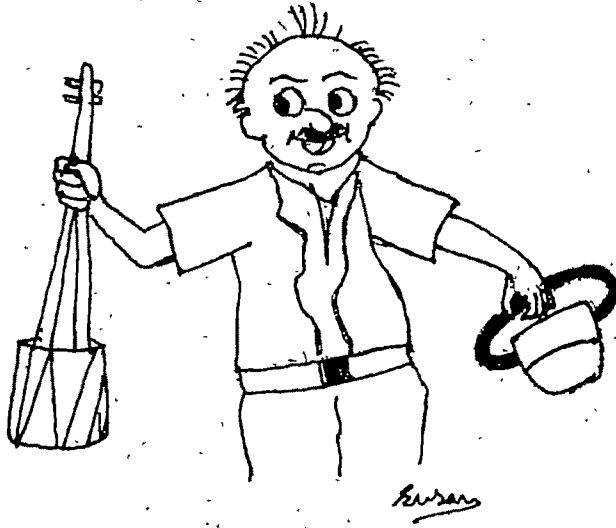
জয় জয় কানাকানি খুরে খুরে গড়।
অর্ধচন্দ্র কর কৃপা করুণা-সাগর॥
জয় কাঁখে গোবিন্দা গো-পাল গলাগলি।
শ্রীধার কালোজিরে মাকুন্দ-স্নবারি॥
পরচর্চা বিনে রে (ভাই) পরনিষ্ঠা বিনে।
বিফলে পাঠকজন্ম যায় দিনে দিনে॥
দিন গেল দেখে দেখে রাত্রি গেল নিদ্রে।
না ভজিনু পরচর্চা-চরণরিবিন্দে॥
পরচর্চাবার তরে সংসারে আইনু।
কে কী মনে করে ভেবে বোবাসম ইহনু॥
ফলরূপ ভূমিকম্প বাড়ি ভাঙি পড়ে।
ধন্যরূপে মমতাদি মঞ্চে চোপা করে॥
পরচর্চা জন্ম নিলেন বৈঠকী উদরে।
বকে বকে দেবগণ গুলবৃষ্টি করে॥
আড্ডাদেব রাখি আইল রকের মন্দিরে।
রক 'পরে পরচর্চা কানে কানে বাড়ে॥
দুর্বলরা রাখে নাম 'প্রভু যাহা করো'॥
শ্রীসুবোধ নাম রাখে 'মরীচিকা সেন'।
'মল্লিকা প্রতিবাদী' ফ্যানেরা বল্লেন॥
চাপ পেয়ে নাম রাখে 'আনন্দ-ললনা'॥
'প্রতিষ্ঠান' নাম রাখে যে চাপ পেল না॥
কফিহোস নাম রাখে 'সারমেয়ঘর'।
কাটাকাটি লাঠালাঠি নিত্য পরস্পর॥
মিশ্রজি বলে 'শুধু লিটম্যাগে লিখি'।
কৌচা নেড়ে মাদলজি হাসে ফিকি ফিকি॥
লিটম্যাগ রাখিল নাম আহা: 'বড় বাড়ি'।
শীর্ষবিন্দু হেসে বলে, 'বছর বছর পারি'॥



বহুরে যমজ ছাড়ি, ফাঁক পেলে তিন।'
তাই শুনে শ্রীসরেস ফুঁড়িলেন পিন॥
বেলুন হেসেই খুন, পিন গেল বৈকে।
শ্রীসরেস ধ্যানে বসে সেই দৃশ্য দেখে॥
ধ্যানে খুশি হয়ে দেখা দিলেন নির্ভীক।
শ্রীসরেস কেঁদে বলে, 'ধিক মোরে ধিক'॥
খুশি হয়ে নির্ভীক দিল তিন বর।
সেই বরে গাড়ি হল, হল ফ্ল্যাটঘর॥
জুজুদেব দূর থেকে দেখে আর ভাবে।
বাংলা ছেড়ে চলে যাব ধ্যানের পাঞ্জাবে॥
সেখানে বড়ই মজা নিত্য আঁহু আঁহু।
তাই শুনে ঋতুদেবী ধরিলেন বাহু॥
সেই বাহুডোরে বাঁধা পড়িলেন প্রভু।
চিম্টি কাটার দোষ কাটিল না তবু॥
রামচিম্টি-গামচিম্টি যদুচিম্টি দেন।
হাতে তত জোর নাই, নখ হৈল পেন॥
ইতিমধ্যে আনন্দ ওঠেন পাঁচ লাখে।
পাঁচলাখ চোখ মারে পাঁচলাখ ডাকে॥
সেই ডাকে পিলপিল লেখক-লেখিকা।
কেউ খোঁজে বাঁধাবাবু কেউ খোঁজে ঠিকা॥
লেখক-লেখিকা চলে কাতারে কাতারে।
জুজুদেব কহে, 'দেশ ভরিল ছাতারে'॥
ছাতার জাতীয় পক্ষী যদি ছেড়ে শিকে।
বঙ্গের হাত ব্যথা হল লিখে লিখে॥
লিখিলে হয় না শুধু, চ্যানেলও তো চাই।
'ও মাদল জ্যাঠা, দাদু, মাদল ভাই॥
তুমি ধর্ম তুমি অর্থ তুমি কাম মোক্ষ হে।
তুমি ফার্স্ট হার্ডল গুরু আমার বই ছাপো হে'॥
বই ছাপা হল যদি কোয়ার্টার হল।
এইবার খেলে যাও সেমিফাইনালও॥
সেখানে, সুনীল তুমি নীলিমায় নীল।
সুনীল-সাগবে ধায় খানা-ডোবা-বিল॥
খাল বিল নদীনালায় কথা ও কাহিনী।
ঝোপ বুঝে কোপ মারার খ্যাটা বাহিনী॥
পরে আরো বর্ণিবার করিব যতন।
আজ তবে এ পর্যন্ত শ্রীচর্চাকীর্তন॥
আজ তাহলে পরচর্চা হেথা সাদ করি।
(মুখে) আঙ্গুল পুরে সিটি মেরে বলুন হবি হরি॥

চরণ বৈরাগীর ইকড়ি মিকড়ি

বই নেবে-গো—বাংলা বই



আবার আসছে কলকাতায় আরেক পার্বণ—বইমেলা! না চতুর্দশ পার্বণ নয়। এখন বাঙালির, বিশেষত কলকাতার বাঙালির পার্বণ (যদি বলা যায়) মাত্র চারটি—ক্রিসমাস, নিউইয়ার্স, রবীন্দ্র জয়ন্তী, দুর্গাপূজা, আর হ্যাঁ, বইমেলা। কলকাতার মতো বইমেলা ভারতের আর কোনো শহরে হয় না। এই গর্বে বাঙালির কৃশ বক্ষ এসপ্যান্ডেডের আকাশমুখী বেগুনের চেয়েও উচ্চকিত। কিন্তু তাতে কি বাঙালির বই-তৃষ্ণা বাড়ল? বাংলা বই কি সব মেলাগামী, মেলাপ্রেমী মানুষের উচ্ছল হাত ধরে ঘরের বুককেসে উজ্জ্বল আবাসন পেল? নাকি উচ্ছেদের নোটস হাতে নিয়ে স্নানমুখে নতশির মধ্যবিত্ত বাঙালিরাও অধুনা নিজেদের বাঙালিত্ব বর্জনে সদা তৎপর। উচ্চবিত্তদের কথা না বলাই বিষয়— কেননা তাঁরা শুধুই উচ্চবিত্ত, বাঙালি নন। ভুল করে বাংলা শব্দ উচ্চারণ করেই বলে ওঠেন, সরি, আই মিন...। মধ্যবিত্তও পিছিয়ে থাকবে কেন? বিশ্বায়নের যুগ এটা। অতএব পুত্র কন্যাকে মামি-ড্যাডি-পাপা-আন্টি শেখাতেই হবে। ভুলেও শেখাবেন না—সুকুমার-হেমেন্দ্রকুমার। শুনছি এখনকার কিশোর-করুণ সম্প্রদায় ঘনাদা টেনিদার নামও নাকি জানে না। সুন্দরবাবু শুনলে নিশ্চয় বলতেন, হুম!

সিনেমা ও টিভির কল্যাণে ফেলুদা এখনো তত বিশ্বরণে যায়নি। তবে কতদিন তার পরমায়ু?

পরিচিত এক প্রকাশক বললেন, কলকাতার বইমেলায় কলকাতার বই কম বিকায়। হাতে হাতে দেখবেন, ইংরেজি বইভরা ব্যাগ। ইংরেজি বই হাতে বা ঘরে না রাখলে বাঙালি বৃকেপিঠে নিজেকে যথেষ্ট সংস্কৃতিবান, কৃষ্টিসম্পন্ন

জাহির করার স্টিকারের অভাব বোধ করে।

সবিনয়ে প্রস্তাব দেওয়াই যেতে পারত, বরং একটা 'বেনফিস'-মার্ক বিপণি খুলুন। লাইন সামলাবার জন্য বিশেষ পুলিশি ব্যবস্থার প্রয়োজন হবে। বলতে লজ্জা করল। প্রতিবার বেনফিসের লাইন দেখে মনে হয়েছে, আবার কি মধ্যস্তর লেগেছে? নতুন এত বড়কু মানুষ লাইনে? এখানে লাইন দেবার জন্যই বইমেলায় হাজিরা দেওয়া? কি জানি!

তুঝি কবি ছমছাড়া তুখোড় বলল, বৈরাগীদা, তুমি কেবল পাঠকদের বা মেলাপ্রমীদেব দোষ ধরছ, যে কারণে কলকাতার বইমেলায় বাংলা বই দুমোরানী-দীনতায় ভোগে, সেটা বোঝার চেষ্টা করছ না!

বৈরাগীকে শিক্ষিত করে ভোলায় আগ্রহে তুঝি-কবি বলে, নামি প্রকাশকরা বছরের পর বছর একই পশরায় দোকান সাজাচ্ছে। খোড়বড়ি মানুষ আর কত থাকবে। একই লেখক-তালিকা, একই বইয়ের নানা নামে পুনর্মুদ্রণ। পাঁচটি উপন্যাস হচ্ছে ডজন উপন্যাস, সেরা গল্প যোমটা টেনে শত গল্প—পাঠকরা কি উজবুক? গত শতকের পঞ্চাশের দশকেও লেখকরা সরাসরি প্রকাশকের হাতে পাণ্ডুলিপি দিয়েও বই ছাপা হত। এখনকার প্রকাশকরা পড়ার কষ্ট স্বীকারে অনিচ্ছুক শুধু নয়, আগাম যাচাই করতে চান, কোনো কাগজে বেরিয়ে কী অখ্যাতি বা কুখ্যাতি অর্জন করেছে। তবেই প্রকাশের বিবেচনা হলেও হতে পারে। তাতেও যে হবে, তার কোনো গ্যারান্টি নেই। নতুন লেখক তো কুঠরোগীর চেয়েও অধম। কুঠ সারে, সারতে পারে। নতুন লেখক? ওরে বাব্বা!!

ছমছাড়া তুখোড় বলল, আমার এখন বই বের করতে অসুবিধে হয় না। নাম হয়েছে কিছুটা। গ্রামে-গঞ্জে কবিতা পড়তে গিয়ে কিছু বানিজ্যও সেরে আসি আর পাঁচশালা যোজনার মতো মাঝেমধ্যেই একটা কোনো পুরস্কার ম্যানেজ হয়ে যায়। টাকাটা নিজেই দিতে হলেও পাবলিসিটি তো হয়ই। কিন্তু যাদের আমার এলেম নেই, বা এখনো ততটা নামটাম হয়নি, তাদের খুবই কষ্ট অবস্থা। দশ-কুড়ি বছর ধরে লেখালেখি করেও বই বের করতে পারছে না।

দশ বা কুড়ি বছর কিছু নির্ধারণ করে না। নির্ধারণ কবে লেখা। সেখানেও সমস্যা—কোথায় লিখবে? পত্র-পত্রিকার সূচীপত্রে বছরের পর বছর একই নামাবলী। যেমন প্রকাশকের বিজ্ঞাপনে পাঠকরাও অসহায়। মুখ বদলাবার ইচ্ছে থাকলেও সুযোগ মেলে না। অগত্যা অপাঠ্য ইংরেজি বইই সই। মুখ বদলও হল, সংস্কৃতির জয়ঢাকও বাজল। 'পেস্টিজ'ও বাড়ল। নয়ত বেনফিস তো আছেই।

জানা ছিল না, কখনো খেলাল করিনি। তুঝি কবিই জানাল, প্রতি বছর ভোজন-বিনোদনের স্টল বইমেলায় বাড়ছে। সেখানেও বিশ্বায়নের ফুরফুরে মেজাজি আয়োজন। হটডগ, হ্যামবার্গার, আইসক্রিম, প্যাসি, প্যান্ডি তো বটেই, অধুনা ফ্রেজ পিৎজার রমরমা এবারের বিশেষ আকর্ষণ। এক

বেওসায়ীই—ভয়ঙ্কর বুকলাভার, মানিমেকার, তিন কি চারটে স্টলের বরাত পেয়েছে। এর আবার নাকি নিলাম হয়। যে দর বেশি হাঁকবে তারই দখলে “দ্রৌপদী”। অর্থভোগ্যা ধরিত্রী। তবে দুর্জনে বলে, বিশেষ কর্মকর্তাদের বিশেষ ‘খুশ’ করলে সফলতা অনায়াসে। আর বেওসায়ীরা তো ‘খুশ’ করার কুশলতার জন্য গণতান্ত্রিক জ্ঞানপীঠলব্ধ। আগামীদিনে শুধু রসনা-মেলার রমরমার জন্যই চীন বা ইতালি কি মেক্সিকো থিম কাপ্তি হতে পারে। চীন বা ইতালির বিভিন্ন রকম রসনা নিরসনের প্রদর্শনীর কথা ভাবলেই মুখে বকে-পাকস্থলী মায় ক্ষুদ্রবৃহৎ অস্ত্রও কিরকম সড়সড়ে হুটোপুটি—কমতাধর দলের ব্রিগেড-উৎসবের মতোই।

কেবল একটা প্রশ্ন জাগে—‘বইমেলা’ নামের আদিথোতা রাখার দরকার কি? বদলে কাছাখোলা মেলা বললে কি খুব ভুল বা দুঃখী? লেখকরা কাছা খুলে ছুটেছে প্রকাশকের পেছনে, প্রকাশক ছুটেছে নামি-দামি লেখকের পেছনে—ঠিক যেমন গ্রামের রাখাল ধামা হাতে গরুর পেছনে দৌড়ম গৌবরের লোভে। আর মামি-ড্যাডি নামক কিস্তিত সম্প্রদায় টিনটিন বা বার্বি-মার্ক হতচালিতদের নিয়ে হড্ডে দিচ্ছে পিৎজা-কিওস্কে বা বেনফিসের অঙ্গগর-পুচ্ছে।

—বইমেলায় যাবেন তো? কবি প্রশ্ন রাখে।

যাব নিশ্চয়। স্মৃতির গম্বুজের মতো পুরনো হারানো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হওয়ার লোভে। আর সুবর্ণরেখায় দুর্লভ মাণিকের মতো সুদুর্লভ কোনো বিস্ময়কর গ্রন্থের আবিষ্কার সম্ভাবনায়। আকাঙ্ক্ষিত পাবনীর প্রত্যাশায়।

কবে দেখব সেই ফেরিওয়ালো, যে ডেকে যাবে—‘বই নেবে গো, বই—বাংলা বই—’.....



N. C. DAW & Co.

Gun Makers

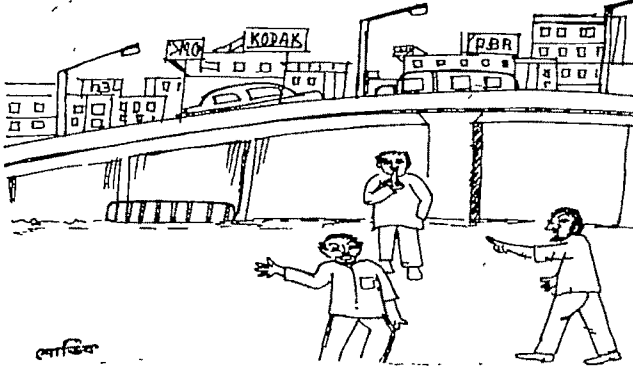
Since 1835

9, B. B. D. BAG (EAST)

KOLKATA-700 001

220-6643/4317

পথঘাটের কিসসা



শোভিত

দলাদলি

গাড়িয়াহাটার মোড়, দুপুর ১২টা। রাস্তার মোড়ের চার কোণে জটলা, ভিড়, অ্যাপয়েন্টমেন্ট, হকার দর্শন। রাস্তা পারাপার চলছে। উত্তর দক্ষিণের গাড়িগুলো সাঁই সাঁই করে নবনির্মিত ফ্লাইওভারের ওপর দিয়ে ছুটছে। রাস্তায় তাই গাড়ি কম। যানজটের ঝামেলাও নেই, দূরে দুই ট্রাফিক পুলিশ ধামের আড়ালে দাঁড়িয়ে হাওয়া খাচ্ছে। বাস্তা পারাপার তাই এখন সহজে করছে পথচারীরা। হকাব আগের মতোই আছে, কেবল ফুটপাথের ওপর সারি সারি চালাঘরগুলো ভাঙা পড়েছে। রাস্তার ওপর ডবঘুরেদের তাণ্ডব কিছুটা কমছে। তাই গাড়িয়াহাট এখন আগের থেকে পরিষ্কার। এপার থেকে ওপাবের দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। ফ্লাইওভারের নিচে নির্মাণকার্য এখনও চলছে। কয়েকজন লোক ছোট ছোট কাগজের হ্যাণ্ডবিল বিলি কবছে। টুকরো কাগজ কেউ নিচ্ছে কেউ আবার মুখ ঘুরিয়ে চলে যাচ্ছে। এক কথায় গাড়িয়াহাটার মোড় কর্মব্যস্ত, গতিশীল। উত্তরপূর্ব কোণে যশোদা ভবনের নিচে ফ্লাইওভারের দিকে তাকিয়ে সিঙ্গাপুরি কলা খেতে খেতে একজন ভদ্রলোক তার সঙ্গীকে বলছে—গাড়িয়াহাটের চরিত্রই বদলে দিয়েছে ফ্লাইওভারটা। প্রায় তিন তলার সমান উঁচু। রাস্তার দৃশ্য আরও সুন্দর, আলোয় ঝলমল করে।

জনৈক পথচারী—ফ্লাইওভার এত উঁচু যে চোখ কপালে তুলে দেখতে হয়। এখনই তো ফাটল ধরে গেছে। কোনদিন ভেঙে মাথায পড়বে তখন বুঝবে ওরা। বাসে উঠতে গেলে হয় গোলপার্ক যাও নয়ত ঘুরপাক খাও।

জনৈক হকার—হ্যাঁ, সবই দুর্বিপাক।

—ধামো হে ছোকরা, মোড় থেকে তো বাসে ওঠার উপায় নেই। ফ্লাইওভার তৈরি নয় তো জনসাধারণের অর্ধে অপচয়।

হকাব—দাদা আপনি কোন দলের?

—কেন? দলাদলির কি হল? যা সত্যি তাই বলছি। যানজট কমে, বরং বেড়েছে।

—দাদা চশমাটা বদলান। পুরনো হয়ে গেছে।

—আপনি কোন দলের গুনি?

—ইস্টবেঙ্গলের।

—দূর বাঙাল।

কলা হাতে ভদ্রলোক—আপনি ঠিক কী বলতে চাইছেন? আপনারা তো রোজই পার্কগুলো ডাঙেন আর গড়েন। যেখানে প্রয়োজন নেই সেখানে টিউবওয়েল বসান, জঞ্জাল জমান, ফুটের ওপব ক্লাব তৈরি করে মস্তান তোষণ করেন। আপনাদের বুঝতে বাকি নেই।

হকাব—হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। চোবের মায়ের বড় গলা। লজ্জা থাকে তো পালা।

—বরণ যোষ



শোভিত

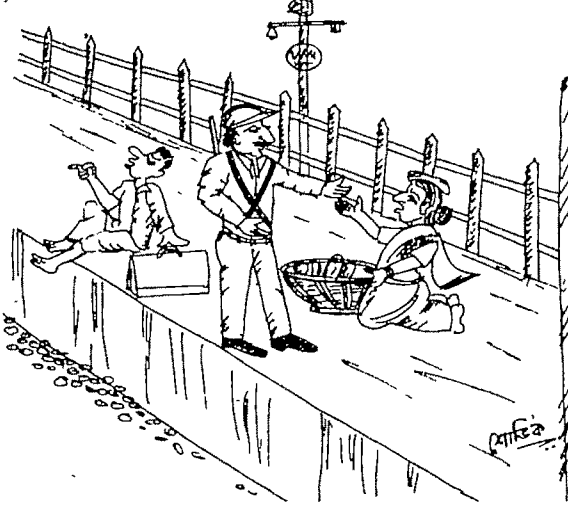
মাকড়সা-আরশোলা

ববিবার সকালে পড়তে যাচ্ছি ট্রেনে করে। হঠাৎ আমার পাশেব কামরা থেকে চিল-চিংকার। সঙ্গে ব্যাপক আর্তনাদ। কি হল চমকে দেখি আমার আশে-পাশে সকলেই বোঝার চেষ্টা করছে কি ঘটেছে। গাড়ি থেকে গেল স্টেশনে। বিস্তব লোক চলাচল করছে। অনেকেই বলাবলি করছে, “স্টেচার আন না একটা. ডাক্তার ডাক না।” স্টেশনে নেমে দেখতে গেলাম ব্যাপারটা। প্রচুর ভিড়। তবুও সেই ভিড় ঠেলে দেখি এক ভদ্রলোক শুয়ে রয়েছেন। কেউ কেউ হাওয়া করছে। একজনকে জিজ্ঞেস করি, ব্যাপারটা কি বলুন তো? কি হয়েছে কি? লোকটি যা বলল তা শুনে আমি হতবাক। “একটা ছোট্ট পেটমোটা মাকড়সা নিজের জাল বুনতে ব্যস্ত ছিল। কিন্তু ট্রেনের ঝাঁকনিতে ভদ্রলোকটির সামনে জেমস বন্ডের মতো ঝুলে থেকে একটা দড়ি সাহায্যে ভারসাম্য রক্ষা করার চেষ্টা করছিল। তাই দেখে ভদ্রলোক ফিট হয়ে গেছেন।” পাশের এক ভদ্রমহিলা ঝগড়ার ভঙ্গি কবে বললেন, “কীরকম কাপুরুষ বলুন তো, একটা মাকড়সা দেখেই এই অবস্থা।” এবা পুরুষের নামের কলঙ্ক। আর তখনই কোথা থেকে ফরফব করে উড়ে এক আরশোলা একেবারে মহিলার নাকের ডগায়। ‘ওঁঘাউ’ বলে চিংকারে আকাশ ফাটিয়ে ভদ্রমহিলা ধপাস। একেবারে মাকড়সাবাবুর উড়ির ওপরে।

—কাকলি সরকার

বিচিত্রা

দিব্যালোচন কলমধারী



আলুটা পটলটা বেচে পরাণ-হারান পদ্ম-সতীরা বারোয়ারী লোকালে বাড়ি ফিরছে। খালি ঝুড়িগুলো সোফা-কাম-বেড। ধানি বিড়িতে সুখটান চলছে। এমন সময় সামনে এসে দাঁড়াল রেলের রাজা রাবণ। রেলপুলিশ।

—কে রে, বের কর।

—বাবু গো, আজ আর সজ্জি বাঁচেনি। এই নাও বিড়ি। গোটা বাঙালিটাই রাখে। কাল আর ভুল হবেনি গো।

—ঠিক আছে, আজকের দিনটা চালিয়ে নেব। কাল কিন্তু শ্যাওলা রঙের গোটা কুড়ি পটল হাতে দিয়ে যাবি। নইলে লক-আপ হবি। রেলের কত ক্ষতি। শাজাহানের মতো আসা-যাওয়া করিস। যেন জলে চলছে। দে, আর. ডি. এক্স. দে। বিড়ি ধরাব কি করে?

—এই যে বাবু—ম্যাচেস। বাবুগো, গাড়িতে আব ধূমপান চলবেনি গো। মন্ত্রী কাগজে কয়েছে।

—পটল বানান করতে পটল তুলিস, তোব আবার কাগজ। জানিস, মন্ত্রী রাষ্ট্রপতির হস্তক্ষেপ চেয়েছে এ ব্যাপারে? এবার রাষ্ট্রপতি দেখবে।

—বলো কি বাবু। তোমাদের তবু আলু-পটল দিয়ে ম্যানেজ করি। তেনারে কি দি?

—তোদের চিন্তা কি, আমরা তো থাকবই—।

—পতি ঘরে ঢুকলে ডাতার তখন ঠাকুরপো হয়ে যায় গো বাবু। বড় চিন্তার কথা গো বাবু।

* * *

সোনালি সেন কোর্টে যাবার জন্যে খেয়ে দেয়ে তৈরি। সঙ্গে যাবে বাবা যতীন সেন। মা বলল, বাবাকে একটু সাবধানে বাঁধিস মা।

—কেন মা? হাবিয়ে যাবে?

—না, তা নয়।

—তবে কি মা?

—অফিসে তোব বাবা ছাড়া সবাই ইউনিয়নের লোক। তাই ক্যাশ চুরি হলেই তোব বাবা বাঁধা আসামি। তিনবার চিৎপুর লক-আপ হয়ে গেছে। এবার হলে বলেছে সত্যিকারের একটা খুন করে জেলে যাবে। পুলিশ দেখলে মাথার ঠিক থাকে না। কোর্টে গিয়ে যতীন পাগলা জজ খুন করে না বসে রে।

—না মা, আমি বাবাব হাত ধরে থাকব। তুমি চিন্তা কোরো না।

—একদম হাত ছাড়িস না মা। চোর-ডাকাতরা নিয়ম করে কোর্টে যায়। আর একদল যায়। সবাই সন্দেহভাজন। ঢালাঘরের তলায় ঢালাঢালি কবে সারাক্ষণ। থেকে থেকে তারিখ আনতে চলে যাচ্ছে। সকেলকে দিচ্ছে—উফ কী ফ্যান্টাস্টিক তারিখ পেয়েছেন মশাই। ববিতাকুবের জন্মদিন। ঐ দিন ওরা ‘অ্যাপিয়ার’ না হলেই হাওড়া ব্রীজ আপনার।

ওরে, কার্ল মার্কস শুধু বিরোধী
আসনের কথা ভেবে তৈরি করেছিল
বামপন্থা। কে জানত পঁচিশ বছর
শাসন করতে হবে? ধন ছাড়া
শাসন হয়? হাল্লা রাজা? গুপী
আর বাঘা ছাড়া কেউ পুঁছবে না।

—বুঝছি মা। ওরা কালো কোটধারী।

—কালো কোটধারীরা আবার দু’জাতের। ‘অনার’ আব ‘ইমোর অনাব’। এক একটা ঘরে এক একটা অনার। আর তাকে ঘিরে একদল ইমোর অনাব। কত ব্ল্যাকার।

—তুমি কিছু চিন্তা কোরো না মা। আমরা যাব আর আসব। কোর্ট খাতা চেয়ে পাঠালেই চল্লিশ যোগ হয়ে যায়। কাউন্সিল বলে, আমরা দুঃখিত ইমোর অনার। খাতা দেখার লোকেদের উপরি বন্ধ হওয়ায় ওরা ষড়যন্ত্র করছে। তার ওপর জনমোদ্ধা ঢুকে পড়েছে। আমরা সাবধান হচ্ছি। এখন এটা খুব চল হয়েছে মা। এখন মেথাবীরা কোর্ট থেকে নম্বর আনছে।

* * *

স্বাস্থ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করছেন হাসপাতালে।

—দিয়ে দে বাবা, দিয়ে দে। ওরে ওটা জেলানোতার বাচ্চা। দিয়ে দে।

—স্যার, এর মধ্যে তিন খেপ মাল গেছে বিহার, ইউ পি আর নেপালে। খুঁজে পাওয়া মুশকিল। দু’দিনের বাচ্চা সব এক দেখতে। ময়দার তাল। লুটি হবে কি পরোটা হবে নাকি সিঙাড়া হবে তা বোঝা দায়।

—এই নে বাবা। জেলানোতা আর চোদ্দ পুরুষের ছবি। মিলিয়ে দেখ বাবা। সামনে ইলেকশন। কি বিপদ।

—এর মধ্যে স্যার, আরব চলে যেতে পারে।
—দিল্লিকে বলে পাশপোর্ট বন্ধ করিয়ে দিচ্ছি এক্ষুনি। এই যে সেক্রেটারি—
—আজ্ঞে দিল্লিতে বিরোধী সরকার। শুনেও শুনবে না।
—বুঝেছি, আপনি ওদের সাপোর্টার। কাল থেকে অফিসে আসবেন না।
গর্ভরোধক গুলি নিয়ে গ্রামে যাবেন।
—আজ্ঞে গতমাসেই ঐ কর্মসূচী আপনি নিজের সেরে এসেছেন। গুলি আর নেই।

—পোস্তা থেকে চিনেবাদাম কিনে নিয়ে যান। বলবেন উন্নত মানের মাল।
বাড়িসুদ্ধ সবাই খেতে পারে। অতিথি এলে দেয়া যেতে পারে। পুজোর পেনসাদ বলে চলতে পারে। একটু নুন দিয়ে খেতে পারলে গর্ভরোধক ছাড়া সারাদিন আর কিছু খেতে লাগবে না। যান—। হ্যাঁ বাবা, তোদের যা বলছিলাম...

—স্যার, বাচ্চাটার নাম যদি বলেন—
—হারাধন। কিন্তু দু'দিনের বাচ্চা কি নাম বলতে পারে?
—গোড়াউনে গিয়ে 'হারাধন' 'হারাধন' বলে চ্যাচাব স্যার?
—সবকটা কেন্দ্রে উঠবে রে। সবকটাই তো হারাধন। অন্য উপায় ভাব রে। অমন লড়াকু নেতা পার্টি-অফিসে বসে কাঁদছে।

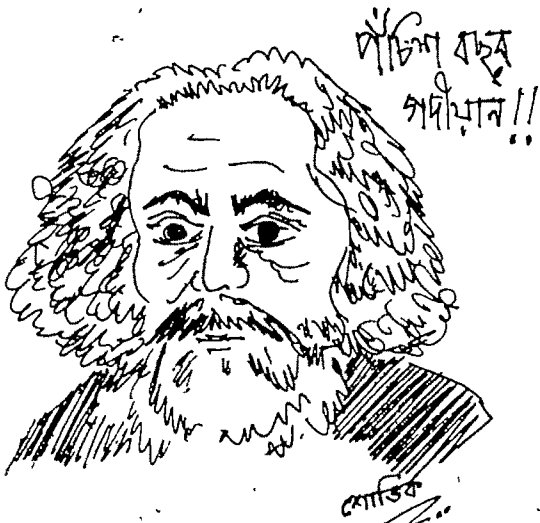
—স্যার, মার্কসবাদে কাম্বাকাটি চলে? কেমন বুর্জোয়া নাম রেখেছে, হারাধন। মার্কসবাদে ধন চলে?

—ওরে, কার্ল মার্কস শুধু বিরোধী আসনের কথা ভেবে তৈরি করেছিল বামপন্থা। কে জানত পঁচিশ বছর শাসন করতে হবে? ধন ছাড়া শাসন হয়? হান্না রাজা? গুপী আর বাঘা ছাড়া কেউ পুঁছবে না। তাই এখন ধনরত্ন চলে রে। খালিগায়ে ঘুবত বলেই গান্ধীজি গুলি খেয়েছিল। নাথুরাম দারিদ্র্য দেখতে পারত না। নেহেরুও তাই। শাসক হতে গেলে কোট চাই। কোটে আবার গোলাপ চাই। গরম পড়লেই ইউরোপ যাওয়া চাই। আলিপুরের বাঘ দেখবি বেশি এধার-ওধার করে না। সুন্দরবনের বাঘ খেটে খেটে মরল। আজকাল মানুষ ধবে ধরে বাঘের মাংস খায়। যাক, কাজের কথা বল বাবা।

—স্যার একটা বদলি দিয়ে রাখছি। ম্যাজাসি মাল। আড়াই বছর। গায়ের রঙটা একটু চাপা হবে।

—জানতে পেরে যাবে রে।

—কেউ জানতে পারবে না স্যার। খোপার কাছে জামা হারালে আর জোর গলায় কেউ বলতে পারে, এটাই আমার? কেশপুরে কি হয়েছিল, কেউ জানতে পেরেছে? অজিতবাবু কোন দলে, কেউ জানতে পেরেছে? শিশুপাচার চক্রের পাণ্ডা কে, কেউ জানতে পেরেছে?



ট্যারা ভোখে



তোমার নাম কি?

—মুজিবুল।

—বাবার নাম ?

—হাজিবুল।

—ঠাকুরদার নাম?

—রেজাউল।

—তার বাবার নাম?

—জানি না, হুজুর। ও শালা হিন্দু ছিল।

(কৃতজ্ঞতা : অশোক মিত্র, আপিলা চাপিলা)

—প্রণয়কৃষ্ণ গোস্বামী

গভেট

প্রবীর মণ্ডল



না, পত্রিকাটির সম্পাদক আমি নই। এমনকি পত্রিকাটির সম্পাদকমণ্ডলীরও আমি কেউ নই। পত্রিকার সম্পাদক শ্রেফ আমার বন্ধু এবং বন্ধুর প্রতি প্রগাঢ় আসক্তির কারণে সম্প্রতি পত্রিকার বিজ্ঞাপনের জন্যে বন্ধুর সঙ্গে এক এম এল এ বাবুর বাড়ি গিয়েছিলাম।

এম এল এ বাবু তাঁর বৈঠকখানা ঘরের সোফা দেখিয়ে আমাদের বসতে বললেন। এবং বললেন, একটু পরে আসছি। আমরা দুই ফেননিভ সেই সোফাতে বসলাম। বসার সঙ্গে সঙ্গেই আমি এক অন্যরকম আরাম অনুভব করলাম। কারণ, এর আগে এমন গদিতে আমি বসিনি। যেন স্বর্গীয় সুখ। যদিও আমি কখনো স্বর্গে যাইনি এবং কোনোদিন স্বর্গে যেতে পারব, এমনটা আমার বিশ্বাসও হয় না। দেবতাদের সঙ্গে আমার বড্ড আড়ি।

স্বর্গীয় আরাম নয়, বরং আমার দুঃখের কথা বলাই ভালো। সেই 'অন্যরকম' আরাম আমার কপালে বেশিক্ষণ জুটল না। কুঁই-কুঁই করতে করতে একটি পুঁচকে কুকুর আমাদের দু'জনের কাছে আসল এবং বন্ধুর সঙ্গে নয়, কুকুরটি আমার সঙ্গে ভাব জমাতে চাইল। যেন আমি ওনার ভালোবাসার পাত্র। আমাকে কৃষ্ণ ভেবে রাধিকার মতো উনি আমার কাছে প্রেম নিবেদন করতে এয়েচেন। দিবাকালীন অভিসার। যেন এম এল এ বাবুর বৈঠকখানা তাঁর কাছে—

মথুরা-বৃন্দাবন অথবা ভিক্টোরিয়া নন্দন।

ইতিমধ্যে উনি আমার পা চাটতে শুরু করেছেন। অথচ উনি জানেন না, কুকুর দেখলেই আমার শরীরের সমস্ত রাগ গরম তেলের মতো টগবগ করে ফুটে থাকে। ইতিমধ্যে পা ছেড়ে উনি আমার হাতদুটিও চাটতে শুরু

করেছেন। অথচ উনি জানেন না, ইতিপূর্বে আমি কুকুর বিষয়ক গদ্যে, কুকুর সম্পর্কে আমার আক্ষেপ ও তীব্র রাগের কথা লিখেছি। তবুও উনি এম এল এ বাবুর বৈঠকখানাকে মথুরা-বৃন্দাবন বানিয়েই ছাড়লেন। ইচ্ছে হল উদ্যম ক্যালাই। তবুও উপায় নেই, বিজ্ঞাপনের কথা যে মাথায় আছে। চুরি করে ওনার কানদুটো জোরে জোরে মলে দিলাম। তবুও কেন জানি না, উনি রাগলেন না। কুঁই-কুঁই করে এমনভাবে ডাকলেন, যেন ওনার কানে আমার হাতের স্পর্শে, ওনার পুলক উদ্বেক হয়েছে।

এমন সময় এম এল এ বাবু আমাদের কাছে আসলেন এবং আমি কুকুর সম্পর্কে আমার বিরক্তির কথা এম এল এ বাবুকে জানালাম। এম এল এ বাবু জীনা-জীনা করে চার পাঁচবার চিৎকার করে বললেন, জীনা, গভেটকে নিয়ে যাও।

'গভেট? শব্দটি শুনে বিশ্বম্বে চোখ বুজলাম এবং বললাম (মনে-মনে), এম এল এ বাবুরাও খিন্তি মারে! কিন্তু কাকে 'গভেট' বললেন, বুঝলাম না। আমরা দু'জন কি....। কিন্তু জীনাই বা কে? ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। এম এল এ বাবু বললেন, জীনা আমার বারো বছরের একমাত্র মেয়ে এবং গভেট আমার কুকুরের নাম।

পুঁচকে গভেট কিছুতেই আমার পাছু ছাড়লেন না।

এমন সময় দোতলা থেকে বারো বছরের জীনা 'গভেট-গভেট' করে পুঁচকে কুকুরটিকে ডাকে। আমিও জীনার সুরে সুর মিলিয়ে বললাম, গভেট যাও, তোমার দিদি তোমাকে ডাকছে।

কুকুরটি ওপরে উঠে গেল।

আমার সম্পাদক-বন্ধু এম এল এ বাবুর কাছে বিজ্ঞাপনের কথা বলল। তিনি অর্থাৎ এম এল এ বাবু বিশ্বম্বে ও বিরক্তির সুরে বললেন, বিজ্ঞাপন? না ভাই, বিজ্ঞাপন-টিজ্ঞাপন, তোমরা এখন...

আমরা দু'জনে উঠলাম।

আমার মাথার মধ্যে একটাই শব্দের ছোঁটাজুটি—গভেট।

লেখক-লেখিকার শ্রুত

পত্রপাঠ অধ্যাত লেখকদের ডায়েরী লেখাই চায়। শুধু দয়া করে লেখার সময়ে পত্রপাঠ-এর চরিত্রটি (কিংবা দুঃচরিত্র) মনে রাখবেন। ফুলাক্ষেপ পাতার একদিকে লিখুন। মার্জিন রাখুন।

বইমেলা ২০০৩, স্টল নং : এম-২১৪

একটি ধোঁয়াটে গল্প

পিনাকীশঙ্কর চৌধুরী



সে দিন সকালে নিজের ঘরে তক্তাপোষে বসে সিগারেট ধরিয়ে টান মারছিলাম। সিগারেটে টান মারলেই ধোঁয়া বেরোয়। আমি সেই ধোঁয়াটাকে জানালা গলিয়ে বাইরে পাঠাবার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু চেষ্টাই সার। বেয়াদব ধোঁয়া, আমার ইচ্ছেমতো চলতে তাব বয়েই গেছে। আমার প্রবল ইচ্ছাশক্তি, ফুঁয়ের শক্তি, এমনকি প্রচণ্ড থাণ্ডডেব শক্তি সবকিছুকে চবম অবজ্ঞায় উপেক্ষা করে সে সোজা ছাদের দিকে চলে যাচ্ছিল, সরি, উড়ে যাচ্ছিল। আর কিছুটা যাবার পরেই ভ্যানিশ হয়ে যাচ্ছিল।

ধোঁয়ার বেয়াদবিতে প্রথমটা খুব রাগ হয়ে গেল। তারপর কিছু করতে না পারায় দুঃখে হতাশ হয়ে পড়লাম। তারপরেই মনের মধ্যে একটা দার্শনিক ভাবের উদয় হল। ভ্যানিশ হয়ে যাবার পর ধোঁয়াটা কি জানি জানলা গলেই বেরিয়ে গেছে। তার মানে লুকোচুরি খেলা। আমার মনোমতো কাজটাই হয়েছে, তবে আমার অলক্ষ্যে। আহা, কে তুমি আমারে ডাকো, অলসে লুকায় থাকো। কোটেশনটা মোটেই মানানসই হল না। কিন্তু এর চাইতে কোনো যুৎসই কোটেশন এই মুহূর্তে আমার মাথায় আসছে না।

শ্রীমান মদনমোহন আমার জানের বন্ধু, ঘরে ঢুকেই হৃদয় ছাড়ল, পেলো, তুই সিগারেট খরেছিস? ব্যস, তোর হয়ে গেল। এবপর বন্ধুটি আমার মুখের দিকে এমনভাবে চেয়ে রইল যেন আমাব ওই হয়ে যাওয়াটা ও

ওইখানেই দেখতে পাচ্ছে।

ঘাবড়ে গোলাম। খুবই স্বাভাবিক। এরকম একটা বেমজ্ঞা কথা শুনলে স্বয়ং অর্জুনও ঘাবড়ে যেত। বললাম, কী হয়ে গেল?

—তুই আর হতে পারবি না।

—কী হতে পারব না? একবার তো মায়ের পেট থেকে হয়েইছি। আবার হতে যাব কোন দুঃখে?

—না না, সে হবার কথা হচ্ছে না। এ অনেক বড় হবার কথা।

—বড়ও তো আমি রোজ একদিন করে ইচ্ছি। আমার বড় হওয়া ঠেকায় কে?

—কিছুই বুঝিস না। তুই একটা হতভাগা।

—সে আর বলতে। আমি যে হতভাগা সেটা তো নিজেই বুঝতে পারছি। দ্যাখ্‌না, তখন থেকে লড়ে যাচ্ছি, সিগারেটের ধোঁয়াটাকে কিছুতেই জানালা দিয়ে গলাতে পারছি না। শুধুই ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। আমারই সিগারেট, আমারই ধোঁয়া, আমারই ফুসফুসের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে আমারই সঙ্গে বেয়াদবি।

বলতে বলতেই মদনের মুখ লক্ষ্য করে কিছুটা ধোঁয়া ছেড়ে দিলাম। ও হাতের চেটে দিয়ে বাতাস করে ধোঁয়াটাকে ওব নাকের সামনে থেকে

উড়িয়ে দিল। ওর ওরকম ভীষণভাবে সিম্পল হারমনিক মোশনের চেটে নাড়ানো দেখে ভয় পেয়ে গেলোয়। ওর একটাও এসে যদি আমার গালের ওপরে আছড়ে পড়ে তবে এখানেই কাৎ হয়ে পড়ে যাব। ভয়ে ভয়ে সরে বসলাম। আর সরে বসেই লক্ষ্য করলাম, মদনার থাঙ্গড় খেয়ে সিগারেটের ধোঁয়াটা গুটি গুটি জানালার দিকে এগোচ্ছে।

বাপরে! বন্ধুর আমার থাঙ্গড়ের এলেন আছে বলতে হবে। আর হবে না-ই বা কেন? মদনমোহনের থাঙ্গড় বলে কথা। ওই থাঙ্গড় খেয়ে কংস পর্যন্ত কাৎ হয়ে পড়েছিল, ধোঁয়া তো কোন তুচ্ছস্য তুচ্ছ।

এইবার আমার মাথায় আর একটা দার্শনিক চিন্তা এসে গেল। পৃথিবী বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকরা অনেক ছোটখাটো জিনিস থেকে অনেক বড় বড় জিনিস আবিষ্কার করেছে। গ্যালিলিও বাচ্চাবেলায় মায়ের সঙ্গে গির্জায় গিয়ে ছাদ থেকে চেনে বোলানো বাতিদানটাকে ক্রমাগত দুলতে দেখে পেণ্ডুলামের তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিল। নিউটন গাছ থেকে আপেল পড়তে দেখে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেছিল। জেমস ওয়াট ফুটন্ত জলের বাষ্পে কেটলির ঢাকনার নড়াচড়া দেখে স্টিম ইঞ্জিন আবিষ্কার করেছিল। গ্যালভানি একটা তারের ছোঁয়া লেগে একটা ঝুলন্ত মরা ব্যাঙের হৃৎকটনি দেখে বিদ্যুৎ আবিষ্কার করেছিল। এই-রকম আরো অনেকে অনেককিছু দেখে অনেককিছু আবিষ্কার করেছিল। তাহলে আমিই বা পিছিয়ে থাকব কেন? মদনমোহনের থাঙ্গড় খেয়ে ধোঁয়ার জানালা-গমন দেখে আমিও কিছু একটা আবিষ্কার করে ফেলতে পারি। কী আবিষ্কার করা যেতে পারে, সেটাই ভাবতে লাগলাম। কিন্তু অনেক ভাবনা-চিন্তা করেও সেরকম কিছুই মাথায় এল না। এসব ক্ষেত্রে ব্যর্থতা মানেই অপদার্থতা। নিজের অপদার্থতার কথা চিন্তা করে মনে মনে খুব বিষণ্ণ হয়ে পড়লাম।

বিষণ্ণতাটা কেটে গেল বন্ধুর দাবড়ানি খেয়ে। শুনতে পেলাম ও আমাকে গাল দিচ্ছে—ইডিয়ট!

—সেকথা কি আর বলতে। আমি একটা ইডিয়ট ছাড়া আর কী? এই দ্যাখ না এতক্ষণ ধরে লড়ে যাচ্ছি তবু যুৎসই একটা আবিষ্কারের কথা মাথাতেই আসছে না। ইডিয়ট না হলে এতক্ষণে আমি ঠিক একটা-কিছু আবিষ্কার করে ফেলতাম। বন্ধুর সঙ্গে এ ব্যাপারে আমি পুরো একমত হয়ে গেলাম।

কাউকে ইডিয়ট বললে সে একমত হয়ে যায়, পৃথিবীতে বোধহয় এই প্রথম হল। আর এটাই কি জানি, হয়ত আমার সেই যুগান্তকারী আবিষ্কার, যা দিয়ে আমি বিখ্যাত হব।

আবিষ্কারের গন্ধ পেয়ে এতক্ষণের বিষণ্ণতাটা কেটে গিয়ে মনের মধ্যে বেশ একটা খুশি খুশি ভাব চাগাড় দিয়ে উঠল। খুশির ঠেলায় বন্ধুকে এককাপ চা খাওয়ানোর কথা ভাবলাম আর মুখ ফুটে সেটা প্রায় বলেও ফেলছিলাম। কিন্তু বন্ধুর পরের শুদ্ধারে মুখের কথা মুখেই ঢুকে গেল।

—তোর দ্বারা আর কিস্যু হবে না। যা-ও বা একটু আশা ছিল সেটাও গেল।

—আমার সম্বন্ধে তোর কী আশা ছিল? আর সেটা গেলই বা কেন?

—তুই কোনোদিন ভারতের রাষ্ট্রপতি হতে পারবি না।

সর্বনাশ! বন্ধু বলে কি? একেবারে রাষ্ট্রপতি? ও যে এতদিন আমার সম্বন্ধে এরকম একটা আশা পুষে রেখেছিল, সেটা তো ঘৃণাকরও কোনোদিন টের পাইনি। জীবনে ওর মুখে অনেকরকম বিশেষণে ভূষিত হয়েছি। রামপাঁটা উজ্জ্বল হাঁদাকান্ত ইডিয়ট এইরকম আরো অনেক কিছু। কিন্তু

আমাকে কোনোদিন রাষ্ট্রপতি বলে গাল দিতে তো শুনিনি। তাহলে কি ওই মোক্ষম গালটা ও আজকের জন্যে তুলে রেখে দিয়েছিল? কিন্তু তাই বা হবে কেন? রাষ্ট্রপতি তো গালাগালি হতে পারে না। রাষ্ট্রপতি তো শুনেছি বেশ মান্যগণ্য লোক। কিন্তু প্রশ্ন সেটা নয়। প্রশ্নটা হল, আমি ওর কাছে কোনোদিন রাষ্ট্রপতি হবার ইচ্ছে প্রকাশ করেছি বলে তো মনে পড়ছে না। যে চাকরির জন্যে আমি কোনো দরখাস্তই করলাম না, সে চাকরি থেকে আমাকে খারিজ করার প্রশ্নটা আসছে কোথেকে? বন্ধুর চিন্তা-ভাবনার গতি-প্রকৃতি আন্দাজ করতে না পেরে আমি ভোম হয়ে বসে রইলাম। ঠিক করে নিলাম আমি আর কোনো কথা বলব না। ওর নিজের মনোভাবটা নিজেই বিশদ করুক।

আমার দার্শনিক চাপের মুখে বন্ধু নতি স্বীকার করতে বাধ্য হল। বলল, দ্যাখ পেনো, ভারতের রাষ্ট্রপতিকে তুই নিশ্চয় অনেকবার দেখেছিস।

—একবারও না। ভদ্রলোক কোথায় থাকেন তা-ই জানি না। চিনিও না। এরপর দেখা হলে চিনিয়ে দিবি।

—আঃ! বড্ড বাজে বকিস। সে দেখার কথা হচ্ছে না। আমি টিভিতে দেখার কথা বলছি। টিভিতে রাষ্ট্রপতিকে দেখেছিস তো? রাষ্ট্রপতি জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেয় শুনিসনি?

—কমিনকালেও না। ঝুটমুট টিভি খুলে রাষ্ট্রপতির ভাষণ শুনতে যাব কেন? আমি তো টিভি খুললে শুধু বিজ্ঞাপনই দেখতে পাই। আমি জানি নানান ধরনের মাল তৈরির বড় বড় কোম্পানির টিভি কোম্পানিকে টাকা দেয়। সেই ধার শোখ করার জন্যে টিভি কোম্পানি দিনরাত ওইসব কোম্পানির তৈরি করা মালের বিজ্ঞাপন দেখায়। বিজ্ঞাপন দেখতে দেখতে লোকে যাতে বমি না করে ফেলে সেইজন্মে তার মাঝে মাঝে কিছু নাচগান চুকিয়ে দেয়। মাঝে মাঝে আবার কিছু কিছু খবরও শোনা যায়। ভূমিকম্প, বন্যা, রেল দুর্ঘটনা, নেতাদের হাজত বাস, খবর হিসেবে এগুলো দেখতে নেহৎ মন্দ লাগে না। এর মধ্যে তোমার ওই রাষ্ট্রপতির ভাষণ শোনার সময় হবে না বাপা।

বন্ধুর দেখলাম অসীম ধৈর্য। আমার এ হেন আকাট মুর্খত্ব সত্ত্বেও ও হাল ছাড়ল না। ছিনে জোঁকের মতো লেগে রইল। আমাকে ব্যাপারটা বুঝিয়েই ছাড়বে। ও প্রাণপণে বোঝাবার চেষ্টা করে যাচ্ছে আর বন্ধুর প্রতি-যথাকর্তব্য সাধনের তাগিদে আমিও প্রাণপণে সহযোগিতা করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু মাথায় যদি না ঢোকে তো কী করতে পারি? ভগবানের মার। মাথাটাকে এত নিরেট করে তৈরি করল কেন?

বন্ধু এবার অন্য পথ ধরল। আমার অন্তরেই আমাকে ঘায়েল করার চেষ্টা।—আচ্ছা, টিভিতে নাচগান দেখিস তো? তাহলে সাধারণতঃ দ্বিবার্ষিক দিল্লিতে সৈন্য বাহিনীর কুচকাওয়াজও নিশ্চয় দেখেছিস? ওটাও তো একধরনের নাচগান।

—হ্যাঁ, তা দেখেছি। এতক্ষণে বন্ধুর একটা কথায় অন্তত হ্যাঁ বলতে পারায় মনে বেশ আনন্দ হল।

—কুচকাওয়াজে কী দেখেছিস?

—অনেককিছুই দেখেছি। কামান বন্দুক ক্ষেপণাস্রব ট্যাংকো ব্যাংপার্টি হরেক রঙের পোশাক পরা ইস্কুলের ছেলে-মেয়ে, হাতি উটের পিঠে চড়া কিছু রিটায়ার করা বুড়োহাড়া সৈন্য এই সমস্ত। সর্বাধিক বড় রাস্তা গুলে লেফট রাইট করতে করতে চলতে থাকে।

—হ্যাঁ চলতে থাকে। তারপর রাষ্ট্রপতির মঞ্চের সামনে এসে রাষ্ট্রপতিকে

অভিবাদন জানায়। রাষ্ট্রপতিও হাত তুলে তাদের অভিবাদন গ্রহণ করেন। সেখানে রাষ্ট্রপতিকে নিশ্চয় দেখেছি।

—ওমা ওই লোকটা রাষ্ট্রপতি নাকি? পুরো সময়টা ধরে ক্রমাগত স্যালুট করতে থাকা লোকটা রাষ্ট্রপতি? আমি তো অন্য একটা কিছু ভেবেছিলাম।

—কী ভেবেছিলি?

—না সেটা বলা যাবে না। একটা লোককে ক্রমাগত স্যালুট দিতে দেখলে যা ভাবা উচিত আমি তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু সেটা বলা যাবে না। বললে আমার জেল হয়ে যাবে।

—তাহলে তুই রাষ্ট্রপতিকে দেখেছিলি।

—হ্যাঁ, মানলাম দেখেছি। আর এটাও বুঝলাম যে রাষ্ট্রপতির কাজ হল স্যালুট করা।

—তোর মতো একটা বেঁড়ে মুখ্য এর বেশি আর কী ভাববে বল। তা সে কথা থাক। এখন কথা হচ্ছে দেখলেও ভারতের লক্ষ লক্ষ লোক প্রতিদিন টিভি ছাড়াও বহু অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতিকে দেখতে পায়। আমি সেই দেখার কথাটাই বলছি।

—তা সেই কথাটুকু বলার জন্যে এত ধানাই পানাই করার কী দরকার ছিল? সোজাসুজি বললেই পারতিন ভারতের রাষ্ট্রপতিকে রোজ অনেক লোক দেখতে পায়। আমি এক কথায় তোর সঙ্গে একমত হয়ে যেতাম। যেটা আমার জ্ঞানের বাইরে সে ব্যাপারে কারো সঙ্গে একমত হতে আমি সবসময় রাজি। তাতে আমার কোনো কষ্ট হয় না, আমাকে কোনো পয়সাও খরচ করতে হয় না। প্রম্মাণ চাস? তুই একবার বলে দ্যাখ যে কাল শনিগ্রহটা বৃহস্পতি গ্রহের উপর আছড়ে পড়েছিল কিংবা পড়বে। আমি সঙ্গে সঙ্গে একমত হয়ে যাব। কেন জানিন? সমস্ত ব্যাপারটাই আমার জ্ঞানের বাইরে। আমি বৃহস্পতিও চিনি না শনিও চিনি না। বারের কল্যাণে ওই নামগুলোই যা একটু আধটু জানি। তার বাইরে আমার জ্ঞানের ডাঙাটী টুঁ টুঁ। শুধু তাই নয়। শনি গ্রহ বৃহস্পতির ওপর আছড়ে পড়লে আমাকে তো কোনো পয়সা খরচ করতে হচ্ছে না।

বন্ধুর মুখে দেখলাম একটা স্নান হাসি। যাকে বলে হেদিয়ে পড়া হাসি। খুবই স্বাভাবিক। সামান্য একটা কথা বোঝাবার জন্যে পরিশ্রম তো কম করতে হয়নি। বাকিটা বোঝাবার জন্যে আরো কতটা করতে হবে কে জানে।

বন্ধু বলল, হ্যাঁ, ‘আমি সেই কথাটাই বলতে চাইছি। এত লোক রোজ রাষ্ট্রপতিকে দেখছে কিন্তু কেউ তাঁকে কোনদিন সিগারেট খেতে দেখেনি।

ব্যাপারটা আমার জ্ঞানের বাইরে। তাই বন্ধুর কথায় আমি সঙ্গে সঙ্গে একমত। কিন্তু একমত হওয়ার কথাটা মুখ ফুটে জানাতে গিয়ে থমকে গেলাম। আমার মাথায় তাল বেতালের মতো দুটো কুয়ুক্তি গজিয়ে উঠল। এক নম্বরের তালটা হল, এত লোক, যারা রাষ্ট্রপতিকে দেখছে, তারা তাকে সিগারেট খেতে দেখছে কি দেখছে না সেটা বন্ধু জানল কোথেকে? তারা সবাই কি রোজ এসে বন্ধুকে কথাটা বলে যাচ্ছে—‘ওগো আজ রাষ্ট্রপতিকে সিগারেট খেতে দেখিনি’? আর আমি যদ্বদ জানি বন্ধুর কোনো কম্পিউটার নেই যে রাষ্ট্রপতিকে লোকে সিগারেট খেতে দেখেছে কি দেখেনি সেটা ওয়েব সাইটে দেখে নেবে। আর দু’নম্বর কুয়ুক্তিটা তো একেবারেই বেতাল। কেউ যদি রাষ্ট্রপতিকে সিগারেট খেতে না দেখে তবে তো বুঝতে হবে রাষ্ট্রপতি তাদের সামনে সিগারেট খায় না, লুকিয়ে লুকিয়ে খায়। সোজা হিসেব।

কুয়ুক্তি দুটো মুখ ফুটে বন্ধুকে বলেই ফেললাম। বন্ধু আমাকে মারার জন্যে যে খাপড়টা তুলল এটা যদি সত্যি সত্যি যথাস্থানে নেমে আসত তবে আমি এতক্ষণ তক্তপোষে যে কাতরাতাম, এই গল্পটা লেখার অবকাশ হত না। ওই যে একটা কথা আছে—মুখ্য ল্যাঠোষধি। বন্ধু এতক্ষণে শেষ কথা হিসেবে সেটাই সার বুঝে নিয়েছে। তবে হাতে লাঠি তো নেই, তাই মুখ্য ল্যাঠোষধি।

বন্ধুর খাপড় খাবার ভয়েই আমি স্বীকার করে নিলাম যে রাষ্ট্রপতির সিগারেট খায় না। আজ বলে আজ নয়, ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর থেকে আজ পর্যন্ত যত রাষ্ট্রপতি এসেছে গেছে তারা কেউই কোনদিন সিগারেট খাননি। শুধু তাই নয়, ভবিষ্যতে যারা আসবে তারাও কেউ কোনদিন সিগারেট খাবে না। বন্ধুর কথার সঙ্গে আমি পুরো একমত তো বটেই বরং এক পা আগে। ভবিষ্যতের কথাটাও এখনই বলে নিলাম।

বন্ধু বলল, অ্যাঁহি তো। এই কথাটাই তোকে এতক্ষণ বোঝাবার চেষ্টা করছি।

—হ্যাঁ আমিও খুব ভালোভাবেই বুঝে নিয়েছি। কিন্তু তাতে হলটা কী?

—হলটা এই যে তুই যদি সিগারেট খাস তো কোনদিন রাষ্ট্রপতি হতে পারবি না। রাষ্ট্রপতি হতে চাইলে তোকে সিগারেট খাওয়ার অভ্যাসটা ছাড়তে হবে।

—বাঃ তার মানে রাষ্ট্রপতি হতে চাইলে শুধু স্যালুট করা শিখলেই হবে না, সিগারেটও ছাড়তে হবে?

অনেক চিন্তা-ভাবনা করে বন্ধুকে কথা দিলাম—দেখি চেষ্টা করে তোর কথামতো চলা যায় কিনা।

বন্ধুর মুখে একটা বিগলিত হাসি দেখতে পেলাম। ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে গলে গলে বেরিয়ে আসছে। আমার মতো একটা অকাটকে ও বাগে আনতে পেরেছে সেই আনন্দের ঠেলায় ও ওই একই তক্তপোষে একই রকম ভসিতা পা মুড়ে বসে পিঠের মাছি তাড়াতে তাড়াতে একবাটি তেল-লঙ্কা মাখানো মুড়ি, একটা ডবল ডিমের ওমলেট আর আগে-পিছে দু’কাপ চা সাঁটিয়ে আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

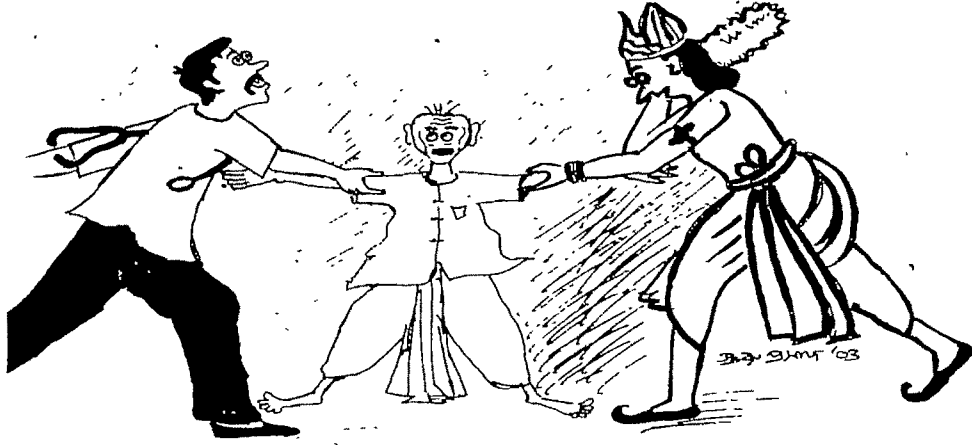
বন্ধুর ফেলে যাওয়া পাশপাশি দুটো এঁটো কাপ দেখে আবার চিন্তিত হয়ে পড়লাম। লোকে তো এক কাপ চাই খায়। দু’কাপ চা তো খায় না। অন্য সবকিছুতেই দুই কিন্তু চায়ের বেলা এক। ভিক্ষে চাইবার বেলা—দুটো পয়সা দিন বাবু। প্যাদানি দেবার বেলা উত্তম-মধ্যম দু’ঘা। খাবার বেলা দু’বেলা দু’মুঠো ভাত। পুজোর বেলা দুটো ফুল বেলপাতা। এমনকি একটা ভালো ওমলেট বানাতেও ডবল ডিম। কিন্তু চায়ের বেলা এক কাপ চা। তা সে যতবড় মান্যগন্য ব্যক্তিই হোন না কেন—এক কাপ চা খান স্যার। কিন্তু বন্ধুটি আমাব দু’কাপ চা সাঁটিয়ে গেল। তাহলে কি ও এটাকে ভিক্ষে কিংবা প্যাদানি হিসেবে নিয়েছে? তোবা তোবা।

সে যাই হোক বন্ধুর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমিও ওই বস্তগুলি গিলেছিলাম। তাই বন্ধু চলে যাবার পর ভরপেট একটু মৌতাত করার দরকার হয়ে পড়ল। প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে ঠোঁটের ফাঁকে গুঁজে দিলাম। দেশলাইটি জ্বালতে যাব কি সেই মুহূর্তেই এইমাত্র বলে যাওয়া বন্ধুর সাবধান-বাণীটা মনে পড়ে গেল।

সিগারেটটা ঠোঁট থেকে খুলে প্যাকেটে ভরে ফেললাম। রাষ্ট্রপতি হবার সম্ভাবনাটা আরো ক’টা দিন জিঁয়ে রাখা যাক।

ডায়াবেটিস

মনোজিৎ বিশ্বামিত্র



হেলেনকে নিয়ে তখন এথেন্স ও ট্রয়ের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ চলেছে। তখনকার দিনে সূর্যাস্তের পর যুদ্ধ হত না। যেমন মহাভারত সিরিয়ালেও দেখানো হয়েছে। তা একদিন রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর দু'জন ট্রোজান সোলজার পায়চারি করতে বেরিয়েছিল। একজন আরেকজনকে বলল, গত ক'দিনে এথেন্সের অনেক বড় বড় বীরকে মারলাম। ম্যাকসিমাস, জেনোফ্রেটিস, এপিগোনাস, মেলিয়াটিস—সব ক'টাকে খতম করেছি। কিন্তু এই ডায়াবেটিস আমাকে কাবু করে ফেলল।

তার সঙ্গী গর্জে উঠল—কাল দেখিয়ে দিস তো। বেটাকে যদি না মারি তো....

আপনাদের মধ্যে যাদের ডায়াবেটিস আছে, তাঁরা জানেন ডায়াবেটিসকে মারা যায় না। ডায়াবেটিসই মারে। তবে রাতারাতি নয়, আস্তে আস্তে। এই ব্যাপারটা উপভোগ করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। আমার ডায়াবেটিস হওয়ার পর আমি খুবই আনন্দে আছি। গোটা জীবনের ছক বদলে গেছে। মনুষ্য চরিত্র সম্বন্ধে জ্ঞান বেড়েছে। বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-অনাত্মীয় পরিচিত-অপরিচিত সকলের কাছ থেকে উপদেশ ও পরামর্শ পাচ্ছি। আবিষ্কার করছি যে এ বন্ধুর পথে আমি একমুখী। আমার জানাশোনা অধিকাংশ লোকেরই ডায়াবেটিস আছে। তাঁরা ওষুধ খান। হন হন করে হাঁটেন। লুকিয়ে দোকানে গিয়ে সদেশ খান। ডায়াবেটিস সম্পর্কে তথ্য জোগাড় করেন।

আমি হোমিওপ্যাথি চেষ্টা করেছিলাম। আগামী দশ বছর ওষুধ খেলেই সেরে যাবে, বললেন হোমিওপ্যাথ। ডানদিক ফিরে শোওয়া বারণ, জীবনমুখী গান শোনা বারণ, দেশ পত্রিকার ধারাবাহিক উপন্যাস পড়া বারণ। উচ্ছে খাওয়া আবশ্যিক। মদ সিগারেট চলাবে না। আমি ভেবে দেখলাম, দশ বছর বাঁচা কোনোমতেই সম্ভব নয়। সুতরাং ওষুধ খাওয়া কেন? খাইনি।

অ্যালোপ্যাথের কাছেও গিয়েছিলাম। তিনি সাতাশটা টেস্ট করাত্তে দিলেন। মোট খরচ ৩২,৫০০ টাকা। এক একটা টেস্ট এক এক জায়গায়, তার সবগুলিতেই তিনি জড়িত আছেন। অর্থাৎ সর্বত্রই কমিশন বাঁধা আছে। তা থাক। কিন্তু আমার ব্যাঙ্কে ৩২,৫০০ টাকা নেই। সুতরাং অ্যালোপ্যাথি হল না।

কবিরাজি চেষ্টা করেছিলাম। তিনি প্রথমে নাড়ি দেখলেন। তারপর বললেন, হবে না। কী হবে না? চিকিৎসা। কেন? নাড়ি দেখে বোঝা যাচ্ছে আর বিশেষ সময় নেই। নাড়ি শীঘ্রই বন্ধ হয়ে পাবে। বলে জপ করতে লাগলেন।

বন্ধু-বান্ধবরা এক তান্ত্রিকের কাছে পাঠালেন। তিনি এক শিশি তরল পদার্থ দিলেন। এটি নিয়ে কৃষ্ণপঙ্কের সপ্তমী তিথিতে গঙ্গার পাড়ে যেতে হবে। কোন এক অশশ্যাওড়া গাছের নিচে শিশিটি মাটিতে রেখে শীর্ষাসন করতে হবে দশ মিনিট। তারপর

ঐ তরল পদার্থটি গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে ১০৮ বার বলতে হবে কষ্টকার কষ্টকার কষ্টকার। তারপর বাড়ি ফিরে আসতে হবে। শিশির বস্তুটি খেলে কিন্তু নির্যাত্ত মৃত্যু। ফি ২৫০ টাকা। ওতে আমার সাতদিনের বাজার হয়ে যায়। তাই চেষ্টা করিনি।

জ্যোতিষীর কাছেও গিয়েছিলাম। তিনি বললেন আগামী বুধবার মঙ্গল, শনি আর রাহু একসঙ্গে একই ঘরে ঢুকেছে। তার একমাসের মধ্যে হয় আমার ডায়াবেটিস সেরে যাবে, অথবা আমার রিস্ট হবে। রিস্ট মানে মৃত্যু। তারপরে অনেক বুধবার কেটে গেছে। সারেওনি, রিস্টও হয়নি।

স্থানীয় এক পার্টির দাদার কাছে গেলাম। তাঁর মত—বর্তমান আর্থ সামাজিক পরিস্থিতিতে ডায়াবেটিস জাতীয় ব্যাপার এড়ানো সম্ভব নয়। বিশেষত বিশ্বায়নের পর ওগুলো বেড়ে উঠছে। লড়তে হবে। বর্তমান সামাজিক কাঠামোর মধ্যে খুবই মুশকিল, তবে পার্টির আগামী জোনাল কনফারেন্সে তোলা যেতে পারে।

শেষ পর্যন্ত সাহুনা জোগালো এক পুরনো বন্ধু। তার সাহিত্যিক হবার বাসনা ছিল। সুবিধে করতে পারেনি। মাঝে মাঝে ছড়া লেখে। পাঁচটি লাইন আমার জন্যে লিখে দিল :

রক্তে যদি একটু বাড়ে শর্করা,
ডাক দিয়েছে জেনো কালের হরকরা,
চিনি খেয়ে না চায়ে
রোজ হেঁটো জোর পায়ে,
যমের সাথে যায় না জেনো দর করা।

অকপটে

কি ব্যাপার? ইঁদুরগুলো কি এদের দেখতে পায়নি? হতেই পারে না। যারা কাঁট ফুটো করে বই ধ্বংস করে তারা চোখের সামনে পড়ে থাকা খাবার খাবে না?

পারভাটেড উইপোকারা

সমরেশ মজুমদার



গত বছরের বইমেলায় কানু বাবু কিছু বই কিনেছিলেন। বাংলা সাহিত্যের যত নামি-দামি বই তা এর আগেই তাঁর আলমারিতে জায়গা পেয়েছে। গত চল্লিশ বছরের সেইসব সংগ্রহ তিনি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পড়েছেন। পথের পাঁচালীর প্রথম সংস্করণ, হাঁসুলিবাঁকের প্রথম সংস্করণ অতি যত্নে রেখেছেন তিনি। গতবার বইমেলায় গিয়ে মনে হল আজকের ছেলেদের লেখা তাঁর পড়া উচিত। হালফিল সাহিত্যের কথা না জানাটা অন্যায়। তরুণ লেখকদের কয়েকটি গল্প এবং কবিতার বই-এর সঙ্গে একটি মোটা উপন্যাসও কিনেছিলেন যার রচয়িতার কোনো লেখা এর আগে তিনি পড়েননি। কিন্তু অজানা লেখকের এত মোটা উপন্যাস যখন প্রকাশক সাহস করে ছাপছেন তখন নিশ্চয়ই খুব ভালো হবে বলে তাঁর মনে হয়েছিল।

বাড়িতে ফিরে কানু বাবু বিপাকে পড়লেন। তাঁর বই-এর দুটো আলমারিতে এক কৌটা জায়গা নেই। নতুন আলমারি কেনার কথা ভেবেছিলেন, কেনা

হয়নি। নতুন কেনা বইগুলো একটা টেবিলে রেখে দিয়েছিলেন তখনকার জন্যে। একেবারে নিচে মোটা বইটি, তাব ওপরে পাতলাগুলো।

কানু বাবু বিপন্ন। একমাত্র কন্যা থাকে আমেরিকার নিউজার্সিতে। সেখান থেকে ফোন এল মেয়ে খুব অসুস্থ। জামাই বলল, 'বাবা, তাড়াতাড়ি চলে আসুন।'

দশবছরের ভিসা আগে থেকেই নেওয়া ছিল, ফ্ল্যাটে চাবি দিয়ে কানু বাবু মেয়ের কাছে উড়ে গেলেন। মেয়ের বুকে ক্যানসার ধরা পড়েছে। তার চিকিৎসার সময় পাশে থাকলেন, অপারেশন হল, ডাক্তার বললেন, 'আপাতত বিপদ নেই।' এই করতে এগারো মাস চলে গেলে মেয়েকে কিছুটা সুস্থ দেখে কানু বাবু ফিরে এলেন।

এবারের বইমেলায় বিজ্ঞাপন দেখে কানু বাবু মনে পড়ল গতবারে কেনা বইগুলোর কথা। দেশে না থাকায় পড়া হয়নি অথচ আব একটা বইমেলা

তাদের গর্তের সামনে বইগুলো রেখে
গবেষকের চোখে তাকালেন। তখনই
কাণ্ডটা ঘটল। হাজার খানেক যেন
প্রাণের দায়ে কার্জন পার্ক ছেড়ে
পালাতে চাইল রাজভবনের দিকে।

এসে যাচ্ছে। কানু বাবু লজ্জিত হলেন। সেইদিন হঠাৎ তাঁর কানে খচর খচর শব্দ বাজল। কি ব্যাপার? শব্দের উৎস খুঁজতে গিয়ে বই-এর আলমারির কাছে পৌছতেই দেখলেন দু'টো ইঁদুর পেছন দিক থেকে পালিয়ে গেল। সর্বনাশ।

তাড়াতাড়ি আলমারি খুলেই তিনি মাথায় হাত দিলেন। তাঁর এগারো মাসের অনুপস্থিতিতে দু'টো আলমারির পেছনের নরম কাঠ ফুটো করে ইদুরেরা ঢুকে প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের সঞ্চয়িতাকে খেয়েছে। একে একে দেখতে পেলেন—শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, এমনকি সমরেশ বসুকেও বাদ দেয়নি রাক্ষসগুলো। কোনোটার খানিকটা কাটা, কোনোটার অর্বেকটাই। ঝুরঝুর পড়তে লাগল কাগজের টুকরোগুলো। চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন কানুবাবু। প্রতিজ্ঞা করলেন, ইদুরগুলোকে পরলোকে না পাঠিয়ে জলস্পর্শ করবেন না। সেদিনই ইদুর মারার বিষ প্রয়োগ করতে গোটা দশেক লেখটি এবং চারটে মজবুত ইদুরের মৃতদেহ পাওয়া গেল। তিনদিন পরে ওদের সংখ্যা চল্লিশে পৌছলে দেখা গেল আর কোনো ইদুর এদিকে পা বাড়াচ্ছে না।



ইদুরেরা ঢুকে প্রথমেই
রবীন্দ্রনাথের সঞ্চয়িতাকে
খেয়েছে। একে একে
দেখতে পেলেন—
শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ,
তারাশঙ্কর, এমনকি
সমরেশ বসুকেও বাদ
দেয়নি

ইদুরকুল ধ্বংস করে ছিন্নভিন্ন বইগুলোর কথা ভাবতে বসে কানুবাবুর নজর পড়ল টেবিলের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ফাঁপরে পড়লেন। গত বইমেলায় কেনা বইগুলো টেবিলের ওপর খোলা পড়ে আছে এগারো মাস। ওগুলো নিশ্চয়ই আস্ত নেই। হাত বাড়িয়ে প্রথম কবিতার বইটা তুলে আশ্চর্য হয়ে গেলেন কানুবাবু। একটা আঁচড়ের দাগ পর্যন্ত নেই। প্রতিটি পাতা আস্ত, এখনো নতুন-নতুন গন্ধ বের হচ্ছে। দ্বিতীয় বইটি তুললেন, ছোটগল্পের।

সেটাও নতুন হয়ে আছে। কি ব্যাপার? ইদুরগুলো কি এদের দেখতে পায়নি? হতেই পারে না। যারা কাঠ ফুটো করে বই ধ্বংস করে তারা চোখের সামনে পড়ে থাকা খাবার খাবে না? কিন্তু খায়নি তো।

কানুবাবু ভাবতে বসলেন। অনেক ভেবে মনে হল, এটা আধুনিক প্রকাশনার অবদান। এখন নিশ্চয়ই বই-এর মলাট ছাপার সময় এমন কেমিক্যাল মিশিয়ে দেওয়া হয় যা ইদুরদের সহ্য হয় না। দূর থেকে তার দ্রাণ পেয়ে ওবা এদিকে এগোয়নি। তাড়াতাড়ি এক পরিচিত প্রকাশককে ফোন করে প্রশ্নটা করলেন কানুবাবু। প্রকাশক আকাশ থেকে পড়লেন। কই, এমন কথা তো তাঁর জানা নেই। উশ্টেই তিনি কানুবাবুকে ধন্যবাদ দিলেন এই আবিষ্কারের জন্যে। এখন যেসব বই তাঁর প্রকাশনা থেকে বের হবে তাতে তিনি এই এক্সপেরিমেন্ট করবেন। অবশ্য তাতে অসুবিধে আছে। অনেক পাঠক পাতা ওল্টান জিভে আঙুল স্পর্শ করে। যে বিশেষ ইদুর মরে সেই বিষ পাঠকের শরীরে যাওয়া ঠিক নয়। অবশ্য একটা ওয়ার্নিং ছেপে দেওয়া যেতে পারে মলাটের এককোণায়।

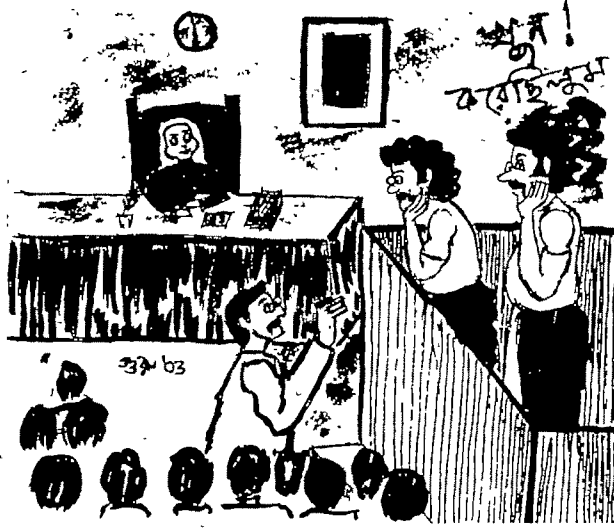
নিজের ভাবনা সঠিক নয় জানার পর কানুবাবু মুগড়ে পড়লেন। দু-একটা ইদুর ধরে এনে তাদের বইগুলোর ওপর বসিয়ে দিয়ে দেখলে হত। কিন্তু এখন এখানে ইদুর পাবেন কোথায়। তখনই মনে পড়ল। পাতলা বইগুলো তুলে ছুটলেন কার্জন পার্কে। সেখানে গর্ত থেকে মেরিয়ে লুটোপুটি কবছে হাজার শানেক ইদুর। তাদের গর্তের সামনে বইগুলো রেখে গবেষকের চোখে তাকালেন। তখনই কাণ্ডটা ঘটল। হাজার শানেক মেন থাপের দায়ে

কার্জন পার্ক ছেড়ে পালাতে চাইল রাজত্ববনের দিকে। পটাপটা ছুটন্ত বাস-গাড়ির চাকার তলায় পিষ্ট হয়ে যাচ্ছিল তারা, তবু কার্জন পার্কে থাকতে চাইছিল না।

বইগুলো নিয়ে ঘিরে এসে কানুবাবুর নজর পড়ল মোটা বইটির দিকে। দু'হাতে তুলতে গিয়ে বেশ হালকা লাগল। পাতা ওল্টাতেই আর এক চমক। পুরো বইটির তিনভাগের দু'ভাগ সুন্দরভাবে খেয়ে ফেলেছে উইশোকারা। খেয়েদেয়ে চলে গেছে। আশ্চর্য। শুধু এই বইটা, তাও পুরোটা নয়, উই খেয়ে গেল? কানুবাবু হাঁখম থেকে পড়তে আরম্ভ করলেন। বেশ ভালো লাগছিল পড়তে। উইপোকা যে সব জায়গা সুনিপুণভাবে খেয়ে গেছে সেগুলো ছাড়াই পুরো উপন্যাস পড়ে ফেলে মনে হল খুব শক্তিশালী কলম। বেশ ভালো দেখা। কিন্তু বাকি দুই তৃতীয়াংশের দেখা পড়া হল না, এ হতে পারে না। তিনি বাজার থেকে আর একটা বই কিনে এনে উইকাটা অংশগুলো পড়তে গিয়ে চোখ বন্ধ করে ফেললেন। পরে চোখ খুলে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখলেন, উইগুলো সেইসব অংশ খেয়ে গেছে, যেখানে চিৎপুরের মলাটহীন চটি বই থেকে টোকা হয়েছিল।

কানুবাবু সিদ্ধান্তে এলেন, উইগুলোতে কোনো স্ত্রী-উই ছিল না, সব পারভার্টেড পুরুষ উই।

জবর থবর



খুন! করেছিলাম নাকি?

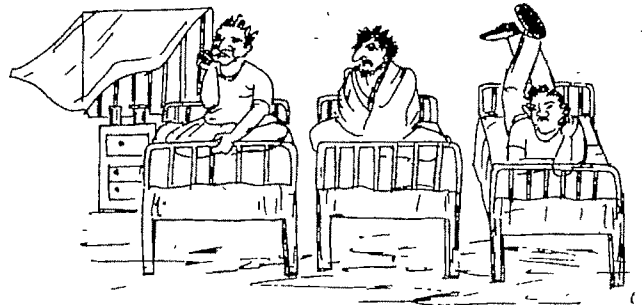
ন'বছর কেটে গেছে। ভুলে যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। কুরদুস আলম আর মহম্মদ একলাখ-এর স্মৃতিশক্তিও তেমনি বাপসা হয়ে আসছিল। ন'বছর আগে একটি বালককে খুন করেছিল তারা। জবরদস্ত প্রশাসন এবং মহামান্য আদালত মাত্র ন'টি বছর নিয়েছে তাদের সাজা দিতে। ঘটনা মনে করতে গিয়ে কুরদুস আর একলাখ এক লাখ বার মাথা চুলকোচ্ছে। আর কটা বছর সময় নিলে তারা বেহেশত-এ বসে দুনিয়ার বিচারটা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতে পারত। বড়ই মনে কষ্ট পেয়েছে দুই-সাজাও।



পাগল নয়, মনোরোগী

পাগল তো নয়, মনোরোগী ওনারা। পাগলা গারদে দেওয়া মানেই মনের চূড়ান্ত অসম্মান। তাই সূর্যকান্ত মিশ্র উঠেপড়ে লেগেছেন। পাতালে, না না, হাসপাতালে মনের রুগিদের জন্যে এবার আলাদা ব্যবস্থা। আলাদা জায়গায় খাটে চিৎ হয়ে তাঁরা মনের চর্চা করবেন। বহুং চিন্তা খরচা করবেন। দেশ ও দেশের কথা ভেবে ভেবে মাথায় টাক গজাবেন।

যে সব কুকুররা হাসপাতালে ঢুকে সদ্যোজাতকে মুখে নিয়ে সুড়ুং করে কেটে পড়ে তারাও অবশ্যই মানসিকভাবে সুস্থ নয়। নইলে এমন দুর্ভিক্ষ কখনোই তারা করতে পারত না। কিন্তু সর্বস্বান্ত সরকারের কথা ভেবেই সম্ভবত সূর্যকান্ত তাদের জন্যে আলাদা ওয়ার্ড তৈবির উদ্যোগ নেননি। বিশ্বস্ত সূত্রে প্রকাশ—বিষয়টি নিয়ে মানেকা মনে মনে খুবই গবেষণা করছেন।



হায় রোমিও!

পাড়ার রোমিও মরলে তার বাপ-মা ছাড়া আর কেউই কাঁদে না। কিন্তু এ রোমিও সে রোমিও নয়। প্রেমিক রোমিও। প্রাণেশ্বর রোমিও। না না, শুনলে ঘোড়ায় হাসব না, বরং কাঁদব। কারণ রোমিও নিজেই যে ঘোড়া। ঘোড়াটি কর্মরত অবস্থায় সেই যে পড়িল, আর উঠিল না। আর তাই দেখে মনোবৈকল্য ঘটেছে তার প্রেমিকা পিকির। আর তাহ্লেব কি বাত, এই রোমিওগিরি তথ্য অবৈধ প্রণয় দিনের পর দিন পুলিশের নাকের ডগায় নয়, একেবারে ঘরের মধ্যে যাকে বলে আস্তাবলে—পুলিশ কিছুটা জানতে পারেনি। অবশ্য রোমিও মৃত্যুতে পিকির তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখে পুলিশের টনক নড়েছে। তদন্ত শুরু হয়েছে—এত বড় দুর্ভিক্ষ কী করে চুপিসাড়ে সম্পন্ন হচ্ছিল। পুলিশ কোডে ঘোড়াদের প্রণয়ের অধিকার নিয়ে কিছু বলা আছে কি না, দেখা হচ্ছে তাও।



বুড়ো বয়েসে ধেড়ে নেতা

পণ্ডিত রবিশঙ্কর বুড়ো বয়েসে সুকন্যাকে নাচাতে নাচাতে নিজের ঘরে টেনে এনেছিলেন। খুঁজুরে হওয়ার পর বোধহয় এবার তাঁর নিজেরই সাথ হয়েছে নাচবার। প্রথম পরিবার অন্নপূর্ণার সূত্রে নাতনি কাবেরী ক্যালিফোর্নিয়া থেকে কলকাতায় এসেছেন নাচতে এবং শহরকে নাচাতে। সবার আগে তিনি বুঝি বা দানুকেই নাচিয়ে নিয়েছেন একপাক। পণ্ডিতজি মনে মনে বোধহয় গাইছিলেন—নেচে নেচে আয় মা শ্যামা। তবে সুকন্যার মতো আর কেউ শাখা-সিঁদুর পরে নাচতে নাচতে পণ্ডিতবাজির ঘবে ঢুকে পড়বে—এ সম্ভাবনা এখনো দেখা যাচ্ছে না। একটি সংবাদপত্র তার চমৎকারিচ্ছে এইভাবে সংবাদ পরিবেশন করেছেন—“রবিশঙ্কর ও অন্নপূর্ণার নাতনির নাচ দিল্লিতে”。 এটি হল শিরোনাম। যদিচ সংবাদ অংশে পণ্ডিতজির নাচার কোনো খবরই নেই। সম্ভবত নিভূতে তাঁরাই একমাত্র এই নেত্যাটি দেখেছেন। দিল্লিকা লাড্ডু, খুড়ি নেত্যা।

পছন্দমতো

যে কোনো দুটো শারদীয় সংখ্যা এবং ইচ্ছেমতো পনেরোটি সাধারণ সংখ্যা পত্রপাঠ নিয়ে যান মাত্র ১০০ টাকায়।

এই সুযোগ শুধুমাত্র বইমেলায় কটাদিন। মনে রাখবেন, পত্রপাঠ-এর অনেক সংখ্যাই শেষ হয়ে গেছে। অন্য সংখ্যাগুলোও আপনার জন্যে বিশেষ অপেক্ষা করবে না। পত্রপাঠ পূর্ণমুদ্রণ হয় না। অতএব.....বইমেলা ২০০৩, স্টল নং : এস-২৯৪

গরুক্ষেতর

যাকে বলে কুরুক্ষেত্র, তাই ঘটে গেল শক্তিগড়ে। একটা বাইপাস তৈরি করতে গিয়ে ল্যাংচা শিল্পকে প্রায় টা টা বাই বাই করে ফেলছেন সরকার। ল্যাংচার ওপরে এমন, ল্যাং মোটেই ভালো চোখে নিচ্ছে না শক্তিগড়ের লোকেরা। তারা গরুর রথে চড়ে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। শতাব্দেক গরুর গাড়ি চড়ে হাতে ঝাণ্টাটা নিয়ে তারা একেবারে গরুক্ষেত্র করে ফেলেছে। তিনজন পুলিশ গরুর গুতোয় কাৎ হয়েছেন। অফৌহিনীকে অতএব পুলিশ বেথডক রুলশেটা করেছে। আঠারোজন, শুনে শুনে আঠারোজন চিৎপাত। কথায় বলে না, বামে ছুঁলে আঠারো ঘা। গরুর পালে বাঘ পড়লে সে ছাড়া আর কীই বা হবে?



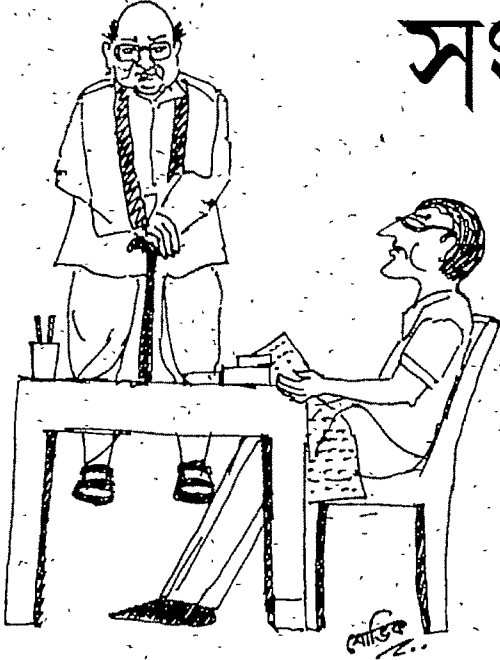
ছবি আঁকা

যে কোনো রকমের ছবি আঁকতে (কার্টুন, স্টিল লাইফ, পোট্রেট, লাইফ ড্রয়িং) অথবা— বাচ্চাদের ছবি আঁকানো শেখানোর জন্য (বাড়ি গিয়ে শেখানোর সুবিধাও পাবেন) এবং কাপড়ে নতুন ডিজাইন করাতে ইচ্ছুক থাকলে দয়া করে নিম্নলিখিত ফোন নম্বরে যোগাযোগ করুন।

(শোভিক বসু রায়) যাদবপুর

ফোন : ২৪৮৩-৩১৪০

(সকাল ৮-১২ টা রাত্রি ৯টার পর)



সং-এর যোগ্যতা

শরদিন্দু কর

শোনে। অভিনয়টাও করতে পারে না তবে দলের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করে। চেয়ার সাজায়, মাইক ফিট করে, রিহাসলে চা এনে দেয়, পর্দা টানে।

—জেনারেল নলেজ কেমন?

—ছেলে বলে, আজকাল জেনারেল নলেজের কোনো দাম নেই। ও সব শুধু কোটিপতি সিরিয়াল দেখতে লাগে।

—আন্তর্জাতিক খবরাখবর রাখে?

—না, বলে—ওয়াশিংটন। চীনে কিবা লেবাননে কোথায় কি হল খোঁজ রেখে লাভ কি?

—দেশের খবর রাখে? খেলাধুলো করে?

গুলতানি করে রাজা-উজির মারে। তবু
হজুর আপনি ওর জন্যে একটা কিছু করে
দেন। ছেলের বাবা হাত জোড় করে। হক
সাহেব মাথা দুলিয়ে বললেন, তাই তো
হে, ওকে মন্ত্রী করে দেওয়া ছাড়া অন্য
কিছু যে ভাবতেই পারছি না আমি।

—দেশের খবর মানে পশ্চিমবঙ্গ আর সেটা ও চায়ের দোকানে বসে
জেনে নেয়। খেলাধুলো করে সময় নষ্ট করতে চায় না বরং সেই সময়টা টিভির
পর্দায় মারদাঙ্গার সিরিয়ালগুলো দেখে। তবে মাঝে মাঝে তিন পাক্তির তাস
খেলে কক্সবান্দার সাথে ফুটি করে।

—কী ভালোবাসে?

—খুন ডাকাতি ধর্ষণ আর অ্যাকসিডেন্টের খবর খুব ইন্টারেস্ট। তার
সাথে আত্মহত্যা, রাজনীতি, হাওয়া বুঝে করে। ফত্বা বড় মানুষই হোক তার
মুখে চুনকালি মাখাতে গুস্তার, চুনোপুটির কথার জোরে রাঘব বোয়াল
বানাতো পারে—তিলকে তাল তালকে তিল....।

সনাতনদাদু ওর নিজের গল্পের হক সাহেবের মতো হাত দিয়ে থামিয়ে
দেন। বলেন, থাক থাক আর বলতে হবে না, বুঝে গেছি। তিল থেকে তালের
হয়ে যাবে আপনার ছেলে। যখন বিশ্ব ব্রজাণ্ডের অন্য কোনো খবরই রাখে
না, খুন জখম, ধর্ষণ, পথ দুর্ঘটনা ডাকাতি আর আত্মহত্যাতেই ওর এত
ইন্টারেস্ট তখন সেরকম বাংলা কাগজের দপ্তরে ওকে ঢুকিয়ে দিতে পারলে
বিখ্যাত হয়ে যেতে পারবে দুদিনেই।

আপনার ছেলের ওই ভয়ঙ্কর জ্ঞান নিয়ে সেই সব বাংলা কাগজের সং,
খুঁড়ি সাংবাদিক হওয়া ছাড়া অন্য লাইনে যাওয়ার কথা চিন্তাই করা যায়
না।

সনাতনদাদু পাড়ার পাকামাথা মানুষ। পাড়া-পড়শিদের সুপারামর্শ দেন।
মাঝে মাঝে একটি গল্প শোনান সুকলকে।

তখন ফজলুল হক সাহেব ছিলেন অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী
(মুখ্যমন্ত্রী)। একদিন হক সাহেবের গ্রামের একজন বয়স্ক মানুষ তাঁর ছেলের
জানো কিছু করে দেওয়ার ব্যাপারে তাঁর কাছে এসে খুব ধরাধরি করেছিল।

হক সাহেব জানতে চাইলেন ছেলে পড়াশুনা কত দূর কি করেছে।

লোকটি উত্তর দেয়, ম্যাট্রিক পাশ করেছে তবে কলেজে গিয়ে পড়াশুনায়
তেমন সুবিধা করতে পারেনি।

তিনি জানতে চাইলেন, চাষাবাস বা অন্য কাজকর্ম কিছু শিখেছে?

তার উত্তর এল, না হজুর সে সব কিছু শেখেনি। কাজকর্ম কিছু করতে
চায় না।

তখন হকসাহেব শুধালেন, তাহলে কী করে?

ছেলের বাবা মাথা নিচু করে অপরাধী ভঙ্গিতে বলল, কি বলব দুঃখের
কথা, সারাদিন চায়ের দোকানে বসে শুধু চা-সিগারেট ওড়ায় আর গুলতানি
করে রাজা-উজির মারে। তবু হজুর আপনি ওর জন্যে একটা কিছু করে দেন।
ছেলের বাবা হাত জোড় করে। হক সাহেব মাথা দুলিয়ে বললেন, তাই তো
হে, ওকে মন্ত্রী করে দেওয়া ছাড়া অন্য কিছু যে ভাবতেই পারছি না আমি।

সনাতনদাদুর কাছে সেদিন এক ভদ্রলোক এসেছেন।

তিনি ছেলের ব্যাপারে খুব চিন্তিত। তাই জানতে চাইলেন ছেলের কোন
লাইনে যাওয়া ঠিক হবে। সনাতনদাদু প্রশ্ন করেন—পড়াশুনায় কেমন, ডায়েন্ট
বা ওই ধরনের কোনো পরীক্ষায় বসেছিল?

ভদ্রলোক জানালেন, বসেছিল তবে কিছু করতে পারেনি।

—কী নিয়ে পড়েছে?

—আজ্ঞে, সাক্ষেস বা আর্টসে অনার্স পায়নি। পাশ কোর্সে বি এ পাশ।

—সাহিত্য, গান বা অভিনয় কিছু জানে?

—কবিতা লেখে। তবে ওর কবিতা নাকি তেমন কেউ বুঝতে পারে না।
তাই ছাপা হয় না। গান জানে না, তবে ক্যাসেটে রিমেক গান মাঝে মাঝে

দিস মা গরু করে। চামড়ার ভয় নেই গরুদের। চামড়ার কারবার তো মেনকা রস্তারা কবে থেকে করছে। এখন তো লাইসেন্সধারী কারবারী আছে শ'য়ে শ'য়ে। ইউনিয়ন করছে। একাডেমিতে আদিকলার প্রদর্শনী দিচ্ছে। বুকফেয়ারে বুক-খোলা স্টল দিচ্ছে।

আবার বাঁচি

দিব্যেন্দু দাস

মা গো, পরের জন্মে যেন পুরো গরু হয়ে জন্মাতে পারি। অনেকটা হয়ে এসেছি। আর একটুখানি। হাতদুটোকে নামিয়ে পা বসিয়ে দিস মা। লেজ দিলে দিস। না দিলেও চলবে। সিং তো আর কাজেই লাগে না। হসপিটালের ই. সি. জি। শেষবারের মতো বিবর্তন দে মা। আর চাইব না, গরুরা যে কী চায় তা আজ পর্যন্ত সাতপুরুষের গোয়ালারাও জানতে পারল না। আর কেনই বা চাইবে? পিচের রাস্তার ধারেও ঘাস গজায়। দশফুট রাস্তার ছ'ফুট পিচ। দু'পাশে দু'ফুট করে মাটি। পরীক্ষার খাতার মার্জিন। বরাত পাইয়ে দিয়ে অফিসারের মার্জিন। ক'দিনেই নেই মাটিতে মালের ম্যাকডোয়েল, আমিনিয়া, অম্বর, পিয়ারলেন্স-ইন, বসন্ত কেবিন। গোয়াল থেকে বেরিয়ে নাদাখানেক গোবর ছড়িয়ে লেজ দুলিখে মালের ভোগ। গোয়ালে থাকলেও পাচ্ছে। গোয়ালার মাতৃভোগ। এমনকি গোয়াল থেকে ফুসলে বেরিয়ে জি. টি. রোড ধরলেও পাচ্ছে। দিস মা গরু করে। চামড়ার ভয় নেই গরুদের। চামড়ার কারবার তো মেনকা রস্তারা কবে থেকে করছে। এখন তো লাইসেন্সধারী কারবারী আছে শ'য়ে শ'য়ে। ইউনিয়ন করছে। একাডেমিতে আদিকলার প্রদর্শনী দিচ্ছে। বুকফেয়ারে বুক-খোলা স্টল দিচ্ছে।

দক্ষিণেশ্বরে থাকতে ঠাকুর একবার রানীকে চড় কবিয়ে বলেছিল, তোর অমন কথাকলি-রাবণের মতো চোখ ঘোরে কেন? গরুর মতো চোখ চাই। তবে মাকে পাবি।

ঠাকুর ঠিক বলেছিলেন। গরু চোখ মারে না। গরুর চোখে সন্দেহ নেই। স্বপ্ন নেই। ঘেমা নেই। বাস্তবযুগের চাহনি নেই। স্কুলের মাঠ প্রমোটারের হাতে তুলে দেবার বাসনা নেই। নির্জন পথে ঘুবতী দেখে চক্‌চক্‌ করে না। সাপখোলা দেখার জন্যে দাঁড়িয়ে পড়ে না। লেডিস সিটের সামনে দাঁড়ালে মগিদুটো খুলে মামনির জামার ভেতর চলে যায় না। গরুর চোখ কত উদাসীন। মস্ত্রীদের



মতো। স্বাস্থ্যমন্ত্রী হাসপাতালে আহতদের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। সে রাতে সবকটা মারা গেল। শুধুরে অভাবে। নার্স ইউনিয়ন সারাদিন ঘেরাও করে রেখেছিল 'উদাসীন' মস্ত্রীকে।

আধুনিক বিজ্ঞান বলছে দুশ্চিন্তাই দুশো রোগের কারণ। উদাসীনতাই স্বাস্থ্যের সিক্রেট। গরুদের চশমা লাগে না। চারেও যা চম্পিশেও তা। স্ক্যাম-ফ্রি ডাবা ডাবা। মাহাপুরুষদের যেমন। রবিঠাকুর থেকে রামঠাকুর—সব তাকিয়ে আছে অপলক চোখে। ফ্রেম-বন্দী হাবা হাবা। দেবতারও গরুবৎ ভূষ্ট, ভক্ত প্রেমে। এই ক'দিন আগে নরেন্দ্র মোদী বড় করে হোম করেছে গোথরায়। তাঁর আগে হাজারখানেক নরবলি হয়েছে। কাশ্মীরে তো কুরবানির মেলা লেগেছে। হিউম্যান লেক্সপো। বুকফাটা-ফেয়ার। প্রশাসনে গরু। চেয়ারের নিচে জাব। খুলি ভর্তি গোবর। চোখে সেই 'চলো যাই চলে যাই' দৃষ্টি। দিস মা, দিস মা গরু করে।

সৌরশক্তি জিনবিদ্যা; পরমানু, জীবানু—সব তুই রাখ মা। শুধু দুটো বাঁচি দিয়ে পাঠিয়ে দে। চরে খাই। পারলে দু'টোর পাশে আর চাট্টি ঝুলিয়ে

দিস মা। গরিব গোয়ালার ইন্জেকশানটা বেঁচে যায়। আমার পাছটাও বাঁচে। তবে জ্বলে ডোবা থেকে দুধ হয়ত বাঁচবে না মা। গোবর একটু কেজিতে বাড়িয়ে দিস মা। গ্যাসের দামে আগুন লেগে গেছে। আবার দেওয়াল ভরে উঠুক খুঁটেতে। ক্ষেত ভরে উঠুক সারেতে।

মাগো, আবার বাঁচি খুঁটের দড়ির ওপর গা এলিয়ে ভেজিটেবিল চাউমিন চিবিয়ে। আবার বাঁচি তুলসিগাছে মুখ বাড়িয়ে চাবীবউয়ের খিঁচি শুনে শুনে। আবার বাঁচি বটের গোড়ায় রাম-রহিমের এঁটো তাঁড়ির হাঁড়ি চেটে চেটে। আবার বাঁচি নীল আকাশের নিচে। কারখানার তাঁে শুনে শুনে।

মারায়ণ

পিনাকীশঙ্কর চৌধুরী



(পূর্ব প্রকাশিত-র পর)

মর্ত্যালোক—৩

চ্যবন ঋষির পুত্র নাম রত্নাকর।
দস্যুবৃত্তি করে সেই বনের ভিতর।।

—কৃতিবাস।

বাপ-মায়ের দেওয়া নাম রত্নাকর। ভালো বাড়ির ছেলে। বাবা কলেজের অধ্যাপক। অতি সজ্জন ব্যক্তি। ক্লাশে পড়াতেন ভালোই। ছাত্ররাও মন দিয়ে লেকচার শুনত। লেকচারের মধ্যখানে মুখে বই চাপা দিয়ে খুব একটা কুকুর-বেড়াল ডাকত না। এমনকি কেউ কেউ ক্লাশের খাতার নোটও নিত। ভদ্রলোকের আর সবই ভালো। শুধু দোষের মধ্যে পান খাওয়া। পান খাওয়াটা অবশ্য

কিছু দোষের নয়। পান করাটা দোষের তালিকায় পড়ে। আজ্ঞে না, দোষাবহ পান বলতে আবার জল পানের কথাও হচ্ছে না। সে পান এমন এক পান যেটা করলে মাথা থেকে পা পর্যন্ত কিক ঘেরে দেয়। আর ধরলীতলের আকর্ষণ এড়িয়ে শুধু উড়তে ইচ্ছে করে। ইংরাজিতে বলে ড্রিঙ্ক। রত্নাকরের পিতাঠাকুর সেরকম পান করতেন না। উনি পান খেতেন। এ পানে দোষ নেই।

মুখ ভর্তি পান। সারাদিন শুধু চ্যাবোর চ্যাবোর করে চিবিয়েই চলেছেন। ছাত্ররা আড়ালে ডাক্তার 'পান চিবানো স্যার।' ছাত্রদের বয়স কম। মাথার মধ্যে রাখা গোবর যথেষ্ট কাঁচা। তাই মগজগুলি যথেষ্ট উর্বর। উর্বর মগজ থেকে আগাছার মতো গজ গজ করে গজাতে থাকে শিক্ষক অধ্যাপকদের

জান্যে সুন্দর সুন্দর খাপ খাওয়ানো নাম। যেমন হরগোবিন্দ ঘোষ, এইচ জি জি হয়ে যান হাণ্ডবাবু, প্রতুলচন্দ্র মুখার্জী, পি সি এম হয়ে যান পিসিমা আর বঘুনাথ দত্ত, আর এন ডি তো এক ঝটকায় রেণ্ডি। 'পান চিবানো সার' ছাত্রদের মুখে প্রমোশন পেতে পেতে হয়ে গেল 'চ্যাবন সার,' সেখানে থেকে স আর র জায়গা বদল করে চ্যাবন ঋষি।

এই চ্যাবন ঋষির পুত্রই হলেন শ্রীমান রত্নাকর। বাপ একজন ঋষিতুল্য শ্রেয়ে ব্যক্তি হলে কি হবে পুত্র কিন্তু বইপত্রের ধার দিয়েও গেল না। ছোট থেকে বয়স বাড়তে বাড়তে শ্রীমান তার মায়ের আদরে এবং বাপের অগদার্মতাব সুযোগে পুরোপুরিই বঞ্চে গেল। খেলে বেড়িয়ে ইয়ার বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে দিন কাটত। বয়স আবে একটু বাড়তেই শুরু হয়ে গেল বাপের পকেট ঘেরে পাওয়া পয়সায় বন্ধুদের সঙ্গে শহরের যত লবঝাড় মার্কা সিনেমা হলে সামনের সারিতে বসে বাদাম চিবাতে চিবাতে—'লুট আউর দাঙ্গা' কিংবা 'দিলো কী রানি' মার্কা ঋরঝবে সিনেমা দর্শন। সে সব সিনেমাব নামিকাদের কী সাজঘাতিক সব সাজপোশাক, নায়ক ঋল-নায়কদের সঙ্গে কী লোমহর্ষক রগড়া-রগড়ি।

নায়িকাদেরকে ওইরকম পোশাক পরা অবস্থায় রাস্তাব মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে তো পাডার কুকুরগুলোও উত্তেজিত হয়ে চিৎকার শুরু করে দেবে। নেহাৎ তারা টিকিট কেটে সিনেমা হলে ঢোকে না তাই রক্ষে। আব রগড়া-বগড়ির বহর দেখলে মনে হবে ওদের গায়ে নর্থপোল সাউথ পোল ম্যাগনেট সাঁটা আছে। কাছাকাছি এলেই ঝাঁটাক্সে টেনে নেয়।

এ হেন সব মারকাটারি সিন-সিনারি দেখতে দেখতে সারা শরীর গরম হয়ে ওঠে। চুল তো চুল, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পর্যন্ত খাড়া হয়ে যায়। বয়সের ধর্ম। রত্নাকরদেরও তাই হত। ইডা পিসলা জাগ্রত হয়ে চড়াং করে এমনি মাথাং উঠে যেত যে ওরা মাঝে মাঝেই এটা ওটা ছুতো কবে সিনেমা হলের গোটের সামনে কিংবা কখনো কখনো, ভেতরেই ঝাড়পিট শুরু কবে দিত। এই করতে করতেই চোখ ফুটে গেল। বুঝে গেল বাবার লাইনে গিয়ে পড়াশুনা কবা ওর পোষাবে না। ও লাইনে

মেহনত বেশি আমদানি কম। তার চাইতে এ লাইনটা অনেক ভালো। মজাও যেমন আছে তেমনি নানা বাহানায় মালকড়িও আমদানিও অটেল।

সন্তবেব দশকেব মাঝামাঝি নকশাল আদোলনের ডামাডোলেব মধ্যে রজা একটা দল পাকিয়ে ফেলল। আর পায় কে? পাড়ায় বোমাবাজি, দোকানদারদের থেকে ভয় দেখিয়ে তোলা আদায়, না দিলেই পেটোব ঝাড়। অবস্থা এমন হয়ে উঠল যে রজার দলের নাম শুনলে সাধারণ পাবলিক তো দূরের কথা পুলিশের পর্যন্ত বুক কেঁপে যায়। কনস্টেবল থেকে থানার বড়বাবু কেউই বন্ধাকে ঘাঁটাতে চায় না। ডাকাতির জন্যে সাধারণ লোক থানায় ডায়েরি করতে গেলে বড়বাবু যদি বুঝতে পাবে যে সেটা রজার দলের কাজ তবে আর ডায়েরি নিতে চায় না। আপোষে মিটমাট কবে নেবার উপদেশ দেব। মনে ভয় আছে, বন্ধার সঙ্গে টঙ্কর মারতে গেলে যে কোনো সময় তার নিজেরই লাশ পড়ে যাবে। চোর পকেটমার খুনি গুণ্ডা বদমায়েসরা পুলিশকে ভয় করে, সেলাম বাজায়। কিন্তু রজা হল অনেক বড় মাপের কাণ্ডে। থানার পুলিশই তাকে স্যাঁলুট মারে।

পুলিশের তখন মুখময় গোবর। তারা জনসাধারণের ধনপ্রাণ রক্ষা করবে কি, নিজেদের জানপ্রাণ নিয়েই টানাটানি। সহজে থানার বাইরে বেরোতে চায় না। বেরোলেও দল বেঁধে। কোথাও উপরতলার হুকুমে পুলিশ পিকেট বসাতে হলে অনেকে মিলে দল বেঁধে দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসে বসে বাপের নাম জপ কবে। কাল গতিকে রজাই এখন বাপ।

কিন্তু বাপেরও বাপ থাকে। সেইরকম দুটি বাপ সে যাত্রা বঙ্গদেশের পুলিশকে বিপদ থেকে উদ্ধার করল। অবস্থা বিপাকে পড়ে বঙ্গবাসী পুলিশ যখন চোখে অন্ধকার দেখছে তখন বাইরের কোথা থেকে যেন বদলি হয়ে এল ইয়া তাগড়া দুই পুলিশ অফিসার। বাইরে থেকে বলতে বঙ্গদেশের বাইরে থেকে। সে যা চীজ, ওবকম স্যাম্পেল বঙ্গদেশের জলহাওয়ায় কোনোদিন তৈরি হয়নি, কোনোদিন হবেও না। বোধ হয় সর্দারজি টর্দারজি হবে। কিংবা পাঠানও হতে পারে।

আবাব পুস্ত হওয়াও বিচিত্র কিছু নয়। সবটাই আন্দাজের ব্যাপার। আসলে তারা যে কী সেটা জিজ্ঞেস করে জানতে যায় কে? সকলেরই তো জানের ভয় আছে।

উচাই সাড়ে সাত ফুট। সেটা চোখে দেখেই বোঝা যায়। ওজনটা মাপা হয়নি। ওজন মাপতে যন্ত্র লাগে, সে যন্ত্র ওদের পায়ের নিচে বসাতে যায় কোন ইয়ে। অফিসে প্রথম দিনই বসতে গিয়ে ওদের দু'জনে দুটো কাঠেব চেয়ার ভেঙে ফেলল। শুধু ভেঙেই নিস্তার নেই। চেয়ারের হাতগুলো নিতম্বের সঙ্গে এমনি আটকে গেল যে সেগুলো টেনে ছাড়াতে দুটো কনস্টেবলের গলদঘর্ম অবস্থা। তারপর ওদের জন্যে দুটো স্পেশাল মাপের লোহার চেয়ার বানিয়ে তাতে বসতে দেওয়া হল। লোহার চেয়ারে যুত করে বসে ওরা দু'জন যখন ফাঁস কবে আরামের নিশ্বাস ছাড়ল তখন ঘরে ঝড় বয়ে গেল। টেবিলের উপরে বাখা খাতাপত্রগুলো তো বটেই এমনকি দোয়াতটা পর্যন্ত উড়ে গিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এস আইয়ের মুখে ঠকাস করে ধাক্কা খেয়ে মুখময় কালি। বেচারা এস আই।

দু'জনের মাথাতেই ইয়া বড়া বড়া জটা আর মুখে ইয়া বড়া বড়া দাড়ি। মাথাব জটা প্রাচীনকালের মুনি-ঋষিদের স্টাইলে চুড়ে করে বাঁধা। দেখলে মনে হবে ওবা নিজেব জন্মে তো বটেই বাপের জন্মেও কোনোদিন চুলদাড়ি কাটেনি। দু'জনের চুলদাড়ি একসঙ্গে বয়ে বেড়াচ্ছে। আর সেইসঙ্গে কতজন্মের উকুন তার কোনো আদম সুমারি নেই। চোখ দেখলে বোঝা যায় ভয়ডর কি জিনিস তা তাবা জানে না। জানে শুধু ভয় দেখাতে। ওদের চোখের দিকে যে তাকাতে তার চোখ ব্রহ্মতালুতে উঠে যাবে।

আবো খবর নিয়ে জানা গেল ওরা এক-একবার খায় একশ চোদ্দোটা

কবে ডবল সাইজের রোটি। খবরটা পেয়ে বঙ্গদেশের পুলিশ অধিকর্তা মুখে কিছু না বললেও মনে মনে বুঝে গেলেন, এবাবে রজা ঠিক জন্ম হবে। বঙ্গ দেশের পুলিশ এতদিন রজাকে জন্ম বন্ধুত পাবেনি তার কাবণ রজা যা খায় বঙ্গদেশের পুলিশও তাই খায়। শুধু কি তাই, রজা খায় বাজাব থেকে পয়সা দিয়ে কেনা টাটকা জিনিসপত্র আর পুলিশ খায় প্রায় বিনা পয়সায় পাওয়া সরকারি রেশনের পুলিশি বরাদ্দ যতসব অখাদ্য ভুগি। ভুগি খাওয়া পুলিশ যে রজাকে কজা করতে পারবে না সেটা দেশেব সরকার এতদিন বোঝেনি। এবার বুঝেছে বলে মনে হচ্ছে।

ব্যাপার দেখে ঘাবড়ে যাওয়া পুলিশ বিভাগের উপঅধিকর্তা চুপি চুপি বড় অধিকর্তাকে জিজ্ঞেস করলেন—স্যার, এই যে দু'জন পুলিশ অফিসার নতুন এসেছে এবা কি আই পি এস অফিসার?

এরা যে আসলে কী সেটা বড় অধিকর্তা নিজেও ভালো করে জানতেন না। প্রশ্ন শুনে কিছুক্ষণ স্থির পাখরের মতো চোখ করে উপঅধিকর্তার চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন—না, এরা আই পি এস নয়। এবা আই আই পি পি এস এস।

সেটা আবার কী জিনিস? উপঅধিকর্তা চুপচাপ বড় অধিকর্তার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। আর মনে মনে পুলিশ সার্ভিস কোডের আগাপাশতলা বেঁটে বেঁটে কথাটাব মানে বাব কবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

উপঅধিকর্তার চুপসে যাওয়া মুখচোখ দেখে বড় অধিকর্তা নিজে নিজেই খোলসা করলেন—আই আই পি পি এস এস হল আই পি এস-এর বাপ। পুলিশ অবস্থা সামাল দিতে পারছে না দেখে সরকার তাদের বাপকে পাঠিয়ে দিয়েছে।

—কিন্তু কথাটার মানে কি স্যার? এটা কোন ক্যাডাব?

—হবে একটা কিছু। এই ধরো না কেন—ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল পেটোরনাল পুলিশ স্পেশাল সার্ভিস ধরনের একটা কিছু।

উপঅধিকর্তা মনে মনে হিসেব কবলেন, পেটোরনাল পুলিশ মানে পুলিশের বাপ, সেটা না হয় মানা গেল। কিন্তু পেটোরনাল পুলিশ মানে তো পেটানো পুলিশও হতে পারে। আর ওদের কজিব যা জোব, দেখে মনে হয় একটা রন্ধা খেলে আর দু'নম্ববটা খাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করাব দরকাব হবে না। উপঅধিকর্তা সেইখানে বসেই মনে মনে ফ্যসলা করে নিলেন। ওদেরকে কোনোক্রমেই ঘাঁটাতে যাবেন না।

শুধু চেহারা আর ওজনই নয়, নতুন আসা পুলিশ অফিসার দু'জনের নামেরও কি বাহার। সিনিয়ার জনেব নাম সৃষ্টি স্থিতি বিনাশাচার্য ব্রহ্মানন্দ কঙ্কৌড়ী আর জুনিয়ার ভদ্রলোকের নাম নিত্যনাবায়ণ পদাভিলাষী নরদানব পঙ্কৌড়ী। বঙ্গবাসী পুলিশের পুলিশ হলে কি হবে বাপ ঠাকুরদা তো পদাবলী কীর্তন গেয়ে বড় হয়েছে। কঠিন কঠিন কথা বলতে তাদের দৌড় ওই সাবধান, বিশ্রাম, বাঁয়ে মোড়, ডাইনে মোড়—এই পর্যন্ত। আবাব কখনো কখনো চোব-পকেটমাব ধরতে পারলে—শালা হারামজাদা কুস্তার বাচ্চা—এইনব। এব ওপরে তারা উঠতেই পারে না। তাই ওই দু'জনের তাগড়া চেহারাগুলো কোনোরকমে চোখে সহ্য করতে পারলেও ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর চেহারাগুলো একেবারেই হজম হল না। উচ্চারণ করতে গিয়ে তাদের রসগোল্লা খাওয়া জিবগুলো এতটাই কেতরে গেল যে নিজেদের পরিচয় দিতে গিয়ে তারা পুলিশ অফিসাব বলতে গিয়ে ফুলিশ অপিচাব বলতে লাগল। ভাগ্যিস সেই সময় কেউ তাদের বাপের নাম জিজ্ঞেস কবেনি। তাহলে তো সন্ধ্যাব বাপের নাম এক ধারসে খসেন হয়ে বসে থাকত। নিজেরা বাঁচাবাব জন্যে তারা নামগুলো ছোট করে নিল। একজনের নাম হল ব্রহ্মা, অন্যজন নারদ। জাতে বাঙালি তো, সুন্দর সুন্দর নাম তৈরিতে সবাই ওস্তাদ। হাজাব হোক দেশটা তো একা শ্রীচৈতন্যের নয়, রবীন্দ্রনাথেরও বটে।

ব্রহ্মা আর নারদের উপর ভার ছিল রত্না আর তার দলকে শাস্ত্রোত্তর করার। কাজটা ওদের কাছে কিছুই নয়, একেবারে ডাল বরাবর। ইচ্ছে করলে শ্রেফ রত্না মেবেই রত্নাকে তারাকাঠি দেখিয়ে দিতে পারে।

কিন্তু ওরা সেটা চাইল না। ওদের উদ্দেশ্য দলবল সুদ্ধ রত্নাকে খাঁচায় পোরা। তার চাইতেও বড় উদ্দেশ্য ছিল রত্নার মনের পরিবর্তন করা। ওপর থেকে ওদেরকে সেই রকমই হুকুম দেওয়া আছে।

রত্নার সঙ্গে মোলাকাতের উদ্দেশ্যে একদিন সন্দের অন্ধকারে ব্রহ্মা আর নারদ দু'জনে শ্রেফ দেহাতি মেয়েমানুষ সেজে গঙ্গার ধারে জেটিতে গিয়ে বসে রইল। টিকটিকির হাত দিয়ে রত্নার কাছে গোপন খবর পাঠানো হল ওইদিন ওইসময় ওইখানে দুটো মাইয়া মানুষের মধ্যে অনেক টাকার নগদ লেনদেন হবে। সময় বুঝে ঝাপটা মারতে পারলে মালকড়ি ভালোই পাওয়া যাবে।

পুলিশ বিভাগের হাতে একরকমের টিকটিকি থাকে যারা শুধু ব্রহ্মার খবরই পুলিশকে দেয় না পুলিশের খবরও চালান করে রত্নার কাছে। এরা দু'দিক থেকে মাল খায়। পুলিশকে দেখায় রত্নার সঙ্গে মাখামাখি করছি ওর পেটের খবর বার করার জন্যে আর রত্নাকে বোঝায় পুলিশের সঙ্গে মাখামাখি তো ওরা কবে কোথায় 'রেড' কবতে যাবে তার খবরটা আগেভাগে বার করে আনার জন্যে। এদের নাম দোগোড়ে টিকটিকি। রত্নারা এদেরকে বিশ্বাস করে আর পুলিশেরও এদেরকে বিশ্বাস না করে উপায় নেই। অনেক টাকার টোপ দিয়ে সেইবকম একটা দোগোড়ের হাত দিয়ে খবরটা চালান করা হল রত্নার কাছে।

দোগোড়ে গিয়ে রত্নাকে পাম্প দিল—এটা এক্সাবে নিম্যস খপর। আফগানিস্তান থিকে নেপাল হয়ে ইণ্ডিয়াম বডার পেরিয়ে এক প্যাকেট মাল এসে পৌছে গেছে কলকাতায়। মালের দাম কুন না এক কোটি তো হবেই। পুলিশের চোখে ধুলো দেবার জন্যে মালটা হাত বদল হবে দুটো মাইয়া মানুষের মধ্যে। এ হল নগদানগদি কারবার। একহাতে মাল আর অন্যহাতে টাকা। ই খপর পুলিশের কাছেও নেই। এক্সাবে ফাঁকা মাঠ। তোমরা গিয়ে সটটি মেরেচ কি নিম্যস গোল। শিঃ শিঃ শিঃ।

মর্ত্যলোক—৪

ব্রহ্মা বলিলেন—পাপ কব কার লাগি।

তোমার এ পাতকের কে হইবে ভাগী।।

—কৃত্তিবাস।

খবর মোতাবেক রত্না তার দলবল নিয়ে চুপিসাড়ে জায়গামতো হাজির হয়ে গেল। দূর থেকে আবছা অন্ধকারে দুটো মেয়েমানুষকে বসে থাকতে দেখে রত্নার এক চোখ তার কানে কানে বলল—ও গুরু। মাইয়া দুটো বসে বসেই এত উচা, দাঁড়ালে কতটা হবে? ওরা কি মানুষের মাইয়া না রাবণের মাইয়া?

সে বেচারার আর দোষ কি? এমনিতেই সাড়ে সাত ফুট। মাথার ওপরে আবার দুজন্মের জটার চূড়া। তার ওপর দিয়ে 'ঘুঙ্ঘট'। স্বয়ং বিখ্যাতও এত উঁচু মেয়েমানুষ তৈরি করার কথা কোনোদিন ভাবেননি। কোনোদিন ভাবেননি বলাটা অবশ্য ঠিক হল না। একবার ভেবেছিলেন। যখন তিনি রেবতীকে সৃষ্টি করেছিলেন। সত্যযুগে সৃষ্টি হওয়া রেবতীর উচাই ছিল পাক্সা আট হাত। রেবতীর বিবাহ হয়েছিল বলরামের সঙ্গে দ্বাপর যুগে। ততদিনে মানুষের উচাই নেমে এসেছে সাড়ে তিন হাতে। এখন মুন্সিল হল এই যে আটহাত উঁচু একজন মহিলার সঙ্গে সাড়ে তিন হাত উঁচু বলরাম সংসারধর্ম পালন করেন কী করে? কিন্তু বলরাম তো স্বয়ং ভগবানেরই আট নম্বর

অবতার। তাঁর কাছে কোনো সমস্যাই সমস্যা নয়। তিনি তাঁর হাতের সেই বিখ্যাত লাঙলটি দিয়ে রেবতীকে ছেঁটে ছোট করে নিলেন। এরকম একটা সামাজিক শল্যচিকিৎসা আজকালের সবচেয়ে বড় ডাক্তারেরও আয়ত্বের বাইরে। যাকগে, পাঠক-পাঠিকাদের জানা থাকলেও নকশালি মস্তানদের ওসব জানা থাকার কথা নয়। রত্নাব সাকরেরদের পক্ষে ঘাবড়ে যাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক।

ওদেরকে দেখে রত্নার মনেও যে একটু খটকা লাগেনি তা নয়। কিন্তু সে হল লীডার। মনের খটকা সাগরেরদেব জানতে দেওয়া চলবে না। মুখে সাহস এনে বলল—আরে ওরা মানুষেরই মাইয়া। দিহাতি তো, তাই অত উঁচু। কিংবা হয়ত পেটে বাচ্চা আছে। নিজের উচাই আর বাচ্চাব উচাই দুটো মিলে অতটা উঁচু দেখাচ্ছে। উসব ভেবে আর এখন লাভ নেই। চল অ্যাকশনে নামি।

ওরা আঙুটে আঙুটে বৃত্ত ছোট করে আনল। ব্রহ্মা আব নারদ বসে বসে আড়চোখে সেটা দেখতে লাগল। আর এমন নাটক করতে লাগল যেন ওরা এদের দেখতেই পায়নি। ওরা নিজেদের মধ্যে লাখবেলাখের কথায় মশগুল। টাকাটা এই হাতবদল হল বলে।

হঠাৎই যেন মাটি ফুঁড়ে উদয় হল পাইপগান আর চপাব হাতে জনপাঁচেক ছোকরা। চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। ব্রহ্মা আর নারদ ভয় পাওয়ার ভান করে উঠে দাঁড়াল।

উঠে দাঁড়াতেই উচাইটা হয়ে গেল দু'গুনো। কী উঁচু। মুখের দিকে তাকাতে হলে আকাশের দিকে চোখ তুলতে হবে। মাথার ব্যাকগ্রাউণ্ডে চাঁদ থাকলে চাঁদ নক্ষত্র থাকলে নক্ষত্র। কথা বলার সুবিধেব জন্যে রত্না দু'পা পিছিয়ে দাঁড়াল। তারপর দলপতি হিসেবে সেই হুকুমটা চালান—মালকড়ি যা আছে সব হ্যাণ্ডওভাব করো। নড়ার চেষ্টাটি কবেছ কি লাশ পড়ে যাবে। মেয়েমানুষ বলে রেয়াত করব না।

ভয় পেয়ে গেলে প্রথমটা একটু চুপচাপ থাকতে হয়, তারপর জোতলে জোতলে কথা শুরু করতে হয়, সেটাই দস্তুর। ব্রহ্মাও তাই কবলেন। গলায় অনেকখানি মাখন মাখিয়ে বললেন—বাপুহে, চাইছ যখন, সবই দিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞেস কবি। এই যে এত পাইপগান চালাচ্ছ পেটো বাড়ছ, ছিনতাই করছ, লাশ ফেলছ—এর শেষ ফলটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে ভেবে দেখেছ? একদিন না একদিন তো পুলিশের হাতে খরা পড়তেই হবে। তখন কি হবে?

ব্রহ্মার মাখন মাখানো গলাব স্বরটা কানে যেতেই রত্নার বুকটা আবেক দফা ধড়াস কবে উঠল—বাপবে। মেয়ে মানুষের এ কী বাজখাঁই গলা। মাখন মাখিয়ে বলছে তাতেই এই। কাজিয়া করার সময় কীরকম ঢাক বাজাবে? এই রকম গলাওয়ালা মেয়েগুলোর সঙ্গে ওসেব পুরুষগুলো প্রেম কবে কী করে?

কোনোরকমে চোক গিলে রত্না বুকের ধড়াসটাকে ভেতরে চালান করে দিল। তারপর গলায় যতটা পারা যায় রোয়াব আমদানি করে বলল—ধ্যুস শালা। আমি রত্না আছি। নকশাল লীডার। আমাকে ধরবে এত হিংস্র পুলিশ ব্যাটাদের নেই।

—পুলিশ ব্যাটার না থাকতে পারে। কিন্তু পুলিশের বাপের তো থাকতে পারে।

রত্না পুলিশের বাপের কথা কোনোদিন শোনেনি। কিন্তু শোনেনি বলেই যে শুনে ঘাবড়ে যাবে সেরকম মশলা দিয়ে সে তৈরি নয়। একই রকম তেরিয়া গলায় বলল—পুলিশের বাপটা আবার কে র্যা?

—কেন, এই যে আমরা। বলেই ব্রহ্মা বিদ্যুৎ গতিতে রত্নার থুতনির তলায় গলানলির দু'পাশে দুটো আঙুল লাগিয়ে ওকে মাটি থেকে দেড় হাত

ওপরে ঝুলিয়ে ধরলেন। তাই দেখে পাশের সাগরেদটা চপার তুলল কোপ মারার জন্যে। নারদের হাতের একটা রন্ধা খেয়ে সে হাত দশেক দূরে ছিটকে পড়ে গিয়ে ওখানেই ঘুমিয়ে পড়ল। নারদ পাশে দাঁড়িয়ে থাকা অন্য দুটো ছোকরার মাথায় মাথায় ঠুকে দিতেই তারা আকাশে অনেক নক্ষত্র টঙ্কর দেখতে পেল আর সেই নক্ষত্রলোকের ভেতর দিয়ে সীতার কাটার ডঙ্গিতে ওখানেই শুয়ে পড়ল। শুল তো শুল শুয়েই রইল। উঠে দাঁড়াবার আর মরোদ নেই। ওপাশের এক সাগরেদ দ্রুত গতিতে পাইপগান তুলে ট্রিগার টিপতে গেল। কিন্তু তার আগেই সেটা উড়ে গিয়ে ছপাত করে গঙ্গার জলে পড়ে ডুবে গেল। ব্যাপার দেখে ছেলেটা অন্ধকারেই ন্যাকশিয়ালের মতো দৌড় লাগাল। কিন্তু কপাল মন্দ। দিশাহারা হয়ে সে তখন দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। দিক ঠিক করতে না পেরে সে যদিকে দৌড় লাগাল সেদিকে স্বয়ং মা গঙ্গা। ঝপাং কবে ঝাপ দিয়ে যে ভাবে সে জলের মধ্যে পড়ল দেখলে মনে হবে সে তার হাতছাড়া হয়ে যাওয়া পাইপগানটার খোঁজেই জলে ঝাপ দিয়েছে। সময়টা মাঘ মাস। কালটা সন্ধ্যা। সে ছোকরা তার পাইপগানটা খুঁজে পাক বা না পাক তার গরম হয়ে যাওয়া শরীরটা একটু ঠাণ্ডা হবে আশা করা যায়।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে এত যে সব ঘটনা ঘটে গেল রত্না কিন্তু সেদিকে নজর দেবার সুযোগ পায়নি। ব্রহ্মার দু'আঙুলের আঁকশিতে সে তখন পেণ্ডুলামের মতো ঝুলছে। চোখদুটো প্রাণপণে গর্ত থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে, কানের মধ্যে হাজারখানেকর্শকের বাদ্যি, নাক দিয়ে গরম নিশ্বাসের ঝড়, জিহ্বাটা জাঁতাকলে আটকে পড়া ইঁদুর আর ওদিকে পেটের মধ্যে ভীম আর দুর্বেখনের গদাযুদ্ধ এমনই দুর্ধর্ষ অবস্থায় পৌছে গেছে যে সেখানে ঢুকিয়ে রাখা মালপত্রগুলো সব তীব্রবেগে বেরিয়ে আসার জন্যে আকুলি বিকুলি করছে।

একই সঙ্গে রত্নার সবকটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই একটা না একটা ধুকুমার চলছে। আর সবাই জানান দিয়ে দিচ্ছে যে এইরকমভাবে ধুকুমার চলতে থাকলে তারা সবাই কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়বে। তখন কিন্তু আর কিছু করার থাকবে না। যাই হোক ভাগ্যগুণে সবাই ঘুমিয়ে পড়ার আগেই ব্রহ্মা তাঁর আঙুলের সাঁড়াশি আলগা কবে দিয়ে ব্রহ্মাকে মাটিতে নামিয়ে দিলেন। ছাড়া পেয়ে যাওয়া অসাড় রত্না তড়িঘড়ি মাটির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক স্থাপন করে ফেলল, লম্বভাবে নয় সটান লম্বা ভাবে।

সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ব্রহ্মা আর নারদ রত্নাকে ধাতস্থ হবার সুযোগ করে দিলেন। ধাতস্থ হয়ে রত্না উঠে বসল। ব্রহ্মা বললেন—পুলিশের বাপের পরিচয় তো পেলে। এবাবে যদি তোমাকে পুলিশের হাতে তুলে দিই তো কেমন হয়? তারা তো তোমাকে প্রথমেই একচোট বেধড়ক ঠেঙিয়ে হাত-পা ভেঙে দেবে। তারপর জেলের ঘানির সঙ্গে জুতে দেবে। জীবনের বাকি কটা দিন সেই ভাঙা হাত-পা নিয়েই জেলের ঘানি ঘোরাতে হবে। জিনিসটা কেমন লাগবে?

কেমন যে লাগবে সেটা রত্নার উন্টোপান্টা হয়ে যাওয়া ঘিলুতে কিছুতেই গোছগাছ করা গেল না। সবকিছু কেবলই গুলিয়ে যেতে লাগল। সেই গুলিয়ে যাওয়া অবস্থাতেই রত্না শুধু একটা জিনিস বুঝতে পারল যে এর মধ্যে কিছু একটা কষ্টের ব্যাপার আছে। আর সেসব কষ্ট সহ্য করার জন্যে বাপকে ডাকা ছাড়া গতি নেই।

নিজে কষ্টে পড়লে যে কোনো বঙ্গবাসীই খুঁজতে থাকে আর কে কে সেই কষ্ট ভোগ করছে। অন্যকে কষ্ট ভোগ করতে দেখলে নিজের কষ্ট নিজে নিজেই অর্ধেক হয়ে যায়। ভরসার কথা ওইটুকুই। রত্নারও ভরসা ওইখানে। ব্রহ্মার কথার উত্তরে সে টি টি করে বলল—আমি একা কেন? ওরাও তো আমার সঙ্গে ঘানি ঘোরাবে। ভাবখানা এই যে, সবাই মিলে হাত লাগালে

কি জ্ঞানি ঘানিটা সহজে ঘুরবে আর তাইতেই ওর কষ্টটা লাঘব হবে।

—ওরা কারা?

রত্নাকর সাগরেদদের দেখতে পাবার আশায় পিছন ফিরে চাইল। কিন্তু ভোঁ ভোঁ। সেখানে কেউ কোথাও নেই। সবাই কেটে পড়েছে। তার এত পেয়ারের সাগরেদরা তাকে একা বিপদের মুখে ফেলে কেটে পড়েছে দেখে বেচারার রত্নাকরের মুণ্ডুটা আর একবার ঘুরে গেল। নিজের বিপদের ছবিটা এখন যেন একটু একটু করে স্পষ্ট হচ্ছে। আর যতই স্পষ্ট হচ্ছে ততই যেন চোখের সামনে সবকিছু অন্ধকার হয়ে আসছে। রত্নাকর খুব মুখড়ে পড়ল।

তাগড়া গুণাকে কৌতুকা মারলে সে যখন চোখা খেয়ে কঁকাতে থাকে তখন সেটা পুলিশের কাছে বেশ একটা উপাদেয় জিনিস। সে জিনিসের স্বাদ ব্রহ্মা আর নারদের অনেক নেওয়া আছে। কিন্তু প্যাচে পড়ে সেই গুণ্ডা যখন মুখড়ে গিয়ে চূপ হয়ে যায় সেটার স্বাদ আলাদা। প্রায় স্বর্গীয় বলা যেতে পারে। সহজে মেলে না। ব্রহ্মা আর নারদ বেশ কিছুক্ষণ ধরে সেই স্বর্গীয় স্বাদটা উপভোগ করলেন। প্রথম ধাক্কাটা কাটার পর ব্রহ্মা বললেন—দেখলে তো হে, তোমার বন্ধুরা কেমন মানে মানে কেটে পড়ল। পাকে পড়লে কেউ তোমার বিপদের ভাগ নিতে আসবে না হে ছোকরা। উন্টে পাছে তুমি পুলিশের কাছে ওদের নামধাম আর গোপন ডেরার খবর বলে দাও সেই ভয়ে ওরা সুযোগ পেলেই তোমার লাশ ফেলে দেবার ধান্দায় থাকবে। তোমার এখন দু'দিকেই বিপদ। এদিকে পুলিশের কাছে বেধড়ক পিটন। ওদিকে পেয়ারের সাকরেদদের কাছে পেটো। এই দু'মুশো বিপদ থেকে এখন নিজেকে কেমন করে সামলাবে সেইটে ভাবো।

রত্নাকর ভাববে আর কি? ভাবার জন্যে কিছুই তো আর বাকি নেই। গলাটা বেজায় শুকিয়ে গেছে। একটু জল পেলে ভালো হত। একবার মায়ের কথা মনে পড়ল। কিন্তু এই অন্ধকারে মা-ই বা কোথায়, জল-ই বা কোথায়? একটু দূরে গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে যাচ্ছে ঠিকই কিন্তু সেদিকটা আগলে দাঁড়িয়ে আছে যমদূতের মতো দুটো পাহাড় সাইজের পুলিশের বাপ।

শেষ পর্যন্ত কোনো পথ খুঁজে না পেয়ে রত্নাকর পুলিশের বাপকেই নিজের বাপ বানিয়ে ব্রহ্মার পা-দুটো জড়িয়ে ধরল। আমাকে বাঁচান বাবা। আমি এখন কী করব আপনারাই দয়া করে বলে দিন।

রত্নাকরের দূরবস্থা দেখে ব্রহ্মার মনে করুণা হল। শুধু করুণাই নয়, মনে আনন্দও হল। এইটাই তো ওঁরা চাইছিলেন। রত্নাকরের মনের পরিবর্তন। ওঁদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবার মুখে। ব্রহ্মা বললেন—বাপুহে, তোমার জন্যে এখন একটা পথই খোলা আছে। পারবে সেটা করতে?

—আপনি হুকুম করুন বাবা। নিশ্চয় পারব। শুধু পুলিশের হাতে ধরা দিতে বলবেন না। ওরা বড্ড পেঁচায়। একবার হাতের নাগালের মধ্যে পেলে পিটে ফাটিয়ে দেবে।

—না না। তোমাকে পুলিশের কাছে ধরা দিতে হবে না। তুমি বরং উন্টোটা করো। নও দো গ্যামায়া হয়ে যাও।

এতক্ষণে রত্নাকরের মনে যেন একটু আশার আলো ফুটল। লাইনব কথা এসে গেছে। বলল—ও হো, গ্যাঁড়াকল? ও আমি খুব পারব। বলুন কার কোথায় কী গ্যাঁড়া মারতে হবে। এক তুড়িতেই কাম ফতে।

—আরে না না। গ্যাঁড়া মারার কথা হচ্ছে না। নও দো গ্যামায়া মানে গ্যাঁড়া মারা নয়। ভেগো পড়া। পুলিশের হাতে পড়ে যদি ভোগে যাবার ইচ্ছে না থাকে তবে মানে মানে ভেগো পড়ো। এদেশ ছেড়ে অনেক দূরে কোথাও চলে যাও। যেখানে তোমাকে কেউ চিনবে না। ধরো পশ্চিমের দিকে কোনো দেহাতি জায়গায়। সেখানে গিয়ে গা ঢাকা দিয়ে থাকো। সময় কাটার সঙ্গে সঙ্গে এদিকের ব্যাপার-ট্যাপারগুলো খিতিয়ে আসবে। সবাই তোমার কথা

ভুলে যাবে। আর তারপর তুমিও ভদ্রলোকের মতো ঘুরে বেড়াতে পারবে।

ব্রহ্মা আর নারদের যুক্তি রত্নাকরের মনে ধরল। এছাড়া তার আর করারও তো কিছু নেই। সেই রাতেই রত্নাকর গঙ্গা পার হয়ে হাওড়া স্টেশনে গেল। একটা পশ্চিমমুখী ট্রেনে চেপে কলকাতা ছাড়ল। অবশ্যই ডাবু টি।

ওদিকে রত্নাকরের স্ব-আরোপিত স্বেচ্ছা নির্বাসনে বঙ্গমাতা হয়ে গেলেন রত্নহীনা। আহা বঙ্গের কী ভঙ্গ ভাগ্য!

মর্ত্যলোক—৫

অকর্দমমিদং তীর্থং ভরদ্বাজ-নিশাময়।

রমণীয়ং প্রসাদাশু সন্মুখ্য মনোযথা।।

—বান্ধীকি

অনেকদিন ধরে অনেক ঘাটায় আর তার চেয়ে অনেক বেশি আঘাটায় জল খেয়ে শেষ পর্যন্ত রত্নাকর এই তমসা নদীর ধারে এসে ডেরা বেঁধেছেন। কিশোর বয়সে যে রত্নাকর ছিল তুই তুমি—এখন বয়স হয়ে আর মুখময় চুলদাড়ি গজিয়ে তিনিই হয়ে গেছেন—আপনি আছেন। আহা কালস্য কুটীলা গতি।

ব্রহ্মা আর নারদ নামের দুই পুলিশের বাপের ঝাপড় খেয়ে যেদিন কলকাতা ছাড়তে হয়েছিল সেদিন থেকেই রত্নাকরের চুলদাড়ি কাটা বন্ধ হয়ে গেছে। অনুপ্রেরণাটা এসেছিল ওদেরই চুলদাড়ির বহর দেখে। ওইরকম চুলদাড়ি আমাকেও করতে হবে। ওটাই কি জানি মহাশক্তি বউৎস। বাপের। ঝাপড়ের কী তেজ!

সেই সঙ্গে গলনলীতে ব্রহ্মার আঙুলের খোঁচা খেয়ে রত্নাকরের মাথার মধ্যে বাখা ঘিলুটাও নড়ে গেছে। তিনি এখন গুণ্ডামির ধারকাছ দিয়েও যান না। এখানে এসে গাঁয়ের দেহাতিদের সঙ্গে ভাব করে নিয়েছেন। তমসা নদীর ধারে বেওয়ারিস জায়গাটা পেয়ে এখানেই ডেরা বেঁধে নিয়েছেন।

রত্নাকর আশপাশের গায়েব ছেলেদের শেখান যোগাভ্যাস, সেইসঙ্গে কিছু ক্যারাটে আর জুজুৎসুর প্যাচ। এটাই গুঁর প্রাইভেট টিউশনি, গুরুকুল বিদ্যা। কিশোর বয়সে নকশালদের নেতাগিরি করাব সময় উনি ক্যারাটে শিখেছিলেন সেই সঙ্গে কিছু জুজুৎসুর প্যাচ। তখন শিখতে হয়েছিল দায়ে ঠেকে। দায়ে ঠেকলে সব্বদ্বীও বাপ হয়ে যায়। গুণ্ডাপাটির সর্দারি করতে গেলে গুঁধু ছুরি ঢালালে আর পেটো হাঁকড়ালেই হয় না, কিছু কিছু প্যাচ-পয়জারও চাই। নইলে চামচাদের কাছে মান থাকে না। তাই রত্নাকরকে চেষ্টা করে ওগুলো শিখতে হয়েছিল।

আসলে ক্যারাটে জুজুৎসু জুডো কুংফু এসব বিদ্যেগুলোও জাপানি, কথাগুলোও জাপানি। জাপানি ভাষায় ক্যাবা মানে খালি আর টে মানে হাত। তার মানে ক্যারাটে হল খালি হাতে যুদ্ধ। ওদিকে আবার জু মানে ভদ্র আর জুৎসু মানে যুদ্ধ। তাব মানে জুজুৎসু হল ভদ্রলোকের খালি হাতে আত্মবক্ষার্থে যুদ্ধ। মোদা কথাটা হল শত্রু আক্রমণ করেছে এদিকে হাতে অস্ত্র নেই। সে ক্ষেত্রে নিজেকে রক্ষা করাব জন্যে এইসব বিদ্যে। ঠেকায় বেরেকায় কাজ দেয় ভালোই। বিদ্যেটা রত্নাকরের যদিও ব্রহ্মা-নারদের মোকাবিলায় কোনো কাজে আসনি তবে অন্য অনেক রকমকে রত্নাকর ওই বিদ্যে দিয়েই জন্ম করেছে।

গাঁয়ের ছেলেগুলো রত্নাকরের কাছে ক্যারাটে জুজুৎসু বেশ আগ্রহ নিয়েই শিখতে আসে। তাদেরও অনেকটাই দায়ে পড়া অবস্থা। তাদের হল ডাকাতের ভয়। অঞ্চলটা পুরোই বনজঙ্গলে ভরা। বড় ডাকাতের উপদ্রব। কথায় কথায় জান চলে যায়। ক্যারাটের প্যাচ শেখা থাকলে অস্ত্রত কিছুটা সাহস। এই করেই দিন যাচ্ছে।

দিন কেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরো একটা জিনিস হয়েছে। সেটা হল রত্নাকরের নামের পরিবর্তন।

তমসা নদীর ধারে আশ্রম বানাবার জন্যে রত্নাকর যে জায়গাটা বেছে নিয়েছিলেন সেখানটায় কোনো কাদাখোঁচা ছিল না। কাদার বদলে বালি, পরিষ্কার টলটলে জল একেবারে সৎ মানুষের মনের মতো নির্মল। সন্মুখ্য মনো যথা।

ছোটবেলায় রত্নাকর বঙ্গদেশের গঙ্গায় তো দেখেছেন শুধু কাদা আব নোংরা ভর্তি ঘোলা জল। লোকে বঙ্গে গঙ্গা সর্ব কলুষ হারিণী। সত্যমুগে সেটাই ছিল দম্ভর। মানুষের মনের সব কলুষ ধুয়ে দিতেন পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা। কলিকালে এসে গঙ্গাদেবী এখন মানুষের মনের কলুষ কতখানি ধুচ্ছেন সেটা ঠিক মাথা যাচ্ছে না। তবে মানুষের তৈরি যাবৎ বর্জ্য দূষিত যে গঙ্গার জলে ধুয়েমুছে নিচের দিকে বয়ে যাচ্ছে সেটা মাপবার জন্যে স্কেল কম্পাসের দরকার হবে না, চোখে দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

হরিন্দার হাষিকেশে গঙ্গা খুব খরস্রোতা। ময়লা ধুতে এক তুড়ির ওয়াস্তা। কিন্তু বঙ্গদেশে এসে বেচারি বুড়ি মাঘের আর ততটা জোব নেই। ওপর থেকে যা কিছু ময়লা বয়ে এনেছে সেগুলো এখানেই দু'পাড়ে জমা কবে দিচ্ছে। যাও বা কিছু কিছু অতিকষ্টে নিচের দিকে যায় সেটাও আবার জোয়ারের ঠেলা খেয়ে ওপর দিকে উঠে আসে। ময়লা আর কমতে চায় না।

এইসব কাণ্ড-কারখানার ফলে বঙ্গদেশে মা গঙ্গার জল আর স্বচ্ছ নেই। রংটি হয়ে গেছে ঘোলাটে লাল। আর কলুষ নাশ? পুণ্য অর্জনের শুভ কামনায় বামকেষ্টপুরের ঘাটে একবার ডুবটি দিয়েছি কি শরীরের নয়টি রক্ত দিয়ে গল গল করে ঢুকে যাবে উজান গঙ্গার মহাত্মাদের দেহ নিঃসৃত পবিত্র বর্জ্যরাশি। সে বর্জ্যরাশির ঠেলায় এখন তোমার কলেরা হবে কি ম্যালেরিয়া হবে সেটা দেখার দায়িত্ব মা গঙ্গার নয়। তকদির আপনা আপনা।

এইরকম ঘোলাটে জল দেখে অভ্যস্ত রত্নাকরের পক্ষে পরিষ্কার টলটলে তমসা নদীর জল দেখে ভালো লেগে যাওয়ারই কথা। হলও তাই। রত্নাকর তমসা নদীর ধারে ডেরা বেঁধে রয়ে গেলেন। কালে কালে ডেরার নাম হয়ে গেল আশ্রম।

কিন্তু এইরকম বালিওয়াল জায়গায় ডেরা বানাবার ফলে একটা অন্য ঘটনাও ঘটে গেল। গাঁয়ের লোকেরা ওঁকে বালিবাবু বলে ডাকতে লাগল। আর সময়ের অগ্রগতিতে গুঁর মুখে ঋষির মতো চুলদাড়ি বেড়ে ওঠার সঙ্গে তাল বেখে মানুষের মুখে মুখে নামটা হয়ে গেল বান্ধীকিমুনি। তাদের ছেলেদের মাস্টারের নাম বান্ধীকি মুনি।

মুখে চুলদাড়ি গজিয়ে রত্নাকর যদি বান্ধীকিমুনি হতে পারে তবে গাছ গাছালির বাগান দিয়ে ঘেরা ডেরাটারই বা আশ্রম হতে বাধা কোথায়? শ্রেফ কষ্ট পরে নাকে তিলক কেটে বোস্তম হয়ে গেলেই ভাত হয়ে যায় অন্ন, তা এ তো একমুখ পাকা পাকা চুলদাড়ি—তাও আবার তেল-চিক্রনি ছাড়া।

লোকের মুখে অবশ্য নিজের বালিবাবু নামটা শুনে উনি প্রথমটায় একটু ঘাবড়ে গেছিলেন। লোকে কি ওঁকে বাঙালি বলে চিনে ফেলেছে নাকি বে বাবা! তাহলে তো পুলিশের কাছে খবর চলে যাবে। আর ধরা পড়লেই কলকাতা। লকআপের মধ্যে পুরে বেধড়ক ঠাণ্ডানি। উঃ! ভাবাই যায় না। পবে অবশ্য আসল কথাটা জানার পর ভয়টা কাটল। লোকে গুঁর বালিয়াড়ির ডেরা দেখেই নাম দিয়েছে বালিবাবু, অন্য কোনো মতলব নেই।

সেসব হয়ে গেল অনেকদিনের কথা। এখন মুখের ভূগোল বদলে নাম পাশ্বে রত্নাকর, মানে আরকি বান্ধীকিমুনি বহাল তবিয়েই আছেন।

কিন্তু ওই যে, তুমি যাও বঙ্গে কপাল যায় সঙ্গে। বান্ধীকির বেলায় ব্যাপারটা উল্টো হয়ে গেল। তুমি ছাড়লে বঙ্গ কপাল ছাড়ে না সঙ্গ।

সে আর এক জ্বরদস্ত কাণ্ড। কেলেঙ্কারি বঙ্গলেও কিছুমাত্র বাড়িয়ে বলা হয় না। তবে কাণ্ডই হোক আর কেলেঙ্কারিই হোক ঘটনার ফলটা হয়েছিল মারামারক।

[ক্রমশ]

রাশি চক্ৰ

জ্যোতিষসান্নী সৌভাগ্যদমন মহারাজ

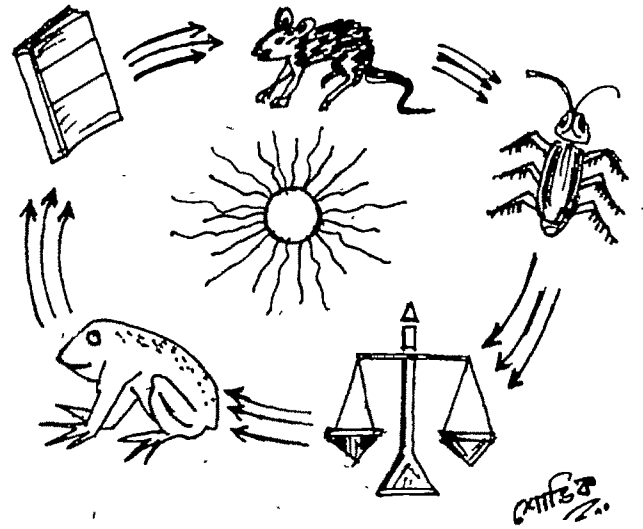
কাব্যগ্রন্থ রাশি : আপনার বিজয়-যাত্রা এই মাসে সাফল্য লাভ করবে। বইমেলায় যদিও একটি কপিও কাটতি হবে না তবু সেই ঘাটতি সম্পূর্ণ মিটেবে গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর। একটিও পড়ে না থেকে আপাদমস্তক বাণিল রূপে বিক্রীত হয়ে আপনার প্রভুকে কিঞ্চিৎ অর্থ-দর্শন করাবে; অবশ্য ওজন দরে।

যৌন উপন্যাস রাশি : যে যে প্রেমিক প্রেমিকাকে তেমন করে স্পর্শ করার সুযোগ পাচ্ছে না তাদের হাতে আপনি প্রথমে শোভিত পরে প্রেমিকাকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে উপহার প্রদত্ত হতে পারেন। তবে শুক্র বক্র থাকায় প্রথমে প্রেমিকাব বমন যোগ এবং পবে আপনার দ্বারাই প্রেমিক-প্রবেরর মস্তক বিদীর্ণ কবণের আশু সম্ভাবনা আছে।

বৃদ্ধস্য উপন্যাস রাশি : অবসর গ্রহণের পর যারা নিতান্তই কাজকন্মো না পেয়ে একের পর এক উপন্যাস প্রসব করে গেছেন তাঁদের উপন্যাস সমগ্র বইমেলায় বসাব পিড়ির পরিবর্ত হিসেবে বিক্রি হতে পাবে, জলের দরে নয়, ইটের দবে। পরবর্তীকালে পাকশালে অগ্নিযোগ ও বাচ্চার দুধ-গরম দশা প্রকট।

কাব্য-সমগ্র রাশি : অতি উৎসাহে বউয়েব গহনা বিক্রি করে যারা আপনাকে ছাপিয়েছেন হাজার দবে কিন্তু একজনও পড়ছে না বলে ব্যাজার হয়ে আছেন, তাঁরা সবিস্ময়ে লক্ষ্য কববেন— একজন পাঠক অন্তত ঘাপটি মেরে আপনার স্থপের মধ্যে বসে আছেন, নীরবে কবিতার ওম নিয়েই যাচ্ছেন; তিনি একটি কোলা ব্যাঙ।

প্রবন্ধগ্রন্থ রাশি : আপনি খুবই কাটবেন, ভীষণভাবে কাটিত হবেন, তবে কিঞ্চিৎ প্রাচীন পদ্ধতিতে। অর্থাৎ ইঁদুর এবং আরশোলার দ্বারা। যত বেশি পুরনো হবেন ততই আপনার আকর্ষণ বৃদ্ধি পাবে। পুনো ঢাল ভাতে বাড়ে, পুনো বই ইঁদুরে কাড়ে।



লিট ম্যাগ রাশি : আপনার এ মাসে ক্রমণ যোগ আছে। বাণিল বেঁধে বইমেলায় বেড়াতে যাবেন। বাবেদিন পবিত্র বই-সাগর মেলা ধুলিমান সেবে সমুদ্র চিহ্নে গৃহে প্রত্যাগমন করবেন। মঙ্গল বৃধ বৃহস্পতি ওক্র—সব গ্রহই আপনাব প্রতি প্রসন্ন থাকায় আপনাব গৃহহীন হওয়ার কোনো আশঙ্কাই নেই।

বিভাব-অনুষ্ঠান রাশি : লিট ম্যাগ জগতে যা রতি ইত্যাদি ভাবের উদ্বোধক বইমেলা কিংবা পাতিরাম-এ তারই নাম হন আপনারা। কিন্তু আয়তনে লিট না হয়ে থান ইট এবং মূল্যে ন্যূন না হয়ে বহুগুণ হওয়ার ফলে মধুব রস সুদূরগামী হওয়ার আশঙ্কা আছে। তবে না-পড়া পাঠকের মুখে বহুগুণ-গান শ্রবণে সমুদ্র লাভ করতে পারেন।

পাঠি রাশি : বিজ্ঞান ও আধুনিকতার রমরমাতেও আপনার কাটতি অব্যাহত থাকবে ব্রাহ্মণ-পুৰোহিত সমাজে। আপনার চমক যোগ থাকায় এ মাসে এক ডিস্কো-থেক মার্কা তরুণ-তরুনীকে বইমেলায় আপনাব পাতা ও-টাতে দেখবেন। আনন্দ সাগরে ভাসতে ভাসতে বুকেব বাদিকে খট-যোগ, যখন ওনবেন তাবা সেই দিনক্ষণ ঝুঞ্জে, যখন আপনাকে বিদেয় করা যায়।

বঙ্গভারতীর বঙ্গদর্শন

সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

সম্মুখে পাইলে
চড়াইতাম!



চড়াইতাম। তাবড় তাবড় প্রাতিষ্ঠানিক কাগজের দৌলতে যুগান্তকারী বৈপ্লবিক সৃষ্টিব উদ্‌ঘাটনায় উপন্যাস নামধারী এমন জিনিসও প্রকাশিত হয় যার কৌৎসিত্য সর্বকালের সর্বদেশের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। নগ্ন নারীদেহের ও মানব-মানবীর আদিম লীলার এমন বমন উদ্বেককারী সাহিত্যিক সৃজন ক্ষমতা ইতিপূর্বে আমার মতো অধমজনের চোখে পড়েনি। শ্রীলতা-অশ্রীলতার পূর্বনো তর্কে যাব না। এটাও সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানের কথা, অতি সাধারণ রুচির কথা—যে কথার জন্যই আমরা নতুন কিছু করার নামে পথে উলঙ্গ হয়ে বেরুই না। যে বেরোয় তাকে উদ্‌ঘাটন বলে উপেক্ষা করে যাই না—তার স্থান হয় পুলিশের গারদে, সেখান থেকে উদ্‌ঘাটন আশ্রমে। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের আজকের এই জড়ত্বের যুগে সেই পাগলা বা পাগলীকে আমরা ঘুরে বেড়াতে দিই, তাকে যারা নাচায় তাকেও কিছু বলা বাহুল্য মনে করি, এমনই আমাদের উদার উপেক্ষা।

আজকে একজন বন্ধিমচন্দ্র না হয় নেই—

অন্তত কয়েকজন সজনীকান্ত দাশ থাকলেও

শুনতে পেতাম—লেখক ছোকরা বা ছুকরীকে সম্মুখে পাইলে চড়াইতাম।

আজকাল আমাদের দেশে বিশেষ করে এই বঙ্গে সাহিত্য-টাইতি নিয়ে কেউই বিশেষ মাথা ঘামাবার ফুরসৎই পায় না, অথবা মাথা ঘামানো বাহুল্য মনে করে। চতুর্দিকে জড়তা—ভালো লিখলেও যা মন্দ হলেও তা। ভালো হলেও কেউ তা নিয়ে আলোচনায় বসে না, মন্দ হলেও তা নিয়ে কারো মাথাব্যথা নেই। রবি ঠাকুর বন্ধিমচন্দ্রের কথা বলতে গিয়ে একবার বলেছিলেন, 'চতুর্দিক ব্যাপী উৎসাহহীন জীবনহীন জড়ত্বের মতো এমন গুরুভার আর কিছুই নাই। সর্বত্রই যখন শৈথিল্য এবং সে শৈথিল্য যখন চিহ্নিত হয় না তখন আপনাকে নিয়মব্রতে বদ্ধ করা মহা সম্বলোকের দ্বারাই সম্ভব।' আজকের অবস্থাটা ঠিক সেইরকম। তা না হলে দেখুন আজকের বাংলাব সাহিত্যের জগতে যে সব কুৎসিৎ বিবমিষা উদ্বেককারী কাণ্ড ঘটছে তা নিয়ে কোথাও একটু নড়াচড়া নেই। আজকে একজন বন্ধিমচন্দ্র না হয় নেই—অন্তত কয়েকজন সজনীকান্ত দাশ থাকলেও শুনতে পেতাম—লেখক ছোকরা বা ছুকরীকে সম্মুখে পাইলে

পশুতেরা বলেন ইউরোপ থেকেই নাকি আমাদের এই আধুনিক উপন্যাস আমদানি করা হয়েছে। সেই ইউরোপের উপন্যাস স্রষ্টা ও তত্ত্ববিদরা প্রায় সকলেই বলেছেন, উপন্যাস হল বাস্তব মানুষের অভিজ্ঞতাপূর্ণ এবং বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ। বাস্তব জীবনের অনুকরণ সম্পর্কে নতুন ধারণা আনবার চেষ্টা করলেন ফরাসী উপন্যাসের কয়েকজন তাত্ত্বিক শিল্পী—গুস্তাভে ফ্লবেরয়ার (১৮২১—১৮৮০), গ্যোঁকুর ব্রাত্তম্ব (১৮২২—১৮৯৬ এবং ১৮৩০—১৮৭০) এবং এমিল জোলা (১৮৮০—১৯০২)।

বাস্তবের অনুকরণ সম্পর্কে ফ্লবেরয়ারের বক্তব্য হল, শিল্পীকে এমন ভাবে চরিত্র ইত্যাদিকে সাজাতে হবে যাতে কখনোই বোঝা না যায় এদের পেছনে কোনো লেখকের কোনো অস্তিত্ব আছে। এই নতুন বাস্তবতাবাদের প্রবক্তা ফ্লবেরয়ার জীবন যেরকম হুবহু সেইরকম করে তাকে আঁকবাব চেষ্টা করলেন তাঁর উপন্যাস মাদাম বোভারী (১৮৫৭) ও লা এডুকেশন সেন্টিমেন্টাল (১৮৬৯) -এ। সেখানে অনেক খোলামেলা কথা আছে কিন্তু সবকিছু খুলে নয় মানব-মানবীকে দেখতে ও দেখাতে চাননি। শেষ পর্যন্ত তিনি টুগেনিভকে লেখা এক চিঠিতে বলেছিলেন, বাস্তবতাকে শুধু দেখাটাই বড় কথা নয়,

দেখা জিনিসগুলোর মধ্যে একটা রূপ আনা, একটা শৃঙ্খলা গড়ে তোলাই হল আসল কাজ। এই সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানটি তিনি হারাননি।

বাস্তবানুকরণের চূড়ান্ত রূপ নিয়ে এলেন ন্যাচারালিস্ট বা প্রকৃতিবাদীরা। এর প্রথম সার্থক প্রবন্ধ হলেন এমিল জোনা (১৮৪০-১৯০২)। তাঁরা বললেন, বাস্তবকে নিয়ে আমাদের কাজ শুক, সেটাই হল আমাদের ভিত্তিভূমি। 'We must modify nature, without departing from nature'। বাস্তবকে বিকৃত না করেই বাস্তবের রূপান্তর ঘটাতে হবে। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'জার্মিনাল'-এ বাস্তবকে যথাযথ রেখে তাঁর মতবাদকে পরীক্ষা করলেন। সেখানেও উলঙ্গ বাস্তবতার কোনো লক্ষণ আমরা দেখলাম না।

পরবর্তীকালে প্রকৃতিবাদীদের অঙ্ক অনুকরণে বাস্তবকে হুবহু তুলে ধরবার নেশায় আক্রান্ত হয়ে উপন্যাসে দেহতত্ত্বের কড়া লেখা আরম্ভ হয়েছিল ইউরোপীয় সাহিত্যে। কিন্তু পর্ণোগ্রাফি ছাড়া কোনো যথার্থ লেখকের হাতে উপন্যাসের নামে মানব-মানবীর আদিম প্রবৃত্তির নগ্ন বিবরণ রূপ ইস বর্ণ সমন্বিত হয়ে প্রকাশিত হতে দেখা যায়নি। এমনকি অতি আধুনিক কালের রোমাঞ্চ সৃষ্টিকারী দুঃসাহসী ফ্রেডরিক ফরসিথ, সিডনী শেলডন এবং হ্যারল্ড রবিপের মতো লেখকবৃন্দও সে কাণ্ডজ্ঞান হারাননি।

সেই কাণ্ডজ্ঞান হারানোর বিশ্বরেকর্ড আমাদের এই জড়তাগ্রস্ত বাংলা

সাহিত্যের জীবন-রঙ্গমঞ্চে এক বৈপ্লবিক সাহিত্য ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বাধীনে উদ্গাদনা সৃষ্টিকারী এক তথাকথিত উন্নততান্ত্রিক সাহিত্যসেবীর হাতে।

সেই নব নব উদ্বেগশালিনী প্রতিভাধরের হাতে ইউরোপীয় ন্যাচারালিজম যেমন নতুন ব্যাখ্যা লাভ কবে নবতর রূপ লাভ কবেছে তেমনি সুপ্রাচীন ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্রের রসবাদেরও নব রূপায়ণ ঘটেছে। আচার্য ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র'র রসসূত্রে আছে—'বিভাবানুভাব ব্যাভিচারী সংযোগাদ্ রস নিষ্পত্তি'। বিভাব অনুভাব ব্যাভিচারী ভাবের সংযোগে রসের নিষ্পত্তি। রসের সৃষ্টিতে এই প্রতিভাধরের ব্যাখ্যায় ব্যাভিচারী ভাব হল ব্যাভিচারী আচার আচরণ—মানব-মানবীর আদিম প্রবৃত্তির নগ্ন রূপের অকৃত্রিম বিবরণ দান। এইখানেই তাঁর বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টিকারী প্রতিভার সবচেয়ে বড় অবদান। কারণ কেউই যেখানে পদচারণা করেননি, তিনি সেকাজ করেছেন। আলেকজান্ডার পোপ তাঁর Essay on Criticism-এ বলেছিলেন—For fools rush in where angels fear to tread. দেবতা যেখানে পদচারণা ভয় পায় সেখানে বোকারা ছুটে যায়। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে সেই প্রতিভাধর তথাকথিত বোকার আবির্ভাবে আরো কি কুরুক্ষেত্র কাণ্ড হবে ভবিষ্যতে, তা বলা যায় না। অবিলম্বে সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন না কবলে আরো কত দুর্গতি বঙ্গভারতীর কপালে আছে কে জানে।



কাঙালি

সৌরেন বসু

বাঙালীরা ভালোবাসে মিষ্টি
সত্যি কত সে করি লিষ্টি—
সীতামোহন মিহিনানা
বোদে দানাদার খা না
নিখুঁতি কি অপরূপ সৃষ্টি।

খাজা গজা দরবেশ
রকমারি সন্দেশ
নারকেল-নাড়ু মোষা মুড়কি;
ছানার পায়ের আঁহা

পেঁড়া ও গুজিয়া তাহা
বাতাসা রে ও-নলেন গুড় কি।

সরভাজা পানভূয়া
রসবড়া মালপুয়া
মিছরি ও ক্ষীর সোনপাণ্ডি;
রাজভোগ বালুসাই
চিনি কালাকাদ চাই
চমচম ল্যাংচা ও রাবড়ি।

আহা রে কত সে ভোগ
বাদশা, শান্তিভোগ
চিক্কুট ও রসগোল্লা;

ক্ষীরমোহনের পাশে
চন্দ্রপুলিও আসে
সরপুরিয়াও দেয় তোলা।

কে বলে বাঙালি ভেতো
লিস্টিটা দেখে নে তো
বলিস তো মুখে আসে যা খালি,
হয়ে যাবে সব ফাঁকা
পকেটে ও ট্যাকে টাকা
আধুলি ও সিকি যত ভাঙালি
মিষ্টি কিনতে আহা
বাহবা বাহবা বাহা
বাঙালিরা মিষ্টির কাঙালি।

হাজার রাজার বাজার

২য় তরঙ্গ

অলোক বসু



বেশ কয়েক বছর আগে অধুনালুপ্ত এক পত্রিকার তবফ থেকে বইমেলা উপলক্ষে এক অসম্ভব নামকবণের প্রতিযোগিতাব আয়োজন করা হয়েছিল। সেই প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ভদ্রলোকের নাম ঠিক মনে নেই। তবে তার অসম্ভব নামকবণটি মনে আছে—‘ছোটদের কামশাস্ত্র’। এই কথাটা মনে পড়ল সেদিন অটোর পেছনে কিছু কিছু লেখা দেখে। যদিও সে সব লেখা ঠিক অসম্ভব না হলেও কৌতূহলকর বটে। বাসে, লরিতে অটোতে নানান কথা লেখা থাকে—যেমন টা টা বাই বাই—দেখবি আর জুলবি, লুচির মতো ফুলবি ইত্যাদি। গড়িয়া টু গড়িয়াহাট রুটের এক অটোর পেছনে ভুল বানানে লেখা আছে—তুমি নদী, আমি ঢেউ, তুমি কুত্তা আমি যেউ। কোন কবির বচনা জানা

সম্ভব নয়—তবে যথেষ্ট চোখ টানে—এমনিও, ভুল বানানের জন্যেও। ‘কুত্তা’ হয়েছে ‘কুত্যা’। সেসব যাই হোক, অটোতে যেতে যেতে ট্রাফিক জ্যামে আটকে থাকার সময় এ সম্বন্ধে এক গল্পও শোনা গেল। কোনো প্রাইভেট বাসেব গায়ে নাকি লেখা ছিল—মামনি—ইত্যাদি। এর পরে নাকি সেলুন-সম্পর্কিত কিছু কথা লেখা ছিল। কথাগুলো এমনিতে খুবই নির্দোষ। কিন্তু যেহেতু মেয়েদের উদ্দেশ্য করে বলা ছিল অতএব রচনাকারী বা লিপিকরের কু-মনোভাব ছিল বলেই মনে হয়। কোনো থানার পুলিশ এ বাসটাকে কি এক আইনে ধরে। তারপর ড্রাইভার কিংবা কন্ডাক্টরকে দিয়ে বাসের মালিককে ডেকে পাঠায়। বাস মালিক এলে নাকি তাকে কিছু আর্থিক জরিমানা তো কবাই হয় এবং মবিল মেশানো কাপড় দিয়ে

ঐ লেখা মুছতে বাধ্য করা হয়। বেচারী বাসমালিক আর কি করেন। বাসকে শোধন করতে হয়। ঘটনাটা সম্পূর্ণই অটোতে বসে শোনা অটো-কাহিনী। সত্য-মিথ্যা বলা মুশকিল।

তা এবকম নানান লেখার ছড়াছড়ি আমরা দেখতে পাই। গলানো সোনা আঠাশ টাকার বিজ্ঞাপনে ‘গলানো সোনা’ নিয়ে, অনেকে অশ্লীলতাও করেছে। তা এসব লেখাকে একধরনের সাহিত্য বলা যেতেই পারে। আজকাল তো অনেকেই বাংলা ভাষার বিজ্ঞাপন হোর্ডিং—এসব নিয়ে বেশ মাতামাতি করে থাকেন। দু’একটি হাতে-গোনা ব্যতিক্রম বাদ দিলে এসব বিজ্ঞাপন কিন্তু সেক্ষেত্রে ভীষণভাবে বাংলাভাষী। শাতিব বাড়িতে, ব্যবসা গাড়িতে—এসব লেখাগুলো অবশ্য সহজ কথায় অনেক মুখে বেধে যাওয়া গভীর কথা বলে দেয়। এক অভ্যুৎসাহী সেই অটো-আলোচনায় বলেছিলেন, এরা তো দু-এক কলি ববীন্দ্রনাথ লেখালে পারে। তা পারে। রবি বুড়োর থেকে কিছু ধার করাই যেতে পারে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে সেইসব কপিরাইট সংরক্ষণ-প্রবণ মহা মহা মণীষীদের, যারা ভীষণভাবে কুপিত, ব্যথিত এবং শেষমেষ ‘চুপিত’ (চুপই তো!) হয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ হাতের বাইরে চলে যাওয়ায় তাঁরা এইভাবে অটোর পেছনে রবীন্দ্রসাহিত্য দেখলে হয়ত ‘ফোটো’ হয়ে যেতে বেশিক্ষণ সময় নেবেন না। হাজার হোক তাঁরাই তো পৃথিবীতে এক এবং একমাত্র রবীন্দ্রবোদ্ধা! তবে দিনকাল যা পড়েছে, রবি ঠাকুর থেকে বেশি কপি করা শুরু করলে ডিভি সিবিষালের ভূতের মতো রবিবুড়ো আবার হাত বাড়িয়ে বলবেন না তো—দেখলে হবে! খরচা আছে!

রবিকে যদিও আমরা প্রচুর খরচা করেছি। তবুও তিনি এতই অসীম যে কোনোদিনই ফুবোন না।

বোধহয় নামকবণ বা এরকম লেখা থেকে আমরা একটু দূরে সরে যাচ্ছি। আজকাল আবার নানান জায়গায় নানান বকম নামকরণ হচ্ছে। মেয়েব সঙ্গে কথায় বাবা সেদিন ‘ডিজের’

সম্মুখে জানলেন। সত্যিই অনেক জেনে গেলেন। তাঁদের সময় অনেক নায়িকা কেঁদে পর্দা ভেঙাতেন—এরকম নাচন-কৌদনে ভিজোতেন না। মেয়ে সেদিন এক সরুমতোন খ্যাংরাকাঠি মাংসহীনাকে দেখিয়ে বলল—এ হল ভিজো! বাবা অবাক—ভিজো কিরে! এতো রীতিমতো শুকনো!

—আরে না না, সে ভিজো নয়—এ হল ভিডিও জাকি—যারা এসব প্রোগ্রামের পরিচালনা করে।

বাবা ভরী আগ্রহ হলেন। সত্যিই তো! কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম না! নামকরণের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে দেখা যায় যাদবপুত্র সন্তোষপুর এলাকায় এক ফ্রিজের দোকানের নাম 'Cold Reception' হলেও গড়িয়াহাট অঞ্চলে এক ফ্রিজের দোকানের নাম হল গিয়ে 'Frigid!'

(২)

ইদানীং নানানভাবে অফিসে হাজারিয়ার কড়াকড়ি, কর্মসংস্কৃতির জোয়ার। মন্ত্রীদেব নরমগরম বিবৃতি, কর্মচারীদের বিরক্তি ইত্যাদি বেশ ব্যাপারটা জমিয়ে দিয়েছে। অনেক অফিসে অফিসাররা মাত্র একদিন না এলেই অ্যাবসেন্ট করে দিচ্ছেন! তা এক সরকারি অথবা আধাসরকারী ডিপার্টমেন্টে জটনেক মহিলা পাশের ডিপার্টমেন্টে নাকিসুরে অভিযোগ জানাচ্ছিলেন—দ্যাখো না, মাত্র একদিন আসেনি, তাতেই কাজ দেখাচ্ছে। এই সরকারি ডিপার্টমেন্টে জটনেক সাধারণ নাগরিক কিছু একটা কাজে গেলে তিনি এই মহিলার অভিযোগ শুনছিলেন। এছাড়া এই ভদ্রমহিলার আরো অভিযোগ ছিল, তাঁকে জব্দ করতে নাকি টেলিফোনে কে বা কারা তিন তিনটে তালা মেরেছে! একজন বলছিল—সত্যিই! এটা ঠিক হচ্ছে না।

সঙ্গে সঙ্গে সেই মহিলা ফুঁসে উঠলেন—ইয়ার্কি মেরো না! একে মাথার ঠিক নেই। হঠাৎ সেই মহিলার কি যেন মনে পড়ে যায়—এ্যা—কি ভাবলে ব্যাপারটা?

—কি আবার ভাবব? সারাজীবন তো ভেবে ভেবেই গেল।

—না-না, এই মেয়েটা কিন্তু খারাপ নয়।

—আরে মেয়েরা কবে খারাপ হয়েছে। যাকগে, বলুন আজকে কি টিফিন আনলেন?

অঙ্কন-শিল্পীদের জন্ম

যাঁরা কোথাও তাঁদের কাজে পাচ্ছেন না, একমাত্র তাঁরাই যোগাযোগ করুন। আপনার তাঁদের বিনিময়ে পত্রপাঠ একমাত্র দাঁতখিঁচুনি ছাড়া আর কোনো পারিশ্রমিকেই দিতে পারবে না। ভেবে যোগাযোগ করবেন।

বইমেলা ২০০৩, স্টল নং : এস-২৯৪

—আরে, এই টিফিন করে দেবার জন্যই তো বলছি!

—না বাবা, এই ক্যান্টিনই যথেষ্ট।

—বয়স হয়ে গেলে টের পাবে। বুঝতে পারবে তখন কি ভুল করেছে।

—তখন নাহয় বলা যাবে ঐতিহাসিক ভুল!

—কি আমার জ্যোতি বসু এলেন! এই কথা শোনার লোকও পাবে না।

এমন সময় বেরসিকের মতো পিওনের আবির্ভাব—দিদি ডেসপ্যাচে অনেকক্ষণ থেকে লোক এসে বসে রয়েছে। বড়বাবু ডাকছে—

—এ অ্যাক্ হয়েছে। দু'দণ্ড যে কথা বলব তার উপায় নেই।

—সত্যিই তো! কি নিদারুণ দুঃখ। চাকরি ছেড়ে চলে যান—কিংবা ঘাসুড়ে দিদির মতো প্রতিজ্ঞা করুন, যদিও এই বড়বাবু থাকবে ফাইল ছৌবনা—চুল বাঁধবনা।

—ফাজিলা! বলে মহিলা নির্গত হলেন নিজের ডিপার্টমেন্টের উদ্দেশ্যে। সঙ্গে সঙ্গে আরো দু'জন মহিলা এলেন অন্য ডিপার্টমেন্ট থেকে সামান্য গল্প করতে। শাড়ির ঝলকে ঝলকে যেন খেঁড়ে বিজয়ের শাড়ির প্রদর্শনী। তারাও এসে টেলিফোন সংক্রান্ত নালিশ শুরু করলেন। সব শুনেটুনে একজন ভারী বিবেচক ভঙ্গিতে বললেন—বয়ং মোবাইল নিয়ে নিন—রিলায়েন্স আপনাদের দুঃখ-কষ্টের কথা চিন্তা করেই বোম্বইয়ের জলের দরে মোবাইল দিচ্ছে।

—সত্যি!—অন্য একজন বলে—সারাদিন এভাবে অফিসে হাড়ভাঙা পরিশ্রমের মধ্যে যদি মাঝে মাঝে একটু ফোনালাপ না কবা গেল। সত্যি এই চাকরি আর জীবনে ঝিক! শত ঝিক!

তা শুনে অন্য একজন বলে ওঠে—'তা ঠিক! আপনাবা সারাদিন এঘর ওঘর ঘুরে এত মোবাইল হয়ে থাকেন যে আপনাদের চেয়ার আপনাদের জন্যে কৌদেন। এজন্যই আপনাদের হাতেই মোবাইল মানাবে ভালো।

অন্য একজন বলে ওঠে—ওনারা চেয়ারের খোঁড়াই কেয়ার করেন। ওনারদের পেয়ারের রাজনৈতিক দাদারা ওনারদের শিখিয়েছেন—কেবল চরৈবেতি—চরৈবেতি—একদম চেয়ারে বসে থেকে জীবনটাকে স্থাবর করে দেওয়া ঠিক নয়।

—ঠিকই! ওনাবা সবাই ভীষণ মোবাইল। কিন্তু এইজন্যই ফাইলগুলো আর মোবাইল হয় না! এ ব্যাপারে ছেলেমেয়ে সবায়ের ভারী মিল।

একজন খেপলেন—একদম ইয়ার্কি মেবো না! তোমরাও কিছু কম নয়।

—তা ঠিক, তবে আপনাদের দম তো আমাদের নেই—তাই আমরা চেয়ারে ব্যোম মেরে বসে থাকি।

মোবাইল আলোচনা থামে। খেঁড়ে বিজয়ের শাড়ি-সুন্দরীরা স্থান ত্যাগ করেন। কারণ ছুটির সময় হয়ে আসছে। খুস্তেরি কড়াকড়ি। কাঁহাতক আর অফিসে থাকতে ভালো লাগে। কত সব ভালো ভালো জায়গায় যাবার থাকে না!

(৩)

ভবি ভুলবার নয়। টেকি স্বর্ণে গিয়েও ধান ভালো। তিন মহিলা মর্নিং ওয়াক কবতে করতে গল্প করেন। নানান সংসারের একই সব ধ্বংসাত্মক আলোচনা—শাওড়ি-নন্দু—কিপ্টে নন্দাই—বড়জা ইত্যাদি—যেন জগতে ভালো থাকতে নেই। এই যে সেজ ননদের সেজ মেয়ে শুই 'একটু একটু ভালো বলে মনে হচ্ছে। তবে কিনা—এ 'তবে কিনা'ই সাংঘাতিক। কাবোকে কি সহজে সার্টিফিকেট দেওয়া যায়। কত বকম গল্প থাকে। নেমন্তন্ন-বাড়ি থেকে খেয়ে এলে লোকে জিজ্ঞেস করত—

—কেমন খাওয়াল?

—ভালো, তবে—

—তবে—তবে কি?

—না, মানে—ঐ নুনটা ঠিক খুয়ে দেয়নি।

ঠিকই তো। নুনটা তো খুয়ে দেওয়া উচিত। নজরুল অনেক বুঝেছিলেন বলেই না লিখেছিলেন—দে' গরুর গা খুইয়ে।

মনিং ওয়াকের পূণ্য বা 'সুফল' বোধহয় চা বিড়ি-সিগারেট আর পরনিন্দা পরচর্চায় শেষ হয়। তারপর তো আছেই বাজারের থলে।

চারের দোকানের আলোচনায় মনে হয় ভালো কিছুই আর অবশিষ্ট নেই কোথাও। সবাই নাকি দুর্নীতিগ্রস্ত। কিন্তু যারা আলোচনা করছে, অবশ্যই তাদের বাদ দিয়েই। তারা বাদে আর সারা দেশ রসাতলে যাচ্ছে। তারা অফিসে যারা ঘুষ খায় তাদের উদ্দেশ্যে কত কথা বলে থাকে। কিন্তু তুমি বাপু সাড়ে বারেটায় এসে 'সাড়ে একটা'য় কাটো—তার বেলায়? সেটা কোন নীতির মধ্যে পড়ে বাপু?

এ যে আমরা অটলে আছি—বুদ্ধে আছি—মমতায় আছি—। ভাষণ বড় জালাময়ী। নেতা-নেত্রীরা দেশের জন্য যারপরনাই চিন্তিত। চারদিক বক্তৃতা দেওয়ায় জগৎ কাঁপে। কিন্তু অফিসে সারামাস কাজ না করেও মাইনে নেওয়ার সময় এমনকি নিজেদের কাছে রেভিনিউ স্ট্যাম্পও থাকে না। খোঁজ খোঁজ পড়ে যায়। অনেকেই অবশ্য নেতা নেত্রীদের সাহায্য করতে উৎসুক হয়ে এগিয়ে আসে। কেউ ফল্গুগিরি করে—আছে, তবে একটু ঘষে-মেজে নিতে হবে। ঘরের দুই মানে খুব খারাপ জায়গায় পড়ে ছিল—তুলে নিয়ে এসেছি গরিব দুঃখীদের কাছে লাগবে বলে। তা উড়ো স্ট্যাম্প নেতায় নমঃ।

(৪)

সম্প্রতি খবরের কাগজে দক্ষিণ সুন্দরী নাগমার এক ছবি বেরিয়েছে। সে নাকি ইদানীং কিসব আর্ট অব লিভিং করে বেড়াচ্ছে। ভারতীয় ক্রিকেট কাপ্তান অবশ্য এখন অন্যরকম লিভিং-এ বিশ্বাসী হয়ে গেছেন। দিল কা-নাগম ছেড়ে ডোনা নাকি টোনা মেরে তাকে সানার বাপে পরিবর্তন করেছেন। এসব ভারী ভালো খবর। কিন্তু অন্য খবরগুলোর মতো ভালো খবর নয়। সাধারণ খবর। কিছুদিন আগে নাইজিরিয়ার জেলে জেলসুন্দরী নির্বাচিত হয়েছিল। তা নিশ্চয় হাসির ব্যাপার নয়। আর একটা খবর আছে, তা হাস্যকর না হাসির, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। সম্প্রতি ২৭ বছর বয়সী থাইল্যান্ডের মহিলা অরুনোতাই শ্রিয়ান বিম্বের 'মিস্ ড্রাক্স'-এব সম্মানে ভূষিত হয়েছে। মদ্যপ—তাও আবার কুমারী। তিনি নাকি মদ্যপানের প্রতিযোগিতায় তিন ডজন তাই কুমারীকে হারিয়ে জয়ী হয়েছেন। আর্ট পেগু মদ্য পানের পর মদের বোতলে সাজানো আঁকাবাকা পথ স্বচ্ছন্দে হেঁটে গিয়ে তিনি নাকি বলেছেন—আমার একটুও নেশা হয়নি। আমাদের পচার মা চোলই খেতে এর চেয়েও ওস্তাদ। সে নেহাৎ কম দামি খাব বলে। তার স্বামী যখন তাকে মদ্যপ অবস্থায় পেটে, তখন তাকে বাঁচাতে গেলে সে চ্যাচায়—আমার সোয়ামি যদি আমাকে মাঝে, তাতে কার কি বলাব আছে।

হে সোয়ামি বিবেকানন্দ, ভুলিও না ভাবতবর্ষ সীতা, সতী, সাবিত্রী, জয়ললিতা, মায়াবতী, মমতা ব্যানার্জি, পচার মা—এদের সবায়ের দেশ।

জ্ঞানে কেয়া হোগা রামা রে। সব খালাস! খালাস!

কলকাতা বইমেলায় পার্ক স্ট্রিট গেটে

এন-১১১ নং স্টলে সবারে করি আহ্বান।

এবারের বইমেলায় প্রকাশিত তিনখানি গ্রন্থ—

কল্যাণখনির বহু আজানা কাহিনী নিয়ে লেখা উপন্যাস

দেবদত্ত রায়ের

কালো হীরের দেশে ৭৫

সফিকুল ইসলাম সম্পাদিত

বৈচিত্র্যের আলোকে নজরুল ১৫০

ভূমিকা—সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

সম্মেলনটিতে লিখেছেন : বাঁধন সেনগুপ্ত, আব্দুর রউফ, বিদিত কুমার দাস, মজহারুল ইসলাম, জিয়াদ আলি, মীরাতুন নাহার, সুমিতা চক্রবর্তী সহ আরও অনেকে।

কিশোর কিশোরীদের উপযোগী

জিয়াদ আলি রচিত

খুশীর চাঁদ ৩০

প্রতিটি মহান একুশে গ্রন্থ সংগ্রহকারীর জন্য একটি উপহার

দিলীপ মজুমদার সম্পাদিত সোমেন চন্দ্রের সমগ্র বচনাবলী

সোমেন চন্দ্র ও তাঁর রচনা সংগ্রহ ২০০

এছাড়া উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ

মহান একুশে ফেব্রুয়ারী পঞ্চাশ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে

বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার বিশিষ্ট লেখকদের লেখায় সমৃদ্ধ সম্মেলন

মহান একুশে ২০০

সম্পাদনা মজহারুল ইসলাম, চিত্ত মণ্ডল

জিয়াদ আলি রচিত

নজরুল প্রতিভার উৎস বিতর্কিত বিস্তার ২০০

মাও-সে-তুঙ রচনাবলী ৪ খণ্ড

৬৭৫ টাকার বই মাত্র ৫০০ টাকায়

প্রতিটি বামপন্থী নেতৃত্বের ও কর্মীর অবশ্য পাঠ্য

কবি কেপ্ত চট্টোপাধ্যায়ের বলিষ্ঠ কাব্য গ্রন্থ

কমরেডস লাইনটা সোজা করুন ৬০

নবজাতক প্রকাশন

এ-৬৪, কলেজ স্ট্রিট মার্কেট

কলকাতা-৭০০০০৭

চিরকালের কৌতুক

সংগ্রহ : কাকলি সরকার

দুই মাতাল জামা খুলে পাশে রেখে একটি বাড়ির দেওয়াল প্রাণপণে সরাবার চেষ্টা করছিল। এক চোর সেই জামাকাপড়গুলো নিয়ে চলে যাওয়ার পর মাতালদুটোর হুঁশ হল, তাদের জামাকাপড় উখাও হয়ে গেছে। প্রথম মাতালের উক্তি—দেখেছিস, আমাদের গায়ের জোর এত বেশি যে এই বড় বাড়টাকে ঠেলে কতদূর নিয়ে এলাম। দ্বিতীয় মাতাল বলল—উঃ, আমাদের জামাকাপড়ও দেখা যাচ্ছে না; কতদূর ঠেলে এনেছি।



এক মাতাল একটি লাইটপোস্টের কাছে এসে ঘরের তালা ভেবে চাবি ঘোরাতে লাগল। হঠাৎ এক চৌকিদার এসে হাজির।

চৌকিদার : অ্যাঁই! তুমি ক্যা করতে হো?

মাতাল : বাড়ির দরজা খুলছি, দেখতে পাচ্ছ না?

চৌকিদার : এটা তুমার বাড়ির দরজা? কী করে সমঝলে?

মাতাল : দেখছ না, ওপরে আমার বউ বাতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।



এক ব্যক্তি রেললাইনের ওপর বসে কুটি খাচ্ছিল।

এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল,—এখানে বসে কি করছেন?

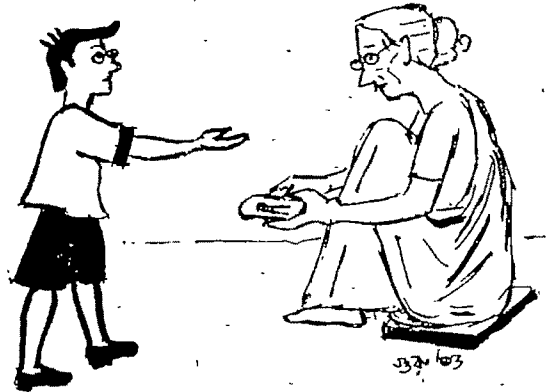
—ট্রেনের অপেক্ষা করছি।

—কেন?

—আমি এখানে আত্মহত্যা করব।

—আপনি তো খাচ্ছেন এখন।

—ট্রেন আসতে দেরি আছে। তাই খেয়ে নিচ্ছি।



বাবাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে একটি শিশু ভারী বিরক্ত করছিল। হঠাৎ শিশুটি প্রশ্ন করে—বাবা, ডিম কারা দেয়?

বাবা : (বিরক্ত স্বরে) যারা গিলে খায়, তারা।

শিশুটি ছুটে যায় ভেতর-ঘরে। সেখানে ঠাকুমা বসে সুপারি কাটছিল।

শিশু : ঠাকুমা, আমাকে ডিম দাও।

ঠাকুমা : কী দেব? ডিম কোথা থেকে দেব?

শিশু : বাবা যে বলল, যারা গিলে খায় তারা নাকি ডিম দেয়? তুমিও তো গিলে খাও, দাঁত নেই বলে। তবে কেন তুমি ডিম দিতে পারবে না?



ইবার বইমাল্যায় আপনাদের আর কী খাওয়াই? একটুকু ডিংলা-পটাশ, একটুকু ডিম-ছোলার ডাল খাওয়া গায়ে জোর হোক। তখন বইমাল্যার ব্যাপারীদের কাছে মনের সুখে ধোঁকাই খান।

ডিংলার সম্বর

কি কি লাগব্যা : অডহর ডাল আধ কাপ, মোটা করে কাটা পিঁয়াজ আধ কাপ, ডিংলা (কুমড়ো) ছুট ছুট কবে কাটা ২৫০ গেরাম, ফাড়া কাঁচা লঙ্কা ৩টে, কারি পাতা একটা ডাল, নুন পরিমাণ মতন, তেঁতুল জল পরিমাণ মতন লাগব্যা, সম্বর পাউডার একটুকুখানি, তিল ত্যাঁল মাঝারি পোলার ১ পোলা, সর্ষে একটুকু।

যে ডাবে কইরব্যা : তিন কাপ জলে ডালগুলা ভাল কবে সেদ্ধ করতে হব্যা। পিঁয়াজের খাদি ও ডিংলার কুচি মিলান, তরকারি সেদ্ধ হলে তেঁতুল জল ও সম্বর পাউডার মিলান। একটু ত্যাঁলে হিং ভেজে লিয়ে গুঁড়া কব্যা সম্বরে মিলালে গন্ধ ভাল হয়। সব কিছু মিলিয়ে ঢাকা দিইয়া রাখতে হব্যা। গরম গরম খাব্যা। পরিবাবের সঙ্কলে মিলে দাওয়ায় বসে পড়ুন।

ডিম দিয়া ছোলার ডাল

কি কি লাগব্যা : ২টো ডিম, ২ কাপ ছোলার ডাল, নুন স্বাদ মতন, চিনি ছুট চামচে ২ চামচ, হলুদ ২ চামচ, গরম মশলা, পিঁয়াজ ১টি বাটা, ২কাঁই কসুন বাটা, ১ চামচ আদা বাটা।

যে ডাবে কইরব্যা : ডিম দুটো অল্প নুন দিইয়া ভাল কইর্যা ফেটে লিন। তাবপর উনুনের মধ্যে একটা জায়গার মধ্যে জল বসান, তাব ওপর একটি ছুট খালায় ডিম দিয়ে বসিয়ে দিন, যখন জমে যাবে লাবিয়ে লিন, হবি দিয়া ছুট ছুট কবে কেটে পাতে রাখুন। ছোলার ডাল অল্প নুন দিয়া

হেঁ সেন

সিদ্ধ করুন, পরে ত্যাঁল, তেজপাতা ও শুকনো লঙ্কা ও জিরা ফোড়ন দিয়া একটু ভেজে পিঁয়াজ বাটা দিয়া দিন, ৫ মিনিট পরে লঙ্কা গুঁড়া, হলুদ ও গরম মশলা দিন। ২ থেকে ৩ মিনিট ভেজে ডাল দিয়া দিন, ফুটলে ডিমের খাদিগুলা ডালের মধ্যে ছাইড়া ভাল কইর্যা লেড়েচেড়ে দিন।

ধোঁকার ডালনা

কি কি লাগব্যা : ছোলাব ডাল, ত্যাঁল, ফোড়ন, হিং, জিবে গুঁড়া, লঙ্কা গুঁড়া, আদা বাটা এবং আন্দাজ মতন চিনি ও নুন লাগব্যা।

যে ডাবে কইরব্যা : আগের বাত্রে ছোলার ডাল ভিজিয়া রাখতে হব্যা। পরের দিন ছোলার ডালটা ভাল করে শিলে বেটে লিতে হব্যা। তাবপর কড়াইব মধ্যে একটুকু ত্যাঁল দিতে হব্যা। ডালের মধ্যে আদা বাটা, নুন এবং চিনি দিতে হব্যা। অল্প আঁচে বাটা লাড়তে লাড়তে ডালটা আস্তে আস্তে মগ্ন মতো হয়ে যাবে তখন ওর মধ্যে ভাজা মশলার গুঁড়া (জিবে, শুকনো লঙ্কা) মিশিয়ে থালার মধ্যে ঢালতে হব্যা এবং হাত দিয়া চেপে চেপে দিতে হব্যা। আব একটা থালা দিয়া চাপা দিয়া একটুকু রেখে দিতে হব্যা। একটুকু পরে ছুরি দিয়া খাদি খাদি কইর্যা কেটে ডোবা ত্যাঁলে ভেজে লিতে হব্যা। এই ডাবে ধোঁকাটা তৈরি হল।

সুতো

কি কি লাগব্যা : আলু, বেগুন, মূলা, কাল্লা, কাঁচকলা, ফোড়ন, ত্যাঁল, সর্ষে, ধুনে বাটা, আদা বাটা, পোস্ত এবং পরিমাণ মত হলুদ, নুন।

যে ডাবে কইরব্যা : প্রথমে আলাদা ডাবে ভেজে রাখব্যা আলু, বেগুন, মূলা, কাল্লা আর কাঁচকলা। বড়ি ভেজে রাখতে হব্যা। ত্যাঁল সর্ষে আব তেজপাতা ফোড়ন দিয়া তারপর ভাজা তবকারিগুলা দিতে হব্যা। অনেকটা পরিমাণে ধুনে বাটা, আদা বাটা অল্প হলুদ জলে গুলে ঢেলে দিতে হব্যা এবং একটু জল দিয়ে টিমে আঁচে সব কিছু ফুটে সেদ্ধ হয়ে গেলে সর্ষে, পোস্ত আব বাঁটুনি ঢেলে দিয়া (সর্ষে আর পোস্ত সমান পরিমাণ, বাঁটুনি অল্প) এবার একটু লেড়েচেড়ে আধ কাপ দুধ আব একটুকু চিনি দিয়া লামান। সুতো ঠাণ্ডা হবার পরে পাঁচফোড়ন ভাজার গুঁড়ো ছড়িয়া দিন। তারপর দেখুন খোঁতে কেমন লাগে। আপনি সাধ বুঝতে গিয়ে সবটায় খেয়ে ফ্যালব্যান না যেন।

—মিঠু কারক

আমার বউ তো হিন্দি ছবির পোকা। বাড়িতে দুটো ভি. সি. আর আর তিনটি কেবল কানেকশন। থ্যালাটা বুঝুন তাহলে। নিজের বউ মানুষ হল না তো পাবলিক কোন ছার! তাহলে আপনারা অতঃপর পরিকাঠামো গড়ার দিকে নজর দিন।

কড়িচা ২০০৩

অমিতাভ সান্যাল

সাংস্কৃতিক বিপ্লব ২০০৩

হা মাং রিজেন্সির ‘বলরুমে’ এক মহতী সভা আয়োজিত হয়েছে। থ্যাটার, ফিল্ম ও সঙ্গীতের উল্লেখ্য ব্যক্তিত্বরা উপস্থিত। মনে হচ্ছে কিছু একটা হবেই আশ্র। সহ্যের সীমা আছে একটা। এবার করেছে ইয়া মরেন্দে। বোম্বাইয়া বোম্বোটেদের এই ‘স্ক্যাম’ আর সহ্য করা যায় না। ‘থ্যাটার ও ফিল্মমন্ত্রী’ এসে গেলেও ‘গানমন্ত্রী’ এসে পৌছাননি এখনো। মেহেদী হুসেন সানাই বাজাচ্ছেন। দু’পাশে একান করে একশো দুইটি খুকি পাপড়ি বৃষ্টি করে চলেছে। ইদানীং ঘোর অর্থসঙ্কট চলছে। তাই ‘বোকের’ বদলে পাপড়ি। এতে পাঁচ শতাংশ খরচ কমেছে।

জানরব উঠল—এসে গিয়েছেন, এসে গিয়েছেন। ‘কে এলেন ভাই?’ আজকের এই মহতী সভার যিনি মেগা-সভাপতি, সেই গানমন্ত্রী এইমাত্র গাড়ি থেকে নামলেন। ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে তাঁকে। মাথায় হিমাচলী টুপি, মুগার ধুতি ও পাঞ্জাবি, নসি শাল আব পায়ে নাগরা। এমন মুগা-সুন্দর মন্ত্রী আর নেই। তাই তাঁব বিকল্পও নেই।

সুন্দরীরা ছুট লাগালেন। মন্ত্রী মহাত্মাজিব ভঙ্গিতে দুটি সুন্দরীর কাছে ভর দিয়ে চলতে থাকলেন। মন্ত্রীকে দেখে সবাই ‘স্টাঞ্জি ওভেশন’ জানালেন। মন্ত্রী বসলেন। সভা শুরু হল।

‘সেনটো’ হল এই দেশের কেন্দ্রীয় কর্মী সংগঠন। সেই সংগঠনের থ্যাটারিং ফিল্ম শাখা ‘সেনফোর’ প্রধান কুমার সত্যজিৎ বললেন, বঙ্কুগণ, রাজ্যের সংস্কৃতি ভাগ্যাকাশে আশ্র দুর্ঘোষের ঘনঘটা। বাজ্যের মানুষেরা মাথার ঘাম পাশে ফেলে টাকা আয় কবে আর বিনোদনের নামে সেসব হাম কবছে বোম্বোটেরা। এসব আমবা



চলতে দেব না। মাতৃভাষা হল গো বিনোদনের মাতৃদুঃখ। মাতৃভাষায় সঙ্গীত, নাটক, ছবি। কবি বলেছিলেন না, আমরা মাতৃভাষা।

প্রথম সাবিত্রে বসা মানুষেরা জোর হাততালি দিলেন। ঠিকই তো, কবি এবকম কথা বলেছিলেন বটে। তবে কোন কবি কবে এসব কথা বলেছিলেন, সে কথা কারোব মনে পড়ল না। আবার বঙ্কুতা শুক হল,—অথচ আমাদের ছবি চলে না, মানুষ থ্যাটার দেখে না, তারা গান যায় না। পাবলিক গাল পাড়ে।

‘বাবা কেন জল কাটে ‘পুকুরে জাল, খালে ছিপ.. ছুরে হিপ হিপ’ ‘মা, মশাবি টাড়া’, ‘টাসা চেপে আসছে দুলহা ভাই’ ইত্যাদি নাকি ছবিই নয়। স্বীকার কবছি, এখানে নায়িকাদের মোটা কোমব ও থলথলে বডি। নাযকেবা বেঁটে ও মোটা—তবে তাতে কি? আমরা কি আর প্রতিবেশিদের মতো বডি দেখাবার তৈরি নিয়েছি? ভাগ্যিস গ্রামবাংলা ছিল, তাই বেঁচে রয়েছে।

সেনফোর উপপ্রধান কুমারপ্রসাদ চক্ৰোতিব

গাল ভরা দাড়ি। তিনি কথা বললেন নাকি বিলাপ করতে লাগলেন বোঝা গেল না। তিনি এভাবে শুরু করলেন,—নাঃ আত্মসম্মান নিয়ে এদেশে আর বসবাস করা যাবে না গো! পেশাদার রঙ্গমঞ্চগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তো আমি কি করব? আমি ডিসইনজের্ট পোর্টফোলিও ডিল করি নাকি? টিভিতে প্রোগ্রাম করলে দু'চার পয়সা আসে। সেখানেও বিপত্তি। ছড়া কেটে শোনায় আমার,—
এই মাটিতে থিয়েটার,

নষ্ট করল সব কদাকার,

এই স্যাঙাৎ টিভিতে ধায়,

মনের সুখে পয়সা কামায়।

বলুন বন্ধুগণ, পয়সা কামানো দোষের? এটা অন্যায়? গ্রুপ থিয়েটার ভেঙে খানখান হয়েচে চটা কী করা যাবে? না ভাঙে যদি গড়ে কি প্রকারে? মহামতি মার্কস বলেছিলেন না, থিসিস, অ্যান্টিথিসিস, সিন্থেসিস! কমরেড মার্কস লাল সেলাম। একদা ছিল মান্তর দশটি থিয়েটার। সেসব ভেঙে এখন দশো দশে দাঁড়িয়েছে। যদিও কেউই তেমন কষ্টে পাচ্ছে না। আরে মশাই, লোকে যদি থ্যাটার দেখতে না চায়, কী করব বলুন? এ কি জলভরা তালশাঁস যে পেলেই খাও? আপন-পর ভেদ করো না। টিভিতে গিয়েছি কি সাথে। শুধু আমি কেন, আমার মতো অনেকেই গিয়েছেন। আর যাবেনও। থিয়েটারের হ্যাণ্ড অনেক। আড়াই ঘন্টা স্টেজ জুড়ে উল্লুকের মতো দাঁড়ানো। তার চাইতে চেয়ারে বসে সোজা-সাপটা কথা বলা অনেক ভালো। আরো বলি, জনগণ—সর্বের মধ্যে বিস্তর ভূত। আমাদের মহা সংস্কৃতি মন্ত্রী (থ্যাটার) সিংহাসনে বসার আগে যিনি ছিলেন রাজসভায়, তাঁর কিন্তু কিম্বদন্তি ফতোয়াতে লাভ ছাড়া ক্ষতি হয়নি। কেন, বলি। নাটকে যদি ভালোবাসার ব্রো হট, কথার সুড়সুড়ি, দুই মিষ্টি সেক্স আর জড়াজড়ি না থাকল, তবে দর্শক আসবে কেন? তা সেই মন্ত্রী সংস্কৃতির নামে স্যাটািস্যাট এক এক করে পেশাদার রঙ্গমঞ্চগুলির ওপর তুরপুণ চালালেন যেই, সবগুলো মুখ খুবড়ে পড়ল।

নাটক, দাদা, আমাদের রক্তে। রক্ত জমাট বেঁধে আছে। শুকিয়ে যায়নি। একটু তা বা তাপ পেলেই দেখবেন টগবগিয়ে ঘোড়ার খুরে খুরে। এ তো আমার একার কস্ম নয় রে ভাই। সবাইকে এসে হাল ধরতে হবে। কালেকটিভ রেসপনসিবিলিটি যারে কয়।

সবশেষে উঠলেন, মানে মধ্যে উঠলেন সেনডিমো প্রধান রূপালি সাহা। রূপালি অবিবাহিতা। সর্বাস্থে প্রভূত সাজ। বিনোদন জগতের অবিবাহিতা মহিলারা জ্বরদন্ত সাজপোশাক করতে ভালোবাসেন। বললেন তিনি, বন্ধুগণ, রেকর্ডের দিন শেষ হয়ে ক্যাসেটের দিন এল যখন, ভাবলাম এবার সুদিন আসবে বোধহয়। ওমা, কোথায় সুদিন! প্রথম সারির এক-দেড়শো ক্যাসেট কোম্পানি মুম্বাইয়া শিল্পীদের ক্যাসেট করছে পরমানন্দে। বিশ্বসংস্কৃতির পীঠস্থান এই শহরের বুকে এইরকম বাটপাড়ি সহ্য হয়? তারপর কিশোর গান? ফ্যাশনের গান? সেখানেও সেই বোয়েটের দৌরাডা। আমাদের গলা নাকি সুরে লাগে না। আমাদের গলায় নাকি সাত সুর তেমন খেলে না। আমাদের নাকি রেওয়াজি গলা নয়। অথচ আমাদের এখানে ট্যালেন্ট-এর অভাব? সাত-আটশো ছেলে-মেয়ে নানারকম কণ্ঠ বা কণ্ঠী হয়ে লড়ে যাচ্ছে। কী সুন্দর গাইছে তাবা। কিশোর, মুকেশ আর ডেড, লতা আশা আর এজেড, ললিত কিশোর, লতা এ্যাণ্ড আশা। অথচ এই সব প্রতিভাবান সন অব দ্য সয়েলরা কষ্টে পায় না। আমরা কষ্টে পাই না। এটা বাঙালার অসম্মান নয়?

আমরা শরৎকালের জন্য মুখিয়ে থাকি। ভারতবর্ষ জুড়ে দুগগো পুজো আর পুজোর আসরে গান। অন্যান্য অঞ্চলগুলি আমাদের মতো এতটা গরিব হয়ে পড়েনি তো, তাই দু-চার পয়সা আসে। মুম্বইতে যেসব বঙ্গসন্তান একদা

দাঁপিয়ে বেড়াতে বা ফাটাফাটি করতেন তথা ফাটিয়ে দিতেন, তাঁরা অবসর জীবন যাপন করতে এখানেই আসেন। আর 'ডাউন সেক্টিমেণ্টাল মেমোরি লেন'-এ দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করেন এখানেই। আমরা তাদের হিংসা করছি না। হিংসে করব কেন, বলুন? তবু বদছি, গান বেচে বা গলা বেচে তো আমাদের ভরণ পোষণ। সন বা ডটাররা যদি সয়েলে প্রোডাক্ট সেল করতে না পারল তবে বেঁচে থেকে লাভ কি?

এইভাবে সেনকো বা সেন্টার অব কালচারাল অর্গানাইজেশনের দুই প্রশাখা, সেন্টার অব থিয়েটার এণ্ড ফিল্ম অর্গানাইজেশন বা সেক্টফো সেনডিমেশন এবং সেন্টার অব ভোক্যাল এণ্ড ইনস্ট্রুমেন্টাল মিউজিক অর্গানাইজেশন বা সেনডিমার কর্তারা নানাভাবে ইনিমে বিনিমে বিলাপ করলেন। এবার গানমন্ত্রীর ভাষণ শুরু হবে। প্রথম ও দ্বিতীয় সারিতে উপস্থিতি মহিলারা চট করে চোটে সিঁদুর গালে রুজ পাউডার মেখে নিলেন। পুরুষেরা হাতে হাতে চুল মেরামত করলেন বা পরচুলার ফিটিং ফিক্সিং ঠিক আছে কিনা দেখে নিলেন। গানমন্ত্রী ইতিমধ্যেই পজিশন নিয়েছেন। অতঃপর তাঁর বক্তৃতা শুরু হল—

: আমি শুরুতেই একটা কথা বলি। রূপালি আমাদেরকে বড়ই অসম্মান করেছেন। গরিবি হটানো যাদের বীজমন্ত্র তারা গরিব হয় কী প্রকারে? ওসব বিরোধীদের অপপ্রচার। আমরা এখন কিঞ্চিৎ সঞ্চয় করছি। কিনা, তাই কৃষ্ণ সাধন।

এবার মূল কথায় আসি। বাংলা ফিল্ম তার জনপ্রিয়তা হারিয়েছে। পাঁচা যেমন স্বেচ্ছায় হাড়িকাঠে গলা ঢোকায় না, মানুষেরা তেমনি বাংলা বই দেখে না। এদিকে গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোতে আমদানি-শুল্ক বসানো যাচ্ছে না কোনোমতেই। তা আমি বলি কি, মা-সম্মিলন, যদি একটু কম খান বা জিমে যান, অচিরেই তাঁরা বরণীয়া হবেন। আমাদের জল ও তেলের অনেক গুণ। চীনেরা খুব সাইকেল-খোর; তারা লম্বাও তাই। তা বাংলার দামাল নায়কেরা সাইকেল চালিয়ে বা প্যারালাল বারে শরীর দুলিয়ে লম্বা হতে পারেন। আমার বউ তো হিন্দি ছবির পোকা। বাড়িতে দুটো ভি. সি. আর আর তিনটি কেবল কানেকশন। ঠ্যালাটা বুলুন তাহলে। নিজের বউ মানুষ হল না তো পাবলিক কোন ছার। তাহলে আপনারা অতঃপর পরিকাঠামো গড়ার দিকে নজর দিন। আমি মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কথা বলে বছরে অন্তত চারটি ছবি প্রযোজনার ব্যবস্থা করেছে। আপনারা শুনেছেন তো, আমরা নিউ টাউনে একটি অত্যাধুনিক স্টুডিও করছি। আদিত ওখানে কার রেসিং কমপ্লেক্স গড়ে তোলার কথা ছিল। কমিশন নিয়ে বিনিবনা না হওয়াতে কার ছেড়ে ফিল্ম ধরেছি। আমাদের তো অনেক কিছু করার স্বপ্ন। মানুষজনের কত দুঃখ। দুঃখের কথা ভাবতে গিয়ে যেন গেল।

থ্যাটার জগতের মানুষদের উসখুশ করতে দেখে মন্ত্রী বললেন, দেখুন ভাইয়েরা, সারা বাংলায় আমরা পাঁচশো মঞ্চ গড়েছি। ওখানে গিয়ে থিয়েটার করেন না কেন? মজার থিয়েটার করে পাবলিকের মন জয় করুন। আমাদের রাজনীতি প্রচার করে পয়সা করুন। কার্জন পার্ক, ভিক্টোরিয়ার মাঠে নাটক করে ফাটিয়ে দিন। আরে মশাই, নবতম কিছু ভাবতে হবে তো।

সবশেষে রূপালিকে বিষণ্ণ দেখে মন্ত্রী বললেন, আপনারদের নিয়ে পরে একদিন বসব'খন। আপনারা আপাতত মাস, মাস, চাল, ডাল, কাপড়-চোপড়ের সাথে ক্যাসেট পুষ করুন। পাঁচ কিলো মাসে কিনলে দুটি, এক কুইন্টাল চাল কিনলে পাঁচটি ক্যাসেট ফ্রি। এই ব্যবস্থাটা পাবলিক ইদানীং খাচ্ছে খুব। শুধু ক্যাসেট বানালে হবে নাকি—গর্ভসঞ্চার করতে হবে না? কী বলেন, রূপালি?

শীতকাল

আইভান হো হো



শীতকালে বাঙালি জীবনে তিনটে জিনিস হয়। ম্যাটাডোরে পিকনিক, ময়দানে মেলা আর মাঝখানে চুলকানি। এরমধ্যে যারা খুব কপাল করে আসে তারাই চুলকানির সুখ পেয়ে থাকে। ঠাকুরের সেই নির্বিকল্প সমাধির কথা মনে আছে? ধ্যান, জ্ঞান, বাহ্যদশা লোপ পেয়ে ভাবসাগরে অবাধ বিচরণ। কে এল, কে গেল খেয়াল থাকে না। কেবল হাতঘড়ি চলছে। পায়ের খাঁজে সুখের জাহাজ ভিড়ছে। বাইরে কে যেন নাম ধরে ডাকছে। সে ডেকে ডেকে ফোকলা হয়ে যাবে। মনে হচ্ছে শীতকাল কেটে গিয়ে আবার শরৎ ফিরে আসবে। কাশফুলের জঙ্গলে ভরে যাবে শরীরের অজ্ঞকার জায়গাগুলো। হাতঘড়ি চলবে আগের মতোই। একটু ফাস্ট হতে পারে। কারণ এদিকে পেণ্ডুলামও দুলছে। সুখ এখন কলেরার মতো ছড়ানো। পায়ের কড়া, কানের চুল, পিঠের তিল—সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। চোখের পাতায় রাষ্ট্রীয় শোক। অর্থনির্মীলিত। এর মধ্যে গোটা পাঁচেক টেলিফোন এসে ফিরে গেল। কেউ

একজন বার বার ট্রাই করছে। করবেই। বুদ্ধ যখন ধ্যানে বসেছিল তখনও এসেছিল সাপ, সিংহ, সুন্দরী, সুড়সুড়ি। কিন্তু বুদ্ধের সাধনা সবাইকে ফিরিয়ে দিয়ে কালজয়ী হয়েছিল। আজও সাধুরা অহংকারকে হারাতে ‘বুদ্ধ শরণং গচ্ছামি’ বলে। আর বলে কম্যুনিষ্টরা। তবে ধন বৈভব বাড়তে। বুদ্ধ একাধারে বাম, ন্যাট্যরসিক, আবার বাস্তববাদী। নে, এখন কি করবি কর। ওদিকে মমতা মারকাটারি। বিদ্রোহ ভরিয়ে ভরিয়ে পাশবালিশ হয়ে গেল দলটা। অটল ক’দিন জড়িয়ে শুয়েছিল। শেষে হাঁটুর রোগ ধবে গেল বেচারার।

যে ম্যাটাডোরে পিকনিক করেনি সে মাধ্যমিক পাশ দেয়নি। মাধ্যমিকের বয়স পরিমেষ্ট আসে ম্যাটাডোরের বয়স। শহর থেকে দূরে যাবার জন্যেই ম্যাটাডোর। বাপ-মার থেকে দূরে যাবার জন্যেই ম্যাটাডোর। বিবেক-বুদ্ধি থেকে দূরে যাবার জন্যেই ম্যাটাডোর। আবার শ্যাওলা ধরা সংসার ফেলে ঠাকুরের মুক্তিমেলায় যাবার জন্যে ঐ ম্যাটাডোর। বন্ধে তখন অন্য গান বাজে। খাট ধরে

ছেলেরা চরিত্র সামলে বসে আছে। বুঝে হতে চুল্লিতে নেয় পয়তাল্লিশ মিনিট। গুর মধ্যেই বাড়ি ফিরে আসতে হবে সবার অলক্ষ্যে। ঝেড়ে ফেলতে হবে বাবার আলমারি। ভাঁড়ারঘরে আলো নিবিয়ে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার নিয়ে অপেক্ষা করবে ছোট বৌ। পয়তাল্লিশ বছরের জীবনে যা কামাইনি, পয়তাল্লিশ মিনিটে তা কামিয়ে নিতে হবে। হয় এবার, নয় নেভার! ফেরার পথে পাড়ার মুদি হেঁকে দিল, ‘ছোটবাবু, তুমি যাওনি?’ ‘চুপ্ শালা, তুই ভাত বসিয়ে বাজার যাস না!’ কর্তাবাবুর আত্মা একথা শুনে মেঘে হোঁচট খেল।

বলি হরি, হরি বোল

ওরে ভাই চোখ খোল।

ছোটজন নেমে গেল

ফাঁকা মাঠে মারবে গোল,

বড় বলে, দেখা যাবে

কার পেশী কত গোল।

একটু ঝোলাওড়ের জন্যে সারা বছর ঝুলে থেকে এই শীতে মুখ ফসকে যাবে—একদিন পিঠে করো না গো। বাস, বউয়ের পিঠে উঠে বসল নুরজাহান—লেক রোডের হাজার স্কোয়ার ফুট মোজায়েক ক্রোয়ের মালিক হয়ে তুমি পিঠে থাকবে! পিঠেপুলি কুলিরা খায়। তোমায় ববং আমি উটের মাংসের বরফ খাওয়াব। ইন্দিরা করে করে সঞ্জয়কে খাওয়াত।

—এই পড়ে থাকার বয়সে উটের টেংরি কি আমার সহ্য হবে গো?

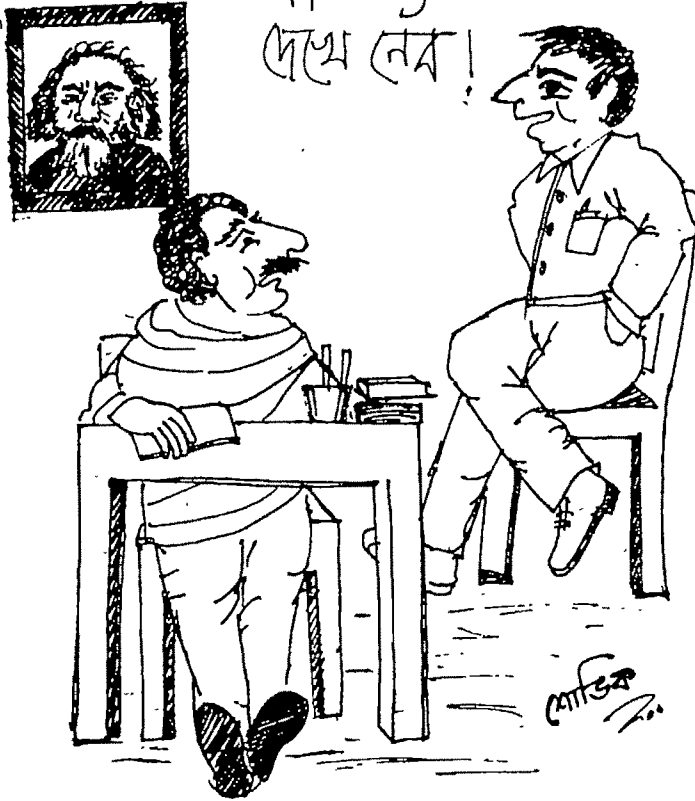
—উঠে দৌড়তেই হবে তোমাকে। ছেলে তো আলাস্লাম—গণপ্রজাতন্ত্রী এস্কিমোতে। কে তোমায় টেনে নিয়ে যাবে? শেষ নিশ্বাস ছাড়ার আগে নাক চেপে ছুটবে শ্মশানে। ঘরে পড়ে থাকলে ‘পল্যুশান’—এ পড়ে যাব। জলকবের ওপর আবার জঞ্জালকর জুড়বে।

—কেন, ছেলে তো স্নেজগাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে। ডেডবন্ডি স্নেজে চাপিয়ে বৃকের ওপর একশো ব্রিটানিয়া ছড়িয়ে চু চু করে সবকটাকে ডেকে নেবে। জানো তো, স্নেজগাড়ি কুকুরে টানে। আর বড় ঠোঙায় এক কেজি লেডো নিয়ে ছড়াতে ছড়াতে শ্মশান পর্যন্ত একজনকে যেতে হবে। শীতের সময় রাষ্ট্রায় জোড়াকুকুর পাবে। কষ্ট করে শুধু স্নেজের সঙ্গে জুড়ে দেবে। এদিকেরটা টানলে নিমন্তলা, ওদিকেরটা টানলে ক্যাণ্ডাতলা।

বই-ঠগী গল্প

পিনাকী ভাদুড়ী

দাম ক্রাপিটিল? টিভিতে
দেখে নেব!



বইমেলায় যদি সময় করে গিয়ে এবং সময় করে নিয়ে একটু বই নিয়ে নাড়াচাড়া করেন তাহলে আপনি বাংলা সাহিত্যের এখনকার মোদা কথাটা বুঝতে পারবেন। বুঝবেন কেন সাহিত্য এখন বোঝাই যায় না, বরং বোঝা মনে হয়। অবশ্য সাহিত্যের তাতে কিছু যায় আসে না। কারণ কেউই তো অপরিহার্য নয়। কেউ না থাকলেও চলে। কেউ চলে গেলেও চলতে বাধা হয় না।

বইমেলায় বই আছে প্রচুর। প্রকাশক আছে তো বটেই, দপ্তরী আছে, ইলাস্ট্রেটর, কার্টুনিস্টও আছে, এমনকি খুঁজলে এক-আধটা ফ্রেতাও মিলবে। কেবল দুটি প্রাণীর অভাব। সে দুটি হল সাহিত্যিক

ও পাঠক। তাও অসুবিধে হচ্ছে না। ও দু'জনের কাজ করছে লেখক এবং ফ্রেতা।

আজকের বই যারা লেখে তারা কেউই সাহিত্যিক নয়, লেখক মাত্র। যেমন কেউ হিসেব লেখে, সেভাবে কেউ কেউ বইও লেখে। বাজারের হিসেবে যেমন রোজ আলু পটল, উচ্ছে মুলো কিনতে হয়, বাজারের বইতেও তেমনি প্রেম রেপ আদর্শ জোচ্ছুরি এসবের অর্ডার থাকে। এই অর্ডারেই পরপর দেখাতে হয়। মনে রাখতে হয় যে এগুলো সিবিয়াল হবে। সিরিয়াস মুখ করে কথা বলবে সবাই, তাদের সেই সব ভারি ভারি কথা শুনেলে হাসি পাবে সকলের। তবু এদের মার নেই, বরং এরাই মার মার করে চলছে।

গভীর প্রবন্ধ বা গভীর উপন্যাস এখন কেউ লেখে না। লিখতে পারে না বলেই লেখে না। সাহিত্য আগে ছিল জীবন, এখন হয়েছে জীবিকা। জীবিকার মতোই এখানে প্রোমোশন পাওয়াটাই লেখকের ইনটেনশন। গল্প ফাঁপিয়ে উপন্যাস, উপন্যাস ফুলিয়ে টি-ভির চ্যানেল, লেখার এখন এই একমাত্র চ্যানেল। যে বই দুম্ করে জমে যায়, আবার দু'মাসেই দমাস্ কবে শেষও হয়ে যায়। দু'বার পড়ার মতো বই কেউ লেখে না। একবারই লেখে, পবেরবার প্রাইজ পায়, তার পরেরবার তাকে সবাই ভুলেও যায়। কাগজের কাপে চা খাওয়ার মতো, খাবার সময় কাপটা চেপে ধরে থাকো, খাওয়া হলেই ফেলে দাও। ও কাপে আব খাওয়া যাবে না, যেমন ও বই আর পড়া যাবে না।

একটা পুরনো গল্প এখানে শোনাই। মফস্বলের একটি ছেলে এসেছে কলকাতায়। গিয়েছে বইপাড়ায়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে বই কেনা-বেচা। দেখতে দেখতে ওনছে কাউন্টারে সেল্‌সম্যান ক্যাশমেরো কাটতে কাটতে হেঁকে বলছে, 'একখানা গোরা, দু'খানা পথের পাঁচালী, বিশখানা ফাগুন গিয়েছে চলে'। মফস্বলের ছেলেটি বুঝল যে ঐ বিশ-বিক্রি বইটাই বেশ বই। দু'বছর বাদে সে আবার এসেছে কলকাতায়। এবারেও দাঁড়িয়েছে বইপাড়ায়। এবারেও সে কান পেতে আছে কাউন্টারে। এবারে সে শুনল, 'দু'খানা গোরা, তিনখানা পথের পাঁচালী, পঁচিশটা প্রেম এসেছে জীবনে। একটু অবাক হল সে। সেই বিশ-বিক্রি বেশ-বেশ বইটা কোথায় গেল? তাহলে কি ঐ প্রেম এসেছে জীবনে বইটাই...? সে বিশ বাঁও জলে পড়ল। তবে একটু ডাবতেই বুঝতে পারল সে যে, হট্ কবে যারা বিক্রি হয়, তারা চট্ করে ফুরিয়েও যায়। থাকে ঐ চিরকালের এক-দু'খানা বিক্রি বই। থেকে যায়। সাহিত্যিক আর লেখকের তফাৎও সে বুঝতে পারল এখন।

এখ তার বইকে পান্না দিতে হচ্ছে

কম্পিউটারের সঙ্গে। সেখানেই এখন বই পড়ে ফেলা যায়। শুধু তাই নয়, সেখানে অনেক সার্জাতে হয়। দেখেই মনে হবে, কী সুন্দর গেট-আপ। ভেতরে অবশ্য ফল্লি সব। Get upয়ের পরেই Sit down.

তাছাড়া বই পড়ার দবকারই বা কি আর? টিভিতেই তো সব জানা হয়ে যাচ্ছে। বামায়ণ মহাভারত তো ওখানেই দেখলাম। কী সুন্দর ছবি। বাকল পরা মেয়েদের দেখা হয়ে গেল, যারা সে যুগেও এ যুগের হুজুগমতোই সাজত। আর যুদ্ধে, দৃশ্যগুলো? মনে হচ্ছে যেন এখনকার গ্রান্সফ ওয়ারের লাইভ কভারেজ দেখছি। বই পড়ে কি এসব পাওয়া যেত? রবীন্দ্রনাথ শব্দচন্দ্রকে তো এইবকম সিরিয়ালেই Burial দেওয়া হয়েছে। দেবদুতেরা যেখানে যেতে পারেন না, সেখানে Fools rush in—TV তাই এত বিউটিফুল। কে যেন বলেছিল, Marx-য়ের Das Capital পড়েছ? তাকে বললাম—না, টিভিতে দেখে নেব। ওরা নিশ্চয় তুলবে ওটা?

তবু বইমেলা হয় প্রতিবার হয়, প্রতিবারই যেমন শীতকালে সার্কাস হয়, তেমনই। প্রতিবার যাই এবং প্রতিবারেই ভুলে যাই। একটা বেড়াবার জায়গা তো হয়। বান্ধবীকে নিয়ে যদি যাই, তখন কেমন জ্ঞান দেওয়ার ইচ্ছে জাগে। তাতে প্রেম বেড়েও যেতে পারে। দু'জনে মিলে স্টলে স্টলে বেড়াই, কোথাও Stalled হই না—শেষপর্যন্ত দু'জনে বেঠোঁরাই বসি। বই না কিনে খাবার কিনি। কেনার মতো বই কোথায়? সেই ভদ্রমহিলাব গল্পটা মনে করুন, কেমন করণ যেন। তাঁর স্বামী বড় ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট। সব জিনিসই ঘুরেফিরে তাঁর বাড়িতেই ফিরে ফিরে আসে। কিছুবই অভাব নেই। দোকানে গিয়ে তাই ভদ্রমহিলা কিছুই ঠিক করে উঠতে পারেন না। ওঁকে যা-ই দেখানো হয়, উনি বলেন, 'এ তো ওঁব আছে একটা।' যত রকম গ্যাজেট, যত রকম মডেল, যত বকম বন্ধুকে তক্তকে চমকে দেওয়া জিনিসপত্র, সব দেখিয়েছে দোকানি, কিন্তু সবই তো 'ওঁর আছে একটা'। উপহার দেওয়া যাবে না তাহলে? ক্লাস্ত দোকানি শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়েও একটা নতুন বই বার করে আনল, 'এই বইটা দিন'। মহিলা আরো হতাশ গলায় বললেন, 'বই? সে-ও তো ওঁব একটা আছে।'

ঠিক কথা। একটা বই তো আমাদের সকলেরই ছিল। বর্ণপরিচয়। অক্ষরের বর্ণনায় পরিচয়ের সহজ পাঠ। তা থেকেই শুরু তাতেই শেষ। সব বইতে ওই কটাই বর্ণ। বর্ণে বর্ণে সত্যি সেই সব বই।

কিন্তু আমি যে বোকার মতো এত বই জড়ো করেছিলাম বাড়িতে তার কী হবে? বই মেলায় বাজার নিয়ে বসব ওই বইগুলোর? নীলামের মতো যা পাওয়া যায়? নাকি বিলিয়ে দেব একে, ওকে, তাকে? তা-ও কেউ নেবে না। কে নেবে বই? লোকে ক্লাসিক কেনার জন্য লাইন দেয়, পড়ে না এক লাইনও। শুধু সাজিয়ে বাঁধে। ইনটিবিযাব ডেকোরেশনে যে বই লাগে তা দেয়ালের মাপে নিয়ে আসতে হয়। শেকসপীয়ার সেখানে দরকার না-ও হতে পারে। তবে Sex Appear যাতে আছে, সেগুলো আলমাবির কোনায় গুঁজে রাখবে সবাই।

তবু লোকে এখানে এসে। তাই প্রকাশকেরাও আসে। মেলায় যেমন পাঁপড়াজা খায়, রগরণে এলভাজা, এখানেও তেমন বইই বিক্রি হয়, যা পবেব মাসে পুবনো খবরের কাগজের সঙ্গে বেচে দেওয়া যাবে।

আসলে সব ভালো জিনিসের মতোই ভালো বইও কম লেখা হয়। একটা বই কিনলে আবেকটা বই ফাউ দিয়েও সামলানো যাচ্ছে না তাই। কারণ ফাউটাও তো বাড়ির জায়গা আটকে রাখছে। টুথপেস্ট ফাউ দিলে লোকে নেবে কারণ সেটা কাজে লাগবে, জায়গা জুড়বে না। বই টুথপেস্ট নয়, টুথপেস্ট। কিন্তু টুথ তো কেউ চায় না, সকলেই ফিক্শন চায়। তাহলে বইয়ের কি হবে? মেলাই সাজান আর বাড়িই সাজান বই নিয়ে, তবু বই কি একটা সাজা হয়ে দাঁড়াচ্ছে?

ঠিক তা নয়। বইমেলায় একটা গুণ তো আছেই। এখানে আসতে আসতে যদি আপনার পড়ার নেশা হয়ে যায়, তাহলে আপনি অন্য নেশায় পড়বেন না। 'মরা মরা' বলতে 'রাম রাম' এসে যাবে। দস্যু রত্নাকর লিখে ফেলবেন রামায়ণ।

বইয়ের নেশার একটা গল্প শুনিতে শেষ করি। এক অধ্যাপকের বইয়ের নেশা ছিল। তিনি বই নিয়েই থাকতেন, বইয়ের দিকে তাকাতেন না। বই নিরাশ হয়ে-মায়ের কাছে প্রার্থনা করল, 'মা সামনের জন্মে বই করে পাঠাস মা। তাহলে যদি স্বামীর নজবে পড়ি।'

সেই প্রার্থনা মা শুনলেন কিনা জানি না, স্বামী শুনলেন। তিনি সংযোজন জুড়ে বললেন, 'মা যদি বই করেই পাঠাবি তবে পাঁজি, কবে পাঠাস। যাতে বছর বছর বদলাতে পারি।'

এবপর কোনো পাঠিকা কি আর যাবেন বইমেলায়? ওইজন্যই ক্লি পাঠিকাদের বই পড়ার সুনাম নেই?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের GITANJALI (SONG OFFERINGS)

এবং

গীতাঞ্জলি

(SONG OFFERINGS) এর ইংরাজী ১০৩ টি ও বাংলা ১০৩ টি গান ছাড়াও বাংলা গীতাঞ্জলির বাকি ১০৪ টি গান সহ একটি পূর্ণাঙ্গ প্রকাশন।

চিরন্তন গল্পমালা

(কাবুলিওয়াল, খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, পোস্টমাস্টার, সম্পত্তি-সমর্পণ, গিন্নি, ছুটি ও ইচ্ছাপূরণ - একত্রে একটি বই)

নজরুল ইসলামের

ঘুমপাড়ানি মাসিপিঁসি

(ছড়া ১ম ও ২য় খণ্ড)

সুজিতনাগ সম্পাদিত

সোনালি দিনের গল্প

পৃথ্বীরাজ সেনের

যারা থাকে সাগরে

বারো ভূত অদ্ভুত

দুলান চন্দ্র দত্তের

গল্পের ফুলঝুরি

রং মশাল

পীযুষকান্তি রায়ের

মুন্সী প্রেমচাঁদের শ্রেষ্ঠ গল্প

১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড

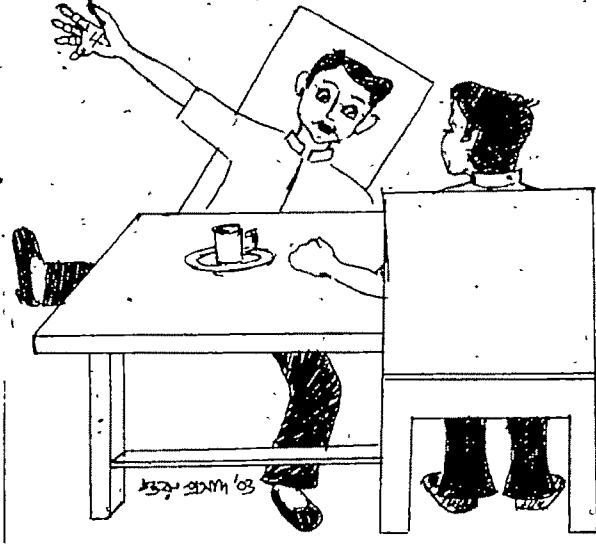
সম্প্রদর্শী গল্প সংকলন

আলো ঘোষের

রান্না রান্না

মোহন লাইব্রেরী টেল নং-এস ১৭৯

৩৫৫ সূর্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৯, কোণ : ২০৫০-০৬০০



ঠাট্টা

সনৎকুমার মিত্র

অমল ॥ আয় দিব্যেন্দু, বোস। তোর জন্যে সেই সাড়ে পাঁচটা থেকে এই বোস কেবিনে বসে আছি। আজ তোর সঙ্গে একটা হেস্টনেস্ট না করে উঠছি না।

দিব্যেন্দু ॥ কেন? কী করেছি আমি?

অমল ॥ তুই আমার সর্বনাশ করেছিস। আবার জিজ্ঞাসা করছিস, কী করেছি? দিব্যেন্দু ॥ কী বলছিস অমল? আমি তোর সর্বনাশ করেছি? খুঃ! তুই আমার সব থেকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমি তোর সর্বনাশ করতে পারি?

অমল ॥ করিসনি? তুই গতকাল আমার বৌকে ফোন করিসনি?

দিব্যেন্দু ॥ হ্যাঁ—তোর বৌকে ফোন করেছি। কিন্তু প্রেম নিবেদন করিনি তো? সম্মান দিয়ে কথা বলেছি। বৌদি বলে কথা বলেছি।

অমল ॥ বৌদি বলে কথা বলেছিস! কিন্তু কী কথা বলেছিস?

দিব্যেন্দু ॥ সত্যি বলছি, কোনো অশ্লীল কথা বলিনি। কোনো খারাপ কথা বলিনি।

অমল ॥ খারাপ কথা বলিসনি? তুই বলিসনি—অমল আজকাল খুব বেশি চা খাচ্ছে?

দিব্যেন্দু ॥ চা? হা-হা-হা। হ্যাঁ তা বলেছি। ঠাট্টা করে বলেছি, অমল আজকাল খুব চা খাচ্ছে। তাতে কী হয়েছে? এটা কি খুব খারাপ কথা?

অমল ॥ দ্যাখ দিব্যেন্দু, তুই ন্যাকা সাজিস না। তুই বুঝতে পারছিস না তুই আমার কত বড় সর্বনাশ করেছিস। আমি খুব চা খাচ্ছি। তাব ফলে আমার ষ্টিদে কমে যাবে, অস্থল হবে, শরীর খারাপ হবে। সুতরাং আমার বৌ আজ আমার পকেটে মাত্র চার টাকা রেখে বাকি টাকা নিয়ে নিয়েছে। বলেছে, যতক্ষণ খুশি গল্প করো। কিন্তু দু'কাপের বেশি চা খাবে না। —এখানে এসে তোব জন্যে বসে থাকতে থাকতে এক কাপ চা খেয়ে ফেলেছি। সুতরাং এবার তুই চায়ের অর্ডার দিবি। দামও তুই দিবি।

দিব্যেন্দু ॥ ওঃ, এই কথা? ঠিক আছে, আমিই চায়ের দাম দেব। আর কোনো সমস্যা নেই তো তাহলে? ঠাট্টা যখন আমি করেছি, জরিমানা আমিই দেব। সারাদিন তো সংসারের চাকায় ঘুরপাক খাচ্ছি। বিকেলে চায়ের দোকানে এই আড্ডা হচ্ছে আমাদের গ্রাণ। ঠিক কি না বল?

অমল ॥ তা ঠিক। কিন্তু দিব্যেন্দু, তুই এটা হালকা ভাবে নিচ্ছিস কেন? তুই বুঝতে পারছিস না আমার আর্থিক স্বাধীনতা তুই শেষ করে দিয়েছিস? হচ্ছে হলে আগে কোনোদিন একটা কাটলেট খেতাম, অথবা একটা মোগলাই পরোটা খেতাম, তোকেও খাওয়াতাম। এখন সে-ওড়ো বালি। মাত্র এই চার টাকা পকেটে নিয়ে আসতে ভালো লাগে? বল?

দিব্যেন্দু ॥ ঠিক আছে, ঠিক আছে। তোকে ভাবতে হবে না। আমার পকেটে তো টাকা আছে। আমি তোকে কাটলেট আর চা খাওয়াব। কী, খুশি তো?

অমল ॥ বল, সব শুনে তুই রাগ করবি না। আমিও অবশ্য ঠাট্টা করেই বলেছি।

দিব্যেন্দু ॥ কী বলেছিস? কাকে বলেছিস?

অমল ॥ বল, তুই রাগ করবি না। আমি দিবি কেটে বলতে পারি, আমি ঠাট্টা করেই বলেছি। শেষ ঠাট্টা।

দিব্যেন্দু ॥ আঃ বলবি তো ঠাট্টাটা কী? কাকে বলেছিস? আচ্ছা, বেশ, কথা দিচ্ছি—আমি রাগ করব না। তুই সব খুলে বল।

অমল ॥ আমি তোর বৌকে আজ ফোন করে বলেছি.....

দিব্যেন্দু ॥ অ্যা—আমার বৌকে? তুই তো জানিস ও খুব সরল মানুষ। তা তুই ওকে কী বললি?

অমল ॥ আমি ভাই, সত্যি বলছি, তখন আমার মাথার ঠিক ছিল না। আমার বৌ যখন তোর ফোনের কথা বলে, খুব কান্নাকাটি করে আমাকে মাত্র চারটি টাকা দিল, আমি তখন রাগের মাথায় তোর বৌকে ফোন করে বলেছি...ইস্ কী ভুল যে করেছি!

দিব্যেন্দু ॥ ওরে কী বলেছিস বল?

অমল ॥ আমার এখন চুল ছিঁড়তে হচ্ছে করছে। ছি ছি, এ কী করলাম?

দিব্যেন্দু ॥ আঃ বলবি তো কী বলেছিস?

অমল ॥ বলছি ভাই, সব বলছি। আমি বলেছি দিব্যেন্দু আজকাল খুব মদ খাচ্ছে।

দিব্যেন্দু ॥ অ্যা। আমি শুধু তোর বৌকে ঠাট্টা করে চা খাওয়ার কথা বলেছিলাম, তার বদলে তুই আমার বৌকে এত বড় মিথ্যে কথা বলতে পারলি?

অমল ॥ আমিও তো ঠাট্টা করেই বলেছি। শুধু ঠাট্টার মাত্রাটা একটু বেশি কড়া হয়ে গিয়েছে।

দিব্যেন্দু ॥ এর ফলে কি হবে জানিস?

অমল ॥ কী?

দিব্যেন্দু ॥ অশ্রবণ্যা! অম্মুংপাত! এবং এবং তুই তো তবু চারটে টাকা নিয়ে চায়ের দোকানে আসতে পারছিস। আমার তো বাইরে বেরুনোই বন্ধ হয়ে যাবে।

অমল ॥ অ্যা।

দিব্যেন্দু ॥ আর আমাদের দেখা হবে না ভাই। তোকে আজ শেষবারের মতো কাটলেট আর চা খাওয়াব। আগামীকাল থেকে আমি গৃহবন্দী।



পুরুষ মহল

‘গাঁক্ গাঁক্’ বিভাগ

সামলাছেন : উন্মাদন দলপতি

● জ্ঞানেন, বিয়ের সময় আমার বউ কি সুন্দর ছিল দেখতে। কিন্তু এখন মোটা হয়ে গেছে। আমার বউ কি আগের মতো হতে পারে না?
—রামদাস চন্দ, খড়গপুর

□ পারে। যদি আপনার হাত থেকে নিস্তার পায়।

● বিয়ে করা পুণ্য, তবে কি প্রেম করা পাপ?

—অমল ব্যানার্জী, হাবড়া

□ পাপ কিনা জানি না তবে ‘মনস্তাপ’ না কি একটা শব্দ আছে যেন, খাল কেটে সেটা ঢুকে পড়ে।

● ভাই, আপনাকে উদ্ধার করতেই হবে আমাকে আমার ইস্তিরির কাছ থেকে। সকাল থেকে যা কিছু ফাইফরমাশ আমি খাটি। কিন্তু তার বদলে আমার ভাগ্য জোটে লাঞ্ছিত, আরো কত কি। বলতেও লজ্জা করে। এই ইস্তিরি কি বদলানো যেতে পারে না?

—স্বপন দাস, কালিনগর, হুগলী

□ হার্ডওয়ারের দোকানে জিজ্ঞাসা করুন।

● আমার বয়স ৪৬ বছর। আমার স্ত্রী আছে, সন্তানও আছে। কিন্তু আমার মিসেস একটুও রঙ্গ বোঝে না। আমি ভারি ভালোবাসি রঙ্গ-তামাসা করতে। কি করা যায়?

—বিনয় চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনগর, কলকাতা

□ এই বয়সে রঙ্গবাজি না করাই ভালো। আপনার স্ত্রী কোনটা বেশি ব্যবহার করেন—খুস্তি না মুড়োকাটা?

● আমার ডিভোর্স হয়ে গেছে। এরপর কি করা উচিত?

—শ্যামল দাস, কলকাতা-৯

□ আরেকটা ডিভোর্সের বন্দোবস্ত করে একটা বিয়ে করে ফেলো।

● পাগল হবার সহজ উপায় কি?

—রবীন্দ্র মাইতি, কাকদীপ, দঃ ২৪ পরগণা

□ মনের সেলারবোর্ডটা উঠিয়ে দেওয়া। তখন মন যা চাইবে তাই-ই করতে পারবেন। ও পাড়ার বৌদিকে দেখে ইচ্ছে করল—ছুটে গিয়ে একটা চুমু.....আগরওয়ালার ক্যাশবান্টা দেখে মনে হল—টুক করে হাত বাড়িয়ে বড় বাস্তলটা.....বাস, পাগলামি বলতে পাগলামি, একেবারে পাগলামির চূড়ান্ত।

বিধিসম্মত সতকীকরণ : গণধোলাইয়ের জন্য কোম্পানি দায়ী নয়।

● আমার বউ দিব্যি নতুন নতুন প্রেম করে-যাচ্ছে কিন্তু আমাকে পুরোটাই আঁচলে বেঁধে রেখেছে। এ বৈষম্য কেন?

—বিবেক বড়াল, কলকাতা-৭৩

□ নিজের সম্পর্কে তাঁর রায়—স্রমর। আর আপনার সম্পর্কে?—No More.

● উন্মাদনরাবু, আপনার ছবিটি দেখে প্রেমে পড়ে গেছি। উন্মাদিনী প্রায়। একদিন দেখা করবেন?

—সাবর্ণী বসু, ব্যারাকপুর, উঃ ২৪ পরগণা

□ মাত্র একদিনের জন্যে ক্যারেক্টার লুজ করে কী লাভ?

● উন্মাদনদা, আমি মোটেই উন্মাদ নই। তবু কোনো মেয়েকে প্রোপোজ করলে ‘উন্মাদ’ বলে হাসাহাসি করে। কেন বলুন তো? দোষের মধ্যে আমার দাঁত উঁচু, নাকটা খ্যাবড়া, চোখদুটো কুতকুতে আর একটু পেটরোগা, মাথায় চুল কম, গায়ে দাদ। এছাড়া আর কীই বা খুঁত আছে আমার?

—বিশ্বনাথ গড়াই, মুরশিদাবাদ

□ ঠিকই তো, আর কীই বা খুঁত থাকতে পারে!!

● আমি বিবাহিত, সন্তান আছে। তবু প্রেমে হাবুডুবু খেতে খেতে একটা নতুন একজনকে বিয়ে করে ফেলেছি। কপালগুণে রাগারাগি করে তিনিও বাপের বাড়ি। প্রথম বৌ তো সে বাড়ির দরজা অনেকদিনই বন্ধ করে দিয়েছে। নতুনটাও গেল বুঝি। আমি এখন কাকে নিয়ে থাকি?

—অচিন পাত্র, বালিগঞ্জ, কলকাতা

□ সাখটি কি? আপনার লক্ষ্য সাতটি কি? হলে এগোল সম্মুখে, না হলে যান এগোন সম্মুখে, না হলে যান নতুন স্বস্তর বাড়ির দোরে বুক হুকে।

● শুধু লম্বা বিনুনি দেখেই যে মেয়েটিকে ভালোবেসেছিলাম, পুরো ডুব যাওয়ার পর জানতে পারলাম, ওটা তার পরচুলো। এখন না পারছি তাকে ছাড়তে না পারছি কাছে টানতে। নিজের চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে।

—ভবানী ভট্টাচার্য, বাঁকড়া, হাওড়া

□ খুব সাধু ইচ্ছে। সব চুল ওপড়ানো হয়ে গেলে তুমিও একটা পরচুলো বানিয়ে নাও। তারপর, কোন চুলোয় আর যাবে, জয় মা বলে টেকো-টেকি ঢুকে পড়ে সংসারের টেকি-কলসে।



মহিলা ম হল

‘ফিস ফিস’ বিভাগ

পরামর্শ দিচ্ছেন : প্রাণঘাতিনী দেবী

- বি. এ. না বিয়ে—কোনটা বেশি লাভজনক?
—তপিতা দে, সুভাষপন্নী, কলকাতা
- প্রথমটা লাফ-জনক, দ্বিতীয়টা Lough-জনক।
- আমি নারীবাদকে কেন্দ্র করে কবিতা লিখতে চাই। একটু টিপস দেবেন?
—বাসবী দাস, বনছগলি, বরানগর
- কবিতা লিখবে কম, পুরুষের বিরুদ্ধে চেতনাবে বেশি।
- শুনেছি কষ্ট করলে কষ্ট পাওয়া যায়। কিন্তু এত চেষ্টা করেও তো কষ্ট পেলাম না?
—আইভি রায়, বসুনগর, মধ্যমগ্রাম
- কষ্ট কম পড়ছে নাকি? আমাদের যে দুধ দেয় তার নাম কষ্ট, যে বাসন মাজে তার নাম কষ্টের মা, মোড়ের মাথাম আছে কষ্টের চায়ের দোকান..... আরো চাই!
- আমি প্রেমে পড়তে চাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, মোটা বলে কোনো ভ্রমরই এই ফুলে বসে না। কি করব বলুন তো?
—হাসিনা আমেদ, কলকাতা-১৭
- একটু মোটা দাগের প্রেম নিবেদন করতে পারো না? অনেক ভ্রমরই মোটা রাবড়ি, খুড়ি, পাপড়ি ভালোবাসে।
- পশ্চিমের দেশের ছেলেমেয়েরা একে অপরকে যখন খুশি ‘I love you’ বলে। কিন্তু আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা, বিশেষত বাঙালিরা এই একগুচ্ছ শব্দ উচ্চারণ করতে এখনো হেঁচট খাচ্ছে কেন?
—ইভা দে, কলকাতা-৫
- গরিব দেশ তো, লাভের মুখ দেখতে পায় না।
- আমি যতবারই চেষ্টা করি ততবারই আমার পছন্দ হয় না। মানে বলতে চাই, যাকে পছন্দ কবি বা ভালোবাসি সেই আমাকে পছন্দ করে না, আবার যে আমাকে ভালোবাসে আমি তাকে পছন্দ কবি না। কী করা যায়?
—রাশি ঘোষ, মালদা
- যাকে পছন্দ করো তাকে অপছন্দ করতে শুরু করো। তখন যাকে অপছন্দ করো তাকে পছন্দ হয়ে যাবে। তারপর হাম-তুম!
- আমি একজনকে ভালোবাসতাম, কিন্তু সে অন্য একটি মেয়েকে

ভালোবাসে। আবার ঐ মেয়েটি অন্য একটি ছেলের প্রতি আসক্ত। আবার ঐ ছেলেটি আমাকে ভালোবাসে, আমি আবার তাকে পছন্দ করি না। এই প্রেমচক্রের কি কোনো সমাধান হতে পারে?

—অনন্যা গড়াই, কলকাতা-৪৪

□ পারে। চারজনেই পুরনো ছেড়ে একটা করে নতুন জুটিয়ে নাও।

● আমাদের পাশের বাড়িতে একটি মেয়েকে কেন্দ্র করে পিতা-পুত্র-পৌত্র—এই তিনজনের মধ্যে দারুণ মারামারি, ঝগড়া, রেবারেঘি। এদের চিৎকারে আমরা অতিষ্ঠ। তিনজনেরই শর্ত—তারা ঐ মেয়েটিকে বিয়ে করবে। কী করলে এদের চিৎকার থামবে এবং আমরাও একটু শান্তি পাব?

—মণিকা দাস, কালিনগর, হুগলী

□ একটি ভালো পাত্র দেখে মেয়েটিকে যমের বাড়ি, না না, স্বপ্নের বাড়ি পাঠিয়ে দাও।

● একটা প্রবাদ আছে ‘দিল্লির লাড্ডু যে খায় সেও আফশোষ করে যে খায় না সেও আফশোষ করে। একটা নমুনা দিন।

—আরতি মুর্মু, মেদিনীপুর

□ বিয়ে।

● শিবপূজা করলে নাকি শিবের মতো বর পাওয়া যায়। তাই নাকি মেয়েদের, বিশেষত আইবুড়ো মেয়েদের করা উচিত এই পূজো। কিন্তু শিব তো মাতাল। তবে কি মাতাল বরই আমাদের আদর্শ।

—শিখা সাহু, কলকাতা-১৮

□ নেশা করে। কিন্তু শিব যে মাতাল হয় তার প্রমাণ কি? পুলিশ কি কখনো লক আপে পুরতে পেরেছে?

● আদর্শ বা বরের উদাহরণ দিতে পারেন?

—সুস্মিতা দাস, বাঁকুড়া

□ জবর। কিংবা শবব। শববও হতে পারে। নাহলে অবশ্যই বর্বর।

● ‘কি মোহিনী জান বঁধু’... আমাকে তো একেবারে ধরাশায়ী করেছেন। আর কত তীর ছুঁবেন? দয়া করুন, চলুন দু’জনে ভিক্টোরিয়াম হাওয়া খেয়ে আসি।

—বনশ্রী সামুই, পুরুলিয়া

□ কেন, ক্যাণ্ডাতলাও তো ভালো জায়গা—হাওয়া খাওয়ার পক্ষেও বটে, হাওয়া হওয়ার পক্ষেও বটে।

লেখা প্রকাশনীর উপহার

অধ্যা. জিয়াউদ্দিন আহমদ প্রণীত • মুহা. মণিরুজ্জামান অবুদ্দিত

এ. টি. এম. রফিকুল হাসান প্রণীত

বিশ্ব সভ্যতায় ইসলামের প্রভাব ১০০

মুসলিম উৎসব ৪০

মাওলা আশরাফ আলী খান ডিও (কঃ) প্রণীত
হালান্স রুজি ৪০
মাও. আবদুল মাজিদ দরিয়াবাদী রচিত
যিকরে রাসূল ৪০

ড. কাওসার ইয়াজ্ঞাবী রচিত
বড় পীর শায়খ আবদুল কাদের জিলানী (রঃ) ৪৫
শামস বাবী উসমানী রচিত
হিন্দু ধর্মের গোপন কথা ৫০

আবদুল্লাহ মামুদ আরিফ আল মাদ্রাস সম্পাদিত
৫০ জন উচ্চশিক্ষিতা মহিলার ইসলাম গ্রহণ ৩৫
অধ্যক্ষ বুর মরুম্ম খলিলুল্লাহ অবুদ্দিত
আব্বাহর রসূল মুহাম্মাদ (দঃ) ৮০

ডাঃ খন্দকার আবদুল মাদ্রাস প্রণীত কমপিউটার ও আল-কুরআন ৬০, স্মৃত ও বিজ্ঞান ২৫, একশো জন অমুসলিম মনীষীর দৃষ্টিতে আল-কুরআন ২৫ • মাওঃ তারিক আমিল ও শফিউল্লাহ কুরাঈনী প্রণীত কে সে জন? ৫০, মৃত্যুর ওপারে ৩৫ • কাযী মূলাইমাহ মালমাহ মাবসূরপুরী প্রণীত রাহমাতুললিল আলামীন (১, ২ ও ৩ খণ্ড) ৯০, ৯০, ১০০ • মাওঃ আবুল বাশার জিয়াদী প্রণীত ইসলামের সভ্যতার বিশ্ময়কর নিদর্শন (১ ও ২ খণ্ড) প্রতিটি ৩০, কেন মুসলমান হলাম? (১, ২ ও ৩ খণ্ড) ৫৫, ৫০, ৫০, এক নজরে স্মৃতে নববী ২০ • শাব্বি আহমাদ প্রণীত মুসলিম নামকরণ নিয়ম ও রীতি ৬০, মহানবীর মুজিয়া ৬৫ • মাওঃ আশরাফ আলী খান ডিও (রঃ) প্রণীত তালীমুন নিসা ৫০ • আবদুল্লাহ মামুদ আরিফ আল মাদ্রাস প্রণীত ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের ভুল ধারণা ৫০ • মাওঃ আবদুল খালেক প্রণীত ছেরাজুছ ছালেকীন ৮০ • ইমাম গাজ্বালী (রঃ) রচিত এহইয়াও উলুমিদদীন (৬ খণ্ড) প্রতিটি ১০০, আল-মুরশিদুল আমীন ৭৫, মিনহাজুল আবেদীন ৭৫, সিরাতুল মুস্তাকীম ২৫ • মাওঃ আবদুল মালোম বাদভী প্রণীত সাহাবা চরিত ৭০ • মার সৈয়দ আমীর আলী প্রণীত হজরত মুহম্মদ (সঃ) জীবন ও শিক্ষা ৬০ • অধ্যক্ষ বুর মরুম্ম খলিলুল্লাহ অবুদ্দিত ইনজীল বারনাবাস ৮০, গালিবার বাগানের কিছু ফুল (১ ও ২ খণ্ড) ২৫ ও ৩০, সুফী সাধিকা রাবেয়া বাসরী ৪৫ • মাওঃ মাজহারউদ্দীন প্রণীত বেহেশতের নূর ৫০ • ডঃ আ. ফ. ম. আববকর সিদ্দিকী প্রণীত বিপ্লবী মুজাদ্দিদ আহমদ সিরহিন্দী (রঃ) ৭০, আত্মশুদ্ধির পথ নির্দেশ ২৫, স্মরণকালের মরণজয়ী ২০, বাদশাহ আকবরের দীন-ই-ইলাহী ও মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানী (রঃ) ২০ • আবদুল্লাহ আল-মামুদ আল মাদ্রাস প্রণীত সেইংস অব মুহম্মদ (দঃ) ৬৫ • মোহাম্মদ হানীউজ্জামান প্রণীত এক নজরে মুসলিম জাহান ৫০ • এ.টি.এম. রফিকুল হাসান প্রণীত মডার্ন ইসলামীক কুইজ ৪৫ • মুহাঃ মণিরুজ্জামান প্রণীত উপমহাদেশের মুসলমান ১ম : ৮০, ২য় : ৭৫ • ডঃ কাজী দীব মুহাম্মদ প্রণীত মানব জীবন ৫০, জীবন সৌন্দর্য ৫৫ • এম. আকবর আলী প্রণীত আলবেরুগী ৪০, ইবনে সিনা ৩০ • মাওলাবা আবদুল কাইউম অবুদ্দিত কুরআন-হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী ৪০, নামাজ শিক্ষা চিরস্থায়ী সময়সূচী সহ ১০, মহানবীর দেহাকৃতি ২৫ • মুহাম্মদ ইব্রাহিম মুহাম্মদ জাযারী (রঃ) প্রণীত হিসনে হাসীন ৬৫ • মুফতী মাওঃ আবদুল রউফ প্রণীত জাহান্নামের ছয় রমণী ২০ • আবুল আবসার মোঃ আবদুল কাহহার সিদ্দিকী প্রণীত আশেকে নবী ২০ • আলহাজ্ব আবুল কালাম মল্লিক সংকলিত হাদীসে রাসূল ২০ • মোহাম্মদ আবীস আলী প্রণীত হাদীসের কাহিনী ২৫ • এম. এম. জুফরুদ্দিন আহমদ প্রণীত ইসলামে মরমী প্রবণতা ৪০ • মোঃ ফজলুল আদ্বি রায়াকালোবী প্রণীত মুক্তি সোপান ১৫, আখলাকে মোস্তাফা ও দু'আ শিক্ষা ২০, সোনালী জীবন ২৫, রমযানের অবদান ১৫, মহানবীর দরবারে শয়তান ২০, ইহলোকের অন্তরালে ৩০, ইসলামের আলো ২০ • মাওলাবা আবুল কালাম আজাদ প্রণীত মৃত্যুর দুয়ারে মানবতা ৪০ • মুহা. বুলুৎ ইসলাম প্রণীত পৃথিবী নয় সূর্য ঘোরে ৪০ • মোজাম্মেল রক প্রণীত তাপস কাহিনী ২০ • ডি. বালেশারা প্রণীত জেগে থাকি সপ্তসূরে ১২০ • গৌরী দাস ও রেহাবা মুরমুদ প্রণীত নানা স্বাদের রান্না ও জলখাবার ২৫ • শেখ আজিবুল রক প্রণীত কাজী নজরুল ইসলাম ও বাংলা সাহিত্য ১২০ • সেকন্দার আলী দৈশ সম্পাদিত ভারতীয় কিশোর গল্প ৪০ • মুহাঃ মণিরুজ্জামান প্রণীত ইসলামী বিশ্বের কিসসা ৩০ • সাহাবা পাবলিক প্রণীত দাম্পত্য সুখের সন্ধানে ৩৫

♦ মোহ. মামুদ কাদী প্রণীত প্রথম পরিবার হযরত আদম ও বিবি হাওয়া (আ.) ২০, মহাপ্রেমিক মুসা (আ.) ৩০, চিশতী চেরাগের রোশনী ২০, আলোকময় দম্পতির খোঁজে ২৫ • মোহ. জুলকারনাইন প্রণীত হযরত নূহ (আ.) ও মহাপ্রাণ ২০, দু'জন নবী যারা বাদশাহ ছিলেন ২৫ • বুলবুল আজাদ প্রণীত জাতির পিতা ইবরাহীম (আ.) ২৫, হযরত ঈসা (আ.) আবার আসবেন তিনি ২৫ • আবদুল ওহাব খান প্রণীত নবী-নব্বিনী ফাতেমা (রা.) ২৫ • এ. টি. এম. রফিকুল হাসান প্রণীত বিশ্বের শ্রেষ্ঠ তিন মসজিদ ৪০ • মাওলাবা আবুল কালাম আজাদ প্রণীত যে সত্যের মৃত্যু নেই ৭০ • মাওলাবা মুহাম্মদ আশিক ইলাহী বুলুৎ শহরী প্রণীত কিয়ামতের আলামত ২৫ • শাইখ আলী তাবতাজী প্রণীত আলোর দিগন্তে হযরত উমর (রা.) ৩০ • মোহ. মণিরুজ্জামান সংকলিত নবজাতকের সুন্দর ইসলামি নাম ৫০

লেখা প্রকাশনী

প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রয়



৫৭ডি, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩ ফোন : ২২৪১ ৯৭১৮

৫২ বছরে পদার্পণের পর

সংসদের গতি অব্যাহত ...

নতুন নতুন অভিধান,

ছোটদের বই, আকর গ্রন্থ,

সুসম্পাদনায় পুনঃপ্রকাশিত চিরায়ত রচনা ...

শুধুই বেড়ে চলেছে তার নতুন প্রকাশনার তালিকা ...



শিশু সাহিত্য সংসদ

সাহিত্য সংসদ



৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৯

ই-মেল : samsad@cal3.vsnl.net.in

ফ্যাক্স : ০০-৯১-৩৩-২৩৬০ ৩৫০৮, ফোন : ২৩৫০ ৭৬৬৬৯/৩১৯৫



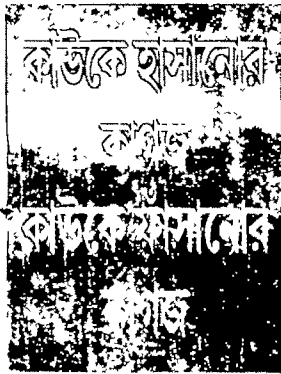
মার্চ ২০০৩

দাম : ৮ টাকা

বিদায় নেবার জন্য নয়

স্বাধীনতা
ওকালোকে কালো
বক্তব্য
একাত্তর
সহৃদয় মাসিকপত্র

৩য় বর্ষ ॥ ৮ম সংখ্যা



সংসার

ঘরে বসে নিয়মিত পত্রপাঠ পেতে হলে গ্রাহক হোন

“পত্রপাঠ” বার্ষিক গ্রাহক টাঁদা ১২০ (একশ কুড়ি-টাকা, ডাকযোগে)। বছরের যে কোনো মাস থেকে এক বছরের জন্যে গ্রাহক হওয়া যায়।

মানি অর্ডার বা ব্যাঙ্ক ড্রাফট PATRAPATH নামে পাঠান এই ঠিকানায়—
PATRAPATH, 10B, 10J, FERN ROAD, (GROUND FLOOR),
KOLKATA - 700 019

সম্পাদকের সঙ্গে ফোনযুদ্ধ করতে চাইলে সকাল দশটার মধ্যে—
2440-3803

যাঁরা পত্রপাঠ পড়তে ভালোবাসেন, যাঁরা চান—পত্রপাঠ বেঁচে থাকুক,
এগিয়ে চলুক, তাঁদেরকে অনুরোধ—আপনারা পত্রপাঠের গ্রাহক হোন আর
উপহার নিয়ে যান পত্রপাঠ নামাঙ্কিত একটি দেওয়াল-ঘড়ি।

বি. দ্র. — আমাদের ঘড়ি আছে কিন্তু ঘোড়া নেই। তাই ঘড়িটি আপনার কাছে
পৌঁছে দেওয়া যাবে না। এসে নিয়ে যেতে হবে নিজেকেই। যাঁরা ডাকযোগে
টাকা কিম্বা ব্যাঙ্ক ড্রাফট পাঠিয়ে গ্রাহক হবেন তাঁদের ঘড়ি সংরক্ষিত থাকবে।
যোগাযোগ করে সময়মতো এসে নিয়ে যাবেন।

যাঁরা ইতিমধ্যেই পত্রপাঠের গ্রাহক হয়েছেন
তাঁদের কাছে অনুরোধ : আপনারা প্রত্যেকে
অন্তত দু’জন পরিচিতকে পত্রপাঠের গ্রাহক করান।

ন্যাকামি

সাদাকে সাদা ও কালোকে কালো বলার একমাত্র সহর্ষ মাসিকপত্র

মার্চ ২০০৩ ॥ ৩য় বর্ষ ॥ ৮ম সংখ্যা

দাম : ৮ টাকা

কাউকে হাসানোর কাগজ
কাউকে ফাঁসানোর কাগজ

পত্রপাঠ

বিদায় নেবার জন্য নয়

পুরনো কাসুন্দি : পরশুরামের “প্রেমচক্র” থেকে □ ৮

রসকাব্য : গান রাম্মার সরল রেসিপি • উদয় বন্দ্যোপাধ্যায় □ ১৮ চিল-খায় দুপুর • শ্রবীর মণ্ডল □ ২০ বাংলা বন্ধ-ব্যাকরণ কথা • সৌরেন বসু □ ২৪ দিদি যদি মজী হত • গোপলা বোস □ ৪২

গল্প : সান্তাহুরের শিহবণ • স্বপ্না শুহ □ ১৭ খাত্তীপান্না নার্সিংহোম • ওম্বিকা গুপ্তা □ ৪৫

নিয়মিত কলাম : অকপটে : নেকু বনাম ন্যাকামি • সমরেশ মজুমদার □ ১৫ তারাপদ রায় ও গঙ্গারাম • তারাপদ রায় □ ২৬ চরণ বৈরাগীর ইকড়ি মিকড়ি • হাট-টু-মা(?)টম □ ৪০ ফজল আলির ফাজলামি : ন্যাকামি □ ৫ কড়া ২০০৩ • অমিতাভ সান্যাল □ ১২ হাজার রাজাব বাজার • অলোক বসু □ ৩৩

ন্যাকামি : টীকা নিষ্প্রয়োজন : সব ন্যাকাচণ্ডী • বুনো রামনাথ □ ১৯ “নেকা” মাহাত্ম্য কথা • শ্রী ভর্তৃহরি ভট্ট □ ৩৭

ধারাবাহিক রসোপন্যাস : মারায়ণ • পিনাকীশঙ্কর চৌধুরী □ ২৮

রসগদ্য : সং-খেপে • দিব্যালোচন কলমধারী □ ১১ কোকিলের কা কা • দিব্যান্দু দাস □ ২১

এছাড়া : সঙ্গীত সং-কট • পিনাকী ভাদুড়ী □ ২২ পথিক তুমি কি পথ হাবাইয়াছ • কুটিল কামিনী □ ৪৪

নিয়মিত বিভাগ : সম্পাদকীয় □ ৪ পত্রপাঠ জবাব □ ৬ ট্যাভা চোখে □ ২৩ সিনেমা দুঃসংবাদ □ ২৫ পুরুষ মহল □ ২৭ হেসেল □ ৩৫ রাশি চক্রো □ ৩৬ জবর খবর □ ৪৩ রসকেলি □ ৪৪ পথঘাটের কিসসা □ ৪৯ মহিলা মহল □ ৫০ কার্টুন □ ১৬, ৩৯, ৪৯

প্রচ্ছদের ছবি : গুরুপ্রসাদ দাস

অলঙ্করণ : গুরুপ্রসাদ দাস • সুপর্ণা মণ্ডল • কুটুস

কর্ম সহায়ক : অচিন্ত্য কারক

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী • তারাপদ রায়
• সমরেশ মজুমদার • শঙ্করলাল ভট্টাচার্য

সম্পাদক : শেখর আহমেদ

পরিচালন সমিতি : ডাঃ তুষারকান্তি রায় • প্রদ্যোত কুমার মিত্র •
বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী • অঞ্জনা দত্ত • ডঃ শুভাশিস নিয়োগী •
শচীন মিত্র



শেখর আহমেদ কর্তৃক ১০ জে, ফার্ম রোড (গ্রাউণ্ড ফ্লোর), কলি-১৯ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন : ২৪৪০-৩৮০৩ (সকাল ৮-১০টা, রাতি ১০টার পর)
সম্পাদকীয় দপ্তর : (সন্ধ্যা ৫-৩০ থেকে ৮-৩০) ১০ বি, ফার্ম রোড, কলি-১৯, মুদ্রণ : দেবী সারদা প্রেস, ৩০এ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলি-৯

সম্পাদকীয়



ন্যাকা এবং ন্যাকামি

জ্যামি পাকামি ধাষ্টামি—সবার শিরোমণি হইল ন্যাকামি। ধনধান্যে না হউক, ‘ধন্য ন্যাকা’য় আমাদের দেশ ভরিয়া উঠিতেছে। রাজনৈতিক ‘ক’ দাদার অঙ্গুলি হেলনে ধুম করিয়া লাশ পড়িয়া গেল। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে ‘ক’ দাদা ন্যাকা সাজিয়া চোখ কপালে তুলিবেন,—‘আমাদের লোক খুন করিয়াছে? হইতেই পারে না; বিরোধীদের অপপ্রচার।’ তমুক সাহিত্যিক-দাদার নিকট হাতা-খুস্তি-চামচাবন্দ স-উপটোকন বেষ্টিয়াই আছে। উদ্দেশ্য অতীব সাধু—সাহিত্য-শ্রদ্ধে কর্তা হইয়া খ্যাতি এবং কড়ি পকেটস্থ করা, বিখ্যাত পত্রে লেখা প্রকাশ, পুস্তক প্রকাশ, দূরদর্শনে দর্শিত হওয়া—ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রশ্ন করুন।—‘ইস! কী যে বলেন! আমরা দাদাকে শ্রদ্ধা করি।’ আমাদের কবি কাম ধর্মোদার দেশনায়ক সাম্প্রদায়িক কড়াইয়ে কয়েক ‘ডজন’ বিস্ফোরক ফুলুরি ছাড়িয়া আসিয়া বিমুগ্ধ ভাষণে বিগলিত—‘তাঁহাকে সাম্প্রদায়িক বলে কাহার সাধ্য! ইহারা কেই ন্যাকা নহেন, ন্যাকা সাজেন। ন্যাকা আমরা, জনগণমেষ; সব দেখি, সব বুঝি, এবং নিশ্চিত আহার-নিদ্রা-মৈথুনের পর ঘুমাইয়া পড়ি।’

ন্যাকা-সাজিয়েরা থাকিবেন বহাল তবিয়েতেই। কিন্তু ন্যাকাদের মাথার উপর ‘অন্যায় যে সহ্যে’-র যে বিপুল মেঘভার ক্রমশ জমিয়া উঠিতেছে, তাহা অনিবার্য নিয়মে যেদিন ভাঙিয়া পড়িবে, সেদিন ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরও কি রক্ষা করিতে পারিবে? মহান ন্যাকাদিগের চৈতন্য হইবে কবে!!

ফজল আলির ফাজলামি

ন্যাকামি

প্রশ্ন করুন,
স্বাস্থ্য পরিষেবার
এমন বেহাল
অবস্থা কেন?
উত্তর পাবেন :
কেন্দ্রের ভুল
স্বাস্থ্যনীতির
জন্ম।



১৩/০৩

যে যাই বলুন, ন্যাকামির মতো জিনিস হয় না। ন্যাকামি হল পাকামির মাসতুতো বোন। পাকামি যদি হয় আনকালচারড ন্যাকামি তবে সফিসটিকেটেড। ন্যাকামি আছে বলেই সংসার সহনযোগ্য ও বাসযোগ্য হয়ে আছে। দোহাই আপনাদের, ন্যাকামির বিরুদ্ধে নিন্দা-মন্দ করবেন না।

ভাবুন সেই কট্টর কম্যুনিষ্ট নেতাটির কথা। যিনি ঠাকুর-দেবতা কিস্যু মানেন না। কিন্তু ইলেকশনের আগে তাঁর স্ত্রীকে পাঠাতেন কালীঘাটে। পূজো দিতে। মায়ের নির্মাল্য নিয়ে আসতেন স্ত্রী। নেতা মশায় খুশি হতেন। ফাজিল কোনো সাংবাদিক এ সম্পর্কে প্রশ্ন তুললে তিনি অম্মান বদনে বলেছিলেন : ‘আমরা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বাস করি। ব্যক্তি-স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। স্ত্রীর ধর্মবিশ্বাসে তাই হস্তক্ষেপ করি না। এ হল তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার।’ আরে বাপস, কী দারুণ উত্তর! সাংবাদিক তো সাংবাদিক, তার বাপ-ঠাকুরদাঁও স্পিকারটি নট। ন্যাকামি বলে ন্যাকামি, এ হল মার্ক্সীয় ন্যাকামি। এমন ন্যাকামি গুলে খোদ কার্ল মার্ক্সও ভাঙলেন বনে যেতেন।

ন্যাকামি হল কি না ভালোমানুষের মতো অজ্ঞতা, সারল্য বা সাধুতার ভান। পশুতেবা কন, ফারসি ‘নেক’ শব্দ থেকে এসেছে ‘ন্যাকা’। ‘নেক’ শব্দের আদি অর্থ হল খুব ভালো মানুষ অর্থাৎ সাধু পুরুষ। তা বাংলায় তো অর্থটা বেমানাম উঠে গেল। হল কিনা কপট সাধু মানুষ। ন্যাকামি আসলে তো ভালো মানুষের ভান। যেন ভাজা মাছটি উঠে থেকে জানে না। ন্যাকামির মধ্যে থাকে সত্য গোপনের ইচ্ছে। চেষ্টাও রীতিমতো ছলনা বা চাতুরি। একে ডড়ং, ভণ্ডামি, কপটতা, মিথ্যাচার, চালিয়াতি কিংবা শঠতাও বলতে পারেন। ন্যাকামি এক ধরনের ভাওতা বাজি। সোজা কথায় পট্টিবাজি। ন্যাকামি মানেই ভাবের ঘরে চুরি, মনকে চোখ ঠারা।

ন্যাকামির একটি পরিচিত দৃষ্টান্ত স্মরণ করিয়ে দিই : ‘বিড়াল বলে মাছ খাব না, আঁশ ছোঁব না কাশী যাব।’ বিশ্বাস করেছেন কি ঠকেছেন। বিড়ালের আবার ধর্মে মতি।

রামচন্দ্র! রামচন্দ্র! কথায় বলে ‘বিড়াল তপস্বী’। ন্যাকামি, ন্যাকামি, বিত্তদ্ব ন্যাকামি। সেই ছড়াটি মনে আছে? কুকুর বিড়ালকে জিজ্ঞাসা করেছিল :

কাল যে বড় গুনিয়েছিলে

চাটাই চাটাই কথা,

বিচুলির দড়ি গলায় দিয়ে

এখন, যাওয়া হচ্ছে কোথা?

তার উত্তরে বিড়াল ন্যাকামি করে বলেছিল :

পাখি-জুখি খাইনে এখন

ধর্মে দিয়েছি মন,

তুলসির মালা গলায় দিয়ে

যাচ্ছি বৃন্দাবন।

এ হল ‘কাপ’। ‘কাপ’ মানে শুধু তামাশা নয়, ‘কাপ’ শব্দের আর একটি মানে ন্যাকামো। ন্যাকামির যদি কোনো পাঠশালা থাকত, তা হলে বিড়াল হত তার হেড পণ্ডিত।

ন্যাকামিতে বাঙালি সবার সেরা। পশ্চিম বাংলার অর্থমন্ত্রী ফি বছর, ঘাটতিশূন্য বাজেট উপহার দেন। ন্যাকামি। আসলে রাজ্যবাসীকে খোঁকা দেন। শুনেছি খোঁকার দালনা রান্নায় তাঁর হাতমশ আছে। এলাকার হারু কিংবা কেলো মন্ডান মিউনিসিপ্যাল ইলেকশনে দাঁড়িয়ে আপনার আমার দরজায় এসে কড়া নাড়ে : ‘মেসোসোমসাই, আপনার আসিরবাদ চাইতে এলাম। এখন থেকে আপনাদের, সেবা করব, ভাবছি।’ ন্যাকামি। যেন, মিউনিসিপ্যালিটির কাউন্সিলর না হলে জনগণের সেবা করা যায় না। ছেলে বিয়ে করতে যাবার সময় গর্ভধারিণী, জন্মদাতাকে প্রতিশ্রুতি দেয় : ‘মা তোমার জন্যে দাসী আনতে যাচ্ছি।’ ন্যাকামি। তলে তলে মাঝেই বউয়ের দাসী বানানোর ফন্দি আঁটছে ছেলে। নব্বই বছরের বুড়ি বলে : ‘আর গেলেই তো হয়। সংসার মানে তো বিষ। শুধু নাভ-বৌর মুখটা দেখে যাব বলে অপেক্ষা করছি। ন্যাকামি। কৌশলে আরো কিছুদিন টিকে থাকার ইচ্ছে।’

প্রশ্ন করুন, স্কুল কলেজে ঠিকমতো লেখাপড়া হচ্ছে না কেন? উত্তর পাবেন : কেন্দ্রের জনবিরোধী শিক্ষানীতির জন্ম। প্রশ্ন করুন, স্বাস্থ্য পরিষেবার এমন বেহাল অবস্থা কেন? উত্তর পাবেন : কেন্দ্রের ভুল স্বাস্থ্যনীতির জন্ম। প্রশ্ন করুন, রাস্তা-ঘাটের এমন শোচনীয় অবস্থা কেন? উত্তর পাবেন : কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে না বলে। ন্যাকামি, ন্যাকামি, সবই ন্যাকামি।

তা হোক, এই ন্যাকামিটুকুর জন্যেই তো একদল মানুষ দিব্যি করে-কস্মে খাচ্ছে। আর এই বিদ্যেটার প্রসার ঘটছে রমরমিয়ে। ন্যাকামির মধ্যে একধরনের অভিনয় আছে। অভিনয় যত নিপুণ, ন্যাকামি তত সুপার ডুপার। ন্যাকামি তাই শিল্প। মন দিয়ে এই শিল্পের চর্চা করুন। উন্নতি অবধারিত। আল্লা মেহেরবান, ন্যাকামিতে আপনি পাবদর্শী হোন, আপনি দিব্যদৃষ্টি লাভ করুন। ফজল আলির তাতেই দিল খুশ। আসুন, আমরা ন্যাকামির এক স্বপ্নরাজ্য গড়ে তুলি। এস্তেকালের পরও যেন ন্যাকামির বেহেশত -এ আমাদের জায়গা হয়।

পত্রপাঠ জবাব

জবাব দিচ্ছেন : দ্বিতীয় সুগ্রীব



- রাসেল আর রাস্কলের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি?

—জ্ঞানেশ মাইতি, কলকাতা-১৮

- রাসেলের সঙ্গে আপনার পার্থক্যের কথা বলছেন।

- বুদ্ধদেববাবু সব জায়গায় বেশ সক্রিয় হয়ে কর্ম করছেন। কিন্তু আমাদের এলাকায় কোনো উন্নতির সম্ভাবনাই নেই। চোর-ডাকাতের উপদ্রব, বিদ্যুৎ চুরি, বিদ্যুৎ সরবরাহে বিঘ্ন—বুদ্ধদেববাবুর দৃষ্টি পড়ছে না কেন?

—হরেকৃষ্ণ দে, তাহেরপুর

- কলকাতায় বসে তাহেরপুর পর্যন্ত খোদ সৌতম বুদ্ধও কি দেখতে পেতেন?

- ‘সেই সময়’ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসটি পড়ে আমার যেন ঘুম ভেঙেছে। অথচ এমন কেউ নেই যাকে আমি আমার মনের সমস্ত কথা জানাতে পারি অর্থাৎ অনুভূতির কথা জানাতে পারি। আপনার ওখানে যদি কেউ শুনতে আগ্রহী হয় অবশ্যই আমাকে সংবাদ পাঠাবেন।

—শান্তিরানী দাস, বারাসত, উত্তর ২৪পরগণা

- এই চিঠিটি পড়ার পর আমাদের সম্পাদককে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। উকিলের চিঠি পাওয়ার জন্যে তৈরি থাকুন।

- যমরাজকে আমার ভারী পছন্দ। ইস! যদি ইস্টারনেটের মাধ্যমে তাঁকে আমার প্রেমময় বার্তা ১৪ই ফেব্রুয়ারি জানাতে পারতাম। আপনারা ওঁর ই-মেল বা ফোন নম্বরটা জোগাড় করে আমায় একটা খবর দেবেন?

—মৌমিতা দে, নিউ জলপাইগুড়ি

- এত তাড়াতাড়ি যমের বাড়ি যাওয়ার কোনো ইচ্ছেই আমাদের নেই।

- প্রতিবারই ১৪ই ফেব্রুয়ারিতে কিছু উদ্বেজনাপূর্ণ অদ্ভুত ঘটনা ঘটে থাকে। জানতে ইচ্ছুক যে, এবারও কি সেরকম কোনো ঘটনা ঘটেছে?

—মৌমিতা দে, নিউ জলপাইগুড়ি

- ১৪ই ফেব্রুয়ারি কি আপনার আদ্যাত্মকের দিন?

- আমার ঠাকুরদার নাম ছিল দিব্যালোচন, কিন্তু তিনি অন্ধ ছিলেন। আমার বাবার নাম ছিল শ্রবণানন্দ, কিন্তু তিনি শুনতে পেতেন না। আমার নাম গুণধর; আমার নামের সঙ্গে আমার যদিও এখনো অমিল হয়নি, তবুও.....

—গুণধর, কল্লনালোক, কলকাতা-২৭

- কত বড় গুণ করতে পারেন আপনি? কত অঙ্কের? আপনার পুরো নাম কি ‘গুণধর কম্পিউটার’?

- বিয়ের আগে আমি ভীষণ ভালোবাসতাম লাড্ডু খেতে। কিন্তু ইদানীং এ অভ্যাস গেছে। আবার কবে আমি লাড্ডু খেতে ভালোবাসব বলতে পারেন?

—বাবাই সরকার, মেদিনীপুর

- বিয়ের আগে আপনি কি দিল্লিতে থাকতেন?

- নষ্টচন্দ্র ও গবুচন্দ্র—নামদুটির মধ্যে কি কোনো মিল বা অমিল আছে?

—সত্যজিৎ ভট্টাচার্য, বেহালা

- আছে। মিল চম্বে। অমিল বলতে দ্বিতীয়টি, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে আছে; আর প্রথমটি জ্যাক্স; আপনি।

- শুনেছি প্রবাদ-প্রবচনে মাঝে মাঝে বলা হয় ‘ধর্ম না শোনে চোরের

কাহিনী' ও 'ধর্মের কল বাতাসে পড়ে'— এগুলির কোনো দৃষ্টান্ত দেখাতে পারেন?
—সাগরিকা ঘোষ, চড়কডাঙ্গা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

□ কেন পারব না? তবে বলাটা উন্টে হয়েছিল। ধর্ম খুব ধর্ম সহকারেই চোরের কাহিনী শোনে, নরকে ছাঁকা তেলে ভাজবে বলে; বরং চোরই ধর্মের কথা শুনে চায় না। আর ধর্মের কল বাতাসে নড়লেও পড়েনি আজ অন্ধ। যাই হোক, এবার উদাহরণ—ধর্মের কথা আপনি কি শোনে? শুনে এমন উন্টে দেখুন পাশে গেছে' প্রবচন আর আওড়াবেন না।

● একটা গান শুনেছিলাম—'ভালোবাসিব বলে ভালোবাসিনে....'। এই গানের পরের লাইন কী হবে বলতে পারেন?

—কাকলি চৌধুরী, কলকাতা-৬৬

□ 'ভালো হাসিব বলে ভালো হাসি নে'।

● 'আমায় মন দিবে বলে আগে আমার মন নিলে'—এই পর্যন্তই পরের পরিণতি নিয়ে একটা পর্যন্ত বলুন তো?

—সুইটি চক্রবর্তী, কলকাতা-১৮

□ আমায় দাঁত দিবে বলে আগে আমার দাঁত নিলে। (কৃতজ্ঞতা : ডেন্টিস্ট)।

● আমি অহিঁত রয়। চৌরঙ্গিতে থাকি। বিজনেস ম্যানেজমেন্টে ফার্স্টক্লাশ ফার্স্ট। ত্রিশহাজারি চাকরি করি। কামদেবের ঠিকানাটা বলুন তো, ভীষণ আশ্চর্য।
—অহিঁত রয়, কলকাতা-৭০০০০১

□ কামদেব শিকারীর কথা বলছেন? শুধু ঠিকানা কেন, তার সবকিছুই বলে দিতে পারি। সে থাকে সুন্দরবনের রাডাবেলিয়াম। মুখে বসন্তের দাগ। এক চোখ কানা। বাগদা চিরড়ির মীন ধরে। দু-গামলা পাত্তার সঙ্গে কুড়িটা কাঁচালক্ষা আর গুণ্ডা দুই পেঁয়াজ খায়। তার নাক ডাকে বাঘের মতন। আরো বেশি জানতে হলে সোজা চলে যান তার বাড়ি।

● আমি দর্শন নিয়েছি। এর ফলেই কি আমি তর্কে পরাজিত হই না কখনো?
—সোনিয়া চৌধুরী, কলকাতা-৬

□ দর্শন নিলে কেউ পরাজিত হয় না। দর্শন দিলে অবশ্য..... বলা যায় না।

● আমার দুর্ভাগ্য এই যে, আমি কিছুতেই আপনার সাক্ষাৎ পাচ্ছি না। শুধু সাক্ষাৎ কেন, আপনার দূরভাষাবাণীও কি পাচ্ছি?

আমি আমার দোষ-ত্রুটিগুলি সম্পর্কে খুব সচেতন। সুযোগ পেলেই সে সব জানাতে থাকি। (১) আমি Basically অলস। (২) বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে গুটিয়ে থাকি। (৩) রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির পঞ্চাশ সংখ্যক কবিতার সেই পূজকের মতো স্বপ্ন দেখি : একদিন নিশ্চয়ই আমার বাড়ির আনাচে-কানাচে প্রকাশকেরা হামলে পড়বে ও বলবে—ইস, আপনি এতদিন কোথায় লুকিয়ে ছিলেন ভাই? দিন দিন—আপনার সব লেখা আমাদের দিয়ে দিন। বাজারের ফর্দ, চিঠিপত্রও দিতে পারেন। দেখুন না—মাস্তুর এক বছরের মধ্যে কোথায় নিয়ে যাই আপনাকে।

—অমিতাভ সান্যাল, নাগের বাজার, কলকাতা-২৮

□ কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে সেটা বলেনি।—স্বর্গে। স্বর্গে যাওয়ার আগে-আগে মর্গে শুয়ে এমন স্বপ্নই দেখা হয়।

● আপনারা কাইজের প্রচলন করতে পারেন না, যাতে আমরা উত্তর দিয়ে পুরস্কার পেতে পারি?

—অর্ঘ্য দে, মধ্যময়াম

□ পুরস্কার তো আমরা দিই না। নিয়ে থাকি।

● আপনারা ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাসী না অশ্বাসী?

—এমা চট্টোপাধ্যায়, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগণা

□ ধরা না পড়লে বিশ্বাসী, ধরা পড়লেই অশ্বাসী।

● কোন পার্টি ভালো?

—মেহমুদ সেখ, দুর্গাপুর, বর্ধমান

□ ডিনার পার্টি। ককটেল হলে আরো ভালো।

● 'পাতালঘর' ছবিটি খুব ভালো লেগেছে। আপনাদের কেমন মনে হয়?
—তপিতা চট্টোপাধ্যায়, হুগলী

□ পাতালঘরের চেয়ে ভালো নয়।

● কালিদাসের কোন লেখা সবচেয়ে ভালো?

—রাকেশ রায়, দমদম

□ হাতের লেখা।

● অপকর্ম বলতে কী বোঝেন?

—শর্মিলা হালদার, হাওড়া

□ আমরা ছাড়া বাকি সবাই যে যে কর্ম করে।

● ডাকাতি দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। জন্মশিই বেপরোয়া হয়ে উঠছে ওরা। কী মনে করেছে কী?

—পিনাকী রায়, আদুল, হাওড়া

□ ডাকাতদের সঙ্গে আমাদের তেমন ভাবসাব নেই; জিজ্ঞেস করার সুযোগ হয়নি।

● যৌবনে কোন কাজটি কখনো করা উচিত নয়?

—চামেলি সরকার, পুরুলিয়া

□ আত্মহত্যা। করলেই যৌবন চৌপাট।

● আজকাল মোটে হাসতে পারি না। সবাই গোমড়ামুখে বলে। কি করি বলুন তো?

—জগদীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, কাঁদি, মুর্শিদাবাদ

□ আমাকে সঙ্গে রাখতে পারেন। হাসির দরকার পড়লেই কাতুকুতু দিয়ে দেব।

● আমার ব্লাডসুগার আছে জেনে আমার কলিগরা-আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে মিষ্টি, আলু—এইসব খায়। ওদের এই নিষ্ঠুরতার জবাব কিভাবে দেওয়া যায় বলতে পারেন?

—বিনয়কৃষ্ণ ঘোষ, কাঁচরাপাড়া

□ আপনিও ওদের দেখিয়ে দেখিয়ে করলাসেদ্ধ, ইনসুলিন আর মেডিকেল লিভ খান।

● আপনাদের পত্রিকায় পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপন দেওয়া যায়?

—অভিরাম গোস্বামী, নবদ্বীপ, নদীয়া

□ যায়, তবে শুধুই পাত্রীর। কেন না পত্রিকা অফিসে পাত্রদেরই প্রাধান্য বেশি।

● বাজপেয়াজি কি সত্যিই উদার?

—বীথিকা ব্যানার্জী, বদরতলা, কলকাতা

□ উদার কিনা জানি না, তবে অ-দার তো বটেই। বিরোধী দুর্ভাষ কাটাবার চেষ্টার দার পরিস্রাঘটি আর হয়ে ওঠেনি।

একটা অদৃশ্য ক্ষুর চরুর ক'রে মুখমণ্ডল নির্লোম ক'রে দিলে, রইল শুধু দু-পাশে দুটি কচি কচি জুলপি। ছাতাপড়া নড়া দাঁত খটাখট উপড়ে গিয়ে দু-পাটি দন্তরুচিকৌমুদী ফুটে উঠল।

পুরনো কাসুন্দি

পরশুরাম-এর “প্রেমচক্র” থেকে

....‘ঋষিকুমাররা চলে গেল। সমিতা অনেকরূপ ভেবে বললে—দেখ, কন্দর্প বেঁচে থাকতে এই প্রেমচক্রের ঘুরপাক থামবে না। চল, আমরা মহাদেবকে গিয়ে খরি, তিনি আর একবার মদনভঙ্গ্য করুন।

জমিতা খুব হিসেবী। বললে—উহু। পঞ্চশরের ভঙ্গ্য যদি ভুবন-মাঝে ছড়িয়ে পড়ে তবেই চিত্তির, যেখানে সেখানে ব্যাঙের ছাতার মতন প্রেম গজিয়ে উঠবে। একেবারে সাবাড় না করলে নিস্তার নেই।

ভমিতার উপস্থিত বুদ্ধি সব চেয়ে বেশী। সে বললে—সুগবান্! রাহকে ধর, তিনি কপ করে গিলে ফেলুন।

সমিতা আর জমিতা শাফিয়ে উঠে বললে—সেই খাসা হবে। চল এক্ষুনি রাহুর কাছে যাই।

বঙ্কা বললে—ছাই গল্প হচ্ছে। শাস্ত্রের কথা না-হয় মেনে নিলুম যে রাহ একটা গ্রহ, আকাশে থাকে। কিন্তু মেয়েরা তার কাছে যাবে কি ক'রে? যত সব গাঁজাখুরি।

চিরড়ি ধমক দিয়ে বললে—তুমি থাম ছোড়দা। এটা যে সত্য

সে. খোমাল আছে? প'ড়ে যাও মামা।

‘রাহ তখন আকাশে নিরিবিলিতে বসে পাঁজি দেখছিলেন। মেয়েদের দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—

কি চাই? চট ক'রে বলে ফেল, আমার সময় বড় কম।

সমিতা হাতজোড় করে বললে—প্রভু, আমরা প্রেমে পড়েছি।

আমার শুধুই মৃত্যু, তাতে প্রেম হয় না। প্রেম চাও তো ইন্দ্রাদি দেবতার কাছে যাও, তাঁদের ওই ব্যবসা।

সমিতা নিবেদন করলে—প্রভু, আপনাকে

হৃদয় দেব এমন ভাগ্য আমরা করি নি। আমরা মানুষকেই ভালবেসেছি, কিন্তু কন্দর্প সমস্তই ওলটপালট করে দিচ্ছেন। তিনি ধ্বংস না হ'লে আমাদের স্বস্তি নেই। আপনি কৃপা করে তাঁকে গ্রাস করুন।

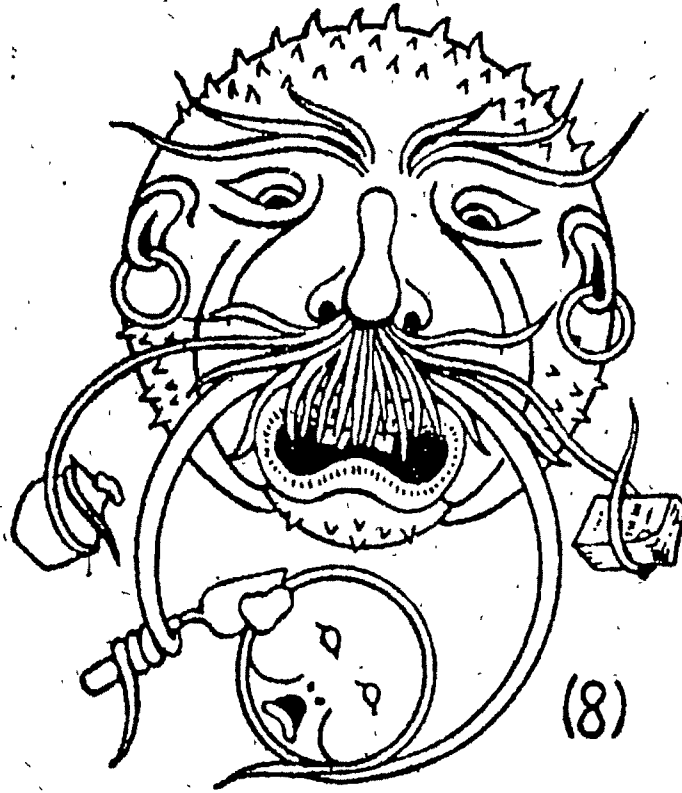
রাহ মাথা নেড়ে বললেন—সইবে না, সইবে না। চাঁদ পর্যন্ত আমার হজম হয় না, গিলতে না গিলতে বেরিয়ে যায়। কন্দর্প খেলে পেট ফাঁপবে।

জমিতা বললে—পেট তো আপনাদের দেখছি না।

রাহ ধমকে বললেন—হাঁ, তুই সব জানিস। আধ্যাত্মিক উদর শুনেছিস? আমার তাই।

জমিতা বললে—প্রভু, তবে আমাদের তিনটিকে ভক্ষণ করুন, বেঁচে আর সুখ নেই।

রাহ একটু বিষণ্ণ হাসি হেসে বললেন—হজমের কি আর শক্তি আছে রে। শুধু লঘুপথ্য খেয়ে বেঁচে আছি। হ'ল একটু চাঁদের আচ্ছা, কাছে আয়, দেখি একটু তোদের গাল চেটে।



রাহ ফিক করে হেসে বললেন—মাইরি? তা আমাকে কেন। আমি শূন্যপথে ধাই, চাঁদ-সূর্যি খাই, প্রেমের আমি কিবা জানি। দেখছ তো,

তমিতা বললে— কি যে বলেন।

—তবে এলি কি করতে? যা এখন পালা, আমার খাবার লগ্ন হ'ল।

রাহু তাঁর লকলকে গোঁপ দিয়ে খপ করে পূর্ণচন্দ্রে ধরলেন, তার পর তাতে একটু মাখন মাখিয়ে কামড় দিলেন। চার নম্বর চিত্র দেখ। মেয়েরা সে করুণ দৃশ্য সইতে পারলে না, ছুটে পালাল।

মহামুনি ঔড়ব হচ্ছেন নৈমিষারণ্যের বড় আশ্রমের কুলপতি। তাঁর দশ হাজার শিষ্য, বিশ হাজার শেণু। যন্তুশালায় রোজ আড়াইশ মণ নীবার ধানের চাল রান্না হয়, আর তিনশ বড়ি উড়ুঘরের তরকারি। ঔড়ব অত্যন্ত রাশভারী ঋষি। আশ্রমবাসীরা তাঁর ভয়ে তটস্থ।

সকালবেলা হারিত জারিত আর লারিত বেনাধ্যয়ন করতে এসেছে। ঔড়ব জলদস্তীরা স্বরে ডাকলেন—হারিত।

—আজ্ঞে।

এসব কি শুনছি? তোমরা নাকি আশ্রমকন্যাসের পিছু পিছু ঘুরে বেড়াও? জান, এটা হচ্ছে তপোবন, ইয়ারকির জায়গা নয়? এখন তোমাদের ব্রহ্মচার্যের সময়, সে খেয়াল আছে?

সভ্যযুগে মিথ্যে কথা লোকে বড় একটা কইত না। হারিত হাতজোড় করে স্বীকার করলে—প্রভু, আমরা অপরাধ করেছি।

তবে প্রায়শ্চিত্ত কর। তিনজনে গোমুখী তীর্থে চলে যাও, নিরস্তর গোসেবা, সদ্যোজাত গোময়আহার, কবোক্ষ গোমুত্র পান, এই ব্যবস্থা। তাতে চিত্তশুদ্ধি পিত্তশুদ্ধি পাপমোচন একযোগে হবে। একটি বৎসর নৈমিষারণ্যের ত্রিসীমানায় এসো না।

হারিত জারিত আর লারিত গুরুদেবের চরণবন্দনা করে বিষম মনে বিদায় হ'ল।

একদিন প্রাতঃকালে কন্দর্প হিমালয়ের পাদদেশে কিম্বরমিথুন শিকার করতে গেছেন। ইতস্তত বিচরণ করতে করতে হঠাৎ তাঁর নজর পড়ল একটা মস্ত উই-টিবি উঁচু হয়ে রয়েছে, তার উপর পোকা বিজবিজ করছে। কেমন সম্ভেদ হ'ল। গোটা দুই বাপের খোঁচা দিতেই পনের ইঞ্চি উই-মাটির স্তর খসে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে ভিতর থেকে মানুষের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শোনা গেল—অহো, কুসুমশর কি দুঃসহ।

কন্দর্প বললেন—ভুগিল মূনির গলা শুনছি না?

বন্দীকের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে ভুগিল বললেন—আমার তপস্যা ভঙ্গ করলে কেন হে? ভয় ক'রে ফেলব।

কন্দর্প বললেন—আরে দাঁড়াও ঠাকুর, এখন গোসা রাখ। বেজায় কাহিল হয়ে গেছ যে। নাও, এই দিব্য মকরমুটুকু খেয়ে ফেল। গায়ে বল পাচ্ছ? বেশ বেশ, আর একটু খাও। তার পর, কিসের জন্য তপস্যা হচ্ছিল?

ভুগিল উত্তর দিলেন—তপস্যা আবার কিসের জন্য করে? মোক্ষলাভের জন্য।

মোক্ষ এখন থাকুক। দিব্যকাস্তি চাও? তপ্তকাঞ্চনবর্ণ চাও? রমণীর মন হরণ করতে চাও?

ভুগিল একটু স্থিধাশস্ত হয়ে বললেন—কিন্তু তপস্যার কি হবে?

তপস্যা এখন থাক না। দিন-কতক ছুটি নাও, ফুটি কর।

ভুগিল ভেবে দেখলেন, এরকম তো অনেক মহামুনিই ক'রে থাকেন, পরাশর বিশ্বামিত্র—ব্যাসদেব। তাতে আর দোষ কি। বললেন—আচ্ছা, রাজী আছি, কিন্তু এক বৎসরের বেশী নয়।

কন্দর্প বললেন—মোটো? বেশ তাই হবে। আমি বর দিচ্ছি, ভুবনমোহন রূপ ধারণ কর। বৎসরান্তে আবার স্বমূর্তি ফিরে পাবে, তখন যত খুশি তপস্যা ক'রো, কেউ বাধা দেবে না।

ভুগিলের আপাদমস্তকে একটা তারুণ্যের প্লাবন ব'য়ে গেল। কাঁচা-পাকা জটাছুট উড়ে গিয়ে মাথায় অমরবিনন্দিত কৃষ্ণ কেশ ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া গজিয়ে উঠল। একটা অদৃশ্য ক্ষুর চরুর ক'রে মুখমণ্ডল নির্লোম ক'রে দিলে, রইল শুধু দু-পাশে দুটি কচি কচি জুলপি। ছাতাপড়া নড়া দাঁত খটাখট উপড়ে গিয়ে দু-পাটি দস্তরুচিকৌমুদী ফুটে উঠল। কটিতে শুভ্র পট্টবাস জড়িয়ে গেল, কাঁধে চড়ল আপীত উত্তরীয়, গলায় মল্লিকার মালা, হাতে মোহন মুরলী, সর্বাস্থে দিব্যকাস্তির পলস্তারা। ভুগিল একটি লক্ষ্য দিয়ে হংকার ছেড়ে বললেন—ভো বিশ্বচরাচর, শৃঙ্খল, আমি আছি, তোমরাও আছ, এইবার দেখে নেব।

কন্দর্প বললেন—অতি পাকা কথা। আচ্ছা, এইবার ওই সুদূর নৈমিষারণ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর।



ভুগিল তাই করলেন। আহ্লাদে আটখানা হয়ে বললেন—আহা, কি দেখলুম!

—কি দেখলে?

—তিনটি পরমাসুন্দরী তরুণী গৌতমীসলিলে স্নান করছে।

—প্রাণে পুলক জাগছে?

—জাগছে।

—হিয়ায় হিল্লোল উঠছে?

—উঠছে।

—চিত্ত চুলবুল করছে?

—করছে।

চিড়ি বললে—‘মামা, এইখানটা ভারী গ্র্যাণ্ড লিখেছি কিন্তু।

—‘হঁই, এখনই হয়েছে কি। পরে দেখবি আরও মধুর, আরও মর্মস্পর্শী। তারপর শোন’।

—কন্দর্প বললেন—ভুগিল।

—আজ্ঞে।

—কোনটিকে পছন্দ হয়?

—ঠিক করতে পারছি না যে।

—আচ্ছা, ওই যেটি তব্বী, দীর্ঘকায়, পদ্মকোরকবর্ণা, রাজহংসীর মতন যার গলা?

—অতি সুন্দর।

—আর যেটি সুমধ্যমা, চম্পকগৌরী, মদমুকুলিতাক্ষী, দোহার গড়ন, টুকটুকে ঠোঁট?

—চমৎকার।

—আর ওই বেঁটেটি? শ্যামাঙ্গী, চঞ্চলা, চকিতমৃগনয়না, বেশ মোটা সোটা টেবো-টেবো গাল?

—ওটিও খাসা।

—ব'লে ফেল কোনটিকে চাও।

—আজ্ঞে তিনটিকেই।

কন্দর্প ভূগিলের পিঠ চাপড়ে বললেন—সাধু ভূগিল, সাধু! তবে আর দেরি করো না, সোজা নৈমিষারণ্যে চলে যাও, গোমতীর তীরে বসে তোমার ওই বাঁশি বাজাও গো।

সমিতা জমিতা আর তমিতা বিকেলবেলা গোমতীর ধারে বসে নৈমিষারণ্যের বিখ্যাত চিড়েভাজা খাচ্ছে। হঠাৎ একটা করুণ বেসুরো বাঁশির আওয়াজ কানে এল। সমিতা এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখতে পেলে, একটা লোক কস্যপ-ঘাটে বসে তাদের দিকে চেয়ে বাঁশি বাজাচ্ছে।

সমিতা বললে—কে ওই তরুণ? আগে তো দেখি নি কখনও।

জমিতা বললে—কেন বাঁশি বাজাচ্ছে কে জানে। কেমন যেন উদাস সুর।

তমিতা বললে—সুন্দর চেহারাটি কিন্তু।

সমিতা বললে—তোর হারিত-দার চেয়েও সুন্দর?।

—কি দেখলে?

—তিনটি পরমাসুন্দরী তরুণী গোতমীসলিলে স্নান করছে।

—প্রাণে পুলক জাগছে?

—জাগছে।

—হিয়াম হিল্লোল উঠছে?

—উঠছে।

জমিতা শুভঙ্গী করে বললে—কি যে বল। হারিদ-দা জারিত-দা লারিত-দার চাইতে বুঝি কারও সুন্দর হ'তে নেই।

মেয়েরা অন্যান্যমুখে হয়ে আড়চোখে দেখতে লাগল।—আচ্ছা চিৎড়ি, আড়চোখে চাওয়া কি রকম করে আঁকতে হয় জানিস?

চিৎড়ি বললে, খুব সোজা। একটা আগুর মতন আঁক। মাথায় ইচ্ছেমত চুল বসাও। কপালে নিরেনকই লেখ, তার নীচে একটা কাত-করা বিসর্গ, তার নীচে একটা পাঁচ। যদি দাঁত দেখাতে চাও তবে চুয়ালিশ বসাও। আর যদি মোনা-লিসার ধরনের নিশুড় হাসি ফোঁটাতে চাও তবে আট লেখ।

বাঃ ঠিক হয়েছে। পাঁচ নম্বর চিত্র দেখ। তারপর শোন—

‘একটি বৎসর দেখতে দেখতে কেটে গেল। হারিত জারিত আর লারিত প্রায়শ্চিত্ত শেষ করে তীরে আশা আর দারুণ উৎকর্ষা নিয়ে নৈমিষার অরণ্যে ফিরে এল। মেয়েদের সংবাদ কি? তারা কি এখনও নিজেদের গৌ বজায় রেখেছে? এই বৎসরব্যাপী বিচ্ছেদের ফলে তারা কি প্রেমের সোজা পথটি খুঁজে পায় নি, মনে একটুও প্রতিদানস্পৃহা জাগে নি? হবেও বা।

কিন্তু খবর যা শুনলে তা মর্মস্পিক। সমিতা জমিতা তমিতা তিনজনেই ভূগিলকে মাল্যদান করেছে। হা রে কন্দর্প, এই কি তোর মনে ছিল? প্রেমচক্রে বৃথাই এতদিন ঘুরপাক খাওয়ালি? হায় হায়, কেন তারা মেয়েদের মতোই সাম দেয়নি, সে তো মন্দের ভাল ছিল। আর মেয়ে তিনটেরও ধন্য রুচি, শেষে কিনা ভূগিল।

হারিত মাথা চাপড়ে বললে—ওঃ, স্ত্রীচরিত্র কি কুটিল। ওদের কিস্‌স বিশ্বাস নেই।

জারিত হাত নেড়ে বললে—একবারে যাস্তেতাই।

লারিত দাড়ি ছিঁড়ে বললে—তিনটি বৎসর নাহক ভুগিয়েছে মশাই।

তিন উদ্দাম প্রেমিক উর্ধ্বশ্বাসে ছুটল ভূগিলের বাড়ি। ব্যাটাকে ঠেঙিয়ে

মনের জালা দূর করতে হবে, তাতে মহামুনি ঔড়ব ভস্মই করুন আর তির্যগ যোনিতেই পাঠান।

ভূগিলের কুতীরে কেউ নেই, শুধু প্রাঙ্গণে একটি আশ্রম-ব্যায়ী তৃণভোজন করছে আর তিনটি হরিণশিশু তার স্তন্য পান করছে। এই ম্লিন্ধ শাস্ত্র আশ্রমসুলভ দৃশ্য দেখে ঋষিকুমারদের হাঁশ হল, অহিংসার কাছে কিছু নেই। হারিত ব্যায়ীটিকে একটু আদর করে সঙ্গীদের বললে—যা হবার তা তো হয়ে গেছে, দেবই সর্বত্র বলবান। কা ভব কান্তা কস্তে পুত্রঃ। মিথ্যা ঋষিহত্যা করে কি হবে, চল আমরা গোমুখী তীরে ফিরে গিয়ে পরমাত্মাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করি।

সংসারে বীতরাগ হয়ে, তারা আবার উত্তর মুখে চলল। কিন্তু দৈবের মতলব অন্য রকম। একটু যেতে না যেতে তারা দেখতে পেলে, বটগাছের তলায় একটি বন্দীকস্থপ, সমিতা আর তমিতা তার উপর ঝাঁটা চালাচ্ছে।

একটি সলজ্জমান হাসি হেসে তমিতা বললে—এই যে, আসুন, নমস্কার। ভাল আছেন তো? কবে এলেন?

হারিত বললে—ভদ্রে, এ কি?

অবনতমস্তকে সমিতা উত্তর দিলে—এই উই-টিপির মধ্যে আছেন। কাল বিকেল পর্যন্ত বেশ স্বাভাবিক অবস্থায় ছিলেন, কত গল্প কত হাসি কত গান। যেমন সূর্যাস্ত হ'ল, অমনি হঠাৎ কেমন একটা কাঁপনি ধরল, আর চেহারাটাও এক মুহূর্তে বিকট কাল মোটা হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মাথায় এক রাশি স্ফটা আর মুখভরা বিল্বী দাড়ি-গোপ। আমরা তো ভয়ে পালিয়ে গেলুম। তার পর খুঁজে খুঁজে পেলুম এই বটতলায় বাহ্যঙ্গান হারিয়ে তপস্যা করছেন। অনেক ডাকাডাকি করতে একবার চোখ মেলে চাইলেন, ধমকে বললেন—খবরদার, ভস্ম করে ফেলব। দেখতে দেখতে সর্বদে উই লেগে মাটির ধুলেপ জমে গেল। দেখুন না, একদিনেই আগা-পাতলা চাপা পড়ে গেছে। আমরা কি আর করি, তিন জনে ঝাঁটা বুলিয়ে উই তাড়াচ্ছি।

হারিত বললে—না না না, অমন কাজও করো না, তাতে ওঁর তপস্যার হানি হবে। উই অত্যন্ত উপকারী প্রাণী, তপস্চর্যার একটি প্রধান অঙ্গ, বাহ্য বিষয় রোধ করে মনকে অন্তর্মুখ করতে অমন আর দুটি নেই।

জারিত বললে—তাছাড়া, উই-মাটি ভেঙে গিয়ে যদি ভিতরে হাওয়া ঢোকে, তবে চটে গিয়ে বিলকুল ভস্ম করে ফেলবেন।

লারিত বললে—ওঃ, কি জোচ্চোর হৃদয়হীন তপস্বী, তিন-তিনটে তরুণীকে ভাসিয়ে দিলে।

তমিতা ঝুঁপিয়ে ঝুঁপিয়ে বললে—ওগো সেই বাঁশিতেই সর্বনাশ করেছে।

জমিতা গদগদ কণ্ঠে ডাকলে—ও হারিদা লারিদা।

হারিত বললে—ভয় কি, আমরা তিন জনেই আছি। ওঁকে আর ঘাঁটিয়ে কাজ নেই, কল্লান্ত পর্যন্ত সমাধিস্থ হয়েই থাকুন। তোমরা আমাদের সঙ্গে হিমালয়ে চল, সেইখানেই আশ্রম নির্মাণ করা যাবে।

—কিন্তু আমরা যে সঙ্গী, হারিত-দা।

—আমরাই কোন্ অসৎ। চল চল, বেলা ব'য়ে যায়।

বন্ধা বললে—থামলে কেন মামা, তার পর?

—তার পর আর নেই। তোর মামী আর লিখতে দেয় নি।

চিৎড়ি বললে—এ মামীর ভারী অন্যায় কিন্তু। সত্যযুগে কী না হ'তে পারে। আচ্ছা, তোমার তো মনে আছে, শেষটা মুখে মুখেই বল না, আমি লিখে নিচ্ছি।

—উহু, একদম গুলিয়ে গেছে, যে তোর মামীর ধমক।

বন্ধা বললে—তোমার মরাল কারেজ কিছু নেই। দাও আমাকে, আমিই শেষ করব।

সং-খেপে

দিব্যলোচন কলমধারী

আমি সপরিবাঃ
রোডে! এখুনি এসে
আপনার ব্যাঃ আর
সাপটার একটা ব্যাঃ
করুন। কি? কি
বলছেন? লাউলি
প্লিঃ—। চিড়িয়াখাঃ?
লালবাজাঃ?
রাইটাঃ? সাউথঃ?
জিওলজিঃ সাঃ অঃ
ইঃ? ইন্টারপোঃ?



সুপার



এক PCO বুথম্যান ও তার কাষ্টমারের কথোপকথন লিপিবদ্ধ হল।
—একটা লোকাল কল করব ভাই।
—করুন, তবে 'হ্যালো', 'ছাড়ছি', 'শুভরাত্রি'—এসব বলবেন না।
—কেন?
—লোডশেডিং চলছে। বুথ চলছে ব্যাটারিতে। ব্যাটারি চলছে কম জলে।
ভাই।
—জল।
—অ্যাসিড-জল। ব্যাটারির তিনভাগ জল, একভাগ শাত।
—পৃথিবীর মতো।
—বিশ্ব একটা ব্যাটারি। এতে নর্থপোল-সাউথপোল, ওতে নেগেটিভ-পজিটিভ।
—তবে পার্থক্য আছে। বিশ্ব গোল, ব্যাটারি চৌকো।
—আপনি দেখেছেন বিশ্ব গোল? স্বচক্ষে?
—ইয়ে—আম্বা না, তবে যারা দেখেছে—

—তাদের চোখ দিয়ে আপনি দেখেছেন, এই তো?
—আম্বা হ্যা।
—আপনার বিয়ের জন্যে আপনারা বাবা-মা মেয়ে দেখেছিল। আপনি তাদের চোখ দিয়ে দেখেছিলেন? নাকি পরে একলা পেয়ে একটু চোখে দেখেছিলেন? ঝাকুম-ঝাকুম করে দেখেছিলেন। গার্জেন কি বলে দিয়েছিল ব্যাডার না করলে রিফিল শুকিয়ে যায়?
—ইয়ে—হ্যাঁ-না- তাহলে ফোন কবি?
—হ্যাঁ, তবে সংক্ষেপে।
নম্বর টিপে কানেকশন পেতেই—
—হ্যা-হ্যা-হ্যা, মাঝেরহাঃ থেকে বনমালী ব্যাঃ বলছি। বুথম্যাঃ ম্যাড। তাই সংক্ষেপে। আপনার দেওয়া ফেংগুঃ ব্যাড ঘরের নর্থ-ইস্টে রেখে যা অনিস্ট হল আমার। কাল রাতে একটা ছঃ ফুঃ কালকেউঃ ঢুকেছিল মশাই। আমি সপরিবাঃ রোডে! এখুনি এসে আপনার ব্যাঃ আর সাপটার একটা ব্যাঃ করুন। কি? কি বলছেন? লাউলি প্লিঃ—। চিড়িয়াখাঃ? লালবাজাঃ? রাইটাঃ? সাউথঃ? জিওলজিঃ সাঃ অঃ ইঃ? ইন্টারপোঃ?
বুথম্যান ছুটে এসে লাইন কেটে দিয়ে—
—আপনি পাগল না পোপু!! একবার ফোন করে ঐ অত জামগা খুঁজছেন? লোকাল বলে ইন্টারপোলে করছেন। জিজ্ঞাবাহিকে খুঁজছেন। চিড়িয়াখানায় করছেন। আবার সাউথ ইণ্ডিয়াম—।
—সাপ ঢুকলে অমনটাই হয় ভাই।
—সাপ—!!!
‘বাবাগো’ ‘মাগো’ চিৎকার সহকারে বুথম্যান অদৃশ্য।

কড়িচা ২০০৩

অমিতাভ সান্যাল

সরকার চালাবার খরচ কম নাকি? একজন মন্ত্রী প্রতিপালন করতে মাসে আড়াই লাখ টাকা সার্ভিস চার্জ, বছর ইয়ারী ফিল্ম উৎসব, আর এইরকম আরো কতগত রকমারি জনকল্যাণ কর্মে বিনিয়োগ।



বাঙলার বাঘিনী এবং অষ্টাদিক মার্গ

এই মুহূর্তে রাজনীতি এক অতি উপাদেয় ব্যবসা। বাম বা ডান, উত্তর বা দক্ষিণ, খগেন বা নগেন কেউই এর ব্যতিক্রম নন। কেউ কেউ বলেন যেমন, চুরি করেছে বেশ করেছে। রাজনীতি ব্যবসায় চুরি করব না তো করব কোথায় শুনি? আর এই ব্যবসায় এসে কেউ ‘সতী’ আছেন নাকি মশাই? সব শ্রী-বা লী আখের গোছাচ্ছে। আরে আপনারা হলেন গিয়ে ‘হস্তিমুখ’। পাবলিক অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে আবেগে আপ্লুত হয়। তারা রং-বেরঙের বোতল দেখেই ভারি খুশি।

অথচ ভেতরের মালে যে ঘুণ ধরেছে, কাকে বোঝাই সে কথা। কে বোঝে সে কথা। শালাদের না আছে গুণ না আছে জ্ঞান।

এই বাংলায় শেষ বাঘ ছিলেন স্যার আশুতোষ। আপনারা সৌদরবনের হাওয়া গায়ে-গতরে মেখে বড় হন বলে বাঘ-বাঘিনীর প্রতি আপনাদের সীমাহীন ঈর্ষি। তা, বিংশ শতাব্দীর শেষে আবার যখন এক বাঘিনীর হস্তার শোনা গেল, পাবলিক পুনরায় আবেগে আপ্লুত হলেন। পটুড়মিকায় যিনি কবি ও ঔপন্যাসিক, গল্পকার ও প্রবন্ধকার উপরন্তু ডক্টর, তিনি যে টালমাটাল ‘বঙ্গ-বজ্রার’ কাণ্ডারী হবার উপযুক্ত, তাতে সন্দেহ কি। ইতিমধ্যে তিনি মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রশাখা স্থাপন করেছেন। সেই প্রশাখা যে কালে কালে এমন

কুলপ্রাবী হবে তা কি ভাবা গিয়েছিল? যেখানে তিনি সেখানে জন-মহাসাগর। জনমোহিনী মূর্তিতে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন। ডান হাতে মাউথপিস আর বাঁ হাতের অবিরাম আপসুইং বা ডাউনটোর্নে তিনি পাবলিককে স্বপ্ন খাইয়ে যান আর পাবলিক গুরুভোজন হেতু কষ্ট লাভ করেন। তবে একথাও সত্যি : ‘দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে?’

এমন সময় ধর্মক্ষেত্রে, কুরুক্ষেত্রের মতো নির্বাচন-ক্ষেত্রে, দেশ-প্রদেশ ক্ষেত্রে দামামা বাজল। এখান থেকেই অষ্টাদিক মার্গচারণা যথাবিহিত শুরু হল। এবার বঙ্গবাঘিনীর অষ্টাদিক মার্গের গল্প শোনাই।

(ক) পাবলিক বিশ্বাস্যাপন্ন হয়ে দেখলেন, বাঘিনীর দল প্রবলভাবে ধর্মনিরপেক্ষ হওয়া সত্ত্বেও তাদের মহাসভাস্থলে গেরুমা পতাকা নিয়ে অনেকেই বসে আর বাঘিনীর প্রচ্ছন্ন প্রশ্নে তাঁরা মাঝে মাঝেই হস্তার দিচ্ছেন।

(খ) নির্বাচন-যুদ্ধ শেষ হলে দেখা গেল যে বাঘিনীর প্রশাখা মূল শাখাকে ধরাশায়ী করেছে। এমনকি বঙ্গভূমিতে যাদের কক্ষে পাবার কথা নয় তারাও দু-দুটো জ্যাকপট পেয়ে আনন্দ আত্মাহারা। মুঘল সম্রাট কি সাথে বলেছিলেন—পুত্র, রাজনীতি বড় জটিল বস্তু।

(গ) অতঃপর তিনি মন্ত্রী হলেন। একদা যে দপ্তর পেয়ে এই বাংলার এক নেতা প্রভূত জনহিতকর কর্ম করে খ্যাতি পেয়েছিলেন বিস্তর, তিনিও পূর্বসূরীর পথ ধরে চলতে চাইলেন। তিনি রেলপথ ধরে এগোলেন।

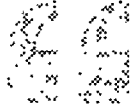
সুসময়ের বাতাস বয় যখন, শোদা মেহেরবান হন। তিনি বহুপ্রার্থিত রেল দপ্তর লাভ করলেন। পূর্বের সিন্ধু বাতাস মুদুমন্দ প্রবাহিত হচ্ছে। শোদ প্রধানমন্ত্রী তাঁর কাশীঘাটের কুটিরে এলেন। মাকে

প্রণাম করলেন। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর আমলে প্রশব মুখুজ্যের যে পোজিশন ছিল, ঋষিভূলা (তপন শিকদার কথিত) অটল বিহারীর আমলে বাঘিনীর মান-মর্যাদা তুল্যমূল্যে সমান বটে।

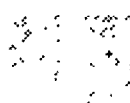
(ঘ) রাজনৈতিক নেতারা চমক দেখাতে ভারি ভালোবাসেন। বাঘিনীর চমক বেশ উঁচু দরের। বারো ভূভূড়ে মন্ত্রীসভায় বেগড়বাঁই দেখলেই রেগে আশুন হয়ে তিনি ইস্তফা দিতে ইতস্তত করেন না আসৌ। অতীতে এভাবে দু-দু'বার ইস্তফা দিয়েছিলেন তিনি আর দু'বারই পিতৃস্থানীয় ও অগ্রজ স্থানীয় সহকর্মীরা তাঁর পিঠে-মাথায় হাত বুলিয়ে কিরিয়ে এনেছিলেন স্বস্থানে। তারপর স্বভূমিতে এসে তাঁর কী স্বকার। আরে, মন্ত্রীত্ব করতে দিল্লি ছুটেছি নাকি? আমার কাছে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ও তাদের কল্যাণ বড় কথা।

(ঙ) হাওয়ালা কাশে যখন দেশ তোলপাড়, বাঘিনীর মনও তোলপাড়। এবার কী করা যায়? তিনি তৃতীয়বার মন্ত্রী ছাড়লেন। পশ্চিমবঙ্গের কথা ভেবে তিনি কংগ্রেসের সাথে গাঁটছাড়া বাঁধলেন, তবে এন ডি এ ছাড়লেন না।

হায়! অতঃপর প্রদেশে তাঁর আকাশিত আসন্ন ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে উল্টে-পাল্টে দেবার কোনো আবেদন গ্রাহ্য হল না। যাঁরা ছিলেন তাঁরাই রয়ে গেলেন। বাঘিনীর প্রশাখায় ঘুপ ধরল। কেউ বিদ্রোহী হল, আবার কেউ বা গোপনে এন ডি এর সাথে সম্পর্ক যথাবিধি বজায় রাখল।



প্রবলভাবে ধর্মনিরপেক্ষ হওয়া সত্ত্বেও
তাদের মহাসভাস্থলে গেরুয়া পতাকা
নিয়ে অনেকেই বসে আর বাঘিনীর প্রচ্ছন্ন
প্রশ্নয়ে তাঁরা মাঝে মাঝেই হুঙ্কার দিচ্ছেন।



(চ) এন ডি এর সাথে সম্পর্ক হার্দ্য করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা রূপে পূর্বরেল ডিভিশন এক অস্বস্তিকর সমস্যা সৃষ্টি করল। বন্ধ হল, ধরনা হল তবু ডিভিশন ঠেকানো গেল না। নীতিশিকুমার তাঁকে গো-হারান হারিয়ে দিলেন। ঘরের শত্রু বিত্তীঘণরা আড়ালে হাসল। এই হয়! জনসেবার যে নানা ঝামেলা। কথায় বলে না,—শ্রোয়সী বহুবিল্লিন।

(ছ) গোখরা কাশ ও গুজরাট জেনোসাইডের মধ্যে যখন বাঘিনীর মন্ত্রীসভায় প্রত্যাবর্তনের সজ্জাবনা উজ্জ্বল হল, তিনি তাঁর আগমার্কা ভাবমূর্তি যথারীতি বজায় রাখতে জানান দিলেন,—নাঃ, যতদিন ত্রাপ শিবিরে আর্ত ও পীড়িতরা রয়েছেন ততদিন তিনি মন্ত্রী হবেন না। তবে নির্বাচনে মোদীর সুফল্যে তিনি তাঁকে বাহবা জানাতে ভুললেন না।

(জ) বঙ্গ-বাঘিনীর বর্তমান অবস্থান বড়ই করুণ। 'একবার সাধিলেই যাইব; রেল বিভাজনের কথা মুখেও আনিব না' জাতীয় মানসিক প্রস্তুতি থাকলেও আর যে তাঁর মাথাম-পিঠে কেউ হাত বুলোয় না। কেউ তো আর বলে না—আর রাগ করতে নেই মা, ফিরে এসো আপন ঘরে। বাঘিনী বুঝছেন, মন্ত্রী ছাড়া আমরা যেন মণিহারী ফনী। কেশপুর আর শেষপুর হল না। হবেও না।

তিনি এখন জলকর, বিদ্যুৎ বিল ইত্যাদি নিয়ে লড়ছেন। ভূপমূল স্তর থেকে তাঁকে আবার শুরু করতে হবে। কথায় বলে না,—কখন শুরু কখন শেষ; কে জানে!

বুদ্ধদেবের সাড়ে-বত্রিশ ভাজা

অতীতে জনৈক সিদ্ধার্থ মানব-কল্যাণে ছটফট করতে করতে একদিন ঘর-সংসার ত্যাগ করে, এমনকি সুন্দরী পত্নী ও সদ্যোজাত শিশুসন্তানের মামা ত্যাগ করে মাঠে-মাঠে গিরি-পর্বতে মাশভূমি ও সমতলভূমি বিস্তার চেষ্টা অতঃপর গয়া শহরে গাছের তলায় বসে যেমন সত্যাশ্রয় করলেন ও বুদ্ধদেব হলেন, এ যুগের বুদ্ধদেব তিতিক্ষা ও ত্যাগের ব্যাপারে কোনোমতেই ন্যূন নন। সে যুগে ছাত্র-ছাত্রী মাঝেই মার্কস বটিকা খেতেন, কেন না ইয়ং ব্লাড গ্যুড বি রেড—এই ছিল আশ্রয়বাক্য। বুদ্ধদেব ক্রমশ মার্কসিস্ট হলেন তবে স্যাড ডেথারিস্ট হলেন না। তিনি বিলক্ষণ জানতেন, নরম মাটিতে স্যাড ডেথারিস্ট হলে কেরিয়ারের কবর অবশ্যিস্ত ভাবে খোঁড়া হয়। মৃত্যু অতঃপর। ঐ আহ্বান কি কমরেড চারু উপেক্ষা করতে পেরেছিলেন? কিম্বা কমরেড কাকার মুখ কতটা বেঁকেছিল—দেখেছিলেন কি?

বুদ্ধদেব যতটা মার্কসিস্ট ততটাই প্রগতিশীলরূপে সাক্ষাতিক। অর্থাৎ তিনি অপসংস্কৃতিক নন। রবীন্দ্রনাথকে পছন্দ না করে উপায় নেই যদিও মানিক বাঁড়ুজ্যে বা সুভাষ মুখুজ্যে তাঁর মতে অনেক বেশি সৃষ্টিশীল। তাহলে জীবনানন্দ, অমিয় চক্রোত্তি বা বিষ্ণু দে? নো কমেন্টস। আর সাম্প্রতিক কালের দেবেশ রায়? আ ফী ডেরিবল।

বুদ্ধদেব কবিতা লিখতেন কিনা জানি না, তবে একখানা নাটক লিখে বুদ্ধিজীবী মহলে শোরগোল ফেলে দিয়েছিলেন। আমরা দেখেছি, যে সব নেতা বা নেত্রী রাজনীতির পাশাপাশি সাহিত্যচর্চা করেন, তাঁরা কালে কালে সেলিব্রেটি হন। প্রসঙ্গত, ওপার বাংলার এইচ এম এরশাদ, এপার বাংলার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ্য। আমরা গান্ধীজি বা নেহেরুজিকে এই তালিকাভুক্ত করলাম না। সঙ্গত কারণেই করা গেল না।

মুখে যতই বলি আমরা যে, ভারতবর্ষ নামে দেশটিতে ত্রিশ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করে বলে এটি উন্নয়নশীল, যদিও বেকার ও জনসংখ্যা বিস্ফোরণ কোনোমতেই হ্রাস করা যাচ্ছে না, এদেশে ফিল্ম নিয়ে মাতামাতি অথবা কেবল টিভির বাড়াবাড়ি সে কথা প্রমাণ করে না। ভারতবর্ষের যে কোনো শহরে কিছু একটা লাগিয়ে দিলেই হল, পাবলিক হুমড়ি খেয়ে পড়বে। অথচ চারখারে এত উপাস্য বস্তু থাকলেও তারা কেন যে হুমড়ি খেতে এত ভালোবাসে বোঝা যায় না। বুদ্ধদেব এই হুমড়ির প্রতি হ্যাংলোমি দেখে কলকাতা ফিল্ম উৎসবের আয়োজন করেছিলেন নাকি দিল্লিকে টেকা দিতে, বোঝা গেল না। তবে একথা বিলক্ষণ বোঝা গেল যে 'বাবা কেন চাকর' অথবা 'টান্কা চেপে আসছে দুলহা ভাই' জাতীয় ছকি নির্মাণে সিদ্ধহস্ত টলিউড এস উৎসবের গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে টু-পাইস কামাবার ব্যবস্থা করে নিয়েছেন।

বুদ্ধদেব নাকি একবার বামফ্রন্টকে ডাগাড়ের শকুন বলেছিলেন, ঠিক যেমন মাও সে তুঙ বলেছিলেন, বুজোয়া পার্লামেন্ট গুয়োরের খোঁয়াড়। আর এতে করে আগ মার্কা মার্কসবাদীরা বিস্তার চটেছিলেন। কেউ কেউ তো তাঁকে মহান পদ্ধতিতে এলিমিনেট করার কথা ভেবেছিলেন। তা, ভেবে হলটা কি। কপালে যার তিলক আঁকা তাকে সরিয়ে দেয় কার সাধ্য। প্রদেশের মানুষ ভারী প্রীত হয়ে প্রত্যক্ষ করলেন, জগৎহরলালের মতো আর এক ঋতুরাজ

সিংহাসনারোহণ করেছেন।

গুরুত্বই চমক। উন্নততর বামফ্রন্টের চমক। পাবলিকের হল গিয়ে প্রলোভিত হয়ে পেরে। সেখানে কি ঘি সময়? তারপর ডাক্তার-মাস্টারদের টাইট দিতে গিয়ে মাস্টারদের উপরি পাওনা বন্ধ করা হল। ডাক্তারদের ঘাড় ধরে বার করে দেবার হুমকি দেওয়া হল। তা ডাক্তাররাও তেমনি। তারা নানা জায়গায় বসে আলু-পেঁয়াজ বেচতে শুরু করলেন। হকার ও জবরদখলকারীরা ছিলেন সরকারের অন্যতম চালিকাশক্তি। তাঁরা কত প্রণামী পাবলী দিয়েছেন, সুখে-দুখে কতকিছুই না জমা করেছেন, এমনকি না চাইতেও—আজ তাঁদের কী দৈন্যদশা!

সে যাক গে। শোষক ও শোষিতের মধ্যে তো পার্থক্য থাকবেই। আলু ও আলুবোখরা, মাছ ও মাছরাঙা, মায়নামার ও ময়নাগুড়ি—এক হয় নাকি? বুদ্ধদেব বুঝিয়ে দিলেন, এ পর্যন্ত যে ভাবে চলেছে বাছারা, পথ পরিবর্তন করতে



হবে। মন্ত্রীতন্ত্র আসলে রাজতন্ত্রের অপভ্রংশ। কথা না শুনেই কোঁৎকা।

সবই তো হল। এবার? এবার শিল্প চাই। ‘বাংলা আবার শিল্পসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।’ বামফ্রন্টের অভ্যন্তরে শিল্পফ্রন্ট গঠিত হল। মন্ত্রীরা বসলেন চেয়ারে; শিল্পপতিরা হাতলে। মন্ত্রীরা চেয়ারে, তো শিল্পপতি টেবিলে। আলোচনা চলল জবর। ইনফোটেক, বায়োটেক, কম্পিউটার, ই-কমার্সের জোয়ার বইতে লাগল। অমর্ত্য সেন মশাই ঘন ঘন, বলতে গেলে ঘন্টায় ঘন্টায় কলকাতায় এসে আলোচনা করতে লাগলেন। (একবার অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত মন্তব্য করেছিলেন—এই হস্তিমুখের সভায় অশিক্ষিতেরা আলো করে থাকেন।) যদি শিক্ষিতরা এই গাড্ডায় পড়েন তবে আর দেখতে হবে না। অজ্ঞান ভিমিরাদ্বয় হবে, জ্ঞানাজ্ঞান শলাকায় দেখা দেবেই না।

বুদ্ধদেবের অধীনস্থ মন্ত্রীরা স্বতন্ত্র, তাই সুন্দর। এখানে একজন অর্থপণ্ডিত রয়েছেন, যিনি নিজের নিয়মে চলেন। তাঁর স্বপ্নের বাজেটে দুঃস্বপ্ন নেই। তা

এবার হল কি, সভয়ে দেখলেন তিনি, রাজকোষের ভাঁড়ে-মা-ডবানী! এখন উপায়? একে তো তাঁকে অনেকই পছন্দ করেন না। তিনি টিভির পর্দায় প্রকাশিত হতে ভালোবাসেন, অন্যের ব্যাপারে অহেতুক নাক গলাতে ভালোবাসেন, গাড়ি থেকে নেমে ট্রাফিক সামলে কাগজের পাতায় খবর হন, মেয়ের সাথে ক্যারারে নাচেন, শুধু নিজের বিষয় খুব ভালো বোঝেন না।

মন্ত্রীসভায় যৌথ দায়িত্বের নীতি কার্যকরী হয়। যেমন অতীতে নিয়ম ছিল, কিং ক্যান ডু নো রং, ইদানীং মুখ্যমন্ত্রীর নেকনজরে থাকলে মিনিস্টার ক্যান ডু নো রং। মন্ত্রীর সীমাবদ্ধতা সামলান মুখ্যমন্ত্রী আর মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ পালন করেন জনগণ। একেবারে ‘শ্যামা’ নৃত্যনাট্যে কোটালের মতো—টাকা চাই, যে করেই হোক—‘নইলে মোদের যাবে মান।’

একেই বলে ‘দশানন অহরং সীতাম, ব্যঞ্জন সাম্যোদধ্যেৎ!’ সর্বহারার সরকারকে সর্বহারারা না দেখলে কে দেখবে? তাই তো সর্বহারাদের কো-অর্ডিনেশন কমিটি পূজা বোনাস নিলেন না, পৌরকর দশ-বারো গুণ বেড়ে গেল তবু জনগণ টু শব্দটি কবলেন না। অতঃপর কোর্ট-ফি বাড়ল, জলকর বসল, লাইসেন্স ফি একশ শতাংশ বাড়ল, রোড ট্যাক্স বহুগুণ বৃদ্ধি পেল, জমির খাজনা বহুগুণ বাড়ল। এতে করে সরকারি কোষাগারে কয়েক কোটি টাকার ব্যবস্থা করা গেল।

তবে সরকারি কোষাগারের পেটে যে রাবণের চিতা জ্বলছে। জ্বলবে না কেন? সরকার চালাবার ধকল কম নাকি? একজন মন্ত্রী প্রতিপালন করতে মাসে আড়াই লাখ টাকা সার্ভিস চার্জ, বছর ইয়ারী ফিল্ম উৎসব, আর এইরকম আরো কতশত রকমারি জনকল্যাণ কর্মে বিনিয়োগ। কোথাও বিনিয়োগ হয় শিল্পস্থাপনে, কৃষি উন্নয়নে, পরিষেবা সম্প্রসারণে আর কোথাও বা হয় মন্ত্রীপালনে, কবর খননে, ফ্ল্যাট নির্মাণে, আদোলনে, মেরুকরণে। বুদ্ধদেবের বুদ্ধিজীবী মন্ত্রীগণ ভাবমূর্তির সাথে আপোষ করেন না। তাই এই রাজ্যে অপারেশন বর্গা হয়, তবে শস্যবীমা হয় না। এই রাজ্যে ভিন্ন রাজ্যের মন্ত্রীরা এসে শিল্পপতিদেরকে তাঁদের রাজ্যে যাবার আহ্বান করেন, তবে এই রাজ্যের মন্ত্রীরা কখনোই রাজ্যের স্বার্থে ভিন্ন রাজ্যে গিয়ে শিল্পস্থাপনের জন্য দরবার করেন না। এই রাজ্যে হতশ্রী শৈলশহর এখবা অবহেলায় জর্জরিত সমুদ্র সৈকতে বিদেশি ভ্রমণার্থী আসেন না। এ রাজ্যের গৌরব শিক্ষককুল হীনমনাতায় ভোগেন। সচ্ছল পরিবারের ভাগ্যবান ছাত্র-ছাত্রীরা দক্ষিণে বা পশ্চিমে পাড়ি জমায়। এখানে যারা থাকে, তাদের চোখের সুমুখে কোনো কাস্তিময় আলো থাকে না। স্বেচ্ছা অবসরের নামে হাজার হাজার মানুষকে কর্মচ্যুত করা হয়। প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ স্নাতক উৎপন্ন হয়। তারা কোথায় যাবে? তাবা কী করবে? দশ শতাংশের মতো নবীন যুবকেরা ভাতের সংস্থান করতে পারলেও অবশিষ্টাংশেরা কোথায় যাবে? অর্থনীতির ব্যাখ্যা অনুযায়ী সরকারি সেবা বিনামূল্যে লাভ করা যায়। তবে এখানে সেবা কিনতে হয়। সেবার দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ে। অবসর নিয়েছেন যারা বা অবসৃত হয়েছেন যারা তাঁরা কী করবেন? বাড়তি টাকা কোথায় পাবেন?

পাঁচ-দশ বছর পর অবস্থাটা কেমন দাঁড়াবে তার আগাম আভাস এখন পাওয়া মুশকিল। বুদ্ধদেবের কাকা বলেছিলেন, ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়। ক্ষুধা আপোষ করতে জানে না। মানুষ বড় বেদনার সাথে উপলব্ধি করেছে যে লিফন বা গান্ধীজি, টুয়ান বা মার্শাল টিটো, মাও সে তুঙ বা হো চি মিনেরা আর জন্মাবেন না। সুযোগ-সম্মানীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তাঁরা যেদিন বিপ্লব করবেন, যে বিপ্লবের স্বপ্ন আমাদের বামাচারীরা এখনো উপাখানের আড়ালে স্বচ্ছন্দে দেখেন, সাড়ে-বত্রিশ ভাজা ও তাদের কারিগররা খড়কুটোর মতো উড়ে যাবেন। অতএব, সাধু সাবধান!

অকপটে

আমাদের পরে যারা নাম করেছে তারা একটু একটু করে বয়স্ক হয়ে উঠল। আমার মনে হয় আমরা কেউ কারো লেখা পড়ি না।

নেকু বনাম ন্যাকামি

সমরেশ মজুমদার



অভিধান বলছে, ভালোমানুষের মতো অজ্ঞতা, সারল্য বা সাধুতার ভাণ করে যে তাকে 'নেকা' বলতে হবে। ভান শব্দটা থাকায় আমরা ব্যাপারটার মধ্যে প্রতারণার গন্ধ পাই। আর যে প্রতারক সে তো অপরাধী। আর অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া উচিত।

কিন্তু অভিধান যাই বলুক, বাংলা শব্দভাণ্ডারের অনেক শব্দের মতো নেকামি অথবা ন্যাকামির অপরাধ অত তীব্র নয়। বরং এ নিয়ে ঠাট্টা-বসিকতা করাও চল আমাদের সমাজে রয়েছে। আমার এক বন্ধুর মা-বাবা খুব সুখী দম্পতি ছিলেন। আমাদের যখন বছর কুড়ি বয়স তখন তিনি চল্লিশে পৌঁছেছেন। সে সময় চল্লিশের মহিলাদের বৃদ্ধা ভাবার চল ছিল, যা এখন পঁয়ষট্টির পবে ভাবা হয়। কিন্তু সেই চল্লিশের মহিলা যেমন সুন্দরী ছিলেন তেমনি কথা বলতেন তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে। আমাকে দেখতে পেলেনই বলতেন, 'ওমা, কী ছেলে গো, একবার মাসিমার দিকে আঁখি চোখে দেখতে নেই। সেই কবে এসেছিলে, তারপর থেকে হা-পিচোশ করে বসে আছি। এক্কেবারে দুইমিস্তি। কী খাবে বলো!'

এরকম ভাষায় আমার কোনো পরিচিতা মহিলা কথা বলতেন না। ওঁর গলার স্বর এত কচি ছিল যে চোখ বন্ধ করলে প্রেমিকার উক্তি বলে ভুল হতে পারত। আমার অন্য বন্ধুরা আড়ালে বলত, ন্যাকা। শুনে আমার খারাপ লাগত। শুধু আমার সঙ্গে নয়, বন্ধুর বাবা হয়ত বেরুচ্ছেন, আমরা ঘরে রয়েছি,

মাসিমা বলে উঠলেন, 'তুমি কী গো! ওরা এখানে রয়েছে অথচ একটাও কথা বলে গেলে না। ওমা! তোমার শার্টের বোতাম কোথায় গেল! এক মিনিট দাঁড়াও লক্ষ্মীটি।' বলে ছুটে গেলেন ভেতরে। ফিরে এলেন সূচ-সূতো নিয়ে। তারপর স্বামীর বুকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে শার্টে বোতাম বসিয়ে দিয়ে হাসলেন, 'এসো।' আমবা যে ঘরে রয়েছি তাতে তাঁর বিন্দুমাত্র সংকোচের কারণ ঘটেনি। অভিধান যদি ন্যাকামিকে ভান বলে তাহলে মহিলাকে ন্যাকা বলা যায় না। কারণ তিনি যা করেছেন তা ভেতর থেকে করেছেন, বানিয়ে করেননি।

কিন্তু তাঁর বয়সী মহিলার ওই আচরণকে কেউ মেনে নিতে পারেনি। বয়স্করা ওঁর সম্পর্কে বলতেন, 'এত নেকি মহিলা যে, দেখলে গা জ্বলে যায়।' 'বুড়ি হচ্ছে না ছুড়ি হয়ে যাচ্ছে কে বলবে।' অর্থাৎ ছুড়িরা, মানে অল্পবয়সী মেয়েবা এমন কথা বললে বা আচরণ করলে সেটা মানানসই। সেসময় কোনো অল্পবয়সী মেয়েকে দেখিনি, যে ওইভাবে কথা বলতে অভ্যস্ত।

এর বছর দশেক বাদে আবার শহরে এসে বন্ধুর বাড়িতে গেলাম। খবর শুনেছিলাম, সে বিয়ে করেছে। বউ খুব সুন্দরী। মাসিমা দরজা খুললেন, 'ওমা, সমরেশ, আমি কি ভাগ্যবতী!'

'কেন?' অবাক হলাম।

'বাঃ! ডুমুরের ফুল দেখছি।' হেসে ফেললেন মাসিমা।

দেখলাম তখন উনি যাঁটে। চুল পাকেনি, শরীর একটু বোগা'হয়েছে কিন্তু সেই সৌন্দর্য যেতে যেতে রয়ে গেছে। ডারতচন্দ্র হীরা মালিনী সম্পর্কে লিখেছিলেন, এতে আছে গুঁড়া। ঠিক তাই। তখন সবে সন্ধ্যা পেরিয়েছে। বন্ধুর খোঁজ করতে বললেন, 'ওরা চাঁদ দেখতে গিয়েছে গো।'

'চাঁদ দেখতে?' টোক গিললাম।

'তুমি তো এখানে বিয়ে করোনি, বুঝবে কেমন করে। বিয়ের পর এটাই তো চাঁদ দেখার সময়। যাও না ছাদে, ওরা ওখানে আছে।' মাসিমা বললেন।

'আমার কি ওখানে যাওয়া ঠিক হবে?' আমি ইতস্তত করছিলাম।

'ওমা! কোথায় সেই ছোট্টবেলার বন্ধু, তুমি যাবে না তো কে যাবে। যাও।'

সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতেই মহিলা কঠ কানে এল, 'ধূর! তুমি না এক নম্বরের কাঠশোঁট। আমাকে জড়িয়ে ধরতে পারছ না? নো নো নো ডার্লিং,

ওভাবে নয়। চাঁদটাকে একটু জেলাস করে দাও না প্লিজ। উম্ম!

নিঃশব্দে নেমে এসেছিলাম। এই কাহিনী কোনো শিক্ষিত মহিলাকে শোনালে তিনি ফাঁস করে ওঠেন, 'ন্যাকামি। যাদের ভেতরটা শূন্য তাদের মুখে ওই বোল ফোটে। আপনারা পুরুষরা তাতেই মজেন।'

হয়ত। কার বুকের ভেতর ভরাট তাই তো বুঝি না। তাই ওই 'ন্যাকামি'র জন্যে হাপিত্যেশ করতে আপত্তি নেই। এরকম নেকু তো বরং বেশ আদরের।

একটু বিখ্যাত হলে মানুষের চালাচলন বদলে যায়। আমাদের সময় বয়স্ক লেখকরা তেমন ছিলেন না। তাঁদের কারো কারো সম্পর্ক খারাপ হলেও পরস্পরের মধ্যে একটা সম্পর্ক বজায় থাকত। এখন তা একেবারেই নেই। এই যে আমি, প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর ধরে 'দেশ' পত্রিকায় লিখছি, সব লেখককেই চিনি, কিন্তু বইমেলায় মাঝে মাঝে ছাড়া কারো সঙ্গেই দেখা হয় না। প্রফুল্ল রায়কে কতদিন দেখিনি, সিরাজুদার সঙ্গে শেষ কবে দেখা হয়েছে মনে পড়ে না। আমাদের পরে যারা নাম করেছে তারা একটু একটু করে বয়স্ক হয়ে উঠল। আমার মনে হয় আমরা কেউ কারো লেখা পড়ি না। আগে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত পড়ত। সন্তোষকুমার ঘোষ তো লিটল ম্যাগাজিনের ভালো লেখা পড়ে লেখককে চিঠি লিখতেন। একবার রাত বারোটায় কোন করে আমাকে গালাগাল দিয়ে ভূত ভাগিয়ে দিয়েছিলেন একটা ভালো বিষয় নিয়ে বাজ্রে লিখে নষ্ট করেছি বলে। এই মানুষগুলো ন্যাকামি কাকে বলে জানতেন না।

এবারের বইমেলায় অনেকদিন পরে এক কবির সঙ্গে দেখা হল। সে এখন বিখ্যাত। আগে দেখা হলে মাথা নিচু করে লজ্জা-লজ্জা ভাব ফেঁটাত মুখে। এবার দেখলাম পাঁচ-দশজন মহিলা-পুরুষ তাঁকে ঘিরে রয়েছে। আমাকে দেখতে পেয়ে সুপুরি গাছের মতো দুলে বলল, 'ভালো।'

বললাম, 'ঠিক আছি। তুমি?'

সে বলল 'এই আর কি। ডোমরা ওঁকে চেনো?'

সঙ্গীরা মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

'কী ভালো লেখেন, তাই না?'

সঙ্গীরা মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

'ওঁর লেখা একদম আলাদা, নর্থ বেঙ্গলকে বেস করে, না?'



৩৩০ ৬৩

সঙ্গীরা আবার মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা, নর্থ বেঙ্গল মানে সিনিক বিউটি, মূর্তি নদীর ধারে সেই বাংলোটা, আছ।'

বললাম, 'চললাম।'

সে বলল, 'দেখা হবে।'

আমি জানি বিখ্যাত হওয়ার পরে সে আমার কোনো লেখা পড়েনি। ওর সঙ্গীরা পড়েছে কিনা তাতে সন্দেহ আছে।

এই ন্যাকামি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কিন্তু যেহেতু ভালোমানুষ সাজার জন্যে এইরকম ন্যাকামি করা প্রয়োজন তাই খারাপ মানুষের সাতখুন মাফ হয়ে যায়।



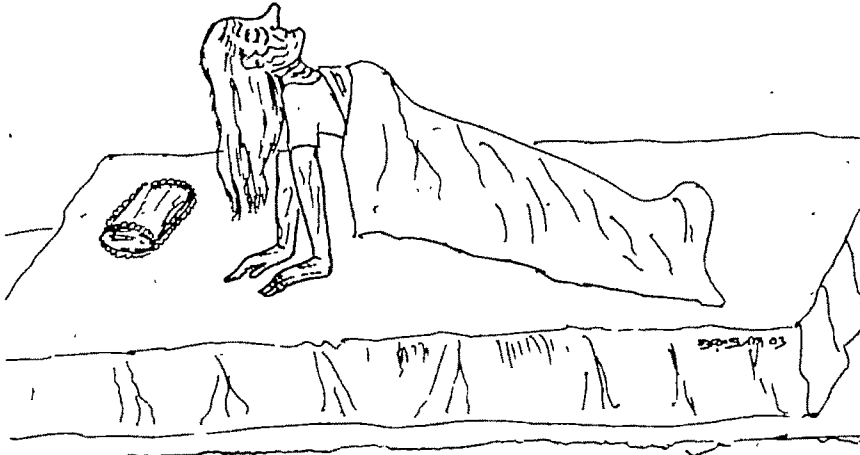
তুমি রবে সরবে.....

কার্টুন : গুরুপ্রসাদ দাস

সাতাত্বরের শিহরণ

দুটো-পাঁচটা লোক মরেছে বলে
বেচারী প্রেমে পড়তে পাবে
না? রাতে যা দেখেছে, রাত
গয়ী বাত গয়ী। এত মিষ্টি একটা
স্টোরির সত্যনাশ করতে কোথা
থেকে এলেন আপনি?

স্বপ্না গুহ



আহা, কি অপূর্ব একখানা ছবি দেখলাম গো! মনটার মধ্যে যেন রামধনু রং ঝিলমিল করছে। কী বা বয়স মেয়ের। ওই যে আমাদের রিনা। খুটিয়ে খুটিয়ে কেমন মাদ্রাজিদের সংসার, মুসলমানের হাবভাব, বয়স্ক লোকের বাস্তবিক বায়েল, ছেলেমানুষদের ফুর্তিফর্তা, উনকুটি দিয়ে সাজিয়েছে ছবিখানাকে। আবার তার ওপর দাঙ্গা-হাঙ্গামার ধুমুসারও আছে। সেগুলি অবশ্য না দিলেও পারত। বুকের ভেতরটা কেমন ঢিব্ ঢিব্ ঢিব্ করে ওঠে মাঝে মাঝে। সে যাই হোক, সত্যিই তো জীবনে ওইসব ভয়ঙ্কর ব্যাপারও আছে বৈ তো নয়? আব ওইসব ধাক্কাতেই তো দুটি প্রাণ অমন কাছাকাছি হতে পেল? আ-হা-হা-হা, কী ভালোবাসা গো! সেই কোন প্রান্তের, কোন ভাষার কোন ধর্মের এক মেয়ে অন্য ভাষায়, অন্য ধর্মের অচেনা এক ছেলেকে কী ভালোবাসাই না বাসল! উজ্জ-হুহ! দেখতে দেখতে আমার সাতাত্বরে

হাড়-মজ্জায় যেন সতেরোর শিহরণ জাগছিল গো!

মনটা এমন টেটপূর ছিল যে বাদুলি হতচ্ছাড়ি রাতের ষিচুড়িটাকে যে প্রায় আলুনি করে রেখেছিল, তা নিয়ে ওকে বকাবকি করতেও ইচ্ছে হল না। একটু নুন মিশিয়ে নিলেই তো চুকে যায়। এমনিতে সোয়াদটি তো ভালোই তোলে বেটি। নুন মিশিয়ে দিবি খাওয়া গেল। তারপর গুণগুণ করে 'সেদিন দু'জনে দু'লেছিনু বনে'র সুর ডাঁজতে ডাঁজতে শুয়ে পড়লুম। কিন্তু কি গেরো। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসতেই কি এক উটকো স্বপ্ন। প্রথমে মন্দ লাগেনি, এক দুই করে সেই ছেলে কোলে মাদ্রাজি মেয়ে মীশাকী, তার নকল স্বামী, সেই নাচগান করা ছেলেমেয়ের দল, সেই দাড়িটাড়িওলা বড় বড় ছেলেগুলি, সব এসে পড়ল যেন, সেই বাসের মতো। আর আমি হঠাৎ তাদের এক একজনকে এক একরকম বিটকেল প্রশ্ন করে বসলাম। প্রথমেই সেই মিষ্টি মেয়ে মীশাকীকে কাছে ডেকে বললাম,

'হ্যাঁগো, তোমাদের পরিবারটি সেই যে বললে অর্থদণ্ড না কি, মানে তো খুবই পুরনোপন্থী আর কড়া নিয়ম মানা? তা তেমন এক পরিবারে বড় হওয়ার পর এক ঝটকায় পরপুরুষের কাছে নিজের মনটা খুলে ফেলে অত ঢলাঢলি করার সাহস জুটল কোথেকে গো? মাদ্রাজে বুঝি এমনটা হয়? আমাদের বাংলায় বাপু তেমন তেমন অর্থদণ্ডের ঘরে মেয়েরা, আর কারো কাছে তো দূর, নিজের কাছেই স্বীকার করার সাহস জুটোতে ক'য়ুগ পার করে দিত যে পরপুরুষকে সে, ভালোবেসে ফেলেছে।

মীশাকী ফিক্ করে হেসে বলল, মাদ্রাজিরা কেমন হয় তার আমি কি জানি। তবে দিদা, ঢলাঢলি তুমি কাকে বলছ? কিছুই তো করাটরা হয়নি।

আমি নিজের মনেই বলি, কমই বা কি করলে। তারপর আবার শুধাই, আচ্ছা মা, তোমার চোখের ওপর যে বুড়ো মানুষ দুটোকে ওভাবে শেষ করে দিল, রাত পোয়াতেই তোমরা সেই ভয়ঙ্কর ব্যাপারটা কি ভুলে গেলে?

আশপাশে সেই শুকিগুলিও এসে দাঁড়িয়েছে দেখে বলে উঠলাম, এই যে, তোমরা! তোমাদের একজন তো কেঁদে ককিয়ে বেহাল হয়ে পড়েছিল। একদিনের মধ্যে তোমাদের ফুচকা পাটি আর পরের মুখে সুধা খাওয়ার, হিহি করার, ঝরঝরানি এল কেমন করে বলো দেখি! অমন আবার হয় নাকি?

এবার মেয়েগুলো কেমন বিরক্ত হয়ে বলল, আঃ আমরা ওসব কি জানি। ওই চন্দন আদ্রেল কি সত্যিকার খুনে নাকি? এ তো সিনেমা।

আমি তখনো গজগজ করছি—কী দিয়ে তৈরি তোমরা সব?

মীণাফী মিটিমিটি হাসছিল দেখে আমার মাথায় যেন আগুন ধরল। বললাম, অমন জঙ্গলের মধ্যে ফাঁকা বাড়িতে দাঁড়িয়ে যে দৃশ্য তুমি দেখলে মা, বমি-টমি ক'বে মুচ্ছে গেলো, তাব পুরদিন ঘুম ভাঙতেই তোমার বুকের ভেতর হা-হা করে উঠল না? দৈত্যের মতো একটা আতঙ্ক ভাব তোমার সারা গা-মাথা অবশ করে দিল না? তুমি কিনা তোমার স্বপ্নের রাজপুত্বে ঘুমন্ত মুখের দিকে চেয়ে তোমার অজান্তের ফুলশয্যেটুকুর আচার চাটতে লাগলে?

এত যে কেন রাগ হল আমার কে জানে। গরগর করে কথাগুলো বলে উঠতেই সেই বেতো মেয়ে এগিয়ে এসে পানের রস ফেলে দিয়ে বলল, কেন দিকদারী করছেন দিদি, দুটো-পাঁচটা লোক মরেছে বলে বেচারী প্রেমে পড়তে পাবে না? রাতে যা দেখেছে, রাত গমী বাত গমী। এত মিষ্টি একটা স্টোবির সত্যনাশ করতে কোথা থেকে এলেন আপনি?

আর আমার দেখে কে! বললাম, চুপ কর হতভাগী! তোরা মিষ্টি গল্পের মধু চাটবি তো মউ বনে যা। এমন নিরীহ মানুষের অকাল মরণ...তার অভাগী ইস্তিরীর হাহাকার, সেই সন্ধহারী ছাওয়ালটার কান্না—এসব বুঝি তোদের মিষ্টি গল্পের চালচলিত? এদের নিয়ে বাস ভর্তি লোকের হেলদোল নেই। থু! নিকুচি করেছে তোদের মিষ্টি গল্পের।

আমি তখন হাঁপাচ্ছি। হঠাৎ সেই চশমা পরা দাড়িওয়া ছেলেটা, সেই বুড়ো মানুষদুটোকে যে চিনিয়ে দিয়ে খুন করাল, সে ওইরকম ভুরু কোঁচকানো বিরক্ত মুখে একেবারে আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, কি-কি-কি? মানে ব্যাপারটা কি? আপনাদের অসুবিধেটা কোথায় হচ্ছে বলুন দেখি!

আমার গলায় এবার কান্না উঠলে আসে। আমি বলি, বাবারা, আমার ভয়ানক অসুবিধে হচ্ছে। আমি পুলিশের গুলিতে সত্যাহ্বীর মরণ দেখেছি। হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গায় মানুষের ধড় থেকে মুণ্ড পড়ে যাওয়া দেখেছি। সারি সারি লাশ পড়ে থাকতে দেখেছি। ভয়ে সিঁটিয়ে লুকিয়ে থাকা মানুষকে ইন্দুরের মতো খুঁচিয়ে মারতে দেখেছি। এক-একবার দেখেছি তো কদিন কবে খেতে শুতে পারিনি, এত অস্থির লেগেছে। ওসব কথা মনে পড়ে আমার যখন বুকের ভিতর ধড়ফড় করছে, তারই মধ্যে কটা নির্বিকার লোকের মিষ্টি গল্প শুনতে আমি পারব না বাবারা, পারব না।

কেন জানি ওই চশমা টাকওয়া ছেলেটার ভারী রাগ হল আমার কথা শুনে। ওকে এমনও আমার বেশ ভয় করছিল। ছেলেটা ওর বন্ধুদের বলল, আই, এ বুড়ি বেশ বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে, তোরা বুঝতে পারছিস?

সেই বড় চোখ-দাঁত ছেলেটা শুধু বলল, হাঁ। অমনি চশমাওয়া ভুরু দুটো আবো কুঁচকে ঠোট দুটো সেই টক-টেকুর চাপার মতো করে বলল, হুঁ? হুঁ কি রে? একে ছেড়ে দিলে কে কোথায় এর অভিযোগগুলো কিনে বসে, সবে কিনা লোকে দাস্তার পটভূমির ব্যবহারকে ধন্য দিতে দিতে ম্যাডামের নানান অ্যাওয়ার্ড জেতার রাস্তা তৈরি করছে, আর এ বুড়ি কিনা—

বলতে বলতে ওরা চার-পাঁচজনে মিলে আমার মুখ চেপে হাত ঠেসে ধবল। 'করো কি, করো কি', বলতে না বলতেই আমার মুখটা কবে বাঁধা শুরু করে চশমাওয়া বলল, 'যতদিন না বি-এফ-জে-এ থেকে শুরু করে অক্ষর পর্যন্ত সবকটার ফলাফল বেরোয়, এ বুড়িকে—

হাঁসফাঁস করতে করতে ঘুম ভেঙে যায়। দেখি ঘেমে গেছি। আর কী জ্বলতেপ্তা। উঃ এ কি দুঃস্থপ! কেমন একটা চমৎকার ছবির স্বাদে মনটা ভবে ছিল। কোথায় মিষ্টি মিষ্টি স্বপ্ন দেখব, তা না, ওই বাদুলি হতজ্ঞাতিরই দোষ। কতদিন বলেছি, বুড়োমানুষের শিচুড়ি, হাঙ্কা করে বানাবি। যি তো নয়ই, তেলও দিবি ফোডনটুকু ভাজার মতো। ব্যস, যাকে বলে রুগি পথ্য। তা শুনবে কখনো? তেলে ঘিয়ে জম্পেশ করে রাখা চাই-ই চাই। বুড়ো বয়সে সহ্য হয়?

গান রান্নার সরল রেসিপি

উদয় বন্দ্যোপাধ্যায়



ভাদুরে দুপুর, আদুরে বিকেল, চাদুরে আড়ালে নীলচে মাদুর
মাধুরী ধরছি ছন্দ বাঁধনে ডাকিছে দাদুরী উডছে বাদুড়।
দাদুরী বলতে 'মিলন তিয়াস' 'মাধুরী' মানেই হিন্দি ফিল্ম,
শিরিশের মিঠে শরীবেব সিঁড়ি স্বপ্নালু চোখ। দু এক ছিলিম—
গাঁজা পডতেই বাঁজা কল্লনা শব্দরাপেণ হয় ফলবান,
তুমি আমি সেই তৃপ্তিতে বেঁধে ফেলি একখান জম্পেশ গান।
ভুরীয়ানন্দ! সাক্ষ্য মেজাজ, সুরের মান্দ্য? সমস্যা নয়,
ছায়া ছায়া রোপে শেয়ালেরা ধরে যৌথ খেলাল, ভিজ়ে হাওয়া বয়।

টীকা নিম্নয়োজন

সব ন্যাকাচণ্ডী

কলকাতা কলকাতাতেই আছে। বছর এবাব শুরুই হল দু-দু'বার 'বিগ্রেড চলো' আর বাবদুই "বন্ধ"-এর মধ্যে দিয়ে। ইদানীং "ত্রিগেড চলো" আব বিশেষ করে শুক্র-সোমে লাগাতার লম্বা ছুটির টোপ-ফেলা "বন্ধের" হুজুতিটা কিছু কম ছিল। গত নির্বাচনে পাণ্ডি খাবার পর ভূপমূল কেমন যেন নেড়িয়ে পড়েছিল। আর পড়বে না-ই বা কেন? গদ্যচ্যুত দ্বিদিগে দিল্লির দাদারা আর কলকাতার ভাইরা তেমন আমলই দিলেন না। বাঁধটা তাহলে ডাকবে কে? বাঁধের প্রবর্তক বামপন্থীরা এখন শিল্পপতিদের সন্ধানে দেশ-বিদেশে দৌড়াপ করছেন। বাঁধ ডাকার সাধ-ইচ্ছেটা তাঁদের বাধ্য হয়েই দমন করতে হয়েছে। ক'টা দিন তাই কলকাতার মানুষ বাঁধ, ত্রিগেডের স্বপ্নর থেকে মুক্তি

বুনো রামনাথ

সি পি এম অবশ্য বাঁধে এবার কাঁধ মেলায়নি। ববং মুখে বাদই সেখেছিল। কিন্তু তাতে কাজ হয়নি। হবার কথাও নয়। কারণ তেনাদের পার্টি জন্মে ইস্তক "চিচিং বন্ধ" "চিচিং বন্ধ" চিল্লিয়ে এসে "চিচিং ফাঁক্" মন্ত্রটি আলিবার দাদা কাশেমের মতো বেমালুম ভুলে বসে আছেন। ফলে, রামা-শ্যামা, খোসা-মোখোর দল হুডুম-দুডুম বাঁধ ডেকে বসছে। শিল্পোদ্যোগী বামফ্রন্ট সরকার হস্তিত্ব করলেও কার্যত নিশ্চূপ। "খুল্ যা সিম্ সিম্" চাবিকাঠিটি সরকারের হাতে নেই। কোনোদিনই ছিল না।

বামপন্থীদের ঠিকুজিতে নেই। ও পথে "যাত্রা নাস্তি" এমন কথা ওঁদের পাজিতে লেখেনি। সর্বোপরি, পথ দেখালেন ওঁরা, আর তাব দখল নেবে মমতা, তা কেমন করে হয়? এ তো সেই অনেকটা ডিম পাড়ল রাজহাঁস আর ওমলেট খাবেন দারোগাবাবুর মতো দাঁড়াল ব্যাপারটা। অতএব হুগা না কাটতেই বিগ্রেড অভিযানে ঝাঁপ দিল সি পি এম। অভিযান বলে অভিযান! রবিবারের যানজটের ঠ্যালায় নাস্তানাবুদ হল কলকাতার মানুষ। ত্রিগেড প্রতিযোগিতায় ইণ্ডিয়া নম্বর ওয়ান যে এখনো তেনারাই সেটা কলকাতার মানুষকে বুঝিয়ে দিল সি পি এম।

হাড়ে হাড়ে সে কথাটা কলকাতাব মানুষ বুঝলেও দেশ-বিদেশের শিল্পপতিরা উন্টে বুঝলেন।



পেয়েছিল।

আবার যে-কে সেই। জানুয়ারি ২০০৩-এ কলকাতার আবার সেই ছুটিছাটার রমরমাটা ফিবে এল। একেই জানুয়ারিতে নানান মোচ্ছব—গঙ্গা সাগর, গণতন্ত্র দিবস, নেতাজি স্বামীজিব জন্মোৎসব, নিউইয়ার্স ডে, বইমেলা। অতঃপর দু-দুটো বাঁধ, দু-দুটো ত্রিগেড চলো-র আদান। তার ওপর শীতটাও বেশ জাঁকিয়ে এসেছিল এবার কলকাতায়। এমত অবস্থায় অফিসে যায় কোন শা—।

"বিগ্রেড চলে।"র পটভূমিকাটা অবশ্য ভিন্ন। গদ্যচ্যুত মমতার "বেঙ্গল প্যাকেজ" নিয়ে লক্ষ্যবস্তু করার উপায় না থাকলেও ডাকটা উনিই দিলেন প্রথম নতুন বছর। একরকম বাধ্য হয়েই। পাত্তাই দিচ্ছে না দ্বিদিগে দিল্লি। উনি যে আছেন সেটা দিল্লিকে জানান দেওয়া উচিত।

আর কেউ না আসুক, জর্জ মারফত খবরটা দিল্লিতে ঠিকই পৌছে যাবে যে মাঠে স্মরণদানে ভিড় জমিয়ে কলকাতাকে কাং করতে মমতা এখনো সিদ্ধহস্ত। ত্রিগেড যাত্রার বিরোধিতা করাটা

থেকে থেকেই কলকাতায় কল-কারখানা, দোকানপাঠ, রাস্তাঘাট বন্ধ হওয়াব উপদ্রব যদি বন্ধ করতে অপারগ হয় বাম সরকার তবে এখানে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ঢেলে দু'পয়সা কামানোর সুযোগটা কোথায়? বরং ভয়ে ঘি ঢালাই হবে। সরকারি আশ্বাস ও স্তোকবাক্যে দুঁদে ব্যবসায়ী-চিড়েটা ঠিক ভেজে না। কিন্তু ভোট খাঁরা দেন তাঁদের অনেকেই হয়ত তাতেই চিড়ে-ভেজা ভিজোম্যান। আর এই ভেজা-চিড়েই বাম সরকারের ফলারটুকু বছর বছর যুগিয়ে আসছে। সুতরাং শিল্পপতিরা ভিজুক আর

না ভিজুক, রাজ্যের ফলার জুটুক আর নাই জুটুক, সরকারি ফলারের বদোবস্ত কয়েম করাই সর্বাত্মে করণীয়। এতএব বাঁধ, ব্রিগেড, যানজট, ফুটপাথে হকার, রাস্তা অবরোধ, ছুটি-ছাটায় অলিতে গলিতে পাড়া-ক্রিকেট নিয়ে কলকাতা দিবি বহাল তবিয়ে কলকাতাতেই আছে।

তা থাকুক। কিন্তু রাজ্যের শিল্পোন্নয়ন করার প্রতিশ্রুতি কি হবে? প্রচেষ্টার ক্রটি নেই। প্রবাসী, অনাবাসী, দেশি, বিদেশি সবাইকে সাদবে আহ্বান করা হয়েছে। আসুন, পশ্চিমবঙ্গে টাকা লাগান, ব্যবসা কবন, সরকার আপনাদের মদত দেবে। কিন্তু মুন্সিল এই যে, বাজারই যেখানে হটমুট ঝাপ ফেলে দেয় সেখানে ব্যবসা করার আক্কেলদাঁত এইসব বে-আক্কেলে ব্যবসায়ীদের ওঠেনি। হাজার হোক পুঞ্জিপতির ঝাড় তো, লাভ-লোকসানটাই বোঝে, সমাজ চেতনা বলে কিছু নেই এদের।

উত্তম কথা। কিন্তু শিল্পোন্নয়নে একাত্তই পুঞ্জিব প্রয়োজন। আর পুঞ্জির যোগান একমাত্র পুঞ্জিপতিরাই দিতে পারে, সমাজপতির নয়। দেখুন না, এক হলদিয়া করতেই হেদিয়ে গেলেন বাবুরা। পূর্ণবাবুর পুঞ্জিতেই কাজ শুরু হল। যে কোনো কারণেই হোক পূর্ণবাবু একটু হাত গোটাতেই হলদিয়া মাঝদরিয়ার গ্রাম ডুবু-ডুবু হয়েছিল। এই তো ক'দিন আগেই কাগজে পড়ছিলাম, হলদিয়ার ছদো হদো টাকা ঢালার শরিক খুঁজছেন কর্তারা।

সহজ কথাটাই মগজে ঢুকছে না শিল্পোদ্যোগী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের। আজ বিশ্বায়নের যুগে বিশ্বব্যাপী ব্যবসায়ী ছোক ছোক করছে বিশ্বজোড়া বাজারে। কোথায় দু'পয়সা লাগিয়ে চার পয়সা কামানো যায়। তার খান্দায় ভাত ছড়ালে যেমন কাককে ডেকে আনতে হয় না, কাক আপনিই আসে, ঠিক তেমনিই রাস্তাঘাট, বাজার-হাট, কল-কারখানা খোলা থাকলে এক কাঁড়ি টাকা ঢেলে দু'পাঁচ কাঁড়ি টাকা কামাবে সব শিল্পপতিই উচিয়ে আছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ভেদাভেদ অর্থাৎ পুঞ্জিবাদ, সাম্যবাদের কেতাবি কলহটা ক্রমশই মিঁয়ে আসছে। রাজনৈতিক ঝুঁকিমাংগ এখানে নেই; আছে প্রতিযোগিতার দাপট।

কারণ আজকের বিপ্লব আম জনতার ক্রমবর্ধমান আশা-আকাঙ্ক্ষার লড়াইকে কেন্দ্র করে। ইংরেজিতে যাকে বলে “Evolution of rising expectation”। মোটা ভাত-কাপড়ে বাঁচা হয়ত যায়, কিন্তু মন ভরে না আজকের মানুষের। বিলেত আমেরিকা আজ আর সাত সমুদ্রের তেরো নদী তফাতে নেই। দূরদর্শনের কাচের জানলা খুলেই উকি দিয়ে দেখা যায় ও পাড়ার চোখাখানো জলসার জৌলুস। ষাওয়া-পরার ওপরের জীবন গ্লানু করে মানুষের মনকে, ও-পাড়ার সেই সম্পদ সমৃদ্ধি।

আকাশ থেকে সে সম্পদ বৃষ্টির মতো ঝরে পড়ে না। শিল্পোন্নয়ন, ব্যবসা-বাণিজ্যই হয় দেশ ও দেশের সমৃদ্ধি। তাই সারা বিশ্বে আজ রাজনৈতিক কোলাকুলি করার অপেক্ষা না রেখেই শুরু হয়ে গেছে অর্থনৈতিক আঁতাত। এখানে সাম্যবাদ, পুঞ্জিবাদ, মৌলবাদ, দক্ষিণবাদ, বামবাদ নিয়ে কোনো বাদাবাদি নেই। বিশ্বায়নের পতিত জমিতে আবাদ করে সোনা ফলিয়ে নিচ্ছে আজ রাজ্যের পর রাজ্য।

আর মুখেন মারিভং জগৎ পশ্চিমবঙ্গ সকাল-বিকেল দিল্লির দৌরাখ্যকে দুষে, ছুতোয়-নাভায় দোকানপাট বন্ধ করে সকাল-বিকেল ব্রিগেডে হাওয়া খেয়ে হা-পিত্যেস করে বসে আছে শিল্পপতিদের অপেক্ষায়। রাস্তায় আবর্জনা, ফুটপাথে ফেরিওলা (অধুনা বাংলা ভাষার যুগে অবশ্য যাদের “হকার” বলা হয়), অফিসে ছুটির হিড়িক, কল-কারখানায় রাজনৈতিক “বন্ধ”-এর হুমকি। তা শিল্পপতির টাকা নিয়ে আসবেনটা কোন চুলোয়? ময়দানে ঘাস কাটতে, নাকি অলিতে-গলিতে পাড়া-ক্রিকেট খেলা দেখতে।

“সব ন্যাকাচণ্ডী”।

মন্তব্যটা করলেন পাড়ার দাণ্ড চক্কোভি।

চিল-খায় দুপুর

প্রবীর মণ্ডল



কী ভালো লাগছে আজ এই শীতের দুপুর
কেমন করে বলি।

রোদের আজ তীক্ষ্ণ তেজ, কী অসহনীয় ভালো;
যেন বাংলা ব্যাণ্ডের উদ্গাদ গান
এ শহর থেকে ও শহর;

কী ভালো লাগছে আজ ঐ সূর্যের দিকে চেয়ে;
এদিক ওদিক বাচ্চা-বুড়োর ছোট্টাছুটি আনন্দে
আর মধ্যখানে বাড়ি হচ্ছে বিশাল।

তুমি আসলে কাছে, বসলে পাশে, অল্প পরে
ওদিকে গেলে, প্যারাসুট দেখতে; প্যারাসুট উড়ল,
আকাশে মিলল। কি ভালো যে বাসি তোমারে,
তোমাকে কেমনে বলি।

গগনে সূর্যের বন্যা, চেয়ে থাকতে আরাম।
বাচ্চা বুড়ো একভাবে ছুটেছে, কী আনন্দ।

তুমি কি কখনো ভাবিয়াছিলে, এত সুন্দর রোদের তেজ
আমরা পাব
যা কোনোদিনই পাইনি?
সোনালি রোদে কত আনন্দ, কত আমেজ
যেন সূর্য থেকে ঝরে পড়ছে
রৌদ্রের ভালোবাসা, আমাদের গায়ে,
তুমি কি ভেবেছিলে কখনো
এরকমও হয়?

৬.৭° শীতেও লেকের জলে আমরা দেখেছিলাম
চিং-সাঁতারে দু'টি ছেলে

সাঁতার কাটছে। কী দুঃসাহস! তুমি হাসলে। আব আমি—
আমরা লাগল ভালো।

তোমার সেই মিষ্টি, ওয়াশারফুল হাসি। দ্যাখো দ্যাখো
কত সুন্দর আজ আকাশ। আর তোমার চোখে
কত হাসি, কত কামা, কত দুঃখ—
সেসব কীভাবে বলি।

রাজনীতিকরা মাঝে শিক্ষকদের বেশ্যা বলছিল। রাস্তা থেকে ছাত্র ধরে এনে দরজা-জানলা বন্ধ করে বই খুলে পড়ানোর অভিযোগে। উচ্চশিক্ষামন্ত্রী নিজেই শিক্ষক হওয়ায় ব্যাপারটা গড়াতে পারেনি।



কোকিলের কা-কা

দিব্যেন্দু দাস

আমি দর না করে কিছু কিনি না। বাবার শ্রদ্ধের বাজার কবতে গিয়ে শ্রীমদ্ভাগবৎ গীতার পকেটবুক একজন লেখা ছিল লিটে।

—গীতা কত করে ভাই?

—আজ্ঞে তিন টাকা পিস।

—সেকি! একটাকা করে রোজ নিয়ে যাচ্ছি।

—দাদার কি সংকাব এজেসি?

—কে বলল? আমার তো ওস্তাদ কার এজেসি। পূর্বনো রিক্সা—। যাকগে, এসব কথা আসছে কেন ভাই?

—আজ্ঞে আপনি রোজকার এই সংকাব বই কেনেন বললেন।

দশকর্মার কর্মচারীরা গীতাকে সংকার বই বলে, তা জানতে পারলাম। রাজমিস্ত্রীরা সিমেন্টকে মাটি বলে। রাজনীতিকরা মাঝে শিক্ষকদের বেশ্যা বলছিল। রাস্তা থেকে ছাত্র ধরে এনে দরজা-জানলা বন্ধ করে বই খুলে পড়ানোর অভিযোগে। উচ্চশিক্ষামন্ত্রী নিজেই শিক্ষক হওয়ায় ব্যাপারটা গড়াতে পারেনি। রাত্রের দিকে খুব নেশা চড়লে হারানের বাবা হারানকে ‘শুরোরের বাচ্চা’ বলে বারকয়েক গাল দেয়। তারপর ঘুমিয়ে পড়ে। দিনের বেলা ‘হারান সোনা’ ছাড়া কথা বলে না।

আমিও একসময় শিক্ষক ছিলাম। গৃহশিক্ষক নয়। বরং ভাড়াশিক্ষক বলা যায়। ছাত্র আমাকে ভাড়া করেছিল। ওদেরই একজনের বাড়িতে পড়াতাম। শর্ত ছিল—হোম ওয়ার্ক দেওয়া যাবে না। পড়াবার সময় কাউকে পড়া ধরা বা চোখ রাঙানো যাবে না। পুষ্পাঞ্জলির সময় যেমন পুরোহিতে পড়ে, ওরকম করে সপ্তাহ তিনদিন দু’ঘন্টা করে ওদের সামনে বসে কিছু

একটা পড়তে হবে।

আমি প্রথম প্রথম ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান বই থেকে মস্তোচ্চারণ করলেও পরের দিকে দেশ, সদেশ, সিনেজগৎ, সত্যকাহিনী—এইসব থেকে পড়তাম। এতে আমার ভাড়া দশটাকা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। বেশ চলছিল ছাত্র সিনেমা-শিক্ষার্থী নিয়ে। আমি যে তিনদিন পড়াতে যেতাম না, সে তিনদিন ওরা আমার বাড়িতে পড়তে আসার নাম করে সিনেমা দেখতে যেত। কোথা থেকে একটা খব্বা খব্বা করে কাশি এসে শিক্ষকতা শেষ করে দিল। আমার কাশি শুনে গার্জেনরা প্রায়ই জ্বল হাতে করে পড়ার ঘরে ঢুকে পড়ছিল। আমার হাতে ধরা ঐ সব পাঠ্যপুস্তক ও পঠনের জ্বলন্ত বিষয়বস্তু সম্পর্কে উৎসাহ দেখাচ্ছিল। ছাত্ররা আমাকে ছাড়িয়ে দিল। বড়দের জন্য ছোটদের কত চিন্তা!

আমার পাশের বাড়ির বারো বছরের সন্ত রাত্রে ভালো করে ঘুমোতে পারে না চিন্তায়। যে কোনো মুহূর্তে বাবা টাইপিসির সঙ্গে ঘর বাঁধতে পারে। সে তখন মাকে নিয়ে কোথায় যাবে? ডজন খানেক এস টি ডি বুথে ইতিমধ্যেই সে ইন্টারভিউ দিয়ে এসেছে। লেটারের অপেক্ষায় দিন গুনছে। এর মধ্যে আবার সন্তর মাস্টারমশাই সন্তর মাকে নিয়ে বুকফেয়ার ঘুরে এসেছে। তারপর থেকেই মাস্টারমশাই পড়াশুনার বাইরে সন্তর দাঁতমাজা, স্নান করা, স্কুল যাওয়া, টিফিন, বুটজুতো, নখ, পুষ্টি প্রভৃতি বিষয়ে দেখাশোনা করছে। সন্তর জন্যে একটা হরলিঙ্গ কিনে এসেছে। কোকিলরা ডিম পাড়ার সময় কা-কা করে ডাকে। বন্যার সময় সাপেরা গাছে উঠে পাখির বাচ্চা পাহারা দেয়। সন্ত চিন্তায় আছে।

সঙ্গীত সং-কট!

পিনাকী ভাদুড়ী



অজয় চক্রান্ত, চক্রবর্তী স্টাইল

রবীন্দ্রনাথ যখন বিশ্বজয় কবেছিলেন তখন তিনি ছিলেন নম্র, নত। তাঁর মৃত্যুতে সমগ্র মানবজাতি নম্র হয়েছিল। তাঁর জীবনে তাঁকে বহুবার নানাভাবে আক্রান্ত হতে হয়। সে আক্রমণ আজও থামেনি। তাঁর কুটী বিচার করলে দেখা যাবে যে মৃত্যুর পরেও তাঁর ফাঁড়া কাটেনি। ফোড়ার মতো এখানে-ওখানে তারা ফুঁড়ে উঠছে। রবীন্দ্রনাথকে দাহ করা হয়েছিল একবার, এখন তাঁকে আরেকবার দহনজ্বালা দিয়েছে তাঁরই স্বদেশবাসী। কবির গ্রন্থস্বত্ব মুক্তির পরে কেউ কেউ মওকা পেয়ে গিয়েছে। যেমন, সম্প্রতি প্রকাশিত একটি সঙ্গীত অ্যালবাম। গায়ক অজয় চক্রবর্তী ‘অজানা খনির নতুন মণি’ নামের এই অ্যালবামে গেয়েছেন রবীন্দ্রসঙ্গীত। নিজের কণ্ঠে শুধু নয়, নিজের সুরেও বটে।

কিছুকাল ধরে এক মিডিয়াম প্রশ্নে অজয় নিজেকে অপরাধে মনে করছেন। সেজন্য রবীন্দ্রসঙ্গীতের নিধনকর্মে লিপ্ত হতে বাধেনি। এই ক্যাসেটে, বলে না দিলে মনে হবে না, রবীন্দ্রনাথের গান গাওয়া হয়েছে। অকালপক্ক অজয় এইসব গানে তাঁর ক্লাসিকাল ঘরানার শ্রাস্ত করে ছেড়েছেন। দু’একটি

নমুনা এখানে দেওয়া যাক।

‘আমি চঞ্চল হে’ গানে ‘সুদূর’ কথাটাকে উনি যথেষ্ট সুদূরে নিয়ে যেতে চেয়েছেন, এমনকি গানটা থেকেও দূর চলে গিয়েছে তাঁর কণ্ঠস্রাব। ‘চঞ্চল হে’-র ‘হে’-তে একটা হেঁচকি দিয়েছেন, অনেকটা টেকুর তোলার মতো। ‘কথা কসু নে লো রাই!’ গানটির খেমটা চালটি গেয়েছেন ঠুংরিতে। আপনাদের হয়ত ‘পরশপাথর’ ছবিতে তুলসী চক্রবর্তীর সেই অবিস্মরণীয় মদ্যপ সংলাপ মনে পড়বে, যেখানে ককটেল পার্টিতে বেসামাল হয়ে তুলসীবাবু গাইতে শুরু করে বলেছিলেন,.....ঠুং.....রি। অজয় চক্রবর্তীও এখানে বেসামাল নিজের দস্তে, ঔজ্জ্বল্যে এবং অরসিকতায়।

তাঁর ‘ওলো সজনী’ গানটিতে কোথাও রবীন্দ্রনাথ নেই, পরিষ্কার একটি ঠুংরি (আবার!) গান। এই গানগুলি নিয়ে বহু বিশিষ্ট মানুষ বিরূপ মতামত দিয়েছেন। তবে অজয় চক্রবর্তীর পক্ষে আছেন বাণী বসু, ইনিও মিডিয়াম দাপটেই করে যাচ্ছেন, মিডিয়া সরলেই ঐরও পাষের তলা থেকে মাটি সরবে। সেই বাণী বসু, যাঁব রচনা পড়লে বাণীদায়িনী দেশত্যাগ করতেন, তিনিও সঙ্গীত সম্পর্কে মতামত দেওয়ার স্পর্ধা রাখেন দেখা যাচ্ছে। ‘ওলো সজনী’ গানটি তাঁর পছন্দ হয়েছে, কারণ তাঁর মনে হয়েছে, ‘যেন নজরুল শুনছি’ শুনে আমরা ঠা-ঠা করে হেসেছি, কারণ নজরুল শুনলে রবীন্দ্রনাথ শোনা হয় না—এইটুকু বোঝার বুদ্ধিও তাঁর নেই। অবশ্য থাকার কথাও নয়, তাঁর লেখা পড়লেই বোঝা যায় যে তাঁর মতো বোঝা সাহিত্যের ঘাড়ে আর চাপেনি। তাঁর পদবীটাও, ‘বোস’, অর্থাৎ বসতেই বলা হচ্ছে তাঁকে, কিন্তু তা বুঝছে কে?

অজয়ের ‘ধান ভাগতে বাণীর কথা’ এত বলতে হল ‘শিবের গীত’ গাইবার জন্য নয়। খালি এইটুকু বুঝতে হবে, অজয়ের দলে যারা আছে, তারা কারা? তাদের Locus standiটাই বা কি? রবীন্দ্রবাণী তারা বুঝবে কী করে, যাদের নিজেরদের বাণী শুনলে কোরাবানী করতে সাধ যায়। এদেরই জোরে অজয় বলেন, তিনি কাউকে গ্রাহ্য করেন না, এবং তিনি নাকি রবীন্দ্রনাথকে অকালমৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবেন। পৃথিবীতে সবকিছুব সীমা আছে, মূর্খামির কি সীমা নেই? অজয়ের নিজের সঙ্গীত জীবন কোনকাল পর্যন্ত যাবে, তাঁর নিজের জীবন অকালে পেরোবে কিনা, এইটের ঠিক নেই, উনি রবীন্দ্রনাথের ঠিকে নিতে চাইছেন। রবীন্দ্রনাথের বাণী এবং সুবের মেলবন্ধন বোঝার তাগিদ অজয়ের নেই, তবে হাল্লা করার তাগদ দেখাতে চান তিনি। হাল্লারাজার কী হয়েছিল সবাই জানে, জানেন না কেবল চক্রবর্তী অজয়। কে বা কারা তাঁকে বিশেষ নাচ নাচিয়ে চলেছে তা আমরা জানি, কিন্তু বলব না।

‘বাণী’র কথা বলতে বলতেই অজয়ের গাওয়া ‘বাণী তব অনন্ত’ গানটা মনে পড়ল। এর গোড়ায় মুখড়া শুনিয়েছেন অজয়, শুনিয়েছেন মুখনাড়ার মতো—‘বাণী’ শব্দটা এল এত দেরিতে, যাতে স্পষ্ট বোঝা গেল যে রবীন্দ্রবাণী অনুভবের জ্ঞান তাঁর এ-জন্মে হবে না। তাঁর রুচি ও অভিরুচি ধ্যান-ধারণায় দীর্ঘ, প্রতিদিনই তা প্রমাণিত হচ্ছে।

অজয় চক্রবর্তী স্বরলিপি এবং স্বাধীনতার কথা বলেছেন, তবে খেচ্ছাচারের কথা বলেননি অবশ্য। এটা কিন্তু ঠিক যে, আপত্তি তিনি গ্রাহ্য করেন না। রবীন্দ্রনাথ হখন বলেছিলেন যে, অনেক সময়ে গান শুনে সেটা আমার গান তা বুঝতে পারি না, তখন তিনি গায়কের কাছে প্রশ্রয় করেছিলেন রুচি ও বোধ এবং অনুভূতি। অজয় প্রমাণ করে দিয়েছেন, ওই তিনটি বস্তু তাঁর নেই। 'দু'কান কাটা' যে সে শহরের মাঝখান দিয়ে হাঁটে; অজয়ের তাই হাঁটতে অসুবিধে হবার কথা নয়। সেজন্যই বিশিষ্ট মানুষের বিরূপ মন্তব্যে তাঁর প্রতিক্রিয়া অমার্জিত, অশিক্ষিত ও অভ্যোচিত। তিনি এও বলেছেন যে, পারলে কেউ তাঁর বিরুদ্ধে 'স্টেপ নির'। তাঁকে মনে করিয়ে দিই, যারা তাঁকে স্টেপনি বানিয়েছে, প্রথম সুযোগেই সেই স্টেপনি তারা বাতিল করবে। রবীন্দ্রনাথ এবং সঙ্গীত—দুটোর কোনোটিই তিনি বোঝেন না। গাইতে পারলেই বোকা যায়—একথা কে বলল? হয়ত সেইজন্যই এদেশে তাঁরই রবীন্দ্রসঙ্গীত পাওয়ার অধিকার সবচেয়ে বেশি। তবে অবুজির অধিকার তো চিরকাল থাকে না। রবীন্দ্রসঙ্গীতে ব্যবহৃত তান ততক্ষণই চলে, যতক্ষণ সে গানের ভাবকে ফেঁটায়। তান নয়, গানই এর লক্ষ্য। এইটুকু সীমারেখার এদিক-ওদিক হয়ে গেলেই যা হতে পারত রমণীয়, তা হয়ে ওঠে অট্টহসনীয়। এদিকে যা রবীন্দ্রনাথ, ওদিকে গেলেই অজয় চক্রবর্তী। এদিকে যা প্রেম, ওদিকে তাই প্রেত।

রবীন্দ্রনাথ থেকে যে 'নতুন মণিটি' অজয় আহরণ করার জন্য চূড়ান্ত শুধু নয়, চুরচুরান্তে আরোহণ করেছেন, তা যে সাপের মাধ্যম বসানো, সাপের মতোই যে সে খেলুড়েকে ছোঁবলাবে এটা বোঝার মতো বুদ্ধি অজয়ের আছে—এমন মনে করার মতো নির্বোধ আমরা নই। তাঁর দস্ত, ঔদ্ধত্য, অবিনয়—এসবের মূলে রয়েছে অশিক্ষা ও কুশিক্ষা। আজ যারা তাঁকে গাছে তুলেছে, তারা মই কেড়ে নেবে বলেই তুলছে, কারণ যে কোনো Sinয়ের মতো পতনের Sceneও Public খায়।

এই ক্যাসেটটি অজয়ের প্রথম অপরাধ, সম্ভবত শেষ নয়। শিশুপালেরও প্রথম অপরাধ পার পেয়ে গেলেও শেষ পর্যন্ত সে রক্ষা পায়নি, একথা শিশুরাও জানে। অজয় জানেন না, তবে জেনে নিন। মিডিয়ার মন্তব্য বা মন্তীর মিডিয়াম তাঁকে বাঁচাতে পারবে না।

এজন্য তাঁকে প্রথমে ভদ্র হতে হবে। নয়-নয় করে একটু বিনয় দেখালে ক্ষ্যামা যেমা পেতে পারেন।

নচেৎ ক্ষ্যামা নয়, যেমাই জুটবে।

পত্রপাঠ লটারি

কলকাতা বইমেলা ২০০৩-এ পত্রপাঠ লাকি ড্রয়ে

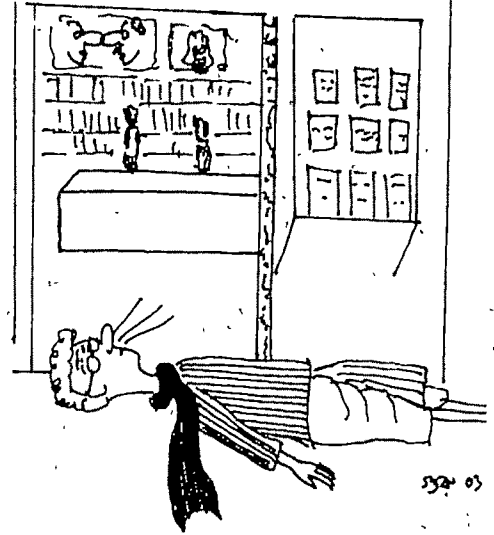
বিজয়ী নম্বরগুলি হল—

৫৮, ১০৫, ১২২, ১৪৪, ১৬৬, ৩২৫, ৩৪৯,
৪২১, ৪৩০ এবং ৮১৩।

যাঁরা এখনো পুরস্কার নিয়ে যাননি তাঁদেরকে অনুরোধ করা হচ্ছে ক্রীত পত্রপাঠ এবং কুপন সঙ্গে নিয়ে অফিসে এসে তাঁদের পুরস্কার নিয়ে যেতে। ৩১শে মার্চ পর্যন্ত যাঁরা যোগাযোগ করবেন না, তাঁদের পুরস্কার আর সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে না। প্রয়োজনে ২৪৪০-৩৮০৩ ফোন নম্বরে সকাল ১০টার মধ্যে যোগাযোগ করতে পারেন।

ট্যারা চোখে

পত্রপাঠ



কান টেনে কানে কানে একটা কথা বলেই ফেলি। আজ সন্ধ্যাবেলা আমাদের 'পত্রপাঠ'র সম্পাদক মশাই খবর পেলেন, তাঁর পত্রপাঠ সারা দেশ ছেয়ে গেছে। হুড়মুড় করে সব লোক কিনছে, খাচ্ছে। বদহজম হচ্ছে। আর অন্য কিছুই খাচ্ছে না। চোঁয়া চোঁয়া টেকুর শুধু পত্রপাঠের লেখকদের। পাকামি, ভাঁড়ামি, আর ন্যাকামির টক টক গন্ধ। 'প্রতিদিন' খাওয়া বন্ধ, 'আনন্দ' নেই, 'বর্তমান'-এ চোখে সরষে ফুল, 'আজকাল' চিরকালের মতো বন্ধ। সম্পাদক মো-সাহেবের যত চামচা বেলচা আছেন সবাই দু'হাতে আঁকিবুঁকি কাটছেন। 'মাসিক' ছেড়ে এক লাফে 'ভোরবেলা' 'সকালবেলা', 'সন্ধ্যাবেলা' পত্র ছাপছেন, বিলোচ্ছেন। 'রাত্রিবেলা' ছাপার কথা ভাবছেন। নতুন উদ্যমে লম্বা লম্বা ছাতা দিয়ে নেতাদের খোঁচা মারছেন। হামি দিয়ে কঁাসিয়ে দেবার চক্রান্ত। মন্ত্রী থেকে আমলা সবাইকে এক গামলায় ডুবিয়ে মারার ফন্দি। পেছনের পাতার রাশি চক্কোরকে উনি একেবারে সামনের পাতায় এনেছেন। রাজ্যের রাজা-প্রজা সবাই রাশি চক্কোর দেখে তবুই সারাদিন চক্কোর মারেন। পত্রিকাফাগো তরতরিয়ে বাড়ছে। টাকা ব্যাঞ্জে না রেখে ট্রাকে রাখছেন। আঁকিয়েরা ছবি আঁকার সময় পাচ্ছে না। যাকে পাচ্ছে তাকেই স্টাম্পপ্যাডের কালি দিয়ে ছাপ মেরে ছবি নিয়ে নিচ্ছে। লিখিয়েরা লেখা নিয়ে হেলাফেলা করে ছেলেবেলা করছে।

এবার আসল কথাটা বলেই ফেলি। এ বছরের বইমেলায় যাঁকা ময়দানে ঘুরতে ঘুরতে ঠাণ্ডা হাওয়ায় আমাদের সম্পাদক মশাই একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

—কুটুস-কুটুস

বাংলা

বন্ধ-ব্যাকরণ কথা



সৌরেন বসু

সবারে বিপদে ফ্যালে, নাই কোনো বোধ।
যারা বন্ধ ডাকে, বলে—‘সাকসেসফুল’।
মনে মনে হাসে সব, কি ভুল কি ভুল।
দোকানিরা ভাবে ঝাপ যদি খুলে রাখি।
গুণ্ডারা সুযোগ এই মিস্ করে নাকি।
বন্ধ তারা বোঝে নাক করে লুটপাট।
ভাঙচুর ক’রে মাল করবে লোপাট।
তাই তারা ঘরে শুয়ে টানে সিগারেট।
‘বন্ধ ছাড়া পথ নেই’ ভাবে কি গবেট।
কারো নাম হবে বলে শিরোনামে ছাপা।
বন্ধ ডেকে দিয়ে নেতা বুলি ঝাড়ে ফাঁপা।
পুজিপতি-চাটুকার, হয় বিরোধী সে।
কাগজেতে লেখে বন্ধ হয়ে গেছে ক্রিশে।
মালিকের দলে যারা লেজ নাড়ে বসে।
গালাগালি করে শুধু শুষ্ক-মুখে কষে।

৩

ভুখা পেটে মরে যারা ছাঁটায়ের দলে।
কেবা শোনে তার কথা তারা কি যে বলে।
হাজার কথাতে যবে ভেঙ্গে নাক চিড়ে।
তখন মানুষ আসে সব বাধা ছিড়ে।
খায় লাঠি শত শত যুবক-যুবতী।
মিটিং-এ মিছিলে যায় কে থামায় গতি।
জ্বলে পুড়ে মরে যারা তারা বলে ভাই।
নিজ স্বার্থে গাস নাবে বন্ধের সাফাই।
দিন আনে দিন খায় তারা গাল পাড়ে।
বাবুরা তো ছুটি খান বন্ধ ডেকে আবে।
ওভারহেড তারে ফেলে শুখা কলাপাতা।
ট্রেন বন্ধ কবে দেয় দু’চারটি মাথা।
কেমনে পৌছাবে বলা আপিসে কেরানি।
সঙ্ঘ্যায় টিভিতে শোনে নেতাদের বাণী।
বন্ধ যারা ডাকে, বলে, ‘হয়েছে সফল’।
বিরোধীরা ‘ব্যর্থ, ব’লে থাকে অচঞ্চল।
সবাই সন্তুষ্ট, শুধু মেটে না অভাব।
সত্যি কে নষ্টেব মূল, কে দেবে জবাব।
দাম বাড়ে হু-হু করে চাম কাটে তার।
যারা অ্যাণ্ড-গ্যাণ্ড নিয়ে চালায় সংসার।
মনে মনে হাসে, ভাবে, বোকার মরণ।
ব্যা-ব্যা করে পড়ে সবে বন্ধ-ব্যাকরণ।
বন্ধ-ব্যাকরণ-কথা গরল সমান।
বিতরে সৌরেন বসু পিয়ে পুণ্যবান।

ডাকো ডাকো বাংলা বন্ধ মাসে দু-দু বার।
সে তারিখে আগে-পিছে ছুটি শুধু যার।
যে কোনো শুকুরবারে ডেকে দিতে পারো।
তাতেও অমত নেই জেনে রেখো, কারো।
হোক বড়-মেজ-সেজ পার্টি হোক ছোট।
বন্ধের ডাকটি দিলে ঘরে গিয়ে ওঠো।
একদিন বন্ধ হলে দুইদিন ছুটি।
মাংসের সঙ্গেতে খাও হাতে-গড়া রুটি।
সকালে চায়ের সাথে গরম কচুরি।
দুপুরেতে মাছ-ভাত অথবা বিচুড়ি।
হবে না আপিসে যেতে ট্রেনে-ট্রামে-বাসে।
গিলে কিছু ছুটে গিয়ে আজ উর্ধ্বশ্বাসে।
রকে বা ঘরেতে বসে পেটা যাবে তাস।
না হয় তো সে শুয়ে কবো এ-পাশ ও-পাশ।
গলিতে ছেলেরা খেলে উইকেট পুতে।
চ্যাচায় ‘আউট’ বলে, দেবে নাকো গুতে।
অথবা সে খেলে বল নাম ক্যাম্বিস।
বলে, ‘হাঁদু করলি তো ডাহা ড্যাম্ মিস্’।
গোল দিলে হই-হই রই-রই করে।
ফাঁকডালে ছুটি পেলে কেবা আর পড়ে।

২

দুপুরেতে টিভি দেখা হল না তো তাই।
গিলি ব্যাজার বড় চোখে ঘুম নাই।
কাজের মাসি ও পিসি আসে নিক আজ।
রেলের বনধে তাঁর বেড়ে গেছে কাজ।
বলে, ‘সব বনধ ডেকে হাত-পা গজাবে।
কাজ নাই, কাম নাই, দেশটা মজাবে।
বাংলা-বন্ধ ডেকে করে পথ অবরোধ

সিনেমা দুঃসংবাদ

পিনাকী ভাদুড়ী

ছবিটির বড় গুণ হল, এতে অপর্ণা
সেন নিজে নামেননি, ভাগ্যিস!
তাহলেই তাঁর ওই কৃত্রিম বাচনভঙ্গি
শুনে দাঁতে কাঁকর পড়ত বার বার।

বাঙালির দুর্বলতা হল ইংরেজি

বাঙালির ছেলে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে ইংরেজি। তারপরে হিন্দি।
বাংলার প্রতি তৃতীয় শ্রেণীর প্রেম তার। অপর্ণা সেনের Mr. and
Mrs Iyer এইজন্যই জনপ্রিয়। কারণ এটা ইংরেজি বই। আর
যেহেতু বইতে যারা ইংরেজি বলছে তারা কেউই ইংরেজ নয়, তার ফলে
এদের ইংরেজিটা সহজে বোঝাও যাচ্ছে। ইংরেজের ইংরেজি তো, বোঝা শক্ত,
যেজন্য ওটা শক্ত বোঝা হয়েছে চেপে বসে। মোট কথা, ইংরেজি না জানাটাই
বাঙালির সবচেয়ে বড় অপরাধ।

শুধু তাই নয়, এতে হিন্দি সংলাপও আছে। কারণ, ওই যে বলেছি, বাঙালি
বাংলার বদলে ইংরেজি আর হিন্দিই বেশি পছন্দ করে।

ইংরেজিতে ছবি তোলার উদ্দেশ্য তো ধরা গেল, এখন বিধেয়টা ধরা
যাক। ছবির পটভূমি হল দাঙ্গা। দাঙ্গার আতঙ্কই মানুষকে দিশেহারা করেছে।
ঐ অবস্থাতে মানুষ সহযোগিতার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, আবার সহযোগীকে
বাঁচাবার জন্য অক্লেশে তাকে স্বামী বলে পরিচয়ও দিয়েছে। পরিচালকের
সহানুভূতি এদের দিকেই, যদিও বিপরীত যে মানুষগুলি বিরূপতার পরিচয়
দিয়ে তাদের প্রতি যদি অনুকূল মনোভাব দেখাতেন সেইটিই উপযুক্ত হত।
ঐ মানুষেরাও কেউ খারাপ নয়, শুধু ভীত। ভয় পেয়েছে তারা। ভয় তাদের
দায়িত্ব কর্তব্য ভুলিয়েছে। এদের নিয়েও ছবি করা যেত।

পরিচালক সে চেষ্টা করেননি। তিনি বানিয়েছেন সেই গল্প, যে গল্প বার
বার অনেকেই বলেছে। বিষয়টির মধ্যে একটি প্রেমের সম্ভাবনাও দেখা যায়—
তবে তাকে বাড়াতে যাননি পরিচালক। বাঁচিয়েছেন। ঐ একটু প্রেম প্রেম
খেলেছে শুধু।

তবে যে আতঙ্ক এই ছবির প্রধান উপাদান, সেইটি এখানে প্রায় নেই।
প্রথমে বাসের মধ্যে যে সিন্চুশোন তৈরি হচ্ছিল, বাস থেকে নেমেই তা ভেঙে
পড়েছে। বাইরে কারফিউর মধ্যেও ছেলেমেয়েরা যা করছিল তাকে পিকনিক
বললে ভুল হবে না। এমনকি ওখানে প্রেম সম্পর্কিত গালগল্পও চলেছে। মনে
হচ্ছে না এখানে 'আশেপাশেই জীবন নিয়ে খেলা হচ্ছে। কারফিউ, পুলিশ,
আগুন,—উপকরণের অভাব ছিল না। খুনও হয়েছে। তবু পরিচালক বা মিস

করছেন তা হল আতঙ্ক। পর্দার আতঙ্ক দর্শকের মধ্যে সংক্রামিত হয়নি। সেইটে
মিস হয়ে গেছে বলেই মিসেস আয়ার শুধু একটি ট্রেনের রোমান্স হয়ে রইলেন,
রোমান্স জাগাতে পারলেন না। আতঙ্ক যেখানে দাঙ্গাবাজদের মূলধন, তাকে
স্পষ্ট করলেই তাকে আমূল বিদ্ধ করা যেত (গুজরাট সত্ত্বেও বলছি),
পরিচালক এ কথাটা বুঝলেন না বলে দুঃখ হয়।

এই প্রথম কল্পনা সেনকে এ ছবিতে মানিয়েছে ভালো। ফোটোগ্রাফিও
আলাদা করে বেশ লাগবে, যদিও তা কাহিনীতে প্রবেশ করেনি। ছবিটির বড়
গুণ হল, এতে অপর্ণা সেন নিজে নামেননি, ভাগ্যিস! তাহলেই তাঁর ওই কৃত্রিম
বাচনভঙ্গি শুনে দাঁতে কাঁকর পড়ত বার বার। সেইরকমই মনে হত।

তারপরে আবার তিনি অভিনেত্রীর শিরেপা পেয়ে গেলে আলোকজাগারের
মতোই এ বিচিত্র দেশের নামে সেলুকাসকে ডাকতে হত আমাদের।

ইংরেজি মিডিয়াম সিনেমার সুখ্যাতিতে বাংলা মিডিয়াও মুক্তকণ্ঠ, তারা
যে ইংরেজি বোঝে না,—এর পরে এমন কথা কে বলবে আর? বাংলা ভুলেছে
তারা বহুকাল, তবে সেজন্য একালে কোনো দোষ তো নেই।

সরকারি বদান্যতায় এবং আমাদের কতিপয় বাংলা-দাদার অতি
উৎসাহে সকলকিছু বঙ্গীকরণের তুমুল ধুম পড়িয়াছে। পরিভাষা ও
প্রতিশব্দের ধাক্কা জিহ্বা ভাষাহীন ও কর্ণ শব্দহীন হইবার উপক্রম
হইয়াছে। কাহারো কাহারো দস্তরুটি কৌমুদীও নাকি নড়বড় করিতেছে।
আমরা সেইসকল দুর্বোধ্য শব্দসমূহের কিছুকিছুর সরল বাংলা করিবার
উপায় ঠাউরাইয়াছি। ভাবিবেন না আমরা বাংলা-বিদেষ্টা, বরং অধিকতর
বাংলা-প্রেমী; কেননা গভীর রাত্রে কয়েক পাঠর বাংলা গলাধঃকরণ
করিবাব পরই আমাদের মস্তিষ্ক সাফ হইয়া আসে এবং দিব্যদৃষ্টি লাভ
পূর্বক আমরা এই অনুবাদ-কর্মে লিপ্ত হই। ক্রমশঃ সকল দুর্বোধ্য শব্দেরই
সরল বাংলা বাংলা মতে আমরা আবিষ্কার করিতে পারিব বলিয়াই
আমাদের প্রবল বিশ্বাস।

দুর্বোধ্য ভাষা

বাস্তকার

অধিকর্তা

শংসাপত্র

মহাবিদ্যালয়

কোম্পাগার আধিকারিক

ভবিষ্যনিধি

সম্মেলক সঙ্গীত

উত্তর বেতন

পোষক

সরল বাংলা

ইঞ্জিনিয়ার

ডিরেক্টর

সার্টিফিকেট

কলেজ

ট্রেজারি অফিসার

প্রভিডেন্ট ফাণ্ড

কোরাস

পেনসন

স্পেনসর

তারাপদ রায় ও গঙ্গারাম

তারাপদ রায়

‘হাওড়া স্টেশনের ইতিহাসে লোকাল ট্রেনের কোনো প্যাসেঞ্জারকে এই প্রথম সী অফ করা হবে। তুমি চেষ্টা করলে ঘটনাটা Ripley সাহেবের Believe it or Not (বিশ্বাস করুন কিংবা নাই করুন) গ্রন্থমালায় লিপিবদ্ধ করতে পারো।



মফঃস্বলের দিকে একটা কবি সম্মেলন ছিল। মফঃস্বল মানে ঠিক কাছাকাছি নয়। বর্ধমান থেকে দুর্গাপুরের মধ্যে একটা ছোট স্টেশন থেকে কয়েক মাইল দূরে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ধারে একটা পুরনো শহর। সেই শহরেরই সাধারণ পাঠাগারের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে সাহিত্যসভা, কবি সম্মেলন ইত্যাদি।

আমাকে অবশ্য সেই ছোট স্টেশন অবধি যেতে হবে না। বর্ধমান স্টেশনে নামলেই হবে। স্টেশনের বাইরে উদ্যোক্তারা গাড়ি রাখবেন। সেই গাড়িতেই কবি সম্মেলনের শহরে পৌছব।

রবিবারের দিন বাড়ি থেকে সকাল-সকাল বেরোছি। বাড়ি থেকে ট্যাক্সিতে হাওড়া স্টেশনে গিয়ে সেখান থেকে লোকাল ট্রেনে বর্ধমান। সব মিলে ঘণ্টা চারেক সময় লেগে যাবে। উদ্যোক্তারা মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন রেখেছেন। মধ্যাহ্নভোজের পর কবি সম্মেলন সন্ধ্যার আগেই শেষ হবে। একটু তাড়াতাড়ি করলে রাত গভীর হবার আগেই কলকাতার বাসায় ফিরে আসা যাবে।

কিন্তু আমার তো ঝামেলার অন্ত নেই। প্রধান ঝামেলা শ্রীমান গঙ্গারাম বেরোনোর মুখে এসে উপস্থিত।

‘কোথায় যাচ্ছেন?’

আমি বললাম, ‘কবি সম্মেলনে।’

‘লেগেন হাসির লেখা, আর যাবেন কবি সম্মেলনে? আপনার যাওয়া উচিত হাস্য সম্মেলনে।’

আমি বললাম, ‘সে আবার কি?’

গঙ্গারাম হেসে বলল, ‘টিভিতে দেখে নেন। হিন্দিতে উর্দুতে কিরকম সব জমজমাট হাস্য সম্মেলন হয়।’

আমি বললাম, ‘বাংলায় হয় না কেন?’

গঙ্গারাম কোনো জবাব না দিয়ে হঠাৎ ঘরের ভেতর থেকেই “এই ট্যাক্সি” “এই ট্যাক্সি” করে চেঁচিয়ে একটা রাস্তার ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে দিল।

এই বিষয়ে গঙ্গারামের বাক্য অনস্বীকার্য। রাস্তায় বেরিয়ে এসে গঙ্গারাম আমার সঙ্গে ট্যাক্সিতে উঠে বলল, ‘যাই হাওড়া পর্যন্ত। আপনাকে সী অফ করে আসি।’

আমি বললাম, ‘হাওড়া স্টেশনের ইতিহাসে লোকাল ট্রেনের কোনো প্যাসেঞ্জারকে এই প্রথম সী অফ করা হবে। তুমি চেষ্টা করলে ঘটনাটা Ripley সাহেবের Believe it or Not (বিশ্বাস করুন কিংবা নাই করুন) গ্রন্থমালায় লিপিবদ্ধ করতে পারো।’

শেষপর্যন্ত গঙ্গারাম শুধু হাওড়া স্টেশনেই গেল না, আমার টিকিট কেটে আনল। নিজেরও প্ল্যাটফর্ম টিকিট কাটল। তারপর প্ল্যাটফর্ম খুঁজে আমাকে ট্রেনে বসিয়ে দিল। জানলায় দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। রবিবারের দুপুরের লোকাল। তেমন ভিড় নেই। ট্রেন হুইসল দিতেই গঙ্গারাম হঠাৎ দরজা দিয়ে ঢুকে আমার পাশে বসল। আমি বললাম, ‘ব্যাপার কি?’

গঙ্গারাম বলল, ‘কাজকর্ম কিছু নেই। তাই আপনার সঙ্গে ঘুরে আসি।’ আমি বললাম ‘বর্ধমান স্টেশনে কিন্তু টিকিট চেকিংয়ের খুব কড়াকড়ি সেখানে তোমাকে ধরবে।’

গঙ্গারাম বলল, ‘টিকিট তো আছে।’

আমি বললাম, ‘ও তো প্ল্যাটফর্ম টিকিট।’

গঙ্গারাম বলল, ‘বর্ধমান স্টেশনে কি প্ল্যাটফর্ম নেই? প্ল্যাটফর্মেই তো আমার টিকিট চাইবে।’

এবার আমি জিজ্ঞাসা করি, ‘তুমি কীজানো যাচ্ছ? আমাকে সঙ্গ দেবো? জন্মে, নাকি রেলভ্রমণেব জন্মে? নাকি কবি সম্মেলন শোনবার জন্মে?’

গঙ্গারাম উত্তর দেয়, ‘কোনোটাই নয়।’

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করি, ‘তবে?’

গঙ্গারাম হেসে বলল, ‘মধ্যাহ্ন ভোজের জন্য। কতকাল যে মফঃস্বলের মধ্যাহ্নভোজ খাইনি।’

পুরুষ মহল

‘গাঁক গাঁক’ বিভাগ

সামলোচন : উন্মাদন দলপতি

● একটা বউ নিয়েই জীবন আমার জাহাঙ্গিরে গেছে। শুধু মুখ ফুটে একবার বলেছিলাম, আমি আরেকটা বিয়ে করব? ব্যস, আমার বউ আমাকে পিটতে শুরু করেছে। আমাকে আপনারা বাঁচান।

—রাজীব রায়, কুচবিহার

□ কথটা একটু সংশোধন করে বলুন—তুমি আর একটা বিয়ে করবে?

● অনেক মনোবিজ্ঞানী বা পরমর্শদাতা গিমিদের উপদেশ দেন, তাঁরা যেন পঞ্চাশ বছরের পর কর্তাদের একটু চোখে চোখে রাখেন। এই সময়ই নাকি তেনারা একটু উড়ু উড়ু করেন। রমাপদ চৌধুরীর ‘বীজ’ গল্পে এমনই ঘটনার কথা বলা হয়েছে। কেন এঁরা এসব কথা গিমিদের বলেন?

—মধুসূদন ঘরামী, বাঁকুড়া

□ বলে দেব, আপনার ক্ষেত্রে তাঁরা যেন গিমির বদলে আপনার প্রেমিকাকে বলেন।

● আমি প্রেম করে বিয়ে করেছি। কিন্তু ইদানীং আরেকটি মেয়ের সঙ্গে প্রেমে জড়িয়ে পড়েছি। এরপর আরো একটি মেয়েকে ভালো লেগে গেছে। এ রোগ কবে কমবে?

—শ্যামলাল সাহা, সন্টলেক

□ বউ যেদিন দশ প্রহরণ ধারণী হবে। ঝাঁটা, খুস্তি, চালাকাঠ ইত্যাদি নিয়ে।

● একটা দুঃখের কথা বলে একটু হাল্কা হতে চাই। আমার একমাত্র বউ আমাকে ছেড়ে তার বয়স্কেশের সঙ্গে ভেঙে গেছে।

—রবিন ঘোষ, কলকাতা-৩০

□ সেইদিনই তো যথেষ্ট হাল্কা হয়েছেন।

● বিয়ের পর পাঁচ-পাঁচটা বছর কেটে গেছে। এখন আমার বউ একজনের সঙ্গে প্রেম করতে শুরু করেছে। খুব মনোবেদনায় আছি।

—নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, কলকাতা-৯

□ এতদ্বারা প্রমাণিত, যে বিয়ের পাঁচ বছর পরেও আপনার স্ত্রীর হৃদয়ে প্রেম জাগ্রত, জীবিত ও বর্তমান। আপনার তো আনন্দ করা উচিত মশাই।

● আমার বয়স ৭৭। অকৃতদার। বিয়ে করব না ঠিক করেছিলাম। কিন্তু ইদানীং প্রচণ্ড বিবাহের শব্দ জাগ্রত হয়েছে। কোনো পাত্রী জোটা কি সম্ভব?

—হরপ্রসাদ চাকলাদার, বীরভূম

□ আর কিছুদিন অপেক্ষা করুন, ওপারে উর্বশী-রস্তারা মালা-টালা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পৌছলেই হয়।

● আমি যাকে ভালোবাসি তাকে বোন বলেই ডাকি। এ নিয়ে কি ভবিষ্যতে সমস্যা হতে পারে?

—বিবেক ভট্টাচার্য, পাঁশকুড়া, মেদিনীপুর

□ সাবধানে থাকুন। বন থেকে শেষে কী বেরোবে কে বলতে পারে।

● শুনছি নাকি নারী-শাসিত সমাজ হবে? ভাবতেই যে বৃকে শুকিয়ে যাচ্ছে।

—চণ্ডীনাথ গাঙ্গুলী, কলকাতা-১২

□ আপনি শাসিত হন না বুঝি? আপনার স্ত্রী কি নিতান্তই বৈষ্ণব?

● আমার মামাতো শ্যালিকা আমাকে প্রেম নিবেদন করেছে। আমি আবার খুব পত্নীভক্ত। প্রেম করা উচিত হবে কি?

—রাহুল হাজরা, বেলঘরিয়া

□ কখনোই না। আপনি কেসটা আমাদের কাছে দ্রুপফার করে দিন। আমরা বিশেষ পত্নীভক্ত নই।

● বসন্তকাল এলেই আমার মন এমন উদাস হয়ে যায় কেন বলতে পারেন?

—সঙ্কর্যণ দত্ত, চৌধুরীপাড়া

□ কোনো সুন্দরীর দাস হবার জন্যেই।

● আমাদের পাড়ায় এক পাগল আছে। তার একটাই কাজ, থেকে থেকে চিৎকার করে ওঠে—ভালোবেসে সুখ নেই। তবে কি আমরা কেউ আর ভালোবাসব না?

—নয়নচাঁদ হাতি, তমলুক

□ পাগল কি তাই বলে ভালোবাসতে বারণ করেছে?



মারায়ণ

পিনাকীশঙ্কর চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশিত-র পর)

তত্বাত্ত্ব মিথুনাদেকং পুমাংসং পাপ নিশ্চয়ঃ।

জ্ঞান বৈরনিলয়ো নিষাদন্তস্য পশ্যতঃ॥

—বান্দীকি,

কৌশল কৌশলী বসিয়া আছিল বৃক্ষডালে।

এক ব্যাধ সেই পক্ষী বিক্লিষ্ট নলে॥

—কুণ্ডিবা।

সেদিন সকালে বান্দীকি নিজের আশ্রমের মধ্যে পায়চারি করছিলেন। শান্ত সুন্দর নিরুপদ্রব উজ্জ্বল সকাল। তমসা নদীর ফুরফুরে হাওয়া এসে শরীর ঠাণ্ডা করে দিচ্ছে। বান্দীকি পায়চারি করতে করতে সেদিন ক্লাশে ছাত্রদের জুজুৎসুর একটা নতুন প্যাচ শেখাবার কথা ভাবছিলেন, আর হাত পা নেড়ে নিজের ছায়ার সঙ্গেই প্যাচটা রপ্ত করছিলেন। হঠাৎ একটা ভয়ঙ্কর চিৎকার — কা-আ-কা-আ—।

কানের কাছে হঠাৎ এরকম একটা বেয়াড়া ধরনের চিৎকার শুনে বান্দীকি আঁতকে উঠলেন। কোথাকে আসছে এরকম একটা বেয়াড়া শব্দ? প্রথমটায় মনে হল তাঁর জুজুৎসুর প্যাচে চিৎপাত হয়ে ছায়াটাই কি জানি চিৎকার করে উঠেছে। পরে ভুল ভাঙল। না, ছায়াটা চিৎকার করেনি। সে বেচারী যেমন কে তেমন বান্দীকির দেহের সঙ্গে লেপ্টে আছে। চিৎকার করার কোনো ক্ষমতা নেই।

পাশে দাঁড়িয়েছিল ভরদ্বাজ নামে একটি ছাত্র। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাস্টারমশায়ের জুজুৎসুর প্যাচ ক'টা দেখছিল আর প্যাচের কামদা দেখে আঁতকে আঁতকে উঠছিল। বান্দীকি ভাকেই জিজ্ঞেস করলেন—কী ব্যাপার, এত চিৎকার কিসের?

ভরদ্বাজ বলল—একটা ছেলে একটা কাক মরে ফেলেছে।

—বলো কী? মরে গিয়েও কাকটা এত জোরে চিৎকার করছে?

—আজ্ঞে না। যে কাকটা মরে গেছে সেটা একদম চুপ, চিৎকার করছে অন্য কাকেরা।

—তা ওরা চিৎকার করছে কেন? ওরা কি কাকটার বউ?

—কি জানি, হবে বোধ হয়।

—না। তাই বা কেন হবে? মানুষের বেলা বর মরে গেলে তার বউ কাঁদে। কাঁদে এই জন্যে যে বরটা টাকা রোজগার করে বউকে খাওয়াত। সেই বরটা যদি মরে যায় তবে তাকে এখন খাওয়াবে কে? সেই শোকেরই বউরা কাঁদে। কিন্তু কাকের বেলায় তো সে রকম নয়। বর কাকেরা টাকা রোজগার করে বউ কাককে খাওয়ায় না। ওরা নিজেরাই যে যার কত খেটে খুটে খুটে খাবার যোগাড় করে। কেউ কারও তোয়াক্কা করে না। তাহলে?

ভরদ্বাজ নতুন বিয়ে করেছে। একটু লজ্জা লজ্জা চোখ করে বলল— তাহলেও একটা প্রেম ভালোবাসাতো আছে। একজন মরলে আর একজনের মনে দুখে হবে বই কি।

—খুস। তুমিও যেমন। কাকের আবার প্রেম ভালোবাসা। ওরা তো বছরে

বছরে বর বদল করে। তুমি বোধহয় জান না প্রত্যেক বছর চোদ্দই ফেব্রুয়ারি ওরা সেই বছরের জন্যে সঙ্গী বেছে নেয়। সেটাই ওদের বিয়ের দিন। ওই দিনটাকে বলে ঋষি ভ্যালেন্টাইন দিবস। ওই দিন ওরা সঙ্গী বেছে নিয়ে এক বাসায় একসঙ্গে বসবাস করতে থাকে। তারপর কী হয় জান?

এবারে তো ভরদ্বাজের দ্বিগুণ লজ্জা। বান্দীকির প্রশ্ন শুনে ভরদ্বাজ উত্তর দেবে কী, তার চোখ মুখ লাল হয়ে গেল। একসঙ্গে একবাসায় বসবাস করার সময় একটা বর কাক আর একটা বউ কাক কী করতে পারে সেটা স্বয়ং গুরুদেব বান্দীকি চোখের দিকে তাকিয়ে ভরদ্বাজ মুখ ফুটে বলে কেমন করে। সে চোখ নামিয়ে চুপ করে রইল।

বান্দীকির চিন্তা কিন্তু ভরদ্বাজের চিন্তার ধার কাছ দিয়েও গেল না। উনি ওই বয়স অনেকদিন আগেই পার হয়ে এসেছেন। ভরদ্বাজের চুপ করে থাকাকে তিনি ওর মুখতা ভেবে নিলেন। ক্লাশেও পড়বার সময় যে কোনো একটা কথার অর্থ জিজ্ঞেস করলে ওই মুখটা ওই রকম বোকাম মতো চুপ করে থাকে। বান্দীকি নিজেই ধরিয়ে দিলেন—সেই বাসায় বউ কাকটা ডিম পাড়ে, তারপর কী হয় বলতো।

তারপর কী হতে পারে বা বান্দীকি কিসের কথা জানতে চাইছেন সে সম্বন্ধে ভরদ্বাজের কোনো জ্ঞান ছিল না। কিন্তু ততক্ষণে আসল বিপদটা কেটে যাওয়ায় তার বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া লেগে গেছে। আন্দাজে একটা ঢিল ছুঁড়ে দিতে বাধা নেই। বলল—তারপর ডিম ফুটে কাকের বাচ্চা হয়।

—হ্যাঁ, ডিম ফুটে বাচ্চা হয় ঠিকই কিন্তু সেগুলো কাকের বাচ্চা নয়।

সর্বনাশ। কাকের ডিম ফুটে কাকের বাচ্চা হবে নাতো কি শেয়ালের বাচ্চা হবে? ব্যাপারটা ভরদ্বাজের মাথায় তো ঢুকলই না, ঢোকাব চেষ্টাও করল না। চুপচাপ বান্দীকির মুখের দিকে চেয়ে রইল। এসব ক্ষেত্রে বোকা সেজে বোবা হয়ে থাকাই ভালো। বোবার শত্রু নেই।

বান্দীকি নিজেই ব্যাপারটা শোলসা করলেন। কাক তার নিজের বাসায় ডিম পাড়ে। তারপর কোনো একসময় একটা কোকিল এসে সেই ডিমটা ফেলে দিয়ে সেখানে নিজে ডিম পেড়ে রেখে যায়। কাক সেটাকেই নিজের ডিম ভেবে তা দিতে থাকে। ডিম ফুটে বাচ্চা বেবোলে সেটাকে নিজের বাচ্চা ভেবে-আদর যত্নও করে। কাক-কোকিল দুই-ই কাগো। তাই মা কাক সহজেই বোকা বনে যায়। কিন্তু যখন সেই বাচ্চার গলায় বোল ফোটে তখন সে কা কা ডাকের বদলে কুহ কুহ ডাকতে থাকে। তখন মা কাকটা নিজের ভুল বুঝতে পেরে বাচ্চাটাকে তাড়িয়ে দেয়। এই ভাবে অন্যের বাচ্চাকে পালন করে বলে কাকের আর এক নাম পরভূৎ। আর অন্যের কাছে পালিত হয় বলে কোকিলের আরেক নাম পরভূৎ। কোকিলকে পরপুষ্টও বলা হয়। এ ছাড়া ওই একই কারণে কোকিলের আরও একটা নাম আছে সেটা হল ঋদ্ধপুষ্ট বা ধ্বংসপুষ্ট।

ভাষণটা শুধু বড়ই হল না, ভরদ্বাজের বোকামির পক্ষে বেশ কঠিনও বটে। ভরদ্বাজের ঘাবড়ে যাওয়া চোখমুখ দেখে সেটা বান্দীকিও বুঝে গেলেন।

কথা য়োরাবার জন্যে বললেন—তা মারার জন্যে এত জিনিস থাকতে ছেলেটা বেছে বেছে ওই কাকটাকেই মারতে গেল কেন? কাক তার কী করেছে? তাছাড়া কাকের মাংসও শুনেছি সুস্বাদু নয়।

বান্শীকির কথাটা শুনে ভরদ্বাজ এতক্ষণে তার লাইন ফিরে পেল।—না না, মাংস খাবার জন্যে মারেনি। এটা হচ্ছে হাত ‘প্যাকটিশ’। যাকে বলে হাতের সুখ।

—সে কি! একজন হাতের সুখ করবে আর তার জন্যে এক বেচারী কাককে মরতে হবে? এতো ভারি অন্যায় কথা। হোয়াট ইজ ফান টু ইউ ইজ, ডেথ টু মী। শেষের ইংরেজি কথাটা বান্শীকি ছোটবেলায় রত্নাকর থাকা অবস্থায় কোনো একটা ইংরেজি বইয়ে পড়েছিলেন। এখন সুযোগ পেয়ে সেটাই কপড়ে নিলেন। যদিও বেচারী দেহাতি ভরদ্বাজ কথাটার মানে কিছুই বুঝল না তবু একটা ইংরেজি বোড়ে বান্শীকীর মানটা তো বাড়ল। সেটাই যথী লাভ।

ভরদ্বাজ বলল—ছেলেটাকে কদিন আগে ওর বাবা রাজপুরের মেলা থেকে একটা এয়ারগান কিনে এনে দিয়েছে। এয়ারগান হাতে পেয়ে ও এখন চোখের সামনে যা দেখছে তাতেই গুলি করছে। গুলি করে ওর পড়ার বই খাতা সব ঝাঁঝা করে দিয়েছে। সন্ধ্যাে ওর মা ওকে রুটি খেতে দিয়েছিল। সেগুলো সব গুলি করে উড়িয়ে দিয়েছে। ঘরে আরশোলা ইদুর টিকটিকি গুলোকে নিশানা করে গুলি চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত একটাকেও মারতে পারে নি। কিন্তু নেশাটা চড়েই যাচ্ছে। এখন গাছের ডালে পাশাপাশি বসে থাকা দুটো কাককে দেখতে পেয়েছিল। বর বৌ-ই হবে বোধ হয়। তাদেরই একটাকে তাক করে গুলি চালিয়ে দিয়েছিল। হাতের একেবারে অব্যর্থ টিপ তো। কাকটা দেখে মারল তির বকটা গেল মরে। যেটাকে নিশানা করে গুলি চালিয়েছিল সেটা উড়ে পালিয়ে গেছে আর অন্যটা গুলি খেয়ে ঝপাত করে মাটিতে পড়ে গেছে।

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং তুমগমঃ শাস্বতীঃ সমাঃ।

যং ক্রৌঞ্চ মিধুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্।।

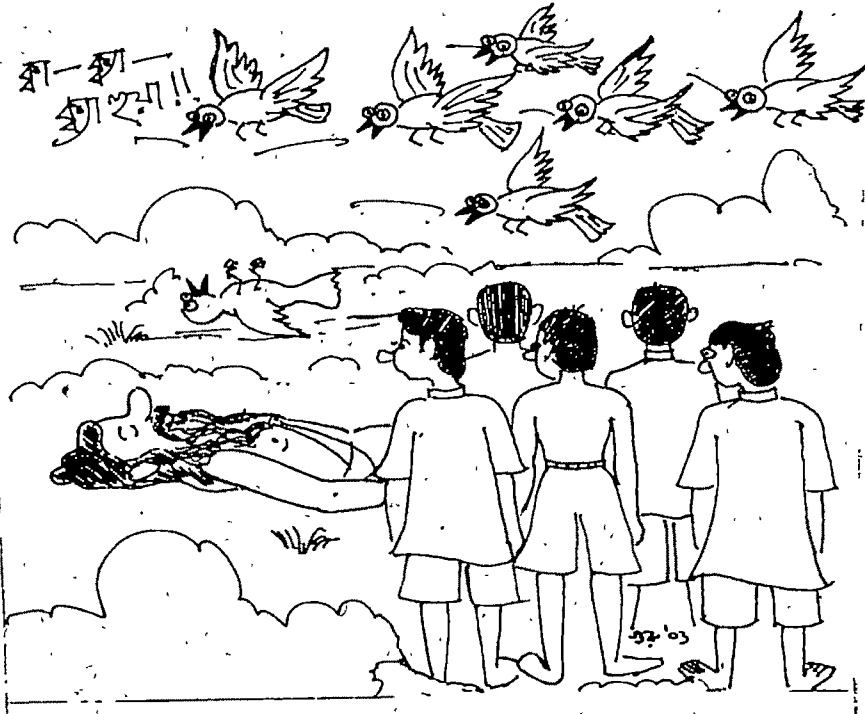
—বান্শীকি।

বান্শীকি আর ভরদ্বাজের এইসব কথাবার্তার মাঝেই কিন্তু ওদিকে কাকের চিংকার ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। বান্শীকির কানে ওই চিংকার খুবই কৰ্কশ লাগছে। অসহ্য! কিন্তু উনি করেনই বা কী। চিংকার থামান কী করে? কাকের ডাকের সঙ্গে তো যুযুতু চলে না।

কাকের জাতও বড় সাংঘাতিক। মরে একটা চিংকার করে হাজারটা। আরাকানে কাক মরেছে কান্দাহারে হাংকার। কাক মরেছে তমসা নদীর ধারে তো চিংকার করতে করতে কাক ছুটে আসছে সেই টেমস নদীর ধার থেকে। শুধু কি টেমস কাক আসছে পৃথিবীর সব প্রান্ত থেকেই। কোনো প্রান্ত বাদ নেই। যেখানেই কাকের ‘ক’ আছে সেখানেই কাকের কা কা ডাক আছে। পশ্চিমে কাবুল কান্দাহার কাজাকিস্তান পাকিস্তান কাশ্মীর, পূর্বে আরাকান কাঁকিনাড়া কাকদ্বীপ কলকাতা কেওনঝড়, দক্ষিণে কুমারিকা কোজিকোড কোদাই কানাল কালিকট—কোনো দেশ থেকে আর কাক আসতে বাকি নেই। আসছে তো আসছে আসতেই থাকছে, কা কা করতে করতে আসছে। শুধু কুমিল্লা থেকে এখনো এসে পৌঁছতে পারে নি। ভারত মহাসাগর পার হয়ে আসতে একটু সময় লাগছে।

এত কাকের মিলিত কা কা চিংকারে ওদিকে বান্শীকির দফারফা হবার জোগাড়। চিংকারের চোটে ডেসিমেলের কাঁটা উনিশশো এক চল্লিশের ঘরে চড়ে বসে ধর ধর করে কাঁপছে সেই সঙ্গে বান্শীকির কানের পর্দাও কাঁপছে, এই ফাটে কি সেই ফাটে। অবস্থা হরিবল। যাকে বলে রিয়াল ট্রাবল।

শুধু কি কানের পর্দা। সেই ভয়ঙ্কর আর্তনাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে বান্শীকির আরো অনেক কিছু হতে লাগল। মাথা লাটু হয়ে বন্ বন্ করে ঘুরতে লাগল। চোখ আগুন হয়ে গন্ গন্ করতে লাগল, নাকের নিশ্বাস ঝড় হয়ে শন্ শন্



করতে লাগল, হাত-পা কাঠ হয়ে টন টন করতে লাগল, আর হৃৎপিণ্ড টেকি হয়ে ঢক ঢক করতে লাগল। তার ধুকধুকনি এই ধামে কি সেই ধামে অবস্থা।

বাস্তবিক কথা বলতে গেলেন। কিন্তু তাঁর গলা দিয়ে কথা বার হল না। গলাটা শুকিয়ে কাঠ, জিভটা জমট আর দাঁতগুলো পাটিতে পাটিতে আটকে গিয়ে ঠিক যেন খিল লাগানো কপাট।

কথা বলার চেষ্টায় অনেক আকুলি বিকুলি করার পর বাস্তবিকর মুখ দিয়ে শুধু গৌ গৌ করে একটা শব্দ বার হল। আর তারপরই গলা চিরে বেরিয়ে এল কয়েকটা অর্থহীন কথা।—

—বৌ বৌ গুল গুল গুডুম ঘ্যাচ
ক্যাক কৌ পটাগ্গট চড়চ—

এই পর্যন্ত বলার পরেই বাস্তবিক অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।

পূর্বকথা

মর্ত্যলোক—৬

অজ্ঞান ততো ব্রহ্মা লোক কপ্তা স্বয়ং প্রভুঃ।

চতুমুখো মহাতেজা দ্রষ্টা তৎ মুনি পূর্ববম্॥

—বাস্তবিক

ব্রহ্মার মুহূর্ত-যাচি হাজার বৎসর।

পুনঃ আইলেন ব্রহ্মা যথা মনিবর॥

—কৃষ্ণিবাস

একটা কাক মরে যাওয়ায় যেমন কোটি কোটি কাক জুটে গেছে তেমনি এক বাস্তবিকর দূরবস্থায় চারদিক থেকে দেহাতির্য এসে জুটে গেল। তারা যদিও কোটি কোটি নয় তবে সংখ্যায় বেশ অনেকটি। বাস্তবিকর অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবার খবরটা এ গাঁয়ে ও গাঁয়ে চাউর হতে বেশি কণ লাগল না। এসব খবর বাতাসের আগে ছোটে। খবর পেয়ে সবাই দৌড়ে এল আর ভিড় করে উঠানে শুয়ে থাকা বাস্তবিকর চারদিকে দাঁড়িয়ে গেল। মেয়ে-পুরুষ ছেলে-বুড়ো সবাই। যে যেখানে যে অবস্থায় ছিল খবর পেয়ে সেই অবস্থাতেই দৌড়ে এসেছে। মেয়েদের কেউ খুঁটি হাতে কেউ ঝাঁটা হাতে কেউ কলসি কাঁখে আবার কেউ ছেলে কোলে। আর পুরুষদের কেউ কোদাল হাতে কেউ লাঠি হাতে কেউ বুড়ি মাথায়, আবার একজন তো লোটা হাতে কানে পৈতে জড়ানো অবস্থায়। সে বেচারী হন হন করে যাচ্ছিল মাঠের দিকে মাঝপথে খবরটা শুনে তার পেটের চাপ মাথায় উঠে গেছে। দৌড়ে এসেছে।

বাস্তবিকর এরকম হঠাৎ ভির্মি খেয়ে পড়ে যাওয়ার কারণটা লোকগুলো কেউই কিছু ধরতে পারেনি। সবাই ধতমত খেয়ে গেছে। যুবকদের মধ্যে দু-একজন এগিয়ে এসে বাস্তবিককে ধরে তুলতে গেল, কিন্তু তাদের বুদ্ধিমান দাদারা বাধা দিল,—যদি ওকে দানোয় পেয়ে থাকে তবে তো যে ওর গায়ে হাত দেবে দানো তাকেই ধরবে। তার চাইতে অপেক্ষা কর, ওঝা আসুক, সে এসে যা করার করবে। নিজেরা আগ বাড়িয়ে কিছু করতে যাওয়া ঠিক হবে না।

বড়দের অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে বাচ্চারা চ্যা চ্যা চিংকার জুড়ে দিল। বুড়ারা মনে মনে ভয় পেলেও বাইরে সেটা জ্ঞানতে না দিয়ে একমনে রামনাম জপ করতে লাগল। আর মেয়েরা মুখে কাপড় চাপা দিয়ে তৈরি হয়ে রইল; উনি মরে গেছেন জ্ঞানতে পারলেই সুর করে মড়াকামা গুরু করে দেবে।

এই সময় ঘটল একটা কাকতালীয় ঘটনা। তালটা গাছের উপরেই পেকে পড়ব পড়ব করছে, একটা কাক তার পাশ দিয়ে উড়ে গেল, অমনি পাকা তালটা দুম করে মাটিতে পড়ল। তালটা দুম করে পড়ল না পড়ে দুম

করল, সে তর্ক বাংলা ভাষার জন্মের দিন থেকেই শুরু হয়ে সমানে চলেছে; কোনোদিন মীমাংসা হবে বলে মনে হয় না। তবে ওই তর্কের মীমাংসা হোক বা না হোক আমাদের এই ক্ষেত্রে ঘটনাটা যে কাকতালীয়বৎ হয়ে গেল সে ব্যাপারে সবাই একমত তো বটেই, আমিও একমত। কাকটিও উড়ে গেল তালটিও বোঁটা থেকে খসে পড়ল।

কী অদ্ভুত যোগাযোগ। বাস্তবিকর আশ্রমের মধ্যে যখন ওইসব হৈ হট্টগোল চলছে ঠিক সময়েই আশ্রমের পাশ দিয়ে নিজেদের কি একটা কাজে যাচ্ছিলেন আমাদের পূর্ব পরিচিত সেই ব্রহ্মা আর নারদ। কাকেদের চিন-চিংকার—মাফ করবেন, কাকেদের চিংকারকেকাক-চিংকার বলাটাই ব্যাকরণ সম্মত। কিন্তু যে কোনো চিংকারের মাহাত্ম্য বোঝবার জন্যে লোকে চিন চিংকার কথাটা ব্যবহার করে, আমিও করলাম।—আর দেহাতি মেয়ে-পুরুষের হৈ হট্টগোল শুনে ওঁদের মনে কৌতূহল হল। ওঁরা দু'জনে গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে গিয়ে ঢুকলেন আশ্রমের ভেতরে। আর ঢুকেই চিড়ির। ঠিক যেন লিভিংস্টোনের ভিক্টোরিয়া আবিষ্কার।

চারদিকে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়ে-পুরুষগুলোকে ঠেলে সরিয়ে ব্রহ্মা আর নারদ গিয়ে দাঁড়ালে বাস্তবিকর মুখোমুখি। মুখোমুখি অবশ্য ঠিক বলা যায় না। ওঁরা দু'জন আছেন পৃথিবীর উপর লম্ব আর বাস্তবিক হয়ে আছেন লম্বা। এ অবস্থায় মুখোমুখি হওয়া সম্ভব নয়। তবে বাস্তবিককে ওখানে ওই অবস্থায় দেখতে পাওয়া মাত্রই ব্রহ্মা আর নারদের মধ্যে চোখে চোখে কথা শুরু হয়ে গেল।

নারদ বললেন—আমি চিনতে পেরেছি। এ হচ্ছে সেই রত্না।

ব্রহ্মা বললেন—চিনেছ বেশ করেছে। তাই বলে এখন ওকে অ্যারেস্ট-ফ্যারেস্ট করতে যেও না যেন। সরকারি নিয়মে আমরা এখন রিটার্ড অফিসার। আমাদের কথারও কোনো দাম নেই কাজেরও কোনো মূল্য নেই। শুধু কি তাই। কলকাতার পুলিশের কাছে তুমি ওকে রত্না বলে সনাক্তই করতে পারবে না। তারা ওকে মেলাতে চাইবে তাদের কাছে ওর যে ফটোটা আছে তাই দিয়ে। কিন্তু কিছুই মিলবে না। তার এক নম্বর কারণ হল লোকটার চোখ-মুখের অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। দাড়ি-গোফ গজিয়ে লোকটা দেখতে হয়েছে প্রায় সন্ন্যাসীর মতো। আর দু'নম্বর হল পুলিশের মহাক্ষেত্রখানায় থেকে থেকে ওর সেই ফটোটাও এতদিনে পচে গেছে। সেই ছবিতে রত্নার মুখটা কি জানি ইয়েতির মুখের মতো হয়ে গেছে। এখন রত্না বলে কাউকে অ্যারেস্ট করাতে গেলে তোমাকে হিমালয় থেকে একটা ইয়েতি ধরে নিয়ে যেতে হবে। ওসব অ্যারেস্ট-ফ্যারেস্টের চিন্তা এখন ছাড়া।

—আজ্ঞে না। আমি সে কথা বলছি না। আমার পরিকল্পনার কথা তো আপনাকে আগেই বলেছি। লক্ষ্মী-নারায়ণকে কথা দিয়ে এসেছি, তাঁদের জন্যে একটা বাস্তবিক খুঁজে বার করব, যে একটা আধুনিক রামজীবনী লিখবে। জননী নারায়ণীর ইচ্ছে হয়েছে, মর্ত্যে লীলা করতে আসবেন। কিন্তু আপনি তো জানেন, লীলা করার উদ্দেশ্যটাই লোপাট হয়ে যাবে, যদি কোনো জবরদস্ত লেখক সেটা বই হিসেবে লিখে বাজারে না প্রচার করে। জনগণের ঘরে ঘরে বহুল প্রচারের জন্যে লেখককে হতে হবে জবরদস্ত। আর লেখাটাও হতে হবে জমজমাট। অবশ্য আজকাল আর শুধু লেখার গুণে বইয়ের প্রচার হয় না। বই প্রচারের জন্যে ঢাক পেটাতে হয়। ঢাকের শব্দ জোর হলেই বইয়ের কাঁটতির জোয়ার। মার্কেটে ঢাক বাজাবার লোক হল প্রকাশক। প্রকাশকরা লেখকের জন্যে প্রচারক কিন্তু জনগণের জন্যে প্রচারক। সেই প্রকাশকও পরে একজন জোগাড় করতে হবে। কিন্তু আমার এখন উদ্দেশ্যটা হল—আগে লেখাটা তো হোক; প্রকাশকের সন্ধান পরে করলেও চলেবে। তাই আমি এতদিন একজন বাস্তবিকর সন্ধানে ছিলাম। এইমাত্র সেটা পেয়ে

গেলাম। একেবারে খাপে খাপে মিলে গেছে। সে যুগে দস্যু থেকে বদলে যাওয়া খুঁবি বাম্বীকি আর এ যুগে নকশাল থেকে বদলে যাওয়া নয়া বাম্বীকি। আর এই লোকটাই যে বাম্বীকি সেটা আমি জেনে গেছি এই লোকগুলোর কথাবার্তা শুনে। আমরা যখন আশ্রমে ঢুকছিলাম তখন শুনতে পেয়েছি, মেয়েগুলো মুখে আঁচল চাপা দিয়ে কাঁদছে আর বলাবলি করছে, আমাদের বাম্বীকিবাবু আর বাঁচবেনি গো। হায় হায় গো, এমন ভালো লোকটা এমন অপঘাতে মারা যাবে গো। আমাদের কী হবে গো—এই সব। তার মানেই সব মিলিয়ে দুখে দুখে চার। যে-ই কলকাতার রত্নাকর সে-ই এই তমসাতীরের বাম্বীকি। আধুনিক রামজীবনীর সুপ্রসিদ্ধ লেখক।

লোকটা এতদিন এখানে লুকিয়ে বসেছিল, আমি খুঁজে পাইনি। এইমাত্র পেলাম। এখন লোকটাকে চাপা করে তুলতে হবে আর আধুনিক রামজীবনী লিখতে রাজি করাতে হবে। তাহলেই লক্ষ্মী-নারায়ণকে দেওয়া আমার প্রতিশ্রুতিটা রক্ষা পায় আর আমিও ছুটি পাই।

ব্রহ্মা বললেন—তুমি তো বললে ভালো। একটা লোক, যে জীবনে কোনো দিন লেখাপড়া বইপত্রের খার দিয়ে গেল না, শুধু নকশালগিরি আর দাসবাজি করেই দিন কাটাল, তারপর পুলিশের তাড়া খেয়ে এখানে এসে লুকিয়ে বসে আছে, সে কেমন করে একটা রামজীবনী লিখতে পারে? লেখালেখি করতে হলে অন্তত হুই-ই দীর্ঘ-ঈ স্ত্রীনাটা তো থাকা চাই। আর ওর যা চরিত্র, আমার তো মনে হচ্ছে ওর হাতে কলম ধরিয়ে দিলে ও তাই দিয়ে লোকের ভুঁড়ি ফাঁসাবে।

—আজ্ঞে না সে ভয় করবেন না। ওর মনের পরিবর্তন হয়ে গেছে। এখন ও আর ওই সব কাজ করবে না। আর লোকটা লেখালেখির কাজ করতে পারবে কিনা তাই ভাবছেন? ও ব্যাপারটায় আমি নিশ্চিত। লোকটা তো আসলে বাঙালি। বাঙালিরা হয় জন্মকবি। ওই একটা কাজ ওরা খুব পারে। অন্য কাজ-কর্ম ব্যবসা-বাণিজ্য কল-কারখানা কিছু করতে পারুক না পারুক, কবিতা লিখতে সবাই ওস্তাদ। অকসেসে বসে হিসেবের খাতাতেও ওরা কবিতা লেখে—সে মা আমায় তবিলদারি।

আর পড়াশুনা জ্ঞান-বুদ্ধির কথা বলছেন? সে ব্যাপারেও আমি নিশ্চিত। রামজীবনী লিখতে লেখাপড়া শেখার দরকার নেই। আসলে লেখক কিংবা কবি হবার জন্যে কোনো লেখাপড়ারই দরকার হয় না। আজ্ঞে হ্যাঁ, ব্যাপারটা এইরকমই। যারা লেখক তারা শুধু লিখেই যায়, পড়ে না; আর যারা পড়ে তারা শুধু পড়েই যায় লেখে না। লেখেই যায় লেখে না। কিন্তু লোক অবশ্য আছে যারা পড়া লেখা দুটোই করে, তাদেরকে বলে অধ্যাপক। তারা পড়ে টুকলি করে চোখা তৈরির জন্যে, চোখা তৈরি করে ছাত্রদেরকে দেবার জন্যে। ওদিকে আবার ছাত্ররা বইপত্র বাদ দিয়ে সেইসব চোখা পড়ে পরীক্ষায় পাশ করার জন্যে। আর পরীক্ষায় পাশ করে বেকার হয়ে ঘুরে বেড়ায়। বাস, কাম শেষ।

নারদের এই সমস্ত ভাষণ শুনে ব্রহ্মা উত্তরোত্তর বিস্মিত হতে লাগলেন। বললেন—তুমি তো দেখছি অনেককিছু খবর রাখো হে নারদ।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, তা রাখি। অনেক দেশ ঘুরি তো। ঘুরতে ঘুরতেই এসব দেখাশোনা আর শেখা হয়ে গেছে। শুধু কি তাই? ভুলে যাবেন না, আমার বাহনের নাম টেকি। টেকি সব বাড়ির সব খবর রাখে। যেখানে যার যা কিছু হাঁড়ির খবর সবকিছু আলোচনা হয় টেকিঘরে। আর টেকির কল্যাণে আমার কিছুই জানতে বাকি থাকে না।

ব্রহ্মা বললেন,—হ্যাঁ, তা যা বলেছ। তবে এখন তোমার ওইসব কথামত রাখো। লোকটার দিকে নজর দেওয়া দরকার। লোকটাই যদি টেকে যায় তবে তো তোমার রামজীবনীর দক্ষারক্ষা।

নারদ এগিয়ে গিয়ে হাঁটু মুড়ে বসে শুয়ে থাকা বাম্বীকির চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিতে লাগলেন। আহা হা। হিমালয়ের পবিত্র বারি সঞ্চারী পুণ্যতোয়া তমসা নদীর জল বলে কথা এ জল কথা কয়। এর কাছে কোথায় লাগে বিশুদ্ধ আয়ুর্বেদিক সরিষাদ সালসা। এক ঝাপটা বাম্বীকির মুখা ছাড়ি ছাড়ি ডাক দিয়ে পালাতে পথ পেল না। বাম্বীকি মুখা ভেঙে উঠে বসলেন।

বাম্বীকি উঠে তো বসলেন, কিন্তু উঠেই আর এক বিপত্তি। সদ্য মুখা ভাঙা চোখ মেলে সামনেই দেখতে পেলেন ব্রহ্মা আর নারদকে। সময়ের তফাৎ প্রায় কুড়ি বছর। এই কুড়ি বছর সময়কালের মধ্যে পৃথিবীর অনেক কিছুই পরিবর্তন হয়ে গেছে। ছেলেরা বাপ হয়ে গেছে, বাপেরা দাদু হয়ে গেছে। কিন্তু ব্রহ্মা আর নারদের কোনো পরিবর্তন হয়নি। ওই চুল দাড়ির ঘন ঝোপঝাড়। ও জিনিস পরিবর্তন হবার নয়। বাম্বীকি একমুগ্ধক দেখেই চিনে ফেললেন। আর চিনেই ঘাবড়ে গেলেন। খুব স্বাভাবিক। সেই প্রাণঘাতী আঙুলের খোঁচা। সে কি এক জীবনে ভোলায় জিনিস? ও জিনিস ভুলতে অন্তত দুটো জীবন লাগে। আর বাম্বীকির তো কেটেছে মাত্র অর্ধেকটা জীবন। এক ঝটকায় তার সব পুরনো কথা মনে পড়ে গেল।—এখানেও সেই পুলিশের ঝাপটো। তার মানে ওরা ওকে গারদে পুরে পেটাবে। উঃ। সে কি পিটন। বাপ তো বাপ, নিজের নাম পর্যন্ত ভুলে যেতে হয়। ভাবনাটা মনে আসতেই বাম্বীকির সারা শরীর শিউরে উঠল। আর তারই ধাক্কা আবার নতুন করে মুখা যাবার জন্যে তৈরি হয়ে গেল সে।

বাম্বীকির উন্টে যাওয়া চোখ আর গোল হয়ে যাওয়া মুখের ছাঁদা দেখে ব্রহ্মা তার মনের ভাবটা আঁচ করে নিলেন। অভয় দেবার ভঙ্গিতে হাত তুলে বললেন—ওহে বাম্বীকি, তোমার ভয়ের কোনো কারণ নেই। আমরা তোমাকে গারদে পুরবার জন্যে আসিনি। একটা কাজে এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তোমার আশ্রমে গণ্ডগোল হৈ-ইটগোল শুনে ঢুকে পড়েছি। এটা যে তোমার আশ্রম সেটাই আমরা জানতাম না। হঠাৎই তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তা বাপু তোমার এই অবস্থা হল কী করে? কী হয়েছিল?

পাদ বন্ধোক্ষর সমস্ত ক্রীলয় সমন্বিতঃ।

শোকর্তস্য প্রব্রুত্রে মে মোকো ভবতু নান্যথা।।

—বাম্বীকি।

বাম্বীকি মুখ খুলবার আগেই পাশে দাঁড়িয়ে থাকা তাঁর দেহাতি ছাত্র ভরদ্বাজ হাঁউমডি করে কেঁদে উঠল। কাঁদতে কাঁদতেই বলতে লাগল, বাবুরা গো। আমাদের মাস্টারজি আর বাঁচবেনি গো। হাজার হাজার কাকের চিংকার শুনে ওঁব মাথার ঘিলু ঘুরে গেছে। মুখা তো হয়েইছেন, এখন বাঁচাও অসম্ভব। আর যদি কোনোরকমে বেঁচেও যান তবে পাগল উনি নিম্যস হয়ে যাবেন।

নারদ জিজ্ঞেস করলেন—কেন? উনি পাগল হয়ে যাবেন কেন?

—পাগল নয় তো কী বলব? আমি পস্ট শুনেছি, মুছেছা যাবার আগে আগাই উনি এমন কতকগুলো কথা বলেছেন, যা শুধু পাগলরাই বলে।

ভরদ্বাজের কথা শুনে নারদ একটু থমকে গেলেন।—এই রে। ঘাটে এসে বুকি নৌকো ডুবল। বাম্বীকি যদি পাগলই হয়ে যায় তবে তাকে দিয়ে রামজীবনী লেখাবেন কী করে? রামজীবনীর লেখক আব যা কিছু হোক না কেন—হাগল হোক গাভোল হোক, এমনকি উদ্যোম ডোম্বল হোক, চলবে, কিন্তু পাগল হলে তো চলবে না। পাগলকে পাগল বলে জানতে পারলে লোকে আর তার লেখা পড়বে না। তাহলে তো এতদিনের পুরো পরিশ্রমটাই বরবাদ। যাই হোক, মনের ভাব মুখে বুলতে না দিয়ে নারদ ভরদ্বাজকে জিজ্ঞেস করলেন—উনি কী কথা বলেছেন?

—উনি যে কথাগুলো বলেছেন সেগুলো আমার এখনো মনে আছে।

উনি বলেছেন—

গৌ গৌ গুল গুল গুডুম ঘ্যাঁচ্।

ক্যাক্ কো পটাগ্গট চড়চ্—

এই কথাগুলো বলতে বলতেই উনি মুচ্ছা গেছেন। এখন আপনারাই বলুন, এগুলো কি সুস্থ লোকের কথা? এরকম খাপছাড়া কথা তো শুধুমাত্র পাগলরাই বলে।

ভবদ্বাজের কথাগুলো শুনে নাবদের মুখে হাসি ফুটল। যাক বাবা, বিপদ কেটেছে। শুধু কেটেছে তাই নয়, ব্যাপারটা একেবারে ঠিক দিকেই এগোচ্ছে। যাকে বলে খাপে খাপ মিলে যাওয়া।

নারদ ভবদ্বাজের মুখে দিকে চেয়ে বললেন—বাপু ভরদ্বাজ, ভয় পেয়ো না। তোমার মাস্টারজির মুখ দিয়ে যে কথাগুলো বেরিয়েছে সেগুলো কোনো পাগলের প্রলাপ নয়। এসব কথার অর্থ চট্ কবে বোঝা যায় না, কিন্তু কথাগুলোর একটা গূঢ় অর্থ আছে। অর্থটা হল এই যে—ওবে গৌয়ার গোবিন্দ ছোকরা, তুই গুডুম করে গুলি ছুঁড়ে একটা কাক মেরে ফেললি। এখন হাজার হাজার কাকের ক্যা ক্যা চিংকারে আমার প্রাণ যায়। ইচ্ছে হচ্ছে তোকে ধরে পটাগ্গট চড় মারি।

এইরকম আধিভৌতিক প্রক্রিয়ায় নিজের মনে ভাব প্রকাশ করার নাম আধুনিক কবিতা। যে পড়বে সে তো মাথামুগ্ধ কিছু বুঝবেই না, যে শুনবে সেও কিছু বুঝবে না। মারের থেকে মাথাটাই জ্যাম হয়ে যাবে। তবে এইমাত্র তোমার মাস্টারজি যেটি রচনা করেছে সেটি আধুনিক কবিতার চেয়েও এককাঠি সরস। এর একটা বিশেষ নাম দেওয়া দরকার। যেহেতু তোমার মাস্টারজি কাকের চিংকার শুনে খাবি খেতে খেতে এটি রচনা করেছে তাই এটার নাম দেওয়া যাক খাবিতা।

তারপব নারদ বাম্বীকির দিকে চেয়ে বললেন—দেখ বাপু বাম্বীকি, এখন তোমাকে আমি একটা ভালো যুক্তি দিই শোনো। তুমি এইমাত্র যে একটি অসাধারণ জিনিস আবিষ্কার করলে, সেটিকে চিরস্থায়ী করে রাখার জন্যে এই খাবিতা দিয়ে একটা মহাকাব্য রচনা করো। সবি, মহাকাব্য নয় মহাকাব্য। মহাকাব্য তো আজকাল আর লোকে পড়ে টুড়ে না। কিন্তু তোমার মহাকাব্যে এমন সব গরম গরম মশলা থাকবে যে লোকে ধরলে আব ছাড়তে পারবে না। লোকে তো পড়বেই। আর না পড়লেও ক্ষতি নেই। জববদস্ত প্রকাশককে দিয়ে প্রচারের ঠাণ্ডায় তোমার নামটা চারিদিকে ছ হু করে ছড়িয়ে পড়বে। লোকে তখন তোমাকে আদি কবি না বললেও খাদি কবি নিশ্চয় বলবে। খাবি খেতে খেতে খাবিতা লেখা খাদি করি। হাতে বোনা সুতোয় দেশজ তাঁতে তৈরি বিশুদ্ধ পবিত্র নির্মল খাদি বস্ত্রের মতো খাদি বিহীন খাদি কবি।

সদ্য মূর্ছা ভেঙে বাম্বীকি এতক্ষণ ফ্যালফ্যাল চোখে নারদ আর ভবদ্বাজের কথাবার্তা শুনছিলেন। মাথাব মধ্যে বিশেষ কিছু ঢুকছিল না। নাবদের শেষ কথাটায় তাঁর অসাড় হয়ে যাওয়া ঘিলুটা একটু যেন নড়েচড়ে উঠল। বললেন—কিন্তু স্যার, ওই আদি কবি না খাদি কবি ওটা হয়ে আমার কী হবে? মালকড়ি কিছু আমদানি হবে কি? সরকারি পুরস্কার টুবস্কার কিংবা জ্ঞানের পিঁড়ি-টিডি মর্কা কিছু খেতাব?

বাম্বীকির কথা শুনে নারদ বুঝে গেলেন—লোকটা এতদিন বসছাড়া হয়ে তমসা নদীৰ ধায়ে বসবাস করলে কি হবে, বাঙালি মার্কা এটেল বুজ্জিটি এখনো টনটনে। সব কথার শেষে আসল কথাটি হল পাওনাগণ্ড। মনে মনে চটে গেলেও নারদ মুখে যথেষ্ট হাসি ফুটিয়ে বাম্বীকিকে বললেন—দেখ বাপু বাম্বীকি, আজকাল সরকারি পুরস্কার পাওয়াটা নির্ভব কবে সবকায়ের পার্টিকে কে কতটা তোয়াজ করতে পারে তার ওপরে। সেটা সবই তোমার

নিজের হাতে। তবে এটুকু বলতে পারি যে, তুমি যদি একবার নাম করে ফেলতে পাবো তবে অনেক ফয়দা। ধরো যদি কোনো বড় কোম্পানি তাদের বিভ্রাপনের জন্যে তোমাকে স্পনসর করে নেয়, তবে তো টাকাই টাকা।

স্পনসর জিনিসটা কি সেটা বাম্বীকি কোনোদিন শোনেনি। বলল—স্পনসরটা আশাব কী জিনিস স্যার?

—স্পনসর হল সেই কোম্পানি যারা তাদের জিনিস বিক্রির জন্যে তোমার ছবি ছাপবে। তাব জন্যে তোমাকে টাকা দেবে। সেটা মাথাব তেল থেকে পামেব জুতো—যে কোনো জিনিস হতে পারে। তার সঙ্গে তোমার মহাকাব্যের কোনো সম্পর্ক থাকবে না। এই যেমন ধরো কোনো তেল কোম্পানি তোমার চুলদাডি সূক্ষ্ম মুখের ছবিটা ছেপে নিচে তোমার বয়ানে লিখে দিল—অমুক কোম্পানির তেলের গুণেই আমার এই চুলদাডি। কিংবা ধর কোনো জুতো কোম্পানীর বিভ্রাপনে তোমার ছবি ছাপা হল। কেডুস পবে দৌড়োচ্ছে। নিচে লেখা থাকবে—শুধু আমাদের কোম্পানির কেডুস পরে রোজ সকালে তিন মাইল দৌড়োলে এইবকম চেহারা হবে। চেহারাটা কি বকম হবে বোঝবার জন্যে পা থেকে মাথা পর্যন্ত তোমার পুরো চেহারাটাই ছবিতে দেখিয়ে দেবে, একটুও বাখঢাক না কবেই সারা অঙ্গে পবিধেয় বলতে ওই একটি কেডুস। এসব জায়গায় তো আবার টাকাব পবিমাগটা হবে অনেক বেশি।

কিন্তু, দেশ বাম্বীকি, এটাই সব নয়। আসল কথা হল, ভালোমতো নাম হয়ে গেলে দেশের লোক তোমাকে ভীষণ ভালোবাসবে আর মবে যাবাব পবেও তোমাকে মনে রাখবে।

—না না, এটা আপনি বাড়িয়ে বলছেন স্যার। তাবা মবে গিয়েও কি কবে মনে রাখতে পারে? মবে যাবাব পবেও মানুষের মন বলে কিছু কি থাকে, না থাকতে পারে?

—আবে না না। তাদের মবে যাওয়ার কথা হচ্ছে না। কথাটা হল এই যে, তুমি মবে যাবার পবেও দেশের লোক তোমাকে মনে রাখবে। তোমাকে অবশ্য এখন কিছু মরাব কথা বলছি না, কিন্তু মানুষ তো একদিন না একদিন মবেবেই। তখনকার কথা হচ্ছে। চিন্তা করে দেখ, তখন দেশের লোকেবা মহা ধুমধাম কবে তোমার জন্মদিন পালন করবে। সে সব জন্মদিনের আবার ভিন্ন ভিন্ন সব নাম হবে। কোনোটা বাম্বীকি জয়ন্তী কোনোটা বাম্বীকি সন্ধ্যা আবার কোনোটা বা বাম্বীকি নাইট। বছরে দু-তিনবার তো বটেই।

ব্রহ্মা পাশ থেকে বললেন—না না নাবদ, এটা তোমার একটু বাডাবাডি হয়ে যাচ্ছে। লোকে বাম্বীকির জন্মদিন বছরে একদিনই পালন করবে। একটা লোক বছরে দু-তিনবার জন্মাতে পারে না।

নারদ বললেন—না স্যাব, আমি ঠিকই বলেছি। এখন দেশের যা অবস্থা চলছে তাতে বিখ্যাত লোকের জন্মদিনটা তাব জন্মদিনেই পালন করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। পাড়ার ছেলেদের বাই চাগাড উঠলেই তাবা জন্মদিন নাম দিয়ে একটা কবে মোজ্জব শুরু করে দেয়। এটা তাদের চাঁদা তুলে মজা ফুটি মারার একটা মস্তকা। পাঁজি পুথি খুলে সতি-সতিব জন্মদিন খোঁজাব দবকাব হয় না। আবার একদিনে না কুলালে তারা কবি সপ্তাহ কিংবা কবি পক্ষও পালন করতে পারে। বাম্বীকির বেলাও তাই হবে। শুধু কি তাই? সেইসব সভায় বাম্বীকির গুণগান কবে এমন সব বক্তৃতা দেওয়া হবে যা বাম্বীকি কোনোদিন মনে ভাবেনি, জ্ঞানে শেখেনি এমন কিকালেও শোনেনি।

এত কথার মধ্যে নাবদ ব্রহ্মাব দিকে মুখ ঘুরিয়ে বাম্বীকিকে লুকিয়ে একটা চোখ একটু টিপে দিলেন। ভাবটা হল, বাম্বীকিকে এইসব ডোজ দিতে হচ্ছে তাকে রামকাহিনী লিখতে বাজি করানোর জন্যে। আপনি আব এব মধ্যে বাগড়া দেবেন না স্যার।

(ক্রমশ)

হাজার রাজার বাজার!

৩য় তরঙ্গ

অলোক বসু



‘কাকু, তুমি টিকিট কাটোনি কেন?’

ই

দানীং কয়েকমাস ধরে বিনা টিকিটের রেলযাত্রীদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে লালগাড়ি আর ‘চেতনা’ গাড়ি। তারা

খুব বিনা টিকিটের যাত্রী ধরছে। ইদানীং বাচ্চাদের দিয়েও টিকিট চেক করা হচ্ছে—শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশুও তার মধ্যে থাকছে। এসব খুদে টিকিট পরীক্ষকরা বিনা টিকিটের যাত্রীদের জিজ্ঞেস করছে—‘কাকু, তুমি টিকিট কাটোনি কেন?’ যাত্রীরা এই প্রশ্ন শুনে নিশ্চয় লজ্জিত হয়েছেন। যাত্রীদের চেতনা বাড়ানোই এর উদ্দেশ্য। তবুও আমাদের দেশে রেলটা যেন আমাদের পৈতৃক সম্পত্তি—এমন ব্যাপার আছে। অনেক লোককেই দেখা যায় যে সপরিবারে সারাদিন ধুকুমাঝ খরচ করার পরে বেলস্টেশনে এলে টিকিট কাটার কথা মনেই পড়ে না, যেন হিসেব মতন টিকিট কাটাটা ঠিক সাহসী পুকমের কাজ নয়, তীতুরা সব চেকারের ভয়ে টিকিট কাটে। যারা টিকিট কাটে তাদের দিকে তারা এমনভাবে তাকায় যেন মনে হয় বলতে চাইছে—বেচারার টিকিট না কেটে ট্রেনে চড়ার সামান্য সাহসটুকুও নেই। আমরা এভাবেই অভ্যস্ত! কু-খিক কু-খিক রেলের গাড়ি নিয়ে আমাদের যত কাজ আছে—তত ভাবনা নেই। রেলেরও যে

একটা আর্থিক সংসার চালাবার ব্যাপার আছে তা কে বলবে! মনে হয়—আরে এতো এমনিই বেশ চলে। এব আধার টাকা দরকার আছে নাকি? লাগে নাকি টাকা? সরকার তো আছেই।

আমরা ফাঁকি দিতেই অভ্যস্ত। কিন্তু সরকারই বা চলে কি করে? দূর! ও ঠিক চলে-চলে যায়। টিকিট কেটে রেলভ্রমণ যে কাপুরুষের পরিচয় তা এক বয়োজ্যেষ্ঠার উজ্জিত প্রমাণ পাওয়া গেছিল। দূরত্বের রেলভ্রমণের জন্য অবশ্য এ মনোভাব নেই কারো। এই অধম লেখকের এক প্রাচীনা আত্মীয় দক্ষিণেব এক প্রান্তিক বেলস্টেশনে বিবাহসূত্রে থাকেন। পিত্রালয়ের কোনো শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের জন্য তাঁকে নেমস্তম্ব করার সময় কথায় কথায় রেলের ভাড়াবৃদ্ধির কথা উঠেছিল। এই অধম ইদানীং একটু সুনাগরিক হবার চেষ্টায় আছে। তাই দিব্যি পরিপাটি রেলের টিকিট কেটে সে আত্মীয়ের বাড়িতে গেছিল। আত্মীয়া সেই বৃত্তান্ত শুনে তো ভারি অবাক,—‘তোরা বেটাছেলোরা আবার টিকিট কাটবি কিরে?’

শুনে কি লজ্জিত হওয়া উচিত? কে জানে। তবে শুনে মনের মধ্যে কেমন যেন একটা পুরনো খচখচানি জেগে উঠেছিল—ইসঃ সত্যিই তো। কি

বোকামির কাজ হয়েছে। এসব লাইনে চেক হয় নাকি? শুধু শুধু পয়সা জলে গেল। কটা টাকা জমে যেত।

আমরা যখন বাড়ি থেকে দুটো স্টেশন ঠেঙিয়ে হাইস্কুলে পড়তে যেতাম—টিকিট কাটার বালাই ছিল না। পকেটে বিপদের কাণ্ডারী হিসেবে স্কুল কনসেশন ফর্ম যোরাঘুরি করত। তা সেই স্টেশনে টিকিটঘরের পাশের গেটে এক ভালোমানুষ চেকার দাঁড়িয়ে থাকত। সে ঘুম নিত না। আমরা সব যাত্রীরা ভারি বিরক্তিতে তাকে হাত দিয়ে সরিয়ে সরিয়ে গেট পার হতাম। আপদ কোথাকার! কাজের সময় কেন যে বিরক্ত করতে আসে। এই টিকিট চেকার প্রসঙ্গে আমার পরলোকগত খুল্লতাত মহাশয়ের এক গল্প আছে। তার আগে অবিবাহিত এই খুল্লতাত সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত করা যাক। তিনি আক্ষরিক অর্থেই খুব সং ব্যক্তি ছিলেন। চাকরি জীবনে এবং ব্যক্তিগত জীবনে তার নানান সততার কাহিনী নিয়ে আমরা অর্বাচীনরা খুবই হাস্যহাসি করেছি একসময়। নিয়মমাফিক শাকসব্জি খাওয়ার ব্যাপারে তাঁর বাতিক ছিল প্রবাদ প্রতিম। তাঁর কল্যাণে কতরকমের শকসব্জির নাম ও গুণাগুণ আমাদের জানা হয়ে গেছিল। তা তিনি হাজার আর্থিক কষ্টের মধ্যেও জীবনে বিনা টিকিটে ভ্রমণ করেননি, বরং রেলকে প্রাপ্যের বেশি টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন। ঘটনাটা হল—তাঁর যেদিন মাহুলি টিকিট শেষ হত, সেদিনই অফিস ফেরৎ তিনি আগেভাগে সন্ধ্যাবেলায় পরের দিনের মাহুলি আগের দিন কেটে নিতেন। ফলে প্রতি মাসেই একটা দিন তাঁর কাছে সন্ধ্যাবেলায় দুটো এক নামের বৈধ মাহুলি টিকিট থাকত। সেদিন তিনি মাকে বলে যেতেন,—‘বৌদি, আজ আমার একটু দেরি হবে, টিকিট কাটতে হবে ফেরার পথে।’

আমরা তখন সব ভাই বোনবা ফিচেলগিরি করে এ ওর মুখ চেয়ে হাসতাম। মা বলত—‘ছোড়দা, কি দরকার, কাল সকালে একটু আগে গেলেই তো হয়।’

—‘ওসব আপনি বুঝবেন না বৌদি।’

সত্যিই ওসব আমরা তখন কেউ বুঝতাম না। এখনো বুঝি না। তা সেই তিনি একদিন ট্রেনে তাঁর অফিস-পথের উন্টেদিকের স্টেশনে এক দুপুরে গেছিলেন। একটা কাজে এক আত্মীয়ের বাড়িতে তাঁর যাওয়ার দরকার পড়েছিল। তা একে উন্টে পথ, দক্ষিণে দিকের গ্রামের রেলস্টেশন, তায়

দুপুরবেলা। আমাদের বাড়িতে সেদিন তুমুল আলোচনা। আজকে দুপুরে ভারতীয় রেল কোম্পানি বেশ একটু লাভবান হবে। কারণ ঐদিকে সকালেই কেউ টিকিট কাটে না তা ভারদুপুর বেলায় তো প্রগাই ওঠে না। তা আমাদের খুড়ো যখন আমাদের স্টেশন থেকে দুপুরবেলায় টিকিট কাটছিলেন, স্টেশন মাস্টার কাম ক্লার্ক নিশ্চয় অবাক হননি, কারণ তিনি খুড়োকে বিলম্ব চিনতেন। অন্য লোক দেখলে অবাক হলেও কাকুকে দেখে তিনি অবাক হননি। তা আমাদের খুড়ো যখন উক্ত স্টেশনে অবতরণ করলেন তখন তেমন বিশেষ লোক ছিল না, দু-একজন এদিক ওদিক দিয়ে চলে যাচ্ছিল। খুড়ো ধীরসুস্থে যখন গেট পার হচ্ছেন তখন ভালোমানুষ চেকারটা হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল বোধহয় অভ্যেস বশতই। কেউ টিকিট না কাটলেও তার তেমন হেলদোল থাকত না। কিন্তু খুড়োমহাশয় যৎপরোনাস্তি বিগলিত হয়ে টিকিটটি তার হাতে কন্যা সম্প্রদানের মতোই সম্প্রদান করে বলেছিলেন, “আপনি টিকিট চেয়েছেন—আমি তারি খুশি হয়েছি।”

যদিদং টিকিটং তব তদিদং চেকিং মম—চেকার মহাশয় পুলকিত না বিরক্ত হয়েছিলেন বিশেষ জ্ঞানার উপায় নেই। তবে নিদুকে প্রণয় করতেই পারে—এসব আমরা জানলাম কী করে। তারও গল্প আছে। সন্ধ্যাবেলায় আমাদের কাকু ফিরলে আমাদের জননী আশ্রীমার কুশল সংবাদ জিজ্ঞেস করার আগেই জিজ্ঞেস করে বসেছিলেন, “ছোড়না, টিকিট কেটেছিলেন?” বলা বাহুল্য খুবই অসাংবিধানিক প্রশ্ন। ভারতবর্ষ পাকিস্তানের সঙ্গে কোনো একদিন মিলে গেলেও যেতে পারে কিন্তু খুল্লতাতে বিনা টিকিটে ভ্রমণের ঘটনা কতদিনকালেও সম্ভব।

তারপর খুড়ো মহাশয় নিজেই সিকিয়ারে ঘটনাটি বিবৃত করেছিলেন। তারপর কিছুদিন ধরেই পাড়ার লোকজনের তাঁকে দেখলেই অবধারিতভাবে মনে হত—“তারি খুশি হয়েছি।”

তা একবার অফিস যাত্রাকালে শিয়ালদহ স্টেশনে তৎকালীন রেলমন্ত্রী গনি খানের স্বৈচ্ছাসেবক বাহিনীর এক অকালপক্ক ছোকরা তাঁকে টিকিট দেখাতে বলে। সেদিক থেকে দেখতে গেলে সে বেচারার কোনো দোষ ছিল না—সে নিয়োগকর্তার নির্দেশানুযায়ী ভারী কর্তব্যবোধেরই পরিচয় দিয়েছিল। কিন্তু খুল্লতাতে দীর্ঘদিনের মাছুলি টিকিটের যাত্রী। তিনি খেপে উঠলেন,—সবে তো এ লাইনে এসেছ ছোকরা—তুমি লোক চিনতে ভুল করেছ।”

তারপর সে বেচারী স্বৈচ্ছা-চেকারকে আমাদের খুল্লতাতে মহাশয়ের পরপর সাজানো বছরের মাছুলি টিকিট দর্শন করতে হয়েছিল। সে বেচারী সদ্য কলেজ থেকে উৎপাটিত, অনেক কলেজীয় গুণগোলের সে সাক্ষী, কিন্তু এ হেন অভিজ্ঞতা বেচারীর বোধহয় কখনো হয়নি এর আগে। সত্যিই আমরা লোক চিনতে ভুল করি। সঠিক লোক চেনার ক্ষমতা ক’জনেরই বা থাকে।

তা রেলগাড়িকে ফাঁকি আমরাও কম দিইনি। শিয়ালদহের দক্ষিণ শাখার আগে দেয়ালে খুঁটে দেওয়া বৈদ্যনাথ ধামের কাছে ট্রেন থামলে জামিদার নামতাম, কিংবা স্টেশনের পেছন দিকে সটকাতাম। তখন ফাঁকি দেওয়াটা একটা বীরত্ব ছিল যেন, সঙ্গে অবশ্য কলেজের কনসেশন কর্ম থাকত। তখন রবীন্দ্রনাথকে ভারী বোকা মনে হত। সে নাকি লিখেছিল—বিশ্বজোড়া ফাঁদ পেতেছ—কেমনে দিই ফাঁকি। এই যে কি সুন্দর ফাঁকি দেওয়া যাচ্ছে। সত্যি দেওয়া যায় নাকি? ছোটবেলায় যখন মাছুলি টিকিটের সঙ্গে পরিচয়পত্রের বাল্লাই ছিল না তখন প্রায়ই দেখতাম, রোজকার মাছুলি টিকিটের যাত্রীদের টিকিট রবিবার বা ছুটির দিন বুকুড় হয়ে থাকত। পাড়ার অমুকদাদা নানান কাজে অন্যের মাছুলি টিকিট নিয়ে কলকাতা যেত। যদিও অন্যের নামে ভ্রমণ আইনসম্মত নয় তবে এটা বোধহয় খুব একটা ফাঁকি নয়, টিকিট তো কাটাই আছে—গুধু ছুটির দিনে লোকবদল আর কি। দলবদল তো আর নয়।

আবেকটা গল্প আছে। এক ভদ্রলোক একবার নিজের ছেলের টিকিট নিয়ে ট্রেনে উঠেছিল। চেকার একবার টিকিটে যাত্রীর বয়স আর একবার যাত্রীর দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল,—“এ কার টিকিট?”

—“কেন, আমার ছেলের।” পিতার নিপাট উত্তর।

—“আপনার ছেলের টিকিটে আপনি রেল চড়েছেন? এ তো বেআইনি?”

—“কিসের বেআইনি?” বর্তমান রেলযাত্রী অবাক,—“ছেলের টিকিটের টাকা তো আমিই দিয়েছি। তাতে আমি ট্রেনে চড়তে পারব না?” সত্যিই, অকাটা যুক্তি। খণ্ডায় কার সাধ্য?

তারপরের ঘটনা ঠিক জানা না গেলেও কিছু যায় আসে না আমাদের।

রেলের টিকিট না কেটে যাতায়াত করার অভ্যেস মাঝে মাঝে আতঙ্কের জন্ম দেয়। কলেজ লাইফে প্রায়ই কনসেশন ফর্ম পকেটে নিয়ে বিনা টিকিটে ভ্রমণ করা অভ্যেসে দাঁড়িয়েছিল। যেন মনে হত টিকিট না কাটাই সবায়ের দস্তুর। তা একদিন তো দারুণ চেক দিয়েছে। শিয়ালদহ স্টেশন তো কালো কোটের লোকে ছয়লাপ। সেদিনই আবার আমার শিয়ালদহ স্টেশনের দিকে একটা দরকার ছিল। সেই ভেবে দিবি তো শিয়ালদহে নামলাম। নেমে দেখি চতুর্দিকে কৃষ্ণ দর্শন। তখন আবার মাইকে অ্যানাউন্সমেন্ট হচ্ছে—দয়া করে আপনার টিকিট গেটে দেখান।”

কি গোত্রো রে বাবা। দাদারা সব টিকিট দেখতে চাইছে। চারিদিকে বেশ একটা কি হয় কি হয় ভাব। দিবি সাহস নিয়ে সপ্রতিভ ভাবে তো গেট পেরিয়ে গেলাম। কাজটা সবে কলেজে যাবার জন্য যখন কলেজ স্ট্রিটে পৌঁছেছি তখন রাতার কোণের ভিড়ে এক ব্যক্তির কনুইটা আমার পেটে লাগতেই আতঙ্কে চমকে উঠেছিলাম—এই বে। চেকার ধরল।

সেই কখন পেরিয়ে এসেছি শিয়ালদহ স্টেশন। কিন্তু অবচেতনভাবে তখন চেকার ধরার আতঙ্ক। এই বুঝি ধরল।

ছোটবেলায় একদিন দূর থেকে স্টেশনের ওপার থেকে পাড়ার এক দাদাকে চেকারের হাতে ধরা পড়তে দেখেছিলাম। মনে হয়েছিল এ মা কি লজ্জা। আমাদের পাড়ার একজন বড় চাকুরে জামাইয়ের রেলব চেকারের হাতে ধরা পড়া নিয়ে পাড়ায় একসময়ে সরগরম আলোচনা চলত। যেন কি একটা সাংঘাতিক অনর্থ ঘটে গেছে।

আমাদের এক বন্ধুর দাদাকে ছোটবেলায় সিনেমার নায়কের মতো মনে হত। কতদিন ভেবেছিলাম, সিনেমার নায়ক হওয়াই তার ভবিষ্যৎ। কিন্তু শুনলাম সে নাকি কোন দাদার দক্ষিণে রেল চাকরি পেয়েছে, রেলের চেকার হয়েছে। অনেক অনেকদিন তার সঙ্গে দেখা ছিল না। সম্প্রতি এক জনবহুল স্টেশনে তাকে দেখি কি রসিদ ছাড়াই লোকের কাছে টাকা নিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে। সৌভাগ্যবশত আমার বৈধ টিকিট ছিল। তিনি আমাকে খেয়াল করলেন না। আমিও পরিচয় দিলাম না। সেই হীরো প্রতিম চেহারা আজ মাধ্যম টাক, আর মধ্যপ্রদেশ এক ফুটবলে পরিণত হয়েছে।

শেষ কথাটা এক মাথায় ইন্দ্রলুপ্তলা চেকারের গল্প। আমাদের স্টেশনে আমাদের স্কুলের শেষের দিকে এক চেকারের মাঝে মাঝে ডিউটি পড়ত। তখন তো এরকম দশ মিনিটে দশ হাজার টাকা দিয়ে টাকের দশদিকের চুল গজাবার দশকর্মা ভাণ্ডাব ছিল না, তাই তার নিষ্কলঙ্ক মাথায় একটাও চুল না থাকলেও কোনো উপায় ছিল না। অল্পবয়সে তার সারা মাথায় টাক নিয়ে আমরা বন্ধুবান্ধব ঠাট্টা-ইয়ার্কি করতাম অমানবিক ভাবে। একটু খ্যাপাটে লোক ছিল বলে তাকে খ্যাপানোও চলত। আমাদের বিটকেল বন্ধু মধুসূদন তাকে খুবই অমানবিক, অগণতান্ত্রিক এবং অসাংবিধানিক এক প্রশ্ন করত—“কাকু, তুমি মাথায় কী শ্যাম্পু মাখো?”



মটরের শুকনো ফ্রাই

কি কি লাগব্যা : ছুটু ছুটু কইর্যা কাটা মাংস আধকেজি, শুকলো লক্ষা ৭টি, ধনে আধ-চামচ, হলুদ ছুটু চামচের এক চামচ, গোলমরিচ অল্প, রসুল কোয়া ৩টি, মৌরি অল্প, লবঙ্গ ২টি, দারচিনি এক টুকরো, ভিনিগার আধ চামচ, নুন পরিমাণ মতোন, কুচি কুচি আদা আধ চামচ, আলু ছুটু ছুটু ২টি খুব সুরু সুরু করে কাটা, নারকোল ত্যাল মাঝারি চামচের ২ চামচ, সর্ষে অল্প, লম্বা করে কাটা পেঁয়াজ ২ চামচ।

যে ডাবে কইরব্যা : শুকলো লক্ষা, ধনে, হলুদ, গোলমরিচ, রসুল, মৌরি, লবঙ্গ, দারচিনি শিলে বেশ কইর্যা বেটে লিন। মশলা, মাংস ভিনিগার, নুন, আদাকুচি ও যথেষ্ট জল মিশিয়া পাত্র ওপর থেকে কোনো গভীর ঢাকনা দিয়া ঢাকা দিয়া এবং সেই ঢাকনায় জল ভরিয়া রাখুন। মাংস সেদ্ধ হয়ে গেলে আবার রসুল, আলু, নারকোল ত্যাল সর্ষে, লম্বা করে কাটা পেঁয়াজ মিশিয়া দিন। যখন আলু সেদ্ধ হইয়া যাবে ও ঝোল শুকহইয়া যাবে তখন লাবিয়া লিন এবং পাত্রের ঢাকনা খুলে রাখুন, নারকোল ত্যাল গরম করুন এবং সর্ষে ভাজুন। পেঁয়াজ ভাজুন এবং পেঁয়াজ বাদামি হইয়া গেলে মাংস দিন। যতক্ষণ না শুকোচ্ছে, ভাজতে থাকুন। সাবধানে লাড়বেন, যাতে আলুর খাদিগুলো ভেঙে না যায়। মশলা যেন পাত্রের পাশে লেগে না যায়। গরম গরম পরিবেশন করুন।

হেঁসেল

কুটু কোরান

কি কি লাগব্যা : সজনে ডাঁটার শাঁস বার কইর্যা লিতে হব্যা। বাঁধাকপি, বীট, গাজর এবং আলু খাদি খাদি করে কাটা। নারকোল ত্যাল ২ মাঝারি চামচ, সর্ষে ছুটু চামচের ২ চামচ, শুকলো লক্ষা ২টি,— প্রতিটি ৪ টুকরা করে কাটা। দু-টুকরা করে ভাজা কাজুবাদাম আধ কাপ, কুচানো কাঁচালক্ষা ১ চা-চামচ, নারকোল কোরা আধ কাপ। পাপড় ভেজে গুঁড়ো কইর্যা নেওয়া বড় চামচের ২ চামচ।

যে ডাবে কইরব্যা : ৩/৪ কাপ ফুটন্ত জলে তরকারিগুলো ছেড়ে দিন, পাত্র ঢাকা দিইয়া রাখতে থাকুন। তরকারি প্রায় সেদ্ধ হইয়া গেলে এবং জল শুকিয়া গেলে লামিয়ে রাখুন ও লুন দিন, ত্যাে সর্ষে ভেজে শুকনো লক্ষা দিন। ভাজা হয়ে গেলে কাজুবাদাম দিইয়া বাদামি কইর্যা ভাজুন। পেঁয়াজ ও কাঁচালক্ষা দিয়া লেড়েচেড়ে লিন। তারকারি মেশান এবং সাবধানে লাড়বেন। ঝোল শুকহইয়া গেলে লাবিয়ে নিয়া পাপড়গুঁড়ো মিশিয়া গরম গরম পরিবেশন করুন। দেখবেন খেতে কেমন লাগে। একেবারে দারুণ!

ছাঁচি (চাল) কুমড়ার সু

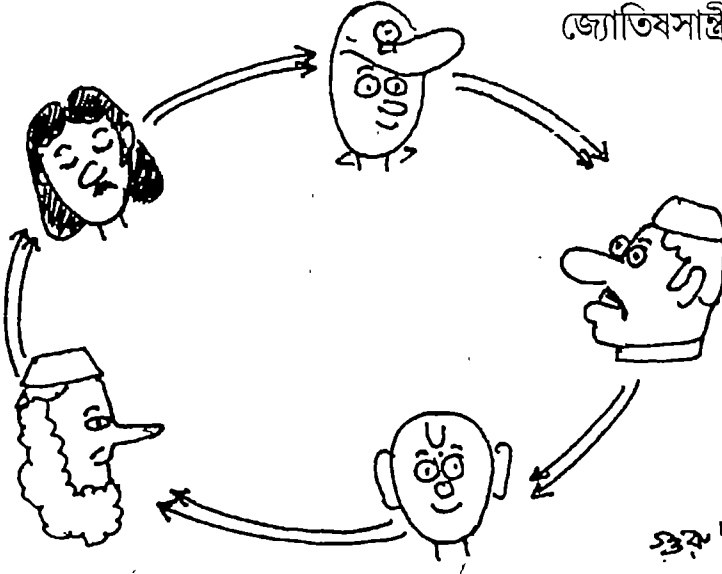
কি কি লাগব্যা : বড় বড় করে কাটা ছাঁচিকুমড়া ২ কাপ, নারকোল ত্যাল ২ মাঝারি চামচ, সর্ষে ছুটু ১ চামচ, দারচিনি ২ টুকরা, লবঙ্গ ৯টি এলাচ ৩টি, ছুটু ছুটু করে কাটা পেঁয়াজ আধ কাপ, লম্বা করে কুচানো আদা আধ চামচ, কুচানো রসুল আধ চামচ, ফাড়া কাঁচালক্ষা ২০টি, কারিপাতা একটি ডাল, নারকোলের দুধ ২ কাপ, নুন পরিমাণমতো, খেঁতো করা গোলমরিচ আধ চামচ।

যে ডাবে কইরব্যা : ত্যাল গরম কইর্যা সর্ষে, দারচিনি, লবঙ্গ, এলাচ, পেঁয়াজকুচি, আদা, রসুল, কাঁচা লক্ষা, কারিপাতা ত্যাের মধ্যে দিয়া ভালো করে লেড়েচেড়ে লিন। এরপর নারকোলের দুধ, নুন, খেঁতো করা গোলমরিচ ও কারিপাতা দিয়া ফুটতে দিন। এইবার ফুটতে থাকলে চালকুমড়ার খাদি দিয়া প্রায়-সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত রাখতে থাকুন। আবার অল্প নারকোলের দুধ দিয়া অল্প আঁচে বসিয়ে লাড়াচাড়া করতে থাকুন, যাতে দুধ ফেটে না যায়। এরপর পরিবেশন করুন। লিজে খাবেন না কিন্তু!

—মিঠু কারক

রাশি চক্রে

জ্যোতিষসাস্ত্রী সৌভাগ্যদমন মহারাজ



১৩/৩

মন্ত্রী ন্যাকা রাশি : ভোট-পূর্ব ভাষণে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি সমূহ পূর্ণ না করার জন্য আপনারা আসন টলমল করার কোনো সম্ভাবনা নেই। দুর্ভাগ্য সাংবাদিকরা আপনার কক্ষপথে মধ্যে মধ্যে উদ্ভিত হয়ে বিঘ্ন ঘটাবে। তবে ক্যাডারকুল কবচেই তাদের কবরে যাওয়ার দশা হবে। সেই অবকাশে আপনি দুঃখপ্রকাশ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে নিতে পারবেন।

গায়ক ন্যাকা রাশি : মাসটি আপনার পক্ষে মোটামুটি শুভ-অশুভ মিশ্র। এই মাস রিমেকের পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল। নিজস্ব কিছু গাওয়ার যোগ্যতা যে আপনার নেই তা ভুলেও স্বীকার করবেন না। অশুভর মধ্যে পাবলিক আপনার যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলবে আর শুভর মধ্যে তাদের দ্বারা আপনার শ্রীমুখটিও রিমেক হয়ে যেতে পারে।

কবি ন্যাকা রাশি : প্রতিটি মাসই আপনার ন্যাকামির পক্ষে প্রশস্ত। তবে এই মাসটি অতীব উল্লেখযোগ্য, কেননা এই মাসেই একটি চারপাতার কবিতা পত্রিকা আপনার হাতে জন্ম নেবে। আর আপনি? কবি থেকে এক লাফে সম্পাদক। কব্যালক্ষ্মী প্রসন্ন থাকায় আপনার ছাপিত কবিতাগুলির এক বর্ণও কেউ বুঝবে না।

খেলোয়াড় ন্যাকা রাশি : মাসটি মোটের ওপর ভালোই যাবে।

পারফরম্যান্সের জন্যে মাঠে মুখ দেখাতে না পারলেও বিজ্ঞাপনে টেলিভিশনে উদ্ভিত হবেন বারবার। জন্ম-শুধিত দর্শকরা গালমন্দ করে ভূত ভাগালেও কাঞ্চন-ধামাকায় তা চাপা পড়ে যাবে। মঙ্গলবার বিবৃতি দেওয়ার সময় এই কথা মুখস্থ রাখতে ভুলবেন না যে—টাকা নয়, খ্যাতি নয়, দেশের জন্যে খেলাই আপনার একমাত্র ব্রত।

ন্যাকা আবৃত্তিকার রাশি : সামনেই কবিপক্ষ। এখন থেকেই রবীন্দ্র-কবিতা আরো নেকিয়ে পড়া অভ্যাস করুন। শ্রোতা পুরো নেতিয়ে পড়ার পর জানবেন আপনি সাফল্যের দোরগড়ায় পৌঁছে গেছেন। কোনো ন্যাকাদাদার আনুকূল্যে জোড়াসাঁকো অথবা রবীন্দ্রসদনে আপনার আবৃত্তি চেকাম কে। আপনার আবৃত্তির নিদ্রাকর্ষণ ক্ষমতা দেখে আপনার নিজেরই তাক লেগে যাবে।

ন্যাকা অসাম্প্রদায়িক রাশি : আপনার চাদরের আড়ালে ছুরিটি কেউ দেখতে না পাওয়ায়, মহানন্দে মানবতার বুলি আউড়ে যেতে পারবেন। ছুরিটি এখন-এখনই কাজে লাগানো যাচ্ছে না বলে দুঃখ করবেন না, সে ঠিক সময়েই সক্রিয় হয়ে উঠবে এবং আপনিই চুকে পড়বে। তবে কিনা আপনারই পেটের মধ্যে।

“নেকা” মাহাত্ম্য কথা

শ্রী ভর্তৃহরি ভট্ট

‘ন্যাকামি’ শব্দটা রোজ ব্যবহার করতে করতে একেবারে জীর্ণ হয়ে গেছে।

শব্দটির পুরনো তেজ যদি থাকত তাহলে শুধু এই শব্দটি বৈদিক মন্ত্রের শুদ্ধতা নিয়ে উচ্চারণ করলেই আজকের দিনের আমাদের দেশের নেতা ও নেত্রী স্থানীয় বহু বিপুল ন্যাকা-নেকির ন্যাকামি-বিদূরিত হত।

শব্দটির উৎসমূলের সন্ধানে গেলে আজকের ন্যাকা-নেকির স্বরূপ নির্ণয়ের গবেষণায় কিছু নতুন জ্ঞান লাভ হতে পারে। শব্দটির উৎপত্তি সম্পর্কে পণ্ডিতেরা বলেন—শব্দটি এসেছে ফারসি শব্দ ‘নেক’ থেকে। তার অর্থ ‘সাধু’। এই ‘নেক’ থেকে ‘নেকা’ ও ‘নেকামি’ ইত্যাদির সৃষ্টি। তবে বাংলায় শব্দটির বর্তমান অর্থ আমূল পরিবর্তিত হয়েছে। শব্দটির বর্তমান অর্থ—সাধুর অভিনয়ে যারা সার্থক। অর্থাৎ এক নম্রের ডণ্ড। ডণ্ডের এই সাধুগিরির অভিনয়ের শিক্ষাটা এসেছে আবার একটি ইংরেজি শব্দের অনুঘর্ষে। সেটি হল—Hypocrite. Hypocrite-এর মূলে আছে আবার একটি গ্রীক শব্দ; সেটি হল Hypocricia. অর্থ—অভিনয়। ফারসি শব্দ ‘নেক’-এর সাধু আর গ্রীক শব্দ Hypocricia-র অভিনয় মিলিয়েই ‘নেকা’ শব্দটি বাংলায় স্থান করে নিল। ‘সাধু’র অভিনয়ে পারদর্শী, অর্থাৎ ন্যাকামিতে পারদর্শী। ন্যাকাদের সংখ্যা মুসলিম যুগ থেকে প্রাক-স্বাধীনতা যুগ পর্যন্ত, অর্থাৎ ইংরেজ রাজত্বকাল পর্যন্ত অনেক কম ছিল। স্বাধীনতা-উত্তর কালে তাদের সংখ্যাবৃদ্ধি আরম্ভ হয়। বর্তমান বাংলায় সবচেয়ে প্রগতিশীল শাসন-ব্যবস্থার ছত্রছায়ায় নির্ভেজাল বিজ্ঞান সম্মত শিক্ষার আলোকে আলোকিত হয়েও ন্যাকা-নেকিদের সংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছে তাতে অচিরে শুধু ভারতে কেন, সমগ্র বিশ্বে বঙ্গবাসী রেকর্ড সৃষ্টির গৌরবে ভূষিত হবে। আজ আমাদের এখানে সমাজের প্রায় সর্ব ক্ষেত্রে Top Position-এ এদের গৌরবোজ্জ্বল অবস্থান। এদের মহিমার কথা শতমুখে বলেও শেষ করা যাবে না। তবে এইসব ন্যাকা-নেকিদের কথা অমৃত সমান। শুনলেও পুণ্য হয়। হালে এদের শিক্ষা-ক্ষেত্রে অবদান নিয়ে খুব হৈ-চৈ হচ্ছে। সে জগতে এইসব মহাপুরুষদের মহিমাময় যে রূপ



দেখেছি, তাদের যেসব রোমন্থকর ক্রিয়াকলাপ আমাদের মতো সাধারণ মানুষকে বিস্ময়ে বিমূঢ় করে দিয়েছে, তারই কিছুটা পরিচয় পঙ্গুর গিরি লজ্জনের প্রশাসের মতো দেবার চেষ্টা করছি।

বিজ্ঞান বিভাগের এক মস্তবড় স্কলার, অনেক গবেষণাপত্র, গ্রন্থ ইত্যাদির ইনি স্রষ্টা, গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে Strict মানুষ, ছাত্রদের মধ্যে ফিসফিসানি—ছাত্রীদের সম্বন্ধে গুঁর নাকি বিশেষ সহানুভূতি দেখা যায়। তবে সংসার আছে—তিনিটি ছেলেমেয়ে, স্ত্রী বর্তমান। পড়াশুনার সমস্যা নিয়ে বাড়ি গেলে সাহায্য করেন। বিশেষ করে ছাত্রীদের। তাঁর মধ্যে একটি বিশেষ ছাত্রী দেখা গেল তাঁর খুব স্নেহের পাত্রী হয়ে উঠেছে। পরীক্ষার বেশ কয়েকমাস আগে থেকেই তাকে ক্লাশে বিশেষ দেখা যেত না। পরীক্ষা যথারীতি হল। মেয়েটিও পরীক্ষা দিল। পরীক্ষায় সেই মেয়েটিই প্রথম শ্রেণীতে প্রথম। প্রথম প্রথম কানামুখে। তারপর সব চূপচাপ। মেয়েটির কোনো

এক আত্মীয়ের সঙ্গে পরিচয় ছিল আমার। বললে—বাড়িতে মেয়েটিকে নিয়ে অশান্তি। প্রবীণ শিক্ষক মশাইকে সে বিয়ে করবেই। তাঁর স্ত্রী-পুত্র বর্তমান থাকার সঙ্গেও। তারপর একদিন গুনলাম, মেয়েটিকে পাওয়া যাচ্ছে না। তার সেই প্রবীণ মাস্টার মশাই অস্ট্রেলিয়ার এক বিশ্ববিদ্যালয়ের Visiting Professor হয়ে গেছেন। মেয়েটি নাকি ভিসা-টিসা করে সেখানে চলে গেছে কাজের সন্ধানে। না গিয়ে তার উপায়ও ছিল না।

আর এক বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার মশাইয়ের কথা। রাজনৈতিক জগতে তত্ত্ববিদ বলে প্রখ্যাত। প্রচণ্ড নীতিবাদী। শহরের উপকণ্ঠে বাড়ি-গাড়ি স্ত্রী-পুত্র নিয়ে পরিপূর্ণ সংসার। পুত্রটি পড়াশুনার ভালো, তবে কয়েকবার জয়েন্ট এন্ট্রাস পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে পড়াশুনো করে। কিছুকাল আগে এম এ-তে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করেছে এবং কলেজ সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষাতেও নির্বাচিতদের তালিকাতে

তার স্থান প্রথম দিকে। লোকে কানামুণো করে। তাতে তার কিছুই যায় আসে না। তারই বাড়ির তলায় একটি ঘর ভাড়া নিয়ে তাঁর কয়েকজন প্রিয় বেকার ছাত্র একটি কোচিং ক্লাশ খুলেছে। এম এ পরীক্ষার্থীদের জন্য। বছরে ছ'হাজার টাকা একসঙ্গে দিতে হয়। তাছাড়া আছে আলাদা ভর্তি ফি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে কোচিং ক্লাশটি অত্যন্ত আকর্ষণীয়। কারণ, সেখানে গেলে নিশ্চিত সাক্ষ্য। তাছাড়া বেশ কয়েকটি স্টার্টআপ সেখানে থেকে প্রতিবছরই বেড়ায়। স্যারের যে-কটি বেকার ছাত্র সেখানে দেখাশুনো করে, নোট দেয়, তারা পড়াশুনায় সতিয়ে ভালো। প্রায় প্রতিবছরই তাদের মুখ বদল হয়। তারা চাকরি পেয়ে চলে যায়, আসে নতুন কয়েকজন। অধিকাংশই দরিদ্র তপশীলীভূক্ত, কিন্তু পড়াশুনায় ভালো। ফলে তাদের চাকরি জুটে যায় এবং শোনা যায়, এ বিষয়ে বদান্য স্যারও তাদের সাহায্য করেন।

এরকম একটি ছেলের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। তার কাছ থেকে শুনলাম, তাদের দিয়ে স্যার নোট লেখান। কোচিং ম্যানেজ করান। বিনিময়ে কোনো মাসে পাঁচশ, কোনো মাসে চারশ টাকা তারা পায়। তাও ঠিক নেই। তার আগে যারা ছিল তাদের কলেজ বা স্কুলে চাকরি সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে পেতে স্যার নাকি প্রকৃত সাহায্য করেছেন। তার ভাগ্যে এখনো কিছু জোটেনি, তার কারণ, স্যারের বাড়ির জন্যে সে যে ‘কাজের মেয়ে’ দিয়েছিল সে নাকি পলাতক।

ছেলেটি দুঃখ করে বলেছিল—এতে তার কী অপরাধ। শ্রদ্ধেয় স্যার সম্পর্কে এইসব কাহিনী Open Secret ওপর-মহলও জানে। তবে শোনা যায়, বিশেষ কোনো প্রভাবশালী সংগঠনে তিনি রীতিমতো মাসিক মোটা চাঁদা দিয়ে থাকেন।

শিক্ষা-সংগঠনের আরো একজন স্যারের কথা খুবই সুপরিজ্ঞাত—তিনি উদার হৃদয়ে ছাত্রদের পি এইচ ডি ডিগ্রি লাভে নিয়মিত সহায়তা করে থাকেন।

এই স্যার শিক্ষা ও রাজনীতির সাংগঠনিক ক্রিয়াকর্মে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকেন। অলিখিত কোচিং ফি-র বিনিময়ে তিনি সফল সহায়তা দান করে থাকেন। বিষয় নির্বাচন থেকে শুরু করে পরীক্ষক নির্বাচনের ব্যাপার পর্যন্ত তাঁর সক্রিয় সহায়তা বিদ্যমান থাকে। দল বিশেষের প্রতি তাঁর প্রবল আনুগত্য। তবে তাঁর কোচিং-এ দল বিশেষের সুপারিশ অপরিহার্য। এমনকি সেই সুপারিশে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তিনি সংশ্লিষ্ট ছাত্র বা ছাত্রীর কাছ থেকে কোনো অর্থই গ্রহণ করেন না। একটি শোনা কাহিনী শোনাই। শিক্ষা-রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে বিজড়িত এক খুদে নেতা বড় নেতারূপে সংশ্লিষ্ট অধ্যাপকের কাছে দাঁড়িয়েছেন। প্রথমে নিজে প্রশ্ন করলেন, পরে অনুজ-প্রতিম সঙ্গীকে বললেন—এই আমাদের সর্বজন শ্রদ্ধেয় দাদা। সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীটির টিপ করে প্রশ্ন ও অত্যন্ত গদগদ শ্রদ্ধায় নিবেদন—‘স্যার, আমি আপনার যে লেখাটি, সম্প্রতি যেটি অমুক পত্রিকায় প্রকাশিত, তা পড়ে অত্যন্ত চমৎকৃত হয়েছি। ও বিষয়ে আমার আপনার কাছ থেকে কিছু জানার আকাঙ্ক্ষা আছে স্যার।’

স্যারের প্রশ্নের হাসি খুদে নেতা বুঝে নিয়েই বললেন, ‘দাদা, এই ছেলেটি কলেজ জীবন থেকেই অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে আমাদের রাজনীতি করে আসছে। খুব ভালো কর্মী। তবে অবস্থা খুব খারাপ। আপনার কাছে ডক্টরেট করতে চায়। অবস্থার চাপে রেজাল্ট ভালো করতে পাবেনি।’

স্যার বললেন, ‘ঠিক আছে, ঠিক আছে—সে না হয় করা যাবে। তুমি যখন এসেছ, একটা কিছু ব্যবস্থা করা যাবে।’

স্যার কথা রেখেছিলেন।

পি এইচ ডি তার হয়েছে। পরবর্তীকালে সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা থেকে কলেজে চাকরি পাওয়া পর্যন্ত ছেলেটি স্যারের সহানুভূতিপূর্ণ সাহায্য লাভ

করেছে। বর্তমানে ছেলেটি অধ্যাপনা কর্মে নিযুক্ত। বন্ধু-বান্ধবদের কাছে বলে—‘ওঁর কথা আর বলবেন না। একেবারে চামার হয়ে গেছে। একসময় আমার কাছ থেকেও টাকা নিতে ছাড়েননি।’

শিক্ষাক্ষেত্রে এই ‘নেকামি’ সম্বন্ধে যদি কেউ গবেষণা করে, তাহলে বোধ করি তার পাতাসংখ্যা মহাভারতকেও ছাড়িয়ে যাবে। প্রাইমারি থেকে মহাবিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিকাশ ভবনের অন্দরে কদরে এত অবিকশিত ও অপ্রকাশিত ‘নেকা’ মহিমার কাহিনী রয়েছে যে তা একটি সংখ্যার ‘পত্রপাঠে’ বলা অসম্ভব জেনে আপাতত সে প্রসঙ্গ স্থগিত রাখতে হচ্ছে।

এবার দৃষ্টি ফেরাই আমাদের আর একটি গৌরব করার ক্ষেত্র স্বাস্থ্য জগতের দিকে। এক ডব্রলোকের স্ত্রীর হঠাৎ অসহ্য পেটের যন্ত্রণা শুরু হয় মধ্যরাত্রিতে। অনন্য উপায় হয়ে এক সরকারি হাসপাতালে অ্যাম্বুলেন্স করে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়। ইমারজেন্সি বিভাগ। সঙ্গে সঙ্গে দু-তিনজন অতিথিও পের ছোঁরা ডাক্তার তাঁকে ট্রলির ওপর একটা বেডে শুইয়ে পরীক্ষা করলেন। একজন এগিয়ে এসে ডব্রলোককে বললেন—‘দেখুন, এখানে তো কোন সীট নেই। পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করলে বোঝাও যাচ্ছে না কী হয়েছে। আপনাকে একজন শুভানুধ্যায়ী হিসাবেই বলছি, আপনি এখনই ঠুঁকে এই নার্সিংহোমে নিয়ে যান। আমাদের একজন বিখ্যাত স্যার ওখানে আছেন। Caseটা ভালো মনে হচ্ছে না। তাঁকে দেখালে ভালো হবে।’

যন্ত্রণা-কাতর স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে ভীতিবিহীন ডব্রলোক ট্যাক্সি নিয়ে ছুটলেন সেই নার্সিংহোমে। সঙ্গে সঙ্গে ডর্তি—Intensive Care Unit-এ স্থানান্তরিত। উৎকর্ষায় অপেক্ষা। সেই বিখ্যাত চিকিৎসককে নার্সিংহোমে থেকে ফোন। তাঁর নির্দেশে চিকিৎসা আরম্ভ হয়ে গেল। রাত্রিশেষে প্রতীক্ষারত ডব্রলোক খবর পেলেন—অবস্থা একটু ভালো। রোগিনী ঘুমোচ্ছে। ডব্রলোক স্বস্তি পেলেন। দু-দিন বাদে রোগিনী পথ্য পেল। মুখের নলটল খুলে দেওয়া হল। ICU থেকে সাধারণ বেডে স্থানান্তরিত করা হল। ডব্রলোক রোগিনীকে দেখে খুবই আনন্দিত। এমন সময় একজন লোক এসে তাঁকে অফিসে যেতে বললেন। সেখানে গিয়ে তাঁর চক্ষু চড়কগাছ। দু-দিনে ওষুধপত্র ইত্যাদি মিলিয়ে ১৮ হাজার টাকার বিল।

এর ওপর আর একটি খাঁড়ার ঘা। একজন বয়স্ক ডাক্তার বেরিয়ে এসে তাঁকে বললেন আড়ালে ডেকে—এখুনি একটা অপারেশন করতে হবে। সেই সুবিখ্যাত ডাক্তারের নির্দেশে এক প্রসিদ্ধ সার্জেনকে দেখানো হয়েছে। রক্ত পরীক্ষা ইত্যাদির রিপোর্টে প্যাথক্রিয়াসে ক্ষতিকর দোষ পাওয়া গেছে। সার্জারির খরচ সমেত প্রায় ৩০ থেকে ৩৫ হাজার টাকা এখনই জমা দিতে হবে। হতভম্ব ডব্রলোক বাইরে বেরিয়ে টেলিফোন করলেন তাঁর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে। তিনি পরামর্শ দিলেন—আর একজন ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ না করে অপারেশনে সম্মতি দিও না। তিনিই তাঁর এক সার্জেন-বন্ধুকে ঠিক করে দিলেন। তিনি এসে রোগিনীকে দেখে তাঁকে একান্তে বললেন—এ রোগীর কিছুতেই প্যাথক্রিয়াসের দোষ হতে পারে না। রিপোর্ট ভুল। ডব্রলোক নিজ দায়িত্বে রোগিনীকে ছাড়িয়ে আনতে গেলে সেই প্রখ্যাত চিকিৎসক বললেন—আপনাদের অযথা ভয় দেখানোর জন্য বলছি না, প্যাথক্রিয়াসের অবস্থা সত্যিই খারাপ। কাজটা ভালো করছেন না।

তবু ডব্রলোক রোগিনীকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে রক্ত পরীক্ষা করালেন। সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

আমাদের দেশে স্বাস্থ্য জগতের ‘নেকাদের’ কী অপূর্ব মহিমা! এরপর ঈশ্বর-আল্লা ছাড়া ভরসার আর কোন জায়গা আছে? উদাহরণ বাড়িয়ে আর কী চেতনার বিকাশ হবে?

পরিশেষে এক জনদরদী সমাজসেবী রাজনৈতিক নেতার 'নেকামি'র মহৎ ইতিবৃত্ত শুনিতে কিছু পুণ্য অর্জনের চেষ্টা করে এই প্রসঙ্গের ইতি করব।

ভদ্রলোক কংগ্রেস জমানাতে ছিলেন একজন বিশিষ্ট সমাজসেবী স্বদেশপ্রেমী কংগ্রেসি শিক্ষক। প্রথম যুক্তফ্রন্টের আমলে তিনি কংগ্রেস ছেড়ে বামফ্রন্টের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। অচিরে কর্মদক্ষতায় একনিষ্ঠ আদর্শবাদী মার্ক্সিস্ট রূপে তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটে। ৫/৬ বছরের মধ্যে, যে স্কুলের শিক্ষক ছিলেন, সেখানেই তিনি হয়ে উঠলেন হেডমাস্টার মহাশয়। অতিদূর প্রসারী তাঁর প্রভাব। সমগ্র অঞ্চলে তাঁর ক্ষমতা অনুভূত হতে লাগল।

তারপর অনেক বছর কেটে গেছে। অবসর নিয়েছেন। বর্তমানে বহু সরকারি, আধা সরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে উপদেষ্টা, সভাপতি ও সহ সভাপতি রূপে জনগণের সেবা করে চলেছেন।

সাধারণ মেধার শিক্ষিত বেকার সংখ্যা সর্বত্র ক্রম বর্ধমান। গ্রামাঞ্চলে, বিশেষ করে একটু শিক্ষাদীক্ষার আলো গেছে—এমন বাড়িতে শিক্ষিত এক বেকার নেই—এমনটা দেখাই যায় না। তাদের মধ্যে অনেকেই কেউ 'দাদা' সম্বোধনে কেউ 'জ্যাঠা' সম্বোধনে সেই বিশিষ্ট জনদরদী মানুষটির কাছে চাকরি করে দেওয়ার আবেদন নিয়ে দিনের পর দিন দাঁড়িয়ে থাকে। এদের মধ্যে একটি ছেলের কাছে সেই বিশিষ্ট জনদরদী মানুষটির এক শিষ্য এসে উপস্থিত। সে ছেলোটিকে বলে, হ্যাঁরে, তোর তো মোটামুটি রেজাল্ট ভালো। তবে স্কুল সার্ভিস কমিশনে চেষ্টা করছিস না কেন? দাদার কাছে তোর কথা বলেছি—তিনি দেখবেন বলেছেন। এরপর একদিন সে এসে বলে, —দেখ, যেখান থেকে

পারিস জমি-জায়গা বন্ধক দিয়ে হোক অথবা অন্য উপায়ে হোক, লাখখানেক টাকা জোগাড় কর। তোর মাস্টারির চাকরি হয়ে যাবে। টাকা মারা যাওয়ার কোনো ব্যাপারই নেই। Interview Letter পেলে অর্ধেক দিবি। তারপর চাকরিতে ঢুকে তিনমাস মাইনে পাবার পর বাকি অর্ধেক দিবি। রাজি যদি না থাকিস, এটা অন্য হাতে চলে যাবে। দাদার তাতে আর কিছু করার থাকবে না।

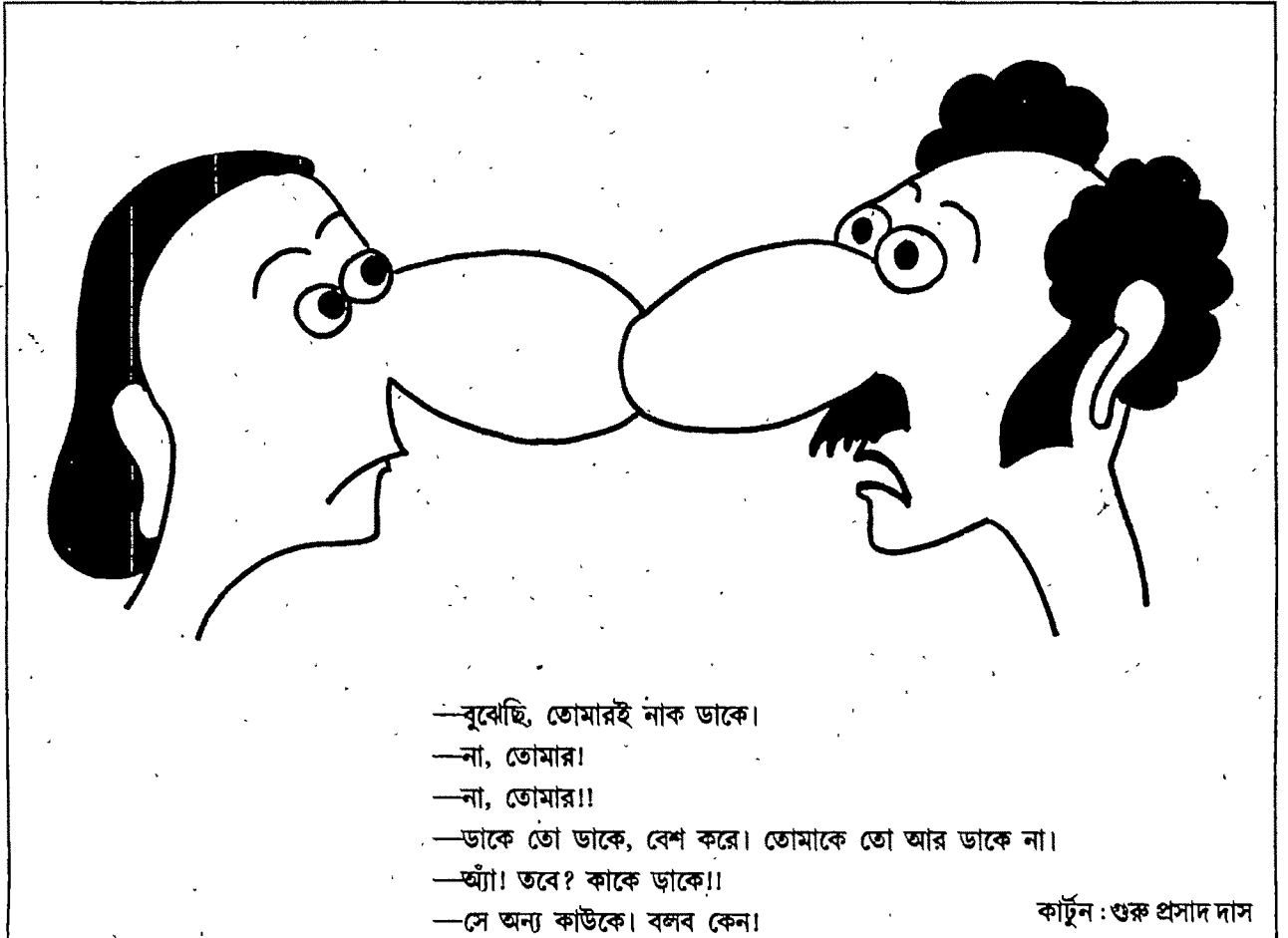
ছেলেটি সত্যিই জমি-জায়গা বেচে সেই টাকা জোগাড় করল এবং নির্দেশমতো অর্ধেক টাকা দিয়ে দিল। Appointment Letter পেয়ে কী আনন্দ। একদিন বাবা-মাকে প্রণাম করে দুর্গা দুর্গা বলে সে স্কুলের দিকে যাত্রা করল। হেডমাস্টার মশাইয়ের কাছে সরকারি Appointment Letter জমা দিল। হেডমাস্টার মশাই পরেরদিন তাকে কাজে যোগ দিতে বললেন।

পরেরদিন যোগ দিতে যাবার পথে একদল সশস্ত্র ছেলে তাকে ঘিরে ধরে বলল—সে যদি বাড়ি ফিরে না যায় তবে তার লাশ পড়ে থাকবে।

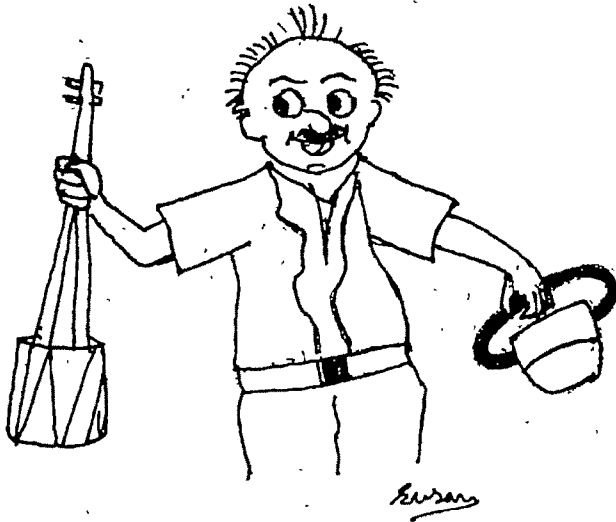
প্রাণের ভয়ে ছেলেটি বাড়ি ফিরে দাদার চালাকে ধরল। সে বলে, এখন তো তার কিছু করার নেই। দাদাও কিছু করতে পারবেন না। এখন যা কিছু সব তাকেই করতে হবে।

তারপর অনেকদিন হয়ে গেছে। এখনো সেই বিভ্রান্ত বেকার যুবক সেই চাকরির পেছনে ছুটছে।

ধন্য সেই 'নেকা' দাদার মহিমা। তিনি আজও সেই পুরাতন মর্যাদায় বিভূষিত হয়ে সগৌরবে বিরাজ করছেন। অলমিতি।



হাট-টু-মা(?)টুম



অভ্যাসের দাসত্ব না থাকলে খবরের কাগজ রাখা কিছুদিন বন্ধ রেখে কিছু অর্থ সাশ্রয় করা যেত। মাত্র চৌদ্দটি দেশের ক্রিকেট নিয়ে বিশ্বকাপ। ক্রমতালিকায় ক্রিকেটের অক্রিকেটিয় কেছা ছাড়া আর

কোনো খবর-স্বখবর থাকছে না।

বানতলার 'গরিমা' কেড়ে নেওয়া ধানতলাও স্থান ভিক্ষা করছে পঞ্চম বা সপ্তম পৃষ্ঠার লাজুক

কলমে। তবে কি ধরে নেওয়া যায় দেশে বেকারি, অশিক্ষা, শিল্প-হাফকার, সাম্প্রদায়িকতা, সীমান্ত সন্ত্রাস ইত্যাদি সব নিকেশ হয়ে গেছে। ভাবা যেতেই পারত এমন। কেউ দোষও দিতে পারতেন না সেজন্যে। তবু ছোট অক্ষরও চোখে বজ্রপাত ঘটায়। প্রবীণ (?) তোগাড়িয়া, যাকে প্রকৃতপক্ষে অবাধ উদ্ভাদ বলাই সমীচীন, ছদ্মকার দিয়েছেন। (এক) সংবিধান বাতিল করবেন, (দুই) হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের জন্যে মহাভারতের যুদ্ধ করবেন। এবং এ যুদ্ধে যাঁরা তাঁদের সহযোগী হবেন না তাঁদের বাবর-সন্তান রূপে গণ্য করা হবে।

প্রধানমন্ত্রী কুতুবমিনারের (সহসাই হযত নাম বদলে বিজেপি মিনার বা অটলমিনার রাখা হতে পারে) চেয়েও দীর্ঘ গলায় সরগরম ঘোষণা করলেন গোমাংস ভক্ষণের পূর্বে মৃত্যু শ্রেয়তর। কে তাঁকে বাধ্য করছে বৈদিক ভোজ্য খেনু-দাবনা অম্লস্ত করত? সবাই জানে, আপকটি খানা—। আরেক প্রধানমন্ত্রী জাতির জন্যে মাগনা প্রেসক্রিপশন দিয়ে গেছেন—স্বম্ভ্র, স্যরি, শামু সেবনের।

কেউ আপত্তি করেনি। কারকে বাধ্যও করা হয়নি। কিন্তু হঠাৎ কবিরাজ প্রধানমন্ত্রীর এমন ঘোষণা কেন? এজন্যে কি যে, তোগাড়িয়া বলছেন, 'গো-মাতা কাটার অনুমতি যারা দেয় সেইসব নেতারা ডুবে মরুক!' তাঁরা নাকি দশ কোটি 'রামভক্ত'কে সংগঠিত করেছেন। এত হনুমান আছে নাকি দেশে? এদের আদমসুমারি হয়েছে তো? প্রচার হচ্ছে—আগামী সংসদ নির্বাচনের আগেই অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণের কাজ শুরু হবে। অযোধ্যাই হবে নির্বাচনের প্রধান ইস্যু। স্বনির্বাচিত তৃণমূল সর্বাধিনায়িকার অনাহৃত ঘোষণা— তেনারা এন ডি এ-তে আছেন এবং প্রধানমন্ত্রীর অশক্ত জীর্ণ হাতকে শক্ত করে ধরে থাকবেন। অথচ তিনি নাকি সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী রাজনীতিতে অঙ্গীকারবদ্ধ। প্রকাশ্যে কোনো নারীকে বহচারিতাদুষ্ট বলা অসভ্যতা—এইটুকু কাণ্ডজ্ঞান এই অখম বৈরাগীর আছে।

ধানতলা নিয়ে মমতাময়ীর আত্ননাদ বিজেপি সংদীয় দলের বঙ্গদর্শনের সুসমাচার পড়ে একটাই জিজ্ঞাসা জাগে—গুজরাটে গণধর্ষণের সময় গলায় কি বাত আর পায়ে সাময়িক পঙ্গুত্ব হয়েছিল?

ধানতলার অপকর্মে সংশ্লিষ্ট সি পি এম নেতাদের তড়িঘড়ি দল থেকে তাড়িয়ে দিয়ে দলে ধ্বস্ত ইমেজে পালিশ লাগাবার চেষ্টা করলেন রাজ্য সম্পাদক। জোড়া খুঁনে অভিযুক্ত দমদমী দুলালের বেলায় তিনি অবশ্য তেমন অ্যাকশন নিলেন না। প্রশ্নের জবাবে জানালেন, দল-গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্ট পাওয়া যায়নি। ছ'মাসেরও বেশি সময় বারে গেছে। মামলা উঠলেও শুনানি হচ্ছে না। যদি বা শুরু হল, কোর্টে দমদমী তোলাবাজদের ষিকখিকে ভিড়, সাক্ষীদের হুমকি। আঞ্চলিক সম্পাদকও সদস্তে তাঁর উপস্থিতি ঘোষণা করেন। ও, নীল বিশ্বাস মশাই আপনার নাকি গণতান্ত্রিক দল এবং এ রাজ্যে সবাই সমান বিচার পায়, পুলিশের দায়িত্ব জার্সির রং না দেখে দুহুতী ধরা ইত্যাদি ইত্যাদি—। আস্তে কন মশায়, ঘোড়ায় না, আপনার ইকোমুখের ন্যাকা কথায় গাধাও মাথা

নাডবো।

ঠিক এই সময়

তুবড়ি কবি ছমছাড়া

চরণ বৈরাগীর ইকড়ি মিকড়ি

তুখোড় এসে বলল, দেখেছেন, মমতা বলেছেন ত্রিপুরায় কংগ্রেস-সিপিএম গটআপ খেলছে।

একটু অবাক লাগল। ক'দিন আগেই পড়েছিলাম তিনি লেখালেখি নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত। নানা ভাষায়, ইনকুডিং ইংরেজি, তাঁর বহু বহু বই বেরুচ্ছে। আর যাই হোক, বই-এর ওপর লাল ত্রিকোণের শাসন নেই। থাকলেও, শ্রেফ লাল বলেই তা মানার কোনো দায়ই তাঁর থাকত না। তবে মনে পড়ল, গত বছরই যেন তিনি বলেছিলেন, বাংলার বদলা নেবেন ত্রিপুরায়। সব তৃণমূল প্রার্থীর জামানত জন্দের 'রটনায়' বলেছিলেন, সব গট আপ পুরোটাই গটআপ। আর সেই অমৃতবাণী—ইসেকশন কমিশন পারচেজড— তো খুবতারা তুল্য। কিন্তু এবারও চর্চিত চর্চন কেন? পুরনো শব্দবদ্ধ? কবি গীতিকার সাহিত্যিকের তুপীয়ে এ কী শূন্যতা?

ছমছাড়া তুখোড় বলল, ত্রিপুরায় বিজেপির সঙ্গে জোট বেঁধে লড়ছে

তৃণমূল। মমতা বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করেছিলাম। ওরা গোপনে সি পি এমের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমাদের হারিয়ে দিয়েছে। অভিজ্ঞতায় দেখেছি, কংগ্রেস গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নেয়।' যাক, তুণীর একেবারে শূন্য নয়।

কিন্তু, কেন কেড়ে নেয়? কীভাবে নেয়? নিতে দেওয়া হয় কেন? যে ভাবে 'মৃতরাষ্ট্র' অটলজির ফুরফুরে হাত শক্ত করে ধরে রাখেন, সেভাবে মইটা ধরতে পারেন না কেন? তাঁর লক্ষ লক্ষ নিবেদিত প্রাণ জাতারা কি সবাই নুলো? এইসব প্রশ্নের উত্তরের জন্যে তুণি কবি নেত্রীর একান্ত তথ্যউপদেষ্টা শ্রী মল্লধর ভান্ডারবাজের সঙ্গে এক নিতৃত সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে। তিনি জানান,—নুলো? নট একজ্যাক্তিলি। তবে ভুলো—ভুলো বলতে পারেন। তবে নুলোও যে একেবারে হতে পারে না, তা আমি বলছি না।

বললাম, আচ্ছা শ্রী মল্লবাজ—

মল্লধর : স্যরি, মল্লবাজ নয়, মল্লধর ভান্ডারবাজ। এম ফর মাদার, এ ফর আপেল, এল ফর—

—নেত্রীও কি বাঙালি বাঙালি গুজব তৈরি করেন?

মল্লধর : নো-ও-ও। আপনি ওয়ান পয়েন্ট প্রোগ্রাম বলছিলেন তো, বাট আওয়ার নেত্রী হাজ মেনি মেনি, বাঙালি বাঙালি পয়েন্টস—

—উরে বাব্বা। একেবারে বাঙালি বাঙালি। পাজাকোলা করে তোলা যাবে তো? দু'একটা স্যাম্পল যদি—

মল্লধর : কেন্দ্রে মন্ত্রী হওয়া অবশ্যই ফার্স্ট পয়েন্ট। তবে সম্মানের সঙ্গে ডাকতে হবে।

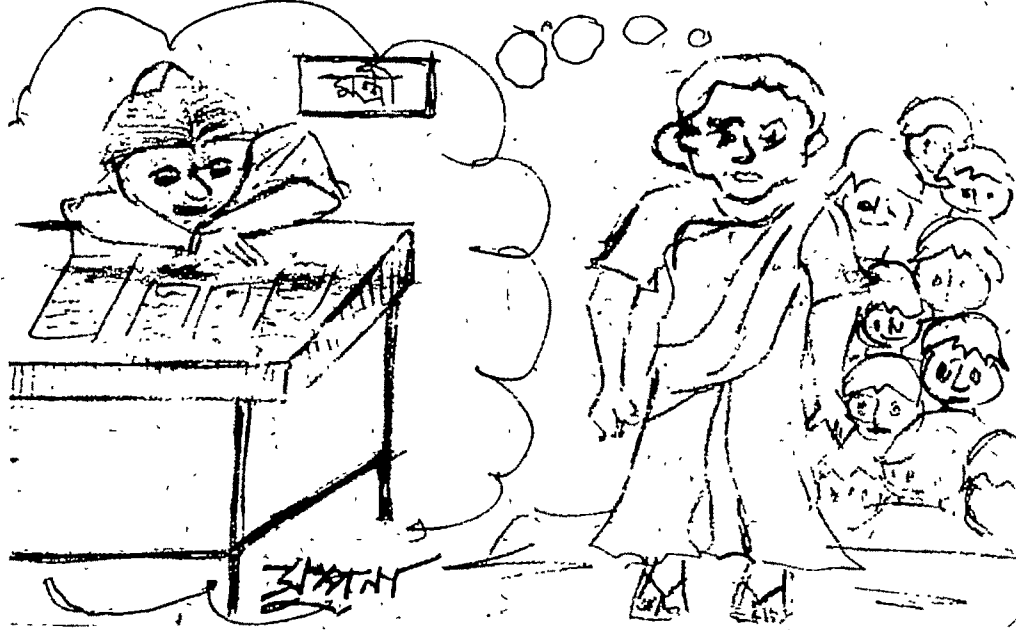
জানতে চাই,—কোনটা ফার্স্ট পয়েন্ট বা প্রাইমারিটি, তা কি ঠিক হয়েছে?

মল্লধর : তার মানে—হোয়াট ডু ইউ মিন?

বললাম, সম্মানের সঙ্গে ডাক পাওয়া, না মন্ত্রী হওয়া—কোনটা ফার্স্ট পয়েন্ট?

মল্লধর : হাঁ। যু হ্যাড অ্যা পয়েন্ট দেয়ার। আপাতত ওটা যুখ্য ভাবে আছে। যুখ্যবিজয়ীর মতো।

—বাঃ। নেকস্ট পয়েন্ট?



—এল ফর লালবাতি।

মল্লধর : এল ফর লালবা— অ্যা, হোয়াই, লালবাতি?

—ওটা গৌড়ানন্দ কবির কথা। মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেছে। তবে লালবাতি জ্বলছে বলছি না। জ্বলবে না যে তাও বলছি না।

মল্লধর : ষড়যন্ত্র—ষড়যন্ত্র হচ্ছে। আমি আর কোনো কথা বলব না।

বললাম, আহা-হা, রাগ করছেন কেন? বিপক্ষের লালবাতি জ্বালার জন্যেই তো এই যুদ্ধযাত্রা। আফটার অল আপনার নেত্রীর তো ওয়ান পয়েন্ট প্রোগ্রাম—

মল্লধর : কে বলেছে? কারা ছড়িয়েছে সাংঘাতিক মিথ্যে এই পাজাকরা গুজব?

পাজা করা! আপনি কি মিঃ পাজার কথা—

মল্লধর : হু ইজ মিঃ পাজা? উই ডোন্ট নো এনি হাঁজা পাজা। পাজা করা মানে বাঙালি বাঙালি—আমাদের নেত্রীর যেমন—

মল্লধর : দ্বিতীয় পয়েন্ট, পছন্দের দপ্তর না পেলে টাইট দেওয়া। থার্ড পয়েন্ট—ঝোপ বুকে কোঁপ মারা। মানে, বেকায়দা দেখলেই ইন্তফা দেওয়া। আর চতুর্থ হল, আপন স্বার্থবিরুদ্ধ সবকিছুই ম্যান মেড বলে চালিয়ে দেওয়া—

—কী বললেন শ্রী মল্লবাজ ভান্ডারব, সবকিছু ম্যান মেইড?

মল্লধর : নো-ও-ও। নট মল্লবাজ, মল্লধর ভান্ডারবাজ। এটাই আপনারদের স্বভাব। ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল মিথ্যে প্রোপাগান্ডা করেন।

—আচ্ছা মল্লবাজ ভান্ডার—স্যরি, স্যরি, মল্লধর ভান্ডারবাজবাবু, গতবার ছিল বদলা নেবার প্রোগান। এবার তেমন কোনো প্রোগান তো শোনা গেল না।

মল্লধর : কেন? প্রোগান আছে, প্রোগান থাকবে, তা যতই স্রো শোনা যাক, থাকবেই। প্রোগান আমাদের ম্যাডামের কবিতার মতোই অনর্গল। তবে এবারের প্রোগানটা খুব এক্সক্লুসিভ। কারুকে ফাঁস করে দেবেন না।

বললাম, সে-বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। ৭০% না! একেবারে

হাড্বেড পার্কে। আপনাদের নেত্রীর ভাষণ শুনেই হাঁসফাঁস করতে হয়। আলাদা করে ফাঁস করার কোনো স্কোপই নেই। আপনি নির্ভয়ে বলতে পারেন—

মল্লধর : এবারের শ্লোগান হল—: কংগ্রেস সিপিএম—এ টিম বি টিম বিজেপি ও তৃণমূল হাটটুমাটুম কুলকুল। এটা আপনাদের সুকুমার রায়ের মাঠে পাড়া ডিম নয়।

জ্ঞানতে চাইলাম,—তবে? হাটটুমাটুম মানেটা যদি বলেন।

মল্লধর : বুঝলেন না তো? জ্ঞানতাম পারবেন না। এটা আসলে শব্দের অতি সূক্ষ্ম বিন্যাস। শব্দের হারাকিরিও বলা যায়। ওহো, আপনি তো আবার এই জাপানি শব্দনৃত্য সম্বন্ধে কিছুই জ্ঞানেন না বোধহয়।

—জাপানি শব্দনৃত্য সেটা নাহয় পরে জেনে নেব। এখন হাটটুমাটুম—এর মানেটা যদি—

মল্লধর : আসলে কথাটা হাত টু মাউথ—অর্থাৎ হ্যাণ্ড টু মাউথ। মধ্যপদলোপী বহুব্রীহির স্টাইলে এটা আমাদের নেত্রীর মৌলিক উদ্ভাবন।

—হাটটুমাটুম—হ্যাণ্ড টু মাউথ কুল? মানে গরিব কুল? কী বলছেন, বিজেপি জোট হ্যাণ্ড টু মাউথ অবস্থায় হেদিয়ে আছে?

শ্লোগান আছে, শ্লোগান থাকবে, তা যতই
শ্লো শোনা যাক, থাকবেই। শ্লোগান আমাদের
ম্যাডামের কবিতার মতোই অনর্গল।

মল্লধর : আপনি কিছু বোঝেননি। আমাদের হাত টু মাউথ মানে হল, ধরো আর গেলো। ক্যাচ অ্যাণ্ড সোয়ালো। দেখছেন না একটা একটা করে আই ডি সির হোটেলগুলো কেমন টপাটপ গিলে ফেলা হল। অয়েল কোম্পানিগুলো হবে। তারপর ব্যাক্স। এল আই সি। কিছু বাদ দেওয়া হবে না। সব ধরো আর গেলো—হাটটুমাটুম। হাটটুমাটুম।

বিগলিত হয়ে বলি, ধ্যান্ডু ধ্যান্ডু,—মল্লবাজ না, না, ভান্নাবাজবাবু, এমন ফ্যান্টাসটিক শব্দের আশু সোনিক হারাকিরি শেখানোর জন্যে।

মল্লধর : যু আর ওয়েলকাম।

বললাম, এতই যখন বললেন ভান্নাবাজবাবু—

মল্লধর : আপনি কি কিছুই মন দিয়ে শোনেন না, মিঃ বৈরাগী? এতক্ষণ ধরে বলছি, নট ভান্নাবাজ—ভান্নাবাজ, আপনি ক্রিকেট কমেটারিও শোনেন না? গ্রামের পুঁচকে ছোঁড়ারাও ভান্নাবাজ শব্দটা জানে। যেমন জানে আমাদের পার্টি তথা নেত্রীর বিরুদ্ধে কত কমপিয়ারিস।

বললাম, ম্যান মেড, কমপিয়ারিস?

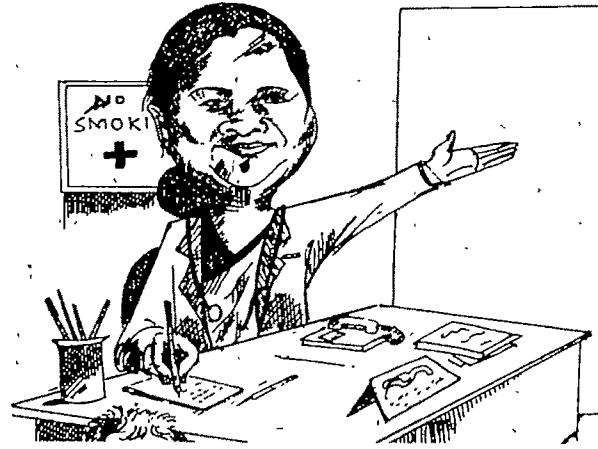
মল্লধর : অফকোর্স। গতবার ম্যাডামের ফ্লাইট ছুতো করে দেরি করিয়ে মিটিংগুলো পণ্ড করেছেন। এবার ওঁকে আগরতলায় ফেলে রেখে প্লেন কলকাতা চলে এল। নেত্রীর ধানতলা যাওয়া ভণ্ডুল করার জন্যে। অল গটুআপ গেম। তবে নেত্রী ছাড়বেন না। আদাপানিতে না হলে বাজখানী পর্যন্ত ট্রাই করে দেখবেন। জরুজা বলেছেন, হ্যাণ্ড টু মাউথ মিনিমিস্ট্রি নেত্রীকে দিতে প্রধানমন্ত্রী ৭০% রাজি হয়েছেন। আর—

—আরো আছে?

মল্লধর : আলবাৎ। নবোদিত তথাগত ঘনঘন গাইছেন—গুজরাটের রাস্তাই আমাদের রাস্তা। ইফ তথাগত সিন্স, ক্যান শি বি ফার বিহাইণ্ড। বুঝলাম কেন শব্দের কাগজে ক্রিকেট ছাড়া আর কোনো খবর থাকছে না। খবরেরও হাত টু মাউথ অবস্থা—ধরো আর গেলো।

দিদি যদি মন্ত্রী হত

গোপলা বোস

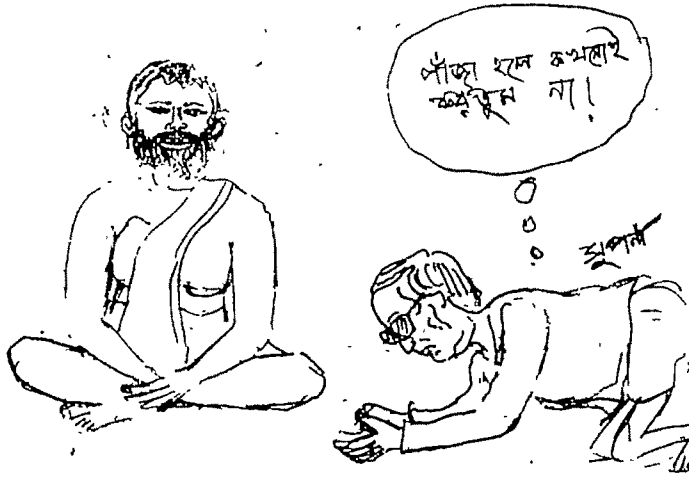


দিদি আমার মন্ত্রী হলে যেতাম আমি দিল্লি
সঙ্গে যেত ন্যাড়া কুস্তি এবং কালা বিল্লি।
সবাই কেমন বলত, দ্যাখো, শেষকালেতে চললি?
দিতাম কেমন চমকে দেখো সংসদেতে চিল্লি।
করে দিতাম গুলটপালট, বললে হল, ইল্লি।
কাগজগুলো ভাট বকে সব, কিসব কথা বললি।
দেব রে এক কানচাপাটি না যদি কান মললি।

সবাই বলে—দিদি নাকি মহারকম 'চান্দ'
'ঝোল খেয়ে যা' টিটকমেতে নেয় নাকি সে 'মান্দ'।
কী যে বলে! বোনটি আমার ভীষণ লোক 'ভান্দ'।
সাদাসিমে দেবীর মতন, (খায়) সেক্ষ ভাতে আন্দ।
(আর) 'কাব' লিখে জ্ঞান করে সে দারুণ রকম 'ঝান্দ'।
কাঁঠাল-পাকা গরমেতে গায়ে কালো 'শান্দ'।

হিংসুটে সব। কী করে যে এমন কন্ঠো পারলি।
এখন খালি খেতে হবে কলকেতারই বালি।
এদিকে যে ভাইগুলো সব ভীষণ জেপে 'গেল্লি'।
মন্ত্রী যদি না হই ওরা সব আমায় ছেড়ে চেল্লি।

জবর থ বর



মার্কস

জ্যোতিবাবুর ধর্ম বিষয়ে ঔদার্যের কথা সুবিদিত। নিজের ঠাকুর প্রণাম না করলেও পত্নীর ধর্মচর্চায় কখনোই বিঘ্ন ঘটাননি। ওটা কমলের ব্যাপার—বলে ধরি মাছ না ছুঁই পানি গোছের ঔদাসীনা্য প্রদর্শন করেছেন। তাঁর উত্তরসূরী বুদ্ধদেব সবদিক থেকেই তাঁকে ছাপিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। কি কর্ম সংস্কৃতি, কি ধর্ম সংস্কৃতি—সবেরেই তিনি অগ্রগণ্য। সম্প্রতি নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমে গিয়ে রামকৃষ্ণদেবের মূর্তির সামনে নত নমস্কারে আধুত হয়েছেন। অবশ্য তার আগে বিলক্ষণ নিশ্চিত হয়ে নিয়েছেন যে ওটি রামকৃষ্ণদেবের মূর্তিই, বামকৃষ্ণরূপী অজিত পাঁজা নয়। শুধু কি তাই, সদর্পে জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁর এই ধর্মাসক্তি মোটেই আকস্মিক নয়, কেননা তাঁরই পিতামহ বাংলায় প্রথম পূজোপাঠের বই ‘পুৰোহিত-দর্পণ’ বচনা করেছিলেন। কটর মার্কসবাদীরা এহেন সুমতি দেশে যারপরনাই বিগলিত হয়েছেন সাধু-সন্তরা। তাঁরা বুদ্ধবাবুকে প্রসন্নচিত্তে পাশ-মার্কস দিতে খুবই ব্যগ্র বলে জানা গেছে।

পাঁজাপাঁজি

যশরঞ্জ বিলীষণ। কী ভীষণ! আর সে কিনা ভাই! ভাই রঞ্জিত পাঁজা দাদা অজিত পাঁজাকে প্রায় পাঁজাকোলা করেই তৃণমূল থেকে উপড়ে ছিন্নমূল করে দিয়েছিলেন। ছোট ভাইয়ের এত তাকৎ। তো বড় ভাই কি না খেয়ে আছেন নাকি? তিনি কি মায়ের দুধ কম খেয়েছেন! তাড়ানোর বদলার

তাড়ানো। দু'জনের বাড়িটা তিনি একা নিজের নামে করে নিয়েছেন। কিন্তু হায়, জ্ঞানাজানি হতেই এই বদলা-ত্রতে বাদ সেখেছেন মেয়র সুরত। বাতিল করে দিয়েছেন সেই মিউন্টেশন। আইনবিদ অজিত এবার তৈরি হচ্ছেন পরের প্যাঁচটি মারার জন্যে আর সার্জেন রঞ্জিত ছুরি-কাঁচি নিয়ে তেগে আছেন সেই প্যাঁচ কেটে বেরোনের জন্যে। কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল, এই সুবাদে বাংলা সমাসে একটি নতুন ব্যাসবাক্যের আমদানি হয়েছে :

পাঁজাতে পাঁজাতে যে যুদ্ধ—পাঁজাপাঁজি।

ভাড়া-শিক্ষক

বাস-সরি-টেম্পো ভাড়া ষাটে। খেলোয়াড়রা ভাড়া খেটে আসছে সেই কোন কাল থেকেই। তবে শিক্ষাক্ষেত্রেই বা

উপেক্ষিত থাকে কেন? ভাড়া ষাটার বংশী ধারণ করেছেন বংশীধর, বংশীধর মাহাতো। আসল শিক্ষক পূর্ণচন্দ্র মাহাতোর হয়ে তিনি পাক্সা সতেরো বছর ভাড়া খেটে চলেছেন বাঁকুড়ার একটি প্রাইমারি স্কুলে। শিক্ষককুল শিরোমণি পূর্ণচন্দ্রর আছে চাষবাস, ব্যবসাপাতিও। চাকরিটি পেয়েই বংশীধরের হাতে বখরা চুক্তিতে চাকরি-বংশীটি তুলে দেন। বড় সাধ ছিল, সারাটা জীবন নন টিচিং টিচার হয়ে ননী খেয়ে যাবেন। কিন্তু সে সাধ আর পূর্ণ হল না তাঁর। জেলের ঘানি তাঁকে খুবই ডাকাডাকি করছে। আর বংশীধর। হাতের বংশী বংশ হয়ে তাঁর দিকেই ছুটে আসছে। মনে মনে বংশীধারীর কাছে কাতর প্রার্থনা জানানো—যদি এ যাত্রা রক্ষা করেন, হাজার হোক নামটা তো একই।

মমতাময়

সি পি এমের সাংসদ রাধিকারঞ্জন প্রামাণিক প্রমাণ করবেনই যে তাঁর বিদ্রোহ শুধুমাত্র সি পি এমেরই বিরুদ্ধে। বাকি সবাই তাঁর আপন। দলছুট হবার পর যথারীতি বিদ্রোহীদের টিমটিমে মঞ্চ পি ডি এস-এর সভায় হাজরে দিয়েছেন। কিন্তু শুধু পি ডি এস হলই তো হল না, মমতা তাঁর সকলেরই প্রতি এই মমতার বশে তিনি আগ বাড়িয়ে জানিয়ে দিয়েছেন, মমতা ডাকলেই তিনি উর্ধ্বশ্বাসে ছুটবেন তাঁর সভাতেও। এমনকি আর এস পিকেও তিনি সঙ্গে পাবেন বলে আগাম স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন। অবশ্য আর এস পি বা মমতা এই মমতাময়ের প্রতি এখনো কোনো মমতাই দেখাননি। তাতে কিছু যায় আসে না রাধিকারঞ্জনের। মমতা দেখানো যাহার কাজ সে মমতা দেখাইয়াই যাইবে, তোমরা লহ কিয়া না লহ।

—পরশ্ব সংবাদদাতা

কাজের দিনে সমাবেশ করিব না ঘোষণা করিয়াও সব ভুলিয়া তৃণমূলী
দিদি গাছ-কোমর বাঁধিয়া সমাবেশ করিবার প্রতিযোগিতায় ছুট লাগাইলেন।

কমরেড, তুমি কি পথ হারাইয়াছ

কুটিলা কামিনী



সিটুর বিগেডে জমারত বড্ড কম হইলে মুখ দেখানো যাইবে কি করিয়া? অতএব হে শ্রমিক ভাইরা, উঠিয়া পড়িয়া লাশুন, একজন শ্রমিকও—
যেন ব্রিগেড ছাড়িয়া অন্য দিকে পা না বাড়ান। প্রতিটি শ্রমিকের ব্রিগেড যাইবার পথ প্রশস্ত করিবার জন্য আগের দিনই অফিসে অফিসে অর্ধদিবস ছুটির দরখাস্ত জমা করা হইল। তবুও কি নিশ্চিত হওয়া যায়? কমরেডদের ভয় হইতে লাগিল, অর্ধ দিবস ছুটি করিয়া ব্রিগেড না গিয়া যদি কেহ বাড়ির পথ ধরেন, তাহা আটকাইবে কে? আর তখনই যেন শুনিতে পাইলাম কমরেড-দাদাদের কণ্ঠ—কমরেড, তুমি কি পথ হারাইয়াছ? চুপি চুপি বাড়ির পথ ধরিবার চিন্তা করিতেছিলেন যে কমরেড, কিংকর্তব্য বিমূঢ় হইয়া আশুপিছু চিন্তা-ভাবনা করিতে করিতেই তাহার কানে আসিল কমরেডদাদার কণ্ঠস্বর—“আইস!” মস্তমুখের ন্যায় সেই কমরেড, কমরেড-দাদাকে অনুসরণ করিতে শুরু করিলেন,—কাপালিকের আশ্রম অভিমুখে নহে, ব্রিগেড অভিমুখে।

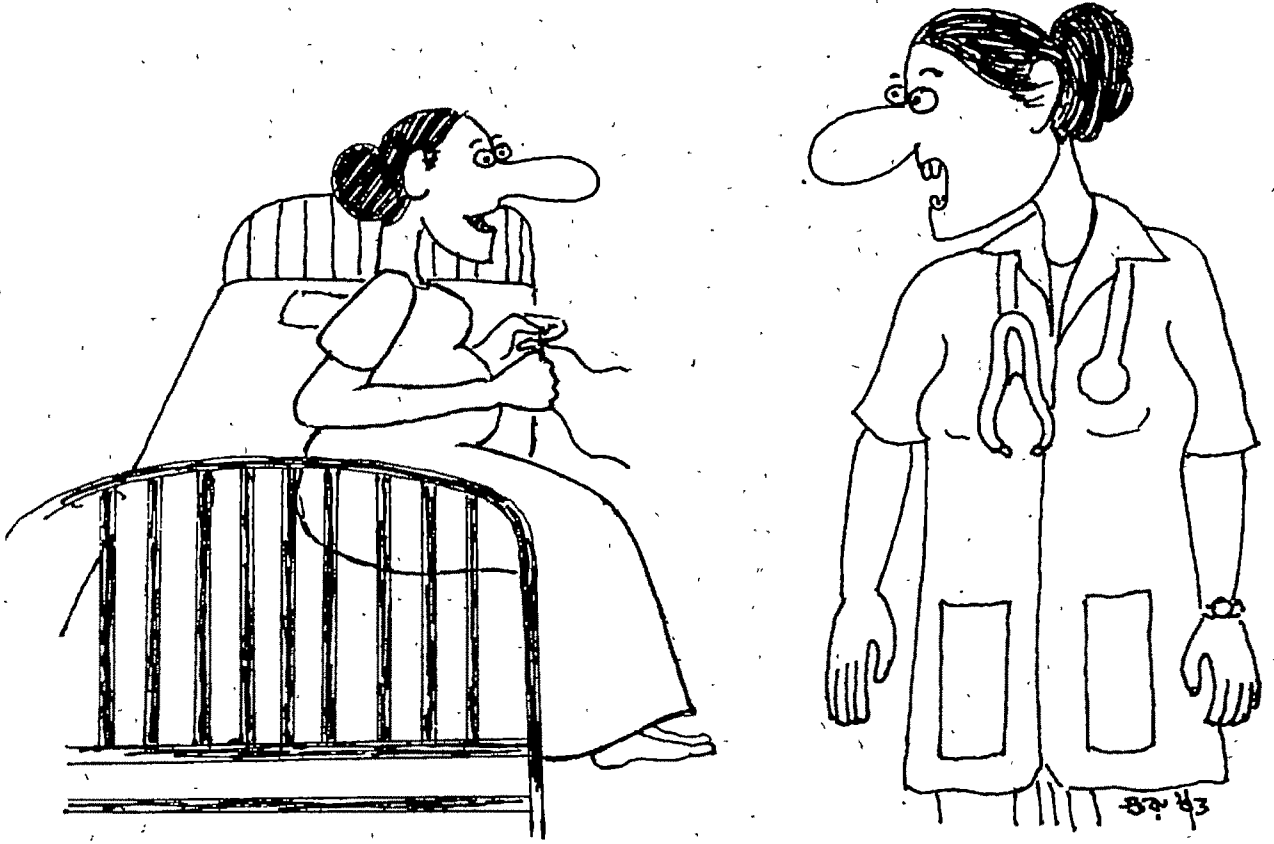
বিক্রমচন্দ্রের উপন্যাসের নায়ক নবকুমার জঙ্গলে পথ হারাইয়াছিলেন। তাঁহার সামনে পরিভ্রাতার ন্যায় উদ্ভিত হইয়াছিলেন কপালকুণ্ডলা। প্রশ্ন করিয়াছিলেন—পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ? প্রায় কিংবদন্তী স্বরূপ এই প্রশ্ন আবার যেন শুনিতে পাইতেছিলাম গত ২৬শে ফেব্রুয়ারি সিটু দাদাদের ডাকা ব্রিগেড সমাবেশের পূর্বাঙ্কে। ২০০২ সনের ডিসেম্বর মাস হইতে সেই যে সি পি আই দাদাদের ব্রিগেড অস্তিত্বের কথা দিয়া বিগেড সমাবেশের প্রতিযোগিতা শুরু হইয়াছিল, কাজের দিনে সমাবেশ করিব না ঘোষণা করিয়াও সব ভুলিয়া তৃণমূলী দিদি গাছ-কোমর বাঁধিয়া সমাবেশ করিবার প্রতিযোগিতায় ছুট লাগাইলেন। তাই দেখিয়া সি পি এম দাদারা তান ধরিলেন—দিসিকে হারাইতেই হবে। অতএব জনগণ দেখিল, ব্রিগেডে ঐতিহাসিক সমাবেশ। কংগ্রেসদাদারাই বা কম যান কিসে? তাঁহারাও ছুটিলেন ব্রিগেডের উদ্দেশ্যে। তাই দেখিয়া

এবার সি পি এম দাদারা বলিলেন, চল তো সবাই মিলে যাই। এই বলিয়া শরিক দল সহ চলিলেন ব্রিগেড অভিমুখে। ইহার পর সিটু দাদারা ভাবিলেন, জোট দলের শক্তি তো দেখানো হইল, কিন্তু আমরা আলাদা আলাদাই বা কম কিসে? সুতরাং এইবার সিটুর ব্রিগেড। কিন্তু মুশকিল হইল, সিটু মানে শুধুই শ্রমিকের দল। পরিবহন শ্রমিক, কারখানা শ্রমিক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক ইত্যাদি ইত্যাদি। সদ্য সদ্য বামমস্তকের ব্রিগেড হইয়াছে, তাহার পাশপাশি

রসকেলি

যুবক : আপনাকে খুব চেনা চেনা লাগছে। কোথাও দেখেছি আপনাকে? কোনো কলেজে?
যুবতী : হতে পারে। ডাক্তারি পাশ করতে আর এক বছর-বাকি আছে আমার।
যুবক : খুব ভালো হল। তার মানে তো ডাক্তার হয়েই গেছেন প্রায়। অসুখ হলেই আমি শুধু আপনার কাছেই যাব।
যুবতী : না না, সে হয় না—
যুবক : কেন হয় না? আমাকে কি মোটেই পছন্দ নয় আপনার? মানে, রুগি হিসেবে?
যুবতী : আমি যে পশুচিকিৎসার ডাক্তার হতে যাচ্ছি। আপনাকে দেখে তো ঠিক.....

—কাকলি চৌধুরী



ধাত্রীপান্না নার্সিংহোম

ওম্বিকা গুপ্তা

তাকে তাকে ছিল পান্না। ঠিক হাটে না হলেও জায়গা বুঝে হাঁড়ি ভাঙার সময়টা যে গড়িয়ে এসেছে সে খেয়াল ছিল ওর। সুযোগ এল গুরুবার সকালে। মাসকাবারি ওষুধপত্রর আনতে সাতটা পাঁচের ডাউন কেবিনগর লোকাল ধরতে ডাক্তার স্টেশনমুখো রওনা দিতেই পান্না আর গাফিলতি করল না। দু'মাস তো হতেই চলল, এরপর বাক্তি ক্রমশ বেড়েই যাবে।

ওপরেব তিন নম্বর কেবিনটা খালিই ছিল। হাসিবৌদিকেও ডাকাডাকি করতে হল না, হাতের কাছেই পাওয়া গেল মেট্রন হাসি দেবনাথকে। বৌদিকে ইশারায় ডেকে নিয়ে তিন নম্বর কেবিনের বেডে শায়ার ফাঁসটা আলগা করে টান টান হয়ে শুয়ে পড়ল পান্না। এমনিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কোনো দরকার ছিল না।

তবু এই অছিলায় অপকর্মের সরঞ্জামিনে তদন্ত করানোটা হয়ে যাবে, আর সেই সঙ্গে সঠিক জায়গায় হাঁড়িও ভাঙা হবে। সেরকমই মতলব ছিল মেয়েটার।

হাসি দেবনাথ শুধু মেট্রন নন, মালকিনও বটে। ডাক্তারজাংলা নারীকল্যাণ

নার্সিংহোম প্রাইভেট লিমিটেডের মালিক ডাক্তার অভয়পদ দেবনাথের 'ওয়াইফ' হাসি। বৌ বা স্ত্রী শব্দটি হাসিবাবার অপছন্দ। 'মেট্রন' বা ডাক্তারের 'ওয়াইফ' বলেই অভিহিত হতে চান উনি। হনও। পান্না অবশ্য 'বৌদি'ই বলে। সেটা কিন্তু নার্সিংহোম সুবাদে নয়, আরো আগে থেকেই।

বছর কয়েক আগে কাজের মেয়ে হিসেবে ঢুকেছিল ও হাসি দেবনাথের সংসারে। নিচের তলাটায় তখন নার্সিংহোম ছিল। দোতলার সিঁড়ির মুখে 'প্রাইভেট' লেখা টিনের ফলক ঝোলানো থাকত। ওপরের দুটো ঘর, কিচেন, বাথরুম আর একফালি বারান্দা নিয়ে ডাক্তারের কোয়ার্টার। নার্সিংহোমের তখন আজকের এই বাড়িবাড়ন্ত ছিল না। নামটাও ছাই প্রসূতি সদন না কি যেন ওই ধরনের কিছু একটা ছিল। পুরনো একটা অ্যামবাস্যাডাব গাড়ি ছিল ডাক্তারের আর ধুবলে ক্যাম্পের রতন কুণ্ড নামে একটা ছোঁড়া ছিল অভয়পদের ছাইভার। সেই রতনই পান্নাকে ডাক্তারের বাড়ির কাজটা জুটিয়ে দিয়েছিল। কাপড় কাটা, ঘর মোছা, বাসন মাজার কাজ। মাইনে দু'শ টাকা। দু'জনের মধ্যে পিরিত-টিরিত কিছু একটা ছিল। পান্নার কাছে অবশ্য পিরিত অনেকটা 'ফ্যালো কড়ি মাখো তেল'-এর মতো হিসেব-নিকেশের ব্যাপার ছিল। সুযোগ

মতো রতনের সঙ্গে মার্কমেথে ও শোয়নি যে তা নয়, শুয়েছে। হোঁড়াটার সঙ্গে পিরিতের নকশাও কিছু কম করেনি। বিনিময়ে ডাক্তারের বাড়ি হল হয়ে ঢোকার ব্যবস্থাটা ও রতনকে দিয়ে করিয়ে নিবেছিল। ফল হয়ে বেরনোর কেবামতি ও নিজেই একদিন দেখিয়ে দেবে, মতলব ছিল ওর।

ঘরের কাজ পুরো একটা বছরও করতে হয়নি পামাকে। হাতে সময় পেলেই নার্সিংহোমে বিনি পয়সার আমার কাজে লেগে যেত মেয়েটা খুশি হয়েই। প্রথমটার রুগির ও-মুত, নোংরা সাফসুফ করার হ্যাণা সামলাতে হয়েছে অনেক। পরে মেনেজুখে ঝাওয়ানো থেকে শুরু কবে ম্যাসেজ করা, সেক দেওয়া, ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, ডুস দেওয়া—সবকিছুই একে একে শিখে নিয়েছিল ও। যেদিন ডাক্তারের নির্দেশমতো একরুগিকে ঠিকমতো ইঞ্জেকশনও দিয়ে দিলে সেদিনই সন্ধ্যায় টাকা-পয়সার কথাটা তুলল পামা মেট্রন অর্থাৎ হাসিবৌদির কাছে। শিকানবিশির পালা খতম। এখন থেকে ফ্যালো কড়ি মাখো তেলের বন্দোবস্ত দাবী কবে বসল মেয়েটা।

কটা মাস পামা নার্সিংহোমে বিনা পয়সার আয়া এবং ইদানীং পুরোদস্তুর না হলেও আখা নার্সের কাজ দিবি চালিয়ে যাচ্ছিল। ইতিমধ্যে হাসি-অভয়পদের ছোট্ট প্রস্তুতি সদনটি ক্রমশই ফুলে ফেঁপে নারীকল্যাণ নার্সিং প্রাইভেট লিমিটেডের আকার ধারণ করেছে। একতলা থেকে ডাক্তারের আবাস দোতলা পর্যন্ত কজা করে ফেলেছে পোয়াতি মেয়ের দল। হাসিবালা হাসিমুখেই বাসা বেঁধেছে পাশেই রাণাঘাটের তারক মজুমদারের বহুদিন ধরে 'টু-লেট লটকানো বায়লোটায়ে। মেট্রন হাসিকে বাদ দিয়েও দু'জন ট্রেণ্ড নার্স কাজ করে এখন অভয় ডাক্তারের নার্সিংহোমে।

তেমন তেমন জরুরি অবস্থায় রাণাঘাটের নার্সিং এজেন্সি থেকে পেশেন্টের খরচায় নার্স আনিবে নেওয়ার ব্যবস্থাও আছে। এর ওপব জনা চারেক আয়া ও আখা নার্স কাম আয়া পামা তো আছেই।

হাজার টাকা মাইনে চেয়েছিল পামা। দু'শ থেকে এক হাজার হাজার—ওনে খাতস্থ হতে সময় লেগেছিল হাসির। বেশ চটে গিয়েছিল ও মেয়েটার ওপর। রাঙির ডাক্তার ওকে বুঝিয়ে বলেছিল—পামা কিন্তু নার্সিংহোমের দু-হাজারি নার্সদের ওপর টেক্সা দেয়। 'নাইট ডিউটি', 'ওভার টাইম'—এর বায়নাঝা নেই মেয়েটার। পেছাপ-পায়খানা সাফ করতে চায় না নার্সরা। তার জন্যে ওদের পেছনে একটা আয়ার জোগান দিতে হয়। পামাব সে বালাই নেই। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সবই হাসিমুখে করে আসছে মেয়েটা। উপরন্তু ঘরের এটা-ওটা সব কাজ ও একাই করে।

হাসি যে এসব বোঝে না তা নয়, বরং ডাক্তারের চেয়ে বেশিই বোঝে। কথাটা আসলে তা ঠিক নয়। হাসিকে ভাবিয়ে তুলেছিল পামার খাঁইটা। শূন্য থেকে এক লাফে যে হাজারে উঠতে চায়, তাকে আশ্বাস দিলে খাঁই তার বেড়েই যাবে।

শেষ পর্যন্ত ঠিক হয়, পামার ব্যাপারটা হাসিরানীই সামলে নেবে। ডাক্তার যেন আগ বাড়িয়ে নাক গলাতে আসে না এর মধ্যে।

আটশ টাকায় রাজি হয়ে গিয়েছিল পামা। খুব একটা দরাদরি করতে হয়নি হাসিকে। এক কথায় না হলেও পাঁচটা মিষ্টি কথার পর পামা আর 'না' করতে পারেনি। চার মাস ধরে পাঁচটা পোয়াতি মেয়ের কাঁথা কাচিয়ে নোংরা খাঁটিয়ে শিকানবিশির অফিসায় একটা কড়িও উপড়হস্ত করেনি হাসিবৌদি। এবার সেটা সুদে-আসলে-উত্তল করার সুযোগ পেয়েও পামা কিন্তু হাজার টাকা নিয়ে খুব একটা জোদাজোদি কবেনি। তেমন চাপ দিলে হাজারেই যে বৌদি রাজি হয়ে যেত সেটা ও জানত, কিন্তু অনেক কিছু ভেবেচিন্তেই ও দর কষাকষির মধ্যে যেতে চাননি। বৌদিকে এখন হাতে রাখলে সময়মতো

অমন অনেক হাজার হাজার পাঁচটা ও খুলে রাখতে চেয়েছিল। দু'পাঁচ হাজারি নার্স হবার জন্য হাড়গিলে ওই তোতলা রত্নার সঙ্গে পিরিতের নকশা করতে যাননি। অনেক দূরপাল্লার দৌড় ওর। বুক চিতিয়ে দড়ি একবার ছুঁতে পাবলেই অমন নার্স গণ্ডায় গণ্ডায় একদিন ও নিজেই রাখবে।

হাসি কিন্তু দু'শ টাকার লোকসানটাও একবকম পুথিয়ে দিয়েছিল। বেশ তোয়াজেই রেখেছিল ও মেয়েটাকে। রাণাঘাটের রসিদ দর্জিকে দিয়ে দু-সেট নার্সের উর্দি বানিয়ে দিয়েছিল। সাজগোজের শখ ছিল পামার। গোয়াড়ি বাজার থেকে মার্কমেথেই ফেসক্রিম পাউডার লিপস্টিক কিনে আনত বৌদি মেয়েটার জন্যে। উলোর চোতমেলা থেকে সেবার তো একটা রঙদার ম্যান্নিই কিনে আনল হাসিরানী। এনেছিল অবশ্য নিজেব জন্যেই। কিন্তু পামা এমন জুলজুল চোখে ডাকাল যে ওটা আর নিজেব জন্যে না রেখে মেয়েটাকেই দিয়ে দিলে। কি জানি, চোপরদিন গতর খাঁটিয়ে কাজ করে মেয়েটা, কাল যদি আবার ক'টা টাকার লোভে দিগ্‌নগরের নতুন নার্সিংহোমটায়ে ঢোকে। ফুলিয়ে নিয়ে যাবার লোকের তো কোনো অভাব নেই! তাই আর কি, এটা-ওটা দিয়ে মেয়েটাকে বশে রাখা।

চোখে চশমা এঁটে, গলায় স্টেথিস্কোপ ঝুলিয়ে পামার মসৃণ বাদামি পেটে চোখ বুজিয়ে নিলে মেট্রন। এদিক-ওদিক টেপাটেপি, আর দু-চারটে জিজ্ঞাসাবাদ করে পরীক্ষাপর্ব শেষ করলে হাসি।

—দু'মাস বললি না? আর সেরি করিস না। পারলে আজই 'ওয়াশ' করিয়ে নে। পই পই কবে সাবধান করে দিলাম, তবু সেই পেট বাধিয়ে বসলি। নিশ্চই ওই রতন হোঁড়াটার কাজ। ওয়াশের খঁচটা আমি ওর মাইনের টাকা থেকে কেটে নেব। তোর আর পয়সা লাগবে না। ভালোই হয়েছে, আজ ডাক্তার নেই। থাকলে হয়ত মাথাগরম করে চ্যাচামেচি শুরু করে দিত। আজই ও পাপ আমি ধুয়ে দেব।

এখনো শরীরকে 'শরীল' এবং বিকশাকে 'রিস্কা' বললেও 'ওয়াশ' শব্দটা পামা আর পাঁচটা লোকের মতো অনায়াসেই বলতে পারে। অর্থটাও জানে। সেটা হয়ত পামা বা মেট্রন যে অর্থে বোঝে, আর পাঁচটা লোক সেই অর্থে বোঝে না। সকাল-বিকেল 'ওয়াশ' হচ্ছে এই নার্সিংহোমে। গর্ভমোচন যত না হচ্ছে তাব চেয়ে অনেক বেশি হচ্ছে গর্ভপাত, অর্থাৎ 'ওয়াশ'। আখা নার্স হিসেবে পামাকেও হাত লাগাতে হয়েছে অনেক সময় এই গর্ভ সাফাই-এব কাজে। তাই হাতে-কলমেই অর্থটা ও শিখে নিয়েছে।

সত্যি বলতে কি এই খোলাই-সাফাই করেই অভয়পদ হাল বদলিয়ে ফেলেছিল ওর নার্সিংহোমের। কুমারী, বিধবা, অবৈধ পোয়াতিদের গর্ভের কলুষ-কলঙ্কিত আবর্জনা 'হোয়াইট ওয়াশ' করেই কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা বানিয়েছিল ডাক্তার। বিবাহিতা পেশেন্ট বিয়োবার তগিদে খুব একটা আসত না নার্সিংহোমে। আর এলেও তেমন গোলমালে কেস না হলে দু-পাঁচশ টাকায় নিষ্পত্তি হয়ে যেত সেসব মামলাব। অমন সাদামাটা পেট খালাস করে পেট ভরত না অভয়পদর। সতীলক্ষ্মীদের চেয়ে অসতীলক্ষ্মীরাই ঝাঁপি উজাড় করে টাকা ঢেলে যেত হাসিরানীর সংসারে। খঁচপাতির কোনো বাঁধাধরা রেট ছিল না এসব ক্ষেত্রে। ঝোপ বুঝে কোপ মারলেই হল। তেমন তেমন শাঁসালো মল্লের দুর্গামের ভয়ে ধামার বদলে টাকা চাপা দিতে দ্বিধা করত না। এমনি একটা পরত্নী ঘটত প্যাচালো কেসে পামাকে হাত লাগাতে হয়েছিল অভয়পদর সঙ্গে। সেই রাতে কোনো নার্স ছিল না নাইট ডিউটিতে। মেট্রনও ক'দিন ধরে জুয়ে শয্যাশায়ী। অগত্যা ধান বাছতে ডাঙা কুলো পামা। নিক্কল্লাটে ভদ্রমহিলাটির গর্ভপাত হয়ে যাওয়ার পর কর্তব্যজ্ঞিটি, নাটের গুরু তিনিই হবেন, অনেকটা দাতাকর্ষের স্টাইলে গলার সোনার চেনটি খুলে পামাকে বশিশ দিয়েছিল।

প্রায় আশ্চর্যজনক হতে পারে। রইস লোকটার নামখাম সব একটুকরো কাগজে লিখিয়ে নিয়েছিল পান্না। এমনি এমনি নয়, পরে কাজেও লাগিয়েছিল।

—নাহ, ‘ওয়াশ’ আমি কোন দূরখে করাব বৌদি? এ যে আমার ভালোবাসার ঘন গা।

শায়ার দড়ি বেঁধে শাড়িটা গুছিয়ে নিতে নিতে পান্না বললে।

—তুই করিস না ছুঁড়ি! ‘ওয়াশ’ করাবি না তো কি বিয়ের আগেই বাচ্চা বিয়েবি? যতসব আদিয়েতা।

পান্না ততক্ষণে বেড়ের ওপর পা বুলিয়ে মেট্রনের মুখোমুখি হয়ে বসেছে।

—তা যদি বড়ো তবে তো এখনি তোমার সঙ্গে সওদায় বসতে হয়। নাও, তুমিই কও, ডাক্তারের মেয়েমানুষের পেট খসানোর খেসারৎ দেবা কত? তুমি তো বাঁজা মেয়েছেলে। দশ বছরেও একটা বাছুর বিয়োতে পারলে না। এখন আমার প্যাটেরটাই তো একদিন এসব কিছুই ন্যায্য মালিক হবে। কখাটা কিছু ভুল কইলাম? তা আখা বখরায় রাজি হও তো ‘ওয়াশ’ করাতে আমিও রাজি। কাগজ-পতর সব তোয়েরই আছে সদরের লবা-উকিলের কাছে। কাল তোমার চেঁয়ে ছুটি নিয়া গোয়াড়ি গেছলাম না? সে তো ওই খোরের ধারে হওয়া খাইতে যাইনি। গেছলাম ওই লবকান্ত উকিলের কাছারিতে।

পান্নার কথার মাঝখানেই স্টেথিস্কোপটা গলা থেকে এক ঝটকায় খুলে সজ্ঞারে ওর মুখে কয়েক ঘা দিতে গিয়েও নিজেকে খুব সামলে নিয়েছিল হাসি। হাত উঠিয়েও নামিয়ে এনেছিল হাতটা। রাগে সর্বাস্ব কেঁপে উঠলেও দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে সংযত রেখেছিল ও। অভয়পদ এর আগেও মেয়েমানুষ ঘটিত কুকর্ম অনেক করেছে। বারদুই ফেসেও গিয়েছিল। খচাপাতি করে নিজেকে উদ্ধার করতে হয়েছে। তবে দু-পাঁচ হাজারেই ‘ন্যাটা’ চুকে গিয়েছিল। কিন্তু এমন একটা সর্বনাশা কলঙ্কারিতে যে ডাক্তার নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে পারে সেটা হাসি ভাবতেও পারেনি। কিন্তু আরো বেশি অবাক করেছিল ওকে পান্না। একটা গোঁয়ো মুখ্য ছুঁড়ির মাথায় যে এত ছল-চাতুরি থাকতে পারে সেটা ওর মতো শহুরে শিক্ষিতা মেয়ে জাঁচও করতে পারেনি। অখচ চোখ-কান খুলে রাখলে কিছুটা আঁচ করা খুব যে একটা শক্ত ছিল না, সেটা এখন হাসি বুরতে পারছে।

পান্নার মুখশ্রী ছিল না ঠিকই। কিন্তু শরীরের জিরি-জাঁদ একটু যেন বেশি-বেশি ছিল। বগানে না হলেও চলনে গমক ছিল মেয়েটার। আর অভয়পদের হোক-হোক বাইটা তো কিছু আজকের নয়। ঢাঙা মেয়েমানুষের ঢলানি ডাক্তারকে কাবু করেছে অনেকবার। তখন ভাবত টাকার শাসয় হবে। এখন বুরতে পারছে হাসি, রাতের ডিউটিতে ডাক্তারের অত পান্নাকে প্রয়োজন হত কেন।

মাথা গরম করে এখন যে কোনো ফল হবে না, বরং উন্টোটিই হবে, সেটা হাসি নিজে নিজেই মেনে নিলে। ছুঁড়িটা যখন আগেভাগেই উকিল-মোক্তার পর্যন্ত কাজ গুছিয়ে রেখেছে তখন ভয় দেখিয়ে বা লোভ দেখিয়ে ওকে হাত করা খুব একটা সহজ হবে না। আর লোভটাই বা ছুঁই কি দেখাবে। আখা সিংহাসনের ওপর যে ধাবা উঠিয়ে আছে তাকে আর কোন কতোষাখানার চাবিকাঠি হাতে ধরিয়ে বেশি আনা যায়, সেটা হাসি ভেবেই পেল না।

—ঠিক আছে, রতনের সঙ্গে কথা কইব এখন।

কথাটা বলেই কেবিন থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল হাসি। একরকম পালিয়েই যাচ্ছিল। দরজা আগলে দাঁড়াল পান্না।

—রতন শুধু কেন, সুমুখের ওই কেলারের আর পাঁচটা ছোকরার

সঙ্গেও তো আমার মিলামিশা আছে। তাদেরও জিগাও গিয়া। ঘরের কথা নিয়া পাচকান করে গিয়া। আমিও তাই ‘ওয়াশ’-টোয়াস করাব না। আর কটা মাসই বা, বাচ্চাটা আগে বিইয়ে নি; তারপর অন্ত-উত্ত পরিক্ষে করে বাপ যাচাই হবেখন। ঢাকা খাওয়াই রতনকে তুমি আগেভাগেই বাপ বানাইয়া দিবা, সেটা আমি মানি কী করে, তুমিই কও দেখি।

শক্তিপুর লোকালে রান্নাঘাট এসে বাসে বাকি পথটুকু আসতে অভয়পদের একটু রাতই হয়ে গেল। ওষুধপত্রের বোলাটা নার্সিংহোমের স্টোররুমে রেখে বাড়ি ফিরবে ঠিক করেছিল, কিন্তু হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে রিকশাটাকে বাড়িমুখো হতে বললে অভয়পদ। সারাদিন শরীরটার ওপর ধকল গেছে অনেক। এখন স্নান সেরে একটু রাম পেটে না পড়লে ঠিক যেন স্বস্তি হচ্ছে না। কে জানে পান্না ছুঁড়িটা আজ আছে কিনা। তাহলে চেয়ারের কৌচটায় লম্বা হয়ে শুতে পারলে মন্দ হত না।

চ্যাচামেচি করেনি হাসি। জল যথেষ্টই ঘোলাটে হয়েছে। তাতে আরো গুচ্ছের কাদা ছিটিয়ে অযথা গায়ে পাক মাখতে চাননি ও। সারাদিন ভেতেপুড়ে এসেছে মানুষটা। এখন রগড়ালেই দপ করে জলে ওঠার সম্ভাবনাটাই বেশি। তাতে সমস্যার সমাধান হবে না। এইসব সাতপাঁচ ভেবেই পান্নার কিলগুলো হজ্জম না হওয়া সত্ত্বেও মুখে কুলুপ এঁটে রইল হাসি। সময় দিয়েছিল ও অভয়পদকে কিছুটা ঠাণ্ডা হবার।

স্নান সেরে পিঠে-ঘাড়ে-বুকে-বগলে ট্যালকম পাউডার ছিটিয়ে নুদিটা কোমরে ঢিলে ফাঁসে বেঁধে ডাক্তার দশটা নাগাদ বারান্দায় এসে বসল। রোজই যেমন বসে। রাতের বোতল, ফ্লাস্কে জল, বরক আগেই রেখে গিয়েছিল হাসি। রোজই যেমন রাখে। প্রথম লার্জ পেগটি নিঃশব্দে নির্বামেলায় গলাধঃকরণের পর দ্বিতীয়টিতে চুমুক দিতেই হাসিরানী মুখ খুলল।

সওয়াল জবাব ঠিক হল না। একতরফাই সওয়াল করে গেল হাসি। গোয়াড়ির নবকান্ত বাঁড়জ্যে অর্থাৎ পান্নার ‘লবা উকিল’ দিয়েই সওয়াল শুরু করায় অভয়পদ কেমন যেন চুপসে গেল। পাঁচ মিনিটে আউস চারেক রাম পেটে পড়া সত্ত্বেও ‘রা’ বেরুল না ওর মুখ দিয়ে। দু-দু’বার গর্ভপাত সংক্রান্ত কৌজদারি মামলায় ফেসে গিয়েছিল ডাক্তার। একবার তো হাসিও জড়িয়ে পড়েছিল। কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে জেরায় জেরায় একেবারে জেরবার করে দিয়েছিল কত-গিমিকে ওই ‘লবা উকিল’। বেইজ্ঞত কম হতে হয়নি অভয়পদ আর হাসিকে। প্রথমবার বাদীপক্ষকে টাকা খাইয়ে মামলার নিষ্পত্তি করতে হয় ডাক্তারকে। আর একবার এক নার্সকে দিয়ে অপরাধ কবুল করিয়ে রেহাই পায় অভয়পদ। টাকার শ্রদ্ধ সেবারও কিছু কম হয়নি। নবকান্ত বাড়জ্যের শাসনিটা আজও ডাক্তারের কানে বাজে—এ যাত্রায় খুব বেঁচে গেলেন ডাক্তারবাবু। ক্রিমিনাল কেসে আমার ফসকে পাকাল মাছও বেরুতে পারে না। নেক্স্টবার যদি মুঠোয় পাই তো যুগলমুর্তিকে ঘানি টানিয়ে ছাড়ব।

কথায় বলে, ন্যাড়া একবারই বেলতলায় যায়। অভয়পদ বারদুই গিয়ে, মাথা ফাটিয়ে না হলেও মাথায় চোট নিয়ে কোনোগতিক ফিরে এসেছিল। এখন শিয়রে শমন। বারবার তিনবার। আখ-ভরা রাম-এর গলাসটা মেঝেয় নামিয়ে রেখে নিজের অজান্তেই দুটো হাত মাথায় রাখল ও। পুরো দুটো পেগও পেটে পড়েনি, তবু কেমন যেন বিশ্বাস লাগল ট্রিপল এক্স রাম। এক পাইটেও খাই মেটে না যার, সেই অভয়পদের আজ তিন আউন্সই অরুচি।

—ছুঁড়িটা শুধু মতলবিই নয়, পান্না সেমানা। আটঘাট সব বেঁধেই আমার ফাঁসিয়েছে। তবে ‘ওয়াশ’ ওকে যে উপায়েই হোক করাতেই হবে, নচেৎ

তুরূপের তাসটি হারামজাদির মুঠোয় থেকে যাবে।

ডাক্তার ককণ চোখে তাকাল হাসির দিকে। অভয়পদকে খাপাতে চায়নি ও, সোজাসুজি দোষারোপও করেনি। কৈফিয়ৎও তলব করেনি। এখন ডাক্তার অপরাধটা একরকম কবুল করায় খোঁচা মারলে হাসি—

—তুরূপের তাসটি যখন তুমিই ওর হাতে না পাতে, কোথায় দিবেছ তুমিই জানো, তখন ওটি উদ্ধার করাটাও তোমারই কাজ। অ্যাডিন তো পেশেন্টকে ‘ওয়াশ’ করিয়েছ কিজ্জ নিয়ে। যাও, এবার মোটা ফিজ্জ দিয়ে পিরিতের পেশেন্টের পেট খসাব গিয়ে। শুধু একটা কথা মনে রেখো ডাক্তার অভয়পদ দেবনাথ, নারীকল্যাণ নার্সিং হোম গ্রাইভেট লিমিটেডের ফিজ্জটি পার্সেন্ট শেয়ার আমার। তোমার কুর্কীর্তির কিন্তু আমি অংশীদার নই। অতএব খেসারৎ যা দিতে হবে তার পুরোটাই তোমার।

গোয়াড়ি কেটনগরের ‘লবা উকিল’কে পান্না কন্মিনকালেও দেখেনি। ওর নামটাও প্রথম এবং একসময় বারবার শুনেছে এ বাড়িতেই। সেবারেব কোলেজারির সময় পান্না সবে নার্সিংহোমে কাঁথা কাচা আর বেডপ্যান থোমার কাজ শুরু করেছে। একতলার কোণের কেবিনে এক পোয়াতি মেয়ে ‘ওয়াশ’ করানোর সময় ডাক্তারের হাতেই টেসে গেল। সেই নিয়ে থানা-পুলিশ, ঘেরাও—এক হলুদুল ব্যাপার। ডাক্তার আর মেট্রনকে কোতোয়ালির ফটকে আটক থাকতে হয়েছিল দুটো রাত। নার্সিংহোমের গেটে কুলুপ দিয়ে গিয়েছিল দারোগা। তিনদিনের মাথায় জামিনে ছাড়া পেয়ে চোপের দিন গুজুর-গুজুর, ফুসুর-ফুসুর করত কর্তা-গিমি ডাক্তারের চেম্বারে। লবা উকিলের নামটা বারবার তখন ওর কানে এসেছে। মানুষটার ডয়ে এরা যেন সিটিয়ে গিয়েছিল।

যেতে হয়নি পান্নাকে, নবকান্ত কেন কোনো উকিল-মোক্তারের বাড়ি কাগজ-পত্রে তৈরি করতে। নামেই কাজ হয়েছিল। বাচ্ছারা যেমন জুজুর নামেই ভয় পায়, ঠিক তেমনিই আঁতকে উঠেছিল হাসি আর অভয়পদ লবা উকিলের নাম শুনেই।

আতঙ্কিত হয়েছিল অভয়পদই বেশি। সারা বাত ঘুম এল না ওর চোখে। ভোরের দিকে ক্লাভিতেই হয়ত চোখদুটো একটু জড়িয়ে এসেছিল। কটা মিনিটই বা হবে। হঠাৎই ধড়ফড় করে উঠে বসল বিছানায়। স্বপ্নটা ভেঙে গেল। দুঃস্থল। কাঠগড়ার ওপরে একটা হাড়িকাঠে ওর মাথাটা আটকে রাখা হয়েছে। পরনে লাল শালুর কাপড়, কপালে রক্ত ভিলক, এক কাপালিক বাঁড়া উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে ওর সামনে। কাপালিকের মুখটা কিন্তু নবকান্ত বাঁড়ুজের। সেই গৌফ, সেই চোখ, সেই অয়িদৃষ্টি।

ফয়সালা হয়ে গেল পরদিনই। অভয়পদের আর তর সইছিল না। শরীর মন ধকল আর নিতে পারছিল না। একটাই শর্ত ছিল ওর। পান্না যেন নবকান্তকে এর মধ্যে জড়ায় না। তা সে জড়ায়নি। ওর হয়ে সালিশি কবতে এনেছিল উলোর খগেন মল্লিককে। বাপ-ঠাকুরা নামকরা জোতদার ছিল। খগেন এখন চটকল আর ইটখোলা কবে অনেক টাকা কামিয়েছে। এই লোকটাই পান্নাকে সেই সোনার হারজড়া বখশিস দিয়েছিল ক’মাস আগেই। হাতে রেখেছিল পান্না খগেন মল্লিককে। নার্সিংহোমের অংশীদারী নিয়ে কিছুটা মুখদেখানি জেদাজেদি করে মূল্য-ধরে দেয়ার ব্যবস্থায় রাজি হয়ে গিয়েছিল ও। খগেন মল্লিক দুঁদে ব্যবসাদার। দর-দস্তুর ওই করেছিল পান্নার হয়ে। ওর বখরা রফা হল এক লাখে। আধা পঞ্চাশ হাজারের কড়কড়ে নোটের বাতিল হাতে হাতেই পেয়ে গেল। বাকি ‘ওয়াশ’ করানোর পর, সেই রাতেই। ধড়বাজ খগেন অভয়পদের কাছ থেকে সেই অস্ত্রের চেক সই করিয়ে রাখলে, যাতে কাজ উদ্ধার হয়ে গেলে হেরাফিরি করার সুযোগ না পায় ডাক্তার।

সন্দের মুখেই নার্স, আয়াদের ছুটি হয়ে গেল। নাইট ডিউটিতে আর কাউকেই বাখলে না মেট্রন। রুগি বিশেষ ছিল না। একটা লাইগেশান কেস আর দুটো ডেলিভারি হয়েছে দু’দিন আগে। বেশ কটা ‘ওয়াশ’ কেস এসেছিল। হাসি সব কাল-পরশুর ডেট দিয়ে দিয়েছে।

পান্নাকে টেবিলে শুইয়ে রেডি করতে খুব একটা সময় লাগল না হাসির। ডাক্তারও ন’টা নাগাদ কাজ শুরু করে দিলে। পান্না হাত অভয়পদের, তবু সময় যেন একটু বেশিই লাগল। হাতটা যে কানপেই হোক খুব একটা স্টেডি ছিল না। দু-দশ মিনিট দেরি হলেও একসময় কাজটা ঠিকঠাকই হয়ে গেল। হাতেব গ্লাভস খুলে সাফনুফ হয়ে ডাক্তার নিচে চেম্বারে এসে ঢুকল। আয়া নেই, অভএব হাসিকেই থোয়াপোছাব কাজে হাত লাগাতে হল।

রামের বোতলটা খুলে সবে একটা পেগ গেলাসে ঢেলে চুমুক দিয়েছে ডাক্তার। চ্যাচামেটিটা ঠিক সেই সময়ই কানে এল। নার্সিংহোমের গেটের সামনেই তরুণ সমিতির ফুটবল মাঠ। দর্মা দেওয়া টিনের চালের ক্লাবঘরটা মাঠের ডান কোনাটায়। ন’টা-দশটা পর্যন্ত কারাম খেলা চলে সেখানে। রাস্তার আলোর পোস্ট থেকে হুক করে লাইন টানা আছে ক্লাবঘরে। চ্যাচামেটিটা যে ওইখান থেকেই আসছে এইরকম একটা আঁচ করছিল অভয়পদ। কিন্তু ঠিক যে কী, কেন বা কীসের গোলমাল সেটা বোঝাব আগের প্রায় মাথার ওপর বাজ এসে পড়ল। চেম্বারের দরজা খুলে আর বেরুতে হয়নি ডাক্তারকে; দরজার মুখেই জনা দশ-বারো ছোকরা গালিগালাজ করতে করতে ঘিরে ধরল অভয়পদকে। ঠিক সেই মুহূর্তেই ওদের চড়া হুঙ্কারেব সঙ্গে তাল মিলিয়ে তবলায় ঠেঁকো দিয়ে উঠল পান্নার আর্তনাদ। জনাকতক ছোকরা সিঁড়ি দাবিয়ে উঠে গেল সেই আর্তনাদের ডাকে। হতভম্ব ডাক্তার কিছু বলার আগেই কালো গেঞ্জি গায়ে এক চকিশ-পঁচিশ বছরের মাস্তান ছোঁড়া দোতলার সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে হুঙ্কার দিয়ে উঠল—

—শালা ডাক্তার আমাব বাচ্চা খুন করেছে। ও শালাকে আমি ফাঁসিকাঠে ঝোলাব। বাদলা, তুই দৌড়ে থানায় যা। মাথা, কালু, দেখিস শালা যেন পালাতে না পারে।

থানা-পুলিশ পর্যন্ত আর গড়ায়নি ব্যাপারটা। পান্নাই সামলে নিয়েছিল। এক হাতে সঁক দেওয়ার পুঁটলিটা পেটের ওপর ঠেসে ধরে সিঁড়ির মাথা থেকেই বাদলাকে দাঁড়াতে বলেছিল ও।

হাজার হোক এতদিন যাদের নুন খেয়েছে তাদের গুণ না গাইলেও একেবারে খুনের মামলায় জড়িয়ে ফেলতে হয়ত ওর বিবেকে বেধেছিল।

বাদলা দরজা-মুখো হবেও দাঁড়িয়ে গেল। আর সেই দরজা দিয়েই গলা খাঁকারি দিয়ে ঢুকল খগেন মল্লিক। দেখে মনে হল কাছাকাছিই কোথাও ছিল লোকটা কিনা হয়ত এদিক দিয়েই যাচ্ছিল কোনো কাজে। অভয়পদ চোখ তুলে তাকাতেই খগেন আশার বাণী শোনালে—

—নাহ, লাইসেন্স আপনার বেঁচে যাবে। হাজতেও ঘনি টানতে হবে না। চান তো কর্তা-গিমি কাজকর্ম যেমন চালিয়ে যাচ্ছেন সেইরকমই চালিয়ে যেতে পারেন। তবে কিনা, ওই মূল্য ধরে দেওয়ার ব্যাপারটা তো আছে। নগদ নারায়ণ তো বিশেষ কিছু নেই আর আপনার। চলুন, চেম্বারে বসে—

অদল বদল বিশেষ কিছু হল না। কাজকর্ম যেমন চলছিল সেইরকমই চলতে লাগল। শুধু গেটের মাথায় নতুন সাইনবোর্ড লেগে গেল ক’দিন বাদেই: “খাত্তী পান্না নার্সিং হোম।” আর গেটের ডানদিকের পিলারে কাঠের ফলকে ছোট সাদা হরফে লেখা: ভিজিটিং ডাক্তার—ডাঃ অভয়পদ দেবনাথ, এম বি বি এস।

পথঘাটের কিসসা

রোল

একটি অ্যামেচার ক্লাবে নাটকের রিহাসাল চলছে। অ্যামেচার ক্লাব। শঙ্খলা-টঙ্খলার বালাই নেই। যে যখন খুশি আসছেন। রিহাসাল নামেই। তাও খেমে গেছে অনেককণ। ঋণা-দাণা চলছে। এগ রোল মাথাপিছু আধখানা। এক বয়স্ক ভদ্রমহিলা সদ্য এসে পৌঁছেছেন। ক্লাবের সম্পাদকও উপস্থিত। রোল খেতে খেতে গল্পগজবের মধ্যে নাটকের প্রসঙ্গ এল। ভদ্রমহিলা এক কঁাকে বলে উঠলেন—আমাকে একটা রোল দে না রে। ইস! আধখানা দেওয়া খুবই অনুচিত কাজ হয়েছে। এই ভেবে, এক তরুণ সদস্য দৌড়ে গিয়ে প্লেট থেকে একটা গোটা রোল তুলে এনে বাড়িয়ে দিল—এই নিন দিদি।

যদিচ রোল না পাওয়ার দুঃখ আর রইল না, তথাপি ভদ্রমহিলার চোখ কপালে।

—মৈনাক মিত্র

নাচানাচি

১লা মার্চ শনিবার, রাত দশটা। হঠাৎ বাজি-পটকার শব্দে কাকগুলো কা-কা করে তেকে উঠেছে। ভীত, সঙ্কুস্ত কুকুরগুলো রাস্তা থেকে বেপান্ত। শতীন রাহুল যুবরাজ মহারাজদের নাম লেখা ফেস্টুন, ব্যানার, ছবি নিয়ে হই-হুল্লোড়। কীসরঘন্টা, বিউগিল বাজাতে বাজাতে ছেলে-বুড়োদের মিছিল ছেয়ে ফেলল গোটা শহর কলকাতার পথঘাট।

এমনই একটা মিছিল বেহালা টোলার কাছে গাঙ্গুলীদের বাড়ির দিক থেকে এসে বীবেন রায় রোড ধরে ডায়মণ্ডহারবার রোড পার হচ্ছিল। এমন সময়ে শীলপাড়ার জমিদারবাড়ির চৌধুরীকর্তার বড় ছেলে মদনবাবু ছুটে গিয়ে একটা ছেলের হাত ধরে বললেন—কি রে—খুব মহানন্দে নেতা করছিস, কী ব্যাপার?

—পাকিস্তানকে হারিয়েছি না! শতীন না থাকলে কি যে হত। ক্যাপ্টেন মহারাজদা জিন্দাবাদ।

—কয়েকদিন আগে মূর্ত্যবাদ বলছিলি না! খেলোয়াড়দের কুশপুত্তলিকা দাহ করছিলি না? আজ যে বড়.....

—আমি দাহ করিনি, এই তো সেই মডেলটা; আমি ফুলের মালা পরিয়েছি।

—একবার জুতোর মালা, একবার ফুলের মালা। একবার ফেস্টে উঠছিস, একবার নেচে উঠছিস? তোদের কি মাথা ধরাপ হয়েছে?

—না স্যার, আমি না। আজ তো আমরা পাকিস্তানকে হারিয়েছি। নাচব না।

—একজন মাঝবয়সী ভদ্রলোক সব শুনে বললেন—এরা হচ্ছে হজুগে। কাজ নেই তাই খই ভাজছে। তাই এত হেঁড়া জুতো আর ফুলের রমরমা ব্যবসা চলছে কলকাতায়।



—আজ তো সবাই নাচছে দাদা। প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী সবাই নাচছে। আমরা একটু নাচব না। পাকিস্তানকে হারানোর স্বাদই আলাদা।

—চলো তবে একটু নেচে-টেচে দেখি। আচ্ছা কী কী নাচ জানো তুমি?

—কী কী নাচ। এই রে।

ছেলেটির মুখ আমসি।

—বরুণ ঘোষ





মহিলা ম হল

‘ফিস ফিস’ বিভাগ

পরামর্শ দিচ্ছেন : প্রাণঘাতিনী দেবী

● আমার নামটা নিয়ে অনেকেই আমাকে বিদ্রূপ করে। বলে, তুই মেয়ে নোস, ছেলে, হলেই তোকে মানায় ভালো। তোর নামের সঙ্গে ভাল মিলিয়ে। কী করব, একটা টিপস দিন।

—কাঞ্চন দে, মুর্শিদাবাদ

□ কাঞ্চনে অরুচি? তবে—‘তামা দে’। ‘তামাদি’-ও চলতে পারে।

● প্রাণঘাতিনীদি, আমি যাকে ভালোবাসি সে আমার চেয়ে সাতাশ বছরের বড়। তাতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু বলি কী করব?

—কানন রায়, কলকাতা-২৯

□ ঠোট ফাঁক করেই বলো।

● আমি যাকে পছন্দ করি, সে আমাকে দেখলেই নাক সিটকায়, আমি সুন্দরী নই বলে। কী মাথলে সুন্দরী হব?

—পুনি দাস, ব্যারাকপুর

□ ডিম। সেই ডিম ফুটেই রূপের বাচ্চা বেরবে। তারপর তাকে ধীরেসুস্থে লালন-পালন করো।

● যখন আমি আমার ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে কথা বলি তখনই আমার বুকটা খড়খড় করে ওঠে। কী করলে এই উত্তেজনা কমবে?

—অনুপমা বসু, বহরমপুর

□ কথা না বললে।

● আমাকে কর্মসে এক ছাত্র, আমার চেয়ে ছোটই হবে, প্রোপোজ করেছে। আমি তাকে পছন্দ করি না। কী করা যায়?

—তানিয়া রায়, খড়গপুর

□ তুমি কি কলা বিভাগের? তবে একটা আস্ত কলা পাঠিয়ে দাও। কলা দেখেই তার চৈতন্য হবে—এখানে বাণিজ্য খাটবে না।

● আমি চাই আমার হবু বর আমার মতোই জীবন-রসিক হোক। ভালো বর কোথায় পাওয়া যায়?

—শবরী গায়ের, কুচবিহার

□ বর পাওয়ার উর্বর ক্ষেত্র? বর চাই। ব্যাক্ত অফ বরোদায় চলে যাও।

● ভালোবাসার ক্ষেত্রে রূপই কি সব? মন কি কোনো কাজে লাগে না?

—মৌমিতা রায়, বেহলা

□ লাগে বইকি। মনোমালিন্যে।

● ভালোবাসা কি শুধু শরীরকেই বোঝে? এখনকার প্রেম করার ধরণ দেখে আমার তো তাই-ই মনে হয়।

—প্রমীলা দাশগুপ্ত, আসানসোল

□ অশরীরীর সঙ্গে প্রেমে আগ্রহী তুমি?

● কোনো অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়ে যদি ভালোবাসার অতলে তলিয়ে যায় তবে কে তাকে টেনে তুলবে?

—নাজনীন খাতুন, কলকাতা-১৭

□ তার বারা। কিম্বা মা। কিম্বা দু’জনেই, দুটো কান ধরে।

● নিভুতে প্রেম করার কি কোনো জায়গাই নেই?

—পম্পা সাউ, শ্যামনগর, উত্তর ২৪ পরগণা

□ কেন, ফুলশয্যার খাট।

● আমার নতুন বস-এর নাম সুখাসিদ্ধ রায়। এত সুন্দর নাম যার সে কখনো অসভ্য হতে পারে।

—কণিকা সেন, উত্তরপাড়া, হুগলী

□ বলা মুশকিল। তবে ন্যাড়া হয়ে অফিস করবেন। কারণ, সিদ্ধ সভ্যতায় মেয়েরা ন্যাড়া আর পুরুষেরা লম্বাচুলো হত।

● চানচুর খাওয়ার সঙ্গে চুল ওঠার কি কোনো সম্পর্ক আছে? আমি ভীষণ চানচুর খায় এবং আমার ভীষণ চুল উঠছে। পরামর্শ চাই?

—রুকসানা চৌধুরী, মালদা

□ সবটা না ওঠা পর্যন্ত কিছু বলতে পারছি না।

● আমি দু’বেলা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত রেওয়াজ করি। একটি অত্যাধুনিক পরিবারে আমার বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছে। আমার কি সেখানে বিয়ে করা উচিত হবে? মানে, বলতে চাইছি, সেখানে গিয়ে আমি কি আর রাগ-চর্চা করতে পারব?

—তমসা বৈদ্য, জলপাইগুড়ি

□ খুবই পারবে। তোমার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত চর্চাই ব্যাপক রাগারাগির কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

● আমার পায়ে খুব লোম। যদিও বাইরে থেকে দেখা যায় না। আচ্ছা, ছেলেরা কি মেয়েদের পায়ে লোম থাকলে অপছন্দ করে?

—অনুপমা সাহু, কলকাতা-৪৪

□ কারো কারো কাছে সেটাই লোমহর্ষক হয়ে উঠতে পারে।

সরসকথা

বালিচক, পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে শ্রী গঙ্গাধর গাঁতাইং লিখেছেন—কুমারেশ ঘোষ সম্পাদিত “যষ্টিমধু” পত্রিকায় ‘সরস সারকথা’ নামে একটি বিভাগ থাকত। তাতে পাঠকদের মধ্যে অনেকেই বিভিন্ন পুস্তকের সরস কথার লাইনগুলি (লেখক ও পুস্তকের নাম সমেত) লিখে পাঠাতেন এবং তা পত্রিকায় ছাপা হত প্রেরকের নাম সমেত। তাতে আসল বই না পড়েও সরস কথাগুলি আমরা উপহার পেতাম। এবং প্রয়োজনে আসল বইটিও পড়ার জন্য অনেকের উৎসাহ বাড়ত। যাই হোক, এমন একটি বিভাগ পত্রপাঠে রাখা যায় কিনা ভেবে দেখতে অনুরোধ করি।

আমরাও গাঁতাইং মশাইকে অনুরোধ করি—ধুনিটা আপনিই প্রথম জ্বালুন। অন্যদের প্রতিও অনুরোধ রইল সেই অগ্নিকুণ্ডে ঘৃতাহুতি দেওয়ার।

গ্রাহকদের জন্য নাহক কথা

পত্রপাঠ ডাকে পাঠানো হয় প্রতিমাসের ১০ তারিখে। ডাক বিভাগ তার আগে আমাদের ডাকে সাড়া দেন না। অতএব গ্রাহকদের অনুরোধ করা হচ্ছে—তারপর অন্তত দশ পনেরোদিন পরেও যদি পত্রিকা না পান তবেই জানান। টেলিফোনে জানালেই হবে।

পত্রপাঠ-এর দুটি যাচ্ছেতাই প্রকাশনা—

অকপটে—সমরেশ মজুমদার ৩৫

পত্রপাঠ সহর্ষ গল্প সংগ্রহ—মনোজ বসু, শক্তিপদ রাজগুরু, বুদ্ধদেব গুহ, নবনীতা দেব সেন, দিব্যেন্দু পালিত এবং.....৩৫

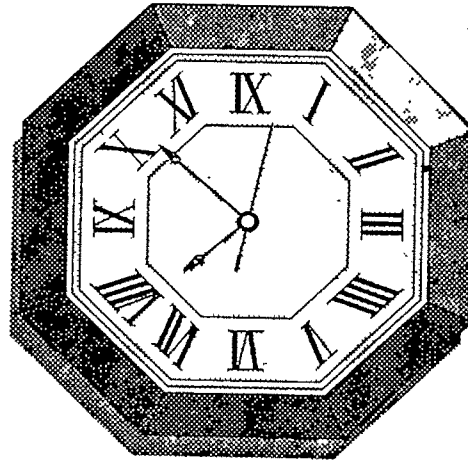
পরিবেশক : নবজাতক প্রকাশন,
এ ৬৪ কলেজস্ট্রিট মার্কেট,
কলকাতা-৭

গোমড়া মুখে আর থাকা নয়। দারাত বছরের হানি-মজার আগাম বায়না করে যান।
মাত্র ১২০ টাকা দিয়ে পত্রপাঠ মাসিকপত্রের এক বছরের
সড়াক গ্রাহক হোন। আর সঙ্গে নিলে যান একটি সুন্দর
দেওমাণ্য ঘড়ি।

একদম



উপহার ষ্টক থাকা পর্যন্ত।
পেতে চাইলে কালকের জন্যে
অপেক্ষা করবেন না।
চলে আসুন আজই।



ফোনে যোগাযোগ :
২৪৪০-৩৮০৩
(সকাল ১০টার মধ্যে)

হাসানোর জন্য আমরা দায়ী ফাঁসানোর জন্যে নয়।

পত্রপাঠ

১০বি (অথবা ১০ জে), ফার্ন রোড, কলকাতা-৭০০০১৯

সাদাকে সাদা ও কালোকে কালো বলার একমাত্র সহর্ষ মাসিকপত্র

এপ্রিল ২০০৩

দাম : ৮ টাকা

স্ট্রিপার্ট

৩য় বর্ষ ৥ ৯ম সংখ্যা

বিদায় নেবার জন্য নয়



চোরের মারের
বড় গলা

গ্রাহকদের জন্য গ্রাহক কথা

পত্রপাঠ ডাকে পাঠানো হয় প্রতিমাসের ১০ তারিখে। ডাক বিভাগ তার আগে আমাদের ডাকে সাড়া দেন না। অতএব গ্রাহকদের অনুরোধ করা হচ্ছে—তারপর অন্তত দশ পনেরোদিন পরেও যদি পত্রিকা না পান তবেই জানান। টেলিফোনে জানালেই হবে।

পত্রপাঠ-এর দুটি যাচ্ছেতাই প্রকাশনা—

অকপটে—সমরেশ মজুমদার ৩৫

পত্রপাঠ সহস্র গল্প সংগ্রহ—মনোজ বসু, শক্তিপদ রাজগুরু, বুদ্ধদেব গুহ, নবনীতা দেব সেন, দিব্যেন্দু পালিত, অমিতাভ চৌধুরি, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, সমরেশ মজুমদার, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, হর্ষ দত্ত, কণা বসু মিশ্র, মন্দাকান্তা সেন, শেখর আহমেদ এবং.....৩৫

পরিবেশক : নবজাতক প্রকাশন,

এ ৬৪ কলেজস্ট্রিট মার্কেট,

কলকাতা-৭০০০০৭

চোরের মায়ের বড় গলা

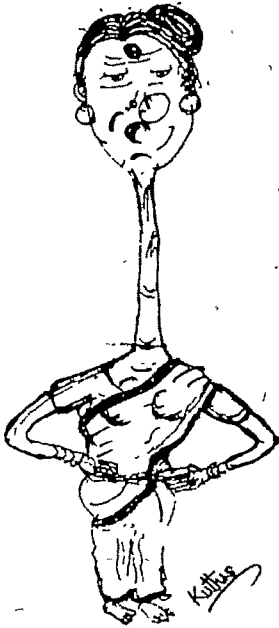
এপ্রিল ২০০৩ ॥ ৩য় বর্ষ ॥ ৯ম সংখ্যা

দাম : ৮ টাকা

কাউকে হাসানোর কাগজ
কাউকে ফাঁসানোর কাগজ

সাদাকে সাদা ও কালোকে কালো বলার একমাত্র সহর্ষ মাসিকপত্র

পত্রিকা
বিদায় নেবার জন্য নয়



পুরনো কাসুন্দি : যোগেশচন্দ্র বসু-র “পঞ্চানন্দ” থেকে □ ৯

রসকাব্য : সভার কথা গবার কথা • ভগলু বাঁড়জো □ ৩৬

রসগল্প : আত্মকাহিনী • দিব্যেন্দু দাস □ ২০

নিয়মিত কলম : রসবশের দিনগুলি • রসময় শিবরাম • সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত □ ১২ অকপটে :
চোরের মা, অথবা চোরের দিদি, চোরের বাবা কোথায়? • সমবেশ মজুমদার □ ১৪ চবণ
বৈরাগীর ইকড়ি মিকড়ি : বাগদাদে সাঁইবাড়ি □ ১৬ টাকা নিষ্প্রয়োজন . এ চোব সে চোর
নয় • বুনো বামনাথ □ ১৮ তারাপদ বায় ও গঙ্গারাম □ ২৫ কড়চা ২০০৩
অমিতাভ সান্যাল □ ৩৪ ফজল আলিব ফাজলামি : হুঁশিয়ার হো □ ৪৩

ধারাবাহিক রসোপন্যাস : মারায়ণ • পিনাকীশঙ্কর চৌধুরী □ ২৮

চোরের মায়ের বড় গলা : চোবের মায়েরা • সুবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য □ ২৩ নিরাপদ মাতা-পুত্র
• বুলু মুখোপাধ্যায় □ ৩২ পিচুব মাযেরা • সুশান্ত রায় □ ৪১ চৌরচরিত •
গোপলা বোস □ ৪৫

অন্যান্য : চিবকালের কৌতুক • কাকলি চৌধুরী □ ৩৩ আবার তোরা গক হ • বাসুদেব মোশেল
□ ৩৭ এ প্রেম • কমল কুমার দত্ত □ ৪৮

নিয়মিত বিভাগ : কার্টুন □ ৪, ১৯, ৪৪, ৪৯ সম্পাদকীয় □ ৫ রাশি চক্কোর □ ৬
পত্রপাঠ জবাব □ ৭ ট্যারা চোখে □ ২৪ মহিলা মহল □ ২৬ পুরুষ মহল □ ২৭ জবব
খবর □ ৩৯ হৈসেল □ ৪৭ সিনেমা দুঃসংবাদ □ ৫০

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা : নীবেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী • তারাপদ রায়
• সমবেশ মজুমদার • শঙ্করলাল ভট্টাচার্য

সম্পাদক : শেখর আহমেদ

পরিচালন সমিতি : ডাঃ তুষারকান্তি রায় • প্রদ্যোত কুমার মিত্র •
বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী • অঞ্জনা দত্ত • ডঃ শুভাশিস নিয়োগী •
শচীন মিত্র

প্রচ্ছদ : ডি সুজা

অলঙ্করণ : অনুপ রায় • শুকপ্রসাদ দাস • কুটুস • জয়ন্তী রায়চৌধুরী
• চন্দন দাস

কর্ম সহায়ক : দিব্যেন্দু দাস • অচিন্ত্য কারক

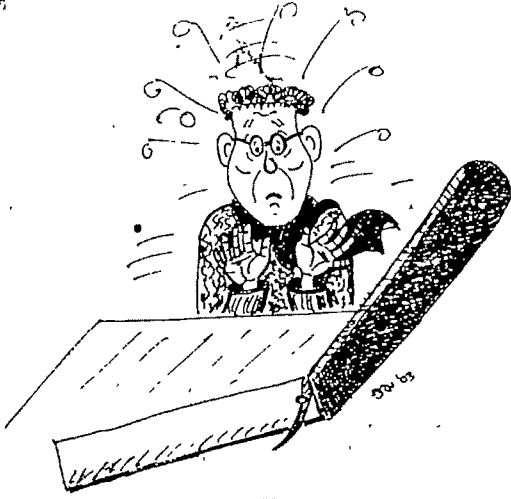
শেখর আহমেদ কর্তৃক ১০ জে, ফার্ম রোড (গ্রাউণ্ড ফ্লোর), কলি-১৯ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন : ২৪৪০-৩৮০৩, ৯৮৩০০-৫২১৮২

সম্পাদকীয় দপ্তর : (সংখ্যা ৫-৩০ থেকে ৮-৩০) ১০ বি, ফার্ম বোড, কলি-১৯, মুদ্রণ : দেবী সারদা প্রেস, ৩০এ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলি-৯



সম্পাদকীয়

চোরা না-শোনে অধর্মের কাহিনী



চোব চুরি করে। চুরি করাই তাহার ধর্ম। অতএব চোর অধার্মিক—একথা বলা নিতান্তই অন্যায়। সেইরূপ ডাকাতেরও কিছু ধর্ম আছে। রাজনীতিবিদ, সাহিত্যিক, পুলিশ—সকলেরই। পুলিশ ক্ষমতার অপব্যবহার করিবে না, রাজনীতিবিদ গুণ্ডা-বদমায়েশ পুষিবে না, চলচ্চিত্র পরিচালক নবাগতা নায়িকাকে শয্যাকক্ষে আহ্বান করিবে না, সাহিত্যিক সাধু সাজিয়া ধান্দাপানি করিবে না—এসব ভাবাও পাপ। এগুলিই লইয়া অনিল বিশ্বাসের বড় গলা, মুখোশহীন নগ্ন সাম্প্রদায়িক বিজেপির সহিত সেকুলার মমতার কাম কুল অ্যাণ্ড কোয়ালিটি গাঁটছড়া বন্ধন—ইত্যাদির মধ্যে আমরা কোনোরূপ অন্যায় দেখি না। তাই স্বৈরতন্ত্রী মুশারফ সরকার ও রাজতন্ত্রী সৌদি আরবের একাধারে পিতা মাতা ও পরমেশ্বর মাফিয়া সর্দাব বুশের ইবাকে Gun-তন্ত্রের গাছ পুঁতিতে যাওয়াতেও আমরা বিন্দুমাত্র ক্ষুব্ধ নই। ধরম আপনা আপনা। করম ভি আপনা আপনা। বিশ্বময় লোকে চিল্লাইয়া গলা ফাটাইয়া ফেলিতেছে। চিল্লাইলেই চোরবাবাজি শুনিবে? তাহার কি পরলোকের ভয় নাই! ফ্রান্স-রাশিয়া-জার্মানি (এবং লজ্জাকুলবধূ চীনও কভি কভি) গরম গরম বুলি শুনাইতেছে। কেন, তোমার স্বদেশ কি 'মাটি দেয়নি কো দেয়নি জল, দেয়নি তোমার মুখেতে অন্ন বাহুতে বল? পূর্বপুরুষ অনুপস্থিত রক্তে....' জানো না, চোর কোন ভাষা বুঝে? নাকি, এ সকল বুলি শুধু ভাসা-ভাসা, তোমরাও অধর্মের পাপাবাগী শুনিতে পাও না? তুমি কংস হও কিংবা দুর্যোধন, অথবা ধৃতরাষ্ট্র—চক্রধারীর গতিরোধ করিবে কী প্রকারে? সে মুখ চক্রধারী যে আবার তাহার ধর্ম ভিন্ন কিছুই বুঝিবে না। তোমাতে চোরেতে প্রভেদ করিবার ন্যায় সূক্ষ্মবুদ্ধি কি তাহার হইবে? চোরের ধর্ম চোর পালন করুক, ক্ষতি নাই। প্রতিবেশীর ধর্ম, বাহুতে বল থাকিলে তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া টানিয়া আনা। নহিলে পবদিন চোরই প্রতিবেশীর কেশাকর্ষণ করিবে। বড়ই ধন্দ জাগিতেছে। শেষে কি গুণাহ কি বাৎ আসিয়া পড়িল? গুস্তাকি মাফ! সম্পাদক তাহার সবেধন নীলমণি নিজস্ব অতীব খাটো গলাটি জবাই হইতে দিতে বিলকুল নারাজ। ধর্মের পথ বড়ই ক্ষুরধার। ক্ষুরের ধার পরখ করিয়া আর কাজ নাই।



জ্যোতিষসঙ্গী সৌভাগ্যদমন মহারাজ

ছোড়ের রাশি : এই রাশির জাতক এবং জাতিকাদের গ্রহ-নক্ষত্র সর্বদাই তুষ্ট থাকে। এ মাসে বিনা প্লাস্টিক সার্জারিতে কোনো ডাক্তার ছাড়াই, স্বেচ্ছা জনগণহস্ত চালানে নিখরচায় শরীর ও মুখের আকৃতি ও প্রকৃতিগত পরিবর্তন করিয়ে নেওয়ার সুবর্ণ সুযোগ আপনার সামনে নাচছে।

চোরের মা রাশি : এ রাশির শুধু জাতিকা নয়, জাতকও হয়। যত বেশি চিৎকার করবেন, আপনার সুপুত্র ততই নিরাপদে অন্যের বোঝা হাঙ্কা করতে পারবে। নিজের ছেলের চুরি ঢাকার চেয়ে অন্যের ছেলেকে চোর বলার কাজে বেশি মনোনিবেশ করুন। কঠে 'সাধু নিবারণী কবচ' ধারণ অতীব ফলপ্রসূ। মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে আপনার গলার মহিমায় নতুন পুত্রলাভের সম্ভাবনা। ঈর্ষাকাতর পুলিশ কিংবা সতীনপুত্রের হাতে আপনার কোনো রক্ত যন্ত্র সহকারে ওপারে পাড়ি দিলেও তাই আপনার কোল শূন্য থাকার কোনো সম্ভাবনাই নেই।

চোরের জ্যাঠা রাশি : এ রাশিতেও জাতক-জাতিকা দুই-ই হয়। চোরের জ্যাঠারা থাকেন হেড কোয়ার্টারে। জাতক-জাতিকারা ভুলেও এ মাসে হেড অফিস ছেড়ে অকুস্থলে যাবেন না। আপনাদের পেট লিক্ করার জন্যে পাবলিক সেজে বিপক্ষ দলের গুপ্তারা গণ্ডায় গণ্ডায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। সাংবাদিক সম্মেলন কালে কঠে তিনটি জ্যাঠামি-মন্ত্র ধারণ করা বিধেয়—১) বিরোধীদের অপপ্রচার, মিথ্যা। ২) পট্টকে যাওয়া ব্যক্তি বা নির্ধাতিতার ক্যারেক্টারই তো লুজ। ৩) আমাদের দলের কেউ এ কাজ করতেই পারে না।

এ মাসে আপনার কুশপুত্রুল পোড়ানোর খুববার্তা আসতে পারে। ফলত খ্যাতি (কু-পূর্বক) ও গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবে। তবে মাথা এবং বুকের ব্যথা বৃদ্ধিরও যোগ আছে, যখন দেখবেন আপনার ভাইপোরা না জেনে কোনো হেভিওয়েট জ্যাঠার ভাইপো বা ভাইবিকে টার্গেট করে ফেলেছে।

চোরের মামা রাশি : আপনার ভাগ্যেরা কামাল করে দেবে মাসের মাঝামাঝি। যা মাল কামাবে তা আন্দাজও করতে পারবেন না। তবে যেহেতু 'জন জামাই ভাগ্যনা তিন না হয় আপনা' সুতরাং সুতোটা নিজের হাতেই রাখবেন। অবশ্য সেই সুতোয় নিজের হাত কাটার সুত্রপাত হতে পারে এবং চুরির অংশ বংশ হয়ে অনুপ্রবেশ করতে পারে আপনার ঘরে, আপনারই গোষ্ঠীশত্রুদের গুপ্তিগত চক্রান্তে। ভাগ্যনা নির্বাচনে ভুল হলেই তা ছল হয়ে ওঠার সমূহ সম্ভাবনা।

চোরের ডাই রাশি : আপনার আদর্শ টনি ব্রেয়ার। প্রত্যহ প্রাতে টনিক খাওয়ার মতো এই নাম ১০৮ বার জপ করবেন। দাদার পাদোদক নিত্য গ্রহণে আপনার পদ নির্বিন্ম হবে। দুর্বল প্রতিপক্ষ দেখে দাদার সঙ্গে হাত মিলিয়ে ঝাপিয়ে পড়লে শুভ ফল পাবেন। তবে হাড় কাঁপিয়ে জুর আসবে, যখন দেখবেন, প্রতিপক্ষ দুর্বল হলেও দাঁত তার ধারালো আর বিষময়। প্রতিবেশী গুপ্তশত্রু আপনার শূল-বেদনার কারণ হয়ে উঠতে পারে। অবশ্য তাতে আপনার Fool-ত্ব আদৌ কমবে না। সমালোচক ও বিরোধী মুখপোড়াদের ক্রমবর্ধমান দাপটে এখন থেকে মুখ পোড়ানো প্র্যাগ্টিশ করলে ভবিষ্যতে যন্ত্রণা কম হবে।

চোরের বউ রাশি : এ মাসটা আপনার ভালোয় মন্দয় মেশানো। রাহু আপনার পতির দিকে বাহ বাড়ানোর ফলে এবং কেতু হেতুর ঘরে অবস্থান করায় আপনার পতির জীবনে যতি-চিহ্ন বসে যেতে পারে। তবে এই পট পরিবর্তনে আপনার অচিরাত পত্নি-পরিবর্তন যোগও বিদ্যমান। ক্ষতি এবং পতি আপনার জীবনে প্রেমিক-প্রেমিকার মতোই হাত ধরাধরি করে আসবে। সামনে হাত, পেছনে হাতকড়া; কিন্তু সেটা আপনি দেখার সুযোগ পাবেন না; দেখার আগেই চাঁখার ব্যবস্থা যাকে বলে।

চোরের ঠাকুর্দা রাশি : খুবই ব্যথা পাবেন, যখন দেখবেন আপনার এত আন্তরিক কোচিং সত্বেও নাতির হাতের ফাঁক দিয়ে হাতি গলে যাচ্ছে। গুরু মলিন থাকায় বুড়া বয়েসে মাঠে নামতে গিয়ে ঘাটে চষে যেতে পারেন। ভালোর মধ্যে চিতায় ওঠার আগে দেখে শাস্তি পেতে পারেন যে সরকারি খরচায় দেয়াল ঘেরা সংশোধনাগারে আপনার বংশ-প্রদীপটির জন্মের মতো খোরপোষের ব্যবস্থা হয়েছে।

সৌভাগ্যদমন মহারাজের রাশি বিষয়ক ভবিষ্যবাণী মিলে যাওয়ায় বহু পাঠক যোগাযোগ করছেন বলে আমরা তাঁদেরকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

ধারা তাঁর ভবিষ্যৎ প্রবচন সত্য প্রমাণ করে পরপারে অবস্থান করছেন, তাঁদের কাছে একান্ত অনুরোধ,—স্ব্যস্তের পর অনুগ্রহ পূর্বক যোগাযোগ করবেন না। কৃষ্ণপক্ষ বা অমাবস্যায় যোগাযোগের চেষ্টা শাস্তিমোক্ষ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হবে। নাকি সূরে কথা না বলাই বিধেয়।

পত্রপাঠ জবাব

জবাব দিচ্ছেন দ্বিতীয় সুগ্রীব

- নির্বাচিত পুর প্রতিনিধিদের পুরপিতা বা পুরমাতা বলার দরকার কি?

—বৈদ্যনাথ ধর, বৈদ্যবাটী, হুগলী

- আপনার প্রাকৃতিক বর্জ্য, আনাজেব খোসা, দইয়ের ভাঁড় ও যাবতীয় উচ্ছিষ্টের তত্ত্বাবধান যিনি করেন, তিনি পিতৃ-মাতৃ তুল্য বইকি।

- আপনাদেব ছাপা অতি জঘন্য।

—চাকলতা বৈদ্য, ব্যারাকপুর

- আমরা ছাপি না। ছাপার অন্য লোক আছে।
- প্রাচীনপন্থী কারা?

—সুচির বসু, মধ্যমগ্রাম, উঃ ২৪ পরগনা

- যারা আজও চিঠি লেখে।
- মোক্ষম দাওয়াই কাকে বলে?

—আরুণি মুখার্জী, মেদিনীপুর

- মুখার্জীকে। এরপর আর কিছু লাগে না।
- চোলাই মদেব ব্যবসা কি লাভজনক?

—বিভাস প্রমাণিক, মেদিনীপুর

- লোকাল থানায় খোঁজ করুন।
- জুতিয়ে কি সত্যিই সোজা করা যায়?

—লালু পাখিরা, যাদবপুর

- ছুটির দিন দেখে হাতে সময় নিয়ে আসুন, দেখি কী করা যায়।
- আমাব নতুন ফ্ল্যাটে কী করব ঠিক কবতে পারছি না। মোজাইক, পাথর না টাইল?

—সুচন্দ্রিমা রায়, কলকাতা-২৯

- একবার করে ফেললে আর কিছু করার থাকবে না। তার চে যেমন আছে বেখে দিন। সবগুলো করাব অপশানই খোলা থাকবে।

- বিয়ের পর মধুচন্দ্রিমা কি আবশ্যিক?

—তুহিনা সামন্ত, বেলঘরিয়া

- আঙুর না, ঐচ্ছিক।
- একটি বিশেষ প্রাণীর বাচ্চা বললে আমরা গ্রেগে যাই, কেন?

—অবনী ঘোষাল, পুকুলিয়া

- আপনাব বাগের কোনো কারণ নেই, নিজেকে চিনতে শিখুন।
- কয়লাকে কালা হীরে বলে কেন?

—মুস্তাক খান, কলকাতা-১৭

- আপনার কি মনে হয়? সাদা লাড্ডু।
- পঞ্চায়েতে দাঁড়াব ভাবছি। কী ভাবে প্রস্তুতি নেব?

—বরদা ব্যানার্জী, বাঁকুড়া

- আপাতত প্রতিদিন ঘণ্টা দশেক দাঁড়ানো প্র্যাকটিস করুন।
- ৪০ বছর ভাড়া থেকে ঘর ছাড়া যায়?

—হরেন্দ্রনাথ পাকড়াশি, বটতলা, কলকাতা-৬৮

- আমার মাত্র দশবছর হয়েছে। আরো তিরিশ বছর কাটলে একটু মনে কবিয়ে দেবেন।

- বাড়ি করছি। কোন ইট ভালো হবে, বলবেন?

—মনু লাহিড়ী, ফুচবিহার

- ঝামশিলা।

- আমি 'হারিয়ে পাওয়া' নামে একটি কবিতা পাঠালাম। আশা করি ছাপবেন।

—শকুন্তলা সামন্ত, বেহালা

- ধন্যবাদ। ওটা আমারই কবিতা। হারিয়ে গিয়েছিল।

- যন্ত্রণা গভীর হলেই কি ভালোবাসা জন্মায়?

—কৃষ্ণা নাথ, বাণ্ডাইয়াটি, কলকাতা

- গলার নলিটা কেটে দেখতে পারেন। ওতে বেশ গভীর যন্ত্রণা হয় বলেই শুনেছি। ভালোবাসা জন্মায় কি না সেটা আপনার কাছ থেকেই জেনে নেব।

- আপনারা একটা লটারি চালু করতে পারেন তো?

—শবনম মুস্তারি, বহড়ু, দঃ ২৪ পরগনা

- চালু তো কবাই আছে। প্রতি সংখ্যা ৮ টাকা। পূবস্কাবের কথা বলে পরিকেশ দুঃখিত করবেন না নিশ্চয়ই।

- স্বল্প সঞ্চয়ের ওপর সুদ কমানো কি সমর্থন করেন?

—অসীম শীল, নিউ ব্যারাকপুর

- না। কেন না অধিক সঞ্চয়ই আমাদের কাম্য।

- আপনাদের পত্রিকায় আঁকা কার্টুনগুলো অত্যন্ত নিম্ন মানের।

—নির্মল ব্যানার্জী, কলকাতা-২৬

- ওগুলো কার্টুন নয়, পাঠক-পাঠিকাদের ছবি।

- পত্রপাঠ উঠে যাবে শুনিছি।

—শিবকান্ত সর্দার, আমতা, হাওড়া

- হ্যাঁ, আপনার ঘাড়ে।

- আপনার যাই বলুন, পত্রপাঠের সেরকম বিক্রি দেখি না।

—কোকিল মণ্ডল, ক্যানিং, দঃ ২৪ পরগনা

- দেখার কথাও নয়। পত্রপাঠ অঙ্কদের পত্রিকা নয়।

- সবসময় সি পি এম আব তৃণমূলের বিরুদ্ধেই লেখেন। আপনারা কি সবাই কংগ্রেস বা বিজেপি করেন?

—আসমা বেগম, বর্ধমান

□ না, আমরা প্রার্থনা করি—হে ভগবান, মাতালরা যেন আমাদের চিঠি না লেখে।

- কুটনীতিকের কাজ কি?

—সুচন্দ্র সেন, আসানসোল, বর্ধমান

□ বহিষ্কৃত হওয়া।

- প্রেম কি অবিনশ্বর, অক্ষয়?

—অনিমিত্তা পাল, বরাকর

□ ভূতের বিয়ে গুনেছি। ভূতের প্রেম গুনিনি।

- খানতলার ঘটনায় পত্রপাঠ নীরর কেন?



—সরস্বতী দত্ত, দুর্গাপুর, বর্ধমান

□ পত্রপাঠ ভূমিহীন। খান তোলার সঙ্গে সম্পর্ক নেই।

- আপনারা গালাগালি ছাপেন?

—শ্যামল রায়চৌধুরী, দমদম

□ ছাপি। জর্জ বুশ, টনি ব্রেনার—ইত্যাদি।

- ইরাকে মার্কিন হানা সমর্থন করেন কি?

—রবি নায়েক, খড়গপুর, মেদিনীপুর

□ না। তবে এখনো যারা তা সমর্থন করছে তাদের ওপরে যেদিন মার্কিন হানা হবে সেদিন খুবই সমর্থন করব।

- প্রশাসন কি কোনোদিন দুর্নীতিমুক্ত হবে?

—সুকুমার আচা, কলকাতা-১

□ পত্রপাঠ যদিই আছে—কোনো আশা নেই।

- স্কুলপাঠে সুকুমার রায় উপেক্ষিত কেন?

—বসন্তী চাকলাদার, বীরভূম

□ কে বলল? এ বছরই স্কুল সার্ভিস কমিশন সুকুমার রায়কে প্রদত্ত জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ বেরার অ্যাডমিট কার্ডে কল্যাণী দাসের ছবি এঁটে একটি হাঁসজার উপহার দিয়েছে।

- মোবাইলফোনের বিপরীত শব্দ কি?

—স্বস্তিক মুখার্জী, কলকাতা-২৮

□ সিউলিফোন।

- আপনারা কেউ বিজ্ঞাপন দেয় না, কী ব্যাপার?

—অপরূপ ঢোল, কলকাতা-২৮

□ আমরা পণ-প্রচার বিরোধী।

- ভারতীয় নৌশক্তি কি দুর্বল?

—নবীন চন্দ্র দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি

□ মোটেই না। দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তি যত শত্রুজাহাজ ডোবাতে পারেনি তার চেয়ে ঢের বেশি ট্রলার আমরা কচুবেড়িয়া-গঙ্গাসাগর রুটে ডুবিয়েছি।

- মাঠে আপনারা 'ন্যাকামি' সংখ্যা বেরিয়েছে। কে বেশি ন্যাকা?

—সাজ্জাহান মাঝি, বসিরহাট

□ শব্দের মধ্যেই উত্তর আছে। ন্যাকা যুক্ত.....কী হয়? মনে মনে

উচ্চারণ করুন।

● গাড়ি কিনব। কোনটা কিনলে সাশ্রয় ও সুবিধা হবে বুঝতে পারছি না। আপনার মতামত চাই।

—বিরটিচন্দ্র গায়েন, কলকাতা-৭৭

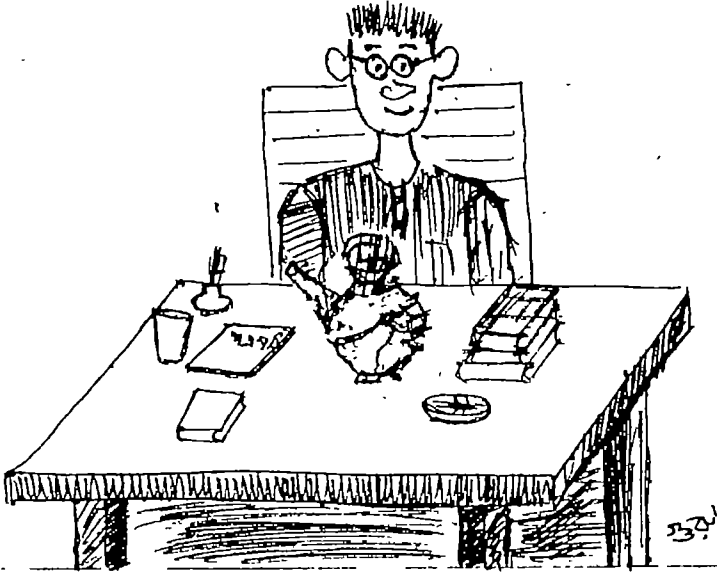
□ অটো কিনুন। অফিস যাতায়াতের খরচা উঠে গিয়েও দু-পয়সা হাতে থাকবে।

পত্রপাঠ জবাব, পত্রপাঠ না জবাব, মহিলা মহোৎসব এবং পুরুষ মহোৎসব বিভাগে যাঁরা এখনো চিঠি লিখতে সাহস করছেন না, তাঁদেরকে এই বর্ণে আশ্বস্ত করা হচ্ছে যে, তাঁদের দৃষ্টান্তকেই আমরা সাহসিকতার জন্য মরণোত্তর “দুঃসাহসী” পুরস্কারে ভূষিত করব।

বিঃ দ্রঃ — অনুগ্রহ পূর্বক মৃত্যুর পূর্বে কেউ এ পুরস্কারের জন্যে তদ্বির করবেন না। তদ্বির একমাত্র প্রাপকভিলাষীই করতে পারবেন। পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে কারো তদ্বির গ্রাহ্য হবে না।

পুরনো কাগসুন্দি

যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর “পঞ্চানন্দ” থেকে



পরদ্রব্য লই না।

বাবু পরম ধার্মিক। ঘরের ভিতর অন্য সময় কি করেন, তা জানি না; যখন বৈঠকখানায় তাঁহার নিকট লোকজন আসে, তখন ধর্মকথা ভিন্ন অন্য কোনো কথাই তিনি কহেন না। ধর্মচর্চাতেই লোক-বিতাড়ন করেন। তিনি মৎস্য, মাংস, হংসডিম্ব এবং কুলীরক সমস্তই ছাড়িয়াছেন এবং দুগ্ধকে মাংসজাতীয় আহার প্রতিপন্ন করিয়া শীঘ্র দুগ্ধ ছাড়িবেন বলিতেছেন। ঐ সঙ্গে ঘৃত ছানা দধি ঘোল ড্যাগেরও উল্লেখ হইয়া থাকে। মিষ্টায়ের দোকানের কাছ দিয়া গেলে, কোন পাণ স্পর্শে কিনা, সে বিষয়েও এক একবার নীরবে এবং সরবে চিন্তা করেন।

বাবুর নিবাস পল্লীগ্রামে। কলিকাতায় থাকেন এবং একখানি সংবাদপত্রও বাহির করিয়াছেন। তাহার গ্রাহকও নাই, বিজ্ঞাপনও নাই। একদা পল্লীগ্রামে বাটীতে যান। ঘোষেদের পুকুরে স্নান করিতে গিয়া, পুকুর-পাড়ে একটি মাটির বদনা কুড়াইয়া পান। বদনাটা সফতনে লইয়া কলিকাতায় আনিয়া সকলকে বলিতে লাগিলেন, “এ বদনা আমি কেমন করিয়া রাখি? যাহার বদনা, তিনি

আসিয়া এখানি গ্রহণ করুন। আমি এ পরদ্রব্য কখনই গ্রহণ করিতে পারিব না, আমার চরিত্র সেরূপ নহে যে, বদনাটিকে আমি লুকাইয়া রাখিব। আমি চোর হইলে বদনাটিকে কখনই কলিকাতায় স্থানিতাম না। আমি ধার্মিক, ধর্মী, আমার কর্ম এবং কর্মই আমার ধর্ম। প্রকৃত অধিকারীর অনুসন্ধান করা উচিত; নহিলে পরোপকার-ব্রত প্রতিপালন হইবে কিরূপে?” এই বলিয়া তিনি আপন কাগজে এক বিজ্ঞাপন দিলেন,—

সম্পত্তি প্রাপ্তির বিজ্ঞাপন

একদিন মধ্যাহ্নে আমি তৈল মর্দন-পূর্বক স্নানার্থে সরোবরে গমন করিয়াছিলাম। তথায় একটি মুক্তিকা-নির্মিত বদনা কুড়াইয়া পাইয়াছি। বদনার তলায় তিন জামগায় ছেঁদা আছে। বদনার গাটী একটুকু ফাটা, একটুকু কেন? অনেক টুকুই ফাটা। পাছে জোড় খুলিয়া যায়, এই ভয়ে আমি দড়ি দিয়া আটক করিয়া রাখিয়াছি। বদনার উপকরকার মুখটা নাই। আমি আলমারীর ভিতর একটা গ্লাসকেসের মধ্যে বদনাটা অতি যত্নে সংরক্ষা করিতেছি। যাহার বদনা হইবে, অথবা যে

সম্প্রদায়ের বদনা হইবে, এবং যদি কোন জয়েন্ট-স্টক কোম্পানীরই হয় তাহা হইলে তাঁহারা সকলে কিম্বা একে একে আসিয়া এ বদনা লইয়া যান এবং আমাকে মুক্তি দিন, বদনার জন্য রাড্রে আমার নিদ্রা হয় না।

যিনি এই বদনা লইতে আসিবেন, তিনি যেন কিছু টাকা সঙ্গে করিয়া আনেন। আমাদের কাগজের গ্রাহক সংখ্যা যে কত অধিক এবং সেই হিসাবে বিজ্ঞাপনের চার্জ যে কত বেশী, তাহা সকলেই জানেন।

জাম খরচের ফর্দ।

১। বোল ছত্র বিজ্ঞাপনের মূল্য	১৬ টাকা
২। বাটি হইতে কলিকাতা আগমনের রাহা খরচ	২ টাকা ৮ আনা
৩। পথে জলপানী	৪ আনা
৪। মুটে ভাড়া	৩ পয়সা
৫। Railway Freight	১২ আনা
৬। বুকিং ক্লার্ক এবং চাপরাশী প্রভৃতিকে বঞ্চসীস	২ টাকা

৭। একজন কনষ্টেবল বদনা পানে চাহিয়াছিল, সে পাছে	
চোরাই মাল মনে করে সেইজন্য তাহাকে বখসীস্	২ টাকা
৮। হাবড়ার কুলী ভাড়া	৮ আনা
৯। ঘোড়া গাড়ী ভাড়া	১২ আনা
১০। বাটী ভাড়া	৫ টাকা
১১। আলমারী ভাড়া	২ টাকা
১২। ঘাস কেস ভাড়া	১ টাকা
১৩। বদনা বাঁধবার দড়ি	১/২ পয়সা
১৪। আমার রাতে নিদ্রা হয়না এবং উহার জন্যে	
আমার সময় নষ্ট চার্জ	৩২ টাকা
১৫। বদনার স্বপ্ন দেখার চার্জ	১৭ টাকা
মোট	৮১ টাকা ১২ আনা ৩/৪ পয়সা।

আধ পয়সা কেহ বেশী দিলে লইব না। আমার ধর্মের সংসার। এককড়া কানাকড়ি বেশী দিয়া দেখ, আমি কিছুতেই তাহা গ্রহণ করিব না। যা ঠিক, তাই দাও—দিয়া বদনা লইয়া যাও। বদনা আমি আর রাখিতে পারিব না; রাখাও কর্তব্য নহে। বেশী দিন রাখিলে, চার্জও ধর্মতঃ বেশী দিতে হইবে।

চরিত্রহীন

বঙ্গ-সংসারে এইবার অতি একটা সাধু সংপ্রস্তাব উঠিয়াছে। স্বয়ং পঞ্চানন্দ সে কথা শ্রবণ করিয়া, পরম আত্মাদিত হইয়াছেন। সাধুগণ সত্য একত্র সমবেত হইয়া, স্থির করিয়াছেন,—“চরিত্রহীন লোকের সহিত আমরা আর কথা কহিব না,—চরিত্রহীন লোকের সম্পর্শে যাইব না,—চরিত্রহীন লোকের ছায়া মাড়াইব না।” একথা অমৃতময়ী। পঞ্চানন্দ-প্রভু এ অমৃত-রস-পানে পুলকে পরিপূর্ণ। প্রভু বলিতে লাগিলেন, “এইবার ঠিকই হইয়াছে। স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্বাহের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। কিন্তু একটা বিশেষ দুর্ভাবনার বিষয় আছে।

যাহার বদনা হইবে, অথবা যে
সম্প্রদায়ের বদনা হইবে, এবং যদি
কোন জয়েন্ট-স্টক কোম্পানীরই হয়
তাহা হইলে তাঁহারা সকলে কিম্বা একে
একে আসিয়া এ বদনা লইয়া যান

কোন ব্যক্তি চরিত্রহীন, তাহা কেমন করিয়া ঠাওরাইয়া লইব? আমাকে রেল-পথে, স্টীমার-পথে প্রায়ই যাতায়াত করিতে হয়। রেল গাড়ীতে চরিত্রহীন লোক বহিয়াছে,—সে গাড়ীতে নাইবা উঠিলাম,—গিয়া অন্য গাড়ী উঠিব। কিন্তু আবার অন্য গাড়ীতে গিয়া যদি দেখি, আর একটা চরিত্রহীন লোক বহিয়াছেন, তাহা হইলে সে কামরায় না উঠিয়া অন্য কামরার সন্ধানে ফিরিব। সকল কামবাতেই যদি চরিত্রহীন লোক দেখি, তাহা হইলে সেদিন না হয়, নাই বা গেলাম,—ঘরে ফিরিয়া আসিব। চরিত্রহীন লোকের সম্পর্শে কিন্তু কিছুতেই যাইব না। বরং পথ হাঁটিয়া চলিয়া যাইতে প্রস্তুত, তথাপি চরিত্রহীন লোকের সহিত পুষ্পক-রথও যাইতে রাজি নই। তবে গুরুতব কথা এইটুকু

দাঁড়াইতেছে, চরিত্রহীন লোককে চিনিয়া লইব কিরূপে? যদি এমন কথা হইত যে, অদ্য হইতে লাস্কুলহীন লোকের সহিত কেহ কথা কহিতে পারিবে না, তাহা হইলে বুকিতাম, যাহার লেজ নাই, তাহার সহিত বাক্যালাপ নিষিদ্ধ এবং লাস্কুল আছে কিনা, চেনাও কঠিন নহে,—দেখিলেই বুঝা গেল। এইরূপ চরিত্রহীনের বদলে, যদি নাসিকাহীন, কর্ণহীনের কথা বলা হইত, তাহা হইলে চিনিবার কোন কষ্ট হইত না,—এ যে চরিত্রহীন,—চিনিব কেমন করিয়া?

রেলগাড়ীতে চড়িবার পূর্বে, অথবা লোক দেখিলেই, প্রত্যেক লোককেই এই কথাটা জিজ্ঞাসা করা ত সম্ভব নয় যে,—“মহাশয়! আপনি কি চরিত্রহীন?” এইরূপ প্লেটফর্মের পাঁচ শত লোককে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে; তাঁহারা যদি বলেন, “না, আমরা চরিত্রহীন নই” তবে গাড়ী উঠিতে পারিব, নচেৎ ঘরে ফিরিয়া আসিতে হইবে।

বাজার করিতে গিয়া মেছুনীকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, “অমি! ধীরকল্যে। তুমি চরিত্রহীনা কিনা? যদি হও, তবে মৎস্য লইব না—প্রকাশ করিয়া চরিত্রকথা খুলিয়া বল।” পূজাব সময় হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে, কাপড় কিনিবার পূর্বে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, “হে হরিদাস! তুমি চরিত্রহীন কিনা?” কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে, কাপড় কিনিবার পূর্বে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, “হে গুরো! সত্য করিয়া বল, তুমি চরিত্রহীন কিনা?”

কলিকাতায় বি-জাতীয়া মহিলাকুলের সঙ্গে যত বেশী কথা কহিতে হয়,—যত বেশী সংস্রব রাখিতে হয়, তত আর কাহারও সহিত হয় কিনা সন্দেহ। অতএব, বি ভর্তি করিবার পূর্বে তাহাকে জিজ্ঞাসিতে হইবে, “হে বি-কুল-ধুরন্ধরে! সুস্পষ্ট করিয়া বল, তুমি চরিত্রহীনা কিনা? তুমি মুখে ঐ কথা বল এবং দুইটি সাপ্পী দ্বারা ঐ কথার পোষক প্রমাণ দাও এবং অবশেষে ডাক্তার সিমন সাহেবের একখানি সার্টিফিকেট আমঘন কর,—তবে তোমাকে ভর্তি করিতে পারি, নচেৎ এই পর্যন্ত,—বিদায়।” সূর্যদেবকে আর দেখিব না,—শারদীয় পূর্ণশশী আর নিরীক্ষণ করিব না,—কে জানে উহার চরিত্রহীন কিনা? গঙ্গার কলকল ভৈরব-নিলাদ আর শুনিব না। আষাঢ়ের আকাশপটস্থ নবমেঘের গুরুগর্জ্জন আর শুনিব না,—কে জানে, উহা চরিত্রহীন কিনা? চাঁপা চামেলী, বেল-বকুল, রজনীগন্ধা—কামিনী কুসুমের আচ্ছাদন আর লইব না,—কে জানে উহা চরিত্রহীনা কিনা? তাল-তমাল-নারিকেল নিরীক্ষণ করিব না,—অশ্বখ-বট-কদম্বের ছায়ায় যাইব না,—কে জানে উহার চরিত্রহীন কিনা? বাড়ীর টিমা-পাখীকে আজ উড়াইয়া দিব,—কারণ সে বলিতে পারিবে না, প্রমাণ দিতে পারিবে না, সে চরিত্রহীন কিনা? গাড়ীগুলার দড়া খুলিয়া তাড়াইয়া দিব,—কারণ গাড়ী প্রমাণ দিতে অক্ষম,—চরিত্রহীন কিনা? ঠাকুর-মাকে গিয়া কবযোড়ে বলিব, “ঠাকুর-মা, যদি আমার গৃহে থাকিতে ইচ্ছা কর, তবে প্রমাণ দাও,—তুমি চরিত্রহীনা কিনা?”

আর একটু সূক্ষ্ম হিসাব করিতে হইতেছে। চরিত্রহীন কাহাকে বলে?—এটা জানা বিশেষ দরকার। পাছে কেহ ঠকায়, এই ভাবনা। কি কি উপকরণে জীব চরিত্রহীন হয়, সেটি জানা না থাকিলে, কেমন কবিয়া সংসার যাত্রা চালাইব?

(১) যাহার পায়ে জুতা নাই, গায়ে জামা নাই, কাপড় হাঁটুর উপর, রং কালো সে চরিত্রহীন কিনা?

(২) হংস, মুরগী খাইলে চরিত্রহীন হয় কি না?

(৩) পশ্চিম বৎসর পর্যন্ত কন্যাকে অনুঢ়া রাখিলে, কন্যা এবং কন্যার পিতামাতা চরিত্রহীন হন কি না?

(৪) যে স্ত্রী স্বাধীনতা পাইয়াছেন, এবং পরপুরুষের সহিত সদালাপে

অনুরক্তা, তিনি চরিত্রহীন কি না?

(৫) রেল-গাড়ীতে বসিয়া কেলনার কোম্পানীর মুসলমানগণের স্পৃষ্ট অম ভোজন করিলে চরিত্রহীন হয় কি না?

(৬) বৃদ্ধ মাতা-পিতাকে এবং স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিলে চরিত্রহীন হয় কি না?

(৭) বিবাহের পূর্বে ডাবি-পত্নীর সহগমন করিলে চরিত্রহীন হয় কি না?

(৮) পত্নী পরপুরুষের সহিত নিশীথে নিভূতে রহস্যলাপ করিতেছেন,—

পতি উকি মারিয়া দেবিয়া সরিয়া পড়িলেন এবং লেপ-মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলেন;—ইহাতে স্বামী, পত্নী এবং পরপুরুষ—এই ত্রিমূর্তির চরিত্রহীনতা দোষ বা গুণ জন্মে কি না?

(৯) পুরুষ অলস, নিষ্কর্মা, চাকরিহীন গড়োগোয়ালা,—স্ত্রী রোজগার করিয়া পতিকে খাওয়াইতেছেন,—ইহাতে পতি চরিত্রহীন কি স্ত্রী চরিত্রহীন?

(১০) গোঁফ দাড়ী পাকাইয়া বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ করিলে চরিত্রহীন হয় কি না?

উপহার! উপহার!!

আমি একখানি গ্রন্থ লিখিতেছি এবং একখানি সংবাদ-পত্র বাহির করিতেছি,—প্রত্যেকের মূল্য দুই টাকা হিসাবে চারি টাকা। কিন্তু সর্বস্বতী পূজার পূর্বে হইলে, অর্দ্ধমূল্যে পাইবেন। অধিকন্তু নিম্নলিখিত ব্যাপারগুলি উপহারস্বরূপ প্রদত্ত হইবে;—

(১) ম্যাকেবের ঘড়ি। (২) ওয়েলার ঘোড়া। (৩) ব্রহ্মদেশের শ্বেত-হস্তী। (৪) সোনার আংটি। (৫) রবারস্ট্যাম্প। (৬) চন্দ্রকোনার এক মটকী ঘি। (৭)

বৈদ্যনাথের আখ মণ দৈ। (৮) মেদিনীপুরের ঘরঘোড়া মিহি মছলন্দ মাদুর। (৯) আসামের মৃগনাভি এক ভরি। (১০) চম্পের সুধা এক বোতল; হরিণ মার্কা। (১১) জৌগ্রামের মহেশ ময়রার সন্দেশ দশ সের। ৯১২ বাঘের দুধ এক ছটাক। (১৩) সতী নারীর নাকের ডগ এক রতি এবং গ্রীষ্মকালের বটছায়া এক বিঘা ও শ্যামা স্ত্রী Q.S.। ইহা ব্যতীত যিনি দশজন গ্রাহক একত্র করিয়া দিতে পারিবেন, তাহাকে আমার একটানে ছয়-সের-দেওয়া কপিলা গাভীটি দিব। টাকা যদি কেহ বেশী দিতে পারেন, তাহা হইলে আমার অর্দ্ধাঙ্গখানিকে দিতেও প্রস্তুত আছি।

উপরোক্ত ঘোষণাটি করিয়াছিলেন পঞ্চানন্দ মহাশয়, তাঁহার পত্রিকার (প্রকাশিতব্য) প্রচার প্রসার ও শ্রীবৃদ্ধি কল্পে। ইহা আবিষ্কার করিয়া আমরা বিলক্ষণ উৎসাহিত বোধ করিতেছি। আমরাও অনুরূপ উপহার ঘোষণা কবিবার জন্য নিতান্তই ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছি। তৎপূর্বে পত্রপাঠ-এর অনুরাগী পাঠক-পাঠিকাদের নিকট হইতে নিম্নবর্ণিত দ্রব্যাদি পাইবার প্রতিশ্রুতি প্রত্যাশা করি। আমাদের প্রবল বিশ্বাস—দাতার সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইবে যে, সকলকে সুযোগ দিতে পারিব না। এজন্য, যাহাদিগের দান গ্রহণ করিতে অপারগ হইব, তাহাদিগের নিকট পূর্ব হইতেই ক্ষমাভিক্ষা করিয়া লওয়া হইতেছে। বিশেষত ১৫ সংখ্যক আইটেম।

১। পত্রপাঠ-এর ঘড়ি-দোকানী	পাঠকের নিকট হইতে	—	ম্যাকেবের ঘড়ি
২। পত্রপাঠ-এর ঘোড়া ব্যবসায়ী	" " "	—	ওয়েলার ঘোড়া
৩। " ব্রহ্মদেশস্থ	" " "	—	শ্বেত হস্তী
৪। " স্যাকরা	" " "	—	সোনার আংটি
৫। " রবারস্ট্যাম্প ব্যবসায়ী	" " "	—	রবার স্ট্যাম্প (জাল)
৬। " চন্দ্রকোণার	" " "	—	মটকী ভরা ঘি
৭। " দেওঘরের	" " "	—	বৈদ্যনাথের দৈ
৮। " মেদিনীপুরের	" " "	—	মিহি মছলন্দ মাদুর
৯। " অসমীয়া	" " "	—	মৃগনাভি
১০। " চন্দ্রলোকবাসী	" " "	—	হরিণ মার্কা চম্পসুধা
১১। " জৌগ্রাম নিবাসী	" " "	—	মহেশ ময়রার সন্দেশ
১২। " সুন্দরবনের কিংবা চিড়িয়াখানাবাসী	" " "	—	বাঘের দুধ
১৩। " সতী	পাঠিকার " "	—	নাকের ডগ
১৪। " গ্রামস্থ জমিদার	পাঠকের " "	—	বটছায়া ও শ্যামা স্ত্রী, অডাবে উপপত্নী
১৫। " স্বর্গলোকস্থ	" " "	—	কপিলা গাভী
১৬। " পত্নীভীত	" " "	—	অর্দ্ধাঙ্গিনী

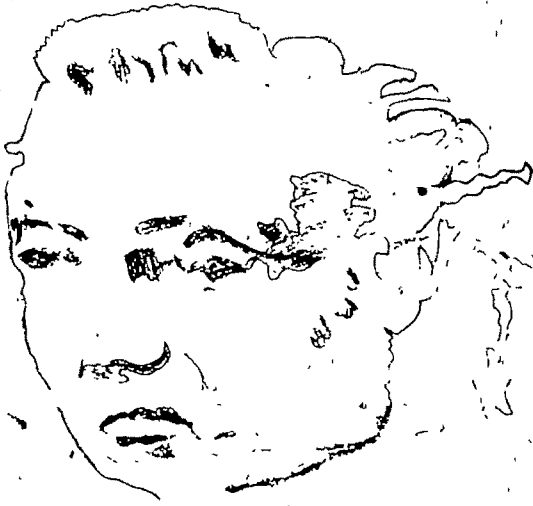
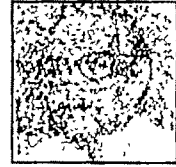
বি. দ্র.—শেষোক্ত দ্রব্যটি বেশী পাঠাইবেন না। আমরা নিজেরাই আপন আপন দ্রব্য গ্রহণেচ্ছু সহৃদয় ব্যক্তি অনুসন্ধান করিতেছি বহুকাল যাবত। এ পর্যন্ত তেমন বীরপুরুষের সন্ধান পাই নাই। সাহস থাকিলে সাধ্য করিবেন।

কৃত্তিকার আদর্শ মনোভাব কল্পনা সত্যের সন্ধানে
কল্যাণ জগৎ হেঁটে সত্যের সন্ধানে

বৃহস্পতির দিনগুলি

রসময় শিবরাম

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত



তখন জার্নালিজম পড়ছি। প্রতি বৃহস্পতিবার একটা করে ক্লাশ। সেই ক্লাশও প্রায়ই হয় না। মিঃ এন্সাইক্লোপিডিয়া অর্থাৎ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের ক্লাশ। প্রায়ই আসেন না, এলেও নানান গল্প করেন অতীতের, যার সঙ্গে কোর্সের কোনো সম্পর্ক নেই। রোল কল প্রায় কেউই করেন না, 'যুগান্তরের' দক্ষিণারঞ্জন বসু ছাড়া। প্রতি বৃহস্পতিবার ইউনিভার্সিটির গেটে আমাকে পাওয়া যাবেই। কেননা বেলা সাড়ে চারটা বা পাঁচটা নাগাদ কিংবদন্তী শিশু-সাহিত্যিক শিবরাম চক্রবর্তী ওখান দিয়ে তাঁর সিল্কের শার্ট বা পাঞ্জাবি, সেনগুপ্ত কোম্পানির ফিউফিউ মুক্তি ও কোলাপুবি চপ্পল পরে হেঁটে যাবেনই। এবং তাঁকে দূর থেকে দেখলেই আমি এগিয়ে যাব। তিনিও যথারীতি আমার কাঁধে হাত রেখে আনন্দরাজ্য পত্রিকা অফিস অবধি হেঁটে যাবেন এবং ওপরে উঠে প্রথমেই অ্যাকাউন্ট ডিপার্টমেন্টে তাঁব পেমেন্ট ক্যাশে নিয়ে ছাদের ক্যান্টিনে লুচি-

মাংস বা লুচিও ডিমের ডালনা আমাকে খাওয়াবেন এবং পরে নিজে খাবেন, সেই সঙ্গে শেষে দুটো ট্যাবলেটও খাবেন এবং বলবেন—চলো সমরেন্দ্র, এবার বই-পাড়ায় যাই। আমরা দু'জনে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ফিরে আসব। তাবপর উনি কোনো প্রকাশকের আড্ডায় আব আমি কফি হাউসে।

শিবরাম চক্রবর্তীর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ প্রেমেন্দ্র মিত্রের বাড়িতে। গভীর বন্ধুত্ব ছিল ওঁদের দু'জনের। আমি প্রায় প্রতি রবিবারই যেতাম। প্রেমেন্দ্রদার সঙ্গেই প্রশ্ন ছিল আমার প্রতি। চুপচাপ বসে আড্ডা দিতে আসা বড় বড় লেখক-শিল্পীদের কথা শুনতাম। এমনি এক রবিবারে একটু দেরি করে গেছি। দেখি প্রেমেন্দ্র ও শিবরামদা গভীর আলোচনায় ব্যস্ত। শিবরাম চক্রবর্তী মালদার চাচলের বাজবাড়ির সন্তান। উনি রাজার প্রথম পক্ষের বড় সন্তান শুনেছি।

তাঁদের সেদিনকার কথোপকথন ছিল অনেকটাই নিম্নরূপ—

শিবরাম : আচ্ছা প্রেমেন, আমি যদি মামলা করি তবে সম্পত্তির অংশীদার হিসাবে অন্তত একলাখ টাকা (সেই ৫৬-৫৭ সালে) নিশ্চয় পাব, কি বলো?

প্রেমেন্দ্র : তা হয়ত পেলোও পেতে পারো। কিন্তু অত টাকা দিয়ে তুমি করবে কি? তাছাড়া তুমি সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে কলকাতায় চলে এলে, অবর্ণনীয় কষ্ট স্বীকার করে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করে লেখক হলে। তুমি টাকা দিয়ে করবে কি?

শিবরাম : কেন, তুমি আমি দু'জনে সাবা পৃথিবী ঘুরে বেড়াব। তুমি 'ঘনাদা' লেখাব আরো বহু উপাদান পাবে।

এ দেশে তো "Wide World" ছাড়া আর তেমন ম্যাগাজিন আসে না, যা তোমাকে ঘনাদা লেখার উপাদান যোগাতে পারবে বছরের পর বছর।

শিবরাম চক্রবর্তীর সঙ্গে পরে এতটাই অন্তরঙ্গতা হয়ে গিয়েছিল যে বৃহস্পতিবার আমাকে না পেলো কফি হাউসের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এসে আমার খোঁজ করতেন। জানতেন, অন্তত বৃহস্পতিবার আমরা কফি হাউস ছেড়ে আব কোথাও যাই না। আমার এই উপাস্ত সন্তবে দেশে বিদেশে বহু মানুষের সঙ্গে দেখা হয়েছে কিন্তু শিবরামদার মতো এমন নির্লোভ, বিষয়-উদাসীন মহৎ মানুষ আর মাত্র দু-একটি দেখেছি। আমি বয়সের ব্যবধানের

জন্য শিববাম এর পরে কি বসাব যখন ভাবছি, উনি বললেন, তুমি শিবরামদা-ই বলা। শিববামের পরে “দা” বসালে সম্পর্কটা একটু ধাবালো হবে।

শিববামদার মতো সদা-প্রস্তুত রসিকতা বা পান্ আমি আব কখনো কাবো মুখে শুনিনি, শুনব বলেও আশা কবি না।

একবার কোনো এক বৃহস্পতিবার তাঁকে দেখা গেল তিনি অন্য দিনের তুলনায় বেশ মন্থর গতিতে হাঁটছেন। একটু যেন দুলে-দুলেও। কাছে আসতে দেখি তাঁর পায়ে চিবাচরিত কোলাপুরির বদলে বাটার স্পঞ্জ দেওয়া অতি সুখপ্রদ, তখনকাব মূল্যে মহার্ঘ চটি। বললাম, বাঃ, আপনার পা-সুটিকে তো বেশ মানিয়েছে।

তিনি বললেন, কেন, বিয়ে কবিনি বলে কি শঙ্খ-আহ্বাদ থাকতে নেই?

বললাম, নিশ্চয় নিশ্চয়। আপনার শৌখিনতা সিক্কের শাট-খুতি থেকে পায়েও পৌছেছে, এ তো খুবই আনন্দের কথা। তবে আপনার হাঁটার ছন্দটা একটু অমিল পয়সারের মতো লাগছে। যাক, অভ্যেস হয়ে যাবে।

শিবরাম দেয়ালে বিভিন্ন চেনাশোনা
মানুষের ঠিকানা লিখে রাখতেন। আমার
ঠিকানা, ফোন-নম্বরও ছিল। বললেন,
ঠিকানা রেখে আর কি হবে, মানুষের
চুন-চেরা’ বিচার করেও লাভ হল না

সেদিন, বলা বাহুল্য, আনন্দবাজারে পৌছতে একটু দেরি হয়ে গেল। তবে সেদিন মাৎস লুটি পরিশেষে একটা মিস্তিও পেলাম। ছাদেব ক্যান্টিনে অনুদান-নির্ভব খাওয়াটা ডবল হয়ে গেল।

শিবরাম যেদিন লেখাব সম্মানমূল্য নিতে যেতেন সেদিন, বিশেষত বৃহস্পতিবার, অন্য কারো ঘবে খুব প্রয়োজন না হলে যেতেন না!

ক’দিন পরে দেখি শিবরামদার পায়ে আবার সেই কোলাপুরি চটি ফিবে এসেছে। শিবরামদা বললেন, না হে, পায়েব তো এত আরামেব অভ্যেস নেই, বাটার চটিজোড়া ভায়েকে দিয়ে ছিলাম। তবে ও তো জানোযাব, ও কি এই দামি চটির মর্যাদা বুঝবে?

আমি সবিস্ময়ে বললাম,—ভায়েকে (সত্তরত কোনো পাতানো ভায়ে!) জানোযাব বলছেন!

শিবরামদা একগাল হেসে বললেন,—বলব না। ‘বোন’ থেকেই তো আসে।

আরেকবার বাণীপুরে সাহিত্যমেলায় (তাবাপদ বায়ের প্রযোজনায—তিনি তখন ওই অঞ্চলেই থাকতেন) যাচ্ছি। গাড়িতে আমি, শিববাম, হুবপ্রসাদ মিত্র। মুক্তবাম বাড়ি থেকে বেবিযে ঠনঠনে কালীবাড়িৰ পাশ দিয়ে যাবাব সময় অতি ভক্তিবাবে শিববাম তিনবার কবজোড়ে কালীৰ উদ্দেশ্যে প্রণাম পাঠালেন। কবি হুবপ্রসাদ মিত্র বললেন, শিবরামবাবু, আপনি না “মঞ্চে বনাম পণ্ডিচেবি” লিখেছিলেন? আপনি এত কালীভক্ত হলেন কবে থেকে?

শিববামেব উত্তব—হুবপ্রসাদবাবু, আপনিও নমস্কার কবন, সমবেদ্রে তুমিও কবো। তবপর বললেন, কালী বড জাগ্রত দেবী। “কাগিৰ” জোবেই তো আমাদের কলম চলে।

মাঝে মাঝে ভাবভাস, শিবরামদা কি আগে থাকতেই এইসব রসিকতা ভেবে বাখেন? না তা স্বতস্ফূর্ত? আবাব কখনো মনে হত কোনো কোনো বসিকতা হয়ত আগে থেকেই ভাবা। তবে কোনো-কোনোটা তাত্ক্ষণিক।

গুরুতে যে মহাপ্রাণ মানুষটির প্রসঙ্গে ‘মহৎ’ বিশেষণটি ব্যবহার কবেছি, তাব একটু উদাহরণ দিই। ভালো লেখা পড়লে, বিশেষত তবণদের, প্রেমেন্দ্র মিত্র যেমন উৎসাহিত হয়ে প্রশংসা কবতেন, লেখকের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন, শিববাম চক্রবর্তী প্রশংসাব ব্যাপারে ছিলেন আবো বেশি দবাজ।

একদিন কলেজ স্ট্রিটের ভায়েব দোকানে গিয়ে ওনি শিবরামদা অন্য একজনকে বলছেন—আমি ভাই এখন “নীল” হয়ে আছি। আহাঃ আহাঃ কি লিখছে ছেলেটা। ছেলেটা এখনই আমার চেয়ে ভালো লিখছে, পরে তো আরো ভালো লিখবেই।

আমাকে দেখে বললেন, সমবেদ্রে তুমি দৈনিক আনন্দমেলায় ‘ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায়ের “এবংপুরেব টিকটিকি” পড়ছ?

বললাম, পড়েছি।

সত্যিই অসামান্য লেখা ইন্দ্রনীলের “এবংপুরেব টিকটিকি”। ইন্দ্রনীল কবিতাও খুব ভালো লিখত। সম্প্রতি পবলোকগত। জীবনের প্রণয় পাশায় হেবে গিয়ে এই প্রতিভাবান মানুষটি শেষদিকে কিষ্কিৎ অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়েছিলেন।

শিববাম অনেক বসিকতা এখন বাজানে চালু হয়ে গেছে। অনেকেই সে সব নিজের বলে চালান, আমিও যে চালাই না তা নয়। তবে পরিস্থিতি বুঝে। শেষ দেখা হয়েছিল মৃত্যুর ছ-মাস আগে। তখন চাকরিসূত্রে আমি সাবা দেশ ঘুরে বেড়াই। মাঝে মাঝে, সময় পেলে তাঁর কাছে যাই। শেষবার গিয়ে দেখি তক্তাপোষে শুয়ে আছেন। কথা বলাব সঙ্গে সঙ্গে একটু হাঁপাচ্ছেনও। বাইবে সিঁড়ির একপাশে ঘরের দেয়ালেব চুন গুলে বাখা হয়েছে। বললেন, ভাবছি আমাব দেয়ালটাও চুনকাম কবাব।

যাবা শিববামেব মেসে গিয়েছেন তাঁবা জানেন শিবরাম দেয়ালে বিভিন্ন চেনাশোনা মানুষের ঠিকানা লিখে রাখতেন। আমার ঠিকানা, ফোন-নম্বরও ছিল। বললেন, ঠিকানা বেখে আব কি হবে, মানুষেব চুন-চেরা’ বিচার করেও লাভ হল না, (স্মরণীয়—ঈশ্বর পৃথিবী ভালবাসা” নামের বিখ্যাত আত্মজীবনী)। তবে সমবেদ্রে আমার অনুবোধ, তোমার লেখক-বন্ধুদের বলা তাবা যেন বাচ্চাদের কথা না ভোলে। তাদের নিয়ে লিখে।

শিল্পী গুরুপ্রসাদের গুরুতর উপলব্ধি



● শিল্পীৰ মেমারিকে এন্সাইক্লোপিডিয়া না বানালে আর উপায় নেই। চিকিৎসা নিম্নকপ :

ওষুধেব নাম—মগজ ধোলাই

চিকিৎসক—পত্রপাঠ সম্পাদক

● দৃষ্টি ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বাডাতে হলে নিজের প্রাণেব ওপর মমতা না বাখাই ভালো। সে দাৰ সম্পাদকের ওপরে ছেড়ে দিয়ে “ফাওন হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে Gone!”

● আঁকার মান উন্নত কবতে হলে সম্পাদকের মুহূৰ্থ ধমক থেরাপিই একমাত্র এবং অব্যর্থ দাওয়াই।

একপৃষ্ঠে



চোরের মা, অথবা চোরের দিদি, চোরের বাবা কোথায়?

সমরেশ মজুমদার

আমার বাড়ির সামনে একটি বস্তি আছে যেখানে দিনে অন্তত তিনবার বেশ ঝগড়াঝাঁটি হয়। লক্ষ্য করেছি, ঝগড়া শুরু হয় পুরুষদের মধ্যে কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই সেটা মহিলাদের অধিকারে চলে যায়। ধরা যাক ভর দুপুরে বাংলা পান করে এই বস্তির এক বেকার যুবক তার জিগরি বন্ধুকে চার অক্ষরের গালাগাল দিল। সে যদি বাংলায় বুঁদ না হয়ে গালাগাল দিত তাহলে বন্ধুটির শব্দটাকে গালাগাল বলে মনে হত না। হেসে দুই অক্ষরের পান্টা জবাব দিত। কিন্তু তাকে ফাঁকি দিয়ে বন্ধু বাংলা খেয়ে

বলছিল, যাও বাড়ি যাও।

এই সময় রণাঙ্গনে উপস্থিত হলেন একটি শীর্ণ চেহারার প্রৌঢ়া। সবার গলা চাপা পড়ে গেল তাঁর গলার তলায়। তাঁর ছেলে মাল খেয়েছে নিজের পয়সায়, কারো পাকা ধানে মই দেয়নি। যে তাকে মারতে চাইছে তার কুষ্ঠ হবে, তার বউ বিধবা হবে।

বউটি তেড়ে গেল প্রৌঢ়ার দিকে,—‘তোর ছেলে লম্পট, চরিত্রহীন।

প্রৌঢ়া চিৎকার করলেন,—‘মুখ ভেঙ্গে দেব শরীতানী। তোরা শরীরে তো কয়েকটা হাড় ছাড়া কিছু নেই। আমার ছেলে দূরের কথা, তোরা নিজের স্বামী কাছে যায় না হাড় কুটে যাওয়ার ভয়ে।’

ক্রমশ দেখতে পেলাম, যুদ্ধক্ষেত্র প্রৌঢ়ার দখলে চলে গেল। শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর শাবককে টানতে টানতে ভিতরে নিয়ে গেলেন। বুঝলাম, চোরের মায়ের বড় গলা কাকে বলে।

বিজ্ঞাপনের যুগের বড় হাতিয়ার ইলেকট্রনিক মাধ্যম। যা সত্যি নম্র তাকে সত্যি প্রমাণ করেও বিভ্রম তৈরি করে জনসাধারণকে টুপি পরানোর যে কায়দা এখন সর্বজন স্বীকৃত তাকে চোরের মায়ের সঙ্গে তুলনা করা যায়। মাঝে মাঝে মনে হয়, জ্যোতি বসু মানুষ হিসেবে আদৌ ধূর্ত ছিলেন না। যা ভালো মনে করতেন তা ফস্ করে বলে ফেলতেন। বানতলায় নারী নিগ্রহ হল, একজন মারাও গেলেন। সাংবাদিকরা ওঁর প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে গভীর মুখে বললেন, এরকম তো হয়ই। যেন ঠাস্ করে চড় কষালেন। হাতি চলে গেল, রাস্তাব কুকুররা চিৎকার চ্যাচামেচি করল। মন্তব্য শুনে তাতে হাতির কিছু এসে গেল না। নিজেকে ভালোমানুষ উনি নিজেই ভাবেন, অন্যের কাছে তা বিজ্ঞাপিত করার কোনো দায় তাঁর ছিল না। বিভ্রম তৈরি করেননি বলে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশিদিন রাজত্ব কবেও তিনি জনসাধারণের সন্ত্রম পেয়েছেন, ভালোবাসা পাননি।

কুচবিহারে সি পি এমের কর্মী-মহিলাকে ধর্ষণ করল তারই দলের লোক। হেঁ হেঁ শুরু হল। অনিল বিশ্বাস রোবটের মতো মুখ করে বললেন, ওই মহিলার চরিত্র ভালো ছিল না। সি পি এম বলল, মহিলাকে ধর্ষণ করাই হয়নি।

দিদি রেলমন্ত্রক চেয়ে না পেয়ে গৌঁসা করেছিলেন। নীতিশ কুমারের ছায়া দেখলেই চিৎকার করতেন। একটি শিশুও লজ্জেলের জন্যে এমন বায়না করে না।

এসেছে—এই রাগে সে গালাগালটাকে গালাগাল ধরে নিল এবং ঝাঁপিয়ে পড়ল। দেখতে দেখতে ভিড় জমে গেল। মনে হচ্ছিল এখনই একটা লাশ পড়ে যাবে; কিন্তু সেটা কখনো পড়ে না। হঠাৎ পিলপিল করে বস্তি থেকে মহিলারা বেরিয়ে এলেন। রোগা অপুষ্টির ছায়ায় শরীরগুলো থেকে যা বের হতে লাগল তাকে চিৎকার বললে কিছুই বলা হয় না। বুঝতে পারলাম, ওদের দলের যে তরুণীটি গলার শিরা ফুলিয়ে চিৎকার করছে সে সমর্থন করছে গালাগাল হজম না করা আক্রমণকারী যুবককে। মাঝে মাঝে ছুটে গিয়ে সে যুবকের হাত ধরে সরিয়ে আনার চেষ্টা করছিল। যুবক বীর ভঙ্গীতে তাকে



রাতারাতি এই প্রচার বাড়ানো হল। যেন সোনাগাছির মহিলাদের ময়দানে নিয়ে গিয়ে যদি ধর্ষণ করা হয় তাহলে সেটা কোনো অন্যায় নয়। কুচবিহারের চোরের মা আলিমুদ্দিনে বসে বড় গলায় যা বলল, তাইই মেনে নিতে হবে।

কিন্তু ডাক্তারি রিপোর্টে যখন বলল, মহিলাকে ধর্ষণ করা হয়েছে তখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রাইটার্সে বসে ব্যাপারটা স্বীকার করে নিয়ে বললেন, কোনো মহিলার চরিত্র ভালো কি মন্দ তার ওপর ধর্মপের অপরাধ কমে যায় না। মহিলাকে ওই কার্যটি করার ব্যাপারে দলীয় কর্মীরা জড়িত থাকলে তাদের রেহাই দেওয়া হবে না। এইটাই বিব্রম দৃষ্টিব আধুনিক কায়দা। দলের সম্পাদক যদি জ্যোতি বসুর মতো বলার যোগ্যতা অর্জন করতো তাহলে বলত, 'এমনটা হয়েছে থাকে।' সেই ব্যক্তিত্ব তাঁর নেই বলে মিথ্যা কথা বলে সেটাকেই সত্যি প্রমাণ করতে চাইলেন। তাঁর সাক্ষরদরা সেই গলায় গলা মেলাল। কিন্তু এই প্রচার জনতা মানছে না বুঝতে পেরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ভালোমানুষেব ইমেজটা আরো বড় করার প্রচারে নামলেন। জনতা বলল, দেখেছ, সি পি এম করেও ভয়লোক হওয়া যায়।

এখন প্রশ্ন উঠবে, চোরের মা কে? চোর তো কুচবিহারের সেই বীরপুরুষ, যে আনন্দিত হয়েছে। পার্টির সদস্য হওয়ায় তার মা অবশ্যই পার্টির সেক্রেটারি। তিনি বড় গলায় যা বলেছেন তা যখন কার্যকর হল না তখন ঠাকুরার প্রয়োজন হল। ঠাকুরাব গলা খাদে থাকলেও বাজী মাং করার পক্ষে যথেষ্ট।

আচ্ছা, চোরের মায়ের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু চোরের বাবার কথা তেমন ভাবে কেউ বলেননি কেন?

আমাদের বাড়ির সামনে বসিতে যেসব বাবা থাকেন তাঁরা ওইবকম চিৎকারের সময় একটি বাক্যও বলেন না। উন্মোচকের ফুটপাথে বসে নির্বিকার মুখে তাস খেলে যান। যা করার মায়েরাই করে। আলিমুদ্দিন বা রাইটার্স যদি মা-ঠাকুরা হয় তাহলে বাবা-ঠাকুরা অবশ্যই জনসাধারণ, যাদের কোনো ভূমিকা নেই, গলাও নেই।

তবে এখন মায়ের যুগ শেষ হয়ে আসছে। বাঙালির দু'জন মা ছিল। একজন গর্ভধারিণী, অন্যজন স্ত্রীমা। যখন ছিল তখন এঁদের গলা ছিল না। কিন্তু এখন বাঙালি একজনই দিদি পেয়েছে। দিদি ডাকলে ট্রেনের রিজার্ভেশন তখনই করে, কলকাতার রাস্তায় অরাজকতা তৈরি করে ভাইরা ময়দানে জমায়েত হন। আমরা দিদিকে টেলিভিশনে দেখি। তিনি যে স্টাইলে শাড়ি

পরেন তা আজকের মহিলারা পরেন না। আঁচল ঘুরিয়ে আনেন বুকের ওপর, যা দেখে আমাদের ছেলেবেলায় দেখা বিধবা পিসির কথা মনে পড়ে যায়। ছবি তোলা শুরু হলেই মুখ গভীর হয়ে যায় তাঁর, খ্যাক খ্যাক করে বাক্য বরা। দু'চারটে বাংলায় পর ইংরেজিতে চলে যান। সেই ইংরেজি শুনে বার্নাড পিগমিলিয়ন লিখতেন না, 'মাই ফেয়াব লেডি' ছবি হত না। যেহেতু বার্নাড আগে জন্মেছিলেন এবং ছবিটি দিদির অভ্যুত্থানের আগে তৈরি হয়েছিল তাই আমরা বিস্মিত হইনি।

দিদি রেলমস্তক চেয়ে না পেয়ে গৌসা করেছিলেন। নীতিশ কুমারের ছায়া দেখলেই চিৎকার করতেন। একটি শিশুও লজ্জেরেব জন্যে এমন বায়না করে না। সেই নীতিশ কুমার যখন রেলের সদর দপ্তর কলকাতা থেকে সরিয়ে

যেন সোনাগাছির মহিলাদের ময়দানে নিয়ে গিয়ে যদি ধর্ষণ করা হয় তাহলে সেটা কোনো অন্যায় নয়। কুচবিহারের চোরের মা আলিমুদ্দিনে বসে বড় গলায় যা বলল, তাইই মেনে নিতে হবে।

নেবেন বলে ঘোষণা করলেন তখন দিদিকে রোখা মুকিল হয়ে গিয়েছিল। প্রকাশ্য সভায় তিনি আকাশ কাঁপানো চিৎকার করে হাততালি কুড়িয়েছিলেন এই বলে,—"আমার বাংলাকে দু'ভাগ করতে দেব না।"

দুর্জনেরা প্রশ্ন তুলল, আমার বাংলা মানে কি? বাংলা কি গুনার পৈতৃক সম্পত্তি? দ্বিতীয়ত, বাংলা বলে কোনো রাজ্য তো এখন নেই। পশ্চিমবঙ্গকে বাংলা বলা কোনোমতেই যায় না। বাংলাদেশ তো ওঁর আওতার বাইরে। তাহলে বাংলা বলতে উনি নিশ্চয়ই পশ্চিমবঙ্গকে বুঝিয়েছেন। লর্ড কার্জন যখন বাংলা ভাগ করতে চেয়েছিলেন তখন ছিল গোটা বাংলা। তার প্রতিবাদে বাঙালি সোঁতার হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ রাশী বন্ধনের ডাক দিয়েছিলেন। দিদির বাসনা হল রবীন্দ্রনাথ হওয়া। ইতিমধ্যে কি সব লেখালেখিও সেরে ফেলেছেন, বইও বেরিয়েছে। তারপর কি হল? রেল দপ্তর চলে গেল বাইরে। বিজেপি মন্ত্রীসভা ওই সিদ্ধান্ত থেকে সরলেন না। দিদি চিৎকার হজম করে ফেললেন এবং এখন পঞ্চায়েত থেকে লোকসভা নির্বাচন পর্যন্ত সেই বিজেপির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে ফেললেন।

চোরের মা বড় গলায় যখন চ্যাপান তখন তিনি ভালো করেই জানেন কখন সেই গলায় মিন্ মিন্ করতে হয়।

স্বৈচ্ছাচারী ছাড়া যে-কোনো স্বৈচ্ছাকর্মী গুণগাঠের
সাঙ্গে যুক্ত হতে পারেন।

প্রকৃত মুখোশধারী ছাড়া ব্যক্তি সকলের ক্ষেত্রেই
মুখ দর্শাতোর জন্য গুণগাঠ-প্রবৃত্তি আবশ্যিক, তবে
অবশ্যিক নয়।

চরণ বৈরাগীর

হৃদয় মিক্‌ড

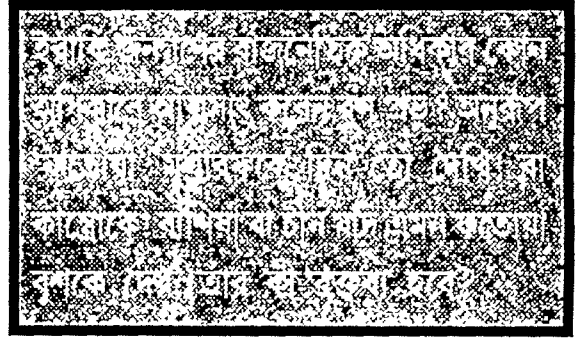
বাগদাদে সাঁইবাডি

খানতলার অসভ্য বর্বর ঘটনার পর মেগা সিরিয়ালের পর্বানুক্রমে পরপর এল ঘোঁকসাডাঙ্গা, কুশমণ্ডি, বাসন্তী। আরো অনেক নাম, বিনা ভ্রমে আশা করা যায়, সিরিয়ালি আসবে। কেন না গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির রাজ্য সম্পাদিকা—ইনি সেই তিনিই, যিনি বিরাটের ধর্মিতা সম্পর্কে সদন্ত সর্গর্ভ সুভাষণ দিয়েছিলেন—ও মেয়ের স্বভাব খারাপ (তিনি কে, কারো স্বভাব ভালো না খারাপ বিধান দেবার? খারাপ হলেও কি ধর্মগাধিকার জন্মায়?)—ঘোষণা করেছেন,—এসব কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বিশ্বায়নের প্রভাবে দেশ তথা বিশ্ব জুড়ে যে আর্থ-সামাজিক অধঃপতন হচ্ছে, তার পরিপ্রেক্ষিতেই এইসব ঘটনা বিচার করে দেখতে হবে। তা, মহাশয়া, রশিদ খানের খাতায় নাম লিখিয়ে যখন টাকা খিঁচিয়েছিলেন এবং রশিদকে দীন হত্যভাগ্য মেয়েদের ‘মাল’ হিসেবে সাপ্লাই করেছিলেন, তখন তো বিশ্বায়নের বিদূষক হিড়িক ছিল না। আর, বিশ্বায়নের কুফলেই যদি নিরীহ নারীদের নিগৃহীত হতে হবে পশ্চিমবাঙলায়; তবে, আপনাদের সুউচ্চকিত “মরুদ্যানে”র ব্যুৎপত্তি কি? বিশ্বায়নের বাজারে শূন্য ঝোলা হাতে জ্যোতি-সোমনাথ-বুদ্ধদেবের নিরবধি মাধুকরীর কণ্ঠকতার ফুলঝুরি কেন? ধারাবাহিক ধরণ অন্য রাজ্যে ঘটছে না কেন? সেসব রাজ্যে বুঝি বিশ্বায়নের দূষিত হাওয়ার জন্য বিশেষ ‘নিরোধে’র ব্যবস্থা হয়েছে?

ধর্মক সমিকন্দিম মিঞার বহু কুরীতির জন্যই মন্ত্রীমশাই ডাকুয়া নামের অর্থগত সম্মান রাখতে অতি তৎপরতার সঙ্গে এই নবীন ডাকুকে আইনি সহায়তা আশ্বাস দিয়েছেন; রাজ্যদেও গোয়ালা যেমন মিছিল নিয়ে থানায় ছুটেছিলেন দমদমি দুলালের জন্য।

কার মায়েব যেন বড় গলা—?

তখনই মনে হয়—এ রাজ্যের আগমার্কা বিপ্লব-পূজবরা মার্কস-লেনিনকে দমদম-ঘোঁকসাডাঙ্গা-কবর দিয়ে মহোন্মাদে বৃশের মানস-সাসত্রে ব্রতী এখন। বহু বছর আগে কোথায় যেন পড়েছিলাম, হিটলার যদি বদ্ধ উন্মাদ, তবে স্টালিন সেয়ানা পাগল। সম্প্রতি জানা গেল, হিটলারের সিফিলিস ছিল। সেটাই দু-জনের মধ্যে প্রভেদেব কারণ কিনা বলা হয়নি। কিন্তু জর্জ বৃশের মধ্যে কোন বীজাণুর সংক্রমণ? ইরাকের সাদ্দামকে সবক শেখাতে তিনি বদ্ধপকিব। সাদ্দামের অপরাধ? ওঁর নাকি সভ্যতা-বিশাশী অস্ত্রসত্তার আছে। যদিও রাষ্ট্রপুঞ্জের অস্ত্রপরীক্ষকগণ দফায় দফায় ইরাকের গোপন অস্ত্রভাণ্ডারে তল্লাশি চালিয়ে যে রিপোর্ট দিয়েছেন তার সঙ্গে বৃশেব দিব্যজ্ঞানেব কোনো মিলই নেই। সাদ্দামও বলছেন, তাঁর কাছে গণবিশ্বংসী মারণাস্ত্র নেই।



রাষ্ট্রপুঞ্জের পরীক্ষকরা ইরাকের সর্ববকম সহযোগিতাব উল্লেখ করে জানিয়েছেন যে লুকানো কোনো বিশ্বংসী অস্ত্রভাণ্ডারের সন্ধান ইরাকে মেলেনি। বৃশ অবশ্যই অনড়। বিশ্বের স্বনিয়োজিত সর্বময় কর্তা বলে কথা। তাঁর দাবী—ইরাকের কাছে যথেষ্ট রাসায়নিক ও জীবাণু অস্ত্র বিদ্যমান।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকেই তো অস্ত্রসত্তারের, সববকম অস্ত্রের,

অধীশ্বর ও জোগানদার আমেরিকা। কোরিয়া, ভিয়েতনামের করুণ, নিষ্ঠুর ও উদ্দীপ্ত কাহিনী কি বিশ্ব-ইতিহাস থেকে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে? নাপাম বোমায় সবুজ শস্যপ্রান্তর জ্বালিয়ে সহস্র গ্রামীণ নিরীহ মানুষকে পুড়িয়ে মেরেছে, বিকলাঙ্গ করেছে যারা, তাদের মুখে এই ধাপ্পা-কথা যে বাহান্তরের ছাপা-ভোটকেও লজ্জায় ফেলেছে। অবশ্য 'লজ্জা' শব্দটির সঙ্গে বৃশ বা আমেরিকার বিশেষ পরিচয় নেই। থাকলে এমন নির্লজ্জ দান্তিক হৃদয় দিয়েও বিশ্বমানব কল্যাণ গরিমার জয়টীকা ধারণের ঘৃণ্য অহমিকার বিবস্ত্র বিজ্ঞাপন সম্ভব হত না নিশ্চয়।

একদা সম্রাট ব্রিটিশ সিংহের 'চুহা' সেজে বৃশের জো-হজুর তাঁবেদারি দেখে সম্ভবত বার্নার্ড শ, রাসেল, ওয়েলস-রা কর্বরের মধ্যেও শিউরে উঠছেন। বিশ্বজুড়ে যুদ্ধবিরোধী প্রতিবাদকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে পদলেহী শাসক-রাষ্ট্রদের নিয়ে বৃশ-বাবা সাদ্দামকে আদম দেখিয়ে ছাড়বেনই। দু-লক্ষরও বেশি মার্কিন সৈন্য ইরাকের তৈলভূমি তছনছ করার জন্য হুকুমের অপেক্ষায়। আমেরিকা দুনিয়ার এক নম্বর সমরশক্তি হয়েও বৃশি নয়। তার লক্ষ্য—সারা

ধারাবাহিক ধ্বংস অন্য রাজ্যে ঘটছে
না কেন? সেসব রাজ্যে বৃশি
বিশ্বায়নের দূষিত হাওয়ার জন্য
বিশেষ 'নিরোধে'র ব্যবস্থা হয়েছে?

দুনিয়ার নিঃশর্ত বশ্যতা স্বীকার। জাপান-জার্মান আরব জগৎ—কারুকেই কশেষ্কবান রাখা চলবে না। সব অস্ত্রের অধিকারী হবে ইউ. এস। পৃথিবীর তাবৎ তেলের, মানে মূল গতিশক্তি ও অর্থশক্তির একক ইজারা থাকবে বৃশ বাবাজির। যারাই বিরোধিতা করবে তাদের গুঁড়িয়ে দিতে হবে। বিশ্ববাজারে চলবে শুধু জিন্স কোক পেপসি পপের হুমোড়। এই-ই হবে বিশ্বসংস্কৃতির রূপরেখা। হলিউড টঙ্কার।

রাষ্ট্রসংজ্ঞা ইতিমধ্যেই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে। প্রয়োজনে ভেঙে দিয়ে নতুন কোনো তাঁবেদার সজ্ঞ তৈরি করাও যেতে পারে। ইরাকের জনগণের মুক্তির জন্য মুক্ত-দুনিয়ার নবীন মোজেস বৃশের এই ঐতিহাসিক অভিযান। ঠিক যেমন ছিল ভিয়েতনামের মানুষের জন্য। ভেনেজুয়েলার মানুষের জন্য। আফগান জনতার জন্য। এমন মহানুভব—মানবমুক্তির ধ্রুব তারকার জয়ধ্বনিত উল্লাস থেকে টাসমানিয়া পর্যন্ত উত্তরোল হয়ে উঠবে না।

এই রাজ্যে যেমন পেশীশক্তি আশ্ফালনে খড়দহের পাভুলিয়া থেকে ধানতলা (আবারও ঘটল ধ্বংস। নায়ক শাসক-নেতার সুযোগ্য পুত্র)। নীরব প্রতিবাদে ফুসছে, বিশ্ব প্রেক্ষিতে বৃশায়নের কীর্তি দেখে মনে হয় না কি, আরেক হিটলার নাম বদলে খেলা দেখাতে শুরু করেছেন? এরও সিকিলিটিক সমস্যা আছে কিনা কোনো অদূর ভবিষ্যতে জানা যাবে কি?

নইলে কোন উন্মত্ততা বশত বৃশ সাদ্দামকে হুকুম করেন স্বদেশ ত্যাগের?

বাগদাদে ঘটতে চান 'সাইবাডি'। ইরাকি জনগণের রাজনৈতিক অধিকার কোন অধিকারে আত্মসাৎ করেন বৃশ প্রভু? অনুরূপ 'ফতোয়া' মুশারফকে দিন তো দেখি। বা কাস্ত্রোকে! রাশিয়া বা চীন যদি এমন ফতোয়া বৃশকে দেয়, তাঁর কী বক্তব্য হবে? জানি, এটা নিছক সুখস্বপ্ন। না আছে সেই লেনিনের রাশিয়া, না আছে মাও সে তুঙের চীন।

যেমন নেই কাকাবাবুর পার্টি বা পি ডি জি-র পার্টি। পার্টি এখন বুন্টন-সুবল-শহিদুল-দুলালের। পার্টি মনোয়ার মণ্ডল, বি ডি সিং-দের। এদের প্রত্যেকের রক্তে সিকিলিটিক বীজাণু, যা হিটলারকে হিটলার করেছিল।

সভ্যতার ইতিহাস হিটলারকে ক্ষমা করেনি। ক্ষুদে হিটলারদের তা মনে করিয়ে দেবেন না তাদের স্বনিযুক্ত অতিকায় দাদারা?!

ঘোষণা না

গুরুগত আগামী কয়েকটি সংখ্যার বিষয়ের বিষয়বস্তু

নিম্নলিখিত কয়েকটি :

নারদ নারদ

দু-কান কাটা

ঘোমটার আনাতে খ্যামটা নাচন

নেই কাজ তো খই ভাজ

স্তাবক বনাম চামচা

ছাই ফেলতে ভাজ কুলো

যাঁরা অহেতুক আমাশা এবং অস্থলে ভোগেন না, যাঁদের স্বাসকট থাকলেও হাঁপানি নেই, যাঁরা আধুনিক কবিতা লেখেন না, যাঁদের হার্টের ব্যারাম নেই, যাঁদের বুকে-পিঠে পুরস্কার-স্বামাচি গজায়নি—একমাত্র তাঁদের কাছ থেকেই লেখা আহ্বান করা হচ্ছে।

বিশেষ আকর্ষণ

- আমরা লেখার পারিশ্রমিক শত পরিশ্রমেও দিতে অপারগ।
- অমনোনীত লেখার লেখকরা অর্থ-সাহায্য করতে চাইলে কৃপা পূর্বক তা গ্রহণ করে থাকি।

সতর্কীকরণ :

- ছড়া কড়া হাতে দমন করা হয়।
- যাঁরা আঁকতে জানেন না তাঁদের আঁকা তাঁদেরই বুকে-পিঠে সেঁটে দেওয়া হয়।
- একমাত্র ব্যঙ্গ-কবিতা বা প্যারডি গ্রহণযোগ্য।
- চাম্চাদের স্বাম্চাতে আমরা সর্বদা তৎপর।
- লেখা বা আঁকা ছাপাব জান্যে যাবতীয় তথ্যের বদ-তুচ্ছদির রূপে প্রতিভাত হয়।
- সুন্দরী যুবতী অথবা তরুণীদের সম্পাদকের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। দুঃসাহসিকার। একমাত্র সম্পাদক-পক্ষীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।
- এসব নিয়ম নিয়ে অযথা ঘষাঘষি করবেন না।

আপনাদের অসহযোগিতার

জন্য আগাম ধন্যবাদ

পুলিশের হাত-পা বাধা। গণতান্ত্রিক দেশে বড় গলাই হোক আর ছোট গলাই হোক চোরের মান-ব গলাই হোক আর দারোগার মান-ব গলাই হোক, কঠোরতর কঠোর শীকতি সবস্থানে নেই।

টীকা নিম্নয়োজন

এ চোর সে চোর নয়

বুনো রামনাথ



টারি কেউই কিন্তু খোদো-মেথো নন, সবাই রামা-শ্যামা বা কেউ-বিস্টু। এক কথায় হোমরা-চোমরা মানুষ। এঁদের চোর বললে, হাজতের দাগী চোরদের এখন চোর বলি কোন মুখে?

গলাবাজিও কিছু কমেনি, বরং পঞ্চমে উঠেছে। তবু চোরের মা-ও ভেক বদলেছে ছেলের মতোই। একেই তো মাতৃরাপের ব্যাখ্যানের অন্ত নেই। বর্তমান প্রসঙ্গে দুগা-মা, কালী-মা ধান্নি-মা, সং-মা বাদ দিলেও শুধু গর্ভধারিনীকেই ম্যা, ম্যা বলে খাড়া করাটা আজকের দিনে আর খোপে টেকে না। বাস্তবিকই, শুধু পেটে ধরলেই মা হওয়া যায় না। বিপদে আপদে আঁচলের আড়ালে মস্তানকে আগলিয়ে না রাখলে কীসের মা? গলা বাড়িয়ে (পড়ুন-গলা ফাটিয়ে) মস্তানের হয়ে লড়তে না পারলে কেমন ধারা মা?

সত্যি বলতে কি, আজকের চোরের মা-রা পেটে না ধরলেও আঁচলে আগলে এবং গলা বাড়িয়েই মাতৃত্বের যোগ্যতা

সে চোরও নেই, সে মা-ও নেই। সে গলাও এখন সকাল সন্ধ্যা রীতিমতো রেওয়াজ করা বাজখাঁই গলা। পুলিশে শুনতে পেলেও কানে ওদের তালা ধরে যায়। আর পেলেও হবেই বা না কেন? চোর বলতে আজ-আর ছিঁচকে, সিন্ধেল বা গাঁটকাটা, পকেটমারদের বোঝায় না। ওসব চুনোপুটিদের এখন এই কোটি-আরব লুটপাটের বাজারে চোর বদনাম দিলে চামচিকেকে বাজপাখির স্বীকৃতি দিতে হয়। দুটি জীবই পাখনা মেলে ওড়ে। তাই বলে চামচিকেকে পাখি বলাটা কি ঠিক হবে? ঠিক তেমনিই বোফার্সের অজস্র সহস্র দস্তরি (কিক্-ব্যাক?) পকেটস্থ করাটা যদি চুরি কবা হয়, তবে কোবরেজ বাড়িতে সেদিন বাতে কটা এটো বাসন কে বাঁ কারা যে উঠিয়ে

নিম্নে গেল, সেটাকে এখন চুরি বলি কোন লজ্জায়। আর চোরের মাথা খেমে বলেই যদি ফেলি অমন একটা কথা সেটাতো বোফার্স-চোরদের একরকম মানহানিই করা হল না কি?

তাই বলছিলাম, যাকে-তাকে এখন আর চোর-ছাঁচোড় বলা যায় না। চোরেরা এখন সব বড় মাপের মানুষ। সি বি আই-এর বোফার্স তদন্তে যে সব রাঘব বোয়ালদের নাম মাঝে মাঝেই কাগজে পড়ি, তাঁদের তো ঠিক খিদিরপুর-ধর্মতলার বাসের পকেটমারদের পর্যায়ে ফেলা যায় না। আর শুধু বোফার্স তো নয়, ইউরিয়া, গরু-ছাগলের জাবনা কেনা, শেমার বাজারের 'স্ক্যাম'—যেখানেই কোটি কোটি টাকার লেনদেন, সেখানেই চুরি। আর চোর সন্দেহে কাগজঅলারা খাঁদের দিকে আঙুল দেখাচ্ছে

অর্জন করেছেন। অবশ্য ব্যাপারটা একই। তখন ছিল পেটে ধরা এখন হল পাটি-ধরা। পাটির পাণ্ডারা যখন ইদিক-উদিক হাত চালিয়ে দেশের এবং দেশের দু-দশ হাজার কোটি পকেটস্থ করেই ফেলে তখন সেইসব পাণ্ডাদের প্রকৃত জননী হিসেবে 'পাটি'র মাতৃদায়িত্ব কিছুটা থেকেই যায়। বিশেষ করে সেইসব পাটি-মা'রা যখন প্রশাসনের হর্তা-কর্তা-বিধাতা হয়ে বিরাজমান থাকেন।

কাগজেই পড়ি, চুরি-চামারিটা ইদানীং বেড়েই চলেছে। দেশটাকে লুটে পুটে আছে আজকের বাজার সবকারের দল। অপকৃষ্টি কিন্তু সেই সাবেকি প্রথায়ই চলেছে। ফর্দ হাতে বাজারে যাওয়া আর দু'পয়সা কামিয়ে বাড়ি ফেরা। শুধু 'দু'পয়সাটা' এখন কয়েক হাজার কোটিতে গিয়ে

দাঁড়িয়েছে। এ তো আর গেরস্ত বাড়ির মুদির দোকানের ফর্দ নয়, এ হল বিশ্ব-বাজারে সরকারি কেনাকাটার ধুমধাড়ানো ফর্দ। বিশেষ করে প্রতিরক্ষা দপ্তরের ফর্দ হলে তো কথাই নেই। কামান কিনতে তখন সরকারি কোষাগারে কামান দাগে চোরেরা। সুইস কামান, চেক বন্দুক কেনা তো চাট্টিখানি কথা নয়। কাঁড়ি কাঁড়ি বিদেশি মুদ্রা ট্যাকে গুঁজে বাজারমুখো হতে হয়। দস্তুরিটাও বিদেশি মুদ্রায় বিদেশি ব্যাঙ্কে বাজার সবকারের খাতায় চুপিচুপি জমা হয়ে যায়। এমনদিকে কাকপক্ষীদের টের পাবার কথা নয়। কিন্তু গুপ্তধন তো আর যথের ধন নয়, মাঝেমধ্যেই মাটি খুঁড়লেই পাওয়া যায়।

“চুরি হয়ে গেছে রাজকোষে, চোর চাই” বলে ঠিক রবীন্দ্র সঙ্গীত না হলেও হল্লা একটা শুরু হয়েই যায়। একদিক থেকে ছুটে আসে কোটাল (পড়ুন—সি বি আই)। আর একদিক থেকে বড় গলা পঞ্চমে তুলে ছুটে আসে চোরের মা (গলা শুনেই চেনা যায়)।

তহেলকা তো চোখে দেখা। বিহারে গরু-মোষের জাবনা চুরি নিয়ে সি বি আই কম লাঠি ঘোরায়নি। বোফার্সের দস্তুরী ব কিছটা হজম করতে না করতেই বদ হজমেই হয়ত মারা গেল চুনোপুটি চাভা! রাঘব বোয়ালরা সব এখনো মা-র গলা ধবে বুলে আছে।

পুলিশের হাত-পা বাঁধা। গণতান্ত্রিক দেশে বড় গলাই হোক আর ছোট গলাই হোক, চোরের মা-র গলাই হোক আর দারোগার মা-র গলাই হোক,

কঠরোধ করার স্বীকৃতি সংবিধানে নেই। তার ওপর মা-তো এখানে পেটের জোরে হয়নি, পার্টির জোরে হয়েছে। আর পার্টিই যদি সরকার চালায়, সে ক্ষেত্রে পুলিশের মা-বাপও তো ওই পার্টিই। এখন মা-বাপের কঠরোধ করবে এমন কুলাঙ্গার পুলিশ কোন দৃষ্টিতে হতে যাবে?

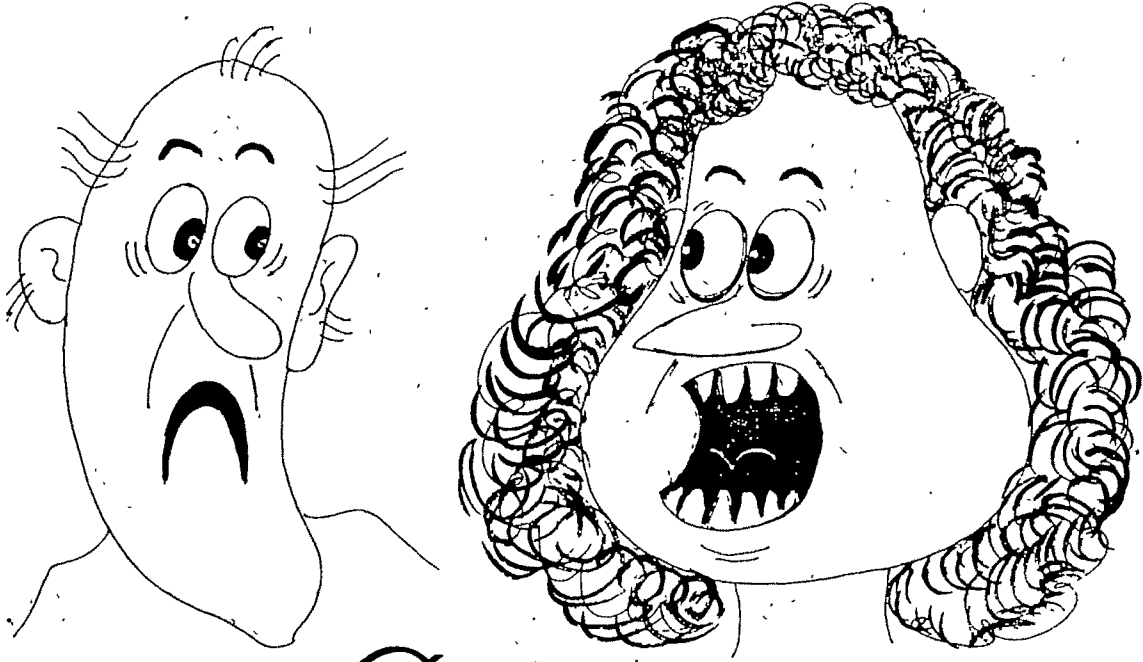
অন্তঃব চুরি-চামারি চলতেই থাকবে। চলছেও। মা-র বড় গলা বাড়তেই

“চুরি হয়ে গেছে রাজকোষে,
চোর চাই” বলে ঠিক রবীন্দ্র
সঙ্গীত না হলেও হল্লা একটা
শুরু হয়েই যায়।

থাকবে। বাড়ছেও। বোফার্স, তহেলকা, গরু-মোষের জাবনা চুরি হতেই থাকবে। হচ্ছেও। সুইস ব্যাঙ্কে চুরির টাকা জমতেই থাকবে। জমছেও। সরকারি তদন্ত কমিশন কেলেকারির তদন্ত করতেই থাকবে। করছেও। কাগজে আমরা লিখতেই থাকব। লিখছিও।



কার্টুন : গুরুপ্রসাদ দাস



আত্মকাহিনী

দিবেন্দু দাঁস

প্রতিবারই আমি মৌলিক রচনা লিখি। কিন্তু প্রতিবারই সম্পাদক ধরে ফেলেন। তাই এবারে মৌলিক বলে একটা যৌগিক আত্মকাহিনী পাঠালাম।

আমি নিজের হাতে করেই নিজের সংসার ভেঙেছিলাম। বালিগঞ্জ, টালিগঞ্জ, নবাবগঞ্জ করে গোটা চাবেক হাফ-রাইটার্স মার্কা বাড়ি ছিল আমার। গাড়ি যা ছিল তা দিয়ে বন্ধু-হিন্দুমোটর আবার চালু করা যেত। সর্বক্ষণ চাকর-বাকর দ্বারা সেবিত হতাম। বডিগার্ড দ্বারা গার্ডিত হতাম। শিক্ষা বলতে খবরের কাগজ। যোগ্যতা বলতে পায়ের ওপর পা দিয়ে বড়লোকি করা। এক স্ত্রী, বিদেশে চাকরি কবে। বিদেশ দপ্তরে। এক মেয়ে। মিছেই স্কুলে যায় আসে। তবে আমি নজর রাখি। রিগির এখন কার্বাইডের বয়স। মানুষের ল অ্যাবাইডিং চরিত্র শুক হয় বিয়ের পর থেকে। তাছাড়া অঘটন ঘটলে রিগির মা খুনী হয়ে যাবে। রাগেব চোটে রজনীকে আমি পোষা অ্যালসেশিয়ানটাকে গলা টিপে মারতে দেখেছি। তারপর আমাকে বলেছিল—বি কেয়ারফুল। হাতি দিয়ে হাতেখড়ি। যে কোনো সময় হিউম্যান হয়ে যেতে পারে।

ভূমিকা শেষ। এবার ভূমিতে। বাড়ির সামনে চাবকাঠা বাগান ছিল।

বালিগঞ্জের বাড়ির সামনে। সেখানে একটা সেগুন কাঠের ছোট টেবিলের সামনে কুমিরের মতো রোদ পোয়াছি। হাতে খবরের কাগজ ও চাষের মাগ। সম্ভ্রান্ত পরিবারে কাপকে মাগ বলে। আলুকে স্টার্চ বলে।

আমার পাশে দাঁড়িয়ে আমাকে পাহারা দিচ্ছে টোকি সিং। আমর্ড, তবে পাঞ্জাবির নিচে। আমি অস্ত্র দেখতে পারি না। হঠাৎ দেখি বিহারী দরোয়ান একটি যুবককে নিয়ে আমার দিকে আসছে। যুবককে সাদামাটা দেখতে। নিম্নবিত্ত।

—সুপ্রভাত স্যাব।

—সুপ্রভাত। কী চাই?

—একটি প্রস্তাব ছিল।

—দশটার পর এসে আমার ম্যানেজারকে করে যাবেন।

—বিষয়টা আপনার বিশেষ ব্যক্তিগত।

—ম্যানেজারও আমার ব্যক্তিগত। টা-টা।

—আমি আপনাব মেয়েকে বিয়ে করতে চাই।

—কি।।

আমাকে চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠতে দেখে টোকি সিং পাঞ্জাবির তলা থেকে ঝুট করে শটগান বেব করে যুবকের দিকে তাক কবে ধরল।

—টোকি সিং। কতবার বলেছি আমার সামনে অস্ত্র ধরবে না। ঢোকাও।

টোকি চুট করে অস্ত্র সম্বরণ করতেই আমি আবার বসে পড়লাম।

—তোমার নাম যাই হোক, তোমার বাবার নাম যাই হোক, তোমার দাদু

যে কোনো মহাদেশের নৃপতি হোক, তোমার এই দুরভিসন্ধি কখনোই পূরণ হবে না। কেটে পড়ো।

যুবক আমার সামনের চেয়ার টেনে বসে পড়ল।

—স্যার, আমি আপনার মেয়েকে ভালোবাসি।

—তাতে আমাব বা আমার মেয়ের কিছু এসে যায় না। দাঁড়িয়ে কথা বলো। তোমার নাম কি?

—রঞ্জয় বল। বাবা সুধীর বল।

—বলপ্রয়োগের আগে বাপ-বেটা কেটে পড়ো।

—সাব, আপনার মেয়েও আমাকে ভালোবাসে। আমি চলে যাবার আগে তাকে একবার জিজ্ঞাসা করে দেখুন। আমি মিথ্যে বলছি না।

চৌকি সিং যুবকের হাত ধরে টানতে লাগল।

—স্যার, প্লিজ একবার জিজ্ঞাসা—

চৌকি সিং ওব মুখ চেপে ঠেলতে ঠেলতে গেটের দিকে নিয়ে চলে গেল। আমার বোধ পোয়ানো মাথায় উঠে গেল। যুবকের কথা সত্যি হলে রঞ্জনের হাতে আমার শেষ রজনী হয়ে যাবে। উঠে পড়লাম। সোজা দোতলায় গিয়ে বিনির ঘরের দরজায় যা মাঝামাঝি। ভেতর থেকে হিন্দি পপ দরজার তলা দিয়ে লিক কবছে।

—রিণি রিণি—

বেশ দেরি করে রিণি দরজা খুলতেই হড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়লাম। খাটের ওপর বিলিতি বই উপড় করে রাখা। মাতৃভাষা-বিরোধী না হলে শিক্ষিত হওয়া যায় না। পোড়া তামাকের যেন গন্ধ আসছে। গন্ধ বা দুর্গন্ধ কোনো প্রমাণ নয়; কিছু বলা যাবে না।

—বাবা, কি বলবে বলো।

—তোমার বয়স্কেশ এসেছিল। তোমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়ে গেল। তুমি আজকাল এইসব করে বেড়াচ্ছ। তোমার মাকে আমি কী কৈফিয়ৎ দেব? ছিঃ রিণি—

—কী সাহসী পুরুষ! তাই না বাবা?

যুবকের কথা বিশ্বাস হল। রিণির উত্তর শুনে প্রচণ্ড রাগ হল।

—এক পাশও বেরোবে না এ ঘর থেকে।

দ্রুত পায়ে বেরিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলাম। দরজার পাশে চৌকি সিংকে পাহারা বসিয়ে নিচে নেমে গেলাম। রঞ্জনের ভয়টা ঘাড় চেপে বসল। অ্যালসেশিয়ানের মুখটা ভেসে উঠছে। রিণিটা। শেষে পিতৃহত্যার কারণ হবে। রাগটা শরীর টুইয়ে জামাকাপড়েও লাগছে। প্রবল বেগে পাথর লাগানো সিঁড়ি বেয়ে নামছি। মাক সিঁড়িতে সামনে পড়ল মিস রায়। ইনি রিণির ব্যক্তিগত সেবিকা।

—স্যার, আপনাকে একটা কথা বলতে পারি?

—না।

এই বলে নিচে নেমে গেলাম দ্রুত।

পরবর্তী চক্রান্তটা জেনেছিলাম পরে।

চৌকি সিং উঠে দাঁড়িয়ে রিণির ঘরের দরজা খুলে দিল মিস রায়কে। মিস রায় ঘরে ঢুকল। খাটের ওপর রিণি উপড় হয়ে হাত-পা ছুঁড়ে কাঁদছে।

—কি ব্যাপার বেবি। আন্দোলন করছ কেন? টেল মি ডিমার—

মিস রায় আবার ট্রেডইউনিয়নিস্টের মেয়ে।

—বাপি আমাকে প্রিজ্ঞার করেছে মিস রায়। ঘরের বাইরে পা রাখতে দিচ্ছে না। হাউ ক্রুয়েল দ্যাথো। আই মাস্ট ডাই। ওর সঙ্গে আব হয়ত দেখা হবে না। ও মিস রায়—

—নো, নো বেবি। তা হতে পারে না এ তো একতরফা এবং যৌবন বিরোধী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মিস্টার মল্লিক। আই হেভ আইডিয়া বেবি। কেন্দো না। গণতান্ত্রিক উপায়ে তোমার শৃঙ্খল মোচন করব।

তড়াক করে উঠে বসল রিণি।

—কিভাবে মিস রায়?

—বি প্রেনান্ট মাই চাইল্ড।

—হোয়াট!!

—ইয়েস। এই একটা রাস্তা আছে ঘর থেকে, মায় বাড়ি থেকে বেরোবার। তোমাকে অন্তঃসত্ত্বা করে আমি তোমার শৃঙ্খল মোচনে করব। প্রোডাকশনের রাস্তাই প্রফিটেবল।

—আপনি আমাকে—বাট হাউ মিস রায়। একি সম্ভব?

—ওয়েট বেবি।

এই বলে মিস রায় রিণির ঘর থেকে বেরিয়ে এল। চৌকি সিং আবার উঠে দাঁড়াল। মিস রায় বেরিয়ে যেতে সে রিণির দরজার লক্কা পরীক্ষা করে আবার বসে পড়ল।

নিচে ড্রয়িং রুমে নিজে থেকে স্থির রাখতে পারছিলাম না। একি করল রিণি। অতি সাধারণ একটা ছেলেকে—অন্তত হাই সোসাইটির কাউকে যদি ভালোবাসত তবু রঞ্জনিকে আমি ফেস করতে পারতাম।

মেয়েকে তো তোমার বিয়ে দিতেই হবে রঞ্জনী। নাঃ, মেয়েটা আমার বাকি জীবনটা মাটি করে দিল। আমি মারা যাবার পর ফটোটা কোন ঘরে

আমি ওর প্রেমিকা স্যার। আমি ওকে আমার বাবার নাম হিসেবে আপনার নাম বলেছিলাম।

রাখলে মানাবে, কিছুক্ষণ এই চিন্তা পেয়ে বসল। রজনী হয়ত আমার আর ঐ অ্যালসেশিয়ানের ছবিটা একসাথে বাঁধাবে। এরকম একটা ছবি আমার আছে। আমি আর দিলীপকুমার মুখোমুখি।

দ্রুত ড্রয়িংরুম ছেড়ে বেরিয়ে দোতলার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলাম। মাঝপথে মিস রায় সিঁড়ি আগলে দাঁড়াল।

—স্যার এখন কি আমি আপনাকে একটা কথা বলতে পারি?

—একদম না।

পাশ কাটিয়ে দ্রুত উঠতে লাগলাম। রিণির ঘরের দরজার ঠিক উষ্টোদিকে আমার অফিসঘরের দরজা। আমি অফিসঘরে ঢুকলাম। চৌকি সিং উঠে দাঁড়িয়ে বসে পড়ল। আমি আবার বেরিয়ে এলাম। ঢুকে গেলাম রিণির ঘরে।

—ছেলেটি কী করে?

—বাবা, আমি প্রেনান্ট।

—কি-ই-ই!!

চিংকার শুনে হড়মুড় করে ঢুকল চৌকি সিং। হাতে পিস্তল।

—চৌকি সিং। বন্দুক হাটাও। ইডিয়েট। বলছি কতবার, ওসব আমি দেখতে পারি না। এখুনি এই টেবিলের ওপর ওটা রাখো।

চৌকি সিং তার পিস্তলটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও টেবিলের ওপর রাখল।

—যা যা আছে, সব রাখো।

আমি থমকে উঠলাম। তারপর চৌকি সিং তার পাঞ্জাবির তলা থেকে একে একে একজোড়া ছুরি দাঁড়ি কামাবার ক্ষুর, হ্যাক্স ক্রাত, গুরুনানক কুপাণ, বাটালি, বটি, নারকোল কোরা, কাঁটা লাগানো লোহার বল ও একটা লোহার চেন বের করল। পায়ের মোজার ভেতর থেকে আর একটা ছুরি, ছুঁচ, গুলতি ও ‘পয়জন’ লেখা একটা কালা শিশি বের করে রাখল। তারপর সে বিষম মনে রিণির ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

টেবিলের ওপর চৌকি সিং-এর অন্তঃসত্ত্বার দশে আমার চোখ তালতে উঠে গেল। চক্ষু তালগাছ। কিছুক্ষণের জন্য বিণির ঐ ভয়ানক কথাটা পর্যন্ত ভুলে গেলাম। তারপরই আবার মনে পড়ে গেল।

—রিনি, তুমি মা হতে চলেছ।

—আমি এখন অ্যাডাল্ট বাপি।

—হায় ভগবান। রজনীকে আমি কী জবাব দেব। তুমি, তুমি—
মাঝপথে ঘরে ঢুকল চৌকি সিং। বলল এক যুবতী আমার সঙ্গে দেখা
করতে চায়।

—দেখা হবে না।

চৌকি সিং চলে যেতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, যুবতী নাকি
বিশেষভাবে অনুরোধ করেছে একবার দেখা করার জন্যে।

ময়ূরের ডাক কেকা, ষোড়ার ডাক হুয়া, হাড়ির ডাক বৃংহণ, যুবতীর
ডাক বিবিছানা। বিছানা ধাতু। পরপর সমাস।

রিণির ঘর থেকে বেরিয়ে দ্রুত নিচে নেমে গেলাম। চৌকি আবার রিনিকে
চৌকি দিতে বসল।

যুটীই বটে। রিণির মতোই বয়স। সুন্দরী আমাকে আসতে দেখে উঠে
দাঁড়াল।

—নমস্কার স্যার। আমি নন্দিতা ব্যানার্জী।

—নমস্কার।

—অলোক আপনার কাছে এসেছিল?

—সে আবার কে?

—যে আপনার কাছে এসে আপনার মেয়েকে বিয়ে করার প্রস্তাব—

—আপনি কি ওর মা? ছেলের জন্যে সম্বন্ধ করতে এসেছেন?

—না, আমি ওর প্রেমিকা স্যার। আমি ওকে আমার বাবার নাম হিসেবে
আপনার নাম বলেছিলাম।

—মানে।

—মানে খুব সহজ স্যার। নিজেকে একজন সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে
হিসেবে দেখাতে আপনার নাম বলেছিলাম।

—মানে।

—মানে খুব সহজ স্যার। নিজেকে একজন সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে
হিসেবে বলতে চেয়েছিলাম।

—কিন্তু কেন? আর এত লোক থাকতে আমার নামটাই বা বললেন কেন?

—বড়লোকের মেয়ের বড় চাহিদা। এই ভেবে অলোক যাতে একটু
সিরিয়াস হয়। একটা ভালো চাকরি খোঁজে।

—তাই বলে এত লোক থাকতে আমার নাম।

—এ শহরে ধনী মানুষদের মধ্যে আপনার নাম সবচেয়ে আগে করা হয়
স্যার। আপনার নামটা ব্যবহার করে যদি একজন সাধারণ মেয়ের উপকার
হয় আশা করি তাতে আপনার আপত্তি হবে না।

আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলাম—

—তার মানে সকালের লোফারটাকে রিণি চেনেই না। জয় মা কালী।
পাঁঠা বলি। শুনুন মিস যোগিতা বলি—

—নন্দিতা ব্যানার্জী স্যার।

—বিয়ের জন্যে যদি কিছু খরচা লাগে আমাকে বলবেন। আমি দেব।
ফলস বাবার দায়িত্ব নিলাম। উফ্, আপনি যে আমাকে কী দৃষ্টিভঙ্গির হাত
থেকে.... দাঁড়ান, তবে যে রিণি বলল সে প্রেণ—একটু অপেক্ষা করুন।
আসছি।

আমি দ্রুত অফিসঘর থেকে বেরিয়ে রিণির ঘরের সামনে বসে থাকা চৌকি
সিংকে বললাম—কড়া নজর রাখবে, অফিসঘর থেকে কেউ যেন বেরিয়ে
না যায়।

—কিন্তু স্যার, আমি তো এই ঘর পাহারা দিচ্ছি। আপনার মেয়েকে।

—বিরক্ত হয়ে অফিসঘরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললাম,—এ ঘরেও
আমার মেয়ে আছে।

এই বলে আমি রিণির ঘরে ঢুকে গেলাম। চৌকি চোখ কুঁচকে, মাথা
চুলকে বিড়বিড় কবে উঠল—স্যারের দুটো মেয়ে!!

—রিণি, রিণি, মা আমার—আমি জানতাম একটা সাধারণ ছেলেকে তুমি
ভালোবাসবে না। তুমি এ কাজ করতে পারো না। আমি জানতাম। তুমি নিশ্চয়ই
কোনো শিল্পপতির সুসন্তানকেই বেছে রেখেছ তোমার জীবনসঙ্গী হিসেবে।
বলো বলো, কে সে?

—আমাব মিউজিক টিচার বাপি। মিস্টার সরোজ বাগচি।

—হা ভগবান।

আমি ধপাস করে রিণির বিছানায় বসে পড়লাম। রিণির গানের মাস্টার
আমার থেকেও বয়সে বড় হতে পারে। হাবমোনিয়মের মতো চেহারা। সাইকেল
চড়ে আসে। রিণি কিনা শেষে... আর ষের্থ রাখতে পারলাম না। উঠে দাঁড়িয়ে
রিণির গালে কষিয়ে দিলাম এক চড়। রিণি হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। ঠিক
সেই সময় ঘরে ঢুকল রজনী। পেছনে পেছনে মিস রায। তার পেছনে চৌকি
সিং।

—রজনী!!

—হ্যাঁ, আমি। অবলা মেয়ের ওপর অত্যাচার হচ্ছে শুনে এলাম।
অত্যাচারের বদলা অত্যাচার।

মিস রায বলল—আন্দোলন।

এরপর রজনী অবিশ্বাস, অসম্মান, অবৈধ প্রণয় ইত্যাদির বদলা কি কি
তা জানাল।

—কিন্তু তোমার মেয়ে কি করেছে শুনেছ? আমি মরীয়া হয়ে বললাম।

—আমি যা করেছিলাম, আব দশজন যা করে থাকে। তুমি মাছ থেকে
শুরু করে তোতাপাখি পর্যন্ত যা করে থাকে। কেন, তুমি কবোনি?

—ইয়ে—না, মানে—বিয়ের আগে বিণি—

রিণি মাকে দেখেই উঠে গিয়ে মায়ের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

—কেন, আম খেয়ে আঁটি পুতে আমগাছ করেনি লোকে? কাদিস না
সোনা, আমি এসে গেছি। দেখি তোর গায়ে কে হাত তোলে।

—এ লোকটা আমাকে চড় মেরেছে মা। রিণি ঝোপে কোপ দিল।

—কিই। এতবড় সাহস তোমার? ফুলের মতো মেয়টাকে মেরেছ।

আমি নিজের গালে একটা চড় ও বুকে একটা ঘুঁষি মেরে বললাম, এই
শোধ হল রজনী। তুমি বোসো, বিশ্বাস করো।

এই বলে আমি দ্রুত রিণির ঘর থেকে বেরিয়ে অফিসঘরে ঢুকলাম।
মেয়েটাকে বিদায় করতে হবে। জটিলতা বাড়তে পারে। আমি বেরিয়ে যেতে
রিণি চৌকি সিং-এর হাতটা খপ করে ধরে ফেলল।

—এই রাফসটা আমার ঘরের বাইরে পাহারা দিত মা। চৌকি সিং বিপদ
বুঝে বলল,—আমি আপনাকে পাহারা দিতাম না বেবি। আমি তো অফিসঘরের
দিকে নজর রাখতাম।

রজনী গর্জে উঠল,—কেন? ও ঘরে কে আছে?

—আজ্ঞে, স্যারের দ্বিতীয় মেয়ে।

—কি। আমার কাঠমাথুতে থাকার ফায়দা তুলেছে-ই-ই। নরখাদকটা। ও
পক্ষের মেয়ে। সেকেন্ড টার্ম।

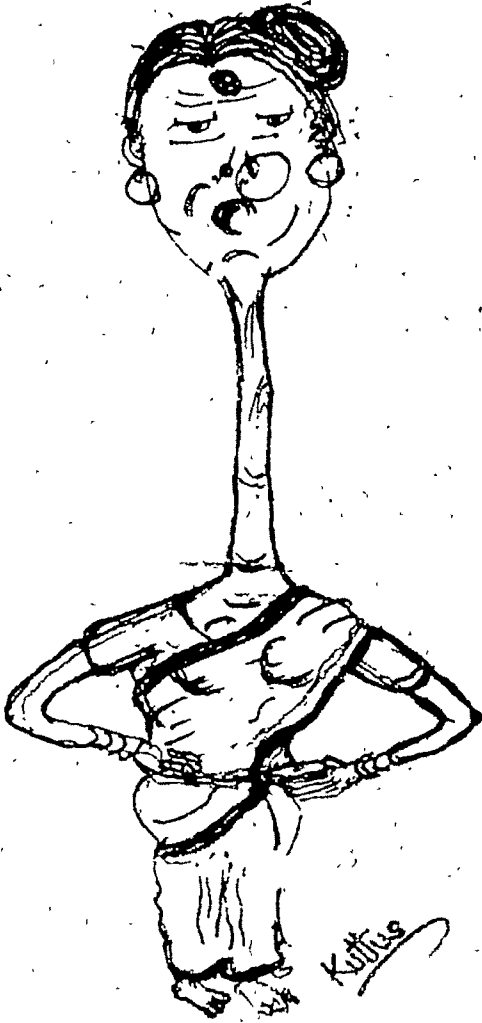
রজনী টেবিলের ওপর রাখা চৌকি সিংয়ের অর্ডনান্স ডিপোর দিকে কটমট
করে তাকাল। ওর হাতদুটো মুঠো হয়ে গেল।

এর পরের আত্মকাহিনী আমার জানা নেই। জানা থাকলেও বলব না।
রজনী যদি আমাকে খেয়ে আমার আঁটি পুতে গাছ করে তবেই পরের প্রজন্ম
বাকি গল্পটা জানতে পারবে।

বাপে-তাড়ানো মায়ে-খেদানো ছেলেকে তারাই খুঁজে এনে রাশিয়াকে কজা করার জন্য ইরাকের বাথ পার্টির নেতা তৈরি করেছিল। সাদামের পরিবার ও গ্রামটাই ছিল ডাকাত আর চোরদের নিয়ে। বাপ মারা গেছে। সৎ বাপের একটা আমোদই ছিল—সাদামকে পেটানো।

চোরের মায়েরা

সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য



চো

র চুরি করে গোপনে, অন্ধকার রাতে। তার মা কিন্তু সব জেনেও গোপন করে সেই কথা। প্রকাশ্যে তারই কষ্টস্বর সবচেয়ে উচ্চছোমে ধ্বনিত হয়—আমার ছেলের মতো ছেলে হয় না।

ক্রেতায়ুগে চোরের মা-বাবার এত বড় গলা ছিল না। অতবড় যে রামায়ণ রচয়িতা বাণ্মীকি, তিনিও একসময় চোর-ডাকাতদের কাজই করতেন। 'রত্নাকর দস্যু' হিসাবে তার কত নামডাক। তার বাবা-মা কিন্তু বড় গলায় ছেলের গুপপনা ব্যাখ্যা করতে যেতেন না। বরঞ্চ নারদ মুনির কথায় বাপ-মায়ের সমর্থন নিতে এসে উষ্টো কথা তাকে শুনতে হয়েছিল—তোমার কাজের ফল তুমি নিজেই ভুগবে—আমাদের ওসব ব্যাপারে টেনো না।

কিন্তু আজকের দিনে সেসব উষ্টে গেছে। এখন যোর কলিকাল। যার ছেলে যত বড় চোর, এখন তার বাবা-মার গলার জোর তত বেশি। আজ দুনিয়া জুড়ে চোর-জোচ্চোরদের রমবমা। কারণ তাদের মাথার ওপরে ছাতা ধরে আছেন স্বয়ং রাষ্ট্রনেতৃবৃন্দ অথবা তাদের শক্তিশালী দলনেতারা। নিজের দেশে দেখুন অথবা বিদেশে দেখুন, সর্বত্র একই অবস্থা। বিদেশের কথা দিয়েই আরম্ভ করা যাক। হঠাৎ পৃথিবী জুড়ে এক মহাযুদ্ধের, কালো মেঘ ঘনিমে উঠতে দেখা যাচ্ছে। এই মেঘ সৃষ্টির পিছনে যাকে অপরাধী হিসাবে খাড়া করা হচ্ছে সে সাদাম হোসেন। সে নাকি গোপনে গোপনে এমন সব মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র মঞ্জুত করেছে যাতে মানব সভ্যতা কেন, তাবৎ মনুষ্যকুলই পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হতে পারে। অভিযোগ করেছে আমেরিকার সবচেয়ে কুশলী গোয়েন্দা বিভাগ। কানাঘুষো শোনা যায়, এই বিরাট সংস্থার পিছনে আছে কোটি কোটি মার্কিন ডলারের মালিকরা আর তাদের বিরাট বিরাট শিল্পসংস্থা। তাদের হাত দিয়েই গোপনে গোপনে শত্রুমিত্র, নির্বিশেষে দেশে দেশে ভীষণ মারগাস্ত রপ্তানি হচ্ছে। এরা আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বৃহৎ ছত্রছায়ায়। প্রকৃতপক্ষে এদের রক্ষণাবেক্ষণের পবিত্র দায়িত্ব সরকারকে দেশবাসীর কল্যাণ কামনায় নিজের হাতে তুলে নিতে হয়েছে। এদের অভিযোগের গোপন কারণ—একসময়ে যাকে মাটি থেকে তুলে নিয়ে নেতা বানানো হয়েছে এবং প্রচুর অস্ত্রসত্তার বিক্রি করা হয়েছে, সে কিনা তাদের অনুমতি ছাড়াই অন্য জায়গা থেকে বেশি দাম দিয়ে সেই জিনিসগুলিই কিনছে। যাকে তারা তুলল তার এই বেয়াদপি কাণ্ড-কারখানা সহ্য করা যায়। খবর পৌঁছল, যার ছত্রছায়ায় তারা আছে সেই তাঁর কাছে। চোরের মা'র বড় গলা। সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের দণ্ড-মুণ্ডর কর্তার টনক নড়ল। গণতন্ত্র গেল, সমস্ত পৃথিবী গেল, এখন তাকে শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক। বড় গলায় সারা পৃথিবীকে জানানো হল—হৈ হৈ কাণ্ড।

আরো একবার ঠিক এইরকম কাণ্ড ঘটেছিল। কুয়েৎ আর ইরাকে নিয়ে। অথচ ব্যাপারটা লক্ষ্য-করুন। এই সাদাম কিন্তু সেইসব চোরদেরই সৃষ্টি। এক বাপে-তাড়ানো মায়ে-খেদানো ছেলেকে তারাই খুঁজে এনে রাশিয়াকে কজা

করার জন্য ইরাকের বাথ পার্টির নেতা তৈরি করেছিল। সাদামের পরিবার ও গ্রামটাই ছিল ডাকাত আর চোরদের নিষে। বাপ মা বা গেছে। সৎ বাপের একটা আমোদই ছিল—সাদামকে পেটানো। সেই ছেলে ধুঁকুমি আব সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আজ বিশ্ব কাঁপানো এক মূর্তি পরিগ্রহ করেছে। “নিজেব হাতের সৃষ্টি যাহা তাহাই যদি ঘটায় পরমাদ”—তাহলে চোরের মায়েদের কী করার থাকে। সব দেশেব চোরের মায়েদের এই দেখে শিক্ষা নেওয়া উচিত। আগেও এরকম অনেক বড় কাণ্ড পৃথিবীতে এইরকম ভাবে ঘটছে। তবু কি তাব থেকে কোনো শিক্ষা হয়েছে?

শুধু কি সাদামেব ব্যাপার। অন্যদিক থেকেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের মুখ থেকে আমরা চোরের মার বড় গলা শুনেতে পাই। তার নিজের দেশে আজ গণতন্ত্র বিপন্ন। সাদা কালোয় ভেদ বেড়েই চলেছে। পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ। দেশ জুড়ে দরিদ্রের সংখ্যা বাড়ছে, বেকারী বাড়ছে—ওদিকে সরকার-পুষ্ট অস্ত্রব্যবসায়ীরা পৃথিবী জুড়ে কারবার করে বৈধ অবৈধ উপায়ে ডলারের পাহাড় জমাচ্ছে। অথচ সারা পৃথিবীর যেখানে যা কিছু ঘটছে মনের মতো না হলেই সেখানেই তারা দেখতে পাচ্ছে—গণতন্ত্র বিপন্ন। দাও দাওয়াই, নাও আমার কাছ থেকে অস্ত্র। ইংলণ্ডের ব্যাপার-সাপারও প্রায় একই রকমের। থাক আপাতত বিশ্বের কৃথা।

আমাদের ঘরের দিকে ফিরে আসি। এখানে দল ও দাদা-পুঁট কর্মীরা বা সেবকরা এমন অপকর্ম নেই যা করতে তারা দ্বিধা বোধ করে। তাদের সেই অপকর্ম ঢাকাব জন্য দলনেতা বা দলীয় সরকারি নেতা সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে ঘোষণা করেন—‘আমার ছেলেরা একাজ করতেই পারে না।’ চোরের মার বড় গলা আর কাকে বলে? কোথাও উপাসনালয় ভাঙল, কোথাও দাঙ্গা লাগল, সঙ্গে সঙ্গে দলনেতাদের উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা—এ ব্যাপারে আমাদের ছেলেদের কোনো দোষ নেই। এসব স্বতঃস্ফূর্ত জনরোষ অথবা বিপক্ষ দলের কারসাজি। আমাদের দলে কোনো সমাজ বিবোধীর বা সাম্প্রদায়িকের স্থান নেই।

যদি বা কোনো নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে হাফ নেতা বা ফুল নেতাকে আইনের দিক থেকে অভিযুক্ত করা হল—সঙ্গে সঙ্গে বড় নেতাদের ঘোষণা—আমরা তদন্ত করছি। প্রমাণিত হলে দল থেকে বহিস্কার করা হবে।

আদালত পর্যন্ত গড়ালে বিচারের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত জনগণকে ধৈর্য ধরতে বলা হল। কারণ তাঁরা নিশ্চিত জানেন, সেই নেতা নিষ্পাপ। পরে দেখা গেল কোনো অজ্ঞাত পুণ্যকর্মের জন্য তাঁর সম্মানে সকল অভিযোগ থেকে মুক্তিলাভ হয়েছে।

দিল্লিই বলুন আর কলকাতাই বলুন, সর্বত্রই চোরের মায়ে বড় গলা সেই একই রকম। গুজরাটে তা ‘অন্যায়ের বিরুদ্ধে জনরোষ’, অযোধ্যায় তা ‘স্বতঃস্ফূর্ত জনজাগরণ’—দিল্লিতে ‘অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও আবেগের’ একটু আতিশয্যময় প্রকাশ। হৃদয়ের দিক থেকে এই সেবোধর্মী মানুষেরা নিষ্পাপ। এইসব কথা চোবেদের নয়, চোরের মায়েদের বড় গলার গৌরবদীপ্ত ঘোষণা।

কুচবিহার ও বাগাঘাটে দুদ্ধতকারীদের হাতে নারী নিগ্রহ গণধর্ষণ ও লুণ্ঠনের জঘন্য ঘটনা। কানাঘুঘো হতে হতে প্রকাশ্যে অভিযোগ—এসব দল বিশেষের লোকদের ব্যাপার। সঙ্গে সঙ্গে চোরের মায়ে বড় গলায় প্রতিবাদের ঢকানিদান—আমাদের ছেলেদের কোনো দোষ নেই—এসবে তাদের কোনো বৌগ নেই। লাক্ষিত অত্যাচারিত নারীটিরই চরিত্র ভালো ছিল না। আর ডাকাতদলে আমাদের কোনো ছেলে থাকতেই পারে না।

দেখা হল না, বিচার হল না, আগেই বড় গলার আওয়াজ। রায়দান।

মনে পড়ে গেল, ছবছ এই গলা শুনেছিলাম ১৯৮২ সালে বিজ্ঞান সেতুর ওপর ১৬ জন আনন্দমাগী সম্মাসীকে যখন প্রকাশ্য দিবালোকে পুড়িয়ে মারা

হল। শুনেছিলাম বড় গলাব অবিচলিত আওয়াজ—জনরোষের আগুনে পুড়ে মরেছেন এঁরা। কিছুই করার নেই।

১৯৯০ সালের বানতলায় দুদ্ধতকারীদের হাতে ৩ জন নারীর লাঞ্ছনা ও তাদের মধ্যে ২ জনের মৃত্যু ঘটনাব প্রতিক্রিয়ায় শুনেছিলাম সেই গলার আওয়াজ—“এমন কতই হয়।”

আপনা থেকে আমাদের মতো জড় প্রকৃতির আজব মানুষদের কণ্ঠ থেকে আর একরকম আওয়াজ বেরিয়ে আসে—“ধন্য আমি জন্মেছি এই দেশে।” হায় হতভাগ্য রবীন্দ্রনাথ! জন্মানোব আর জায়গা পাননি! আর, কোথায়ই বা জন্মাতেন, এই দুনিয়াব কোন দেশে, যেখানে এমন চোরের মায়েরা উচ্চকিত গলায় ভাষণ দিচ্ছে না, যেখানে ‘ধন্য আমি জন্মেছি এই দেশে’ বললে সে কথাকে ব্যঙ্গ মনে হত না, যেখানকাব গাছে গাছে ব্যঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী প্রাণ খুলে তাঁর সঙ্গে এই গান গাইতে পাবত।

ভার্যামে



আমড়া বিষয়ক

অনেক আমি মিলেমিশে আমরা। সেই হামাওড়ি বয়স থেকেই শুনে এসেছি—একা আমি ভালো নয়। তুমি একা ভালো নয়। এসো, কাছাকাছি এসে গাদাগাদি হয়ে এক পাড়ায় থাকি ‘আমরা’ হয়ে। ছিলাম ভালো। দশচক্রে হলাম ছাগল। সব ডাকেতেই ব্যা—ব্যা। সুসভ্য আমবা আজ অসভ্য আমড়া হয়ে সভ্যতার ডাল ধরে ঝুলছি। ন্যাড়া গাছে সুন্দর কদম ফুলের মতো। পাকলে সংসার—গাছেব তলায় গড়াগড়ি। টাকা শেষ, আঠাও শেষ। চরম খান্ধাবাজির পৃথিবীর গোলে আমরা গোলেমাতে বেশ বেড়ে উঠেছি। মানুষের দরকারে আমরা মানুষ কোনো কাজেই লাগি না। যেমন চাটনি ছাড়া কোনো কাজেই লাগে না আমড়া। নাক সিটকে তাই অনেকে বলেই ফেলেন—আঁটি আর চামড়া, এই নিয়েই আমড়া। পাড়াব মাল-দা তাই বলেন—ছেলে আব বৌ নিয়ে আমবা। বাকি সব ছোবড়া।

তাই না দেখে মা-বাবা ভাই-বোন সকাইয়ের মুখ গোমড়া। চুপি চুপি বলে রাশি, আমিও ওই দলে; ঝুলে আছি আমড়ার ডালে। দুনিয়ার নেড়া আর ভেড়া সঙ্কলে দলে দলে যোগ দিন। আমড়াতলায় মিলিত হোন।

আমরা মূর্খাবাদ।

আমড়া জিন্দাবাদ।

—কুটুস কুটুস

তারাপদ রায় ও গঙ্গারাম

তারাপদ রায়

গঙ্গারাম বলল,—আপনি আর কার
সর্বনাশ করতে পারেন? আপনি তো
বাংলা সাহিত্যের সর্বনাশ করছেন।

মারোমধ্যে গঙ্গারাম আমার জীবন দুর্বিসহ করে
তোলে। আজ সকালে এল। এসেই বলল,—সর্বনাশ!

আমি মন দিয়ে খবরের কাগজ পড়ার চেষ্টা করছিলাম। একদিকে
বিশ্বত্রিকিট। অন্যদিকে ইরাক আক্রমণ। অন্য একদিকে এ রাজ্যের অর্থমন্ত্রীর
বসতভিটেয় খাজনা বসানো এবং বাড়ানোর ঘৃণ-চরানো বাজেট। এই তিনটি
চমকপ্রদ সংবাদ। কোনটিকে ফেলে কোনটিকে আগে পড়ি—এই বকম দ্বিধাগ্রস্ত
অবস্থায় রয়েছি। এমন সময় গঙ্গারামের 'সর্বনাশ'।

আমি বলি,—কার সর্বনাশ? কোথা সর্বনাশ? কীসের সর্বনাশ?

গঙ্গারাম বলল,—আপনি আর কার সর্বনাশ করতে পারেন? আপনি তো
বাংলা সাহিত্যের সর্বনাশ করছেন।

আমি অবাক হয়ে বলি, কিভাবে?

গঙ্গারাম বলল,—আপনি আবার গোপাল ভাঁড় নিয়ে লেখা আরম্ভ
করেছেন?

আমি জিজ্ঞাসা করি,—তাতে কী হয়েছে?

গঙ্গারাম এবাব কথার মোড় ঘোরায়,—গোপাল ভাঁড় সম্পর্কে আপনি
কী জানেন?

দু-একদিন আগেই গোপাল ভাঁড় নিয়ে কিঞ্চিৎ পড়াশুনা, জোখখবর
নেবার চেষ্টা করেছিলাম। তারই ওপর নির্ভর করে আমি বললাম, গোপাল
ভাঁড় কোনো রক্ত-মাংসের মানুষ ছিলেন না। ঐ নামে মহাবাজা কৃষ্ণচন্দ্রের
দরবারে কোনো সভাসদ ছিলেন বলে মনে হয় না। গোপাল ভাঁড় নিতান্তই
মানুষের মনগড়া কাল্পনিক চরিত্র।

গঙ্গারাম আবার বলল,—সর্বনাশ! এসব কী বলছেন আপনি! এরপরে
তো বলবেন—গঙ্গারাম মনগড়া কাল্পনিক চরিত্র।

তবে দুঃখের কারণ অনুমান করতে পেরে একটু মুচকি হেসে আমি
বললাম,—একথা তো আমি নিজে থেকে বলছি না, স্বয়ং সুকুমার সেন
বলেছেন।

সুকুমার সেনের নাম শুনে গঙ্গারাম কেমন থমকে গেল। তারপর বলল,—
আমি তর্কে যাব না। তবে বাংলা ভাষায় ঐতিহাসিক কিংবা কাল্পনিক গোপাল
ভাঁড়ের অবদান কম নয়।

আমি অবাক হয়ে বললাম,—বাংলা ভাষায় গোপাল ভাঁড়ের অবদান?
সে আবার কি? রসিকতাগুলো তো মোটেই সাহিত্য পদবাচ্য নয়।



গঙ্গারাম বলল,—সাহিত্য নয়, কত বাংলা প্রবাদের জন্ম হয়েছে গোপাল
ভাঁড়ের বইয়ে তার খোঁজ করেছেন?

আমি এ বিষয়ে বিশেষ কিছু ভাবিনি। গঙ্গারামকে বললাম,—উদাহরণ
দাও।

গঙ্গারাম বলল,—আশ্চর্য! একটা দিচ্ছি। বাকিগুলো পরে।

সেই একটা কি, জিজ্ঞাসা করতে গঙ্গারাম বলল,—গাছে না উঠতেই এক
কাঁদি। গোপালের কলা-বাগানে চোর ঢুকেছিল। চোর এক কাঁদি কলা কেটে
মাটিতে রেখে আরেক কাঁদি পাড়ার জন্য অন্য গাছে উঠছিল। শব্দ পেয়ে
গোপাল সেখানে যাওয়ায় চোর কাঁদি ফেলে পালিয়ে যায়। তখন সেই কাঁদি
টেনে বাড়ির মধ্যে এনে গোপাল স্ত্রীকে বলেছিলেন,—গাছে না উঠতেই এক
কাঁদি।

আমি বললাম, আশ্চর্য।

গঙ্গারাম বলল,—আমি আপনাকে আরো আশ্চর্য করব।

আমি বললাম,—সর্বনাশ!

পত্রপাঠ কে যারা ভাস্কর বিবেচনা
করেন এবং লেখা পাঠাতে সংশোধন
বোধ করেন, তাদেরকে জানানো
যাচ্ছে যে, পত্রপাঠের কোনো
কবিতা প্রান্তে নেই। এরপর ভিত্তিগত
আপত্তা আপত্তা।



মহিলা ম হল

‘ফিস ফিস’ বিভাগ

পরামর্শ দিচ্ছেন : প্রাণঘাতিনী দেবী

□ বেনিফিট অব ডাউট। সে যা হোক, তোমার কেমন বর পছন্দ—
আট না আশি? দু-রকম পাত্রই মজুত আমাদের কাছে।

● প্রেম নাকি কাঁঠালের আঠা? লাগলে আর ছাড়ে না?

—বীণা দাস, মালদহ

□ খুব ছাড়ে। সর্বের তেলে ছাড়ে কাঁঠালের আঠা; আর প্রেম ছাড়ে
বিয়েতে। বাপ বাপ করে ছাড়ে। কুইনিনে ম্যালেবিয়া জুরের মতো।

● আমার কলেজের সহপাঠীরা বড়ই অসভ্য। আমাকে দেখলেই সিটি
মারে।

—আলো সান্ত্বারা, কলকাতা-৯

□ তুমি কি ‘সিটি’ কলেজে পড়ো?

● আদর্শ বর কেমন হওয়া উচিত?

—মায়া পাড়ুই, গোবরডাঙ্গা

□ স্থাবর।

● আমার সমস্যা খুবই জটিল প্রাণঘাতিনীদি। আমার স্বামী আসামে
থাকে। এদিকে তাঁর অবর্তমানে আমি একজনকে দেহমন সমর্পণ করে বসে
আছি। সে আবার এক খুনের আসামি। অথচ আমি আমার স্বামীকে অত্যন্ত
ভালোবাসি। খুব অন্তর্দ্বন্দ্ব ভুগছি। আমি কি খুব পাপ করছি?

—সুমিতা চৌধুরী, কলকাতা-৩৮

□ এক ‘আসামি’কে দেহ-মন দেওয়া আর অন্য অন্য আসামিকে
দেওয়া—তফাৎ কি! দু’জনেই তো আসামি।

● আমার পায়ে খোস হয়েছে। কিছুতেই সারছে না। লজ্জায় ছেলে-
বন্ধুদের কাছে যেতেই পারছি না। কী করি বলুন তো প্রাণঘাতিনীদি?

—শ্যামলী প্রধান, মেদিনীপুর

□ বুক ঠুকে এগিয়ে যাও। এমন খোশ-খবর কেউ গোপন করে।

● এই ২৬ বছর বয়সেই আমার চুলে পাক ধরেছে। আর কি কোনো
ছেলে আমাকে পছন্দ করবে?

—মুরলা হাতী, বাঁকুড়া

□ দেশে কি ‘পাকা ছেলের’ আকাল পড়েছে।

● শচীন আব সৌরভ দু’জনকেই আমার ভারী পছন্দ। কিছুতেই বুঝতে
পারছি না, কাকে ছেড়ে কার সঙ্গে প্রেম করব। আপনাদের কাছে বেশি পছন্দ?

—সঞ্চিতা সামন্ত, দাশনগর, হাওড়া

□ পছন্দ করব আমি আর প্রেম করবে তুমি।

● প্রাণঘাতিনীদি, পত্রপাঠের সম্পাদকের সঙ্গে প্রেম করতে ইচ্ছে করে।
একটা টিপস দেবেন?

—বাসন্তী হাজরা, দমদম, কলকাতা-৩০

□ সম্পাদক মশাই দেনার দায়ে আপাতত গলায় দড়ি দেওয়ার কথা
ভাবছেন। তুমি সঙ্গে যেতে, থুড়ি, বুলতে রাজি আছো?

● ‘নবোন্মুদ্র’ মানে কি? মানেটা যদি ভালো হয়, তবেই জানাবেন,
নতুবা নয়।

—বনানী জোয়ারদার, কলকাতা-২৯

□ মানেটা ভালোয়-মন্দয় মেশানো। নতুন চন্দ্র, যিনি তোমার জীবনে
হালে উদ্ভিত হয়েছেন। তবে অর্ধেক হয়ে যাবেন, যখন তোমার বাবা বা
দাদা হাতে অর্ধচন্দ্র খাবেন।

● আমি অতীতকে ভুলতে চাই। কী করে ভোলা যায়?

—প্রিয়া মুখার্জী, কলকাতা-৩৭

□ ভোলা নামে কোনো বেকার যুবক কি পাড়ায় নেই।

● স্বপ্নে দেখা মানুষটিকে এতদিনে খুঁজে পেয়েছি। সুদর্শন, ব্যক্তিত্বময়
বিদ্বান, রসিক, বড়লোক। সব গুণই আছে। কিন্তু আমাকে যে পাণ্ডাই দিচ্ছেন
না!

—সোনা খাতুন, কলকাতা-১৭

□ স্বপ্ন থেকে বেরিয়ে এলে আর কি গুণ-ভাগ মেলে!

● আমার সমস্যাটা একটু জটিল। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে আমি একটু
বেশিই সুন্দরী। আর সেজন্যই আমার বিয়ে হচ্ছে না। আমাকে তো সবাই
পছন্দ করছে, কিন্তু আমার যে কাউকেই ‘সুন্দর’ মনে হচ্ছে না। সুন্দর পাত্র
কি কোনোদিনই পাব না?

—সুরমা সান্যাল, আসানসোল, বর্ধমান

□ পাবে না মানে? পেয়ে গেছ। পত্রপাঠ ছাপাখানার একমাত্র বেয়ারা
কাম ঝাড়ুদার কাম ফাই-ফরম্যাশ খাটিয়ের নাম সুন্দর পাত্র। সে অবিবাহিতও
বটে।

● আমার বয়স বাইশ। প্রেম শুরু করিনি এখনো। করব-করব করছি।
তাব আগে একটু ভেবেচিন্তে নিতে চাই। শুনেছি অসম বয়সী দাম্পত্য খুব
সুখের হয়? মানে ছেলের বয়স মেয়ের চেয়ে অনেক বেশি বা মেয়ের বয়স
ছেলের চেয়ে অনেক বেশি। তাতে নাকি ছোটর প্রতি বড়ব স্নেহ আর বড়র
প্রতি ছোটর শ্রদ্ধা একত্ব হয়?

—মৌমিতা চক্রবর্তী, পলাশি, নদীয়া

পুরুষ মহল

‘গাঁক্ গাঁক্’ বিভাগ

সামলাচ্ছেন : উন্মাদন দলপতি

● আমার হবু প্রেমিকাকে কবিতা লিখেছি—“তোমার দুয়ারে ফিরি শূন্য ভিক্ষাপাত্র হাতে।” সে নিশ্চয় খালি হাতে ফিরিয়ে দেবে না।

—মণিময় খাঁড়া, ঘটকপুকুর, দঃ ২৪

পরগণা।

□ কখনোই না। একটা সিকি অস্ত্রত দেবেই।

● আমি অল্পেতেই প্রেমে পড়ে যাই। কী করি বলুন তো?

—অভিজিৎ দাশগুপ্ত, যোধপুর পার্ক, কলকাতা

□ প্রেমের ফ্রেমে একটা লোহার গিল লাগিয়ে নিন।

● আমার প্রেমিকার কুমারীত্ব নিয়ে আমার সন্দেহ জাগছে। কী করলে সন্দেহমুক্ত হতে পারি?

—হাজারিলাল হালদার, বারুইপুর, দঃ ২৪ পরগণা

□ নিজের কুমারত্ব ঘোচানো ছাড়া আর তো উপায়ই দেখছি না।

● আমার স্ত্রী অল্পেতেই আমার ওপর কিল-চড়-লাথি চালায়। বয়স অনেক হল। কবে আর তার এ বদভ্যাস যাবে?

—মনোময় চক্রবর্তী, বেলগাছিয়া, কলকাতা-৪১

□ বিধবা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অশরীরীকে কেউই কিল-চড় মারতে সাহস করে না।

● বার্নার্ড শ বলেছিলেন, Oh! How silly the law is! Why I can't marry them both? —আমার জীবনে এমন একটা অবস্থা এসেছে। কী পরামর্শ দেন—দু'জনকেই তবে.....

—সৈকত সাহা রায়, ইছাপুর, উঃ ২৪ পরগণা

□ দুই সতীনের ঘর? খোদায় রক্ষে কর।

● সব মেয়েই আমার নাম নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করে। হৃদয় নামটা কি খুবই খারাপ?

—হৃদয় বেরা, বরাসত, উঃ ২৪ পরগণা

□ না না, খারাপ হতে যাবে কেন, আসলে হৃদয়-বিদারক।

● একালের মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করতে মন চায় না। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের নায়িকারা কত সুন্দর ছিল। তারা কি আর আছে এ যুগে?

—অলোকনাথ ভট্টাচার্য, রহড়া, উঃ ২৪ পরগণা



□ আছে কেউ কেউ। কেউ ৮৫ কেউ বা ৯৭। ঠিকানা দরকার?

● আমার মুখে বসন্তের দাগ। সেজন্যে সাহস করে কোনো মেয়েকেই প্রেম নিবেদন করতে পারি না।

—অমল চক্রবর্তী, বেলেঘাটা, কলকাতা

□ আরে মশাই, শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা—সবসময়েই তো আপনি বসন্তের বার্ভা বহন করছেন। আপনার কিসের চিন্তা।

● প্রেম করে নিয়ে করেছিলাম। তবু অন্য একটি মেয়ের প্রেমে পড়ে তার সঙ্গে গোপনে Live together করছি। বউ যেদিন জানতে পারবে, কী করব?

—নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, কলকাতা-২৯

□ তৎক্ষণাৎ Leave together, একেবারে তল্লাট ছেড়ে। তবে অর্ধাঙ্গিনী তো! তাঁর হকের অর্ধাঙ্গ (আপনার) নোড়ায় খেঁতো

না করা পর্যন্ত তিনি কি আর ধামবেন!

● আমার স্ত্রী অত্যন্ত দজ্জাল। তার ফাই-ফরমশ খাটতে খাটতে জান কয়লা হয়ে গেল। গাঁটে গাঁটে বাঁধা। ব্যাখাটা নিরাময়ের একটা উপায় বাতলে দেবেন?

—সোলেমান হালদার, মুর্শিদাবাদ

□ যখন তেনার হাতের কাছে চ্যালাকাঠ মজুত থাকবে, তখনই পায়ে পা বাধিয়ে ঝগড়া লাগিয়ে দিন।

● মেয়েরা এত টক খেতে ভালোবাসে কেন?

—ঋতুপর্ণ দাশ, কোমগর, হুগলী

□ নো-Talk মেয়েদের কেই বা পছন্দ করে?

● পুণ্য করলে ভগবানকে পাওয়া যায়। আসলে ভগবান নয়, আমার দরকার বিশেষ একজনকে। সে অন্য একটি ছেলের সঙ্গে প্রেম করে। আচ্ছা, আমি যদি পুণ্য করি, এবং ভগবান হাজির হন, তিনি নিশ্চয় পরামর্শ দিতে পারবেন—কী করলে মেয়েটির মন পাব?

—জাপস বৈদ্য, বর্ধমান

□ চেষ্টা করে দেখতে পারেন। তবে মেয়েদের মন তো, ভগবানও বিশেষ কিছু টিপস দিতে পারবেন বলে মনে হয় না।

তরুণ

কি.
চি.
ব.
কি.
কি.

(পূর্ব প্রকাশিত-র পর)

বাল্মীকি এতক্ষণ হাঁ করে নারদের ভাষণ শুনছিলেন। কথাগুলো তাঁর এতই ভালো লাগছিল যে কাকের ডাকে ঘুরে যাওয়া ঘিলুটা আবার আস্তে আস্তে তার জায়গামতো সেঁটে বসে যাচ্ছিল। সেঁটে বসে যাওয়া ঘিলুর কল্যাণে বাল্মীকি বুঝে গেল নারদের উপদেশটা বেশ কাজের। প্রথম জীবনে এই ব্রহ্মা আর নারদের উপদেশ মতো কাজ করে একটা মহৎ বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছিলেন। এখন এঁদের উপদেশ মতো কাজ করলে কি জানি কোনো এক মহন্তর সিদ্ধি হতে পারে। বাপু রে! সে কি দৃশ্য! পাড়ার ছেলেরা ধুমধাম করে জন্মদিন পালন করছে। গণ্যমান্য ব্যক্তির তর নামে গুণগান করে ভাষণ দিচ্ছে, ছবিতে মালা পরাচ্ছে, চাই কি কোথাও রাস্তার মোড়ে একটা পাথরের মূর্তিও তৈরি হয়ে যেতে পারে।

যদিও মূর্তি তৈরি হলে তাতে সারা বছর ধরে কাকে চুনকাম করবে। (এই রে! আবার কাকা!) তবু তো অন্তত বছরে একটা দিন সেটা পরিষ্কার করে মালা-টালা পরানো হবে। সেটাই বা কম কি। উঃ! এসব কথা ভাবতেও গায়ে শিহরণ বয়ে যায়। যদিও এই সমস্ত কিছু হবে মরার পর, তবু নিজের চোখে দেখি আর না দেখি নামটা তো থাকবে। নারদের কথামতো কাজ করতে বাল্মীকি এক কথায় রাজি।

এরপর বাল্মীকি জীবনে যেটা 'কোনোদিন করেননি সেটাই করে বসলেন। বসলেন বলাটা অবশ্য ঠিক হল না। উনি এতক্ষণ বসেই ছিলেন। উত্তেজনার ঠালায় সেই অবস্থা থেকে ব্রহ্মা আর নারদের পা বরাবর সটান উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লেন। বসলেন—হ্যাঁ স্যার, আপনারা যা বলছেন আমি সেটাই করব। আমার এই আধুনিক খাবিতা দিয়ে আমি একটা চাউস বই লিখব।

এরপরই বাল্মীকি আবার একটু চিন্তায় পড়ে গেলেন—কিন্তু বইটা কী নিয়ে লেখা হবে, কে নায়িকা হবে? মানে আর কি, লেখার বিষয়বস্তু কী হবে? কে নায়ক হবে, কে নায়িকা হবে? আবার ভিলেনই বা কে হবে? এসব কথাগুলো তো লেখা আরম্ভ করার আগেই ভেবে নিতে হবে। বাল্মীকি সেই ভাবার কথাটা ভাবতে গিয়ে একটু ধমকে গেলেন।

নারদ বুঝে গেলেন, এই তো, এসে গেছে মোক্ষম সুযোগ। এখন বাল্মীকির সামনে বামের কথাটা বেশ যুৎসই করে পাড়তে পারলেই হয়। তাহলেই কার্যসিদ্ধি। তিনি মনে মনে একবার লক্ষ্মী-নারায়ণকে স্মরণ করে নিলেন। ভাবাবেগের ঠালায় একটু কঁপেও গেলেন। রামের জীবনী বলে কথা। শুধু ভাবনা দিয়েই সবকিছু হবে না। সঙ্গে যথেষ্ট ভাবাবেগও থাকতে হবে। ভাবাবেগের ঘোরে ঘুরতে ঘুরতেই নারদ বাল্মীকিকে রামকথা বলার জন্যে তৈরি হয়ে নিলেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্য। নারদের ওই তৈরি হওয়াটা তৈরি হওয়া অবস্থাতেই থেকে গেল। তাঁকে আর মুখ খুলতে হল না। তার আগেই বাল্মীকি আনন্দে লাফ দিয়ে উঠলেন—পেয়েছি।

—কী পেয়েছ?

—কাক। হ্যাঁ কাক। কাকের চিংকারের ঠালাতেই আমার নাকমুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে এই অতি আধুনিক খাবিতা। তাই কাকের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে আমি কাককে নিয়েই লিখব একটা মহাকাব্য। সেই বইটার নাম দেব কাকায়ণ। ঠিক রামায়ণের মতো।

বাল্মীকির এরকম একটা বদখৎ মতলবের

কথা শুনে নারদেব চোখ গোল হয়ে গেল। হাত তুলে তাকে বাধা দিয়ে কিছু একটা বলতে গেলেন। কিন্তু বাল্মীকিকে ততক্ষণে খাবিতায় পেয়ে বসেছে। অতি আধুনিক খাবিতার প্রেরণা বলে কথা। থামানোই দুঃসাধ্য। নারদের হাত-টাতে তোলাকে পাক্সা না দিয়ে বাল্মীকি নিজেই ঝরঝর করে বলতে শুরু করে দিলেন—

'লেখা আবস্ত কবব কাকের জন্ম থেকে। জন্ম অবশ্য দু'বাব। একবার মায়ের পেট থেকে ডিম হয়ে বেরনো আর একবার ডিম থেকে কাক হয়ে বেরনো। কী অদ্ভুত তার জন্ম রহস্য। পৃথিবীর সব প্রাণীরই জন্ম হয় মায়ের পেট থেকে। কিন্তু কাকের জন্ম হয় কাকীর পেট থেকে। কাকীর পেটে না জন্মে তারা কবেই বা কি? পৃথিবীর তাবৎ মেয়ে-কাকেরাই যে কাকী। তবু তো তারা বালিকা পাচিকা যাচিকা মালিকা প্রেমিকা—এই সমস্ত মহাশয়াদের দেখাদেখি কাকা হয়ে যায়নি। তাহলে তো কেলেকারি হয়ে যেত। কাকীর পেটে জন্মানো যাও বা মেনে নেওয়া যায় কিন্তু কাকার পেটে জন্মানো। অসম্ভব। কাকাকে পুং লিঙ্গ বানিয়ে ভগবান নিজেই সে রাস্তা মেরে বেখে দিয়েছেন।

তা সে যাই হোক। কাকীর পেট থেকে যেটি জন্মাল সেটি হল ডিম। আর ডিম ফুটে একটা কাক জন্মাল সেটা কোকিল হতে হতে বেঁচে গেল। কাকীর বাসায় ডিমটা বদল করার জন্যে কোকিলা বাহিনী তো তৈরি হয়েছে। কোকিলা বাহিনীর আক্রমণের সেই মহা বিপর্যয় কাটিয়েই কাককে কাক হয়ে জন্মাতে হয়।

তারপর সেই কাকের বড় হয়ে ওঠা। বালা কৈশোর পার হয়ে যৌবনে এসে ঋষি ড্যাঙ্গেটাইন দিবসে তার প্রেম আর বিয়ে। কাকের দেখাদেখি মানুষের মধ্যেও হাজার হাজার বিয়ে না হওয়া প্রেমিক-প্রেমিকা ওই দিনটিকেই বেছে নিয়েছে। নিজেদের প্রেমদিবস হিসেবে। সেই প্রেম দিবসের উত্তেজিত কাজকর্ম অবধারিত ফলটি তার অস্তিত্ব জানান দিয়ে দেয় একমাস পরেই। মানুষের বেলা ওই দিনটির দশ মাস পরে দেশে অবৈধ জনসংখ্যা হঠাৎ কতটা বেড়ে যায় তার কোনো পরিসংখ্যান নেবার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি—বাড়ি বাড়ি গিয়ে খোঁজ-খবর নিতে গেলে প্যাঁদানি খেতে হবে, সেই ভয়েই অবশ্য। তবে একটা নির্দিষ্ট সময় পার করে কাকের ডিম সংখ্যা যে বেড়ে যায় সেটা নির্যাস সত্যি। আব পরিসংখ্যান মতে সেটা সত্যি হোক ছাই না হোক। আমার জোরালো কাব্যিক ভাষায় তার এমন বর্ণনা দেব যে লোকে বিশ্বাস না করে পারবে না। কাব্যের ভাষা



পরিসংখ্যান ভাষার চেয়ে সবসময়েই জোরালো।

কাক হল মানুষের সবচেয়ে নিকট প্রতিবেশী। আজ বলে আজ নয়, সেই আদি যুগ থেকে। তখন কাকের গায়ের রং ছিল সাদা। তখন কাককে বলা হত সঞ্চান পক্ষী। পরে দেবদূতের অভিলাষে তার গায়ের রং কালো হয়ে যাওয়াতেই নামটাও বদলে হয়ে গেল কাক। সঞ্চান পক্ষীকে সেযুগে সবাই বেশ সমীহ করে চলত। কথিত আছে, রাজা দশরথের পুত্রোপস্থি যজ্ঞে আমন্ত্রিত হয়ে ঋষি বিশ্বামিত্র নিজে উপস্থিত হতে না পেয়ে তাঁর স্ত্রী নিকষাকে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু নিকষা যেহেতু জাতিতে রাক্ষসী ছিলেন তাই নিজের রূপে না গিয়ে তিনি সঞ্চান পক্ষীর রূপ ধরেই দশরথের যজ্ঞস্থলে গেছিলেন, এবং যথেষ্ট সম্মান পেয়েছিলেন।

সঞ্চান পক্ষীরা মানুষের প্রতি মমত্ব বশতই নিজেদের বিভিন্ন রকম ডাকের মাধ্যমে তাদের ভবিষ্যতের কথা জানিয়ে দিত। পুরাকালে ঔর্ক

মুনি তিনটে সঞ্চান পক্ষীকে একসঙ্গে ডাকতে শুনে বুঝতে পেরেছিলেন যে পৃথিবীপতি সগরের জন্মকাল আসন্ন। ঔর্ক মুনি তাঁর তপঃ প্রভাবে সগরের মাকে তালজঙ্ঘা নামের অসুরের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে সগরের জন্মকে নির্বিন্দু করেছিলেন।

শুধু কি তাই? একালের কাকেরাও তাদের নানারকম ডাকের মাধ্যমে মানুষকে তার ভবিষ্যতের কথা বলে দেয়। শুধু ডাকই নয়, কাক তার বিচিত্র রকমের কাজকর্ম দিয়ে মানুষের অনেক উপকাব করে। এমনকি কাকের পালক ছাৎপিণ্ড হাড় রক্ত—এই সমস্ত দিয়ে নানা তান্ত্রিক ক্রিয়াকাণ্ড করেও মানুষের অনেক উপকার করা যায়। কী কী করা যায় সে সব অবশ্য আমি নিজেও বিশেষ জানি না। তবে চিন্তা নেই। কাক চরিত্রের বইয়ে এসব কথা পাঁচ কাহন করে লেখা আছে। আমি সেখান থেকে টুকলি করে আমার বইয়ে ঢুকিয়ে

দেব। তাতে আমার বইটা আরো টাউস হয়ে যাবে।

রামস্য চরিতং কৃষ্ণং কুরু ভূম্বিসম্ভব।
ধর্মাত্মনো গুণবতো লোকে রামস্য
ধীমতঃ॥

—বান্দীকি।

যেই রাম নাম হৈতে হইলা পবিত্র।
সেই গ্রন্থ রচ গিয়া রামের চরিত্র॥

—কাশীরাম।

এক নাগাড়ে অনেকক্ষণ ভাষণ দিয়ে হেদিয়ে পড়ে বান্দীকি দম নেবার জন্যে একটু ধামলেন আর এতক্ষণ চোখ গোল গোল করে শুনতে থাকা নারদ সুযোগটা চট করে ধবে নিলেন। যতই হোক নারদ তো নারদই। তাবৎ বিশ্বরক্ষাও শুধু চরেই বেড়াচ্ছেন না, চরিয়েও বেড়াচ্ছেন। তিনি কিনা তমসা নদীর ধারে এসে এক ভেক বদলানো

বাঙালি নকশালের কাছে হেরে যাবেন? তাই কি কখনো হয়।

নারদ বলতে শুরু করে দিলেন— দেখ বাপু বাম্মীকি, ওসব বুদ্ধি ছাড়া। কাক নিয়ে তোমার ওই কাকায়ণ লিখলে লেখাটাই সার হবে। কেউ পড়বে না। লোকে ভাববে কাকায়ণ নিয়ে লেখাই যদি পড়তে হয় তো কাকচরিত্রই পড়বে। কাকায়ণ পড়তে যাব কেন? তার চাইতে আমি বলি কি তুমি রামকে নিয়ে এক রামজীবনী লেখ। তাতে বইটাও এমনিতেই টাউন হয়ে যাবে আর লোকে পড়বেও। হিন্দুস্তানেও যে যত বড় পাখওই হোক রামজীবনীকে সহজে অবহেলা করতে পারবে না।

এই পর্যন্ত বলার পর নারদের খেয়াল হল, বাম্মীকি এইমাত্র কাক নিয়ে একটা মস্ত ভাষণ দিয়েছে। এখন ওকে কাৎ করতে হলে রাম নিয়ে আরো মস্ত একটা ভাষণ ঝাড়তে হবে। যেমনি ভাবা অমনি কাজ। নারদ মনে মনে লক্ষ্মী-নারায়ণকে স্মরণ করে কোমর বেঁধে লেগে পড়লেন।

দেখ বাপু বাম্মীকি, রামকে তুমি একটা যাই তাই মনে কোরোনা। এই তামাম হিন্দুস্তানটাই হল রামের দেশ। ভারত ভারতবর্ষ আর্ষাবর্ত জম্বুদ্বীপ হিন্দুস্তান ইণ্ডিয়া পুণ্যভূমি, যে নামেই ডাকা হোক না কেন আসল কথাটা হল এই যে দেশটা রামের দেশ। দেশটার নামের মধ্যে কোথাও রাম নেই

কাকের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে আমি কাককে নিয়েই লিখব একটা মহাকাব্য। সেই বইটার নাম দেব কাকায়ণ। ঠিক রামায়ণের মতো।

কিন্তু বাকি সর্বত্রই রাম। আকাশে রাম, ইয়া মস্ত এক রামধনু। বাতাসে রাম—Rum-এর বোতল খুললেই ভুর ভুর করে গন্ধ ছড়ায়। উত্তরে রাম—কারাকোরাম। দক্ষিণে রাম—সেতুবন্ধ করে রামেশ্বরম্। পূবে রাম—মিজোরাম। পশ্চিমে এক রামের বদলে অনেকগুলো রান,—ইরান, তেহরান, কস্কেহর রান, পোখরান এই সমস্ত। মানুষের চিত্তায় রাম, ভূতের ভয় পেলেই—রাম রাম। কথায় রাম—রাম কহো ভাইয়া। গণনা শুরু রাম দিয়ে। রাম দুই সাড়ে তিন, অমাবস্যা যোড়ার ডিম। পেলায় জিনিস বোঝাতে রাম—রামদা। অপকর্ম ঢাকার জন্যে রাম।—ওহে গয়লা ভায়া দুখে জল দাওনি তো?—আরে রাম রাম। কেছ গাইতে রাম।—ও দিদি গুনছি, ও বাড়ির ছেলেটার সঙ্গে সে বাড়ির মেয়েটা—। আরে ছ্যা ছ্যা রাম রাম। ঘরে ঘরে পুটিরাম মুটিরাম দুখীরাম সুখবাসের ছড়াছড়ি। আনন্দে রাম—জয় রাম। দুঃখে রাম—হায় রাম। জীবনে রাম—রামজীকি কৃপা। মরণে রাম—রাম নাম সং হয়। এ সং সে সং নয়। ওঁ তৎসতের সং।

শুধু মরা মানুষকে কাঁধে করে শ্মশানে নিয়ে যাবার সময় তাকে ওইরকম রামনাম শোনানোই নয়, না মরা মানুষকেও রাম নামেই সম্বোধন। নরম সম্বোধন—জয় সীয়ারাম, গরম সম্বোধন—ব্যাটা রামপাঁঠা।

ভারতের একশ পার হওয়া কোটি অধিবাসীর মধ্যে জীবনে কোনো না কোনো সময় বন্ধুর মধুর সম্বোধন ‘রামপাঁঠা’ ডাকে আপ্যায়িত হয়নি এমন লোকের সংখ্যা দশ আঙুলের চম্বিশটি গাঁটেই এঁটে যাবে। তবে রামপাঁঠা ডাক শুনে যাদের বদন বিগড়ে যায় তাদের দুঃখ লাঘবের জন্যে বলে দিই, রামপাঁঠা কথাটা গালি হিসেবে চালু থাকলেও আসলে কোনো গালি নয়। এটি শুদ্ধ সংস্কৃতের একটি বিশুদ্ধ দেহাতি সংস্করণ। কথাটা আমি এই মুহূর্তে

তোমার কাছে প্রমাণ করে দিচ্ছি। তুমিও তোমার বইয়ের মধ্যে এটা লিখে ভারতের তাবৎ রামপাঁঠার জ্ঞানচক্ষু খুলে দিও।

সংস্কৃতে খুব জোর দিয়ে শেখানো হয়—অজরামরবৎ প্রাজ্ঞ বিদ্যামর্থধর্ষচিন্তয়েৎ। কথাটার যে যাই অর্থ করুক আসলে শুদ্ধ ভাবে উচ্চারণ করলে কথাটা দাঁড়াবে—আজ রাম রোবট প্রাজ্ঞ বিদ্যা অর্থ চর্চিন্ত তয়েৎ। এর অর্থ কী হল? আজ অর্থার্থ পাঠা এবং বাম এরা দু’জনেই রোবটের মতো প্রাজ্ঞ। রোবট যেমন সবকিছুই জানে সবকিছুই করতে পারে তেমনি পাঠা এবং রাম উভয়েই অতি প্রাজ্ঞ। ওরা সবকিছু জানে সবকিছুই করতে পারে।

রাম বেঁচে নেই। কী করতে পারত বা না পারত তার কোনো চাক্ষুষ প্রমাণ এখন আর পাওয়া সম্ভব নয়। বাম্মীকি যেটুকু লিখে গেছে আর সেইটে কচলে কচলে গায়ের রামযাত্রা থেকে টিডি পর্যন্ত যতটুকু দেখায় ততটুকুই আমাদের সম্বল। তবে পাঠা আমরা হরবৎ চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। আমাদের অভিজ্ঞতায় বলে যে পাঠায় খায় না এমন জিনিস নেই। বেদ বাইবেল কোরান—যা সামনে ধরে দেবে তাই শেষ করে দেবে। তাহলেই বুঝে দেখ বেদ বাইবেল কোরান হজম করে ফেলা একটা পাঠা কত বড় প্রাজ্ঞ হতে পারে! একেবারে রামের মতোই।

বাম এবং পাঠা, এরা অত্যন্ত প্রাজ্ঞ বলেই এদের সম্বন্ধে বলা হয় এরা বিদ্যা এবং অর্থ দুটোকেই চর্চিন্ত তয়েৎ অর্থ চিনে ফেলেছে এবং তৎক্ষণাৎ চিবিয়ে শেষ করে ফেলেছে। চিবানো কথাটা অবশ্যই রামের বেলা ভাবার্থে এবং পাঠার বেলা বাগার্থে। যদিও কেউ কোনোদিন পরীক্ষা করে দেখেছে কিনা জানি না তবে তুমি নিশ্চিত থাকতে পারো যে একটা কড়কড়ে পাঁচশো টাকার নোট পাঠার সামনে ধরে দিলে সে সেটা মুহূর্তেই চিবিয়ে শেষ করে দেবে। এটা হল অর্থ চিবানোর কথা। আর বিদ্যা চিবানোর কথা তো আগেই বলেছি। বেদ বাইবেল কোরানের চেয়ে বড় বিদ্যা আর কোথায় আছে? তার মানে হল বিদ্যা এবং অর্থ কোনোটিই চিবিয়ে খেতে পাঠারা পেছপা নয়।

রাম এবং পাঠা এই দুই প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্বকে এক সারিতে বসিয়ে একসঙ্গে জুড়েই বলা হয় রামপাঁঠা। প্রাজ্ঞ ব্যক্তির অপর নাম রামপাঁঠা। হিন্দুস্তানে রামপাঁঠারই মেজরিটি।

স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রী মোগান তুলেছিলেন—আরাম হারাম হ্যায়। অর্থার্থ আ-রামও যা হা-রামও তাই। রামকে ডাকতে যে কোনো একটা ব্যবহার করতে পারো।

গান্ধীজিকে যে লোকটা গুলি করেছিল তার নাম নাথুরাম বিনায়ক গডসে। অর্থার্থ সে শুধু রামই নয় সে গডও। লোকটা গুলি করার সময় বলেছিল—জয় শ্রীরাম। গান্ধীজি গুলি খেয়ে মাটিতে শূটিয়ে পড়ার সময় বললেন— হে রাম। গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষে ভোট জিতে লোকসভা বিধান সভার সদস্য হতে পারলেই নেতারা আযারাম গয়বাম হয়ে যায়। একদল লোক নেচে নেচে দু’হাত তুলে গান গায়—হবে রাম হবে রাম রাম রাম হবে হবে। অর্থার্থ রাম তাদের সন্ধিছু হরণ করে নিয়ে চলে যাচ্ছে, ধরো ধরো। তারপরে সব জালা-সম্রাণা শূটিয়ে খাটিয়ায় শুয়ে অস্তিম যাত্রার পথে শ্মশান বন্ধুদের মুখে গুনতে গুনতে চলো রাম নাম সং হ্যায়। আহা—সারা ভারত জুড়ে রামের কী রমরমা। রামরামাও বলা যায়।

বামের মহিমা এখানেই শেষ নয়। সেই কোন বহুদূরে পৃথিবীর উল্টো পিঠের ইংরেজরাও এসেছে এসে রামের নামে এতটাই অভিভূত হয়ে পড়েছিল যে তাদের ভাষায় হ্যারাম স্কারাম (Harum Scarum) বলে একটা কথা চুকিয়ে নিয়েছে। যদিও কথাটার অর্থটা খুব একটা সম্মানজনক নয়, বেশরোয়া লোককে বোঝাতেই তারা ওই কথাটা ব্যবহার করে, তবু

শেখরপীয়ারের দেশের ভাষায় ঢুকে পড়াটা রামের পক্ষে কম কৃতিত্বের কথা নয়।

ব্রহ্মা এতক্ষণ পাশে দাঁড়িয়ে বান্দীকির মতোই নারদের ভাষণ শুনছিলেন। শুনতে শুনতে তাঁরও মৈথ্যচ্যুতি ঘটে গেল, মাথাটা বিম্বিম্ব করে উঠল। তিনি হাত তুলে নারদকে বললেন—আরে নারদ থামো থামো, অনেক হয়েছে। তোমার এত কথা শোনার পর বান্দীকি নিশ্চয় মনে মনে রাজি হয়ে গেছে। কিন্তু তোমার ভাষণ যদি চালিয়ে যাও তবে তো লোকটার মাথাই খারাপ হয়ে বাবে।

বান্দীকির অবশ্য মাথা-টাথা খারাপ হবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। জ্ঞাতে বাজালি তো! কাকের ডাক সহ্য করতে পারে না, ভূত-ভূত দেখে ভয় পায় ঠিকই, কিন্তু ভাষণ শুনে এতটুকু টসকায় না, তা সে যত লম্বা ভাষণই হোক।

মুচকি হেসে বান্দীকি বললেন—আপনি তো বললেন ভালোই। সবই বুঝলাম। কিন্তু রামজীবনী নিয়ে একটা বই তো আগে থেকেই আছে। আমি আবার সেইসব একই কথা লিখলে আমার লেখা লোকে পড়বে কেন?

নারদ বললেন—আরে না না। এ রাম সে রাম নয়। সেটা ছিল ব্রোতা যুগের সত্যবাদী রাম আর এটা হবে একেবারে খাস কলি যুগের সাহেব রাম। সে যুগের রামজীবনীর সঙ্গে তোমার লেখার কোনো মিল থাকবে না। সত্যি বলতে কি তোমার লেখাটা হবে সেই লেখাটার ছব্বহ উল্টো। তাই তোমার বইটার নাম রামায়ণ হবে না, হবে মারায়ণ। যাকে বলে একেবারে মার মার কাট্ কাট্ ব্যাপার।

—অ্যাঁই দেখুন, আপনার ওই মার মার কাট্কাট্ শুনে মনে পড়ে গেল আর একটা কথা। আর সেটা খুবই সর্বনেশে ব্যাপার। রামের জন্মস্থান কোথায় হবে? আপনি তো জানেন রামের জন্মস্থান নিয়ে সারা হিন্দুস্তান জুড়ে এক মহা মার মার কাট্ কাট্ চলছে। কত মানুষ খুন হল, কত আগুন জ্বলল, কত গুলি বোমা বন্দুক—ওরে বাবা আমি ওর মধ্যে নেই।

অভয় দেবার ভঙ্গিতে হাত তুলে নারদ বললেন—না না সে ভয় তোমাকে করতে হবে না। এক নম্বর তো, এ যুগের সাহেব মার্কী রামের জন্মভিটে নিয়ে কেউ ঝগড়া কাজিয়া করতে যাবে না। করতে যাবেই বা কেন? ওতে ফয়দা তো কিছু নেই। এ যুগে শুধু তাদেরই জন্মস্থান নিয়ে কাজিয়া হয় যারা বাবা হয়ে যায়। একদল বলে বাবার জন্ম আমাদের এখানে অন্যদল বলে আমাদের এখানে। যদিও সেই দু'তিনশ বছর আগে বাবা ঠিক কোথায় জন্মেছিল তা কেউই কিছু জানে না। নিজের ঠাকুরদার জন্মস্থানেরই খোঁজ রাখা না তো বাবার জন্মস্থান। কিন্তু দু'দলই কোমর বেঁধে লেগে পড়ে লোক টানতে, যাতে তাদের মন্দিরেই বেশি করে প্রণামী পড়ে। খবরের কাগজে মস্ত মস্ত বিজ্ঞাপন দেয়, রাস্তার মোড়ে মোড়ে টাউস টাউস হোর্ডিং লাগায়। তাতে বাবার বয়ানে লেখা থাকে—রণে-বনে-জলে-জঙ্গলে যখনই বিপদে পড়বে আমাকে স্মরণ করবে। আমি তোমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিব। এমনকি বিভিন্ন জায়গা থেকে বাবার জন্মস্থানে যাবার জন্যে বিশেষ বাসেরও ব্যবস্থা করা হয়। এতসব বিজ্ঞাপন আর প্রচারের চটকে পড়ে লোকেরা পড়িমরি করে দৌড় লাগায় ওইসব জন্মভিটে দেখতে যাবার জন্য। এই সব সৌড়ের পেছনে যত না পুণ্য লাভের আকাঙ্ক্ষা তার চেয়ে অনেক বেশি হল বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার আশা। বাবা বলছে বিপদ থেকে উদ্ধার করে দেবে ব্যাস! ভক্তের বান এখন ঠেকায় কে? আর যত বেশি ভক্তের ভীড় ততই প্রণামী। জয় বাবা।

আবার কোথাও তো জল এতদূর গড়ায় যে বাবা মরে গেলেও প্রণামী বন্ধ হয়ে যাবার ভয়ে চালাচালি প্রচার করে দেয় যে বাবার সমাধি হয়েছে,

উনি আবার জেগে উঠবেন। মরা বাবার পা খোঁওয়া জল খেয়ে ভক্তদের পেট খারাপ বমি পায়খানা এমনকি কলেরা পর্যন্ত হয়ে গেলেও ভক্তির কোনো খামতি হয় না। এসব নিয়ে অনেক কেচ্ছা-কেলেঙ্কারি হয়ে যাবার পর শেষ পর্যন্ত পুলিশ লাগিয়ে বাবার মৃতদেহ সংস্কার করতে হয়। এ সমস্তই হল বাবাদের ব্যাপার। তোমার কোনো ভয় নেই। রামের বেলা এসব কিছুই হবে না।

আর দু'নম্বর কথা হল তুমি তোমার বইতে রামের জন্মস্থান বলে এমন একটা জায়গায় নাম লিখবে যে জায়গাটা ভারতবর্ষে কোনোদিন ছিল না থাকবেও না। লোকে ম্যাপ খুঁজতে খুঁজতে হত্ন হয়ে যাবে কিন্তু ওই যে যাকে বলে—এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না। তুমি, সকল সুখের খনি সে যে রামের জন্মভূমি।

নারদের কথায় সারবত্তা আছে। বান্দীকিকে মানতেই হল, কিন্তু মনের খটকা যাই যাই করেও যেতে চায় না।—কিন্তু আমি যে আধুনিক খবিতায় রামজীবনী লিখব সেটা পড়ে তো কেউ কিছু বুঝতে পারবে না। সে বই বিক্রি হবে কেমন করে?

নারদ বললেন—সে ব্যবস্থা আমি করে দেবখন। তুমি তোমার রামজীবনী ওই খবিতা দিয়েই লেখো। তারপর একটা লোক জোগাড় করে দেব, যে তোমার বইটা সর্বসাধারণের বোধগম্য ভাষায় অনুবাদ করে দেবে।

আবার খটকা—কিন্তু তাহলে তো সেই অনুবাদকের নামটাই সবাই জানবে। আমার নামটা চাউর হবে কী করে?

—ভয় নেই। আমি যাকে জোগাড় করে দেব সেটি হবে এক অলস কুঁড়ে অকর্মণ্য বোকা এবং বেকার। এক কথায় বাজালি। লোকটা সারাদিন বসে বসে মশা আর মাছি মারে। তোমার বইটা অনুবাদ করতে সে রাজি হয়ে যাবে। কাজটা অন্তত মশা-মাছি মারার চাইতে তো ভালো। এরকম একটা কাজ করে লোকটা নিজের নামের কথাটা ভাববে না। তাই তার নামটা থাকবে না। বইটা তোমার নামেই চলবে।

এরপর বান্দীকির আর বলার কী থাকতে পারে। তিনি সানন্দে রাজি হয়ে গেলেন। একেবারে হাসতে হাসতে না হলেও কাশতে কাশতে সম্মতি দিলেন।

বান্দীকির সম্মতি পেয়ে নারদের মুখে হাসি আর ধরে না। বান্দী-নারায়ণ তাঁকে যে কাজের ভার দিয়েছিলেন তাতে তিনি একশ ভাগ সিদ্ধ। এখন ক্ষীরোদ সমুদ্রে ফিরে গিয়ে ওঁদেরকে খবরটা দিলেই হয়। আর তর সয় না। ব্রহ্মাকে চোখের ইঙ্গিত করে দৌড় দিলেন তপোবনের বাইরে গুলঞ্চ ঝোপের বেড়ার ধারে যেখানে নিজের টেকিটি লুকিয়ে রেখে এসেছিলেন সেই দিকে।

ব্রহ্মা নারদের পিছে পিছে দৌড়ে যতক্ষণে টেকির কাছে গিয়ে পৌঁছেছেন ততক্ষণে নারদ কিক্ মেরে স্টার্ট দিয়ে দিয়েছেন। উত্তেজনার ঠাণ্ডায় তিনি খেয়ালই করলেন না, ব্রহ্মা তাঁর পেছনে উঠে বসতে পেরেছেন কিনা। এক নিমেষের মধ্যে টেকি ভূ-ম্-ম্ করে আলোর গতিতে উধাও। ব্রহ্মা তখনো এক পা তোলা অবস্থায় বান্দীকির তপোবনের গুলঞ্চ বেড়ার ধারে দাঁড়িয়েই আছেন।

আমাদের আধুনিক বামায়ণ রচনার প্রথম খেসারৎ হয়েছিল একটা কাক। আর দ্বিতীয় খেসারৎ হলেন ব্রহ্মা। জানি না এই বইটা শেষ করতে আরো এরকম কত খেসারৎ দিতে হবে। ব্রহ্মাকে অবশ্য কাকের মতো প্রাণ দিতে হয়নি। নারদ তাঁকে পৃথিবীতে রেখে চলে যাবার পর উনি মনে মনে ওঁর মনোরথকে স্মরণ করলেন। সঙ্গে সঙ্গেই মনোরথ এসে পৌঁছে গেল আর উনিও তাতে চেপে নির্বিঘ্নে ব্রহ্মালোকে পৌঁছে গেলেন। অসুবিধে তেমন কিছু হল না। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা একটা বৈজ্ঞানিক তথ্য বটে।

(ক্রমশ)

পরদেশজাতা নেত্রীসমন্বিত বিরোধীদলকে দেশের সংস্কৃতির ধারক ও বাহকেরা যত পারেন দোষারোপ করে চলেন, যাঁরা নিজেরা, দেশের সংস্কৃত ভাষা ও ইতিহাস কতটা জানেন, তাতে সন্দেহ আছে। যারা অন্ধ তারা আজ.....

নিরাপদ মাতা-পুত্র

বুলু মুখোপাধ্যায়



চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা, যদি না পড় ধরা। চুরি ধরা না পড়লে সে চুরি চুরিই নয়, বিদ্যা। তখন আমরা কে চোব, কে বা তার মা, খুঁজেই পাব না। খবাই তো পড়েনি। যারা আইন এবং মামলা-মোকদ্দমার সঙ্গে যুক্ত তারা সবাই জানে কেমন করে সন্দেহের ফাঁক গলে প্রমাণের অভাবে বাঘা বাঘা চোরেরা বড় বড় পুকুর-চুরির অভিযোগের নিরোট দেখাল ফাঁক করে পালিয়ে যায়। থুড়ি, পালিয়ে যান। কেন না তাঁরা তখন চোর প্রমাণিত হন না, তাঁরা হন ভদ্রলোক। আর ভদ্রলোকদের তুই-তোকাকরি করলে মানহানির মোকদ্দমা হুঁকে তো দেবনই তাঁরা।

যাক সে কথা। মনে পড়ছে একটি বিখ্যাত ইংরেজি প্রবন্ধ।

Those who live in glass houses ought

ought to throw stones!

কাচের প্রাসাদ ভঙ্গুর। তাই নিজের কাচের তৈরি ভঙ্গুর বাসগৃহকে সুরক্ষিত রাখার উপায় হল ঢিল-পাটকেল না ছোঁড়া। তাহলে তার প্রত্যন্তরে অপরের ছোঁড়া ঢিল আমাদের কাচের শিশমহল ভেঙে টুকরো করে দেবে। এই প্রসঙ্গে মহাপুরুষ যীশুখ্রীস্ট যে মহৎ উক্তিটি করেছেন সেটিও মনে আসছে। যীশু বলেছিলেন কেবল সেই মানুষই ইঁট ছুঁড়বে শান্তি প্রাপ্ত অপরাধিনীর প্রতি, যে নিজে কোনো দোষ কখনো করেনি। কিন্তু প্রখ্যাত প্রবন্ধকার Stephen Leacock তাঁর 'Old Proverbs made new' প্রবন্ধে এই প্রবাদের অন্যরকম ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন, যারা কাচের প্রাসাদে থাকে, তারা অবশ্যই অন্যের প্রতি সর্বদা ইঁট ছোঁড়ার কাজে ব্যস্ত থাকবে, নিজের প্রাসাদকে

ভগ্নদশা হওয়ার হাত থেকে বক্ষা করাও জন্য। কেননা তাহলে অন্যেরা নিজেদের রক্ষা কবতেই ব্যস্ত হবে, শিশমহলবাসীকে ব্যস্ত করবে না। এক কথায় ইংরেজি ভাষায় যাকে বলে Offence is the best defence “দেশে বিদেশে”- ভ্রমণকাহিনীতে সৈয়দ মুজতবা আলী বলেছেন, গাঁক গাঁক করে অর্থাৎ প্রচুর accent দিয়ে ডুল ইংরেজি বলা হচ্ছে খারাপ বাম্যায় ঠেসে ঝাল দেবার মতো। তাতে রান্নার দোষ যেমন ঢাকা পড়ে, তেমনি accent বহুল ইংরেজি ব্যাকরণগত ত্রুটি সহজে শ্রোতা বুঝতে পারে না।

অর্থাৎ ব্যাপাবটা সর্বত্র একই। চোরের মা, কিংবা যে দোষী, সে বড় গলায় আগেই অন্যের দোষত্রুটি দেখাতে লাগুক।

চারদিকে তাকিয়ে দেখুন, সবাই অন্যকে দোষারোপ করে চলেছে। যে কেউ কোনো কাজে হাত দিচ্ছে, কোনো কাজের দায়িত্ব পাচ্ছে, সে কিন্তু নিজে কাজটা কেমন করে সারবে, তা ভাবার আগেই ভেবে নিচ্ছে কেমন কবে অন্যের কাজের ত্রুটি বিচার করবে। একজন যদি বলেন যে শাসনকাজে অন্যায প্রশ্ন পাচ্ছে, তিনি প্রচার করেন যে যে-কোনো অপরাধমূলক কাজের জন্য দেশের শাসনব্যবস্থা দায়ী। সঙ্গে সঙ্গে মহাশাসন কার্যালয় অবরোধ বা সর্বাঙ্গিক ধর্মঘটের কার্যসূচী জনগণ? সে তো ‘খাবি রে পাগলা? না হাত খুয়ে বসে আছি’-র দলে। বন্ধ মুফতে আরেকটা ছুটি? পিকনিক?—চল পানিসি মজ্জো। সঙ্গে সঙ্গে মাননীয় শাসন দপ্তর এ সব কাজকে নাশকতামূলক আখ্যা দেন। কর্মসংস্কৃতির প্রচার। এ প্রসঙ্গে নন্দনতত্ত্বের প্রধান সভামঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় সভা ও নাটক প্রদর্শনী।

দেশের অর্থনীতির সার্বিক নড়বড়ায়মান দশা।

দারিদ্রসীমার নিচে অবস্থিত ভুখা জনগণ বস্ত্র-ওষুধ-পানীয় জল খাদ্য ইত্যাদির অভাবে বিপর্যস্ত। এই সমস্যাগুলো এমন কিছুই না। দেশের প্রতিরক্ষা খাতে অর্থ বরাদ্দ হয়, সীমান্তে জোর লড়াই চলে প্রতিবেশী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে, রাযবদেবের জন্মস্থানে মন্দির নির্মাণ অথবা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্মযাজক আক্রমণ। সাম্প্রদায়িক বিভেদের তাপ-পোয়ানো আগুন। পরদেশজাতা নেত্রীসমন্ভিত বিরোধীদলকে দেশের সংস্কৃতির ধারক ও বাহকেরা যত পারেন দোষারোপ করে চলে, যাঁরা নিজেরা, দেশের সংস্কৃত ভাষা ও ইতিহাস কতটা জানেন, তাতে সন্দেহ আছে। যারা অন্ধ তারা আজ.....

আর বিদেশে দেখি, শ্বেতবীপবাসী Big Brother রা তাঁদের আগ্রাসনের হাত দীর্ঘায়িত করেন, তবু মুখে বলেন, এ তাঁদের দায়িত্ব। সভ্যসমাজের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য White man's Burden যদিও বা কখনো কখনো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি ভাবে যে বড় বড় “দাদা”রা উৎপন্ন দ্রব্যের জন্য বাজার

খুঁজছেন, খুঁজছেন সস্তায় কাঁচামাল বা শ্রমিক। চৌর্ধ্বন্তি কিন্তু স্বীকৃত হবে না কখনো। “দাদা”রা বিশ্বায়নের বিশ্বশক্তির বুকনি আওড়াবেন। সে বিষয়ে তপন রায়চৌধুরী মশায় “রোমন্থন অথবা ভীমরতিপ্রাপ্তর পরচরিত চর্চা” গ্রন্থে অনুপম মন্তব্য করেছেন—“ক্রাইড আর হেস্টিং তো আরো কি করেন, কি করেন, বলে উপড় হয়ে পড়েছিলেন। আমরাই তাঁদের ওজর-আপত্তি না মেনে জোর করে দেশটা তাঁদের পাতে দিয়ে দিয়েছি। তখন অগত্যা, কি আর করা...”

শুধুমাত্র বেচারি উপেন-রা ক্ষীণকণ্ঠে আজও বলতে চাইছে—

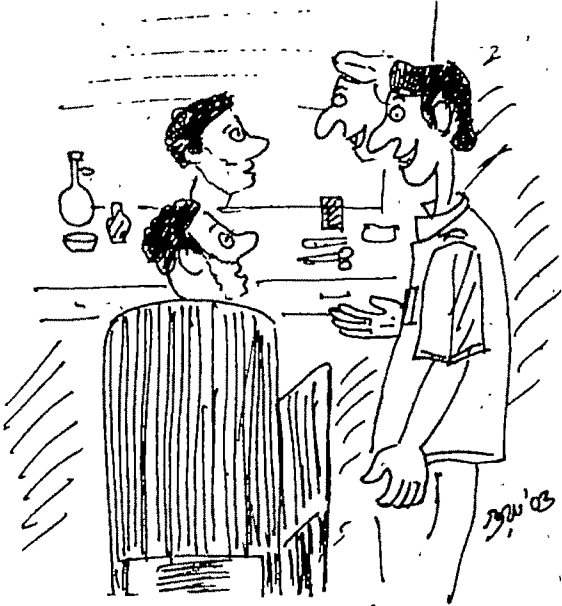
“তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ আমি আজ চোর বটে।”

এই আপদদের কথা এদের পাশের বাড়ির লোকই শুনতে পায় না তো সরকার শুনবে কি! নেতারা শুনবে কি! দাদারা শুনবে কি!

শুনতে না পেলেও রক্ষে ছিল; কিন্তু শুনতে শোনে না যে। আর এখানেই চোর আর তার মা নিরাপদ, সম্পূর্ণই নিরাপদ।

চিরকালের কৌতুক

পরিবেশনা : কাকলি চৌধুরী



এক ধড়িবাজ খন্দের নাপিতের কাছে এসেছে।

খন্দের : দাও তো বাপু গোঁফখানা কামিয়ে।

চতুর নাপিত অর্ধেক গোঁফ কামানোর পর—

নাপিত : পয়সা দিন।

খন্দের : পয়সা কাল দেব।

নাপিত : তবে বাকি অর্ধেক গোঁফও কাল কেটে দেব।

* * *

এক ভদ্রলোক পুকুরের জলে ডুবে মরতে গেছে। তখনই—
একজন মাতব্বর : এই! দেখছ না, এখানে জাল ফেলে মাছ ধরা হচ্ছে? নিকালো বাহার।

ভদ্রলোক বিষ কিনতে গেল দোকানে। প্রচুর ভিড়।

কর্মচারী : এই! দেখছ না এখানে লাইন রয়েছে? শেষে গিয়ে দাঁড়াও, তবে বিষ পাবে। এখন বিষের ভীষণ ডিম্বাণ্ড। যাও যাও, লাইনে দাঁড়াও।

ভদ্রলোক রেল গলা দিতে এল।

রেল লাইনের ওপর বসেই রয়েছে। চার ঘণ্টা ট্রেনের পাত্তা নেই। বিরক্ত হয়ে স্টেশনে গিয়ে স্টেশন মাস্টারকে জিজ্ঞেস করলেন।

স্টেশন মাস্টার : আরে মশাই, লরির সঙ্গে লোকাল ট্রেনের ধাক্কা লেগেছে। লরির ড্রাইভাররা পথ অবরোধ করে রেখেছে। ট্রেন আসতে রাত হয়ে যাবে।

ভদ্রলোক : দুগুেরি! নিকুচি করেছে। এত হ্যাপা জানলে মরতে কে আসত?

* * *

লোকটি আদৌ কোনোদিন সিনেমা দেখেনি। একদিন ইচ্ছে হল সিনেমা দেখার। সিনেমা হলে গিয়ে একটা টিকিট কিনল। একটু পরে আবার একটা। বারকয়েক এইরকম টিকিট কিনতে আসার পর কাউন্টারের লোকটি অবাক বিশ্ময়ে বলল,—মশাই, সবাইকে একসাথে নিয়ে এসে একেবারে টিকিট কিনে নিন না! তাহলে তো আর আপনাকে বার বার আসতে হয় না।

লোকটি হতাশ গলায় বলল,—আরে মশাই, আর বলবেন না। ওই গেটের কাছে একজন মোটা কালো দারোয়ান রয়েছে, যতবার আমি তাকে টিকিটটা দিচ্ছি ততবারই সে টিকিটটাকে ছিঁড়ে দিচ্ছে। সেই জন্যেই তো বারবার আমাকে টিকিট কিনতে আসতে হচ্ছে।

কড়িচা ২০০৩

অমিতাভ সান্যাল



জলপাইগুড়ি শহরের অনতিদূরে মণ্ডলঘাটে গাছের ছায়ায় বসে চাষা নুন-লব্ধা দিয়ে পাস্তা মারছে। কিশোরী কন্যা শতচ্ছিন্ন পোশাক পরে হলদিবাড়ি-মুখী ছয় কামরার ট্রেনের মন্দাক্রান্তা ছন্দ দেখছে। বাপ জল খেয়ে বিড়ি ধরাবে যখন, সে ছুটি পাবে। গঞ্জের মোড়ল বা জোতদার, মহাজন বা ভদ্রলোক চাষীরা বর্গার বাড়াবাড়ি পেখেই রঙ পাণ্টেছে। এখন তাদের বাড়ির মাথায় লাল পতাকা, বসবার ঘরে প্রমোদ বা হেমন্ত; জ্যোতি বা বিমান, পুতিতুস্তি বা রাম চাটুজ্যের ছবি। মানানসই রঙ হলে চিত্রার কোনো কারণ নেই। তাই তো গত পঞ্চাশ-ষাট বছর ধরে দারিদ্রের খার পূর্বাপর অনড় অচলায়তন। জনকল্যাণের সংজ্ঞা

আধুনিকতার নিরিখে নিরূপণ করার কাজ খুব কঠিন।

আম জনতার কথা ছাড়ুন না হয়। সেই সভ্যতা ও সমৃদ্ধির উষাকাল থেকে আশি শতাংশ মানুষ বিশ শতাংশ সম্পদের ওপর হামলে পড়ে সুখী। ভারী সুখী তাবা। গাঁয়ের মোড়ল থেকে নেতা, অঞ্চল প্রধান থেকে মন্ত্রী স্বপ্ন দেখান, তাদেরকে। স্বপ্নের ফেরিওয়ালারা 'প্যানডোরাস বক্স' থেকে একটা একটা করে স্বপ্ন বার করে দেখান ঠিক যেমন শেয়াল পশুিত একটাই কুমিরছানা বারবার দেখিয়ে খুশি করত কুমির দম্পতিকে, আর জনতা ভারী খুশি হন। নেহেরু বলেছিলেন, বঙ্করাত চোরাকারবারীদেরকে ল্যাম্পপোস্টে ঝুলিয়ে মারব আমরা। দেবেগৌড়া বললেন, আমার কাছে রঙ মেখে আসবার দরকার নেই। আমি চাই শিল্পের পাগলাঝোঁড়া। জ্যোতি বসু বললেন, অমানিশার অবসান হয়েছে। এবার আমরা সীমিত ক্ষমতা নিয়ে নতুন বাঙলা গড়ব। গত ছাব্বিশ বছর ধরে সেই নয়া বাঙলা গড়ার কাজ চলছে।

পশ্চিমবাঙলার বাইরে তেমন যাওয়া হয়নি বা থাকাত হয়নি। একবার ব্যাঙ্গালোর গিয়ে আশেপাশে এক ডজন এঞ্জিনীয়ারিং কলেজের বর্ণময় চাকচিক্য দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম আর শিবপুর যাদবপুরের সাথে তুলনা করে মন ভারী বিষণ্ণ হচ্ছিল। ঈশ্বরের অনুগ্রহে গুণগত মানে অন্যান্যের কাছাকাছি না এলেও পরিমাণগত প্রতিযোগিতায় এবা শতক মোজান এগিয়ে।

মানুষের মন বড়ই পরশীকাতর। এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশে সবচাইতে সুখী কারা? আমি অবশ্যই নই বা আপনি অবশ্যই নন। তাহলে? সুখী মানুষের সূচীপত্রটা মিলিয়ে নিন তাহলে। মন্ত্রী, বিধান সভাসদবৃন্দ, বিবোধী দলনেতা, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, কর্পোরেশনের মেয়র ও মেয়র পারিষদগণ, মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, স্থানীয়ভাবে সাপ্লাই-এর কাজে ব্যস্ত পার্টিদাদার ব-কলমে মাসুলম্যান, প্রাইভেট সেক্টরে কর্মরত এঞ্জিনীয়ার্স এবং শিল্পপতিগণ সুখ তালিকার শীর্ষে। এই মুহূর্তে এঁরা হলেন ফরাসি বিপ্লবের আগে 'ফার্স্ট এস্টেটের' প্রিন্সিপেল পিপল। মুখ্যমন্ত্রী ঘোড়শ লুই নন অথবা শরীর-বাহ্যের যে অবস্থা তাঁর, মেরী এগুনিমেন্টের কথায় চলেন বলে মনে হয় না। শ্রীমতী ইন্দ্রাণী বা ঋতুপর্ণার বিবাহ অনুষ্ঠানে তাঁকে যেতেই হয় ঠিক যেমন মেয়র-সাব প্রতিবেশিনী শতাব্দীর বিয়েতে স-পারিষদ সোনার দোকান ছুটির দিনে জোর করে দোকান খুলিয়ে উপহার সংগ্রহ করেছিলেন। যিনি নগর শাসনের সূত্র ধরে মহানাগরিক তাঁকে এসব দিবি মানায়।

মুখ্যমন্ত্রী একনায়ক ঘোড়শ লুই এর মতো ডাক্তারদের ঘাড় ধরে বার করে দিতে পারেন, যদিও পার্টিশাণ্ড থেকে মাস্টারদের মাইনের টাকা আসে না, টাকা আসে ট্যাক্স থেকে, কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদান ও মাধুকরী থেকে। কিন্তু তিনি শিল্প আনতে পারেন না। তাঁর পূর্বসূরী শিল্প-সংস্কৃতির গদ্যযাত্রা ভগীরথের মতো সম্পন্ন করে মনীষী বা মহামানব আখ্যা পেয়েছিলেন আর বর্তমান প্রজন্ম সেই পথে চলছে। শিল্প নিয়ে বছর-ইয়ারী আলোচনা; এখন 'ইন্ডেন্ট' একটাই। কাগজ হাতে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বা শিল্পমন্ত্রী গড়গড় করে কঠিন ইংরেজিতে বক্তৃতা দেন আর সমবেত বিশিষ্ট জনেরা হাততালি দেন জব্বর।

তারপর চর্বচোষা খেয়ে শিল্পপতির অঙ্ক বা ব্যঙ্গালোর অথবা গাজিয়াবাদের যান, যেখানে সিঁটু নেই বা 'ডিকটেক্টরশিপ অব দ্য প্রলোভিতারিয়েত নেই। যেখানে ব্যবসার পরিবেশ আছে মূলধন তো সেখানেই যাবে।

প্রায় আড়াই দশক কাল ধরে লাগাতার অনুৎপাদনশীল কর্মে প্রভূত অর্থ ব্যয় করে প্রশাসন থমকে দাঁড়িয়েছে। প্রয়াত অর্থনীতিবিদ ভবতোষ দত্তর সাথে অসীম সৌভাগ্য বলে একাধিকবার মুখোমুখি আলাপচারিতার সৌভাগ্য হয়েছিল। স্বভাবগন্তীর মানুষটি সরকারি অপদার্থতার নানা নজির তুলে ধরতেন যা বেশ কয়েক বছর পর আজ অবধারিত সত্যের মুখোমুখি হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে একাধিক মার্কসবাদী অর্থনীতিবিদ রয়েছেন যাদের মার্গ-দর্শন ডঃ দত্তের অনুরূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন নয়। গোলমাল তো এখানেই। মসনদে যারা আছেন তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, ভাবনাদৃষ্টি, প্রয়োগক্ষমতা কাম্য মানের অনেক নিচে। অপ্রিয় কথা বলতে নেই, মন্ত্রী আমলাদের দোষ-ক্রটি চিহ্নিত করা গুরুতর অপরাধ। কিন্তু কয়েক কোটি মানুষের ভাগ্য নিয়ে হেলায় ছিনিমিনি খেলেন যারা গণতান্ত্রিক আবহে, সেই সব উল্লাট ব্যক্তিত্বদের বিচার হবে না কেন? তাঁরা নির্লজ্জভাবে বিলাসব্যসনে গা ভাসাবেন, ফিল্ম উৎসব, যাত্রা উৎসব, নাট্য উৎসবে অর্থহীন অর্থব্যয় করবেন—আর আমজনতাকে কৃচ্ছসাধন করতে বলবেন। তাঁরা মাস্টারদের মুক্ত সময়ের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবেন, স্ট্যাম্প ফি বাড়াবেন, কোর্ট ফি বাড়াবেন, লাইসেন্স ফি বাড়াবেন। অথচ সময়মতো পেনশন দেবেন না বা দিতে পারবেন না, বোনাস ছাটবেন, জরী ট্রেড ইউনিয়ন নেতাকে দিয়ে কারখানায় অনৈক্য সৃষ্টি করবেন। পরিণামে শিল্প রূপ হবে, বন্ধ হবে ও হাজার হাজার শ্রমিক বেকার হবে। তারপর কবরের মাটি না শুকোতেই প্রমোটার নির্মাণ শুরু করবেন। আর ছত্রিশ কোটি দেবতার মতো স্থানীয় ভাবে ছত্রিশটি দেবতার পকেট ভারী করবার আয়োজন শুরু হবে।

এভাবেই চলছে একশ ছয় কোটি মানুষ অধ্যুষিত ভারতের জনকল্যাণে অর্থনৈতিক জীবন দর্শন। সরকার চলেন শিল্পপতির অঙ্গুলী হেলনে। সঞ্জীব গোয়েঙ্কার একচেটিয়া বিদ্যুৎ ব্যবসা স্ব শিগগিরি মধ্যবিত্তদের ঘাড়ে কোপ দিতে অস্ত্রে শান দিচ্ছে। ভর্তুকি নিয়ে এখন নয়া দর্শন। মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট ও রাজ্য সরকারের ঘাড়ে হাত রেখে গোয়েঙ্কা গোষ্ঠীরা আনন্দে করিবে পান সুখা নিরবধি।

অতএব সাধু সাবধান। দেশ যে ভাবে এগোচ্ছে তাতে মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিলুপ্ত হবে। কুড়ি শতাংশ সম্পদশালীর পাশাপাশি তিরিশ শতাংশ হতদরিদ্র মানুষ থাকবে খোলা আকাশের নিচে; মাঝের পঞ্চাশ শতাংশের জন্য কবর খোঁড়া হচ্ছে।

মহানাগরিক

মাননীয় মহানাগরিক স-পরিষদ সভা আলো করে বসে রয়েছেন। বঙ্গবাহিনীর বিশেষ আত্মতাজন এই মানুষটির জীবনটাই নাটকীয় যাত-প্রতিযাত ভরা। আইনের বিন্দুবিসর্গ না জেনেও তিনি আইনজ্ঞ, ঠিক যেমন তাঁর 'পৃষ্ঠপোষিকা' রাজনীতির ব্ল্যাক বেস্ট হওয়া ছাড়াও একজন ডক্টরেট ও প্রাবন্ধিক, কবি ও গল্পকার, ঔপন্যাসিক ও আরো অনেক কিছু। ঈশ্বর যদি নেতাদের দিন রাত চকিব ঘন্টার জায়গায় অন্তত চৌত্রিশ ঘন্টা করতেন—মানুষের হিতে আরো কত কি করা যেত।

মহানাগরিক একদা বাঙলার দামাল ছেলে, তরুণ তুর্কী ইত্যাদি বিশেষণে বিভূষিত হতেন। এমনই দাপট ছিল একদা তাঁদের যে ছিয়ানব্বই শতাংশ ভোট পেয়ে বাঙলার মসনদে বসে গিনেস বৃকে অরবীণ হয়েছিলেন। কমরেড

চারু মজুমদার জেলস্থ হবার পর তিনি তাঁকে বাঘ-ভালুক জ্ঞান কবে দেখতে গিয়েছিলেন আর এমন সব কথাবার্তা বলেছিলেন নাকি যে চারুবাবু শক-থেরাপী হেতু কেঁদেই ফেলেন আর কি! ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতাচ্যুত হলে কলকাতায় আসতেন যখন, নেতাকে ডেকে পাঠাতেন। তারপর ইন্দিরা গান্ধী প্রয়াত হলে চিতায় একফালি চন্দনকাঠ চড়াবার সময় দেখা গেল, নেতার ডান হাতে চন্দ্রল আর বাঁ হাতে বরাদ্দকৃত সেই একফালি চন্দনকাঠ। চিতা, চন্দন ও চন্দ্রলের অভূতপূর্ব সহাবস্থান।

ইতিমধ্যে ভাগীরথী দিয়ে বিস্তার জল গড়িয়েছে। পূর্বতন বঙ্গেশ্বর যখন উন্টোডাঙার উদ্যানে বসে শিশুর কলতানে বিভোর, নবনিযুক্ত বঙ্গেশ্বর ক্রমশ পশ্চিমবঙ্গকে মুষ্টিবদ্ধ করতে তৎপর। দৃঢ় পায়ের তিনি এগোচ্ছেন। পাইয়ে দেওয়ার তাস খেলে তিনি যে শুধু পাবলিককে পকেটস্থ করলেন তাই নয়, বিরোধীরাও তাঁর পকেটস্থ হল। গণতন্ত্রের মোড়কে এ দেশে এল একদলীয় গণতন্ত্র।

বঙ্গবাহিনী হিটলারের কায়দায় ডান বাঁ হাত নাড়িয়ে টেমপেস্ট-এর গতিতে হলদিয়া থেকে হলদিবাড়ির গ্রাম-শহর চম্বে বেড়াচ্ছেন আর পাবলিক আসন্ন মহাপ্রলয়ের আশঙ্কায় কম্পমান, যখন নেতারা একে একে বিবর থেকে বার হয়ে বাঘিনীর আঁচলে আশ্রিত হলেন। রাজনীতির এটাই হল সিদ্ধ রুট। পকেটের থেকে আঁচল নিরাপদ মনে হলে ফ্রোর ক্রশ করাই রীতি। তা বাঘিনী তুষ্ট হয়ে তাঁকে তৎকালীন নগর দখল সংগ্রামে মেয়র কাপে প্রজেক্ট করলেন আর শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে তিনি মেয়র হয়ে বসলেন।

তিন বছরের পুরনো মেয়র এখন যৎপরোনাস্তি প্রভাবশালী। নিজের হাতে গড়া ফ্রাঙ্কেনস্টাইনকে স্বয়ং বাঘিনীও ভয় করেন। আগের মতো মতানৈক্য হলে ভাঙচুর করেন না বটে তবে অচল করার শক্তি ধরেন এখনো। দেবদ্বৈপায়নবাবু সে কথা হাড়ে হাড়ে বুঝেছেন। ইতিপূর্বে পবন দত্ত বুঝেছিলেন ও শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় উপলব্ধি করছেন। মেয়রের গিলোটিন থেকে রক্ষা পাওয়াই কঠিন।

বর্তমান মেয়রের প্রশাসনিক নৈপুণ্যের ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত। মেয়রের সাথে হাওয়া অফিসের বেজায় মিল। তিনি বলেছিলেন, এবারের বর্ষায় শহর ডুববে না। অথচ আখবেলার জবরদস্ত বৃষ্টিতে কলকাতা ভেনিস হয়ে গেল। শুধু গণ্ডোলা চলল না। নিম্নুকেরা বলেন, কলকাতা শহরের নব্বই শতাংশ রাস্তাঘাট খুব খারাপ। কলকাতা শহরের মধ্যে বেনিয়মই নিয়ম। পুনে বা ব্যাঙ্গালোর, দিল্লি বা বরোদা থেকে কলকাতায় এলে মনে হয়, শহর থেকে গায়ে এলাম বোধহয়।

সে যাই হোক, শনিবারে কোনো কাজকর্ম থাকে না বলে মেয়রের ইনার সার্কেলের আম দরবার বসে। আজও বসেছে। জল-পারিষদ বললেন, আপনি একদা একটি সিরিয়াল করেছিলেন, মনে আছে? গতকাল রাতে দেখলাম। বউ ক্যাসেট এনেছিল। কি ওয়াগারফুল অভিনয়। উত্তমকুমারকে মনে পড়ছিল।

মেয়র বললেন, আরে সে কথা তো ভুলেই গিয়েছিলাম। অভিনয়টা ভালোই করেছিলাম, কী বলো? এবার শিক্ষা-পারিষদ বললেন, স্যার, এবার পুঞ্জোয় পারিষদরা মিলে একটা থিয়েটার করলে হয় না? নটী বিনোদিনী করা যায়। অথবা তিন পরসার পালা। তেমন হলে বিরোধীদের মধ্যে কাউকে নেওয়া যেতে পারে।

মেয়র বললেন, না না, ওসবে সরকার নেই। একেই তো পলতায় পিকনিক করতে গিয়ে খবরের শিরোনামে উঠে এসেছি। ওরা চুরি কবে ফাঁক করতে পারে আর আমরা পিকনিক করলেই দোষ।

স্বাস্থ্য-পারিষদ পাদপুরণ করলেন অতঃপর,— মাঝে মাঝে গায়ে জ্বালা

ধরে। একজন বলেছেন সেদিন, সুভাষের চেয়ার কলঙ্কিত হল। এই চেয়ারটাকে হেরিটেজ চেয়ার রূপে মিউজিয়মে পাঠালে ভালো হত।

মেয়র বললেন, সুভাষ কে?

স্বাস্থ্য বললেন পুনরায়,—সুভাষকে চিনলেন না স্যার? সুভাষ বোস, যিনি দেশত্যাগী হয়েছিলেন। আরে, অ্যাডভেঞ্চারিস্ট হয়ে কি আর ভারত স্বাধীন করা যায়? বেঘোরে প্রাণটা দিতে হল তো! তাছাড়া কনট্রিবিউশন কি তার? তাও তো আমরা দোকানদারদের মৌরসীপাট্টা বন্ধ করতে চলেছি, কর বাকি থাকলেই জল কেটে দিচ্ছি, সকালে বাস্তা ধুয়ে দিচ্ছি, জলকব বসাইছি, প্রাথমিক শিক্ষা প্রসার করছি, কলেবা নির্মূল করেছি এবং আরো কত কিছু করবার প্রস্তুতি নিচ্ছি। তবে?

জঞ্জাল-পারিষদ বললেন বা পাদপূরণ কবলেন,—এদের সবচেয়েই সমালোচনা। হেবিটেজ বিন্ডিং নিয়ে, অবস্থান পবিত্বন নিয়ে সমালোচনা। দুর্নীতিতে নাকি সবাই আকর্ষ নিমজ্জিত। কেন বে শালারা, তোদের জামানায় হুইস্কি দিয়ে মুখ ধোবার অভিযোগ ওঠেনি? প্রমোটা কালচাব তোবা আমদানি করিসনি? এসব যুগের হাওয়া। এখন এবা সুভাষচন্দ্রের ভারী ভক্ত হয়েছে। সুভাষের যুগে সুযোগ থাকলে তিনিও ঘুষ খেতেন, কি বলেন?

মেয়র বললেন, ছাড়ো এসব কথা। কাল শিলিগুড়ি যেতে হবে। ওখানে উত্তর-পূর্ব ভারতের মেয়র সম্মেলন হবে। আমরা তো এ-ওয়ান হয়েই রয়েছি। দেখি, ওদেরকে তোলা যায় কিনা।

সভার কথা গবার কথা

ভগ্নলু বাঁড়ুজো



সেদিন ছিল ইউনিয়নের সভা
সকাল থেকেই শশব্যস্ত হেড অফিসের গবা।
বেলা দু'টায় হবে মিটিং শুরু,
“লোক ধবে আন”—আদেশ দিয়ে গেছেন গবার গুরু।
দেখতে দেখতে পৌনে দুটো বাজতেই
কলম বন্ধ মিটিং ছাড়া কারোব কোনো কাজ নেই।
ঠিক কত লোক আসছে সভা গুনতে—

গবার দু'চোখ ঘুরপাক খায় তাদের মাথা গুনতে।
তারপরে সব নিয়মবাঁধা কাজ,
নিয়ম মানা বক্তৃতাতে নিয়মমতো ঝাঁঝ।
প্রগতিশীল চেনা ধানাই পানাই
পেন্টাগনকে ধমক লাগায় কেওড়াতলার কানাই।
সবাব শেষে বড় নেতার পালা
মন দিয়ে তার ভাষণ শোনে এক কোণে দুই কালা।
বাকি সবাই নিয়মমতোই ঢোলে
হাই তোলে আর হাততালি দেয় আওয়াজ বন্ধ হলে।
এসব দেখা নয়ত গবার কর্ম
সে শুধু চোখ বন্ধ করে পালন কবে ধর্ম।
গবার মতে, সবার ভালোমন্দ
সামলান তার পরম পিতা শ্রী শ্রী মার্কানন্দ।
তাই দু'বেলা গায় গবা তাঁব গান—
“সত্য তুমি, কাবণ তুমি সর্বশক্তিমান।”
তাব কাছে কেউ বোলো না এই ছড়া
বিশেষ করে হমনি যাদের জীবনবীমা করা।
গবার গুরুর নামকরা সব চেলা
দুলাল কিম্বা বন্টনেরা সইবে না এই খেলা।
খেপলে তারা মারবে ছুঁড়ে ঢিল
নিপাত যাবে তোমার মতো প্রতিক্রিয়াশীল।
তাব চেয়ে ভাই বুঝেসুঝেই চলো
সবাই মিলে একই সূরে একই কথা বলো।
তাতেই ববং মিটেবে তোমার স্বার্থ
গবার বাবা তুষ্ট হলেই মিলবে পবমার্থ।

তোমাদের ছেলে-মেয়ে কিছু না পারলে আমাদের বিষ্ঠা নিয়ে ঠাট্টা করতেও ছাড়ো না। 'মাথায় গোবর আছে' বলে যে ভাবে তাচ্ছিল্য করো তা সহ্য করা যায় না। তোমাদের বিষ্ঠার কথা একবার ভাববে তো!

আবার তোরা গরু হ

বাসুদেব মোশেল



গরু যা পারেনি আমরা তা করতে চাই না। গরুর মত মনোহর না খেতে পেয়ে মরেছে তা তবু সহ্য করা যায়। সব জীবই মরণশীল। মনোহর খেতে পেলেও মরত, না খেতে পেলেও মরত। মরণের হাত থেকে বাঁচতে কেউ পারে না, কেউ পারবে না। মনোহর চিরকালই না খেয়ে মরে। এর জন্যে ঈশ্বরের কাছে নালিশ করে কি লাভ? বরং যেসব মনোহরদের অকালে জলজ্যান্ত বধ করা হচ্ছে তাব জন্যে একটু চোখ-কান বুঁজে চিন্তা করলে শুধু মানুষের বাচ্চার নয়, সমগ্র জীবজগতের মঙ্গল হবে। জীবের প্রতি দয়া-মমতার কথা বিলে তো কবেই বলে গেছে। তার কথা কি একবারও মনে করি? জীবের প্রতি আমাদের দরদ কোথা? এ 'ইংরেজ আমলে একটা সভা গড়ে উঠেছিল এই নামে 'পশুর প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার নিবারণী সভা'। তারা গরু-মহিষের উপর অকথা অত্যাচার বর্নদাস্ত করতে পারেনি। আইন কবে তবে ছাড়ে। পশুও তো প্রাণ আছে, তাদের এভাবে মার-পিট করে কাজ করানো কি উচিত? তারা সে সময়ে যা পেয়েছিল আমবা তা কেন পারব না? এখন তো আমাদের

হাতে অনেক ক্ষমতা। তা ছাড়া আমরা যে ইচ্ছে করলে সবকিছু ভেঙেচুরে গুঁড়িয়ে দিতে পারি, তা চোখের সামনে বিশ্বাসী দেখেছে। আমাদের কেউ কিছু করতে পারল কি? আমাদের একগাছি সরু চুলও ছিঁড়তে পারল না কেউ। কেস-কাছারিও হল অনেক। সকলেই বেকসুর খালাস। এখন তো একটা মন্ত্রকও তৈরি হয়েছে জীবের প্রতি সহানুভূতি দেখাতে।

আমাদের এখনই উচিত সত্যাগ্রহে বসা। জনমত তৈরি করা। গরুর তো একা ছিল। এখন আমরা হাজার হাজার গরুর। আমরা কাছা বেঁধে কাজে না লাগলে এ জাতিটাই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। কতকগুলো হিংস্র মাংসখোঁ প্রাণী প্রকাশ্যে এভাবে বধ করে ঝালে-ঝালে-অম্বলে খাবে, এ মেনে নেওয়া যায় না। আস্ত অস্ত বড় একটা জীবকে এ ভাবে বধ কবে খাবে আর আমরা তা চোখে দেখে সহ্য করব, এ হতে পারে না, এ হতে দেব না। ইয়াকি নাকি?

সত্যিই মানুষের মতো কথা বটে। এত বড় মাঠে, এত মানুষের সমাবেশে গরম গরম বুলি শুনে, মাঠের আশপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা নিবাসিনী জীব 'বাহম্বা-বাহম্বা' করে উঠল। সত্যিই তো, ওদের কথা এমন করে কেউ কোনোদিন ভাবেনি তো। কেবল মাইকে গলা ফাটিয়ে বলা নয়, রীতিমতো হিংস্র আছে। তা না হলে সংসদের মতো ঝোঁয়াড়েও আমাদের কথা তোলা হবে কেন? আমাদের বাঁচাতে সংসদে বিল আনাও হবে বলে যে ভাবে ঘোষণা করা হচ্ছে তাতে আমাদের জাতির পক্ষ থেকে ওদের কাছে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা-জ্ঞানানো উচিত। সত্যিই আমবা কৃতজ্ঞ, সত্যিই আমরা ঋণী। ওদের গুরু, ওদের বাবা, ওদের জাতির বাবা গান্ধী বাবাজির কাছেও আমরা কৃতজ্ঞ। তিনি আমাদের কথা ভেবেছেন। শুধু দেশের কথা নয়, শুধু নিজের শ্রেণীর কথাই ভাবেননি। এ জন্যেই উনি পিতা। তারপরে সবাই তো নেতা ছাড়া আর কিছুই হয়ে উঠতে পারল না। একটা মানুষের পক্ষে কম কথা নয়। জিন্দাবাদ গান্ধী, জিন্দাবাদ....।

ওদের কর্মসূচী একদলের একেবারে পছন্দের নয়। যতসব বেঁড়ে পাকা ওরা, গাছের খাবে তলাবও কুড়াবে। যখন তালগোল পাকিয়ে বায় তখন জিন্দা কামড়ে বলে, খুবই ভুল হয়ে গেছে, আর হবে না। ওরা বলছে—পশুদের নিয়ে যারা এত ধ্যান্টামো করছে, তারা পশুখাদ্য কলেক্টারিতেও লজ্জা পায় না। ছিঃ ছিঃ। ওবা ইতিহাস পড়েও ন্যাকামি কবছে। ওরা জানে না, বাপুর বাপ-ঠাকুরদারা মধুপর্ক নামে যা ভক্ষণ করতেন তা সুবাদ নরম কচি মাংসেরই ডিস। ওই কচি মাংস কি গাছে ফলত, না মাটির নিচে জন্মাত?

আমাদের নিয়ে সেই যে কবে থেকে ক্যাচাল গুরু করেছে তার হিসেব নেই। ওদের এতসব কাণ্ড-কারাখানায় আমাদের কি এতটুকু উন্নতি হয়েছে? সেই ভাঙা ঘর, ভাঙা চাক্ষু ডাবায় পচানো বাসি খাবাব। ওরা যা খেতে

পারে না তাইই ডাবায় ঢেলে দিয়ে আমাদের সেবার নামে পিরিত্তি দেখায়। আসলে আমরা জানি, ওরাও জানে, কার কোথায় স্বার্থ। আহা, মরে যাই ওদের ভালোবাসায়। আমাদের এটাই সাফ কথা। আমাদের জন্যে ভাবনা-চিন্তা একেবারে বাজে কথা। আমরা জন্মেছি সমাজের উপকারের জন্যে, আমরা সমাজের উপকারেই মরব। একদিন জো আশু-পিছু সবাইকে মরতে হবে। তবে চোখের সামনে জলজ্যাস্ত জবাইয়েতেই যা ভয়। তারপর টাউস বিডিটা কুলিয়ে পাল্লায় চাপিয়ে ব্যবসা কবাটা একেবারে ভালো লাগে না। মরেও কি শাস্তি আছে দাদা। আমাদেরই ছাল-চামড়া ছাড়িয়ে পদ-মুগলের শোভা বর্ধন থেকে, ভুঁড়ি কমাতে কটিবন্ধন, পয়সা রাখতে থলি, কোনো মনিবের ইচ্ছা হলে নিজের আদরের কুত্তারও গলায় গলাবন্ধ বেঁধে দিয়ে স্বাধীনতা হরণ করতে দ্বিধা করে না। ওরা মুখে স্বাধীনতার কথা বলে আর জীয়েতে আমাদের মতো নিরীহ

এত বড় মাঠে, এত মানুষের সমাবেশে গরম
গরম বুলি শুনে, মাঠের আশপাশে ছড়িয়ে-
ছিটিয়ে থাকা নিরামিষী জীব 'বাহম্বা-বাহম্বা'
করে উঠল। সত্যিই তো, ওদের কথা এমন
করে কেউ কোনোদিন ভাবেনি তো।

শাস্ত্র স্বভাবের জীবগুলোকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে সোহাগ দেখায়। আমাদেরই চামড়ায় ঠাকুর দেবতার নামে যা উল্লাস করে টাক ডুমা ডুম করে, তা দেখলে পিণ্ডি জ্বলে যায়। অত্যাচারের শেষ কি এখানেই? নিজেদের বউদের বৃকে দুধ শুকিয়ে যাবে, সৌন্দর্য নষ্ট হবে বলে আজকাল আমাদেরই শিশুদের শোষণ করে নিজেদের বংশধরদের সুখে রাখতে প্রার্থনা করে—'আমার সন্তান যেন থাকে দুশে-ভাতে।' দুধও আমাদের জন্যে, ভাতও আমাদের জন্যই। আমরা চাষ-বাসের কাছে জোয়াল কাঁখে না নিলে কবে তোমাদের সভ্যতা মুছে যেত। আমরা না থাকলে তোমাদের ইঞ্জিনচাষের স্বপ্ন কি ফলত? খালি পেটে সভ্যতার কচকচি আর করতে হত না। আমরা সহনশীল সম্প্রদায় বলেই রোজই ইঞ্জেকশনের ছুঁচ শরীরে ফুটিয়ে দিয়ে বালতি বালতি ভর্তি করে চালান দিচ্ছি হাটে-বাজারে। নতুন ফলি এঁটে আমাদের জন্যে বড় মাপের গোয়াল তৈরি করে বলছে—বৃহত্তর পরিকল্পনা। তোমাদের বৃহত্তর পরিকল্পনায় আমাদের সুখ-শান্তি কি বৃদ্ধি পেয়েছে? বন্যায় মরছি, খরায় মরছি আবার তোমাদের হাতেও মরছি। তবুও আমরা তোমাদের মতো আন্দোলনের নামে সংগ্রামের নামে গাই-বাঁধুর নিয়ে মিটিং মিছিল করে গোচারণ ছুঁমি দখল করে চেল্লাই না। আমরা অত্যন্ত ভদ্র। আমরা অত্যন্ত সহবস্থানে বিশ্বাসী বলে কখনো কিছু প্রতিবাদ করিনি। হাজার হোক তোমরা আমাদের অগ্রপুরুষ। শুনেছি আমাদের সাত সাতবার জন্মের পর তোমাদের মতো দু-পা বিশিষ্ট পশু হয়ে উঠতে পারব। আমরা আর নত মস্তকে নয়, উন্নত মস্তকে তোমাদের মতো বলতে পারব—উন্নত মম শির, শির নেহারি নত শির ওই শিখর হিমাদ্রি। অগ্রপুরুষ হিসেবে তোমরা নমস্য। তোমাদের কুর্নিশ না জানিয়ে পারা যায় না। তোমরা যতই আমাদের প্রতি অবহেলা করো না কেন তবুও তোমরা অগ্রজ, তোমরা প্রশম্য। অগ্রজের শাসন মান্য করা অন্যায় নয়। বরং অগ্রজের ভয়-ভীতি মিশ্রিত চোখরাডানিই আমাদের বাঁচার প্রেরণা যোগায়। সত্যি কথাই। তোমরা মতলববাজ খড়িবাজ না হলে এমন করে আমাদের দেবড়া জ্ঞানে পুজো করতে

না। আমাদের বিষ্ঠাই নয়, আমাদের শিবানুও তোমাদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র। তোমরা নাকি পাপ করো। পাপ কি? আমরা তা জানিও না, বুঝিও না। তবুও সেই পাপ সফলনের জন্যে আমাদের শরণাপন্ন হও। এসবের পরেও কি দু-পদ বিশিষ্ট জীব হয়ে জন্মাতে ইচ্ছা করে? পাপ খণ্ডনকালে বলতে শুনি—'নমঃ গোভ্য শ্রীমতিভ্যোঃ সৌরভেইভ্য এ বদঃ' ইত্যদি কঠিন কঠিন সব দুর্বোধ্য শব্দ। এ ভাবে আমাদের গণ্য-মান্য করার পরেও আর ভাবতে ইচ্ছা করে কি—সবার উপর ওরাই সত্য, তাহার উপরে নাই।

তোমরা নও, আমরাই সভ্য জীব। একান্তে ভেবে দেখো তো তোমাদের সঙ্গে আমাদের তফাৎ কোথায়, কতটুকু? আমাদেরই ফলো করাও তোমাদের বাচ্চা-কাচ্চাদের। আমাদের জীবন-প্রণালী নিজেই পড়াশুনা শুরু। আমাদের নিয়ে যে ছেলে যত বুদ্ধি খরচ করে বুঝতে শিখবে, লিখতে শিখবে, সেই তত সমাজে বুদ্ধিমান পরে বুদ্ধিজীবী পর্যন্ত হতে পারবে। আমাদের আকৃতি-প্রকৃতি, স্বভাব, চালচলিত, উপকারিতা, অপকারিতা উপলব্ধি করে ব্যক্তিগত জীবনেও অ্যাপ্লাই করতে পারলে তাকে রাখে হরি মারে কে? অবশ্যই শ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে সমাজে সম্মান পাবেই পাবে। কিন্তু তোমাদের বদ অভ্যাস, তোমাদের ছেলে-মেয়ে কিছু না পারলে আমাদের বিষ্ঠা নিয়ে ঠাট্টা করতেও ছাড়ো না। 'মাথায় গোবর আছে' বলে যে ভাবে ভাঙিছল্যা করো তা সহ্য করা যায় না। তোমাদের বিষ্ঠার কথা একবার ভাববে তো! আমাদের ছাল-চামড়া, মাংস, হাড়-গোড়, চুল-খুর নিয়ে যে যেমন পারে গুছিয়ে নেয়। আর আমরা যে কে সেই রইলাম। কলুর বলদ ছাড়া আর কি।

আমাদের জাতিকূল নিয়ে কম ভাবনা-চিন্তা হয়নি। আমাদের জাতির প্রকৃত উচ্চারণগত শব্দ কী হবে বা হতে পারে, এ নিয়েও একটা লোক ফালতু সময় ব্যয় করে গেল। 'ও'-কার না 'অ'-কার কী হবে? শেষ পর্যন্ত তাঁর জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে ঠিক কবলেন 'গ'-'গো' হওয়াই উচিত। তিনি 'গো'ই লিখতে শুরু করলেন। এতে আমাদের কুলমর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা আমরা জানি না। তবে ওরা যে আমাদেরই পদে পদে অনুসরণ করে সমাজ সেবার নামে শ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে নিজেদের ঢাক নিজেরাই পেটাচ্ছে তা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

ওরা বুদ্ধিমান জীব বলেই আমাদের ফাঁকা জায়গাগুলো দখল করে যেমন বাড়ি-ঘর-দোর বানাচ্ছে আবার আমাদের জন্যে রাখা মাঠ-ময়দানগুলোও দখল করে আমাদের মুক্ত বিচরণের পথকে দূষিত করে ছাড়ছে। যততর মলমূত্র। হাঁটা যায় না, মুখও দেওয়া যায় না। ওদের ছেলেমেয়েরা বেকার হয়ে পড়ছে। কল-কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। অথচ আমাদের মাংস বেচে বৈদেশিক অর্থ সংগ্রহ করতে নতুন নতুন কসাইখানাও খোলা হচ্ছে। তবুও শাকি ওদের ছেলেরা কাঁজ পাচ্ছে না। আমরাও তো বেকার। আমাদের পুরুষ সমাজের কোনো কাজ নেই। ধর্মের ষাঁড়গুলো মস্তানী চেহারা দেখিয়ে ঘুরে-ফিরে বাজার-হাটে তোলা তুলে কোনোরকমে বেঁচে আছে। তাও তোলা তোলাও আজকাল নাকি কঠিন হয়ে উঠেছে। আশু-সজির যা অমূল্য্য তাতে কেউ সোহাগ করে দিতে চায় না। সব দুরছাই করে দেয়। তবুও ওবা টিকে আছে শহরে থাকে বলে। সমাজের আর সবার কথা ভাবলে মনটা খারাপ হয়ে যায়। তখন বলতে ইচ্ছে করে—আমাদের বাঁচিয়ে রাখার জন্যে মায়াকান্না না দেখানোই ভালো। এর চেয়ে পরের জন্যে নিজের জীবনদান করে বলতে ইচ্ছে করে—পুষ্প আপনার জন্যে ফোটে না, পরের জন্যে তোমার জীবন প্রস্তুত করিও। তাই আমরা বলি—আমাদের গো-জীবন সার্থক তোমাদের সেবা করেই। তোমরা আমাদের অগ্রপুরুষ, তোমাদের নমস্কার ও শ্রদ্ধা জানিয়ে বলি—যা হয়েছে তা হয়েছে দুঃখ নেই। আমরা বলি—আবার তোর গরু হ....

জৈবিক হান্স



বিয়ে-বয়কট প্রত্যাহার

জিওফ্রে বয়কট। জিজে দাঁড়ালেই রান বয়কট। আরিও না মরিও না— এমনই নির্বিকার। গের্দবাজ ডাইনে বাঁয়ে, আগে পিছে, ওগলি জগলি, ফুল টস, ভুল টস, লেগ স্পিন বেগ স্পিন—যত কসরতই করুন না কেন, বোল্লেবাজবাবু নট নডন চডন। শুরুতে নেমে, সারাদিন অবস্থান করে, জনা চারেক সহ-খেলোয়াড়কে রান আউটের মুকুট পরিধান করিয়ে প্যাভেলিয়নে ফেরৎ পাঠানোর পর, সূর্যদেব যখন নিতান্তই বিদায় হলেন, তখন কী আর করা, খুব অনিচ্ছায়, গজেন্দ্র গমনে, বয়কট সাহেব বিরস বদনে ফিরতি পথ ধরলেন। ভাববেন না শূন্য হাতে। রান? পাঁচ। কিংবা ছয়। দশও হতে পারে। অস্থির হলে চলবে? পরদিন আবার ব্যাট করতে হবে না! এবং তার পবদিনও। এবং নিতান্ত কপাল মন্দ না হলে তাবও পরদিন!!

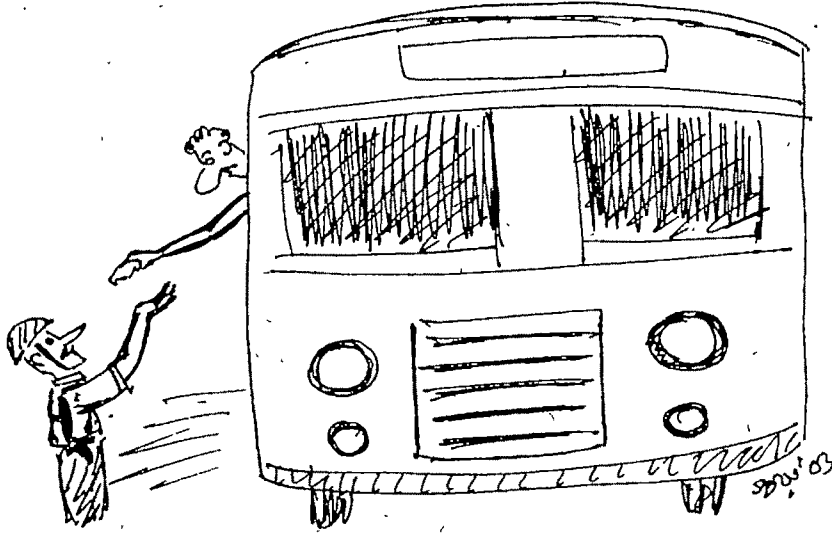
হ্যাঁ, বয়কটবাবু আর যাই হোন, জীবনে অশ্রম্য হননি কখনো। সাজা মানুষ। মাঠেও যা, ঘরেও তা। প্রেমের ব্যাটিংয়েও তিনি তাঁর ঐতিহ্য ভোলেননি। মাঠে সেধুরি সরেছেন হয়ত দিন চার-পাঁচেক সময় নিয়ে। এখানে সামান্য বেশি লেগেছে। প্রেম থেকে বিয়ে পর্যন্ত সময় নিয়েছেন মাত্র ২৯টা বছর। অবশ্য তার আগে একটি দৃষ্টিনন্দন ডবল ওভার বাউন্সারি আছে। কন্যা এন্না। সেও চোদ্দ বছর হল। কিন্তু বিয়ে? মাঠে যার এত সেধুরি, তাঁর যিনি ভাৰ্য্যা হবেন, অন্তত একটা হাফ সেধুরিও তো সাবতে হয় তাঁকে! হ্যাঁ, শেষ

পর্যন্ত পঞ্চাশ ছুঁয়েছেন প্রেয়সী র্যাচেল সুইঙ্গলহাস্ট। আর অমনি খুশি হয়ে ব্যাট, গুড়ি, হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন বয়কট দাদা—হ্যাঁ, বিয়ের পিড়িতে বসতে আর বাধা নেই।

চিমা চমক

যদিচ এ চিমা সে চিমা নন, তবে কম নন মোটেই। যেমনি দৌড় তেমনি গুটিং পাওয়ার। খানতলা কেসের বন্দী চিমা ওরকে চিমু সর্দার। কিন্তু খানতলার ধানক্ষেতে যার অনুশীলন, তাকে আটকায় কে? খেলাটা অবশ্য কলকাতায় হয়নি, হয়েছে রাণাঘাটে, খোদ সি আই ডি-র দপ্তরে। হাতে হাতকড়া পরানো অবস্থায় চিমাকে জেরা করছিলেন সি আই ডি-র একজন সাব ইন্সপেক্টর। পাশে দাঁড়িয়ে পুলিশ নয়, একজন এন ডি এফ জওয়ান। নিরাপত্তার খাসা ব্যবস্থা সন্দেহ নেই। আর তাই দেখেই টগবগিয়ে উঠলেন চিমা সর্দার। হতকড়া বাজ পড়ার মতো নেমে এল সাব ইন্সপেক্টরের মাথায়। কুলিশ পাতনে পুলিশ সাহেবের পতন এবং মুর্ছ। এবং সাইড লাইন ধরে চিমার দৌড়। রেললাইন ক্রশ। গোল-লাইন বললেও আপত্তি নেই। আর অমনি, হিঙ্গি সিনেমার কোনো প্রযোজকের সঙ্গে চিমার কোনো দহরম মহরম আছে কিনা কে জানে, একেবারে সিনেমার স্টাইলে একটি ট্রেনের আগমন। ওপারে তুমি চিমা এপারে আমি, মাঝে ট্রেন যে ছোট্ট রে... ধাওয়া করা পুলিশ-পুঙ্গবরা শূন্য হাতেই অতঃপর—না, শূন্য হাতে বলা ঠিক হবে না, যেসব বন্দুক-পিস্তল হাতে করে ধাওয়া করেছিলেন, সেগুলো হাতে নিয়েই ফিরে এসেছেন। সেগুলো কেন খুঁয়ে আসেননি, এবং না খোয়ানোটা অপরাধ কিনা জানা যায়নি, তবে পুলিশ কর্তারা ঘায়েল অফিসারকেই পত্রপাঠ সাংসপেও করে দিয়েছেন।





বেশ বেশ পরিবেশ

গত ১৩ই মার্চ সকালে খবরের কাগজে প্রকাশিত হল সেই সাংঘাতিক খবরটি—প্রকাশ্যে ধূমপান আর চলবে না। ঠোটে সিগারেট নিয়ে আগুনমুখে হয়েছে কি ছুটে আসবে পুলিশ। মুখের অগ্নিশলাকা ফেলে তখন তাঁর সাথে পাড়ি দিতে হবে শ্রীঘবে, যাকে বলে বন্দী বলাকা হয়ে। কয়েক ঘণ্টা পরেই রবীন্দ্র সরোবরের মুখে সিগন্যালে দাঁড়িয়ে চক্ষু চড়কগাছ। কর্তব্যরত ট্রাফিক সার্জেন্ট গাছের নিচে দাঁড়ানো বাইকে হাত রেখে মৌজ করে সিগারেট ফুকতে ফুকতে বশব্দ ট্রাফিক কনস্টেবলদের সঙ্গে খোশগল্প করছেন। ভাবা গিয়েছিল, এটি বুঝি বা ব্যতিক্রম। অথবা অতি কর্তব্য সচেতন পুলিশ সাহেব নাকেমুখে দুটি গুঁজেই বেরিয়ে পড়েছেন। কাগজ খুলে দেখার সময়ই হয়নি। কিন্তু দু'দিন পরেই দেখা গেল বাইপাশে সিগন্যালে একটি স্টেটবাস দাঁড়াতে হাসিমুখে এগিয়ে এলেন ট্রাফিক বাবু। ড্রাইভার সাহেব, বোঝাই গেল পরিচিত, গল্প করতে করতে হাসিমুখে এগিয়ে দিল একটি গোল্ডফ্রেক। বিশ্বস্ত সূত্রে প্রকাশ—পরিবেশ কতটা দূষিত হচ্ছে সেটা হাতেনাতে পরখ করার জন্যই এই ট্রেনিং। নইলে যদি লম্বু পাপে গুরুদণ্ড হয়ে যায় পাবলিকের। পুলিশ কি কখনো নির্দয় হতে পারে?

বয়েসের হিসেবে তাঁর কাছে কেউই ঘেঁষতে পারবেন না জার্মানিতে। গত ২৬ শে মার্চ তেড়েফুঁড়ে ১১১ তম জন্মদিন পালন করেছেন তিনি।

আসচে বছর আবার!

জায়গাটার নাম নিউ মার্কেট হলেও নিউ মার্কেটের আদৌ ধারেকাছে নয়, এবং সেখানে মার্কেট নয়, মানুষই বাস করে। মানুষ মানে অতিমানুষ। অতিমানুষই। অতিমানুষী। বয়েসের হিসেবে তাঁর কাছে কেউই ঘেঁষতে পারবেন

তেল মাথায় থাক; একশ কোটি মানুষ আমরা, দরকার হলে কোমরে দড়ি বেঁধে বাস-লরি টেনে নিয়ে যাব। কেন, প্রভু জগন্নাথের রথ আমরা টানি না?

না জার্মানিতে। গত ২৬ শে মার্চ তেড়েফুঁড়ে ১১১ তম জন্মদিন পালন করেছেন তিনি। পত্রপাঠ-এ এ সংবাদ প্রকাশিত হবে জানা না থাকায় তিনি এই সাংবাদিককে নেমস্তম্ভ করতে পারেননি। অবশ্য তার জন্যে অন্যদের কিছু আটকায়নি। কল্লি ডুবিয়েই খানাপিনা সেবেছেন তাঁর আত্মীয়-বান্ধব নাতি-নাতিনি ও তস্য নাতি-নাতিনির দল। 'আসচে বছর আবার হবে' ধ্বনি সহকারে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি, ঘটেছে বলে জানা গেছে।

ইরাক এবং ই-রাগ

জলের দরে তেলের ব্যবস্থা হতে পারত ভারতে। ৬ টাকা লিটার। অবিশ্বাস্য হলেও এই দাম। দিতে চেয়েছিলেন সাদ্দাম। তেলের বদলে উদ্বৃত্ত গম। অজিত পাজা তাঁর আমলে বাগদাদে গিয়ে বাঘ শিকারের চেয়েও অনেক বড় এই কর্মটি করে এসেছিলেন। পাজা মশাই ভেবেছিলেন তিনি বুঝি বা দেশ জয় করেই ফিরলেন। কিন্তু শুনে রাজপেয়ীজির মাথা ঝা ঝা করে উঠেছে। ইরাকের সঙ্গে দোস্তি কিংবা মস্তি কবতে গেলে যে একেবারে ই-রাগের কবলে পড়তে হবে। এ-সার্প নয়, বি-সার্প নয় একেবারে সিধে ই-সার্পের চড়া রাগ। সার্প কিংবা সাপ। বলা বাহুল্য, আমেরিকার। সুতরাং, গম খেয়ে শেষ করতে না পারলে সমুদ্রে ফেলে দেব। মাছেবা খাবে। তারপব মাছেদের আমবা খাবে। তেল মাথায় থাক; একশ কোটি মানুষ আমরা, দরকার হলে কোমরে দড়ি বেঁধে বাস-লরি টেনে নিয়ে যাব। কেন, প্রভু জগন্নাথের রথ আমরা টানি না? তাকৎ কম হ্যায় হিন্দুস্তানিকা!! বলা বাহুল্য, জগন্নাথদেব এ সমাচার শুনে পুরীতে বসেই গভীর সন্তুষ্টি প্রকাশ কবেছেন।

—পরম্ব সংবাদদাতা

নিন্দুকেরা কানমলা-সর্দারের কাছে কানমলা খেয়েই জীবন কাটাক। আর ধর্মতলার মোড়ে পিচুর মার প্রস্তরমূর্তি বসানোর প্রস্তাব অনুমোদিত হোক অবিলম্বে।

দুনিয়াটা কত আজব
তা না দেখলে, না
চিনলে বোঝা যায় না।
ছেলেবেলা থেকেই দেখে
আসছি তাদেরই সততার
বড়াই বেশি, যারা নিজেরা
খুবই অসৎ। খুব ছোট বয়সে
পিচুর মা-কে দেখতাম সবার
সঙ্গে গলা উঁচিয়ে ঝগড়া
করতে। অনুসন্ধান করে জানতে
পারতাম, পিচু কারো কিছু চুরি
করেছে। যার জিনিস চুরি করেছে
সে সেটা পিচুর মাকে জানাতে
গিয়েই তাব ঝাঁকের মুখে পড়েছে।

আমাদের ওখানে একটা গরুর
খাটাল ছিল। নির্জন দুপুরে পিচু
বাঁটে মুখ দিয়ে পেট পূরে দুধ
খেয়েছে। বিকেলে দুধের টান
পড়তেই সমর চ্যাচামেচি শুরু করেছে। শেষে কেউ বলেছে, পিচুকে খাটালের
সামনে দেখা গিয়েছিল। ব্যস, সমর বনাম পিচুর মা'র ধুকুমার গালাগালি,
ঝগড়া। পিচুর মার সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেরে শেষে পালিয়ে যেত সমর।
পালাবেই তো। সমরবা তো অমর নয়।

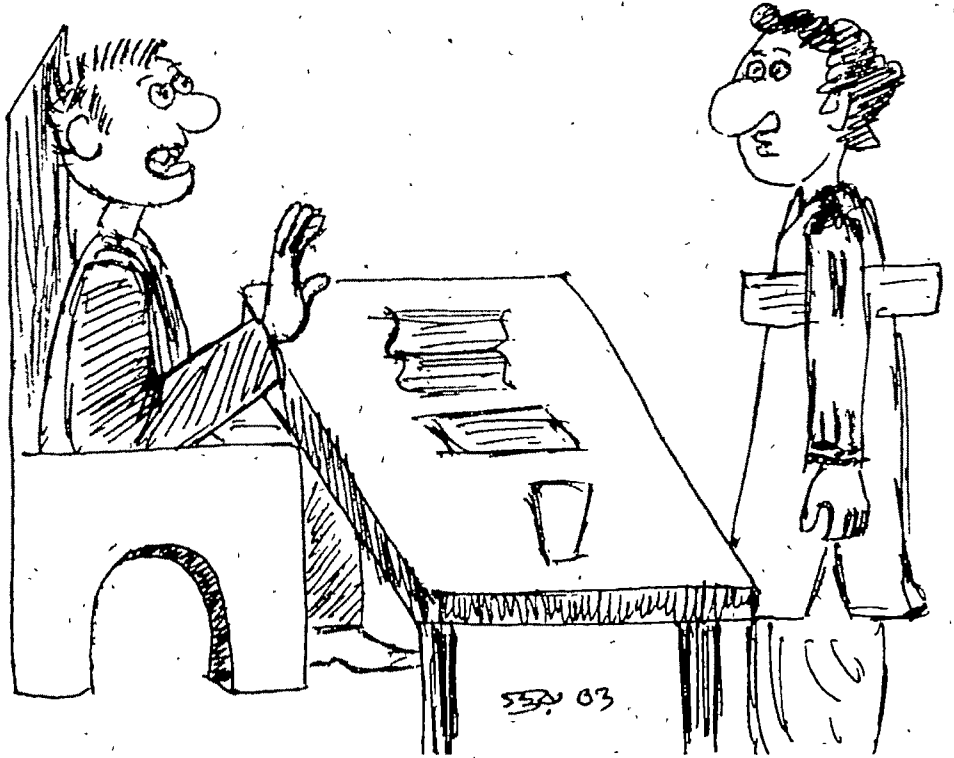
পিচুর মা'রা নানান চেহারায় সমাজে চিরকালই বিদ্যমান। কত নামে,

কত চেহাৰায়।

একজন যাত্রার পালায় অভিনয়
কবত। হযত এখনো কবে। খবর
রাখি না। সেই অভিনেতা আমার
সঙ্গে যা করেছিলেন, তা পিচুর
মাকেও হার মানায়।

আমি তখন গান লিখি।

গীতিকার হবার সুবাদে তার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন এক সুরকার।
আমাকে সেই অভিনেতা বললে যে দৃশ্য অনুযায়ী তাকে কিছু গান লিখে দিতে
হবে। সে নিজে কবি নয়, গীতিকার তো নয়ই। অথচ সে আমার গানের বাণী
বিচার করবে। ভাবলুম, হবেও বা। অজ্ঞান তিমিরান্ধসাবাই এ যুগের জ্ঞানী।
বেশ-কয়েকটা গান লিখে তাকে দিলাম। ভাবলাম সুর করবার সময় নিশ্চয়
আমাকে ডাকবে। আশায় আছি। আশায় মরে চাষা। গানের চাষ করি, চাষা
তো আমি বটেই।



একদিন সন্ধ্যাবেলা তার কাছ থেকে ডাক এল। আহা, তুমি ডাক দিয়েছ
কোন সকালে। গোলাম। না, সুরকার নয়, সেই অভিনেতা। জানালেন,
গানগুলো ঠিকমতো লেখা হয়নি। শব্দচয়ন আরো সুন্দর, গীতিময় হতে হবে।
গীতিময় হওয়াটা কি, সেটা কিন্তু বলতে পারলেন না। চাষার ভাসা-জ্ঞান তাঁর
ভাষা বোঝে, তাও হয় নাকি! তিনি রইলেন নীরবে। রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর
উদ্দেশ্যেই লিখে গেছিলেন—তুমি
রবে নীরবে!

যথারীতি সুরকারের সঙ্গে আর
দেখা হল না কোনোদিনও। গীতিময়
হওয়াটা কিন্তু কেউ ঠেকাতে পারল
না আমার। দেখলাম সেই পালায়
আমার লেখা গানের লাইন নিয়ে
যাত্রার এক কর্তব্যাক্তির নামে

সেগুলো চালানো হয়েছে। সেই অভিনেতা সেখানে অভিনয়ও কবলেন। মনে
হল, আমি না হই, আমার গান তো গান-স্যানুট পাচ্ছে। তাই সই। কৃতিবাসের
কাব্যে কত লিপিকার নিজেদের লেখা ঢুকিয়ে দিয়েছে। নামে কি যায় আসে।
তবু বাঙালি তো। তাঁকে কথটা বলতে গোলাম। সুরকার কোথায়, দেখি এ
আর এক পিচুর মা। স্ত্রীলতার মুখোস খসে বেরিয়ে এল নির্লজ্জ ভাষা এবং
ব্যবহার। পিচুর মা শুনলেও পিটান দিত।

একজন নামি রাজনৈতিক নেতা। সাদা লেবেল লাগিয়ে ঘুরে বেড়ান।

পিচুর মায়েরা

সুশান্ত রায়

নামিদের এমনই মুন্সিল যে তাঁরা সাচ্চা ছাড়া আর কিছু সাজতেই পারেন না। কপাল। কত সততার গল্প ফেঁদে বেড়ান। কোনো এক নির্বাচনের সময় তাব চুরি, আমার চেয়ে ভালো কে আর জানে। অনেকেই জানে বা জানত। কিন্তু তারা অনেকেই পয়সায় বিকিয়ে গেল। জেনে না-জানা বাবুর্চাই এখন দলে ভারি। এখনো কিছু লোক তাকে অন্ধের মতো ভোট দিয়ে নির্বাচন জেতায়। তাব চুরির সামনা-সামনি প্রতিবাদ করায় আমার পেছনে তার গুণ্ডাবাহিনী লেগেছিল। পুলিশও লেগেছিল। দোষ দিতে পারব না যে পুলিশ নিষ্ক্রিয় থেকেছে। কিছু করতে না পেরে শেষে কী দুঃখ তাদের। দেখলে বুক ফেটে যায়। এখন সমস্ত কিছুই অস্বীকার করে। বলে, তেমন কিছুই কখনো ঘটেনি। ওঁরা এ যুগের বেদব্যাস। ওঁদের কথাতেই অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ

ইদানীং সাহিত্য জগতের কেউ
কেউ সরকার-খোদার খাস
বান্দা হয়ে উঠেছেন। পত্র-
পত্রিকার সম্পাদক, লেখকদের
হাত এখন ঢের লম্বা। ভূতের
মতো। এর তার ঘাড় ইচ্ছে
হলেই মটকে দিতে পারেন।

সবাই এক-দো বলে প্যারেড করতে করতে চলে। বর্তমান প্রচারে সে এখন উঁচু সারির শীর্ষনেতা। জনগণের দরদে প্রায় চোখে জল এসে যায় আর কি। সস্তর দশকে যুবক নিখনে যার হাত ছিল সে এখন সম্মানিত জননেতা। পিচুর মা যুগ যুগ জিও।

ইদানীং সাহিত্য জগতের কেউ কেউ সরকার-খোদার খাস বান্দা হয়ে উঠেছেন। পত্র-পত্রিকার সম্পাদক, লেখকদের হাত এখন ঢের লম্বা। ভূতের মতো। এর তার ঘাড় ইচ্ছে হলেই মটকে দিতে পারেন। তাঁদের মাহাত্ম্য কীর্তন একটু না হলেই নয়। কোনো এক পত্রিকার সম্পাদকের কাছে আমি একটা গল্প জমা দিয়েছিলাম। তখন জেরজের এত রমরমা ছিল না। তাই মূল পাণ্ডুলিপিটাই জমা দিয়েছিলাম। তিনি তখনকার মতো গল্পটি পড়ে অনুমোদন করলেন। আমিও আশাবিত্ত যে, এইবার হয়ত গল্পটা ছেপে বেরাবে। কা কস্যা পরিবেদনা। একমাস গেল, দু'মাস গেল, এবং এরকম করে প্রায় মাস ছয়েক চলে যাবার পর একদিন সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি কপালে চোখ তুলে (সম্পাদকের কপালে চোখ তোলা নাকি জন্মগত প্রতিভা, পরে জ্ঞানলাভ

করেছিলাম।) বললেন—সে কি। আমি তো গল্পটা কবে ফেরৎ দিয়ে দিয়েছি। আচ্ছা, ঠিক আছে, পরে এসো। দেখে বলব।

আর দেখতে হল না। আমার লেখা সদয় হয়ে আমাকেই দর্শন দিল। একটু মেক-আপ বদলে উনিত হল মঞ্চে। মায়া প্রপঞ্চে। কোনো এক বহুল প্রচারিত পত্রিকায়। সামান্য অদল-বদল করে। অন্য লেখকের নামে। সেই লেখককে সরাসরি কোনোদিন প্রদ্ব করবার সৌভাগ্য হয়নি আমার। তবে সম্পাদকের কাছে গিয়েছিলাম আর একবার। তিনি প্রথমে কপালে চোখ তোলার অভ্যেসটা ঝালিয়ে নিয়ে অস্বীকার করলেন। তিনি আমার থেকে ছাপাবার জন্য কোনো গল্প নিয়েছেন? রাম রাম। পরে বললেন—যার লেখা টুকে এনেছিলে তার নামেই তো গল্পটা ছাপা হয়েছে। বেশি বাড়াবাড়ি করো না। ওদের হাত অনেক লম্বা। কখন যে কী ফাঁদে পড়বে বলা যায় না।

আমি প্রতিবাদ করতেই তাঁর চেহারা বদলাল। হিংস্র চাউনি আর চেল্লানিতে দফতর মাথায় তুলে ফেললেন। তিনি কবে কাকে কি করেছেন, আমবা কতটা ভিখিরি, তিনি আমাদের কত সাহায্য করেছেন, আমরা সব নেমক হারাম, বেইমান ইত্যাদি ইত্যাদি।

পিচুর মাকে আবার দেখতে পেলাম। সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি পরা পিচুর মা। তিনি এখনো বেঁচে আছেন। পত্রিকাটির গঙ্গাপ্রাপ্তি হয়েছে। মাঝে মাঝে কোনো সভা-সমিতিতে সম্পাদকের সততা ও প্রতিভা আবিষ্কার নিয়ে বক্তৃতা দিয়ে থাকেন। হাততালি পান। গঙ্গার দুর্ভাগ্য। রাম তেরী গঙ্গা ময়লী। এমন পুণ্যবানকে কোলে ধারণ করে শুদ্ধ হবাব সুযোগ আজও পাননি মা গঙ্গা।

‘তুমি মহারাজ, সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর.....’ রবীন্দ্রনাথ লিখে গিয়েছেন এবং কোন প্রসঙ্গে, সেটা আমাদের সকলেরই প্রায় জানা। সাধুসঙ্গে পুণ্যলাভ হয়। আমাদের পুণ্য ঋণায় কে? কোন্ ইয়ে।

আজও এর কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি। কেউ একজন তার বিপদের সময় আমার কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েছিল। এবং প্রায় পা-ধরাধরি করে। রবীন্দ্রনাথের কাছে দশটাকা ধার নিয়ে একজন বলে গেছিলেন—‘আমি আপনার কাছে চিরঋণী হয়ে বইলাম।’ আমার মতো তুচ্ছকে এত সম্মান দান করা স্বভাবতই তাঁর কাছে মূর্খের স্বর্গলাভের সামিল বলে বোধ হয়ে থাকবে। ফলত বছর কয়েক বৃথা রবীন্দ্রনাথ হওয়ার প্রতীক্ষায় থেকে একদিন ফোনে টাকা ফেরতের কথা পাড়লাম। তিনি বললেন—কিসের টাকা? আমি তোমার কাছ থেকে কোনো টাকা-পয়সা নিইনি। এ ব্যাপারে আমাকে আর কখনো বিরক্ত করবে না। করলে ফল ভালো হবে না।

ফোন রেখে দিলাম। তবে বাড় সুখ হল, যখন জ্ঞানলাম, সে আমার সম্পর্কে নানান রকম কুৎসা আর নিদে ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ কি, তিনি আমাকে যে বিদ্যাসাগরের সম্মান দিয়ে বসেছেন। একবার বিদ্যাসাগরের কোনো অঙ্ক ভক্ত উত্তেজিত হয়ে বলেছিলেন,—পণ্ডিত মশায়, অনুমতি করুন, অমুক গাঁয়ের তমুক ন্যায়রত্ন আপনাকে যাচ্ছেতাই গালমন্দ করছে; আর যে সহ্য হয় না। একটা হেস্তনেস্ত—বিদ্যাসাগর মশায় বাধা দিয়ে বলেছিলেন, তা কী করে হয়। আমি তো ওর কোনো উপকারই কখনো করিনি।

তিনি বা তেনারা বহাল তবিয়েই থাকুন। নিদুকেরা কানমলা-সর্দারের কাছে কানমলা খেয়েই জীবন কাটাক। আর ধর্মতলার মোড়ে পিচুর মার প্রস্তরমূর্তি বসানোর প্রস্তাব অনুমোদিত হোক অবিশ্যি। আমরা দু’হাতের চেটায় সর্বের তেল মাশিশ করতেই থাকি। অনেককণ হাততালি দিতে হবে তো। শুধু, দু’হাত যদি কখনো আত্মবিশ্ময় হয়ে মূর্তি পাকিয়ে ওঠে, ওপীজন, নিজগুণে কোনো হে মার্জনা।

চোরের মা এখানে কো-অর্ডিনেশন কমিটির জঙ্গি নেতা। চুলে পাক, চোখে রিমলেস চশমা, দু-আঙুলের ফাঁকে ক্লাসিক সিগ্রেট। এপাশে ওপাশে পাঁচজন পাঁচজন দশজন সাগরেদ। অতীব বশংবদ।

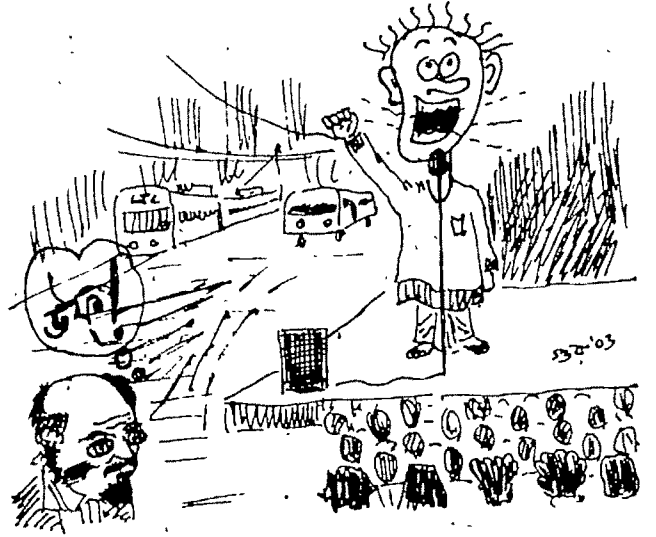
ফজলে আলির ফাজলানা

হুঁশিয়ার হো

Wake up my soul!
Wake up, my harp and lyre!
I will wake up the sun
Psalm 108, The Bible

‘চোরের মায়ের বড় জালা’। সেসব বিশ প্রজন্ম আগের কথা। তখন চোরের মায়ের লাজ-লজ্জা ছিল। মাথা নিচু করে থাকত। মুখ তুলে কারো সঙ্গে কথা বলা তো দূরের কথা, ছেলে দশ জায়গা থেকে এটা ওটা চুরি করে আনলে মা ভয়ে সিটকে থাকত। এই বুঝি লোকের কাছে হেনস্থা হতে হয়। কিন্তু অভাবের সংসার, সোমন্ত ছেলে, কীই বা কবাব আছে মায়ের? আডালে আবডালে চুপি চুপি কান্দত। চোখের জল ফেলত। পেটের ছেলে চুবি কবে বেড়াচ্ছে, এ কি কম দুঃখের? অথচ কিছু বলতেও পারে না; আবার এই চুবিচুবিগুলো মেনে নিতেও পারে না। আসলে মন সাম দেয় না। হাজার হোক, অন্যায় কাজ তো। ওপবওয়ালারা চুবিব দায়ে ছেলেকে খবে নিয়ে গেলে মা নিঃশব্দে কান্দত। কথায় আছে না, ‘চোরের মায়ের কান্না উগবোবাবও নয় ফুকবোবাবও নয়’? স্বয়ং পদকর্তা চণ্ডীদাস সাক্ষা দিচ্ছেন, বলছেন: ‘চোরের মা যেন চোবের লাগিয়া ফুকরি কান্দিতে নারে’। তখন ছিল, চোবের দশদিন, সাধুব একদিন’। তখন চোরের কথা কেউ বিশ্বাসই করত না। বলত—‘চোবের কথায় কোথা কে কবে প্রত্যয়’? তখন ছিল ‘চোব শুমরের একই পথ’। সে পথ নোংরা, আবর্জনাময়। বন-বাদাড, জল-কাদা, আক্তাকুঁড় ডিঙিয়ে তাব যাতায়াত ছিল।

কিন্তু দিনকাল পাটেছে। এখন চোবের মায়ের লজ্জা-সঙ্কোচের বালাই নেই। তাব চোখে জল থাকে না, রাকদ থাকে। সে কর্তিত ওষ্ঠ, মানে ঠোট-কাটা। সে জানে, জমানা বদল গয়া। ‘জোর যাব মলুক তার’। এখন গলাবাজির দিন। যাব গলায় জোর বেশি, সে-ই শক্তিশালী। তারই জিৎ। সমাজে তারই খ্যাতি। এখন, ‘চোবের মায়ের বড় গলা, খেতে চায় সে দুধ-কলা’। এখন সমাজে চোরদেবই সম্মান, প্রতিষ্ঠা, খ্যাতি। চুরি এখন স্ট্যাটাস সিঙ্ঘল। এলেমদার লোক হতে হলে চোর হতে হবে। গড়ের মাঠের মতো বুকুর পাটা চাই। মনুমেন্টের মতো মাথা উঁচু করে চলতে হবে। জেনুইন রয়াল বেঙ্গল



টাইগারের মতো হবে গলাব আওয়াজ। AK47 নিয়ে আনকালচাবুড পারলিককে শায়েস্তা করতে হবে। চোবের মায়ের তাই এখন বড়ই বমবমা। স্তাবকেবা প্রতি মুহূর্তে তাব স্তবকীর্জন করে। বেশ জানে, চোবের মা খুশি থাকলে তাদের উন্নতির পথ প্রশস্ত। কারণ চোব অন্ধ মাতৃভক্ত। মায়ের আগাম অনুমতি না নিয়ে চুরি কবে না। মাকে তিনশ পয়ষটি দিন দুধ-কলায় বশীভূত বাখে। সে দুধেব স্বাদ আলাদা, বর্ণ আলাদা। আব কলা? অতিশয় দলভ, দুপ্রাপ্য। দেবজোগা, দেবজোগা। মুন্সুক হিন্দুস্তান মে নোহি মিলতা হ্যায়। যো তি নোহি খায়া ওডি পস্তায়া।

একালে দিনে-দুপুরে পুকুর-চুরি হয়। মাটি বোঝাই ডজন ডজন লরী এসে চোখের পলকে পুকুরকে ড্যানিশ করে দেয়। এবকম কর্মসংকীর্তি রাজ্যের সমস্ত কেন্দ্রে বজায় থাকলে রাজ্যটা এতদিনে স্বপ্নবাজ্যে পরিণত হত। পুকুর-চোবের এলাকায়তো নাম প্রমোটা। দু-পাঁচজন ইন্ডিয়ট পারলিক খেউ খেউ করে। চোব মিটিমিটি হাসে। দু-পাঁচজন ক্ষুদ্রে সাংবাদিক আব ল্যাংবোট ফটোগ্রাফার উকি-খুকি দেয়। চোর মউজ কবে সিগ্রেট টানে। চোরের মা শবরের কাগজকে

বুড়ো আঙুল দেখিয়ে, টিভি খাসখবরকে খোশখবর বানিয়ে হুঙ্কার ছাড়েন: 'এখানে কামিনকালেও পুকুর ছিল না। ছিল অ্যান্টিসোশ্যাল ক্রিমিনালদের খাঁটি।'

চোরের মা হলেন পুলিশের বড়কর্তা অথবা মহামান্য মন্ত্রী। ব্যস, মামলা বরবাদ। অভিযোগ নস্যাৎ হয়ে যায়। দেখতে দেখতে সেখানে গড়ে ওঠে মাল্টি স্টোরিড ফ্ল্যাটবাড়ি। নয়নাভিরাম সেই ফ্ল্যাটবাড়িগুলি ছা-পোষা পাবলিককে ভেংচি কাটে। চোর এবং চোরের মায়ের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট স্ফীত হয়ে ওঠে। চোরের মুখে ফিটেল হাসি। চোরের মা চোরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ: 'জীতা রহো বেঁটা, জীতা রহো। অ্যায়সা মাফিক কাম করো। শরমভি ছোড়ো, ধরমভি ছোড়ো।' স্টুপিড পাবলিক কচুপোড়া খায়, ফ্ল্যাটবাড়িগুলির দিকে জুলজুল করে তাকিয়ে থাকে।

মধ্য দুপুরের সরকারি অফিস। অফিসবাবুরা দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির পর্যালোচনা শেষ করে আন্তর্জাতিক দুনিয়ার সফর সবে শুরু করেছেন। এখনো খেলার ধারাবিবরণী বাকি আছে। টিফিনের সময়ও হয়ে এল। আবার তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। ট্রেনে-ট্রামে-বাসে আজকাল বড্ড ভিড়। ফাইল-পত্ৰ নট নড়ন চড়ন। অফিস-বসও স্পিকটি নট। চুরি, চুরি। এভাবেই অফিসের কাজের সময় চুরি হয়। প্রতিবাদ করে লাভ নেই। চোরের মায়ের জিভে ফুরুর ধার: 'কাজ-কর্ম হচ্ছে না তো রাজ্যটা এমনি এমনি চলছে নাকি মুশাই। এরিয়ার ডি. এ-গুলো ইমিডিয়েটলি মিটিয়ে দিতে বলুন। দেখুন কাজের বন্যে বইয়ে দিই কি না।' চোরের মা এখানে কো-অর্ডিনেশন কমিটির জঙ্গি নেতা। চুলে পাক, চোখে রিমলেস চশমা, দু-আঙুলের ফাঁকে ক্লাসিক সিগ্রেট। এপাশে ওপাশে পাঁচজন পাঁচজন দশজন সাগরেন্দ। অতীব বশব্দ।

পঞ্চায়েতে মাটি চুরি হয়, গাছ চুরি হয়, বি পি এল তালিকায় গরিব মানুষের নাম চুরি হয়। তাতে কিছু যায় আসে না তো। চোরের মা—কোনো না কোনো পার্টির নেতা—এগিয়ে আসেন। হুঙ্কার ছাড়েন: 'সব বুট্ হ্যাম,

সব বুট্ হ্যাম।' দিব্যি সবকিছু ম্যানেজ করে দেন তিনি। এটাই তো তাঁর দায়িত্ব, পবিত্র কর্তব্য। প্রশাসন খুশি হয়। ভোট যায়, ভোট আসে। মাটি চুরি হয়, গাছ চুরি হয়, বি পি এল তালিকায় গরিব মানুষের নাম চুরি হয়। সব বুট্ হ্যাম।

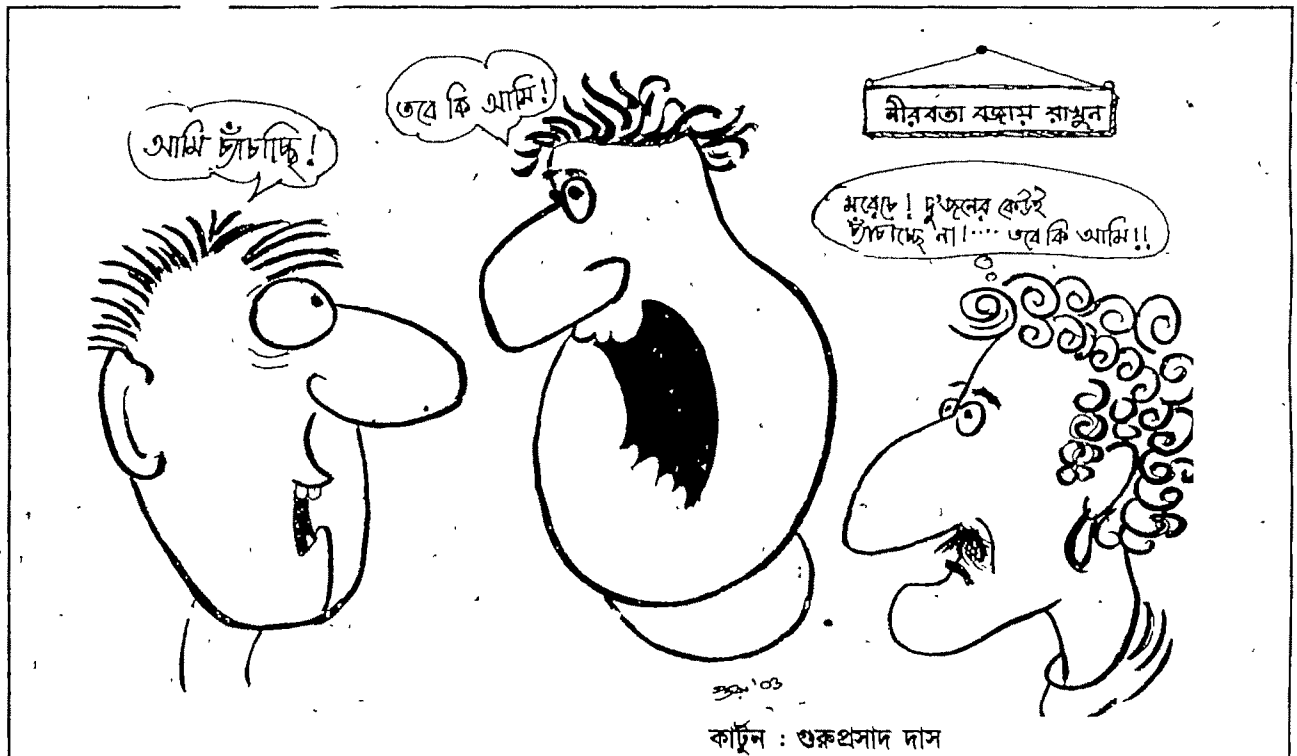
বিধানসভার অধিবেশন বসে। দু-একদিন উপস্থিত থেকে অধিকাংশ দিন গরহাজির থাকেন অধিকাংশ সদস্য। নাই বা থাকলেন উপস্থিত। যতদিন অধিবেশন চালু থাকে ততদিনের ভাতাই কিন্তু পেয়ে যান তিনি। রোজ সাড়ে তিনশ টাকা হিসেবে। চুরি নয়? জনগণের টাকা চুরি নয়? কাজ না করে মজুরি নেওয়া চুরি নয়? কে কী বলবে চোরকে? আশেপাশেই আছেন চোরের মা। তাঁর কৈফিয়ৎ তৈরি: 'প্রতিদিন হাজারটা সভা-সমিতি, এ অনুষ্ঠান ও অনুষ্ঠান। আরে মুশাই, ফি-দিন কত মিটাও ফিতে কাটতে হয় জানান?'

সত্যিই তো? জন-প্রতিনিধিকে কম হ্যাপা পোয়াতে হয় নাকি? না না, চুরি নয়, ও টাকাটা তো শ্রদ্ধার্থ্য। আর ক'টাই বা টাকা। কসুর মাপ কিজিয়ে। দয়া করে এ সম্মান-সঙ্গিণাটা গ্রহণ করুন। আমাদের কৃতার্থ করুন। আপনারা আমাদের গার্জেন। গার্জেনের কোনো অপরাধ থাকে না।

অদূরেই সিধু-কানহো ডহর। নিত্য মিটিং মিছিল। লাউড স্পিকারে বিপ্লবের তুবড়ি ছোটে। অগ্নিবীণা লেঙ্গ ওঠে। জনগণ উল্লসিত। স্পষ্ট শুনতে পায় বিপ্লবের পদধ্বনি।

কয়েক গজ ব্যবধানে দাঁড়িয়ে কমরেড লেনিন পথ-চলতি মানুষজনকে দেখেন, মেহনতি হকারদের মেহনতের তারিফ করেন এবং সিধু-কাশহো ডহর থেকে ভেসে আসা বিপ্লবের বুলি হজম করেন।

প্রিন্স কমরেড লেনিন, মহান লেনিন, রাইফেলটা নিয়ে একটব্যর স্ট্যাচুর ভেতর থেকে বেরিয়ে আসবেন? বজ্রধ্বনিতে গর্জে উঠবেন: 'ইশিয়ার হো, ইশিয়ার হো.....'?



চৌরচরিত

গোপলা বোস



চোরেদের মায়েদের বড় গলা নিয়ে তুমুল আলোচনায় তাদের গোসা হতেই পারে। তারা বলতেই পারে—কেন বাপু, ভালোমানুষের মায়েদের গলাই বা কিসের কম? এত টানাটানি কেন আমাদের নিয়ে। তা নিশিকুটুম্ব-জনীদের নিয়ে আমরা অনেক সময় অকথা-কুকথা বলে থাকি। তার জন্য নিশিকুটুম্ব বা তাদের গর্ভধারিণীদের দায়ভাগও বড় কম বলে বোধ হয় না।

নিশিকুটুম্ব প্রজাতির অনুচরিত মস্ত্র হল—বসু খৈব কুটুম্বকম। ঠিকই তো, নিশিকুটুম্বদের পৃথিবীতে বাছবাছি করলে চলবে কেন? তবে আর সবায়ের মতো ধনী কুটুম্বদের দিকে তার পক্ষপাতটা থেকেই যায়।

চোরের মায়েদের বড় গলা আমরা খুব শুনেছি। নির্বাচনে আগাপাঙ্গলা 'রিগিং' করে জনগণতন্ত্রের খুব প্রশংসা শুনেছি। তহলুকা টেপ কেলেকারির হলুকা থেকে বাঁচতে আত্মসাক্ষাইয়ের নির্লজ্জ কল্কাও দেখেছি। সবাই যে

চোরদের আর তাদের নিয়ে ভীষণই অনধিকার চর্চা করে থাকে তাও ঠাঠাঠা করে আমাদের শোনানো হয়েছে। তা ভবী কি আর ভুলবার? আমাদের এত চেস্ দেওয়া হচ্ছে, এত কেস্ দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু আমাদের তাতে কিছুমাত্র ক্রেশ কোথায়?

আমাদের দেশে চৌর্যবৃত্তি ভারী সম্মানিত। বড় বড় সব সাহিত্যিকরা চোরদের অনেক কাহিনী উপাখ্যান ইত্যাদি ফেঁদেছেন। তাদের জননীদের নিয়েও আছে অনেক ব্যাখ্যান। চোরের মায়েরা নিশ্চয় চোর নয়। কিন্তু তাদের নিয়ে এত টানা-হ্যাঁচড়া কিসের?

আসলে চোরেরা চুরি করার পরে তাদের মায়েরা গলা তুলে সাফাই গাওয়া শুরু করলেই তবে না তাদের নিয়ে টানাটানি।

আমরা বিবেকবান, তত্ত্ববৃত্তিতে দীর্ঘকাল ধরেই অভ্যস্ত। মৃত সৈনিকের কফিন ধরে ধরে কমিশন খাই, দাগী দাগী সব অপরাধী কারান্তরালে বসে ভোটে দাঁড়ায় এবং কি সুন্দরভাবে সাংঘাতিক সব পিলে চমকে দেওয়া ভোট পেয়ে জিতেও যায়। আমাদের দেশের প্রতিরক্ষায় কমিশন আমাদের আত্মরক্ষারই স্বার্থে। আপনি বাঁচলে বাপের নাম, এবং কে না জানে বাপের নাম বাঁচলে দেশের নামও বেঁচে যায়। সবই ঐ প্রাকৃতিক খাদ্য-শৃঙ্খলের মতো! ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

দেশের রাস্তাঘাট হঠাৎ হঠাৎ খুব ভালো

হয়ে যায়। আবার হঠাৎ হঠাৎই এখানে ওখানে গর্ত দেখা যায়। সারা জীবনে একবার রাস্তা সারালেই চলবে? তাই এইভাবে রাস্তা শরীরের কিছু জায়গায় ক্ষত নিয়ে মুখ ভ্যাঙাতে থাকে। মহামতি বিল ক্রিস্টন সামান্য এক মণিকা লিউনক্লির পাল্লায় পড়ে জনগণের সামনে কত বার হাজিরা দিতে বাধ্য হন। অথচ আমেরিকায় তা জলভাত। কিন্তু আমাদের তো অন্যভাবে জীবন যাপন। কই, তদন্তে তো কিছু প্রমাণিত হয়নি? অতএব আমি পরে নিলাম নামাবলী। আমি তো যেচ্ছায় আমার পদ ছেড়ে চলে গেছিলাম। উনি আমার সততার পুরস্কার স্বরূপ ফের ডেকে এনে পদ ফিরিয়ে নিলেন। উনি বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ, আত্ম আছেন কাল নেই, ওনাকে ফেরাই কি করে? উনি যে ভারী খুশি হয়েছেন তা ওনার চোখ পিটপিটুনি দেখেই বোকা যায়।

—তা মশাই আপনি এত সৎ কেন?

—তাই তো। আচ্ছা বেশ, তার কারণ খুঁজে বার করতে একটা তদন্ত কমিশন বসানো হোক। দেখছেন তো, আমার এটা দু'নম্বরী সততা—আমি

কোনো তদন্তে ডরাই না।

এসব বাজকীয় উপমার মাঝে একটা পাতি ঘটনার কথা বলা যাক। ছোটবেলা দেখেছি সোনাদা বাড়িতে কাজ করত। সকালে আসত, সন্ধেতে যেত। কাছেই বাড়ি ছিল তার। সে গরুর যত্ন করত। আবার সকালে কেউ ওঠার আগে বাগ্মাঘরে ঝাঁট দিত, জলটল তুলে দিত। সে ছিল বেশ বিশ্বস্ত।

একদিন আমার পিসি হঠাৎই সকালে উঠে বাগ্মাঘরের দিকে গিয়ে দেখে সোনাদা তাড়াতাড়ি করে কাপড়ের কোঁচড়ে কি যেন লুকোনোর তাল করছে।

পিসি কাছে গিয়ে বলল,—কি সোনাদা, ওটা কী লুকুচ্ছে?

সোনাদা ছিল যথেষ্টই স্মার্ট। সে সামান্য এক পিসিকে ভয় পাবে কেন? সে কাপড়ের কোঁচড় থেকে দুটো বাসি কটি বার করে সেগুলো বাগ্মাঘরের যথাস্থানে রেখে দিয়ে বলল,—যাকগে যাকগে, যা হবার হয়ে গেছে, লোককে জানিয়ে আবার কাজ নেই।

সত্যিই তো! এতসব অপ্রাকৃত কথাবার্তা লোককে তো জানিয়ে কোনো কাজ নেই। লোকেরও বা বলিহারী। তাদের কি শেষেদেয়ে আর কাজ নেই।

কেন আমাদের কোনোরকমে দুটো নাকে-মুখে গুঁজে অফিসে ছুটে আসতে হবে? অফিসে কাজ করি বলে কি আমরা মানুষ নই?

না, তাবা হচ্ছে সর্বঘাটে কাঁঠালিকলা। এমন গুলি শোন, তা নয়, সে সব নিয়ে আলোচনাসভা, ধিক্কাব, প্রতিবাদসভা—কত কি সব বড় বড় ব্যাপার খাটিয়ে ফেল। তাদের যদি সন্মান্য বোধশক্তি থাকত। আরে বাবা, চেম্বেরদেব কি মান-সন্মান নেই নাকি যে তাদের নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া করতে হবে? চোরদেব নিয়ে এমন ঝামেলা শুরু করলে তাদের মায়েরা বড় গলা করে চ্যাচারে না? পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রে প্রত্যেকেরই যে গণতান্ত্রিক অধিকার আছে নিজেদের মতো স্বাকার' চান বলে সে কি গণতান্ত্রিক হতে পাববে না?

আমাদের কিছু অধিকার আছে, মানে ছিল আবার কি। কোন দুঃখে আমরা ঠিক সময়ে অফিস যাব? কী হবেটা কি ঠিক সময়ে অফিসে গিয়ে? একটু ধীরেসুস্থে পান চিবোতে চিবোতে অফিস গেলে কার যে কী ক্ষতি হয় বুঝি না বাপু। তা নয়, হঠাৎ কোথেকে ঘাড়ে এসে চেপে বসল কি এক কর্মসংস্কৃতির অপদেবতা। নাকি ঠিক সময়ে অফিসে আসতে হবে, কর্মটর্ম সব সাবতে হবে। কর্ম সেবেছে বে।

ঠিক সময়ে অফিসে আসা গেল। তাব ওপব কাজও কবতে হবে? মামদোবাজি? মাইনে-টাইনে বাডাবার নাম নেই, কাজকর্মের সুবিধে দেবে না, অফিসে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নেই—এসব অবস্থায় কি কাজকর্ম মন দেওয়া যায় নাকি? যত্নসব।

সবাইকে ঠিক সময়ে অফিসে আসতে বলাব পব কত গণতান্ত্রিক আন্দোলন হল। সবাই এতদিন ভুলেই গেছিল ক'টায় লাল দাগ পড়া নিয়ম, কটায় অনুপস্থিত কবা নিয়ম। নতুন সার্কুলাবে বলে দেওয়াও হল। চালু কবলেই তো হবে না—লাল দাগ মারার জন্য লাল পেনও চাই। লাল পেনেব খোঁজ পড়ল।

সবাই খুব ক্ষুব্ধ। কেন আমাদের কোনোরকমে দুটো নাকে-মুখে গুঁজে

অফিসে ছুটে আসতে হবে? অফিসে কাজ করি বলে কি আমরা মানুষ নই?

অফিসের মোটাবৌদি আপত্তি জানাচ্ছিলেন—কি মুশকিল হল বলা তো? সংসাবে কত কাজ থাকে বলা। সে সব করে, গোপালকে খাইয়ে তবে না আসতে হয়!

সবাই উৎসুক হয়ে ওঠে,—গোপাল? সে আবার কে? আপনার ছেলে তো দিল্লিতে থাকে। আবেকটা আছে নাকি?

জানা গেল, তা নয়। গোপাল হল ভগবান নাডুগোপাল।

বড়বাবু ছোটবাবু মেজবাবু সবাই অল্পবিস্তর কুপোকাং। কারোর ছেলে পড়ে পুরনো বারান্দাব স্কুলে। কাবোব মেয়ে পড়ে কাঠগুদামে, কাবোব ছেলের আবার ভুলিয়ান দে-তে নাম লেখানো। কাবোব গিমি আবার মিষ্টি করলাদেব 'কৃষক হলে' মাস্টারি করে। এতসব সামলে কি অফিসে ঠিক সময়ে আসা যায়, না আসা উচিত?

কেউ কেউ আবার আউটডোব ডিউটির ধান্দা করল। তাহলে বেশ বাড়িতে বসে বাইরে বেডানোর ডিউটি কবা যাবে। ঐ সপ্তাহেব দু'একটা দিন চশমা নাকের ডগায় তুলে তিন-চারদিন সই করা যায়। কিন্তু সে গুডেও বালি। বলে কিনা বোজ্জই অস্ত্রত অফিসে সই করে যেতে হবে। এ তো বীতিমতো অত্যাচার।

এত কিসের কাজেব আঠা কে জানে। হুঁঃ! কর্মসংস্কৃতির জোয়ার।

বড়সাহেব একটু নবম-সবম লোক। তাকে সবাই মিলে শাসানো হচ্ছে—রোজ রোজ এভাবে লাল দাগ—অবসেন্ট মারা চলবে না। বাপ-ঠাকুর্দার আমলেব এতদিনকার সংস্কৃতি এভাবে চলে যাবে? আমবা চ্যাচার না?

কে একজন তেজ দেখিয়ে কি একটা বেআইনি ভিডিও তুলেছিল। সেই পহেলকাকে কেনন আমবা ক্রমশ 'এক পহেলী' কবে দিলাম। আরে আমরাই তো এরকমভাবে বড় বড় চুবি কবব। না কি করবে ওপাবের শ্যামাপদ?

এসবকে কী কবে যে দুর্নীতি বলে যাচ্ছে সবাই। দুর্নীতি আবার কি? যেসব টাকা আমবা নিচ্ছি তা তো কারোব না কারোব কাছে থাকতই। তা আমাদের কাছেই না হয় থাকছে। আমবা তো হিসেবেব টাকাই নিচ্ছি। একজন না একজনকে কাছে তো থাকতই!

লোকে কতবকম কথা বলে। কতবকম কেলেকারিবিব কথা। কেলেকারি আছে বলেই না কেলেকারি ঘটবে। অন্য কাবোর বদলে আমবাই না হয় কবলাম। তবে হ্যাঁ, আমাদের শান্তি বিঘ্নিত হয় বলেই না সবকটাকে জেলে পাঠাই। জেলে বসে বসেই না হয় লেখো বাপু তত্ত্ববৃত্তিব ডিঙিকাহিনী। কেউ কিছু বলবে না। তবে কিনা আমবা মাফিয়া হতে বড় ভালোবাসি। তোমবা হযত বলবে—পথে ইয়ে কববে আবার চোখ রাজাবে?

চোখ রাজাতে হবে বৈকি। নাহলে তোমারা শুনবে? কাচের ঘরে বাস কবি না বলেই অন্যের ঘরের দিকে চিল ছুড়ি। তোমাদের মতো অজ্ঞজন তো বলবেই—চোবের মায়েব বড় গলা! লাদেন ছিল এক আর এখন হয়েছে সাদ্দাম। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশের তো কিছু একটা চাই। নাহলে যে জনগণ মানে না। ওসব ভুলে গেলেই হবে যে সাদ্দাম কার হাতের তৈরি। যুদ্ধ যুদ্ধ বলে চ্যাচাতেই হবে। এবং যুদ্ধও কবতে হবে। আমেরিকাব ওপব আছে না সারা পৃথিবীকে অজ্ঞহীন কবার মহান কুমারী দায়িত্ব। কোথাকার কে এক ইবাক কেন ফালতু পাবমাগবিক, আব জীবানু অস্ত্র বানিয়ে চলবে?

আমরা সবাই প্রায় একই। চোবের মায়েব গলার তেজ না থাকলে আশ্বরক্ষার উপায় কি?

তুমি একবার তহলকা দেখাও, আমিও তোমাকে জেলেব হলকা খাইয়ে মারব। আমার বাঁহাত বেশিগাত্রায় সচল হতেই পারে, কিন্তু কাজ না করলে কেন তোমাদের অভিযোগে মুখ সচল হবে? এই তো, এখন আমাদের তত্ত্ববৃত্তির গাজোয়ারি গলা সাধা—চোরে জোবে গা গং—চোরেব মায়ে করে খাবে উপযুক্ত সজ্জত। সজ্জত কাজই বটে।

হেঁ স্নেল



অঙ্কন : মণিকান্ত

হপা (চিচিঙ্গা)র কুটু

কি কি লাগব্যা : ছুটু ছুটু খাদি কইর্যা কাটা হপা ২ কাপ, কুচানো কাঁচা লঙ্কা আধ চামচ, সিদ্ধ করা ছোলার ডাল ১ কাপ, হলুদ ছুটু চামচের ১ চামচ, জিরা অল্প, রসুল ৪ কোয়া, নারকোল কোরা আধা কাপ, তেঁতুল দু গুলির আকারে, নুন পরিমাণ মতন, কারি পাতা ১টি ডাল, নারকোল ত্যাল ২ মাঝারি চামচ, সর্ষে আধা চা-চামচ, বিউলির ডাল অল্প, চাকা কইর্যা ছুটু পেঁয়াজ ১ টি, শুকলো লঙ্কা ২টি।

যে ডাবে কইরব্যা : অল্প জলে হপা কাঁচালঙ্কা কুচি দিয়া বামা করুন। প্রায় সেদ্ধ হইয়া এলে, সিদ্ধ করা ডাল মেশান। হলুদ, জিবে, রসুল, নারকোল কোরা শীলে ডাল কইর্যা বেটে লিন এবং হপার সঙ্গে মিশিয়ে লিয়া পাত্রটি ঢাকা দিয়া দিন। ফুটে উঠলে যখন পাত্রের মধ্য থেকে ধোঁয়া বেরোতে থাকবে তখন হাতা দিয়া ডাল কইর্যা নাড়িয়া চাড়িয়া নিয়া একটু জলে তেঁতুল গুলে মেশান এবং কাবিপাতা দিন। ঝোল ঘন হইলে লাবিয়া লিন। ডাল ও খুব বেশি সেদ্ধ যেন না হইয়া যায়। ফ্রাই প্যানে ত্যাল গবম কইর্যা সর্ষে, বিউলির ডাল, চাকা কইর্যা কাটা পেঁয়াজ, শুকনো লঙ্কা ভেঙে নিয়া হপাব কুটুতে ঢেলে দিয়া ডাল কইর্যা মিশিয়া লিন।

গাজরের পাচাড়ি

কি কি লাগব্যা : পিপো কইর্যা কুচানো গাজর ১ কাপ, পিপো কইর্যা কুচানো

কাঁচা লঙ্কা আধ চামচ, পিপো কইর্যা কুচানো পেঁয়াজ ২ চামচ, নুন পরিমাণ মতন, তিল ত্যাল ১ মাঝারি চামচ, সর্ষে সামান্য, বিউলির ডাল বা কলাইয়ের ডাল ১চা-চামচ। শুকলো লঙ্কা ১টা ৪ টুকরো কইর্যা লইতে হবে, দই মাঝারি চামচের ২ চামচ।

যে ডাবে কইরব্যা : কুচানো গাজর, কাঁচালঙ্কা, পেঁয়াজ এবং নুন—এই উপকরণগুলো মিশিয়া লিন। এব পর তিল ত্যাল গরম কইর্যা প্রথমে সর্ষে তারপর বিউলিব ডাল ভাজুন। বাদামি হইয়া গেলে শুকলো লঙ্কা দিয়া ভাজুন। সবকিছু নামিয়া নিয়ে ঠাণ্ডা করুন। ঠাণ্ডা হইলে কুচানো গাজর, কাঁচালঙ্কা, পেঁয়াজ এবং নুন ওর সঙ্গে মিশিয়া ফেলুন। দই দিয়া সবকিছু একসঙ্গে ডাল কইর্যা মিশিয়ে লিন। একটু নারকোল কোরা দেওয়া যেতে পারে।

সজনে ডাঁটা ও কাজু বাদামের স্টু

কি কি লাগব্যা : খাদি কইর্যা কাটা সজনে ডাঁটা ১০০ গ্রাম। খাদি কইর্যা কাটা আলু ১০০ গ্রাম। কাজুবাদাম ফুটন্ত জলে ভিজিয়া রেখে ভেঙে নেওয়া ৫০ গ্রাম। ত্যাল ১ মাঝারি চামচ, লম্বা কইর্যা কাটা পেঁয়াজ আধ কাপ, চেরা কাঁচা লঙ্কা ৪টি, রসুল আধ চামচ, লবঙ্গ ৮টি। খেঁতো কইর্যা গোলমরিচ আধ চামচ, ভিনিগার ও নুন পরিমাণ মতন, এক কাপ নারকোল কোবা থেকে বার করা নারাকোলের দুধ আধ কাপ।

যে ডাবে কইরব্যা : সজনে ডাঁটা, কাটা আলু, কাজুবাদাম জল ও নুন দিয়া সিদ্ধ করুন। জল থাকতে থাকতে নাবিয়া লিন। ত্যাল গরম কইর্যা, কাটা পেঁয়াজ, কাঁচা লঙ্কা, রসুল, লবঙ্গ, দারচিনি, গোলমরিচ, ভিনিগার—এই উপকরণগুলো ত্যালের মধ্যে দিইয়া একটু লেড়েচেড়ে লিন। ঝোল সহ তরকারি ওতে ছাড়ুন। নুন ও ভিনিগার দিন। যখন ফুটতে থাকবে, আঁচ কমিয়া গেলে নারকোলের দুধ দিন। খুব গরম হলে নামিয়া লিন। তরকারি ঘন করবার জন্য দুধে একটু ময়দা গুলে মেশান যেতে পারে। গরম গবম পরিবেশন করুন। সবটা খায়্যা লিবেন না। লেখিকার জন্য একটুকু বাখব্যা। কষ্ট কর্যা লিখছি যে। খিদা পায় না।

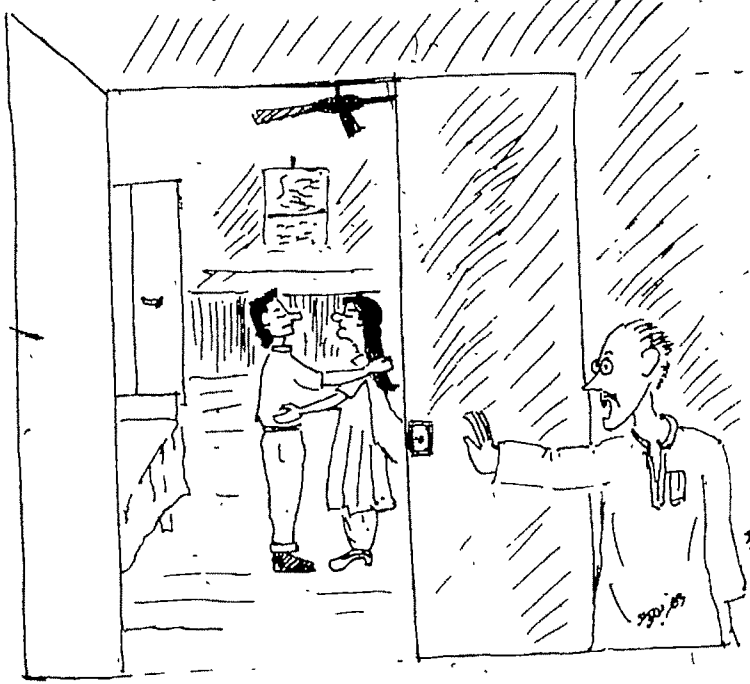
—মিঠু কারক

এ প্রেম

কমলকুমার দত্ত

আমার ছোটবেলায়ও দেখেছি, প্রকাশ্য প্রেম প্রায় নিষিদ্ধ পর্যায়ের ছিল। স্কুল থেকে ফেরার পথে এক বিকেলে দেখেছিলাম প্যান্ট-শার্ট-গগলস শোভিত এক যুবককে রাস্তায় নাকে খৎ দিতে। তার অপরাধ— সে এ পাড়ার একটি মেয়ের সঙ্গে প্রেম করে। তাই বলে কি ‘প্রেম করা’ ছিল না। খুব ছিল। আমাদের বাবা-ঠাকুরদাদার আমলে ছিল, তাঁদের বাপ-পিতেমোর আমলেও ছিল। लेकिन তবিকা

বিশ্বাস না হলে হেমন্ত সন্ধ্যা মামা শ্যামল সতীনাথ চালিয়ে দেখুন, হিট গানগুলোর সিংহভাগই বিরহের। হিট করিয়েছিল কারা? কারা আবার, আমাদেরই বাপ-স্বাঠারা; হ্যাঁ, অনেকটা মাজ্যাইমারাও। তখন একখানি চাল-দোওয়া হাত, এক লহমার রঙিন আঁচল, একটিলতে স্ফুরিত হাসি-কটাক্ষ দেখেই সে যুগের মানুষ প্রেমে পড়তে পারত। একা-একাই। বাকিটা পুষিয়ে নিত কল্পনায়, কবিতায়। তখন কত মেয়ের নাম যে স্বপ্না, কল্পনা



ওয়জ ডিফারেন্ট। এই তো মাত্র পঞ্চাশ-ষাট বছর আগেও প্রেম মানে ছিল ‘এখনো তারে চোখে দেখিনি, শুধু বাঁশি শুনেছি’-র পরেই ‘মন প্রাণ যাহা ছিল দিয়ে ফেলোছি’-র মতো সরল, বোকা-বোকা। তখন একটুকু কথা শুনেই প্রেমের ছোঁওয়া লাগত। বড়জোর সাহস করে ‘এই রাত তোমার আমার’, সঙ্গে মোলায়েম করে একটু শিস। তখন প্রেমের চেয়েও বোধকরি বেশি সুখ ছিল বিরহে।

ছিল। কত যে কাননবালা!!

পরবর্তী সময়ে এই ব্যাপার-স্বাপার গুলোকে আওয়াজ দেওয়া শুরু হল ‘প্লেটোনিক প্রেম’ বলে। এখন তো ‘প্লেটোনিক প্রেম’ শব্দবন্ধটি গালাগাল পর্যায়ে চলে গেছে। এখন বলা হয়—প্লেটে টনিক ঢেলে খালি বোতলটি হাতে করে ভাব্বা মেরে বসে থাকার নাম ‘প্লেটোনিক প্রেম’। এখন প্রেম আর নিবেদন-টিবেদন করার কল্প নয়, একেবারে

হ্যাঁচকা টান মেরে পেড়ে ফেলার ব্যাপার। এখন চিঙ্ক বড়ি ‘হ্যায় কিনা—এটুকুই দেখবার ও দেখাবার, আ যা মেরি গাড়ি মে বৈঠ যা—এটুকুই শোনবার ও শোনাবার। এখন পুরুষ কোমর নাচাতে নাচাতে বলবে—‘দে দে প্যাব দে প্যার দে’। আবার নারী বলবে ‘ফেত গঙ্গি বাবা, বাজার গঙ্গি মা, অকেলা হ্যায় ঘর মে, তু আ-যা বালম’। ঘরে একলা থাকার এ প্ররোচনা প্রথম হিট হয় যে সিনেমায় তাব জাতীয় সঙ্গীতের বাণী ছিল—‘হাম তুম এক কামরে মে বন্ধ হে, ঔর চাবি খো গয়ে’।

তখন প্রেমিকার খোঁপা বলে একটা জিনিস ছিল। সেখানে আকাশ থেকে তারা পেড়ে এনে গুঁজে দেবার স্বপ্ন-টপ্প ছিল। এখন ‘প্রেম’ই নেই তো প্রেমিক-প্রেমিকা!

ভাবুন, ঘরে তালাবদ্ধ যুবক-যুবতী, আর সেই তালার চাবি গেছে হারিয়ে—সুপার-ডুপার হিট না হয়ে উপায় আছে।! সেজন্যেই গত ১৫/২০ বছরে এমন একটা সিনেমার নাম খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব যেখানে ‘প্যার’ বা ‘দিল’ শব্দটা নেই। ‘প্রেম একবারই এসেছিল জীবনে’ বলে কাদুনি গাইবার দিন শেষ। এখন হানড্রেড পারসেন্ট Fool না হলে কেউ ‘তোমার সমাধি ফুলে ফুলে ঢাকা, কে বলে আজ তুমি নাই’ বলে কেঁদে ভাসায় না। এখন সবাই সেই মাতালের মতো বুদ্ধিমান, যে ঘন ঘন বিয়ার খেতে খেতে আব বাথরুমে যেতে যেতে বিরক্ত হয়ে বিঘাবের তৃতীয় বোতলটি সোজা বাথরুমে নিয়ে গিয়ে উপড় করে দিয়ে বলেছিল—‘যাবি তো সোজাসুজি যা, অত ঘোরপ্যাচ কিসেব রে, অ্যাা’ এখন সব ঝুঁইট। অ্যাণ্ড ফরওয়ার্ড। এখন ‘লাইফ বিগিন্স অ্যাট ফর্টি’র সময়, এখন মেকিং ফান-এর সময়।

অনেক কাল আগে যখন ‘প্রেম’ বলে একটি শব্দ ছিল, তখনকার একটা জোকস বলি। এক ভদ্রলোক হোটেল ভ্যাগ করে বেরিয়ে গেছেন। রাস্তায় গিয়ে মনে পড়েছে—‘এই রে, ছাতাটা যে ফেলে এসেছি হোটেলের ঘরে’।

হোটেল ফিরে এসে দেখেন ঘর অলরেডি বুকড, দরজা বন্ধ। ভেতর থেকে একটি যুবক ও

जीवनभूती चिकित्सा केंद्र



सुख '03

कार्टून : गुरुप्रसाद दास

সিনেমা

দুঃসংবাদ



পাতাল প্রবেশ

বাংলা সিনেমার কাদাজলে তুফান ছুটিয়ে সম্প্রতি একটি সিনেমা সাঁই সাঁই কবে ছুটেছে। ছবিটির নাম পাতাল প্রবেশ। না না, বোধহয় পাতালঘব। তবে 'পাতাল প্রবেশ' নাম হলেই বেশি ভালো হত। সীতা মনের দুঃখে একবার পাতাল প্রবেশ করে আব উঠে আসেননি। এ ছবির প্রযোজক, পরিচালক, অভিনেতা-অভিনেত্রীবা সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলে বাংলা চলচ্চিত্র এবং দর্শকরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচত। শীর্ষে মুখোপাধ্যায়ের মুখ পুড়িয়ে তাঁব কাহিনীকে কতটা বিকৃতিব শীর্ষে তোলা যায় তাবই মার-মার কাট কাট চেঁচা চলেছে এখানে।

চলচ্চিত্রের পাতাল-যাত্রায় সিনেমার ছিটেকোটা নেই, আছে শুধু যাত্রা। ব্র্যাক ম্যাজিক মোশন পিকচারের এই প্রথম নিবেদনটিই শেষ নিবেদন হলে নিশ্চিত হওয়া যেত। সারাক্ষণ পটাটো চিপস আর পপকর্নের প্যাকেটের খড়মড় এবং তা চিবানোর খচব মচর শব্দ তুলে কচি-কাঁচার দল এবং তাদের বাপ-মায়ের দম্ভল যে হারে পিকনিকী উৎসাহ জুগিয়ে যাচ্ছে তাতে এই অপেরা দলের আরো ঢের অপলাপ হজম করতে তৈরি থাকা ছাড়া আমাদের আর উপায় নেই।

পুরাকালে ঘড়া ঘড়া টাকা মাটির নিচে রেখে সেখানে একটি বাচ্চাকে বসিয়ে পাতালের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হত, যাতে সে যক্ষ হয়ে অনাদিকাল সেই ধন পাহারা দিতে পারে। এই ছবিটি দেখাব পর কোনো সহাদয় দর্শকের এরকম ইচ্ছে হতেই পারে যে—প্রযোজক পবিচালকের সঙ্গে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, রমা প্রসাদ বণিক, বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়, খরাজ মুখোপাধ্যায়, সুনীল মুখার্জী এবং অবশ্যই মিতা অশিষ্ট না বশিষ্ঠ কি যেন, বিশিষ্ট তো নয়ই, ওকেও এই ছবির একটি প্রিন্ট সহ পাতালে ঢুকিয়ে সুড়ঙ্গের মুখ বন্ধ কবে দেওয়া হোক এবং অনাদিকাল ধবে এই ছবিটাই ওঁরা দেখতে থাকুন।

পবিচালক অভিজিৎ চৌধুরীর নামের মধ্যে 'অভি' থাকলেও অভিনয় ব্যাপারটা যে তাঁর বোঝাব বস্তু নয়, সেটা তাঁর মাথায় গজাল মেরে গৌজাতে

পারলে যদি বোঝেন। সত্যজিৎ রায় ছোটদের বইয়ে ফ্যান্টাসি এনে মাত কবে দিয়েছিলেন। অভিজিৎ চৌধুরী ফ্যান্টা দেখাতে গিয়ে যা করলেন তাকে 'ঘণ্টা' আখ্যা দেওয়াই সম্ভব।

পুজোর ঢের আগে এত হাড়-কাঁপানো শীত পশ্চিমবঙ্গের কোথায় পড়ে তার খবর শুধু পবিচালকই রাখেন। সোয়েটার চাদর মাফলার প্রদর্শনীতে হবলালকা বা গজকুমার ব্রাদার্সও এখানে হার মেনে যায়।

অপয়া গোবিন্দর অপদৃষ্টির প্রভাব বেলা গড়াতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই চলতে থাকে বলে শীর্ষে লিখেছিলেন। কিন্তু মহা গুণধর পরিচালক রীতিমতো রাতিরেও সে দৃষ্টির তেজ সমানে বজায় রেখেছেন। পরিচালক একাধারে দিনকাণা ও রাতকাণা হতে পেরে আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ করেছেন।

রমা প্রসাদ বণিক অভিনয় না করে অভিনয় করাতেন। এবং সেসব নাটক যে কত অনবদ্য ছিল তা বলে বোঝানো অসম্ভব। "রাণী কাহিনী"-র কথা কেউ ভুলবে না আজীবন। তেমন ভুলবে না তাঁর এই বিকট যাত্রাভিনয়। নাটক থেকে যাত্রার নাটের গুরু হয়ে ওঠাই যে তাঁর ভবিষ্য ছিল সে কথা কে আর জানত।

আর অশিষ্ট মিতা বশিষ্ঠ! "স্বাভিমান" সিরিয়াল থেকে রিয়াল অভিনয়ে এসেই চিংপাত। ন্যাকামো, বিকট চেহারা আর মেলোড্রামাই যদি বাচ্চাদের

নামের মধ্যে 'অভি' থাকলেও অভিনয়

ব্যাপারটা যে তাঁর বোঝাব বস্তু নয়,

সেটা তাঁর মাথায় গজাল মেরে

গৌজাতে পারলে যদি বোঝেন।

ছবিব মূলমন্ত্র হয় তবে আর্ট নামক বস্তুটা অচিবেই মেল ট্রেনে চেপে দেশছাড়া হবে। আলফি লায়লার ডাক্তারী মতো স্থূল চিংকার ও লাফঝাপ করানো হয়েছে তাঁকে দিয়ে, যা দেশে বাপ বাপ বলে প্রেক্ষাগৃহ ছেড়ে পালানো যায়।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এখন ঝোলে ঝোলে অম্বলে সর্বত্রই অভিনয়েব বায়না নেবেন বলে ঠিক করেছেন। শুধু গায়ে-গায়ে গিয়ে যাত্রাপালায় পয়সা কামানোটাই বাকি আছে। সেও হতে আর দেরি লাগবে না। একে একসময় উত্তম কুমারের সঙ্গে তুলনা করা হত, ভাবতে অবাক লাগে। অবশ্য সৌমিত্র নিজে অবাক হন না। অবাক হওয়া নয়, অবাক হওয়ানোই যে তাঁর কাজ।

শুধু প্রবীণ মনু মুখার্জী, তরুণ জয় সেনগুপ্ত এবং শিশু-শিল্পী সৌরভ ব্যানার্জী এ যাত্রায় অযাত্রা করে রক্ষে করেছেন আমাদের। মনু মুখার্জী সম্ভবত পরিচালককে ধমকে বিরত করেছেন তাঁকে নির্দেশ দেওয়া থেকে। সৌরভ খোদ উত্তমকুমারের নাতি সম্পর্কে হয়, হাজার চেঁচা করেও বোধহয়, তার অভিনয়কে দূরভিনয় করে তোলা যায়নি। আর জয়, বোকা জয়, জানেন না যাত্রায় কত পয়সা। ভালো অভিনয় ধুয়ে খেয়ে কি পেট ভরবে?

এঁদেরকে পাতালে পাঠালে অবশ্য, অবশ্যই বাংলা ছবির কিছু ক্ষতি হবে। আরো ক্ষতি হবে বাকিদের না পাঠালে।

—ভূতলেন্দু ভৌমিক

ঘরে বসে নিয়মিত পত্রপাঠ পেতে হলে গ্রাহক হোন

“পত্রপাঠ” বার্ষিক গ্রাহক টাঁদা ১২০ (একশ কুড়ি টাকা, ডাকযোগে)। বছরের যে কোনো মাস থেকে এক বছরের জন্যে গ্রাহক হওয়া যায়।

মারি অর্ডার বা ব্যাঙ্ক ড্রাফট **PATRAPATH** নামে পাঠান এই ঠিকানায়—
**PATRAPATH, 10B, 10J, FERN ROAD, (GROUND FLOOR),
KOLKATA - 700 019**

সম্পাদকের সঙ্গে ফোনযুক্ত করতে চাইলে সকাল দশটার মধ্যে—
2440-3803

যাঁরা পত্রপাঠ পড়তে ভালোবাসেন, যাঁরা চান—পত্রপাঠ বেঁচে থাকুক, এগিয়ে চলুক, তাঁদেরকে অনুরোধ—আপনারা পত্রপাঠের গ্রাহক হোন আর উপহার নিয়ে যান পত্রপাঠ নামাঙ্কিত একটি দেওয়াল-ঘড়ি।

বি. দ্র. — আমাদের ঘড়ি আছে কিন্তু ঘোড় নেই। তাই ঘড়িটি আপনার কাছে পৌঁছে দেওয়া যাবে না। এসে নিয়ে যেতে হবে নিজেকেই। যাঁরা ডাকযোগে টাকা কিম্বা ব্যাঙ্ক ড্রাফট পাঠিয়ে গ্রাহক হবেন তাঁদের ঘড়ি সংরক্ষিত থাকবে। যোগাযোগ করে সময়মতো এসে নিয়ে যাবেন।

যাঁরা ইতিমধ্যেই পত্রপাঠের গ্রাহক হয়েছেন

তাঁদের কাছে অনুরোধ : আপনারা প্রত্যেকে

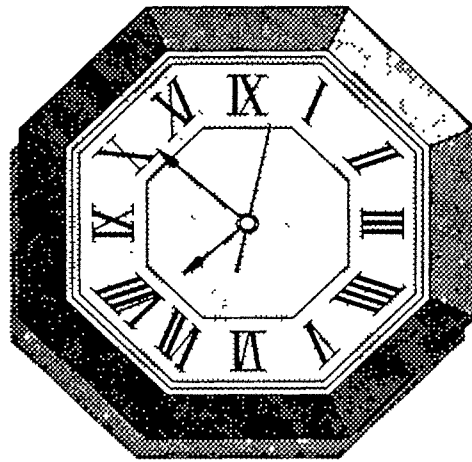
অন্তত দু'জন পরিচিতকে পত্রপাঠের গ্রাহক করান।

গোমড়া মুখে আর থাকা নয়। সারা বছরের শান্তি-মজার আগাম বায়না করে রাত।
মাত্র ১২০ টাকা দিচ্ছে পত্রপাঠ মাসিকপত্রের এক বছরের
সভ্যক গ্রাহক ছেন। আর সঙ্গে নিচ্ছে যান একটি সুন্দর
দেওয়ান ঘড়ি।

একদম



উপহার স্টক থাকা পর্যন্ত।
পেতে চাইলে কালকের জন্যে
অপেক্ষা করবেন না।
চলে আসুন আজই।



ফোনে যোগাযোগ :
২৪৪০-৩৮০৩
৯৮৩০০-৫২১৮২

হাসানোর জন্য আমরা দায়ী ফাঁসানোর জন্যে নয়।

পত্রপাঠ

১০ জে, ফার্ম রোড, কলকাতা-৭০০০১৯

সাদাকে সাদা ও কালোকে কালো বলার একমাত্র সহর্ষ মাসিকপত্র

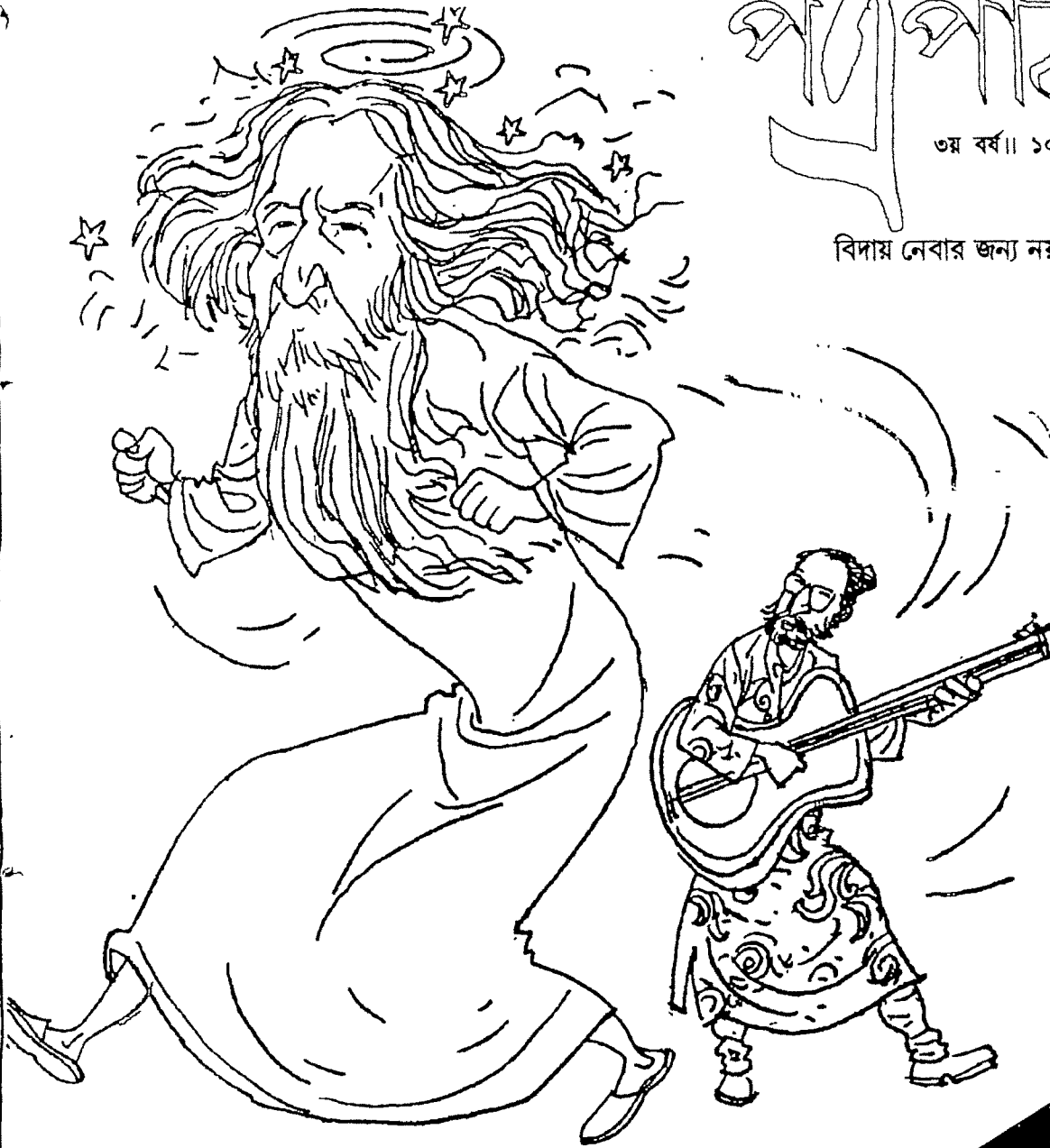
মে ২০০৩

দাম : ৮ টাকা

দ্বিপাঠ

৩য় বর্ষ ৥ ১০ম সংখ্যা

বিদায় নেবার জন্য নয়



ভবীর হাতে
রবি ঠাকুর

কাউকে হাসানোর কাগজ
কাউকে ফাঁসানোর কাগজ

গ্রাহকদের জন্য নাতক কথা

পত্রপাঠ ডাকে পাঠানো হয় প্রতিমাসের ১০ তারিখে। ডাক বিভাগ তার আগে আমাদের ডাকে সাড়া দেন না। অতএব গ্রাহকদের অনুরোধ করা হচ্ছে—তারপর অন্তত দশ পনেরোদিন পরেও যদি পত্রিকা না পান তবেই জানান। টেলিফোনে জানালেই হবে।

পত্রপাঠ-এর দুটি যাচ্ছেতাই প্রকাশনা—

অকপটে—সমরেশ মজুমদার ৩৫

পত্রপাঠ সহর্ষ গল্প সংগ্রহ—মনোজ বসু, শক্তিপদ রাজগুরু, বুদ্ধদেব গুহ, নবনীতা দেব সেন, দিব্যেন্দু পালিত, অমিতাভ চৌধুরি, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, সমরেশ মজুমদার, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, হর্ষ দত্ত, কণা বসু মিশ্র, মন্দাক্রান্তা সেন, শেখর আহমেদ এবং.....৩৫

পরিবেশক : নবজাতক প্রকাশন,

এ ৬৪ কলেজস্ট্রিট মার্কেট,

২ লকাতা-৭০০০০৭

ভবীর হাতে রবি ঠাকুর

মে ২০০৩ || ৩য় বর্ষ || ১০ম সংখ্যা

দাম : ৮ টাকা

কাউকে হাসানোর কাগজ
কাউকে ফাঁসানোর কাগজ

পত্রপাঠ
বিদায় নেবার জন্য নয়



ভবীর হাতে রবি ঠাকুর : অমিতাভ চৌধুরী • প্রদীপ ঘোষ • কবীর সুনন •

পি সি সরকার (জুনিয়র) • জো উইটার □ ৬

পুরনো কাসুন্দি : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “গল্পসল্প” ও “শনিবারের চিঠি” থেকে □ ১২

নিয়মিত রচনা : অকপটে—জলের ভূমিকা • সমরেশ মজুমদার □ ১৫ ফজল আলির
ফাজলামি—ভবীর হাতে রবি □ ১৯ তারাপদ রায় ও গঙ্গারাম • তারাপদ রায় □ ২২
হাজার রাজার বাজার—গ্যাসায়ণ • অলোক বসু □ ২৪ চরণ বৈরাগীর ইকড়ি মিকড়ি—
অস্তায়মান রবি-বাংলা □ ৪৫

গল্প : হারানো প্রাপ্তি • দিব্যলোচন কলমধারী □ ২৩ নিবারণ বৈরাগীর বৈরাগ্য • দেবপ্রসাদ
কুমার □ ৩৩

অন্যান্য : আমার মামা • প্রবীর মণ্ডল □ ২৬ নন্দনিক • দীপক দাস □ ২৭ মোদী লাইন •
অহিভান হো হো □ ৩৬

প্রচ্ছদ কাহিনী : নিঃস্বহ রবীন্দ্রনাথ • সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য □ ৩০ কপিরাইট কবি • দিব্যলোচন-
কলমধারী ৩২ □ কপিরাইট : অপারেশন রবি ঠাকুর • গোপলা বোস □ ৪৩ রবীন্দ্র রচনা-
বলি • স্বামী কমলানন্দ অবধূত □ ৪৭

ধারাবাহিক রসোপন্যাস : মারায়ণ • পিনাকীশঙ্কর চৌধুরী □ ৩৭

নিয়মিত বিভাগ : সম্পাদকীয় □ ৫ রাশি চক্কোর □ ৯ পত্রপাঠ জবাব □ ১০ সাহিত্য
দুঃসংবাদ □ ১৭ টারা চোখে □ ১৬, ১৯, ৪৬ মহিলা মহল □ ২৮ পুরুষ মহল □ ২৯
সিনেমা দুঃসংবাদ □ ৩৫ জবর খবর □ ৪১ সামালোচনা □ ৫০

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী • তারাপদ রায়
• সমরেশ মজুমদার • শঙ্করলাল ভট্টাচার্য

সম্পাদক : শেখর আহমেদ

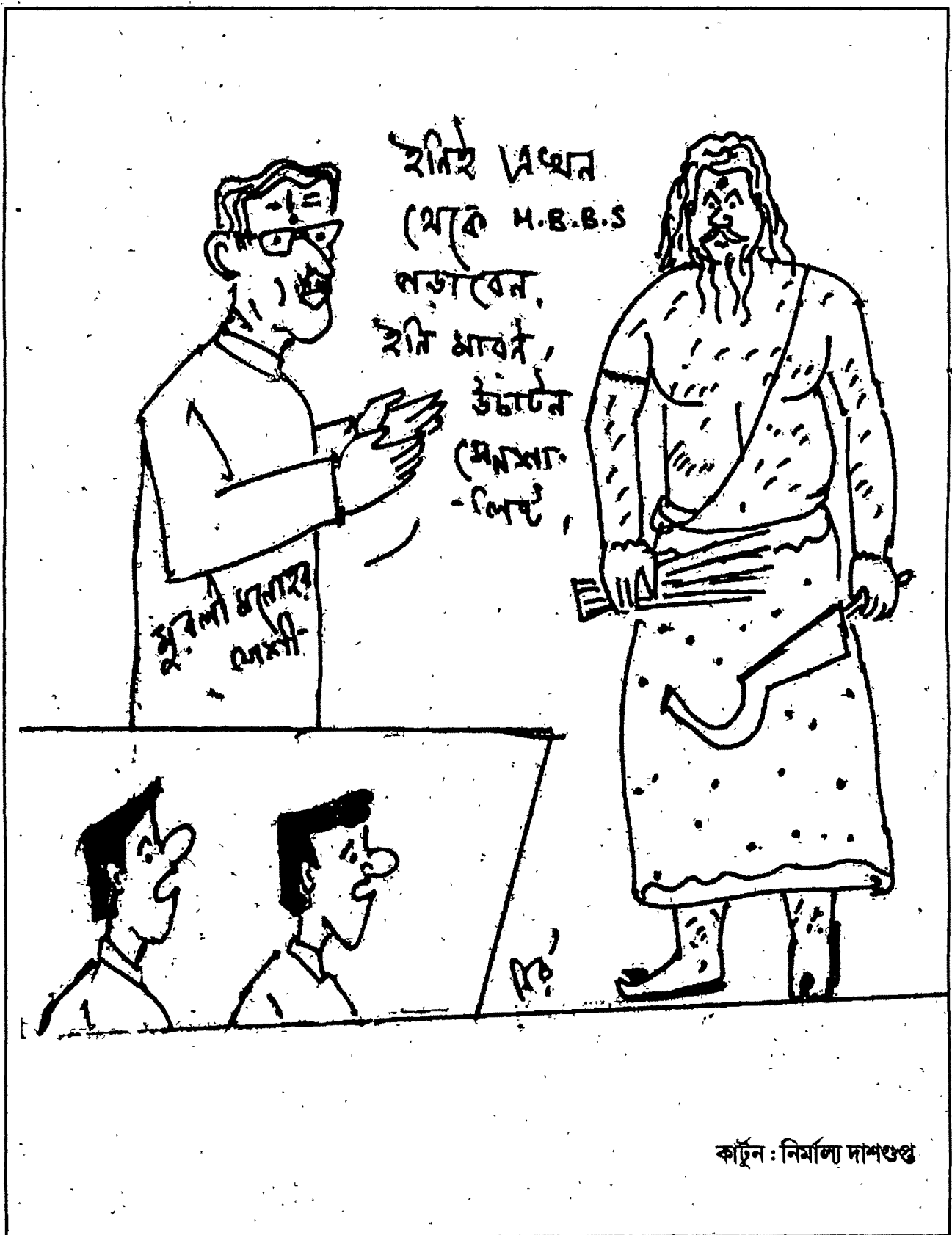
পরিচালন সমিতি : ডাঃ তুষারকান্তি রায় • প্রদ্যোত কুমার মিত্র •
বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী • অঞ্জনা দত্ত • ডাঃ শুভাশিস
নিয়োগী • শচীন মিত্র

প্রচ্ছদ : সুমন্ত সেন

অলঙ্করণ : জয়দীপ রাউত • সন্দীপ দেবনাথ • নির্মাণ
দাশগুপ্ত • গুরুপ্রসাদ দাস • শশাক ঘোষ • উজ্জ্বল
দাস • সুপর্ণা মণ্ডল • কুইস

কর্ম সহায়ক : দিব্যেন্দু দাস

শেখর আহমেদ কর্তৃক ১০ জে, ফার্স রোড (গ্রাউন্ড ফ্লোর), কলি-২৯ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন ২৪৪০-৩৮০০, ৯৮০০০-৫২১৮২।
বর্ষ ও চিত্র বিন্যাস—পত্রপাঠ, ১০ বি, ফার্স রোড, কলি-১৯, প্রচ্ছদ মুদ্রণ—অঞ্জন ভৌমিক, গ্রাহিক, ১এ কলেজ রো, কলি-৯, অস
মুদ্রণ—শান্তি মুদ্রণ, ৩২/৩ পটুয়াটোলা লেন, কলি-৯। সম্পাদকীয় দপ্তর : (সন্ধ্যা ৫-৬০ থেকে ৮-৩০) ১০ বি, ফার্স রোড, কলি-১৯।



କାର୍ଟୁନ : ନିର୍ମାଳ ଦାଶଗୁପ୍ତ

সঙ্গীতকার

সেরা ঔষধি লাঠৌষধি.



রবীন্দ্রনাথ বিলম্বশরীর-চর্চা করিতেন। স্বীয় শরীর দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে বিপুলাকার ধারণ করে নাই বটে, তবে তাঁহার সৃষ্টি সাহিত্য-সঙ্গীতের তনু তাঁহার হস্তস্পর্শে পর্বতাকার ধারণ করিয়াছে। স্বত্ব বিলুপ্তির পর অতিবিস্তৃত কিছু শাখামৃগ তাঁহার সৃষ্টিকে সংশোধন করিবার মহৎ যজ্ঞে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কেহ সঙ্গীত শোধরাইবার সং, কেহ সাহিত্য ঠিক করিবার ঠিকাদার। শোনা যাইতেছে কোনো বি-চিত্রকর তাঁহার চিত্রগুলিকেও সম্পাদন করিবার চিন্তা করিতেছেন। এমনকি এও শুনা যাইতেছে যে দাঁড়িগোঁফ ও ওই বিকট জোকা হঠাইয়া সৌম্য-সুন্দর ধূতি-পাঞ্জাবি পরিহিত রবীন্দ্রনাথকে আঁকা হইবে। দেখিলেই মনে হইবে—সাহিত্যিক বটে। ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া আমরা হায় হায় করিয়া বলিতেছি—রবি ঠাকুরের আত্মা চোঁ চোঁ দৌড় দিতেছে।

সত্য বটে; দৌড়টি সত্য। কিন্তু কিরূপ দৌড়? কাটিয়া পড়িতেছেন—না ধইয়া আসি... মজবুত হস্ত, লাঠি কিংবা মুণ্ডর চালনে পোস্ত। পরিণাম যথেষ্ট মজাদার হইবে, সন্দেহ নাই। আর তিনি যদি না আসেন? রামভক্তের দেশে রবীন্দ্রভক্ত পবন-নন্দনেরও অভাব হইবে না, এই শাখামৃগগুলিকে মৃগীর দশায় দাঁড় করাইতে; হিস্টিরিয়ার. কেস-হিস্ট্রি বলিলেও চলে।

ভবীর হাতে রবি ঠাকুর

ব্যান্ড-মাস্টারেরা রবীন্দ্রনাথের গানকে যেভাবে দলাই-মলাই করছেন তাতে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের যা দুর্দশা হচ্ছে তা দলাইলামার বর্তমান অবস্থার চেয়েও মারাত্মক।

—অমিতাভ চৌধুরি

রবীন্দ্রনাথের কপিরাইট উঠে যাওয়ার পর লুণ্ঠনই চলছে। বাঙালি



প্রকাশক বা পাঠক-সমাজ এতটা উদ্বৃত্ত হয়নি যে সবকিছু ঠিকঠাক বুকে চলবে। কপিরাইট উঠে গেছে ভালোই হয়েছে। তাই বলে এই নয় যে, যা খুশি করবে।

আগে গানের কথাটাই বলি। গত শতাব্দীর, তিরিশের দশকে দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে তাঁর পান নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। উনি রবীন্দ্রনাথের খুব পিয় ছিলেন। উনি তজ্জ্ঞা করছিলেন যে কেন নিজের সুরে রবীন্দ্রনাথের গান

গাইতে পারেন না। রবীন্দ্রনাথ বললেন—একটা গাও তো তুমি।

মহুঁ রাম অর্থাৎ দিলীপকুমার রায় গাইলেন— কোন সুদূর হতে আমার মন মাঝে.....

গানটি শুনে রবীন্দ্রনাথ বললেন, —শোনো মহুঁ, আমার পানগুলো হচ্ছে ঠিক আমার মেয়ের মতো। সব বাবাই চায় তার মেয়ের বিয়ে হোক। কিন্তু যদি বাবা জামতে পারে স্বত্ত্ববান্ধিতে মেয়েটি তীব্র অ-সুখে আছে, তখন বাবার মনে হবে, মেয়ে স্বত্ত্ববান্ধিতে কষ্ট পাবার চেয়ে অবিবাহিতই থাক। অর্থাৎ আমার মেয়ে আমারই থাক। অর্থাৎ আমার পান আমারই থাক, তোমার গাওয়ার দরকার নেই।

তিনি বললেন— আমার সব সৃষ্টি চলে গেলেও থাকবে আমার পান। কপিরাইট উঠে যাওয়ার পরেও পান বেশ টিকে আছে। দু-চারজন নামকরা বরেন্দ্র শিল্পী, যেমন অজয় চক্রবর্তী, প্রায় নিজের সুরে রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাওয়ার চেষ্টা করছেন, গাইছেন। কিন্তু সেগুলি আমার মতে, অজ্ঞাব্য। অজয় তো শিল্পী, তার চেয়ে মারাত্মক যেটা—বিভিন্ন ব্যান্ড-মাস্টারেরা রবীন্দ্রনাথের গানকে যেভাবে দলাই-মলাই করছেন তাতে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের যা দুর্দশা হচ্ছে তা দলাইলামার বর্তমান অবস্থার চেয়েও মারাত্মক।

সে যাক, যারা রবীন্দ্র-সঙ্গীতের চর্চা করেন, সাধনা করেন, তাঁদের মাধ্যমে পানগুলো ঠিকই টিকে থাকবে।

গানের মতোই রচনার ক্ষেত্রেও প্রাথমিক লক্ষ্য-বস্তু পর মনের প্রতি

লোকের আকর্ষণ টিকে থাকবে। ২০০২ সালে রবীন্দ্র-গ্রন্থস্বত্ব উঠে যাওয়ার পর ছোট-ছোট প্রকাশকরা রবীন্দ্র-পুস্তক প্রকাশে যে যথেষ্টাচার দেখিয়েছেন, তা এখন কিন্তু স্তিমিত হয়ে আসছে। কিঞ্চিৎ বুকিসম্পন্ন বাঙালি রবীন্দ্রনাথের বই আগের মতোই দেখতে চায়, ঠিক যেমনটি প্রকাশ করতেন পুদিনবিহারী সেন বা চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল, অনেকে ভেবেছিলেন গ্রন্থ-প্রকাশক বিশ্বভারতীর বুকি দুর্দিন খনিরে এল। কিন্তু চুপিচুপি বলি, বিশ্বভারতীর বিক্রির সংখ্যা আগের চেয়েও বেড়ে গেছে। কারণ শিক্ষিত বাঙালির সংখ্যাও বাড়ছে, যারা ভালো জিনিস চায়।

সব শেষে বলব, স্বত্ব উঠে যাওয়ার পর বিশ্বভারতীর বদি কোনো ক্ষতিও হয় তাহলেও বঙ্গবাসীর কোনো ক্ষতি হবে না। ভালো রবীন্দ্রনাথের বই পড়ার আগ্রহ দিন দিন বাড়ছে। প্রকাশকরা যদি সেই আগ্রহ মেটাতে পারে তাহলেও, বলব, সেই রবীন্দ্রনাথেরই জয়।



কোনো বিকৃতির দুঃস্বপ্ন দেখি না। কেউ বিকৃত করলে ক্ষমা করার প্রস্তুতিও ওঠে না। দরকার হলে নিজেরা কবিতা লিখে আবৃত্তি করুন বা গান করুন।

—প্রদীপ ঘোষ

আমার কাছে বিষয়টা নিয়ে কণ্ঠ নেই, তার কারণ একটাই— কেন না



স্বত্বমুক্তির আগে রবীন্দ্রনাথকে যথাযথ উপস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন বিশ্বভারতী, কোনো ব্যক্তিবিপ্লব মন। রবীন্দ্র-রচনাবলীর বিতরণতা রক্ষায় এঁরা সাংগঠনিকভাবে কাজকর্ম করেছেন। তাঁদের সব চেউই যে ক্রটিহীন, এমন কথা বলবার কোনো কারণ নেই। তবে সামগ্রিকভাবে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকে যথাযথ নির্ভুলভাবে জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কাজে তাঁরা সতর্ক, সচেতন ছিলেন। স্বত্বমুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন প্রকাশক

রবীন্দ্র-রচনা থেকে পাঠক-সাধারণের জন্যে নানা ধরনের সম্ভব প্রকাশে তৎপর হয়েছে। অসংখ্য প্রকাশক এবং অগণিত প্রকাশনা। এবং তার মূল্যমানও সাধারণের আয়তনের মধ্যে। যারা শুধুই সংগ্রহের জন্যে বই কেনেন বা রাখেন তাঁদের সমস্যা বিশেষ নেই। কিন্তু যারা নিয়মিত চর্চা করেন তাঁদের পক্ষে এইসব প্রকাশনার দ্রুতি-বিচ্যুতিগুলো কখনোই মজর একাধারে না। তাড়াহড়ো করে চট-জ্বলদি-বাঁজার ধরবার জন্যে প্রকাশকরা যে ঝুঁকি নিয়েছেন, সামগ্রিক বাণিজ্যিক লাভ কিছুটা হলেও যথার্থ পাঠকের কাছে তা বেশিদিন গ্রহণযোগ্য থাকবে না।

কিন্তু যদি এইসব প্রকাশনাও যত্ন সহকারে করা হয় তাহলে প্রতিযোগিতা মূলক মূল্য নির্ধারণের সুবিধা ক্ষেত্র সাধারণ পেতে পারেন। সেদিক থেকে এ ধরনের কোনো দায়িত্বশীল প্রকাশনা নিশ্চয় তার জায়গা করে নিতে পারবে।

দূষণ এবং বিকৃতি বহুমিন ধরেই চলছে। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তা দেখা গেছে। আবৃত্তির ক্ষেত্রেও কমবেশি হয়েইছে। কিন্তু এ সুযোগ কোনো নির্ভাবান শিল্পীর কাছে কোনো সুযোগই নয়, কেন না, যে কোনো সংবেদনশীল, সং শিল্পীই চান নিজ ক্ষেত্রে সনিষ্ঠ থাকতে। কখনো কখনো প্রকাশ বা প্রয়োগ মাধ্যমের চাহিদা অনুযায়ী কিছু কিছু রূপান্তর হয়ত অনিবার্য হতে পারে। কিন্তু স্বৈচ্ছাচারিতা বা শঙ্কাহীনতা হবে না নিশ্চয়।

আমি সবসময় আমার কাজে সং থাকার চেষ্টা করেছি। আমি নিজে কোনো বিকৃতির দুষ্প্রদ দেখি না। কেউ বিকৃত করলে ক্ষমা করার প্রসঙ্গ ওঠে না। দরকার হলে নিজেরা কবিতা লিখে আবৃত্তি করুন বা গান করুন। কিন্তু বিকৃত করার অধিকার কারো নেই। প্রথম প্রথম মানুষ গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু পরে প্রত্যাহ্বান করবেই।

যাঁরা নিয়মিত আবৃত্তি চর্চা করেন তাঁদের প্রত্যেকের এই সন্তোষবোধ আছে। রবীন্দ্রনাথকে বদলাতে পারেন একমাত্র তিনিই যিনি রবীন্দ্রনাথেরই সমতুল্য, অন্য কেউ নয়। সুতরাং আশাহত হওয়ার কোনো কারণই নেই।



আমরা স্বাধীনতা আর যথেষ্টাচারকে এক করে ফেলি। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হতেই পারে। কিন্তু কতটা?

—কবীর সূমন

আমি যে সময়ের লোক সে সময় পৃথিবী-অন্যরকম ছিল। ১৯৬৬ সালে ১৭ বছর বয়সে রেডিওতে রবীন্দ্র-সঙ্গীত করি। তখন বি-হাই স্টেডের শিল্পী



ছিলাম। ১৯৭২ সালে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ডিস্ক বেজোর আমার। ১৯৭৩ সালে দ্বিতীয়। সেই সময়ের সব শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিল্পীদের পাশাপাশি গেয়েছি। তাই আমার মূল্যবোধ সে সময়ের। তখন বিশ্বভারতী সেরকম ছিল না, পরে যেমন শোনা যেত। স্টুডিওতে ঢুকলে পুলিশি মজরদারি করত না।

আমি শিখেছি বাবা সুধীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। “ভূমি সঙ্ঘার মেঘমালা”-র ফার্স্ট বেসিক আমার বাবার। তিনি রবীন্দ্রনাথের আমল থেকেই প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন। ইনি পুলিশি তৎপরতায় গান শেখাননি। নীহারবিন্দু সেনও বলতেন— বাবা, আনন্দ করে গা।

কোথাও একটা স্পর্শের লাগল কি লাগল না—কেউ মাথা ঘামাত না। “এমন দিনে তারে বলা যায়”—গানটা শুণ্ড করেও গাওয়া হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তো আপত্তি করেননি। তবে ভাবের দিক দিয়ে একটা কালচার আছে। শিকার সঙ্গে দীক্ষা। এটা থাকলে বিশ্বভারতী সঙ্গীতবোর্ড আপত্তি করেননি। ১৯৯৭ সালে শুধু একটা গীটার নিয়ে আমাকে গাইতে দিতে তো আপত্তি করেননি। কিন্তু যথেষ্টাচার করার অধিকার কারো নেই।

রবীন্দ্রনাথের কাঁধে বন্দুক রেখে যা খুশি তাই করা কেন?

আমার মনে আছে, ‘কিরবে না তা জানি’ আর ‘হেলাফেলা সারাবেলা’ সঙ্কারী থেকে আবার গাইলাম।

আপত্তি করেননি। পরবর্তীকালে অবশ্য ওঁরা নির্দিষ্ট নির্দেশিকা জুড়া চলতে দিতেই চাইলেন না। ‘আমার মুখখানি কারো মলিন বিধুর’ গানে ‘একদিন’-কে ‘একদিনো’ উচ্চারণ করতে বাধ্য করলেন। বেচারী রবীন্দ্রনাথ! আমি শুধু পায়ে ধরতে বাকি রেখেছিলাম। কার ইচ্ছায় কর্ম? কর্তা, না তাঁর সেরেস্তার কেউ?

সে যুগে পঙ্কজ মল্লিক, সুবিনয় রায়, রাজেশ্বরী দত্ত, সুচিত্রা মিত্র, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়দের গান শুনে শুনে বড় হয়েছি। সেই শিক্ষায় শিক্ষিত আমি, দীক্ষিত। গান থেকে রস টেনে বের করে ছিবড়ে করে দেওয়া রবীন্দ্র প্রতিষ্ঠানই শুরু করেছিল। ’৯৩-৯৪ সালে তেমন কড়া কড়িরই মুখোমুখি হতে হয়েছে আমাদের।

দেশ ভাসের মতো গান ভাগ হয়ে গেল। সঙ্কারী থেকে আর গাওয়া যাবে না। শুধু স্বরলিপি দেখে গান হবে। হয়? হয় না! তাই আমিও চাইছিলাম—বন্ধন টুটুক। শুধু রবীন্দ্রনাথকে নিবিড় করে পাওয়ার জন্যে। কিন্তু আমরা স্বাধীনতা আর যথেষ্টাচারকে এক করে ফেলি। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হতেই পারে। কিন্তু কতটা?

সাবেকিয়ানা আর ক্লাসিকিয়ানা—জোর করে এটা করার দরকার নেই। রবীন্দ্রনাথ যখন পূর্ববী ব্যবহার করেছেন তখন পূর্ববীর জন্যে নয়, গানের জন্যে ব্যবহার করেছেন। এটা যে বোঝে না সে বেরসিক। এদের হাতে যদি রবীন্দ্রনাথের গান পড়ে, তো সর্বনাশ। এসব কিছুদিন চলে। চিরদিন চলতে পারে না। হতেও পারে, একটা পুরস্কারও পেয়ে গেলেন। কিন্তু দেবী সরস্বতীকে হঠাৎ ট্রাপিজ খেলায় নামিয়ে তাকে ডেকাধেরনে পাঠানোর চেষ্টা!!

কেউ যদি ভাবেন যে তিনি ২০০৩-এর নিবারণ চক্রান্তি তবে তিনিই ভুল করবেন। আমি যদি জোর করে কিছু কাঠামো চাপাই, কে বাধা দেবে? বেশ তো, পরীক্ষা চলুক। কিন্তু রসের জায়গা থেকে যেন বিচ্যুত না হই। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও সে সাহস দেখাননি।



কোনো সেলুন-শিল্পী অনেক পিটপিটে নাপিতের মতো বলতেই পারেন— দাড়িটা ফ্রেঞ্চকাট বানিয়ে দিচ্ছি।

—পি সি সরকার (জুনিয়র)

রবীন্দ্রনাথকে মূল্যায়ন করার কোনো ফেল কিতে বা দাঁড়িপাল্লা খুঁজে পাই না। একজন বলেছিলেন—রবীন্দ্রনাথ খুব কিপুটে ছিলেন। পরে খবর নিয়ে জেনেছি, তাঁর বাবার সেলুন আছে। হয়ত রবীন্দ্রনাথ একটা কবিতা লিখে দিলে,— এই যে সেলুন, দাড়িটা কামিয়ে খেদুন—বিক্রি বাড়ত। একটা অসাধারণ ঘটনা ঘটে গেছে জীবনে। বিদেশে গিয়ে শুধু চপ-কাটলেট-স্টেক খেতে রোজ ভাতো লাগে না। প্রাণে বাঁচতে গেলে বাঙালি রাগা চাইই চাই। বিদেশে গেলে চুড়ির মধ্যেই থাকে—কিচ্চেন সান্নাই করতে হবে। চাল, ডাল,



গাওয়া যি— সবই নিয়ে যাই। সঙ্গে পাচক, এবং অবশ্যই তার প্রাইভেসি, লুসি ও খালি গায়ের অধিকার। সঠিক পাচক কোথায় পাই? তারা কি কর্মখালির বিজ্ঞাপন পড়ে? তবু দেওয়া হল। আবেদনও এল। ফাইনাল রাউন্ডে উঠল দু'জন। তারা রেষে দেখাবে। একজন ভালো পারল। কিন্তু তার চাকরি হল না। কারণ? তার নাম। তার নাম— রবীন্দ্রনাথ। রাম্মার ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ? অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথের ওপরে এতটাই দুর্বলতা আমার। যাই হোক, এফিডেবিট করে নাম পাণ্টাতে বললাম। রাজি হল না। রবীন্দ্রনাথকে ছাড়তে সে রাজি নয়।

শুনেছি তাঁর শব্দগুণামীদের কেউ কেউ দাড়ি ছিঁড়ে নিয়েছিলেন। তাঁর লেখা, গান, ছবি নিয়ে ছেলেখেলা করাও তেমনই নৃশংসতা। কোনো সেলুন-শিল্পী অনেক পিটিপিতে নাপিতের মতো বলতেই পারেন— দাড়িটা ফ্রেঞ্চকাট বানিয়ে দিচ্ছি।

ম্যাজিকে তেরোটা রস আছে— অদৃশ্য রস, আবির্ভাব রস, শূন্য ভাসমান রস, রূপান্তর রস— আমার ইচ্ছে করে, এদের সবকটাকে রসে রসিয়ে একটা বয়সে করে এগুজিবিশনে পাঠাই, যাতে নতুন করে আলোকজাভার এসে আবার বলতে পারে— সত্য সেলুকাস, কি বিচিত্র এই দেশ।

এরা তো নিজেদের বাপ-ঠাকুরদাকেও পরিবর্তন করতে পারে। এদেরকে যদি কাছে পেতাম, একটু সাহিত্য করেই বলতাম— বাবা, প্রেমপত্রে না, ভুল ধরতে নেই। আমি তো 'ভালোবাসা' বলতে গিয়ে যেসব জড়তা বা খেঁই হারিয়ে ফেলা— সেটাই আসল বক্তব্য প্রকাশ করা বলে মনে করি।

'সঙ্কল্পিতা' নামটাতেও কেউ কেউ ভুল ধরেছিলেন। ওটা নাকি 'সঙ্কিতা' হবে। তাবুন। আরে ওই জন্যেই তো তিনি রবীন্দ্রনাথ, নতুন শব্দ সৃষ্টি করেন। এইসব শোখরানো-বদলানো বাবুদের যোগ্যতা একটা চামচের। তাই নিয়ে মাপতে যান সমুদ্র। রবীন্দ্রনাথই লিখে গিয়েছেন—

সংসার মাঝে দু-একটি সুর
রেখে দিয়ে যাব করিয়া মধুর
দু-একটি কাঁটা করি দিব দূর
তারপরে ছুটি নিব।

তিনি দু-একটা কাঁটা দূর করলেও রমে গেছে অনেক। তাঁর সময় থেকেই বড় বড় পণ্ডিতরা যেভাবে তাঁর পেছনে লেগেছিলেন—

'গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা', তো 'রাশি রাশি ভারা ভারা ধান কাটা হল সারা' হয় কী করে? বর্ষাকালে কি ধানকাটা হয়? তার মোক্ষম সময় এল জবাবের, 'সাজাহান' নাটকে যখন ঔরঙ্গজেব নতজানু হয়ে ক্ষমাভিক্ষা করছে সাজাহানের কাছে। এটা কি ইতিহাসে আছে? ইতিহাস আর নাট্যকারের নাটক যেমন এক নয়, তেমনি আবহাওয়া-বার্তা আর কবির সাহিত্য-মন এক নয়। সাহিত্য এমন এক জায়গা, যা প্রেমসীর রান্না করার মতো। হাতের স্পর্শতেই স্বাদ। রসগোল্লার মিষ্টতাও পিছিয়ে যায়, যদি চকিত স্পর্শ লাগে।

আমি স্নেহে হাদুকর। বটতলায় ডুগডুগি বাজিয়ে আমার আবাস। দু-একটা খেলা দেখাই আর বলি— বাচ্চেলোগ, ঔর একদকে হাততালি বাজা দো। এই সমস্ত খেড়ে, দড়কোঁচা মারা, অকাল-কল্লভ 'বিদ্রি'— তাঁদের প্রতি মায়ামমতাও জাগে। চারপাশের বাচ্চাদের বলি— ওদের দেখেও একদকে হাততালি বাজা দো।

আমি ব্যথিত হলেও বলব, ওরা যা পারে তাই করুক। দেখুক মানুষ, কী করছে ওরা! মানুষই প্রত্যাখ্যান করবে।

—জো উইন্টার

কপিরাইট উঠে যাওয়াকে আমি সমর্থন করি। যদি পাণ্ডুলিপিই আটকে



থাকে তাহলে মানুষ কী করে পারে? ৬০ বছর বিশ্বভারতী অধিকার রক্ষা করেছে।

অনেক রুচিহীন মানুষ তো থাকবেই। যে যার মতো রবীন্দ্রনাথকে ভাঙিয়ে খাবে। কেউ রবীন্দ্রনাথকে ঘণা করে, কেউ ভুল উপস্থাপনা করে। যেটা সহ্য করা যায় না, সেটা হল যথাযথ উপস্থাপনা না করা। আমি অতি আধুনিকতায়

বিশ্বাস করি না। তবুও মনে করি, রবীন্দ্রনাথকে পাওয়ার অধিকার সব মানুষেরই আছে।

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যা খুশি তাই করা হচ্ছে। কিছুদিন আগে Shakespeare in Love ছবিটিই অস্কারের জন্যে পাঠানো হয়েছিল। কী যায়-আসে? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন সর্বোচ্চ ব্যক্তি ইতিহাসে। আধ্যাত্মিক গুরু হিসেবে তিনি অবিস্মরণীয়। মূলত তিনি লিরিক কবি ছিলেন। শ্রেষ্ঠ গীতিকবি।

বিশ্বভারতী সাধারণ মানুষের চাহিদাকে নিয়ন্ত্রণ করছিল। এখন সব মানুষ সহজে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকে পেতে পারে। আবার দেখুন, বাঙালিরা অনেকেই ভালো ইংরেজি জানেন কিন্তু কেউ সেভাবে রবীন্দ্রনাথকে অনুবাদ করেননি। সুদূর লন্ডন থেকে কলকাতায় এসে পড়ে আছি, তাঁর লেখা ভালো করে অনুবাদ করার জন্য। "গীতাঞ্জলি" অনুবাদ করেছি, ছন্দে, যেহেতু আমি নিজে কবি। "লিপিকা" করেছি। এখন "আত্মপরিচয়" অনুবাদ করছি, বিদেশ থেকে এসে। রাগ হয়, খুব রাগ হয়, কেন এতদিন হয়নি?

রবীন্দ্র-জয়ন্তী আসছে। সেই একই গান, একই নাটক। রবীন্দ্র-জয়ন্তীতে কেউ মসে করবে না উপসাগরীয় যুদ্ধের কথা? রবীন্দ্রনাথ কি এই নির্মমতার বিরুদ্ধে ছিলেন না? এই যে তালিবানদের বুদ্ধমূর্তি ভাঙা, রবীন্দ্রনাথ থাকলে কী বলতেন? গত কয়েক বছর ধরে তাঁর জন্মদিনে আমি কিছু না কিছু লিখি। চার বছর আগে লিখেছিলাম— "আমার ভাবনা, আমার সময় ও রবীন্দ্রনাথ"। অন্যোও তাবুন।

মানুষ দুসাহস দেখাচ্ছে তাঁর রচনাকে বিকৃত করার—লেখাকে, গানকে; শুদ্ধতার নামে যা খুশি করার। শেক্সপীয়রের ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটেছিল। মানুষ কি নিয়েছে? তাই, আমি ব্যথিত হলেও বলব, ওরা যা পারে তাই করুক। দেখুক মানুষ, কী করছে ওরা! মানুষই প্রত্যাখ্যান করবে;

স্বর্ণ কি হবে না কেনা

বিধের ভাগ্যী ওষিবে না

এত স্বপ্ন

রাজির তপস্যা, সে কি আনিবে না দিন...



জ্যোতিষাঙ্গী সৌভাগ্যদমন মহারাজ

রবীন্দ্রপায়ক রাশি : ব্যাণ্ড লয়ের জাতক জাতিকরা এ মাসে অত্যন্ত একটা উজ্জ্বল সঙ্গীতানুষ্ঠানে ডাক পাবেন। তবে অনুষ্ঠান চলাকালীন নিম্নস্বে, বিশেষত পশ্চাদ্দেশে আধাতের সত্তাবনা আছে। স্প্যানিশের সঙ্গে ফার্স্ট এড কিট সঙ্গে নিয়ে গেলে আখাত এলেও প্রাণ রক্ষা পাবে।

রবীন্দ্র প্রকাশক রাশি : বাজ্ঞেটে বাঁশের দাম বৃদ্ধিতে কাগজের দাম অস্বাভাবিক বেড়ে ব্যবসায় ক্ষতির সত্তাবনা। এ মাসে রবীন্দ্রনাথ স্থগিত রেখে 'সাক্ষ্য' সম্পর্কিত বই প্রকাশনার কাজে হাত দিলে লাভের সত্তাবনা প্রবল। গীতাঞ্জলি শব্দে জন্ম হলে সাইড বিজনেস হিসেবে গামছার কারবার শুরু করতে পারেন। ফোল্ডিং ছাতাও মন্দ হবে না।

রবীন্দ্র উকিল রাশি : গত ক'মাস মন্দা গেলেও খুব শীঘ্র কপিরাইট সম্পর্কিত মামলা হাতে আসবে। তবে কোর্ট ফি শুনে আবেদনকারী বা ক্লসেট 'এখন আমার হারিয়ে যেতে নেই মান' গাইতে গাইতে আদালতের ভিড়ে মিলে যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে যে উকিলরা শাসক পার্টির সাপোর্টার তাঁরা 'আমি কোথায় পাব তারে' গাইতে গাইতে বাড়ি ফিরলে গৃহিণীর কাছে অপূর্ব সমাদর লাভ করবেন। অকস্মে সেই সমাদর-জ্বলিত প্রাণ-বেদনায় পরবর্তী কয়েকদিন কোর্ট কামাই হওয়ার সত্তাবনা রয়েছে।

রবীন্দ্র কবি রাশি : কবিতা ছেড়ে এ মাসে মাংসের দোকান দিলে ফাঁড়া কেটে গিয়ে আমদানির সুযোগ হবে। দু'বেলা বাড়িতে ঢুকতে পারবেন। পতীর রাতে হারিকেনের আলোয় চর্চা জারি রাখলে ভবিষ্যতে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের স্বপ্ন পেতে পারেন। স্বপ্নে পাওয়া কবিতাই আপনাকে কবি হতে সাহায্য করবে। অবশ্য পাঠকের কাছে তা দুঃস্বপ্ন বলেই বোধ হবে।

রবীন্দ্র পুলিশ রাশি : বদলির যোগ থাকলেও আমদানিতে তেজি ভাব থাকবে। শীঘ্র একটা মেয়ে হারানো কেস হাতে পাবেন। মেয়ে উদ্ধার করতে মহেশ্বরদ্রো পর্বত যাতায়াতের সমস্ত খরচা মেয়ের বাবা অফার করবে। তাতেই পুঁজি হবে। ওসি থেকে

চায়ের ভাঁড় সামনে দিয়ে সুর করে বলুন—
লহ লহ তুলে লহ..... প্রথমে চায়ের
ভাঁড় এবং ভবিষ্যতে আপনি—
ওপরে ওঠা সুনিশ্চিত।

সাবধান থাকবেন। উদ্ধার কালে তার 'কালো হরিণ চোখ' থেকে হুঁশিয়ার থাকুন। আপনার কপালে 'তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার 'সর্বনাশ' দশা অত্যন্ত প্রকট।

রবীন্দ্র নাপিত রাশি : সময় খুবই খরাপ আসছে। যুবসমাজ রবীন্দ্রনাথের মতো নাপিত বিরোধী মনোভাব দেখালে ব্যবসার সমূহ ক্ষতির আশঙ্কা। দোকানে একটা লটারি চালু করতে পারেন। অপেক্ষমান কাস্টমারদের স্যার্মা প্রকাশনীর 'কথা ও কাহিনী' পড়তে দিন। কথায় কথায় সময় কাটিয়ে সে অকস্মাই আপনার ক্ষুরে গলা পেতে দেবে। আপনার অবিস্মৃত 'রবীন্দ্র ছাঁট' অন্যদের খন্ডের ছাঁটাইয়ে সাহায্য করবে।

রবীন্দ্র চা-ওলার রাশি : এখনই চায়ে চরস মেশাতে না পারলে খরিস্কার হাতছাড়া হবার যোগ রয়েছে। যারা লেবু চা খাচ্ছেন তাদের জন্যে পাতি লেবুর পরিবর্তে বাতাবি ব্যবহার করলে দোকানের সুনাম বাড়তে পারে। দরখারে চা-বাগান তুলে দিয়ে বহুতল তৈরিতে সরকারের পাশে থাকুন। চায়ের দাম বাড়তে পারবেন, মনোনয়ন পাবেন। চায়ের ভাঁড় সামনে দিয়ে সুর করে বলুন—লহ লহ তুলে লহ..... প্রথমে চায়ের ভাঁড় এবং ভবিষ্যতে আপনি—ওপরে ওঠা সুনিশ্চিত।

রবীন্দ্র পরীক্ষক রাশি : খাতার চাপে ষাড়ে ব্যথা। গড় ছেড়ে ল সা ও পদ্ধতিতে নম্বর দিলে আরাম পাবেন। লটারি পদ্ধতি আরো সুবিধেজনক হবে। বিবেক-তাড়িত না হয়ে আপনার প্রিয় টিভি সিরিয়ালগুলির সময়সূচী অনুযায়ী খাতা দেখলে পরবর্তী মাসে রিভিউ-এর কাজ পেতে পারেন। নিজের কামরায় খাতা হারানো থেকে সাবধান।

রবীন্দ্র সুরকার রাশি : সুর করে খাবার দিন শেষ। সুর ছাড়াই বহু গান 'স্টোডেন ডিস্ক' পেয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখ্য—

বারান্দায়, রোদুর—

এই তো বেশ আছি

সুরের থেকে দূর।

বইমেলা শেষ হলেও ভেলেভাজায় ভোগ্যাদয় হতে পারে। তেল মাখালে আঁও ফললাভ। সুর করা কালীন ভেল-এর চেয়ে আঁতেল-এর ওপরে জোর দিন।

পত্রপাঠ জবাব

জবাব দিচ্ছেন : দ্বিতীয় সুগ্রীব



● আপনাকে লেখা পাঠাতে ইচ্ছে করে। আশা করি পড়বেন। কেমন লাগল জানাতে চুলাবেন না।

—অমিতাভ সাম্যাল, নাগের বাজার, কলকাতা-২৮

□ আসে থেকেই জানিয়ে দিচ্ছি—খুব ভালো লেগেছে। এবার নিশ্চয় দয়া করে লেখাটা আর পাঠাবেন না।

● ফুটবল না ক্রিকেট—কোন খেলা বেশি আকর্ষণীয়?

—কাক্ষন হাইতি, মেদিনীপুর

□ কিছুদিন খেলে দেখে জানাব। আপনি অবিশ্যি ২০টা ফুটবল, ৪০ জোড়া বুট, ৮০ জোড়া মোজা, ৫০ টা জার্সি, ৫০ টা স্পোর্টস প্যান্ট, ৫০ সেট ট্রাকসুট, খানকুড়ি ক্রিকেট ব্যাট, শ-দুয়েক ডিউজ বল, গোটা মশেক হেলমেট, তার সঙ্গে প্যাড, গ্লাভস, অ্যাক্রিট, নী-কাফ প্রয়োজন মতো পাঠিয়ে দিন।

● কেউ যদি বীরামপুরের সঙ্গে দেখা করতে চায়, তাকে কী করতে হবে?

—হাসান রাজা মোদ্রা, মুর্শিদাবাদ

□ প্রথমেই আগাম প্রার্থের আয়োজন করে আমাদের কল্লি ভূবিজে খাওয়াতে হবে। তারপর বাবা-মা জী-পুত্রের কাছে বিদায় নিয়ে যাত্রা করতে হবে কর্ণাটকের জঙ্গলে। চিটাটা চন্দনকাঠেই সাজানো হবে—হায়েড পাসেন্ট গ্যারেটেড।

● রবীন্দ্রনাথ দাড়ি কাটতেন না কেন?

—বিচক্ষণ পরামাণিক, বাসন্তী, উঃ ২৪ পরগণা

বিচক্ষণ পরামাণিকের সন্ধান পাননি বলে।

● পত্রপাঠ পত্রিকার আধুনিক কাল কত হবে?

—রিকি ব্যানার্জী, ডাকঘর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

□ 'কাল'-এর কথা আজ কি করে বলি?

● ক্রিকেট খেলায় এত রোমাঞ্চ। অথচ আমেরিকা ক্রিকেট খেলে না। কেন?

—শৌভিক সেনগুপ্ত, বাণেশ্বরী, কলকাতা

□ আমেরিকা যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলে। সে রোমাঞ্চের কাছে ক্রিকেট? ছোট।

● কলকাতা বইমেলা ২০০৩-এ 'পত্রপাঠ'-এর যারা বার্ষিক গ্রাহক হলেন, তাঁদেরকে ত্রি-গিফট হিসেবে বড়ি দেওয়া হল। আপাদী বইমেলায় ত্রি-গিফট কী থাকবে জানাবেন কি?

—কণিমা দাস, বিজয়মারী, বর্ধমান

□ হাই-ই দিই, একবছর "পত্রপাঠ" পড়ার পর সেটা দেখার মতো অবস্থায় আপনি থাকবেন?—বড় বেশি আত্মবিশ্বাস হয়ে যাচ্ছে না?

● লোকসাহিত্য পড়ে লোকের কী উপকার হয়?

—অনিভা রায়, বড়িশা, বেহালা

□ কোন লোকের কথা বলছেন? ইহলোক না পরলোক?

● আপনাদের সম্পাদক ব্যঙ্গ-শাস্ত্রে সিদ্ধহস্ত বোকাই যাচ্ছে। প্রেম-শাস্ত্রে কেমন?

—লিলি শাড়া, দুর্গাপুর, বর্ধমান

□ তাঁর প্রেমিকাদের জিজ্ঞেস করুন।

● রামায়ণকে ব্যঙ্গ করে "মারায়ণ" লিখছেন আপনারা। খুবই অন্যায় করছেন। আমরা, রামভক্তরা, এর তীব্র প্রতিবাদ করছি।

—জীবন মিত্র, কৈখালি, উঃ ২৪ পরগণা

□ দাঁত খিঁচিয়ে।

● আমরা একটি নতুন পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি। আপনাদের মতো চ্যাংড়াপি মারার কাগজ নয়, রোমান্টিক প্রেমের। নাম দিচ্ছি—

“প্রেমস্বর”। এতে শুধু প্রেমিক-প্রেমিকার মনের কথা নয়, নানান প্রতিযোগিতাও থাকবে। পুরস্কার ভারী লোভনীয়—একটি উষ্ণ চুম্বন। আগ্রহী হলে যোগাযোগ করুন।

—জয়িতা রায়, কলকাতা-২৯

□ আসপাতালের বার্ষ ওয়ার্ডে আসা থেকে আসন সংরক্ষণ করা থাকবে তো!!

● লাদেন মৃত না জীবিত?

—হুমায়ুন, সিরাকোল, দঃ ২৪ পরগণা

□ দেখা হলে জিজ্ঞেস করে বলব।

● ঘটকালি করে খাই। আপনাদের দপ্তরের ব্যাচেলর পুরুষদের ব্যাডোটা পেলে উপকৃত হতাম।

—বিপুল সেন, বালিগঞ্জ, কলকাতা

□ যদিও বিয়ে করেনি—এমন কেউ নেই, তবে পুরো ব্যাচটাই বউয়ে খেদানো। চলবে?

● সদ্য বিয়ে করেছি। হানিমুন করার ভালো জায়গা কোনটা—একটু পরামর্শ দেবেন?

—সুদেশ ঘটক, আসানসোল, বর্ধমান

□ কিচ্ছিক্কা।

● আজকাল কাগজ পড়ে মনে হয় আপনারা পুরুষরা সব পণ্ড।

—পিঙ্কি সেন, কলকাতা ২৭

□ আর আপনারা পণ্ডথেমী।

● একজন সংসারী মানুষের পক্ষে কি সংসার ত্যাগ করা সহজ?

—শুভময় ঘোষ, উত্তরপাড়া, বর্ধমান

□ না, দু’জন সংসারী মানুষের পক্ষে খুব সহজ।

● আমি একজন যন্ত্রশিল্পী। একটা ছোট অরগান কিনতে চাই। বিক্রয়তা থাকলে জানাবেন

—অবিনাশ চক্রবর্তী, রাণাঘাট, নদীয়া

□ আপনার ‘অরগান’ নেই!?

● আমার স্ত্রী সামান্য কারণে রেগে গিয়ে চিৎকার করে বাড়ি ফাটায়। কী করা যায়?

—ভবতোষ ঠাড়া, যাদবপুর, কলকাতা

□ তাঁবুতে থাকুন। তাঁবু উড়ে যায়, পুড়ে যায়, কিন্তু ফাটে না।

● মন্ত্রী আর নেতাদের বিরুদ্ধে এত বিতর্কাদ্ধার করেন কেন?

—ড. মুকুন্দ কুমার, পাইকপাড়া, কলকাতা

□ তাঁদের সততার জন্যে।

● সত্যিকারের সমাজসেবা কিভাবে করা যায়?

—মণিকা মুরমু, মেদিনীপুর

□ সমাজচ্যুত হয়ে।

● আপনাদের সাহস দেখে তাজ্জব হয়ে যেতে হয়। আপনাদের ঘাড় কটা করে মাথা?

—মধুমিতা গোস্বামী, দমদম

□ এখনো আছে নাকি? দেখতে পাইনে তো? পেলে দয়া করে পাঠিয়ে দেবেন?

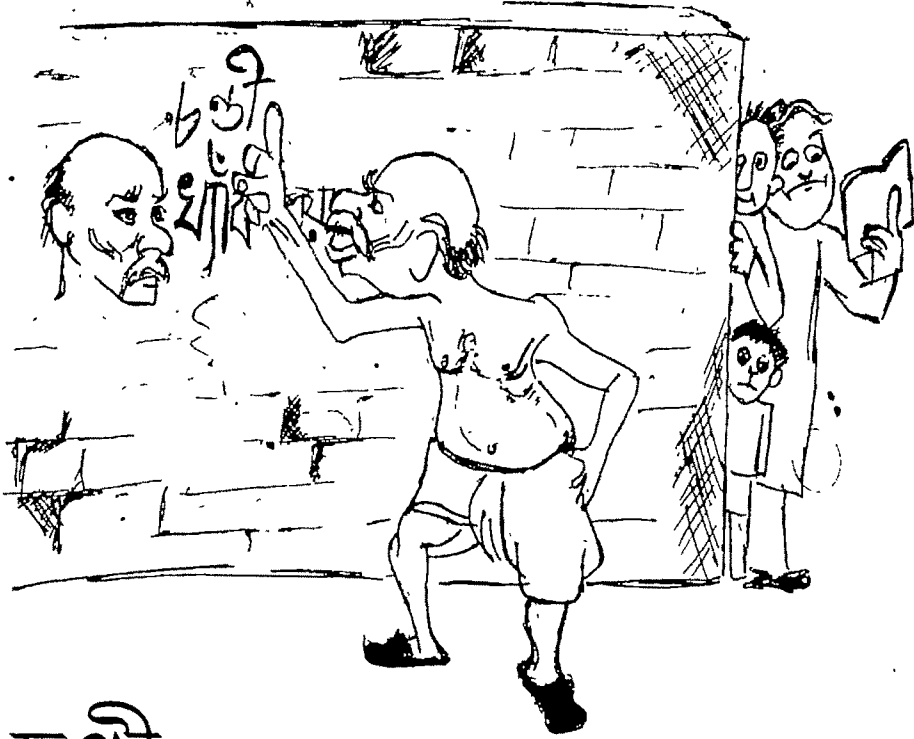
“পত্রপাঠ”-কর্মিত দুঃসমস্যার

“পত্রপাঠ” বেশ রমরমিয়ে চলছে। পত্রপাঠের সিডি-রম বেশ ছুটেছে। “পত্রপাঠ”-এর অনুরাগীদের কাছ থেকে মুহূর্মুহু সাবাশি জুটছে যে—জিতা রহো! এমনি করে ‘ঝোড়ে কাপড় পরিয়ে দেওয়া’-র তো কেউ নেই আর! শুধু খবর নেন না তাঁরা, “পত্রপাঠ”-এর সম্পাদকের পরনে কাপড়টি আর আছে কি না! বিজ্ঞাপনহীন এই কাগজ তাঁর ছবি ছাপতে পারে না শুধু এই কারণেই। সেসবের ভয়। আপনারা কেউ কেউ আট থেকে আঠারো হাজার টাকার সিগারেট ফোঁকেন ফি বছরে। আঠারো হাজার থেকে পঞ্চাশ হাজার মদ-মদে মত্ত হন, বিশ-পঞ্চাশ-একলাখ ছাড়েন ভ্রমণ-রমণে, এবং এমনি আরো কত কি। এসব হল কেজো খরচ। আপনাদের সন্তান-সন্ততির অর্থাৎ সন্তোরবে বলতে পারবে—আমার বাবা কিংবা মা-কে নিয়ে আমি গর্বিত, কেন না তিনি এই এই করেছিলেন। শুধু “পত্রপাঠ”-কে টিকিয়ে রাখার জন্য দু-দশ হাজার খরচ করতে পারেন না এই জন্যেই যে, সেটা নিতান্তই বাজে খরচ। আপনার সন্তান এ পরিচয় দিতে বড়ই লজ্জা বোধ করবে যে, “পত্রপাঠ”-এর কৃতিত্বের অংশীদার ছিলেন ‘আমার...’।

সদুপদেশ : বাজে খরচ করে মুখরাই!

পুরনো কাগাসুন্দি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “গল্পসল্প” থেকে



চণ্ডী

দিদি, তুমি বোধ হয় পাড়ার চণ্ডীবাবুকে জ্ঞান?
জ্ঞানি নো। তিনি যে ডাকসাইটে নিদ্দুক।

বিধাতার কারখানায় খাঁটি জিনিস তৈরি হয় না, মিশ্রল থাকেই। দৈবাৎ এক-একজন উৎরে যায়। চণ্ডী তারই নমুনা। ওর নিদ্দুকতায় ভেজাল নেই। জানো তো, আমি আর্টিস্ট মানুষ। সেইজন্যে এরকম খাঁটি জিনিস আমার দরবারে জুটিয়ে আনি। একেবারে লোকটা জীনিয়াস বললেই হয়। একটা এড়িয়ে গেলে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। একদিন দেখি, অম্বাপক অনিলের দরজায় কান দিয়ে কী শুনছে। আমি তাকে বললুম অমন করে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছ কাকে হে।

সেটাই যদি জ্ঞানতুম তাহলে তো কথাই ছিল না। চার দিকে

চোখ কান খুলে রাখতে হয়, কাউকে বিশ্বাস করবার জো নেই—চোর।
ছাঁচোড়ে দেশ ভরে গেল।

বলো কী হে।

শুনে অবাক হবেন, এই সেইদিন অমন আমার চাঁপা রঙের গামছাখানা
আলনার উপর থেকে বেমালাম গায়েব হয়ে গেল।

বলো কী হে, গামছা।

আজ্ঞে হ্যাঁ, গামছা বই-কি। কোণটাতে একটুখানি ছেঁড়া ছিল, তা
সেলাই কবিয়ে নিয়েছিলুম।

তুমি অনিলবাবুর দরজার কাছে অমন ঘুর-ঘুর করছিলে কেন। পরের
গামছা জোগাড় করবাব রোগে তাকে ধরেছে নাকি।

আরে ছি ছি, ওঁরা হলেন বড়োলোক, গামছা কখনো চক্ষুও দেখেন
নি। টার্কিস তোয়ালে না হলে ওঁর এক পা চলে না।

তা হলে?

আমি ভাবছিলুম, ওঁব পাওনা তো বেশি নয়। অথচ, এত বাবুআনা
চলে কী করে।

বোধ হয় খার করে!

আজকালকার বাজারে খার তো সহজ নয়, তার চেয়ে সহজ ফাঁকি।

আচ্ছা, তুমি পুলিশে খবর দিয়েছিলে নাকি।

না ভাই দরকার হয় নি। সেটা বেরোল আমার স্ত্রীর ময়লা কাপড়ের বুড়ির ভিতর থেকে। কাউকেই বিশ্বাস করবার জো নেই।

কী বল তুমি, ওটা ঠিক জায়গাতেই তো ছিল।

আপনি সাদা লোক, আসল কথাটাই বুঝতে পারছেন না। আপনি জানান তো আমার শালা কোচলুকে। কী রকম সে গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ায়। পয়সা জোটে কোথা থেকে। কাজটি করছেন তিনি, আর গিমি সেটাকে বেমালুম চাপা দিয়েছেন।

তুমি জানলে কী করে।

হ্যাঁ হ্যাঁ, এ কি জানতে বাকি থাকে।

কখনো তাকে নিজে দেখেছ?

যে এমন কাজ করে সে কি দেখিয়ে দেখিয়ে করে। এ দিকে দেখুন না, পুলিশ আছে চোখ বুজে, তারা যে বখরা নিয়ে থাকে। এই-সব উৎপাত আরম্ভ হয়েছে যখন থেকে দেখা দিয়েছেন ঐ আপনাদের গান্ধিমহারাজ। এর মধ্যে তিনি আবার এলেন কোথেকে।

ঐ যে তাঁর অহিংস নীতি। ধড়াধড় না পিটলে চোরের চুরি রোগ কখনো সারে? তিনি নিজে থাকেন কপনি পরে। এক পয়সা সম্বল নেই। এ-সব লম্বাচওড়া বুলি তাঁকেই সাজে। আমরা গেরস্থ মানুষ, শুনে চক্ষু স্থির হয়ে যায়। এ দিকে আর-এক ফন্দি বেরিয়েচে জানান তো? ঐ যে যাকে আপনরা বলেন চাঁদা। তার মূল্য কম নয়। কিন্তু সেটা তলিয়ে যায় কোথায় তার হিসেব রাখে কে। মশায়, সেদিন আমারই ঘরে এসে উপস্থিত অনাথ হাসপাতালের চাঁদা চাইতে। লজ্জা হয়, কী করে বলব। খাতা হাতে যিনি এসেছিলেন আপনারা সবাই তাঁকে জানান। ডাক্তার—আর নাম করে কাজ নেই, কে আবার তাঁর কানে ওঠাবে। তিনি যে মাঝে মাঝে আসেন আমাদের ঘরে নাড়ী টিপতে। সিকি পয়সা দিতে হয় না বটে, তেমনি সিকি পয়সার ফলও পাই নে। ব্লোগিরা তাঁর কাছে ধোঁয়ে না। কাজেই কাজের টানাটানি হয় বইকি।

ছি ছি, কী বলছ তুমি।

তা মশায়, মুখফোড় মানুষ। সত্যিকথা আমার বাধে না, ওঁর মুখের সামনেই শুনিতে দিতে পারতুম। কিন্তু কী বলব, আমার ছেলেটাকে আদায়ের কাজে রেখে আমার মুখ বন্ধ করেছেন। তার কাছ থেকেও মাঝে মাঝে ইশারা পাই। দক্ষিণহস্ত বেশ চলছে ভালো। বুঝছেন তো? আমাদের দেশে আজকালকার ইংরামি যে কী রকম অসহ্য, তার আর-একটা নমুনা আপনাকে শোনাই।

কী রকম।

আমাদের পাড়ায় আছে একটা গোমুখ্য যাকে ওরা নাম দিয়েছে কবিবর।

তাকে দিয়ে দেখুন আমার নামে কী লিখিয়েছে। ঘোর লাইবেল নিম্নকেরা দল পাকিয়েছে। পাড়ায় কান পাতবার জো নেই। খ্যাকশিয়ালি বলে চোঁচাচ্ছে আমার পিছনে পিছনে। এত সাহস হত না যদি না এদের পিছনে থাকত নামজাদা মুরুবি সব গান্ধিজির চেলা।

দেখি দেখি কী লিখেছে। মন্দ হয় নি তো। লোকটার হাত দোরস্ত

—আছে!

আলো যার মিটমিটে,

স্বভাবটা খিটখিটে

বড়োকে করিতে চায় ছোটো,

সব ছবি ভূষো মেজে

কালো করে নিজেকে যে

মনে করে ওস্তাদ পোটো,

বিধাতার অভিশাপে

ঘুরে মরে কোপে কাপে,

স্বভাবটা যার বদশৈয়ালি

খ্যাক খ্যাক করে মিছে

সব তাতে দাঁত খিঁচে

তারে নাম দিব খ্যাকশৈয়ালি।

ও কী ও, আপনার দরজায় পুলিশ যো।

ব্যাপারটা কী।

চণ্ডীবাবুর ছেলের নামে কেস এসেছে।

হ্যাঁ, কিসের কেস।

অনাথ-হাসপাতালের চাঁদার টাকা তিনি ভেঙে বসেছেন।

মিথ্যে কথা। আগাগোড়া পুলিশের সাজানো। আপনি তো জানেন, আমার ছেলে একসময় আহর নিদ্রা ছেড়ে গান্ধির নামে দরজায় দরজায় চাঁদা ত্রিফে করে বেড়িয়েছিল, সেই অবধি বরাবর তার উপর পুলিশের নজর লেগে আছে। কিছু না, এটা পলিটিক্যাল মামলা।

দাদামশায়, তোমার এই গল্পটা আমার একটুও ভালো লাগল না।

যেমন পাজি তেমনি বোকা,

গোবর-ভরা মাথা,

লোকটা কে-যে ভেবে পাচ্ছি না তা।

কবে যে কী বলেছিল তা ঠিক মনে নাই,

আচ্ছা করে মুখের মতো জবাব দিতে চাই;

কী যে জবাব, কার যে জবাব যদি মনে পড়ে—

প্রাণ ফিরে পাই ধড়ে।

হাতে পেলে দেওয়াই নাকে খত,

স্ত্রীর ছিড়ে দিই নখ।

রাস্কেল সে, পাজির অধম, শয়তান মিটমিটে;

দিনরাত্তির ইচ্ছে করে ঘুঘু চরাই ভিটেয়।

বদমাশকে শিকা দেব—অসহ্য এই ইচ্ছে

মনকে নাড়া দিচ্ছে।

লোকটা কে-যে পষ্ট তা নয়, এই কথাটাই পষ্ট—

অতি খারাপ, নিতান্তই সে নষ্ট।

পথের মোড়ে যদি পেতেম দেখা

মনের ঝালটা বেড়ে নিতেম যদি থাকত এঁকা।

বুকটা ভরে অকথ্য সব জমে উঠছে ঢের,

লক্ষ্য মনে না পড়ে তো কাগজ করব বের,

যেখানে-পাই নাম একটা করব নির্বাচন—

খালাস পাবে মন।

শনিবারের চিঠি, মাঘ ১৩৩৮ থেকে

নৃত্যময়ী

জিনু এতদিন কোন্ মহাঘমে মজ্জিত—

নয়ন মেলিয়া দেখি একি আশি-ভাতি রে।

চৌদিকে মোর, করি বেশবাস বজ্জিত

সুরসুন্দরী নাচে অপক্লপকান্তি রে।

নাচে উল্লাসে মেনকা-রস্তা-উকশী,
নৃত্যের তালে পড়ে কুন্তল-চূর খসি'
—দেহ হ'তে মোর নিতে চায় বুঝি প্রাণ ছিড়ে।

টানি নাই মাল মাধবী পৈণ্ঠী গোড়ীয়া
সেবন করিনি চণ্ড চরস গঞ্জিকা;—
নহি উদ্দাদ—উদোম ফিরি না-দোড়ীয়া,
পথ চলি দেখে গুপ্তপ্রেমের পঞ্জিকা।
তবে একি হল? মরিয়া ঢুকিনু স্বর্গে কি?
স্বপ্নের ঘোরে লভিনু চতুর্দর্শে কি?
কিন্বা এ মায়া কল্পনা- অনুরঞ্জিকা।

—স্বর্গ এ নয়, ওরে মন, নয় কল্পনা
আহা মরি মরি। এ যে নিত্য সত্য রে।
নহে এ লাস্য হেমা-রস্তার ছলপনা:
—বঙ্গ মহিলা নাচিছে রঙ্গ-চক্রে।
চরণে চরণে মঞ্জির মৃদু গুঞ্জিয়া
তনু তরঙ্গে কলাকৌশল পুঞ্জিয়া
আপন নৃত্যে আপনি মগন মন্ত রে।

গুরু নিতম্ব শোভে কাঞ্চন কাঞ্চীতে;
কঞ্চুলী আঁটা পীন পরিসর বক্ষ রে।
সু-খনু হইতে হানে বিযাক্ত বাণ চিতে—
ঘায়িলে হইয়া পড়ে যত রূপদক্ষ রে।
ফিরায়ে আনিল কে কহ প্রাচীন লাস্য এ?
অজস্তা-অঁকা চিত্রের চারু ভাষ্য এ?
—নাম তাঁর লেখা রবে সুবর্ণ অক্ষরে।

নটীর ছন্দে নাচিছে সাজিয়া নর্তকী
দেবদাসী সেজে নাচে কভু নাট-মন্দিরে।
ভ্রম হয়, এটা সেই পুরাতন মর্ত্য কি—
অথবা এ দেবসভা পারিজাত-গন্ধী রে।
নাচিতে নাচিতে নটীর চরণে খাল্ থরে
দেখিতে দেখিতে দর্শকমুখে নাল্ করে—
কি নাচ। আ মরি। সুধারসনিঃস্যান্দী রে।

নাচবে নেশায় মাতিল বঙ্গ-অঙ্গনা
রঙ্গমঞ্চে, নাচিল কুহক ভঙ্গিতে!
অস্তরীক্ষে বাজিল মৃদু-সুদঙ্গ না?
তবলায় টাটি কে দিল সুতাল সঙ্গীতে?
নিজে নটরাজ বাজান ডমরু গঙ্গীরে—
তবু নাচিবে না কে আছে এমন দস্তী রে।
কে পারে তাঁহার রসানুশাসন লঙ্ঘিতে!

নাচিতেছে তাই তরুণী সবাই উল্লাসে
ভঙ্গিমাভরে কটিদেশ করি বঙ্কিত;—
লাস্য-আলসে নয়নে আবেশ-চুল আসে
শিরায় স্নায়ুতে শৃঙ্গার-সুর বঙ্কিত।

বাংলা ভাসিল নৃত্য-ফেনিল বন্যাতে
নাচে এক সাথে পিসী-মাসী-মাতা কন্যাতে।
—আমি চেয়ে থাকি বোকার মতন, শঙ্কিত।

ঘন ঘন লাঙ্গল-দায়ক জয় হে, জয়ন্তিভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয় জয় জয় হে।
অহ অহ কত প্রোগ্রাম প্রচারিত, অগুণিত অগুণিত তাহা,

জয়জয়ন্তী

ঘন ঘন ধনমপি নায়ক জয় হে জয়ন্তিভাগ্যবিধাতা
ইংলণ্ড-ফ্রান্স-সুইডেন-ইটালী-আরব-তুর্কী-কম্বো
আল্গস্-ককেশস-দনিয়ুব-ভল্গা-নাইল-মিসিসিপি-হংহো
তব ফরমাসে আসে বাংলা কবিতা চাষে
পুরিল কৃষ্টির স্বাতা।

ঘন ঘন লাঙ্গল-দায়ক জয় হে, জয়ন্তিভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয় জয় জয় হে।
অহ অহ কত প্রোগ্রাম প্রচারিত, অগুণিত অগুণিত তাহা,
চিঠি-পোষ্টারে অর্থ ফুকীকৃত সহস্র অযুত ত ডাহা!
পোয়া বারো হাতে, আড়ি মার' তুমি তাতে
পাকা ঘুটি ঘর যাতা।

ঘন ঘন অক্ষ-বিহঙ্গমক জয় হে, জয়ন্তিভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয় জয় জয় হে।

পতন-রবদয়-দুর্গম-পদ্মা চিন্তা কর তুমি খোড়া,
হে পয়সারথি, তব রথচক্রে শহর লহর সম জোড়া।
সদর-মক্ষ-ম্বল মাঝে তব হর্গক্ষনি বাজে
ডাউন মিটার-হাতা।

ঘন ঘন রথ-পরি ধায়ক জয় হে, জয়ন্তিভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয় জয় জয় হে।

"শৈল"- "নীল"- "নূপ"- "বিমলা"-নন্দিত পিবীত-চর্চিত দেশে,
জাগ্রত ছিল তব সূতীক্ষ্ণ ঈক্ষণ,—কি সুক্ষ্মে পশ' শেষে।
কঠে তেবেলেলা ফতে হইল সব কেলা

টুই টুই করি দ্বাতা।

ঘন ঘন লক্ষে জয় হে, জয়ন্তিভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয় জয় জয় হে।

যাত্রী মাতিল শুধি প্রাক্তন ঋণঘত ছুড়ি হোমজ ভস্মে,
গাহে সুরঙ্গম-সুবঙ্গমা কত বিচিত্র দীর্ঘে হ্রস্বে।
কত তরুণারূপ-রাগে কলিকা শ্মুট-বর মাগে
লিখিত কাগজ তা তা।

জয় জয় জয় হে, বগলে-ধৃতরবি, জয়ন্তিভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয় জয় জয় হে।

একপর্কে



লোডি রাগু দশ বছর বয়সে উলঙ্গ
হয়ে তাঁর সামনে দাঁড়িয়েছিলেন,
এটা এখন প্রমাণিত। তখন দশ
বছর বয়সে মেয়েদের বিয়ে
হয়ে যেত।



জলের ভূমিকা



সমরেশ মজুমদার

না মের পাশে ঠাকুর থাকলে তার দিকে বিতীর্ণবার তাকাতেই
হত। তার ওপর সেই মানুষটির গায়ের চামড়া যদি সৌরবর্ণ
হয়। শরীর দীর্ঘ, নাক টিকালো, তাহলে তৃতীয়বার দেখতে
হবে। আমাদের ঘোবনে এরকম ঠাকুর অনেক ছিলেন যাদের প্রতিভাকে আরো
প্রচারিত করেছিল ওই ঠাকুর পদবী। সৌমেন ঠাকুর, শুভ ঠাকুর মশাইরা
নিজওপে যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিলেন ঠিকই কিন্তু জোড়াসাঁকোর গঙ্গা খুঁজে পেতাম
তাঁদের পদবীতে। আর জোড়াসাঁকো বলতে দেবেন ঠাকুর বা অবন ঠাকুরের
নাম প্রথমে মনে আসতনা, তার পুরোটা জুড়ে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। হিমালয়ের
পাশে শুভনিয়ার পাছাড়ের যে অবস্থান, ঠিক তাই হয়েছিল জ্যোতির্বিজ্ঞ বা
দিনেন ঠাকুরের। তিনি চলে গেছেন একচল্লিশ সালে। যা রেখে গেছেন তা
নিয়ে আমরা ভরাট হয়ে আছি। এতটাই সেই মুকুতা যে পরবর্তীকালে কোনো
ঠাকুর যদি বস্তু হিসেবে দারুণ বলেন তাহলে বলি, হবে না কেন, রবীন্দ্রনাথের
রক্ত আছে শরীরে।

শুভ ঠাকুরের বহেমিয়ান জীবনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঠিক মেলেনি তবু
তাঁর প্রতিভায় রবীন্দ্রনাথকে অবিস্মার করার চেষ্টা করেছি। এই যে বাণী, বাণী
ঠাকুর, দারুণ রবীন্দ্র-সঙ্গীত গান, ওই ঠাকুর পদবীটা বোধহয় সমসাময়িকের
থেকে ওঁকে একটু এগিয়ে দিয়েছিল। সেইসঙ্গে রবীন্দ্র-স্রবানার সঙ্গে মিলিয়ে
ওঁর চেহারার গড়ন, গায়ের রঙ ওই এগোনোর কাজটাকে সহজ করেছিল।

মনে আছে, বেকবাগানের মোড়ে শ্রদ্ধেয়া অমিয়া ঠাকুরের কাছে একবার
গিয়েছিলাম। রবীন্দ্রনাথের নিকট-আত্মীয়া ওই মহিলা চমৎকার গান গাইতেন।
আমার অনুপ্রাণে একটা অনুষ্ঠানে উনি গিয়েছিলেন বৃদ্ধা বয়সে। বয়স যত
বড়ে মানুষ যে তত সদয় হয় এটা আমি জেনেছিলাম তাঁকে দেখে, পরে সুচিন্তা
মিলকে। অমিয়া ঠাকুর আমাকে একটি পোস্টকার্ড দেখিয়েছিলেন। জগদীশচন্দ্র
বসু ডাকে পাঠিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে। সাধারণ দু'চারটে লাইন। এক দুপুরে
রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়েছিলেন অমিয়া ঠাকুর। তাঁকে দেখতে পেয়ে সেই দুপুরে

গান এল তাঁর মনে। কেরখার লিখবেন, কাম্বজ কই, শেরে গেলেন পোস্টকার্ডটা।
উন্টোদিকের ঠিকানায় পাশের ফাঁকা জায়গায় লিখে ফেললেন প্রথম চারটে
লাইন। সুর দিয়ে শোনালেন। বললেন, এটা নিয়ে যাও, ফুলে ফেল মুখড়াটা।

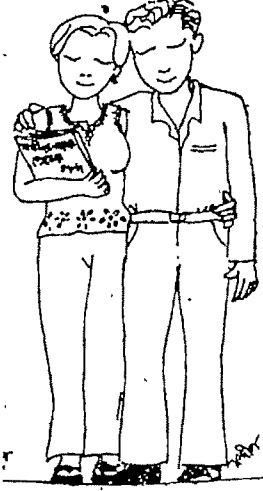
অমিয়া ঠাকুর বলেছিলেন, এ আমার কাছে কোহিনূরের চেয়েও দামি।
আমি তো চলে যাব, দিয়ে যাব বিশ্বভারতীর সংগ্রহশালায়। নইলে হয়ত...

কথা শেষ করেননি তিনি।

এই 'নইলে হয়ত' শব্দদুটো নিয়ে আমরা দীর্ঘদিন নাড়াচাড়া করেছি।
রবীন্দ্রনাথের ওপর বিশ্বভারতীর একচেটিয়া অধিকার নিয়ে যেমন বিরক্ত
হয়েছি তেমনি নিষেধাজ্ঞা উঠে গেলে ব্যবসায়ীদের হাতে পড়ে রবীন্দ্রনাথের
হাল কি হবে তা ভেবে আতঙ্কিত হয়েছি। সন্তোষ কুমার বোধ বলতেন,
নিষেধাজ্ঞা উঠে গেলে অশিক্ষিতরা উল্লসিত হবে কয়েকদিন, তারপর থিতিয়ে
যাবে দলবৃদ্ধি না হওয়ায়। রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথেরই থাকবেন চিরকাল।

কুড়ি বছর আগে শোনা এই কথাগুলো সত্যি হতে চলেছে। নিষেধাজ্ঞা
উঠে গেলে কলেজস্ট্রিটের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীর প্রকাশকরা উঠেপড়ে
লাগলেন রবীন্দ্রনাথের বই ছাপাতে। কোন বই? রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতা,
প্রেমের গল্প, প্রেমের উপন্যাস শত্নন রঞ্জন মল্লিক বাজারে বের হল।

রবীন্দ্রনাথের অমূল্য কবিতাও ছাপা হয়ে গেল। কি আছে সেই বইতে?
বিয়ে হল বাহুবীর। বাসর শেষে নিরালায় দেখা হল বরের সঙ্গে। পরদিন
তার সঙ্গীরা জিজ্ঞেস করল, কি হল তখন? কলে মুচিক হেসে বলেছিল, 'কাল
রজনীতে ঝড় হয়ে গেছে রজনীগন্ধা বনে।' কলে চলে গেল স্বপ্নরবাড়ি। ফিরল
সাতমাস পরে। তার সম্ভান হবে। সঙ্গীরা টিপ্পনি কাটল, কলে বলল, কি করব
বল। এক রজনীর বর্ষশে মোর সরোবর পেছে সুরিয়া। শুধু তাই নয়, প্রথম
রাত্রের মিলনের পর কলে তার বরকে অনুপ্রাণিত করেছিল, 'কাদালে তুমি মোরে
ভালবাসারই ঘায়ে, নিবিড় বেদনাতে পুলক লাগে গায়। সম্পাদকের বক্তব্য,
প্রথম সন্তানের এমন জ্যাক্ত বিবরণ ওই রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কে দিতে



পারেন? আর যৌনসুখে উন্মত্ত নারী তার প্রিয়কে বলছে, 'আরো আরো প্রচুর আরো, এমনি করে—'। এমনকি 'সোনার ভরী' কবিতাটি যে চরম অলীল তা আমরা এখন জানতে পারলাম।

আমার এক বন্ধু ওয়েলিংটন থেকে লিখলেন এমনি এক কপিনব গীত বিতান কিনে পাঠাতে। কলেজস্ট্রিটের পাঁচজন প্রকাশক বইটি এখন ছেপেছেন। একটি বইয়ের ওপর নটরাজের মূর্তি। ছাপা ভালো। না দেখে কিনে পাঠিয়েছি। বন্ধু বই পেয়ে ফোঁ করলেন—বিশ্বজ্ঞানভীর বইতে

একঘেয়েমি ছিল। এটি যেমন ভুলে ভরা তেমনি দৌজন্য বিহীন ছাপা। কেন? ঘোঁষা পেয়ে লজ্জিত হয়েছিলাম। আমাদের কলেজ স্ট্রিটের অন্তত নব্বই ভাগ প্রকাশক প্রকাশনার মান নিয়ে মাথা ঘামায় না, খরচ বেড়ে যাওয়ার ভয়ে। ফলে তাঁদের বইগুলোকে মোটেই আধুনিক বলে মনে হয় না। আর রবীন্দ্রনাথের বই-এর ক্ষেত্রে তো কেউ কৈফিয়ত চাইতে আসবে না। লেখককে সম্মান দক্ষিণা দিতে হচ্ছে না, সেই টাকা প্রকাশনায় খরচ করলে বইয়ের মান ভালো হবে—এসব ওঁরা ভাবেন না। বই বাজারে ছাড়ার সময় ভেবে নেন, অন্তত পনেরো-কুড়ি শতাংশ লাভ হয়ে গেল, যা লেখকদের দিতে হয়, রবীন্দ্রনাথকে দিতে হবে না।

আজকের তরুণ কি রবীন্দ্রনাথ পড়ে? এই প্রশ্নের জবাব দেওয়ার আগে আরো পাল্টা প্রশ্ন করতে হয়, শিক্ষিত বাঙালির কত শতাংশ বাংলা বই পড়েন? সম্প্রতি সমীক্ষা চালানো হয়েছিল। দশ জন বিভিন্ন বৃত্তির বাঙালিকে প্রশ্ন করা হলে মাত্র পাঁচজন রলেছেন নিয়মিত বাংলা পল্প-কবিতা-উপন্যাস প্রবন্ধ পড়েন। বাংলা খবরের কাগজ পড়েন পঞ্চাশ শতাংশ, পক্ষিক মাসিক বা সাপ্তাহিক পত্রিকা পড়েন আট শতাংশ। দশ জনের পাঁচজন মানে আড়াই শতাংশ। বাকি সাড়ে সাতানব্বই শতাংশ মানুষ বাংলা সাহিত্যের ষোঁজই রাখেন না। এ যদি তথ্য হয়, এই আড়াই শতাংশ পাঠকের অনেকেই রবীন্দ্রনাথ পড়া। তরুণদের কেউ কেউ পড়েছেন বলেই অনুমান। এখানো একুশ বছর বয়সে 'কিনু গোল্ডার গলি' পড়ে নিজের সঙ্গে মিল খুঁজে পেয়ে তো তাদের মন্দ লাগে না।

সেদিন এক তরুণ প্রশ্ন করল, রবীন্দ্রনাথের জন্যে কত মানুষ বিখ্যাত হয়েছেন তার খবর রাখেন? সেই প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, যিনি রবীন্দ্রনাথের জীবনীকার, রবীন্দ্রনাথ না থাকলে কেউ তাঁকে চিনত? সেদিন থেকে আজ অবধি যত রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞ শ্রদ্ধা এবং পুরস্কার পেয়ে গেছেন তা তো রবীন্দ্রনাথের জন্যেই। রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোয় না জন্মালে চিত্রা দেব 'ঠাকুরবাড়ির অমরমহল' লিখলে কেউ কি পড়ত? আর চিত্রা কি লিখতে উদ্যোগী হতেন? শান্তিনিকেতন আর জোড়াসাঁকোয় দু-দুটো বিশ্ববিদ্যালয়ে হাজার হাজার মানুষ খেয়ে-পড়ে বেঁচে আছে তো তাঁর জন্যে।

তরুণ আরো বলল, এসব তো বিশাল বটগাছে আশ্রয় পাওয়া সত্যার কথা। কফিহাউসে খবর পেলাম, 'রবীন্দ্রনাথের যৌনজীবন' শিরোনামে একটি বই বের হচ্ছে। আপনি কি জানেন?

চমকেউঠলাম। তরুণ জানাল, সেই আশা থেকে শুরু করে নতুন বোর্ডান হয়ে বন্ধ বয়সে ভিক্টোরিয়া ওকাল্পোতে আলোড়িত হওয়ার পরেও কিশোরী

কোনো ঠাকুর যদি বক্তা হিসেবে

দারুণ বলেন তাহলে বলি, হবে না কেন,
রবীন্দ্রনাথের রক্ত আছে শরীরে।

রাণুর প্রতি তাঁর তীব্র আকর্ষণের বর্ণনা থাকবে বইটিতে। বাঙালি পাঠক উপভূ হয়ে সেসব গিলে নেবে।

রেগে গেলাম খুব। জিজ্ঞাসা করলাম, লিখলেই হল? সাক্ষী কোথায়? হাসল, —লেডি রাণু দশ বছর বয়সে উলঙ্গ হয়ে তাঁর সামনে দাঁড়িয়েছিলেন, ওটা এখন প্রমাণিত। তখন দশ বছর বয়সে মেয়েদের বিয়ে হয়ে যেত। ওকাল্পোর বাড়িতে তিনি লিখছিলেন। কৌতূহলী ওকাল্পো কী লিখছেন দেখার জন্যে পেরন থেকে উকি মারতেই তিনি আপেল ধরার মতো....।

বাকিটা বলতে তরুণের সঙ্কোচ হল।

বললাম, এসব তো কুৎসা।

পকেট থেকে একটা কাগজ বের করল তরুণ, —গুনুন। প্রেমে পড়বার কোনো বয়স নাই। স্বচ্ছন্দে সন্তরের কাছে আসিয়াও আপনি প্রেমে পড়িতে পারেন; এই গ্রন্থ আপনাকে উদ্ধৃত করিবে; নহিলে মূল্য ফেরৎ।

তরুণকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি রবীন্দ্রনাথ পড়েছ?

—হ্যাঁ। একটা জাতি হামাগুড়ি দিচ্ছিল, তিনি তাকে দাঁড় করালেন, হাঁটতে শেখালেন, দৌড়াবার শক্তি দিলেন। ওই কারণেই তাঁকে বলতে হবে—ঈশ্বর, এরা জানে না কী করছে, এদের ক্ষমা করো।

ডায়েরী

ভীমরতি-বন্ধ অসিত-বন্দ্যো

বিশিষ্ট সমালোচক-অধ্যাপক-পণ্ডিত প্রবর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এ বছর আনন্দ-পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেছেন। একটি 'নীল' উপন্যাসকে শংসাপত্র দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন—“পর্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ।” এতদ্বাণী যে তাঁর ভীমরতিরই প্রকাশ, সেকথা বলেননি। সমালোচক-চূড়ামণির এই চূড়ান্ত চাটুকারিতা আমরা বুঝিনি। 'চূড়া' শব্দটি কোন অনুঘর্ষে তাঁর চিত্তে এসেছে, তাও তিনি প্রকাশ করেননি। তবে স্বর্ণ-নিবাসী এক ফক্কড়-নিম্নক অসিতকুমারের গুরু সুকুমার সেনকে নাকি বলেছেন, 'কুচযুগ হৈল যেন পর্বতের চূড়া' পংক্তিটির প্রভাবেই অসিতকুমারের এই 'উচ্চারণ'। এ সবাদ অবশ্য অসিতকুমারের কর্ণে প্রবেশ করেনি। অগ্রিয় সবাদে অসিতকুমার অশীতিপর বহিরতা অবলম্বন করাকেই শ্রেয় বোধ করেন। তিনি শতায়ু হোন। তাঁর শতবর্ষে আরো কিছু প্রলাপ শোনার অপেক্ষায় রইলাম।

সাহিত্য দুঃসংবাদ

তিলোত্তমা, আনন্দ এবং....

‘অ

‘আনন্দ’! দুঃখ দ্যাও কেন মা?! তুমি তো রত্নগর্ভা! বছরে বছরে তোমার প্রসূত তারকা-মহাতারকা সন্তানেরা সাহিত্যাক্ষপ খাচ্ছিল। তোমার গর্ভাবসে কত সাহিত্যিক-উজ্জ্বল জন্মিত হয়।

বিক্রমাদিত্যের ‘নবরত্ন’ সভা তো তোমার বৃধমণ্ডলীর তুলনায় ‘তৃণসম’। পত্রিকা-পরিমণ্ডলে তুমি তো যাকে বলে, ‘মনোপালি’। তোমারই তো ক্যাপশন—ভারতের সর্বাধিক বিকৃত না বিকৃত, কি যেন প্রথম শ্রেণীর দৈনিক। আর তুমি কিনা এরকম বাসি-পাচা-টোকো খবর ঝাড়ছ? তার বদলে ওই জায়গাটায় একটু ‘রঞ্জনীয়’ নেশা ঢেলে দিতে পারতে। নববর্ষের সকালে একটু আমেজ আসত। হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছ, তিলোত্তমার (গুণু নামটাই যথেষ্ট) ‘আনন্দ’ পাওয়ার কথাই বলছি। পাচা-পাচা খবর। ও তো সবাই জানে। ভাবছ বুঝি, আমি সেই ‘সারস্বত’-এর কলাম চুরি করছি? হ্যাঁ, তিনি প্রায় মাস-দেড়েক আগে ঘোষণা করেছিলেন বটে—“এবারের পাঁচলাখি আনন্দ পুরস্কার তাকেই (তিলোত্তমা) দেওয়া হচ্ছে।” সেই সঙ্গে ‘দেশ’ প্যাডেলিয়নে তাঁর ছবি টাঙানো, IMAGE BUILDING ইত্যাদি কথাও বলেছিলেন। তা, উনি এসব বলতেই পারেন। কারণ, অনেক সারস্বতের সঙ্গেই তাঁর ঘা-ঘষাঘষি আছে। কিন্তু অসারস্বতরাও যে জানত, তিলোত্তমার তিন তিল করে উত্তমা হবার কথা। জানত যে, সাহিত্য-গুণের প্রয়োজন নেই, তিলোত্তমা ‘আনন্দ’ পাবে নিজগুণে। কবিকল্পদেব চণ্ডীমঙ্গলে ছন্দরূপিণী চণ্ডী ফুল্লরাকে বলেছিল : “আনিয়াছে স্বামী তব বান্ধি নিজ গুণে।” একটু বদলে দিলে পঙ্ক্তিতিলোত্তমা-সম্ভব হবে : ‘আনন্দ’ আনিয়াছে তিলু বান্ধি নিজ গুণে। এ প্রসঙ্গে স্বকর্ণে শ্রাব্য দুই নিন্দুক ও সন্দেহ বাতীকের সংলাপ স্মরণ করা যেতে পারে।

১ম নিন্দুক : জানেন, কলকাতার বদলে এবার বুঝি তিলোত্তমার মাধ্যম হাত পড়েছে।

২য় নিন্দুক : শুধু মাধ্যম !!?

এক আনন্দকাকু, নাকি দাদা, সম্ভব্য করেছেন—“সব সাহিত্যিকই হারামজাদা এক্সপ্রেস্ট সুনীল গাঙ্গুলি।” তবে আর কি? তিলোত্তমার জন্য বাংলা-গাড়ি। সঙ্গে একশ আরাম, এবং পোস্ত লবির লেজুড় হিসেবে আরো দু-চারটে সাহিত্য পুরস্কার।

যাক গে, পুরস্কার তো তিনিই পেয়েই গেছেন। তা তো আর কেড়ে নেওয়া যাবে না। তবে ঘর জন্য পুরস্কার তার একটু খোঁজ নেওয়া যাক। কেমন মাল তিনি ছেড়েছেন সাহিত্য-বাজারে? উপন্যাসটা তিনি শুরু করেছিলেন ভালোই। ছিল সম্ভরের সেই নিশ্ফল অথচ শুভ প্রচেষ্টা এবং তথাকথিত ‘রোমান্টিসিজম’। ছিল আনিসুজ্ঞামাসের মুসলমান হয়েও দুর্গা সম্বন্ধে গবেষণা করার যুগোপযোগী সঙ্গীতির চিহ্ন, ছিল ‘নিখিলের হতাশের দলের’ বিবেক-চরিত্রে অভিনয় করা অজ্ঞর মাস্টারমশাই। এবং মল্লিনাথের হিন্দু-সম্ভব সংস্কার-কুসংস্কার বা মানসিক বিকৃতি। মনে হচ্ছিল, এ উপন্যাস উচ্চচিন্ত, উচ্চমেধা যুক্ত ‘বাঙালির মননের সঙ্গী’। কিন্তু যেই করপোরেশনের ঝাড়ুদার হরিচরণ শবরীর “রক্তচিহ্নিত খোলামেলা কাপড়ের টুকরোগুলি” পেল, ঠিক তখনই উপন্যাসটা আপামর ‘বাঙালির মননের সঙ্গী’ হয়ে গেল। উচ্চচিন্ত-অধ্যাপিত-নিরুচ্চিন্ত, উচ্চমেধা-অধ্যমেধা-নিম্নমেধা—সব একাকার করে দিলেন তিলোত্তমা। তিলোত্তমার মতে, উপন্যাস নাকি “...একটা জানালা। এই



সন্দেহ

জানালায় ফ্রেমে যতটুকু ধরা পড়েছে, সেটাই একটা উপন্যাস।” তা, তিলোত্তমার জানালায় কী ধরা পড়ল? ধরা পড়ল, যুগলে-যুগলে ‘অমৃতকুন্ড’; তাতে গোবর কুড়ানি ফুলরেণুও বাদ নেই। ধরা পড়ল পুরুষ-সাবধানতার উপকরণের বিজ্ঞাপন; জিনি-দেবাশিস কণ্ঠোপকণ্ঠন। আর ধরা পড়ল বিবিধ ‘শৃঙ্গার পদ্ধতি’। যার যে কোনো একটার বর্ণনা বাৎস্যায়নকে নকআউট করার পক্ষে যথেষ্ট। পারিজাত-কাননে বসে বাৎস্যায়ন নিশ্চয় এখন হাত কমড়াচ্ছেন—মর্ত্য-মানবকে পূসারকালে পিচ্ছিলকারক কোনো দ্রব্য ব্যবহারের পরামর্শ দেননি বলে। বিকাশ ও লক্ষ্মী, অজ্ঞ আর টেপির ডাক্তার-ডাক্তার খেলার বর্ণনা তো ‘সত্যসন্ধানী’ কেও হার মানায়। আবার বয়সকালে হাতের একটা কু-অভ্যাসও দেখে ফেলেছেন জানালা দিয়ে। পড়তে পড়তে মনে হয়—‘হারল্ড রবিন্স, হ্যাডলি চেজ, লরেন্স, মিলারদের ভূত একথোশে তিলোত্তমার কলমে ভর করেছে। আর কলম পাই পাই করে ছুটেছে।

এ প্রসঙ্গে আরো একটি ঘটনা। এক পরিচিত ‘পাশ্চাত্য-সাহিত্য-প্রেমিক’ লাইব্রেরি থেকে লাইব্রেরিতে ছুটে বেড়ায় লরেন্স-মিলার-রবিন্স পড়ার জন্য। পড়ে, কিন্তু খামচে খামচে। অর্থাৎ শুধু রগরগে জায়গাগুলো। সে হঠাৎ একদিন ঘোষণা করল :

—আর ছোট্টাছুটির দরকার নেই।

—কেন রে?

—বাড়িতে তো ‘দেশ’ নিচ্ছে। ‘বসুধারা’তেই সব পাচ্ছি।

তিলুদিদি, পৌরাণিক তিলোত্তমার কথা মনে আছে? সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা তাঁকে সৃষ্টি করার পর দেবতাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু ব্রহ্মার ‘স্ফোট-স্ফোট-স্ফোট’ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তিলোত্তমার এতটুকু উত্তমা কিন্তু আর অবশিষ্ট ছিল না। সেইসব লোভী দেবতারাও কিন্তু তা নিয়ে মাথা ঘামায়নি। ছবি টাঙিয়ে, IMAGE BUILDING-এর ‘তিল’ দিয়ে সৃষ্টিকর্তার আজ তোমাকে ‘তিলোত্তমা’ বানাচ্ছে। তাঁরা হয়ত স্ফোটম উচ্চারণ করবেন না। তাঁদের স্বার্থেই করবেন না। কিন্তু ‘কাল’? তিলুদিদি, ‘কাল’ কিন্তু ‘স্ফোটম’ উচ্চারণের জন্য মুখিয়ে আছে। মুখোমুখি না হয়ে নিস্তার নেই। ঈশ্বরকে রকে কলতে বলে লাভ নেই। এ তাঁরও সাধের বাইরে।

—পঞ্চম কলমচি

বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ পরীক্ষার খাতাতেও এখন পাবেন, রবীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত গল্প হল 'চারুলতা'। রীতিমতো আবিষ্কার। অতীব রোমহর্ষক! চুলোয় যাক 'নষ্টনীড়'।

ফজল আলির ফাদলানামা



লাখ লাখ টাকার ব্যবসা করছে। ভবী তক্কে তক্কে ছিল। গুরুদেব দেহ রেখেছেন ১৯৪১-এ। পঞ্চাশটা বছর যেতে দাও। এল ১৯৯১। তো কেন্দ্রীয় সরকার রবীন্দ্রনাথের রচনাস্বত্বের মেয়াদ আরো দশটা বছর বাড়িয়ে দিলেন। কুছ পরোয়া নেই। বাঙালি উত্তেজিত হলে হিন্দি বাত্ব ঝাড়ে। দেখতে দেখতে এসে গেল ২০০১। ভবীর দল হৈ হৈ করে ঝাপিয়ে পড়ল। ছেপে ফ্যাল, ছেপে ফ্যাল। বিজ্ঞাপন দে, বিজ্ঞাপন দে। ফেস্টুনে ফেস্টুনে বইপাড়া ছয়লাপ করে দে। হেভি মওকা। গুরুদেবকে নিয়ে বেসাতি শুরু হয়ে গেল। ভবীর দলের ব্যাঙ্ক ব্যালাস বাড়তে লাগল। গুরুদেব এখন ইন্ডাস্ট্রি।

ভবী হল নাছোড়বান্দা। তার কাছে ভব্যতার আশা করা বৃথা। ভব্যতার ধার সে ধারে না। এই দেখুন না, বাংলার রবি, মানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভবীর হাতে পড়ে তাঁর কী করুণ অবস্থা। ঠিক যেন, 'ছেড়ে দে মা কৈঁদে বাঁচি'!

লিখেছিলেন 'নষ্টনীড়' গল্প। সিনেমার কন্ডায়ে সেটা হয়ে গেল 'চারুলতা'। লোকের মুখে মুখে এখন 'চারুলতা'। যতই বোঝানোর চেষ্টা করুন না কেন, রবীন্দ্রনাথ ঐ নামে কোনো গল্পই লেখেননি, ভবী ভোলবার নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ পরীক্ষার খাতাতেও এখন পাবেন— রবীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত গল্প হল 'চারুলতা'। রীতিমতো আবিষ্কার। অতীব রোমহর্ষক! চুলোয় যাক 'নষ্টনীড়'। দেমাকে চারুলতার মাটিতে পা পড়ে না। বিশ্ব জুড়ে তার অধিষ্ঠান।

কে বলে বাঙালি ব্যবসা বোঝে না? রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বাঙালি এখন

সঞ্চয়িতা, চোখের বালি, নৌকাডুবি, ঘরে বাইরে, গোরা, শেষের কবিতা, গীতাঞ্জলি, গল্পগুচ্ছ। পাবলিক নিচ্ছে। ঘর সাজানোর নতুন উপকরণ। এসব নিয়ে তো বেশ কিছুদিন চলল। ছাপার ভুলের মা-বাপ নেই। পত্ন-স্বত্ব লোপ পেল। নায়ক-নায়িকার নাম পাণ্টে গেল। হেমনলিনী হয়ে গেল হেমা মালিনী। ছাড়ো তো গুরু। মাস্টারি রাখো। গুরুদেব পপুলার হচ্ছেন। বুর্জোয়া কবি প্রলোভিত হয়ে বনছেন। ইতিহাস পাণ্টে যাচ্ছে। এনজয় ইট, এনজয় ইট।

উত্তেজনার প্রথম প্রহরগুলো তো এভাবেই কেটে গেল। এবার এল নতুন সওদা। রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গল্প, রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গান, বাছাই রবীন্দ্রসঙ্গীত, রবীন্দ্রনাথের কিশোর রচনা সংকলন, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস সমগ্র, নাট্য সমগ্র। স্ত্রীকে লেখা চিঠিগুলো ছেপে দিয়ে হল 'ভাই ছোট বউ'। এল রবীন্দ্র রচনাবলী। ছাপানো আর বিক্রির ধামাকা। এত খণ্ড,

অতঃপাশ্চ। কে কত সন্তায় দেয় তার দুর্ধর্ষ প্রতিযোগিতা।

যত দিন যাবে ততই নতুন নতুন বেশে দেখা দেবেন রবীন্দ্রনাথ। ভবীর দল উপহার দেবে 'নতুন বউঠান', কবিতা গান আর গল্পের বিচিত্র সমাহার। হয়ত হাতে পাবেন রবীন্দ্রনাথের 'পল্লী বাংলার গল্প' কিংবা রবীন্দ্রনাথের 'দলিত সাহিত্য'। কিংবা 'প্রেমের কবিতা', 'অতিপ্রাকৃত গল্প'।

ভবীর দল ক্যাসেটের পশরা সাজাবে। জীবনমুখী গানের সুরে রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনা যাবে। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত আলাদা আলাদা গানের ক্যাসেটে বন্দী হবে। পাবেন রবীন্দ্রনাথের বাউল পর্যায়ের

আর একদল ভবীকে খুঁজে পাবেন
বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে। ওঁরা রবীন্দ্র-
সাহিত্য নিয়ে পি এইচ-ডি করছেন।

গান, ভক্তিশ্রীতি, প্রার্থনাসঙ্গীতি, নাটকের গান ইত্যাদি ইত্যাদি। এখানেই শেষ নয় মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকুন, রবীন্দ্রসঙ্গীতে রাজা কিংবা পথ অথবা ফুল কিংবা আকাশ অথবা সমীরণ নিয়েও ক্যাসেট পাবেন।

এ তো গেল একদিক। আর একদল ভবীকে খুঁজে পাবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে। ওঁরা রবীন্দ্র-সাহিত্য নিয়ে পি এইচ-ডি করছেন। বিষয় নির্বাচন? কোনো সমস্যা নেই। হাতের কাছেই আছে রবীন্দ্র রচনাবলী। কিন্তু ব্যবহৃত হতে হতে বড় বড় বিষয়গুলো আগেই অন্যদের দখলে চলে গেছে। এখন খোঁজ করো নতুন বিষয়ে। কেমন সেগুলো? কয়েকটি নমুনা :

রবীন্দ্র-কবিতার প্রথম পংক্তি

রবীন্দ্র-কবিতার শেষ পংক্তি

রবীন্দ্র-কবিতার ত্ত্বকসজ্জা

রবীন্দ্র-গল্পের পরিচ্ছেদ বিভাগ

রবীন্দ্র-গল্পের নাট্য-লক্ষণ

রবীন্দ্র-উপন্যাসের পরিচ্ছেদ বিভাগ

রবীন্দ্র-উপন্যাসের নাট্য লক্ষণ

রবীন্দ্র-নাটকে অঙ্ক ও দৃশ্য বিভাগ

রবীন্দ্র-সাহিত্যে অন্তঃপুরচারিণী

রবীন্দ্র-সাহিত্যে পরিধান-প্রসাধন

রবীন্দ্র-সাহিত্যে মন কেমনের পালা

রবীন্দ্র-সাহিত্যের দরজা-জানালা

রবীন্দ্র-কবিতায় বিশেষ্য-বিশেষণের প্রয়োগ

রবীন্দ্র-গল্পে বিশেষ্য-বিশেষণের প্রয়োগ

রবীন্দ্র-উপন্যাসে বিশেষ্য-বিশেষণের প্রয়োগ

রবীন্দ্র-সাহিত্যে কর্তৃবাচ্য কর্মবাচ্য ভাববাচ্যের ব্যবহার

রবীন্দ্র-সাহিত্যে হসন্ত চিহ্নের প্রয়োগ

রবীন্দ্র-সাহিত্যে চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার

ইত্যাদি ইত্যাদি।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে ভুবনে বিষয়ের অভাব? কভি নেহি। ভবীর দলের মস্ত ভরসা সেখানেই। এসব নিয়ে গবেষণা করতে করতে একশ শতক তো দিবি কেটে যাবে। গুরুদেবের দিব্যদৃষ্টি ছিল, স্বীকার করতেই হবে। শিলাইদহ-পাতিসর-সাজাদপুরের জমিদারি অনেকদিন আগেই হাতছাড়া হয়ে গেছে। কিন্তু অন্য যে জমিদারিটি রচনাবলীর পাতায় পাতায় রেখে গেছেন, তা তো অজর অমর। কতজনের করে খাবার ব্যবস্থা যে করে দিয়েছেন। শ'য়ে শ'য়ে পি এইচডি হবে, গবেষকদের স্ট্যাটাস বাড়বে, ইনক্রিমেন্ট পাবেন। সত্যি, ডাবলে দেহ-মন রোমান্সিত হয়ে ওঠে। চিন্তা নেই, ভবীরাই রবিকে সুদীর্ঘকাল বাঁচিয়ে রাখবেন।

—ফজল আলি

ফ্র্যাঙ্কফোর্ট

Festival of টক্ সাহিত্য

কেউ কেউ পুরস্কার পাওয়ার লোভে পাগল হন। কেউ কেউ পুরস্কার পেয়েও প্রত্যাখ্যান করেন। আবার অনেকে পুরস্কার পেয়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করেন। ক্যানেক্সা পিটিয়ে বলেন,—আমি এক মস্ত হোঁ—নু—

সম্প্রতি ২০ মার্চ বাংলা আকাদেমি-রবীন্দ্রসদন প্রাঙ্গণে, এরই নজির রাখলেন রবিশংকর বস। তিনি এদিন 'সুতপা রায়চৌধুরী' স্মারক পুরস্কার পান। কথা প্রসঙ্গে 'অন্নদাশঙ্কর রায় মুক্ত মঞ্চ' সাহিত্যিক মতি

নন্দী 'তুমি কি এর আগে অন্য কোনো পুরস্কার পেয়েছ'র উত্তরে রবিশংকর লজ্জাবনত হলেন এবং জনসমক্ষে (২০০-৩০০জন) ঘাড় কাত করে 'না' শব্দের সমর্থন করেন। কিন্তু তিনি যে একজন বৃহত্তর মিথ্যুক, তার প্রমাণ পাওয়া গেল ৩০শে মার্চ 'গণশক্তি'র রবিবারের পাতায়। এখানে উল্লেখিত অন্তত পাঁচ-পাঁচটি পুরস্কার তাঁর গাঁটে গচ্ছিত।

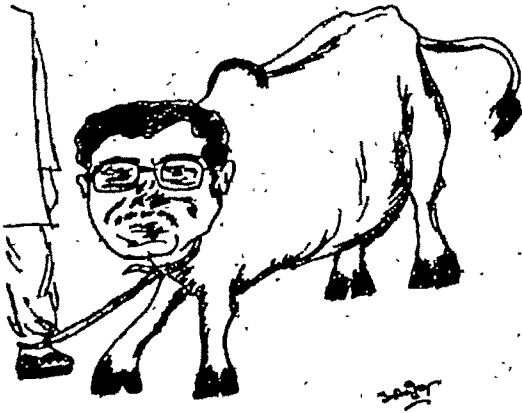
নিজের ঢোল নিজে পেটাতে এত লজ্জা! কেন?

কথা প্রসঙ্গে 'কথাসাহিত্য উৎসব' নিয়ে আরো একটু টক্ খবর। উৎসবে বহুমানুষের সমাগম হয় বলে ছোটবেলা রচনায় পড়েছি এবং বাস্তব অভিজ্ঞতায় জেনেছি। কিন্তু এটা কেমনজরো উৎসব? লোক নেই অথচ টক্ আছে। মানে কথা। মানে গল্প। মানে গল্প পাঠ। হে উদ্যোক্তাগণ, এবার থেকে, যে ভাবে জোর করে ভোটের সময় ভোটের (আট দশ বছরের ছেলে-মেয়েদের) বানানো হয়—আপনারাও কিছু শ্রোতা.....না হলে কি উৎসব হয়? আনন্দ???

—টুপুর রানী

আপনি ছদ্মবেশী পরম পুরুষ রামকৃষ্ণ, যিনি প্রাণ্ডুক্ত বিভিন্ন ভাষার শব্দচতুষ্টয়ের তুলনা
দিয়া সর্বধর্ম সমন্বয়ের বা 'যত মত তত পথে'র দিশারী। এমনকি আপনাকে
আত্মগোপনকারী প্রত্যাগত রবিঠাকুর বলিয়া সংশয় হইতেছে,

পত্রপাঠ লা-জবাব



খুঁটির খোঁটায় বদ্ধ গ () রু

বালির জীবন দেবতা রবীন্দ্রনাথের (অ)জয়গুরু চক্রান্তবর্তী
হওয়া নিয়ে চারদিকের হৈচৈ থেকে 'পত্রপাঠ'ও শেষ অবধি গা
বাঁটিয়ে থাকতে পারল না। কেন, খামোকা এসব নিয়ে কাগজ-
কালি খরচা করেন? জ্ঞানেনই যখন, এ সবে 'পণ্ডিত' মশায়ের "কিস্যু যায়
আসে না"!

অর্থাৎ, যাওয়ার তো নতুন করে কিছুই নেই। আর যেটা 'আসার' সেটারই
আশায়, মানে আপনাদের এই হৈচৈ, আর তার ফলস্বরূপ ক্যাসেট কোম্পানির
ক্যাশবাক্স ঝলঝলানির অস্তিত্ব গন্ধ পেয়েই তো তিনি এবার এ লাইনে (আইন
বিশুদ্ধির পরেই অবশ্য) পা রেখেছিলেন। মশায়ের গত ক বছরের রাগপ্রধান
ওরকে রাগাশ্রয়ী ওরকে রাগান্বিত চাল এবং সে চালাকিতে শেষ পর্যন্ত
Lucky- ই প্রতিপদ হয়েছেন জয়গুরুবাবু। নিশ্চিত থাকার জন্য শুধু ধীতিকার
রবীন্দ্রনাথ বা নিজের বহুল বিজ্ঞাপিত নামটাই যথেষ্ট নয়, ক্যাসেট 'ইনলেটে
নিজের অধিষ্ঠায় 'পাটোয়ারী বিনয়' দেখিয়ে জ্ঞানবাবুর ছবি (বড়ে গোলাম
আলি বা মুনব্বর আলিরই বা নয় কেন?) এবং খুঁটির জোর জাহির করতে
বুদ্ধবাবুর নামটোও ছাপিয়ে দিতে কসুর করেননি। তারপরেও আপনাদের এই
চ্যাচামেচি। এতে তো জয়গুরুমশায়ের ওই 'খনি'-র ব্যাপারটা যাদের অজানা
ছিল তারাও হজুপের মণি (যেমন আমেরিকান ডায়মন্ড)-র অমোঘ আকর্ষণে

ওই সাদা ইনলের আলোয় ঢাকা অন্ধকারে বাঁপ দেবে। তার চেয়ে উপেক্ষাই
হল অব্যর্থ দাওয়াই। এরপর কুমার শানুর ইয়াদ গিয়াকে আরে, বাজুবন্ধ খুল
খুল যায়-এর অ্যালবাম বের করুন, বাংলা ব্যাত বিলম্বিত কুমারায় মারু
বেহাগের খেয়াল শোনাক, আমাদের কিস্যু যায় আসে না। খুব কষ্ট হলে
বরং তাক থেকে বার করব ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত 'নানা রঙের গান' নামের
একটা ক্যাসেট। মধ্য হয়ে গুনব অজয় 'চক্রবর্তী' নামের এক
বাহুল্য-হীন মোসাহেবহীন শিল্পীর গলায় কিরবানীতে বাঁধা একটা অসাধারণ
বাংলা গান—

সব কাজে আপনার

ভাবি, আছে অধিকার। নিজেরেই মান দিতে চাই।

...কেন যে লুকাতে চাই মোর যত মলিনতা

আর যত বিকলতা,

তোমার অজানা কিছু নাই।

—উদয় বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘরের ঢেঁকিই কুমির

শ্রদ্ধের মহাশয়,

আপনার খুঁড়ে খুঁড়ে দণ্ডবৎ। আপনি সত্যিই এবং সত্যত শ্রদ্ধের। এবং
এই অনাবিল শ্রদ্ধাবশত আপনার আদ্যশ্রদ্ধ করা পবিত্র কর্তব্য বলিয়া
পীড়া অনুভব করিতেছি, যাহার মধ্যে দ্রীড়ার কোনো বালাই নাই। আপনট
২০০১ সংখ্যায় আপনার পত্রপাঠে মল্লিখিত 'আক্ষেপ' শিরোনামে একটি
পত্র পত্রপাঠ লা-জবাব বিভাগে মুদ্রিত হয়। এই অপকর্ম করার মতো
অদূরদর্শিতার জন্য আপনাকে আক্ষেপ করিতে হইবে। কারণ আপনি
অনবধান বশত যেক্ষণ কৃত্রিম নহর (খাল) কর্তন করিয়া নক্স (কুমির)
আহ্বান করিয়াছেন, যে নক্স নারদের বাহন, যাহার গঠন উপাদান আত্মাতক
কাঠ (আমড়া কাঠ), যিনি গৃহে নক্সের কুমিকা পালন করিয়া থাকেন
(ঘরের ঢেঁকি কুমির)। আহ্বান যখন করিয়াছেন তখন বাঙালিকল্পতরু
করণসিদ্ধ এই নক্স সেই আবাহনে কি স্থান থাকিতে পারে? আমি তো

কবিগুরু মতো বধির নহি যে ঘোষণা করিব— তুমি ডাক দিয়েছ কোন সকালে তখনে আমি পাইনি।

বলিহারি আপনার উদ্ভাবনী শক্তি। পত্রপাঠে এপ্রিল ২০০৩ সংখ্যার কিছু না ঘণবার জন্য আহান জানানো হইয়াছে অর্থাৎ ঘোষণা করা হইয়াছে, “পত্রপাঠ আগামী কয়েকটি সংখ্যার বিষয়বস্তু নিম্নরূপ ঠিক করেছে” (যাহা আমার এবং মাদৃশ বর্ণচোরাদের শোণিতের উচ্চাপ বর্ধনে একাত্তাই সহায়ক হইবে বলিয়া প্রতীয়মান হয়)।

- ১। নারদ নারদ
- ২। দুকান কাটা
- ৩। ঘোমটার আনাতে খ্যামটা নাচন
- ৪। নেই কাজ তো খই ভাজ
- ৫। স্তাবক বনাম চাম্চা
- ৬। ছাই ফেলতে ডাঙা কুলো

মুদ্রাকর প্রমাদে সম্ভবত তিন নম্বর বিষয়বস্তুর দ্বিতীয় শব্দটি ‘আড়ালে’র পরিবর্তে ‘আনাতে’ হইয়াছে অথবা পূর্বকল্পিত তাহা নির্ণয় করিতে অপারগ বিষয় প্রমাদ গুণিতেছি। কারণ সার গ্রন্থের ক্ষমতা তো সকলের সমান নহে।

কেহ বলেন জল, কেহ বলেন পানি, কেহ বলেন ওয়াটার। সম্ভ্রান্তি গ্রীষ্মের বেরূপ প্রদাহ চলিতেছে তাহার সহিত ‘লু’ যুক্ত হইলে তৃষ্ণা নিবারক এই পানীয় অর্থাৎ ওয়াটার হইয়া যাইবে নেপোলিয়নের বিতীষিকা বা নেপোলি দধি ভক্ষণের ইতি। আরো আছে—সংস্কৃতের ‘অপ্’ গীতার বাণী, ‘কর্ম’যোগে যাহা দাঁড়াইবে তাহা আমার পেটেন্ট নেওয়া আছে, ঐ দিকে হস্ত প্রসারণ করিও না। মোট কথা, জল, পানি, অপ্ বা ওয়াটারের মুখ্য উদ্দেশ্য হইতেছে তৃষ্ণা নিবারণ এবং বলিতে আমি বাধ্য যে, ‘বন্ধে আমার তৃষ্ণা’। রক্ষা করিলেন পতিত-পাবন সম্পাদক মহাশয়। আপনি হৃষ্যকেশী পরম পুরুষ রামকৃষ্ণ, যিনি প্রাণ্ডন্ত বিভিন্ন ভাষার শব্দচতুষ্টয়ের তুলনা দিয়া সর্বধর্ম সমন্বয়ের বা ‘যত মত তত পথের’ দিশারী। এমনকি আপনাকে আশ্বত্থোপনকারী প্রত্যাগত রবিঠাকুর বলিয়া সংশয় হইতেছে, যিনি লিখিয়াছিলেন—অনেক কথা যাও যে বলে কোন কথা না বলি’।

আপনার কি এরূপ বোধ হইতেছে যে এ অবোধ আপনার স্তাবকতা করিতেছে? অথবা আমি বেশরম দুকান কাটা? অথবা অবগুর্জন উন্মোচন না করিয়া খ্যামটা নৃত্য করিতেছি? অথবা কর্মহীনের ন্যায় লাজ (খই) ভর্জন করিতেছি? অথবা নিম্নকের অস্থিহাহকারী তথা অসুমা-উদ্বেককর জনপ্রিয়তার মধ্যগমনে বিরাজমান পত্রপাঠের অগণিত পাঠকের সহিত আপনার কলহ বাধাইবার অচরিতার্থ বাসনায় নারদ-নারদ জপ করিতেছি? নাকি রজ-বাসের অধুনা উষর মরুতে একমেবা দ্বিতীয়ম মরুদ্যান ‘ছাই ফেলতে ডাঙা কুলো’ পত্রপাঠকে বিদ্বিষিত করিতেছি?

“অকসটে” স্বীকার করিতেছি যে আপনি এসমস্ত কথা বলেন নাই। কিন্তু অনুমাত্র চিন্তা করিলে ইহা অনুভব করা কি একাত্তাই অসাধ্য যে ঘোষিত বিষয়বস্তুগুলির হলাহল খল-সুড়িতে ঘর্ষণ করিলে বা সমন্বয় করিলে মানব-চরিত্রের অদালোকিত কোরকণ্ডাজ “সুদাস মালীর করে কাননের সরোবরে, একটি ফুটেছে কি করিয়া”র মতো প্রস্ফুটিত হয়?

আমি তো হস্তিমুখ, মা সরস্বতী আমার করুণা বশতই করুণা করেন নাই। নাসিকায় নস্যর মতো আমার বিদ্যালয়ে গুজিয়া দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু অত্যন্ত দ্রুত হাঁচির মতো ছিটকাইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছিলাম। অপিচ পশ্য, “কাননের সরোবরে একটি ফুটেছে কি করিয়া”র মতো আজও স্মরণ আছে দুইটি ইংরাজি প্রবচন—(১) To call a spade a spade (২) To play the Second fiddle. পত্রপাঠ তথা সম্পাদক প্রথমটির স্বপক্ষে এবং দ্বিতীয়টির বোরতর বিরোধী, যাহা স্পষ্টতর হয় সম্পাদকীয় কলমে। সম্পাদকের আয়ুধ প্রোবাস্তক লেখনী ব্যসের দোয়াতে ডোবানো। উদ্দেশ্য—মুখোশখারীদের ডোবানো, যাহা আদৌ ছেলের হাতের মোয়া নহে এবং এই দুঃসাধ্য সাধনায় কদাচ স্ক্রুত হই নাই—“ক্লাস্তি আমার কমা কর প্রভু”।

আপনি আমাদের অসহযোগিতার জন্য অগ্রিম ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন বলিয়া আমরা যৎপরোনাস্তি নন্দিত এবং তদ্বিধায় আপনার কিছু অপকীর্তির (পূর্বেই বলিয়াছি যে অপকর্ম আমার খাস তালুক) কথাও ফাঁস করিয়া দিতেছি। এবং আপনি হাঁসফাঁস করিলে আমরা স্বর্গসুখ অনুভব করিব। আপনার এবং পত্রপাঠের অপকীর্তির তালিকা অবশ্য নাতির মতোই দীর্ঘ, যাহার জন্য হতাশা আপনাকে গ্রাস করিবে, যাহা রবীন্দ্রনাথের ‘সেবতার গ্রাস’ অপেক্ষাও করুণ। যথা—(১) অসহিষ্ণুতা (২) মিছরির ছুরির মতো বাক্যবাণ। (৩) বাতুলতা (৪) উবেগ (৫) অবিমূঢ়াকারিতা।

ক্রমানুসারে হেতু তথা উপযুক্ত জবাবও দর্শানো হইল—

- ১) ন্যাকামি, ধান্নাবাজি ইত্যাদির মতো জনপ্রিয় বিষয়ের বিরুদ্ধে।
- ২) বর্ণচোরা কেউবিটুদের রেয়াৎ না করা।
- ৩) কিনা সুপারিশে ঘোষণা লেখকের রচনা প্রকাশ এবং অপোসহীন কাঠগোয়ারের মতো আচরণ।
- ৪) পত্রপাঠের নিরলস জীবিক চিন্তা।
- ৫) গজলিকা প্রবাহে গা মা ভাসানো।

উপরোক্ত পক্ষপাতবই আহৃত অসহযোগিতা আন্দোলনের পক্ষে যথেষ্ট। সম্ভ্রান্তি বিধানে এতদতিরিক্ত কিছু প্রয়োজন হইলে কেবলমাত্র আদেশের অপেক্ষা, কৌরব বাহিনী উন্মুখ হইয়া আছে।

ক্রোধ ও অসুমা জ্ঞাপনাতে উদগত পিশীলিকা
—হতস্ত্রী দেবপ্রসাদ কুমার

পু.—একটি অনুরোধ। আমার এই গর্জবাবকে বর্জ্য পদার্থ জ্ঞানে সম্পূর্ণ পেটিকায় নিষ্ক্ষেপ করিবেন এবং আমার সম্পূর্ণ আস্থা আছে যে আমার অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হইবে। প্রত্যাখ্যাত হওয়ার মামলায় আমার হাতবশ অবিসংবাদিত এবং সেইটাই আমার বিধিলিপি, যে ব্যাপারে মুক্তহস্ত আমার Better half আর আপনি তো মহাশয় No better than half a loaf. আমার স্পর্ধা যদি মাফ করেন তবে সন্দের আর কোনো অবকাশই থাকিবে না যে আপনি কলত্র সকালে মাদৃশ বীরগুণের মতো অকুতোভয় অস্ত্র নম। পরিশেষে আপনার হিতার্থে অব্যাহিত সতর্কবাণী এই যে—সাধু সাবধান। আমি লোকটি কিন্তু পালোয়ান, কারণ, খোদা মেহেরবান।

ভায়াপদ বায় ও গঙ্গারাম

৬৬

অন্যান্য বছর মেজাজি কালোয়াতি গরম পড়ে
২৫শে বৈশাখের পর, রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সুরধারায়
সিদ্ধিহত হয়েও সে গরম কমে না।

৭৭

গরম প্রত্যেক বছরই পড়ে। কিন্তু এ বছর বড় বেশি গরম পড়েছে।
আকাশে মেঘ জমছে, হাওয়া খেমে যাচ্ছে। দিনরাত গুমোট হয়ে থাকছে।
কিন্তু বৃষ্টি কোথায়? ঝোড়ো হাওয়া কোথায়, যা আমাকে শীতল করবে? দু-
একটা এলোবেলে কালবৈশাখী হয়ে গেছে। কিন্তু তাতে কোনো সুরাহা হয়নি।
অন্যান্য বছর মেজাজি কালোয়াতি গরম পড়ে ২৫শে বৈশাখের পর, রবীন্দ্র-
সঙ্গীতের সুরধারায় সিদ্ধিহত হয়েও সে গরম কমে না। বরং উত্তরোত্তর বেড়ে
যায়। এবার ব্যাপার আরো খারাপ। এবার প্রখর গ্রীষ্ম শুরু হয়ে গেছে। পয়লা
বৈশাখ, নববর্ষেই কিংবা সঠিকভাবে বলতে গেলে চৈত্র মাসের শেষ থেকেই।
বছর শেষ হওয়ার দু'দিন আগে নীলষটী। মিনতি দেবী সেলেন খালি পায়ে
শিবমন্দিরে। শিবের জন্যে পঞ্চকল নিয়ে আর মাধায় জল দিতে। পিচের
রাঙায় খালি, পায়ে তার ওপরে চৈত্রের রোসের হলুদ। মিনতিসেবী ফিরলেন
লাকাতে লাকাতে। মহাদেবের মাধায় একঘড়া জল দিয়ে এসেছিলেন। এবার
বাসায় এসে নিজের মাধায় একশ ঘড়া জল ঢাললেন।

সেই পরাগবাবুকে গঙ্গারাম দেখে
এসেছে। ধুতি মালকোঁচা দিয়ে ই এম
বাইপাসে দৌড়োচ্ছেন। গঙ্গারাম
এইমাত্র দেখেছে।

এইরকম করে কোনোভাবে দিন কাটছে। জানলা-দরজা বন্ধ করে মেঝের
ওয়ে থাকি। সকালে জলখাবার খেয়ে স্নান করে অন্ধকার জীবন শুরু হয়।
মধ্যে দু'একবার হামাগুড়ি দিয়ে কিছু খেয়ে আসি। পানে-তোজনে, আসনে-



বাসনে কিছুতে রুচি নেই। গঙ্গারামের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। হঠাৎ হৈ হৈ
করতে করতে কাল সকালে এসে উপস্থিত হল। কোনো কিছু জিজ্ঞাসা না
করে দু' করে দরজা ধাক্কা দিয়ে খুলে অন্ধকার মেঝেতে আমাকে ভিজে
গামছা পরে ওয়ে থাকতে দেখে বলল—আগনি এই গরমে বিলাসিতা
করছেন?

আমি তাকে কথা শেব না করতে দিয়ে বললাম—ভাই একটা হাক
গামছা পরে মেঝেতে ওয়ে আছি। আলোটা পর্যন্ত জ্বালিনি। এর মধ্যে কি
বিলাসিতা হল?

গঙ্গারাম প্রায় ধমকের সুরে বলল, বিলাসিতার কথা ছাড়ুন, এদিকে
আপনার বন্ধু পরাগবাবু যে এই গরমে মারা পড়তে বসেছেন।

পরাগবাবু আমাদের হারানো বন্ধু। বাতিকপ্রবণ ছিটগরু লোক। এখন
আমাদের পাড়াতেই থাকেন। আজ তাঁর ধারণা হয়েছে, তিনি পাগল হয়ে
যাচ্ছেন। ডাক্তার তাঁকে বলেছে, সবসময় কোনো না কোনো কাজে ব্যস্ত
থাকুন। তাহলে পাগল হবেন না।

সেই পরাগবাবুকে গঙ্গারাম দেখে এসেছে। ধুতি মালকোঁচা দিয়ে ই এম
বাইপাসে দৌড়োচ্ছেন। গঙ্গারাম এইমাত্র দেখেছে।

তার আগ্রহাভিষেধের ছাতা মাধায় দিয়ে বাইপাসের দিকে ছুটলাম।
ভাগ্য ভালো, ফিরতি দৌড়ে বাইপাসের মুখেই এসে গিয়েছেন। জিভ বেরিয়ে
গেছে, ধুতি-পাঞ্জাবি ঘামে জবজব করছে। আমি আর গঙ্গারাম এগিয়ে গিয়ে
পরাগবাবুকে ধামাতে গেলাম। কিন্তু পরাগবাবু বললেন, বাধা দেবেন না।
আমাকে ধামিয়ে দেবেন না। আমাকে ব্যস্ত থাকতে দিন। এই বলে সেই
প্রখর রোদুয়ে আরো জোরে ছুটতে লাগলেন।



হারানো প্রাপ্তি

দিব্যালোচন কলমধারী

বমেনের আসার কথা, বেণুমামা এসে হাজির। রমেন প্রথম আসছে এ বাড়িতে। বেণুমামা অগুস্তিবার। বাবার অ্যালার্জি বেণুমামা। বোনের প্রেম বমেন। বাড়িতে জলের কানেকশনের মতো সুপাত্রের কানেকশন। ভাইটালের ভাইটাল। বোনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হবার দিন। নতুন বিছানার চাদর, কাচা পর্দা, পাট করা গামছা, খাবিমালা কই, এটেল দই—সব বেডি। আজকেব দিনে বাড়িতে মুখ্যমন্ত্রী আসতে চাইলেও ‘না’ করে দিতাম। এর মধ্যে বলা-কওয়া নেই, বেণুমামা এসে হাজির। হাজির না বলে অনুপ্রবেশই বলা যায়। বাবা স্নান সেরে কাচা ধুতি পরে সবে দুটো মুড়ি চিবোচ্ছিল; ধড়মড় করে উঠে গিয়ে মাকে বলল,—বেণুটাকে নিয়ে বাড়ির পেছনের ঝোপে ভাত ফুটিয়ে খাও গো। রমেন গেলে তারপর আসবে। আরশোলার বাচ্চাটা আসার আর দিন পেল না।

মায়ের জাতপ্রেমে পোকা পড়ল—রমেনের রামাটা বুঝে কোবো। আমরা ঝোপে চললাম।

আমি মাকে বোঝালাম, বাবাকে বকলাম। কিন্তু চমক দিল বেণুমামা—

—এই নিন মুখজ্যোবাবু, খেয়ে দেখুন। এ মাল জীবনে খাননি।

একটা বড় হাঁড়ি বাবার সামনে নামিয়ে রাখল বেণুমামা।

—আমি যখনই আসি খালি হাতে আর খালি পেটে আসি। এবার একহাঁড়ি রসগোল্লা। কলকাতার কে সি দাস। নাম শুনেছেন নিশ্চয়, দাম শুনে ঝাওয়া হয়নি কখনো। নিন, এবার খেয়ে দেখুন, বাকি জীবনটা বেণুর বেণী হয়ে পেছন-পেছন আসতে হবে। এমন টেস্টদার!

বাবা মিস্ত্রিপ্রেমী ডায়াবিটিক। চিরশত্রু বেণুমামার এই অপ্রত্যাশিত উপহারে খুশি হয়ে বেণুমামাকে বসতে বলল। জীবনে বা বিবাহোত্তর জীবনে এই প্রথম বার।

এদিকে রমেনের আসার সময় হয়ে গেছে। শিখালদায় ও আমার হোস্টেলমেট ছিল। ও দোতলায়, আমি তিনতলায়। বোন কিছুদিন আমার ওখানে গিয়েছিল। তখনই রমেনের সঙ্গে সিঁড়িতে পরিচয়। তারপরেই পিড়িতে বসার প্রোগ্রাম। আমি যখন জানলাম ততক্ষণে শিখালদার লোক জেনে গেছে। আমি মাকে জানাতেই মা বাবাকে জানায়। বাবা গুরুদেবকে। গুরুদেব মা-কালীকে মা-কালী আবার গুরুদেবকে। গুরুদেব বাবাকে। বাবা মাকে। চলবে। সুপাত্র।

বাড়িতে নেমস্তম্ভ করো। আমি মায়ের দূত হয়ে রমেনের কাছে গেলাম। তাই রমেন কলকাতা থেকে আজ আমাদের বাড়িতে আসছে। বোনকে দেখে মনে হচ্ছে রহস্য উপন্যাস। অপরাধী শিবঠাকুর সেজে থানার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওসিকে পাশায় হারিয়েছে পিসি।

বেলা গড়িয়ে দুপুর হল। বাবা কে সি দাস হাফ করে ফেলল। রমেন অবশ্যই আসবে বলেছিল। বোন আর ধৈর্য রাখতে না পেরে বেণুমামাকে আক্রমণ করে বসল—

—যত অপয়া তুমি। সারাজীবন খালি হাতে এসে পোট ভর্তি করে চলে গেছ। একবারও দিদি-জামাইবাবু ভাগনা-ভাগনির কথা ভেবেছ? তাব ওপর তোমার বৃশ্চিক রাশি। অন্যকে না কামড়ে থাকতে পারো না।

মা বোনের ওপর রাগ করল। বাবা ধৃতরাষ্ট্র হয়ে গেল। আমি মামাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে চলে যেতে বললাম। ততক্ষণে মামার ভাত ঝাওয়া হয়ে গেছিল। যাবার সময় মামা বাবাকে বলে গেল—

—সামনেব সপ্তায় আর এক হাঁড়ি নিয়ে আসব। সপ্তাখানেক থাকব।

মামা যাবার আধঘণ্টার মধ্যে রমেন এসে গেল। সবাই মিলে দেরির কারণ জিজ্ঞেস করতে গেলাম। কিন্তু একি! বমেনের জামাকাপড় বিধ্বস্ত। মানুষ মারামারি কবে এলে যেমন হয়। তবে কি রমেন বিনা টিকিটে! রেলপুলিশে ধরে...

রমেন আমাদের মুখ দেখে বলল, আগে জল খাব!

সরবৎ এল। এক চুমুকে শেষ করে রমেন খোলসা করল—

—ঠিক সময়ই ট্রেন থেকে নেমেছি। সারা রাত্তা একটা শয়তানের সঙ্গে বকতে বকতে এসেছি। সেও এই স্টেশনে নামে। আপনাদের একটা ফোন করে দেব ভেবে তাকে বললাম এটা একটু ধরুন, একটা ফোন করে আসছি। শয়তানটা আমার জিনিসটা নিয়ে হাওয়া। আমাবও জেদ চেপে গেল। নিশ্চয় ফিরবে। তখন ব্যাটাকে ধরে—কিন্তু...

বাবা হাঁ হাঁ করে উঠল—

—ছি, ছি, মানুষকে এতটুকু বিশ্বাস করা যাবে না! মায়াবতীর মামায় আচ্ছন্ন দেশ। কী জিনিস খোয়া গেল বাবা তোমার? আমাদের এখানে আসতে গিয়ে তোমার ক্ষতি হল, এ আমাদের বড় লজ্জার ব্যাপার বাবা।

—না না, লজ্জিত হবার মতো কিছু নয়। সামান্য এক হাঁড়ি কে সি দাসের রসগোল্লা।

দুর্গা অসুর মারেন, রাম রাবণকে মারে। মুখে রাজা-উজির মারে। মুখেন মারিতং জগৎ। মানুষ একে-তাকে মারে। যুদ্ধে মারে, দাঙ্গা হাঙ্গামায়, সাম্প্রদায়িকতার মারণে। ভাগ্য মানুষকে মারে।

আলোক রসু



গ্যাসায়ণ

আমার খুল্লতাের অনেক গল্প আছে। তাঁর নিয়মনিষ্ঠা আমাদের বেশ হাসির বিষয় ছিল। তা আবার অনেক সময় বিড়ম্বনা বলেও মনে হত। ছোটবেলায় সেজন্য অনেক সময় নিজেকে অপমানিত মনে হত। আমাদের আবার তখন মান-অপমান জ্ঞান ভারী টনটনে ছিল। সংবেদনশীল মন কিনা! আজকাল 'ডেভেলপমেন্ট' নিয়ে নানান কথা শুনে পাই। চারিদিকে নাকি বহু ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে। কিন্তু এই 'ডেভেলপমেন্ট ফি'—কথাটা আমাকে কি যে অপমানের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল।

সত্যিই কাকুর কি দরকার ছিল সেদিন আমাকে ঠেলে পাঠাবার। কি লজ্জায় না পড়েছিলাম সেদিন।

স্কুলে সবাইকে মাইনে দিয়ে পড়তে হত। কিন্তু তথাকথিত ভালো ছেলে হওয়ার সুবাদে এই অধমের মাস-মাইনেতে একটু কনসেশন ছিল। সবাই দিত

সাড়ে তিনটাকা, আর আমাকে দিতে হত মাত্রই আটআনা, যা কিনা স্কুল ডেভেলপমেন্ট ফি। ভালো ছাত্রের জন্যে তো স্কুলের ডেভেলপমেন্ট আটকানো যায় না। তাই ওটা দিতেই হত। গ্রীষ্মের এবং পূজোর ছুটিতে একটা দিন স্কুল কয়েক ঘণ্টার জন্যে সকালের দিকে খোলা রাখা হত। সেই দিনে অনেকে মাইনে-টাইনে জমা দিত। তা আমরা চিরকালই নীতিগতভাবে জেনে এসেছি যে মাসের মাইনে মাসে ঠিক টাইমে না দিলেও চলে যায়। কিন্তু আমাদের খুল্লতাের তো সেসব জ্ঞান ঠিক হয়ে ওঠেনি। তাই উনি অজ্ঞজনের মতো খেয়াল রাখতেন—আমরা যেন ঠিক সময়ে স্কুলের মাইনে দিই, ঠিকমতো পড়াশুনা করি। যন্ত্রাসব। বাবাকে আরার বলা হত—দাদামণি, তুমি বড়ই ইন্সপেক্টর সবার ব্যাপারে।

বাবা হেসে সে মোক্ষম অভিযোগ শুননের কোনো চেষ্টাই করতেন না। তা একবার হয়েছিল কি, গ্রীষ্মের ছুটির মধ্যে একটা মাইনের দিন ঠিক হল। আর আমাকেও ঐ মহামূল্যবান 'আধুলি' সমর্পণ করতে স্কুলে যেতে হল। কাকুর ঠালায়। সামান্য বিদ্রোহের চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু আপত্তি খোপে টিকল না। তা স্কুলে গিয়ে দেখি কেউ কোথাও নেই, অফিসঘরে শুধু দু'জন ক্লার্ক বসে আছে।

দুরু দুরু বক্ষে কক্ষে ঢুকলাম আমি, আধুলির মালিক। তখন সেই বয়সে অফিসঘরে ঢুকতে সত্যিই বুক দুরু দুরু করত। একজন করণিকের হাতে অতি সত্ত্বপণে ভয়ে ভয়ে আধুলিটা সমর্পণ করার পর তিনি যুগপৎ আমাকে আর আমার হস্তচ্যুত আধুলিকে সযত্নে নিরীক্ষণ করে অতি তাজ্জিলের সঙ্গে অন্য করণিকের উদ্দেশে বললেন,—সেই সকাল থেকে ঠায় বসে আছি। এতক্ষণে এই আধুলি জমা পড়ল।

সে সময়ে দুই কর্তব্যপারায়ণ করণিকের মুচকি হাসি দেখে কী যে অপমানিত লেগেছিল নিজেদের। সবই তো ঐ কাকুর জন্য। কী দবকার ছিল সামান্য আধুলি জমা দিতে আসতে বার বার করে বলা? স্কুল খুললেই তো দিলে হত। অপমানে লজ্জায় সীতার মতো মনে হয়েছিল—ধরণী দ্বিধা হও।

তা ঐ খুল্লতাের সামান্য হলও একতা কাপুরের ব্যামো ছিল। একতা কাপুর যেমন চারিদিক 'ক'-এ শোভিত করে চলেছে তাতে সুভাষিনী নিমেষে কুভাষিনী আর সুচরিত কুচরিতে পরিণত হচ্ছে। আর বালাজী প্রোডাকশনের

হাজার হাজার বাজার

টিভি সিরিয়ালের দৌলতে কোনো সু জিনিস আর সু রইল না—সব কু-এ পরিণত হল। কোনো একটা কাগজে ভারী মজা করে একতা কাপুরকে কেকুতা কাপুর, জীতেজকে কীতেজ, তুয়ার কাপুরকে কুয়ার কাপুর আর জীতেজ-গুহিণী শোভাকে কোভা বলা হয়েছিল। তা গল্পের আগে একতা কাপুরের সাম্প্রতিক বাঙালি-প্রীতির গল্প শোনা যাক। সে নাকি কলকাতা ঘুরে ভীষণ ধুম মচিয়ে ভারী ভারী সব আর্টিস্ট খুঁজে বেড়িয়েছে। কলকাতার মডেল সোনাল রাওয়াত—গৃহবধুর সঙ্গে ইমারুডো এক সিঁদুরটিপের বিজ্ঞাপনে বেশ চোখ টানছিল কলকাতাবাসীর। কেকুতা কাপুর তো কোনাল (সোনালের ক-করণ) রাওয়াতবে নির্বাচিত করে বেশ একটা হৈ হৈ ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু আমাদের সোনাল—সে তো যাবে বিশ্বজয়ে, সামান্য ছিচকাদুনে শাওড়ি-বৌ-নন্দ মার্কা সোপ

আমাদের মা-জননীকে একবার আমাদের কাকুর বয়স জিজ্ঞেস করায় তাঁর সূচিন্তিত উত্তর ছিল,—তোমাদের কাকু বয়সে বড় আর আমি মান্যে বড়—

অপেরার সাবান মাখলে তার চলে? সে তো ভবিষ্যতে কত পারফিউম মাখবে। অবশ্য ইদানীং আমরা জেনে গেছি যে সোনালের সে আশা পূরণ হয়নি। যাক গে। জীবনে আরো অনেক কিছু করার আছে। আরে, হিন্দি সিনেমার রণক্ষেত্র তো আছেই। একতা কাপুরের এ নতুন কেলি-সিরিয়ালের নাম হয়েছে—কাহানী তেরী মেরী। তা এই তেরী-মেরী-তে কোন জ্যোতিষীর পরামর্শে সে অনেকগুলো ‘আর’ অক্ষর এমন বসিয়েছে যে উচ্চারণ করতে গিয়ে দাঁত কিড়মিড় করতে শুরু করেছে আমাদের। বাঙালি পরিবার এই তেড়েমেড়ে হিন্দি সিরিয়ালের রণভূমে বেশ জমিয়ে নেমে পড়ল। এইসব এদিক-ওদিক অক্ষর পরিবর্তন করে অনেকে অনেক কিছু পেতে চায় জীবনে। আমাদের কাকুর সঙ্গে জনৈক মহাপুরুষের নামের তব্ধ মিল থাকায় তিনি মধ্যে ‘চন্দ্র’ বাদ দিয়ে ‘কুমার’ লিখতেন। তাতে কোনো দোষের কিছু না। তিনি আজীবন চিরকুমারই ছিলেন।

তাঁর খবরের কাগজের ওপর তাঁর হস্তাক্ষরে লেখা থাকত—অমুক কুমার অমুক। ‘চন্দ্র’ বাদ দিয়ে, হয়ত তিনি নিজের মতো করে বিখ্যাত হতে চেয়েছিলেন। তবে তাঁকে এলাকার সবাই-ই চিনত এবং নানান ব্যাপার নিয়ে যৌক্তিক অযৌক্তিক ভাবে হাসাহাসি করত। এবং তিনি দ্য স্টেটসম্যান পড়তেন। প্রতিদিনই পড়তেন, আর সে খবরের কাগজ পড়ার ব্যাপারেও বেশ তরিবৎ ছিল। এই সৎব্যক্তির মনে মনে নিজেকে একটু আলাদা দেখার বাসনা ছিল। তাতেও দোষের কিছু নেই। তা আমাদের সবায়ের থাকে। হাম হ্যান্ হ্যাম—ইত্যাদি ইত্যাদি। তিনি অবশ্য কিছু কিছু ব্যাপারে হাস্যকর ভাবে বেশ আত্মপ্রচার সর্বস্ব ছিলেন।

আমাদের ঐ গ্রামে সেকালে তথাকথিত পড়াশুনা জানা লোক খুব বেশি ছিল না। আর যারা ছিল তাদের মধ্যে দ্য স্টেটসম্যান পড়ত মাত্র কয়েকজন। এখন যেমন এত ইংরেজি দৈনিকের ছড়াছড়ি, তখন ঐ দ্য স্টেটসম্যান শুনলে লোকে সসন্ত্রমে মাথা নাড়াত। ভারী উঁচু চোখে দেখত আর অপারগরা দূরে সরে থাকত। ইংরেজি না জানলে যে ইংরেজি খবরের কাগজ পড়া যাবে না তা সবাই জানত, বুঝত।

কাকু আমাদের নিয়ম করে খবরের কাগজ পড়তেন। পাড়ার অন্য একজন

গণ্যমান্য ব্যক্তিরও স্টেটসম্যান পড়ার অভ্যাস ছিল। তাঁর সামাজিক অবস্থানের জন্যই বা তাঁর সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তার জন্য, তাঁকে নস্যাৎ করা ঠিক সম্ভব ছিল না। তাই কাকু যখন তাঁর স্টেটসম্যান পড়া নিয়ে গর্ব জাহির করতেন তখন ঐ ব্যক্তিকেও জড়িয়ে নিতেন—এ অঞ্চলে আমি আর নবীন ছাড়া পুরো খুটিয়ে স্টেটসম্যান পড়ার মতো কেউ নেই।

নবীন হল ঐ ভদ্রলোকের নাম, যিনি আমাদের আত্মীয় এবং স্টেটসম্যান পাঠক।

পরে দেখেছি, বুঝেছি, ইংরেজি জানা নিয়ে তাঁর এই গর্ব করে বলাটা একটা বাতিক ছিল। আমি দ্য স্টেটসম্যান পড়ি—এই বিজ্ঞাপনটা তিনি বেশ অনেক ভাবে প্রচার করতেন। অনেক সময়েই তা হাস্যকর ছিল। তাঁর অফিস-ব্যাগের সঙ্গে খবরের কাগজটা এমনভাবে বের করা থাকত, যেন সবায়ের চোখে নামটা পড়ে। স্টেটসম্যান কাগজের পাঠক হিসেবে তাঁর উচ্চতা তিনি সবসময় আন্দাজ করতে চাইতেন। কথায় কথায় বলতেন,—বুঝলে, আজ স্টেটসম্যান এই লিখেছে, এই খবর আজ বেশ অনেক ডিটেলসে লিখেছে—এসবের অর্থ ছিল—আসলে দ্যাখো, আমি মোটেই ওপর-ওপর কাগজ পড়ি না, কত খুটিয়ে পড়ি। তোমরা সব দ্যাখো। তিনি বলতেন,—আমি মাইনিউটলি পেপার পড়ি।

এই ‘মাইনিউটলি’ মিনিটে মিনিটেও হতে পারে, আবার খুটিয়ে খুটিয়েও হতে পারে। মেজান বুঝ করহ সন্ধান।

কলা বাহুল্য, তাঁর কাছ থেকেই ইংরেজি খবরের কাগজ নিয়মিত পড়ার প্রথম অনুপ্রেরণা পেয়েছিলাম।

তবে পরবর্তী কালে অনেক ঘটনায় প্রমাণ পেয়েছিলাম যে তিনি খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠা এবং খেলার পৃষ্ঠা ছাড়া তেমন কিছুই পড়তেন না। আমাদের মা-জননীরও তাঁর স্নেহভাজন দেবরের কথা থেকে স্টেটসম্যান প্রীতি জন্মেছিল। তিনি মাঝে মাঝে তাঁর দেবরের কাছ থেকে আজ “স্টেটসম্যান” কী লিখেছে, তা পরম আগ্রহে জানতে চাইতেন। তা আমাদের মা-জননীকে একবার আমাদের কাকুর বয়স জিজ্ঞেস করায় তাঁর সূচিন্তিত উত্তর ছিল,—তোমাদের কাকু বয়সে বড় আর আমি মান্যে বড়—

এসব গুরুত্ব নিয়ে আমাদের মধ্যে বেশ আলোচনা হত। মা শুনে আমাদের ভাইবোনগুলোকে ধমকাতেন—আঃ! কি হচ্ছে? বড়দের নিয়ে ইয়ার্কি করতে নেই।

অনেক কিছুই তো করতে নেই। মাকে আমরা এসব নিয়েও খুব পেছনে লাগতাম। মাকে আমরা ভাইবোনেরা আবার খুব “মান্য” করতাম। মা বেশি খেঁকিয়ে উঠলে আমরা বলতাম,—তুমি এরকম খ্যাঙ্ খ্যাঙ্ করছ আর লতা মঙ্গেশকর তোমার চেয়ে বয়সে বড় হয়েও কেমন সুন্দর গান করে দেখেছ?

মায়ের বাবা, মানে আমাদের দাদু, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী ছিলেন। রেগে গেলে আমরা মাকে বলতাম,—তোমার বাবা তো মার্কশীট জাল করে।

বাবা যখন মাকে দেখতে গেছিল, মাকে জিজ্ঞেস করেছিল—কোন কেলাস্ অবধি পড়া হয়েছে?

মায়ের জবাব ছিল—কেলাস্ ফাইভ।

বাবা বাড়িতে এসে তাঁর বাবাকে বলেছিলেন—এ আমার চলে যাবে। আমাদের ভাইবোনের একজন ক্লাশ সিলেঞ্জ ওঠার পর মাকে বলেছিল,—মা, আজ তোমাকে মেয়ে দিলাম—

সত্যিই তো। মার দিয়া কেল্লা। কিভাবে যে কে কাকে মেয়ে দেয়। মানুষ কত ভাবে মারে। মশা মারে, মাছি মারে, বাঘ-সিংহ-হরিণ মারে। দুর্গা অসুর মারেন, রাম রাবণকে মারে। মুখে রাজা-উজির মারে। মুখের মারিতং জগৎ।

মানুষ একে-তাকে মারে। যুদ্ধে মারে, দাঙ্গা হাঙ্গামায়, সাম্প্রদায়িকতার মাৰ্গে। ভাগ্য মানুষকে মারে। হতাশায় মানুষ নিজেকে মারে। অমিতাচার প্রতিভাকে মারে। এক প্রতিভা আর এক প্রতিভাকে মারে। মারতেই থাকে।

শেষে একটুকরো গ্যাসের গল্প। ইদানীং রামার গ্যাসের সিলিণ্ডার সম্বন্ধে নানান অভিযোগ শোনা যায়। খবরে, টেলিভিশনে পড়া আর দেখা যায় যে গ্যাসের সিলিণ্ডারে অনেক কম পরিমাণে গ্যাস ভরে সরবরাহ করা হচ্ছে। ফলে অনেক আগেই গৃহস্থের রান্নাঘরে গ্যাসের টান পড়ছে। বাড়ির লোকের মেজাজ চড়ছে। যারা এইসব চক্রের সঙ্গে বলে ধবা পড়ছে—তারা যে আসল চাই না, তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। আসল চাই আসলে নিবাপদে সরে থাকছে, বলির পাঠা হয়ে যেতে হচ্ছে অন্য ভারবাহীদের। গ্যাস সরবরাহ দোকানে সব সময়ে সব পরিবারের লোকের পক্ষে যাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। তার ফলে গ্যাস বুকিং ইত্যাদি নানা কাজের জন্য নিযুক্ত কোনো কোনো ব্যক্তি বা স্থানীয় দোকানের সাহায্য নিতে হয়। এরা কিছু টাকা নিয়ে গ্যাস বুকিং থেকে গ্যাস সিলিণ্ডার সরবরাহ—সব কবে দেয়। এইসব ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে কিছু অশুভ চক্রের যোগসাজস থাকে। একটা বাড়িতে এইরকম গ্যাস সিলিণ্ডারের ক্ষেত্রে বেশ কয়েকমাস সন্দেহের ছায়া দেখা যাচ্ছিল। সিলিণ্ডারে গ্যাস কম থাকছে তা ক্রমশ মালুম হয়ে গেল। যে ছেলেটি এসব কবে থাকে তাকে একদিন বলা হল ব্যাপারটা। যখন অভিযোগ করা হল তখন ভাগ্যক্রমে শীতকাল। এবং বেশ শীতই পড়েছিল।

অভিযোগ শুনে ছেলেটি দিব্যি সপ্রতিভ ভঙ্গিতে পুরনো সিলিণ্ডার বদলে

নতুন সিলিণ্ডার লাগাতে লাগাতে উত্তর দিয়েছিল,—শীত পড়েছে না, তাই গ্যাস তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাচ্ছে!

শীত এসেছে আর রামার গ্যাস তাড়াতাড়ি ফুরোচ্ছে। সময়ের এত আগে ফুরোচ্ছে যখন, নিশ্চয় কোনো গভীর ওহা সম্পর্ক আছে শীত আর রামার গ্যাসের। ছেলেটা কি এটা বোঝাতে চেয়েছিল—শীতে অনেক রকম পদ রান্না হয়, তাই রামার গ্যাস তাড়াতাড়ি ফুরায়?

লোকে বলে,তোর খুব গ্যাস হয়েছে। বেশি ফুলিস না,ফেটে যাবি। ‘GAS’-কথাটার অন্যতম এক মানে দেওয়া আছে ডিক্শনারিতে। গর্ব ভরে কাঁপা বা অস্পষ্ট কথা কওয়া।

আমরা প্রায়ই বলাবলি করি—কাকুর জীবিত কালে আমাদের বাড়িতে গ্যাস এলে অনেক কিছু সাবধানবাণী হয়ত আমরা ওনতে পেতাম। গ্যাস সিলিণ্ডারটি রান্নাঘরে শোভা পাচ্ছে দেখলে তিনি হয়ত রান্নাঘরের দরজায় এক দুই তিন করে সতর্কবাণীগুলো লিখে দিয়ে জনে জনে ডেকে সবাইকে সাবধান করে দিতেন। আর আমরা সব ফিচেল ভাই-বোন মুচকি হাসতে হাসতে ব্যাপার পর্যবেক্ষণ করতাম।

কাকু হয়ত মাকে বলতেন,—বৌদি আপনি বড় ভড়ে আছেন, সাবধানে গ্যাস জ্বালাবেন। দেখছেন, কতরকম অ্যান্ড্রিডেন্ট ঘটছে!

আমাদের আদল পজারও গ্যাস জ্বালাতে খুব সফল হতেন বলে মনে হয় না। তবে সাদা বাংলায় ‘গ্যাস’ খেতেন খুব। তা, ‘গ্যাস’ আমরা কে না খাই—কম আর বেশি!

আমার মামা

প্রবীর মণ্ডল

মাধ্যমিক পাশে সুখ অথবা অসুখ আছে কিনা আমার ছোটমামা আজও বুঝতে পারেনি। মানে আমার ছোটমামা যতবারই মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে ঠিক ততবারই ফেল। আমার দিদি যখন ক্লাশ নাইনে পড়ত, মামা দ্বিতীয়বার মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসল। দ্বিতীয়বারও ফেল। আমার দিদি যখন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী, একদিন আমার তোতলা মামা দিদিকে বললে, ‘ভা-ভা-আ-মি, তু-তু-মি আর আ-আ-মি এক স-স-ও-সে পরী-ক্ষা দে-দে-ব।’

মামা আর ভাগি একসঙ্গে পরীক্ষা দিল। তৃতীয়বারও মামা ফেল। আমি যখন ক্লাশ নাইন, আমার মামা চতুর্থবার মাধ্যমিক পরীক্ষা দিল। চতুর্থবারও মামা আবার অকৃতকার্য। তারপর আমি যখন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী, মামা বললে, ‘বুও-ঝলে ভা-গ-নে, তুমি আর আ-আ-মি এক স-স-সে পরী-ক্ষা দেব।’ মামা আর আমি পরীক্ষা দিলাম। মামা এবারও ফেল।

একদিন আমার দাদা মামাকে বলল, ‘আচ্ছা মামা, একবার ডালা করে পড়াগুলো করে পরীক্ষা দিলে ই তো পারো। এভাবে বার বার—’

আমার মামা এই অকৃতকার্যতার জন্যে অন্য কাউকে দোষারোপ করল না। দাদার কথার উত্তরে বললে, ‘ক-অ-ত বাব তোমার ব-অ-অ-ড মামাকে ব-ও-লে-ছি, আ-আ-মি আর পরীক্ষা দে-দে- দে-ব না। ত-ত-ত-বুও—আচ্ছা, তু-তুমিই বলো, কি-ই ক’রে পা-আ-শ করব? আমি য-য-দি মনে



ম-ম-নেও ব-ও-ই পড়ি, বেশে যায়। আবার জো-ও-রে জো-ও-রে পড়লেও বে-এধে যায়। এই ভা-আ-আ-বে কি প-অ-ডা যায়?’

কয়েক বছর পর দেখলাম, আমার এই মামার কথা এখন আর তোতলে যায় না। অর্থাৎ স্লিপ হয না।

তিনদিনের নতুন মামির সামনে, (ফুলশয্যায়) আমি দুম্ করে বলি, আচ্ছা মামা, তোমার তো কথা এখন বেশে যায় না। সুতরাং তুমি জোরে জোরেও পড়তে পারো আবার মনে মনেও পড়তে পারো। তুমি এবার অবশ্যই পরীক্ষা দেবে।

হাসতে হাসতে মামা বললে, এই যে বি-য়ে পরীক্ষা ছিলুম, একি কম কথা! পাশ তো করে গেলুম।

নান্দনিক

দীপক দাস

মাঝেমাঝেই আমি নন্দনে হুঁ মারি। নো আঁতলামি। নো দেখানেপনা। চিমসে চেহারা, করোটির ওপর চামড়া লাগানো মুখ নিয়ে জগৎ-সংসারকে দেখাতে পারলাম না কিছুই। শুধুই দেখা। অবলোকন কাম চরিতার্থ করা। ওই জন্যই তো যাই নন্দনে। দেখেছেন সজ্জের নন্দন বা রবীন্দ্রসদন? কত রঙ, মেলা ঢঙ, ইনজিরিতে যারে কয় পোজ। নানারকম কপোত-কপোতী নানা বিভঙ্গে বসে আছে। থেমের মুক্ত চম্বর কিনা। কিছুদিন আগে এক নামি কাগজের দামি কলমটি এঁদের জন্য প্রচুর অশ্রু-বিসর্জন, মাসে কালি খরচ করেছিলেন। কলকেতায় নাকি পিরিত-কুঞ্জের ভারী টানাটানি। তার ওপর পুলিশি অত্যাচার। পুলিশগুলো বড় বেরসিক। শুধু ধেমালিগে কি আর পক্ষেদ্রিয় তৃপ্ত হয়? অন্য ইন্দ্রিয় ওলো কি উপোসী থাকবে না কি? কিন্তু পুলিশের জ্বালামুসেই তৃপ্তির কোনো সুযোগ নেই। কলমটি বোধ হয় এদের অতৃপ্তির বাসনাতেই বেদনা-হত হয়েছিলেন। অহো! কি রোমাঞ্চিক উনি। রাজভোগ পড়ক ওনার মুখে। প্রপার চ্যান্ডেলের কাছে (ভাগবান নন, পত্রিকা-মালিক) প্রার্থনা জানাই, সাধারণ কলমটি থেকে যেন উনি কলম-সর্দারে (সম্পাদকে) উন্নীত হন। ওনার কলমের সার্বভৌমত্ব যেন উইপোকার মতো বেড়ে যায়। আহা এরকম কলমটি কেন যে আরো দু'চারটে থাকে না! তাহলে তো আমাদের মতো অবলোকনকারীদের গোয়াবারো।

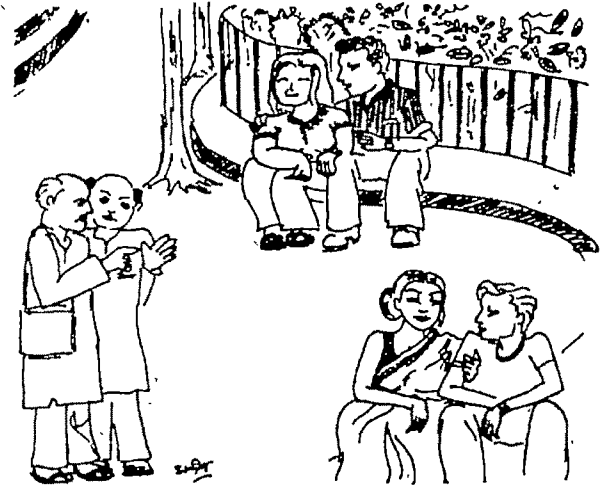
তা বুঝলেন, নন্দনে বসে থাকতে থাকতে আর দেখতে দেখতে একটা মানসিক গবেষণা করে ফেলেছি। পত্রপাঠসম্পাদক আমার সেই গবেষণার পেপার প্রকাশে সম্মত হয়েছেন। লক্ষ্য করে দেখেছি, নন্দনে আসে দু' ধরনের লোক। একদল মাদনিক অর্থাৎ মদনদেবের আর্শীবাদ ধন্য। মানে কপোত কপোতীরা। অন্যদল অমাদনিক। অর্থাৎ মদনদেব এঁদের দিকে ভুল করেও তাকান না। অমাদনিকরা আবার দু' ধরনের। একদল জিতেদ্রিয়। অর্থাৎ হুঁ মাই মশাই এঁদের দেখে। চাক্ষুশে এত দৃশ্য-বিপ্লব ঘটে যাচ্ছে। অর্থাৎ কি নির্বিকার। ধ্যানী বুজের মতো অধিনির্মিত আঁখি নিয়ে বসে থাকেন এঁরা। আসলে এঁরা সব এনলাইটেড। মানে আলোকপ্রাপ্ত। জেনে রাখুন, পূর্বে উদিত সূর্য এঁরা অসুস্থস্পন্দিত। আর পূর্বের কিরণে কখনো আলোকপ্রাপ্ত হওয়া যায় না। এঁদের সূর্য পশ্চিমে উদিত হয়। আর পশ্চিমী সৌরমণ্ডলের আদর্শ হল, চোখ কান বুজে থাক। চোখাচোখি হলে হাই-হ্যালো চলতে পারে। কিন্তু খবরদার! টম ডিকের দিকে তেড়ে গেলে আটকাতে যেও না। তাহলেই কিন্তু এটিকেটের ফানুস ফুটুস।

অমাদনিকদের অন্যদল ধারাভাষ্যকার। এঁদের সূর্য পূর্বেই ওঠে। কারো বাড়ি বাঁকুড়া, কর্মসূত্রে কলকাতায়। কেউ বা বৃহত্তর কলকাতার—কলকাতা টেলিফোন যন্ত্রণা মেলেছে—বাসিন্দা। নন্দনের নাম-মাছো আকৃষ্ট হয়ে চলে এসেছেন। এঁরা সংবেদনশীল এবং দৃশ্য-বিপ্লবে প্রভাবিত। শুধু তাই নয়, কিভাবে বিপ্লব সংঘটিত হচ্ছে তাই নিয়ে নিজেদের মধ্যে মত বিনিময় করেন এঁরা। উদাহরণে পরিষ্কার হবে ব্যাপারটা।

দৃশ্যপট-১:

কালো হোঁৎসামতো একজোড়া কপোত-কপোতী। যেন হিড়িম্বা আর হিড়িম্বা।

লক্ষ্য করে দেখেছি, নন্দনে আসে দু' ধরনের লোক। একদল মাদনিক অর্থাৎ মদনদেবের আর্শীবাদ ধন্য। মানে কপোত কপোতীরা। অন্যদল অমাদনিক।



জেলেটা মেয়েটার কাঁধে মাথা দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে কি সব বকে যাচ্ছে। বোধহয় বাসা-বাঁধার প্রাক-প্রস্তুতি চলছে। মেয়েটা কিন্তু চুপচাপ। এক ধারাভাষ্যকারের বিস্ময়-উক্তি—মেয়েটা তো দেখি কিছুই বলে না, খালি শোনে। বোবা নাকি?

—ও বলবে কি ও তো এখন ভাবছে।

—কি ভাবছে?

—ভাবছে যে, আমারও জুটল?!

দৃশ্যপট-২:

একজোড়া দৃশ্য-বিপ্লবী অনেকক্ষণ থেকে বিপ্লব ঘটিয়ে চলেছে। দু'জনের বয়সের পার্থক্য অনেক। কপোতের যদি একশে পা হয় কপোতী তবে তীক্ষ্ণ তিরিশ। দেখে এক ধারাভাষ্যকারের মন্তব্য—এরাই আসল কেউলীলা চালাচ্ছে। দেখছেন, মামিকে নিয়ে এসেছে।

অপর ধারাভাষ্যকারের জোর আপত্তি—দূর। আপনি কিছু জানেন না। জেলেটা ওই মহিলার কাছ থেকে থেমের পাঠ নিয়ে। মহিলা কত আগে পৃথিবীতে এসেছে বলুন তো? অতিজ্ঞতা কি কম।

মহিলা ম হল



‘ফিস ফিস’ বিভাগ

পরামর্শ দিচ্ছেন : প্রাণঘাতিনী দেবী

- আমার একজন নিরাপত্তা কর্মী প্রয়োজন। কোথায় সন্ধান পাব?
—মামণি চৌধুরী, কলকাতা-১৮
- ‘শাত্রু চাই’ বিজ্ঞাপনে। অবশ্য সে বেচারী নিজের নিরাপত্তাটি খোঁয়াবে।
- আমি অভিনয় করতে গিয়ে এক Director -কে বিয়ে করি। কিন্তু আজ অবধি সন্ধানের মুখ দেখতে পেলাম না। কি করা উচিত?
—ইজ্রাবী হেমরম, বালীগঞ্জ।
- ডিরেক্টর ছেড়ে আপনি একজন Proudicer-কে বিয়ে করুন।
- আমি ‘বেসরকারি সংস্থা’ টাইপিস্ট, আমি খুব শ্রমণ-পিপাসু। কিন্তু চাকরির জন্যে শ্রমণ হয় না। কী করলে দুই-ই বজায় থাকে?
—মহুমিতা হালদার, হালদা
- টাইপিস্টের চাকরি ছেড়ে পি.এ.-র চাকরি খুঁজুন।
- আমি অবিবাহিত। উচ্চ শিক্ষিতা, সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে। আমার জন্য কেমন Husband খোঁজা উচিত?
—রমিতা দত্ত, চন্দন নগর, হুগলী
- Husband-দের ছেড়ে একজন অবিবাহিত পুরুষ খোঁজা উচিত।
- আমি খুব দুশ্চিন্তায় আছি। আমার বৌদির এক বিশ্বাসী বান্ধবী বাড়িতে খুব যত্নায়াত শুরু করেছে। দাদার সঙ্গে খুব মাখামাখিও চলছে। বৌদির নাম আবার আশা। ওর বান্ধবীর নাম বিলোদিনী না হলেও, কাছাকাছি—বিনতা। আমার ভয় হচ্ছে—দাদা শেষে ‘চোখের বালি’র মতো হয়ে যাবে না তো? কী করি বলুন তো প্রাণঘাতিনীদি?
- মণিমালা পোদ্দার, কলকাতা-২১

- তুমি ‘চোখের বালি’টা নতুন করে লিখে ফ্যালো। সেখানে যদিও নন্দ-টনদ ছিল না, এখানে চলবে। কপিরাইট উঠে গেছে, এখন সব চলবে। চাইকি বাউলুদে বিহারীটা তোমার কপালে জুটেও যেতে পারে।
- আমার সামনে বিয়ে এবং বি.এ.—দুটোরই সুযোগ ঝুলছে। কোনটা আগে করব প্রাণঘাতিনীদি?

—হেমা দাস, গড়িয়া

- কে ঝুলছে? তোমার হব বর? গাছ থেকে? সুবিধের ঠেকছে না। তুমি দ্বিতীয়টাই আগে করো। সেখানে এমন অনেককেই পেয়ে যাবে।
- আমার বিমান-সেবিকা হওয়ার খুব ইচ্ছে। একটা পথ বলে দেবেন?
—অনসুয়া চৌধুরী, মালদা
- বিমানবাবু তো শুনেছি সেবিকা পছন্দ করেন না; ওই জন্য বিয়েই করেননি। তুমি বরং অন্য কাউকে বাছো।
- মহাভারতের দ্রৌপদী পাঁচ-পাঁচটা বর রেখেছিল, আমাদের কেন একটাতেই বাঁধা থাকতে হবে?

—অনি সামন্ত, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া

- রাখো, তুমিও রাখো। কিন্তু দ্রৌপদীর বরেরা আরো কতগুলো বিয়ে করেছিল সে খেয়াল আছে? বিশেষত হিড়িম্বা। সতীনের সঙ্গে পাল্লা দিতে গেলে—তোমার গায়ে জোর-টোর কেমন? ক্যারাটে কুংফু জানা আছে তো?
- প্রাণঘাতিনীদি, সর্বনাশ হয়েছে। আমার বর আপনার মজার মজার উত্তর পড়ে আপনার প্রেমে পড়ে গেছে। সেদিন তো বলেই ফেলল, তোমাকে আর ভালো লাগছে না, আমি প্রাণসোনা কে বিয়ে করব। আমাকে বাঁচান।
—নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, বাঁশদোণী, কলকাতা
- প্রাণসোনা নয়, প্রাণঘাতিনী। এবং আক্ষরিক অর্থেই। পেশাদারও বলতে পারো। এটা স্মরণ করিয়ে দিও তাকে।
- আচ্ছা, প্রেম কী করে করতে হয়?

—পূর্ণিমা দলুই, নামখানা, দঃ ২৪ পরগণা

- এর কোনো থিরোরেটিক্যাল হয় না। পুরোটাই প্র্যাকটিক্যাল। করতে শিখে যাবে।

পুরুষ হল



‘গাঁক গাঁক’ বিভাগ

সামলাচ্ছেন : উন্মাদন দলপতি

● আলিসন করে কাছে টেমে নিলেই স্ত্রী চোখ বুজিয়ে ফেলে কেন?

—অভিজিৎ রায়, কলকাতা-১০

□ স্ত্রীরা অসত্যতা দেখতে পারে না।

● ফিল্মোৎসবের গুরুত্ব কি?

—মনোতোষ দাস, বনছন্দালী

□ Young couples and old films.

● আমার কোন এঙ্গেই আমার স্ত্রী জিজ্ঞাসা করে কে কোন করেছিল। একটা উপযুক্ত জবাব বলে দেবেন?

—শ্যামল হালদার, নদীরা

□ বলবেন মেয়েদের স্কুল ভেবে কোন করেছিল। জিজ্ঞাস করছিল হেডমিস্ট্রেস বেরিয়ে গেছেন কিনা।

● এ যুগের মেয়েগুলো এত বেহারা হয়ে উঠেছে। এরা কি লজ্জার মাথা খেয়ে বসে আছে?

—বরদাশ্রম চাট্‌জেট, হলদিয়া

□ আত্মে না, বসে নেই তো, মিথি সেচে কুঁসে বেড়াচ্ছে।

● আমি ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র। কলেজের এক অধ্যাপিকাকে ভালোবেসে কেসেছি। কথাটা তাঁকে বলব ভাবছি। উচিত হবে?

—পাপু, (কলেজের নাম বলব না)

□ পিঠের ছাল-চামড়া ওঠার পর অজ্ঞান অবস্থায় চিত-উপুড়ে কী যার আসে।

● আমার প্রেমিকা-কাল আমাকে প্রথম চুমু দিয়েছে। ওঃ, তারপর থেকে আমি আর মাটিতে নেই, হাওয়ার ভেসে বেড়াছি। কিছুতেই মাটিতে নামতে পারছি না।

—বাসব সেন, আসামসোণ, বর্ধমান

□ বলেন কি। ছুরি নয়, পিঙ্কল নয়, চুমু দিয়ে খুন।

● আমার স্ত্রী বত মোটা হচ্ছে আমি ততই রোগা হয়ে যাচ্ছি। আমার স্ত্রী আমার রোগা হওয়ার উন্নতি। কেন বলুন তো?

—পানব ভট্টাচার্য, বড়গাছিয়া, হাওড়া

□ আঁচলে বেঁধে রাখতে সুবিধে হবে বলে।

● আমার সমস্ত কোনো মেয়ে-ষটিত নয়।

আমি তবলা বাজাই। কিন্তু মুশকিল হয়েছে কি, খুব দাদ হয়েছে আমার। বাজাতে বাজাতে চুলকোয়। দাদের জ্বালায় কি শেষে তবলা ছাড়তে হবে?

—অরবিন্দ তালুকদার, দক্ষিণপাড়া, বীরভূম

□ না না, একেবারে ছাড়বেন কেন? দাদরা-টা অন্তত বাজাবেন। সে আপনার চেয়ে আর কে ভালো পারবে?

● আমার স্ত্রী হঠাৎ কবিতা লিখতে শুরু করেছে। তার চেয়ে উন্নতক হল— সেগুলো আমাকে শুনতেও হচ্ছে। এদিকে এক বর্ণও বুঝতে পারি না। পরিব্রাণের একটা উপায় বলবেন?

—জাহাঙ্গীর বৈদ্য, সাঁতরাপাছি, হাওড়া

□ একটিই উপায় দাদা। আশনিও লিখুন। এবং শোনান। মারের বদলে মার, কবিতার বদলে কবিতা।

● তিনমাস ব্যবৎ নার্সিংহোমে ভর্তি আছি। এক নার্সের সঙ্গে আমার প্রেমও হয়েছে। কিন্তু রোগ না সারার দরুণ বাড়ি যেতে পারছি না। কি করি?

—মহীতোষ দে, বাপুর্নঘাট

□ মনে হয় আপনার রোগ সারবে না। আপনার ডাক্তারও ঐ নার্সের প্রেমে পড়েছে। এবং তিনি আপনার ব্যাপারটা জানতে পেরেছেন। সুতরাং বাড়ির বদলে কেওড়াডালা বা নিমতলায় যাবার জন্যে মনকে প্রস্তুত করুন।

● প্রেম করে ক্লাসমেটকে বিয়ে করেছিলাম, কিন্তু হনিমুন করতে পারিনি। এত বছর পর স্ত্রী হনিমুনে যেতে চাইছে। একসঙ্গে কি ঠিক হবে?

—সুরদ সেন, আসামসোণ

□ কেন হবে না? ক্লাসমেট হিসেবেই তো যাচ্ছেন তিনি। কোন ক্লাশে যাচ্ছেন —ফার্স্টক্লাশ না সেকেন্ডক্লাশ?

নিঃস্বত্ব রবীন্দ্রনাথ

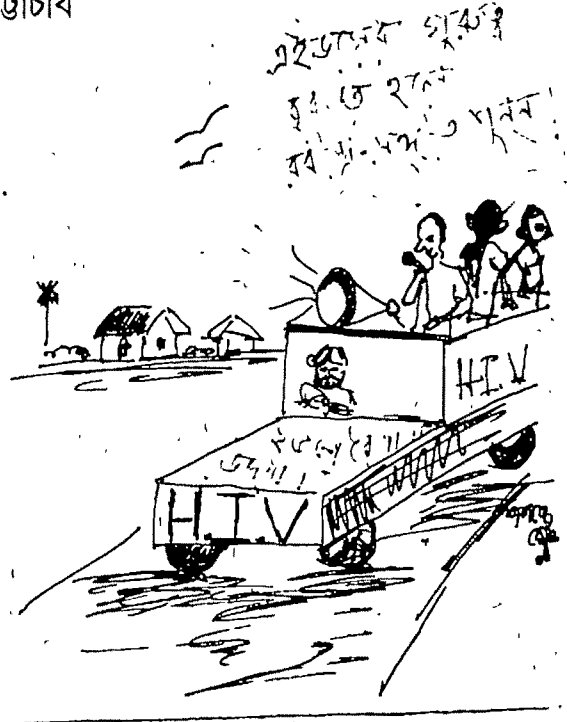
সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

রবীন্দ্রনাথ এখন সর্বপ্রকার বন্ধন মুক্ত। তাঁর গ্রন্থস্বত্বও নেই, মুদ্রণস্বত্বও নেই। এখন তিনি বাহ্যিক ও আত্মিক সকল অর্থেই সর্বজনায়, অর্থাৎ সকলের জন্য। ‘সকল’ অর্থে অবশ্যই বুঝতে হবে শুধু লেখাপড়া জানা লোক। কারণ বাংলা তথা সারা ভারতবর্ষে নিরক্ষর ও অতি অল্প-শিক্ষিত লোকের সংখ্যাই বেশি। তাঁদের মধ্যে অনেকেই এখনো রবীন্দ্রনাথের নামই শোনেননি। তাঁর লেখার কথা জানা তো অনেক দূরের কথা। তাঁদের অনেকের কাছে উনি অনেক ঠাকুরের মতো একজন ঠাকুর। এদেরই মাথায় কাঁঠাল ভেঙে সমাজ, সংসার ও রাজ্যপাটঘরা চালাচ্ছে, ব্যক্তিগত ভোগসুখে আছে তারা, সেই তথাকথিত শিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত লোকের দল। এঁরাই এখন মুক্তকণ্ঠ হয়ে রবীন্দ্রনাথকে আপন করে নেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নেমেছেন। স্বল্প শিক্ষিত বা নিরক্ষর জনগণের কাছে ‘ঠাকুরের’ কথামত হিসেবে হোক বা তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের কাছে সন্ত্রম ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্যই হোক— পক্ষে হোক বিপক্ষে হোক, কথায় কথায় এখন রবীন্দ্রনাথকে বিকৃত বা অর্ধবিকৃত করে উদ্ভূত করা মতলববাজ রাজনীতিবিদ থেকে তথাকথিত আঁতেলসের ব্রেণ্ডমার্কে দাঁড়িয়ে গেছে।

কিছু উৎসাহী যুবক জনগণকে এইডসের ভয়াবহতা সম্বন্ধে সচেতন করার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রবাণী বা সঙ্গীতকে কাজে লাগাবার প্রস্তাব করেন।

রবীন্দ্রনাথের সমকালে বেশ কিছু সাহিত্যসেবী ও বুদ্ধিমান লোক বিকৃত ভাবে ব্যাখ্যা করে তাঁকে ঈর্ষা বশত হেয় করবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে বেশ নামজাদা লোকেরাও ছিলেন। যেমন সুরেশ সমাজপতি, বিজ্ঞানেশ্বর রায়, বিপিনচন্দ্র পাল, রাখাকমল মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি। তাঁদের লেখার তবু কিছু কণ্ডুস্রাবের পরিচয় ছিল। এখন রবীন্দ্রনাথ অবস্থা হওয়ায় তাঁর বর্তমান অবস্থা কী হচ্ছে এবং ভবিষ্যৎ কী হতে পারে সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ বাস্তব ও অনুমানলব্ধ পরিচয় প্রদানের চেষ্টা করা যেতে পারে।

সম্রাতি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীমতী সুষমা স্বরাজ এইচ আই ভি বা এইডস রোগ নিবারণের জন্য বেসরকারি সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নিজে ক্লাশ নেবেন এবং যেখানে নিজে ক্লাশ নিতে পারবেন না সেখানে ক্লাশ নেবার ব্যবস্থা করে দেবেন বলে শোনা গেছে। এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের একটি সেবা প্রতিষ্ঠানের কিছু উৎসাহী যুবক জনগণকে এইডসের ভয়াবহতা সম্বন্ধে সচেতন করার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রবাণী বা সঙ্গীতকে কাজে



লাগাবার প্রস্তাব করেন। তাঁরা বলেন, গ্রামে গ্রামে, শহরের পথে পথে রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ গান যদি শোনাবার ব্যবস্থা করা যায় তাহলে সকলেই এতে আকৃষ্ট হবে। গানটি হল—

“কাদালে তুমি মোরে ভালবাসারই ঘায়ে

নিবিড় বেদনাতে পুলক লাগে গায়।।”

এইডসের স্বরূপ এর চেয়ে ভালো আর কারো পক্ষেই বলা সম্ভব হয়নি। বক্তাকে প্রশংসা করা হল,—এটিকে পূজা পর্যায়ের গানের মধ্যে রাখা হয়েছে কেন?

উত্তর হল,—তাতে কি হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ কামধেনু। তাঁর থেকে যেমন প্রয়োজন তেমন অর্থ পাওয়া যায়।

২৫ বছরের ওপর একটানা শাসনে থেকে কোনো দল যদি দেশটাকে প্রায় যদাঁপ করে আনে, তাহলে সেও তখন রবীন্দ্রনাথের কাছে বেঁচে থাকার ওষুধের জন্য হাত পাতে। রবীন্দ্রনাথ তো ‘কণিকা’ কাব্যের এক জারগায় বলেছেন— ‘কাজ করি আমরা যে তাই করি ভুল।’ কাজ করি বলেই তো ভুল হয়েছে। এরপর আর কী কথা আছে—সাতখুন মাফ। দেখতে দেখতে আবার এসে যায় নির্বাচন। হস্তত সেটা গ্রামশঙ্কায়ের নির্বাচন। তাহলেও এর গুরুত্ব অনেক এবং ফল সুদূরপ্রসারী। বড় মারবারি সব রকমের নেতারই গ্রামাঞ্চলে পদার্পণ ঘটতে থাকে। সেখানেও রবীন্দ্রনাথকে আনা হয়। একজন নেতার উক্তি,—

ভুল করেছি অনেক আমরা, সে কথা মেনে নিচ্ছি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কালান্তরে বলেছেন, “মানুষের ওপর বিশ্বাস হারানো পাাপ।” আমাদের ওপর অবিশ্বাস করে সে পাাপটা করবেন না। দেখবেন, আমরা ঠিক আপনাদের আবার মঙ্গল করে তবেই ছাড়ব।” রাজনীতিবিদদের চিন্তা একটাই। ছলে বলে কৌশলে জয়লাভ করা। এটা তো রবীন্দ্রনাথই বলেছেন গান্ধীরীর আবেদনে— ‘রাজধর্মে শাস্ত্রধর্মে বদ্ধধর্ম নাই শুধু জয়ধর্ম আছে।’

জয়লাভের পর জনগণকে অভিনন্দন জানাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথেরই ‘শেষ লেখা’ থেকে কয়েকটি কথা সবসময় তাঁরা স্মরণ করান—

“অন্যায় সে পেরেছে ছলনা সহিতে

সে পায় তোমার হাতে

শান্তির অক্ষয় অধিকার।”

এটাই তো জনগণের পরম সাধুনা।

নির্বাচনের আগে বা পরে দলের ছেলেরের এত তোয়াজ করা হয় কেন? এখানে তারা গুরুদেবের প্রতি অসুখি নির্দেশ করে বলে—গুরুদেবই বলেছেন ‘যোগাযোগ’ উপন্যাসে, ‘যে ব্যক্তি উপরে চড়ে তাকে সেই পায়ের তলার অবলম্বনটাকে বাঁচিয়ে চলতেই হয়।’ অতএব আমাদেরও সেটা করতেই হচ্ছে। কারণ এখন আমরা বিদেশি গুরুর সঙ্গে এই দেশীয় গুরুকে সমান মর্যাদা দিয়েই থাকি।

দলের ছেলেরা যখন প্রতিক্রিয়াশীলদের ঘরে আগুন লাগায় তখন সে কাজটা সাধারণ বুদ্ধিতে অন্যায় বলে মনে হতে পারে, কিন্তু একটু ভাবলে সেটা মনে হবে না। প্রতিক্রিয়াশীলরা সবসময়ই দেশের প্রগতিককে বিস্তৃত করে। তাই প্রতিক্রিয়াশীলকে প্রগতিশীল করতে গেলে তাকে অন্তরে বাহিরে শুদ্ধ করতে হয়। আগুনই সেই শুদ্ধীকরণের উপাদান। গুরুদেবই তো বলেছেন—

“আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রধে

এ জীবন পুণ্য করো দহন দানে।”

দলনেতাদের এ যুক্তি সত্যিই সাধারণ মানুষের মনকে প্রবুদ্ধ করে, তারা শান্ত চিত্তে সেটা মেনে নেয়। আজকাল নির্বাচনের ডামাডোলের দিনে শহরে গ্রামে শাসক গোষ্ঠীকে শিক্ষকদের ওপর অবধা অন্যায়ের দোষারোপ করা হচ্ছে। সেখানেও তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে দেখিয়ে দেন। জীবন স্মৃতির একজায়গায় রবীন্দ্রনাথ নাকি বলেছেন যে, ছেলেরের অপরাধকে বড়দের মাংগাঠিতে মাগতে গিয়ে একথা আমরা ভুলে যাই যে ছেলেরা চলে বর্ণার বেগে। বেগ যেখানে খেমে যায় সেখানেই বিপদ। মাস্টারদের মধ্যে সেই বেগেরই অভাব দেখা দিচ্ছে। সেই জন্যে তো গুরুদেব বলেছেন—‘এই জন্য শিক্ষকদের অপরাধকে যত ভয় করিতে হয়, ছাত্রদের তত নহে।’ গুরুদেবের নির্দেশ তো আর অমান্য করা যায় না।

শিক্ষকদের বেগটা মাগল কে, সে প্রশ্ন কিন্তু এখানে একেবারেই অবাস্তব।

ব্যবসায়ী, চোরাকারবারী এবং দুর্বৃত্তরাও মুক্ত রবীন্দ্রনাথের মধ্যে নিজেদের পেশার স্বপক্ষে নানা মত ও পথ খুঁজে পাচ্ছে বলে শোনা যাচ্ছে। সেসব শোনা কথা বলতে গেলে আর এক মহাভারত তৈরি হবে। তবে তার মধ্যে দু-একটা খুবই চিত্তকর্ষক কথা এখানে না বলে পারা যাচ্ছে না। বসিরহাট থেকে প্রকাশিত একটি পত্রিকায় লোডশেডিং সম্বন্ধে একটি লেখার আরম্ভই করা হয়েছে—

যতবার আলো জ্বালাতে চাই

নিবে যায় বায়ে বায়ে

আমার জীবনে তোমার আসন

গভীর অন্ধকারে।

আর একটি পত্রিকায় অনেকগুলি উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে রবীন্দ্রনাথ থেকে।

প্রতিক্রিয়াশীলকে প্রগতিশীল করতে
গেলে তাকে অন্তরে বাহিরে শুদ্ধ করতে
হয়। আগুনই সেই শুদ্ধীকরণের
উপাদান। গুরুদেবই তো বলেছেন—

এদের মধ্যে দিয়ে দেখাবার চেষ্টা হয়েছে—দুর্বৃত্ত, চাঁদা আদায়কারী, চোর, আধুনিক রোমিওরাও রবীন্দ্রনাথকে কিরকম সহানুভূতির সঙ্গে স্থান লাভ করেছে।

যথা— (ক) দুর্বৃত্তদের প্রতি পরোক্ষ সহানুভূতি—

“মেয়েরা অভিসারিকার জাত। এগিয়ে গিয়ে থাকে চাইতে হয় তার দিকেই তাদের পুরো ভালবাসা। ওদের উপেক্ষা তারই পরে দুর্বৃত্ত করার মতো জোর নেই যার কিংবা দুর্লভ হবার মত তপস্যা।” (বীশরি)

(খ) চাঁদা আদায়কারীদের প্রতি সহানুভূতি—

“আমাদের দেশের চাঁদার খাতা আমাদের দেশের গরুর মত। তাহার চরিত্রের স্মৃতি নাই বলিলেই চলে।”

(গ) চোরের প্রতি সহানুভূতি—

“চুরিকে লোকহিত নাম না দিলে শুনতে খারাপ লাগে।” (রাজা)

(ঘ) আধুনিক রোমিওদের প্রতি সহানুভূতি—

“যে পুরুষ অবশেষে অকুণ্ঠিত ভাবে নিজেকে প্রচার করিতে পারে.....সেই সমর্থ পুরুষ সহজেই নারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে।” (নটনীড়)

অথবা,

“ধিমা করে নিজেকে যে পুরুষ যথেষ্ট জোজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ না করায় মেয়েরা তাকে যথেষ্ট স্পষ্ট করে প্রত্যক্ষ করে না।” (শেখের কবিতা)

এইসব উদাহরণ প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের কালজয়ী প্রতিভাকেই আমাদের সামনে প্রেচ্ছল করে তোলে। কারণ তিনিই কালজয়ী কবি-প্রতিভার অধিকারী যিনি বিভিন্ন কালের মানুষের রুচি ও প্রকৃতি অনুযায়ী গঠিত ও ব্যাখ্যাত হন। আজকের মানুষ আজকের রুচি ও মন নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে দেখছেন। কিন্তু মহৎ কবির কবিতা চিরকালীন সত্য নিয়েই কাল থেকে কালান্তরে যাত্রা করে। তার পরিসর থাকে অস্মান সর্বকালের সহদয় সামাজিক পাঠকের কাছে।

হোঁসেং নাই

এ সংখ্যায় রান্নাবান্না আর করা হল না। স্বস্ত্র উঠে যাওয়ার পর খোদ রবীন্দ্রনাথকে বঙ্গবাসীরা যেভাবে কেটেকুটে ঝেঁড়েবেড়ে ঝালে ঝালে অম্বলে খেতে শুরু করেছেন তাতে পরপাঠের রান্না আর তাঁদের মুখে রুচবে বলে বোধ হয় না। তবে পরবর্তী সংখ্যায় ঐদেবই কাউকে কাউকে ঝেঁড়ে উপহার দেওয়ার ইচ্ছে রইল। চুপি চুপি বলি, এ সংখ্যাতেও ঐদেব নিয়ে রান্না হয়েছে বিস্তর। ঝুঁজে পেলো চেখে দেখতে পারেন। কেমন লাগল, চিঠি দিয়ে জানালে রান্নাবান্নায় উৎসাহ বাড়বে বই কমবে না।

কপিরাইট কবি

দিব্যালোচন কলমধারী

বারে এক ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞাসা কবেছিলেন—রবীন্দ্রনাথের কপিরাইট উঠে গিয়ে কি ভালো হল?

তখনকার মতো বলেছিলাম,—না বলে উঠে যাওয়া মোটেই ভালো না। টেবিল ম্যানার বলে একটা জিনিস আছে।

প্রশ্নকর্তা আর দাঁড়াননি। থলে দেখেই বুঝেছিলাম, টেবিল ম্যানারের মানে জানেন না। বাজারের থলে মানুষের মার্কশীট। এ নিয়ে পরে আলোচনা করা যাবে। তবে আমিও কপিরাইটের মানে জানি না। কপি কথটা খুব চেনা। পরীক্ষার দিনগুলোতে সারাজীবন আমার পাশে পাশে থেকেছে। যে কটা পাশ দিয়েছি তা শুধু ওগুলো পাশে থাকার জন্যেই দিতে পেরেছি। কিন্তু এ বাইটে গিয়ে জ্ঞানের খামে স্টেপলার পড়ে গেল।

একটা 'রাইট' মানে জানি, দিক। জ্যোতিবাবু যে দিকে হাঁটেন তাব বিপরীত দিক হল বাইট। আর একটা রাইট হল সঠিক। যে কাজ আমি জীবনে করিনি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এ বাইটটা যে কি, তা বুঝলাম না।

পবে যখন বুঝতে পাবলাম তখন আমি হেসে কুটিকুটি। তাই তো বলি, এত পাতার পর পাতা মাল ছাড়লে কী কবে চাদু! বাজার, রেশন, স্কুল-ছাড়া, জল-তোলার পর এ গানের ডিক্শনারি ছাপালে কী করে? আমাদের পঞ্চাশ পাতাব পত্রপাঠ ছাপতে সম্পাদক অনাথ হয়ে গেল! এখন হোমে থেকে কাজ চালাতে হয়। সারা বছর তেল-সাবান-মাজনের 'ভিক্ষা দেহী' করে শেষ পাতায়



একটা ঘড়ি একে লিখে দিল—বিনামূল্যে বিজ্ঞাপনের একমাত্র মাধ্যম—কাল সকালবেলাই চলে আসুন—আমি মোড়ের মাথাম থাকব—ইত্যাদি।

তার মানে কপি কবাব বাইট ছিল রবীন্দ্রনাথের। এ বাইট আমার থাকলে কবে গ্রাভুয়েটে হয়ে যেতাম! এখনো ওয়েট করে থাকতে হত না। ঠাকুরদা প্রেমের লিখেছেন, ভক্তিব লিখেছেন, ভক্তুরা সাবাজীবন কি গাইবে তা লিখেছেন, কিন্তু অধিকারের গান লেখেননি। ট্রেড সিক্রেট। অধিকারের গান নজরুল লিখেছেন। ইংরেজের রুল খেয়ে এ একজনেবই গান বেবিয়েছিল। কী দরদ সে গানে। শুনলেই প্রথমে বুকের বাঁ দিকে একটা পেন্ হবে। তার পরেই রক্তে অলিম্পিক। ফিবাও মোর অধিকার—বলে বাঁটি নিয়ে ভাইসরয়ের বাড়ির দিকে ছুটেতে হবে।

টুকলি করার অধিকার ছিল রবীন্দ্রনাথের। ঠাকুরবাড়িতে টুক-টাক গান-কবিতা সন্ধানি, মায় চাকর-বাকরেরাও লিখত। তাদেরই কারো খাতা ঝেড়ে—। যাক গে, যা দেখিনি তা বলা ঠিক হবে না। কপিরাইট জিনিসটা বোয়ের মতো। হাতেনাতে না ধরলে ধরা হয় না। এ আমি স্কুলেই শিখেছি। যারা এ লেখা পড়ছেন তারাও বিলক্ষণ জানেন, ওয়াকিবহাল। এক বর্ণ না পড়েও কি করে বহাল তবিয়েতে পাশ দেওয়া যায়, তা জানেন।

যে ভদ্রলোক আমায় প্রশ্ন কবেছিলেন, মাসখানেক পর তাঁকে বাজারে দেখতে পেলাম। ডেকে বললাম,—স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই যখন সম্মানে উঠে গেছেন, তখন সব রাইট তো তিনি সঙ্গে করেই নিয়ে গেছেন। এই যে যেমেনেয়ে হাড়ভাঙা পরিশ্রম কবে বাড়ির রাজা-রানীদের জন্যে বাজার টানছেন, আপনি উঠে গেলে এ পরিশ্রম কি আর থাকবে আপনার? এ পাটও আপনার চিতাঘ উঠে শুয়ে পড়বে। পড়ে থাকবে এই থলে, ফতুয়া, লুঙ্গি, মাদুলি, চশমা, নসি, হাওয়াই, ফল্‌স দাঁত—

ভদ্রলোক হঠাৎ আমাকে ধামিয়ে দিয়ে বললেন,—আর পড়ে থাকবে আপনার সর্বস্ব পোড়া ছাই, নাতিকুণ্ড।

তাবপব দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

সত্য সদাই অসহ্য।

জলকর



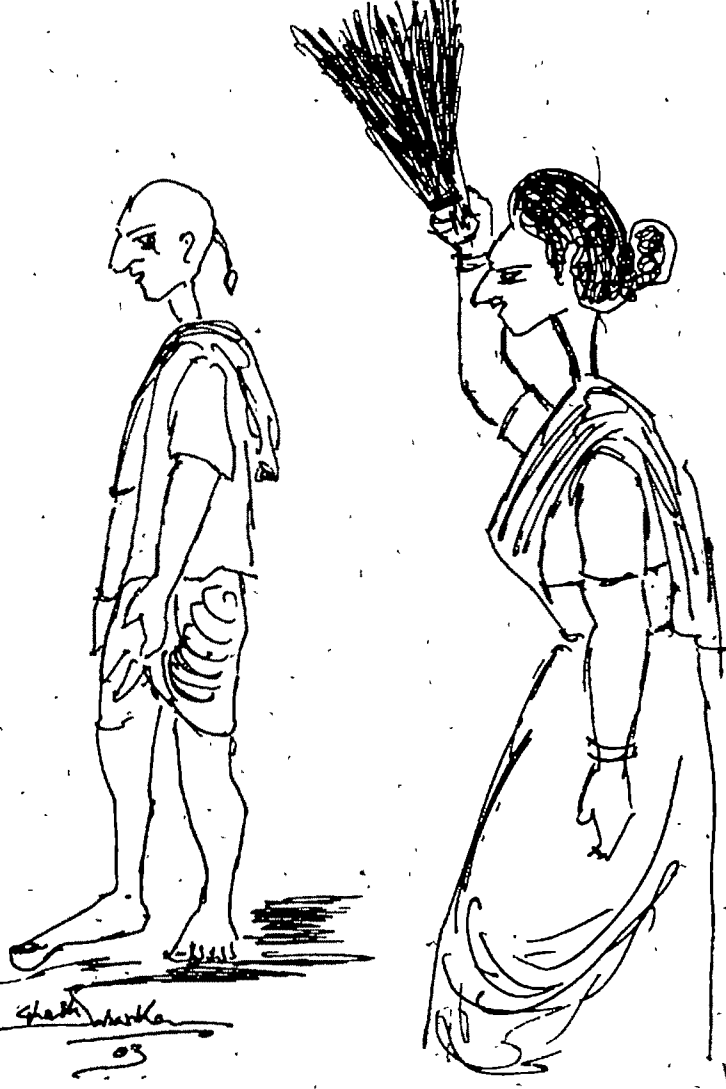
জলকর

করবার মতো কিছু না থাকায় জলকর বসিয়েছে পুরসভা। এতে গেরস্তের গা করকর করানো যাবে। করপোরেশনেরও বেশ কর আদায় হবে। কর্মচারীদেরও টেবিলের তলায় কারবার বাড়বে। বিবেচী পক্ষ কদিন টেবিলে চাপড়ে একে আপত্তিকর বলছে। এ অবস্থায় ভগবান শ্রীবন্দেব করকমলে করজোড়ে এই মিনতি—শীঘ্র একটা বায়ুকর বসিয়ে প্রাণান্তকর এই জীবনের দফারফাটা করে দিন।

—দিব্যেন্দু দাস

নিবারণ বৈরাগ্যের বৈরাগ্য

দেবপ্রসাদ কুমার



রবীন্দ্রনাথের ‘দর্শনরথ’ গল্পের আরম্ভ এই রকম—“কী করিয়া গল্প লিখিতে হয় তাহা সম্প্রতি শিখিয়াছি। বন্ধিমবাবু এবং স্যার ওয়ান্টার স্কট পড়িয়া আমার বিশেষ ফল হয় নাই।” বন্ধিমবাবু বা স্কট পড়িয়া রবীন্দ্রনাথের কী ফল হইয়াছিল তাহা পাঠক মাত্রই অবগত আছেন এবং রবীন্দ্রনাথ যে ক্ষুদ্রকে উদ্ভবরূপে পাঠ করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহের

কোনো অবকাশ নাই। আমাদের নিবারণচন্দ্র বৈরাগ্য বন্ধিমচন্দ্র যদিও অল্পস্বল্প পাঠ করিয়াছে কিন্তু ক্ষুদ্রের নামও শোনে নাই। অথচ তাহার গল্প লেখার শখ। সেইজন্য সে বাংলা ভাষায় যে সমস্ত উত্তম ছোটগল্প নাগালের মধ্যে পায় তাহাই গোত্রাঙ্গে গেলে। বিশেষ করিয়া ‘গল্পগুচ্ছ’। গল্পের বিষয়বস্তু, মূল সূত্র, মনস্তত্ত্ব এইসব বিষয়ের প্রতি নিবারণের মনোযোগ একনিষ্ঠ

নহে। তাহার বিশেষ নজর হাস্যরসের প্রতি। একথা অনবীকার্য যে রবীন্দ্র-গল্পে ছত্র বিশেষে হাস্যরসের দৃষ্টান্ত কখনো দেখা দেয় নাই। কিন্তু সেই হাস্যরস আদৌ স্থূল নহে, সূক্ষ্ম। নিবারণের উদগ্র বাসনা— হাস্যরসের ভেলায় চাপিয়া গল্প-পারাবার পার হইবে। সে ঠিক করিয়াছে, হাস্যরস যেখানে তাহার মগজের মতো ক্ষুরধার নহে সেই সমস্ত হাস্যরসাস্বাদক উপমাগুলিকে সে নিজ গল্পে ব্যবহার করিবে। ‘সমাপ্তি’ গল্পে ‘অস্থিহাহকারী’ বলিয়া একটি প্রকৃতিসূচক শব্দ আছে যাহার অর্থ হাড় জ্বালানি। অস্থিহাহকারী শব্দের উপর তো রবীন্দ্রনাথের Copy Right নাই যে অন্য কেহ ব্যবহার করিতে পারিবে না। (সমস্ত রবীন্দ্রসাহিত্যের উপরই যে Copy Right বিলুপ্ত হইয়াছে এবং ইহাতে বিশ্বজন্যীদের অস্থিহাহ হইলেও নিরারণ কিন্তু নির্ধিকার, কারণ সে সংবাদপত্র ক্রয় ও পাঠকে যুগপৎ অর্থ ও সময়ের অপচয় জ্ঞান করে)। সে লক্ষ্য করিয়াছে যে ‘সমাপ্তি’র মৃন্ময়ী একটি অবোধ সরলা, প্রায়-অশিক্ষিতা গ্রাম্য বালিকা, যাহার প্রথম সম্বন্ধে প্রাথমিক উপলব্ধি ভ্রমাজ্জ্বলিত অমিশ্র হইলেও পরিণামে তাহার বোধোদয় হয় এবং প্রথমে স্বাদ সে অনুভব করে বিরহানলে দগ্ধ হইয়া।

নিবারণচন্দ্র মনস্থ করিল যে তাহার গল্পে একটি সরলা বালিকা থাকিবে যাহার আদল হইবে প্রাথমিক পর্যায়ের মৃন্ময়ী। পরিণামের কথা চিন্তা করিবার এখনো অনেক সময় আছে। প্রথমে উপকরণ সংগ্রহ করা যাক।

নিবারণ এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে এই দুনিয়ায় মৃন্ময়ীর মতো সরল প্রকৃতির বালিকা বর্তমানে বিরল প্রজাতির অন্তর্গত। বরং কুটিল্য স্বভাবের স্ত্রী জাতিরই প্রাদুর্ভাব। একটি স্বর্ণপরিমলিয়ার একতাই প্রয়োজন— অবশ্যই গল্পের খাতিরে। বাস্তব জীবনে তাহার খাতিরে শয্যাসজিনী তো একাই একশ। বাস্তবের কুটিল্যকে লইয়া তাহার কাজ নাই। তাহাড়া নিজ জীবকে গল্পে স্থান দিবার মতো দুঃসাহস আছে—এরূপ অপবাদ তাহার অস্তিত্বই শঙ্কিত দেয় না। তাহার প্রয়োজন কল্পনার কুটিল্য। ‘গল্পগুচ্ছ’ কুশীলবণ যে চরিত্রের তাহা রুহু বিচিত্র—তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিলে কি একটি স্বার্থপর স্ত্রী চরিত্রের সন্ধান মিলিবে না? রবীন্দ্রনাথ কি এতই স্বার্থপর?

“ভূশঙীর মাঠে” গল্পে একজায়গায় পরশুরাম লিখিয়াছেন—“উদ্‌ঘোষী পুরুষের লক্ষ্মীলাভ অনিবার্য।” সে নিত্যই অতিভূত হইয়া পড়িল। সে মনে মনে মণিমালিকার হতভাগ্য স্বামী কলীকৃষ্ণের ‘লক্ষ্মীভিক্ষা’ হইল এবং বিশ্বকবি কে নাগালের মধ্যে পাইলে তাঁহার পদযুগল বেঁটন করিয়া ধপ্প করিত যে নিবারণের দুর্ভাগ্যের মনোজগতের এমন যথার্থ বিশ্লেষণ তিনি করলেন কি করিয়া? কদলীবৃক্ষে মৃগের শৃঙ্গ ঘর্ষণের আত্মপ্তি, মাতামহীদের নিকট হইতে প্রাপ্ত শাপিত বরুণাঙ্কের প্রয়োগ করিতে না পারার হতাশা তো আঁতের খবর। এই অকাট্য তথা অশ্রান্ত উপমাগুলি নিজের সহিত মিলিয়া দেখিয়া সে যৎপরোনাস্তি রোমাঞ্চিত হইয়া এই ভাবিয়া কিষ্কিৎ সাক্ষ্য লাভ করিল যে লেখকও স্বয়ং সম্ভবত অনুরূপ পরিস্থিতির শিকার হইয়াছিল।

সংখ্যাতত্ত্বের হিসাবে নিবারণের গল্পের উপকরণ দাঁড়াইল দুই। উত্তম রূপে চিন্তা করিয়া গল্প-মশ-লিঙ্গ নিবারণ দেখিল ইহা যথেষ্ট নহে। আপাতত একটি নামকের প্রয়োজন। মণিমালিকা কোনোক্রমেই নায়িকা হইতে পারেন না—বিশেষত স্বভাবে যখন মণির সহিত তাহার অব্যক্তিতা জীর দৃশ্যতই সাদৃশ্য রহিয়াছে। সুতরাং নায়িকার ভূমিকায় সূর্য্যীর মতো কোনো অসাপেক্ষা বালিকাই বিধেয় এবং এই প্রেক্ষিতে নামক বয়স্ক বা ধুমসো হইলে চলিবে না। আকাশ-পাতাল ভাবিয়া সে যখন কুল-কিনারা না পাইয়া গলদঘর্ম হইতেছে তখন অমানিশীথে বিদ্যুৎ চমকের মতো তাহার চিত্তাকাশে তারাপদ মুক্টিলা আসান করিল। ‘অতিথি’র নামক তারাপদ অল্প বয়স্ক, সৌরবর্ণ, সুদর্শন। পরিধেয় বস্ত্র মলিন এবং দেহখানি সর্বপ্রকার বাহুল্য ব্যর্জিত। মণি-কণ্ঠন যোগ আর কাহাকে বলে। নামকের নাম কাক্সন ভিন্ন অন্য কিছু ভাবা অসম্ভব হইবে অনুচিতও বটে। চাহিকি গল্পের নামকরণ “মণি-কাক্সন যোগ” রাখা যাইতে পারে কিনা সে বিষয়ে অধিক গবেষণার প্রয়োজন নাই। ‘যোগ’ কথাটি তাহার মনে উদয় হওয়ায় পরিপূরক শব্দ ‘বিয়োগ’ তাহার সুখস্বপ্নে কঁটার মতো খচ করিয়া উঠিল। গল্প মিলনান্তক অপেক্ষা বিয়োগান্তক করিলে লেখকেরও কিছু সুবিধা হয় এবং পাবলিকও খায় ভালো। নহিলে শরৎবাবুর অপরিণামদর্শী মদ্যপ নামক দেবদাসের স্মৃতি জ্ঞানমানসে এত সহানুভূতি বা জনপ্রিয়তার অদ্যাপি অব্যাহত থাকে কেনন করিয়া? তদুপরি তারাপদ পলাতক মনোভুক্তির ছোঁকরা। কোনো একটি ক্ষুণ্ণ তাহাকে দেশান্তরী করিতে বেগ পাইতে হইবে না। মলিন বেশভূষা বর্ণনার জন্য উচ্চাদের কষ্টকল্পনা করিতে হইবে না। কারণ, পরিধেয় মহার্ঘ্য হইলে হিমকন্ডর, নিত্য শিম ভক্ষণে অভ্যস্ত নিবারণকে হিমশিম খাইতে হইত। কিন্তু তারাপদ যে ব্রাহ্মণ-বালক। সে তাহার নায়িকাকে কায়স্থ রূপে স্থির করিয়াছিল। তবে উপায়? কায়স্থ-কন্যার সহিত ব্রাহ্মণ-বালকের যে মিলন করাতেই হইবে—এমন মাথার দিবি তো কেহ সেম নাই এবং অগতির গতি তারাপদ তো পরিণামে পলাতক, পরিণয়ের বালাই নাই।

রক্তনের জন্য উত্তম উপকরণ হইলেই চলে না—মশলাপাতির ভূমিকাও অপরিহার্য। মণিহার্য গল্পের উপসংহারে আছে—“প্রকৃতি ঠাকুরানী উপন্যাস লেখিক নহেন, তাঁহার হাতে বিস্তর কাল আছে।” প্রকৃতিদেবী যতই কর্মবাস্ত থাকুন না কেন পরিবেশ বর্ণনায় তাঁহার উপস্থিতিকে অস্বীকার করিলে তিনি হয়ত নিজের পান কিন্তু জিজ্ঞাসেবী পাঠক গল্পকারকে মুক্তকণ্ঠ করিয়া ছাড়িবে। প্রকৃতি ঠাকুরানীর খাস ভালুকে স্থায়ী বাসিন্দা হিসাবে চন্দ্রালোক, কুহরব, মলয় পবন, প্রস্ফুটিত বা বিকটোমুখ কুসুমদাম, বিহঙ্গ-কাকলি, নিষ্কর সেবোত্তর লাখেরাজ ভূমিতে স্মরণাতীত কাল হইতে অবাধ বিচরণ করিতেছে; অদ্যাবধি কোনো বিসংবাদ নাই।

কিন্তু বিপদ হইতেছে যে প্রকৃতিদেবীর কুসীদজীবী বলিয়া কোনো সুখ্যাতি নাই। থাকিলে নিবারণচন্দ্র তাঁহার ঋণ হইয়া পরিবেশের সহিত সলতিপূর্ণ কিন্তু প্রকৃতিক সামগ্রী চড়া সুদে ঋণ লইতেন।

রবীন্দ্র কবিতা পাঠের বদভ্যাস নিবারণের ছিল না। কিন্তু স্কুলপাঠ্য কবিতা

আর পাঁচজন ছাত্রের মতো তাহাকেও কুইনিনের মতো শিলিতে হইয়াছিল, যাহার মধ্যে “হোরিখেলা” অন্যতম। দুর্বল স্মৃতিশক্তিতে আখিল খাওয়ানো সাপের মতো খোঁচাইয়া হোরিখেলার প্রকৃতি বর্ণনার অংশ বিশেষ সে স্মরণ করিয়া উৎফুল্ল হইয়া আর্কিমিডেসের মতো ইউরেকা বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। এই আকস্মিক হৃদয়োচ্ছ্বাসে বৈরাগ্য-জায়া চমৎকৃত হইয়া সম্মাজনী হস্তে সরজমিন তদন্তে আসিলে, কণ্ঠিতবন্ধ নিবারণ বলিল—আরশোলা। “ম্যাসো” বলিয়া তিনি রণে ভঙ্গ দিলেন, কারণ তাঁহার আরশোলা-জীতি। তবু রক্ষা এই যে ইউরেকা শব্দের সহিত বৈরাগিনীর কোনো আত্মীয়তা নাই। থাকিলে বৈরাগ্যজায়া হস্তধৃত শতমুখী (বাঁটা) অস্তিত্বহীন আরশোলা-পৃষ্ঠের পরিবর্তে যে প্রাণাধিকের পৃষ্ঠ স্পর্শ করিত ইহা ভাবিয়া নিবারণের কুরুক্ষেত্রে রণবিমুখ অর্জুনের বিস্তর দর্শনের অনুরূপ রোমহর্ষক অনুভূতি হইল। জী নিরাপদ দূরত্বে অঙ্কিত হইলে সে নোট করিয়া গেল—

ফাগুন মাসে দখিন হাওয়া
বকুল বনে মাতাল হয়ে এল।
বোল ধরেছে আমের বনে বনে,
স্রমরগুলো কে কার কথা শোনে
ওণ্ডণ্ডণিয়ে আপন মনে মনে
ঘুরে ঘুরে বেড়ায় এলোমেলো।

নামক-নায়িকার মিলন-সময় ফাগুন মাস। স্থান আশকুর্জ। আমে বোল অবশ্যই ধরা চাই। এর উপর উৎপাত হচ্ছে, দক্ষিণ দিক থেকে বকুলবনে হাওয়া মাতলামি করবে। অলিকূল স্বীয় অভিপ্রায় অনুযায়ী পর্যটন করিবে বিশৃঙ্খল অবস্থায়। কিন্তু পুরা মাল অর্থাৎ প্রকৃতির অনুসঙ্গগুলিকে একেবারে উজাড় করিয়া দিলে চলিবে না। “প্রেমচক্র” গল্পে পরশুরামের প্রকৃতি বর্ণনাও কাজে লাগিতে পারে। যথা—“আজি কি সুন্দর প্রভাত, নীলনভে পূর্ণচন্দ্র উঠিছে, মলয় মৃদু হিম্মোলে বহিছে, কুসুম ধরে ধরে ফুটিছে, হৃদয়ে সাহানা রাগিনী বাজিছে।” এ বয়ঃ মন্দের ভালো। বসন্ত এখানে পরজীর মতো মৃদু, তাহার বৈশ জীর মতো স্বাধীনচেতা বা বিশৃঙ্খল নহে। কিন্তু প্রগুণ দুই সাহিত্যিকের মতলব কোনোটিই নিরক্ষণ নহে। পরশুরাম—“আজি কি সুন্দর প্রভাত” বাক্যটি আরম্ভের পূর্বে একটি গ্রন্থি বহুল বংশদণ্ড সংযোজন করিয়াছেন এই বলিয়া—“ভাষা, ছন্দ, ভাব তিনটেই বেশ স্ট্যাণ্ডারাইজ করে ফেলেছে।” বোঝো ঠালা। গল্পের মাল-মশলা না হয় জোগাড় করা গেল। কিন্তু তাহাকে স্ট্যাণ্ডারাইজ করা কি চাটখানি কথা।

এই স্ট্যাণ্ডারাইজ করার মামলার রবীন্দ্রোক্ত—“রচনা নৈপুণ্য, স্বভাব, সৌন্দর্য, প্রসাদগুণ, প্রাজ্ঞলতা ইত্যাদি শাস্ত্রসম্মত নানা গুণের সমাবেশ”—বেশ সায়ুজ্যপূর্ণ। কিন্তু ইহার কি সংক্ষিপ্ত উপায় নাই? হয় রে। আজ যদি তাহার প্রাণসখা জগা উপস্থিত থাকিত তবে সমস্যার কত সহজ সমাধান হইয়া যাইত। নিবারণ তখন নবম শ্রেণীর ছাত্র এবং সেই সময় ইংরেজি দ্বিতীয় শ্রেণী প্রেসি লেখা ছিল আবশ্যিক। জগা বলিয়াছিল যে Precies লেখার মতো আর সহজ কিছুই নাই। তাহার মতে—যদি দেখিস Precies গনৈরো লাইনের তবে তাকে দাঁড় করাবি পাঁচ লাইনে। প্রথম দু লাইন আর মাঝের দু লাইন আর শেষের এক লাইন নিলেই তো পাঁচ লাইন। আর Grammar-এর দিকে খুব নজর দিবি। Is কে are; Arc কে is; was কে were; Where কে nowhere করে দিলেই দেখবি খাসা Precies হয়ে গেছে। নিবারণ একটি দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া মানসনেত্রে দেখিতে পাইল যে সেই Precies এবং Grammar কে কদলী প্রদর্শন করিয়া এবং মহাজ্ঞানী না হইয়াও মহাজ্ঞানী করিয়া জগা আজ কোটিপতি। আর নিবারণ কিনা উচ্চকোটির গাণ্ডিক হইবার বাসনায় প্রাণপাত করিতেছে।

মহাজ্ঞানীরাই বলিয়াছেন—একবার না পারিলে দেখ শতবার। ‘দর্পহরণ’ গল্পে

রবীন্দ্রনাথ কিছু বানান লইয়া রসিকতা করিয়াছেন, যাহা অশুদ্ধ হইয়াও রসোজীর্ণ হইয়াছে।

অশুদ্ধ বানানের মামলায় নিবারণের প্রাণে পুলক জাগিল। অশুদ্ধ বানান লিখিতে নিবারণ সিক্কহস্ত, এ ব্যাপারে তাহাকে নিবারণ করা অসম্ভব। দর্পহরণে বানান লইয়া রসিকতার পরিসর নিতান্তই সংকীর্ণ বরং ইচ্ছাকৃত ভুল বানানের কিস্তীর্ণ পরিসর প্রত্যাকুমাের মুখে পাখ্যায়ের “রসময়ীর রসিকতা”।

নিবারণের একাডেমি ইচ্ছা যে সে তাহার নায়িকাকে দিয়া অশুচি হস্তের ভুল বানান দ্বারা প্রেমপত্রে হাস্যরসের সৃষ্টি করিবে। কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া সে আপাতত প্রেমপত্রের একটি মুসাবিদা করিল। নায়িকা লিখিতেছে—

প্রমাণ পূর্বক নিবেদন বিসেস (অর্থাত্ ইহা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না) তুমি আমাড শয়ন ঘড়ের কাছে মাজে মাজে আসিয়া ও বড়ে শোকার মত যে ঘুড় ঘুড় কর তাহা পিড়িবেসী শকলেই যানিতে পাড়িয়াছে। নিজের রূপ বমনা সোভা পায় না। কিন্তুক পাঁচঘনে বলে মনীর রূপের কি বাহার, সুদু গড়রে একটু মাংস যা কম। আসীকাদ করো জেন আমাড গড়রে ওতিসয় মাংসো লাগে। তোমার মত মলটা সিয়ালে গংগাডীয়ে খেয়েও জেন সেস করতে পাড়ে না। এবারে আশল

কতা বলি। রেডিওতে গান গায়—বীশীকে জেন দয়াল ফাঁসি দেয়। মানে বীশী যেন না বায়ে। ওসব ইয়ের কথা—তুমি আমাড শয়ন ঘড়ের কাছে ঘুড় ঘুড় না করে সেই যায়গায় ডেইরে খেকে। দু-চারটে পিঁপরে যদি কামরায় আমাড জন্য....

ইতি তোমাডই ছিড়দিনের দাশি।

কিন্তু গল্পটিকে একটি নিটোল এবং সামগ্রিক রূপ দেওয়া যায় কেমন করিয়া? গল্পের গতি যদি দুর্গতির দিকে অগ্রসর হয় তবে নায়ক পগার পার হইবে ইহা পূর্ব নির্দিষ্ট। কিন্তু নায়িকার গতি কি হইবে? সে কাহার উপর ভরসা রাখিবে? নিবারণের উপর নিশ্চয় নহে। নিবারণ তাহার রণচরী কীকে বেশে আনিতেই চোখে সর্বের ফল দেখে। ইহার উপর যদি নায়ক-পরিভাষ্য অভ্যাসিনী নায়িকার ভার লইতে হয় তাহা হইলে স্বল্পসুহিতা তাহাকে কি আর আশ্ব রাখিবে? দু-কূল রক্ষা করা নিবারণচন্দ্র বৈরাগ্যের কর্ম নয়। অতএব শ্যাম ও কুল রক্ষা করার জন্য আত নিষ্কৃতি লাভের একমাত্র উপায়—বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি। ইহাতে বিশ্বকবি গৌসো করিলেও সে নিরুপায়। কষ্টকল্পিত গল্পের উপসংহারে সে রবীন্দ্রনাথকে সংহার করিয়া লিখিল—কী করিয়া রণে ভল দিতে হয় তাহা সম্প্রতি ঠেকিয়া শিখিয়াছি।

সিনেমা দুঃসংবাদ

নীল গর্জনে

প্রদর্শনী শেষে প্রেক্ষাগৃহ হতে নিষ্করণরত দুই যুবকের একজন উল্লসের বেগ সামলাতে না পেরে মন্তব্য করলেন—“ইস! পরে যারা দেখতে আসবে, তাদের কথা ভেবে দুঃখ হচ্ছে। যদি আগে থেকেই তারা জানত।”

সুরত সেনের সেনারা এমনই খেলা দেখিয়েছেন তাঁর সাম্প্রতিক ছবি “নীল নির্জনে”—তে। বাজারের আনাচে-কানাচে লুকিয়ে-চুরিয়ে রক্তে আশুন-ধরানো যে নীল ছবিগুলি, ইংরেজিতে যাকে Blue Film বলে, রমরমিয়ে চলে, সেন সুরতর মহান ব্রত ছিল সেগুলিকে আইন সম্মত করে তোলা। সেরা ভরত মহান। সেরা ব্রত তি মহান। প্রেম ও যৌনতায় আত্ম-আত্ম পুত্ৰ পুত্ৰ এই দেশে স্নেহ কাড়ুকুতু দিয়েই তিনি একটি চূড়ান্ত বিপ্লবের (চ্যাটার্জী নয়) সূচনা করলেন—এমনই সাধ ছিল। কিন্তু Shoe-ব্রত সাধতে গিয়ে Shoe-টা যে সজোরে নিজের গালেই এসে পড়বে, তা অনুমান করার অনুমার কমতাও তাঁর ছিল না।

সুরতবাবুর খিড়ী ও গ—তিনি নেটিভ-সাবেব। সাহেবরা অশ্রুপানবহুর আগে এ দেশ ছেড়েছে, সঙ্গে সঙ্গে কালা সাহেবদেরও দিন শেষ হয়েছিল। সেইসব কালা সাহেব, যেনারা জেলে জেলে ইংরেজি বলতেন, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ইংরেজি বলতেন, মায় স্বপ্নও দেখতেন ইংরেজিতে। সে সব সাহেবদের হারিয়ে এ দেশ কানা হয়েছিল। অ্যান্ডিনে মিস্টার স্টেইন আলো জ্বাললেন। এমন জ্বালান জ্বাললেন যে তাঁর ছবিতে মানুষেরা তো বটেই, বাঁকুড়ার বুনো পাখিও ইংরেজি বাড়ছে। কখনো সে জিজ্ঞাসা করছে—Why did you do it? কখনো বা বলছে—Should you do it? সেনসাব সম্ভবত একটি ইংরেজি ছবি করার কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু বাতালি সাহেব তো, তাও এত বছর পরে, তাই বাংরেজি হয়ে গেছে। জমা আর আমন চরিত্রের মুখে আমন ধানের মতোই ষে ফুটেছে ইংরেজি। বাদ বাননি মুনমুন সেন ও তাঁর কন্যা।



ও গধর মানুষ সুরত সেন। কাহিনী, চিত্রনাট্য—সবই তৈয়ার। দুটি নদীর সলম দেখে দুটি তরলী সলমে গম্ভীর হয়ে ওঠে। হোটেল ম্যানেজার, শিক্ষিত টেকো ছেলেরি শেষে আদিবাসী মেয়েটিকেই আঁকড়ায় আর অবিবাহিতা কিন্তু ‘মিস’ রাঁধা মুনমুন পল্লীহীন মিলিটারি সায়েবকে পাকড়ায়। সুরত সেন ছবি না করে এটি উপন্যাস করলে আনন্দ পুরস্কার পেতে পারতেন। ব্রুউপন্যাস লিখলে ইদানীং ‘আনন্দ’ পাওয়া যাচ্ছে। উপন্যাসে সেনসাবোর্ড নেই। সে যাই হোক, সুরতবাবু ফেল মেয়েছেন—একথা বলা যাচ্ছে না, কেন না, হাসির বই না হলেও দর্শকেরা ছিন্ন-স্তম্ভ দেখে বারবার সেলামে সশব্দে হেসেছে। দরকার হলে পাঠকরাও বাড়িতে বসেই হেসে নিতে পারেন, হলে যাওয়ার দরকার নেই।

—ভূতলেন্দু ভৌমিক

পুরোহিত কোনোদিন পণ্ডিত হয় না। পণ্ডিত কোনোদিন পুরোহিত হয় না। জহরলাল, রবিশঙ্কর, গুলাম আলিরা কোনোদিন কাঁসর বাজায়নি।

মোদী লাইন

আইভান হো হো



মা নুঘের জীবদ্দশায় গীতা মোটা। মরণের পর পকেট সাইজ। পরীক্ষার আগে নোটস। পরীক্ষার দিন একটা পাতা। কিডনির কাছে সেলোটেপ দিয়ে সাঁটানো। জয় মা কালি লেটার ও কম্পোজিসন। এখন প্রশ্ন হল যে, শ্রাদ্ধের সময় শ্রীমন্তাগবতের ঐ কলে বসার কলেবর লাগে কেন। তিনশ পেন্সের সেই হার্ডবাইণ্ড মালটা লাগে না কেন? উত্তরটা এই যে, পণ্ডিত আর পুরোহিত এক বস্তু নয়। বাবার শ্রাদ্ধের সময় ছেলেরা খুব ফ্রি মুডে থাকে। মনের কার্নিশে বসে গুপ্তধন চ্যাপ দোলাচ্ছে। এই অবস্থায় নিজেকে ধরে রাখতে কোন ছেলে গীতা পাঠের বায়না ধরে বসতে পারে? পকেট সাইজ হলে তবু চালিয়ে নেবে পুরোহিত। কিন্তু ঐ অশুভ দশ কাণ্ডের বুক অফ ওয়ার পণ্ডিতের কন্মো? আর পুরোহিত কোনোদিন পণ্ডিত হয় না। পণ্ডিত কোনোদিন পুরোহিত হয় না। জহরলাল, রবিশঙ্কর, গুলাম আলিরা কোনোদিন কাঁসর বাজায়নি। আমাদের পাড়ার নবী পুরোহিতের ছেলে বাজারে মাংসের দোকান দিয়েছিল। সে আবার আচমকা ঐশ্বর্য হয়। ওর মুরগির পেটে চরস পেয়েছিল পুলিশ।

তবে গীতার ব্যাপারে আমার একটা নিজস্ব মত আছে। মরণের পর মানুষের আর অশুভ গীতায় কাজ কি? শুধু রাইটার, এডিটর, প্রিন্টার, প্রিন্টারের নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর, এডিসন, কপিরাইট, রিটেল প্রাইস ও কাকে উৎসর্গ করা হয়েছে—এইটুকু জানা বাকি রয়ে যায়। শ্রাদ্ধের গীতায় সেইটুকু দেওয়া থাকে। স্বর্গযাত্রাপথে টাইমপাস করে নাও।

মানুষ মৃত্যুর পরেই ইকো-ফ্রেন্ডলি হয়। জীবদ্দশায় এনিমি। বনভোজনে গিয়ে আস্ত একটা বন কেটে উনুনে গুঁজে দিল। যাবার পথে নার্সিং হোমের এক হার্ট পেশেন্টের দফারফা করে গেল। ম্যাটাডোরে হাশুইকর নশ ওয়াটের

হাই-ফাই বস্ত্র ধরে যাচ্ছিল। মাঝপথে আচমকা সেই বস্ত্র বেজে উঠতেই সে চলন্ত ম্যাটাডোর থেকে লাফিয়ে পড়ল। আর নশ ওয়াট হার্টের পক্ষে অনেক। পথে সেই আওয়াজে কত গোয়ালার গরু দড়ি ছিড়ে পালিয়ে গেল।

নদীর ধারে পিকনিক হলে নদী ভয়ে মরে। যে কোনো মুহূর্তে একদল পুরুষ জামা-কাপড় খুলে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে তার বুক। মহিলারা আরো সাংঘাতিক। ‘একটু ঘুরে আসি’ বলে পাড ধরে মোহনার দিকে কিছুটা হেঁটে গিয়ে পাতা পর্যন্ত জলে দাঁড়িয়ে পাখি দেখতে দেখতে হালকা হয়ে গেল। ও জায়গায় মাছেদের সারাদিন কার্যু লেগে গেল। শুটু অ্যাট সাইট। মহিলার

কবরের মাটিতে আফিমের চাষ ভালো হয়। আমেরিকানদের দৌলতে ভিয়েতনামের আশিভাগ আফিম।

বি-কোলাই থাকলে তো আর দেখতে হবে না। ইলিশের ঝাঁক অন্ধ হয়ে গেল। পাইকারি বাজারে আগুন লেগে গেল। মৎস্যমন্ত্রী একবার বলেছিলেন, গদার ধারে পিকনিক বন্ধ না করলে বাজারে ইলিশ পাওয়া যাবে না।

এইভাবে এক বর্গমাইল জমিতে মালের বোতল ছড়িয়ে পিকনিক শেষ হল। কৃষিজমি আবগারী দপ্তরের অধীনে চলে গেল। দুকো ঘাস ছাড়া কিছু ঐ শতাব্দীতে চাষ করা যাবে না দেখানো। এই মানুষই যেই থেমে গেল অমনি পরিবেশ-বন্ধ। ওয়ার্ডে পড়ে থাকা রেলকামরা। কামরার মধ্যে সবুজ ঘাস গজাল। দু’চারটে ছাগল, চড়াই, আমার মতো ছিন্নমূল ঢুকতে বেরোতে লাগল। ভাড়া জানালায় শিশির ঝরে ঝরণা হল। চাকার চারপাশে কাশফুল হল। বুড়ো হলে অনেকের কানের পাশে ফুরফুরে চুল হয়। মানুষ থেমে গেলেও চুল ওড়ে। লোকজন সব এসে পড়লে চ্যাংদোলা করে ঘাটে কিম্বা বাস্কে। উত্তর পুরুষেরা গামছা বেঁধে কালপুরুষের চারপাশে এসে দাঁড়াবে। যাদের পাওনা বাকি বয়ে গেল তারা দেখতে আসবে। যারা দু’চক্ষে দেখতে পারত না তারা দেখতে আসবে। রামচন্দ্র লঙ্কা ছাড়ছে। পড়ে থাকছে হনুমানের দল। চারপাশে সবাই দাঁড়িয়ে, মিলখা সিং তখন ওয়ে। টা-টা বাই-বাই। যাই, এবার সার হয়ে যাই। কবরের মাটিতে আফিমের চাষ ভালো হয়। আমেরিকানদের দৌলতে ভিয়েতনামের আশিভাগ আফিম। মানুষ-পোড়া ছাই গায়ে মাখলে মুখ্যমন্ত্রী হওয়া যায়। মোদী-লাইন।



মারায়ণ

পিনাকীশঙ্কর চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশিত-র পর)

কথারস্তু

আদিকাণ্ড—১

দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গে।

ত্রিভুবন তারিণী তরল তরঙ্গে।।

—বান্দীকি নয়

পুণ্যভূমি হিন্দুস্তানের তিনদিকে জল একদিকে
বরফ। বরফের দিকটা উঁচু, জলের দিকটা নিচু।

দেশটা হাতি থেকে মশা, হাজারো মাপের প্রাণীতে
ভর্তি। হাতির চেয়েও বড় ডাইনোসর, ম্যামথ
জাতীয় কোনো প্রাণী এই হিন্দুস্তানে ছিল কিনা
জানা নেই, তবে এখন যে নেই সেটা নিশ্চিত।
ইয়েতি নামের এক বিশালকায় প্রাণীর কথা কেউ
কেউ বলে। কিন্তু সে প্রাণীটিকে আজ পর্যন্ত কেউ
চোখে দেখেনি। তাই প্রমাণের অভাবে সেটা

খারিজ।

আর অ্যানাকোণ্ডা? ওটা তো দক্ষিণ
আমেরিকার প্রাণী। অবশ্য দক্ষিণ আমেরিকার
একেবারে নিজস্ব নয়। ওইরকম একটা বিশালকায়
সামুদ্রিক সাপ নাকি হিন্দুস্তানের পাশের দেশ
সিংহলেও পাওয়া যেত। অ্যানাকোণ্ডা নামটাও
সিংহলী ভাষার 'হেনা কাণ্ডাইয়া' থেকেই এসেছে।
সিংহলী ভাষায় 'হেনা' মানে বিদ্যুৎ আর 'কাণ্ডা'
মানে গাছের গুঁড়ি। অর্থাৎ এমন একটা প্রাণী যার
দেহটা গাছের গুঁড়ির মতো মোটা আর শক্ত অথচ
আক্রমণের সময় বিদ্যুৎ গতিতে ছোবল মারে।

হিন্দুস্তানে যারা আছে তারা সবাই কেউ
জীব। তার মধ্যে মানুষও একটি। কেউ কৃপাতেই
বেঁচে বর্তে আছে, দুঃখে সুখে কাটাচ্ছে আর মহানন্দে
বংশ বৃদ্ধি করে চলেছে। আনন্দাঙ্কেব খস্মানি
ভূতানি জায়ন্তে। মানুষ নামের ভূতগুলি নাকি
আনন্দেই জন্মায়। তবে জন্মানোর আনন্দের চেয়ে
জন্মানোর আনন্দ অনেক বেশি। সে আনন্দ বলে
বোঝানো যায় না। নিজে নিজে বুঝতে হয়।
হিন্দুস্তানের মানুষ সেই আনন্দে সদাই আস্বাস্তার।

হিন্দুস্তানের পশুদের তুলনায় মানুষদের একটা ঘাটিতি আছে। মানুষের মধ্যে পশুসুলভ শালীনতার বড়ই অভাব। এতই অভাব যে ভিন্ন লিঙ্গের বিশ্বরূপ দর্শনে যাতে পথেঘাটেই কোনো কেলেঙ্কারি না বেধে যায় সেইজন্যে সবাই নিজের নিজের দেহকে বস্তায় পুরে ঢেকে রাখে। বস্তার আর এক নাম পোশাক। জিনিসটার নাম পোশাক, এই জন্যেই হয়েছে যে এটি আকৃতিতে, এবং সেই সঙ্গে প্রবৃত্তিকেও পোষ মানিয়ে রাখে। 'পোষ' এর সঙ্গে আকৃতির 'আক' যোগ করে হয়েছে পোশাক। মানুষ পোশাক মুক্ত হয়ে রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়ালে চারদিকে যে তাণ্ডব গুরু হয়ে যাবে সে অবস্থার কথা ভাবাই যায় না। হিন্দুস্তানের জীবনের মধ্যে মানুষই একমাত্র প্রজাতি যাদের তাণ্ডব বন্ধ করার জন্যে পোশাকের দরকার হয়।

আর ওই পোশাক দিয়েই হয় মানুষের মূল্য বিচার। যার পোশাক যত দামি—লব্ধশাট পটাবৃত— সে তত মানী লোক। অবশ্য পণ্ডিতরা এইসঙ্গে একটা উপদেশও দিয়ে গেছেন—নীবি মোক্ষণ কালে তু বস্ত্রমৌল বিচিস্তকা। যত মূল্যবানই হোক, উন্মোচন কালে বস্ত্রের মূল্য নিয়ে মাথা ঘামাবে না। তাতে কাজকর্মের আনন্দ চোট খেয়ে যাবে। খুবই কাজের কথা।

এ ছাড়া পশুদের সঙ্গে মানুষের আরো একটা তফাৎ আছে। পশুরা অকারণে হিংসা করে না। মানুষ কিন্তু বনের মধ্যে খেয়ে গিয়ে পশুবধ করে আসে।

সিংহ ব্যায় বরাহাণ্য মন্তান্য নদতাং বনে

হস্তারো নিশিতৈঃ শব্দৈর্বলাদ্বাহ বলৈরপি।।—বাস্তবিক

বাঘ সিংহ নিজের মতো করে বনের মধ্যে আছে। দৌড়ে গিয়ে তাদেরকে মারার তোমার কী দরকার পড়ল বাপা? না, বীরত্ব প্রদর্শন। যে যত পশু বধ করতে পারে সে তত বড় বীর। আর ওই একই ভাবের ঘোরে ভাবাকুল হয়ে মনুষ্য সমাজে নিত্য মারামারি খেয়োখেয়ি।

প্রেরণাটা জন্মসূত্রে পাওয়া। মানবশিশুই একমাত্র শিশু যে ভূমিষ্ঠ হবার সময় হাত মুঠো করে যুদ্ধের ভঙ্গিতে বেরিয়ে আসে। অন্য কোনো প্রাণীই এ রকম ঘুমি পাকিয়ে জন্মায় না। জন্মাবার পরেই শুরু হয় একটি মানব শিশুর চিৎকার, রণ-ছন্দার। আর চিৎ হয়ে থাকা অবস্থাতেই লাগি ছুঁড়ে ঘুমি মেরে বাতাসের সঙ্গে যুদ্ধ। যাকে বলে মারামারির হাড্ডেখড়ি।

জীবন মানেই জীবন যুদ্ধ। মারামারির এক প্রকাশ কাণ্ড। শুধু কি তাই? মানুষই একমাত্র প্রাণী যারা ভালোবাসতে, প্রেম করতেও যুদ্ধের ভঙ্গিতে দু'জন দু'দিকে মুখ করে থাকে। একজন পুংমুখো তো অন্যজন পশ্চিমমুখো। একজন পৃথিবীমুখো তো অন্যজন আকাশমুখী। অন্যান্য সব পশুপাখিরাই এ অবস্থায় একই দিকে মুখ করে থাকে।

মারামারি করে বেঁচে থাকা, মারামারি করতে করতেই মরা। মরার পরেও মানুষ মারামারি করে কিনা তার কোনো প্রমাণসিদ্ধ তথ্য আমাদের হাতে নেই। কেউ কেউ বলে নরকে গিয়ে তারা যমদূতদের হাতে বেদম মার খায়। অন্যেরা বলে মৃত হয়ে তারা নিজেদের মধ্যে বেদম মারামারি করে। কেউই কোনো প্রমাণ দেখাতে পারেনি। তবে ভূতের মারামারি নিয়ে এত গল্প লেখা হয়েছে যে, অবিশ্বাস করাই মুস্তিল।

এ হেন মারকাটার দেশ হিন্দুস্তানের সীমান্তোহদ্বি কি? আজকাল কোনো দেশের সীমান্তোহদ্বি নিয়ে মাথা ঘামানোটা মাথার পক্ষে মোটেই নিরাপদ নয়। যে কোনো মুহূর্তে সীমান্তরক্ষী সৈন্যদের গোলাগুলির ঘায়ে ছাত্ত হয়ে যেতে পারে। তবে সবদিক বাঁচিয়ে একটি নির্দোষ ইস্কুল-ছাত্রের সরল ভাষায় বলে দেওয়া যায়—পূবে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে আরব সাগর আর অন্তরঙ্গস্যং দিশি দেবতান্মা হিমালয়, নাম নগাধিরাজ। তবে এঁদের একটা করা যেতেই পারে। পুরাণকারদের দেওয়া তথ্য মেনে যদি বলা যায়

যে বিষ্ণুচক্রের ছিন্নভিন্ন সতীর দেহাংশ যে একাঘটি পাঠস্থানে পড়ে সেগুলিকে তীর্থে পরিণত করেছে সেই স্থানগুলি সবই হিন্দুস্তানের অংশ তবে তো পাকিস্তান শ্রীলঙ্কা নেপাল বাংলাদেশ এমনকি তিব্বতও হিন্দুস্তানের অংশ বলে প্রমাণ হয়ে যাবে।

এটা অবশ্য খুবই সর্বনেশে কথা। ওইসব দেশের সরকাররা শুনলে ফাঁসি দিয়ে দেবে। তখন আর কলমজীবীর কলম তাকে রক্ষা করতে পারবে না। তা সে যতই বলা হোক না কেন, পেন ইন্স মাইটিয়ার দ্যান সোর্ড। ওই কথাটা শুধু কলমধারীরাই বলে, সোর্ডধারীরা কেউ স্বীকার করে না।

এ হেন হিন্দুস্তানের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছেন পুণ্যতোয়া গঙ্গাদেবী। সবাই জানে দেশটার নাম যে হিন্দুস্তান হয়েছে তার পেছনে গঙ্গাদেবীর এতটুকুও অবদান নেই। যার অবদান একশ ভাগ তিনি হলেন সিদ্ধনন্দ, পিতৃদেব। তিনি নাম দিয়েই খালাস। এখন দেশটাকে তার পীযুষধারায় বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব মা গঙ্গার।

মা গঙ্গা বয়ে চলেছেন তো চলেইছেন। গান করতে করতে গমন করেন বলেই তো ওঁর নাম গঙ্গা। সেই গমন শুরু হয়েছিল সত্যযুগে। আজও সমানে চলেছে।

সত্যযুগে হিন্দুস্তানে আসার আগে মা গঙ্গা ঘুমিয়েছিলেন ব্রহ্মার কমণ্ডলুর মধ্যে। ঘুম ভাঙল রিমোট কন্ট্রোলে চালান করা ভগীরথের কাচুকু খেয়ে।

যে গঙ্গাজলের ছোঁয়ায় আগে পুণ্যাত্মা থেকে দুরাত্মা সবাই পবিত্র হয়ে যেত, সেই জলে স্নান করলে এখন কলেরা অবধারিত। গঙ্গাজল পেটে গেলে এখন আর মারুতি চেপে স্বর্গে যাওয়া হয় না, খাটিয়া চেপে শ্মশানে যেতে হয়।

পুরাকালে আমাদের দেশের মুনি-ঋষিরা যে মন্ত্র আর তন্ত্র ব্যবহার করতেন সেটা আসলে ওই রিমোট কন্ট্রোল কথাটারই সংক্ষিপ্ত রূপ। মন্ত্র আর তন্ত্র কথাদুটো লুকিয়ে আছে ওই রিমোট কন্ট্রোল কথাটার ভেতরেই। শুধু আড়াল এইটুকুই যে ইংরেজিতে যেটা 'ট' বাংলা সংস্কৃতে সেটা 'ত'। ইংরেজি বর্ণমালায় 'ত' নেই। ওই রিমোট কন্ট্রোল মন্ত্র আর তন্ত্র দিয়ে একালে মুনি-ঋষিরা অনেক সব রোমহর্ষক কাণ্ড ঘটিয়ে দিতেন। ভগীরথের তপস্যার মন্ত্রও ছিল ওইরকম একটি রিমোট কন্ট্রোল যা দিয়ে তিনি মা গঙ্গার ঘুম ভাঙিয়েছিলেন।

ঘুম থেকে জেগে উঠে মা গঙ্গা শিবের মাখায় পা দিয়ে হিন্দুস্তানে নেমে এলেন। আর নেমে এসেই আর এক বিপত্তি।

মা গঙ্গা তো একজন দেবী। সব দেব-দেবীরই বাহন থাকে। সত্যি বলতে কি দেব-দেবীদের বাহন দিয়েই চেনা যায়। বাহনের পরিচয়তে দেবাঃ। নইলে আর কে কাকে চেনে। বাহনটি সঙ্গে না থাকলে মানুষ তাদের দেবতা বলে পূজবেই না। কার্তিক আর বিশ্বকর্মা, একজনকে চেনা যায় ময়ুর দিয়ে অন্য জনকে হাতি দিয়ে। ওই দুটি না থাকলে দু'জনেই সমান। শুধু কি তাই? ময়ুর ছাড়া কার্তিক আর হাতি ছাড়া বিশ্বকর্মা একবার অফিস টাইমে কলকাতার বাসে চেপে দেখুক তো কী হাল হয়? চারবার কনুইয়ের গুতো, তিনবার লাড্ড, দু'বার কণ্ঠস্বরের খোঁচা, আর মাত্র একবার—ওই একবারই যথেষ্ট—পকেটের মানিব্যাগ সাফ। ওঁরা তো এ যুগের বাবুদের মতো সেলাই করা প্যান্ট-জামা পরেন না, পরনে থাকে গিটি মারা ধুতি। সুতরাং বাস থেকে

নামার সময় শ্বেফ ট্রেলদস্যমী।

প্যাচা ছাড়া লক্ষ্মী আর রাজহাঁস ছাড়া সরস্বতীর তো হবে আরো দূরবস্থা। ওঁরা হলেন দেবী, মা জননী। দূরবস্থার চোদ অবস্থার বর্ণনাগুলো লিখতে বড়ই লজ্জা করছে। কলকাতার রাস্তাঘাটে ধর্মের ঘোড়ের মতো ঘুরতে থাকা রোমিওদের হাতে এ যুগের বাহনছাড়া লক্ষ্মী-সরস্বতীদের কী দূরবস্থা হতে পারে সেটা খবরের কাগজ পড়া পাঠক-পাঠিকারা নিজেরাই কল্পনা করে নিন।

ওদিকে আবার বাহন ছাড়া মা শীতলাকে দেখলে যে চ্যাংড়াটি বুড়ি-হাবড়ি বলে বক দেখাবে সেই চ্যাংড়াই সঙ্গের ওই গাখাটিকে দেখতে পাবার সঙ্গে সঙ্গে সাতবার জিব কেটে আটবার দন্তী কেটে পঞ্চাশবার মাথা কুটে অস্থির হয়ে যাবে।

মর্ত্যে নেমে এসেই মা গঙ্গার চোখ খুলে গেল। আঁধার জুড়লেন—
← তাঁরও একটি বাহন চাই। বাহন না পেলে পাদমেকং ন গচ্ছামি।

গঙ্গাব আঁধার গুনে সৃষ্টিকর্তা বড়ো ব্রহ্মার মাধ্যম হাত। তাঁর স্টকে যত জীবজন্তু ছিল সবই এক-একটি দেবতাকে বাহন হিসেবে বিলিয়ে দিয়েছেন। এখন এই বড়ো বয়সে নতুন করে ছেনি-হাডুড়ি নিয়ে বসেন কী করে? চোখে ছানি, হাত কাঁপে, কানে শোনেন কম। মাথটাও ঠিকমতো কাজ করে না। এই অবস্থায় যা তৈরি করবেন সে তো প্রাণ পেয়ে উন্টে তাঁকেই মারতে আসবে। ব্রহ্মার হল বিরাট সম্ভট।

একবার ভাবলেন ভগীরথকেই গঙ্গার বাহন করে দেবেন। কিন্তু পরে ভবিষ্যৎ চিন্তা করে পিছিয়ে গেলেন। ভগীরথ তো মানুষ। মানুষ যা ঘোড়ল জাত। বাহন হতে বললেই মাইনে চাইবে। তার সঙ্গে বোলাস, ইনক্রিমেন্ট এল টি সি, লীড এনক্যাশমেন্ট, হাজারটা দাবী। সেসব না পেলেই স্ট্রাইক, ঘেরাও, প্রোগান—নানা ফৈজত। আর সবার উপরে আছে ট্রেড ইউনিয়ন। ওরা তো ট্রেড ইউনিয়ন-ছাড়া বাঁচতে পারে না। কাজকর্ম সব চুলোয় যাক, এমনকি কোম্পানি নিজেই লাটে উঠে যাক, কিন্তু ইউনিয়নটি চাই। সৃষ্টির শেষদিন পর্যন্ত ইউনিয়ন চলতেই থাকবে। এত বন্ধি ব্রহ্মার সহিবে না। শেষে অনেক ভেবেচিন্তে তিনি গঙ্গার বাহন করে দিলেন মকরকে।

মকর। সেটা আবার কি জীব রে বাবা? না হাঙর, না কুমির, না শুণ্ডক, না তিমি। সবগুলো থেকেই একটু একটু করে নিয়ে এই মকর।

মকর নামটাও তৈরি হয়েছে ওইসব নামগুলো থেকে একটু একটু করে ধার নিয়ে। কুমির আর তিমির ‘ম’, শুণ্ডক আর কুমিরের ‘ক’, হাঙর আর কুমিরের ‘র’—এই নিয়ে মকর। এখানে জলহন্তীর কোনো অবদান নেই। জলহন্তী হিন্দুস্তানের জীবও নয়।

মকর এমন একটি জীব যার কোনো প্রজাতি নেই। বিশ্বভূমণ্ডলে সাকুল্যে ওই একটি। গঙ্গার বাহন। তবে তাতে সম্মানের কোনো হানি হয়নি। কার সম্মান বলুন তো? গঙ্গাদেবীর সম্মানের কথা হচ্ছে না, হচ্ছে মকরের সম্মানের কথা। মকর স্থান পেয়েছেন স্বয়ং কামদেবের পতাকার মধ্যে। আর সেই আনন্দে কামদেব নাম নিয়েছেন মকরকেতন।

শুধু কি তাই? সত্য হ্রোতা পার হয়ে ছাপরে এসে যখন ভগবান নিজে কৃষ্ণ রূপে অবতীর্ণ হলেন তখন নিজের বিভূতি বর্ণনার সময় বলে দিলেন—
← ঋষাণাং মকরশ্চামি। জলচর জীবদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল মকর এবং আমিই সেই মকর। স্বয়ং কৃষ্ণ যাকে শ্রেষ্ঠ বলেন তার শ্রেষ্ঠত্ব তো অবিসংবাদী।
” এহ বাহ্য। মকরকে সম্মানে জায়গা দেওয়া হয়েছে রাশিমাণ্ডলের দশম স্থানে। রাশিচক্রের ক্রিকেট টিমের দশ নম্বর ঠাইটা মকরের জন্যে বাঁধা। এইট ডাউনে ব্যাট করতে নামেন ঠিকই কিন্তু ছাদশ খেলোয়াড় হিসেবে মাঠে জঙ্গ বইতে হয় না। জঙ্গ বইবার জন্যে আছে ছাদশ খেলোয়াড় মীণ। জলের

মধ্যেই থাকে। ক্রমাগত মুখ দিয়ে জল ঢোকাচ্ছে আর কানকো দিয়ে ছাড়ছে। এদিকে মকরের ব্যাটিংয়ের সময়ে মাঠে যদি জল আসে তবে তো শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা। যদি বর্ষে মকরে ধান হবে টেকরে। কিংবা যদি বর্ষে মাঘের শেষ খন্য রাজার পুণ্য দেশ। (খনা)।

এ হেন মকরকে বাহন করে গঙ্গাদেবী মর্ত্যে এসেছিলেন একটি মহৎ কর্ম সম্পাদন করার জন্যে। সেটি হল, সগর রাজার ষাট হাজার ছেলেকে উদ্ধার। পাতালে কপিলমুনির আশ্রমে ঘোড়াচোর ধরতে গিয়ে সেই ষাট হাজার রাজপুত্র কপিলের চোখের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে ওখানেই পড়েছিল। কথা ছিল একমাত্র গঙ্গাদেবীর স্পর্শ পেলে তবেই তাঁরা উদ্ধার পাবেন।

ব্রহ্মার কমণ্ডলুর মধ্যে থেকে গঙ্গাকে বার করে আনার জন্যে ওই ষাট হাজার রাজপুত্রের একমাত্র ভাইপো অংগুমান আর তার ছেলে দিলীপ অনেক চেষ্টাচরিত্র করলেন কিন্তু কেউই গঙ্গাকে আনতে পারলেন না। শেষে দিলীপের ছেলে ভগীরথ বহু পরিশ্রম করে গঙ্গাকে নিয়ে এসে তাঁর বাপের ষাট হাজার ঠাকুর্দাকে উদ্ধার করলেন।

ভগীরথের জবাব নেই। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ইঞ্জিনিয়ার। সেই কোন গঙ্গোদ্রী থেকে এতবড় এক বিশাল জলধারাকে তামাম হিন্দুস্তানের ওপর দিয়ে বইয়ে এনে একেবারে বঙ্গোপসাগরে ফেললেন। এ কি কম কৃতিত্বের কথা? আর হবে নাই বা কেন? ভগীরথ নিজে কি সেটা তো দেখতে হবে। উনি তো কোনো সাধারণ মানুষ ছিলেন না। হিন্দুস্তানের কোটি কোটি মানুষ জন্মেছে এবং জন্মাবে তাদের বাবার ওরসে মায়ের গর্ভে। অর্থাৎ প্রক্রিয়াটা সবার জন্যে ওই একই। পিতামাতার যৌথ উত্তরাধিকার। ভগীরথই একমাত্র, যার বেলায় ওই পৈতৃক সম্পত্তির বালাই ছিল না।

বাবা দিলীপ যখন মারা যান ভগীরথ তখন তার দুই মায়ের কারো গর্ভেই এসে পৌঁছননি। সেই অবস্থাতেই দিলীপের দুই রানী বিধবা হলেন। সর্বনাশ। এখন বংশরক্ষা হবে কী করে? অনেক ভাবনা-চিন্তা করে ওঁদের কুলগুরু দুই বিধবা রানীকে নিজেদের মধ্যে সেই কাজটি করতে বললেন, যেটা তাঁরা দিলীপের সঙ্গে করতেন।

আর সেই কর্মের ফলশ্রুতিতে জন্ম হল ভগীরথের।

দৌহাতে জানিল যদি দৌহার সম্ভর্ড।

দৌহে কেলি করিতে একের হৈল গর্ভ।।

—কৃষ্ণিবাস।

আর ভগে ভগে ঘর্ষণ জনিত এই অদ্ভুত প্রক্রিয়ায় জন্ম নেওয়াটাকে স্মরণীয় করে রাখবার জন্যেই পুত্রটির নাম দেওয়া হল ভগীরথ।

ভগে ভগে জন্মহেতু ভগীরথ নাম।

সূর্য বংশে জন্ম তব অযোধ্যায় ধাম।।

—কৃষ্ণিবাস।

হিন্দুস্তানে সবাই হয় বাপের ছেলে। ভগীরথ হল তাঁর সম্মানের ছেলে। সে যুগের কুলগুরুরা ধর্মশাস্ত্র পড়তেন। যাগ-যজ্ঞ তপ-তপস্যা করতেন। চিকিৎসা-শাস্ত্র পড়তেন বলে জানা নেই। কিন্তু কী ধুরন্ধর ব্যবহারিক বুদ্ধি। কত অনায়াসে পিতার সাহায্য না নিয়ে সম্ভ্রান উৎপাদনের মতো একটি কঠিনতম কর্মের সহজতম উপায়টি বাতলে দিলেন।

এ ব্যাপারটা অবশ্য সম্ভব হয়েছিল যুগটা সত্যযুগ বলেই। এযুগে হলো? অপরাধ নেবেন না, আমাদের পাপী মন বড় সম্ভেদ-প্রবণ, এযুগে হলো কি জানি হয়ত ওই কুলগুরুটি লুকিয়ে লুকিয়ে ওই পৈতৃক সম্পত্তি যোগান দেবার ভার নিজেই নিয়ে নিতেন। তোবা তোবা।

তা সে যাই হোক সত্যযুগে মা গঙ্গা তাঁর কাজটি ভালোই উত্তরে দিয়েছিলেন। তিনি এসে স্পর্শ করা মাত্রই ছাই হয়ে পড়ে থাকা সেই ঘাঁট হাজার সগরপুত্র জেগে উঠে চোখ কচলাতে কচলাতে মারুতিতে চেপে ড্যাং ড্যাং করে স্বর্গে চলে গেল।

পাঠক-পাঠিকারা ভুল বুঝবেন না। সে মারুতি এ মারুতি নয়। সেটা ছিল সত্যযুগের মারুতি। মরুৎ অর্থাৎ স্বয়ং পবনদেবের পুত্র বীর হনুমান বজ্ররঙ্গবলী। সে মারুতির পিঠে চাপলে সাঁই সাঁই করে আকাশপথে উড়ে যাওয়া যেত। স্বর্গে গিয়ে পৌঁছনো এক তুড়ির ওয়াস্তা। আর আজকালকার মারুতি চেপে 'কলকোটা খিকে বদমান' যেতে একবার কয়েল বদলাতে হয়, দু'বার টায়ার বদলাতে হয়, তিনবার জল বদলাতে হয় আর গীয়ার বদলের সংখ্যা তো অগুণতি।

তবে হ্যাঁ এ যুগেও মারুতি চেপে স্বর্গে যাওয়া যায়। সেটা কিরকম? জায়গাটা যদি কলকাতা হয়, আশেপাশে যদি রেবারেঘি করে বাস চালানো কিছু এঁড়েমার্কী ড্রাইভার থাকে, আর ভাগ্যদোষে যদি তোমার মারুতিটি সেই দু'জনের মধ্যে পড়ে যায় তবে অতি সহজেই স্বর্গে চলে যাওয়া যাবে ওদেরই কোনো একটা বাসের চাকর ভাড়া দিয়ে। ভায়া সরকারি হাসাপাতাল।

একবার ভাবলেন ভগীরথকেই গঙ্গার বাহন করে দেবেন। কিন্তু পরে ভবিষ্যৎ চিন্তা করে পিছিয়ে গেলেন। ভগীরথ তো মানুষ। মানুষ যা ঘোড়েল জাত! বাহন হতে বললেই মইনে চাইবে।

মা গঙ্গা তাঁর কাজটা ভালোভাবে উত্তরে দিয়ে বেশ বহাল তবিয়েই ছিলেন। হিন্দুস্তানের কাদার ওপর চিঠি হয়ে শুয়ে আকাশের মেঘ-নক্ষত্র চাঁদ-সূর্য দেখতে দেখতে সত্য ত্রেতা দ্বাপর তিনটে যুগ কাটিয়ে দিলেন। এর মধ্যে কোনো ঋক্সট-ঝামেলা হয়নি। সন্তানরা বেশ ভক্তিশ্রদ্ধা করে। ফুল চড়িয়ে পুজো দেয়। লম্বা লম্বা সংস্কৃত শ্লোক আউড়ে মায়ের গুণগান করে। পুণ্যাত্মারা মায়ের জলে অবগাহন করে তাঁদের পুণ্যের পরিমাণটা বাড়িয়ে নেন। আর পাণী-তাপীরা তো সংখ্যায় কম, তাদের দু'চারটেকে উদ্ধার করে স্বর্গে পাঠিয়ে দিতে মায়ের কোনো কষ্টই হয় না।

মা গঙ্গা ভেবেছিলেন এইরকম করে কলিযুগটাও কাটিয়ে দেবেন। তারপর মহাপ্রলয়ের দিনে পাততাড়ি গুটিয়ে স্বর্গে নিজের জন্মগায় ফিরে গেলেই হবে। কিন্তু সেটি হবার আগে কলিযুগে এসেই মা গঙ্গার মাথায় হাত। তিনি এতদিন সন্তানদের আপন পীষ্মধারায় বাঁচিয়ে রেখেছেন। তাদের জীবনকে ধনধান্য ফুল-ফলে ভরিয়ে দিয়েছেন। সন্তানকে সুখী দেখলে কোন মায়ের না আনন্দ হয়। আপনার সবটুকু অক্লেশে দান করে দিয়ে মা গঙ্গা তাঁর সন্তানদের সুখ-সমৃদ্ধি দেখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সন্তানদেরও যে মাকে এত কিছু দেবার থাকতে পারে সেটা এতদিন বোঝা যায়নি। বোঝা গেল কলিযুগে এসে। একেবারে হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে ছাড়ছে।

কলিযুগে হিন্দুস্তানের সন্তানরা মা গঙ্গাকে কী না দিচ্ছে? দৈনন্দিন প্রাতঃকালীন দেহবর্জ্য তো আছেই, সেইসঙ্গে যত রাজ্যের মরাপটা জন্তু-জানোয়ারের লাশ, নগর-কন্দরের নর্দমার সারাৎসার, কারখানার হাজার ধরনের বর্জ্য পদার্থ। কী নেই তার মধ্যে? কলেরা থেকে হেপাটাইটিস, সবরকমের রোগের বীজানু কিলবিল করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ত্রস্তা গঙ্গাকে মর্ত্যে পাঠিয়েছিলেন পাপ নাশ করার ভার দিয়ে। গঙ্গাও জানতেন সেটাই তাঁর কাজ। কিন্তু কলিযুগে হিন্দুস্তানিরা গঙ্গাকে

লাগাল আবর্জনা পরিষ্কার করার কাজে।

সন্তানদের এইসব কাজ-কারবার চোখ মেলে দেখা আর মুখ বুজে সম্মে যাওয়া ছাড়া মা গঙ্গার আর কী করার থাকতে পারে? অনেক বয়স হয়েছে। মা বুড়ি হয়ে গেছেন। তবু সেই বুড়ো বেতো শরীর নিয়েই সন্তানদের দান করা যাবৎ দূষিত পদার্থ টেনে টেনে সাগরে নিয়ে গিয়ে ফেলাছেন। সাগরও যে তার সবটা খাচ্ছে তা নয়। জোয়ারের ধাক্কা দিয়ে কিছু কিছু উল্টে মা গঙ্গাকেই ফিরিয়ে দিচ্ছে। এ সবের ফলটা কি হচ্ছে? মা গঙ্গার, বিশেষ করে ভাটিগঙ্গার ময়লা আর সাফ হয় না। যে গঙ্গাজলের ছোঁয়ায় আগে পুণ্যাত্মা থেকে দুরাত্মা সবাই পবিত্র হয়ে যেত, সেই জলে স্নান করলে এখন কলেরা অবধারিত। গঙ্গাজল পেটে গেলে এখন আর মারুতি চেপে স্বর্গে যাওয়া হয় না, খাটিয়া চেপে ঋশানে যেতে হয়। সেখান থেকে আবার কোথায় যেতে হয় সেটা মা গঙ্গাও জানেন না।

শুধু গঙ্গাই নয়, কলিযুগে পুণ্যভূমি হিন্দুস্তানে সব নদীরই ওই একই দুরবস্থা। সেই রকমই একটি নদী সরযু, আমাদের কাহিনীর পটভূমি।

ওশে গৌরবে সরযুও কিছু কম যান না। মানস সরোবর থেকে বেরিয়ে এসেছেন তাই নাম। সরযু রামায়ণকালের বর্ণনা মতে, এত যোজন বিস্তার তত যোজন প্রসার। দুই তীরের বৃক্ষরাজি কী অপূর্ণ শোভাময়। যেন স্বর্গ-সূর্যমা মণ্ডিত। জলরাশি এতই প্রবল যে রামের মতো মহাবলশালী পুরুষও এ ব জলে ডুবে গিয়েছিলেন। শুধু কি তাই? এই সরযুর জলে দেহ ত্যাগ করে হাজার হাজার রাক্ষস বানর আর ভল্লুকেরা স্বর্গে চলে গেছেন।

তস্মিন্ যেহপি সমাপন্না ঋক্ষ বানর রাক্ষসাঃ।

তেহপি স্বর্গং প্রবিবিশুর্দেহান্মক্ষিপ্য চান্ডসি ॥

—বান্দীকি

তার মানে ত্রেতা যুগে গঙ্গাদেবীর মতো সরযুও মর্ত্যের প্রাণীকে স্বর্গে পাঠাবার ক্ষমতা ধরতেন।

এখন সে রামও নেই সে অযোধ্যাও নেই। সরযু এখন মরা গাও। তার জলে এখন বাচ্চারাও ডুবে মরবে না। দু'পারের সৌন্দর্য বলতে বৃক্ষরাজি নয়, দেহাতি মেয়েদের কাপড় কাচা আর গা রগড়ে স্নান করা। দৃশ্যটা সুন্দর বৈকি। গায়ে কাপড় না থাকলে সব যুবতীই সুন্দরী।

সে রামও নেই সে অযোধ্যাও নেই, ওটা একটা কথা। আগের দিনের মহিমা বোঝার জন্যে বুড়োরা বলে। সেটাও তারা বলে ওই রামায়ণকালের থেকে ধার করা কথা দিয়েই—অরণ্য ভূদেব পুরী সারথ্যে প্রতিভাতি মাম্ (বান্দীকি)। অযোধ্যা-পুরীটা ভূতের বাড়ি হয়ে গেছে। কিন্তু কথাটা সত্যি নয়। রাম না থাকতে পারে, কিন্তু তার জন্মস্থান আছে। সরযু নদী আছে, অযোধ্যাও আছে। শুধু আছে বললেই সবটুকু বলা হয় না। বেশ বহাল তবিয়েই আছে। একবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় হিন্দুস্তানের একশ কোটি লোক সবাই কোমর বেঁধে লেগে পড়েছে এই মারকাটারি কাণ্ডে। বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় পৃথিবীর লোকসংখ্যা ছিল সাড়ুল্যে তিনশ কোটি। তার মানে আজকের হিন্দুস্তানের রামজন্মভূমির মারকাটারিটি একটি বিশ্বযুদ্ধের তিন ডাগের একডাগ। কী সাংঘাতিক! এই মারকাটারি কাণ্ডে রম রম করে আছে। মার মার কাট কাট করে আছে। অনেক লোককে মরতে হয়েছে। আরো কত মরবে কে জানে। সে যুগে রত্নাকর মরা মরা বলতে বলতে রাম বলেছিল। এ যুগে আর রাম নয়, মনে হচ্ছে মরাতেই ফিরে যেতে হবে।

এই অযোধ্যাতেই আমাদের কাহিনীর যবনিকা উন্মোচন। বিশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এখানে বাস করতেন এক রাজাসাহেব। নাম দশরথ। তাঁকে দিয়েই এই কাহিনীর শুরু। (ক্রমশঃ)

জৈব হাদরা



হায় প্রেম

দেশের তামাম লোক তাঁকে পছন্দ করে প্রধানমন্ত্রীর কুর্সি দিলেও কোনো মেয়ে কিংবা মেয়ের বাপ তাঁকে আসৌ পছন্দ করেনি। বর হিঁসেবে। এবং এই বর্বরোচিত ব্যবহারে বড়ই ব্যথা পেয়েছেন অটলজি। চের দিন মনে মনে চেপে রেখেছিলেন চির-কৌমার্যের এই করুণ রহস্য। সপ্তপতি চিরকুটে কোনো এক অনুষ্ঠানে তাঁর এই করুণ হৃদয়চিহ্নখানি ধরা পড়েছে। তিনি অটল বলে কোনো মেয়েরই হৃদয় টলবে না তাঁর জন্মে। কত কবিতা—পঙ্কজম। সব প্রেম, সব রোমান্স, জলে গেছে। আর হৃদয়? চুপি চুপি জ্বলে গেছে। এই স্ববাদ পড়ার পর ষাটোর্ধ্ব রোমান্টিক তরুণীরা তাঁর দরজায় ভিড় জমিয়েছেন কিনা জানা যায়নি, তবে চিড় ধরেনি কোনো বিশ-বাইশের আধুনিকার মনে। চিড়ে ভেজেনি এসব কথা। প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় অবশ্য এমন মর্মস্পর্শী বিষয়ে আশ্চর্য রকম নীরব। “পাত্রী চাই” কলমে করে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হবে, জানানো হয়নি তাও।

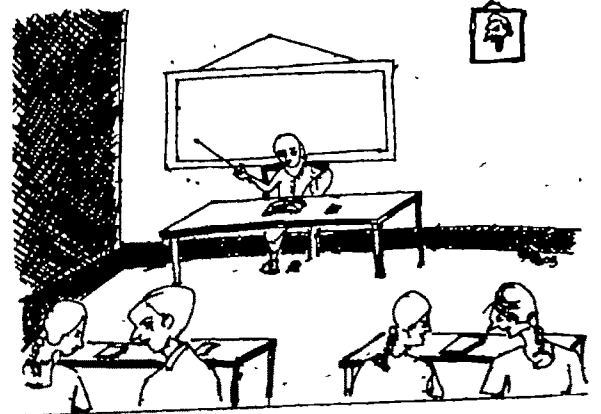
সার্সের মধ্যে ভূত

চীনে শুরু আবার পর জর্জ ফার্নান্ডেসকে আর কেউ চিনতেই চাইছে না। চীনের ‘সার্স’ নাকি চিলে চিলে তাঁর খাড়েই ভর করেছে। জর্জসাহেব যতই

বোঝাচ্ছেন যে তাঁর সার্সের কাহিনীটা নিতান্তই ফার্স, ততই লোকে তাঁকে দেখলেই গা ঢাক দিচ্ছে। এমনকি দপ্তরের লোকজন। নাপিত নাকি মাড়ি কামাতে চাইছে না, খোপা কাপড় কাচতে চাইছে না। ডাক্তারি সার্টিফিকেটে প্রত্যয় না হোক, এ কথাটা তো বোঝা উচিত মানুষের যে, সার্সের মধ্যে ভূতের দেশের একজন কর্তাব্যক্তি তিনি, সার্সের মধ্যের ভূত কোন সাহসে তাঁকে কামড়াবে? তার কি মরণের ভয় নেই? সার্সের ভূতের ভাইরাস তখনই ঢুকে পড়বে তার মধ্যে। সার্সের ভূত যদি বা ছাড়ে, সার্সের ভূত। একবার ধরলে ইহজন্মে আর নয়। পরজন্মে ছাড়ে কি না তাতেও ঘোর সংশয়।

আবিষ্কারক পার্টি অব ওয়েস্ট বেঙ্গল

পশ্চিমবঙ্গ মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির অনেক গুণ। তাঁদের নিত্য নতুন আবিষ্কারে মাঝে মাঝে কলহাস, ভাস্কো ডা গামা সঙ্গল বসেই দু’হাত দিয়ে মুখ ঢাকেন। অধ্যাপকদের মূল বেতন আই এ এস-দের সমতুল হওয়ার পর এঁরা কোনো এক সুন্দর প্রভাতে আবিষ্কার করে ফেললেন—অধ্যাপকরা নিতান্তই ফাঁকিবাঁজ, আদৌ পড়ান না। যেন এ তাবৎ যাবতীয় কৃতী ব্যক্তির কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় নয়, তাঁদের পার্টি হেড কোয়ার্টারের প্রশিক্ষণেই তৈরি হয়েছেন। এঁরা এ-ও আবিষ্কার করে ফেলেছেন যে একদা তাঁদের নেতাজি-মূল্যায়ণ ভুল ছিল। আবিষ্কারের শেষ সেই এঁদের। এঁদের ডিসকন্টারি চ্যানেল জানিয়েছে, রাজ্যের যাবতীয় অধ্যাপকন এবং বেকার সমস্যার মূল কারণ হল শিক্ষক-



অধ্যাপকদের টিউশন প্রবণতা, ক্লাশ না থাকলেও অধ্যাপকদের কলেজে বসে গুলতানি না করা ইত্যাদি ইত্যাদি। শিক্ষক-অধ্যাপকদের টিউশনি বন্ধ করে দিলেই ছাত্র-ছাত্রীর বাপ-মায়েরা অশুচি, অদক এবং অনভিজ্ঞ ডিম্বপ্রার্থী বেকার যুবক-যুবতীর কাছে আপন সন্তানকে টিউশন-বলির হাড়িকাঠে ধারণ করতঃ রাজ্যের বেকার সমস্যার আশুন কাশুন হাওয়ায় নিজেরে দেবেন। বলা বাহুল্য, তারপর থেকে রাজ্যে বেকার বলে আর কেউ নেই। যুব সম্প্রদায় এমন কামান কামাচ্ছে যে সরকারি চাকরিতেও আর কেউ আবেদন করছে না। কিস্তাবে প্রশাসন চলবে, ভেবে পার্টি-কর্তারা মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন। এঁদের নবতম আবিষ্কার—পঞ্চায়েত সদস্য বা প্রধান হলে প্রাথমিক শিক্ষকরা ইচ্ছলে বড়ই ফাঁকি দেন। ফলতঃ আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রাথমিক শিক্ষকরা কান্ডে হাতুড়ি তারা প্রতীকে আর খাড়া হতে পারবেন না। অবশ্য এম এল এ, এম পি-তে বাধা নেই। উচ্চ মার্গে তাঁদের মার্গ দর্শনই আলাদা। কাল মার্কস কটা কথাই বা বলে যেতে পেরেছেন তাঁর সীমিত জীবনে? বাকি সব কথা বলার ভার দিয়ে দেখছিলেন ৩১ নং (এবং পর পঞ্চায়েত ৩৩ নং) আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের বাবুদের ওপর। অবশ্য এ কথা শুনে কথা বন্ধ হয়ে গেছে মার্কসীয় প্রাথমিক শিক্ষকদের। এমন শিক্ষাও পেতে হবে তাঁদের, তা কি স্বপ্নেও জানতেন না। টিউশন-শ্যামও গেল, পঞ্চায়েত কুলও গেল, এখন 'অকুল দরিয়ার বৃকে কুল নাই রে'।

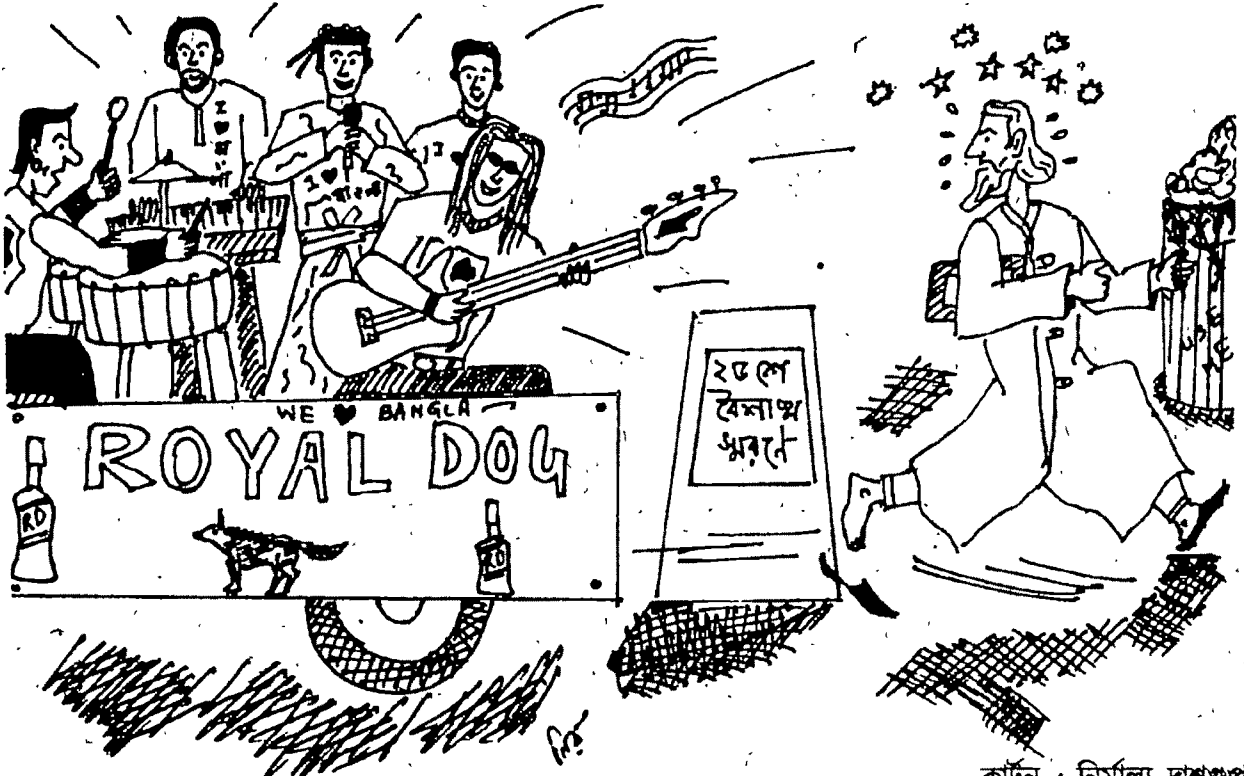
সদভাওনা-বদভাওনা



অটলবিহারীজি খুব সদভাওনা নিয়েই সেবারে পাকিস্তান যাত্রা করেছিলেন। বলা বাহুল্য, সেই বাস শেষে রূপান্তরিত হয়েছিল বাঁশে। তবু, 'একবার না পারিলে দেখ শতবার' জ্ঞাপে আর একবার যাওয়ার উজ্জ্বল করছেন। কিন্তু পাকিস্তানিরা এর মধ্যে খানিকটা বদভাওনার পঙ্ক পাচ্ছেন যেন। বিশেষত তাঁর আইবুড়ো-বুজুজ ফাঁস হওয়ার পর। কোনো পাকিস্তানি তরুণী তাঁর দুহুখে তাঁর ধেমাই পড়ে যেতে পারে—এমনই আশঙ্কা। শোনা যাচ্ছে, বিবাহযোগ্য কন্যাদের আবুজানেরা তাঁদের কন্যাদের আপাতত গৃহবন্দী রাখার কথা ভাবছেন।

ব্যতিক্রম আজাদ কাস্মীর। এখানকার সব নারীই নাকি এক-একটি মানব-বোমা। অটলজি সেখানেই উল্টোমুখে দৌড়োবেন। হাঁটুর ব্যাধা? আগে প্রাণ না আগে হাঁটু!

—পরস্ব সংবাদদাতা



কার্টুন : নির্মাণ্য দাশগুপ্ত

কপিরাইট : অপারেশন রবি ঠাকুর

গোপলা বোস

রবীন্দ্রনাথ প্রতি বছর পঁচিশে বৈশাখ বেড়াতে আসে। লোকটা কি এক সামান্য কয়েকপাতা লিখে বহু রুপিয়া কমিয়েছিল বলে শোনা যায়। কেউ কেউ বলে ঐ কি এক কাব্য নামিয়ে ইয়েটস্ সাহেবকে জপিয়ে জাপিয়ে প্রাইজটা পেয়ে গেছিল। তা কপালে টাকা থাকলে কে খণ্ডায়। লোকে বলে টাকা থাকলে নাকি টাকা আসে। তা এ বেটা দাড়ি রেখেই বহু মাল কমিয়ে নিল।

তবে সেসব অনেক পুরনো কথা। সেই কোন উনিশ শ তেরো সালে নোবেল প্রাইজ পেয়ে সে বোকার মতো বাড়ি-গাড়ি না করে কি এক শান্তিনিকেতনের উন্নয়নকল্পে টাকাটা লাগিয়েছিল। লোকে বলে তেরো সংখ্যা অপয়া। তা দাড়িওলা আলখাল্লার জন্য তেরো শুভ বলে প্রতিপন্ন হলো শেষমেশ সেই অপয়াই হল। নিজের ভোগে না লাগলে সে টাকা তো অপয়ার মালই হল, নাকি।

ইদানীং এক ঘোরতর মাংস্যান্যায় শুরু হয়েছে বলে স্বঘোষিত তাত্ত্বিকদের মন শরীর সবই বেশ খারাপ হয়ে পড়ে আছে। কোনো ডাক্তার বদ্য কিংবা কোনো রকম টোটকাতেই কাজ হচ্ছে না। দাড়িওলার কপিরাইট ভোগে চলে যাবার পর কেউ তেমন আর পান্ন দিচ্ছে না। আগে গির্দা চা দিতে এলে কর্তা চায়ের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করার জন্য রবীন্দ্রিক চোখে চেয়ে চরম ব্যক্তিগত প্রকাশে নিজের ওজন জানান দিতেন। নেহাৎই

অশিক্ষিত গিন্নি বাংলা ছবির নামিকার মতো আশঙ্কায় থাকত। তাদের মনোবেদনা বোঝে তেমন মন এখন কোথায়? ভগবান যদি নিজে সেভাবে রবীন্দ্রিক হতেন তাহলে তিনি কবেই সব মানুষকে সঠিক হৃদয়বৃত্তির অধিকারী করে দিতেন। তাহলে কপিরাইট থাকল কি গোল তাতে কী এসে যায়? কি এক ওলাউঠো আইন গো বাপ, যার ঠ্যালার রবীন্দ্রনাথের মতো জাতীয় সম্পত্তি কেমন আমজনতার 'মাল' হয়ে গেল।

তাও না হয় অর্বাচীন ছেলে-ছোকরাদের কথা ভেবে শান্তি পাওয়া যেত। তা নয়, কে ভতিকটু জয়জয় রুপসী চক্রবর্তী কি এক বাজারে ছেড়েছে। তা বেশ তো, করে খাচ্ছিলিস নিজের রাগ আর ক্রোধের রাম-রাজ্যে, তোর কি মাথায় শোকা কামড়াল, কি এক অজানা খনি থেকে কিসব মণিমুক্তা তোলা। ও অপরাধের কোনো ক্ষমা নেই। দাড়িওলা চিরকাল আমাদের। তোর এসব বেশ বাড়াবাড়ি।

সুখ নেইকো মনে— কপিরাইট উঠে গেছে, বলছে জনে জনে। রবীন্দ্রনাথ যেহেতু কবরে যায়নি তাই কপিরাইটের খবরে তার পাশ ফিরে শোওয়ার কোনো চান্স নেই। কিন্তু তার আত্মা যে ভয়ে ভয়ে মরছে গো। কে জানে তার 'গোরা' কখন ছোরা বাগিয়ে 'চোখের বালি'কে হঠাবার জন্য ট্যাংরাখালি চলে যায়। তবে কে এক খর খর গলার লোক ব্রাহ্মজনের রুদ্ধসঙ্গীত গেয়েছিল বলে টগর বোষ্টমী কিংবা পদিপিসিদের কাজ কমেনি বাপ। রবীন্দ্রিক কাহিনীর সব অরবীন্দ্রিক ছক্কা দেখে তারা ভারী আহত হয়ে লিখছেন— কোথায় যেন রবীন্দ্রিকতার অভাব—

সুকুমার রায় সেই, রাজশেখর, পরশুরামও নেই। কে আর এত হাসাবে এখন? অতএব এইসব স্বঘোষিত তাত্ত্বিকরা লোক হাসানোর মহান দায়িত্ব নিয়েছেন। কিন্তু প্যাচামুখে জনগণ হাসেও না যে। পাড়ায় এবারে পঁচিশে বৈশাখ করার কথা খুব জাঁকজমকের সঙ্গে। মূল বিষয় হবে—বন্ধনহীন রবীন্দ্রনাথ।

কিন্তু, বিধির বাধন কাটবে তুমি এমনি শক্তিমানে।

অনেকে বন্ধনহীন রবীন্দ্রনাথ বলতে ভাবল রবীন্দ্রনাথকে এতদিন বেশ মোটা দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল, এখন সে বাঁধা গল্প ছাড়া পেয়ে কোথায় না কোথায় চরতে গেছে। তাই এবারের জন্মজয়ন্তীতে তাকে নিয়ে টানাটানি না করলেও চলবে। কিন্তু কী নিয়ে বলা হবে? কমিটিতে আলোচনা হল। কী নিয়ে আলোচনা হল? রবি-বেটা অনেকদিন ধরে বেশ পট্টে রেখেছিল আমাদের, তাকে একেবারে ছেড়ে দেওয়া কি ঠিক হবে? বাঁধা গল্প ছাড়া পেলে কত না কেঁদা ঘটিয়ে ফেলে। একটু চরতে দিয়ে সজ্জাবেলার খুঁজে খুঁজে ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া হোক। কেউ একজন ভেবেছিল, যেহেতু তেমন কড়াকড়ি থাকবে না— অতএব সঙ্গীসাধী ছবি থেকে গান গাইবে— ও রবীন্দ্রনাথ তুমি ওনতে কি পাও এ কেসুরো গান আমার।

কিন্তু বন্ধনহীন রবীন্দ্রনাথ মানে কি? যেহেতু কপিরাইট উঠে গেছে অতএব প্যান্‌প্যানিমির প্রোগ্রাম বাদ দিয়ে কিছু করা যাক। কমিটির এক



বয়োজ্যেষ্ঠ আশুপ্তি করলেন,— ল্যাদুয়েজ! ল্যাদুয়েজ!

অল্পবয়সী এক সদস্য বলল,—কি আর এমন ল্যাদুয়েজ বলা হয়। আজকাল প্রযুক্তির যুগে ওসব প্যানপ্যানি কি আর চলে?

একজন বলল,—তবে প্রযুক্তি নিয়ে কিছু করা যাক।

—সে আবার কি?

—এই যেমন—ইন্টারনেটে রবীন্দ্রনাথ, মোবাইল কানে রবীন্দ্রনাথ কিংবা বাইকে রবীন্দ্রনাথ অথবা রবীন্দ্রনাথ আজ আ হিন্দি ফিল্ম হীরো—
—ক-ক-কি—

দুষণ! দুষণ! বরক মানুষটি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। কপিরাইট উঠে গেলেও এভাবে দুষণের অধিকার কে দিল?

নবীন কিছু দুষণ দেখল না। কেন আমজনতার এত আদরের ধন হিন্দি ফিল্ম কী দোষ করল? ঋত্বিক রোশন না হোক, অমিতাভ বচ্চন তো কান্ট ফিগার। আর রবীন্দ্রনাথও তো কান্ট ফিগার। কেন রবি ঠাকুর তো কি এক ‘নটীর পূজা’-তে সিনেমায় অভিনয় শুরু করেছিল। হিন্দি ফিল্ম বলে দোষ হল? রবীন্দ্রনাথের মোটেই সঙ্গীর্ণমনা হওয়া উচিত নয়। জাতীয় কবি বলে কথা।

—ইন্টারনেটে নাহয় রবীন্দ্রনাথের রচনা পাওয়া যাচ্ছে, তা বলে মোবাইল কানে রবীন্দ্রনাথ কিংবা বাইকে রবীন্দ্রনাথ আর হিন্দি ফিল্ম?

—তাতে কি? রবীন্দ্রনাথের যুগে মোবাইল থাকলে কী মজা করে, এ যে বিজয়া নাম দিয়েছিলেন যাকে, সেই ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর সঙ্গে কত কথা বলা যেত। আর রবীন্দ্রনাথের মতো মোবাইল লোক কে বাবা। সর্ব জায়গায় কীর্তি করে রেখেছে। বাচ্চাদের শেখাল সহজ পাঠ আর বড়দের সভ্যতার সঙ্কট। ক্যালি ছিল বটে মালটার।

—আবার! ল্যাদুয়েজ! ল্যাদুয়েজ!

—কি হল রে বাবা। ক্যালি হচ্ছে রাজভাষা। ইংরাজির ক্যালিবার আর এ যে শেষের কথাটা বোঝেন না—ওটাতে বোঝা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ কতখানি জনগণের মধ্যে এসে গেছেন।

—মানে। রবীন্দ্রনাথ এতদিন জনগণের মধ্যে ছিলেন না?

—কোথায় আর? অবশ্য শান্তিনিকেতন ছাতিমতলাকে যদি জনগণ বলা যায়। আর আপনাদের কোলার মধ্যে পড়ে থেকে দাড়িওলার বজ্র পরম হচ্ছিল। বেরিয়ে পড়ে বেঁচেছে। এ যেন সেই বাবা-মা ছেলে-মেয়ে খালি খবর দেখবে আর শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান। অন্য অনুষ্ঠান একদম দেখবে না। তা ছেলে একদিন বলল—মা, কার্টুন খুব শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান। কার্টুন

দেখলে আনন্দ কি, তার শিক্ষা পাওয়া যায়। তা এখন মা আর ছেলে একসঙ্গে কার্টুন দেখে আনন্দের শিক্ষা লাভ করে।

—এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কী সম্পর্ক?

—না, এ যে বাচ্চাদের জন্য কষ্ট করে সহজ পাঠ লিখেছিল; এর চেয়ে একটু ভেবেচিন্তে যদি কার্টুন আঁকত—

—এ কি! এরা যে রবীন্দ্রনাথকে ভালোরকম কার্টুন বানিয়ে ছাড়বে।

—বানাবে কি, অলরেডি আপনারা তা বানিয়ে রেখেছেন। এ যে মুখ বেকিয়ে বলতেন—আসলে রবীন্দ্রনাথকে বোঝা—

দুষণের মাত্রা একটু বেশি হয়ে গেলে। প্রবীণ আচ্ছন্নভাবে নিজের কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ নাতির জায়গায় চিত্তা করলেন, রবীন্দ্রনাথ মাউস টিপে ইন্টারনেটে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর সঙ্গে চ্যাট করছে—

বাইকে রবীন্দ্রনাথ! ওরে বাবা! বুক ধড়ফড় করতে শুরু করল। শান্তিনিকেতনের রাস্তায় রবীন্দ্রনাথ বাইক হাঁকিয়ে গাইছেন— ইয়ে দিবানো—মুখে পয়চানো। মায় হুঁ...
চারিদিক অন্ধকার ঠেকেছে। কপিরাইটের সঙ্গে এর কি সম্পর্ক?

প্রযুক্তির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এত গভীর সম্পর্ক কে জানত? তিনি ভাবতেন, প্রায় তিনি একাই রবীন্দ্রনাথ বোঝেন আর সবাই অর্বাচীন। কিন্তু সেই অর্বাচীনরা যে প্রযুক্তির দাড়ি ধরে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এত ভাবে, তা কে জানত। সত্যি, প্রযুক্তি কত এগিয়ে গেছে। বন্ধনহীন রবীন্দ্রনাথ নিয়ে আলোচনা ঝাঁপনছাড়া হয়ে যাচ্ছে দেখে একজন রাশ টানতে চাইল। প্রবীণ জলের ছিটেটিটে নিয়ে নিজেকে খাতস্থ করে নিলেন। একজন বলল, — তাহলে নতুন কী বিষয় ঠিক হল?

—বন্ধনহীন রবীন্দ্রনাথই থাক। সবাই একটু রসেসয়ে বললে ভালো হয়। আর এ যে ছাতিমতলা অবধি ঠিক আছে, আর এ মোবাইল বা বাইকে চড়ানো টড়ানো না হলেই ভালো হয়— বাইক চালাতে গেলে ব্যালান্স লাগে। সে সময় কই? বেচারী সামান্য সাইকেলও কি চালিয়েছে? ওনিনি। কে জানে।

—সেসব ঠিক আছে। তবে পুঁটুরানীকে বলবেন, এবার যেন সেই এক প্যানপ্যানানির উদ্বোধনী সঙ্গীত না গায়। শালা নতুন কিছু ভাবতে পারে না— বছর বছর কত রবীন্দ্রসঙ্গীত লেখা হচ্ছে।

—হচ্ছেই তো। সব কি এ রবীন্দ্রনাথের নাকি। আমার নামও তো রবীন্দ্রনাথ বোষ। আমি গান লিখলে তা রবীন্দ্র-সঙ্গীত হবে না কেন বাবা? এক নতুন কপিরাইটের জন্ম হল।

আনন্দ-সংবাদ

আনন্দ-সংবাদ

আনন্দ-সংবাদ

বিল ক্লিনটনের ভবিষ্যৎ-বাণী করিয়া জ্যোতিষী ডঃ সম্পীপন চৌধুরী নিজের নিকট বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তিলোত্তমা মজুমদারের ভবিষ্যৎ-বাণী করিয়া জ্যোতিষ-সাত্রী ভাগ্যদমন মহারাজ জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন এবং “পুরস্কার-রত্ন” উপাধি লাভ করিয়াছেন। এক বৎসরেরও অধিক পূর্বে তাঁহার গণনাক্রমে সৈন্য মিত্র মহাশয় ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, তিলোত্তমা ‘আনন্দ’ পাইতে চলিয়াছেন। এ সংবাদ প্রকাশে এক ‘আনন্দ’-দাস বড়ই দুঃখ পাইয়া চিটং হইয়াছিলেন, ছুপ্কে ছুপ্কে ঘটিতং আনন্দ-হাঁড়িটি হাটের মাঝে ফটিহিবার কারণে; পত্রপাঠ-সম্পাদককে চোখ রাঙাইতেও দ্বিধা করেন নাই। অবশ্য ভাগ্যদমন মহারাজ তাঁহার উপর কোনো মারপ-উচাটন প্রয়োগ না করিয়া আশীর্বাদই করিয়াছেন এবং

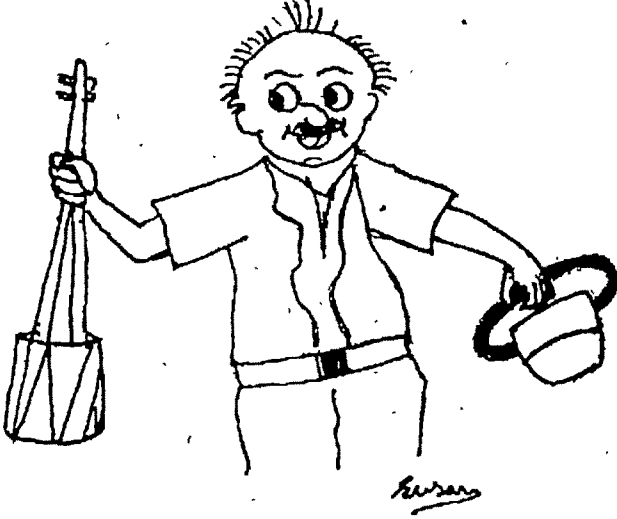
শিবাব্দ্রের নিকট ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছেন যে, দাসব্রের স্বর্গদিন ঘুটিবার পরে তাঁহার বোধোদয় হইবেই। কেন না, তাঁহার কপালে আনন্দ পুরস্কার-যোগ একেবারেই নাই।

সে যাহাই হউক, ভাগ্যদমন মহারাজের এই অলৌকিক দক্ষতা দেখিয়া কাতারে কাতারে পুরস্কার-পিপাসুগণ তাঁহার দরজায় প্রায় ব্রিসেডের জনসভা বসাইয়া ফেলিয়াছে। বিশেষত বাড়ির ঝিয়ের দল। কারণ আর কিছুই নহে, মহারাজ মুখ ফুকাইয়া এই অপ্রিয় সত্য কথাটি বলিয়া ফেলিয়াছিলেন যে, তদ্বীশ্যামা শিখরীদশনা বি-গণেরও পুরস্কার-সম্ভাবনা আছে।

বি. ম. প্রায়র অ্যাপ্রেন্টেসেন্ট ভিন্ন মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ সম্ভব নহে।

চরণ বৈরাগীর

হুঁড়ে মিকুড়ি



ছল ছুতো খুঁজে খুঁজে বছরে
অন্তত তিনবার আমেরিকা ছোটেন
এবং যাদের পুত্র-কন্যাদের যা কিছু
করণীয় ধরণীয় করে বুশখামে গচ্ছিত
রেখেছেন।

অস্তায়মান রবি-বাংলা

আবার বৈশাখ। নববর্ষ রবীন্দ্র জয়ন্তী। কিছু কিছু বঙ্গ-পুরুষের দু দিন ধুতি পরার সুযোগ। মহিলারা চণ্ডা পাড়ের শাড়ি পরা শরীরে চলমান গহনার প্রদর্শনী। এবং অবশ্যই লরেটোর বাংলা উচ্চারণে পাওয়া বাঁধাধরা রবীন্দ্রসঙ্গীতি—আমায় জ্বম হে জ্বম....। নন্দন চত্রে পানের বন্যা। তবে কিনা শহরের নাম কলকাতা। বৈশাখ বলে কি বিপ্লব বন্ধ থাকবে। ইরাক রয়েছে। সিরিয়া ও উত্তর কোরিয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। এরই প্রেক্ষিতে পঙ্কাজেত নির্বাচন। দিদির কলকাতায় বসে নিরাপদ উদগার। ওদিকে নিঃশব্দে কেশপুর খেজুরি মডেল সারা রাজ্যে বামফ্রন্টকে নিঃসঙ্গ করার আয়োজন চালাবে। কী সুন্দর সঙ্গত চলছে। মার্কিন পণ্য বর্জনের প্রোগ্রাম ও বিবৃতি। বিবৃতি দেলেবালাদের তালিকায় জলজ্বল করছেন সেইসব বঙ্গদিশ্গজরা যারা ছল ছুতো খুঁজে খুঁজে বছরে অন্তত তিনবার আমেরিকা ছোটেন এবং যাদের পুত্র-কন্যাদের যা কিছু করণীয় ধরণীয় করে বুশখামে গচ্ছিত রেখেছেন। এঁরা অবশ্য ধানতলা, ঘোঁসাকাডা নিয়ে এক একটি অতিরিক্ত শ্বাসও অপব্যয় করেননি। করবেনও না। কেন না গণস্বার্থে এবং বাংলার সংস্কৃতির সত্যি অক্ষুণ্ণ রাখার মহা-মহীয়ান রূতে এঁদের নানা অ্যাকাডেমি, পরিচালন সভা, পুরস্কার বিতরণ কমিটির দায়িত্ব-পতীর পদ অলঙ্কৃত করতে হয়। কেউ শরীফ মেজাজে রাজ্যসভার মনোনয়নে প্রয়োজনে নিতান্ত অনিচ্ছা ও নাছোড়বাধ্যবাধকতায় সুচকুর বোড়েচালায় ব্যস্ত থাকেন। কিংবা সর্বোত্তম অর্থসাহিত্যতীর্থ জ্ঞানশীট-ক্ষুণ্ণ লালসায় সর্ব ভারতীয় মঞ্চ থেকে বাঙালি মহাশেতা-নিধনের বিশেষক বিশ্লেষণের সাক্ষ্যে গরীয়ান।

সংস্কৃতির শব-সাধনায় মস্ত এই রাজ্যের নির্বীৰ্য আঁতেল জনতা। তাই বনগাঁর কাছে কলসাদো গ্রামে সাত বছরের বালিকা-ধর্মক নাসিরুদ্দিন মণ্ডল সন্তোষে সরকারি

হাসপাতালে বসেই বলতে পারে, আমার বাবা সিপিএম নেতা, আমার কিছুই হবে না। আর দমদমি দুলাল ওরফে জোড়া খুনের আসামির সাগরেদরা পুলিশকেও তুফান জল দিতে বাধা দেয়। বিরুদ্ধ সাক্ষ্য দিলে পরিণাম ভালো হবে না—এই শাসনি পাড়ায় প্রকাশ্যে দিতে পারে দুলালপ্রাণ। এইসব অতিভুজ্ঞ ও বিজ্ঞ বিষয় অবশ্য উক্ত দিশ্গজদের নজর আকর্ষণ করে না। কেন না রবীন্দ্রনাথের থেকেও তাঁরা বড় লেখক, অন্তত গ্রন্থ সংখ্যার বিচারে। বহু-প্রসবিনীকে যে বহু শায়িনীও হতে হয়—এটুকু জ্ঞান অপভিভেদও থাকে। শম্মা-বিহারের ব্যক্ততায় তুচ্ছ বিষয় উপেক্ষিত হলে দোষ ধরা নিছক বঙ্গ-কুচুটেপনা ছাড়া আর কী।

সেইসব কুচুটেদেরও আর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না, যারা রবীন্দ্র-গ্রন্থস্বত্বের মৌরসিপাষ্ট্রির অবসানে বঙ্গসাহিত্যের মহাবিপণ্যের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। কোনো বিপণ্য ঘটেছে বলে এই অখমের জানা নেই। নানা প্রকাশক বাণিজ্যলাভে নানা বই নানা চতে নানা রঙে ছাপছেন। পাঠক নিজস্ব রুচি অনুসারে সেসব কিনছেন বা কিনছেন না।

কোনো কোনো অতি শক্তিশালী কবির অতিসাধ ছিল সঙ্গীতা সম্পাদনা করার। সঙ্গীত অনুরক্ত কোনো প্রকাশক এখনো বরাত দেয়নি বলে গ্রন্থটির প্রসব ঘটেনি এখনো। অবশ্য কবির একপে রবীন্দ্র-কবিতাই সম্পাদনা করার পবিত্র রূতে কেন্দ্রীয় সরকারের হাট অর্থানুকূল্য (গ্রান্ট) অনুমোদনের তথ্যে মুহূর্তে রাজধানীর রাজপথ অলঙ্কৃত করছেন, এমনই প্রকৃতি।

এতসব উল্লেখটির বিষয় বৈরাগীর নিরুত্তর মগজে ঢেঁটে তোলে না। তবু বৈরাগীরও একটু আক্ষেপ আছে। ভেবেছিলাম কিছু কিছু রবীন্দ্র-কবিতা এবার

কেউ কি পারেন না 'প্রণয়প্রস্ন' বা 'শেষ বসন্ত' সুরময় করে তুলতে? আরো অজস্র কবিতার কথা বলা যায়, যারা সুরারোপ দাবী করতে পারে।

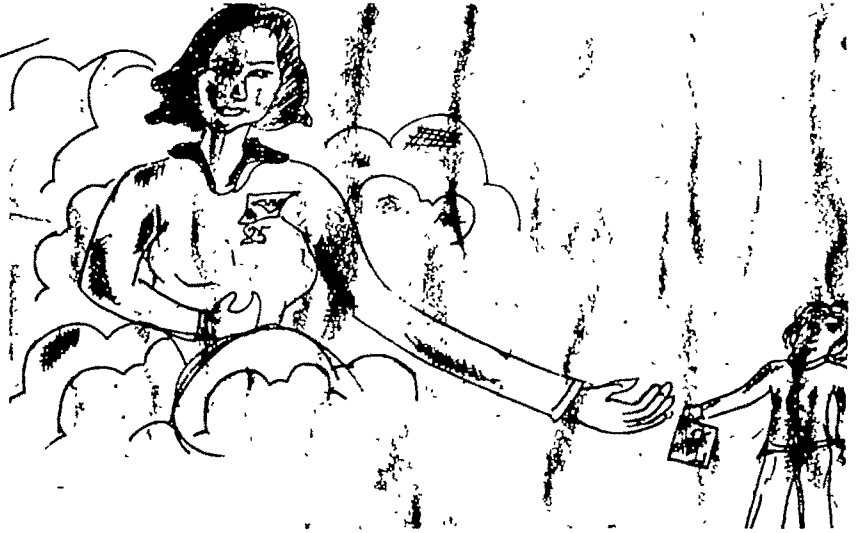
গান হবে। পঙ্কজ মল্লিক যেমন 'দিসের শেষে' করেছিলেন, কেউই হয়ত তেমনই সাহস ও দক্ষতার পরিচয় দেবেন। একটা নমুনাও এখনো পর্যন্ত পাওয়া গেল না। যে কোনো আসরে ঘুরেফিরে শ-শ্রবণ গান শোনার একঘেয়েমি থেকে মুক্তির বাসনা যে প্রবল হয়ে উঠেছে। কেউ কি পারেন না 'প্রণয়প্রস্ন' বা 'শেষ বসন্ত'

সুরময় করে তুলতে? আরো অজস্র কবিতার কথা বলা যায়, যারা সুরারোপ দাবী করতে পারে।

আসলে হয়ত একেবারেই তুল ভাবছি। যে বই বাজারে আছে, যে গানের ক্যাসেট-সিডি সহজলভ্য সেগুলোর কদর কতটা? মধ্যবয়সী বা তদূর্ধ্ব মানুষের কথা বাদ দিয়ে, যারা নকশাল, জরুরি অবস্থা বা বামফ্রন্টের সময়সীমা তারা কি পাঠের বাইরে রবীন্দ্রনাথ পড়ে? রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনে? ইংলিশ মিডিয়ামের আগ্রাসনে এবং বোকাবাঞ্জে হিন্দি ফিল্ম গান আর পপ মিউজিকের দৌরাণ্ডে রবীন্দ্রনাথ কতখানি টিকে আছেন এবং অদূর ভবিষ্যতে থাকবেন, সে বিষয়ে সমীক্ষা করা বোধহয় খুবই জরুরি।

জীবন যাপনে রবীন্দ্রনাথ না থাকলেও বাৎসরিক উৎসবে ও কোনো কোনো ছুইংকমে, হঠাৎ হঠাৎ রবীন্দ্র-গান নিয়ে আদেশ-লেনার হুজুতি, ভব, বোধহয় এখনই বন্ধ হবে না। তবে তার আগেই রবীন্দ্র-বাংলা বাঙালি মাছ খাওয়ার মতোই ছুঁলে যাবে, এমন আশঙ্কা খুব অমূলক নয়।

দ্বারাশ্রমে



করণ কল্পনা

আসুন, কল্পনা চাওলা সম্পর্কে দু-লাইন কল্পনা করি। মার্কিন ফেরি কলম্বিয়া যুগাসময়ে পৃথিবীতে নেমেছে। 'নাসা' থেকে মাস দুয়েকের ছুটিতে দেশে ফিরে এসেছে কল্পনা। সমর্থনার ধুম পড়েছে। আজ এখানে, কাল সেখানে। দিল্লি থেকে শুভচন্দ্র এল। সেশের বিজ্ঞানকরগুলো থেকে মানপত্র এল। রাষ্ট্রপতির সঙ্গে ভাত খাবার ডাক এল। শেষে এল সুসংবাদ। কল্পনা পদাশী পাবে। গত এক যুগ ধরে তার কীর্তিকলাপে ভারতের গর্ব চুঁয়েছে মহাকাশ। শাম হয়েছে বিস্তার।

থাক, আর কল্পনা করব না। এবার বাড়ব। তেভুলকর পায়ে পড়ল। একটা চালা কাঠ দিয়ে গত একযুগ ধরে কী বল শিটিয়েছে সে। সেশের নামে 'বোল্ড' হয়েছে কতবার। দেশকে জেতাতে নিজের লিগামেন্ট বাজি

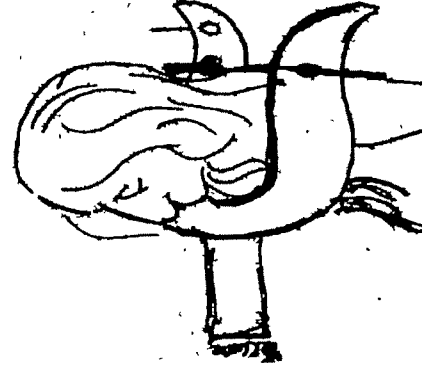
রেখেছে কতবার। তেভুলকর কাঠ-বলের যুগাবতার।

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে কত অসুর বধ করে যুগাবতার হতে হয়েছিল। রামকৃষ্ণ যে কৃষ্ণসাধন করেছিলেন তা তো তাঁর চেহারা দেখেই মালুম হয়। কুদিরাম দেশের জন্য ফাঁসিতে ঝুলেছিল। আর তেভুলকর? তেভুলকররা সাউথ আফ্রিকা থেকে বিদেশের নাম উজ্জ্বল করে ফিরেছে। সূত্রাং, দাও পড়ল।

আর কল্পনা হয়ে গেছে দক্ষযজ্ঞের সতী। কটপিস হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে কল্পনা মহাশূন্যে। পঙ্ক দূরে থাক, এক পিস কলকেষুল ও জুটল না কপালে। পঙ্কে ভরে গেছে কেন্দ্র। পাকৈ ভরে গেছে সমাজ।

—দিব্যেন্দু দাস

রবীন্দ্র-রচনা



স্বামী কমলানন্দ অবধূত

বিশ্বের বিস্ময়! সাদামের চেয়েও স্মরণীয়!! লাদেনের থেকেও রহস্যময়!!!

বই-পাড়ায় এই প্রথম

‘এক খণ্ডে রবীন্দ্র-রচনা সমগ্র’

বই-পাড়ায় কেউ যা কখনো দুঃস্বপ্নেও দেখেনি আমরা তাই দেখাতে পেরেছি। একটা চালের দানার উপরে যদি চিঠি লেখা যায়, একটা সর্ষের দানার উপরে যদি রবি ঠাকুরের অত চুলদাড়ি সমেত মুখ আঁকা সম্ভব হয়, তবে একখণ্ডে তাঁর সব স-ব স—ব কিছু কেন ধরানো যাবে না? আমরা ধরিয়ে দেখালাম। পাঠক নয়, কেবল সংগ্রাহক আসুন। মনে রাখবেন, এ জিনিস সস্তা বইয়ের মতো পড়বার জন্যে নয়, এ হল মূল্যবান ষাঁড়ক।!

—অনাথ পাবলিশিং

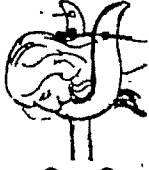


বেডসাইড রবীন্দ্রনাথ

কপিরিহট উঠে গেছে বলেই তিনি যা কিছু লিখেছেন হাবিজাবিসুদ্ধ ছেপে দেবার জন্যে বই-পাড়ায় আমরা আসিনি। হংস যেমন দুখজল থেকে কেবল দুখটুকুই ছেঁকে নেয়, আমরাও তেমনই রবিঠাকুরের গুচ্ছের লেখাপত্র থেকে বেছে বেছে শুধু অ্যাডান্টদের পছন্দ হবে তেমন লেখাই এই সংগ্রাহে রেখেছি। নমুনা— কেন যামিনী না যেতে জাগালে না, প্রমোদে চালিয়া দিনু মন, উলঙ্গিনী নাচে রণরঙ্গে, সেদিন দুজনে দুসেছিনু বনে, নিশিদিন কাঁদি সখী মিলনের তরে, যৌবন নদীর স্রোতে তীর বেগ ভরে, ইত্যাদি। সেই সঙ্গে শ্রী মিথ্যা চৌধুরী অঙ্কিত মানানসই ছবি, যা বৃদ্ধের গোল অঙ্গকেও লালাসিক্ত করবে।

—ময়ুম্মী প্রকাশনী

প্রকাশিত হইল



প্রকাশিত হইল

প্রকাশিত হইল

রোডসাইড রবীন্দ্রনাথ

রোড লইয়া রবীন্দ্রনাথের ভাবনার বিরাম ছিল না। সারা জীবন ধরিয়া তিনি যে কত ভাবে কত রূপে রোডকে দেখিয়েছিলেন তাবিলে মাথার রোড জ্যাম হইয়া যায়। একখানা বই-ই তো লিখিয়া ফেলিলেন—‘পথে ও পথের ধান্ডে’। সেই মূল্যবান গ্রন্থে রোড, লেন, বাই লেন, রাইড লেন লইয়া তাঁহার মৌলিক ভাবনা-চিত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। তাই তিনি গাহিয়া উঠিলেন—‘পথ চেয়ে যে কেটে গেল কত দিনে রাতে’। অর্থাৎ কবিগুরু সহিত রাত্রিকালীন পথেরও পরিচয় ছিল। ডাকপিওন চিঠি বিলি করিতে করিতে যাইতেছে দেখিয়া তিনি লিখিলেন—‘পথ দিয়ে কে যায় পো চলে/ডাক দিয়ে সে যায়’। পথের দিকে দৃষ্টি-নিষ্কোপ করিতে করিতেই একদিন কবির চোখে আনন্দ পাবলিশার্সের সাইনবোর্ড পড়ে ও তিনি পুলকিত হইয়া গাহিয়া উঠেন—‘আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ’। এখানেই শেষ নহে, ভুবনডালার পরাণ মণ্ডল মাঠে চাষ করে, পুকুরে মাছ ধরে, মাঠে পরু চরায়—ইহা দেখিতে দেখিতে একদিন তাঁহার ঘৈর্ষের বাঁধ ভাঙিয়া যায়। কেন সে কখনো রোডকে ব্যবহার করে না তাবিয়া বুদ্ধ রবীন্দ্রনাথ একদিন তাহার কান ধরিয়া টানিতে টানিতে পথে লইয়া আসেন ও ধমক মারেন—‘পথিক পরাণ, চল, চল, সে পথে তুই’।

তবে রোড লইয়া তাঁহার অস্তিত্বটা সর্বদা সূঁথের হয় নাই। একবার রোডে চলিবার সময় পাথরে হেঁচট খাইয়া তিনি পড়িয়া বান, তাঁহার পা কাটিয়া যায়, রোডের ধূলার রক্তাক্তি কাণ্ড। সেই মুহূর্তে তিনি দুইখানি গীত রচনা করেন—

১। আমার পথে পথে পাথর ছড়ানো

২। আমার ভাঙা পথের রাস্তা ধূলায়

বৃদ্ধ বয়সে প্রাতঃসময় করিবার সময় কবির গতি রূপ হইয়া যাইত, তাঁহার সঙ্গীরা আগাইয়া যাইতেন, তাহাতে ব্যথিত কবি গাহিলেন—
‘আমার এ পথ তোমার পথের থেকে অনেক দূরে গেছে বেকে’।

পথিকরা যার আপন-সঙ্গে, আমারে যার পিছে রেখে।।

বৌবসে এই রোডেই রবীন্দ্রনাথের প্রেম ও স্নেহ-এর অস্তিত্ব হইয়াছিল। সত্যবাদী কবি তাহা লুকান নাই, পরিষ্কার লিখিলেন—

‘পথে এখনো শেষ হল না, মিলিয়ে এল দিমের ভাতি।

তোমার আমার মাঝখানে হার আসবে কখন অঁধার রাত্তি।।

এবার তোমার শিখা আনি

জ্বালাও আমার প্রদীপখানি,...

পাঠক, এখানে ‘শিখা’ ও ‘প্রদীপ’ রূপক, স্নেহপীঠের স্টিত।

একবার রোডে চলিতে চলিতে কবি পথ হারাইয়া ফেলেন, রোড কোথায় গিয়া শেষ হইয়াছে কিছুতেই ঠাহর করিতে না পারিয়া সেই জনশূন্য রোডকেই প্রণয় করেন—‘পথের শেষ কোথায়’।

আগামী সোমবার অফিস আওয়ারে জনাকীর্ণ, তৈলা-রিজাকীর্ণ রবীন্দ্রসরসী উপরে এই গ্রন্থের প্রকাশ অনুষ্ঠান। প্রকাশ করিবেন শিব্যভারতীর উপাচার্য মাননীয় শ্রী পথিক ধর মহাশয়।



পাগলদের রবীন্দ্রনাথ

কপিরাইট উঠে যাবার পর থেকে এ পর্যন্ত কোনো প্রকাশকই বাসের কথা ভাবেনি সেই মানসিক ভারসাম্যহীনদের কথা কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন। আমরা শুধু তাঁর মূল্যবান ও আকুল করা প্রাণের বাণীগুলিকে নিয়ে একত্রে একটি আঁটি বেঁধেছি। আঁটিতে যা বা আছে—

- ওরে শিকল, তোমার কোলে ক’রে দিয়েছি ককার।
- আমাকে যে বাঁধবে ধরে, এই হসে যার সাধন,
- আমারে বাঁধবি তোরা সেই বাঁধন কি তোদের আছে।
- ওকে বাঁধিবি কে রে, হসে যে ছেড়ে দিতে।
- পাগল হাওয়ার... পাগল আমার মন জেলে ওঠে।

ওধু পাগল নয়, পাগলদের নিয়েও তাঁর আকুলতার অন্ত ছিল না। তাই তো এই আঁটিতে রয়েছে—

‘পাগলদী, তোর লাগি কী আমি করিব বল।

কোথার রাখিব তোরে খুঁজে না পাই ভ্রমণে।’

তিনিই পাগলদের আহ্বান করে তাদের সব বিধা, সজোহ বেড়ে ফেলে প্রাণতরে পাগলামি করতে বলেছিলেন। এমনও বলেছিলেন যে সেই পাগলামি মন যদি প্রতিবেশীকে ছুঁতে এসে দরজার খাড়া দেয় তখন যেন পাগলরা তাতে পাখ না দেয়, যেন পাগলামির ব্রতে অবিচল থাকে। তাই আমাদের এই

আজি শেষ গুচ্ছটি আমরা বড় বড় করে শ্রী খ্যাপা খাতকীর-এর অলঙ্করণে পরিবেশন করেছি। কথাগুলি গুলিয়ে পানলসের বকে নতুন করিয়া বলের সঞ্চার হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপনে আমরা লাইনগুলি তুলিয়া দিতেছি—

‘পাগল যে তুই, কষ্ট ভরে

জানিয়ে দে তাই সাহস করে।।

দেয় যদি তোর দুয়ার নাড়া

ধাকিস কোণে, দিস সে সাড়া—

বিশেষ দ্রষ্টব্য : আমাদের এই প্রকাশনা কেবল জেনুইন পাগলাদের প্রতি উৎসর্গীকৃত। তাই প্রমাণপত্র সঙ্গে আনবেন।

আনন্দ সংবাদ।

আনন্দ সংবাদ!!

আনন্দ সংবাদ!!!



আমরা আনন্দের সঙ্গে প্রকাশ করছি

কুমোরপাড়ার গরুর গাড়ি

এই রুচিশীল গ্রন্থে কেবল এই একটি কবিতাই থাকছে। মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯৬। কোনো পাতায় একটি শব্দ, কোনো পাতায় দুটি। বাকি অংশে অলঙ্করণ। অলঙ্করণ করেছেন বিখ্যাত শিল্পী শীর্ষেন্দু চাকী। মোটা আর্ট শেগারে ছাপা ট্রে সাইজের এই অভিজাত প্রকাশনাটি এ মাথা থেকে ও মাথা Only Vimal-এর কাপড়ে মোড়া। পলাশ রঙ প্রচ্ছদ। মূল্য ৫০০০ টাকা।

—সদানন্দ পাবলিশার্স

প্রকাশিত হয়েছে।



প্রকাশিত হয়েছে!!

প্রকাশিত হয়েছে!!!

রবীন্দ্রসাহিত্যে ব্যাং

বিশিষ্ট গবেষক শ্রীমতী সুবিধা চক্রবর্তী সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্য মন্থন করে এই নদী তুলেছেন। আমরা সেই নদী অফসেটে ছেপে বাংলার বিশ্বজ্ঞানের হাতে তুলে দিতে পেরে গর্বিত বোধ করছি। শ্রীমতী চক্রবর্তী তাঁর এই বহুমূল্য গবেষণার দেখিয়েছেন যে ‘ব্যাং’ রবীন্দ্রসাহিত্যে কী গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে। তাঁর এই গবেষণা প্রমাণ করেছে যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমগ্র সাহিত্যে ও চিঠিপত্রে মোট ১৭ প্রকার ব্যাঙের উল্লেখ করেছেন। সেদিক থেকে তাঁর এই গবেষণার প্রাণী-বিজ্ঞানের একটি বিশেষ ভূষণও আলোকিত হয়ে উঠেছে।

—ম্যাগনেট পাবলিশার্স



স্বরলিপি প্রকাশনের একটি ভক্তিবিন্দু নিবেদন

খুল্লমখুল্লা রবীন্দ্রনাথ

‘রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি সেকেন্দ্রনাথের সেহাভ হলে রবীন্দ্রনাথ যে নাপিতের কাছে ন্যাড়া হয়েছিলেন তার সম্পর্কে আলোচনা করেছেন মৃণালারতীর অধ্যাপক। রবীন্দ্রনাথের পাত্রে গোদ ছিল কিনা এবং সেই গোদ ঢেকে রাখবার উদ্দেশ্যেই রবীন্দ্রনাথ আলখাল্লা পরে থাকতেন কিনা সে বিষয়ে আলোকপাত করেছেন প্রখ্যাত অস্থিবিদ ও চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ। এছাড়া আমাদের এই বইটি পড়লে জানা যাবে—কবিগুরু কী তেল মাথার দিচ্ছেন, কোন টুথপেস্ট ব্যবহার করতেন, বউ চোপা করলে ঘর থেকে বেরিয়ে কোন বৃকতলে গিয়ে বসতেন, এবং গীতাঞ্জলির কবিতা ‘একলা আমি অহির হলেম’-এর সঙ্গে এরকম কোনো একদিকের চোপের সম্পর্ক আছে কিনা এবং এরকম আরো বহু গোপন কথা। সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের হাঁটুর ‘স্বরলিপি’ও আলোচনা।

মালোচনা

তারাপদ রায়ের রিভিউ

নাম দেখে মনে হল বইটা ফড়িং
ও দোয়েলের বায়োগ্রাফি—
'ষে জীবন ফড়িঙের, দোয়েলের'।

নাম দেখে কাউকে অমর বলা যায় না। প্রতি মাসে আমার সত-অন্তত একবার মূল্যকাণ্ড হওয়া হেতিওয়েট লেখক শ্রী তারাপদ রায়কে তাই অমর বলা হল না। তবে তাঁর বই রিভিউ করতে গিয়ে আমি খুব শীঘ্র অমর হয়ে যাব বলেই আমার ধারণা।

মূল্যকাণ্ড না বলে মুটুভেড় বলা ঠিক হবে। অমন একটা ব্যক্তিত্বের সঙ্গে প্রতি মাসে ভিড়তে ভিড়তে আমার অবস্থা কম্পন ভয়ানক হয়ে উঠছিল। প্রতি মাসে বেহালা থেকে সন্ট লেকচারিলাম একপাতা গল্পারামায়ণ আনতে। রায় মশায়ের ঐ একপাতা হাঙ্গির লেখা আমার প্রগু-বরফ জীবনে কামার মসিক ছেজে পরিণত হয়েছিল। সাহিত্য আর সম্পাদকের খাতিরে কানজ চালিয়ে যাচ্ছিলাম।

দু-হাজার তিন সালের মার্চ মাসের কথা। একপাতা গল্পারাম-মোপালভাঁড় মেশানো অল্পনিক-ঐতিহাসিক লেখা দিয়ে বললেন, 'একটু রোগ, আসছি।' একটুটা একা একা হলে অনেকটা হয়ে যায়। তার ওপর নতুন কোনো বিপদের সত্তাবনা দেখা দিলে তা আরো বাড়ানো হয়। আমি একবার না বলে কেটে পড়ার কথা ভেবেছিলাম। কিন্তু বিবেক বসিয়ে রাখল। প্রায় কুড়ি মিনিট বাসে দেখি আর লুপ্ত পড়ে কিনে এসে চেরারে। একটা বই বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'একটা রিভিউ করে দিও তোমার ভাষায়।' (যে মানুষের ব্যাপারে আমার ভিত্তি সবচেয়ে গড়বড়ে তাঁর বইয়ের রিভিউ আমার ভাগ্যে।)

নাম দেখে মনে হল বইটা ফড়িং ও দোয়েলের বায়োগ্রাফি—'ষে জীবন ফড়িঙের, দোয়েলের'।—তারাপদ রায়। দেড়শ পাতা, আশি টাকা। স্ট্রেট পিচটা গল্পের সঙ্কলন। অর্থাৎ এক একটা গল্পের দাম বোলা টাকা ধার্য করা হয়েছে। প্রথম গল্পটা বোলা আলা জৈতিক। যে অঞ্চলে এ গল্পের প্রেক্ষাপট রচিত হয়েছে, কর্পোরেশন সে অঞ্চলকে 'ম্যাসেরিয়া প্রবণ' বলে চিহ্নিত করেছে। একই বংশের একজোড়া ভৃত, তাদের অতুতুড়ে কাণ্ড ও কালিঘাট অঞ্চলের এক ভৃতুড়ে বাড়ি ছাড়া এ গল্প আর বাড়তি কিছু নেই। কিছুটা পড়লেই বোকা যায়, লেখক ভৃতদের পড়বার জন্যই এ গল্প লিখেছেন। তার এ গল্পের জন্য বোলা টাকা খরচা করতেই পারে।

দ্বিতীয় গল্পের নাম হল কুমুদী। ইনি আবার মনুষ্যেতর জীব। 'কুমুদ' এই পৃথিবীরই হাঁস'। মেনকা গান্ধী ছাড়া কেউ এ গল্প ছোঁবে।

'শালুক টিনেছেন' গল্পে পুরনো কলকাতার এক পত্রিকা অফিসের কোম্পানি করেছেন লেখক। তিনজন প্রমথেশের কেওড়াভালার বাড়ির কুল বারান্দার কুলে গেছে গল্প।



এরপর অনেকটা ইচ্ছা সত্ত্বেই বইটা হারিয়ে যায় আমার ডেস্ক থেকে। সম্পাদককে জানাতে কেশে গিয়ে বললেন—বাকিটা 'ঠাকুরমার ঝুলি' থেকে লিখে দিন।

আমি দেখলাম, চলতে পারে। বইটার শেষ গল্পটার নাম ছিল পুটিমেঘ ও বরুণকুমার। অরুণকুমার ও কিরণকুমার সত্তবত উচ্চশিক্ষার্থে কানাডা যাওয়ার, সুযোগ পেয়ে বরুণকুমার প্রেম করে পুটির সঙ্গে। অসময়ে পুটিকে নিয়ে যায় মমরাজ। একা পড়ে যায় বরুণকুমার। কিন্তু লেখক 'বিয়ে পাগল' বরুণকুমারকে ছাড়ে তুলে পুটির আত্মার সঙ্গে মালা বদল করিয়ে পাঠকদের কাছ থেকে বোলোআলাই বোলা টাকা আদায় করে ছেড়েছেন।

ইনি আবার মনুষ্যেতর জীব। 'কুমুদ'
এই পৃথিবীরই হাঁস'। মেনকা গান্ধী
ছাড়া কেউ এ গল্প ছোঁবে।

আমাদের সমাজে সুস্থ, স্বাভাবিক পাঠকদের সংখ্যা প্রায় তালানিতে এসে গেছে। সেদিক থেকে বইটি অত্যন্ত সমর্থিত হয়েছে। কর্তৃপক্ষ বৃহত্তর পাঠকশ্রেণীর কথা মাথায় রেখেই এই গল্প সঙ্কলন হয়েছে। এই জনহিতকর সাহিত্যকর্মের জন্য বেলতন্ত শ্রী রায়কে সাহিত্যে 'বেল' দেওয়া যেতে পারে। তারকাদের মধ্যেই তারাপদর স্থান। এর মধ্যে ঠাকুরমার ঝুলিও আমার ডেস্ক থেকে হারিয়ে যাওয়ায় অসম্পূর্ণ রেখেই শেষ করতে হল এ বারের বেস্ট-সেলারটির রিভিউ।

—দিব্যেন্দু দাস

ঘরে বসে নিয়মিত পত্রপাঠ পেতে হলে গ্রাহক হোন

“পত্রপাঠ” বার্ষিক গ্রাহক টাঁদা ১২০ (একশ কুড়ি টাকা, ডাকযোগে)। বছরের যে কোনো মাস থেকে এক বছরের জন্যে গ্রাহক হওয়া যায়।

মানি অর্ডার বা ব্যাঙ্ক ড্রাফট **PATRAPATH** নামে পাঠান এই ঠিকানায়—
**PATRAPATH, 10B, 10J, FERN ROAD, (GROUND FLOOR),
KOLKATA - 700 019**

সম্পাদকের সঙ্গে ফোনযুক্ত করতে চাইলে সকাল দশটার মধ্যে—
2440-3803

যাঁরা পত্রপাঠ পড়তে ভালোবাসেন, যাঁরা চান—পত্রপাঠ বেঁচে থাকুক, এগিয়ে চলুক, তাঁদেরকে অনুরোধ—আপনারা পত্রপাঠের গ্রাহক হোন আর উপহার নিয়ে যান পত্রপাঠ নামাঙ্কিত একটি দেওয়াল-ঘড়ি।

বি. দ্র. — আমাদের ঘড়ি আছে কিন্তু ঘোড়া নেই। তাই ঘড়িটি আপনার কাছে পৌঁছে দেওয়া যাবে না। এসে নিয়ে যেতে হবে নিজেকেই। যাঁরা ডাকযোগে টাকা কিস্তি ব্যাঙ্ক ড্রাফট পাঠিয়ে গ্রাহক হবেন তাঁদের ঘড়ি সংরক্ষিত থাকবে। যোগাযোগ করে সময়মতো এসে নিয়ে যাবেন।

যাঁরা ইতিমধ্যেই পত্রপাঠের গ্রাহক হয়েছেন

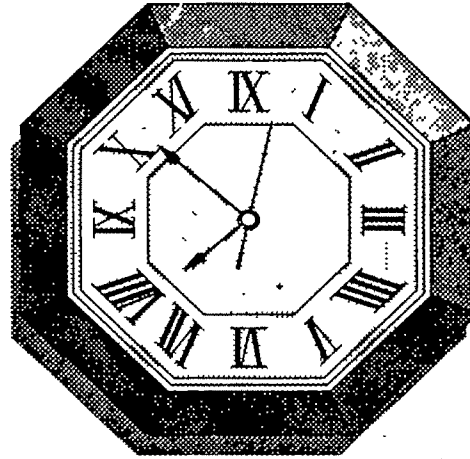
• তাঁদের কাছে অনুরোধ : আপনারা প্রত্যেকে
অন্তত দু’জন পরিচিতকে পত্রপাঠের গ্রাহক করান।

গোমড়া মুখে আর থাকা নয়। সারা বছরের শনি-মজার আগাম বারতা করে যান।
মাত্র ১২০ টাকা দিয়ে পত্রপাঠ মাসিকপত্রের এক বছরের
সডাক গ্রাহক হোন। আর সঙ্গে নিলে যান একটি সুন্দর
দেওয়ান ঘড়ি।

একদম



উপহার স্টক থাকা পর্যন্ত।
পেতে চাইলে কালকের জন্যে
অপেক্ষা করবেন না।
চলে আসুন আজই।



ফোনে যোগাযোগ :
২৪৪০-৩৮০৩
৯৮৩০০-৫২১৮২

হাসানোর জন্য আমরা দায়ী ফাঁসানোর জন্যে নয়।

পত্রপাঠ

১০ জে, ফার্ন রোড, কলকাতা-৭০০০১৯

সাদাকে সাদা ও কালোকে কালো বলার একমাত্র সহর্ষ মাসিকপত্র

জুন ২০০৩

দাম : ৮ টাকা

দু'কান-কাটাদের কানের ফুটোয় বড়াশ লাগিয়ে টান
মেরেছেন ভারতের প্রথম 'ম্যাগস্ট্রেইসেই' পুরস্কার-
প্রাপ্ত সাংবাদিক, 'যুগান্তর' ও 'দেশ' পত্রিকার ভূতপূর্ব
সম্পাদক ও বিশিষ্ট নিবন্ধকার অমিতাভ চৌধুরী—
জীনিরপেক্ষ নামেই যিনি সমধিক পরিচিত • প্রখ্যাত
কথাকার ও পত্রপাঠের জমাদার সমরেশ মজুমদার
• THE SUN পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক ওম্বিকা
ওপ্তো • চরণ বৈরাগী এবং ফজল আলি

পত্রপাঠ

৩য় বর্ষ ১১শ সংখ্যা

বিনায় নেবার জন্য নয়



কাউকে হাসানোর কাগজ
কাউকে ফাঁসানোর কাগজ

দু'কান-কাটা

বিনামূল্যে দেওয়াল-ঘড়ি

শেষ সুযোগ

৩১শে জুলাই ২০০৩



হ্যাঁ, ওইদিন পত্রপাঠের ঘড়ির বারোটাই বেজে যাচ্ছে। মানে ওইদিনের পর গ্রাহক হলে
আর ঘড়ি উপহার পাওয়া যাবে না।

সশরীরে আসা সম্ভব না হলে আগামী এক বছরের চাঁদা বাবদ ১২০ টাকার চেক
(শুধুমাত্র কলকাতা এলাকার জন্য) অথবা ড্রাফট বা মানি অর্ডার (কলকাতা ছাড়া অন্য
এলাকা) ওই তারিখের মধ্যে পাঠিয়ে দিন।

আপনার ঘড়ি অবশ্যই সুরক্ষিত থাকবে। পরে আপনার সুবিধামতো এসে নিয়ে যাবেন।



চেক বা ড্রাফট এই নামে হবে— PATRAPATH

পত্রপাঠ, ১০ জে ফার্ম রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৯

ফোন: ২৪৪০ ৩৮০৩, ৯৮৩০০ ৫২১৮২

সাদাকে সাদা ও কালোকে কালো বলার একমাত্র সর্ব মাসিকপত্র

কাউকে হাসানোর কাগজ
কাউকে ফাঁসানোর কাগজ

মে ২০০৩

দাম : ৮ টাকা

পত্রপাঠ
৩য় বর্ষ ॥ ১১শ সংখ্যা
বিদায় নেবার জন্য নয়

পুরনো কাসুন্দি : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের “পল্লীসমাজ” থেকে □ ৮

প্রচ্ছদ নিবন্ধ : ইরাক নিয়ে ইয়াকি • ওম্বিকা ওপ্তো □ ১১ দু’কান-কাটাদের চরিত্রনামা • শ্রীনিরপেক্ষ □ ১২

নিয়মিত কলাম : ফজল আলির ফাজলামি—কানকাটাদের রাজ্য □ ১৬ কড়চা ২০০৩—কুয়োভাদিস • অমিতাভ সান্যাল □ ১৭

অকপটে—পত্রপাঠের কান • সমরেশ মজুমদার □ ১৯ টীকা নিষ্পয়োজন—হা মরি বাংলা ভাষা • বুনো রামনাথ □ ২১ চরণ বৈরাগীর

ইকড়ি মিকড়ি—মুখ্যমন্ত্রীর বিশ্বরেকর্ড □ ২২ তারাপদ রায় ও গঙ্গারাম • তারাপদ রায় □ ২৭ হাজার রাজার বাজার—নামায়ণ •

অলোক বসু □ ৩৯



গল্প : লেবেল ক্রসিং • দিব্যেন্দু দাস □ ৪৩

ধারাবাহিক রসোপন্যাস : মারায়ণ • পিনাকীশঙ্কর চৌধুরী □ ২৮

অন্যান্য : রবীন্দ্র-সং-গীত • সুশান্ত রায় □ ২৪ দশে দেখাও দরজা • পঞ্চম

কলামটি □ ৩৪ মূল্যবান ছাত্র আমার • কমলকুমার দত্ত □ ৩৫ অমিতাভ

বচনকে চাই • পিনাকী ভাদুড়ী □ ৩৬ একটি প্রতিবেদন • রসময় চৌধুরী □

৩৭ ডু-বিন্দর-সং-গীত • স্বামী কমলানন্দ অবধূত □ ৪৮

নিয়মিত বিভাগ : সম্পাদকীয় □ ৫ পত্রপাঠ জবাব □ ৬ জবাব খবর □ ১৪

টার্সা চোখে □ ২০ খবর চড়াপড় □ ২৬ পথঘাটের-কিসসা □ ৩১ রাশি

চক্কোর □ ৪২ সিনেমা দুঃসংবাদ □ ৪৫ মহিলা মহল □ ৪৭ হেঁসেল □ ৫০

দু-কানকাটারা আমাদের কাছে বিলক্ষণ পরিচিত। সমাজে, রাজনীতিতে, সাহিত্যে—কোথায় নয়? তাদের কানের ফুটোয়

বঁড়শি লাগিয়ে টান মেরেছেন ভারতের প্রথম ম্যাগসোইসোই পুরস্কারপ্রাপ্ত সাংবাদিক, ‘যুগান্তর’ ও ‘দেশ’ পত্রিকার

ভূতপূর্ব সম্পাদক ও বিশিষ্ট নিবন্ধকার অমিতাভ চৌধুরী—শ্রীনিরপেক্ষ নামেই যিনি সমধিক পরিচিত; প্রখ্যাত কথাকার

ও পত্রপাঠের জমাদার সমরেশ মজুমদার; THE SUN পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক ও সাহিত্যিক ওম্বিকা ওপ্তো;

নামাবলীর আড়ালে চরণ বৈরাগী এবং আর এক ছুপা রুস্তম ফজল অলি □ ১১, ১২, ১৬, ১৯, ২২

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী • তারাপদ রায়

• সমরেশ মজুমদার • শঙ্করলাল ভট্টাচার্য

সম্পাদক : শেখর আহমেদ

পরিচালন সমিতি : ডাঃ তুষারকান্তি রায় • প্রদ্যোত কুমার মিত্র •

বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী • অঞ্জনা দত্ত • ডাঃ শুভাশিস নিয়োগী

• শচীন মিত্র

প্রচ্ছদ : রেবতীভূষণ

অলঙ্করণ : সুরিয়া খড়কর • জয়দীপ রাউত • সন্দীপ দেবনাথ

• নির্মাল্য দাশগুপ্ত • গুরুপ্রসাদ দাস • সুপর্ণা মণ্ডল

• কুটুস • দিব্যেন্দু দাস • উজ্জ্বল দাস

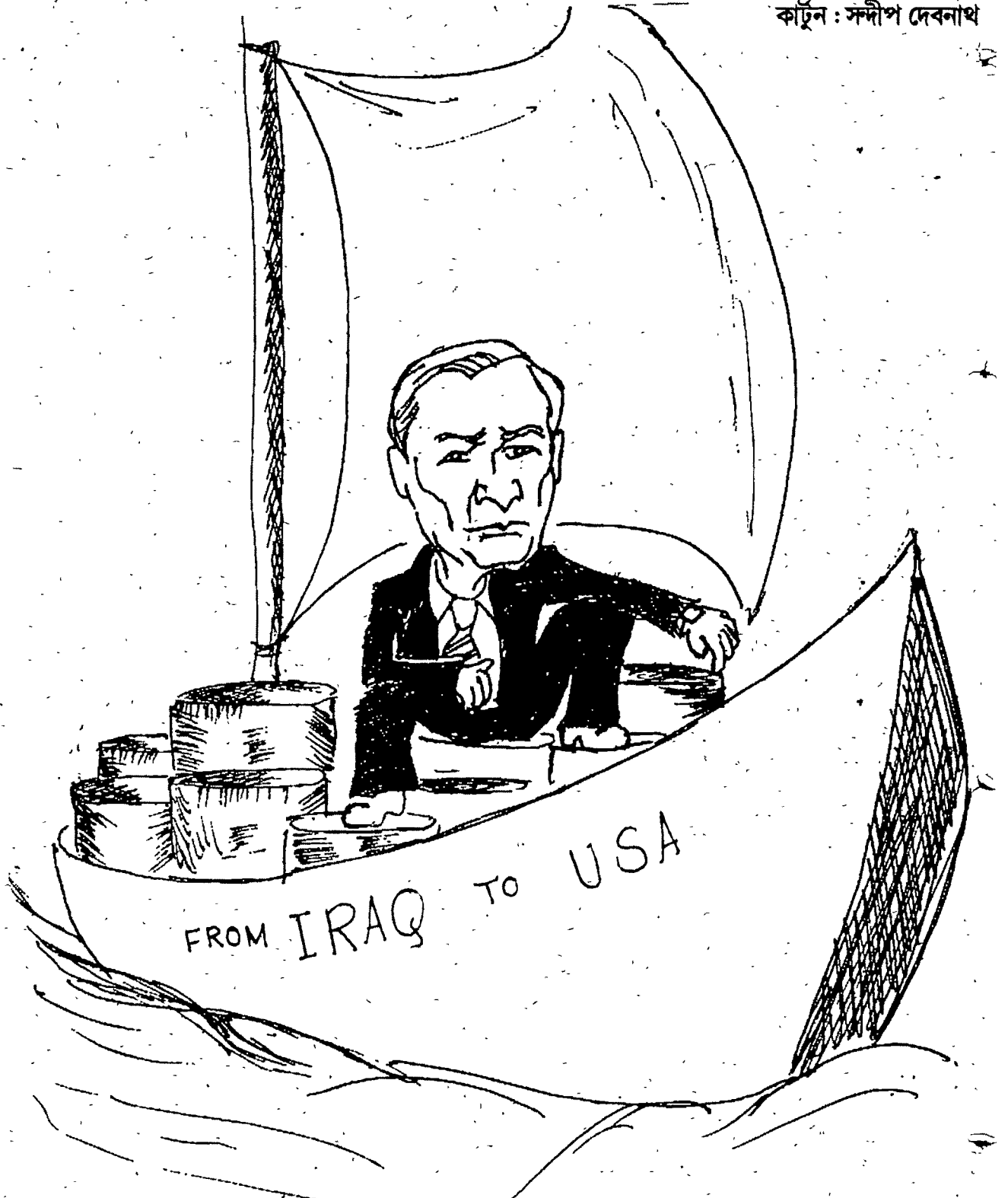
কর্ম সহায়ক : দিব্যেন্দু দাস

শেখর আহমেদ কর্তৃক ১০ জে, ফার্ম রোড (গ্রাউন্ড ফ্লোর), কলি-১৯ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন ২৪৪০-৩৮০৩, ৯৮৩০০-৫২১৮২।

বর্ষ ও চিত্র বিন্যাস : পত্রপাঠ, ১০ বি, ফার্ম রোড, কলি-১৯, প্রচ্ছদ মুদ্রণ : অঞ্জন ভৌমিক, গ্রহিক, ১এ কলেজ রো, কলি-৯, অঙ্গ মুদ্রণ : শান্তি মুদ্রণ,

৩২/৩ পটুয়াটোলা লেন, কলি-৯। কার্যালয় : ১০ বি, ফার্ম রোড, কলি-১৯।

কার্টুন : সন্দীপ দেবনাথ



আমি কাউকে তেল দিই না ॥ সন্দীপ

সঙ্গীদকায়



তৃতীয় কর্ণের কথা

শূর্ণখার নাসিকা সহ কর্ণ ছেদনের পরও সে দু-কান কাটা হইতে পারে নাই। দাদা রাবণের নিকট আকুল ক্রন্দনে ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। এবং তাহার ফলেই রাবণের ক্রোধবহির প্রজ্জ্বলন ও সবংশে ধ্বংস হওয়ার করুণ বৃত্তান্ত। পরশুরাম অবশ্য তাঁহার “স্মৃতিকথা” গল্পে বাঁধানো দাঁতের ন্যায় কাষ্ঠনির্মিত কর্ণ-নাসিকায় ভূষিত করিয়াছিলেন শূর্ণখাকে। একালের শূর্ণখারা কিন্তু নকল কর্ণ লইয়াই জন্মায়। তাহারা জননেতা হয়, অবতার হয়, মন্ত্রী হয়, ডাক্তার-উকিল-শিক্ষক এমনকি লেখকও হয়। এইসব শূর্ণখারা নারী পুরুষ—উভয় রূপেই বিরাজ করে। ইহাদের বহিরঙ্গের কর্ণ দুইটি কেবলমাত্র একদিক হইতে দুর্বাক্য শুনিয়া অপরদিক দিয়া নির্গত করিবার জন্য। ইহাদিগের একটি তৃতীয় কর্ণ আছে, যাহা দৃশ্যমান নহে। এই কর্ণ তক্কে তক্কে ওঁৎ পাতিয়া থাকে। যাহাতে মধু আছে তাহা কপ্ করিয়া ধরিয়া ফেলে; যাহাতে অন্ন তাহা সময়ে রামের নিকট হইতে শ্যামের বাটি এবং শ্যামের নিকট হইতে রামের বাটি পারাপার করিয়া থাকে। ইহাদের কপালে প্রাপ্তিযোগের শেষ নাই। ইহাদিগের প্রভুরা ইহাদিগের তৃতীয় কর্ণ মর্দন করতঃ বিলক্ষণ আমোদ অনুভব করেন এবং পুরস্কার, খেতাব ইত্যাদি উপহার দিয়া থাকেন। কিন্তু হায়, মানুষ বড়ই ঈর্ষাকাতর। সম্প্রতি কিছু দুরাচার আবির্ভূত হইয়াছে; তাহারা ইহার উহার কান টানিয়া পরখ করিতেছে কানটি আসল কি না। উদ্দেশ্য অতীব মন্দ—তৃতীয় কর্ণের রহস্য সর্বজন সমক্ষে ফাঁস করা। দু-কান-কাটা দিগকে সাবধান করিবার নিমিত্ত আমরা পাড়ায় পাড়ায় চিৎকার করিয়া বেড়াইতেছি। কিন্তু তাহাদিগের সুখী তৃতীয় কর্ণে কি এবস্থিধ দুঃসংবাদ প্রবেশ করে? হায়, কে বলিয়া দিবে।

পত্রপাঠ জবাব

জবাব দিচ্ছেন : দ্বিতীয় সুগ্রীব



- ‘জোখের বাগি’ কবে মুক্তি পাচ্ছে?

—শ্যামলী মা, রামদাসীহাটা, দঃ ২৪ পরগণা

- কোনো চক্ষু-বিশেষজ্ঞকে জিজ্ঞেস করুন।

- কলকাতার দূষণ কবে বন্ধ হবে? —জয়ন্ত রায়বর্মন; দুর্গাপুর

□ এমন দোষণীয় কথা আর বলবেন না। দূষণ কলকাতার ভূষণ। সে গেলে আর থাকবে কি?

- জীবন-সাম্রাজ্যে উপনীত হয়েছি। এখন পাপ-পুণ্যের হিসেবটা খুব জানতে ইচ্ছে করে। কিন্তু কার কাছেই বা পাব?

—রবিদাস পাকড়াশি, কোমগর, হুগলী

□ পুণ্যের হিসেব পাওয়া যাবে না। পাপের হিসেব কড়ায় গণ্ডায় পেয়ে যাবেন গৃহিনীর কাছে।

- লাই ডিটেস্টার বলে একটা যন্ত্র বেরিয়েছে নাকি? যাতে চাপালে সব চেপে যাওয়া কথা ছড়ছড় করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে? ইস, ‘আপনাদের, মানে পুরুষদের, মানে স্বামীদের কী দূর্বস্থা যে হবে। সকলেই আসামি হয়ে যাবে। হি-হি—

—তন্মিত্রা রায়, কলকাতা-১৬

□ যন্ত্রটা আপনাদের, মানে মেয়েদের, মানে বউদের ওপরে পরখ করা যাবে না— এমন কিন্তু নয়। কত বউ যে তখন দ্রৌপদী হয়ে যাবে। হা—হা—

- পৃথিবী কত দিনে ধ্বংস হবে বলতে পারেন?

—বুবুন দে, কলকাতা-৬৬

- আপনি নিশ্চিত—দিনেই? রাতে নয়।

- ‘ভবীর হাতে রবি ঠাকুর’ সংখ্যায় সমরেশ মজুমদার যে ‘রবীন্দ্রনাথের যৌনজীবন’ নামের বইয়ের কথা বলেছেন, তা কবে নাগাদ প্রকাশিত হবে? ভীষণ পড়তে ইচ্ছে করছে। —সুহাসচন্দ্র চাকলাদার, ঝাংপু

□ করছে তো? তবে। বাংলা বইয়ের পাঠক নাকি কমে যাচ্ছে। যন্ত্রসব নিম্নুকের রটনা। আপনারা আমাদের গৌরব, বাংলার গৌরব, বাংলা ভাষা-সাহিত্য-পাঠকের গৌরব। দয়া করে যদি একটা ছবি পাঠিয়ে দেন, ছেপে ধন্য হই।

- এবারের পঞ্চায়েত ভোটে এত খুনোখুনি কেন? বিধানসভা লোকসভা ভোটেও তো এত হয় না। এ রাজ্যে আইন-কানুন আছে?

—জগদীশ রায়, বহরমপুর

□ নিম্নুকের মুখ কে বন্ধ করবে। অসুখ-বিসুখ বৃদ্ধি পাচ্ছে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, শুধু খুনোখুনিটা বৃদ্ধি পেলেই রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে ট্যাচামেচি!!

- পত্রপাঠের বাড়াবাড়ি দেখে পান্টা একটি পত্রিকা বের করতে চলেছি। নাম হবে—‘চিতার কাঠ’; যেমন ‘শনিবারের চিঠি’-র পান্টা ছিল ‘রবিবারের লাঠি’। কেমন লাগছে শুনে? —বিশ্বরূপ হালদার, কলকাতা-৩৩

□ খুব ভালো লাগছে। পত্রপাঠের কেউ মারা গেলে, লেখক-পাঠক-গ্রাহক যেই হোক, ইলেকট্রিক চুলো চুলোয় যাক, সব ওই দিয়েই পোড়াব। অনেক টাকার সাশ্রয় হবে এবং সবই যাবে পত্রপাঠ ফান্ডে। ধন্যবাদ।

- আচ্ছা, দ্বিতীয় সুগ্রীব কি সত্যি বাদর?

—চুনীলাল দে, কৃষ্ণনগর

- হ্যাঁ, এবং সেই সুবাদে আপনার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়।

- চালাক লোক ঢের ঢের দেখেছি। কেউ কেউ মূর্খ সেজে থাকে কিন্তু মূর্খ নয়। একজন খাঁটি মূর্খের সন্ধান দিতে পারেন?

—অনন্তপ্রসাদ ব্যাপারী, হাওড়া

- পত্রপাঠের সম্পাদক।

- আপনাদের পত্রিকায় লেখিকার সংখ্যা এত কম কেন?

—রানি দে বিশ্বাস, কলকাতা-১৫

- লেখকদের চাপে। “নারীবাদী লেখক সমিতি” বলে একটা সংগঠন তৈরি হচ্ছে শুনেছি, লেখকবাও শুনেছেন। ফলে অনেক লেখকই মালকোঁচা মেয়ে ধন্যত হয়ে আছেন এখন থেকেই। লড়বার জন্যে নয়, ওঁরা হাজার হওয়া মাত্র পালাবার জন্যে।

- বিজেপির মতো ভণ্ড সাম্প্রদায়িক দল এদেশ শাসন করছে ভেবে লজ্জা বোধ কবি।

—শুভশঙ্কর সেন, ইছাপুর

- কোন আঙ্কেলে বলছেন? বিজেপিই একমাত্র সত্যের পূজারী, এঁরা খুঁজে বের করছেন সব আদি সত্য। মসজিদ নয়, মন্দির ছিল বলে তুলে দিচ্ছেন হিন্দুদের হাতে। খুব শিগগিরিই এঁরা জেনে যাবেন যে এ দেশ আদতে ছিল অনার্যদের। দ্রাবিড়, অস্ট্রিক—এদেরই। অমনি তামিল, কোল, ভীল, সাঁওতাল, মুন্ডা—যাবতীয় খাঁটি অনার্যদের হাতে রাজ্যপাট তুলে দেওয়া হবে। আমরা কেউই খাঁটি অনার্য নই কি না। তখন বাজপেয়াজি, যোশীজি,

আদবানিজি, আপনি, আমি সবাই হাত ধরাধরি করে গান গাইতে গাইতে বেরিয়ে পড়ব—সব ঠাই মোর ঘরে আছে আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া। যদি দয়া করে পাকিস্তান বা বাংলাদেশ শরণার্থী শিবিরের ব্যবস্থা করে। নয়ত পথে পথে গাছতলাতেই বাকি জীবনটা...। এতবড় আত্মত্যাগে যাঁরা প্রস্তুত, তাঁদের আপনি নিষেধ করছেন?!!

- সমরেশ মজুমদার তো দেখছি কাউকেই রেয়াৎ করছেন না। ছাল ছাড়িয়ে দিচ্ছেন একধারসে সকলেরই। তারাপদ রায় কাউকে আক্রমণ করছেন না কেন?

—অনিতা দলুই, মেদিনীপুর

- আমরাই করতে দিই না; ভয়ে। আক্রমণ করে, তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া গেল, তিনিই আহত হলেন। কিন্তু তারপব? কাত হয়ে যখন পড়বেন তার ওপর? রায়মশায়ের শরীরের আয়তন এবং ওজন সম্পর্কে আমরা যথেষ্ট সচেতন। শেষে খুনের দায়ে ফাঁসি যাবেন। তখন পত্রপাঠে গঙ্গারামায়ণ গাইবে কে, আপনি!!

- আপনারা এত ‘দেশ’দ্রোহী কেন?

—মৈথিলী চ্যাটার্জী, কলকাতা-১৭

- ‘দেশ’-এরই স্বার্থে। ‘দেশ’টা যে রসাতলে যাচ্ছে।

- অন্যদের এত পিন না ফুটিয়ে নিজেদের চেহারা-চরিত্রগুলো একবার আয়নায়ে দেখুন।

—শর্মিলা রায়, আসানসোল, বর্ধমান

- আমাদের আয়নাটা যে আপনাদের দিকেই খোরানো আছে। আগে আপনাদের দেখা শেষ হোক।

আপনার নিজস্ব কম্পিউটার আছে? কিন্তু জানেন না বিশেষ কিছু? ব্যাঙ্কের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা নানান কম্পিউটার সেটারে গিয়ে পকেট খালি করার আর দরকার নেই। ঘরে বসেই অতি সহজে শিখে নিন সব রহস্য।

বাংলায় কম্পিউটারের বই



তপন সাহার

কম্পিউটারের সহজপাঠ ৩৫

কম্পিউটার ইন্টারনেটের অ আ ক খ ৪০

মাদার পাবলিশিং

৪১/এ, বেনিয়াটোলা লেন

কলকাতা-৯ ফোন : ৩১০১-৮৯৩৭

Our Publications

MIDNAPUR BOOK DEPOT
12, BIDHAN SARANI, KOLKATA-700 006



CHALANTIKA PRAKASHAK
4, COLLEGE ROW, KOLKATA-700 009



S. CHOWDHURY & CO.
12, BIDHAN SARANI, KOLKATA-700 006

Phone : 2241-4212/7602

E-mail : mbd@vsnl.net

subhasmbd@rediffmail.com

পুরনো কাহিনী

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের “পল্লীসমাজ” থেকে

কর্মবাড়ি। মধ্যে শুধু দুটা দিন বাকি। বৃহস্পতিবার রমেশের পিতৃত্যাক। দুই-একজন করিয়া ভিন্ন গ্রামের মুকুর্বিরা উপস্থিত হইতেছেন। কিন্তু নিজেদের কুঁয়াপুরের কেন যে কেহ আসে না, রমেশ তাহা বুঝিয়াছিল এবং হয়ত শেষ পর্যন্ত কেহ আসিবেই না তাহাও জানিত। শুধু ভৈরব আচার্য ও তাহার বাড়ির লোকেরা আসিয়া কাজকর্মে যোগ দিয়াছিল। ব্রাহ্মণদিগের পদধূলি আশা না থাকিলেও উদ্যোগ-আয়োজন রমেশ বড়লোকের মতোই করিয়াছিল। আজ অনেকক্ষণ পর্যন্ত রমেশ বাড়ির ভিতরে কাজকর্মে ব্যস্ত ছিল। কি জন্যে বাহিরে আসিতেই দেখিল, ইতিমধ্যে জনদুই প্রাচীন ভদ্রলোক আসিয়া বৈঠকখানার বিছানায় সমাগত হইয়া ধূমপান করিতেছেন। সম্মুখে আসিয়া সবিনয়ে কিছু বলিবার পূর্বেই পিছনে শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দেখিল, এক অতি বৃদ্ধ গাঁচ-ছটি ছেলেমেয়ে লইয়া কাসিতে কাসিতে বাড়ি ঢুকিল। তাহার কাঁধে মলিন উস্তরীয়, নাকের উপর একজোড়া তাঁটার মত মস্ত চশমা—পিছনে দড়ি দিয়া বাঁধা। সাদা চুল, সাদা গৌরু তামাকের ধূয়ায় তাম্রবর্ণ। অগ্রসর হইয়া আসিয়া সে সেই ভীষণ চশমার ভিতর দিয়া রমেশের মুখের দিকে মুহূর্তকাল চাহিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে কাসিয়া ফেলিল। রমেশ চিনিলা না ইনি কে, কিন্তু যেই হোন ব্যস্ত হইয়া কাছে আসিয়া তাহার হাত ধরিতেই সে ভাঙ্গা গলায় বলিয়া উঠিল, না বাবা রমেশ, তারিণী যে এমন করে কাঁকি দিয়ে পালাবে, তা স্বপ্নেও জানিনে, কিন্তু আমারও এমন চাটুয্যেবংশে জন্ম নয় যে, কাক ভয়ে মুখ দিয়ে মিথ্যা কথা বেরবে। আসবার সময় তোমার বেণী ঘোগালের মুখের সামনে বলে এলুম, আমাদের রমেশ যেমন প্রাঙ্গের আয়োজন করচে, এমন করা চুলোয় যাক, এ অঙ্কলে কেউ চোখেও দেখেনি। একটু থামিয়া বলিল, আমার নামে, অনেক শালা অনেক রকম করে তোমার কাছে লাগিয়ে যাবে বাবা, কিন্তু এটা নিশ্চয় জেনো, এই ধর্মদাস শুধু ধর্মেরই দাস, আর কারো নয়। এই বলিয়া বৃদ্ধ সত্যভাষণের সমস্ত পৌরুষ আত্মসাৎ করিয়া গোবিন্দ গাঙ্গুলীর হাত হইতে হাঁকাটা ছিনাইয়া লইয়া তাহাতে এক টান দিয়াই প্রবলবেগে কাসিয়া ফেলিল।

ধর্মদাস নিতান্ত অত্যাক্তি করেন নাই। উদ্যোগ-আয়োজন যেরূপ হইতেছিল, এদিকে সেরূপ কেহ করে নাই। কলিকাতা হইতে ময়রা আসিয়াছিল। তাহারা প্রাঙ্গের একধারে ভিমান চড়াইয়াছে—সেদিকে পাড়ার কতকগুলো ছেলেমেয়ে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে; কান্দালীসের বস্ত্র সেওয়া হইবে—চণ্ডীমণ্ডলের ও-ধাবের বাবান্দায় অনুগত ভৈরব আচার্য ধান ফাড়িয়া পাট করিয়া গাদা করিতেছিল—সেদিকেও জনকয়েক লোক থাকা পাতিয়া বসিয়া এই অপব্যয়ের পরিমাণ হিসাব করিয়া মনে মনে রমেশের নিরুজ্জ্বলতা জন্য তাহাকে গালি পাড়িতেছিল। গরীব-দুঃখী সংবাদ পাইয়া অনেক দূরের পথ হইতেও আসিয়া জুটিতেছিল। লোকজন, প্রজা-পাঠক বাড়ি পরিপূর্ণ করিয়া কেহ কলহ করিতেছিল, কেহ বা মিছিমিছি শুধু

কোলাহল করিতেছিল। চারিদিকে চাহিয়া ব্যায়বাহ্য্য দেখিয়া ধর্মদাসের কাসি আরও বাড়িয়া গেল।

প্রত্যন্তরে রমেশ সঙ্কুচিত হইয়া ‘না না’ বলিয়া আরও কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু ধর্মদাস হাত নাড়িয়া থামাইয়া দিয়া ষড়্ ষড়্ করিয়া কত কি বলিয়া ফেলিল, কিন্তু কাসির ধমকে তাহার একটি বর্ণও বুঝা গেল না।

গোবিন্দ গাঙ্গুলী সর্বাত্মে আসিয়াছিল। সুতরাং ধর্মদাস তাহা বলিয়াছিল। তাহা বলিবার সুবিধা তাহারই সর্বাপেক্ষা অধিক থাকিয়াও নষ্ট হইয়াছে ভাবিয়া তাহার মনে মনে ভারি একটা ক্ষোভ জন্মিতেছিল। সে এ সুযোগ আর নষ্ট হইতে দিল না। ধর্মদাসকে উদ্দেশ করিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, কাল সকালে, বুঝলে ধর্মদাসদা, এখানে আসব বলে বেবিযেও আসা হ’ল না—বেণীর ডাকাডাকি—গোবিন্দখুড়ো, তামাক খেয়ে যাও। একবার ভাবলুম, কাজ নেই—তারপর মনে হ’ল ভাবখান বেণীর দেখেই যাই না। বেণী কি বললে জান বাবা রমেশ। বললে, খুড়ো, বলি তোমরা ত রমেশের মুকুর্বি হয়ে দাঁড়িয়েচ, কিন্তু জিজ্ঞেস কবি, লোকজন খাবে-টাতে ত? আমিই বা ছাড়ি কেন। তুমি বড়লোক আছ না আছ, আমার বমেশ কারো চেয়ে খাটো নয়। তোমার ঘবে ত এক মুঠো চিড়ের পিতোশ কার নেই। বললুম বেণীবাবু, এই ত পথ, একবার কান্দালী-বিদায়টা দাঁড়িয়ে দেখো। কালকের ছেলে বমেশ, কিন্তু বুকের পাটাও বলি একে। এতটা বয়েস হ’ল, এমন আয়োজন কখনও চোখে দেখিনি। কিন্তু তাও বলি ধর্মদাসদা, আমাদের সাধিই বা কি। যার কাজ তিনি উপর থেকে কবাচ্ছেন। তারিণীদা শাপজন্তু দিকপাল ছিলেন বৈ ত নয়।

ধর্মদাসের কিছুতেই কাসি থামে না, সে কাসিতেই লাগিল, আর তাহার মুখের সামনে গাঙ্গুলীমশাই বেশ বেশ কথাগুলি অপরিপক্ক তরুণ জমিদারটিকে বলিয়া যাইতে লাগিল দেখিয়া ধর্মদাস আরও ভাল কিছু বলিবার চেষ্টায় যেন আকুলি-বিকুলি করিতে লাগিল।

গাঙ্গুলী বলিতে লাগিল, তুমি ত আমার পর নও বাবা—নিতান্ত আপনান। তোমার মা যে আমাব একেবারে সাক্ষাৎ পিসতুতো বোনের খুড়তুতো ভগিনী। রাধানগরের বাঁড়ুয়া বাড়ি—সে-সব তারিণীদা জানতেন। তাই যে-কোন কাজকর্মে—মামলা-মোকদ্দমা করতে, সাক্ষী দিতে—ডাক গোবিন্দকে।

ধর্মদাস প্রাণপণ বলে কাসি থামাইয়া ঝিচাইয়া উঠিল—কেন, বাজে বকিস্ গোবিন্দ? থক্—থক্—থক্—আমি আজকের নয়—না জানি কি? সে বছর সাক্ষী দেবার কথায় বললি, আমার জুতো নেই, শালিপায়ে যাই কি করে? থক্ থক্—তারিণী অমনি আড়াই টাকা দিয়ে একজোড়া জুতো কিনে দিল। তুই সেই পায়ে দিয়ে বেণীর হয়ে সাক্ষী দিয়ে এলি। থক্—থক্—থক্—

গোবিন্দ চন্দ্র বস্ত্রবর্ণ করিয়া কহিল, এলুম?

এলিনে?



দূর মিথ্যাবাদী।

মিথ্যাবাদী তোর বাবা।

গোবিন্দ তাহার ভাঙ্গা ছাতি হাতে করিয়া লাফাইয়া উঠিল, তবে রে শালা।

ধর্মদাস তাহার বাঁশের লাঠি উঁচাইয়া ঘৃষ্কার দিয়াই থচগুভাবে কাসিয়া ফেলিল। বমেশ শশব্যস্তে উভয়ের মাঝখানে আসিয়া পড়িয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। ধর্মদাস লাঠি নামাইয়া কাসিতে কাসিতে বসিয়া পড়িয়া বলিল, ও শালার সম্পর্কে আমি বড় ভাই হই কিনা, তাই শালার আক্কেল দেখ—

ওঃ, শালা আমার বড় ভাই। বলিয়া গোবিন্দ গাঙ্গুলীও ছাতি গুটাইয়া বসিয়া পড়িল।

শহরের ময়রারা ভিয়ান ছাড়িয়া চাহিয়া বহিল। চতুর্দিকে যাহারা কাজ-কর্মে নিযুক্ত ছিল, চোঁচামেচি শুনিয়া তাহারা তামাশা দেখিবার জন্য সুমুখে ছুটিয়া আসিল। ছেলেমেয়েরা খেলা ফেলিয়া হাঁ করিয়া মজা দেখিতে লাগিল এবং এই সমস্ত লোকের দৃষ্টির সুমুখে রমেশ লজ্জায় বিষ্ময়ে হতবুদ্ধির মত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না। কি এ? উভয়েই প্রাচীন, ভদ্রলোক—ব্রাহ্মণ-সন্তান। এত সামান্য কারণে এমন ইতরের মত গালিগালাজ করিতে পারে। বারান্দায় বসিয়া ভৈরব কাপড়ের ধাক দিতে দিতেই সমস্তই দেখিতেছিল, শুনিতেছিল। এখন উঠিয়া আসিয়া রমেশকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, প্রায় শ' চারেক কাপড় ত হ'ল, আরও চাই কি?

রমেশের মুখ দিয়া হঠাৎ কথাই বাহির হইল না। ভৈরব বমেশের অভিজ্ঞত ভাব লক্ষ্য কবিয়া হাসিল। মৃদু অনুযোগের স্বরে কহিল, ছিঃ গাঙ্গুলীমশাই। বাবু একেবারে অবাক হয়ে গেছেন। আপনি কিছু মনে করবেন না বাবু, এমন ঢের হয়। বৃহৎ কাজ-কর্মের বাড়িতে কত ঠেঙ্গা-ঠেঙ্গি

রক্তারক্তি পর্যন্ত হয়ে যায়—আবার যে-কে সেই হয়। নিন্ উঠুন চাটুয্যেমশাই—দেখুন দেখি আরও ধান ফাড়াব কি না?

ধর্মদাস জবাব দিবার পূর্বেই গোবিন্দ গাঙ্গুলী সোৎসাহে শিরশ্চালনপূর্বক খাড়া হইয়া বলিল, হয়ই তা। হয়ই তা। ঢের হয়। নইলে বিরদ কর্ম বলেচে কেন? শাস্ত্রের আছে লক্ষ কথা না হলে বিয়েই হয় না যে। সে বহুব—তোমার মনে আছে ভৈরব, মৃদু মুখ্য্যেমশায়ের কন্যা রমার গাছ পিতিষ্ঠের দিনে সিঁদে নিয়ে রাঘব ভট্টাচার্য্যেতে হাবাণ চাটুয্যেতে মাথা-ফাটাফাটি হয়ে গেল? কিন্তু আমি বলি ভৈরব-ভায়া, বাবাজীরা এ কাজটা ভাল হচ্ছে না। ছোটলোকদের কাপড় দেওয়া আর ভস্মে ঘি ঢালা এক কথা। তার চেয়ে বামুনদের একজোড়া, আর ছেলেদের একখানা করে দিলেই নাম হ'ত। আমি বলি বাবাজী, সেই যুক্তিই করুন, কি বল ধর্মদাসদা?

ধর্মদাস ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিল, গোবিন্দ মন্দ কথা বলেনি, বাবাজী। ও ব্যাটার হাজার দিলেও নাম হবার জো নেই। নইলে আর ওদের ছোটলোক বলেচে কেন? বুঝলে না বাবা রমেশ।

এখন পর্যন্ত রমেশ নিঃশব্দে ছিল। এই বক্তব্যবিতরণের আলোচনায় সে একেবারে যেন মর্মান্বিত হইয়া পড়িল। ইহার স্মৃতি-কুস্মিত স্মৃতি নহে, এখন এইটাই তাহার সর্বাপেক্ষা অধিক বাজিল যে, ইহার যাহাদিককে ছোটলোক বলিয়া ডাকে, তাহাদেরই সহস্র চক্ষুর সম্মুখে এইমাত্র যে এতবড় একটা লজ্জাকর কাণ্ড করিয়া বসিল, সেজন্য ইহাদের কাহারও মনে এতটুকু ক্ষোভ বা লজ্জার কণামাত্রও নাই। ভৈরব মুখপানে চাহিয়া আছে দেখিয়া রমেশ সংক্ষেপে কহিল, আরও দু-শ' কাপড় ঠিক করে রাখুন।

তা নইলে কি হয়? ভৈরবভায়া, চল, আমিও যাই—তুমি একা আর কত পারবে-বল? বলিয়া কাহারও সম্মতির অপেক্ষা না করিয়া গোবিন্দ উঠিয়া বস্ত্রাশির নিকটে গিয়া বসিলেন। রমেশ বাটীর ভিতর যাইবার উপক্রম

করিতেই ধর্মদাস তাহাকে একপাশে ডাকিয়া লইয়া চুপিচুপি অনেক কথা কহিলেন। রমেশ প্রত্যন্তরে মাথা নাড়িয়া সম্মতিজ্ঞাপন করিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। কাপড় শুষ্কহিতে শুষ্কহিতে গোবিন্দ গাঙ্গুলী আড়চোখে সব দেখিল।

কৈ গো, বাবাজি কোথায় গো? বলিয়া একটি শীর্ণকায় মূর্তিতত্ত্বার্থ প্রাচীন ব্রাহ্মণ প্রবেশ করিল। ইহার সঙ্গেও গুটি-তিনেক ছেলেমেয়ে। মেয়েটি সকলের বড়। তাহারই পরনে শুধু একখানি অতিজীর্ণ ডুবে কাপড়। বালক-দু'টি কোমরে এক-একগাছি ঘুনসি ব্যতীত একেবারে দিগম্বর। উপস্থিত সকলেই মুখ তুলিয়া চাহিল। গোবিন্দ অভ্যর্থনা করিল, এস দীনুদা, ব'সো। বড় ভাগ্য আমাদের যে আজ তোমার পায়ের ধুলো পড়ল। ছেলেটা একা সাবা হয়ে যায়, তা তোমরা—

ধর্মদাস গোবিন্দের প্রতি কটমট করিয়া চাহিল। সে জঙ্কেপমাত্র না করিয়া কহিল, তা তোমরা ত কেউ এদিক মাড়াবে না দাদা—বলিয়া তাহার হাতের ঝাঁকাটা তুলিয়া দিল। দীনু ভট্টাচার্য আসন গ্রহণ করিয়া দম্ব হুঁকাটায় নিরর্থক গোটা-দুই টান দিয়া বলিল, আমি ত ছিলাম না ভায়া—তোমার বৌঠাকরুনকে আনতে তাঁর বাপের বাড়ি গিয়েছিলুম। বাবাজী কোথায়? শুনচি নাকি ভারী আয়োজন হচ্ছে? পথে আসতে ও গাঁয়ের হাটে শুনে এলুম খাইয়ে-দাইয়ে ছেলে-বুড়োব হাতে বোলখানা কবে লুচি আর চাব-জোড়া করে সন্দেশ দেওয়া হবে।

গোবিন্দ গলা খাটো করিয়া কহিল, তা ছাড়া হাতে একখানা করে কাপড়ও। এই যে রমেশ বাবাজী, তাই দীনুদাকে বলছিলুম বাবাজী,—তোমাদের পাঁচজনের বাপ-মায়ের আশীর্বাদে যোগাড়-সোগাড় একরকম করা ত যাক্, কিন্তু বেণী একেবারে উঠে পড়ে লেগেছে। এই আমার কাছেই দুবার লোক পাঠিয়েছে। ত আমার কথা না হয় ছেড়েই দিলে, রমেশের সঙ্গে আমার যেন নাড়ির টান রয়েছে; কিন্তু এই যে দীনুদা, ধর্মদাসদা, এঁরাই কি বাবা তোমাকে ফেলতে পারবেন? দীনুদা তা পথ থেকে শুনতে পেয়ে ছুটে আসছেন। ওরে ও বতীচরণ, তামাক দে না রে। বাবা রমেশ, একবার এদিকে এস দেখি, একটা কথা বলে নিই। নিভুতে ডাকিয়া লইয়া গোবিন্দ কিস্কিস্ কবিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ভিতরে বুকি ধর্মদাস-গিন্নী এসেছে? খবরদার, খবরদার, অমন কাজটি করো না বাবা। বিটলে বামুন যতই ফোসলাক, ধর্মদাস-গিন্নীর হাতে ভাঁড়ারের চাবি-টা বিদে না বাবা, কিছুতে দিও না—খি, ময়দা, তেল, নুন অর্ধেক সরিয়ে ফেলবে। তোমার ভাবনা কি বাবা? আমি গিয়ে তোমার মামীকে পাঠিয়ে দেব। সে এসে ভাঁড়ারের ভাব নেবে, তোমার একগাছি কুটো পর্যন্ত লোকসান হবে না।

রমেশ ঘাড় নাড়িয়া 'যে আজ্ঞা' বলিয়া মৌন হইয়া রহিল। তাহার বিশ্বাসের অবধি নাই। ধর্মদাস যে তাহার গৃহিণীকে ভাঁড়ারের ভার লইবার জন্য পাঠাইয়া দিবার কথা এত গোপনে কহিয়াছিল, গোবিন্দ ঠিক আশ্চর্য কবিয়াছিল কিরাপে?



ইরাক নিয়ে ইয়ার্কি

ওম্বিকা গুপ্তো

হা বশিরাগানের নত্তে মিস্তিরের মতে কথাটা আসলে, 'সত্যম, সাদ্দাম, সুন্দরম'। 'শিবম' শব্দটি 'সাদ্দাম'-এব সংস্কৃতায়ন। মূল শব্দটি ফার্সি, সাদ্দাম। শব্দ দুয়ণেব আবো নজির দেখিয়েছিল নস্তে। যেমন, লাদেন-এর কান্দাহাবে ডেরা বাঁধবার আগে সবাই বলে আসছিল, 'তমসো মা জ্যোতির্গময়'। তা তো নয়, বাক্যটির শুদ্ধ উচ্চারণ হল 'ওসামা মা জ্যোতির্গময়'। আববিকৃত। ওসামা বিন লাদেন অবশ্য এখনো জ্যোতির্গময় হননি। আঁধার থেকে অলোয় আসা হয়ে ওঠেনি লাদেনেব। ধুয়ো দিয়ে শুহ থেকে টেনে আনার যে ছমকি দিয়েছিলেন বুশ, সেটা লাদেন কানেই তোলেননি।

সাদ্দামকে নিয়েও বুশের অবস্থা তথৈবচ। বুশ ব্রায়ারের ববকন্দাজরা খুঁজেই পাচ্ছে না সাদ্দামের সঠিক ঠিকানাটা আজ ক'মাস ধরে। অবশ্য দোষও খুব একটা দেওয়া যায় না সেপাইদের। একটা ঠিকানা তো নয় যে থেকতারি পবোয়ানা নিয়ে দবজায় হাজির হলেই হল। ইরাকে নাকি তেলের কুয়ো যত, সাদ্দামেব প্রাসাদও তত। বুশের তো ওই একটাই ঠিকানা—হোয়াইট হাউস। চালা ব্রায়ারেরও তাই—দশ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিট। দুটোই সরকারি বাসা।

সাদ্দাম কে'থায়? কেন, তথ্যমন্ত্রী সাহাব তো কিছু লুকোছাপা করেননি। স্পষ্টবক্তা উনি। স্পষ্টই বলে দিয়েছেন, বাড়িতেই আছেন, মানে প্রাসাদে বহাল তবিয়েতে আছেন প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন। এই এলেন বলে সদর বাস্তায়। মার্কিন আর ইংরেজগুলোকে বেঁটিয়ে তাড়াতে। থুড়ি, বাগদাদের রাস্তায়, আবার ইংরেজ, মার্কিন কোথায়? ওগুলো তো সেই কুয়েতে বসেই ইট-পাটকেল হুঁড়ছে। বাগদাদ তো দূরের কথা, ইবাকের মাটিতেই পা বাধার হিম্মত হবে না ওদের। রিপাবলিকান গার্ডেব জুজুর ভয় আছে না।

পালেস্তিন হোটোলে থ্রেস ব্রিফিংয়েও সাহাব মুক্তকণ্ঠ। এয়ারবোর্ন ডিভিশনের বিছানায় বসে আসা (এম-বেডেড) জনৈক অর্বাচীন মার্কিন সাংবাদিক প্রশ্ন কবলেন :

তাহলে সাদ্দামের দুম্বো দুম্বো মূর্তিগুলো গুঁড়িয়ে গুঁড়িয়ে চুরমার করছে কারা?

সাদ্দামের মূর্তি? সেরেফ ধান্না। ওগুলো আসলে বুশ 'আব ব্রায়ারের ধাতুর কুশপুতলিকা। ইরাকিরা রাগের মাথায় রানিয়েছিল তো, তাই চেহারাগুলো ঠিক মেলাতে পারেনি। এখন ওরাই সেগুলো ভাঙছে। দাহ করার রীতি নেই এ মূলুকে। তাই কুশপুতলিকা হয়েও পুড়ে মবার-যজ্ঞণা থেকে বেঁচে গেল বুশ-ব্রায়ার এ যাত্রায়।

মুদু হেসে জবাব দিলেন তথ্যমন্ত্রী।

বাগদাদ আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্ট আজ মার্কিনদের কবলে কেন?

প্রশ্নটি করলেন কুয়েত টিভি-র এক প্রতিবেদিকা।

বাগদাদ আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্ট? সেটা আবার কোন চুলোয়— ওয়াশিংটন না লন্ডনে? তবে হ্যাঁ, সাদ্দাম হোসেন আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্ট এই কাছেপিঠেই আছে। আর সেটা আমাদের বগলে, ওদের দখলে নয়। বলেন তো হাওয়া খেতে খেতে দেখিয়ে আনি আপনাদের।



‘বামদাদে ভ্রাক্ত’ হাস্য মনোভ

সাদ্দাম কি তবে হারেমের বোরখা পরে চরে খাচ্ছে?

নস্তে মিস্তির বলেছিল, চরে খাচ্ছে কি কবে খাচ্ছে জানি না। তবে হ্যাঁ, সাদ্দামেব 'সেফ হেভেন' বলতে ওই একটাই। হারেমের কায়েম হয়ে আছে সাদ্দাম। রাজা আর খোজা ছাড়া হাবেমে ঢোকান অধিকারই নেই কারুর। বুশের পস্টনেবা ওখানে গায়ের জোরে হামলা করলে খোদ আমেরিকার 'ফেমিনিস্ট' আলোচনাকারীরা বুশকে কিছু ছেড়ে কথা বলবে না। ঝেড়ে পাঁচটা ভালোমন্দ শুনিতে দেবে। বুশের তখন ইশ আসবে বাপ-বাপ বা বুশ-বুশ বলে। বাপও তো ওই বুশ।

আমেরিকায় শুনি, কাগজেও পড়ি, ইরাককে নিয়ে ঠাট্টা-মস্করার মান্টি-মিলিয়ন ডলারের এক ব্যবসা জমে উঠেছে। নাইট ক্লাবে, হোটেল-রেস্তোরাঁয়, টিভিতে। কাগজের কলমে কলমে ইরাককে নিয়ে ভাঁড়ামি একেবারে তুঙ্গে। আমাদের বইপাড়ার ভাষায়, এটাই এখন খাচ্ছে লোকে, হেসে হেসেই।

এখানে কিন্তু মুখ্য ভূমিকায় বুশ ব্রায়ার সাদ্দাম কেউই নন। সব রঙ-তামাশার মূল স্রোত 'কমিক আলি'কে ঘিরে। 'কমিক আলি'? এই নামেই উনি আমেরিকার আমজনতার কাছে আজ পরিচিত। পেটাগনের তাসের প্যাকে অবশ্য উনি মহম্মদ সৈয়দ আলসাহাব, সাদ্দামের তথ্যমন্ত্রী। তুলাপের তাস। কোনো গতিকে ইনি যদি নিউইয়র্কে একবার ডেরা বাঁধতে পারেন তাহলে ঠেকালেই সোনা। মানুষটা এখনো অজ্ঞাতবাসে। তা সছেও ওঁর থ্রেস ব্রিফিং-এর ক্যাসেট দেখিয়েই হাজার হাজার ডলার কামাচ্ছে পাঁচ ভূতে।

ইরাকি ইয়ার্কি নিয়ে টিভিতেও কুইজ প্রতিযোগিতা শুরু হল বলে। প্রশ্ন : ধিক অব বাগদাদ ছবির নতুন সংস্করণে মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় কববেন কে? সাদ্দাম হোসেন? জর্জ বুশ? অন্য কেউ? প্রথম পুরস্কার: ইউ, এস মেরিগনের সঙ্গে এক বিছানায় (এম-বেডেড) সাত দিনের বাগদাদ সফর মুকতে। উপরি, সাদ্দামের প্রাসাদে রাতিবাস একদিনের জন্যে।

সঠিক উত্তর দিয়েছিল হাবশি বাগানের নস্তে মিস্তির :

টনি ব্রায়ার। 'বাগদাদে ডাকাত' বা 'বাগদাদে বর্গিহানা' ছবি হলে জর্জ বুশকেই মানাত। চোর-ছাঁচড়েব ভূমিকায় টনি স্কুস দ্য পাট।



মুখ্যাত্মমুখ্যমন্ত্রী লালুপ্রসাদকে কয়েকবার জেলে-গারদে পাঠিয়েও কোনো হিল্লো হল না। কেবল কি আঞ্চলিক সি বি আই অধিকর্তারই দু'কান কাটা গেল? না কি, দু'কান গেল রাবড়ীপ্রসাদ লালুজির

দু'কান-কাটার চরিতনামা

শ্রীনিরপেক্ষ

দু'কান কাটা একটি নতুন সভ্যতা, বেশ কিছুদিন হল পশ্চিমবঙ্গে আস্তে আস্তে উদ্ভিত হয়েছে। এটা লক্ষ্য করিনি আমরা ইতিপূর্বে। সে কে-ই বা লক্ষ্য করেছে, যখন সভ্যতাটির উদয় হচ্ছিল অন্যান্য দেশে? হঠাৎ চোখে পড়ার মতো ব্যাপারই নয় ওটা। কারো বাড়িতে আগুন লাগলে, কিংবা ডাকাত পড়লে যেমন কাছেরিতে পাড়াপড়শি জুড়ে হৈ হৈ পড়ে যায়, দু'কান কাটা সভ্যতার উত্থান তো তেমন ঘটনা নয়। লোকের ভিড়ে কলকাতা ভরে গেল যখন, ওই হকং সম্বন্ধে যেমন বলা হয়, এখানে পা-টুকু ফেলবার ঠাই নেই। কিন্তু কারো চোখে লাগে, আচমকা? ধীরে ধীরে ছেলেমেয়েরা বড় হতে থাকলে যেমন চোখে পড়ে না, বিদেশ থেকে কোনো অস্বীয়া ফিরে এসে হয়ত বলেন—ওটা কি খোকন নাকি গো? ওমা, এইটুকু ছিল, এখন নিজে নিজে জামা-জুতো পরে ইন্ডুল চলে যাচ্ছে? তাও একা?

ওই দর্শকের চোখে পড়ল, সে বাইরে ছিল বলে। অন্য দর্শকের পড়ল না, তারা কাছে ছিল বলে। দু'কান কাটা সভ্যতাটির উদয়ও সেইরকম।

তবে ওটা হল জনসমষ্টিতে নিয়ে দু'কান-কাটা সভ্যতার উদয়ের কথা। ব্যক্তি-বিশেষের 'দু'কান কাটা গেল' ব্যাপারটা অন্য ধরনের। সেদিন রাস্তায় একটা লোক আর একটা লোককে বললে, "এই যে মশাই, আপনি কি দু'কান কাটা? আপনি গায়ে পড়ে বেয়হিবাড়ির কাছে নিজেই কথা পাড়তে,

দয়া চাইতে যাচ্ছেন? দু'টো কানই কি গেল তাহলে?"

পান কিনে বাড়ি ফেরার পথে কথাটা শুনে আমি ভাবতে লাগলাম, তাহলে আমি যা জানতাম তাও তো সর্বাংশে একেবারেই খাটছে না? আমি জানতাম, যার বিবেক নেই তার কানও নেই। দু'কান-কাটা হয়ে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এবার বুঝছি যে, যার হায়া নেই, তারও দু'কান কাটা। অথবা, সে-ই প্রকৃতপক্ষে দু'কান-কাটা। কিন্তু কানেব সঙ্গে হায়া কিংবা আত্মসম্মান বোধকে জুড়ল কে? বাঙালিরাই একমাত্র, যতদূর জানি, হায়ার সঙ্গে কানের অঙ্গের যোগটি লক্ষ্য কবেছে। ইংরাজি, বা ফরাসি, কিংবা জাপানি, অথবা চীনে ভাষায় এইবকম ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধবোধ জাগায় এমন কোনো প্রবচন নেই। 'কান মলে সেওয়া' বাল্যকালে একটা চরম অপমানের জ্বালা বলে মনে হত। তারই প্রমাণ, "কানে হাত দে, বল—আর করবি না।" ইত্যাদি। আরো ব্যাপারটাকে অপমানের শেষ হিসাবে যখন আনা হয় তখন কি দু'কান-কাটার জন্ম? যে ব্যক্তি নিজেই নিজের অপমান করেন তিনিই প্রকৃত দু'কান-কাটা।

হতেও পারে।

পত্রপাঠের সম্পাদক বর্গোছাপেন, এই ইরাকের ঘটনায় কাকে—বুশ না ব্রেকার, কাকে আমার দু'কান-কাটা বলে মনে হয়?

বুশ প্রায় দু'বছর আগে তত্ত্বি করে বলেছিলেন, ওসামাকে তিনি “জীবিত বা মৃত” ধরে আনবেন, “প্রকৃত ন্যায়বিচারের সামনে”। ওসামাকে ধরা গেল না। আফগানিস্তানকে নতুন টেকনোলজির আওতে পোড়ানো হল। মৌলবাদী মৌলভিদের ইকুলে পড়া, না খেতে পাওয়া, কোরাণ মুখস্থ করা বেকার-কিশোর গেল হাজারে হাজারে ধর্মোচ্ছার করতে তালিবান হয়ে। ভালো করে তাদের দাড়িও গজায়নি। লিপস্টিক লাগানো চোঁট দেখলে তাদের ভয় করে। কাজেই তালিবান নবজাগরণে আধসিকের সেপাই হয়ে তারা যাত্রাদলের নাটকে নেমেছিল। ওখানে ধর্মও হবে, দু'বেলা চাপাটিও পাওয়া যাবে। ওই হাড়-হাতাতেদের তিন কি সাড়ে তিন হাজারকে বন্দী করে নিয়ে লোহার পিঞ্জরাবদ্ধ করে রাখা হল ওয়াদালকানল ধীপে—কিউবা এবং আমেরিকার জলধিপারে। কোথায় দুর্গমগিরি কাছার মরু, আর কঁহা ভি কিউবা। তখন বুশ দেখলেন, এইসব খড়িকাটির দশা পি-ও-ডব্লিউ দিয়ে তাঁর মহামুখের মান যায়-যায়। বললেন, ইরাকের সাদ্দাম হুসেনকে ধরে আনতে হবে। ওসামা নেই, তালিবানও ফড়িং-এর মতো পলকা সেপাই, তাহলে কী হবে? এবার তাহলে উর্দুপরা একটা মুসলমান হিটলারই ধরে আনব। ইরাক হল এখন ধ্বংসজ্বলের একটা নৈরাজ্য।

“

ভোল বদল করাকে দু'কান-কাটা
পলিটিশিয়ান বলা যায় কি?
কান নিয়ে জন্মায়ইনি, তার আবার
দু'কান কাটার প্রশ্ন উঠছে কী করে?

”

কিন্তু ওখানেও সাদ্দাম চিরহীন ভাবে নিরুদ্ভিষ্ট। কাজেই ঘরের দেয়ালে কুলিয়ে পড়শিদের সেধানোর মতো একটা বন্য মহিষের মাথা পাওয়া গেল না। এবার দেখা যাবে, ডন কুইকসো কাকে ধাওয়া করেন। কিন্তু তাঁর দু'কান-কাটা চেহারা ভাব হয়েছে, এমন তো মনে হয় না। সেটা কি বিবেক নেই বলে? অথবা হায়াহীন রাজনীতিতে আছেন বলে? তাঁর বেলায় বোধহয় প্রগটাই অবাস্তর। যার জন্মেই হায়া নেই বা ছিল না, সেইরকম রাজনীতির লোককে কেউ দু'কান-কাটা বলবে?

মমতা ব্যানার্জি আদর্শের শপথ নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন। আবার আর একটা শপথ নিয়ে মন্ত্রীসভায় ঢুকতে চলেছেন। হঠাৎ-জাগা আদর্শ দু'মাসের গ্রীষ্মে শুকিয়ে যখন কাঠ, অজিত পাঁজা, এমনকি সুদীপরাও দিল্লির বরপুত্র হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তখন “চূপচাপ ফুলে ছাপ” নয়, চূপচাপ আঁচলের গিটে আদর্শটিকে বেঁধে দিয়ে জর্জ ফার্নান্দেজের স্নেহাকাঙ্ক্ষী হলেন অন্য এক মমতা। কোথায় কোন দফতরের মাধ্যম এখন তাঁর জায়গা হবে, তাও দিল্লির সংবাদদাতারা মে মাসের আঠেরো তারিখের মধ্যেই প্রায় নিশ্চিত জেনে গেছেন। ভোল বদল করাকে দু'কান-কাটা পলিটিশিয়ান বলা যায় কি? কান নিয়ে জন্মায়ইনি, তার আবার দু'কান কাটার প্রশ্ন উঠছে কী করে?

বুশের ‘সামার সন্ট’, আর মমতার ভোল বদলের মধ্যে তফাৎ আছে

কি? কোথায়? সেটা এখনো ঠাঠর করে উঠতে পারিনি।

অটলবিহারীজি কৃত্রিম হাঁটুর জন্য পা ধবে ধবে হাঁটেন, হাঁটুটা তাঁর ভাঁজ হয় না। হাঁটু না ভাঁজ করে তিনি মুশারফের সঙ্গে লাহোর-দিল্লি-আগ্রা করেছেন কয়েকবার। মার্কিন পররাষ্ট্র উপসচিব রিচার্ড আর্মিটেজও জানেন, কোন পরমপিতার প্রসন্নতা সম্পাদনের জন্য পূর্বকার বে-হাঁটুভাঁজ বৈঠকগুলি ঘটতে হয়েছিল। এবারেরটিও কার মনোরঞ্জননের জন্য, সে আর্মিটেজও চেপে রেখেছেন, দিল্লির বড় আমলারাও। শুধু পৌ-ধরা কিছু সাংবাদিক বলছে, জীবনের শেষ প্রান্তে এসে অটলজি একটা ঐতিহাসিক কাণ্ড করতে চলেছেন; যেন লালবাহাদুর শাস্ত্রীর তাসবন্দু যাওয়া।

ইতিমধ্যে রাজস্থান পাঞ্জাব সীমান্তে বারুদ টাটকা রেখে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল অর্ধকোটি সৈন্য, প্রায় অর্ধ বৎসর। আমরা, করমাতারা তার টাকা জোগালাম। কিন্তু গিয়ে কী ফয়দা উঠল, না গেলে কী বেসামাল হতে হত—সেসব খোলসা করে কেউ বলল না। হঠাৎ রাজস্থান গুজরাটের ট্রেনগুলি গাড়িয়ে ওই মৌজিরা বিনা ভাড়ায় বাড়ি ফিরে এসে। কারাগিরে তবু পূজার নৈবেদ্যের ন্যায় দেখতে একটা টিলা পুনর্দখল করা গিয়েছিল ১১-১২ হাজার ফুট উচ্চতায় প্রাণ দিয়ে। প্রাণপণ লড়াই করে। এবার পাক সীমান্তের সমতল ক্ষেত্রে চাষীদের গমের ক্ষেতের ফসল দূরমুশ করে কোন টিলাটি দখল হল—জানা যায়নি। যাবেও না। কিন্তু অটলজির কি দু'কান কাটা গেছে? মানালিতে গিয়ে পাহাড়ি গোলটুপি মাথায়, গলায় তাঁর ফুলের মালা দোলানো। এই আসন্ন অশীতিপর কবি-প্রধানমন্ত্রীকে তো কেউ দু'কান-কাটা বলছেন না।

এতে একটা বিষয়ে আমি নিশ্চিত হয়েছি যে, যাহা দৃষ্ট কিংবা অদৃষ্ট তাহা দ্বারা হায়া আছে-কি নাই, বিবেক স্মৃতিক্ষেপে তোলা, কি বাইপাস-স্করা হৃদযন্ত্রটির পাশে উসখুস করছে, এইসবের দ্বারা দু'কান-কাটা হওয়া বা না হওয়া নির্ভর করে না।

যে ব্যক্তি দেখে, সেই কেবল জানে, কারো দু'কান কাটা কি কাটা নয়।

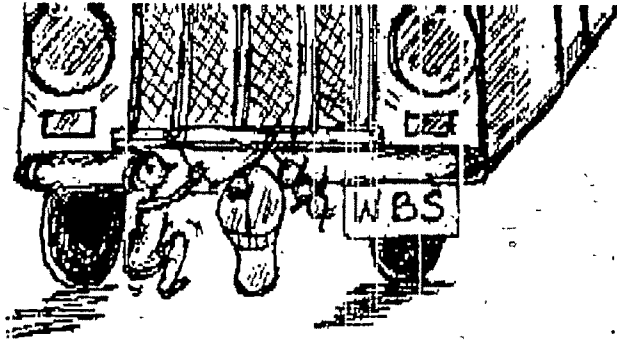
শেঁশসুন্দর লোক আমেরিকায় এখনো বলতে শুরু করেনি যে, এই ছোটো ‘বুশবাবুর’ দু'কান কাটা। মমতাকে, ফার্নান্দেজকে, প্রবু মহান দক্ষিণের সিঙ্গে আবৃত জয়ললিতাকে কেউ বলছে না—তার দু'কান কাটা। তৃতীয় জন সন্দেহে এইরকম একটা নিম্নচাপ উত্তরাবর্তের বাতাসে শুরু হয়েছিল। সে চাপও বেশিদিন টিকল না, নিম্নচাপটি তামিলনাড়ুর আকাশকে অস্থিরও করল না। ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিপুলতম মুখ্যমন্ত্রী বহাল তবিরভেই রয়েছেন।

আমাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্যে রাবড়িসেবী মুখ্যমন্ত্রী হয়ে রয়েছেন। পর্দার অন্তরালে মুখ্যমুখ্যমন্ত্রী লালুপ্রসাদকে কয়েকবার জেলে-গারদে পাঠিয়েও কোনো হিমে হল না। কেবল কি আঞ্চলিক সি বি আই অধিকর্তারই দু'কান কাটা গেল? না কি, দু'কান গেল রাবড়িপ্রসাদ লালুজির?

লালু-রাবড়ির গদির স্থায়িত্ব জ্যোতি-বুদ্ধসেবের স্থায়িত্বের মতোই নিরাপদ দৈর্ঘ্য লাভ করে কোয়ার্টার সেঞ্চুরির দাগ ছড়িয়েছে। তাতেও পশ্চিমবঙ্গেব কমিউনিস্ট নেতারা কোয়ার্টার সেঞ্চুরি পার হওয়ার গর্ব ছাড়ছেন না। তাতে জ্যোতিবাবু কিংবা বুদ্ধসেবাবুর কি দু'কান কাটা গেছে? নাকি লোকে ওইরকম বলতে শুরু করেছে?

‘গণশক্তি’র নতুন বিজ্ঞাপনটি সগৌরবে লিখছে—“আমরা নিরপেক্ষ নই”। তাতে কি বর্তমান লেখকের দু'কান কেটে রক্ত গলছে? ‘বর্তমান’ অনেকদিন আগে বাহাদুর জোগানটা বের করেছিল: ভগবান ছাড়া আর কাউকে ভয় সে করে না। বাহাদুর বটে। কিন্তু তাতে কি ভগবানের দু'কান কাটা গেছে?

জৈবিক হাঙ্গার



বাস-বাম-বীমা

হাফ রিপোর্টার : পয়লা এপ্রিলের দুর্ঘটনার পর আর দুর্ঘটনার শেষ থাকবে না বাস-যাত্রীদের। দুর্ঘটনা সুনিশ্চিত করতে এবার আসছে দুর্ঘটনা-বীমা। যাত্রীদের দুর্ঘটনা ঘটিয়ে পকেটে থিমিয়ামের ব্যবস্থা করছে সরকার। এবার থেকে বাসে উঠলেই পদে পদে দুর্ঘটনা।

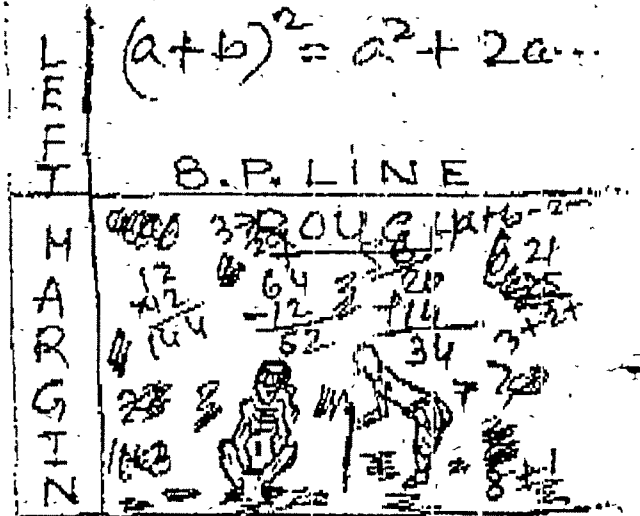
তেলের দাম বাড়লে যোয়ার দামও বাড়বে, এতে আর আশ্চর্য কী? বীমার থিমিয়ামও পিছিয়ে থাকবার পাত্র নয়। এবার থেকে বাস-মালিকদের হাতেহাতে ধরে বীমা কোম্পানিও দুর্ঘটনায় ফেলবে যাত্রীদের। তাগিস, যোয়া কোম্পানি বলে কিছু নেই।

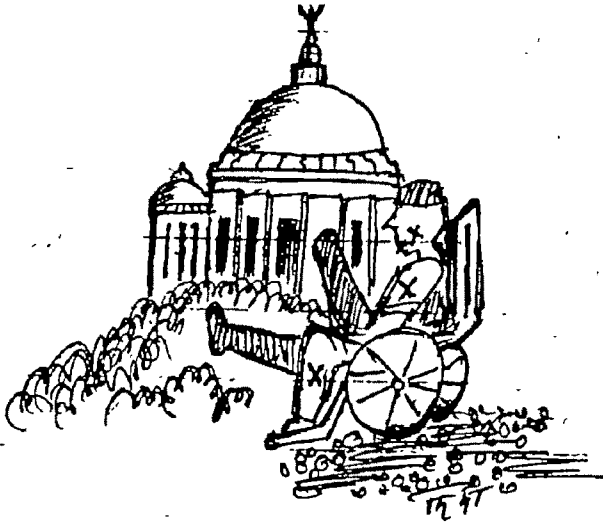
জ্বালানির জ্বালা কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই বীমার জ্বালায় জ্বলবে যাত্রী। সঙ্গে থাকছে দুর্ঘটনার নিশ্চয়তা। এরপর যাত্রী-কল্যাণে হয়ত প্রতিটি বাসের পেছনে অ্যাম্বুলেন্স ছোটাবে সরকার। কে কখন দুর্ঘটনায় পড়ে। ধরুন, বাগবাজার থেকে বাসে উঠে যাবেন শ্যামবাজার। বাজার করতে। ভাড়া দিতে গিয়ে দেখলেন, বাজারে দেবার কিছুই রইল না। আর থাকবেই বা কি করে? জ্বালানি আছে, বীমা আছে, পিছনে অ্যাম্বুলেন্স আছে, গাড়ির ট্যাক্স আছে, মালিকের সংসার আছে, ড্রাইভারের চোলাই আছে, কন্ডাক্টরের সাত্তা আছে, ডেহিকেলসের ভাইরা আছে, পার্টির চাঁদা আছে। সব মিলিয়ে দু-কিলোমিটার পর্যন্ত দূশ টাকা। না পোষায় নেমে যাও। গণতান্ত্রিক আন্দোলন তো পায়ে হেঁটে হয়। গাড়ি চেপে কাউকে রেল অবরোধ, পথ অবরোধ, আইন অমান্য করতে দেখেছ? গাড়ি তো মালিকের আর শাসকের জন্যে। কাস্তে বা হাতুড়ি নিয়ে জম্মালে সারা জীবন মাঠ ধরে, আল ধরে আর পতাকা ধরে চলতে হবে। তার বীমা করা আছে বামপন্থায়।

বি পি এল

হাফ রিপোর্টার : বি.পি.এল বেলেঙ্গা-পনা (সেনিনবাদী)। অর্থাৎ সেনিনবাদীদের বেলেঙ্গাপনা। মহামতি সেনিন তাঁর সেনিনবাদে কমরেডদের মনোরঞ্জনর কোনো ব্যবস্থা রাখেননি। মোবাইল ফোনে কেমন আছে। ছেলে হতে দেরি আছে, বউয়ের পেন্‌লেট, ওয়ার্ডের সিঁড়িতে বসে ততক্ষণ রাক্ষস রাক্ষস খেলো। ইনকামিং আর টাইমপাস ফ্রি।

রাজস্ব চালাতে চালাতে কমরেডরা ক্লাস্ত। তাই বিমানবাবুরা বি.পি.এল খেলা বার করেছেন। সেনিনেব নামে উৎসর্গ করে বাজারে ছেড়েছেন খেলার নিয়ম—এ রাজ্যে গরিব কত বলতে হবে। পঞ্চায়েতের আগে কম্পিউটার পোস্টকার্ডে উত্তর লিখে আলিমুদ্দিনে পাঠাতে হবে। জিতে নাও জ্যাকপট—আগামী বিধানসভার টিকিট, আর ভোট হারলেও একটা নিরুপস্রব মন্ত্রী। যেমন আদিবাসী-কল্যাণ মন্ত্রী। আদিবাসীরা আত্মও জানে না। এছাড়া থাকছে সাধুনা পুরস্কার—পঞ্চায়েত। বি.পি.এল খেলার নিয়মাবলী বুঝে নাও। এ রাজ্যে কত শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে তা পরিসংখ্যান সহযোগে লিখে পাঠাও। তবে ৩৬ শতাংশ মানুষ বা তার ওপর বেশানো চলবে না। পুলিশে ধরবে। কাণ্ড কেন্দ্র বলেছে—৩৬ শতাংশ দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকে। আমরা বিরোধী।





ভিক্টোরিয়া দর্শন

হাফ রিপোর্টার : ভিক্টোরিয়াকে দু'বেলা বাঁটা দেবার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জগমোহন ১৬ কোটি বরাদ্দ করেছেন। গা-গাতর পরিষ্কার, গম্বুজ সাবাই, নতুন গ্যালারি, ব্লাস্ক কর্ণার, ইস্টারনেট, ফাইবার অপটিক, আলো আব পাথুরে পথের সৌন্দর্য খাতে ঐ টাকা খরচ করা হবে। তবে সবচেয়ে আকর্ষণীয় হবে দর্শকদের ওয়াকম্যান পরিয়ে ভিক্টোরিয়ার ইতিহাস শোনানো আব ছইল চেয়ারে বসিয়ে চারিদিক ঘুরিয়ে দেখানো। বর্তমানে ভারতীয় শিল্প-স্থাপত্যের প্রতিবন্ধী অবস্থার কথা বিবেচনা করেই নাকি এই ব্যবস্থা। তবে অপ্রতিবন্ধী দর্শকদের ক্ষেত্রে প্রথমে পিটিয়ে প্রতিবন্ধী করে তারপর ছইল চেয়ারে বসিয়ে মধ্যযুগীয় ইতিহাস শোনাতে শোনাতে...

করতে সক্ষম হয়েছেন। এক সতর্কবার্তায় তাঁরা জানিয়েছেন যে তেইশ জোড়া প্রেমিক-প্রেমিকার ওপর তাঁরা এই পরীক্ষা করেছেন। তাদের মধ্যে আঠারো জোড়া আসলে অভিনেতা-অভিনেত্রী। যারা অভিনেতা-অভিনেত্রীর হাত থেকে মুক্তি পেতে চান এবং বৌটিয়ে বিষ ঝাড়তে চান তাঁরা এই বিজ্ঞানের সাহায্য নিতে পারেন।



বৌটিয়ে বিষ ঝাড়ার বিজ্ঞাপন

হাফ রিপোর্টার : বিজ্ঞান এতদিনে মুখ তুলে চাইল শকুন্তলাদের দিকে। 'আমি তোমার ভালোবাসি' বলে একটা আংটি গছিয়ে কেটে পড়েছিল রাজা দুহাস্ত। আমিও তেমনি একটা চুলের ক্লিপ কিনে দিয়ে কেটে পড়েছিলাম। আমার বাবা তো আমাব জগ তৈরি করেই কেটে পড়েছিল। কত শকুন্তলাই তো দু'পাতা ঘূমের ওয়ুধ খেয়ে জীবন-গাড়ি থেকে মাঝরাস্তায় নেমে গেল। যে বলেছিল 'আমি তোমার প্রেমে পাগল' সে অন্য একটা গোলমাল দেখে মেয়ে বিয়ে করে নিল। অবশ্য বাস্তবটা এরকম একপেশে নয়। অনেক শকুন্তলা দুহাস্তের দু'পুরুষের সঞ্চয় ঝেড়ে দিল সিনেমা দেখে। তারপর বাপির দেখা ইঞ্জিনিয়ার ছেলের সঙ্গে ঝুলে গেল। কেরানি দুহাস্ত বাউল হয়ে পথে পথে ঘুবছে। সাধের লাউ বানাইল মোরে বাউল।

এবার বিজ্ঞান এসে পাশে দাঁড়াল। একটা ছোট্ট পরীক্ষা হবে, প্রেমিক-প্রেমিকার, আলাদা আলাদা ভাবে। প্রিয়তম বা প্রিয়তমার ছবি সামনে রেখে সেই অবস্থায় ব্রেন স্ক্যান করা হবে। তারপর ছবি বদল করে বাবা বা মার ফটো সামনে রেখে আর একবার স্ক্যান হবে। প্রেম সাচা হলে দুটো স্ক্যান রিপোর্ট এক হবে না। আর গচ্চা হলে একদম এক হবে। লন্ডন ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞানীরা এই 'বিজ্ঞানসন্মত' উপায়ে প্রেমে ভেজাল বের

বাংলার স্বার্থে

পরম সংবাদদাতা : তিনি বাংলার স্বার্থে হাওয়াই চম্বল পবেন। নীলপাড়া সাদা শাড়ি? সেও ওই বাংলার স্বার্থে। গুরু হয়েছিল কংগ্রেস ছাড়া দিয়ে। বিজেপির সঙ্গে গাঁটছড়া? কেন্দ্রীয় মন্ত্রী? সবই বাংলার স্বার্থে। কী না করেছেন তিনি বাংলার স্বার্থে? গঠবন্ধন। বন্ধন তোড়। রেলমন্ত্রক থেকে বাংলার মাটিতে কাঁপ। নাকে খং দিয়ে কংগ্রেসের ন্যাজ ধরা। শেষে ন্যাজেব ঝাপটা সহিতে না পেবে ন্যাজ ছাড়া। কিন্তু ন্যাজ ছাড়া যে টিকে থাকাই দায়। অতএব বাংলার স্বার্থে, শুধু বাংলার স্বার্থে, তিনি আবার ন্যাজ ধরলেন বিজেপির; একেবাবে নাক-কান কেটে রক্তারক্তি। বাংলাব স্বার্থে তিনি সব পারেন। অতঃপর বাংলার স্বার্থে একটি মন্ত্রীদের জন্যে ঝুলোঝুলি শুক হল। শিকে আর ছেঁড়ে না। শেষে যদি বা ছিঁড়ল, ও মা, তার মধ্যে বসে আছে বোয়াদব সুদীপ বৌজুজ্য। অতএব বাংলার স্বার্থে তিনি গর্জে উঠলেন— চাই না মন্ত্রীত্ব। এমনকি জোটেরও স্বস্বীপূজো করে ছাড়বেন। বন্ধন তোড়। হ্যাঁ, এও বাংলাব স্বার্থে। সুতবাং আপাতত সুদীপের মন্ত্রীত্ব-দীপটা আর স্থালানো হল না? বাজে তুলতে হল। সঙ্গে সঙ্গে বাংলার স্বার্থে তিনি গদিরদিকে শিনে শিনে... মমতা মন্ত্রী হচ্ছেন। এমন প্রাণঘাতী চেয়ারে তিনি বসতে যাচ্ছেন, প্রাণের মায়া ত্যাগ করে, আহ, নিতান্তই বাংলার স্বার্থে। সার্থক জনম বাংলার, কেন না তিনি, মমতা জন্মেছেন এই দেশে, বঙ্গোদরে।

ফজল আলির হাড্ডিমা



কানকাটারদের রাজ্য

এক যে ছিল রাজ্য। সে রাজ্যের মেয়ে-মন্দ সকলেরই কানই কাটা। কারো এক কান কাটা, কারো দু'কান। যাদের দু'কান কাটা তাদের ইচ্ছা বেশি। তাদের দৈম্যকও বেশি। এক কান কাটারাই তাই দু'কান কাটারদের ঈর্ষার চোখে দেখে। তাদের কেউ কেউ আবার গোপনে আর একটি কান কেটে নেওয়ার জন্যে তদ্বির করে। দিনের পর দিন হন্যে হয়ে ঘোরে। খেয়ে স্বস্তি নেই, ঘুমিয়ে শান্তি নেই এমন অবস্থা। কারো কারো ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে। দ্বিতীয় কানটি কেটে নেওয়ার আবেদন মঞ্জুর হয়। খবরের কাগজের প্রথম পাতায় বড় বড় হরফে সে খবর ছাপা হয়।

সঙ্গে ছবি। তার আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব তাকে অভিনন্দন জানায়। দ্বিতীয় কানটি যেদিন কাটা হয়, সেদিন তার বাড়িতে দিনব্যাপ্ত চলে মোহুর। চলবে না? তার যে কপাল খুলে গেল।

কান কাটা হয় বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে। না, পাড়ার হাক নাগিত এ কাজের যুগ্ম নয়। এজন্যে বিশেষ মেডিক্যাল বোর্ড আছে। বোর্ড-মেম্বাররা কান কাটার আগে 'দ্যাট ভেরি পার্সনের' পালস দেখে, হেশার চেক করে, কাউন্ট করে সুগার। হাঁটা-চলার ভঙ্গি দেখে, বুকের ছাতির মাপ নেয়, চোখের জ্যোতি দেখে, দাঁতের গড়ন দেখে। হাজারটা পরীক্ষা। পরীক্ষের

উত্তরে গেলে বৈদ্যুতিক কবাত্রে কানটি কেটে নেওয়া হয়। তারপর কানটি মালিকের পরিচিতি সহ পাঠিয়ে দেওয়া হয় রাজ্যের সংগ্রহশালায়। সেখানে কানটি সংগ্রহে বন্ধ করা হয়। কাটা কানকে এভাবেই সম্মান দেওয়া হয় সে রাজ্যে।

এ তো গেল দ্বিতীয় কান কাটার সিস্টেম। একে বলে 'লাকি অপারেশন'। তুলনায় প্রথম কানটি কেটে ফেলার পদ্ধতিটি সহজ। শিশুব জন্মের পরপরই তার বাঁ দিকের কানটি কেটে নেওয়া হয়। একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের উপস্থিতিতেই এ কাজটি করা হয়। একে বলা হয় 'অপারেশন আফটার বাথ'। সংক্ষেপে 'ও-এ-বি'। কান কাটা পর্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হলে অভিভাবকেরা নিশ্চিন্ত হন। শিশুর নাগরিকত্ব এতে স্বীকৃতি পায়।

দু'কান কাটারদের সংখ্যা আঙুলে গোনা যায়। মন্ত্রীকুল, রাজ্যের প্রথম সারির নেতাবা, বড় কুর্সিব আমলারা, বাছাই কিছু বুদ্ধিজীবী পুলিশেব হোমরা চোমবা বড় কর্তারা, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যেরা মুখ্যত এ তালিকায় শোভা পান। বাজের মানুষজন তাঁদের ভক্তি করে, শ্রদ্ধায় প্রণত হয়। তাঁরা রাজ্যের গৌরব। তাঁরা যা বলেন তাই বাণী হয়, তাঁরা যা করেন তাই কর্ম হয়, তাঁরা যা দেখেন তাই দর্শনীয় হয়।

এক কান কাটার খায়-দায় ঘুমোয়। কেউ কেউ অবশ্য ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখে—তার দ্বিতীয় কানটি কাটা হচ্ছে। খুব পবিত্র স্বপ্ন। এ স্বপ্ন গোপন রাখতে হয়। অন্তত ততদিন পর্যন্ত, যতদিন না এক কান কাটা দু'কান কাটা হচ্ছে।

এককথায় কানকাটারদের রাজ্য স্বর্গরাজ্য। এ রাজ্যের মানুষজন ভারি শান্ত। দু'কান কাটারদের সুশাসনে এক কান কাটার দল পরম শান্তিতে দিন কাটায়।

শুধু মাঝে মাঝে ভিন্ রাজ্যের না-কান কাটা কিছু দুদ্ভুতী এ রাজ্যে ঢুকে পড়ে উৎপাত সৃষ্টির চেষ্টা করে। তারা গ্রাম-গঞ্জে আগুন লাগায়, ক্ষেতের ফসল নষ্ট করে, গেবহুকে গুণ করে, নাবালিকাকে ধর্ষণ করে, বোমা ফাটায়। রাজ্যের দু'কান কাটার দল সে সব সন্ত্রাস হাঙ্গী হতে দেয় না। অলৌকিক তৎপরতায় দক্ষ গ্রাম-গঞ্জের বেবাক ছাই উড়িয়ে দেয়, ফসল-ক্ষেত শস্যপূর্ণ হয়ে ওঠে, গেরহু শহীদ বনে, নাবালিকাব দল উধাও হয়ে যায়, বোমার টুকরো খুঁজে পাওয়া যায় না। বাজ্যেব এক কান কাটার দল আবার ঘুমিয়ে পড়ে। দু'কান কাটারদের রাজ্যপাট মজবুত থেকে মজবুততর হয়। ঈশ্বর হাসেন। অদ্বুত বিচিত্র এক রহস্যময় হাসি।

—ফজল আলি

কড়চা ২০০৩

কুয়ো ভাদিস?

অমিতাভ সান্যাল



ভারতবর্ষের দৃষ্টিতে পশ্চিমবঙ্গ অণুঃসারশূন্য হলেও বুদ্ধিজীবীদের মাত্রা ও সচেতনতা এখনো এখানে নাকি ক্রিয়াশীল। অবশ্য বিয়য়টি আপেক্ষিক। আমাদের দৃষ্টিতে বিহাব বা আসাম কিম্বা উড়িষ্যা জনপদ নাকি? ওখানে তো হাফ নেকেড ফকিররা অ্যানিম্যালদের সাথে থাকে। চাকর-বাকর বা রাঁধুনি আসে এখানে। আহা, কি কষ্ট!

বুদ্ধিজীবীর তক্মা পরিমেছিলেন মহামতি গোখলে, তাঁর সেই বিখ্যাত উক্তির মাধ্যমে—What Bengal ইত্যাদি। লিগাসী চলছে বা চালানো হচ্ছে বোধহয়। কথা হল, ডাঃ বিধানচন্দ্র বায়েব আমল অন্দি চললেও তাকে যদি বর্তমানের প্রেক্ষাপটে স্থাপন করা হয় তবে তা নিঃসন্দেহে মর্মান্তিক হবে।

কেন? গত তিরিশ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গে এক মাৎস্যন্যায় চলেছে। লাগামছাড়া সরকারি অপদার্থতা ব নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত রূপে পশ্চিমবঙ্গ ইতিমধ্যেই পাদপ্রদীপের শীর্ষে উঠে এসেছে। এ জিনিস একদিনে হয়নি। তিল তিল করে এঁরা যে জতুগৃহটি নির্মাণ করেছে তাতে আশুন লাগলে লেলিহান শিখায় পশ্চিমবঙ্গ যে ছাঁরখার হয়ে যাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এমন নৈর্ব্যক্তিক, উদাসীন, আত্ম-মগ্ন, অচেতন ও আত্মঘাতী জনতা ভারতবর্ষের অন্যত্র কোথাও আছে বলে তো মনে হয় না আমাদের। এ কারণে মনে হয় আমাদের—আমেরিকা ইংলণ্ড বা ফ্রান্স-কানাডার অনুকরণে অথবা কৃত্রিম অনুকরণে যে গণতন্ত্র স্থাপন করেছেছি আমরা তার শিরোনাম হওয়া উচিত—Dictatorial Democracy বা চীনের Peoples' Democracy, অথবা পাকিস্তানের Basic Democracy'র চাইতেও ভয়ঙ্কর।

আমরা 'কুয়ো ভাদিস' শীর্ষক আলোচনায় ভাবতবর্ষের প্রেক্ষাপটে

পশ্চিমবঙ্গের কথা বলছি কারণ, বিশাল ভারতবর্ষের অন্তর্গত তিরিশটি রাজ্য তথা কিছু কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল তৎসহ বহু ভাষাভাষী মানুষের মনের কথা জেনে লেখা রেখায় তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা এক দূরত্ব কাজ বটে।

জন্মলাগ থেকেই খণ্ডিত বাঙলা ভাগ্যবিড়ম্বিত। বিহার বা কেরালা বা উত্তরপ্রদেশ দ্বিজাতিত্বের রোষে পড়ল না; পড়ল বঙ্গদেশ আর পাঞ্জাব। সেকালে নেহেরু জন্মানায় পূর্ববাসিন মন্ত্রী ছিলেন মেহেরচাঁদ খান্না, যিনি জন্মসূত্রে পাঞ্জাবী হওয়াতে স্বভাবতই একপেশে ছিলেন। তবে এ কথাও ঠিক যে সুযোগ-সম্মানী রাজনীতি-ব্যবসায়ী উদ্বাস্তুদের নিয়ে যেরকম খেলায় মেতেছিলেন মরিচকাপি পর্যন্ত—একটানা এক ভাবে—পাঞ্জাবে সে সবার কিছুই ছিল না।

পশ্চিমবঙ্গে গত পঞ্চাশ বছর ধরে সাতজন মুখ্যমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে প্রশাসন জনকল্যাণ করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। জনকল্যাণের বিষয়টি এখন মূর্খ ও নির্বোধের কাছেও প্রাঞ্জল। 'জনকল্যাণ' বলতে আমরা এমন একটা অবস্থা কল্পনা করি যেখানে তিরিশ শতাংশ হতদরিদ্র মানুষের পাশাপাশি আঠারো শতাংশ ভাগ্যবান মোট সম্পদের সিংহভাগ করায়ত্ত্ব করে সুখে দিনযাপন করে আর অন্তর্বর্তী বাহাম শতাংশ মানুষ হাঁসের মতো প্যাঁক প্যাঁক করে, বঙ্কিমচন্দ্র বিরচিত বাবু সম্প্রদায়ের লিগাসী পরমানন্দে বহন করে, ওয়েদার-ককের মতো স্থান পরিবর্তন করে, স্বপ্নের সওদাগরের কথায় প্রফুল্ল হয় আর অনাগত 'শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর' বিষয়ে নির্মোহ থাকে। দোকানদারের কাছে যাদের যেমন মা-লক্ষ্মী, সুযোগ-সম্মানী চতুর আত্মসুখসর্বস্ব রাজনীতি-ব্যবসায়ীদের, কাছে এরা তেমনিই।

প্রফুল্ল ঘোষ মশাই তেমন বুদ্ধি পোড় খাওয়া ধুরন্ধর মানুষ ছিলেন না বলে। দু-দফায় তাঁকে লেঙ্গি খাওয়ার যন্ত্রণা সহ্য করতে হচ্ছিল যথাক্রমে বিধানচন্দ্র রায় ও অজয় মুখার্জীর কাছ থেকে। তিতিবিরক্ত মানুষটি আর পুনরাগমনে প্রবৃত্ত হননি। তাঁর মুখ্যমন্ত্রীদের মেয়াদ এত স্বল্প সময়ের জন্য ছিল যে কিছু করবার সুযোগই পাননি তিনি।

তবে বিধানচন্দ্র রায় পেয়েছিলেন : ১৯৭৬ রাজনীতি তেমন ভালো না বুঝলেও, প্রধানত চিকিৎসক হিসাবে তাঁর জ্ঞান জোড়া খ্যাতির জন্য আর পণ্ডিত নেহেরুর সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের জন্য। তিনি অনেক কিছু করেছিলেন, তবে আরো অনেক কিছু করবার সুযোগ ছিল তাঁর। তাঁকে আমরা পরম শ্রদ্ধায় নব বাঙলার রূপকার বলি। বস্তুতপক্ষে তাঁর সময় আর্থ-সামাজিক কাজকর্ম মতটা হয়েছিল পরবর্তীকালে ভয়াবশে হয়নি।

ভুল মানুষ মাত্রই করে। রাজনীতিবিদেরা মানুষ যখন, তখন তাঁরে ঐতিহাসিক ভুলে নদী গতি পরিবর্তন করে। অজয় মুখার্জীকে যদি তদানীন্তন বঙ্গেশ্বর অসম্মান না করতেন, বাঙলা কংগ্রেস হত না। অজয়বাবু সুযোগ-সন্ধানীদের কাছে অবলম্বন ছিলেন। তাঁর প্রশয় ছিল বলেই শ্রমমন্ত্রী ঘেরাও-সংস্কৃতি আমদানি করে শিল্প-মানচিত্রটাই পাস্টে দিয়েছিলেন। অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে কেন্দ্রীয় সাহায্যের মুখাপেক্ষী একটি রাজ্য যদি ভাবে যে ডিক্টেটরশিপ অব দ্য প্রলতারিয়েত এসে গেল আর এখন থেকে এখানে মালিক শ্রমিক সমানাধিকার—তাঁরা যে মুর্খের স্বর্গে বসবাস করেন তাতে সন্দেহ কি।

অথচ এরাই প্রফুল্লচন্দ্র সেন মশাইকে স্বস্তিতে সবকার চালাতে দেননি। বিরোধী পক্ষ সুগঠিত হলে সরকারকে যে কী প্রবল অস্বস্তির মধ্যে পড়তে হয়—জ্যোতি বসু মশাই সে কথা হাড়ে হাড়ে টের পাইয়ে দিয়েছিলেন। আবার মুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় এলে তাঁর ঐতিহাসিক ঘোষণা—এবার নতুন বাঙলা গড়তে হবে। কাজ কবতে হবে। মানুষের বিশ্বাসভাজন হতে হবে।

জ্যোতি বসু মশাই-এর মতো বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান মানুষ এ রাজ্যে আর আসেনি। মুক্তফ্রন্টের ভেলায় চেপে বামফ্রন্ট, জনতা দলেব ভেলায় চেপে আরো শক্তপোক্ত বামফ্রন্ট ও গত পঁচিশ বছর ধরে একমেবাদ্বিতীয়ম বামফ্রন্ট। এঁদের বদান্যতায় দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে ঢের অকাজ হয়েছে। শহর নগর গ্রামে বর্ণময় পাটি-অফিস হয়েছে। মূলধন, পালিয়েছে। শহর নগর হকারদের মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়েছে। শাস জমি জবর দখল হয়েছে। ঘাটটি শনা বাজোটেব গাউন পরে অনুৎপাদনশীল খরচ নব্বই শতাংশ ছাড়িয়ে গিয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থা

লোহিত সন্ত্রাসের কবলিত হয়েছে। বন্যা হয়েছে খরা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সাহায্য পাটি-তহবিল বা নেতৃবিশেষদের সমৃদ্ধ করেছে; মানুষের চোখের জল মোছাতে পারেনি। রাজনৈতিক নেতা ও মন্ত্রীদের বিলাস বহুল জীবন যাপন রাজা-মহারাজাদের টেকা দিয়েছে। দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গে কোনো বিরোধী শক্তি নেই। তথাকথিত বিরোধিতার নামে আছে ক্রাউনের মতো হাত-পা বাড়িয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার প্রবণতা।

অথচ মানুষকে বিভ্রান্ত করতে শিল্প নিগমের বক্তৃতা বা উন্নততর বামফ্রন্টের প্রচার। মার্ক্সবাদীদের জমিদারীতে অর্থনীতির কেন্দ্রাঙ্গ যে কোন স্তরে পৌছেছে কিনা দারিদ্র্যরেখা—হিসাব করা কঠিন। একসময় ছিল পাইয়ে দেওয়া; এখন শুরু হয়েছে 'খাইয়ে দেওয়া'। বছর ইয়ারী সি. আই. আই-এর অধিবেশনে শিল্পপতিদের মোচ্ছবে মন্ত্রীদের বক্তৃতা ও করতালির বন্যা। শিল্পপতিরা খাওয়ানাওয়া করে তাজ বেঙ্গলে তোফা ঘুম দিয়ে নিজ নিজ কর্মস্থলে ফিরে যান। শিল্পমন্ত্রী বলেন, আসছে বছর আবার হবে। এখন যখন সামনে পঞ্চায়েৎ নির্বাচন, মোচ্ছবের রাঙা মূলো নাকের ডগায় রেখে নির্বোধদের ভোটগুলি আদায় করি।

ওরা বলেন, থিসিস, অ্যান্টিথিসিস সিনথেসিস। আমরা বা আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম সিনথেসিস দেখতে পাব না। এখন চলছে অর্থসঙ্কট। ডঃ ভবতোষ দত্ত ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন পনেরো বছর আগে; অর্থপণ্ডিত অসীম দাশগুপ্ত দেওয়ালের লেখা পড়তে পারেননি? প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছে বলে নির্বিচারে উচ্ছেদ অভিযান চলছে। হকার নির্মূল অভিযানে শান দেওয়া হচ্ছে। শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশন বন্ধ কবে ক্যাডারদের অর্থোপার্জনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। অ-গণতান্ত্রিক ডাক্তারদের ঘাড় ধবে বার করে দেবার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। হাজার রকমের ফি পঞ্চাশ বা পাঁচশো গুণ বাড়ানো হচ্ছে এই অভ্যুত্থানে যে গত দশ বছর ফি বাড়েনি। হেরিটেজ বিল্ডিং অথবা জলাজমির সংখ্যা যথাক্রমে মেয়র ও পরিবহন মন্ত্রীর ব্যাখ্যানে পাস্টে যাচ্ছে। না পাস্টেলে বাড়ি ভাঙা হবে কী করে আর বাড়ি ভাঙা না হলে প্রমোটারের মাধ্যমে কোটি টাকা আসবে কী করে?

রাজ্যবাসীর বিবেক ঘুমিয়ে আছে। আহা, বিবেকের কচি ঘুম ভাঙলে তারস্বরে কান্না জুড়ে দেবে না? বিবেক জাগবে সেদিন যেদিন শতাংশ মধ্যবিত্তকে গণ কবরে নিক্ষেপ করা হবে। তারপর সে নোটাফ। সেখানে লেখা থাকবে : এই কবরে হতভাগ্য ৫৪ শতাংশ মধ্যবিত্ত চিরনিদ্রায় বিলীন, যারা বিশ্বাস করেছিল এ কথা জেনে যে মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ।



আমি যেন সেই নস্টালজিয়ায় আক্রান্ত হলাম। কিন্তু জানতাম না, যাদের আক্রমণ করে শেখর পত্রপাঠ বের করছে, তাদের দু'কান কাটা।

একপাঠ

সমরেশ মজুমদার



পত্রপাঠের কান

পত্রপাঠের সম্পাদক প্রতি মাসের নির্দিষ্ট তাবিখে তাগাদা দেন লেখার জন্যে এবং আমিও বাধ্য ছেলেব মতো লেখা দিয়ে যাচ্ছি প্রথম থেকেই। ব্যাপারটা অনেকের চোখে পড়েছে। যেসব ছোটবড় কাগজের অনুরোধে ইচ্ছে সত্ত্বেও লিখতে পারি না তাদের সম্পাদকরা জানতে চান, কেন আমি 'পত্রপাঠে' লিখে চলেছি—ওরা তো বিজ্ঞাপনে আপনার নাম ছাপে না। তবে কি বেশি টাকা দেয়?

পত্রপাঠে বিজ্ঞাপন কতটা আনুকুল্য দেয় তা কাগজ খুললেই বোঝা যাবে। টাকা দেওয়ার ক্ষমতা যে সম্পাদকের নেই তা একটি শিশুও বলে দিতে পারবে। তাহলে কেন লিখি?

কলেজে পড়ার সময় দীপ্তেন সান্যালের 'অচলপত্র' ব ভক্ত পাঠক ছিলাম আমি, ব্যঙ্গ-বিদ্বেষের মাধ্যমে অন্যান্যকে চাবুক মারার সাহস দীপ্তেন সান্যালের ছিল। তারপর আর এই ধরনের কাগজ বাংলায় হয়নি বললেই চলে। মনে আছে, খাদ্য আন্দোলনের পব পর কলকাতায় বরিস পাণ্ডেরনাকের 'ডক্টর জিভাগো' উপন্যাসটি খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। ছবিও চলেছিল। দীপ্তেন সান্যাল কাগজের হেডলাইন কবলেন—'ডক্টরজী ভাগো।' খাদ্য আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে বিধানচন্দ্র বায়ের প্রতি বিদ্বেষ ওই উপন্যাসের নাম ভেঙে চমৎকার জমিয়ে দিয়েছিলেন। শেখব যখন 'পত্রপাঠ' বের করল, আমি যেন সেই নস্টালজিয়ায় আক্রান্ত হলাম। কিন্তু জানতাম না, যাদের আক্রমণ করে শেখর পত্রপাঠ বের করছে, তাদের দু'কান কাটা।

আচ্ছা, এক কান কাটা আর দু'কান কাটার মধ্যে পার্থক্য কি? যিনি এক চোখে দেখেন তাঁকে কানা বলা হয়, যিনি দু'চোখেই দেখতে পান না, তাঁকে অন্ধ। তাহলে এক কান কাটা একটু কম নির্লজ্জ, দু'কান কাটার ক্ষেত্রে যা কোনো হিসেবে ধরা পড়ে না। অভিধান বলছে, কান কাটা ব্যক্তি নিজের বদনাম গ্রাহ্য করে না। আব দু'কান কাটা যে, সে স্রেফ নির্লজ্জ। অর্থাৎ কান কাটা (অর্থাৎ এক কান কাটা) ব্যক্তি একটু বেপরোয়া হয়, ভদ্রতার ধার ধারে না। কিন্তু দু'কান কাটা হলে তার মধ্যে একটা আক্রমণ চলে আসে, যাব আড়ালে সে লজ্জাহীন। এটুকু জানার পর আমার কান কাটার প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ল। তারা যত খারাপ কাজ করুক, তা প্রকাশ্যেই করে থাকে। অর্থাৎ তাদের বোঝা যায়।

পৃথিবীর সব দেশের মতো কলকাতায় এক কান কাটার চেয়ে দু'কান কাটার সংখ্যা একটু বেশি। সাধারণত এঁরা একজন ক্ষমতাবান ব্যক্তির ছায়ায় ঘোরেন এবং সবসময় তাঁকে প্রশংসা-বাক্যে রসসিক্ত করে থাকেন। বাবু যদি এক বলেন তো এরা একশ বানিয়ে দেয়। একজন, ধবা যাক কবি হতে চায়। খুব বড় কবি, যাঁব হাতে কবিতা প্রকাশের ক্ষমতা আছে, তাঁর কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়ার রাস্তা সে খুঁজে নেয়। তারপর কবির বাড়ি ব বাজার করা থেকে রাতে মদের বোতলের জোগান দেওয়া ইত্যাদি কর্মের মাধ্যমে সে আরো আস্থাভাজন হওয়ার চেষ্টা করে। এবার কবিতা। চল্লিশ বছর আগে মাসিক বসুমতী অথবা তারও আগের ধবাসী পত্রিকায় ছাপা অখ্যাত কোনো কবির রচনা একটু আধটু পাঠে সে কবির পাদপদ্মে নিবেদন করে। কবি বলেন, এঃ এটা তো কবিতাই হয়নি। সে বলে, আচ্ছা, ঠিকই হয়নি। কবি বলেন, তোমার দ্বারা কবিতা হবে না হে। সে বলে, আপনার আশীর্বাদ থাকলে হবে; কিছুদিন পরে বড় কাগজে তার কবিতা ছাপা হল। বাস। তারপর থেকে সব কবি-সম্মেলনে তাকে দেখা যাচ্ছে, এমনকি বাংলাদেশে গিয়েও নিজের কবিতা পড়ে আসছে। কবিসের দলে ঢুকে পড়ে কলার তুলে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে, যদিও আর কোনো কবিতা তার ছাপা হয়নি। লোক বিদ্রূপ করলেও তার কিছু এসে যাচ্ছে না।

সেই গল্প ছাপা হয়েছিল। সম্পাদক মন্তব্য করেছিলেন—দু'কান কাটা লেখক।

লেখকরা কতদিন তরুণ থাকেন? বছর পনেরো-কুড়ি আগেও সুনীল গাঙ্গুলীদের তরুণ লেখক বলা হত। আজকে অমর মিত্র, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়দের বলা হয়। যদিও ওদের বয়স পঞ্চাশের আশেপাশে। মনে আছে, এরকম এক পঞ্চাশ পাব হওয়া তরুণ লেখক, যিনি 'দেশ' পত্রিকায় ধায় পঞ্চাশটি গল্প লিখেও পাঠকের কাছে গ্রহণীয় হননি, 'দেশ' নতুন গল্প জমা দিয়েছিলেন। তৎকালীন গল্প-সম্পাদক সেই গল্প পড়ে আশুন।

কাকিমার সঙ্গে প্রেম ও শারীরিক সম্পর্কের বিশদ বিবরণ ছিল গল্পে। রুচিবান সম্পাদক গল্প ফিরিয়ে দিয়ে অন্যান্য তরুণ লেখকদের সামনে তাকে ভর্তসনা করেছিলেন খুব। পরদিন সেই তথাকথিত গল্প-লেখক আর একটি গল্প জমা দিলেন। সম্পাদক দেখলেন, দুটি গল্প একই, শুধু কাকিমার জায়গায় নতুন বউদি করে দেওয়া হয়েছে। সম্পাদক অবাক। লেখক জানালেন, নষ্টনীড় অত বছর আগে লেখা বলে শরীর পর্যন্ত এগোতে পারেননি রবীন্দ্রনাথ। তবে নতুন বউঠানের সঙ্গে প্রেম দেখিয়েছিলেন। সময়টা আধুনিক বলে এই গল্পে দেখজ্ঞ প্রেম দেখানো হয়েছে। তাছাড়া গল্পটা না ছাপিয়ে উপায় নেই। সম্পাদক কারণ জিজ্ঞাসা করলে লেখকের স্বীকারোক্তি—নতুন গল্প লিখে বাড়ি থেকে বেরবার সময় তাঁর স্ত্রী খাতায় এন্ট্রি করে রাখেন। ছাপা হলেই টাকার জন্যে অপেক্ষা করেন। এই গল্পও তিনি এন্ট্রি করে ফেলেছেন। না ছাপা হলে তাঁর প্রেস্টিজ থাকবে না স্ত্রীর কাছে।

সেই গল্প ছাপা হয়েছিল। সম্পাদক মন্তব্য করেছিলেন—দু'কান কাটা লেখক।

কলকাতায় সরকারি অফিসগুলোতে নিয়মিত দেরিতে যারা কাজ করতে যান এবং গুণগতগুণাবলি ভর্তসনা শোনেন, তাঁদের সেটা গা-সওয়া হয়ে গেছে। দু'কানকাটা হলেই বোধহয় চমড়া পুরু হয়ে যায়। এঁদেরও হয়েছে।

সবচেয়ে বড় দু'কানকাটার রাজনীতিতে আছেন; লজ্জা বলে কোনো বস্তু তাঁদের অভিধানে নেই। এই কংগ্রেসকে গাল দিচ্ছেন, আবার পরক্ষণেই তার হাত ধরছেন। এই বিজেপিদের চোর বলে মন্তব্যসভা ছেড়ে চলে আসছেন, আবার ধর্মোজ্ঞন হতেই তাদের পদসেবা করছেন। একটা মন্তব্যের জন্যে ওঁরা, যা কিছু করতে বলা হবে তা-ই করবেন। তখন রেলমন্ত্রী হাতছাড়া হয়ে গেছে বলে যে শোক হয়েছিল, তা ভুলে যাবেন। দলের কেউ প্রতিবাদ করলেই পদত্যাগপত্র লিখে গৌসাবরে ঢুকে যাচ্ছেন। সবাই

আনুগত্য স্বীকার করতেই ব্যাপারটা ভুলে যাচ্ছেন।

দু'কান কাটার সবচেয়ে বড় উদাহরণ হল বামফ্রন্ট। সবাই জেনে গেছে, সিপিএম মানে বামফ্রন্ট, বামফ্রন্ট মানে সিপিএম। সিপিএমের সাংগঠনিক ক্ষমতার ধারেকাছে আসে না শরিকদল। বামপন্থার নজির বজায় রাখতে সিপিএম অন্যান্যদের সঙ্গে রেখেছে। এই অন্যান্যরা প্রতি পদক্ষেপে অপমানিত, অবহেলিত হয়েও মন্ত্রীত্বের লোভে বামফ্রন্ট ছেড়ে যেতে পাবছে না। পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় তারা প্রকাশ্যে সিপিএমের সন্ত্রাসের নিন্দা করেছে, তাদের সঙ্গে সংঘর্ষ কবেছে, কোথাও কোথাও প্রতিদ্বন্দ্বিতা কবে হেরেছে, বামফ্রন্টে থাকবে কিনা তা নিয়ে হুমকি দিয়েছে, আবার সুড়সুড় করে বাইটার্সের চেয়ারে গিয়ে বসেছে। সিপিএম-খুড়োর কল থেকে বেরিয়ে আসার ক্ষমতা এদের নেই। কারণ বেরিয়ে এলেই সিপিএম তাদের অস্তিত্ব মুছে দেবে নির্বাচনে। অতএব বাইরে বড়দার বিরুদ্ধে যতই এরা গজরাক, দু'কান-কাটা হয়ে এদের বলতে হচ্ছে—আমরা বামফ্রন্ট।

কলকাতার চলচ্চিত্রেও এঁরা বেশ আছেন, একটার পর একটা আঁতেল ছবি কাউকে না কাউকে টুপি পরিচয় বানাচ্ছেন, পাবলিক সেসব ছবি দেখতে চাইছে না, অথচ কাগজে লেখালেখি হচ্ছে, ফেস্টিভালে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে পরের ছবির জন্যে মুরগি খুঁজছেন, ছটা ছবি বানিয়েই নিজেদের সত্যজিৎ রায় বলে ভাবছেন। প্রযোজক সর্বস্বান্ত হচ্ছেন তো বয়েই গেল।

এরপর বঙ্গদেশের জনতা। এঁরা সব বোঝেন, সব জানেন। কিন্তু প্রতিবাদ করে নির্লজ্জদের ছুঁড়ে ফেলার ক্ষমতা যেহেতু নেই, তাই সেই তিন বাঁদরের মতো মুখ-চোখ-কানে হাত চাপা দিয়ে বসে আছেন। এই অর্থে তাঁরাও দু'কান-কাটা।

শেষরের কাগজে লিখছি এই আশায়, যদি কেউ ভুল কবেও একবার চোখ-কান-মুখ থেকে হাত সরায়—এই আশায়। তবে প্রশ্ন উঠতে পারে—পত্রপাঠের কী অবস্থা? তার কান ধরে টানাটানি হচ্ছে না তো?.....

সুনিলাবতী!

সংবাদ প্রতিদিনের বিক্রিবাটা বাড়ায় তাঁদের ফ্যান্টাও বেড়েছে। আর ফ্যান্টা দেখতে গিয়ে তেনারা তেনাদেব কাগজে ফ্যান্টাসি বলে একটি বিভাগও খুলে দিয়েছেন। গত ২৪শে মে সেখানে ফ্যান্টামি করেছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। যে সে ফ্যান্টাগিরি নয়, একেবারে মেয়ে-মার্কী ফ্যান্টামি। পরজন্মে (পরজন্মে যদিও তিনি মানে না, তথাপি) তিনি নাকি মেয়ে হয়ে জন্মা নিতে চান। আর মেয়ে হলেই তিনি নারীবাদের স্বাভা নিয়ে নারী-কেলাব জিন্দাবাদ বলে ময়দানে লক্ষ দিয়ে হাঁকার ছাড়বেন। অর্থাৎ কিনা পুরুষ জাতি বড়ই দুর্বল। পুরুষ হলে আর যাই হোক, মেয়েদের হয়ে লড়াই করা যায় না। হয় মেয়েদের সঙ্গেই লড়াই করতে হয়, নয়ত মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করতে হয়। কী আফশোষ। তিনি আবার মহাভারত থেকে রাজা অঙ্গসক্তর উদাহরণ খুঁজে বের করেছেন, যিনি কিছুদিন মেয়ে হয়েছিলেন; তিন-চারটে সন্তানও বিইয়েছিলেন। মেয়ে হয়ে তিনি নাকি পুরুষের চেয়ে বেশি যৌনসুখও পেয়েছেন। সে পাবেই। কেননা অঙ্গসক্তর নামেই প্রমাণ—তিনি শুধু অঙ্গই আসক্ত। সে বিষয়ে, এবং সুনীলবাবু মেয়ে হয়ে কী কী করবেন সে বিষয়েও আপাতত মৌন থাকা গেল। কিন্তু যে জ্বলন্ত ফ্যান্টাসি-টি জিজ্ঞাসার চিহ্ন হয়ে সামনে জিত বেব করে দাঁড়িয়ে আছে, সেটা সম্বন্ধে



তিনি কী কলবেন? যারা মেয়ে হতে চেয়েও মেয়ে নয়, সমাজে ঘৃণা আর অবহেলা ছাড়া যাদেব জন্য কিছুটা নেই, সেই হতভাগ্য অথবা হতভাগিনীবা? আচ্ছা সুনীলবাবু, পরজন্মে আপনি যদি....

এসব ন্যাকামি, ধুড়ি, ফ্যান্টামি ছেড়ে আপনি যদি সত্যিকারের কল্পনার টুকরোগুলো একটু কবিতার বাগানে নিয়ে যেতেন। কিছু ফুল ফুটত। চটকদারিবি আড়ালে মটকা মেয়ে পড়ে না থেকে একবার চটকা ভেঙে উঠে দাঁড়ালে হত না। শক্তি নেই, কবিতার সাম্রাজ্যে সে যে কতবড় অভাব। বাসাংসি জীর্ণানি যথা শরীবার.. বলতে বলতে আপনার বিপুলায়তন পেশাদারি গদ্য, কে জানে হয়ত একদিন সূক্ষ্ম শরীরে চলে যাবে। কিন্তু কবিতা! আপনার কাছে আমাদের অনেক আশা যে সুনীল, এখনো, এতকিছুর, সবকিছুর পবেও।

—মৈনাক মিত্র

টীকা নিম্নয়োজন

হা মরি বাংলা ভাষা

বুনো রামনাথ

নদীয়া তখন নদীয়াতেই ছিল। ‘বাজারি’ বানানের স্তম্ভের চোটই হোক বা কলমের খোঁচাতেই হোক, দীর্ঘ ‘ঈ’ তখনো দুই ‘ই’-তে অধঃপতিত হয়ে ‘নদিয়া’ হয়ে যায়নি। সূতানটি, গোবিন্দপুরের সহোদরা কলিকাতাও তখন কলিকাতাতেই ছিল। ‘আ মরি বাংলা ভাষা’র আদিখ্যেতার আতিশয্যে আটপৌরে কলিকাতাও তখন শুভনাম হবার সরকারি স্বীকৃতি পায়নি।

ভাষা নিয়ে মাজাঘষা চলেই আসছে। পবিত্রধ্বনি অব্যাহত প্রচেষ্টা কিছু নতুন নয়। কিন্তু এলোপাতাড়ি ঘর্ষণ অনেক সময়ই ধ্বংসে বিকৃত হয়। ভাষার ঠাস বুনুটি তখন কেমন যেন ভাসা ভাসা হয়ে যায়। শিথিল হয়ে আসে অর্থ। উদাহরণ? বরাবর পড়ে এসেছি, শুনেও, তুলসী গোস্বাই বা শ্যামাপ্রসাদ বসু অ্যাসেমব্লিতে জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা দিয়েছেন। বক্তৃতা করেছেন এমনও কানে এসেছে। কিন্তু বক্তব্য কোনোদিন ওদের রাখতে দেখিনি এই চর্মচক্ষুতে। শোনা বা পড়ার প্রথ অবাস্তব। ‘রাখা’ তো ঠিক শ্রাব্য বস্তু নয়। এখন কিন্তু কাগজে হরদম পড়ছি, জ্যোতি বসু বা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রিগেডের (গড়ের মাঠেই বা নয় কেন?) সভায় তাঁদের বক্তব্য রাখেন। বক্তৃতা দেওয়া বা করা সংবিধান-সিদ্ধ হলেও কাগজে কলমে নিষিদ্ধ হয়ে গেছে আজ ভাষার ভাষ্যে। এখন সাজিয়ে শুছিয়ে বক্তব্য রাখাটাই ‘বাজারি’ রীতি।

ইংবেজিতে ‘স্পীচ ডেলিভারি’ করাটা ব্যাকরণ সম্মত। ‘মোশান’ বা ‘প্রোপোজাল’ ‘টেবল্ড’ অর্থাৎ টেবিলস্থ করারও রীতি আছে। সেই সূত্রে টেবিল যখন আছে তখন রাখতে বাধা কোথায়। এখন বাংলা ভাষায় বিশুদ্ধ ইংরেজি ভাষার ভঙ্গিমায় বক্তব্য ‘রাখা’ যখন চালুই হয়ে গেছে তখন দু’দিন বাদেই বক্তব্যের বিলি-বটন বা প্রসব (ডেলিভারি) যন্ত্রণা ভোগের আশঙ্কা একটা থেকেই যায়। তাই না? সাদা বাংলায় বক্তাকে যদি সাবেকি প্রথায় বক্তৃতা দিতে দেওয়া হত তাহলে এই ইংরেজি ভাষার ধাঁচে অব্যাহত বক্তব্য ‘বাখার’ বা অদূর ভবিষ্যতে বিলি বটনের বিব্রাঙ্কি ও আশঙ্কায় বিরত হতে হত না আমাদের মতো অ-বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবী নয় কর্মজীবী পাঠকদের। বিভিন্ন ভাষা থেকে প্রয়োজন মতো আবশ্যকীয় শব্দ-চয়নে সব ভাষাই সমৃদ্ধ হয়। মানি। কিন্তু শব্দ চয়ন আর বুলির বুনট বদল এক কথা নয়। তাই ভাষার নিজস্ব, স্বকীয় প্রকাশ ভঙ্গিমা, চম্ ইংরেজি বাক্য-বিন্যাসে আধারিত হলে চোখে ভে লাগেই। কানেও বেসুরো, বেতালা বাজে। অর্থও দুর্বোধ্য হয় অনেক সময়ই।

খেলার প্রতিবেদনেও ভাষার স্ফুটনাবিত্য বেদনাদায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানে কিন্তু ইংবেজি ভাষার পৌ ধরার প্রচেষ্টা অজুহাতটুকুও নেই। এই সোঁদন পর্যন্ত মোহনবাগান বা ইস্টবেঙ্গল লীগ বা শিল্পের খেলায় গোল ‘দিতে’ বা গোল ‘কবতে’ মাঠে নামত। গোল বাঁচাতেও। এখন খেলোয়াড়দের

‘সৌরভের অফ ড্রাইভে ফ্রপদী মূর্ছনা।’ এরপর হয়ত দেখতে, না শুনতে হবে—শটীনের ছক্ শটে খেলার বিস্তার।

গোল দেওয়া, করা বা রক্ষা করার কৃতিত্বটুকুও প্রতিবেদকেরা ভাষার মাধ্যমে বা কলমের জোরে কেড়ে নিয়েছেন। গোল এখন দিতেও হয় না, করতেও হয় না, ‘পেতে’ হয়। আজকাল হরদমই কাগজে পড়ি, মোহনবাগান বা ইস্টবেঙ্গল ভাস্কো বা চার্টিলের বিরুদ্ধে একটা না ক’টা যেন গোল ‘পেয়েছে’। কথটা কেমন যেন লটাবি ‘পাওয়ার’ মতো শোনায়। গোল ‘দেওয়া’ বা ‘করার’ মধ্যে খেলোয়াড় বা টিমের চাতুর্য, কৌশল বা প্রচেষ্টার যে স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে, ‘পাওয়ার’ মধ্যে সে ইঙ্গিত নেই। বরং শব্দটাই ফালতু পাওয়ার মতো শোনায়। ফলে ভাষাটিও অসার, বিভ্রান্তিকর।

ক্রিকেট প্রতিবেদন পড়ে মনে হয়, আর যাই হোক, ‘দিস-ইজ্ নট ক্রিকেট!’ বাস্তবিকই। ভাষার অলঙ্কারের বেড়া টপকে শেষ পর্যন্ত আর খেলার মাঠে ঢোকাই যায় না। ডোভার পেন মিউজিক কনফারেন্স বা বড়ে গোলামের সঙ্গীত আসরে চলে যাই প্রতিবেদকের হাত ধরে বা কলম ধরে: ‘সৌরভের অফ ড্রাইভে ফ্রপদী মূর্ছনা।’ এরপর হয়ত দেখতে, না শুনতে হবে—শটীনের ছক্ শটে খেলার বিস্তার। একা নভজ্যোত সিধুর জিতে যা অলঙ্কার আছে, সারা বৌবাজার স্যাকরাসের শো-কেসেও বোধহয় এত পাকা সোনার (গিস্টি?) বিছেহার নেই।

ফুটবলে যেমন গোল করার নিয়ম এখন উঠে গেছে, জিততে হলে গোল পেতে হয়, ঠিক তেমনিই ক্রিকেটেও ইদানীং উইকেট পড়েও না আর রানও কেউ করে না। উইকেট, রান—সবই এখন তুলে নিতে হয়:

“ব্রায়ান লারাব উইকেট তুলে নিয়ে অস্ট্রেলিয়া ম্যাচে ফিরে আসে।”

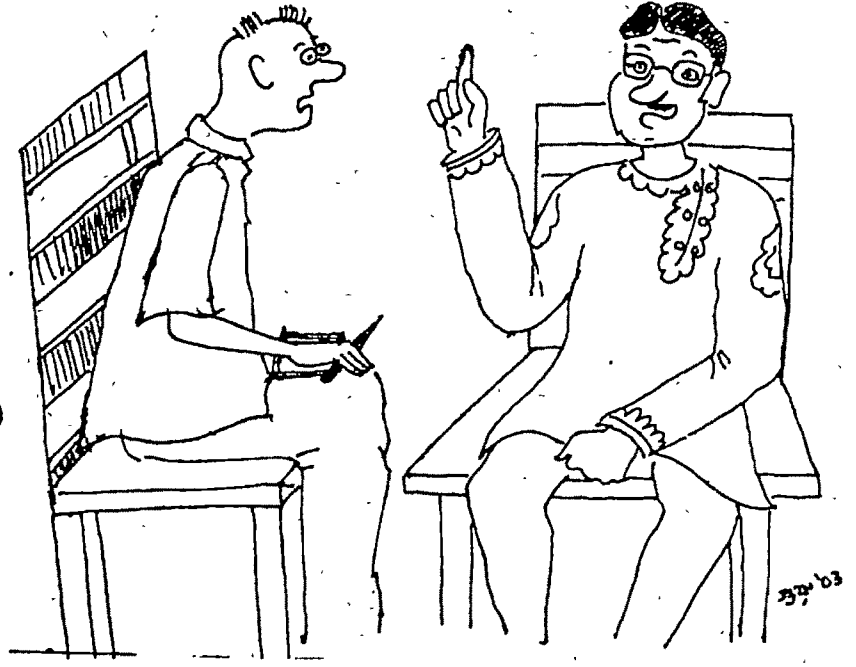
একই প্রতিবেদক এর পরেই লিখছেন: “লারার ও হেডেন অবিচ্ছিন্ন থেকে ৫০ রান তুলে ফেলেন...।”

ঠিক পরের ছম্বেই অবশ্য লারাকে উনি রান ‘করার’ কৃতিত্ব থেকে বঞ্চিত করেননি: “৯৪ বলে ১২টি চার ও ১টি ছয়ের সাহায্যে ৬৮ রান করেন তিনি (লারা)।

মনে হয়, লারার উইকেটটি এর আগেই পাজাকোলা কবে তুলে নেওয়াব দুঃখেই উনি ব্রায়নকে এবার রান করার স্বীকৃতি দেন।

চরণ বৈরাগীর

ইকুইড মিকুইড



মুখ্যমন্ত্রীর বিশ্বরেকর্ড

ব্যা প্যারটা চালু করেছিলেন সর্বজনপ্রিয় মানুষ—
সিদ্ধার্থশংকর রায়। দুই সপ্তকে ওঁকে নাকি 'ছিন্নমস্তক
রায়' বলত। তিনি মুখ্যমন্ত্রী থাকা কালে সবচেয়ে কম
সময় কলকাতা থাকার বিশ্বরেকর্ড করেছিলেন। মাঝে মাঝে রাজধানী
কলকাতায় পদার্পণ করলে সারা পশ্চিমবঙ্গে শঙ্খ কাঁসর বাজত। সেটা
আনন্দে না আতঙ্কে—বুঝ মন যে জানো সন্ধান। জ্যোতিবাবু তো একের পর
এক বিশ্বরেকর্ড করে গেছেন। গান্ধাসকারের পর একমাত্র ভারতীয়, যাঁব এত
বিশ্বরেকর্ড আছে। ওয়ানফোর্থ সেঞ্চুরির মুখ্যমন্ত্রী। স্বেচ্ছায় পদত্যাগী
মুখ্যমন্ত্রী। সবচেয়ে বেশি বাড়ি বদল করা মুখ্যমন্ত্রী। দলদেপে ফেলায়
প্রধানমন্ত্রিত্ব তুচ্ছ করা মুখ্যমন্ত্রী। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তোলপাড় করে নীলপদ্ম, মানে
বিদেশি বিনিয়োগ অনুসন্ধান বাৎসরিক ভ্রমণ-ব্যয়ামবীর মুখ্যমন্ত্রী। ফলং—
যা হবার তাই, অবশ্যই লবডঙ্কা।

তবে সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলিতেছে।

বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীও শনৈ শনৈ মহাজনদের পছন্দ অনুসরণ করে নতুন
বিশ্বরেকর্ডের দিকে নিশ্চিত ভাবে এগিয়ে চলেছেন। এই লক্ষ্যে অর্জনের
মতোই তাঁর পা মাটিতে, চোখ আকাশে। দুই পাখিটা কেবল জায়গায় নেই।
তাঁর সাদা ধূতি-পাঞ্জাবির মতো নিষ্কলুষ ভাবমূর্তি সুপরিচিন্তভাবে
কালিমালিগু করার জন্য কিছু পত্রকার যে ঘৃণ্য অপচেষ্টা চালাচ্ছে তা
আমাদের মুখ্যমন্ত্রী তাঁর সাহসী প্রচেষ্টায় অসফল করবেনই—জানালেন
মুখ্যমন্ত্রীর নবনিযুক্ত সংবেদনা-সচিব শ্রী মেধাটঙ্কর বিবেকবাগীশ ক্ষমার্থী।

সাংবাদিক : মিঃ মেধাটঙ্কর ব্যক্তবাগীশ ক্ষমার্থী—

ক্ষমার্থী : নো ব্যক্তবাগীশ। আমার অত ব্যক্ততা নেই। বিবেকবাগীশ
ক্ষমার্থী। প্রিজ পেট কারেস্তেড।

সাংবাদিক : আয়্যাম স্যো স্যরি মিঃ মেধাটঙ্কর বিবে—

ক্ষমার্থী : ওঃ নো-ও-ও। নট মেধাটঙ্কর,—মেধাটঙ্কর। প্রিজ
আমার সঙ্গে টঙ্কর মারার চেষ্ঠা কববেন না, মিস্টাব।

সাংবাদিক : মেধাটঙ্কর বিবেকবাগীশ ক্ষমার্থী। ইজ দ্যাট রাইট?

ক্ষমার্থী : ইয়েস ইয়েস—দ্যাটস ও'কে।

সাংবাদিক : আচ্ছা মিঃ ক্ষমার্থী, মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ে নতুন যে দপ্তর
খোলা হয়েছে—আপনি যার প্রধান সচিব, সে সম্পর্কে
যদি একটু অবহিত করেন—

ক্ষমার্থী : ওঃ। দ্যাটস্ মাই প্রেজার। আসলে হল কি, আমাদের সি
এম খুব সংবেদনশীল মানুষ। ঠ্যালাগাড়িতে চেপে চিড়ে
চ্যাপ্টা মানুষের চোখের জল মাপতে দূর-দূরান্তে ছুটে
ছুটে যান। ইলেকশনের সময় প্রমিস করেছেন
সংবেদনশীল সরকার গড়বেন। তার তদারকি, ফলো
আপ, রেকর্ড বাখা, স্ট্যাটিসটিক্স তৈরি করা, প্রেস
ব্রিফিং, ইন্টারন্যাশনাল পাবলিসিটি—এসবের
প্রফেশনাল ব্যবস্থার জন্যেই 'সংবেদন যোজনা' অফিস
খুলতে হল। আমি তার প্রথম প্রাইড প্রধান সচিব।

সাংবাদিক : বাঃ, দারুণ। কনগ্রাচুলেশনস মিঃ মেধাটঙ্কর বাক্যবাগীশ
ক্ষমার্থীবাবু—

ক্ষমার্থী : আঃ। কতবার বলব, বাক্যবাগীশ নয়, বিবেকবাগীশ।

সাংবাদিক : স্যরি। এগেন স্যরি। আসলে আপনি এত ভালো
বলছিলেন না, তাই। তাছাড়া কি জানেন, ইলেকশনের
প্রমিস মনে রাখা তো উচিত নয়। ক্যাবো, সে অভ্যেসই
নেই। থাকলে কি আর কোয়ার্টার সেঞ্চুরি জুড়ে রাজ্যের
অবস্থা-বা হয়েছে—

ক্ষমার্থী : টু ব্যাড। আমরা চাই অভ্যাসটা তৈরি হোক। উই ওয়াস্ট টু ডু ইট নাউ।

সাংবাদিক : তা, এই সংবেদনা যোজনার জন্যে আপনাকে কি বিশেষ কোনো ট্রেনিং বা কোয়ালিফিকেশন নিতে হয়েছে?

ক্ষমার্থী : ও ইয়েস। যু আর ইনস্টিটিউট, আই মাস্ট সে। অনেকে ভাবে যে-কেউ এই সংবেদনা যোজনার হাল ধরতে পারে। দে আ অটোরলি রং।

সাংবাদিক : রং? কোন রং? পঁচিশ বছর ধরে আমরা তো কেবল রক্তের রংই দেখছি। এবার কি বদলাবে?

ক্ষমার্থী : নো—নো, রং—মানে ভুল। নট কালার। আমাকে তিন বছর Special Training নিতে হয়েছে ইন দ্য Institute for Special Studies in Supersensitive psychoeuphoria of Marxist Society.

সাংবাদিক : এটা কি হার্ডভাড, না এডিনবার্গ?

ক্ষমার্থী : আপনাদের মগজে ডি-জেনারেটেড আমেরিকা বা ইংল্যান্ড ছাড়া আর কিছুই আসে না? দিস ইস কল্ড সাইকো-কালচারাল কলোনিয়ালিজম। দ্য স্ট্রেট Institute for Special Studies in Supersensitive Psycheluphoria of Marxist Society. ছিল সেনিনগ্রাডে—ইয়েস, সেনিনগ্রাডে।

সাংবাদিক : ছিল কেন বলছেন মেধাফল্গু বচনবাগীশ ক্ষমার্থীবাবু?

ক্ষমার্থী : আপনি কি কিছুতেই আমার নামটা কারেইলি বলবেন না? ইট ইজ নট মেধাফল্গু—

সাংবাদিক : ভুল হয়ে গিয়েছে, ক্ষমা করে দিন ক্ষমার্থীবাবু। সেনিনগ্রাডে ছিল কেন বলছিলেন যদি—

ক্ষমার্থী : নেভার মাইন্ড। টু আর (err) ইজ হিউম্যান। ছিল মানে, এখন তো আর সেনিনগ্রাড নেই। তাই ঐ Instituteও নেই। তবে—

সাংবাদিক : তবে—তবে কি মেধাটঙ্কর বাবু?

ক্ষমার্থী : অফ দ্য রেকর্ড বলছি এখন। CM নিজেই পরে ঘোষণা করবেন—আমরা সন্টলেক বা রাজারহাট নতুন টাউনশিপে একটা ঐ Institute খোলার প্ল্যান করছি। সংবেদনশীলতায় পশ্চিমবঙ্গকে আমরা দেশের একনম্বর করে ছাড়ব—দু'তিন বছরের মধ্যে—মানে বিফোর নেক্সট ইলেকশন।

সাংবাদিক : আপনি বারণ করলেন, তাই আপনাকে কোট করব না। কিন্তু ধরুন, যদি না করতে পারেন। ঐ Institute-এর কথা বলছি।

ক্ষমার্থী : বললাম যে, CM নিজেই ঘোষণা করে সবাইকে জানাবেন। মিডিয়া উইল কভার দ্য হিস্টোরিক মোমেন্ট। তারপরও হবে না? ধুর, তা হয় নাকি।

সাংবাদিক : হয় মেধাটঙ্করবাবু, হয়। কত শিলান্যাস ছাগলে মুড়িয়ে খেয়েছে, গ্রামেগঞ্জে গেলেই বুঝতে পারবেন। যাই হোক, ধরুন, CM ঘোষণা করার পরও নেক্সট ইলেকশনের আগে আপনারা Instituteটা, মানে, 'Institute for Special Studies in Supersensitive Psychoeuphoria of Marxist Society—টিক বললাম তো, করতে পারলেন না, —তখন কী বলবেন?

ক্ষমার্থী : সংবেদনা যোজনায় যা প্রধান কর্তব্য, তাই করা হবে। CM ক্ষমা চাইবেন। দেখেছেন নিশ্চয়, CM ক্ষমা চাওয়ার ব্যাপারে কেমন দরজাডিল—দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ কল্ড Supersensitive Psychoeuphoria—

সাংবাদিক : মিঃ মেধাফল্গু ভাষণবাগীশ ক্ষমার্থী—

ক্ষমার্থী : নাঃ, আপনাকে নিয়ে পারা গেল না। ভাষণবাগীশ আমি কেন হব, ও তো মন্ত্রীরা হন। আমি মেধাটঙ্কর বিবেকবাগীশ ক্ষমার্থী—

সাংবাদিক : স্যরি, আমিই আপনার কাছে ক্ষমার্থী, মিঃ বিবেকবাগীশ ক্ষমার্থী। বলছিলাম কি, যদি ঐ ক্ষমা চাওয়ার Supersensitive ব্যাপারটার কিছু নমুনা পেশ করতেন—

ক্ষমার্থী : শিওর। সিম্পল স্যাম্পল। এই ধরুন, ডাক্তারদের গলাধাক্কা দেওয়া—ফিলিংটা মে বি রাইট, তবে মুখে বলা অনুচিত ছিল। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা প্রার্থনা। দলের মিছিলের জন্যে যানজট, জগজগের হয়রানি, তৎক্ষণাৎ দণ্ডি কাটার মতো মার্জনা ভিক্ষা। তারপর দেখুন, মাদ্রাসা নিয়ে শবরের কাগজগুলোর ইচ্ছাকৃত অজ্ঞাতপ্রসূত : বিকৃত রিপোর্টিং—টিভিতে যদিও অন্যরকম বোঝা গেছে, তবু সাপ্তাহিক ক্ষমাভিক্ষায় সংবেদনশীলতার যুগান্তকারী উদাহরণ রাখা গেছে। আর কত বলব—আমি তো মশাই, রেকর্ড রাখতেই ইটিং হিমসিম।

সাংবাদিক : কেন, আপনাদের কম্পিউটার নেই?

ক্ষমার্থী : থাকবে না কেন? সংবেদনা যোজনার জন্যে বিল গেটসের কাছ থেকে Special Super Computer আনা হয়েছে। এত Sensitive যে ওর জন্যে আলাদা করে ঠাণ্ডাঘরের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। সে ঘরের Temperature হিমাক্ষ ছেড়ে উঠতেই দেওয়া হয় না। ওটা আছে বলেই রেগুলার আপডেটেড রেকর্ড রাখা যাচ্ছে। এশিয়াডে, অলিম্পিয়াডে পাঠাতে পারছি। আগামী অলিম্পিকে—

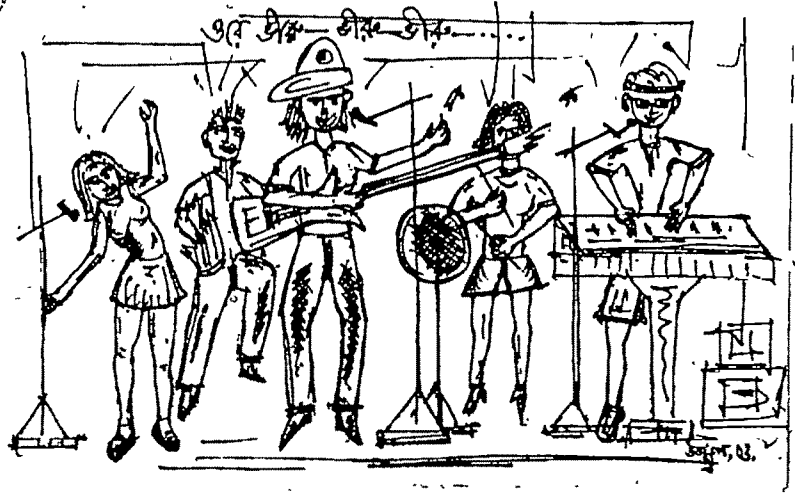
সাংবাদিক : আগামী অলিম্পিকে কী, মিঃ মেধাটঙ্কর বিবেকবাগীশ ক্ষমার্থী?

ক্ষমার্থী : ঐ যাঃ, বেকাস বলে ফেললাম। টপ সিক্রেট। কারুরে বলবেন না। আগামী অলিম্পিকে নতুন একটা গেম ইনট্রোডুসড হবে—ভারবাল ডিগবাজি—আসল নামটা স্প্যানিশ না গ্রীক, কী হবে—তা নিয়ে চাপান উত্তোর চলছে। আপাতত ওটাকে বলা হচ্ছে, রিগ্রেটাথালন। আমরা স্থির নিশ্চিত, রিগ্রেটাথালনের প্রথম স্বর্ণপদক অর্জন করে আমাদের CM বিশ্ববৈকল্য করবেনই।

গুঃ—সাম্প্রতিক পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর পশখোলাই আর রাজ্য পূর্তমন্ত্রীর একাধিকবার দুখট হেনস্থা ও কাছাখোলা প্রস্তর-চুটের বেদনায় ক্ষমাভিক্ষার বহতা উল উপরোক্ত সজাবনার সুনিশ্চিত ইঙ্গিতবাহী। ক্ষমা প্রার্থনার নিয়মিত তেড়েফুঁড়ে-লাগা অনুশীলনে যে কোনো খামতি নেই, এটা মানতেই হবে।

সুশান্ত রায়

সম্মিলিত বাজনা বাজে, বাজতেই থাকে। যেন ধান কুটে শিবের গীত। অবশেষে



দেশ থাকিয়ে জিবো টুপিওয়ালা বলে—আমরা প্রথমে রবীন্দ্রসঙ্গীত দিয়ে আমাদের প্রোগ্রাম শুরু করছি।

বলতে বলতেই ঝিন্ চাক্ চাক্ বাজনা শুরু এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত যন্ত্রগুলো

**‘যদি তোর’ শুনে সম্বিত ফেরে। জিরো
টুপি চারবার ‘যদি তোর’ বলছে আর
সবাই, মানে মঞ্চের সমস্ত ছেলেমেয়ে, যন্ত্রে
বাজাচ্ছে—ডিং চাক্ চা—ডিং চাক্ চা**

সচল (আসলে সদলবলে কিনা)—

ড্যাং-ড্যাং-ড্যাং-ড্যাং... গিটারের গলা সাফ করা হচ্ছে।

সঙ্গে-সঙ্গে সমবেত ভাবে ঝিংকা চিক্কা, ঝিংকা চিক্কা, ঝিংকা চিক্কা ঝিং—
রবীন্দ্রসঙ্গীতের আয়োজন কিনা।

জিরো টুপির সামনে মহিক। খুব অমায়িক ভাবে জিরো টুপি ‘ওরে ডীক’ বলে
পেছনের দিকে তাকাল। ‘আই ডোন্ট রিকিউজ’ মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে টাট্ টারা, টাট্
টাটা শব্দে তার আধুনিক নাকড়াটা বাজাতে লাগল।

জিরো টুপি বলল—প্রথম গান, ওরে ডীক—

এবং সঙ্গে সঙ্গেই শুরু—

ওরে ডীক—এক গাইল জিরো টুপি।

ঝিং চাক্ ঝিং চাক্—সকলে একসঙ্গে গাইল—ওরে ডীক, ডীক ডীক...

ক্রমশ ডীক ক্ষীণ হয়ে এল।

আবাব গ্যাও-ঝাং, গ্যাও-ঝাং—

আবার ‘ওরে ডীক’র সেরকম পুনরাবৃত্তি।

তারপর ‘তোমার হাতে’। সে নিয়মে কিছুক্ষণ বিদেহী হাতাহাতি-চলল। তারপর
এল ‘নাই ভুবনের তার’ (ভাঁড় নয়), এবং ডীকব কসরৎ চলল বেশ কয়েক মিনিট।
একটি করে শব্দ, পবে বাজনা, তারপর আবার সমবেত সুরগান।

যড়ির দিকে পড়িমরি করে তাকালাম। হিসেব করে দেখলাম, দু-মিনিটে এক
লাইন। সুতরাং পুরো গান কমপক্ষে পনেরো মিনিট। ঠিক তাই, সতেরো মিনিটে
(প্রায়) ‘ওরে ডীক’র ডীক নয়, বান্দন শেষ হল।

বেশ তো ছিল। হঠাৎ একলা চলবার শব্দ কেন যে হল জিরো টুপিদের। বেশ
রবীন্দ্রনাথ এবং আবাবও এক হাত নেবার চেষ্টা র-স-এর অর্থাৎ রবীন্দ্র সঙ্গীতের।
এবারে একটু বিশদে অনুধাবন করবার চেষ্টা করলাম।

পাশের শ্রোতা বলল, র—(Row!) সঙ্গীতকে কোথায় তুলে দিলে, দেখলি?
মনে মনে বললাম,—গুরোগুরি তুলে দিল না বাপ, বাজালির তো সব গেছে, রবীন্দ্র
সঙ্গীতটুকু আছে বলে এখনো বুক কোলাতে পারি।

‘যদি তোর’ শুনে সম্বিত ফেরে। জিরো টুপি চারবার ‘যদি তোর’ বলছে আব
সবাই, মানে মঞ্চের সমস্ত ছেলেমেয়ে, যন্ত্রে বাজাচ্ছে—ডিং চাক্ চা—ডিং চাক্ চা—
ডিং চাক্ চা—চা চা চা—আর প্রতিটা ‘যদি তোর’-এর পরে ড্যাং করে একটা শব্দ
হচ্ছে স্প্যানিশ গিটারে। এরপর আবার ‘যদি তোর’ করার পর সবাই মিলে য—
দি তো-ও-র বলে আখর তুলে পুরোদমে সবগুলো যন্ত্র বাজাতে লাগল।

তারপর ‘ডাক’। ডাক—ডাক—(ঠিক আগের গানের ডীক-ডীক-ডীকর মতো)
আবার ঝিং চাক্ ঝিং চাক্

—শুনে কেউ, শুনে কেউ, শুনে কেউ...

না আসে না—আ—সে না—আ—সে...

ঝিক্ ঝিং—ঝিক্ ঝিং—ঝিক্ ঝিং—সিঁচা—ঝিং

তবে একলা—একলা—একলা—

ক্রমশ ‘একলা’ ক্ষীণ হয়।

হঠাৎ জোরে—চলো রে, চলো রে, চলো রে, চলো রে...

সত্যিই চলতে শুরু করি।—যে দমে ‘চলো রে’ হচ্ছে তা কবার হতে রাতের
খাবার ঠাণ্ডা মেয়ে যাবে। আর র. স-এর দাপটে শেষে যদি আসলটাই ভুলে যাই—
বলে ফেলি।

—বালাই বাট, ভুলবে কেন বাপ। একজন মন্তব্য করে, দেখছ না কেমন জোরে
চলছে চলো রে, চলো রে। বল তিনিও চলতে শুরু করলেন।

কুলায় না, ‘জোসে’ বলতে তিনি ব্যাবাদিকার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে-ধাক্কা
কাবো-কাবোর প্রশংসার হাত দাবানো দেখে বক্রোক্তি করলেন না আসল জোসে-
এর কথাই বললেন।

খবর চড়-চাপড়

টিপ্পনী দেবী

হাওড়া শহরের একাংশে পরিষ্কৃত জলের পাইপলাইন থেকে ঘোলা জল বার হচ্ছে। পুরসভার লোকজনকে জানিয়েও কোনো কাজ হয়নি বলে বাসিন্দাদের অভিযোগ।

(ঘোলা জল বার হচ্ছে না, বার করা হচ্ছে। উদ্দেশ্য—মাছ ধরা।)

☆

কাজে বেশি মন বসাতে সি এস টি সি-র কর্মীদের জন্য স্বাস্থ্য-বিমা চালু করেছে কর্তৃপক্ষ।

(এর বদলে কমিশন-বিমা চালু করলে সত্যি সত্যি কাজে মন বসত।)

☆

ফটো-সহ টিকিট চালু করেছে সি এস টি সি। জুলাই মাস থেকেই নতুন এই টিকিট-ব্যবস্থা চালু হচ্ছে। এর জন্য বাড়তি কোনো টাকা যাত্রীদের দিতে হবে না।

(কিন্তু স্টুডিওগুলোকে তো দিতে হবে, ভর্তুকি বাবদ।)

☆

এবার পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে ধ্বংসাত্মক শননকার্যের দাবী উঠল। নব-বৌদ্ধ গোষ্ঠীর নেতা উদিত রাজ দাবী করেছেন, পুরীতে জগন্নাথ মন্দির হওয়ার আগে সেখানে বৌদ্ধ মন্দির ছিল।

(সবে কলির সন্ধে। এরপর ধীরে ধীরে বাকিরাও উদিত হবেন।)

☆

শ্রীরামপুরের তারাপুকুরে একটি পশু-হাসপাতাল তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

(বাহ্য্য। এই যে জেলায় জেলায়, কলকাতায় এত যে হাসপাতাল, সেগুলো তাহলে কী?)

☆

উত্তর ২৪ পরগণার জেলা স্বাস্থ্য দফতরে পরিদর্শক না থাকায় স্বাস্থ্য ভেজাল ধরার কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এর সঙ্গে স্বাস্থ্য ব্যবসায়ীদের থেকে আদায় করা লাইসেন্সের ফি বাবদ অর্থ সংগ্রহও করা যাচ্ছে না। ফলে এই খাতে সরকারের আয়ও বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

(খোঁজ নিয়ে দেখুন, সরকারের আয় যে হারে বন্ধ হয়েছে তার চতুর্গুণ হারে বে-সরকারের আয়ের পথ খুলে গেছে।)

☆

ইউরো-২-এর নিয়ম অনুযায়ী যেসব গাড়ির বয়স ১৫ বছরের বেশি, সেগুলি পরীক্ষার পর বাতিল বলে খারিজ করা হবে। পরিবহনমন্ত্রী অবশ্য বলেছেন যে ঐতিহ্যের কারণে দুই-একটি গাড়ি রাখা যেতে পারে।

(একুনি আপনার পুরনো গাড়িতে যে কোনো সরকার-স্বীকৃত বিখ্যাত মানুষকে বসিয়ে নিতম্পর্শী ঐতিহ্য সৃষ্টি করে ফেলুন।)

☆

গব্বরের পর মধ্য কলকাতার আর এক কুখ্যাত তোলাবাজ় বাচ্চা রাজু ধরা পড়ল পুলিশের হাতে। গোয়েন্দা প্রধান সৌমেন মিত্র জানান, বাচ্চা রাজুর বিরুদ্ধে খুন এবং ভয় দেখিয়ে টাকা আদায়ের ছ'টি মামলা রয়েছে। (ধরবার মুরোদ নেই, শেষপর্যন্ত একটা দুধের বাচ্চাকে ধরে কেস দিলে গা।)

☆

ভ্যাট নিয়ে বিতর্ক এখনো মিটল না। এবার দেশ জুড়ে সমস্ত রাজ্যে একযোগে ভ্যাট চালু না হলে পশ্চিমবঙ্গে এই আইন মানবে না বলে ব্যবসায়ীরা জানিয়ে দিয়েছে।

(ভ্যাট!)

☆

বিয়েতে রাজি না হওয়ায় থ্রেমিকার মা, কাকা, পিসি এবং ঠাকুমাকে কাটারি দিয়ে কোপালো থ্রেমিক। ঘটনাটি ঘটেছে বাণ্ডাইআটির কৈশালির রামকৃষ্ণপল্লীতে।

(একেই বলে মারকাটারি থ্রেম।)

☆

ট্রাফিক সিগন্যাল অমান্য করায় বাধা দিয়ে মোটর বাইক চালক ও আরোহীর কাছে মার খেয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে হল কলকাতা পুলিশের এক ট্রাফিক কনস্টেবলকে।

(কনিষ্ঠ বল।)

অব্রীল ছবি ও গল্পের ১৪৫০টি বই আটক করল কলকাতা পুলিশ।

(তারপর কী করল?)

☆

হবিনাম সংকীর্তনের আসরে ভোজ খেয়ে ৭০০ মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, স্বরাপনগরে সওনা গ্রামে।

(মারে কৃষ্ণ রাখে কে।)

☆

ছাপানো প্যাডে বাদিকের কোণে মোটা অক্ষরে স্বক্খক করত ডঃ পি এস বাগ, এম বি বি এস। টানা দশ বছর বারাসাত থানার কলোনি মোড় এলাকায় তিন-তিনটে ডিসপেনসারিতে পালা করে বসা এহেন ডাক্তারবাবুটিকে পুলিশ শনিবার সকালে গ্রেফতার করল 'ভুয়ো' বলে। আসলে পি এস বাগ শুধুই মাধ্যমিক পাশ।

(এতদিনে বাগে পাওয়া গেল।)

☆

রবিবার সন্ধ্যায় চিত্রকূট আর্ট গ্যালারিতে অভিনব এক চিত্র-কবিতা সঙ্গীত সন্ধ্যা। অনুষ্ঠানের আঁকা ছবির উদ্বোধন করবেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। সেই ছবি দেখে কবিতা লিখবেন কবিরা।

(ছবিতা।)

তারাপদ রায় ও গঙ্গারাম

তারাপদ রায়



“গাছের কাঁঠালটা। দেখেছ? দু’এক দিনের মধ্যেই পেকে যাবে। তখন খেতে গিয়ে কাঁঠালের আঠা গোঁফে—হাতে লেগে না যায় তাই আগে থেকে তেল মাখিয়ে রাখছি। দুঃখের বিষয়, সেইদিন রাতেই গাছ থেকে প্রায়-পাকা কাঁঠালটি চুরি গেল।”

সেই যে গঙ্গারাম একবার জিজ্ঞেস করেছিল গোপাল ভাঁড় সম্পর্কে আমি কী জানি, তার সেই প্রশ্ন আমি ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু সে ভোলেনি। মনে পড়ছে, গঙ্গারাম বলেছিল, কত বাংলা প্রবাদের জন্ম হয়েছে গোপাল ভাঁড়ের গল্পে সেকথার কেউই খোঁজ রাখেনি। সেদিন গঙ্গারাম

‘গাছে না উঠতেই এক কাঁদি’ এই প্রবাদবাক্যটি গোপাল ভাঁড়ের গল্প থেকে উদ্ধৃত করে বলেছিল, গোপাল ভাঁড়ের বইয়ে খুঁজলে এরকম বহুত বহুত চমৎকার প্রবাদবাক্য পাওয়া যাবে। এবং গোপাল ভাঁড়ের কাহিনী দিয়েই এইসব প্রবাদের সৃষ্টি।

এইসব প্রবাদ যে গোপাল ভাঁড়ের গল্পের মাধ্যমেই সৃষ্ট হয়েছে, তার আগে প্রচলিত ছিল না, তার প্রমাণ কি? জানি, গঙ্গারামকে সরাসরি প্রশ্ন করলে সে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠবে। তাই তাকে একটু ঘুরিয়ে কথাটা বললাম। বলা বাহুল্য, গঙ্গারাম কোনো ব্যাখ্যা দিল না। সে বলল, তাহলে গোপাল ভাঁড়ের এই গল্পটা শুনুন। গোপাল ভাঁড় চড়া সুদে এক মহাজনের কাছ থেকে বেশ কিছু টাকা ধার নিয়েছিল। বছর ঘুরে গেল, কিন্তু গোপাল ভাঁড় ঋণ শোধ দেয় না। তখন উপায়ান্তর না দেখে মহাজন রাজ-সরবারে নালিশ করল। মহারাজা ক্রুদ্ধ হয়ে গোপালকে তলব করলেন। গোপাল এসে কবুল করল—হ্যাঁ, ধার নিয়েছিলাম; ঠিক সময়ে শোধ দেব।

মহারাজ গর্জে উঠলেন, ঠিক সময় আবার কি? তুমি এক বছরের কড়ারে ধার নিয়েছিলে। এখন চোদ্দ মাস হয়ে গেছে।

গোপাল করজোড়ে বলল, আমার কথাটা শুনুন মহারাজ। বাজারে সুদের হার বারো টাকা। এই লোকটির হার আঠারো টাকা। তাই আমি

ভেবেছিলাম এর বোধহয় আঠারো মাসে বছর।

গোপালের যুক্তি শুনে মহারাজ হেসে ফেললেন।

গঙ্গারাম একটি গল্পে নিবৃত্ত হয় না, সে আর একটি গল্প বলল গোপাল ভাঁড়ের বই খুঁজে। গল্পটা সাদাসিধে। গোপালের প্রতিবেশী তার বাড়ির বাইরের কাঁঠালগাছ তলায় বসে গোঁফে তেল মাখাচ্ছিলেন। গোপাল ভাঁড় কৌতূহলী হয়ে তাঁর সামনে দাঁড়ালে তিনি বললেন,—গাছের কাঁঠালটা। দেখেছ? দু’এক দিনের মধ্যেই পেকে যাবে। তখন খেতে গিয়ে কাঁঠালের আঠা গোঁফে—হাতে লেগে না যায় তাই আগে থেকে তেল মাখিয়ে রাখছি। দুঃখের বিষয়, সেইদিন রাতেই গাছ থেকে প্রায়-পাকা কাঁঠালটি চুরি গেল। গোপাল বললে, ‘গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল।’

গঙ্গারাম তার বোলায় ‘মোন্নার দৌড় মসজিদ’ থেকে ‘যেমন কুকুর তেমন মুত্তর’, ‘বাগকা বেটা’, ‘বিচিত্র সখ’ ইত্যাদি গোপালভাঁড়ীয় কাহিনী আছে বলে উল্লেখ করল।

‘বেল পাকলে কাকের কি’ পর্যন্ত আমি সহ্য করেছি। আর পারলাম না। বললাম,—এবার তুমি যাও।

গঙ্গারাম আহত হয়ে বলল, কেন?

আমি বললাম,—গোপাল ভাঁড়ের বইয়ে এই প্রবাদটাও আছে।

তৈরিক

তৈরিক
কিন্তু

(পূর্বপ্রকাশিত-র পর)

আদিকাণ্ড-২

ইন্দ্রকুমারতিরথোৎসব ধর্ম পরোক্ষী।

মহর্ষিকল্পো রাজর্ষি দ্বীপু লোকেশু বিস্তৃত॥

—বান্দীবি

দশরথকে লোকে ডাকে—
রাজাসাহেব। শুধু রাজাতেই শেষ
নয়, সঙ্গে আবার সাহেব। একা রামে
রক্ষা নাই সুগ্রীব দোসর।

ইংরেজরা আসার আগে হিন্দুস্তানে অনেক
রাজা ছিল। রাজায় রাজায় ঠোকাঠুকি ফাটাফাটি
কাটাকাটি। একেবারে রাজা কাটরা কারঁবার।
রাজার ভিড়ে তৈরি হয়েছে রাজস্থান। রাজা
রাখবার পিঁজরাপোল। শুধু কি তাই? রাজমহল
রাজগীর রাজমুখী রাজশাহী রাজৌরি গার্ডেন
রাজাবাজার—রাজার রাজায় ছয়লাপ। শেষ
পর্যন্ত রাজাভাতখাওয়া। কোন এক রাজা নাকি
সেখানে বসে ভাত খেয়েছিল।

গুরুনাথ তাঁর গুরুনাথিসার গ্রন্থে বলে গেছেন
বিশ্বশক্তি লক্ষ রৌপ্যমুদ্রা আয় হলে তবেই সে রাজা
হয়। সেটা সে যুগের কথা। একবিংশ শতাব্দীতে এসে
এখন তো বিশলাখ টাকা পান-দোকানির গঁজের
মধ্যেই পাওয়া যায়। কিন্তু তাই বলে তো পান-
দোকানিকে রাজা কলা যাবে না। পান-দোকানি যদি
রাজা হয় তবে আমিও বান্দীকি। আহা রে। দিনে দিনে
টাকার কী দুর্দশা। কোথায় রাজকোষ আর কোথায়
পান-দোকানির গঁজে। আর নোট? মেক ভারত
সরকারের ছায়া মারা পচা কাগজ। তা দিয়ে বিশ্বের
বাজারে ছুবি ছাড়া আর কিছুই কেনা যায় না।

ইংরেজরা তাদের রাজত্বকালে এদেশে কিছু রাজা
পুষত। পুষবেই তো। ইংরেজদের নামে রাজ,
বাকিংহাম প্যালেসে তোয়াজে রাশা একটি রাজ। তাই
এদেশেও ছিল কিছু গোষ-মানানো রাজ। তারা ছিল
প্রজাদের কাছে শের আর ইংরেজদের কাছে চুহা।

ইংরেজরা চলে গেছে আব সেই সঙ্গে রাজারাও
কালেক অতলে চলে গেছে। এখন আছে শুধু একটা
মহারাজ—পায়ে নাগরা মাথায় পাগড়ি পরে এয়ার
ইন্ডিয়া যাত্রীদের সেলাম বাজায়।

সাহেবদের ব্যাপারটা অন্যরকম। সাহেব
আমদানি করেছিল ইংরেজরাই। সাদা চামড়ার
সাহেবরা চলে গেছে আর দেশ ছেয়ে গেছে বাদামি
সাহেবে। বে-দামিও কলা যায়। সাহেবদের এখন আর
পিতল আদালিরাও সেলাম স্যালুট দেয় না। উষ্টে
ঘেরাও, ধনী বিত্তি খেঁড়ড়ে চোদপুরুষ উজ্জার করছে।

দশরথ ছিলেন রাজাসাহেব। কিন্তু না ওইরকম
পোষা রাজা, না এইরকম ফুকো সাহেব। উনি হলেন
এক জবরদস্ত রাজাসাহেব।

কয়েক হাজার একর জমি। সেখানে আখ চাষ
হয়। সেই আখ মাঠ থেকে যায় ওঁরই চিনিকলে। আখ
মাড়াই হয়ে রস বার হয়। তার থেকে প্রথমে চটচটে
আঠালো শুড় তারপর খটখটে দানা-দানা চিনি। চিনি
যায় বাজারে। যে পথে চিনির গমন সে পথেই
উষ্টোরথে অর্ধের আগমন। অঢেল অর্থ। অযোধ্যা
শহরে দশরথের প্রাসাদতুল্য বাড়ি, গ্যারেজে খান
দশেক গাড়ি, চারিদিকে গুণ্ডা গুণ্ডা মোসাহেবের দল,
তুড়ি মারলেই দৌড়োবার জন্যে একপায়ে ঝাড়া।
নেতা মন্ত্রীবা নিয়মিত তাঁর স্বাস্থ্যের খবর নেন। এ
হেন দশরথকে লোকে রাজাসাহেব বলবে না তো কি
যোশো মোখোকে বলবে?

একই সঙ্গে দশরথের আরো একটা খেতাব জুটে
গেছে। না, পদ্মশ্রী কিংবা পদ্মভূষণ মার্কা তখির করে
পাওয়া সরকারি খেতাব নয়। এ খেতাব দিয়েছে
দেশবাসী। ভয়ে দিয়েছে কি ভালোবাসায় দিয়েছে কলা
যায় না, তবে এ খেতাব পাওয়ার পিছনে দশরথের
নিজের কোনো হাত ছিল না।

আখকে ভালো কখায় বলে ইকু, তাই লোকের
মুখে মুখে দশরথের নাম হয়ে গেল ইকু দশরথ।
দশরথ তো দেশে একটার জায়গায় দশটা থাকতে
পারে। কিন্তু ওরকম দিকান্ত হোঁয়া ইকুবাগানেব মালিক
কটা হয়? তাই উনি ইকু দশরথ।

পুরাকালে রামকে নিয়েও এইরকম একটা
ব্যাপার ঘটেছিল। সেকালে স্বনামখ্যাত রাম ছিলেন
তিনজন। তাদেরকে আলাদা করে চেনার জন্যে
পাবলিক তাদের নামের সঙ্গে একটা করে নামাকণী
ছুড়ে দিয়েছিল। ‘পরশু’ নামের কুড়ুল হাতে রাণী
বামুনটির নাম পরশুরাম। লাঙল কাঁধে কৃষকের দাদা
গয়লাটির নাম বগরাম। আর ক্ষম্মিয় রাজা রঘুর
বংশধর রামের নাম রঘুপতি রাম—জয় জয় রঘুপতি
রাখব রাজা রাম।

নামের এরকম মেটামরফসিস এ যুগে আমাদের
আশেপাশেও কিছু কিছু হচ্ছে। পাড়ার এক মস্তান
বোমাবাজি করতে গিয়ে নিজের হাতেই বোমাটি
কাটিয়ে হয়ে গেছে নুলো গদাই। এক পেদি নেতা
পাটির হয়ে ভেড়ির দফল নিতে গিয়ে বেখড়ক
প্যাদানি খেয়ে এখন ল্যাংড়া মদন। এক পঞ্চায়ত
প্রধান ভাঁওতা মেয়ে একটা মেয়ের ইচ্ছাত লুঠ করার
মুখে মেয়েটা এক মোক্ষম কামড়ে তার কানটা কেটে
নেওয়ায় সে এখন কানকাটা কেলে।

এই দু’রকমের মেটামরফসিসকে এক লাইনে
ফেলে এক করে দেখাটা অবশ্য ঠিক নয়। প্রথমটা যদি
হয় গুটিপোকা থেকে প্রজাপতি তবে পরেরটা হল
গোবর পচে জৈব সার।

দশরথের নাম প্রথমে হল ইকু দশরথ। লোকের
মুখের ভাষা তো এক জায়গায় থেমে থাকে না। কালে
কালে নামটা হয়ে গেলে ইকুকু দশরথ।

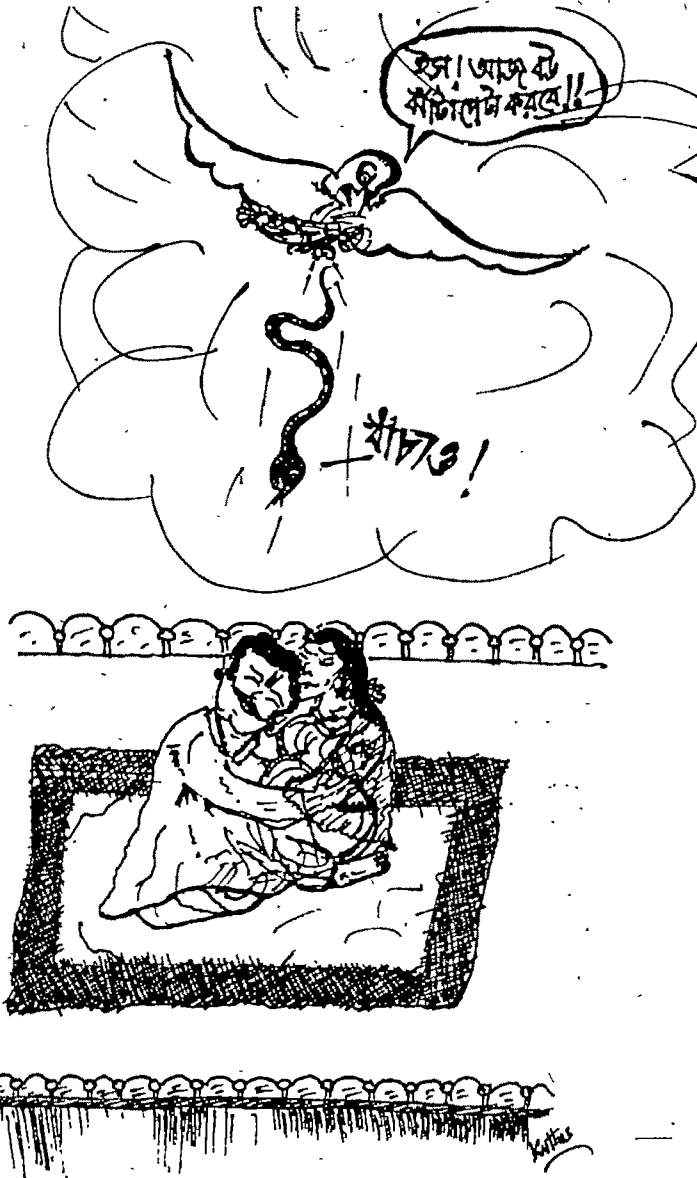
দশরথ আসলে কী বংশের লোক, রণবীর না
ভূমিহার—সেটা বলতে গিয়ে গুলি খেয়ে মরার ইচ্ছে
নেই। তবে স্বচ্ছন্দে বলে দেওয়া যায়, দশরথ যে
বংশের লোক সেটা ইকুকু বংশ।

তস্যচৈবজ্ঞানবস্যা ধর্মজ্ঞশ মহামনঃ।

সূতার্থঃ তপ্যমানস্য নাসীৎ বংশকরসূতাঃ॥

—বান্দীকি

এ হেন যে মহাপ্রতাপশালী দশরথ, তাঁর মনে
কিন্তু শাস্তি নেই। আজকাল অকণ্ঠ শাস্তি আর কার
মনেই বা আছে? বিশেষ করে দশরথের মতো কাঁড়ি
কাঁড়ি টাকাকড়ি ঘাঁটিঘাঁটি করা লোকের মনে তো
শাস্তি না থাকারই কথা। ইনকাম ট্যাক্স, সি বি আই,
ফেরা, ফরেন অ্যাকাউন্ট, নেতাদের পাওনাগুণ্ডা,
আস্তর ওয়াশ্‌ ডনদের পোষণ, শ্রমিক ইউনিয়নের
তোষণ—মাথায় ওপর সবসময় ‘সোর্ড অফ
ডেমোক্রিসি’ বুলেই আছে। আহা রে, আনইজি লাইজ



দ্য হেড দ্যাট উইয়ার্স এ ড্রনউন। শান্তি অতি দুর্লভ বস্তু।

না, এখানে সেই সব অশান্তির কথা বলা হচ্ছে না। এটা নেহাৎই পারিবারিক ব্যাপার। বা আরো অন্তরঙ্গ করে বলা যায়—আর্থিক। দশরথের কোনো আত্মজ নেই। এত ধনসম্পত্তি বিষয়-বৈতন। সেখ বৃজলে এসব থাকে কে? পাঁচ ভূতে ছুঁটরে?

কপালে নেই কোঁচি ঠকঠকহিলে অইব কিতা। ঘটি বাজানোই সার। দশরথের ঘরে ছেলে তৈরির যন্ত্র একটি নয়, দুটি নয়, শুণে শুণে তিনটি। কিন্তু তিনটি যন্ত্রের মিলিত উৎপাদন সেই শূন্যই। তাহলে? তাহলে ডালমে জরুর কুছ কালা হয়। নিশ্চয় কাঁচা মালের অভাব।

কিন্তু দশরথের মতো এক জাঁদরেল রাজাসাহেব বলে কথা। ব্যাপারটার ফয়সালা করে কে? যে যতকড় ডান্ডারই হোক না কেন শেষ কথাটি বলে দিয়ে এমন শীশালো মক্কেল হাতছাড়া করে পত্নাবে এত বোকা কেউই নয়। তাই কথাটি বুঝেও তারা চেপে যায়, আর টেনে চলে। মাঝে মাঝেই আসে, যন্ত্রগুলি পরীক্ষা করে দেখে। বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়েই দেখে। তারপর লম্বা লম্বা প্রেসক্রিপশন লিখে দিয়ে আরো লম্বা লম্বা চেক পকেটে পুরে বাড়ি যায়। মনে মনে জানে, এইরকমই চলবে, যতদিন না—কেস রেকর্ড টু স্বর্ণবন্দ্য শব্দভরি।

নিজের ঘটতির ব্যাপারে সম্প্রহটা যে দশরথের নিজের মনেও উকি মারেনি, তা নয়। এর পেছনে

একটা অনেকদিনের পুরনো ঘটনার প্রভাব থাকারো বিচিন্য় নয়। ঘটনাটা যখন ঘটেছিল তখন দশরথের বস্তু ছিল যথেষ্ট গরম। তাই তখন বিশেষ পাতা টান্স দেননি। তুড়ি মেবে উড়িয়ে দিয়েছিলেন।

কথাটা দশরথ নিজের মনে মনেই রেখেছিলেন। কষ্টকে কেনোদিন বলেননি। পেয়ারের রানিসাহেবদেরও না। কলকেন কী করে? ব্যাপারটা যে একটি নিষাদ কেলেকারিয়াস কেছা। অনেকদিনের পুরনো। এতদিনে ভুলে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ভুলতে দিচ্ছে কই? এখন যে প্রতি মুহূর্তে হাড়ে হাড়ে টের পাইয়ে দিচ্ছে। বংশ সুদ্ধ পুচ্ছ ধরে টান মেরে নির্বংশ করে দেবার অবস্থা। সেই কেছার ইতিবৃত্ত জ্ঞানার জন্যে এখন একটু পিছিয়ে যেতে হবে।

আদিকাণ্ড-৩

পারিজাত ফখনই হইল পরশন।

ইন্দুমতী ছাড়িলেন তখনি জীবন॥

—কৃত্তিবাস।

দশরথের বাবা ছিলেন অজয়বাবু, মা ইন্দুমতী। দশরথের বয়স যখন সবে এক-বৎসর তখন হঠাৎই একটা দুর্ঘটনায় ওঁরা দুজনেই একসঙ্গে মাঝা গেলেন। সে এক অদ্ভুত ধরনের দুর্ঘটনা। পৃথিবীর ইতিহাসে এরকম দুর্ঘটনার উদাহরণ আর আছে বলে মনে হয় না। ট্রেন ওন্টানো নয়, জাহাজ ডুবে যাওয়া নয়, আগুনে পুড়ে যাওয়া নয়, ঝড় উড়ে যাওয়া নয়, এমনকি ডাকাত কিংবা পুলিশের গুলি খাওয়াও নয়। মক্কা বেমক্কা যত বকমের দুর্ঘটনার কথা ভাবা যেতে পারে তার কোনোটিই নয়। তবে দুর্ঘটনাটা কিন্তু জ্বরদহ।

অজয়বাবু ছিলেন সেই সময়কার এক জাঁদরেল মুখিয়া—ঠাকুর সাহেব। কয়েক হাজার বিঘে জমির খানদানি জমিদার। গায়ে-গতরে খটিতে হয় না, দশটা পাঁচটা অকিস করতে হয় না। খাওয়া-দাওয়া ঘুমানো ছাড়া কাজের কাজ বলতে প্রজাদের দণ্ডবৎ নেওয়া আর গোঁফে তা দেওয়া।

প্রজাদের দণ্ডবৎ নিতে হাত-পা নাড়তে হয় না। কিন্তু গোঁফে তা দিতে পা না হলেও অন্তত হাতটা নাড়তেই হয়। পায়ের নখ কাটা থেকে মাথার চুল ছাঁটা পর্যন্ত সবই চাকর-বাকর দিয়ে করানো যায়। কিন্তু গোঁফে তা দেওয়াটা অন্যকে দিয়ে হয় না। নিজের গোঁফে নিজেই তা দিতে হয়। অজয় ঠাকুরের শাটনি বলতে ওইটুকু।

এই ধরনের লোকেরা সাধারণত সূর্যোদয় দেখে না। উটেই সূর্যকেই দেখতে হয় ওঁদের শক্তাভাগ। দুপুরে রান-খাওয়া-বিশ্রাম আর মোসাহেবদের তেল-

মাখন সেবন, এই সমস্ত করতে করতেই বিকেল। সেদিন অজয় ঠাকুর বিকেলের ফুরফুরে হাওয়ায় ছাদের ওপর আরাম-কেন্দারাম বসে জলচৌকিতে পা তুলে দিয়ে পাশে বসা ইন্দুমতীর আদর খাচ্ছিলেন। দুইটানাটা ঘটল সে সময়।

মাধার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল একটা বাজপাখি। তার পায়ের নখে ধরা ছিল একটা সাপ। সাপটা দিয়ে একটু পরেই একটা মজাদার ডিনার হবে, সেই আনন্দে ডগমগ হয়ে পাখিটা যখন ট্রা-সা-সা করে গান গাইছিল তখন সাপটা হয়ে গেল হাতছাড়া, মানে আর কি পাখির পা ছাড়া।

পাখিটার আরো সাবধান থাকা উচিত ছিল। কিন্তু পাখির মাধ্যম ফিলু বলতে তো ওইটুকু। তার পক্ষে এরকম একটা ভুল খুব একটা দোষের বলা যায় না। হঠাৎ খেতে পাওয়ার সুযোগ সামনে এসে গেলে এরকম ভুল অনেকেই করে। উদাহরণ অনেক আছে। গাধা যে গাধা, পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণী সেও এর থেকে রেহাই পায়নি।

গাধাব বেলায় তো ঘটনাটা হয়েছিল একেবারে মারাত্মক। একবার একটা গাধা বুড়ো হয়ে যাওয়ায় তার মালিক তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। বেচারি গাধা প্রচণ্ড বিদ্রোহ শুরুতে শুরুতে তার অজ্ঞাভেই একটা পিঁজরাপোলের সামনে গিয়ে হাজির হল। তার অবস্থা দেখে পিঁজরাপোলের দারোয়ান তার সামনে কিছু খাবার ধরে দিল। হঠাৎ সামনে খাবার দেখতে পেয়ে গাধার আনন্দ আর ধরে না। সে আনন্দে আকাশের দিকে মুখ তুলে হো হো করে হাসতে শুরু করল। আর হাসতে হাসতেই হার্টফেল করে মরে গেল। গাধা নিজে মরে প্রমাণ করল যে ব্যাপারটা খুবই মারাত্মক ছিল।

মানুষের বেলায় এরকম হেসে হেসে মরে যাওয়ার উদাহরণ হয়ত নেই। কিন্তু অনাহারের মুখে পেট ঠেসে খেয়ে টেসে যাওয়ায় উদাহরণ অনেক আছে।

সাপ পা ছাড়া হয়ে যাওয়াটা পাখির পক্ষে মারাত্মক হল না, মারাত্মক হল অজয় ঠাকুর আর ইন্দুমতীর পক্ষে। সাপটা সোজা এসে পড়ল ওদের গায়ের ওপর। ওরা বসেছিলেন যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ হয়ে। তাই সাপটা এসে পড়ল একসঙ্গে দু'জনেরই গায়ের ওপর।

সে কোরা জ্বাতে সাপ। একেই পাখির নখের আঁচড়ে ক্ষত-বিক্ষত। সেই সঙ্গে একটু পরেই ডিনার হতে হবে, সেই দৃষ্টিভঙ্গি। তার ওপরে আবার অত উঁচু থেকে পড়ে যাওয়ার ব্যথা। সব মিলিয়ে তার ফিলুতে তখন চলছে ভূমিকম্প। দোষী পাখিটা শান্তি পেল না। সাপের মরণ-কামড় গিয়ে আছড়ে পড়ল অজয় ঠাকুর আর ইন্দুমতীর ওপর। দু'জনেই সঙ্গে সঙ্গে ঢলে পড়ে গেলেন মরণের কোলে।

এ জগতে পাঞ্জির-পা-ঝাড়া পাখীরা অনেক অকর্ম কুকর্ম করে। কিন্তু পাখির-পা-ছাড়া সাপটা যা করল সেটা কোনো অকর্ম কুকর্ম কিংবা দুষ্কর্ম নয়, সাপের স্বাভাবিক কর্ম। একটা মরোমরো সাপ স্বকর্ম সাধন কবে মারায়ণ উপন্যাসে অমর হয়ে গেল।

যখন এই ঘটনাটা ঘটে তখন পাশাপাশি কেউ ছিল না। অনেক পরে ইন্দুমতীর খাস ঝি কমলিনী রেকাবিতে সাক্ষ্যকো ঘটি আর বাটিতে আমের সরবৎ নিয়ে যখন ছাসে এসে পৌঁছিল তখন অবস্থা দেখে তার মাধ্যম বজ্রাঘাত। সর্গাঘাতে ঠাকুর আর ঠাকবাইন মরলেও বজ্রাঘাতে কমলিনী অবশ্য মরল না। হাতের ঘটিবাটি ফেলে দিয়ে—ওগো মাগো কী হবে গো—বলে দৌড়ে নিচে গিয়ে সবাইকে খবর দিল।

শুরু হয়ে গেল জ্ঞাতিগুণি ঝি-চাকরদের দৌড়োদৌড়ি। হুসুহুল কাণ্ড। চারদিক লোকে লোকে ছমলাপ। সবাই দৌড়োয়। কাজের কাজ যত না হয় হটগোল হয় তার দশগুণ। সবাই ছাদে উঠতে চায়। ধাক্কাধাক্কিতে দু-একজন গড়িয়ে নিচে পড়ে গেল। যারা ছাদে উঠতে পেল না তারা নিচে সাঁড়িয়ে বেশি বেশি চিংকব করতে লাগল। এর মধ্যে দু-চারজন যারা হাতচিটা ছাড়াই ঠাকুর সাহেবের থেকে টাকা কন্ড নিয়েছিল তারা লুকিয়ে স্বস্তির চাশা নিশাস ছাড়ল।

সেই পুত্র সৈয়া গেল আপনার ঘবে।

পড়াইল নানা শাস্ত্র, শাস্ত্র অনুসাবে।।

—কৃষ্ণিবাস

খবর পেয়ে দৌড়ে এলেন বশিষ্ঠ শর্মাচার্য। উনি হলেন অজয় ঠাকুরের প্রাণের বন্ধু। জ্ঞানী গুণী বিদ্বান সজ্জন বলে খ্যাতি আছে। সময়ে অসময়ে অজয় ঠাকুরকে নানা সুযুক্তি দিয়ে সাহায্য করতেন। স্ত্রী অরুম্বতীকে নিয়ে সহজ সবল জীবন যাপন করেন। বন্ধুর পুত্র দশরথকে নিজপুত্রের চোখেই দেখেন। এরকম উদার বন্ধু-বৎসল বশিষ্ঠকে দেখিয়ে অযোধ্যার লোক বলাবলি করে—এরকম স্ববিতুল্য মানুষ একালে

এ জগতে পাঞ্জির-পা-ঝাড়া
পাপীরা অনেক অকর্ম কুকর্ম
করে। কিন্তু পাখির-পা-ছাড়া
সাপটা যা করল সেটা কোনো
অকর্ম কুকর্ম কিংবা দুষ্কর্ম নয়,
সাপের স্বাভাবিক কর্ম।

দেখা যায় না। সেই রোতা যুগে রামের আমলে ছিলেন এক বশিষ্ঠ ঋষি আর একালে ইনি।

সেকালের বশিষ্ঠের পবিচয় ছিল—

কামক্লেখাবুভৌষস্য চরণৌসংবাহতঃ।

ইন্দ্ৰিমাণং বশ করে বশিষ্ঠ ইতি চোচ্যতে॥

একালের বশিষ্ঠ অতটা না হলেও কিছুটা বটে। বশিষ্ঠ এসেই ডাক্তার আনালেন। কিন্তু ততক্ষণে ডেথ সার্টিফিকেট লেখা ছাড়া তার আর কোনো কাজ নেই। দু'জনের জন্যে দুটো সার্টিফিকেট লিখে দুগুণ ভিজিটের টাকা পকেটে পুরে ডাক্তার বাড়ি চলে গেল। ডাক্তার গেল বাড়ির দিকে আর এঁরা দু'জনে দুটো ফুল দিয়ে সাক্ষ্যকো গাড়িতে চেপে চলে গেলেন স্বশানের দিকে।

বশিষ্ঠ মনে মনে ভাবলেন, কি অদ্ভুত মৃত্যু। সেই রোতা যুগে এই অযোধ্যারই রাজা অজয় আর তাঁর বানী ইন্দুমতী মারা গেছিলেন আকাশপথে উড়ে যাওয়া নারদের বীণা থেকে খসে পড়া পারিজাত ফুলের ছোঁয়ায়। আব এ যুগে আমার বন্ধু অজয় আর তার বউ ইন্দুমতী মারা গেল বাজপাখির পা থেকে খসে পড়া বিষধর সাপের ছোঁবে। কি অদ্ভুত মিল। এ যেন কলিযুগে তৈরি হওয়া এক নিউ রামায়ণের কাহিনী। রামায়ণ তো নয়, যাকে বলে মারায়ণ।

এরপর বশিষ্ঠের কাজ হল অজয় ঠাকুরের বিষয়-সম্পত্তির রক্ষাবেষক্স করা আর শিশু দশরথকে বড় করে তোলা। বড় অবশ্য কাউকে চেঁচা করে করতে হয় না। হিন্দুস্থানে সবাই দিনে একদিন করে বড় হচ্ছে, তা সে কিছু কক্ষক বা না কক্ষক। রেফ খাটিয়াম শুয়ে ঘুমোলেও কোনো হিন্দুস্থানির বড় হওয়া আটকে থাকে না। অবশ্য সেই খাটিয়ামটি ক্ষমানে যাবার খাটিয়া আর ঘুমটি চিবঘুম হওয়া চলবে না।

বশিষ্ঠ দশরথের সে রকম বড় হওয়ার কথা ভাবেননি। অরুম্বতীর যুক্তিমতো তিনি দশরথকে হস্টেলে রেখে ভালো স্কুলে ভালো কলেজে পড়ালেন। তারপর যখন দশরথ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর ছাত্র, তখনই বাধিয়ে বসলেন সেই কলেজরিয়াস কাণ্ডটি, যেটা শুধু বড়বাই করতে পারে। অ্যাডাল্টস ওনলি।

(ক্রমশঃ)



পথঘাটের কিসসা

নব্বীপের গজানন মাকাল আব রঙপুরের পোড় খাওয়া পঞ্চানন পোড়েল অবার কলকাতায় একসঙ্গে হয়েছেন বহুকাল পর। শৈশব, যৌবন কলকাতায় স্কুল-কলেজে এক সঙ্গে কাটিয়ে বর্তমানে কর্মসূত্রে সুদূর ইংলণ্ডবাসী। এখানে এসে ভোজন রসিক দুই বন্ধু পুনরো অভ্যাসমতো ফুটপাথের হকারদের খাবার চেখে চেখে বেড়াচ্ছেন। চাখতে চাখতে সেদিন দুপুরে রাইটার্স বিল্ডিংয়ের দক্ষিণ-পূর্ব দিকের দোড়গোড়ায় এসে উপস্থিত। বিশাল খাবারের মহামিছিল দেখে দুই বন্ধু হতবাক। ব্রোবোর্গ রোড থেকে গাড়িসলো চার্চের পাশ দিয়ে দক্ষিণে ছুটে চলেছে। ডানদিকে ফুটে খাবারের হকাররা চিৎকার করে বলছে—আসুন। গরম বাবু। কেউ আবার বলছে, বাবু ঠাণ্ডা। গজানন বললেন, এক জায়গায় এত খাবার! ফুটপাথের ওপর। লন্ডনে এরকম দেখিনি। বিশ্বের আর কোথাও আছে বলেও শুনিনি।

ঘুরে ঘুরে দু'জনে খাবারের আইটেম গুনতে লাগলেন। বাদাম, কলা, আপেল, মেওয়া, খেজুর, সন্দেশ, রসগোল্লা, সীতাভোগ, মিছানা, রাজভোগ, বিরিয়ানি, মাংস, কাবাব, পরোটা, লুচি, রোল, মোগলাই, চপ, কুটি, ঘুগনি, বীটের দম, জিলিপি, দুধের সর, মাখন, কেক, স্কীর, হানা, দই, রাবড়ি, বড়া, চাউমিন, আরো কত কি। রাইটার্সের ক্যান্টিন থেকেও জানলা দিয়ে খাবার বিক্রি হচ্ছে।

গজানন—বাপরে বাপ, কি নেই এখানে? কোনটা ছেড়ে কোনটা খাব?

পঞ্চানন—সব চেখে দেখতে গেলে লন্ডনে আর ফেরা হবে না। চাকরিটা খোঁয়াতে হবে। স্টক এক্সচেঞ্জের রাস্তায় ওগুলো কী, গজা?

গজানন—ওগুলো তালের পাটালির স্টক। মোয়াও রয়েছে। আমাদের সময়ে এতসব ছিল না। দশ টাকায় বিরিয়ানি, ভাবাই যায় না।

পঞ্চানন—তখন থাকলে কে কলকাতা ছাড়ত। কে জানত কলকাতা খাবারে ডুববে? খালি একটু জলকব হয়ত দিতে হতে পারে। আর হোমরা-চোমবাদের চামচে হও, ব্যস।

গজানন—মাথায় তো কাল নোংরার প্যাকেট পড়েছিল। লন্ডনের কথা ভাবো, ওখানে হনুমানরাও নোংরা ছুঁড়ে মারতে শেখেনি।

পঞ্চানন—নোংরা পজুক। ছাতা নিয়ে ইঁটব। দরকার হলে গামবুট পরব। রাস্তায় তো আর গরু ঘাঁড়ের উৎপাত নেই। যে যেখানে পারো দোকান করে বসে যাও নোংরার ওপর। কেউ শুঁতো মারবে না। খালি জঞ্জালের পাহাড় আব গর্ত বানাও। পুলিশও তো স্ট্যাচু।

গজানন—পুলিশ-টুলিসের, খাবার-দাবারের ওপর এসে না বসাই ভালো। ওনাবা যেখানে আছেন সেখানেই থাকুন।

পঞ্চানন—তা ঠিক। আচ্ছা, খাটাল উঠে গেছে নাকি শহর থেকে?

এক জিলিপিওয়ালা দুলে দুলে জিলিপির প্যাঁচ মারতে মারতে বললে—খাটাল এখন সোনারপুর আর হাসনাবাদে চলে গেছে বাবু।

পঞ্চানন—ও। তাই এতটা রাস্তা হেঁটে এলাম একবারও গোবরে পা পড়েনি। ছাগলনাদিরও দেখা মেলেনি।

জিলিপিওয়ালা—গোবর, নাদি আর পাবেন না এখন। শুধু বৌদে আর ন্যাংচা বাবু।

গজানন—শুধু খাবার, যেদিকে তাকাই। অবাঁক কাণ্ড বটে।

এক ব্যক্তি ঘুঘনির পাতা চেটে ফেলে দিয়ে বললেন—গরু ঘাঁড় না থাক, মানুষরূপী মোষ তো আছে, কখন যে যেমো গা দিয়ে শুঁতিয়ে দেবে কে বলতে পারে।

জিলিপিওয়ালা গরম তেলের কড়াই থেকে জিলিপি তুলে পাশে রসেব ডাকাম ডুবিয়ে দিয়ে বললে—শুঁতো খাবার ভয় নেই, এখানে এসে দাঁড়ান। গরম জিলিপি খান বাবু।

গজানন লম্বা আঙুল তুলে বললেন, ঐগুলি কি, নেংটি ইঁদুরের মতো?

—মালপো বাবু। খান না দুটো।

—পাশের ছেলেটি?

—ও আমাব ভাইপো। ওই তো মালপো ভেজেছে।

—ভাইপোকে বলো দুটো করে মালপো দিতে।

খাওয়া শেষ হতে পয়সা নেওয়ার পর ছেলেটি বলল—আব দুটো করে খান না হলো বেড়ালের মতো।

গজানন—আমাকে হলো বেড়াল বললি। ভদ্রতা শিখিনি? সাহস কম নয় তো।

—নেংটি-ইঁদুর তো হলো বেড়ালেই খায় বাবু।

—বুঝছি। বাবুকে কাবু করছে। ওস্তাদ ছেলে বটে।

পাশের জগ থেকে জল খেয়ে পকেট থেকে অ্যান্টাসিড ট্যাবলেট বাব কবে মুখে পুরে দুই বন্ধু টেকুর তুলতে তুলতে ব্রোবোর্গ রোড পার হয়ে লালবাজারের দিকে হন হন করে ইঁটতে লাগলেন।

জিলিপিওয়ালা মুখ বেকিয়ে বললে,—বিলিতিবাবু! যক্ষস চপের চপ।

নতুন একজন পথচারী জিজ্ঞেস করল—দাদা, মালপো ভালো হবে?

—বলেন কি। বিলেত-আমেরিকায় থাকা বাবুরা কলকাতায় এসে আমার কাছে ছাড়া মালপোই খান না, বুয়েচেন।

—বরুণ ঘোষ

পত্রপাঠ-এর সাম্প্রতিক গ্রাহক তালিকা ও প্রত্যেকের নামের পাশে রেজিস্ট্রেশন নম্বর দিয়ে দেওয়া হল। কোনো কারণে যোগাযোগ করলে দয়া করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বরটি উল্লেখ করবেন

০০৩ অধ্যাপক প্রতুল কুমার সিংহ, কলকাতা-৬০
 ০০৫ অধ্যাপক অমর ব্যানার্জী, কলকাতা-১২
 ০০৮ ইন্দ্রনাথ সিন্ধা, কৃষ্ণনগর
 ০১৩ দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা-২৯
 ০১৯ শ্রীমতী অলকা দত্ত, কলকাতা-১২
 ০২০ শ্রীমতী রাণা দত্ত, কলকাতা-৫৭
 ০২১ শিবদাস ঘোষ, কলকাতা-২৯
 ০২২ ড. নন্দদুলাল পারিয়া, কলকাতা-৬
 ০২৩ ড. রবীন্দ্রনাথ প্রকায়স, কলকাতা-৩২
 ০২৪ ড. সুকুমার আদিত্য, কলকাতা-৫৪
 ০২৫ স্বপনকুমার দাস, কলকাতা-৬
 ০২৭ সুরাত গঙ্গোপাধ্যায়, কলকাতা-২৬
 ০৩৩ ডা. সেবাশিস ভট্টাচার্য, কলকাতা-৩৪
 ০৪০ সঞ্জিত কুমার সিংহ, শ্রীরামপুর
 ০৪২ অধ্যাপিকা বিনতা রায়চৌধুরী, কলকাতা-৩৭
 ০৪৪ অধ্যাপিকা সুশ্রীমা দত্ত, কলকাতা-৭৮
 ০৪৬ ড. সুমিত্রা সেন, কলকাতা-১৯
 ০৫৩ ডাঃ রাজদীপ মুখার্জী, কলকাতা-১৯
 ০৫৪ শ্রীমতী প্রতিমা রায়, কলকাতা-৯
 ০৫৫ অধ্যাপক বিনতানন্দ দাশগুপ্ত, কলকাতা-৩০
 ০৫৬ অধ্যাপিকা কাকলি দাস, কলকাতা-৮৯
 ০৫৭ অধ্যাপিকা জয়ন্তী রায়চৌধুরী, কলকাতা-২৫
 ০৬০ অধ্যাপিকা আফরোজা খাতুন, কলকাতা-৭৫
 ০৬১ সমরেশচন্দ্র বেরা, লক্ষ্মী, মেদিনীপুর
 ০৬৩ মাণিকচন্দ্র দাস, জেমারী, বর্ধমান
 ০৬৫ অধ্যাপক প্রশান্তনাথ ঘোষ, বহডু, দঃ ২৪ পরগণা
 ০৬৬ ড. বীণাপাণি রায়চৌধুরী, কলকাতা-৭১
 ০৬৮ কমল রায়, ব্যারাকপুর
 ০৬৯ অসীম কুমার রায়, কলকাতা-১৯
 ০৭০ শ্রীমতী শুচিতা পট্টনবীশ, কলকাতা-৬১
 ০৭১ বুদ্ধদেব কর্মকার, সোনারপুর
 ০৭২ বাসুদেব পাল, দত্তপুকুর উঃ ২৪ পরগণা
 ০৭৩ আশিস কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ইউকো ব্যাঙ্ক, বালিগঞ্জ
 ০৭৪ রোটারিয়ান টি এস ডি নাথ, কলকাতা-৪৫
 ০৭৫ রোটারিয়ান প্রভাত মিত্র, কলকাতা-৫৪
 ০৭৬ তপনকুমার শূর, চন্দননগর
 ০৭৭ বীরেন্দ্র বেরা, কলকাতা-১৯
 ০৭৮ জয়দীপ ব্যানার্জী, কলকাতা-২৯
 ০৭৯ প্রশান্ত সাহা, ব্যারাকপুর, কলকাতা-১২০
 ০৮০ সুপ্রতিম চাকলাদার, কলকাতা-১৯
 ০৮১ অধ্যাপক কল্যাণময় গাঙ্গুলী, নিউ আলিপুর কলেজ
 ০৮২ নরেন্দ্রনাথ জানা, কলকাতা-১৯

০৮৩ শ্যামলেন্দু রায় মগরা, হুগলী
 ০৮৪ ইন্দ্রনীল মিত্র, কলকাতা-২৫
 ০৮৫ ইউসুফ খান, কলকাতা-৩১
 ০৮৬ অধ্যাপিকা নীলা সরকার, কলকাতা-১০৪
 ০৮৭ অধ্যাপিকা বসু মুখার্জী, কলকাতা-৩৪
 ০৮৮ রোটারিয়ান বিশ্বনাথ ঘোষ, কলকাতা-৩৯
 ০৮৯ রোটারিয়ান তরুণ কুমার মিত্র, কলকাতা-২৭
 ০৯০ শ্রীমতী ইন্দ্রাণী ব্যানার্জী, কলকাতা-২৬
 ০৯১ রোটারিয়ান কল্যাণকুমার ঘোষ, কলকাতা-১৯
 ০৯২ রোটারিয়ান অমিয় দাস, কলকাতা-৯৮
 ০৯৩ রোটারিয়ান এ বি চৌধুরী, কলকাতা-১৯
 ০৯৪ শ্রীমতী দীপ্তি সেনগুপ্ত কলকাতা-৩৪
 ০৯৫ শ্রীমতী জয়শ্রী চাকলাদার, কলকাতা-১৯
 ০৯৬ সঙ্গত ভট্টাচার্য, কলকাতা-৪
 ০৯৭ রোটারিয়ান সুমিতা সেনগুপ্ত, কলকাতা-৬৮
 ০৯৮ অধ্যাপিকা বন্দনা রায়, নিউ আলিপুর কলেজ
 ০৯৯ তিমির গুহ, নিউ আলিপুর কলেজ
 ১০০ দুলালচন্দ্র চৌধুরী, মেদিনীপুর
 ১০১ দীপঙ্কর মণ্ডল, কলকাতা-৩
 ১০২ হারাণচন্দ্র গায়েন, কোণালবাড়িয়া, নদীয়া
 ১০৩ কিরণচন্দ্র দাস, খড়্গপুর
 ১০৪ তন্ময় পাল, বারাসত
 ১০৫ প্রশান্ত দত্ত, কাশিমবাজার, মুর্শিদাবাদ
 ১০৬ অঘরীশ দত্ত, কলকাতা-৩৪
 ১০৭ সুরজিৎ দত্ত, কলকাতা-১
 ১০৮ ড. মঞ্জু ব্যানার্জী, বালিগঞ্জ সায়েল কলেজ
 ১০৯ অধ্যাপক শুভময় দাস, কলকাতা-৯০
 ১১০ দিব্যেন্দু আচার্য, কলকাতা-৪১
 ১১১ গদাধর শ্যামকই, বাগনান
 ১১২ শ্রীমতী স্বপ্না গুহ, বীবতুম
 ১১৩ বাণীব্রত বস্তু, রহড়া
 ১১৪ শুভজিত মজুমদার, কলকাতা-৩২
 ১১৫ শশধর সাহা, কলকাতা-১১
 ১১৬ রাজকুমার অধিকারী, কলকাতা-৬০
 ১১৭ শঙ্কর দাস, মধ্যমগ্রাম
 ১১৮ শ্রীমতী মন্দিরা সিংহ, কলকাতা-২৬
 ১১৯ অরুণজ্যোতি দাস, স্টেট ব্যাঙ্ক, নিউ আলিপুর
 ১২০ অলক দাস অধিকারী, বেহালা
 ১২১ সায়ন্তন আচা, কলকাতা-৪৫
 ১২২ সাহানি বেগম, গুমা, উঃ ২৪ পরগণা
 ১২৩ শ্রীমতী মায়ী সেন, কলকাতা-১৯
 ১২৪ উদয় কর্মকার, কলকাতা-৬

- ১২৫ অরুণকুমার ঘোষ, কলকাতা-৪৭
- ১২৬ অরুণকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা-৩৩
- ১২৭ সমীর মজি, কোমগর
- ১২৮ অর্পণ হাজরা কলকাতা-৫২
- ১২৯ স্বপন ঞ্চমাবিক, বালটিকুরী, হাওড়া
- ১৩০ নির্মাল্য দাশগুপ্ত, কলকাতা-৫৬
- ১৩১ পার্শ্ব মুখোপাধ্যায়, বাগনান
- ১৩২ শ্রীমতী সীমা চক্রবর্তী কলকাতা-৯২
- ১৩৩ তারকনাথ পাণ্ডা, যুগডিহা, মেদিনীপুর
- ১৩৪ শ্রীমতী শিবাবী ধরভৌমিক, কলকাতা-৩১
- ১৩৫ কৌশিক রায়, কলকাতা-২৪
- ১৩৬ শ্রীমতী মণীষা ভট্টাচার্য, নৈহাটি
- ১৩৭ রাজর্ষি মৈত্র, নরেন্দ্রপুর
- ১৩৮ ডাঃ এ কে মিত্র, হাওড়া
- ১৩৯ অভিনব রায়, কালীবাজার, বর্ধমান
- ১৪০ কাকলি চৌধুরী, সন্তোষপুর, কলকাতা-৬৬
- ১৪১ অজিত কুমার দেবনাথ, হরিনাতি
- ১৪২ অসিত কুমার মিত্র, আদি সপ্তগ্রাম, হুগলী
- ১৪৩ অর্পণ কুমার শর্মা, চাকদহ
- ১৪৪ শ্রীমতী অলিভিয়া শেঠ, কলকাতা-২৬
- ১৪৫ বাবুয়া রায়, শ্রীরামপুর
- ১৪৬ অজিত আচার্য, কলকাতা-২৫
- ১৪৭ দীপ্তেন গোদার, কলকাতা-৫৪
- ১৪৮ শুভেন্দু মিত্র, কলকাতা-৬
- ১৪৯ শ্রীমতী মৌসুমী চক্রবর্তী, কলকাতা-৪১
- ১৫০ সপ্রটি বসু, কলকাতা-৯
- ১৫১ হিমাংশু কুমার নাথ, কলকাতা-৩৩
- ১৫২ দেবপ্রসাদ মুখার্জী, কলকাতা-৮৪
- ১৫৩ বৈদ্যনাথ সাধুর্মা, কলকাতা-৫
- ১৫৪ ড. টি. এন. পাল, কলকাতা-১০
- ১৫৫ আশিস রাণা, তারকেশ্বর পৌসভা, হুগলী
- ১৫৬ অশোক কুমার দাশগুপ্ত, কলকাতা-৩১
- ১৫৭ বারিদবরণ বসু, কলকাতা-১০৭
- ১৫৮ ড. কুণাল চক্রবর্তী, হুঁচুড়া
- ১৫৯ প্রবীর ঘোষ, কোদালিয়া
- ১৬০ দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, বারাসত
- ১৬১ সিদ্ধার্থ গঙ্গোপাধ্যায়, মহেশমাটি, মালদা
- ১৬২ অতীশ কুমার বসু, কলকাতা-৩৬
- ১৬৩ শ্রীমতী শ্রীজাতা গুহ, কোলামঙ্গলা, বাঙ্গালোব
- ১৬৪ চন্দন মিত্র, কলকাতা-৬৫
- ১৬৫ শ্রীমতী কৃষ্ণা মুখার্জী, পলতা
- ১৬৬ প্রদীপ্ত কুমার ঘোষ, বাগী
- ১৬৭ প্রব দাশগুপ্ত, কলকাতা-১৫
- ১৬৮ প্রভাত কুমার দাস, বোটানিকাল গার্ডেন, হাওড়া
- ১৬৯ রাজীব দাস, কলকাতা-৬
- ১৭০ সুশ্বেন্দু সেনাপতি, জগাছা, হাওড়া

- ১৭১ সুমনকল্যাণ বিশ্বাস, আগরপাড়া
- ১৭২ বিমলচন্দ্র পাল, কলকাতা-৭৪
- ১৭৩ তাপসকুমার গায়েন, বসিরহাট
- ১৭৪ সারস্বত দাস, হরিসেবপুর
- ১৭৫ সুরত মণ্ডল, চাকদহ
- ১৭৬ দেবাশিস রায়, কলকাতা-৪০
- ১৭৭ প্রসেনজিৎ দাস, শিবপুর, হাওড়া
- ১৭৮ প্রীতিশঙ্কর চৌধুরী, ঘাটাল
- ১৭৯ শ্রীমতী শুক্লা ভট্টাচার্য, কলকাতা-৭১
- ১৮০ শ্রীমতী দেবারতি সেনগুপ্ত, বেহালা
- ১৮১ সমবেদ্র গাঙ্গুলী, গড়িয়া
- ১৮২ ড. এ কে পাল, বালিগঞ্জ সায়েল কলেজ
- ১৮৩ ড. দিলীপকুমার দাস, সুভাষগ্রাম
- ১৮৪ ড. স্বপন কুমার ঘোষ, কলকাতা-৯৫
- ১৮৫ শ্রীমতী জয়ন্তী পুরকায়স্থ, কলকাতা-৫৩
- ১৮৬ শ্রীমতী তপতী বন্দ্যোপাধ্যায়, ইবলুর বাঙ্গালোর
- ১৮৭ শ্রীমতী সীতা রুদ্র, কলকাতা-২৬
- ১৮৮ কমল বসু, কলকাতা-৪৫
- ১৮৯ সুশান্ত রায়, কলকাতা-১৪
- ১৯০ দীপক লাহিড়ী, কলকাতা-৪২
- ১৯১ সমীর ঘোষ, কলকাতা-১৯
- ১৯২ শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী চৌধুরী, সন্টলেসক
- ১৯৩ শ্রীমতী অঞ্জনা দত্ত, শান্তিনিকেতন
- ১৯৪ সৌমেন মিত্র, যাদবপুর
- ১৯৫ কমল দে শিকদার, কলকাতা-৫৪
- ১৯৬ শ্রীমতী মৌসুমী ঘোষ, কলকাতা-২৯
- ১৯৭ সুবোধ সরকার, কলকাতা-৪১
- ১৯৮ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, কলকাতা-১৯
- ১৯৯ প্রবনারায়ণ কুণ্ডু, কলকাতা-১৯
- ২০০ রোটারিয়ান কমল বসু, কলকাতা-২৯
- ২০১ শ্রীমতী নীলা বসু, মধ্যমগ্রাম
- ২০২ শ্রীমতী অনুপ্রী অধিকারী, আসানসোল
- ২০৩ শ্রীমতী কৃষ্ণা বোদক, কোমগর
- ২০৪ শ্রীমতী চিত্রা লাহিড়ী, কলকাতা-৪২
- ২০৫ বিশ্বজিৎ মিত্র, কলকাতা-১৯
- ২০৬ অর্পণকুমার নাথ, কদমতলা, হাওড়া
- ২০৭ শ্রীমতী জয়ন্তী সেন, কলকাতা-২৯
- ২০৮ সঞ্জিত বসু, কলকাতা-১৯
- ২০৯ শ্রীমতী অনিতা দাস, কলকাতা-৪
- ২১০ অধ্যাপক প্রিয়ব্রত চক্রবর্তী, কলকাতা-১০
- ২১১ রত্নেশ্বর মুখার্জী, কলকাতা-৩৮
- ২১২ জাহিরুল হাসান, কলকাতা-২৩
- ২১৩ রোটারিয়ান শুভেন্দু গাঙ্গুলী, কলকাতা-৬৭
- ২১৪ শ্রীমতী অনিতা গায়েন, সোনারপুৰ
- ২১৫ সুজয় রায়চৌধুরী, কলকাতা-৪৭
- ২১৬ অজিত বসু, কলকাতা-১২

দশে দেখাও দরজা



আরে বাবা, চিত্রকররাও তো
ন্যুড স্টাডি করে। সিনেমা-
শিল্পীরা করবে না কেন?

কৃপমণ্ডক রক্ষণশীলরা একটু বাড়াবাড়ি বা চিৎকার করবে বটে; ও
আস্তে আস্তে সয়ে যাবে। তা ছাড়া যত চিৎকার, তত পাবলিসিটি।

এছাড়া সিনেমাকে আর্টের মর্যাদা দেবার পক্ষে আরো বড় এবং অকাটা
যুক্তি আছে। সাহিত্য হল সমাজের দর্পণ। সাহিত্যিক নামক দুর্বল মনের ব্যক্তির
হৃদয় নামক নরম কাদায় সমাজের ইট-পাটকেলগুলো আটকে যায়। সুরকির
রূপ ধরে প্রকাশ পায়। সিনেমাও তাই। সমাজের প্রতিফলন। অনেকে দ্বিমত
হবেন। সবেগে মাথা নেড়ে বলবেন—না হে কলমটি, তোমাব কলমাড়স্বরকে
মানতে পারলাম না। সিনেমা হল বিনোদন। এন্টারটেনমেন্ট। তাতে টাক-টাক
ঝুম্-ঝুম্-ই বেশি।

না মশায়, নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, সিনেমার মতো বাস্তব
আর কিছু নেই। কি একটা সিনেমায় (বোধহয় 'মোহরা') দেখেছিলাম, পুলিশ
রূপী পরেশ রাওয়াল সাধ মেটানোর জন্যে—সরকারি বেতনে নাকি স্বিদের
খাদটাই বোজে, মনের সাধ মেটে না—ভিলেনের ইনফর্মার হয়েছে। বাক্য
পিছু টাকার মিটার বাড়ে। ব্যাটা পুলিশ এত চালাক যে, মিটার বাড়ানোর
জন্যে নিজের জামাকাপড় পরে বেরনো শুরু করেছে।

এইবকমই ঘটনা ঘটতে দেখলাম শত্ৰুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে। আউটডোরে
বসে আছি ডাক্তারের কুপাগ্রাথী হয়ে। ঢুকলেন একজন বিহারী দেহাতি। বৃকে
বাধা। কোন বিভাগে যেতে হবে জানেন না। আমরাও অজ্ঞ। ভদ্রলোক সামনে
দিয়ে যাওয়া এক হাসপাতাল-কর্মীর কাছে জানতে চাইলেন। কর্মীটি স্পীকটি
নট্। উদাসীন চোখে, সাহিত্যিক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন সামনের দিকে। দেহাতি
ভদ্রলোক পকেটে হাত চালিয়ে বেব করে আনলেন দশটাকার একটা নোট।
কর্মী ভদ্রলোক নিরাসক্ত ভাবে এবং নিশ্চিত অধিকারের ভঙ্গীতে দক্ষিণা গ্রহণ
করলেন। তাঁকেও তো সাধ মেটাতে হবে। দেহাতি ভদ্রলোক গুটিগুটি পায়ের
কর্মী ভদ্রলোকের নির্দেশিত দিকে এগিয়ে গেলেন। তবে সিনেমা কেন Art-
এর মর্যাদা পাবে না? এর থেকে রিয়েল লাইফ কী দেখাতে পারে?

—পঞ্চম কলমটি

মাঝে একবার সিনেমাকে শিল্পের মর্যাদা দেবার জন্য কল্মকাটি গুরু
হয়েছিল। নাঃ, Industry-ব শিল্প নয় হে, Art মানে যে শিল্প, সেই শিল্প।
ভালো কথায় যাকে বলে কলা। কলা বলে কলা। সিনেমায় তো কলার ছড়াছড়ি।
নায়ক-নায়িকা সকলেই একেকটা কলাবিদ। এক নায়ক যদি ম্যানারিজমের
বিরক্তিকর বিচিকলা প্রদর্শনে পোক্ত তো অন্যজনের হিউমার আর ভাঁড়ামোর
অল্পমধুর চাপাকলার আবাদ। আবার সর্বঘট্টের ক্যাঠালিকলার মালিকও আছেন।
মানে তাড়ি ব্যবসায়ী থেকে নিম্মল হতাশ প্রেমিক; বড়লোকের বয়ে যাওয়া
মালে চুরচুর ছোঁড়া থেকে বদরাগী পুলিশ—সব চরিত্রেই তিনি সমান স্বচ্ছন্দ।

নায়িকাদের নৃত্যকলা (নকরা-ছকরা) এবং শব্দী কলাব (সেক্সবোম) কথা
বাদই দিলাম। সূত্রাং ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রির ফিল্ম আর্ট হবার জন্য বায়না ধরার
অধিকার আছে। সিনেমাকে কলা দিয়ে দেওয়া, মানে শিল্প আখ্যা দেওয়া
উচিত। কেন না যতদিন সিনেমা ইণ্ডাস্ট্রি থাকবে ততদিনই তাকে সেন্সর বোর্ড
আর ভারতীয় সংস্কৃতির ঘোমটা পরে থাকতে হবে। খ্যামটা নাচের জন্য প্রাণ
আঁকপাঁকু করলেও। শিল্পের মর্যাদা পেলে আর চিন্তা নেই। পরিচালক-
প্রযোজক নামক সম্ভাবিত শিল্পীরা রিয়েল লাইফ আর চিত্রনাট্যের দোহাই
দিয়ে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের যখন-তখন বার্থ ডে কন্সটিউমস—জগৎকন্ঠের
সেই সর্ববন্ধন মুক্ত অবস্থার কথা চিন্তা করল—পরিয়ে দেবেন। তখন দেখবেন
হুসেন মিঞার সরস্বতী 'গজগামিনী' রূপে 'শ্রোণীভাবা দলসংগমনা' হয়ে
স্বচ্ছন্দে বিচরণ করছে। সেন্সরবোর্ড তার টিকিও ছুঁতে পারছে না। আরে বাবা,
চিত্রকররাও তো ন্যুড স্টাডি করে। সিনেমা-শিল্পীরা করবে না কেন? তবে

মূল্যবান ছাত্র আমার!



কমলকুমার দত্ত

পারনে মোটা ঠেঙে ধুতি, মলিন জামা; চশমার একদিকের ডাঁটি ভাঙা—সেখানে সুতো দিয়ে বাঁধা, গালময় খোঁচা-খোঁচা কাঁচা-পাকা দাড়ি, নিস্ত্রভ দৃষ্টি, রুগ্ন শরীর টেনে টেনে চলেছেন স্কুলে পড়াতে,—মাস্টারমশাই। একটা সময়ে এরকম মাস্টারমশাইদের দেখা যেত। এখন যাদের বয়স ষাট ছাড়িয়েছে তাদের ছাত্রজীবনে এরাই পড়িয়েছেন—বিশেষ করে গ্রামে। আমরা যারা চল্লিশ ছাড়িয়েছি, তাদের গ্রামের স্কুলের স্যারবা অতটা মলিন ছিলেন না, মোটামুটি ধোপদুরন্ত হয়েই স্কুলে আসতেন। তাঁদের খাওয়া পরার সমস্যা ছিল না, অনেকেই প্রাইভেট পড়িয়ে বাড়তি রোজগার করতেন।

কিন্তু এখন যাবা স্কুল-কলেজে পড়ছে তাদের স্যাবদের দেখলে আর মাস্টারমশাই বলে চেনা যাচ্ছে না। অনেকেই বাইকে চেপে জ্যাকেট-শোভিত হয়ে হুসু করে ঢুকছেন, ক্রাসে ঢুকে মিনিট কুড়ি-পঁচিশ যা করছেন তাকে প্রায়, পারফর্মিং আর্টের কাছাকাছি কিছু বলা যায়। এদের অনেকেরই করতলে মোবাইল ছাত্র-ছাত্রীমহলে প্রায় হিবোব মতো গ্ল্যামার, এবং সবকিছু ডাক্তারদের নার্সিং হোমের মতো টিউটোরিয়াল হোম বমরম করে চলছে। এই টিউটোরিয়াল হোম ইণ্ডাস্ট্রি চেহাবার একটা মোটামুটি আন্দাজ পেতে চান তো এখন এই শীতের মবসুমে কোনো পিকনিক স্পটে চলে যান, দেখতে পারেন ঝাঁকে ঝাঁকে টিউটোরিয়াল টিম চলে এসেছে পিকনিক করতে, টিম লিডার টিউটোরিয়ালের 'স্যাব'। এটা একধরনের বিজনেস ট্রিপ, ছাত্র-ছাত্রীদের বিনোদনের সঙ্গে সঙ্গে টিউটোরিয়ালের প্রচাৰ। এইসব স্যাবদের মধ্যে যাবা স্পেশ্যালিস্ট তাঁবা অনেকে একক ভাবে বাড়িতে বা ভাড়া নেওয়া ঘরে বিশেষ সাবজেক্টটি পড়িয়ে থাকেন। এবকম একজনের কথা শুনেছি—তিনি তাঁব ব্যক্তিগত শিক্ষা-চেহাবে

মাইক্রোফোন ব্যবহার করে থাকেন। তাঁর এক ছাত্রের দেওয়া হিসেবমতো ঐ স্পেশ্যালিস্টের টুইশনি বাবদ মাসিক আর টুইশনির উপরে নিষেধ আবোপ কবা হয় তখন কয়েকজন শিক্ষক তাদের শিক্ষকতাব ঢাকবি ছেড়ে দেন যুক্তিযুক্ত যে প্রাইভেট পড়িয়েই তাদের সুনাম, বজায় রাখতেই তারা এই নৌকো ছেড়ে ঐ নৌকোয় চাপছেন। অবশ্য বেশিভাগ 'স্যাব'-বা এখনো দু-নৌকোয় চেপেই জীবিকা সাগরে বিহার করে চলেছেন। পাড়াব বেকাব ছেলেরা সক্রিয় হয়ে উঠে মাঝে মাঝে নৌকো দু'লিয়ে দিচ্ছে বটে, কিন্তু বটের চাবা কার্নিশ থেকে নিমূল করা যাচ্ছে না। যাবে কী করে, সেদিন টিভিতে দেখলাম অনেক ছাত্র-ছাত্রীই বলছে যে প্রাইভেট টুইশনি উঠে গেলে তাদের পড়ানোর ক্ষতি হয়ে যাবে। অনেক অভিভাবক-অভিভাবিকাদের মত-ও এবকম। এজন্যেই বটের শিকড় বলছি, যতটা বাইনে দেখা যাচ্ছে তার অনেকও ভিতরে ছড়িয়ে গেছে। এটাই-মূলধন ওইসব টিউটোরিয়াল হোমলিডাবদের। কেউ বলছে আমি ৯০% কমন দেব কেউ বলছে আমি দেব ৯৫%। আবার পরিসংখ্যানও থাকে—'গত দশবছরে গড়ে আমাদের টিউটোরিয়ালের সাজেশান ৯৩% কমন পড়িযাচ্ছে।' চারদিকে দাঁদাদের কোটিং, ভাইদের-বোনদের শিক্ষিত করে তোলাই তাদের জীবনের ব্রত, নিজের বাড়ির তিনতলা চারতলা তোলা নয়। এরা শিক্ষারতী—যবে যবে শিক্ষা পৌঁছে দিচ্ছেন—একেবারে রামা কবা—হোম মিল সার্ভিস দেবার মতো। কেউ বলছে মাত্র ১৫ টা প্রশ্ন প ড়তে হবে—দশটা কমনের গ্যারান্টি, কেউ বলছে ১২ টা পড়লেই হবে। 'গুণজ্ঞান' পিন এটে বিক্রি করা মতো বিক্রি হচ্ছে খামবন্ধ 'লাস্ট মিনিট সাজেশান'—খামের মধ্যে 'কমন' খলবল করছে জ্যান্ত মাছের মতো। গুনতে পাই এইসব হোমের সঙ্গে পেপার সেটাবদের কারো কারো বেশ সুসম্পর্ক আছে, এবং হোমের ট্যাকব একটা অংশ তাদের হোমেও ঠিকঠাক পৌঁছে যায়।

একটা সময়ে বলা হত যে সরস্বতীর সঙ্গে লক্ষ্মীর বনিবনা হয় না। সে বোধহয় ঐ সব ডাটিভাঙা চশমা পবা শিক্ষকদের দেখেই। এখন আর বলা যাবে না। এখন ববং লক্ষ্মীর সঙ্গেই সরস্বতীর মাখোমাখো সম্পর্ক। একসময় বলা হতো 'বিদ্যা বিনয়ং দদাতি', এখন বলতে হবে 'বিদ্যা নোটং দদাতি'। পরস্কাব হিসেবে—আমাব হোমে এসো আমি ৯৫% কমন আসার নোট দেব. তোমবা নোট গুণে দিয়ে নোট নিয়ে যাও। চমৎকার নোটজিকব খেল চলেছে যার শেষ কথা—খেল খতম পয়সা হজম। শিক্ষকদের কাছে আর শিক্ষা নয়, মূল্যবান হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রী। এক-একজন ছাত্র মানেই মাসে মাসে তিন-চার-পাঁচশে টাকার কারবার। আগে ছাত্রকে আসতে দেখলে গুরু ভাবতে জ্ঞান তৃষ্ণা হেঁটে আসছে, এখন স্যারদের হোমে ছাত্র-ছাত্রীদের ঢুকতে দেখলে স্যার দেখেন একশো টাকার নোটেবা উড়ে উড়ে আসছে। আহাঃ মূল্যবান ছাত্র আমার।

অমিতাভ বচনকে চাই

পিনাকী ভাদুড়ী

মুখে পাহাচানো,
হাতে পাহাচানো, ফ্যাং ইং কৈন!

অমিতাভ বচনই পারে আমাদের মুখে
বচনের খই ফোটাতে। খই ছিটিয়ে
নিয়ে যাবার আগে একবার উড়ো খই
গোবিন্দায় নমঃ করে নিই। গোবিন্দের
নামে ঢোল বাজিয়ে নিই একবার।



কিছুতেই মনের মাঝে শান্তি নাহি পাই। কেউ পাচ্ছে না। যারা শান্তি চায়
ভারাও না, যারা অশান্তি হুড়াচ্ছে তারাও না। রাজনৈতিক নেতা,
মন্ত্রী, পথচলতি মানুষ, আপনার আমার পাড়ার মাস্তান, বন্ধু, আত্মীয়,
আদর্শবাদী সংগঠন—সবাই ভুগছে অশান্তিতে। আবার সবাই অশান্তি ছড়িয়ে
দিচ্ছে সর্বত্র। এ ওকে মারছে, ফুঁসছে, গাল দিচ্ছে, সেইসঙ্গে কাতরাচ্ছে,
কাঁদছে, মরছে।

কিছুতেই কিছু করা যাচ্ছে না। ভোট দিয়ে নয়, ভোট না দিয়েও নয়।
জোচ্ছুরি করে নয়, চুরি করে নয়, ভণ্ডামি কবে নয়। মাইনে বাড়িয়ে নয়,
ছাঁটাই করেও নয়। সুদ কমিয়ে, সুদ না দিয়ে, লোভ দেখিয়ে, ভয় দেখিয়ে,
ছলে বলে কৌশলে লাভ হচ্ছে না কিছুই। কেবল এক দুর্যোগ থেকে আরেক
দুর্ভোগে গিয়ে পড়তে হচ্ছে। যারা নীতির কথা বলে, তাদের দুর্নীতি দেখে
হেসে উঠছে সবাই। প্রগতির নামে দুর্গতির গতি চলেছে অনেক দূর। যারা
ন্যায়ের নামে হাসে, তাদের অন্যায় করার ক্ষমতাও শেষ হয়ে এসে। সেই
শেষের ভয়ঙ্কর দিনের কথা ভেবে তারা নিরুশ্বাস করে দিতে চাইছে মানুষকে।
মেরে হোক ধরে হোক, পাড়াছাড়া করে, দেশছাড়া করে জিতে নিতে চাইছে
ভাগ্য। দেখেও নে ভাগ্য হাসছে। নির্বিকার নির্গুণ নিশ্চিত সেই হাসি। তাতে
পরাজয় নেই, পরিহাস আছে। সেইসঙ্গে পরিচয় আছে ভবিতব্যের। যে
বিক্রমে তীক্ষ্ণ, বিরূপে তীব্র, স্বরূপে সেই তির্যক।

ভয়ের মুখোশ দেখিয়ে যারা জয় করতে চেয়েছে দেশটাকে, তারা যেদিন
অভয়ের মুখ দেখতে পাবে সেদিন তাদের কে বাঁচাবে? ক্রমের দক্ষিণ মুখের
জন্ম দক্ষিণা দিতে হবে যে।

যতদিন তা না হচ্ছে, ততদিন আমাদের একজন অমিতাভ বচন চাই।
অমিতাভ বুদ্ধকে সহ্য করার প্রাণশক্তি আমাদের নেই, বরং অমিতাভ বচনের
মারদাস্তার মধ্য দিয়েই অনাচারের উরুভঙ্গ করব আমরা। বাস্তব আমাদের
পাড়া দিচ্ছে বলেই অবাস্তব সেই বচনই আপাতত আমাদের জন্য
অনির্বচনীয়কে সম্ভব করতে পারে। যারা ভোট জিতবে আর যারা ভোট
হারবে, যারা ভোট দেবে আর যারা দেবে না, যারা অনেক ফলস ভোট দেবে
আর যারা একটা ভোটও দিতে পারবে না, তাদের ফলসা বার জন্মই
অমিতবিক্রম খোলাই আবশ্যিক। এক্ষুনি।

মুশকিল হচ্ছে, আমাদের কোনো মুশকিল-আসান নেই। অথচ মুশকিল
আছে অনেক। আছে নয় শুধু, বেড়েও যাচ্ছে। আগে নির্বাচনের দিনেই
মাবপিট হত। এখন নির্বাচনের আগেই শুরু হয়ে যায়। চলে নির্বাচনের
পরেও। দুর্গাপুজোর মতো। পুজোর কদিন আগেই যেমন মণ্ডপ উদ্বোধন হয়,
বিসর্জন হয় আরো কদিন পবে, মাবপিট তেমনি ভোটের আগেই শুরু,
ভোটের পরে শেষ হবে—এমন অবশ্য বলা যায় না। কারণ মাবমারি খুবই
হোঁয়াচে। যাকে আজ মারা হল, কাল তার দল উষ্টে মারবে। খুন করতে না
পারলেও খুন ঝরিয়ে দেবে, নাহয় পায়ে মেরে লেম্ করে দেবে। পুলিশ লেম্
এককিউজ দেবে, ধরবে না কাউকে। চোরদের সঙ্গে পুলিশের এই
'বিউটিফুলিশ' খেলা চলতে থাকবে, মারা যাবেন শুধু আপনি, মারা যাব
কেবল আমি।

সারা জীবন ভয়ে ভয়ে কেটেছে, জীবন সারা হবার আগে একবার
নির্ভয় হতে চাই। অমিতাভ বচনই পারে আমাদের মুখে বচনের খই
ফোটাতে। খই ছিটিয়ে নিয়ে যাবার আগে একবার উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ
করে নিই। গোবিন্দের নামে ঢোল বাজিয়ে নিই একবার।

জীবনে কোনো সাধ মেটেনি, স্বাদ পাইনি স্বস্তির বা সুখের বা শান্তির।
সকলেই পুড়িয়ে মেবেছে—আচার আচরণে শুধু নয়, বচনেও মেরেছে
পুড়িয়ে পুড়িয়ে। এই জন্যই চাই অমিতাভ বচনকে, যার কোনো ট্রেনিং নেই,
কিন্তু মারের ট্রেড আছে। এইটাই সেই ট্রেড যার লাইসেন্স না নিয়েই মারমার
করে চালানো যায়। যারা মার দেয় আর যারা মাব খায়, দুজনেই জানে যে
আসলে মারের কোনো বিকল্প নেই। বেয়াড়া স্বামী, বেয়াদপ স্ত্রী, দুঁদে মন্ত্রী,
দুর্জন মাস্তান, দুঃসহ প্রতিবেশী, দুঃশীল পরিজন, দুঃস্থ গুণ্ডা—সবাইকে টিট
কবে দিতে পারে একমাত্র বচন সাহেব। অরণ্যদেব বা সুপারম্যান যেন
ছেলেভুলোনো চরিত্র, অমিতাভ বচন কিন্তু পাড়াগাড়োনো ক্যাবেস্টার। এ
দুর্দিনে অশুভ দুর্দিন বচনকে ডাকো, সে আমাদের বচন দেবে যে, এসবের
বদলা ও না নিয়ে ধামবে না।

ইভটিজিং রুখতে গিয়ে যারা মরেছেন এবং মরবেন, তাদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত

একটি প্রতিবেদন

রসময় চৌধুরী

পথেঘাটে মহিলাদের উদ্ধৃত্ত করা আর সঙ্গে বিভিন্ন বৌদরামো করাকে শুদ্ধ ভাষায় বলে হিড়িকবাজি। গ্রামে-ঘরে যেমন হনুমান, শহরে তেমনি হিড়িকবাজদের উৎপাত। এরা না হনুমান, না মানুষ। দুয়ের মাঝামাঝি দোআঁশলা ধরনের এক জন্তু। এই বিশেষ প্রজাতির জীবগুলো এতই খুরক্ষর যে এদের শ্রেণী বিন্যাস করতে স্বয়ং ডারউইনও হার মেনে পেছেন। তিনি ঘোমায় তাঁর বইতে এদের উল্লেখ করেননি। সম্প্রতি কলকাতায় নিখিলবঙ্গ হিড়িকবাজ মহাসম্মেলন বার্ষিক সম্মিলনী হয়ে গেল। সেখানে অধিবেশনের সভাপতি লাস্কুলশ্রী গাণ্ডুফটাস একটা উদ্দীপক ভাষণ দিয়ে তাঁর প্রতিশ্রুতিটা বর্তমান প্রতিবেদককে দিয়েছিল। দীর্ঘ ভাষণের অঙ্গীল অংশটা বাদ দিয়ে শুধুমাত্র ছাপার যোগ্য অংশ এখানে উদ্ধৃত্ত করা হল।

হে পথেঘাটে মেয়েদের পেছনে (এখানে আদিত্যে সেই প্রাকৃত শব্দটাই ছিল, অঙ্গীল বোধে প্রতিবেদক সেটাকে বদলে দিয়েছে।) লাগা ফেউ-মার্কী রামপাঁঠা ভায়েরা, আমি তোমাদের রামপাঁঠা নামে সম্বোধন করছি এইজন্যে যে, কোনো কোনো লোক তোমাদের নাম দিয়েছে রোডসাইড রোমিও। কথাটার মানে কি আমি তা জানি না। তবে যদূর শুনেছি, কথাটা ইংরেজি। আর ইংরেজি শব্দন তাহলে নিশ্চয় গালাগালি। আমরা হিড়িকবাজরা কোনোৱকম ইংরেজি গালাগালি শুনে হজম করার বাশা নই। আমাদের কেউ ‘প্যালক’ সম্বোধন করুক, সহ্য করব। বরাহনন্দন, সারমেয় শাবক এমনকি নপুংসক-নন্দন বললেও সহ্য করব। (এখানে অঙ্গীল বোধে শব্দগুলো বদলে দেওয়া হল।) কিন্তু ইংরেজিতে গালাগালি। কতি নেহি। তাই আমি ওই কথাটাকে রোমিও থেকে ঘুরিয়ে করে নিয়েছি রামপাঁঠা।

কেউ কেউ আমাদের ইভটিজার বলেও ইংরেজিতে গাল দেয়। ‘জার’ নয়, কথাটা হবে বীড়। ধম্মের বীড়। শুনতেও ভালো, বলাও সহজ।

অর্থাৎ আমরা এক-একটি ধম্মের বীড় এবং রামপাঁঠা। এই নামে ডাকলে একদিকে যেমন মনের মধ্যে একটা বীর বীর ভাব চাপিয়ে ওঠে, তেমনি নামগুলো বেশ শুনসইও বটে। যুৎসই এইজন্যে যে বীড় আর পাঁঠার মতোই আমাদের কোনো হামা পিস্তি লজ্জা-শরমের বালাই নেই। ওসব থাকলে হিড়িকবাজ হওয়া যায় না।

বন্ধুগণ, আজ আমরা এখানে জুটেছি আমাদের অধিকার রক্ষা করার মহান উদ্দেশ্যে। এই সভা থেকেই আমরা এক বৃহত্তর আন্দোলনের পথে এগিয়ে যাব। আমরা পিতা-মাতার অনভিপ্রেত সন্তান। তাই মেয়েদের পেছনে লাগা আমাদের জন্মসূত্রে পাওয়া অধিকার। বালিকা, কিশোরী, যুবতী এমনকি প্রৌঢ়াতোও আমাদের কোনো আপত্তি নেই। শুধু একেবারে অশুদ্ধ চুলপাকা বুড়ি না হলেই হল। বহু আন্দোলন করে পাওয়া আমাদের এই অধিকার বাতে কেউ কেড়ে নিতে না পারে সে ব্যাপারে আমাদের সজাগ থাকতে হবে।

বেশিরভাগ সময়েই পুলিশ আমাদের কাজকর্ম দেখেও না দেখার ভান করে চোখ ঘুরিয়ে নেয়। এটা হল ওদের বদাই মার্কী নশ্বরামো। এই নশ্বরামো ওরা কেন করে জানেন? করে এই জন্যে যে সুযোগ পেলে ওরা নিজেরাও ওই কমটি করে থাকে। ওদের শহুরামো আবার অনেক উঁচু দরের। যাকে ধরে তার পায়ের ছালচামড়া না ছাড়ালেও উপরের সবকিছু ছাড়িয়ে ছাড়ে।

পুলিশও আবার কখনো কখনো ভুল করে সেমসাইড ফাউল করে বসে। কিছুদিন আগেরু একটা খবর হল, পাঁচ কনস্টেবল প্রকাশ্য রাস্তায় এক যুবতীকে ধরে বেইজ্জতি কবছিল। এক পুলিশ সার্জেন্ট এগিয়ে গেছিল তাদের কাজে বাধা দিতে। সে বোধহয় ভেবেছিল, যেহেতু সে সার্জেন্ট তাই ওই কনস্টেবলরা তার কথা শুনবে। কিন্তু সে জানত না যে এই ধরনের মারহাঝা কাজে একবার মেতে গেলে আমাদের মতো রামপাঁঠারা নিজের বাপকেও গ্রাহ্য করে না। অফিসের সায়বে তো কোন ছার। তার ওপরে ওরা ছিল মাল টেনে আকর্ষ টইটমুর। তাই যা হবার তাই হয়েছে। ওই কনস্টেবলরা সার্জেন্টকে লাথিয়ে হাসপাতাল দেখিয়ে দিয়েছে। সেখান থেকে ক্যাণ্ডাভালা।

এই তো চাই। আমাদের কাজে যে বাগড়া দিতে আসবে তাকেই ওইরকম গাভুয় করে দেওয়া হবে। তা সে সেমসাইডই হোক কিংবা রঙসাইডই হোক। ওই কনস্টেবলরা রামপাঁঠা হতে পারে, কিন্তু বীর বটে।

শুনেছি দেশের মুখ্যমন্ত্রী ওই পাঁচ কনস্টেবলকে কড়া শাস্তি দেবার জন্যে পুলিশ কমিশনারকে ছফুম দিয়েছেন। দিলে কি হবে? মুখ্যমন্ত্রী ভুলে গেছেন যে শাস্তি ওরা কেউ দেয় না। শাস্তি দেয় আদালত। ওই কনস্টেবলরা তো আমাদেরই দলের লোক। তাই ওদের জন্যে আমরা আদালতে দুঁদে উকিল লাগাব। আর আমাদেরই ইয়ারদোস্ত কোনো এক রামপাঁঠা পুলিশ অফিসারকে দিয়ে হোঁপরামার্কী চার্জশিট দাখিল করে ওদেরকে বেকসুর খালাস করিয়ে আনব। আদালত ছেড়ে দিলে তখন মুখ্যমন্ত্রী তো মুখ্যমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীও কোনো শাস্তি দিতে পারবে না। পুলিশ কমিশনার তো ছার।

পুলিশের ব্যাপারে আপনাদের আরো একটা সুসংবাদ জানিয়ে দিই। এই কাজে শুধু কনস্টেবলরাই নয়, সায়বেরাও সমান শহুরা। উর্দির খাতিরে কনস্টেবলদের মতো খ্যামটা নাচ নাচতে পারে না ঠিকই, তবে ঘুরিয়ে ওইটেই করে। কিছুদিন আগের খবর। ইস্টার্ন বাইপাশে একটা গাড়িতে স্বামী-স্ত্রী পাশাপাশি বসে যাচ্ছিল। তদ্রলোক অসুস্থ বলে মাথাটা স্ত্রীর কাঁধের ওপর রেখেছিলেন। ওখানে ডিউটিতে থাকা দারোগা ওদের পাকড়াও করল। মহিলার দিকে রসালো রসালো তীর চালিয়ে হিড়িকবাজির হফ-মুন্দ করে নিল। তারপর ওদের ধানায় নিয়ে গিয়ে সারারাত অটিকে রাখার ভয় দেখাল। ধানার লকআশে কী কী অপকর্ম হতে পারে তার ইঙ্গিত দিয়ে ওদেরকে পুরো নার্তাস করে দিল। তারপর কোনোৱকম রসিদ ছাড়াই অটিশ টাকা জরিমানা আদায় করল। ওই দারোগার নামে মহিলা উদ্ধৃত্ত করার কোনো কেস তো

হলই না, উন্টে আটশ টাকা যৌতুক। খবরের কাগজের লোকেবা ওই দাবোগাকে জম্ব-টম্ব বলে গাল দিলে কি হবে, লোকটা তো আমাদের কাছে গুণক।

মাঝে মাঝে দু-একটা পাবলিক আমাদের কাজে বাধা দিতে আসে। তার জন্যে তাবা কী শাস্তি পায়, আপনাবা খবরের কগেজে পড়ে থাকবেন। আমবা তাদের পেঁদিয়ে বৃন্দাবন দেখিয়ে দিই। কখনো বা নিমন্তলা।

আমাদের কোনো বেণো বন্ধু কখনো বা অজান্তেই কিছু অফসাইড কবে বসে। কিছুদিন আগে আমাদের দুই সদস্য চিনতে না পেয়ে খোদ বড়কর্তাব মেয়েকেই হিড়িক মাবতে গেছিল। বড়কর্তার ব্যাপার বলে কথা। পুলিশের তো চাকরিব ভয় আছে। তাবা ওই দু'জনকে পাকড়াও করে কেস দিয়ে দিয়েছে। আপনাবা শুনে মজা পাবেন যে ওবা কেস দিয়েছে ৩৮০ আব ৪৫৭ ধারায়। একটা চুরি আর অন্যটা অনবিকার প্রবেশ। না দিয়ে উপায় নেই। মহিলাকে উত্তর করার কেস দিলে যে ওই কন্যাটিকে সাক্ষী হয়ে কোর্টে দাঁড়াতে হবে।

বড়কর্তাব মেয়েকে সাক্ষী কবে কোর্টে তোলা। ওবে বাবা। সেবকম কেস দিতে গেলে পুলিশের ঘাড়ে দুটো মাথা থাকতে হবে। বেড়ে মজা হয়েছে মাইবি।

বন্ধু গণ, আমরা সর্বত্রই আছি এবং সংখ্যায় বাড়ছি। একটা টেসে গেলে তিনটে গজাই। অনেকটা ছাপোকার মতো। আমবা জাতে রামপাঠা কিংবা ধর্মের বাঁড় হতে পারি কিন্তু থাকি মানুষের বেশে। আব সে বেশগুলোও বেশ চটকদার। তাই চট করে আমাদের চেনা যায় না। ইচ্ছেসুখে মালাটি চটকে দিয়ে চটপট চম্পট দিই। আজকাল সবকাব জঙ্গি আক্রমণ ঠেকানোর জন্যে কম্যান্ডো, ব্ল্যাকক্যাট এইসব আমদানি কবেছে। কিন্তু আমবা হল্যাম গিয়ে জাত ফেঁটি। ওইসব কালো বেড়াল আমাদের কী কববে?

বন্ধু গণ, এসব হল সুসংবাদেব দিক। এবার বিপদের দিকটা বলি। আমাদের এইসব কাজকর্মে গোঁজ লাগাবাব জন্যে সরকার উঠেপড়ে লেগেছে। এতদিন দেশের চালু আইন অনুযায়ী আমরা ধরা পড়লেও সঙ্গে সঙ্গে খালাস পেয়ে যেতাম। থানায় বসে ঘন্টা দুই বড়বাবু মেজবাবুর সঙ্গে ফস্টিনস্টি করে কনস্টেবলের থেকে চেয়ে নেওয়া বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে বাড়ি চলে আসতাম। এখন নাকি নতুন আইন তৈরি হচ্ছে যে, এসব কেসে জামিন পাওয়া যাবে না। শালা। আশা পেয়েছে? আইন করলেই হল? আমাদের এতদিনের অধিকার এক ঝটকায় কেড়ে নেবে? আমাদের এখন

এই কালা-কানুনের বিরুদ্ধে জনমত তৈরি কবতে হবে। আন্দোলন কবতে হবে, প্রসেশন কবতে হবে, পথ অববোধ করতে হবে। দবকাব হলে বাংলা বন্ধ ডাকতে হবে। আব সেই বন্ধ-এ যাতে রাজনৈতিক দাদা-দিদিদের মদত পাওয়া যায় তাব জন্যে তদ্বি কবতে হবে। আপনাবা তৈরি হয়ে পড়ুন।

দ্বিতীয় বিপদটা হল শালাব পাবলিক। এতদিন কী ছিল? আমবা কোনো মেয়েকে হিড়িক মাবলে পাশাপাশির পাবলিক নেউলেব মতো মুখ ঘুরিয়ে দৌড় লাগাত। এখন সেটা আস্তে আস্তে বদলে যাচ্ছে। আজকাল পাবলিক এসব কেসে দল বেঁধে এগিয়ে আসছে। আব আমাদের বন্ধুবা গণগোলাই খাচ্ছে। এতদিন এক-আধজন প্রতিবাদ করতে এলে আমবা তাকে পেঁদিয়ে বৃন্দাবন দেখাতাম। কিন্তু এখন দলবানো পাবলিকের সঙ্গে পারা যাচ্ছে না মাইবি। পাবলিক-প্যান্ডানি যে কী সাংঘাতিক বন্ধু সেটা যে না খেয়েছে সে বুঝবে না। এর প্রতিকারের কথা আপনাদের চিন্তা কবতে বলি।

তিন নম্বর বিপদটা তো খুবই সাংঘাতিক। আজকালকাব মেয়েগুলো

নিজেবাই আমাদেরকে মোকাবিলা কবতে শিখে নিচ্ছে। ওদের জুডো যুযুৎসুব প্যাঁচে আমরা মাইবি চেনা খেয়ে যাচ্ছি। ওধু চেনা খেয়েই নিস্তাব নেই। কয়েকদিন আগে যে ঘটনাটা ঘটেছে সেটা তো রীতিমতো বীভৎস। আমাদের এক বন্ধু একটা নবম নবম দেখতে মেয়েকে হিড়িক মাবতে গেছিল। কিন্তু নরমের মধ্যে যে এত গবম থাকতে পারে সেটা সে ধবতে পাবেনি। মেয়েটা স্নেক হাঁটুর এক কৌতকার আমাদের বন্ধুব বাবোটা বাজিয়ে দিয়েছে। বন্ধু এখন সোজা হয়ে গেছে। আব মেয়েদের ব্যাপাবে সব আগ্রহ হাবিয়ে বসেছে।

এটা সত্যিই আমাদের

এক মন্ত বড় বিপদের কথা। পথেঘাটে হিড়িক মারতে গেলেই মেয়েরা যদি এরকম কৌতকা মেবে দিতে থাকে তবে তো আমবা সবাই একধাবসে সোজা হয়ে যাব। সোজা হয়ে ঘুবে বেড়ানো হিড়িকবাজদের তো আব ধর্মের বাঁড়ও বলা যাবে না, বামপাঠাও বলা যাবে না। সেই অন্ধকাব ভবিষ্যতের কথা ভেবে আমাব তো কান্নাই পাচ্ছে।

সভাপতির ভাষণ এখানেই শেষ। তবে নিজস্ব সূত্রে আমবা খবর পেয়েছি যে সভাপতির কণ্ঠ সমবেত সব হিড়িকবাজবাই কামা গুণ কবে দিয়েছিল। কামা-বন্ধু, গানাম্বিল অনেকটা শেয়ালের হক্কা-হুয়া ডাকবে মতো। দুব থেকে শুনে মনে হচ্ছিল গ্রানের পাশেব গোড়াগাড়ে একপাল শেয়াল একসঙ্গে কাদছে। হিজড়ে হয়ে যাবার ভয়ে হিড়িকবাজদের মড়াকামা। ওই কামাব মধ্যেই সেদিনেব সেই সভা শেষ হয়েছিল।



হাজার বাজার বাজার

অলোক বসু

নামায়ণ

শেক্সপীয়র বলে একদা এক নামডাকওলা কবি ছিল। যদিও অনেকে বলে থাকে, ওই লোকটা কোনো বন্ধুর রচনা চুরি করে নিজেব নামে ছাপিয়েছিল। লোকটা নাকি-প্রেজিয়ারিস্ট। বাংলায় কুড়ীলক। অর্থাৎ যে কিনা অন্যের লেখা নিজের নামে চালায়। তা যাই হোক,—লোকটা অনেক ভালো ভালো কথা বলে গেছে। সে বলেছিল—“What's in a name? That which we call a rose, by any other name would smell as sweet.”

গোলাপকে যে নামেই ডাকা হোক না কেন সে সুগন্ধ বিতরণ করবেই। সত্যিই নামে কি এসে যায়? এই আমরাই তো কত শুনি, কত লোকের কত কিছু নাম। কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন, হতকুচ্ছিং মেয়ের নাম হয় সুন্দরী, বেটপ মোটা লোকের নাম হয় সূতনু—ইত্যাদি ইত্যাদি। রাম নাম, কৃষ্ণ নাম, হরির নাম—এসব তো গুঢ় তত্ত্বের বিষয়। এই এক একটা নাম নাকি কত লোককে কত ভাবে ভবসাগর তরিয়ে দেয়।

হরির নাম তো পাড়ার কেন্দ্রনওয়ালারা সকাল-বিকেল খুব মনোযোগ সহকারে

এক ভদ্রমহিলা তার প্রাণাধিক কুত্তাকে
বকছিলেন—সুইটি, তুমি কিন্তু ম্যানাস
সব ভুলে যাচ্ছ। এত জোরে ডাকতে
না তোমাকে কতবার বারণ করেছি।

করে। একেবারে খোল-করতাল সহযোগে নগবসকীর্তনেও বের হয়। তারই মাঝে পবের নাম ধরে ছোটখাটো পবচর্চাও হয়ে যায়।

শ্রীকৃষ্ণের আবার অষ্টোত্তর শতনাম। এক-একটা নামের জোবও নাকি বেশ সাংঘাতিক রকমের। আমরা সবাই জানি, কেউর অনেক কেলোর কীর্তি আছে। গোপিনীরা খুব আনন্দও পেত শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধনে, তার রঙ্গভরা দুইমিতে। সাক্ষাৎ ভগবান বলে কথা। আবার আম জনতাকে কেনন আম খাওয়ানো হয়েছ—আমি যা করি সেটা অনুসরণ করবে না কখনোই বরং আমি যা বলি তা অনুসরণ করবে সর্বদা। তাহলেই মোক্ষ।

আসলে সেই কোন স্বাপর না কোন যুগ থেকে চলে আসছে এসব ঢপের কীর্তন।

সব যুগের বাবারাও তাই বলে থাকে। এই যেমন—একদম ধূমপান করবে না। ধূমপান করা একদম উচিত নয়। ভালো ছেলেবা ধূমপান করবে না।

—কিন্তু মা, বাবা যে ধূমপান করে? বাবা কি তাহলে খাবাপ ছেলে মা?

—চোপ! বড়দের মুখে মুখে চোপা? বাবারা কখনো খাবাপ হয়?

ঠিকই। বাবারা কখনোই খাবাপ হয় না। কিন্তু কেউ কেন ঠিকভাবে শেখায় না—ধূমপান শরীরের পক্ষে খারাপ বলেই তাতে নিষেধ করা হয়—এটা খাওয়া না খাওয়ার সঙ্গে নৈতিকতার কোনো সম্পর্ক নেই। অবশ্য ছয় এক হীরোগিরির ভাব এসে যায় অনেকের মধ্যে। ছেলেরা বোঝে না বাবারা ঠিক কখন থেকে সিগারেট খায়। আসলে যেন এটাই স্বাভাবিক। জন্ম থেকেই দেশে—বাবারা সিগারেট খায়, বাবাদের মুখ ছলে। তা আমাদের কৃষ্ণবাকুও সেইবকম। সেও ঠিক সব বাবাদের (বা গুরুগুর) মতো। যা বলছি শুনেব মুখ বুজে—আমি কি করছি তা তোমাকে দেখতে হবে না, আমার ব্যাপার আমি বুঝে নেব'খন।

ছেলেদের কি এসময় বলা উচিত—আমার ব্যাপার তাহলে আমিই বুঝে নেব? আমাদের জীবনে নানা বস্তুচরিতার মতো এও এক জিনিস। আমরা সবাই কেউর জীব। অতএব কেউর জীলাকে চার চোখ বুজে সমর্থন হবে বা চোখ অন্ধ বাক করে তার কীর্তিকলাপ দেখি। আর মনে হয় যেন ভিজেরা টিভিতে চকমকিয়ে দেড়খানা ক্রমালের জ্ঞান আর একখানা ন্যাতার মতো কি একটা প্যান্ট পরে বলে উঠত—আব্ আ রহা হ্যায় ধূম মচানে—ড্যানিং স্যানিং কিসিং—

না, আর এগোনো ঠিক নয়। পাড়ায় আমাদের টগর বোষ্টনী আছেন, তিনি ভারী রাগ করে তাঁর সারা বাড়ি গোবর আর গঙ্গাজলে গুচি করে দেশের অন্যায়কে মনের সুখে গালিগালাজ করবেন।

হোক গে তা। লোকে তো এভাবেই গোবর-গঙ্গাজলে কৃষ্ণপূজা করে থাকে। নাম সঙ্কীর্তনের অনেক ব্যাখ্যান। বাড়ির কুকুরকে ‘কুকুর’ নামে ডাকলে অনেকের লিখি গোসা হয়। শুকে কেন ‘কুকুর’ বলা হল? শুকে তো আমরা ছেলের মতো দেখি—ইত্যাদি। মনে পড়ে গেল এ সম্বন্ধে আশাপূর্ণা দেবী চমৎকার এক গল্প লিখেছিলেন—‘কিছু করবে না, কিছু করে না—’ বটেই তো। কেউ খামোকা কাউকে কিছু করতে যাবেই বা কেন? কিন্তু কেউ কেউ তো করে। তবে কেন লোকে বলে—কুকুরের কাজ কুকুরে করবে—তা বলে মানুষে কি শোভা পায়?

কুকুর একটু কেউ খেউ করলেও সে বড়ই প্রভুভক্ত জীব। তার নামে অকথা কুখ্যা কেন বলা হবে? লোকে তার নাম রাখে কত যত্ন করে, রীতিমতো সাত-সত্তরখানা অভিধান দেখে। বাপে এক নামে ডাকে, মায়ে আরেক। ছেলে এক তো মেয়ে আরেক। এতসব নামে তার বেশ নামডাক হলেও সে কিন্তু খেউ খেউই করে। একবাব এক ভদ্রমহিলা তার প্রাণাধিক কুত্তাকে বকছিলেন—“সুইটি, তুমি কিন্তু ম্যানাস সব ভুলে যাচ্ছ। এত জোরে ডাকতে না তোমাকে কতবার বারণ করেছি।”

ঐ সুইটি কিন্তু কালো ধূমসো কুকুরটাকে সম্বোধন করা হচ্ছিল। তার একটা অন্য নামও ছিল, সেটাই আসল।

একজনব বাড়িতে এক বেড়াল অন্য একজন লোককে দেখে ভীষণ মিউ মিউ করছিল। এত মিউ মিউ করার কি আছে কে জানে। তা সে ভদ্রলোকের একটু কবি কবি ভাব ছিল। সে মনে মনে ছড়া কাটিছিল—বেড়াল ডাকে মিউ—সবাই বলে, কিউ? ঘটনাটা সেটা নয়। সে স্বেল বেড়ালটাকে সবাই ‘বাবু বাবু’ বলে ডাকছে। সে ভাল আদরের ডাক হবে বুঝি বা। ঐ বাবু ডাক তো লোকে এমনিতাই কত

ডাকে। ভীষণ নোংরা লোককেও লোকে বাবু বলে সম্বোধন করে। কিন্তু তার কাব্য প্রতিভা যখন অন্য একটা লাইন প্রকাশের আকুলতায় মনের ভেতর শুমরে মরছে তখন গুরুত্বপূর্ণ বেড়াটাতে আদর করতে করতে হিন্দি সিনেমায় নতুন নায়িকার লঙ্কিং-এর মতো ঘোষণা করেছিলেন,—ওর ডাক নাম বাবু, ভালো নাম গোন্ডি।

রাম নাম সত্য হয়। কিন্তু বেড়ালের ভালো নাম কী কাজে লাগে কে জানে। সে বেড়াল কি পাঠশালায় কিংবা ইকুলে ভর্তি হয়েছিল? সে ওই 'ব্ল্যাক্ ক্যাট' না কিসব পুণ্ডি না প্রতিরক্ষা বাহিনী আছে, তাতে ভর্তি হবে?

ভালো নাম ডাক নাম যাই হোক না কেন, বেড়ালদের সম্বন্ধে লোকের সচেতনতা ইদানীং বেশ বেড়েছে। আগে লোকে কালো বেড়াল রাস্তা দিয়ে পার হলে অপয়া ভাবত। দাঁড়িয়ে পড়ত। ঈশ্বরের নাম নিত। কিন্তু এখন যে কোনো বেড়াল দেখলেই সবাই কেন্দ্র জড়সড় হয়ে যায়, দাঁড়িয়ে পড়ে, অটোরিক্সাওলারা বিচ্ছিরি ব্রেক কয়ে, হাতের খুচবা পমসা গড়িয়ে পড়ে যায়—সবাই ঈশ্বরের নাম করতে থাকে। ঈশ্বর নিশ্চয় খ্রিস্ট কামড়ান। অবশ্য তাঁর জিহ্বার আর সাড় থাকার কথা নয়, সবাই যে হাতের তাঁকে হরবখত ডেকে চলে।

নানান নামকীর্তন নিয়ে আমাদের জীবন। বেড়ালকে যে নামেই ডাকে—সে বেড়ালই থাকে, যেমন গোলাপকে যে নামেই ডাকে না কেন বেটুফুল হয় না। আমাদের অবশ্য নামের বাছবিচার বরাবরই। আজকাল আবার লোকের পুরনো ঐতিহ্যের প্রতি এমন ভয়ঙ্কর বকমের শ্রদ্ধা জেগে উঠেছে যে পুরনো নামের খুব চল হয়েছে। পুরনো মানে পৌরাণিক নাম। লোকে এখন পুরাণমুখী হয়ে বেশ নামটাম বাছছে। তাব জন্য বাচ্চাকে নামের বানান শেখাতে বাবা-মায়ের খুব সূখের কষ্ট হচ্ছে। মায়ের তরকারি পুড়ে যাচ্ছে, দুধ উথলে যাচ্ছে, কাজের মাসি এই সুযোগে বাসনে ছাই রেখে ভালো কবে বাসন না মেজে চলে যাচ্ছে, কাগজগুলো একটা কাগজের বদলে অন্য কাগজ দিয়ে যাচ্ছে, একতা কাপড়ের ভালো ভালো সব সামাজিক সাংসারিক মূল্যবোধগুলো 'ক'-সিরিয়ালগুলো শেষ হয়ে যাচ্ছে, দাড়ি কাটতে কাটতে বাবার গাল কেটে যাচ্ছে, অফিস দেবি হয়ে যাচ্ছে, সিগারেট নিঃশেষে সেবাহীনভাবে ছাইদানে জ্বলছে। এসব ঘটনা খটে চলেছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে—কিন্তু ছেলে শেখ তার নামের বানান। এবং অবশ্যই ইংরেজিতে। বাবা-মা কিছুতেই বাইরের লোকের কাছে গল্প করবে না যে ছেলে আমার নামের ইংরেজি বানান ভুল করছে। ওমা, ছেলের কি সুন্দর ব্রেন আমার। একবারে কি সুন্দর শিখে নিল।

কিন্তু ছেলে যদি নামের বাংলা বানান খুব তাড়াতাড়ি শিখে নেয় তাহলে সেটা একদম বলা চলবে না। বললে তো প্রেস্টিজ একদম পাংচার। কোনো কালচার থাকবে না যে। বাংলা বানান এত তাড়াতাড়ি শিখে ফেলা তো রীতিমতো ব্যাড ম্যানার্স। বরং কলতে হবে—জানো তো, আমার বেবি না, বাংলার নামের বানান লিখতে লিখতে কি সিলি মিস্টেক করছে।

বাংলা বাচ্চা কখনো বাংলা নামের বানান ঠিক লেখা চলবে না। ফুলের আঁটি যদি নাই বা বলল, আপনার বেবি কিন্তু কেসলিতে ভীষণ উইক—খুব পুণ্ডর মার্কস স্কোর করছে, ওর দিকে একটু 'কেয়াব' দিন। নিজেব নেমের স্পেলিংও পর্যন্ত...

বটে। বাচ্চা এখন আমার আরো সব পড়া বাদ দিয়ে সামান্য বাংলা নামের বানান নিয়ে মেতে উঠুক আর তাব কেরিয়াবেব বারোটা বাজুক, আর কি।

একজন বাচ্চাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল,—তোমার বাবার নাম কি?

তাব তুরন্ত জবাব ছিল,—আমার বাবার বাংলা নাম সমবেদ্রনাথ সবকার, আর ইংরেজি নাম এস এন সবকার।

আমরা লোককে অনেক নামে ডেকে থাকি। বাচ্চাদের আদব করার সময়—সোনামনা—এই ছেলেটা ভেলভেলেটা—গুসুগুসু—লায়লা—কুলু কুলু—ওয়ে ওয়ে ইত্যাদি। প্রেমিকরা তাদের প্রেমিকাদের কত সব নামে ডাকে—তুমি আমার বাসতি, আমি তোমার ন্যাতা—ইত্যাদি সব প্রাপ্তবয়স্ক কথাবার্তা শুনে নারিকা ছয় কুপিত হয়ে বলে,—যাও। সব জানা আছে।

আবার অমপ্রাশনের আগে নামকরণ নিয়েও অনেক পাবিবারিক নাটক হয়ে

থাকে। স্বপ্নরবাড়ির দেওয়া নাম ছেলের বোমের ঠিক জুৎ হচ্ছে না, নাক সিটকোচ্ছে। ফুঁসে উঠছে—যন্ত্রে সব Old-fashioned। কোনো কালচার নেই। ওসব নামে ওবা ডাকুক গে।

তারপর নিজের গর্ভধারিণীর দেওয়া নামে যাবপবনাই পুঙ্কিত হয়ে ওঠে—ওমা। তোমার কি সুন্দর চমেস গো। এটাই ওর ভালো নাম থাক।

জামাই বেচারী কী করে। মনে মনে শাওড়ির দেওয়া নাম পছন্দ না হলেও গৃহশান্তির দায়ে সে কিছু বলে না। তখন তাকে উদাসীন হতে হয় দার্শনিকতায়। শেক্সপীয়ার তো বলেই গেছেন—নামে কি এসে যায়।

কর্পোরেশনের বার্থ সার্টিফিকেট করার সময় অক্সা কেউ কেউ সামান্য সাহসী হয়ে কিংবা গৃহিণীর সঙ্গে মৃদুমন্দ আলোচনার ফলস্বরূপ মাঝে মাঝে নামের আদল-বদল করে থাকে। শাওড়ির দেওয়া নাম তেমন পছন্দ না

হলেও সুন্দরী শ্যালিকার দেওয়া অকিঞ্চিৎকর নামও পছন্দ হয়ে ওঠে দিবি। তা নিয়ে কখনো কখনো গৃহে অশান্তিও বাধে।

বাঙালির সর্বঘাটে কাঁঠালি কলা রবি ঠাকুর তো পেলেই এর তাব নাম রেখে বেড়াতে। তাব কি আব কোনো কাজ ছিল না নাকি? স্মৃতি যদি বিশ্বাসঘাতকতা না করে থাকে, নবনীতা দেবসেন একবার কোথায় যেন গিয়েছিলেন—তাঁর নামটা ববীন্দ্রনাথের দেওয়া। পরবর্তীকালে সামান্য জ্ঞান হলে পর এ নাম নাকি তাঁর ভালো লাগছিল না। কোন এক দোকানের নাম দেখে তিনি নিজের ষাটায় নাকি লিখেছিলেন—বীণাপাণি বিপণি। সেটা তাঁর খুব ভালো লেগেছিল। সত্যিই তো, তুমি রবি ঠাকুর বলেই তোমার সবকিছু মানতে হবে নাকি? নটী নবনীতা বীণাপাণি বিপণি হতেই পারেন।

কিন্তু মুশকিল ঐ যে। দাড়িওলা বুড়ো যে বড্ড বড় ধরনের এক ম্যাজিকওলা।



কী যে তাঁর ম্যাজিক। সে তো সেবি সর্বদ্যে। সবাই তো ওই ঠাকুরকে এক ডাকে চেনে। তা বাজারের নামধাম সব ওই রকির থেকে ধার কবা। সে যে কোনো কিছু জানতে, কোনো কিছু লিখতে বাকি রাখেনি।

স্কুলে রবীন্দ্রনাথের বাবা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা লেখা ছিল—হিমালয় ভ্রমণ। রবির বাবা খালি কথায় কথায় ঈশ্বরকে ধরে টান মারছে আর এখান থেকে ওখান থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছে। হাকিন্ড-টাকিন্ড, এসব কবির রচনা থেকে লিখে দিচ্ছে। একজন ছাত্র তাই পড়ে বলেছিল, স্যার, রবীন্দ্রনাথের বাবা যদি রবীন্দ্রনাথের পরে জন্মাত তাহলে তাকে আর এসব কোটেশনের জন্য অন্য কোথাও যেতে হত না—রবীন্দ্রনাথেই তো সব পেয়ে যেত।

সত্যিই তো। রবীন্দ্রনাথের বাবা যদি রবীন্দ্রনাথের পরে জন্মাত।

কিন্তু যে যত বড় নামডাকপালা লোক হোক না কেন, ছেলেরা কখনোই বাবার আগে জন্মায় না। সে রবীন্দ্রনাথের মতো লোক হলেও নয়। রবীন্দ্রনাথের নামডাক

স্যার, রবীন্দ্রনাথের বাবা যদি
রবীন্দ্রনাথের পরে জন্মাত তাহলে
তাকে আর এসব কোটেশনের
জন্য অন্য কোথাও যেতে হত
না—রবীন্দ্রনাথেই তো সব পেয়ে
যেত।

সাদা পৃথিবী ছুড়ে। কেউ কেউ মুখ বেঁকালেও সবাই কঁক পেলেই দু-এক কলি রবীন্দ্রনাথ গেয়ে নেয়। গিরি উদাস হয়ে গান—আমার বেলা যে যার ডাল সোঁতলাতে আর বাচ্চার জন্য দুধ ওধলাতে—

ছেলে গায়—তুমি রবে কিতাবে ম্যাটে মম—

বাবা অফিসের কাজের কঁকে গাম—দূর টাইপ-মেশিন হাসিনি—তোমার চায়ে দেব কি চিনি—

মেয়ে গায় প্রেমিকের উদ্দেশ্যে—তোমার সকল টাকার খারা আমাতে হোক না হারা—

তাঁর থেকে এত নাম আমার ধার নিলেও তাঁর নিজের নামটা তেমন 'হিট' নয় বাজারে। অতিবড় রবীন্দ্রভক্তও ছেলের নাম রবীন্দ্রনাথ রাখতে চান না। অনেকে বলে, লোকটা ভালো, কিন্তু নামটা কেমন যেন পসের নয়। আঙ্কলার বাজারে ঠিক খাপ খায় না।

ক্রিকেটের কিংবদন্তী খেলোয়াড় সুনীল গাভাসকার তাঁর ছেলের নাম রেখেছিলেন রোহন জয়বিশ গাভাসকার। রোহন হচ্ছে রোহন কানহাইয়ের নামে, জয় হচ্ছে জয়সীমা আর বিশ্ব হচ্ছে শুভাশ্রী বিশ্বনাথ। এসব ক্রিকেট প্রেমাররা হচ্ছে তাঁর প্রিয় ক্রিকেটার। শোনা যায়—অনুনা প্রিয় স্বস্তিক রোশনের নাম নাকি স্বস্তিক ঘটকের নাম থেকে হয়েছে। আরেক দুয়দাম নায়ক বিবেক ওবেরয়ের নাম বিবেকানন্দের থেকে হয়েছে কিনা কে জানে? সূচিরা মিত্রের পিতা সাহিত্যিক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়কে নাকি অনেকে 'ফুটকি সাহিত্যিক' বলে অভিহিত করতেন। তিনি নাকি অনেক লাইনই শেষ করতেন পরপর অনেকগুলো ফুটকি চিহ্ন দিয়ে।

বিভিন্ন সময়ে হিম্মি সিনেমার নাম বা সংলাপ বা গান থেকে নায়ক-নায়িকারা পরিচিত হয়ে যান। অপর্ণা সেনের ছবি 'পার্ট সিন্স টোরবী লেন'-এর মতো ছবিতে

ধুমুসার কিছু 'কিসিং সিন' থাকায় মুম্বাইয়ের কিছু কিছু ম্যাগাজিনে দেবশ্রী রায়কে কলা হতে লাগল—পার্ট সিন্স কিসিং গার্ল।

কোরি রকিনা ট্যান্ডন। ছবি কিছুতেই হিট হয় না রে মা। সে ভাবছিল, হিট বোধ হয় হল না, কতি না। এমন সময় কি একটা এমিক-ওমিক মাথায় দুলিয়ে নেচে-কুঁদে কিসব অদ্ভুতুড়ে বেশভূষা করে সে ইঠাৎ 'মহু গার্ল' নামে বিখ্যাত হয়ে গেল—তু চীজ বড়ী হায় মহু মহু। শোনা যায় গানটি কোনো পাকিস্তানি কণ্ঠযালি গানের সুর থেকে নেওয়া। তা রকিনা মহু মহু বিখ্যাত হলে কি হবে, বেচারি কবিতা কৃষ্ণমূর্তির তো গানটি গেয়ে অভিনানে গাল ফুলে গেল। তাঁর গুরুস্থানীয় এক গায়ক নাকি কোথায় কোন সাক্ষাৎকারে বললেন—এরকম 'অবরদত্ত' ভুলভাল গান করলে একদম আমার সঙ্গে কথা বলবে না। একদম না। গুরু দোস্তি খতম।

বোঝা যাচ্ছে নামডাকের অহমিকার অভিমানও কি সাংঘাতিক। ঐ গুরু যেনো নামডাক, তাঁর ছাত্রীস্থানীয়া স্নেহভাজন কবিতা এমন কৃষ্ণমূর্তিব মহু ভজনা করলে তাঁর নামে কালি পড়বে না। বাবা, আমি শ্রীশ্রী ভক্তহরি মায়া। কে জানে সেই দুঃখে কিনা কবিতা এখন যন্ত্রবাদকের কিংবদন্তীতে আটকে পড়ে অন্য নাম সন্নির্ভূত করে চলেছেন। গান গাওয়া নাকি তাঁর কমে গেছে।

কর কপালে কি ভাবে যে নাম এসে যায়। নৃত্য-নির্দেশক সরোজ খান নাকি নৃত্যপটিকারী অভিনেত্রী শ্রীদেবীর জন্য একটা নাচ ভেবে বেখেছিলেন। কিন্তু গোল বাধল ওই নামডাক নিয়ে। সরোজ খানের তখন খুব খ্যাতি, আব ওদিকে 'ধাভারআই' শ্রীদেবীর নামে তখন সারা ভারত তোলাপাড়। এ বলে কি—আমার নৃত্য-নির্দেশনার জন্যই গান হিট, ও বলে কি—না, আমি বলে শ্রীদেবী, আমার নাচের জন্য ছবি হিট। এই দুই দেবী হিটাহিটের ইটবৃষ্টিতে সরোজ গেলেন বিগড়ে। মাঝখান থেকে মাধুরী দীক্ষিত বেটা 'ধক্ষধক্ষ করলে লাগা' নেচে সারা ভারতে অল্প কিছুদিনের জন্য 'ধক্ষধক্ষ গার্ল' নামে পরিচিত হলেন। রানীবাবুও 'আরে কেয়া বোলতি তু—ম্যাম কেয়া বোলু—আতি কেয়া খাভালা'র জন্য 'খাভালা গার্ল' নামে পরিচিত হয়ে গেল। আমাদের রামুর পেয়ারের উর্মিলাবাই কত নাম। এ বলে রঙ্গি লা তো ও বলে 'হুমা হুমা' গার্ল। সে অভিমানে মুখ ফুলিয়ে বলল কি না—মোটাই না, আমি সুঅভিনেত্রী হিসেবে পরিচিত হতে চাই। 'সত্য' সে দেখিয়ে দিল বটে।

ইদানীং এক কোম্পানি এসে সবাইকে খালাস করে দিয়েছে। আহা রে ইশা কোপিকার। এর আগে এর তার টুপি ধরে টেনেটেনেও তার কিছু হচ্ছিল না। রামু যেই না তাকে 'খালাস' নাচ নাচাল অমনি সে 'খালাস গার্ল' নামে বিখ্যাত হয়ে গেল।

বাবা-মাঝা ছেলেমেয়েদের নাম রাখে নিজেদের নামের সঙ্গে মিলিয়ে বা কখনো দু'জনের নামের প্রথম অক্ষরগুলো জুড়ে। ধবা যাক বাপের নাম কেশব এবং মায়ের নাম লোপা। তাতে ছেলে 'কেলো' হলে সেই কেলোর কীর্তির দায় কিন্তু উভয়কেই নিতে হবে। তবে মহিম আর দময়ন্তী নিশ্চয় তাদের প্রথম অক্ষর দিয়ে ছেলের নাম ভাববে না। নামের বানান উটেপাটে বা একদম নাম পাটে অনেকে ভাগ্য অধ্বংসে রত হয়। কেউ বা শব্দের মাঝখানে একখানা 'এস' বসিয়ে 'স' সোবের প্রাকল্যের শিকার হয়। আমার এক জ্ঞানশোনা ছেলের নাম তার বাবা-মা ভারতব প্রথম আধুনিক পুরুষের নামে রেখেছিল। পরবর্তীকালে সেটা তাব বিশেষ পছন্দ হয়নি। সে যখন কর্মক্ষেত্রে একটু হতাশ হয়ে পড়ছিল তখন সে তাব নাম পরিবর্তনের কথা ভাবে। ভারতের প্রথম আধুনিক পুরুষের নাম এ যুগে আর তত আধুনিক নেই। সে তো অনেক ভেবেচিন্তে এমিডেবিট করেট্রে তার নাম ঠিক করল—অর্পক। শুনে নিজের অজান্তেই বলে ফেললাম,—কলকাতায় তো এক জব চার্ক ছিল শুনেছি, তুমি কি তার ভাই নাকি?

বেচারি একটু মনঃকুণ্ঠ হয়েছিল,—আপনিও মূরগি করছেন।

কিন্তু এখন সে নামের গুণেই হোক, ভাগ্যের গুণেই হোক বা অধ্যবসায়ের গুণে হোক, ভালোই কাজকর্ম করছে।



জ্যোতিষসান্নী সৌভাগ্যদমন মহারাজ

রাস্তাবীতিক রাশি : এবার পঞ্চায়েত ভোটে জয়লাভ আপনার অধিকতর লাভের অনুকূল হতে পারে। যে কোনোদিন স্বর্ণ প্রমোশন পেতে পারেন। শনির দৃষ্টি এড়াতে অষ্টগ্রহের হস্তে রত্ন ধারণ অনিবার্য—কমাতো সুরক্ষিত উর্ধ্বতন নেতার পদ।

শিক্ষক রাশি : এ মাসে আপনার সর্বোচ্চ দর্শন ও পাদপদ্মস্পর্শ যোগ আছে। একতলার পর দোতলা, দোতলার পর তিনতলা তুলেও যারা সূর্যোদয় সূর্যাস্ত না দেখে টিউশনি করেই চলেছেন কিন্তু বাজার বেশ মন্দা, তাঁদের এ মাসে মেঘ না চাইতে জল। একদল কচি কচি ছেলে-মেয়ে আপনি এসে খাঁচায় ধরা দেবে। দুঃখের মধ্যে, চোখে সর্বোচ্চ দেখবেন এরা আদৌ টিউশন-পড়ুয়া নয়, ক্ষুদে ক্ষুদে পাটি ক্যাডার। অতঃপর বাকি পড়ুয়াদের পলায়ন, নয়নে সন্নিবাহুল দর্শন ও পাটিনেতার শ্রীপদস্পর্শ যোগে বিপদমুক্তি। তবে ত্র্যহস্পর্শ সম্পূর্ণ হবে—যখন পৃথিবী আপনার সামনে রক্তচক্ষু মেলে ইনস্টলমেন্টে সদ্যক্রীত ভারী হারছড়াটির দাম কিভাবে শোধ হবে তা জানতে চাইবেন।

উপন্যাসিক রাশি : সদ্য প্রকাশিত ও সদ্য পুরস্কারপ্রাপ্ত রপ্নরূপে উপন্যাসটি দেশে উৎসাহিত হয়ে যারা কান কাটিয়ে এসে উপন্যাস রচনায় হাত দিয়েছেন তাঁদের পক্ষে এ মাসটা ভালোয়-মন্দয় মেশানো। মন্দর মধ্যে সেই প্রতিষ্ঠান উচ্ছিন্ন ছাপবে না। ভালোর মধ্যে অন্য প্রকাশক বইটি ছাপবেন, তবে মলাট ছাড়াই, মানে লেখক ও প্রকাশকের নাম ছাড়াই। বইটি বিক্রিও হবে মুড়ি-মুড়কির মতো, তবে ফুটপাতে, এবং অবশ্যই অঙ্ককারে।

এম এল এ রাশি : মাসটি শুভ। অধিবেশন চলাকালীন কুস্তি ও বক্সিং চর্চায় কয়েকটি নতুন পাঁচ ও ও পাঞ্চ আয়ত্ব করতে পারেন। তবে উরুভঙ্গের সম্ভাবনা থাকায় হাসপাতাল ও শুশ্রূষা এড়াতে বিদেশে চিকিৎসা করানো বিধেয়।

মন্ত্রী রাশি : বিরোধী-অড়িত হয়ে মাঠ-ময়দান ভেঙে দৌড়ানোর ফলে আপনার হাঁটুর বাত ছেড়ে যেতে পারে। মুখ্যমন্ত্রী ব উদ্দেশ্যে তর্জন-গর্জনে খোলতাই হতে পারে গলাও। তবে গদি হারানোর ভয়ে সে গলা অচিরেই খাদে নেমে আসবে। বড়দার ধমক-রত্ন নত মস্তকে ধারণ করলে সুফল পাবেন।

পুলিশ রাশি : মিছিলে গুলি চালানোর সময়ে সতর্ক থাকা বিধেয়। নজরদারি করতে আসা শাসকদলের কেউ আপনার গুলিতে মাথার খুলি হারিয়ে বসতে পারে। তখন 'মিছিল হিংস হয়ে উঠেছিল, পুলিশ আত্মরক্ষার্থে...' বলে শত চেষ্টা করলেও আত্মরক্ষা দুঃসাধ্য হবে। পূর্ব হতে রাজনৈতিক কবচ ধারণ করুন।

উকিল রাশি : এ মাসে আপনার জয় এবং পরাজয় হাত ধরাধরি করে আছে। নিশ্চিত খুনি জেনেও মক্কেলকে খালাস করিয়ে এনেও ফাঁস নিয়ে বেধারেবিত্তে তার হাতে আপনি খুন হবার পর সে খুনি প্রমাণিত হবেই।

ডাক্তার রাশি : ডিজিট বাড়াবার সুবর্ণ সুযোগ। যাঁদের যথেষ্ট সুনাম ও চাহিদা হয়েছে, এক লাফে দুশ থেকে চারশুয় চলে যেতে পারেন। কিন্তু দরজায় কমাতো রাখা ভালো, নয়ত অক্ষমরা চাঁদা তুলে রীতিমতো ডিজিট দিয়ে আপনাকে পেটাই করার লোক ভাড়া করে আনতে পারে। ই এন টির ক্ষেত্রে গালমন্দে কানকে সাউন্ড প্রফ ও অর্থোপেডিকের ক্ষেত্রে অচিরেই নিজের ভগ্ন হাড়পোড় করে নেওয়ার সুযোগ থাকায় তাঁদের ওপরে রাব্বির প্রকোপ খুব বেশি হবে না।

যেখানে কইতে কথা বারেনি

সমগ্রেশ মজুমদারের
অকপটে ৩৫



মনোজ বসু, শক্তিপদ রাজগুরু থেকে শুরু করে একালের
তরুণ লেখক-লেখিকা পর্যন্ত। অসাধারণ একগুচ্ছ হাসির গল্প

পত্রপাঠ সহর্ষ গল্প সংগ্রহ ৩৫



প্রাপ্তিস্থান : নবজাতক প্রকাশন, এ-৬৪ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট,

কলকাতা-৭০০ ০০৭

লেবেল ক্রসিং

দিব্যেন্দু দাস



গাড়ির সদরে
হ্যাসবোর্ন্ট, খিল, তাল্লা,
ছিটকিনি, চেন, পেরেক ও
খুঁটের দড়ি লাগাবার
ব্যবস্থা আছে কি না তা
দেখে কেনা উচিত।

একটা গাড়ি না থাকলে জীবন ম্যাডমেডে। আবার দাম ওনলে রক্ত
জ্বল। একটা অসুস্থ টানাপোড়নে গেছে কটা বছর। শেষে সিদ্ধান্ত
নিয়েই ফেললাম। তবে সেকেশু হ্যাণ্ড কিনব। প্রথম হাত হলে
হাত-পা ভেঙে যাবে। খুব দেখেওনে নিতে হবে। আমাদের বংশে এই প্রথম
গাড়ি কেনা। গ্যারেজ চাই, যাতে রাত্রিবেলা পূর্বজরা এসে লাইটের সুইচ
টেপাটেপি করতে পারে, ড্যাশবোর্ডে রাখা আঙ্গুরের ছড়া থেকে দু-একটা গালে
পুরতে পারে। শেষে খুশি হয়ে পেট্রল ট্যাঙ্কের গায়ে একটা বেলপাতা রেখে
বর নিয়ে যেতে পারে—‘যা, তোর কোনোদিন মোটা ভাত-পেট্রলের অভাব
হবে না।’ কাপড়ের কথা কিছু বলবে না। গাড়ি বাড়িতে পা রাখলেই আমি
উচ্চাঙ্গ হয়ে যাব। তখন ওনাদের সমান। আর কাপড়ের প্রয়োজন থাকবে না।
লঙ্কা চলে গেলে আর নিবারপের কি কাজ? তাছাড়া দিনের মধ্যে কুড়ি ঘন্টাই
তো তখন গাড়িতে কাটবে। যে যতক্ষণ গাড়িতে কাটাতে বাজারে তার তত
কাটতি। এখন আর রিক্সা চড়ে রুগির বাড়ি যান না ডাক্তাররা। রিক্সাওলাই
কেমন করে তাকায়। আগে ওনাদের সঙ্গে করে নিয়ে আসা যেত। এখন—
‘আপনি লোকেশন দিয়ে চৌমাথায় ওয়েট করুন, আমি ড্রাইভার এলে
বেরোছি।’ বাস, দু-মিনিটার জন্যে ট্রাফিক পুলিশ। রোড-ভলেন্টারিয়ার। শেষে
যখন ওনার গাড়ি এসে দাঁড়াল তখন বডি বেরোচ্ছে রজনীগন্ধা বেঁধে। কল
পেয়ে এসেছেন। রুগি ওয়েট করেনি। সেটা কার দোষ? ট্রেন ছেড়ে গেলে
টিকিট ফেরত হয়?

গৌরদার কাছে পরামর্শের জন্য গেলাম। এ পাড়ার একমাত্র গাড়িওলা।
অবশ্য প্রাক্তন। এক মাস হল চুরি হয়ে গেছে। আমার যেমন হোমওয়ার্কের
খাতা হারিয়ে যেত। বাবা যেদিন হারানোর কারপটা আবিষ্কার করেছিল
সেদিন আমি বুঝেছিলাম কখি কি জিনিস। গৌরদা নাকি গাড়ি দাঁড় করিয়ে
পেট্রল কিনতে গিয়েছিল। ফিরে এসে দেখে গাড়ি নেই। পুলিশ ডায়রি নেয়নি।
গৌরদা মানবাধিকারে গিয়েছিল।

প্রাণ হারালেও পরিবার রয়ে যায়। গরু হারালেও গোয়াল রয়ে যায়।
পেন হারালেও পেন-ফ্রেশ রয়ে যায়। এমনকি ট্রামে চড়তে গিয়ে ‘ঠ্যাং
হারালেও জুতো রয়ে যায়। দুর্ঘটনার আগেকার স্থিতি। গাড়ি হারালেও
অভিজ্ঞতা রয়ে গেছে গৌরদার।

বলল,—গাড়ির সদরে হ্যাসবোর্ন্ট, খিল, তাল্লা, ছিটকিনি, চেন, পেরেক
ও খুঁটের দড়ি লাগাবার ব্যবস্থা আছে কি না তা দেখে কেনা উচিত। প্রতিদিন
রায়ে গাড়ি গ্যাবাজ করে একটা আস্ত আনন্দবাজার খরিয়ে চারটে দরজার
চারপাশে ঘুরিয়ে নেওয়া চাই। তারপর কেন্দ্রীয় পেট্রলিয়াম মন্ত্রীকে মনে মনে
কল্পনা করে কামানাসন করবে। কামানাসন খুব সোজা। ক্রাইভের কামানের
যেমন এক্সিট পয়েন্টটা শরুপক্ষের দিকে তাক করে রাখা হত,তোমারও
এক্সিট পয়েন্টটা ঐ ভাবে দিল্লির দিকে তাক করে দাঁড়াতে হবে। গানস্যালাউট!
গাড়ি বাড়িতে থাকলে সন্ধ্যার মুখে গাড়িকে মোমবাতি দেখাবে।

একটু উলু দিতে পারলে ভালো হয়। গাড়ির ড্যাশবোর্ডে ঘাড় নাড়া কুকুর, বাদর, কালী—যাই রাখো না কেন, কোনো কাজের না। কালী ট্রাক টানে ট্রাকের গায়ে থাকে ডাকিনী-ঘোমিনী। স্ট্যাটিস্টিক বলছে ট্রাকের সঙ্গে মুশোমুশি ভিড়েছে এমন প্রাইভেট গাড়ির একশটার মধ্যে নব্বইটাতাই টুনি আর কালী ছিল। কুত্তা আরো মারাত্মক। লেবেল ক্রসিং-এ ধরবে। এফোড় ওফোড় হয়ে যাবে। সেবার মতো পিণ্ডিও থাকবে না। লেডি ডায়নার গাড়িতে নাকি হায়নার ছবি ছিল। পরিণতি দেখেছ। পরপুরুষের সঙ্গে পরবাসে চলে গেল সুড়ঙ্গ বেয়ে। গাড়ির মাইলেজ দেখতে হবে। মাইল এবং এঞ্জ। গাড়ির এঞ্জ বাড়লে মাইল কমে। মানুষের যেমন এঞ্জ বাড়লে দাঁত কমে। আমার হারিয়ে যাওয়া গাড়ির এঞ্জ ছিল মাত্র দুই। পেছনে ডিকির ভেতরে চক দিয়ে লিখে রেখেছিলাম।

গৌরদার গলাটা ভারি হয়ে গেল। গৌরদা তাহলে সত্যিই গাড়ি হারিয়েছে। আমি তাড়াতাড়ি বললাম, অনেক কিছু শিখলাম। আজ থাক। আবার আসব।

গৌরদা বুঝতে পেরে বলল—যার যায় সেই বোঝে। মনের কষ্ট তো আর পুলিশকে বলা যায় না। ওরা খুঁজুক আর না খুঁজুক, আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি। শয়তানটাকে একবার পেলো—। গৌরদার দাঁতের পাটিতে পাটিতে ঘষাঘষি খেল।

আমি আর দাঁড়াইনি। দুদিন পরেই গাড়ি কিনে বাড়ি এলাম। ঝাঁপিয়ে পড়ে দেখতে লাগল পরিবার। গর্বে আমার বুকের বোতাম ছিঁড়ে গেল। চলো, গঙ্গার ঘাটে যাওয়া যাক। ডিকিতে সতরঞ্চি, হাওয়াই চটি, শিরীষ কাগজ, জাতীয় পতাকা, ক্যালেন্ডার, কড়াইশুটি, সেলাই মেশিন, চালের ড্রাম, মিনারেল ওয়াটার তুলে নাও। কলের জলের দিন শেষ। চাবি ঘুরিয়ে ডিকি তুলে দিলাম। হঠাৎ এচাখ গেল, চক দিয়ে 'দুই' লেখা আছে ভেতরে।

আমি 'লেবেল ক্রসিং' 'লেবেল ক্রসিং' বলতে বলতে অজ্ঞান হয়ে গেলাম।

কার্টুন : নির্মাণ দাশগুপ্ত



সিনেমা দুঃসংবাদ

ছবি কীভাবে তুলতে নেই, এই শিক্ষার জন্য ‘হেমন্তের পাখি’কে উড়িয়ে দিলেন উর্মি

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের গল্পশো নিয়ে উর্মি চক্রবর্তী যখন ছবি করছেন জানা গিয়েছিল, তখনই ভেবেছি, এ ছবি কী হবে। তখনই বোকা গিয়েছে যে এটা আর বাই হোক, কোনো ছবি হবে না। কারণটা খুব স্পষ্ট—সুচিত্রা ভট্টাচার্য গল্পশো লেখেন মোটা দাগের, মোটামুটি এটাই তাঁর পরিচিতির কারণ। আমাদের জীবন এখন ছবির মতো সেগে সেওয়া হয়েছে—সেই দাগের ওপর বুগিয়ে গেলেই বাজিমাত। প্রায় কিস্তিমানের মতো—কয়েক কিস্তি ধরে চালিয়ে যাওয়া যায়, ছকে বাঁধা প্লট, তাতেই ছক। মেরে চলছে সাহিত্য, নাকি সাহিত্যের অ্যাপলজি? সুচিত্রা ভট্টাচার্য আর সুচিত্রা সেনকে তুলিয়ে ফেলেছে পাঠক ও দর্শক। দু’জনেই আমাদের জীবনের দুর্যোগের সুযোগ নিয়েছেন। যে প্রেম কোনোখানে নেই, সেই অবাস্তব, অবাস্তব, অসম্ভব প্রেমের জোলে ছবি দেখে বাঙালি দর্শক হাপুস নয়নে হেসেছে। সুচিত্রা ভট্টাচার্য সেই প্রেমের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন প্রেমহীনতা, জুড়ে দিয়েছেন মানুষের ভোগের আকাঙ্ক্ষা। সব ভোগে গেছে অবশ্য, কারণ তাঁর হাতের লেখা যেমনই হোক, লেখার হাত একেবারেই নেই। কে তাঁকে লিখতে বলেছিল জানি না, এখনো কেউ তাঁকে ধামতে বলেনি কেন তাও জানি না। যার একটা গল্পশো পড়লে সব গল্পশোই পড়া হয়ে যায় তিনি বরং বাংলা দূরদর্শনে সিরিয়াল লিখুন, সাহিত্যের চেটা কেন? অবশ্য এসব বলার কোনো মানে নেই, অপমানও নেই। বাঙালি পাঠক এই পর্যায়ে নেমেছে যে এমন বিপর্যয়ও সে হাসিমুখে নিয়েছে। বাঙালির সহনশীলতার এমন পরীক্ষা আর হয়নি।

উর্মি চক্রবর্তী যখন এমন বই বেছেছেন ছবি করার জন্যে, তখনই বোকা গিয়েছিল বাংলা সিনেমার রাত এখনো কাটেনি। এই কাহিনী বেছে নিয়েই তিনি বেঁচে যাবেন, কারণ বাংলা সিনেমা ও উপন্যাস এখনো আছে কাপুক্ষ্য ও মেয়েমানুষদেরই হাতে, পুঙ্খ বা মানুষের হাতে নেই।

গল্প থেকে ছবি করতে হলে দুটো মিডিয়ামকেই জানতে হয়—দুটোর একটাও না জানলে যা হয়, তাই হয়েছে ‘হেমন্তের পাখি’ বস্তাপচা গল্পের দূরবস্থা বাড়িয়েছে পরিচালনার শিক্ষাহীনতা। কে যেন বলেছেন যে এ গল্পের নায়িকার ওপরে সত্যজিতের ‘চারুলতা’র ছাপ পড়েছে। যিনি একথা বলেছেন তিনি ‘চারুলতা’ বা ‘হেমন্তের পাখি’ কোনোটাই দেখেননি, দেখলে এমন উন্মাদ-বাকা তিনি উচ্চারণ করতে সাহস পেতেন না। গল্পকে হুবহু নকল করতে গিয়ে মার খেয়েছে ছবি, পরিচালক এবং দর্শক। যেখানে পরিচালক নিজস্ব কল্পনা প্রয়োগ করেছেন সেখানেই ধরা পড়ে গিয়েছে ধড়াতাড়ের আড়ালে কী আছে। নায়িকার বন্ধু যাকে দেখানো হয়েছে, শুধু কয়েকটা শেখানো সংলাপ আউড়ে দিয়েই তার কর্তব্য শেষ করেছেন পরিচালক। তাকে আরোপিত বললে পিতঃ মাপ করবেন, তাকে বলতে হয় ভূঁইকোঁড়া।

বেড় সীন দেখানো এখন আবশ্যিক অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে বাংলা ছবির, এভাবেই পর্ণোগ্রাফি পড়ার আশ মিটিয়ে নিচ্ছে সবাই। এ ছবিতো সেইরকম একটা দৃশ্য আছে, নায়ক-নায়িকার আবেগের দৃশ্যে নিঃশ্বাসের যে গর্জন শোনা গেছে, তাতে মনেই হয়েছে যে এ আওয়াজ হাঁপানির আওয়াজ, এই নিঃশ্বাসই না শেষ নিঃশ্বাস হয়। শ্বাস উঠলে যেমন সবাই অপেক্ষা করে

সেইরকম অপেক্ষা করছিলাম আমরা—কখন ছবির শেষ নিঃশ্বাস পড়ে। পরিচালক এ ব্যাপারটাও জানেন না দেখছি।

মুন্সিল হচ্ছে, এ গল্পের লেখকও নেই, অস্তিত্ব এ লেখায় কোনো সাবস্ট্যান্স নেই, অর্থাৎ তার কোনো বিশ্বাসযোগ্য অস্তিত্ব নেই। মনে হচ্ছে সবটাই সাজানো। ছবির পরিচালক বলেও কেউ নেই, যদিও তিনি প্রাইজ পেয়েছেন একটা। কুস্তিতে পাবি না, প্রাইজের উপযুক্ত কেউ না থাকলে কয়েকটা বছর প্রাইজ দেওয়া বন্ধ থাকে না কেন। প্রাইজ কি দিতেই হবে? এতে ভালো ছবি আসার পথও তো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কারণ এমন ছবিকেই ভালো ছবি মনে করছে সবাই। ভালো ছবি না দেখতে পেরে পিটুলিপোলোকেই দুধ ভাবিছে সকলে। এমন প্রাইজে ছবির দিন ফেরে না, দুর্দিনই ফিরে আসে।

এ ছবিতো অভিনয়ের কথা কহতব্য নয়। এমন দুরত্বিনয় সহজে চোখে পড়ে না। প্রত্যেকটি চরিত্রে যে এমন কু-অভিনয় করা যায়, না দেখলে বিশ্বাস হত না। সৌমিত্র বলুন, সন্ত বলুন, তনুশ্রী বলুন, মমতা বলুন—অ্যাকটিংয়ের হাজার মাইলের মধ্যে দিয়ে কেউ যাননি।

সম্ভব উর্মির ডাকে পক্ষাতের ঢেউ

দিব না দিব না যেতে, নাই শোনে কেউ—

কেউ শোনে না বলেই সাগরের উর্মির মতোই উর্মি চক্রবর্তীও ভেঙে ভেঙে মুছে মুছে যাবেন। ততদিনে আরো গোটাকতক প্রাইজও তাঁর পাওনা হতে পারে। তবু একথা এখনই বলতে হবে যে, ফিল্ম পরিচালনা তাঁর লাইন নয়। ছবি তোলায় যে প্রধান শর্ত, অর্থাৎ ছবি তোলার আগেই চোখের সামনে ছবি ফুটে ওঠা, ‘হেমন্তের পাখি’ প্রমাণ করেছে যে ছবির সেই অস্তিত্ব তাঁর নেই। তাতে লজ্জার কিছু নেই, কারণ সকলের সব কিছু থাকে না। যা থাকে তাকেই প্রতিষ্ঠা করার পরীক্ষা দিতে হয়।

শিল্প কেউ শেখে না, যদি না শিল্প নিজেই কাউকে শেখায়। উর্মি চক্রবর্তী বরং ফিল্ম পত্রিকা বার করে দেখতে পারেন, এমনকি ফিল্মের ফাইন্যান্সিয়ারও হতে পারেন তিনি, কিন্তু ফিল্ম মেকার—নৈব নৈব চ। ছবি তোলার পরিস্রম প্রবৃত্ত, সেই পরিস্রম যে জলে গেছে, গলে গেছে তাঁর বৌবন, একতা যে দিন কুস্তিতে পারবেন ততদিনে বনে যাবার সময় যদি হয়ে যায় তাঁর, তবে সেটা দুঃখের হবে। একটাই জীবন, তাই আরেকটা ছবি করার আগে আরো অনেকবার তেবে দেখলে ভালোই করবেন তিনি। তাঁর বেসিক গোলমাল হল, ছবি তোলার বেসিক তিনি ধরতে পারেননি। তাই গাছে যেভাবে ঝোলে কাঁঠাল, তাকে পাতে সেইভাবেই খেতে দিয়েছেন। গাছে থাকলে তবু চুলে তেল দিতে পারতেন তিনি, গাছ থেকে কেটে নামিয়ে গাছপাঠাই হয়ে গিয়েছে তাঁর ছবি। নেহাৎ যদি ছবি তুলতেই হয়, তবে এ বা বলেছি, বোকা বাজ্জব জন্য, বোকা বোকা ছবি তুলুন—যেখানে যুক্তিহীন প্রযুক্তি, বুদ্ধিহীন কাহিনী, বোধহীন নির্বুদ্ধিতার সমাচারের আদর্শ সমাহার। ছবি কেমন করে তুলতে নেই, উর্মি চক্রবর্তীর ছবি দেখে সে শিক্ষা পাওয়া যায়—সেদিক থেকে অবশ্য তিনি অশিক্ষিত পাঠক্রমে দীক্ষিত করতে পারেন আমাদের।

—পিনাকী ভাদুড়ী

হে রাম!

কারণ বিনা কার্য হয় না—কথাটা কে বলেছিলেন? কেউ যদি না বলে থাকেন তাহলে প্রবাদ-পেটেন্ট আজ থেকে আমাব এবং পেটেন্ট-পতিত্ব প্রমাণের ভারও আমার। খবরটা নিশ্চয় এতদিনে চক্ষুগোচর হয়েছে—বলিউডি দুই নিভৃত তারকার রাম নামকীর্তনে, না না রাম ধারণে। সলমন খান আর ঋত্বিক রোশন। কলির দুই Riiii শতির হঠাৎ ত্রেতার রঘুপতি সাজার বাসনা কেন? কারণ নিশ্চয় আছে। সেই কারণই খুঁজব। নাহলে পেটেন্ট হাতছাড়া হয়ে যাবে। প্রথমে খান-রাম তারপব রোশন-রাম।

খান সাহেব রামচরিত্রে অভিনয় করতেই পাবেন। কাবণ ত্রেতার রামচন্দ্রের সঙ্গে তাঁব প্রচুর মিল। বলা যেতে পারে রামচরিত্রে অভিনয় করার জন্যই খান সাহেবের জন্ম। রাম জন্মাবাব আগেই যেমন বাস্মিকি রামায়ণ লিখে ফেলেছিলেন, তেমনি প্রোডিউসার তাঁকে রাম চরিত্র অফাবের অনেক আগে থেকেই খান সাহেব রাম চরিত্রাভিনয়ের মহড়া দিতে শুরু করেছিলেন। হরিণ মারার কেসটাই ধরুন না। রামচন্দ্র সীতার বায়নাঙ্কায় সোনার হরিণ মারতে গিয়ে বিপদ ডেকে এনেছিলেন। খান সাহেবও তাই। গুটিং-এ নামিকাব সামনে বীরত্ব দেখাতে গিয়ে মেয়ে দিলেন কৃষ্ণসাগর। তাবপর জেল, জরিমানা। ইমেজে ছেনিব যা। বামাঘণে কথিত, লঙ্কাকাণ্ডে রাক্ষস হত্যার জন্য রামচন্দ্রকে প্রায়শ্চিত্ত কবতে হয়েছিল। মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালিয়ে ফুটপাতবাসীদের পিষে ফেলে খানসাহেবকেও কম প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়নি। বেশ কিছুদিন হাজতেব লগ্নি চাটতে হয়েছে। এখনো আদালতে কেস ঝুলে আছে। আবাব সীতাহরণ কেসটা ভাবুন। পৌরাণিক লঙ্কাকাণ্ড তো আমাদেব জানা। খান সাহেবও তাঁর প্রথম সীতা সঙ্গীতা বিজলানিকে রাবণরূপী আঙ্কুমিঞা হরণ কবার পর আরেক লঙ্কাকাণ্ডে মানে মুম্বাই কাণ্ড বাধাবার তাপে ছিলেন। হুন্সাব দিয়ে বলেছিলেন, মুম্বাই-এ এলে তিনি মিঞা সাহেবের ঠ্যাং ভেঙে দেবেন। আপনারা বলবেন, লঙ্কাকাণ্ড তো বাধাতে পাবেননি খান সাহেব? মিঞা তো বহাল তবিযতেই ঘরকন্না করছেন। মশাই, সবটা কি আর মেলে? মনে বাখবেন এটা কলিকাল। এই কঙ্কি অবতারের কেসটাই ধরুন না। পুরাণ অনুসারে, তিনি নাকি সাদা ঘোড়ায় চেপে তলোয়ার হাতে আবির্ত্ত হবেন। হুঁ! ক্ষেপণাস্ত্র আর জঙ্গি বিমানের যুগে ঘোড়া আব তলোয়ার?! কঙ্কিকে অসুব দমনে আর কঙ্কে পেতে হবে না। দেখবেন, পুরাণ পাণ্টে কঙ্কি একহাতে পেটোর মতো হাইড্রোজেন বোমা এবং অন্যহাতে পৃথ্বী ক্ষেপণাস্ত্র ধরে কনকর্ড বিমানে চেপে আবির্ত্ত হবেন। খান সাহেবের রাম সাজার আরো কাবণ আছে। একবাব রামনাম কবলে নাকি বেশ কয়েক কোটি ব্রহ্মহত্যাব পাপ স্ক্রলন হয়। গুহক

চণ্ডাল তিনবার রামনাম করে তাঁর সমস্ত কৃতকর্মের পাপ থেকে রেহাই পেয়েছিলেন। খান সাহেবও পাবেন। নাম ভূমিকায় অভিনয় কবার জন্য হয়ত বেশি রামনাম জপতে পারবেন না, কিন্তু নানা সাংস্কাৎকাবে ফিল্ম কলমচিদেব তো বলতে হবে—বাম ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী যুক্ত। আমি রাম চরিত্রে অভিনয় করতে পেবে....ইত্যাদি। এতেই হবে। তাহলেই তিনি হরিণ মারা, মানুয মারা, দ্বিতীয় সীতার (সোমি আলি) মায়ায় ডরা পার্টিতে মদ ঢেলে দেওয়া, তৃতীয় সীতাব (ঐশ্বর্য বাই) বাড়িতে চড়াও হওয়া এবং তার নব্য প্রেমিককে (বাবেক ওবেরয়) খুনের ছমকি দেওয়া—সব পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন।

এবার রোশন বাম। ছেলেটাব জন্য দুঃখ হয়। প্রথম ছবিতে ধনীরা দুলালী নায়িকার কাছে 'কহোনা প্যাব হ্যায়' আবেদন করতে কবতে দর্শকদের প্যারটাও আদায় কবে নিয়েছিলেন। কিন্তু, তারপর থেকেই বগ্ন অফিসেব 'ফিজা' খারাপ। কাঙ্ক্ষীবী মিশন ইম্পসিবল হয়ে দাঁডাল। মাঝে 'মুঝসে দোস্তি করোগি' বলে দর্শকদের 'ইয়াদে' আছেন কিনা সেটাই সন্দেহ। তবে কোণঠাসা হয়ে রোশন কুমার হঠাৎই দিব্যদৃষ্টি লাভ কবেছেন। বেশ বুঝতে পেরেছেন, ওসব বসিক নাগরগিবি আর চলবেক নাই। এখন রামভরসা হতে হবে। কারণ লাসুলবিহীন পবনন্দনে দেশ ছেয়ে গেছে। তাদের হাতেই সব ক্ষমতা। পৌবাণিক পবনন্দনের মতোই। আধুনিক পবনন্দনবা মন্দির-মসজিদ, কৃষ্টি-সংস্কৃতি সবকিছুতেই দাঁত ফুটিয়ে রামনাম খুঁজছে। পৌরাণিক পবনন্দন যেবকম খুঁজেছিল সীতাদত্ত হারে। ভয় হয়, কোনদিন হয়ত সংবিধানের Secular শব্দটাতেও দাঁত ফুটিয়ে রামনাম খুঁজবে বোশন-কুমাবের রাম সাজার কারণ বোঝা যাচ্ছে? গোটা সিনেমাতেই যদি রামনাম গুঁজে দেওয়া যায় তাহলে তো পবনন্দনরা উর্ধ্ববাহু হয়ে লাসুল-নৃত্য করবে। আর তিনিও দর্শকদের 'ইয়াদে' এসে যাবেন। প্রসঙ্গত, রোশন কুমাবেক একটা প্রশ্ন আছে। দুর্ধর্ষ হোমওয়ার্ককারী রোশন কুমার বাঙালির মন জয় কবার জন্য কলকাতায় দাঁড়িয়ে তাঁর ডাটাচর্চড়ি-প্রিয়তার কথা জানিয়েছিলেন। এবার নিশ্চয় তিনি চিকেন ছেড়ে পুরোডাশ আর গোধুমচূর্ণ ভক্ষণ কববেন। পিপাসা নিবারণেব জন্য স্ব-বিজ্ঞাপিত গোমাতা ভক্ষণকারী স্নেচ্ছ নির্মিত ঠাণ্ডা পানীয়ের বদলে সোমবস মাঙ্কী আর কপিথ তরু সেবন করবেন? এগুলো তো করতে হয়। বেন কিংসলে কবেছিলেন। গান্ধী চবিত্রে (বিচার্ড আটেনবাবোর গান্ধী) অভিনয়েব সময় তিনি নাকি শাকাহারী হয়ে গিয়েছিলেন।

— পঞ্চম কলমচি

পত্রপাঠের ৩য় বর্ষ পূর্তি বিষয়ক সম্মেলন

আপনাদের বহুৎ বহুৎ মেহেরবানি বে এখনো পর্যন্ত পত্রপাঠকে পিটিয়ে পত্রপাঠ বিদেয় না করে হাত গুটিয়ে বসে আছেন। সে যাই হোক, সামনের মাসেই, পত্রপাঠের ৩ বছর পূর্ণ হচ্ছে। এ দুঃসংবাদে, এ তাবৎ বেসব মহাপুরুষদের আমরা মনের সুখে গালমন্দ করে যাচ্ছি, তাঁরা নিশ্চয় আহ্লাদে আটখানা হবেন। পর বৎসরের জন্য প্রস্তুত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আপনাদের সহনশীলতার জন্য ধন্যবাদ।



মহিলা মহল

ফিস্‌ফিস্‌ বিভাগ

পরামর্শ দিচ্ছেন : প্রাণঘাতিনী দেবী

নিতান্ত বাধ্য হয়েই আমাদের মহিলা মহল ও পুরুষ মহল বিভাগকে ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যায় স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিতে হল। প্রাণঘাতিনী এবং উন্মাদনের কৌদলে দপ্তরের কাজকর্ম শিকয়ে উঠতে চলেছে। চুলোচুলি লেগেই আছে। তা ভিন্ন নিন্দুকে অন্য কথা কয়, এসব নাকি লোকদেখানো চণ্ড, তলে তলে বইছে অন্য রসের ধারা। তা সৈ যাই হোক, পত্রপাঠ দপ্তরে যেহেতু রাগ এবং অনুরাগ সমানভাবে নিষিদ্ধ, অতএব এখন থেকে এক মাসে প্রাণঘাতিনী দেবী মহিলা মহল সামলাবেন—উন্মাদন দলপতি ত্রিসীমানায় ঘেঁষবেন না; এবং পরের মাসে উন্মাদন তাঁর পুরুষ মহলে রাজত্ব করবেন— প্রাণঘাতিনী দপ্তরের ছায়াও মাড়াবেন না।

—সম্পাদক

□ অনেকের কাছেই শুনি, আপনি ডিভোর্সী। কিছু মনে করবেন না, আলাপ করতে পারি?

—বিহঙ্গ চ্যাটার্জী, কলকাতা-৫

○ ভুল জায়গায় লিখেছেন। ‘পত্রপাঠ’ নয়, ‘তথ্যকেদ্রে’ যোগাযোগ করুন। কুমারী, বিধবা, বিবাহ-বিচ্ছিন্না—সবকম পাণ্ডুর-হৃদিশ পাবেন।

□ আমি সম্প্রতি শাওড়ি হয়েছি। ছেলের বিয়ে দিয়েছি। কিন্তু বৌমা আমার খোকনকে এমন গিলে খেয়েছে যে খোকন আমাকে আর বিশেষ গুরুত্বই দিচ্ছে না। বিধবা মানুষ, বড় মনোবেদনায় আছি। কী করি বলুন তো? বড় একা হয়ে যাচ্ছি।

—সত্যবতী রায়, বর্ধমান

○ একা হবার দরকার নেই। স্মৃতিকে সঙ্গী করুন। সেই যে, যখন খোকনের বাবাকে আপনি আঁচলে বেঁধে রেখেছিলেন। এতেও না হলে সন্ধেবেলা হরিনামের আসরে যান, অনেক শাওড়ির জন্মায়ত হয় সেখানে। তাদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বউয়ের নিদ্রা করলে মন হাল্কা হবে।

□ একবার, শুধু একবারই তাকে দেখেছি; তাও স্বপ্নে। কিন্তু স্বপ্নেই সে আমার হৃদয়ের সবটুকু হরণ করে নিয়েছে। তারপর থেকে পথে-ঘাটে সর্বত্র তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। কোথাও সে নেই। প্রাণঘাতিনীদি, আমি কোথায় পাব তারে?

—রিমলি সাহা, কলকাতা-৯

○ কেন, স্বপ্নে। আবার স্বপ্ন দেখতে কেউ বারণ করেছে তোমায়?

□ আমি সুন্দরী। প্রশংসনীয় চেহারা। কিন্তু রবীন্দ্র সঙ্গীত শিখি বলে কলেজের বন্ধুরা আমাকে খুব তাচ্ছিল্য করে, গুদের মতো এসব ছেড়ে আমাব নাকি বাংলা ব্যান্ড শেখা উচিত, এতে আমার গ্ল্যামার বাড়বে। আপনি কি বলেন? ব্যাপারটা খুব ভাবাচ্ছে আমাকে।

—সালি সেনগুপ্ত, দমদম

○ তারপর লিভ টুগেদার করলে আরো গ্ল্যামার বাড়বে। তারপর ফিল্মে নামলে, স্বল্পবাস শরীরী নাচ নাচলে এবং নাচালে...ঠিক কতটা গ্ল্যামার চাই তোমার?

□ বিয়ের পদ্ধতি এক এক সম্প্রদায়ে দেখি এক এক রকম। আমি উচ্চশিক্ষিতা উদারমনা, কোনো সাম্প্রদায়িক বিষয় আমার মধ্যে নেই।

এদিকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়ে দেখেছি সবগুলোই আমাব ভালো লাগে। নিজের বিয়ে অনুষ্ঠান কোন সম্প্রদায়ের মতো করব, একটু সাজেস্ট করবেন?

—সঞ্জিতা হালদার, মেদিনীপুর

○ যুব সম্প্রদায়ের মতো কবাই ভালো, বিশেষত তোমার যে বর হবে সে যেহেতু যুব সম্প্রদায়ভূক্ত।

□ বিয়ের পরে স্বামীর সঙ্গে এক শয্যা শয়নকে বলে ফুলশয্যা। বিয়ের আগে শয়ন করলে কি বলে?

—তৃণা দাস, হাওড়া

○ Fool শয্যা।

□ পাশের বাড়ির বন্ধাকে মনে মনে আমিও ভালোবাসি। কিন্তু রোজ রাতে আমার শোবার ঘরের জানালায় এসে ও হাতমুখ নেড়ে কীসব বোঝাতে চায়। বোজ রোজ জানালায় ওর এই বাদরামো আমার সহ্য হয় না। কী করে ওকে নিরস্ত করি বলুন তো?

—তিমি লাহিড়ী, কুচবিহার

○ জানালার পাশে গাছ নেই? না থাকলে বৃক্ষরোপণ করো। গাছে উঠে বাদরামো করলে ভালো লাগবে নিশ্চয়।

□ শেষ পর্যন্ত আমার বব ডিভোর্সে বাজি হয়েছে। খুব ভালো লাগছে। আচ্ছা, আমার বয়স্কেন্ডকে কি আমাদের বিবাহ বিচ্ছেদের দিন ইনভাইট করব?

—মধুরিমা লায়েক, কলকাতা - ২৭

○ নিশ্চয়। আপনাব সঙ্গে ভবিষ্যতে ডিভোর্সের সময় এই অভিজ্ঞতা তারও কাজে লাগবে। তখন কিন্তু সেই সময়ের বয়স্কেন্ডকেও হাজির থাকতে বলবেন, নতুন কবে পরামর্শ চাওয়ার দরকার নেই।

□ একজন বিবাহিত পুরুষের প্রেমে পড়েছি বলে সবাই এমন করছে, যেন পৃথিবীটাই পুড়ে ছাই হতে চলেছে। আপনাবও কি তাই মত?

—মলি গুপ্ত, সোদপুর, উঃ ২৪ পরগণা

○ না না, তা কেন, তার সংসার আর তোমার ভবিষ্যৎ—এ দুটো ছাড়া আর কিছুই পোড়ার সজাবনা নেই।

আমাদের ফ্যালনার যখন মানি ছিল তখন মিঠুর কাছে ফ্যালনা আমাদের ফ্যালনা ছিল না। এখন ফ্যালনা নামেও ফ্যালনা কামেও ফ্যালনা। মিঠু এখন আর একটা নতুন প্রেমিক জুটিয়েছে

ডাবিন্দর সং-গীত

স্বামী কমলানন্দ অবধূত



ববি ঠাকুর তাঁর সুন্দর গানগুলি লিখে রেখে মারা যান, ওগুলোর প্যারডি করে যাবার সুযোগ পাননি। দাদুর সেই না-করা কাজের দায়িত্ব আজ আমাদের, মানে তাঁর নতিপুতিদের ঘাড়ে। অস্তুত আমাদের এই প্রেমময় বাংলার প্রেমিক-প্রেমিকাদের কিছুটা হেল্প করার জন্যে প্যাবডিং প্যারাসুট তাদেব হাতে হাতে ধবিয়ে দেওয়া কর্তব্য, যাতে করে প্রেম-যমুনায় ঝাঁপ দিলেও হাড়গোড় আত্ম থাকে। দাদু লিখেছিল, 'দাঁড়ি—আচ্ছ তুমি আমার গানের ওপারে'। এই 'তুমি' কিন্তু ভিক্টোরিয়ার 'তুমি' নয়, এ হল গিয়ে-পবম শক্তিমান আনন্দরূপ তুমি। এইসব পরম-টরম এখন দশ পয়সা কুড়ি পয়সা হয়ে গেছে, এখন চরম-গরম-এর যুগ। সুতরাং এই গানটিকে বর্তমান প্রেমিক সম্প্রদায়ের ব্যবহারোপযোগী করে নেওয়া হচ্ছে। শুক করুন—মা মা গা ধা এক দুই তিন—

দাঁড়িয়ে আচ্ছ তুমি তোমার জানলার ওধারে।
তোমার নাইটিচাকা চরণ, আমি-চাই আড়ে আড়ে ॥
তোমায় দেখে পড়িমরি, আর কত বা ধৈর্য ধরি,
এসো রাস্তা পার হয়ে এই পার্কের মাঝারে ॥

তোমার চোটে রঙের খেলা বুকের ভেলাতে;
কত ছেলে ভিন্নমি খেল ম্যাটিনি শো-তে।
কবে আমার পাশে আসি বসিবে গো গায়ে ঘেঁষি'
ভিক্টোরিয়ার কোণের ঝোপের নিবিড় ভ্রূধারে ॥

পাঠক, লক্ষ্য করুন, নাইটি-রাণীর প্রতি প্রেমিকের আঁকুপাঁকু কেমন টুসটুসে কোম্পার মতো ফুটে উঠেছে। ভাষা-শৈলীর এই হিমশৈলে ধাক্কা খেয়ে একেঁড় ওকোঁড় হবে না এমন নারী-টাইটানিক আছে কোথায়?

এবার আসুন ঐ গানটায়—ওই যে 'জীবনে যত পূজা হল না সাবা/জানি হে জানি তাও হয়নি হারা'। 'রবিদাসু কি জানতেন, গানটার বাইবের পোশাকের আড়ালে নারী সম্পর্কে কী সাংঘাতিক হাড়গোড় সব লোকনো রয়েছে? সেই হাড়গোড় টেনে বের করে এনেছি আজ আপনাদের উপহাস দেব বলে। সুর দিন— রে রে গা ধা এক দুই তিন—

জীবনে যত মেয়ে হল না ধরা
জানি হে জানি তারা পায়নি ছাড়া
ঐ বেগী না লুটিতে ধরেছে ধরণী দে

যে খেঁদি গ্রে স্ট্রিটে দিল নথনাড়া
জানি হে জানি সেও পায়নি ছাড়া।।

ফ্রকপরা আজো যারা রয়েছে পিছে
জানি হে সেখানেও লাইন লাগিছে
আমার অনাগতা জিন্স পরিহিতা
হোটলে বারে-বারে নাচিছে যারা
জানি হে জানি তারা পায়নি ছাড়া।।

প্রেমিকারা রাগ করলে? রাগ হবারই কথা। খুবই ইনসান্টিং। ঠিক আছে,
এবার প্রেমিকদের বকে দিচ্ছি। দাদুর ঐ যে 'আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু' গানটা
আছে না—ঐ সুবে বকে দিচ্ছি। জানি না বুঝি, ছেলেগুলো কেমন হ্যাংলার
মতো তোমাদের পেছনে লাগে। প্রাণ খুলে সুর দাও—ধা ধা গা ধা এক দুই
তিন—

আছে বন্ধু, আছে সন্ত, প্রেমিক-সকল আগে।
তবুও কান্দি, তবু সুকান্ত আমার পেছনে লাগে।।
তবু হারাণ চিন্তা'রা চোখ টিপে হাসে তারা
বসন্ত নিকুঞ্জদা'রা থাকে তাকে তাকে।।
সুশাস্ত পিছনে ধায়, আনন্দ জোটে
প্রসূন ইশারা করে, ইঙ্গিত চোটে।
নাহি ভয়, নাহি ক্রেশ, প্রেমিকেব নাহি শেষ
এই ভিড়াকার প্রেম মিঠে মিঠে লাগে।।

মিঠে-মিঠে লাগারই কথা নিজের পপুলারিটি দেখতে কাব না ভালো
লাগে? আর মিঠে লাগে প্রেমিকের মানিব্যাগ—অন্তত মিঠুর লাগত।
আমাদের ফ্যাশনার যখন মানি ছিল তখন মিঠুর কাছে ফ্যাশনা আমাদের
ফ্যাশনা ছিল না। এখন ফ্যাশনা নামেও ফ্যাশনা কামেও ফ্যাশনা। মিঠু এখন
আর একটা নতুন প্রেমিক জুটিয়েছে, তার সঙ্গেই সিনেমায় রেস্টুরেন্টে যায়
আর ফ্যাশনা আমাদের ফ্যাশ-ফ্যাশ করে চেয়ে থাকে। তবে সাব্বনা এই যে,
এ লাইনে ফ্যাশনা আমাদের একা নয়—আরো যে সব ফ্যাশনারা আছ
তারাও গলা মেলাও। দীর্ঘশ্বাস বেরোচ্ছে শুধু? ঠিক আছে, ফৌসফৌস করতে
করতেই হয়ে যাক— 'এই করেছ ভালো মিঠুর' গানের সুরে। শুরু করুন—
গা ধা গা ধা এক দুই তিন—

এই করেছ ভালো মিঠু, এই করেছ ভালো
এমনি করে হৃদয়ে মোর তীব্র দহন জ্বালো।।
আমার দিকে না তাকালে ঐ ছেলেটার সঙ্গে গেলে
সিনেমাতে ট্রিপ মাঝিবে, সেই হল আজ ভালো।।
যখন থাকে পরিপূর্ণ মানিব্যাগ আমার
তখনি পাই পরশ তব তোমার দেহভারে।
অন্ধকারে হলের মাঝে এতক্ষণে তাহার কাছে,
দিচ্ছ তারে দু'চোঁট ভবে, আমার ভাগ্য কালো।।

আজ তবে এইটুকু থাক, বাকি কথা পরে হবে কি হবে না তা যার পাঁঠা
সেই সম্পাদক মশাই ঠিক কববেন।



হেঁসেল



আজগালগার বৌগার মুকি উচবে কি না বোলতি পারবুনি। এসব আন্না গেরামের বৌগার বাচ্চা হোলি শাউড়িরা খেতি দিতো, শউরে বৌগার মুকিও উচতি পারে।

পোদিপিসির পঞ্চ ব্যামোন

পোদিপিসি কথিত

এঁদে খাওয়াতি পারবুনি। চোকি সেখতি পাইনে। মুকি মুকি বোলতিচি। নিকে নিতি পারো।

শোন্ডায় বালোস-পোয়াতিগার জনি কটা ব্যামোন বেইনে সেখতি পারো। আজগালগার বৌগার মুকি উচবে কি না বোলতি পারবুনি। এসব আন্না গেরামের বৌগার বাচ্চা হোলি শাউড়িরা খেতি দিতো, শউরে বৌগার মুকিও উচতি পারে। পেখমে বলি—

বিউলি ডালের বড়ির অসা

খেলি আর তুলতি পারবে নে। দু-তিন জনের জনি আঁধতি নাগবে—হাতে-গড়া মোশলা-দেওয়া ৮/১০ খান বড়ি (বিউলি ডালের তৈরি)। দু-তিনডে কাঁচা নংকা। এঁখেন সরবে, আদাবাটা। নুন, ৩ চামচ সর্বে তেল। সর্বে তেলি বড়ি অল্প ভেজে নিলি, হলুদ-নুন-নংকা-সরবে-আদা বাটা এঁটু জলের সাথে মিঁশে পাঁচটা মিনিট ফুটলিই হয়ে গেল বিউলিডালির বড়ির অসা।

পটোল-সরবে

৭/৮ টা বড় বড় বাচাই করা পটোল বাঁট সে পা ছাইড়ে সাদা করে ফেলি আন্ডো পটলের দুটো মুক কেটে কেটে চিরি দিতি হোবা। তারপর ২/৩ ডে কাঁচা নংকা, আদা, সরবে বেটে আক্তি হবে। এরপর ৪পলা সর্বে তেল কড়ায় সে আন্ডো পটোল এঁটু ভেজি নে ছেড়ে দাও বাটা মশলা। গছ বেকলি নুন-জল আর এঁটু চিনি সে পাঁচটা মিনিট ফুটলিই পটোল-সরবে।

নারকোল পোস্ত

একমালা নারকোল কুরে নে, ২ চামচ সরবে ৩ চামচ পোস্ত আদা ও ৩/৪ টে কাঁচা নংকা সে মোলেম করে বাঁচতি হবে। তারপর এঁটু নুন ও

তেল সে মেকিয়ে কড়ায় ১ মিনিট নেড়ে নিলি হয়ে গেল নারকোল পোস্ত। এরপর ভাতের সঙ্গে মেইকে খেলি ওজ খেতি ইচ্ছে হবে।

দুধ-ঝিঙে

এটা ভাত সে খেলি শরীলডা একেবারে শীতল হয়ে যাবে।

৪/৫টা ঝিঙের খোসা ছেড়িয়ে নে গোল গোল টুকরো করে কাটতি হবে। তারপর কড়াটায় দু-চামচ সর্বেতেল দে, একচামচ আন্ডো সরবে ছেড়ে সাত্তে সাত্তে ঝিঙের টুকরো ছাড়তি হবে। এঁটু কবে নে নুন-চিনি-অল্প সে জল ঢেলে দ্যাও। ঝিঙে সেদ্ধ হয়ে এলিই এক কাপ দুধ ঢেলে দে—এঁটু ফুইটে নামালিই দুধ-ঝিঙে। এটা ঠাণ্ডা করে তারপর খেতি হব। পরাগতা জুইড়ে যাবে।

চাঁদা-পুটির অম্বল

ছোট ছোট পুটি ও চাঁদা মাচ ২০০ গেরাম। পাকা তেঁতুল—দানা বের করে নেওয়া, সরবে—অল্প আর এক পলাটাক সর্বেতেল নাগবে।

সরবের তেলি (২পলা) মাছ কটা ভেজি নে, সরবে ফোড়ন দে, এক চিমটে হলুদ ও নুন সে জল ঢেলে দিতি হবে। ফুটে উঠলি তেঁতুল জলে শুলে নে ছেড়ে দিতি হবে কড়ায়। মাছওনো সেদ্ধ হলি নেইমে নে পাতে পাতে, মানে শেষ পাতে দিলি—একেবারে টেকুর তুলতি তুলতি বাড়ি যাবে সব ফুঁক-সাক্তে।

আজ আর বোলতি পারবুনি। এতওনো বোলতি বোলতি হাঁপ ধরে গেচে।

অনুলেখন : পরাণের মা

ঝেড়ে কাপড় পরিয়ে দিন আর নিয়ে যান দুর্দান্ত পুরস্কার

পত্রপাঠ কেমন লাগছে? নির্ভয়ে লিখুন। ভালো লাগলে চুলকে দিন পিঠ। খারাপ লাগলে পিঠ খুঁচিয়ে ছড়িয়ে দিন নুন আর লঙ্কা। সেরা পত্রদাতার জন্যে সেরা পুরস্কার।

পত্রপাঠের একজন হয়ে যান আর সারা বছর পত্রপাঠ পেতে থাকুন বিনি পয়সায়

পত্রপাঠ পরিবারের একজন হয়ে যান—পত্রপাঠ-কে ভালোবেসে আপনার গ্রাহক-সময়সীমার মধ্যে কমপক্ষে ১০ জনকে গ্রাহক করান, আর পরবর্তী বছরে আপনার গ্রাহক-চাঁদার কোনোরকম নবীকরণ ছাড়াই, সম্পূর্ণ বিনা পয়সায় পেতে থাকুন, পড়তে থাকুন, উপভোগ করতে থাকুন—পত্রপাঠ

পত্রপাঠ-এর আজীবন সদস্য হোন এবং পত্রপাঠের মতো মর্যাদাপূর্ণ ঐতিহাসিক পত্রিকার গৌরব ও মালিকানার অংশীদার হোন

মাত্র ৫০০০ টাকায়। সারাজীবন পত্রপাঠ পেতে থাকুন। তৎসহ সার্বিক বিনিয়োগের ওপর আপনার প্রদত্ত অর্থের আনুপাতিক মালিক হোন।

চমক : লোকসানের কোনো দায়িত্ব আপনাকে নিতে হবে না।

ধমক : সম্পাদনায় আপনার পরামর্শ গ্রহণযোগ্য হলেও খবরদারি একেবারেই চলবে না। আপনার কিংবা আপনার উমেদারিত্বে কোনো লেখা সম্পাদকের অমনোনীত হলেই— ফুস!!

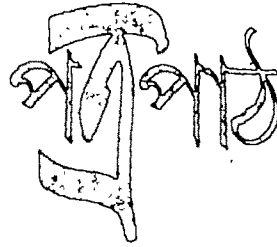
শানিবারের ডিডি

অচলপত্র

সাঁড়ি ভারত

এয়া কেউ আর নেই

আছে শুধু এদের একমাত্র উত্তরসূরী
সাদাকে সাদা ও কালোকে কালো বলার একমাত্র সহৃদয় মাসিক পত্র



কাউকে হাসানোর কাগজ কাউকে ফাঁসানোর কাগজ

১০ জে ফার্গ রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৯

ফোন: ২৪৪০ ৩৮০৩

৯৮৩০০৫২১৮২

সমসাময়িক সাদা ও কালোকে কালো বলার একমাত্র সহয মাসিকপত্র

জুলাই ২০০৩

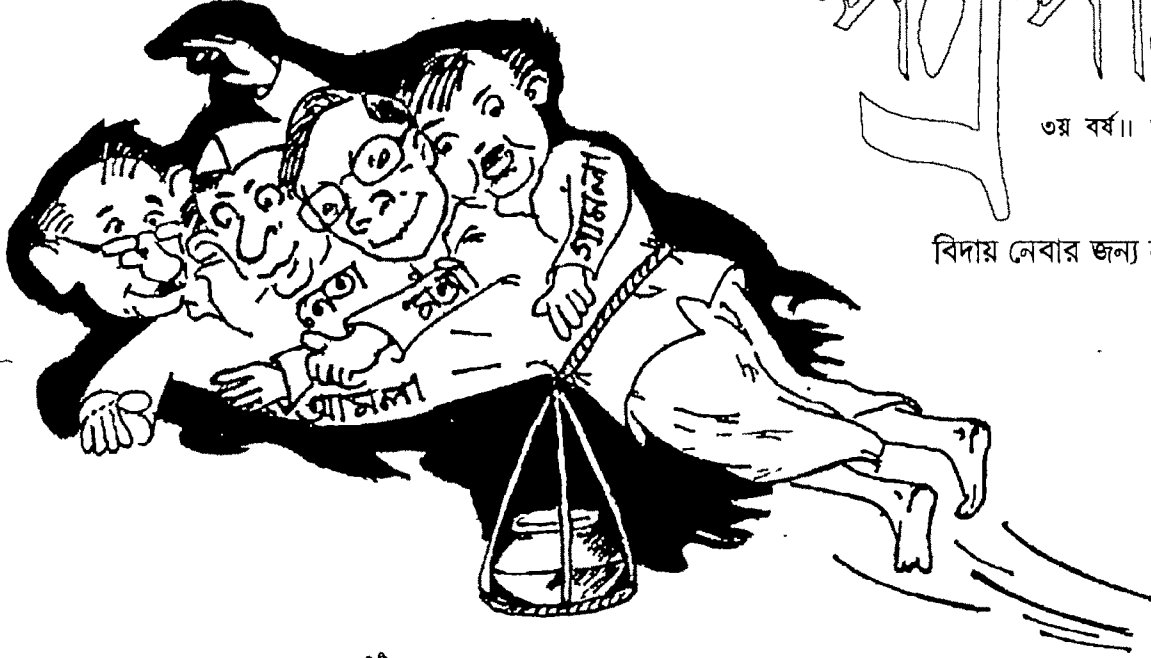
দাম : ৮ টাকা

তৃতীয় বর্ষ পূর্তি সংখ্যা

সদ্য

৩য় বর্ষ ১২শ সংখ্যা

বিদায় নেবার জন্য নয়



গউকে হাসানোর কাগজ
গউকে ফাঁসানোর কাগজ

নেপায় মারে দে

ঝেড়ে কাপড় পরিয়ে দিন আর নিয়ে যান দুর্দান্ত পুরস্কার

পত্রপাঠ কেমন লাগছে? নির্ভয়ে লিখুন। ভালো লাগলে চুলকে দিন পিঠ। খারাপ লাগলে পিঠ খুঁচিয়ে ছড়িয়ে দিন নুন আর লঙ্কা। সেরা পত্রদাতার জন্যে সেরা পুরস্কার।

পত্রপাঠের একজন হয়ে যান আর সারা বছর পত্রপাঠ পেতে থাকুন বিনি পয়সায়

পত্রপাঠ পরিবারের একজন হয়ে যান—পত্রপাঠ-কে ভালোবেসে আপনার গ্রাহক-সময়সীমার মধ্যে কমপক্ষে ১০ জনকে গ্রাহক করান, আর পরবর্তী বছরে আপনার গ্রাহক-চাঁদার কোনোরকম নবীকরণ ছাড়াই, সম্পূর্ণ বিনা পয়সায় পেতে থাকুন, পড়তে থাকুন, উপভোগ করতে থাকুন—পত্রপাঠ

পত্রপাঠ-এর আজীবন সদস্য হোন এবং পত্রপাঠের মতো মর্যাদাপূর্ণ ঐতিহাসিক পত্রিকার গৌরব ও মালিকানার অংশীদার হোন

মাত্র ৫০০০ টাকায়। সারাজীবন পত্রপাঠ পেতে থাকুন। তৎসহ সার্বিক বিনিয়োগের ওপর আপনার প্রদত্ত অর্থের আনুপাতিক মালিক হোন।

চমক : লোকসানের কোনো দায়িত্ব আপনাকে নিতে হবে না।

ধমক: সম্পাদনায় আপনার পরামর্শ গ্রহণযোগ্য হলেও খবরদারি একেবারেই চলবে না। আপনার কিংবা আপনার উমেদারিত্বে কোনো লেখা সম্পাদকের অমনোনীত হলেই—ফুস!!

সাদাকে সাদা ও কালোকে কালো বলার একমাত্র সহর্ষ নাসিকপত্র

কাউকে হাসানোর কাগজ
কাউকে ফাঁসানোর কাগজ

জুলাই ২০০৩

দাম : ৮ টাকা

পত্রপাঠ

৩য় বর্ষ ॥ ১২শ সংখ্যা

বিদায় নেবার জন্য নয়

তৃতীয় বর্ষ পূর্তি সংখ্যা

সম্পাদকীয় □ ৫

পুরনো কাসুন্দি : বাঙ্গালী চরিত্র • যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু—বঙ্গবাসী পত্রিকা থেকে □ ৮

প্রচ্ছদ নিবন্ধ : নেপো-চরিত্র-মানস • ফজল আলি □ ২৬ আসুন নেপোদের পৌ ধরি • রামমূর্খ □ ২৯

অম্লানবদন মাসল • চরণ বৈরাগী □ ৪৩

নিয়মিত কলাম : অকপটে—দেওয়ালটা একটু সরান • সমরেশ মজুমদার □ ১১ তারাপদ রায় ও গঙ্গারাম • তারাপদ রায় □ ১৩ টাকা

নিষ্প্রয়োজন—বাঙালির বিশ্বায়ন • বুনো রামনাথ □ ২২

রসকাব্য : অ-কাব্যিক • উদয় বন্দ্যোপাধ্যায় □ ৪২

গল্প : ফিমেল ক্লাব • ওম্বিকা গুপ্তো □ ১৪ প্রতীক্ষা • চুনীলাল মুখোপাধ্যায় □ ২৪ রমার চিঠি • দিব্যেন্দু দাস □ ৪৬

থারাবাহিক রলোপন্যাস : মারায়ণ • পিনাকীশঙ্কর চৌধুরী □ ১৯

অন্যান্য : স্ত্রী একটি লিঙ্গ • দিব্যলোচন কলমধারী □ ১৬ মালামাল • দিব্যেন্দু দাস □ ২৩ আধুনিকি-আধুন্যাকা • অহিভান হো হো □

২৮ বিশ্বকাপে ম(ন)দিরার ফেনা • অরুণোদয় ভট্টাচার্য □ ৩২ সাক্ষীগোপাল • দেবপ্রসাদ কুমার □ ৩৯ চিরকালের কৌতুক • কাকলি

চৌধুরী □ ৪০ সুধীর মুকুন্দের দাদাগিরি • অমিতাভ সান্যাল □ ৪১ গবেষক দুঃসংবাদ • পঞ্চম কলামটি □ ৪৭ ফিরে দেখা • পিনাকী

ভাদুড়ী □ ৫০

নিয়মিত বিভাগ : পত্রপাঠ জবাব □ ৬ রাশি চক্কোর □ ৭ দূরদর্শন দুঃসমাচার □ ১৭ ট্যারা চোখে □ ২২ সিনেমা দুঃসংবাদ □ ২৭

রাশি চক্কোর □ ৭ পুরুষ মহল □ ৩৪ সাহিত্য দুঃসংবাদ □ ৩৫ ছাইপাঁশ □ ৩৬ জ্বর খবর □ ৩৭ খবর চড়াপাড় □ ৩৮

হেঁসেল □ ৪৯

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী • তারাপদ রায়

• সমরেশ মজুমদার • শঙ্করলাল ভট্টাচার্য

সম্পাদক : শেখর আহমেদ

পরিচালন সমিতি : ডাঃ তুষারকান্তি রায় • প্রদ্যোত কুমার মিত্র •

বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী • অঞ্জনা দত্ত • ডাঃ শুভাশিস নিয়োগী

• শচীন মিত্র

প্রচ্ছদ : সন্দীপ দেবনাথ

অলঙ্করণ : সন্দীপ দেবনাথ • পলাশ রায়

শেখর আহমেদ কর্তৃক ১০ জে, ফার্ম রোড (গ্রাউন্ড ফ্লোর), কলি-১৯ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন ২৪৪০-৩৮০৩, ৯৮৩০০-৫২১৮২।
বর্ণ ও চিত্র বিন্যাস : পত্রপাঠ, ১০ বি, ফার্ম রোড, কলি-১৯, প্রচ্ছদ মুদ্রণ : অঞ্জন ভৌমিক, গ্রাহিক, ১এ কলেজ রো, কলি-৯, অঙ্গ মুদ্রণ : শান্তি মুদ্রণ,
৩২/৩ পটুয়াটোলা লেন, কলি-৯। কার্যালয় : ১০ বি, ফার্ম রোড, কলি-১৯।

পত্রপাঠ ৩য় বর্ষ পূর্তি বিষয়ক
ফুটি প্রকাশ



কার্টুন : সন্দীপ দেবনাথ

সন্দীপ



সম্পাদকীয়

দৈ-বেচা নেপো

পত্রপাঠ নয় নয় করিয়া তিন বৎসর পূর্ণ করিল। ইতিমধ্যে কত নামগোত্রহীন শিল্পী-নেপো, লেখক-নেপো—যাঁহাদের ‘সিদ্ধ’-কে ঘষিয়া ঘষিয়া ‘শিল্প’ এবং ‘লেখা’কে মাজিয়া মাজিয়া ‘লেখা’য় পরিণত করা হইয়াছে, তাঁহারা পত্রপাঠ বিদায় গ্রহণ পূর্বক পত্রপাঠ-পৈতা প্রদর্শন করতঃই করিয়া চরিয়া খাইতেছেন। তা খাউন। খাইলে তত ভয় নহে, যত ভয় দৈ বেচিলে। সে দৈ হজম করে, বাঙালির পরিপাক যন্ত্র এত প্রবল নহে। ইদানীং এক কাগজ-বেণ্ডসায়ী নেপো, যাঁহার কাগজ নাকিসর্বাধিক পচারিত, তিনিও কাগজে ব্যঙ্গরস আমদানির উদ্দেশ্যে ভাঁড়ামো পরিবেশন শুরু করিয়াছেন। তাঁর মালিকানাধীন সাহিত্যপত্র, কিশোরপত্র—প্রায় সবগুলির সম্পাদক হইয়া বসা এই নেপো অকস্মাৎ বাংলা সাহিত্য-বিশারদ হইয়া উঠিয়াছেন এবং মস্তব্য করিয়াছেন যে রবীন্দ্রনাথ কিঞ্চিৎ কম লিখিলেই ভালো করিতেন। ইনি সম্ভবত অকস্মাৎ রবীন্দ্রকলার নাম শুনিয়া সেই গল্পের মারোয়াড়ির ন্যায় একটি কলা খাইয়া ফেলিয়াছেন—রবীন্দ্র কলা। ফলত বদহজম এবং বক্তৃতারূপ চোঁয়া টেকুর। তাঁর পোষা সাহিত্যিক দল সারা বৎসর ধরিয়া যে জঞ্জাল প্রসব করিতেছেন তাহাতেই প্রাণ ওষ্ঠাগত; ইহার পর তিনিও যদি উপযুক্ত রবীন্দ্রনাথ হইবার মানসে কলম ধরেন এবং সে দৈ লইয়া হাটে হাজির হন তবে পলাইবার জন্য পাঠককে রামভক্তের উল্লম্ফন অভ্যাস করিতেই হইবে। বিধাতা তাঁহাকে সুমতি দান করুন।

পত্রপাঠ জবাব

জবাব দিচ্ছেন : দ্বিতীয় সুগ্রীব



● আমাদের সঙ্গে এম. এ পড়তেন এক শেখর আহমেদ। কবিতা-টবিতা লিখতেন। তিনিই কি পত্রপাঠের সম্পাদক?

—আফতাব হোসেন, পাইকর, বীরভূম

□ এম. এ পড়তেন? হাসালেন মশাই। পত্রপাঠ-সম্পাদকের পদটি একশো ভাগ গণমুখের জন্যে সংরক্ষিত, সেটাও জানেন না?

● আমি বেশ কিছু কৌতুক লিখে পাঠিয়েছি, সেগুলো আর কবে ছাপবেন? আমি যমের বাড়ি গেলে? —কাকলি চৌধুরী, সজোবপুর

□ সেখান থেকেও চিঠি লিখবেন।।

● বাংলা সিনেমার দুর্দশা ঘোচার দিন কি আর আসবে না? খালি হিন্দি সিনেমার নকল তিসুম্ তিসুম্ দিয়ে কি বাংলা সিনেমা বাঁচে?

—গোপাল ঝাঁড়া, আলমবাজার, কলকাতা-৩৫

□ আর তিসুম্ তিসুম্ নয়, এবার থেকে বাংলা সিনেমা চলবে বৌদ্ধ মতে। টলিউডকে ঢেলে সাজাতে স্বয়ং বুদ্ধ অবতীর্ণ হয়েছেন।

● ফ্রেস্কাট দাড়ি দেখলেই আমার ছাগলদাড়ির কথা মনে পড়ে। ফ্রেস্কাটগুলো পুরুষদের আমি দু-চক্ষে দেখতে পারি না। ওরা এমন দাড়ি

কেন রাখে?

—উর্মিলা ঘোষ, কলকাতা-৩৪

□ বচন যদি আপনাকে প্রেম নিবেদন করে, এমন বচন ঝাড়তে পারবেন?

● আপনার সম্পাদনার প্রশংসা করি।

—মাণিকচন্দ্র দাস, বাসুদেবপুর, বর্ধমান

□ আমাদের সম্পাদক অন্ধ, কালা এবং বোবা। সম্ভবত সে কারণেই তিনি এমন সম্পাদনা করছেন যা আপনাকে মোহিত করেছে।

● ‘কমিউনিস্ট’-এর অর্থ কি? কমিনিষ্ট? মানে—যত পারিস কামিয়ে নিস?

—নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা-৮৪

□ না, কমিনিষ্ট। মানে, এমন অলুক্ষণে কথা বলার অভ্যেস যত পারিস ‘কমিয়ে নিস’।

● বিধায়ক না সাংসদ—কোনটা হওয়া ভালো?

—অনুপ বর্মণ, পুষ্করিয়া

□ আখের গোছানোর জন্যে না বস্ত্রিং লড়ার জন্যে?



শিক্ষক নেপো রাশি : আপনার শুভ যোগ। উত্তরপত্র অনুযায়ী ছাত্রকে খরব দিয়ে ডেকে বিলম্ব দূ'পয়সা আমদানি হবে। তবে সবচেয়ে ভালো হবে যখন না জেনে কোনো গোয়েন্দা অফিসারের ছেলেকে ডেকে পাঠাবেন। জেলে বসে শুধু অমের পয়সা বাঁচবে তা-ই নয় কয়েদীদের 'রাইটারবাবু' হয়ে দু-পয়সা রোজগারের ব্যবস্থাও হবে।

প্রকাশক নেপো রাশি : যে সব প্রকাশকরা টাকা নিয়ে কবিতার বই ছাপেন—এ মাসে তাঁদের ভাগ্যের মিশ্রফল লক্ষ্য করা যায়। সুন্দরী আধুনিক কবির মোহে নিশ্চরচায় কবিতার বই ছেপে সঞ্চয় হ্রাসের সম্ভাবনা থাকলেও আপনার ব্যবসা-রহস্য ধরা পড়ে যাওয়ায় এক ক্যারাক্ট-কবির হাতের এবং পায়ের স্পর্শে আপনার অভিজ্ঞতার সঞ্চয় বৃদ্ধি পাবে। এমনকি এই দুর্লভ অভিজ্ঞতা আপনাকেও কবিতা লিখতে প্ররোচিত করতে পারে; যার প্রথম লাইন হবে—ক্রস লি-ই কবি, যদি জ্ঞানতাম পূর্বে/তার বই কক্ষনো ছাপতাম—দূর বে।

মন্ত্রী নেপো রাশি : ভূমি কিংবা হাওলা, একটা কিছু মওকা এ মাসেই জুটে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। বিরোধীদের ঘুরি খেয়ে কুর্সি একটু নড়বড় করলেও থিতু হয়েই থাকবেন। কানে কাপাসতুলো ধারণে ব্রাডথেসার স্বাভাবিক থাকবে।

জীবক নেপো রাশি : দাদাদের ধুতির খুঁট কিংবা জামার কোণ ধরে সর্বদা তোষণকারী চামচাদের পক্ষে মাস্টা খুব সুবিধের নয়। কয়েকজন নতুন উমেদার জুটে এমন তেল মাখাতে শুরু করবে যে তার ধারায় আপনারই হৃদকে যাওয়ার দশা হবে। তবে কবি-চামচাদের এক-আখটি কবিতা ছাপা হতে পারে। সে কবিতা পড়ার পরই পাঠকরা কবিকে মালা পরানোর জন্যে খুঁজে বেড়াবে, অবশ্য ফুলের নয়, জুতোর।

প্রমোটার নেপো রাশি : নতুন মার্শিটোমিড শুরু করার পক্ষে শুভ। তবে যে বাড়িটি ভেঙে কাজ শুরু করবেন সেখানে ভৌতিক উপলব্ধির সম্ভাবনা। কর্পোরেশন ভূত এবং তোলাবাজ মাস্তান ভূতের ঠাণ্ডায় ভিত পাড়তে গিয়ে নিজেই ভিতের তলায় তলিয়ে যেতে পারেন। প্রতিকার স্বরূপ স্থানীয় বিধায়ক বা পুরসিতার কোনো ভাষ্যকে জলের দরে একটি ফ্ল্যাট দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলে ভূতের হাত থেকে রক্ষা পাবেন।

আর্টিস্ট নেপো রাশি : বাংলা ব্যান্ডের মতো বাংলা আর্ট চালু করতে পারেন। অর্থাৎ ইংরেজি-বাংলার পিচুড়ি। যেমন ধরুন—আটপৌরে ফুলকাটা ব্রাউজ আর জীনস পরা ম্যাডোনা। কিংবা ঘাঘরা আর টী-শার্ট পরা সীতা। অবশ্য পুরনো পছন্দ আপনাকে চিতায় পাঠানোর বন্দোবস্ত করতে পারে। কিন্তু জানেন তো—নো রিস্ক—নো গেন।

বিশেষ অনুসন্ধান জানিলাম, বিজ্ঞাপিত চাকরিগুলি অনেক সময় খালি
হয় বটে, কিন্তু বিজ্ঞাপন দিবার পূর্বেই লোক বহাল হইয়া যায়।

পুরনো কাগাসুন্দি

“বঙ্গবাসী” ১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩১১ সংখ্যা থেকে

বাঙালী-চরিত

যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু

“বাঙ্গালী-চরিতে”র এই নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইল। গ্রন্থকার স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয় তাঁহার প্রতিষ্ঠিত “বঙ্গবাসী”তে বাঙ্গালী-চরিত্রের এক একটি চিত্র ক্রমশঃ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সে চিত্র তুলি দিয়া আঁকা নয়; ভাষায় অঙ্কিত। এইরূপ বাঙ্গালী-চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া তিনি “বঙ্গবাসী”তে তেতাল্লিশটি প্রবন্ধ লেখেন। সেই তেতাল্লিশটি প্রবন্ধ তিনভাগে বিভক্ত করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। সেই পুস্তকের নাম “বাঙ্গালী-চরিত”। এই পুস্তক ক্রমে ক্রমে তিন খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার পর তাঁহার জী-দর্শন “বাঙ্গালী-চরিতে”র শেষ মুদ্রণের সময় তিনি তিনভাগ এক করিয়া, প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ইহা অল্প দিনের মধ্যে নিঃশেষিত হয়। পাঠকগণের আগ্রহাতিশয্যে পুনরায় সেই তিনভাগ একত্র প্রকাশিত হইল। এখন এই “বাঙ্গালী-চরিতে”র পুনঃ প্রচারে গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সাধিত হইলে প্রচার সফল জ্ঞান করিব। ইতি—

বঙ্গবাসী-কার্যালয়

প্রকাশক।

১৭ই মাঘ—১৩১৪।

আমার একটি চাকরি চাই। কিন্তু কাকেই বা বলি, কেই বা শুনে? এ ভবসংসারে যে দিকে তাকাই, শূন্যময় বোধ হয়। ডাকিলে কেহ উত্তর দেয় না, তোষামোদ কেহ গ্রাহ্য করে না, পায়ে ধরিলে, কাহারও পা-পাষণ নড়ে না। এ জগৎ আমার পক্ষে এখন বিজ্ঞান কানন। দুঃখিনী মাতা আজন্ম আশা করিয়া আছেন, পুত্রের রোজগারের ধনে সুখী হইবেন, এক্ষণে নিরাশ-ব্যাকুল দুই একটি উষ্ণ দীর্ঘ নিঃশ্বাস দেখিয়া, আমার এক ছটাক করিয়া গায়ের রক্ত প্রত্যহ জ্বল হইয়া যাইতেছে। পাঠাবস্থায় পতিব্রতা সহধর্মিণীকে বলিতাম, — “প্রিয়ে! আরও কিছুদিন সবুজ কর, আর দুই বৎসর বাদে তুমি যে গহনা চাহিবে, আমি সেই গহনাই দিব; তখন আর যদুর সোকানের নসিকা জোড়া

চমিশ নম্বরের কালাপেড়ে সাড়ী পরাইব না—ফরাসডালা লালবাগানের পাঁচ টাকা জোড়া, মিহির উপর খাপ মতি পেড়ে, কাশী পেড়ে, রেলরোড পেড়ে—কিমধিক, আর গোপালের তাঁদের সাত টাকা জোড়া বোর কালাপেড়ে কাপড় অষ্টপ্রহর পরাইব। যখন নিমন্ত্রণ খাইতে কিম্বা পূজা দেখিতে অপরের বাটী যাইবে, তখন ঢাকাই কি বেনারসী সাড়ী তোমার অঙ্গের শোভা বর্ধন করিবে। যদি আমার কটকে চাকরী হয়, তাহা হইলে কটক প্রস্তুত সুবর্ণ এবং রৌপ্যনির্মিত বিবিধরূপ উত্তম উত্তম ফুল তোমার কুণ্ডলীকৃত কালবিষধরের তুল্যখোঁপায় বাহার দিবে।” কিন্তু হয়। এ সকল কথা এখন স্বপ্নবৎ বোধ হইতেছে। মনে করিয়াছিলাম, দুই বৎসর বাদে এত ঐশ্বর্য্য হইবে, কিন্তু এখন দু-দুগুণে চারি বৎসর গত হইল, তবু সে দিন আসিল না। পঞ্চম বৎসরে পড়িয়াছি, তবুও সে দিন আসিল না। কবে যে আসিবে তাহাও জানি না। ধর্ম্মার সেই অপরিমুচিত, পরিপাণু-মুখকান্তিতে কেবলমাত্র ব্যক্ত মনোভাব দেখিয়া, আমার হৃদয়ের মর্ম্মস্থানে আঘাত লাগিয়াছে।

এ হতাভাগা তিনমাসকাল, ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত
ছিল, শেষে আসিবার সময়, মুদী-উঠনার
বাকীর দরুণ চিরসঞ্চিত দরিদ্রের কাফন,
কতকগুলি পুস্তক আটক করিয়া রাখে।

এ ভগ্নদেহে, একবার ছয়মাস কাল জ্বর ভোগ করিতে হইয়াছিল; একটি দুর্ব্বল চাকর আমার সেবা শুশ্রূষা করিত; তার আশা ছিল, আমার চাকরী হইলে বকশিশ লইবে এখন সে কি মনে করে, এই ভাবিয়াই আমি পাগল। যখন আমি চোঁচ টাকা জল পানি পাইলাম, তখন কলসী কঁাকে, হাস্যমুখী, পাড়ার যুবতীগণ জল আনিতে গিয়া আমার কত গুণগান করিত; বলিত,

ইহার স্ত্রী কতই না গহনা কাপড় পরিবে, কতই না সুখে থাকিবে। প্রতিবাসিনী বৃদ্ধারা ভাবিত, এইরূপ ছেলে হলেই মায়ের সুখ, এখন হইতে রোজগার আরম্ভ করিল। না জানি, ইহার পর কত উপার্জন করিবে। আমার এক অতি বৃদ্ধা পিতামহী বলিতেন, —“ভাই। আমার আর কিছুই চাই না, কেবল তুমি স্ত্রীস্বপ্নাবনবাসের খরচটা দিও।”

এখন আমি কাহাকে কি দিই, কিছুই ভাবিরা ঠিক পাই না। এ ভাঙ্গা হাটে, এ বাকীপড়া শিকড়ি মহলে কি আছে যে, অপরকে দিব? আমি নিজের জন্য বেশী দুঃখিত নহি, কিন্তু অনেকের যে আশা ভঙ্গ করিলাম, এই দারুণ দুঃখে আমার জীবনের মূল গ্রহি পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া যাইতেছে। হে ভগবন! কি পাপে বাঙ্গালীর ছেলের এত কষ্ট, এত যন্ত্রণা—এ দুর্ভর দুঃখ। কই, আমি ত কখন কাহারও ধার করিয়া খাই নাই, অসৎকর্ম করিয়া কাহারও মনে ব্যথা দিই নাই, ‘আপনি’ বই কাহাকে কখন ‘তুমি’ বলি নাই, উচ্চ চক্ষে কখন কোন যুবতীর পানে চাই নাই। নিরীহ ভাল মানুষটির মত পাড়ায় থাকিতাম, এবং নিজ পাঠে সর্বদা মনোনিবেশ করিতাম। কিছু কম টোন্ধ বৎসর নারীর মুখ না দেখিয়া একরূপ অনশন ব্রত অবলম্বন করিয়া, রাগে না ঘুমাইয়া, বহু কষ্টে বহু পরিশ্রমে, বহু যত্নে “এম এ” উপাধি লাভ করিলাম; তবুও চাকরি হইল না, এক পয়সাও উপায় করিতে পারিলাম না। প্রশ্রয়িত অলংকার দূরে যাউক, এখন খাই কি? অন্ন-চিন্তা চমৎকার, এ জঞ্জরিত সেহে একাধিপত্য লাভ করিতেছে। ইহা ব্যতীত, বাবা আজকাল একখানা কর্ম বাহির করিতে আরম্ভ করিয়াছেন—তিনি বলেন, “আমার নন্দদুলালকে লেখাপড়া শিখাইতে সাড়ে তিন হাজার টাকা খরচ হইয়াছে।” তাই বলি আমার একটি চাকরি চাই। তোমরা যে কাজ করিতে বলিবে আমি তাহাই করিব। আগা পাড়াপড়শীরা, কেউ আমাকে চাকরি দেকে কি গা?

তখন আর যদুর দোকানের ন’সিকা জোড়া চম্বিশ নম্বরের কালাপেড়ে সাড়ী পরাইব না—
ফরাসডাঙ্গা লালবাগানের পাঁচ টাকা জোড়া,
মিহির উপর খাপ মতি পেড়ে, কাশী পেড়ে,
রেলরোড পেড়ে—কিমধিক, আর গোপালের
তাদের সাত টাকা জোড়া ঘোর কালাপেড়ে
কাপড় অষ্টপ্রহর পরাইব।

আমার আর চলে না। মুখে অন্ন রুচে না। বাপের ভাত খাইতে লজ্জা করে। পঁচিশ বৎসর হইল, এক পয়সাও আনিতে পারিলাম না। লোকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিল। কোথা চাকরি পাই, কোথা চাকরি পাই, এই চিন্তানলে শরীর দগ্ধ হইতে লাগিল। দিন আর যায় না। এক দিবস একজন বৃদ্ধ উপদেশ দিলেন, “তুমি ‘এডুকেশন গেজেট’ দেখিতে আরম্ভ কর তাহাতে অনেক চাকরি খালি বিজ্ঞাপন থাকে”; তাহাই করিলাম। দেখিলাম, পাঁচ টাকা হইতে আরম্ভ করিয়া রোক পঁয়তাল্লিশ টাকা অবধি, অনেক চাকরি প্রতি সপ্তাহে খালি হয়। মনে বড় ক্ষোভ হইল। ধারণা ছিল, এত পাশ কবিরাজি, নিদানপক্ষে একশত টাকার কম মাহিনার চাকরি কখনই করিব না।

পিতামাতার যে কি ধারণা ছিল, তাহা বলিয়া আর এখন লোক হাসাইব না। কিন্তু গতি নাই—‘দারিদ্র্যলেশো গুণরাশিনাশী’ দরখাস্ত করিতে আরম্ভ করিলাম। বলিলে বিশ্বাস করিবে না পৌনে পাঁচটাকার টিকিট খরচ করিলাম। চাকরি হওয়া দূরে থাক, একখান পত্রের উত্তর পর্যন্ত পাইলাম না। মনে মনে বড় সমেহ হইল—ব্যাপারটি কি? গেজেটের এসব ভৌতিক কাণ্ড নাকি? বিশেষ অনুসন্ধানে জানিলাম, বিজ্ঞাপিত চাকরিগুলি অনেক সময় খালি হয় বটে, কিন্তু বিজ্ঞাপন দিবার পূর্বেই লোক বহাল হইয়া যায়।

তখন আবার মনে বড় ভাবনা উপস্থিত হইল। কি করি? একজন বৃদ্ধের পরামর্শ অনুসারে, বাস্তবচক্রে ইন্সপেক্টরের নিকট যাতায়াত করিলাম। ক্রমে তাঁহার নিকট বড় আশা পাইলাম। ছয়মাস আনাগোনা করিয়া এক জোড়া জুতা ছিড়িলে শীতলগ্রামে, গবর্ণমেন্ট সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ে ষাট টাকা মাহিনার প্রধান শিক্ষকের পদ একটি খালি হইল। ছয়মাস আনাগোনা, তোষামোদ এবং তদুপরি দুইজন্যর অনুরোধ এই গ্রাহস্পর্শ একত্র হইলে, ইন্সপেক্টর মহোদয় সদয় হইয়া আমাকে বাহালি পরওয়ানা দিলেন। নন্দদুলাল জয়চাঁদের সে দিবস কি আনন্দের দিন। বিদ্যালয়িকার প্রথম ফল মনুষ্য জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য, স্ত্রীপুত্র দ্বারা সম্মানিত হইবার একমাত্র অধিতীয় উপায়, অর্থোপার্জনের দ্বার অন্য মুক্ত হইল।

বাহালি-পরওয়ানা হাতে করিয়া, আত্মদে আটখানা হইয়া, গৃহে প্রত্যগমন করতঃ একেবারে কামিনীর চরণ-প্রান্তে তাহা ফেলিলাম; বলিলাম, “ধিয়ে। গহনার কর্ম দাও, আজ হইতে অভাব মোচন হইল।” কামিনী তামাসা বিবেচনা করিয়া, কিহা অর্থহীন হইলে বুদ্ধিগুণ্ডি লোপ হয় মনে মনে ভাবিয়া, আমাকে পাগল ঠিক করিয়া বিরক্তভাবে তথা হইতে উঠিয়া গেল। আমি বড় ফাঁপরে পড়িলাম। ডাবিলাম একি? ইহাকেই বলে হরিষে বিষাদ। এই আপোষনৈকি রোগে পৃথিবীপতি রাজা দুর্যোধনের মৃত্যু হয়। আমি ত কোন কীটানুর্কীট। সকল চিন্তা দূরে গিয়া আমার মরিবার ভয় হইল, হায়রে “... হায়রে অমৃতে উঠিল ফ্লাহল।” একটু কাদিলাম। মনকে দৃঢ় করিলাম। ধর্মীতে আধ্যাত্মগোপিত বহিতে লাগিল। বুঝিলাম, কামিনী আমার কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া, ওরূপ করিয়াছে, অজ্ঞাব দণ্ডার্থ নহে। অবশেষে হিরচিন্তে, গভীর প্রকৃতিতে বাটীর প্রত্যেক পরিজনকে বিশেষ করিয়া বুঝাইলাম যে, আমার চাকরি হইয়াছে। সে দিবস মদীয় ভবনে আর আনন্দের অবধি রহিল না। পরদিন প্রাতঃকালে, উন্নতলগাটে প্রভাতচন্দ্রবৎ দধির ফোঁটা লাগাইয়া, মাতাকে প্রণাম করিয়া কামিনীর সহিত কেবলমাত্র নয়নে নয়নে হানাহানি করিয়া, যাত্রা করিলাম। স্টেশনে আসিয়া শুনিলাম, পাড়ী চলিয়া গিয়াছে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইবে—প্রায় দুই ঘণ্টা। ইত্যবসরে একটি ভদ্রলোকের সহিত আলাপ হইল। ক্রমে তিনি জানিলেন যে, আমি শীতলগ্রামের প্রধান শিক্ষক। তখন তিনি গলগলীকৃত বাস হইয়া, কৃতান্তলিপুটে, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া উর্জ্জ্বলমুখে বলিলেন,—“মহাশয়। এমন কাজ আপনি কদাচ করিবেন না—এ হতাভাগা তিনমাসকাল, ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিল, শেষে আসিবার সময়, মুদী-উঠনার বাকীর দরুণ চিরসঞ্চিত দরিদ্রের কান্না, কতকগুলি পুত্রক আটক করিয়া রাখে।” অনেক কথাবার্তার পর, শেষে সমস্ত রহস্য অবগত হইলাম। বলিলাম, “আমি এই পথেই গৃহ প্রস্থান করিব।”

ভদ্রলোকের নাম রসিকদাস—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ.। তাঁহারও যে দশা, আমারও সেই দশা। দুজনে বড় মাথামাশি আলাপ হইল। একবার কোলাকুলি করিয়া দুজনে শানিক আনন্দাঙ্গু বিসর্জন করিলাম। কক্ষেতে আমি ছিল, তাহার সাক্ষাতে পরস্পরে বলিলাম, “তুমি আমার সাক্ষাত, আমি তোমার সাক্ষাত।”



একপট্ট

সমরেশ মজুমদার



দেওয়ালটা একটু সরাও

গ্রন্থের একটি পঞ্চম শ্রেণীর অভিনেতা সিরিয়ালে
ভাঁড়ামো করার সুযোগ পেয়ে এমন নাম করে গেল
যে সে ওয়ান ওয়ালে যোগ দিলেই শো পিছু বারো
হাজার টাকা পেয়ে যাচ্ছে।

কয়েকদিন আগে একজন তরুণ পরিচালক আক্ষেপ করে বলছিলেন তাঁদের নাটক তেমন কল শো পাচ্ছে না, যদিও কাগজে ও লোকমুখে প্রশংসা হয়েছে। তিনি জানানলেন, এর জন্যে থিয়েটারের এক দাদার বড় ভূমিকা আছে। এখন মোটামুটি পশ্চিমবাংলার কোথায় কে বা কারা কল শো-এর ব্যবস্থা করেন তা জানা হয়ে গিয়েছে। নাট্য পরিচালক হিসেবে ওই দাদাব খ্যাতি এখন তুঙ্গে। শুধু নিজের দল নয়, অন্য কয়েকটি দলের নাটকও তিনি পরিচালনা করেন, না করলে দেখে দেন। সরকারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক খুব ভালো। ফলে কল শো-এর আয়োজকদের অনেকেই তাঁর বক্তব্যকে গুরুত্ব দেন। তিনি যে দলকে নিয়ে যেতে বলেন তারাই আমন্ত্রণ পায়। এর পেছনে অন্য কোনো আর্থিক লেনদেন আছে কিনা তা তরুণ পরিচালক বলতে পারলেন না।

তরুণ বয়সে নাটকের সঙ্গে কিছুকাল জড়িয়ে ছিলাম। নাটককে ভালোবেসে বেশ কয়েক বছর 'দেশ' পত্রিকায় লেখালেখি করেছি। ইদানীং তেমন সময় হয় না নাটক দেখার, ইচ্ছেটাও কমে গিয়েছে। কোনো নাটক নিয়ে তর্কবিতর্ক উঠলে চলে যাই দেখতে। যেমন 'উইকল টুইকল' দেখতে গিয়েছিলাম। তাই এখনকার নাটক নিয়ে 'কথ' বলা আমার সাজে না। বলতে চাইও না।

ষাট দশকে কোনো দলের সভ্য অন্য দলের পরিচালক বা অভিনেতা হয়েছেন, এমন উদাহরণ ছিল বিরল। কয়েকটি দল নিয়ে একটি নাটক নির্দিষ্ট শো-এর জন্যে করলে আমরা যেমন আনন্দিত হতাম তেমনই ভয় হত—ভাড়াটে ব্যাপার না হয়ে যায়। ডিসপ্লিনের নামে যে কড়াকড়ি তার যে

কোনো মানে ছিল না তা একটু দেরিতে বুঝেছি। কিন্তু গোড়া থেকেই সেবেছি নাটক করা মানেই আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া। কখনোই কোনো নাটক হাউসফুল হলেও খরচ করা টাকার পুরোটা পকেটে আসে না। তাই বাংলা নাটককে কল শো-এর মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়েছে। একটা কল শো মানে দুটো নিজস্ব শো-এর ক্ষতিপূরণ।

এই ব্যবস্থায় এক ধরনের অপমানও হজম করতে হয়। টিভি সিরিয়ালে মুখ দেখানো নাটক না জানা অভিনেতা অভিনেত্রীদের নিয়ে একটা দল গড়ে ওয়ান ওয়াল থিয়েটার বলে যেখানে কল শো করে গেছে গত রাতে যারা তাদের দেওয়া হয়েছে চল্লিশ হাজার টাকা, সেখানে দিনের পর দিন রিহার্সাল দেওয়া নাটকের জন্যে ত্যাগ স্বীকার করা ছেলেমেয়েদের প্রশংসিত নাটক পাচ্ছে বারো হাজার টাকা। এককালে শ্যামবাজারী থিয়েটারের সিনেমার অভিনেতা অভিনেত্রীদের কাছে আকাদেমির থিয়েটার দলগুলোর পরাজয় অনিবার্য ছিল এবং তার পেছনে মুক্তিও পাওয়া যেত। কিন্তু এখন গ্রন্থের একটি পঞ্চম শ্রেণীর অভিনেতা সিরিয়ালে ভাঁড়ামো করার সুযোগ পেয়ে এমন নাম করে গেল যে সে ওয়ান ওয়ালে যোগ দিলেই শো পিছু বারো হাজার টাকা পেয়ে যাচ্ছে। কিছু করার নেই, যারা ভালো নাটক করার জন্যে জীবনের কয়েক হাজার সঞ্চে রিহার্সাল কমে কাটাচ্ছেন তাঁরা যদি অভিমান অপমানে কল শো করতে আব রাজি না হন তাহলে আকাদেমি বা মধুসূদনের ভাড়া দেওয়ার ক্ষমতাই থাকবে না, নাটক করা দূরের কথা।

ব্যাপারটা নিয়ে একসময় অনেক কথা হয়েছে। যে আবেগ বাংলার তরুণ থিয়েটারদলগুলোকে নাটক করতে উদ্বীণ করেছে বহু বছর ধরে তার আয়ু নিয়ে কথা হয়েছে। শুধু আবেগ দিয়ে একটা দল বেশিদিন চলতে পাবে না। আরো বেশি দর্শককে তাদের নাটক দেখতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। যে আর্থিক মূল্যে আজকাল টিকিট পাওয়া যায় তার যোগফল হাউসফুল হলেও যখন পুরো খরচ মেটায় না তখন মূল্যবৃদ্ধি যে প্রয়োজন তা বুঝেও সাহসী হতে পারে না দলগুলো। খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনের দাম হু হু করে বাড়ছে, বাড়ছে প্রেক্ষাগৃহের ভাড়াও। শুধু আবেগ সর্বস্ব হয়ে পড়ে থাকলে যে আত্মহত্যা অনিবার্য তা এঁরা বুঝেও কিছু করতে পাবছেন না কেন? আমাদের নাটকের দলগুলোর ক্ষমতা আছে, প্রতিভা আছে, পরিশ্রম করার ব্যাপারে কেউ পিছিয়ে নেই। নাটক, যখন টিকিট বিক্রি হচ্ছে তখন অবশ্যই ব্যবসার দিকটা দেখা কর্তব্য। ব্যবসায়িক দৃষ্টি ভঙ্গিতে পরিকাঠামো ঢেলে সাজানোর

ব্যক্তিবিশেষের ইগো এত বড় হয়ে যায় এবং কোনো কোনো মুখ তাকে এমন হাওয়া করে যে সে নিজের ভাবনা থেকে নড়তে চায় না। সমালোচনা করলেই তাকে শত্রু বলে ভেবে নেয়।

চেপ্টা হচ্ছে না কেন?

কিতাবে এটা সম্ভব?

একদম প্রথমে নাটকের বিষয় নির্বাচন। আপনি কেন নাটকটি নির্বাচন করলেন? আপনার নিজস্ব ভালো লাগা উপভোগ করতে, নাকি দর্শকদের আনন্দিত করতে? মনে রাখতে হবে, আগে সিনেমা ছিল একা, এখন থ্রু চ্যানেল টিভি-তে মনোরম অনুষ্ঠান নিয়ে দর্শকদের বলছে—দেখুন। সেই আকর্ষণ ত্যাগ করে কেন দর্শক আসবেন আপনার আশ্রয়িতা দেখতে, যদি কোথাও যা তিনি পাচ্ছেন না তা আপনার নাটকে না পান?

‘উইঙ্কল টুইঙ্কল’ চমক তৈরি করেছিল। বিষয় নির্বাচনে সাহস দেখিয়ে দর্শকদের বাহবা পেয়েছিল। যা তাঁরা ভাবেন অথচ কেউ বলেন না তাই তাঁরা এই নাটকে দেখতে পেয়েছিলেন। কিন্তু বিষয়, বস্তুব্য, অভিনয় বা পরিচালনা অতি উচ্চমানের হওয়া সত্ত্বেও নাটকের গঠনে নাটকীয়তার অভাব এবং কাহিনীর বিন্যাসে অমনোযোগী হওয়ার কারণে একটা দ্রুত ভাব তৈরি হয়। দর্শক অতগুলো প্রাপ্তির পাশাপাশি যদি টানটান নাটক দেখতে পেত তাহলে এই নাটকের সর্বনিম্ন টিকিটের দাম তিরিশ টাকা করলেও পাঁচশ শো হাউসফুল যেত। নাটকটির পরিচালক আমার কাছে এসেছিলেন। আমি তাঁকে ক্রটিগুলোর কথা বলেছিলাম। বলেছিলাম, ‘যেহেতু এই সময়ের নাটক এবং একটা আকর্ষণীয় নাটক তাই ক্রটিগুলো দ্রুত শুধরে ফেলা দরকার। মুশকিল হল, এখানে ব্যক্তিবিশেষের ইগো এত বড় হয়ে যায় এবং কোনো কোনো মুখ তাকে এমন হাওয়া করে যে সে নিজের ভাবনা থেকে নড়তে চায় না।

সমালোচনা করলেই তাকে শত্রু বলে ভেবে নেয়। এই কারণেই নাটক নির্বাচন করে মহলার আগে বিভিন্ন শ্রেণীর বন্ধুদের ডেকে একটা বোর্ড তৈরি করে তাদের মতামত নেওয়া উচিত। সেই মতামতে যুক্তি থাকলেই দলগুলোর যারা পরিচালক তাঁরা একত্রিত হয়ে আলোচনায় বসা উচিত। দেখা যাবে বিষয় নির্বাচনে অনেকটা উন্নতি হয়ে গেছে।

‘তেরো পার্বণ’ করার পর শুনেছিলাম জোহনদার দলে সব্যসাচী এবং মুকু থাকায় নাটকের দর্শক বেড়েছিল। প্রতিটি দলের পরিচিত অভিনেতা অভিনেত্রী অনেক আছেন যারা অন্য মিডিয়ার মাধ্যমে দর্শকের পরিচিত। তাঁদের অনুরোধ করা যাক না কোনো একটা নাটকে কাজ করার জন্যে। এতে লক্ষ্যের কিছু নেই। রণি তো উইঙ্কল টুইঙ্কলে চমৎকার কাজ করেছে।

ভালো বাংলা গল্প-উপন্যাসকে বিষয় হিসেবে নির্বাচন করুন না। যে বই পঞ্চাশ থেকে এক লক্ষ কপি বিক্রি হয় তার ভেতরে নিশ্চয়ই এমন কিছু আছে যা নাটকের মন ভরায়। সেই কাহিনীর নাট্যরূপ তো পাঠক দর্শক হিসেবে দেখবেনই।

কাগজে যখন আটহাজার টাকা না দিলে বিজ্ঞাপন বের হয় না তখন টিভির জনপ্রিয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে কথা বলুন। তারা এক হাজারে দশ সেকেন্ড হিসেবে আটবার ওই টাকায় আপনাদের বিজ্ঞাপন দেখাবে। এতে প্রচার অনেক বেশি, কর্তৃত্বাভাব এবং বাইরেরও।

নিজেকে বিকিয়ে অথবা রুচি জলাঞ্জলি না দিয়েও তো সমঝোতা করা যায়। নাটককে বাঁচালে তবেই তো নতুন কাজের সুযোগ পাওয়া যাবে।

ড্রামাডোমে

বি পি এল

তার ওপরে ২৫ বছর ধরে এ রাজ্যে ক্ষমতাসীন। তাই যে যত কম করে গরিব দেখাতে পাবে সেই জিতবে জ্যাকপট।

মন্ত্রীরা খেলুক। আমরা ততক্ষণ গ্রামবাংলার গরিবদের চিত্রটা একটু দেখে নি। এই চোত-বোশেখে কাজ বলে নেই গ্রামে। মাঠ খাঁ খাঁ। বোদ বাঁ বাঁ। জ্বালায় জ্বলছে চাষীর ঘর। কোচবিহারের ধানচাষী মধুসূদন, হুগলির আলুচাষী সামিম একযোগে কীটনাশক খেয়ে ঝপেব জ্বালা মিটিয়েছে। মৃশ্যমজ্জী বলেছেন ঋণ নয়, পাতকুয়োর তলায় মুক্তো কুড়োতে গিয়ে মারা গেছে ওরা। মালদার মায়াদাসী, পুরুলিয়ার পারুলবালার পাকস্থলিতে এক মাস কিছু না পড়ায় যমে ওদের ডেকে নিয়েছে। মৃশ্যমজ্জী এবার বলেছেন অনাহারে নয়, অপুষ্টিতে মারা গেছে ওরা। শোদ মহানগরীর উপকণ্ঠে কসবার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ক্ষুদ্রিমা ডবল অশৌচ পালন করছে। সে হিসেব করে বৃদ্ধ বাপ-মাকে দেখিয়েছিল যে তাদের সংসারে দু’জন কমে গেলে এক বছরের মধ্যে তার দশ হাজার টাকার দেনা হাসতে হাসতে শোধ হয়ে যাবে। ক্ষুদ্রিরামের বাপ-মা খেঁতো পানে চূনের বদলে তুঁতে মাখিয়ে খেয়ে নিল। আশ্বিনটার মধ্যে ক্ষুদ্রিরামকে ঋণমুক্ত কবে

বিশ্বব্যাকের মামা কাটাল।

এবার আসছি আমার কথায়। বনগাঁর হরিহরপুবে ক্ষেতমজুরি করি। ক্ষুধা, আশ্রয়হীনতা, স্বাস্থ্যহীনতা, নিবন্ধরতা, শিশুমৃত্যু, কর্মহীনতা। কথগুলো মঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শিখেছি। মানে জানি না আমার রোজ সরকার বেঁধেছে ৬২.৫০ টাকা, আর যে দেয় সে ৫০.৬২ টাকা দেয়। বাকিটা ইনকামট্যাক্স কাটে। বলে ‘পার্টি বাঁচলে চাষী বাঁচে গো’। আমি যদি বলি ‘কুন্ডলাম না কস্তা’, তবে বলে, ‘কমরেডের ভাষা কান্তে বোঝে না বাপু’।

এ বছর মালিকের পাকা ধান কেটে, ঝেড়ে, সিদ্ধ করে, টেকি ভেঙে, গোলায় ভবে যখন পয়সা নিতে গেলাম তখন মালিক বলল, অর্ধেক নাও বাছ। অর্ধেক জমা থাক। বললাম ‘চলবে কেন কস্তা’? মালিক বলল, তুমি তো বড়লোক বাছ। রোজকার ৬২.৫০ টাকা। হিসেবে বছরে কামাও ১৮,৭৫০টা। সরকার কইছেন ১৪০০০ টাকার নিচে যাদের আয় তারাই গরিব। আমিও গরিব। এই দেশ আমার বি পি এল কার্ড। আমার কি তোমারে দেবার ক্ষমতা আছে? এখন তাগে আসোগে।

—দিব্যেন্দু দাস

তারাপদ রায় ও গঙ্গারাম

তারাপদ রায়



”

তুমি আমাকে পরীক্ষ করটা বোঝাও।
গঙ্গারাম যা বলল তা অকল্পনীয়। গঙ্গারাম বলল,
কুকুরের ওপর ট্যাঙ্ক হল পরীক্ষ কর।

“

আজকাল গঙ্গারামের যে কি হয়েছে, কথায় কথায় গভর্মেন্টের ওপরে রাগ। কিছু হচ্ছে না। কিছু করছে না। রীতিমতো আশ্রয়ালন। এর মধ্যে লোকদের মাইনে পেতে অসুবিধা হচ্ছে। শুধু যে সরকারি অফিসে মাইনের টাকার অভাবে কাবো মাইনে আটকে যায় তা নয়। অনেকসময় খুব তুচ্ছ কারণে মাইনে আটকে যায়। এই তো গত মাসে মাইনে আটকে গিয়েছিল ডাকঘরে রেভিনিউ স্ট্যাম্প নেই বলে। ডাকঘরে প্রয়োজনমতো রেভিনিউ স্ট্যাম্প থাকবে না, এটা ভাবা যায় না। গঙ্গারাম আমাকে বলতে লাগল এইবারে ব্যাঙ্কে চেক দিলে বলবে, এখন ভাঙিয়ে দিতে পারব না, টাকা নেই। পরে আসুন।

আমি শুনে বললাম, তোমার জ্ঞানবুদ্ধি খুবই কম। ইন্ডেস্ট্রমেন্ট কোম্পানিগুলো অনেকেরই ধাপ্য টাকা দিতে পারছে না। অনেক ব্যাঙ্কে—বিশেষ করে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কেও এরকম ব্যাপার আছে।

গতকাল গঙ্গারাম এসেছে ট্যাঙ্ক নিয়ে গজর গজর করতে। ভুল করে তার অফিস থেকে বেশি আয়কর কেটেছিল। সেই টাকা ফেরত পেতে গঙ্গারামের নাতিশ্রাস উঠে গেছে। এক কাউন্টার থেকে আর এক কাউন্টার, এক

ফর্ম থেকে আর এক ফর্ম। আইনের এক ধারা থেকে আর এক ধারা—

গঙ্গারাম অনেকক্ষণ বিরক্ত হবার পর আমি বাধ্য হয়ে বললাম, তুমি নিশ্চয়ই গোড়াতেই কোথাও ভুল করেছিলে।

গঙ্গারাম বলল, আমি নই, আমার অফিস করেছিল, বেশি আয়কর কেটে।

আমি বললাম, সে তো করেছিল। কিন্তু আয়কর দপ্তরে গিয়ে গোড়াতেই কিছু ভুলভাল..... এত দেরি হওয়ার কথা নয়।

গঙ্গারাম বলল, না আমি কিছুই ভুল করিনি।

সে রীতিমতো তেরিয়া হয়ে উঠল। আমি তাকে দমাবার জন্য বললাম, কর, মানে ট্যাঙ্ক বিষয়ে কী জানো?

গঙ্গারাম বোধহয় কলেজে অর্থনীতি কিংবা বাণিজ্য পড়েছিল। তাই সঠিক ভাবে উত্তর দিল, কর দু'রকম। প্রত্যক্ষ কর বা ডিরেক্ট ট্যাঙ্ক। আর পরোক্ষ কর বা ইন্ডিরেক্ট ট্যাঙ্ক।

আমি বললাম প্রত্যক্ষ কর তো বুঝলাম। তোমার ঐ আয়কর। সরকার তোমার কাছ থেকে সরাসরি প্রত্যক্ষ কর আদায় কবছে। তুমি আমাকে পরীক্ষ করটা বোঝাও।

গঙ্গারাম যা বলল তা অকল্পনীয়। গঙ্গারাম বলল, কুকুরের ওপর ট্যাঙ্ক হল পরীক্ষ কর।

আমি স্তম্ভিত হয়ে বললাম, সে আবার কি?

গঙ্গারাম বলল, সোজা কথাটা বুঝতে পারছেন না? কুকুরের যখন ট্যাঙ্ক করা হয় তখন সে টাকাটা কি কুকুর দেয়? সেটা দেয় কুকুরের মালিক। তাই এটা আসলে পরীক্ষ কর।

অনেকসময় খুব তুচ্ছ কারণে মাইনে আটকে যায়।

এই তো গত মাসে মাইনে আটকে গিয়েছিল

ডাকঘরে রেভিনিউ স্ট্যাম্প নেই বলে।

গল্প

ফিমেল ক্লাব

ওম্বিকা গুপ্তা

ভুবনমোহন ভুবন আলো করে সভাপতির আসনে বসলেন। যেন রেকাবিত্তে একহাতা মোহনভোগ। অবশ্য কাব্য করেও বলা যায়, আর সেটাই ভুবন পালের গভীর ভাবমূর্তির সঙ্গে বেশ খাপ খায়। যথা, গুণীজন মাঝে শোভে ভুবনমোহিনী। স্বল্প মাইকেলী অমিত্রাক্ষর ছন্দে বাঁধা, যেমনটি ভুবনমোহন নিজেও। হাঙ্গা পয়ার ছন্দে ওনার ব্যক্তিছটা ঠিক ফোটে না। আর ‘মোহিনী’টি কাব্য-প্রয়োগ এতে কোনো লিঙ্গ-দুষ্টতা নেই।

চৌটে নেতা-মাথানোই হোক আর ন্যাতা-নিকোনোই হোক, মৃদু-মধুর হাসি। ওষ্ঠের পর্দার অন্তরাল থেকে তিনটি বৈ চারটি দাঁতও বিকশিত হল না অভ্যাসবশতই। বেশ ক’বছর এক নাগাড়ে নানান প্রতিষ্ঠানে সভাপতিত্ব করে আসার পর বড় একটা ভুল ইসানীং হয় না। গোড়ায় গোড়ায় অবশ্য উচ্ছ্বাসের আবেগে বক্তৃতা পাঠাই কেঙ্গিয়ে ফেলতেন। আবেগবহুল হলেও কিছুটা আড়ম্বর ছিল সে হাসিতে। ফোকলা অংশটি খুব সুদৃশ্যও ছিল না। এখন সংযত, পরিমিত, অনেক মাপজোপা হাসি। হাজার হোক, অনেকগুলো বছর পাঁচ-সাতটা সম্ভব, সমিতি-সভার লাগাতার সভাপতিত্ব করাব পর ছকে মেলানো ফরমুলা-হাসি, সাদা বাংলায় যাকে বলে দ্যাখনহাসি, সেটি বেশ মজা করে ফেলেছেন ভুবন পাল।

শুধু হাসি নয়, বসার ভঙ্গিমাও এখন অনেকে সাবলীল, সূচু। পাটোয়ারীরা যেমন গদিতে বসে, পুরুতে যেমন আসনে বসে, বর-বৌ যেমন পিঁড়িতে বসে—ঠিক তেমনিই অনায়াসে, অবলীলাক্রমে। কোনো কিস্ত-কিস্ত বা সঙ্কোচ না করেই। পুরনো চাল ভাতে বাড়ে। ভুবনমোহন কিস্ত ভাত-ডাল-অম্বল সবচেয়েই বেড়েছেন। পাড়ার তরুণদের ব্যায়াম সমিতি থেকে শুরু করে কিশোর-কিশোরীদের পাঠাগার, নবীনদের নাট্যসঙ্ঘ, প্রবীণদের জনকল্যাণ সংস্থা—সব বুড়িই ছুঁয়ে আছেন ভুবন পাল। সভাপতি হিসেবেই। কোথাও নির্বাচিত, কোথাও মনোনীত আবার কোথাও প্রতিষ্ঠাতার অগ্রাধিকারের সৌজন্যে। এগুলি চিরস্থায়ী না হলেও তবু একরকম পাকা ব্যবস্থা। না হলেও ভুবনমোহনের কোনো অসুবিধা ছিল না। ফিতে কাটা, বৃক্ষ রোপণ, শোকসভা, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উদ্বোধন—এমন অনেক অনুষ্ঠানে উনি এক রাতের খন্ডের হয়েই পৌরোহিত্য করে এসেছেন অক্লেশে। মালা পরাটা এখন ওঁর একটা অভ্যাস বা বদভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। রোগও বলা যায়, আবার শখও। তবে দুর্ভোগ যে নয়, সেটা ভদ্রলোকের পরিতৃপ্ত মুখ দেখলেই বোঝা যায়।

যে কোনো আলোচ্য বছরে ভুবনমোহন সাতটা না হলেও পাঁচটা সমিতি বা সংস্থার সভাপতির পদে বহাল থাকেন। বর্তমানে দুটোব তো উনি লাইফ-প্রেসিডেন্ট। সেটাই উনি পছন্দ করেন। বছর বছর নির্বাচন বা মনোনয়নের জন্যে পাঁচজনের ষারছ হতে হয় না। ব্যাপারটা কানু রায়ের গোচরে আছে। চেষ্টাও চালিয়ে যাচ্ছে সে। নেতা বানানোর কানু একেবারে ঝানু। ভুবনবাবু এ বয়সে আর বিশেষ ছোট্টাছুটি-করতে পারেন না। তাই পা-চালাচালিটা কানুই করে। সহোদর না হলেও সহোদরের মতনই কানু ভুবনমোহনের কাছে। ‘ছত্রছায়া’-ক্লাবের ভুবন-পালের সুরাসুরি সভাপতিত্ব প্রাপ্তি কানুরই কল্যাণে। পদটি এমনিতে মাস্টারেরই পাবার কথা। শান্তিপূরের অধিষ্ঠ

গান্ধুলিই আর পাঁচটা প্রত্যক্ষদর্শনরত অকসরপ্রাপ্ত বুড়োহাথড়াকে ‘ছাতার’ ভাষায় আনেন। সরকারি মানুষ তো, ওনার অত কাব্য আসে না। উনি নাম দিয়েছিলেন ‘আম্ব্রেলা ক্লাব’। তারই কাব্যায়ণ করেন ক্লাবের নবীনতম সদস্য প্রবীণতম গুপ্তমশাই। বয়সকালে সাংবাদিকতা করতেন ভদ্রলোক। বদ অভ্যাসটি সিগারেট খাওয়ার মতোই ইচ্ছে থাকলেও ছাড়তে পারেননি। হাবিজাবি পাঁচটা কাগজে ছাইপাশ লেখেন। ছাপা হয়, তবে অপাঠ্য। ভুবনমোহনের সঙ্গে এইখানেই ওনার মিল। একজন সভাপতিত্বের নেশায় বৃন্দ, আর একজন লেখার পেশায় মশগুল।

কানুই মাস্টারকে বুঝিয়েছিল বা বানিয়েছিল। হয়ত শেষটাই। অডিক্স লোক। মালকড়িও আছে পালবাবুর। চাই কি একটা তোজের ব্যবস্থাও হয়ে যাবে। আপনাদের তো সেই মাসে একদিন জিলিপি আর মিনি ভাঁড়ে চা। পাল হাল ধরলে মাঝেমধ্যে একটু কজ্জি ডোবানোর বন্দোবস্ত হয়, এই আর কি।

মাস্টারের আন্তরিক আপত্তি ছিল কি না সেটা জানা যায়নি। পেলেও শোনা যায়নি। কারণ কানুর টোপ ততক্ষণে গিলে ফেলেছেন পৌসাই, বাঁড়ুজ্যে, সেন, বিশ্বাস, শ্যামলবাবু, সাহামশাই, কল্পনাথ, অসিত রায়, জজসাহেব এবং মিস্টার ঘটক। ফুলহাউস। মাস্টারের রাজি বা পররাজি হওয়া ধর্তব্যের মধ্যেই আসেনি। এঁদের সোষও দেওয়া যায় না। বুড়োদের নোলা বরাবরই একটু বেশি। বাতের মতো খাই-খাই বাতিকাটাও বার্কোই বাড়ে। এ বয়সে বাড়িতে যেটা বরাদ্দ সেটাকে ঠিক খাদ্য না বলে পথ্যই বলা ভালো। মাস্টারও তো বুড়ো মানুষ। টোপটা যে সেও গেলেনি তাই বা কে বলবে?

সর্বসম্মতিক্রমেই ভুবনমোহন ‘ছত্রছায়া’র ছত্রধারক হলেন। কানু তত্ক্ষণাবক। শ্যামলবাবু ঠিক যত্ক্ষণাবক না হলেও কাছাকাছিই। সঙ্গীতেই জমিয়ে রাখতেন উনি ছত্রছায়ায় আসর। ‘জয় মা’ বলে ঝাঁপিয়ে পড়তেন উনি শ্যামা মার বন্দনায়। রাগপ্রধান, রবীন্দ্র সঙ্গীত, কীর্তন, ভজন—সব গানই গাইতেন শ্যামলবাবু উদাত্ত কণ্ঠে। ভক্তিরসের মানুষ, থেকে থেকেই বেরিয়ে পড়েন কাশী, কাঞ্চী, গয়া, গঙ্গা স্রমণে। একা নয়, ছত্রছায়ায় অনেকেই তখন রোদ পোয়াতে জুটে যান শ্যামলবাবুর সঙ্গে।

পৌসাই মশাই সদাই ‘কানাই কানাই’ করেন। কানাই অর্থাৎ কানু, বিকল্পে ‘কেনো’ (মাস্টারের ভাষায়) চকিধ লগ্গটাই ভুবনময় আচ্ছন্ন। কোথা থেকে যেন খবর পেয়েছে, গাঙ্গীনগরে শ্রীহরি সভার মোহন অঙ্কুতানন্দ মহারাজ কাশীবাসী হয়েছেন। দক্ষিণ ২৪ পরগণার আদি সনাতন ধর্ম সংস্থার সভাপতি ছিলেন উনি। পদটি কতমানে খালি। খবরটা ভুবনমোহনের কানেও এসেছিল। ইচ্ছেও ছিল, কিন্তু ঠিক সাহস পাননি। সাহস, ভরসা দুই-ই জোগালে কানু রায়।

বড় মাপের মানুষ চায় ওরা। খাড়ায় না হলেও চওড়ায় আপনাই বা কম কি? অঙ্কুতানন্দব কোমরের বহর ছিল আটকিশ ইঞ্চি। আপনার নেয়াপাতি জুড়ির ঘের কিছু না হলেও বাহাম ইঞ্চি তো হবেই। ওখানেই তো আপনি এক ফুট দুই ইঞ্চি এগিয়ে। খাড়ায় আপনি পাঁচ ফুটের নিচে ঠিকই, কিন্তু সেখানের আট ইঞ্চি বাটটিটা জুড়ি আপনার পুরিয়ে দিয়েও ফুরিয়ে যাবে না,

বেশ ক'ইকি উদ্ভূতই থাকবে।

ভুবনমোহন জীবনে এই প্রথম নিজের চির-অন্ধঃসত্ত্বা ভূঁড়িটির দিকে সন্নেহে তাকালেন। ওটিকে কিঞ্চিৎ কৃশ করণের অভিপ্রায়েই ওনার এই দৈনিক প্রভাতী পদযাত্রা। বিশেষ তেমন কল হয়নি। ভাগ্যিস।

—তবে হ্যাঁ, কেউপূরে বগলা বোষ্টুমির আখড়ায় আপনাকে একটা উইকেট কাটাতে হবে। বোষ্টম হওয়ার জন্যে কোর্টঘর, এফিডেবিট, যাগযজ্ঞর হ্যাঁপা সামলাতে হয় না। কণীবদল করলেই সব ল্যাটা চুকে যায়। বোষ্টুমিকে নিয়ে ঘরকন্না করার প্রক্লই ওঠে না, আখড়াবাসীকে আখড়াতেই রেখে আসুন। বোদির সংসার অটুটই থাকবে। শুধু নামটার একটু অদল-বদল হবে। এখন আছেন ভুবনমোহন পাল। তখন হবে ভুবন গৌসাই। বলেন তো কালই চলুন বগলা বোষ্টুমির আখড়ায়।

—ওখানে আবার কেউ ব্যাগড়া দেবে না তো?

—দেবে। কিন্তু আমি অছি কী করতে?

কিছু টাকা খরচা করতে হয়েছিল ভুবন গৌসাইকে। তবে দক্ষিণ ২৪ পরগণার আদি সনাতন ধর্ম-সংস্কার সঙ্গে কানুর কল্যাণে একটা পাকা পোস্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়ে গিয়েছিল। আজীবন সভাপতিত্বে আসীন হয়েছিলেন ভুবন মহারাজ। কানু যেন নবদ্বীপের কোন এক অখ্যাত টোল থেকে ন্যায়রত্ন না তর্কচূড়ামণির সার্টিফিকেটও জোগাড় করে এনেছিল ভুবন মহারাজের নামে। সেখানেও দশ-বিশ টাকা দিতে হয়েছিল। হলেই বা, সবই তো এককালীন প্রদেয়। গদিটি তো চিরকালীন।



দুই

ছত্রছায়ায় অলিখিত সংবিধানটির অ-লেখক যতদূর মনে হয় মাস্টার। ঘটক সাহেবের সংশোধন প্রস্তাবগুলিও অলিখিত হলেও অসংযোজিত ছিল এমন নয়। মেনে নিয়েছিল সবাই। মাস্টারের মাস্টারিতে আপত্তি থাকলেও কানুও মেনে নিয়েছিল। মানামানির বিশেষ কিছু ছিল না। প্রাতঃপ্রমণ দিয়েই ক্লাবের অধিবেশন শুরু। অতঃপর 'ওপন সেশান'। যেখানে রাজনীতি, সুদের হারের হ্রস্ব গতি, কানু রায়ের মতিগতি, সাহাবাবুর রামঠাকুর-প্রীতি, মাস্টারের ব্যায়াম-প্রীতি, গৌসাইয়ের বোষ্টুমি-নীতি, ঘটক সাহেবের ক্রিকেটে দুচ্ছতী, কল্লনাথের পারিবারিক সম্বন্ধীতি, ভুবন পালের সভাপতি, শুণ্ডদার খেউড় খিতি এবং দিবানাথ সেনের ইতিউতি নিয়েই আলোচনার ঝড় উঠত। সভা সমাপ্তিতে শ্যামলবাবুর সুললিত কণ্ঠে মাতৃকন্দনা। মাঝেমধ্যে রবীন্দ্র সঙ্গীত, রাগধধান, রামভজন ছিটিয়ে ছড়িয়ে দিতেন।

কেউ কেউ ওরই মধ্যে সময় করে মুণ্ডর ভেঁজে নিতেন মুণ্ডর বিনাই। অসিত রায়কে দেখে মনে হত উনি ক্লাবে আসেননি, এসেছেন বিষ্টু ঘোষের আখড়ায়। ওঁর সঙ্গে ঠিক পাল্লা না দিলেও তবলায় ঠেকো দেওয়ার মতো কাজ চালিয়ে যেতেন ঘটক সাহেব, সাহাবাবু, গৌসাই এবং 'হয়-মা' শ্যামল।

মাসের মধ্যে অন্ততপক্ষে একবার কোনো না কোনো ছুতোয় জলযোগ-এর গোলযোগ ছিল। তেমন তেমন হলে ন'মাসে ছ'মাসে ধুমধাড়া একটা দুটো খাঁটিও হয়ে যেত। অলিখিত সংবিধানে লেখা আছে কি না জানি না তবে শীতটা-আসটা পড়লে শ্যামলবাবুর লেজ ধরে নীলমাধব, বিশ্বনাথ, পরেশনাথ দর্শনে বেরিয়ে পড়ত অনেকেই।

ভুবনমোহন পালকে আমি মুণ্ডর ভাঁজতে দেখিনি। কেউই দেখেননি। কারণ মুণ্ডর উনি কখনিকালেও ভাঁজেননি। বিশেষ করে রসবশের মানুষ হলেও উনি তো ঠিক নিরাকার ব্রহ্ম ছিলেন না, অস্তিত্বও ওঁর কিছু অদৃশ্য ছিল না। তাই সাকার ভুবন পাল মুণ্ডর ভাঁজলে কেউ না কেউ দেখেই ফেলত, নিদেনপক্ষে কানুর চোখ এড়াতে না। সেও দেখেনি। শরীরের খাঁজে খাঁজে, ভাঁজে ভাঁজে, আঙ্গেবাজে মেদবাহ্য্য মেনেই নিয়েছিলেন ভুবনমোহন। পাগোয়ানী প্রক্রিয়ায় তাকে প্রশমিত করার প্রয়োজন মনে করেননি উনি। কানুরও সায় ছিল।

একটু গান্ধে-গতরে না হলে গণেশ হয়ে সভাপতির আসনে গেড়ে বসবেন কী করে? চেতল মাহের পেটি বলেই না মুইঠ্যা। ট্যাংরা মাছে কি মুইঠ্যা হয়?

কথাটা মনে ঘরেছিল ভুবনমোহনের। বিশেষ করে মুইঠ্যার উপমাটি। ওপার-বাংলার মানুষ তো, চিতল মাহের মুইঠ্যা, তিতার ডাল কানে এলেই জিতে জল এসে যায়। 'ছত্রছায়া'য় ঘটক সংখ্যাই বেশি বলে মনে হয়। দুই পাল, জঙ্গসাহেব এবং স্বয়ং সভাপতির জিহাই একটু বাদিক ঘেঁষা।

বাংলার গৌরব সৌরভের কুতিত্বপূর্ণ নেতৃত্বের উপলক্ষে বা অজুহাতে ছত্রছায়ায় ভালোমতো দক্ষিণ হস্তের ব্যবস্থায় উদ্যোগী হয়েছিলেন ভুবন পাল পাকিস্তানকেবিশ্বকাপের দৌড় থেকে স্থানচ্যুত করার পরই। ছত্রছায়ায় গণ্ডির বাইরের অ-সভ্যরা গাভ্রদাহর দক্ষিণই হোক বা রসনার হাথকারেই হোক ক্লাবটিকে ততদিনে 'খাই-খাই কাফে' অভিহিত করে কিছুটা আত্মতৃপ্তি লাভ করেছে। নামটা নতুন শুনিয়েছিল ভুবনমোহনের কানে। খাই-খাই নাম, সেটা ঠিক উনি উপলব্ধি করতে পারেননি। ইদানীং মনের মধ্যে কিছুটা চাপও ছিল। নবীন সমিতি প্রবীণ পালকে হাটিয়ে কোনো অর্বাচীনকে সভাপতি করার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছে। একই সঙ্গে পাড়ার সংস্কৃতি পরিষদ ভুবনবাবুর নতুন 'গৌসাই' অবতার রূপটি ঠিক বরদাভ কবতে পারছে না। ওখানে ধুম্রো উঠেছে—'গৌসাই হঠাও, সংস্কৃতি বাঁচাও'। তাই ভুবনমোহন ক'দিন ধরেই ক্লাবে ক্লাবে টহল দিচ্ছেন, কোথাও গদি খালি আছে বা খালি হওয়াব আশা আছে কি না জানার অভিপ্রায়ে। কানুও বসে নেই, চরে বেড়াচ্ছে একই ধাপ্পায়।

পঙ্কতি ভোজনে সবে তখন ভাজা সোনামুগী ডালের মুখে পরম গরম বেগুনি পরিবেশিত হয়েছে। নেত্রটু আইটেম কুমড়োর ছক্সাও পাতে পড়ে গেছে। সবাই বেশ পরিভূক্তির সঙ্গেই আহ্বারে নিমগ্ন। কিন্তু ভুবনমোহনের

গলা দিয়ে কিছুই যেন নামতে চায় না। গরম বেগুনিও বিবাদ।

—কী যেন খাই-খাই ক্লাব কইসে? পট খালি থাকে তো কও, দরজা খুলেই কইসে।

ধমটা কানুকে।

কানু বেগুনিতে কামড় দিয়েছিল। হেসে বললে, সেখানের পটে তো আপনি বসেই আছেন। আমরা বলি ‘ছত্রছায়া’, ওরা বলে ‘খাই-খাই’। এরপর অসিতবাবুর মতো আমি-আপনিও যদি ষষ্ঠাখানেক মুণ্ডর বোরাই রোজ সকালে, তবে শুনবেন এটাই আবার ‘মুণ্ডর আখড়া’ হয়ে গেছে পাঁচজনের মুখে। মাস্টারের খাতায় ‘ছত্রছায়া’ কিন্তু লোকের কথায় ছায়ার বললে খাওয়া। তাতে আপনার অত চিন্তা কিসের? কানু হায় না?

কানু ‘সার্ক’ নয় ঠিকই। তেমনি ব্যাপারটাও তো ঠিক কাপড় ধুয়ে সাধা করা নয়। এখানে অন্য সাফাই।

—সিগনেচার ক্যাম্পেন কাল থেকেই শুরু করে দিয়েছি। এখন পর্যন্ত সাতাশটা সই নেওয়া হয়ে গেছে। চেষ্টা করছি কাউন্সিলার শ্যামলীদির সইটা যাতে পাই। কাল দুপুরের মধ্যেই একশ এক সই যুক্ত নাগরিকদের আন্তরিক আবেদন দাখিল করে দেব অনামিকা সঙ্ঘের সেক্রেটারির হাতে। শক্তিনগরে থাকেন বলে শুনেছি। আহা, কুমড়োর ছকটা তো দেখছি তুফপের টেকা। আর আধ হাতা হবে নাকি শ্যামলবাবু?

ছুবনবাবু ছকায় তখনো হাতই লাগাননি, বেগুনিটি সবে দাঁতে কেটেছেন, ভালোমতো চিবোনোও হয়নি। পাতের ছকটি কানুর পাতে তুলে ধানাই-পানাই না করে সোজা-সাপটাই বললেন—

—তুমিই আমায় রক্ষা করলো কানাই।

* * *

ডাক এল দিন দশেক বাদে। অনামিকা সঙ্ঘের কার্যকরী সমিতির তরফ থেকে ‘ছুবন-মোহিনী’ পালকে চা-পানের নিমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। স্বাক্ষর করেছেন ইংরেজিতে Ashoka Guha। অশোক, অশোকা, ইংরেজিতে ‘এ’ টা অপরিহার্য।

‘এ’ নিয়ে একটা সম্মেলন থেকেই গিয়েছিল। কিন্তু অনামিকা সঙ্ঘের দ্বার পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসে কানু একেবারে নিঃসম্মেলন হয়ে গেল। দরজার মুখে সবই গেডিজ প্রিপার্স। আর দরজার ঠিক ওপরেই কাঠের ফলকে লেখা—“অনামিকা”। তলার বন্ধনীর মধ্যে ছোট অক্ষরে মহিলা ‘মজলিশ’।

ছুবনমোহন, বিকল্পে ‘মোহিনী’র এক পা চৌকাঠ ছুঁয়েই ফেলেছিল। কানু একরকম কাঁপিয়ে পড়ে টেনে বাহিরে আনলে পাল মশাইকে। তারপর একরকম হেঁচড়িয়েই টেনে আনলে রাস্তায়।

—আরে বোপারডা কী, তা তো কইবা।

—জোরে পা চালান দাদা। পাড়ার ছোঁড়ার ইট না ছোঁড়ে। ক্লাবটা ফিমেলদের’।

শব্দটা ছুবনবাবুর ধ্বনি। উনি সচরাচর গেডিজ বা মহিলা বলেন না।

—কও কি কানু! এখন উপায়?

—উপায় একটা আছে। আজকাল শুনি এ দেশেও ডাক্তারেরা অপারেশনটা করে। বিলেত আমেরিকায় ছুঁতে হয় না। তবে ব্যাপারটা ঠিক বোষ্টম হওয়ার মতো সহজ নয়। এখন আপনার ইচ্ছে—‘মোহন’ থাকবেন না ‘মোহিনী’ হবেন, নামে নয়, কামেও।

স্ত্রী একটি লিঙ্গ

দিব্যালোচন কলমধারী

লভুর সঙ্গে আপনাদের পরিচয় হয়নি। লভু আমার স্ত্রী। ভাল নাম লতিকা দাস। মহা ধুরন্ধর, ধারাবাহিক। আলুবাহক। না, লতিকাকে তো আলুবাহক বলা যাবে না। বরং কড়াইগুটিবাহক বলি। শুধু বললেই তো হল না। এভিডেন্স চাই। বিয়ে যখন আদালত পর্যন্ত পড়ায় তখন আর বিয়ে বলা যায় না। তখন ‘ম্যারেজ’ বলতে হয়। ছাড়াছাড়ি বলা যায় না। ডিভোর্স বলতে হয়। রোটারী ক্লাবে ক’জন বন্ধু একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করে বসেছিল, ‘ডা. দাস, ইন্ডিয়ান সোসাইটিতে ডিভোর্স এত বেড়ে গেল কেন? আপনার ওপিনিয়ন কি?’ রোটারী ক্লাবে রাত বেড়ে গেলে প্রথম-উত্তরের আসর বসে তা আমার জানা ছিল না। অপ্রস্তুত ছলাম। ক্লাসটা গলায় খালি করে স্বর্গীয় পিতৃদেব, পিতামহ ও প্রপিতামহকে মনে মনে স্মরণ করে বললাম, ‘আমার মতে এর কারণ অতিরিক্ত বিবাহ।’ স্নেহান্বিতের মধ্যে একটা গুল্লন উঠল। তারপর সবাই যে যার গ্লাস গলায় ঢেলে ‘গুডনাইট’ করে বেরিয়ে গেল। আমার উত্তরে সবাই যেন বুকতে পেরে গেল এবার বাড়ি যাবার সময় হয়েছে। সে রাতের মতো আসর ভাঙল।

লভুর কথা বলতে বলতে রোটারীর কথায় চলে গেছি। কড়াইগুটিবাহক লভুর সঙ্গে আমার কিন্তু ডিভোর্স হয়নি। আমার একটা ধারণা আছে যে অধিকাংশ জজই ডিভোর্সী। তারা একজন কাঁদে পড়া সেন্সারী মানুষের কী ন্যায় করবে। এই ধারণা থেকেই আমি ও পথে যাইনি। তারওপর ডিভোর্স আইনে অনায়ত্তাবে খোরপোষ দেবার বিধান

আছে। স্ত্রী স্বামীকে সবকিছু দেওয়া বন্ধ করে দিল। আর স্বামী খোরপোষ দিতে থাকবে স্ত্রীকে। স্বামী একদিকে হাত পুড়িয়ে বেগুন সেকবে। আর খোরপোষের পয়সায় স্ত্রী তার প্রেমিককে চাউমিন খাইয়ে খাইয়ে বড় করবে। অসহ্য। অগত্যা আমি লভুকে সহ্য করেই সংসার করে যাচ্ছি। আজও আমার বাড়িতে শীতকালে এলে দেখবেন লভু সোয়েটার বুনছে। ও মাগ আমাদের সাতপুরুষের কারো না। তবে ঐ মাপের মালিককে একদিন প্রায় ধরতে পেরেছিলাম। যাকে বলে হাতেনাতে ধরা। যে সময় সে লভুকে হাতে ধরেছিল প্রায় সেই সময় আমি ওদের ধরে ফেলেছিলাম। দিনটা ছিল বুধবার। ভর দুপুর। ঐ সময় আমি কোনোদিন বাড়ি ফিরি না। ভগবানই আমাকে ফেরাল। ‘বাড়ি চল। তোকে এভিডেন্স দিচ্ছি।’ সন্দেহ দরজা ভেঙানো দেখেই আমার সম্মেলন হল। পোকা দেখলে টিকটিকিরা যেমন করে হাঁটে তেমন করে ডহিনিং-এ এলাম। শোবার ঘরের একটা দরজা বন্ধ। ভেতর থেকে লভুর গলা পেলাম, ‘তুমি কি ট্যাক্সি ড্রাইভার ছিলে বিজন?’ দুর্জনের উত্তর, ‘তুমি কি ঠেলাগাড়ি নাকি?’ ওদের কথা শুনে আমার কেমন হতে লাগল। অ্যাকশন অ্যাকশন ভাবটা চলে গিয়ে পেশেন্ট পেশেন্ট ভাব হয়ে গেল আমার। ঘাম হচ্ছে। লভু বলছে, ‘জানো বিজন, এসব করা আমার উচিত হচ্ছে না। ডাক্তারের বারণ আছে।’ দুর্জন বলল, ‘কেন ডার্লিং, তোমার কি শরীর খারাপ?’ লভু বলল, ‘না, তা নয়। আমি একজন শচর ডাক্তারের বোঁ।’ দরজার বাহিরে আমি জ্ঞান হারালাম।

কেবল-দর্শন



কেবল রে, তোর ইয়া বিশাল ল্যজ
কোথায় লাগে সব বিষধর সাপ
সেই ল্যাঞ্জেতে উগরে দিলি ঘরে ঘরে
গোটা দুনিয়টার যত পাপ।
রিমোটের বোতাম টিপে এক লহমায়
সব চ্যানেলে সীতার কাট, বাপ।

(ব্যাডের গান নয়)

সব জলে জলকেলি করে হাবুডুবু খাব না আমরা। প্রধানত বাংলা চ্যানেলগুলোয় চোখ রাখব সংস্কৃতির গতিপ্রকৃতির ওপর। হাড্ডাহাড়ি চ্যালেঞ্জ চ্যানেলে-চ্যানেলে। কারণ, একই মাস্টার প্লানের ফটোকপি চলে গেছে সকলের হাতে। কেবল খেঁচামের নামের এপাশ-ওপাশ। আর অ্যাঙ্কাররা কেউ বেশি ডিজে। কেউ কিছুটা শুকনো। যেমন (১) দ্রৌপদীর ভুবন; শ্রীমতী মহল; তঞ্চী তনয়া ইত্যাদিতে মহিলাদের রান্নাঘর থেকে ড্রেসিং টেবিল, সেখানে থেকে আন্ড্রেসিং কোড। (২) এক আন্নার নিচে/এই যদি জীবন হয়/আমরণ জন্মভূমি, ইত্যাদিতে বাপের নাম খগেন করা মহামেগা। (৩) ভিন্নরতিলাল/ভাগ্যের ফুটবল/গ্রহর চুলের মুঠি গ্রহণ ইত্যাদিতে মাথায় হাত-বোলানো ভবিষ্য-বার্তা উইথ চেয়ারের কনটাক্ট নাহার। (৪) ভুলে যাও লজ্জা-শরম/পাড়ার সেরা হীদা/আদম টিঞ্জিং ইত্যাদিতে টিভির শেখানো সিলেবাস। (৫) টেস্ট খপর/ শকুন-কুপ/আজকের পাণারাজি ইত্যাদিতে অপঘাত, দুর্ঘটনা, খুন, বলাৎকার জাতীয় রাজ্যের ভয়াবহ বার্তা (৬) গানে-

দূরদর্শন দুঃসমাচার

গানে অজ্ঞান। অতএব একটা ক্যাসেট/সিডি বার করেছে, এমন অ্যাঙ্কার খাড়া করে, তার পরিচিত কোনো এক-শিল্পীর বিচারকড়ে সঙ্গীত প্রতিযোগিতা। অতিরিক্ত যত্নশা, যখন-তখন অ্যালবামের গান।

ক্রমে ক্রমে সব হবে। আজ শুধু সবচেয়ে কড়, অঘোষিত এবং সব চ্যানেলের কমন আইটেমটা দিয়ে ওপেন করা যাক। আজকের বিষয়—

বিজ্ঞাপনের গরু

লর্ড টেনিসন সমুদ্র-লহরীর তীরে বারবার আছড়ে পড়া দেখে লিখেছিলেন 'Break! Break! Break!' (এ একটা লাইনের Scansion করতে ইংলিশ অনার্স পড়ুয়াদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে); এখনকার টিভি অ্যাডদাতারা তাঁর সেই কথাটা ভাঙিয়ে কোটি কোটি টাকার বিজ্ঞপ্তি করছেন। ব্রেক হ্যাড়া আবার লাগামহীন স্পনসরিং-এর ঘোষণা—সুকুমারী হেয়ার অয়েল। 'হিনেজৌক' (কোনো সিরিয়াল) রাত আটটা কুড়িতে সিদ্দি বাংলায়। বনিভা ফুটওয়ার সংবাদ, রোজ বিকেল পাঁচটায় এখন বাংলায়। প্রতিটি ছায়াছবির ক্ষেত্রে ব্যাপক শেয়ার-হোল্ডার স্কীম। 'রাতজাগা পাখি'-র ঠোট দেখাবে হিন্দুজা ব্যাঙ্ক ও শনশন সাইকেল। মাথা—জয় শ্রীরাম টাইলস। ডান চোখ অনন্ত সুইটস, বাঁ—বাবুলাল ভুজিঅলা। পা—ভীমা লিকুইড সোপ। প্রতি ডানা-র জন্য কম করে এক ডজন ডোনার। হাজারো স্পনসরের সৌজন্যে বার ছোট পর্দায় পুনর্জন্ম, তার সমস্ত সত্তা বিকিয়ে গেছে। যাদের ছাগল তারা যেখান থেকে খুলি কাটবে, ছিঁড়বে...

উপাসনা সবে মানবের পকেটে মেরেলি আখরে লেখা ডেওডোরেন্ট মাখানো চিরকুট আবিষ্কার করেছে—'তুমি সেদিন আমায় আদর করতে করতেন...'

বিনা নোটিশে ভট করে পৌঁছ মেরে ঢুকে এল বিজ্ঞাপনের গরু। শোনা গেল অব-বীট সুরে—'এ কী পালকের সুখ এ ছোঁয়ায়/পুলকে মন যে হারায়/চলো যাই গড়ের মাঠে, তোরে/বাসনা পেঞ্জি ও জাঙিয়া পরে।' এক জোড়া ধুমসো চেহারার পুরুষ ও নারী (উক্ত হোসিয়ারি দ্রব্য পরিহিত) একবার আপনার সামনে কোমর বেঁকাল, তারপর গিছর ফিরে নিতম্ব দোলাল স্ক্রিন জুড়ে। এরপর রেনবো শ্যাম্পু, বক্সেন্সর ঠাণ্ডাপানি, রাইনো ফার্নিচার, সিংলিং-এর ফেংশুই (জ্যোতিষ শাস্ত্রী হরেন্দ্রনাথ আচার্য অনুদিত) ইত্যাদি একশটি অ্যাডের আড়ং ধোলাই খেয়ে ছায়াছবি অবিশ্বাস্য ভাগ্যের জোরে ট্রাকে ফিরে এল। আবার সেই দৃশ্য, গোড়া থেকে। উপাসনা পকেট থেকে বার করেছে...। সুতরাং এ ফিল্ম সবটাই দেখতে গেলে আপনাকেই হতে হবে রাতজাগা পাখি।

গল্পের গরু চিরকালই গাছে উঠত। কিন্তু বিজ্ঞাপনের গরুর কাছে আকাশটাও কোনো লিমিট নয়। যে কোনো গ্রহেও ঘুরে আসতে পারে। আপনার আক্কেল বা কমনসেন্সকে বেমালাম শেকড়সুজ্ঞ উপড়ে ফেলতে পারে। সবাই বিলক্ষণ জানেন, তবু মিলিয়ে নিন।

'চোর। চোর। চোর।'—রাস্তায় চিংকার। এক মহিলার ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে (ইচ্ছাকৃত নয়, তার জন্য অন্য অ্যাড আছে) পালাচ্ছে ভিলেন। রাস্তার মাঝখানে কুড়ি ফুট উঁচু শক্ত সোহার আল দিয়ে ডিভাইডার করা। অন্য পথচারীরা সেবতে পেলেও এদিকে আসতে অসম্ম। হিসেব মশাই চট করে

তার প্রিয় কোম্পানির তৈরি হাওয়াই চম্পল জোড়া পায়ে গলিয়ে নিলেন। তারপর স্পাইডারমানের মতো খাড়া জাল বেয়ে উঠে ওপারে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ভিলেন হাওয়াই-শোভিত, পদাঘাতে ধরাশায়ী। (ফ্রিনের নিচে কোনো সতর্কবাণী নেই)।

ফরমুলা পেয়ে গেছেন। এবার করোলারি টানুন। আমি দুটো বলছি।

১। কোনো মেয়ে জিমন্যাস্ট। বারবার ভালো শুরু করেও শেষ রক্ষা করতে পারছে না। বার-এর ওপর দারুণ খেলা দেখিয়ে পাঁচটা সামারসন্ট খেয়ে ল্যান্ড করার সময় মাটিতে মুখ খুবড়ে পড়ছে। ধরুনটা কী? অ্যাড্‌ একপার্টকে বলতে উনি মুহূর্তে সলুজ করে দিলেন। পরের মীটিং-এ সবকটা ইভেন্টে ফার্স্ট মেয়েটি। কিন্তু তার পরনে টাইট জিমন্যাস্ট-এর ড্রেস নয়, 'অসম্ভব' সিল্ক শাড়ি। রোগান—এ শাড়ি অসম্ভব সম্ভব করে। আপনি নিশ্চিন্তে ভন্ট খেঁতে ও শীর্ষাসন করতে পারেন।

২। সাহেব বিয়ে করছেন বঙ্গলনাকে। কিন্তু গোঁড়া হিন্দুশাস্ত্র মতে বিয়ের সব আচার অনুষ্ঠান হচ্ছে। ডার্জিং চাইছে, তাই সাহেবকে কুশভিকার সময় হাঁটু মুড়ে পিড়িতে বসে থাকতে হবে টানা দু'ঘণ্টা। ধৃতি পরে সুবিধে হচ্ছে না। কেমন সুডুড়ি লাগছে। অসম্ভব অসোয়াস্তি। শেষে এল ব্রাইডগ্রুম প্যাড্‌। প্রায় ব্যাটসম্যানের প্যাডের মতোই দেখতে কিন্তু পরলে শক্ত হাঁটুও মাখনের মতো ভাঁজ হয়ে যায়। রোগান—এ প্যাড পরে আর্থারাইটিস রোগীরাও আট মাসের শিশুর মতো দ্রুত বাবাহামা দিতে পারবেন।

অ্যাড্‌ অ্যাডিকশানের ফল দৈনন্দিন জীবনে ফটাফট চলছে।

আপনার অফিসের তাড়া। ছেলের স্কুলও আছে। গিনি সব চেপেচুপে রান্নার দিকে মনোনিবেশ করছেন। আপনারা কেউ বাথরুমে ঢুকতে পারছেন না। কারণ? মেয়ে স্নান করেছে। একবার শেষ করে, আবার শুরু

করছে। শুশে শুশে সাতাশ বার রোজ। আপে ভাবত, একবার স্নানে সাতাশ বারের কাজ হবে আয়ুর্বেদিক সাবানে। এখন রোজ সাতাশ ধরেছে। তাতে হকের কোনো পরিবর্তন নেই। শুধু ট্যাক্সের জল খালি। সন্তেরোবার পাম্প চলছে। মেয়ের বুকে সার্স-কষ্ট। আপনি তাকে নিয়ে 'বেলেঘাটা যাবেন না লুইসী পার্ক?'

কলিং বেল শুনে দরজা খুলে বেরোতেই সামনে দেখলেন সর্বশক্তিমান দলের এক কম-লাল সেনা। আপনার হাতে সে পুঁজে দিল চাঁদার বিল। আপনি পড়ে দেখলেন। আঁতকে উঠলেন—ন'শ এক। অত্যন্ত মৃদু গলায় বশব্দদ সুরে বললেন, 'এত কেন, ভাই?' ব্যাস্‌। সে ভূতের মতো লম্বা হাত বার করে আপনার ঘাড় ধরল। গলিতে গত রাতের বৃষ্টিতে জমে থাকা জল-কাদার মধ্যে আপনার মুখ ঠুসে ধরল কয়েকবার। তারপর ছেড়ে দিয়ে গর্জে উঠল—'দুবারা মাং পুছনা।'

আজকাল বাপ-মা ছেলে-মেয়েদের বিয়ে দিয়েই তটস্থ থাকেন, এই বুঝি গাঁটছড়া ছিঁড়ল। আমাদের পাড়ায় একই দিনে চারটি মেয়ের বিয়ে হয়েছে। দু-বছর না যেতে একে একে রুমেলি, সঞ্জনা, কবিতা, তিন জনেরই বিচ্ছেদ ঘটে গেছে। শুধু অবজ্ঞিকা এখনো দিব্যি চুটিয়ে সংসার করে যাচ্ছে প্রলব্ধের সঙ্গে। ছেলেও হয়েছে একটা। সাকল্যের রহস্যটা কি। ওদের পঞ্চম বিবাহ-বার্ষিকীতে ফাঁস করলেন অবজ্ঞিকার মা। 'ওদের স্বামী-স্ত্রীর ফটোগ্রাফটা অ্যাড্‌হেসিভ টিউবের সঙ্গে গার্ডার দিয়ে বেঁধে, এ জুটি অক্ষয় থাকুকলিশে, ব্যাকের সেফ্‌ ডিপোজিট ভন্টে রেখে দিয়েছি।'

কি বলবেন একে? পুরনো রূপকথা যুগের কুসংস্কার, না, পোস্টমডার্ন ম্যাজিক রিয়েলিজম? মারকোয়েজ কী বলেন?

—আংকেল বে-আংকেল



ধারাবাহিক রসোপন্যাস

চন্দ্রচন্দ্র

চন্দ্রচন্দ্র
কিনো

(পূর্বপ্রকাশিত-৩য়)

আদিকাণ্ড-৪

ততো জলাশয়াং সর্বা দারিকাঃ শীতবেপিতাঃ।
পাণিভ্যাং যোনিমাচ্ছাদ্য প্রোক্ষেরুঃ শীতকর্ষিতা ॥

—শ্রীমজ্জাগবতম্।

হোলি উৎসবের দিন হোস্টেলের কয়েকজন বন্ধু মিলে ঠিক করল পিকনিকে যাবে। শহর থেকে দূরে নদীর ধারে বনের মধ্যে পিকনিক। পিকনিক মানেই সেদার মজা। বড়লোকের ছেলের পিকনিক। উনুন তৈরি করা, কাঠ কাটা, জল বয়ে আনা, রান্না করা—সবকিছু চাকর-বাকররাই করে। নিজেরা বাহাদুরি মেয়ে হাত লাগিয়ে যেটুকু করতে যায় তার নাম বিশুদ্ধ ওবলেট। চাকররা যখন রান্না করছে বাবুদের ব্যাটারী তখন ব্যাট নিয়ে খানিক পেটাপেটি করল। তারপর সতরঞ্চিপেতে বোতল খুলে বসে গেল।

দুপুরে পেট পুরে খেয়েমেয়ে কিছুক্ষণ গাছের ছায়ায় ঠাণ্ডা চিরে চিৎপাত হয়ে চোখ মুদে রঙ দেখা হল। তারপর দশরথের কি খেয়াল হল। একা-একাই নদীর ধার বরাবর বনের পথে হাঁটা দিল। সবুজ বন, তার ওপরে আছড়ে পড়েছে বসন্তের শেষ বিকেলের সোনালি আলোর বন্যা। মধ্যে দিয়ে চঞ্চলা কিশোরী কন্যার মতো একে বেকে বয়ে যাওয়া একটা ছোট নদী। দু'পাশের গাছগুলো নুয়ে পড়ে নদীর আয়নায় নিজেদের রূপ দেখতে ব্যস্ত। এপাশ-ওপাশ থেকে ভেসে আসছে নানা নাম না জানা পাখির ডাক। আ হা হা। সব কিছু দেখতে দেখতে, শুনতে শুনতে দশরথ তো আনন্দে আত্মহারা। আর হবে না-ই বা কেন? পেটের মধ্যে যে খাঁটি স্কচ।

স্কচ পারে না এমন কাজ পৃথিবীতে নেই। স্বর্গে কি জানি দুটো থাকলেও থাকতে পারে। ঠিক ঠিক ডোজের স্কচ পেটে গেলে পৃথিবীকে কোলে করে শুয়ে থাকা অবস্থাতেই স্বর্গ দেখে আসা যেতে পারে। স্কচের মেহেরবানিতে লোক হিম্মতের শাহেন শা বনে বেতে পারে, আবার অবস্থার ফেরে সেই লোকই সেবদাস হয়ে গিয়ে পার্কের বেঞ্চে শুয়ে কান্না জুড়ে দিতে পারে। দশরথকে বনের পথে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ানো তো সে তুলনায় নসি। ভাগ্য ভালো যে সে কবি হয়ে যায়নি।

স্কচের দৌলতে কবি হয়ে গিয়ে দশরথ জ্ঞানপীঠ কিংবা অ্যাকাডেমি পুরস্কারের জন্যে লাইন লাগাল না ঠিকই কিন্তু সে যা পেল সেটা কোনো নবাব-বাদশাও কোনোদিন পায়নি।

গাছ-গাছালির ফাঁক দিয়ে হঠাৎই দশরথের চোখে পড়ল নদীর একটা ঘাট। শান বাঁধানো সুদৃশ্য কোনো সোপান শ্রেণী-টেনি নয়, নেহাৎই গাছের ওঁড়ি পেতে বানানো পৈঠা। সেই পৈঠাতেই তাঁদের উদয়। দশরথের চোখের সামনেই জল থেকে উঠে এল এক জলপরী। বনদেবীও বলা যায়। উদ্ভিন্ন যৌবনা বনদেবী নান সেরে নদীর জল থেকে উঠে এলে যে অবস্থায় থাকা উচিত, এ ক্ষেত্রেও ঠিক তাই ছিল। স্ফটিকে খোদাই করা মূর্তি, পড়ন্ত সূর্যের সোনালি আলো গায়ে পড়ে পিছলে যাচ্ছে। বসন্তের মলয় বাতাস সর্বাস্থে সোহাগ জানাচ্ছে, পা থেকে মাথা পর্যন্ত কোনো অঙ্গ বাদ দিচ্ছে না। সেবে কেন? সোনার অঙ্গে যে সূতীখণ্ডের চিহ্নমাত্রও নেই।

সেই জনমানবশূন্য গাছ-গাছালি ঢাকা নদীর ঘাটে পাখি আর কাঠবেড়ালি ছাড়া আর কেউ তাকে দেখতে পারে এমন কথা সেই মেয়ে স্বপ্নেও ভাবেনি। তাই লজ্জা পাবার পায়নি অবসর।

নড়ন-চড়ন ছিল একান্তই নিঃসঙ্কেচ। বনদেবী পৈঠায় দাঁড়িয়ে সামনে ঝুঁকে মাথার চুল উন্টিয়ে ঝুলিয়ে দিল। একটাল কালো চুল নেমে গেল হাঁটু পার হয়ে নিচে, শরতের মেঘে ঢাকা পূর্ণ শশীর ক্ষণিকের আবরণের মতো, তারপর সেই মেয়ে আবার পিছনে হেলে মুক্তবেণী এলিয়ে দিল পিঠের পরে। এবারে সর্ব অঙ্গে ভরা পূর্ণিমার জোয়ার। বনদেবী শুকনো কাপড়ে মাথ মুছল, কপাল মুছল, মুখ মুছল, গলা মুছল, মুছতে মুছতে পা পর্যন্ত গেল। সবটাই হল দশরথের গোল হয়ে যাওয়া চোখের সামনে।

স্বীকার করতেই হবে, এ দৃশ্য নবাব-বাদশারও কল্পনার বাইরে। তাদের মাইকেলের আসরে লাখটাকা দিয়ে অর্ডারি নির্মোক উন্মোচন নৃত্য হতে পারে, কিন্তু কোথায় পাবে এইরকম উদ্ভিন্ন যৌবনার স্বাভাবিক নিঃসঙ্কেচ ভঙ্গিমা?

সামনে বনদেবীকে দেখে তারও বনদেবতা সাজার শখ উথলে উঠল। শখ মেটাতে সময়ও বেশি লাগল না। বিশেষ করে সে সাজে সাজতে যখন কোনো সাজগোজের দরকার হয় না।

বিজনেস ম্যানেজমেন্টের ছাত্র দশরথের কালিদাস গড়ার কথা নয়। তব্বী শ্যামা শিখরীদর্শনা পকবিশ্বাধরোষ্ঠী—বলে কালিদাস যতই গদগদ হোন না কেন সেসব হল মহাকবির কল্পনা মাত্র। দশরথকে কোনো কল্পনা-উন্নতির ধার ধারতে হল না। চোখের ওপর একেবারে জলজ্যাস্ত নমুনা— জল থেকে উঠে আসা, জ্যাস্ত।

পৌরাণিক যুগ থেকে আজ পর্যন্ত ভারতের ইতিহাসে বহুহরণ হয়েছে সাকুল্যে দেড়বার। ধৃতরাষ্ট্রের রাজসভার দুর্যোধনের আদেশে মহাবীর দূঃশাসন ওই মহৎ উদ্দেশ্যে দ্রৌপদীর একমাত্র বস্ত্রটি ধরে যথাসাধ্য টানাটানি করেছিল। কিন্তু কৃষ্ণের বদান্যতায় দ্রৌপদী সে যাত্রা রক্ষা পেয়ে গেছিল। অর্ধেক বহুহরণ।

আর পূর্ণ বহুহরণ ওই কৃষ্ণ ভ্রমসোকাটিই করেছিলেন। কালিন্দীর ঘাটে অনেক গোপিনীর বস্ত্র একসঙ্গে হরণ করে উনি কদম গাছের ওপর



চড়ে বসেছিলেন। সময়টা ছিল মাঘ মাস। বেচারি গোপিনীরা জলের মধ্যে শীতে থরথর করে কাঁপছে। কৃষ্ণ তাদের আদেশ দিলেন তোমরা ওই অবস্থায় উঠে এসে আপন আপন বস্ত্র নিয়ে যাও। গোপিনীরা তাই করতে বাধ্য হল। তবে ওই আর কি, প্যানিভ্যাম্ বোনিমাচ্ছাদ্য। দু'হাতের পাতা নিয়ে যতটুকু ঢাকা যায় ততটুকুই লজ্জা নিবারণ। কিন্তু তাতে কি নিজস্ব আছে? গাছের ওপর থেকে আদেশ হল—বছাঞ্জলিং মূর্ছান্যাপনুন্তয়েংহস কৃতা নমোমোবসনং প্রগৃহ্যতাম্।—হাতদুটি জড়ো করে মাথায় ওপর তোল, তারপর প্রণামের ভঙ্গিতে নিচু হয়ে আপন আপন বস্ত্র গ্রহণ করো।

কৃষ্ণ ছিলেন কালো। গোপিনীরা আদর করে ডাকত—কালো। কালো কানুর কীর্তিতুলি কেলোর কীর্তি নামেই বিখ্যাত হয়ে আছে। তার মধ্যে আবার এই কীর্তিটির তো কোনো তুলনা নেই।

আমাদের দশরথ দুঃশাসনও ছিল না, কৃষ্ণও না। কিন্তু নিশ্চিতভাবেই সে ছিল এক নবীন যুবক। এরকম একটা স্বর্গীয় দৃশ্য দেখেও সে যদি উত্তেজিত হয়ে না উঠত তবে তার পুরুষত্ব সম্বন্ধেই সন্দেহ জেগে যেত। সেরকম সন্দেহের অবকাশ দশরথের দেহে কিংবা মনে কোথাও ছিল না। জোয়ার-ভাঁটা খেলার মতো যথেষ্ট রসদ তার শরীরেও মজ্জুত ছিল। তাই সামনে বনদেবীকে দেখে তারও বনদেবতা সাজার শব্দ উথলে উঠল। শব্দ মেটাতে সময়ও বেশি লাগল না। বিশেষ করে সে সাজে সাজতে যখন কোনো সাজগোজের দরকার হয় না।

এটা ঝাপর যুগ নয় যে কৃষ্ণের বাঁশি শুনে গোপিনীরা উন্মাদ মদন মনোরথ পথিক-বঁধুজন জনিত বিলাপে শূন্য কলসি নিয়ে ঘরে ফিরবে আর ঘরের দাওয়ায় পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসবে। যে সময়ের কথা হচ্ছে তখন

কম্পুটার আবিষ্কার হয়নি। ঠিকই, তবে উড়োজাহাজ আবিষ্কার হয়ে গেছে। তখনকার মডার্নি ছেলে-মেয়েরা 'ধর তজ্জা মার পেরেক' থিয়োরিতে বিশ্বাস করতে শুরু করে দিয়েছে। ওই দেহাতি বনদেবীটি হয়ত সেই তজ্জা-থিয়োরিতে ততটা পোক্ত ছিল না, কিন্তু শহরের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া বড়লোকের ব্যাটা দশরথ ওই থিয়োরিতে তখনই যথেষ্ট পোক্ত এবং শক্ত। সুতরাং যা হবার তাই হয়ে গেল। কী হয়ে গেল সেটা আর বিশদে বলা যাবে না। অল্লীলতাব দায়ে সম্পাদকের জেল হয়ে গেলে মনে বড়ই অনুতাপ হবে।

ভার্গব রাজার কন্যা ছিল একজন।

তার গর্ভে এক কন্যা জন্মিল তখন ॥ —কৃষ্ণিবাস

এক সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করে হস্টেলে ফিরে এসে দশরথ তার বইপত্রের মধ্যে কেবলই খোঁয়া দেখতে লাগল। খোঁয়া বললে ভুল বলা হবে, দশরথ অন্ধরের ফাঁকে ফাঁকে স্রেফ নতুন দেখা রমণীঅঙ্গ দেখতে লাগল। ফল যা হবার তাই হল। পরের পরীক্ষায় খাতায় নামিয়ে এল স্রেফ অশ্বভিষ্ম। নম্বর পাবার কথা ছিল একান্তর, সেটা ডিগবাজি খেয়ে হয়ে গেল সন্তোরে।

ওদিকে বনদেবীরও হজম হয়নি। দু'মাসের মাথায় বাড়ির লোকের কাছে ধবা পড়ে গিয়ে দশরথের নাম-ঠিকানা বলে দিতে বাধ্য হল। অবশ্য ঠিকানাটা হল কলেজের। মেয়েটা সেইটুকুই জানতে পেরেছিল।

সে মেয়ের বাপ ছিল সেই দেহাতি গাঁয়ের সরপঞ্চ। ভার্গব সর্দার। আগেকার দিনে এদের বলা হত সর্দার। সরকারি কাগজে এখন সরপঞ্চ লেখা হলেও লোকে এখনো সর্দার বলেই ডাকে। পূর্বপুরুষরা ছিল ডাকাতি আর

নরহত্যা সিদ্ধহস্ত। ইংরেজ শাসনে অপকর্মগুলো কমেছে। কিন্তু রক্তের তেজটা যায়নি। ল্যাজে পা পড়লে ফাঁস করতে ছাড়বে না। মহারানির রাজত্ব তো কি হয়েছে। খুন কা বদলা খুনই যদি না নিলাম তবে আর হারামির বাচ্চার সঙ্গে তফাত কি রইল।

ভার্গব সর্দার লোক পাঠাল দশরথের কলেজে। ছকুম দিল পারলে যেন তুলে নিয়ে আসে। ধড় আর মুণ্ডু আলাদা করে ঠিক ওইখানটাতেই পুতে দেবে যেখানে সে শয়তান সরল আর সাদাসিধা পেয়ে এই বাচ্চা মেয়েটার সর্বনাশ করে গেছে।

কিন্তু যারা খবর অনতে গেল তারা ফিরে এসে শোনাগ এক উন্টো বৃত্তান্ত।

স্বচ পারে না এমন কাজ পৃথিবীতে নেই। স্বর্গে
কি জানি দুটো থাকলেও থাকতে পারে।
ঠিক ঠিক ডোজের স্বচ পেটে গেলে পৃথিবীকে
কোলে করে শুয়ে থাকা অবস্থাতেই স্বর্গ দেখে আসা
যেতে পারে।

দশরথ নামের সেই ছোকরা পরীক্ষায় গাঙ্কু মেরে লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে বাড়ি চলে গেছে। বাড়ি তাদের অযোধ্যায়। আর তার চেয়ে বড় খবর হল দশরথ কোনো হেঁজিগেঁজি বংশের ছেলে নয়। সে হল অযোধ্যার অজয় ঠাকুরের ছেলে। বাবার সুবাদে যা প্রতাপ আর হাঁকডাক তাতে গায়ে চুসকির যা পড়লে লোক পাঠিয়ে পুরো গ্রাম জ্বালিয়ে দিতে পারে। এ বড় কঠিন ঠাই। বুকে সমঝে হাত বাড়ায় সর্দার।

রিপোর্ট শুনে সর্দার গুম্ মেরে গেল। অজয় ঠাকুরের প্রভাব-প্রতিপত্তি লোকবল-অর্থবলের কথা তারও জানা ছিল।

ভার্গব সর্দার গায়ের বুড়োদের সঙ্গে যুক্তি করতে বসল। তারা যুক্তি দিল শুধু শুধু মাথা গরম করাটা ঠিক হবে না। এটা আমাদের সমাজে এমন কিছু নতুন কথা নয়। আগে এমন অনেক হয়েছে। দশরথের ওপর রাগ করে কি লাভ? হাজার হোক তোমার নাতির বাপ তো এখন সেই। এখন যদি তাকে মেরে বদলা নাও তবে নাতি বড় হয়ে আবার তোমার ওপর বদলা নিয়ে নেবে। দাদুর চেয়ে বাপ বেশি আপন হয়। তার চেয়ে দশরথকে আদর-আপ্যায়ন করে ডেকে আনো। সে যদি তোমার মেয়েকে বিয়ে করতে রাজি হয় তো ভালো কথা। রাজি না হলেও বলার কিছু নেই। অজয় ঠাকুরদের সঙ্গে আমাদের অনেক ফারাক।

দশরথ ততদিনে অযোধ্যায় ফিরে গিয়ে বাপের ফেলে-বাওয়া সম্পত্তি দেখাশোনায় মন দিয়েছে। সময় কাটার সঙ্গে সঙ্গে নদীর ধারের কাজকর্মের ঘোরাও অনেকটা কেটে যাচ্ছে। তবে কেলেকারির ভয়ে ব্যাপারটা পুঁবে চেপে রাখতে হয়েছে। বিষয়-সম্পত্তি রাখতে ব্যবসা বাণিজ্য বাড়তে এরকম অনেক কথাই পোপন রাখার অভ্যাস করতে হয়। মনসা চিন্তিতং কর্মং বচসা মা প্রকাশয়েৎ। ভেতরের ঘরে যার বাপের সম্পত্তির দলিল জাল হচ্ছে, বাইরের ঘরে তারই সঙ্গে বসে মদ খাওয়া আটকায় না। কোথায় নদীর ঘাটে কোন মেয়ের সর্বনাশ করে এসেছে, সেটা নিয়ে অযোধ্যাব রাজবাড়িতে বসে দৃষ্টিভ্রম কিছু নেই। সেকালে রাজা দুখ্যত এই কন্ম করেছিল, তো একালে

দশরথের কী সোষ?

দুখ্যন্তের ব্যাপারটার সঙ্গে তফাত এইটুকুই যে বিপদে পড়ে শকুন্তলা দৌড়ে গেছিল দুখ্যন্তের কাছে। এ কালে সর্দার খাতির করে ডেকে পাঠাল দশরথকে। দশরথও বাপের ব্যাটা। বুকের পাটা আছে। সর্দারের ডাক পেয়ে একাই চলল নিমন্ত্রণ রাখতে, একা যাবার কারণটা একদিকে যেমন গোপনীয়তা, সেইসঙ্গে বনদেবীকে আর একবার দেখতে পাবার লোভ। হাজার হোক প্রথম অভিজ্ঞতার মোহময় অনুভূতি। আকর্ষণটা এড়ানো বড় কঠিন।

দশরথ ভার্গব সর্দারের জামাই হল না। এমনকি মেয়েকে একবার দেখতেও দেওয়া হল না। তবে অজয় ঠাকুরের ছেলে হিসেবে জামাই-আদরটা গেল পুরো মাত্রায়। আপ্যায়নের সঙ্গে একটা স্কীল অনুরোধ এল মেয়েকে বিয়ে করার। দশরথ সেটা পত্রপাঠ নাকচ করে দিল। অযোধ্যাব অজয় ঠাকুরের ছেলে রাজ্যসাহেব। কত রাজকন্যা তার জন্যে মালা নিয়ে অপেক্ষা করছে। সে কি একটা দেহাতি মেয়েকে বউ করে নিয়ে যেতে পারে? তবে চিন্তা নেই যে আসছে তার সারা জীবনের খাওয়া পরার ব্যবস্থাটা করে দেবে সে।

ভার্গব সর্দার দাঁতে দাঁত চেপে কথাটা হজম করল। সর্দারের গিন্নি কিন্তু অত সহজে ছেড়ে দেবার পাত্রী নয়। সর্দার পারেনি। কিন্তু বদলা নেবার কাজটা সর্দারগী গোপনে গোপনে ঠিকই সেরে নিল। আর সেটাই হল এই কাহিনীর একেবারে যাকে বলে গোড়ার কথা। সর্দারগী বদলা না নিলে আমাদের এই কাহিনী লেখার সুযোগই হত না।

দশরথকে অযোধ্যায় পৌঁছে দেবার জন্যে ভার্গব সর্দার একটা জ্বরদস্ত লোক সঙ্গে দিয়েছিল। অযোধ্যায় পৌঁছে বিদায় নেবার সময় মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে সে বলল—রাজ্যসাহেব, আপনি ধরতে পারেননি। আমাদের সর্দারগী কিন্তু আপনার ওপর পুরো বদলা নিয়ে ছেড়েছে।

ঝামেলাটা ভালোয় ভালোয় মিটে গেছে মনে করে দশরথ এতক্ষণ বেশ খোশ মেজাজেই ছিল। অতদূর থেকে সঙ্গে আসা লোকটাকে বখশিস দেবার জন্যে দশটাকার একটা নেটি পকেট থেকে বারও করেছিল। কিন্তু সেইমুহুর্তে এরকম একটা বেয়াড়া কথা শুনে দশরথের চোখ দুটো টারায় হয়ে গেল।—বদলা!!

—হ্যাঁ রাজ্যসাহেব। আমাদের সর্দারগী আপনাকে খাসি করে দিয়েছে। অনেক জড়িঝুটি জানা আছে তার। খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে আপনাকে খাইয়ে দিয়েছে। এখন আপনার আর নিস্তার নেই। আপনি এবারে জন্ম ভোর নির্কর্মা হয়ে থাকবেন। আমাদের সর্দারের যে নাতি কিংবা নাতনি হবে, ওটাই হবে আপনার একমাত্র সন্তান। এটাই আপনার শাস্তি।

দশরথ সদ্য সদ্য এম এ ফেল করা মর্ডান যুবক। রক্তের তেজ অসাধারণ। লোকটাকে তেড়ে ধমক লাগল, —ভাগ। যন্তসব।

তখন রক্তের জোরে লোকটাকে তড়পে দিয়েছিল। কিন্তু আড় চন্নিশ বছর পরে রক্তের জোর অনেক কম। তার ওপর হাতে পাজি মঙ্গলবার তো দেখাই যাচ্ছে। এত বছর এত চেষ্টা করেও তিন তিনটে মেশিনের একটাতেও কোনো প্রডাকশন হল না, এখন আর অতটা জোর দিয়ে 'ভাগ' বলা যাচ্ছে না। উন্টে মনের মধ্যে খটকাটা দিনে দিনে চেপে বসছে। আর সবচেয়ে বড় বিপদ এই যে কথাটা প্রাণ খুলে মন খুলে মুখ খুলে কাউকে বলাও যাচ্ছে না।

তবে একটা কথা মানতেই হবে যে সেই সর্দারগী বুড়ির জড়িঝুটির জোর আছে। এই চন্নিশ বছর পরেও সমানে কাজ করে চলেছে।

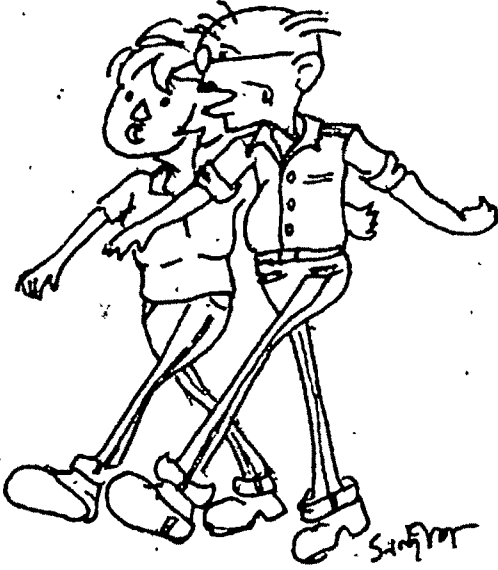
(হুমশ)

টীকা নিম্নরোজন

বাঙালির বিশ্বায়ন

বুনো রামনাথ

বাঙালির বিশ্ব-জয়যাত্রা



খোল-নলচে সবই পাশ্টে গেছে। এখন 'গড়গড়া' বললে লোকে মনে করতে পারে আমি বৃষ্টি পড়ের মাঠে গড়াগড়ি দিয়ে হাওয়া খাওয়ার কথা বলছি।

ভুল। গড়ের মাঠের কথাও কবে ভুলে মেরে দিয়েছে বাঙালি। অনেক জল গড়িয়ে গেছে গড়ের মাঠের ওপর দিয়ে ইতিমধ্যে। এখনঃ ব্রিগেডে চলো। সেদিনের গড়গড়া, গড়ের মাঠ, গড়পার, পরাগহাটা গ্যাঁড়াতলা এদিনের বাঙালির কানে বেসুরো বাজে। শব্দগুলোর তেমন রেওয়াজই নেই আজকাল।

বস্তুত বাঙালির বোলচালই বদলে গেছে আজ। যাবারই কথা। যাচ্ছেও। এখনো সেই সাবেকি গড়ের মাঠকে আঁকড়ে থাকলে 'ব্রিগেড চলো'র ডাকে সাড়া দেবে কে? পার্টি পলিটব্লের গীঠস্থান সেই ব্রিগেডে গুপ্তির পিণ্ডি দেওয়ার ব্যবস্থাটা করবে কারা? গড়ের মাঠের হাওয়া খেয়েই তো বাঙালির আজ এই অবস্থা। তাই লেফট-রাইট সব পার্টিই আজ ব্রিগেডে বাঙালিকে

বাঙালির বোলচালই বদলে গেছে আজ।
যাবারই কথা। যাচ্ছেও। এখনো সেই সাবেকি
গড়ের মাঠকে আঁকড়ে থাকলে 'ব্রিগেড চলো'র
ডাকে সাড়া দেবে কে?

থেকে থেকেই লেফট-রাইট করছে। হালটা যদি পান্টানো যায়। 'গড়ের মাঠ' শব্দটি বা শব্দযুগলটি পঞ্চদশ লাভ না করলেও প্রাচীনত্ব বা 'আর্কেয়িক-ত্ব' লাভ করেছে। কিন্তু ধর্মঘট, সত্যগ্রহ? সেগুলো আবার কোথায় পালাল? একই পথে। ধর্ম এখন ঘটের মধ্যে। সত্য অন্য গ্রহে। ওসব কলোনিয়াল যুগের ধর্মঘট, সত্যযুগের দিন ফুরিয়ে গেছে। এখন বাঙালির চিন্তায় বন্ধ বিকল্পে বাঁধ। বন্ধ বলতে হয়ত 'বন্ধ'-ই বোঝায়। আর বাঁধ কি নদীর বাঁধ? অর্থাৎ বেঁধে দেওয়ার বা বাধা দেওয়ার কোনো প্রক্রিয়া বোঝায়? ঠিক জানি না। কিন্তু ধর্মঘট বা সত্যগ্রহ'র মূল উদ্দেশ্যটাও তো অনেকটা তাই। সে ক্ষেত্রে বন্ধ, বাঁধ নিয়ে এত হীকাহাকি ডাকাডাকি কেন আজকের প্রজন্মের? 'বন্ধ' শব্দটি যতদূর মনে হয় হিন্দি বা উর্দু হবে। সাদামাটি বাংলা শব্দ

আর কালেভদ্রে ধুতি যাঁরা পরেনও সে
ধুতি ধনেখালির পাছাপেড়ে শাড়িকে
লজ্জা দেয়। এমনিই তার ধাক্কার বহর।
সর্ব ফুলের বুটিতোলা জমকালো রংদার
আজানুলম্বিত পাঞ্জাবি। পায়ে কিন্তু
পাম্পসু নয়। কোলাপুরি।

'বন্ধ' থাকতে আবার 'হসন্ত'র জুতো পরানোর হেতুটা কি, ঠিক বুঝি না। শুধু বোলচালে কেন, সাজগোজেও বাঙালির আর সে বাবুয়ানি নেই। বিয়ে থাওয়া, পুজো-পার্বণে ধুতি-পাঞ্জাবি পরা বাঙালি ভবলোক মাঝেমধ্যে চোখে যে পড়েনি তা নয়, পড়েছে। তবে কুর্তা-পাজামা পরাই বেশি নজরে আসে। আর কালেভদ্রে ধুতি যাঁরা পরেনও সে ধুতি ধনেখালির পাছাপেড়ে শাড়িকে লজ্জা দেয়। এমনিই তার ধাক্কার বহর। সর্ব ফুলের বুটিতোলা জমকালো রংদার আজানুলম্বিত পাঞ্জাবি। পায়ে কিন্তু পাম্পসু নয়। কোলাপুরি।

তবে কুর্তা-পাজামাই আজকের বাঙালির স্ট্যান্ডার্ড ইউনিফর্ম। কচিৎ সিকের, বেশিরভাগই টেরিকটের বা নাইলনের। পদযুগলে চমক—কোলাপুরি থেকে শুরু করে নানান রকমারি। তরুণ-তরুণী আর তারুণ্যের জোয়ার এসেছে মনে এখন মাঝবয়সীদের, ইউনিফর্ম কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন। জীন্স, টি-সার্টই এদের একমাত্র পায়ের মোড়ক। সর্ব ঘটে, সর্ব সময়, সর্ব কাজে। বাঙালি এখানে বাঙালিপনা বিসর্জন দিয়ে পুরোপুরি আন্তর্জাতিক হয়ে উঠেছে। হবারই কথা। যুগটিই যখন বিশ্বায়নের তখন কুপমণ্ডকের বদনাম করাতে যাবে কেন বাঙালি তরুণ-তরুণীরা? জ্যোতিবাবু বুদ্ধদেববাবুর কথা আগাদ। বাঙালির নেতা ওনার। সাবেকি আটপৌরে-ধুতি-পাঞ্জাবিতেই

আজ বিশ্ববন্ধর কান্ডে-কুড়ুল চালিয়ে যাচ্ছে ওনারা নির্বিবাদের। “ব্যস্ত লেবেল” বলেও তো একটা কথা আছে।

খাবারেও রুচি পাশ্চাত্যে বাঙালির। কলকাতায় গুটিকয়েক স্টার-মার্কা হোটেল বাদ দিলে ব্যাটিকচড়ি, ডাব-চিংড়ি, পাটস্কীর, কৈ-পাতুরি কটা গেরস্থ বাঙালির হেসেলে রান্না হয়? দইকর্মা আর নারকেলের নাড়ু খাবার ইদানীং খুব নোলা হয়েছে আমার। কিন্তু তারকাবহুল হোটেলের পোয়ানিজ ‘সেফে’রা এখনো পর্যন্ত ওগুলো ঠিক মজা করে উঠতে পারেনি। রেসিপিটাও মা-দিদিমা লিখে যাননি যে ওদের সেব।

হেসেলে, রান্নাঘর এখন শুই গড়গড়া, গড়ের মাঠের মতোই ‘আর্কেটিক’ শব্দ বাঙালির-অঙ্গর মহলে। কিচেনে কুকার নিয়েই ‘থ্রেস্টিজ’ বজায় রেখেছেন বাঙালি বৌমারা। কড়া-খুঁটি এখন শুনিতির মধ্যেই আসে না। মেনু কী? চাইনিজই অভিজ্ঞত। মাঝে মধ্যে মোগলাই বিরিয়ানি চাপ কষা—মশ জমে না। আর তেমন তেমন হলে নিচে নেমে রান্নায় বেরুলেই চারদিকেই

সোরগোল-রোল। রবিবাবুতো বহুদিন আগেই তবিষ্যৎবাণী করে ছিলেন, ভাত ডাল মাছ পখ্য করে আর কতকাল চলবে। চলেনি।

রবিবাবুর নাম ওঠায় পানের কথাটা এসে গেল। যদিও জীবনমুখী গানের বাজার এটা তবুও রবীন্দ্র সঙ্গীত এখনো ঠিক মরণমুখী হতে পারেনি। টিকে আছে। কেউ কেউ অবশ্য বলে “মরণেরে তুঁছ মম শ্যাম সমান” মরণ-মুখী না তো কী? আমার কিন্তু ঠিক প্রত্যয় হয় না। বারে-বারেই তো শুনি পানটা। বারে-বারেই আমার জীবনে কে ভালোবাসতে বলে শুই গান। আমি কি তবে বধির না কি ঘর-জামাই!

একদিন ছিল, বাঙালির পুজোমণ্ডপে ঢাকের বাদ্যি বাজত। এখনো বাজে। হিন্দুজীবির গানের ফাঁকে ফাঁকে। এবার পাড়ার পুজোয় ঢাক-ডোল-তাসা-চড়বড়ি অনেকটাই বিয়মাণ মনে হলোও বাংলা ব্যান্ড ‘ভূমি’-কম্প ডেকে এনেছিল। বাংলা গানের এবার বোধহয় সত্যি-সত্যিই ব্যান্ড বেজে গেল। তা বাজুক। জীবনমুখী তো। ঢোল পিটিয়ে কি শুধু শব্দবাহাই হয়।

মালামাল

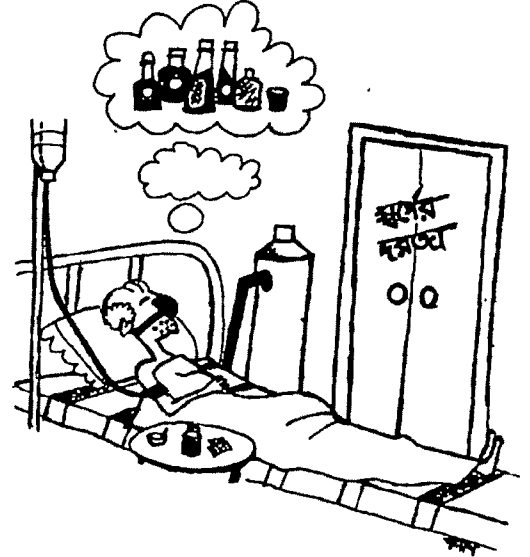
দিব্যেন্দু দাস

জন্মের পর সন্ধান তার মা, বাবা ও স্ত্রীর হাত পায়। আমার দাদা শশীভূষণ বাবার মতো লম্বা, মার মতো চাপা আর বৌদির মতো কুচুটে হয়েছিল। আমার ছোটকাকা দমকলে চাকরি করত। বিয়ের পর কাকা দমকলের খণ্টা বাজানোয় খুব নাম করেছিল। এমনটা দমকলের ইতিহাসে আগে কখনো ঘটেনি। আমার ছোটকাকি দুধের সাইড-ব্যবসা করত। কাকাকে দিয়ে বারোমাস গাই দোয়াতো। তাই কাকা দমকলে অত নাম করেছিল। আমার বস চ্যাটার্জি সাহেব হঠাৎ একদিন অকসেসে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। ‘তৈতুল’ ‘তৈতুল’ বলে জ্ঞান হারালেন। আমরা তাড়াতাড়ি বাড়িতে খবর দিলাম। ওঁর বড়ছেলে এসে একটু তৈতুল সাহেবের জিতে ঠেকাতেই চোখ মেলে উঠে বসলেন সাহেব। তাই দেখে আমাদের চোখ উন্টে গেল। পরে ওঁর বড়ছেলে জ্ঞানাল যে তার মামার বাড়ি কুরুবান্দপুরমে। অতাইয়ার ফ্যামিলি। চ্যাটার্জি সাহেবরা বাড়িতে তৈতুলজল খেয়ে তৃষ্ণা মেটান।

এসব ঘটনাই প্রমাণ করে যে মানুষ বাবা-মা ছাড়াও স্ত্রীর হাত পায়। আবার অনেক সময় বাবা-মাকে ছেড়ে শুধু স্ত্রীর হাত নিয়েই থাকে অনেকে। তারা শান্তিকামী। যুদ্ধবিরোধী। মেট্রোতে যারা ঝাঁপ দিচ্ছে তারা এদের দলে নয়। ছাপোষা মানুষের মনের সাইজ ব্রেডের খাঁপের চেয়ে বড় হয় না। সেখানে বাবা-মা-স্ত্রীকে একসঙ্গে জায়গা দিলে নিজেকে রেললাইনে গিয়ে শুতে হয়। এও এক সত্যি।

বাবা অ্যালকোহলের পুজারী ছিল। নিত্য-পুজারী। ভোর হুটায় শুরু করে ভোর হুটায় শেষ করত। আর বলত, যা রেখে যাব তাতে মালামাল হয়ে যাবি।

এশিয়া মহাদেশে এক গোলাধ থেকে অন্য গোলাধে চলে গেল। কিন্তু বাবা সেই গ্রাস নিয়েই বসে রইল।



বাবার বন্ধু ছিলেন বিশ্বনাথ দত্ত। বাড়ির চেয়ে হাইকোর্টে বেশি থাকতেন। নামকরা অ্যাডভোকেট। আমরা কোর্টকাকা বলতাম। বাবার যাবতীয় ওপেন-গোপন, সু-আইনি কু-আইনি দেখত এই কোর্টকাকা। সব কাগজপত্র থাকত তাঁর কাছে। বাবা মারা যাবার সময় বলে গেল যে উইল করা আছে কোর্টকাকার কাছে। সেই শুনে দাদা আর স্বাশানে না গিয়ে সোজা কোর্টকাকার চেম্বারে চলে গেল। কোর্টকাকা জ্ঞানতে চাইলেন, বিধুভূষণ কই, দাদা বলল, তাই বাবার সঙ্গে সহমরণে গেছে। আপনি বাবার উইলটা দিন।

কোর্টকাকা দাদাকে চিনতে। দীতে ব্যথা বলে দু’ঘণ্টা ঠেকিয়ে রাখলেন। আমি দাঁহ সেরে ভিজ্জে কাপড়ে গিয়ে উঠলাম কোর্টকাকার চেম্বারে। তখন দু’ভায়ের সামনে বাবার উইল বের করে কোর্টকাকা জোরে জোরে পড়লেন—

“আমি আমার যাবতীয় স্বাবর-অস্বাবর সম্পত্তি মালের পেছনে খরচা ফেলেছি। প্রচুর খালি বোতল রইল। যোগ্য পুত্র হিসেবে আমার আত্মার শান্তির উদ্দেশ্যে ওগুলো ভরে দিও।”

প্রতীক্ষা

চুনিলাল মুখোপাধ্যায়

গল্প

চাঁদের কাপে চুমুক দিয়ে সমীর বলল, জানি বিরহের কথা বললেই লোকে রোমিও মজনু কিংবা দেবদাসের উদাহরণ দেবে। তোমরা তো সব শিক্ষিত, আজকালকার ছেলে। তোমরাও কি একই রকম চিন্তা করো?

উপস্থিত সকলে নিশ্চিত হল—সমীর আজ যে গল্প বলবে তা প্রেমেরই গল্প। তবে তার মধ্যে বিরহ জ্বালার পান্নাটা একটু ভারী হবে। গল্পটা শোনবার জন্য সমীরকে একটু উসুকে দেবার প্রয়োজন আছে। মনের সেই উদ্দেশ্য গোপন করে শুভেন্দু বলল, রোমিও বা দেবদাসের ভালোবাসার কথা এমনভাবে চিত্রিত হয়েছে যে মানুষের মনে দাগ কেটে গেছে। যদি আরো একটি কাহিনী এইভাবে অঙ্কিত হয় তাহলে মশ কি? আপনার কি শোনা আছে এমন কোনো উপাখ্যান, সমীরদা?

সমীর চোখ বন্ধ করে চিন্তার ভঙ্গিতে বলল, শুধু শোনা আছে বলছ কেন? এ ঘটনা তো আমার নিজের জীবনের। শোনো তবে। আমার এখনকার চেহারা দেখেই বুঝতে পারছ বৌবনে কিরকম সুপুরুষ দেখতে ছিলাম আমি। এর জন্য বাবার কাছে কম বকুনি খেয়েছি।

দেবরত কিছু বুঝতে না পেরে বোকার মতো প্রশ্ন করল, তা, ছেলে সুপুরুষ হলে বাবা বকতে যাবেন কেন? আপনার বাবার কি হিংসা হত?

কমাসুলভ দৃষ্টিতে তাকিয়ে সমীর বলল, না, তা হতে যাবে কেন? সকালের দিকে আমি বাজারে যাবার পথে দেখতাম পাড়ার পরিচিত সব মেয়েরা জানালায় দাঁড়িয়ে আছে। একবার চোখাচোখি হলেই হল। একগাল হেসে আমাকে চা খাবার জন্যে ডাকত। তারপর এক-কথা সে-কথার পর কেউ বলত আমাকে ওদের ইলেকট্রিক বিলটা জমা দিয়ে আসতে, কেউ বলত লাইব্রেরির বই ফেরত দিয়ে নতুন বই নিয়ে আসতে। কেউ বা বেড়াতে যাবে, নাকি সুরে আন্কার করত রেলের টিকিট কেটে দিতে। একদিন এক বাড়িতে এরকম চুকেছি হাতে বাজারের থলি নিয়ে। বাড়ির মেয়েটা কাঁদো-কাঁদো সুরে বলল, জানো সমীরদা, সর্বনাশ হয়েছে। অত বাছাবাছি করে নীল রঙের শাড়িটা কাল নিয়ে এলাম, ভাবলাম সবাইকে টেকা দেব এবার সব্বতী পুজোয়, কিন্তু আজ সকলেই চিত্রা এসে দেখিয়ে গেল সেও একই দাম দিয়ে একই রংয়ের শাড়ি কিনে এনেছে। সাড়ে দশটায় দোকান খুললেই তুমি কিন্তু এটা পাল্টে গোলাপি রঙের শাড়িটা নেবে। তুমি একদম দেরি করবে না। স্নিগ্ধ। একটা পিস্ মাত্র পড়ে আছে দোকানে। ওটা বেহাত হয়ে গেলে আমি কারো কাছে মুখ দেখাতে পারব না। তুমি বরং দোকান থেকে ফিরে এসে চা খেয়ো। আমি নিজের হাতে চা বানিয়ে আজ তোমাকে খাওয়াব। এইবেলা উঠে পড়ো।

এ-বাড়ি ও-বাড়ি হুঁ মেরে বাজারের থলি নিয়ে বাড়ি ফিরতে ফিরতে বেলা হয়ে যেত। শুদিকে বাবার কোর্টে যাবার তাড়া। বাবা ছিলেন উকিল। বেশিরভাগ দিনই বাজার থেকে আনা মাছ রান্না হবার আগেই তাঁর খাওয়া হয়ে যেত।

শুভেন্দু বলল, পাড়ার মেয়েরা যে আপনাকে বেগার খাটিয়ে নিচ্ছে তা বোধহয় বুঝতে পারেননি আপনি?

সমীর বলল, ঠিক তাই। আসলে ঐ বয়সে ছেলেরা খুব দিলদরিয়া হয়। কি পেলাম কি পেলাম না—ওসব হিসেব নিয়ে ভাবতে বসে না। একদিন পাড়ারই এক কিশোরী একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলল। বাড়িতে ডেকে আমাকে চা খাইয়ে তার মা-বাবার অজান্তে আমাকে টাকা দিল সিনেমার দুটো অগ্রিম টিকিট কেটে আনতে।

দেবরত জ্ঞানতে চাইল,—আপনাকে নিয়ে সিনেমা দেখার মতলব ছিল বুঝি তার?

সমীর ঘান হেসে বলল, 'হ্যাঁ, সেদিন আমারও তাই মনে হয়েছিল বটে। ঐ একদিনই আমি বাজার নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরেছিলাম। কিন্তু সিনেমার টিকিট হাতে পেয়ে কিশোরীটি তার মনের আনন্দ গোপন রাখতে না পারলেও টিকিট দুটো নিয়ে কে কে সিনেমা যাবে তা অবশ্য গোপন রেখেছিল। আমারও কৌতুহল বাড়ল। সন্দের সময় সিনেমাহলের পাশে দাঁড়িয়ে শালপাতার প্লেটে খুগনি খাচ্ছি। দেখলাম, কিশোরীটি অন্য একটি ছেলেকে নিয়ে হলে ঢুকল। মনটা খারাপ হয়ে গেল। মনের বেদনা লাঘব করার জন্যে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সময় কাটিয়ে বাড়ি ফিরতে একটু যেন দেরিই হয়ে গেল। বাবার কাছে খুব বকুনি খেয়ে ঠিক করলাম, বোম্বাই চলে যাব। ওখানে ঘোরাফেরা করলে সিনেমায় নামবার সুযোগ একটা এসেই যাবে। দশ-পনেরো জন বন্ধুর কাছ থেকে কিছু কিছু করে টাকা ধার নিয়ে আমি চলে গেলাম বোম্বাই। মনে আশা, যদি চোখে পড়ে যাই কোনো পরিচালকের কিংবা



নায়িকার অথবা নায়কের, কমপক্ষে খল-নায়কের। বাড়িতে একটা চিঠি লিখে রেখে সাতসকালে বেরিয়ে পড়লাম।

বোম্বাই পৌঁছে খুঁজেপেতে একটা কম পয়সার মেসে উঠলাম। মেসেই কয়েকজন যুবকের সঙ্গে পরিচয় হল। তাদের মনেও উচ্চাশা—সিনেমার নায়ক হবার। দেখলাম ভারতবর্ষের সব প্রদেশের ছেলেই এসে জুটেছে সেখানে—মাদ্রাজি, গুজরাতি, রাজস্থানি, এমনকি কুলবস্ত সিং নামের এক সর্দারজি আছে। একই পথের পথিক সবাই, নিজাদের মধ্যে ভাব-ভালোবাসা হতে পেরে হল না।

রাহে বিছানায় যাবার সময় মায়ের জন্যে মন খারাপ হত খুব। আগে কখনো মা-বাবাকে ছেড়ে থাকিনি। আমি তাদের একমাত্র সন্তান। আমাকে ছেড়ে থাকতে তাদেরও নিশ্চয়ই কষ্ট হচ্ছে খুব। শেষে থাকতে না পেরে মাকে একটা চিঠি লিখলাম। কি ভাবে অল্প টাকা নিয়ে বোম্বাই চলে এসেছি, কিভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার লক্ষ্যে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি সেইসব কথা জানানলাম। চিঠিতে অবশ্য মেসের ঠিকানাও দিয়েছিলাম। আমার বন্ধমূল ধারণা হয়েছিল আমার চিঠি পেয়ে বাবার মন কিছুটা নরম হবেই। বাবা মুখে তর্জন-গর্জন করেন ঠিকই, কিন্তু মনে মনে আমাকে ভালোবাসেন বলেই আমার বিশ্বাস ছিল।

—তা ভালোবাসা বা বিরহ সম্বন্ধে কী যেন বলছিলেন? সেই স্বর্গীয় ভালোবাসার কী হল? শুভেন্দু জানতে চাইল।

একটু রূপ করে থেকে সমীর বলল, এই অনুভূতিকে স্বর্গীয় বলবে কি না ঘটনাটা পুরো শুনে সে বিচার তোমরা নিজেরাই করবে। যাই হোক মাকে আমার উদ্ভল ভবিষ্যতের আশ্বাস দিলেও প্রার্থিত যোগাযোগ তখনো পর্যন্ত কারোর সঙ্গেই হয়নি। ওদিকে গকেটের পয়সা শেষ হতে চলেছে। আর হবে নাই বা কেন? সিনেমায় নামতে এসেছি শুনেই ধান্দাবাজ লোকেরা আমাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আমাদের পরসায় কত যে ছোট্টেলে খেল, কতবার যে ট্যান্ডিতে চড়ল তার ইয়ত্তা নেই। আমিও তখন পরিস্থিতির শিকার হয়ে পড়েছি। মেসের বন্ধুদের কাছেও ধার করেছি কিছু টাকা। মাকে চিঠি লিখেছি দিন-দশেক হল। মা-বাবার কথাই ভাবছি জানালার পাশে দাঁড়িয়ে। বিশেষ করে বাবার কথা। আমার জন্যে কি তাঁর চিন্তা হয় না একেবারেই?

এমন সময় সেই অপ্রত্যাশিত ঘটনাই ঘটল।

সেদিন আমি মেসে একাই আছি। বলা যায়, খানিকটা মনমরা ভাব আমার। অন্যেরা সব ভাগ্যান্বেষণে বেরিয়েছে। ঘড়িতে এগারোটা বাজে। সেদিনই প্রথম তাকে খেয়াল করলাম। রাত্তা দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ আমাদের মেসের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। বাড়িটাকে বোধহয় নিরীক্ষণ করল একটু। ভেতরে আসবে কি আসবে না তাই নিয়ে সামান্য জড়তা, বিধা কিংবা কুঠা। মুহূর্তকাল পরে সাবলীল ভঙ্গিতে দরজার কলিংবেলে হাত রাখল। মেসে তো আর কেউ ছিল না। আমি সোৎসাহে ছুটে গিয়ে দরজা খুলতেই তার সঙ্গে চোখাচোখি হল। কী প্রথম সেই দৃষ্টি। আমার অন্তরে কোনো পাপ আছে কিনা, কোনো কপটতা বা শঠতা আছে কিনা তাই বুঝি যাচাই করে নিল। কিন্তু তোমরা তো জানো, বিবেকের কাছে আমি চিরকাল পরিষ্কার। আমার সত্য পরিচয় পেয়ে খুশি হয়েছিল সে। সুগঠিত চোঁটের কঁাকে দুই সারি মুক্তা দেখে আমারও যে কী আনন্দ হয়েছিল সেদিন।

তোমরা কি বিশ্বাস করো না, মানুষের জীবনে কোনো বিশেষ সময়ে কোনো বিশেষ ব্যক্তির আগমন খুব স্বরূপীয় হয়ে থাকে? আমারও তাই হল। তখন আমার যা অবস্থা তাতে আমার রোজ মনে হতে লাগল—সে আবার

কবে আসবে? এগারোটা বাজলেই আমি তৃষিত চাতকের মতো জানলার ধারে দাঁড়িয়ে থাকতাম। প্রতিদিন তাকে দেখতেও পেতাম। পরিচিত সাবলীল ভঙ্গিতে হেঁটে চলে যেত সে। দূর থেকে তাকে দেখলেই আমার মনের কোণে আশার আলো জ্বলে উঠত। জানতাম, আমার বাবার জন্যই সে আশা পূরণ হয়ত হবে না। অমন কড়া ধাতের মানুষকে কে বোঝাবে? চিংকার করে বলতে হচ্ছে করত—বাবা, তোমার মানসিকতাটা একটু বদলাও। ছেলের কষ্ট বোকবার চেষ্টা কর।

শুভেন্দু বলল, তা আপনি বাবাকে চিঠি লিখে খোলাখুলি সব জানানেন না কেন? বাবা রাজি হলে তো আপনাকে এত কষ্ট পেতে হত না।

সমীর উত্তর দিল, তা তুমি ঠিকই বলেছ। আসলে বাবা আমাকে বকুনি দিয়েছিলেন বলেই তো আমি বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছিলাম। নিজের পায়ে না দাঁড়ালে আর ফিরে যাব না ঠিকই করেছিলাম। সুযোগ না আসা পর্যন্ত সব কষ্ট সহ্য করে যাব বলে মনস্থ করেছিলাম। বলতে পারো অভিমান করেই বাবাকে আমি কিছু জানাইনি। আবার এদিকে বাবা সদয় না হলে আমার কষ্টেরও লাঘব হয় না। অবশ্য আমার কষ্টের কথা মা যে বাবাকে বলেছিল তা পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ থেকে প্রমাণিত হয়।

সিদ্ধার্থ প্রশ্ন করল, সমীরদা, পাড়ার মেয়েরা তোমার সাথে যে ধর্মশের ব্যবহার করেছিল ও কি তাই করবে বলে তোমার ধারণা হয়েছিল?

একটা সিগারেট ধরিয়ে সমীর বলল, না। বরং উল্টোটা। ও যে কখনোই আমাকে শাড়ি পাণ্টে এনে দিতে বলবে না বা সিনেমার টিকিট আনতে বলবে না, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত ছিলাম। তার মাতৃভাষা ছিল মারাঠি, যদিও আমার সঙ্গে ইংরেজিতেই আলাপ করেছিল। ওকে নিয়ে আমি একখানা কবিতাও লিখেছিলাম। কিন্তু আমার ছাদয়ের আবেগকে ও কিভাবে নেবে তা চিন্তা করে সঙ্কুচিত হয়ে নিজের সৃষ্টিকে নিজের খাতাতেই রেখে দিয়েছিলাম। বলতে পারো আমি খানিকটা মজ্জমুজ্জের মতো হয়ে গিয়েছিলাম। বেলা এগারোটা বাজলেই হল, আমি তার পথপানে চেয়ে থাকতাম, যদি সেদিনের মতো রাত্তা দিয়ে চলতে চলতে তার পা দু'খানি আমাদের মেসবাড়ির সামনে ধমকে যায়, যদি আমাদের বাড়ির দিকে চোখ দুটি তুলে...

সেবরত্নকে আবেগ যেন পেয়ে বসল। সে বলে উঠল, সমীরদা, বলছেন যখন বলুন না কেন পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে...

সমীর খেমে বলল, তা তোরা পরে সাক্ষিয়ে নিস, সে স্বাধীনতা তোদের দিলাম। যাই হোক, একমাস পর আমার প্রতীক্ষার অবসান হল। সে আবার এসেছিল। আবার আমার নাম ধরে ডেকেছিল, আমার সাথে কথা বলেছিল। এই ঘটনার দু'দিন পর আমি বাড়ি ফেরবার ট্রেন ধরি। তার সাথে আমার আর কখনো দেখা হয়নি।...

নিজের কথা শেষ করে সমীর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই সকলে তাকে হেঁকে ধরল,—দাদা, আপনি তার নাম কিংবা ঠিকানা কিছুই নিলেন না। এত শক্ত মনের মানুষ আপনি।

সিগারেটের শেষ প্রান্তটুকু জুতোর তলায় পিবে সমীর বলল, নাম জেনে আর লাভ কি হত আমার? তবে পরিচয়টা প্রথম দিনেই পেয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু এ পাড়ার মানি-অর্ডার বিলির মারাঠী ডাকপিওন যুবকটি আর কোনোদিনই সদয় হল না। বাবা কবে টাকা পাঠাবেন এবং সেই টাকা নিয়ে এই ডাক-পিওনটি আমাদের মেসে আসবে আমি সেই প্রতীক্ষাই করতাম। দ্বিতীয়বার টাকা পাঠানোর সময় বাবা লিখেই দিয়েছিলেন—এটাই শেষ, এর পর কোনো টাকা আর তিনি পাঠাবেন না।

ফজল আলির ফাদলানি

বা বা নাম রেখেছিলেন ‘নেপোল’। পাড়ার লোকে বলত ‘ন্যাপলা’। বন্ধুরা ডাকত ‘নেপো’ নামে। ফুলশয্যার রাতে নতুন বউ অবশি কানে কানে তাকে ‘নেপু’ বলে সোহাগের সুবাস ছড়িয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত ‘নেপো’ নামেই সমাজে তার প্রতিষ্ঠা ঘটল। যাবতীয় খ্যাতি এবং অখ্যাতির উৎস হয়ে উঠল সে।

ছোটবেলা থেকেই নেপো বেশ চালাক-চতুর। মনিং সোজ দি ডে। কালে কালে নেপো যে তালেবর হবে তা ছোটবেলা থেকেই আত্মীয়-স্বজন জ্ঞাপিতগোষ্ঠীর মালুম হয়েছিল।

নেপো চারপাশের আবহাওয়াটা ভালো বুঝত। এ ব্যাপারে সে ছিল বিচক্ষণ। কথাবার্তাতেও ছিল চৌখস। ফলে যে-কোনো পরিস্থিতি থেকেই সে ফায়দা ভুলত। নেপোর যাকে বলে লাভের কপাল। নেপোর অভিধানে লোকসান শব্দটাই ছিল না। নেপো মানেই মুনাফা। আর তা অন্যের মাধ্যম কাঁঠাল ভেঙে। কাঁঠাল ভাঙতে সে ছিল রীতিমতো ওস্তাদ। এবং তা অন্যের মস্তকাগ্রে।

নেপো ইকুলে যেত। বাড়ি থেকে টিফিনের পয়সা পেত। কিন্তু সে সব পয়সা সে বাজে খরচ করত না। অথচ টিফিন খেত। অন্যদের তুলনায় ভালো এবং বেশি। টেকনিকটি ছিল মোক্ষম। বিমলের কাছে গিয়ে ‘সেশি সেশি মাসিমার হাতের রান্না কেমন’ বলে তোয়াজ করে যদি আজ টিফিন খেল, তো কাল অমলের কাছে ‘বিমলটা ভীষণ কিপেট বুঝেছিস, বন্ধুকে একটু টিফিন খাওয়াবে তাতেও আপত্তি। তোর মনটা অবশি খুব সাদামাটা, তুই খুব ভালো বন্ধু’ বলে তার টিফিনের একটা অংশ হাতিয়ে নিল। এভাবে দিনে দিনে ক্রমে ক্রমে শ্যামল কমল শোভন স্বপন প্রমুখ সকলের টিফিনবাজের সঙ্গেই তার আত্মীয়-সম্পর্ক গড়ে উঠল। এক সময় এমন হল, তাকে আর টিফিন চাইতে হত না। বন্ধুরাই সোৎসাহে টিফিন অফার করতে লাগল। তা যাক সেসব কথা। নেপোর বাধ্য-কৈশোর লীলার এমন অনেক অকথিত কাহিনী বারাত্তরে থাকাশের ইচ্ছে রইল।



কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ইউনিয়নের বামপন্থী শিবিরে নেপোর কদর বেড়ে গেল। নেতাদের মতে, নেপো একটি জিনিয়াস। অতএব শনে শনে নেপোর উন্নতি হতে লাগল। না, নেপো ছাত্র ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট অথবা সেক্রেটারি হতে চাইল না। তাতে তার খ্যাতি বাড়ল। পদের প্রতি তার মোহ

নেই। আসলে নেপো আম খেতে চায়, আমলা হতে চায় না। তাই প্রেসিডেন্টের কানের কাছে ফিস্ ফিস্ করে সেক্রেটারির নামে কনফিডেনসিয়াল বার্তা পাঁছে দিল তো, সেক্রেটারির কাছে প্রেসিডেন্টের পিতামাতার খাঙ্ক করল। ফলে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সোশ্যালের টাকার একটা অংশ তার পকেটে এল। নেপো সুটেড বুটেড হল। প্রায়শই ট্যান্ডি চাপতে লাগল। অন্তঃনতি বাস্তুবী ভুটল। তাদের হৃদয়ারণে যথেষ্ট মৃগয়াও করল। নেপো হিরো হয়ে উঠল।

বিশ্ববিদ্যালয়ে নেপো একটি অসাধ্য সাধন করল। অধ্যাপকে অধ্যাপকে খিচান লাগিয়ে দিয়ে একটি প্রথম শ্রেণী বাগিয়ে নিল। তাতে পোলে একটা পি-এইচ. ডিও। বামপন্থী শিবির নেপোর প্রতি প্রসন্নই ছিল। কাজেই খুব সহজেই বিশ্ববিদ্যালয়ে

লেকচারারের চাকরি পেয়ে গেল সে। কালক্রমে রিডার এবং কালগলে প্রফেসর। নেপো হল পার্টির তাত্ত্বিক নেতা। এডুকেশন সেলের সদস্য। নেপো তখন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পছন্দমতো ছেলে-মেয়েদের চাকরি দেয়। তাতে ক্যান্ডিডেট পিছু বিশ-পঞ্চাশ হাজার টাকা আসে। আসলে পোস্টিং অনুযায়ী ফি নির্ধারিত হয়। নেপোর একটি কাউন্সেলিং সেন্টার আছে। না, টিউশন সে করে না। পার্টির নিষেধ। এই কাউন্সেলিং সেন্টারের সুবাদে ছাত্রছাত্রীরা নেট কিংবা স্নেট পরীক্ষায় উত্তরে যায়। নেপো এজন্যে থতকোর কাছ থেকে থোক হাজার আটকে টাকা নেয়। কলেজ সার্ভিস কমিশনের ইন্টারভিউয়ের জন্যে আগাদা প্যাকেজ। পছন্দসই পোস্টিংয়ের জন্যেও বৃত্তান্ত দক্ষিণা। নেপো বাড়ি বানিয়েছে, গাড়ি কিনেছে। নেপো ভালো আছে। নিয়মিত দই খাচ্ছে। বামপন্থী শিবির নেপোকে খুব খ্যাতির করে। শোনা যাচ্ছে, নেপো খুব শিগুণির উপাচার্য কিংবা রাজ্যসভার সদস্য হবে। নেপো ভাবনা-চিন্তার জন্যে কিছুদিন সময় নিয়েছে। প্রেসারটা চেক করাচ্ছে। সুগারটাও।

সিনেমা দুঃসংবাদ

গৌতম কি ঘোষে ঘোষে সত্যজিৎ হতে চাইছেন?

দুজনের তফাৎ কালের নয়, অকালের

দুটো গাড়িতে দল বেঁধে সবাই আবার অরণ্যে যাচ্ছে, হঠাৎ একটা পাগলাটে লোক প্রথম গাড়িটার সামনে এসে পড়ল। চাপা পড়তে পড়তে বাঁচল সে। আরোহীরা চমকে গেল, শেষপর্যন্ত টাকা-পয়সা দিয়ে লোকটার হাত থেকে ছাড়ান পেল সবাই।

গাড়ি চালু হল, কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গে লোকটা এবারে দ্বিতীয় গাড়িটার তলায় পড়ল। বোঝা গেল, লোকটা শুধু পাগল নয়, সেয়ানা পাগল।

গৌতম ঘোষও কম সেয়ানা নন, সত্যজিতের নাম ভাঙিয়ে অরণ্যে ঝাঁপিয়ে ভেবেছেন লাফিয়ে দাপিয়ে তুলে নেবেন টাকা, করে নেবেন নাম। তাঁর ছবি কেমন হয়েছে, যাঁরা এ ছবি দেখেছেন তাঁরা বুঝেছেন সেকথা। যাঁরা এ ছবি দেখেননি এবং সত্যজিতের ছবিটা দেখেছিলেন তাঁরা যা চেয়েছেন এ ছবি তার ধারকাছ দিয়েও যায়নি। কারণ একটাই, সত্যজিতের আশপাশ দিয়েও গৌতম যান না।

‘অরণ্যের দিনরাত্রি’ ছবিতে সত্যজিৎ যা দেখিয়েছিলেন তা হল চারটে যুবকের গতানুগতিক নাগরিক জীবনের অপমান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার প্রয়াস। এবং সেই সুবাদে অরণ্যবাসের পরিসরে প্রকৃতিকে, স্বভাবকে এবং সুযোগকে স্পর্শ করার চেষ্টা। যার ছোঁয়া বনের বসবাসে পেয়েছিল তারা, তাকেই মনের আবাসে ধরবার আকাঙ্ক্ষাই সে ছবির উপজীব্য ছিল। এখানে যাদের সঙ্গে তারা ঘনিষ্ঠ হয়েছিল ক্ষণকালের জন্য, চিরকাল তাদের কথা মনে রাখার অবকাশ তারা পাবে না, সম্ভবত মনে রাখতে তারা চাইবেও না। শুধু তারা একবার জীবনের দিগন্ত পার হয়ে যাবে, দিনান্তে অনুভব করে নেবে অপার বিস্ময়।

যারা ঘোঁষনে বনে গিয়েছিল, তারা যে শিহরণ পেয়েছিল, এখন বৃন্দাবনে যাবার সময়ে ফের বনে গিয়ে তারা সেই শিহরণ দর্শককে দিতে পারেনি। ক্যামেরায় কিছু দৃশ্যগত এলিমেন্টকে পর্দায় উপস্থিত করেই যথেষ্ট হয়েছে, ভেবেছেন গৌতম। অরণ্য কেন অনন্য তা বলতে না পেরে অন্য গল্প ফাঁদতে হয়েছে তাঁকে। আর তাতেই ফাঁদে পড়েছেন তিনি। এ ছবিতে সত্যজিতের ছবির ক্লিপস, সেদিনের দর্শক—আজ যাঁরা বুদ্ধ, তাঁদের নষ্টালজিয়াকেও বিনষ্ট করেছে। ইনকমপ্যাটিবল্ এ দৃশ্যযোগে দুই যুগের কমপ্যারিজনে প্যারিটির অভাব ঘটে গিয়েছে অথচ তা ছবি দেখেও গৌতম বুঝতে পারেননি। বুঝলে এ ছবি রিলিজ হতে দিতেন না তিনি। আজকের যুবক যাঁরা, তাঁরা সত্যজিতের ছবির ব্যাখ্যা অনুধাবন করতে পারেন না এ ছবি দেখে, এমনকি এই ছবিটির ব্যাখ্যানও বুঝতে অপারগ হবেন। গৌতম শেষ পর্যন্ত আধুনিক হবার গোডে আমেরিকার সম্ভ্রাস-সংবাদ এনে ভেবেছেন টপিক্যাল হতে পারলেন বুঝি। আসলে টপিক্যাল নন, টপিক্যাল হয়ে গেছেন পরিচালক। একটি মেয়েকে অপ্রাসঙ্গিক ভাবে কিডন্যাপের সিচুয়েশন কোনো কিডও যে নিতে পারবে না সেটা তিনি বোঝেননি। যারা কমার্শিয়াল ছবি করে সফল, তাদের আমরা বুঝতে পারি। কারণ তাদের কোনো ঢাক শুড়

গুড়ু নেই। গৌতম ঘোষের কিন্তু আর্ট ঘোষণা করে কমার্সের ঢাক বাজাতে চায়। প্রাইজও চাই, প্রাইজমানিও চাই। জল্পুলে সমাজ থেকে মেসায়ার বাণী বিতরণ করেই ছবির কোরবাণী সাধন করেছেন তিনি।

গল্প এতে এগোয়নি বা পিছোয়নি, শুধু মিলিয়ে গিয়েছে। ছবিতে গল্প বলতে পারাটাই আসল আর্ট, আসল কলা, তার কৌশল কেবল কলাকৌশলে নেই, আছে হৃদয়ে ও মস্তিষ্কে, এইটে যেদিন বুঝবেন পরিচালক সেদিন তাঁকে আর অযথা সত্যজিতের পরীর পেছনে ছুটতে হবে না।

ছবিটির প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে এতে সকলেই একই রকম স্ট্যান্ডার্ডের অভিনয় করেছেন। এই বিলো অ্যাভারেক্স ছবিতে একমাত্র অ্যাবড্ অ্যাভারেক্স হলেন শমিত ভগ্ন। মরণের ছায়া পড়া এই চরিত্র জীবনের দীপ্তিতেই ভাবব। শমিতকে আসন্ন মৃত্যু প্রসমিত করতে পারেনি, নমিত করেছে। গৌতমের রঙে রঙিন সূর্যাস্তের সাজানো পটভূমিকার চেয়ে অনেক বেশি কালারফুল এবং বিউটিফুল শমিতের সাহসিক ও স্বাভাবিক সংলাপ উচ্চারণ। গৌতমের ছবি যে সত্যজিতের ছবির প্যারডিও হয়নি, এ কথা শমিতের চেয়ে যিনি বেশি জানতে পাবতেন, তিনি হলেন রবি ঘোষ, যাকে মৃত্যু আগেই বাঁচিয়ে দিয়েছে। বেঁচে থাকলে এ ছবিতে তাঁকে অভিনয় করতে হত।

অন্যান্যদের মধ্যে অরুণ মুখোপাধ্যায়কে দেশে আমাদের দুঃখ হয়েছে। ইদানীং এই শক্তিশালী অভিনেতাকে একাধিক অবাস্তব চরিত্রে অবাস্তব সংলাপ আওড়াতে হয়েছে থলাপের মতো। মৃণাল সেনের ‘আমার ভুবন’ এবং গৌতম ঘোষের আবার অরণ্যে এই দুটিতেই প্রকৃষ্ট প্রহসনে তাঁকে নামতে হয়েছে।

ছবির জগৎটা এখন আর অর্থসঙ্কটে দীন নয়, গুণহীনতার সঙ্কটই এখন আশঙ্কার কারণ। তাই এমন ছবির পরিচালকও প্রাইজ পাচ্ছেন। তাঁরাও মনে করছেন, ভালো ছবি তুলেছেন তাঁরা। দর্শকও ভাবছেন এটাই বুঝি ভালো ছবি। গিটুনির বদলে গিটুলিপোলাই এখন দুধ বলে চলছে।

সত্যজিতের ছবি ধার করেছেন গৌতম, যদিও তাঁর ছবিতে কোনো ধার নেই। সংলাপের উইট, সিচুয়েশনের হিউমার, ক্যারেক্টারের আনন্দ-বেদনার অন্তরঙ্গ মুহূর্ত—এসব নেই বলেই গৌতমকে অযথা ডাইডাক্টিক হতে হয়েছে শেষ দিকে। তাতেই শেষ হয়ে গিয়েছে ছবির আবেদন। যাতে তিনি অভিজ্ঞাত হবেন ভেবেছিলেন, তাতেই জ্ঞাত গিয়েছে তাঁর।

গৌতম বুদ্ধ আর গৌতম ঘোষ যেমন এক হতে পারেন না, তেমনি একাকার হতে পারেন না সত্যজিৎ ও গৌতম। সত্যজিতের মতোই ছবির সব ডিপার্টমেন্টে চুকেছেন গৌতম—চিত্রনাট্য, চিত্রায়ণ, চলচ্চিত্রকার ও সঙ্গীতকার। তাঁর জানা উচিত ছিল, সত্যজিৎ ছিলেন Genius, কিন্তু তিনি শুধু Genius-এর প্লুরাল—Genli. শব্দটার মানেটা অভিধানেই আছে। কাল থেকে কালান্তরে যে আকাল এসেছে, ‘আবার অরণ্যে’ সেই দূষণেরই ভূষণ।

আধুনিকি-আধুন্যাকা

আইতান হো হো

সম্রাট সানশ্বাস চোখে দিয়ে চৈনিক পরিব্রাজককে
সঙ্গে নিয়ে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে এলেন। গাড়িতে
উঠবেন, এমন সময় জুলিয়াস সিজার এসে
বলল—আমার দুধের টাকাটা?!

ব্রাহ্মতন্ত্রে নির্বাচন ছিল না। নির্বাচনে খুনও ছিল না। গণতন্ত্রে দুই-ই
আছে। কারপটা সহজ। এখন আমরা সবাই খুনি আমাদের এই খুনের
রাজত্বে। আধুনিক রবীন্দ্র সঙ্গীত, আধুনিক সমাজ ব্যবস্থা, আধুনিক ইতিহাস।
হোভা মোটর-সাইকেলটা। স্ট্যান্ড করে দিয়ে সোজা হর্বের ড্রিঙ্কিং ক্রমে ঢুকে
গেল হিউয়েন সাঙ। বলল, ‘কমৌজের ফ্লাইটে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে
চেমিস্ খাঁ। চালুক্যাবা গেছে, তুমি যাবে তো গাড়ি বের করো। এই কথা শুনে
হর্বহর্বনের হাত থেকে হুইস্কির গ্লাস পড়ে গেল। তারপর ছুটে গিয়ে মার্কে
পোলোকে একটা ই-মেল করে সম্রাট সানশ্বাস চোখে দিয়ে চৈনিক
পরিব্রাজককে সঙ্গে নিয়ে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে এলেন। গাড়িতে উঠবেন,
এমন সময় জুলিয়াস সিজার এসে বলল—আমার দুধের টাকাটা?!

আধুনিক ইতিহাসের মতো আর এক জিনিস হচ্ছে আধুনিক সিনেমা।
সিনেমা সমাজের জলছবি। আমি সম্প্রতি একটা ছবিতে নায়ককে চোখের
মণিদুটো দু’হাতে নিয়ে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে দেখেছি। দু-দুটো কিডনি অপারেশন
করে পরদিনই নায়িকাকে সিমলার দুরন্ত পাহাড়ি ঝরণায় সাবান মেখে চান
করতে দেখেছি। ‘বাবা কেন চাকর’ ছবির করুণ পরিণতিতে দেখেছি বাবা
বাজারে গিয়ে আর বাড়ি ফেরেনি। পরে চালের দোকানে চালের বস্তার
ভেতরে আনাজউলির সঙ্গে ধরা পড়ে ও আনাজগুলার বাঁটির আঘাতে প্রাণ
যায় বাবার। ‘সমুদ্র সৈকত’ ছবিতে চার বন্ধুকে বালিতে রোদ পোয়াতে
দেখেছি। সারা শরীর বালির নিচে, কেবল শুক অঙ্গ কটা রোদে পুঁজুছে।
কারণ হিসেবে নির্দেশক দেখিয়েছেন যে ঐ বন্ধুগণ আগের দিন হোটেলের
কামরায় লস্ক্য করেছেন যে তাঁদের শরীরের একটা জায়গা ছাড়া আর সব
জায়গা সূর্যমানে তামাটে হয়ে গেছে। কেমন যেন বেমানান লাগছে। তাই
মানানসই করতে ঐ ব্যবস্থা।

আধুনিক পোশাক মানে পোশাকহীনতা। কাপড়ের শিল্প বিপ্লবে
ফ্যাশানের কোপ। জমিক ও সুন্দরী—দুই-ই উলঙ্গ। ক্যাচ-শোতে যে
আধুনিকতা দেখা গেল তার প্রতিফলন হল, গেরস্তের ঘবে। গুরুজনদের
সামনে বধুর ঘোমটা বিসর্জন হল। বৃদ্ধ বাবাকে একপাতা ঘুমের ওষুধে
আচ্ছন্ন করে আধুনিক পোশাকের বন্ধুদের নিয়ে বাড়ি জুড়ে হসোড়। পানীর
ফোয়ারা। যে পাঞ্জাবি পুরে বামীজি শিকাগো গেছিলেন, সেই পাঞ্জাবি পরে

মানুষ ভর্তি একটা রেল কামরায় আশুন দেওয়া হল। আধুনিক হিন্দুত্ববাদ।
আমি নিজের বোনের বিয়েতে যে পাঞ্জাবি পরে ছিলাম সেটার পিঠের
মাঝখানে বড় করে হলুদ রঙে “পদ্ম” লেখা ছিল। বৃকে লেখা ছিল
“এইডস—আই লাভ্‌ যু।”

১১

যে পাঞ্জাবি পরে বামীজি শিকাগো
গেছিলেন, সেই পাঞ্জাবি পরে মানুষ ভর্তি
একটা রেল কামরায় আশুন দেওয়া হল।

আধুনিক হিন্দুত্ববাদ!

১২

সম্পর্কেও আধুনিকতা এসেছে। আগে বাবার ভাই ছিল কাকা। এখন
মায়ের প্রেমিক ‘কাকু’। আগে কাজের মহিলা ছিল মোক্ষদা। এখন ‘মাসি’।
‘দালাল’ এখন ‘এজেন্ট’। সম্পর্কের মধ্যে সবচেয়ে ব্যাপক হল ‘দাদা’।
এমনকি চির অজ্ঞান পুরুষকেও ‘দাদা’ বলা হয়। নতুন ‘দাদা’-র জন্ম হয়
রাজনীতির জটরে। সোমেনদা, সুব্রতদা, সুভাষদা। আর আপন মাতৃজ্ঞে
জন্মে যে দাদা, সে আজ ‘ক্রিমিনাল’। আদালতে প্রতিপক্ষ। মোতলার
দখলদার। আমি যখন কলেজের নির্বাচিত ছাত্র সংগঠনের সেক্রেটারি ছিলাম
তখন কত সহপাঠীর বাবা আমাকে ‘দাদা’ বলত। সে দাদা ধরোজনের দাদা।
এই মারকাটারি প্রতিযোগিতার যুগে একটা কলেজে সন্তানের মাথা গৌজবার,
ঠাই জোটাবার ‘ইউনিয়ন-দাদা’। আমিও কলেজের ইউনিয়নকমে বসে
সেইসব কাকাতুতো ভাইদের বলতাম, ‘আপনার ব্যাপারে বিকেলে থভাসদার
সঙ্গে কথা বলব।’

প্রভাসরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় আমাদের কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন।
ব্যাপারটা তাঁর কানে যেতেই আমার কলেজের পাঠে ইতি হয়েছিল।

আগে বাবার ভাই ছিল কাকা। এখন মায়ের
প্রেমিক ‘কাকু’। আগে কাজের মহিলা ছিল
মোক্ষদা। এখন ‘মাসি’। ‘দালাল’ এখন ‘এজেন্ট’।

রামমুখের কলম

আসুন নেপোদের পোঁ ধরি



সুন্দীপ

সে জানে যে সে জানে
সে জানে না যে সে জানে
সে জানে যে সে জানে না
সে জানে না যে, সে জানে না।

প্রথম লোকরা অনিরাপন্ন নয়, দ্বিতীয় লোকদের থেকে আপনি চাইলে দূরে থাকতে পারেন, তৃতীয় লোক বোধ হয় প্রথমদের মতোই কাম্য। এই চতুর্থ শ্রেণীকে নিয়েই মুশকিল। কিন্তু এরাই তো এখন সর্বত্র। আমি, রামমুখও ঝরাপাতা হিসেবে এদেরই দলে।

ঝরাপাতাদের সম্পর্কে যারা কড়া কথা নাড়া বেঁধে বলবেন বলে সাড়া ফেলে দেন সর্বত্র, তাঁদের ওপর আমার রাগ করবার বিলম্ব কারণ আছে। আরে মশাই, যুগ এখন পিছন পানে এগিয়ে সামনে যাওয়ার। সেনিন সাহেবকে এখনই পুনর্জীবিত করা দরকার। এক কদম আগে দু'কদম পিছে হাঁটা খুব দরকার। দু'কদম পিছনে কেন, চলুন সাড়ে ছাপান্ন পা পিছনে হাঁটি। হেঁটে ব্রিটিশ সাহেবদের রাজত্ব ফিরে যাই।

গিয়ে ভজনা করি, বাবা, বহু অন্যান্য করিয়া ভাগ্যের সহিত খেলিতেছি,

চলো বাপধন, তোমাদের কর্তব্য তোমরা সদলে ও সবলে করো। গণতন্ত্র বড় আজব জিনিস, মাঝে মাঝে ক্ষমতাচ্যুত হইবার ভয়। পাঁচবছর অন্তর ভোট করিবার ভয় থাকে। আমরা তোমাদের আই সি এস, বা জমিদার বা রাজা হইব—তোমরা আমাদের রসেবশে রাখার ব্যবস্থা করো।

শুন রাগ করিও না। তোমরা গিয়াছ, গিয়াছ, কিন্তু আমরা রাজানুগত্য ছাড়ি নাই। তোমাদের রাজবধূর মৃত্যুতে কলেজ স্কোয়ার কামার শোতে ডুবাইয়া দিয়াছি, প্রফুল্ল এলাকা মলিন করিয়াছি, লালবাড়িতে লালবাতি জ্বলাইয়া পঞ্চরাত্র টিভি দেখিয়াছি। আমাদের ছেলে-মেয়েরা কেহ বাংলা বলিতে পারে না। মানে, আমরা অজ্ঞত তাই ভাবি। না ভাবিলে মুশকিলও। বাকি সময় ইহারা 'আই ডাক' গোছের ইংরেজি বলিলেও পরিষ্কার বাংলায় 'শুয়োরের বাচ্চা' বলিয়া গাল দেয়। আচ্ছা, উহাদের কি এই চেতনাও নাই যে শুয়োরের বাচ্চার সন্তান শুয়োরই হইবে। আমার গিমি বলেন, ইহা বরং ভালো, তবু তো ইহারা ইঞ্জিরিতে গাল পাড়ে নাই, 'বাস্টার্ড' বা তাহার চেয়েও খারাপ গালাগাল, 'ইডিয়ট' বলে নাই। এর চেয়ে বরং বোকা বোকা বাংলা গালই কম চর্মপীড়াদায়ক।

বাংলা গাল? বলো কি গিমি? বাংলা মদ, বাংলা শাড়ি, সবই চলতে

পারে, কিন্তু বাংলা পালাগাল। কেমন যেন বস্তি বস্তি শোনায় না।

আমার বউ সদ্য সমাজতত্ত্ব পড়েছে। সে ফুকো না শুকো আওড়াইয়ে বলতে চাইল, ফ্ল্যাটিবাড়িগুলি আধুনিক বস্তি মাত্র।

তাগিস, দেবিদা-র নাম বলেনি। আমার জানা দেবিদা কেবল, একজনই ছিল। সে আমি। আমি সর্বত্রই দেবিতে যেতাম; আমার বন্ধুরা আমাকে লেট লতিফ বলত। আমার এক বাংলা-শ্রেণী শিক্ষক বলেছিলেন, আছ বাংলা বলো। ওকে গুরু-চণ্ডালী নামে না ডেকে 'দেবিদা' বলো। তাই আমার নাম হয়ে গেল, দেবিদা। আজকাল শুনি একজন 'দেবিদা' খুব রাজহু করছে, সেও নাকি পুরনো কথা দেবি করে করে দেড়ি ওজন নিয়ে বলছে; তাই তার নামও দেবিদা। আমি অন্তত এমনই জেনেছি।

শুনুন, মশাই রাগবেন না, আজকাল সব স্রোগান পাণ্টে ফেলার যুগ। দেখেন না, আগে বামপন্থীরা স্রোগান দিও—'লড়াই লড়াই লড়াই চাই, লড়াই করে বাঁচতে চাই'। আজ তৃণমূলীরা স্রোগানে তাই বলে চ্যাচায়। অজিত পাণ্ডেই কেবল ভুল করে বিধানসভায় গিয়েছিলেন, তৃণমূলীরাও তো আজকাল গণসঙ্গীত বাজায়। এস এফ অহিয়ার ছেলেরা উবা উখপের উবা সঙ্গীত শুনে এবং শুনিতে নবীন ভোটেরদের ঘুম ভাঙায়, তাদের পুনরুজ্জীবিত করে, ভোটের বাজ ভরায়। অবশ্য আজকাল গণতন্ত্র অতীব সহজ সরল সন্নিকরনের অভেক ভরায়। যে যেখানে ক্ষমতায়, সেই সেখানে গণতন্ত্র। এবং সেই সেখানে প্রধান নেপো।

নেপো তোমার উৎস কোথায়? তুমি কোথা হইতে আসিলে? ন্যাপলা থেকে? 'নেপোটিজম' থেকে? নেপো? নাকি 'নেপোলিয়' থেকে? ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ান নন, তাঁরই নামধারী এক ব্যক্তি 'নেপোলিয়' আপন কর্তৃত্ব বলে সবকিছুই আত্মসাতের নাকি অধিকার দান করেছিলেন নিজে, বেঙ্কায়। তার থেকেই এসেছে ইংরেজি 'নেপোটিজম' ন্যাপলা বা নেপো—এমনই জানে রামমুখ। আর যদি আপত্তি থাকে কৈ বাত্ নেহি, লেখার শুরুতে চলে যান। নিজেই প্রথম শ্রেণীভুক্ত করে, আমায় চতুর্থ সারিতে ফেলে মাফ করে দেবেন। আর কে না জানে ক্ষমা পরম ধর্ম।

দেখলেন না রাজ্য সরকারের ক্ষমা পেলেন ৪ জন পুলিশ। পাঞ্জাবের ৪ জন পুলিশ বাংলার তিলজলায় এসে তিলমাত্র অবকাশ না দিয়ে দমাদম হিরোইক স্টাইলে গুলি চালিয়ে দু'জন স্বামী-স্ত্রীকে মেরে ফেলল। লোকটি নাকি 'উগ্রপন্থী'। কিন্তু স্ত্রীটি কোনো অপরাধে যুক্ত নয়। অপরাধী নয়, তবু খুন? আরে মশাই, ও-সব গুলে মেরে ফুলে যান। কান খুলে শুনুন, আমরা যাহা করি, তাহাই গণতন্ত্র। আমাদের ইচ্ছা হয়েছে মারব। ব্যাস। অন্য কথা বলো না। কি বলছেন, আইন বলছে বিনা বিচারে হত্যা তো দূরের কথা, শাস্তি দেওয়াও যায় না? মশাই, রাখুন। আমি রামনাম জপিয়া বলিতেছি, রামচন্দ্রও শব্দক হত্যা করিয়াছিলেন, কোনো অপরাধ ছাড়াই। অপরাধ অবশ্য ছিল, জানার চেষ্টা।

জানা বড় সাংস্ফটিক অপরাধ। জানবেন কেন মশাই? যা জানাচ্ছি তাই কি যথেষ্ট নয়? তা আবার জানার চেষ্টা কেন? সেবলেন, ইরাকে ৪ জন সাংবাদিককে গটাপট্ মেরে ফেলা হল। আরে, যা জানহিস তাই যথেষ্ট। তা নয়, নিজে নিজে জানার চেষ্টা। তার থেকেও বড় অপরাধ, সেই জানা অন্যকে জানানোর চেষ্টা অ—মা—জ—নী—য় অপরাধ। মশাই ৭২ পয়েন্ট বোম্ব অক্ষরে কথাটা টাঙিয়ে রাখুন।

আমরা আধুনিক 'নেপোলিয়'রা যা বলছি তাই ভালো করে জপ করে নিন, তসবি যা মালা হতে। 'যা দেখছেন, তা আপনি দেখছেন না, আপনাকে দেখানো হচ্ছে, আপনি যা শুনছেন, তা শুনছেন না, আপনাকে শোনানো হচ্ছে। যা বলছেন, তা বলছেন না, তা বলানো হচ্ছে।' এই খাঁটি সত্যটা

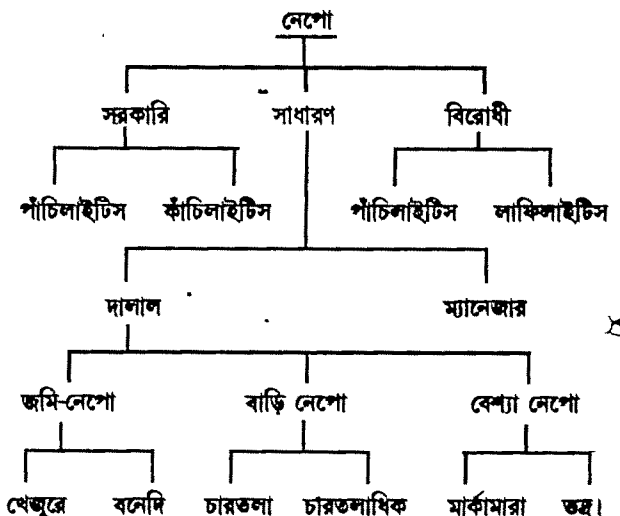
আসল ঋণা দি সহযোগে জুইফুল ভাতের সঙ্গে রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেওয়া 'হট ডগে'র রেসিপি পড়তে পড়তে কৌৎস করে হিতবাদী হয়ে গিলে ফেলুন।

শুনুন, 'নেপো' শব্দের আজকাল বিভিন্ন অর্থ হবে। মন্ত্রী, নেতা, ক্যাডার, কন্ট্রোল ইত্যাদি। নেতার আবার নানা ক্লাস। হাফ, ফুল, সিকি, পৌনে সিকি, হাফ পৌনে সিকি, ইত্যাদি। ক্যাডারেরও তাই। কেবল ঠিকাদার দুই শ্রেণীর। ধীর এবং অধীর। ধীর তারা, যারা নিজেরা লাইন দেয় না, বা দিতে সাহস পায় না, অধীর বাহিনীর হাত মারকত তামাক খেয়ে নতুন বিশ্বব্রাহ্মে গঙ্গাজল আনে। গঙ্গাজলও অবশ্য ইদানীং সরাসরি পাওয়া যায় না। সেখানে 'নয়া নেপো'রা নানা কোম্পানি খুলে ফেলেছেন। 'গঙ্গা' নামে সাবান হয়েছে, সাবান গায়ে ঘষার জন্য গঙ্গাজলও প্যাকেটে। বোতলেও। আর তাঁড়েরের কাল গিয়েছে, আজকাল প্লাস্টিকের যুগ। গোপাল তাঁড়েরাও লজ্জা পেতেন নেপোর পাশে থাকা হাফ নেপোদের দেখলে। এরা সব কোলাব্যাণ্ডের দীক্ষায় দীক্ষিত, কুঁয়োর শিক্ষায় শিক্ষিত (কু-শিক্ষিত)।

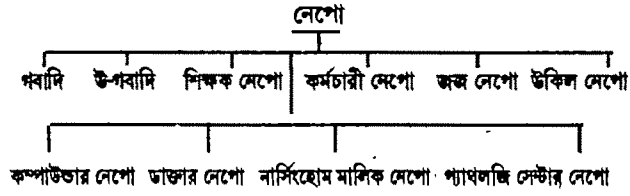
১৯৯৪ সালে ৫ সেপ্টেম্বর শেপসি সংস্থা বাঙ্গালোরে যে তিন বিমান ভর্তি প্লাস্টিক বোতল ফেলে গেল, সে কি আর অমনি অমনি? আমেরিকায় নিষিদ্ধ, এ তো বাহ্য কারণ। আসল কারণ, আজ তো প্লাস্টিকের যুগ। তাঁড়-এরও মেরুদণ্ডে সামান্য লাগে, তাই ভেঙে যায়, প্লাস্টিকের সেসব সমস্যা নেই। মাটিতেও মেশে না, জলেও ভেজে না। এ অমর। চির তৈলমর্দন কারী। অতএব প্লাস্টিক মানি, প্লাস্টিক মেরুদণ্ড, প্লাস্টিক মনের যুগ।

প্লাস্টিক-নেপোদেরও তাই রমরমা। তারা আবার 'স্বাকের কই' নন, তারা সব পাঁচিলাইটিস, পাঁচিলেই বসে থাকেন। এঁরা 'রক্তকরবী'র নশ্বিনীর বিস্তার মতো প্রকার নন যে, ওপারের আকাশকে এঁদের মারফৎ দেখবেন। ওঁরাই আপনাকে সবকিছু দেখিয়ে দেবেন। লাল বাড়ি, সাপা বাড়ি, পেরুয়াবাড়ি, তরমুজ বাড়ি। কালিঘাটি বাড়ি, ধাপা বাড়ি, ধাপুপা বাড়ি, খাপুপা বাড়ি, মাপুপা বাড়ি—সব। এঁরা সব পাঁচিলে বসে থাকেন, যখন যে দলের পান্না ভারি সে দিকে ঝাঁপ দেন। বাংলায় অবশ্য ওঁদের কসরৎ কম। কারণ, একই দল ২৭ বছর, তবে সে দলের মধ্যে যে নানা উপদল—সেই উপদলের কার কখন দলমাদল গর্জনের ক্ষমতা বুঝে এই পাঁচিলাইটিস নেপোরা ঝাঁপ মারেন, কোপ মারবেন বলে।

আসুন, নেপো সম্পর্কিত আলোচনা সহজ করে নিই। নেপো-র শ্রেণী বিভাজন করি।



দাঁড়ান দাঁড়ান, সব নেপোদের জায়গা দিতে পারছি না। আরেকবার পৌ ধরি।



এতেও হল না। পরে শ্রেণী বিন্যাস করা যাবে। আগে তো আগের গুলোর পরিচয় দিই। পরিযায়ী পাখি সব। গোসা করে ইন্তফা দিয়ে বসবেন। কেউ মমতাময়ী, কেউ বৌদ্ধ। দু'পক্ষই আবার ইন্তফার রাজনীতির দ্বারা দরকষাকষি করে নিজেদের দর ও কদর ভালোই বাড়াতে জানেন।

সরকারি নেপো— ব্যাক্যার অবকাশ নেই।

বিরোধী নেপো— ইহারা গোঁকুলে জন্মে কংসের সেবার ভারি আত্মদে মগ্ন থাকেন। সিন্ধিতে সরকারিও রাজ্যে বিরোধী হইলে জন্মে ভালো। কেশের কল্যাণে গ্যাস ও পাম্পের ডিলারশিপ আর রাজ্যের দমায় নানা সুমদ্রে জমি।

সরকারি প্যাঁচলাইটিস নেপো— আগেই ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এঁরা বেহাদতির দাতার থেকেও বেশি সাবধানী। সুযোগ পাইলেই নামিয়া জাঁকিয়া বসেন।

কাঁচিলাটিস নেপো— ইহারা সর্বত্র চুকলিও কাঁচি করতে বড়ই দক্ষ। সবকিছু আঁচিয়া ও তাহা কাঁচিয়া দেওয়া ইহাদের অভ্যাস।

বিরোধী প্যাঁচলাইটিস— সরকারি লক্ষ্যাক্রান্ত।

বিরোধী লাফিলাইটিস নেপো— ইহারা মূলে ও তৃণমূলে লাফাইয়া লাফাইয়া দর বাড়িয়া থাকেন।

সাধারণ নেপো— এই দলে আপনিও পড়িতে পারেন।

সাধারণ দালাল নেপো— জগৎ দালালময়।

জমি নেপো— ইহারা জমির বিক্রিবাটা সহ সবকিছু প্লট করিয়া নিজেদের প্লটে সাজাইয়া রাখেন।

বাড়ি নেপো— বাড়ি করিতে বা কিনিতে চাই। এই নেপোদের বাদ দিয়া ডেপোমি করিলে বাঁচিবার আশা কম। চারতলার নেপোদের বাজারদর কম। অধিকগণ পুরসভার পারমিশান আদায় করিতে দক্ষ।

খেজুরে নেপো— পাঠক ভাগ করিতে থাকুন। চিনিবেন।

বেশ্যা নেপো— ইহারা তো আজ সর্বত্র। বেশ্যা নেপোরাও আবার দুই প্রকার—

(ক) যৌনকর্মী নেপো— যাহারা দেহ ব্যবসায়কে শ্রমের তত্ত্বে বিশ্বাসী করিবার ধ্যাসে ধ্যাসী। ইহাদের মধ্যে প্রধান শ্রেণীভূক্ত এন. জি. ও নেপোরা। তাহারা 'দেহ ব্যবসা যুগ যুগ জিও' বলিয়া এবং ইহাদের ট্রেড লাইসেন্স দাবী করিয়া ট্রেড ইউনিয়ন গড়িবার লক্ষ্যে আপন 'ট্রেড' ভালোভাবে চালাইতে বদ্ধ পরিকর।

(খ) সহজলভ্য বা কলগার্ল নেপো— এঁদের আপনি চিনিয়াও চিনিবেন না। চিনিলেই বিপদ। আপনাকেই ফাঁসিয়া দিবে। ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পৌছাইবার নামে, বাজার করিবার নামে, অফিস হইতে এক ফাঁকে কাজ সারিবার নামে যাহারা পবিত্রকর্ম সারিয়া আসেন, ইহারা তাহাদের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া সম্পন্ন হইতেছেন।

মার্কাযারা ও ভদ্র নেপো— ব্যাখ্যা করিব কি?

ম্যানেজার নেপো— আপনি যদি প্রভাবশালী হন, তবেই চেষ্টা করিতে

পারেন। অই, অই, টি, ডাক্তারি পাস করিবার পর আজকাল ম্যানেজমেন্ট পড়িতে হয়। না হইলে চাকরি মেলে না। রাজনীতি, সমাজনীতি, সাংবাদিকতা সর্বত্রই ম্যানেজার নেপোদের রমরম। দেখিতেছেন না মিডিয়া কিভাবে ম্যানেজ হইয়া বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা লইয়া বাজারে আনন্দ বিতরণ করিতেছে!!

গবাদি নেপো— ইহারা তান্ত্রিক। গঠনবাদী তত্ত্বে ইহাদের সমধিক খ্যাতি।

উগ্রবাদী নেপো— উত্তর-আধুনিক গঠনবাদী ইহারা।

শিক্ষক নেপো— দেখেন নাই, ইহারা বাল্যকালে মাস্টার পূজো, যৌবনে কেরিয়ার পূজো, চাকরি জীবনে থবেশের আগে ও পরে নেতা পূজো করিয়া নিজেরাই চাল-কলার ব্যবস্থা করিয়া গন।

ছাত্র নেপো— কখনোই ক্লাস করেন না। ক্লাস না হইবার প্রতিবাদে কেবল আন্দোলন করেন।

জজ নেপো— বাক্য। একদম বলিব না। মানহানি হইয়া যাইবে। অবসর কালে সরকারি ট্রাইবুনালাে চুকিয়া সরকারকে জেতানোই ইহাদের লক্ষ্য।

উকিল নেপো— বিদ্যে তেমন নাই। শুধু অ্যাটেস্টেড করিয়া থাকেন আর যোগাযোগ করিয়া মামলা জিতিবার মন্ত্র জপ করিয়া মামলা-সাগর পার হইয়ন।

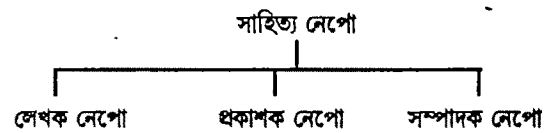
ডাক্তার নেপো— বর্ধমানে একটি ডাক্তার পাড়া আছে। নাম ঘোষবাগান। লোকে ডাক্তার নেপোদের ডাকতি দেখিয়া ইহা নামকরণ করিয়াছে 'চোষ বাগান'। রুগিদের ভালো করিয়া চুবিতে পারাই ইহাদের সেরা গুণ।

কম্পাউন্টার নেপো— জানিতে হইলে মুর্শিদাবাদের লাগগোলা বান।

নার্সিংহোম মালিক নেপো— বোঝেন নাই? আপনার মানসিক চিকিৎসার প্রয়োজন।

প্যাথলজিস্ট নেপো— সুরক্ষা কবচ পরিয়া আছেন তো? মেডি কেয়ারের দরকার হইবে। জ্বর, পতিজ্বর, হাঁচি—যাহাই হউক না, ডাকাতবাবু আপনাকে ঠেলিয়া এইখানে পাঠাইবেন। ৩৩ শতাংশ কমিশনের জন্য আপনাকে ইহাদের কবলে পড়িতেই হইবে।

আরো নেপো আছেন। সাহিত্য জগতে।



লেখক নেপো— বেড সিন ও রেপ মাস্টার বলিয়া ইহাদের অধিক পরিচিতি। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দারিদ্র্য, বেকারি এইসব ইহারা শোনে নাই। শুধু দেহতৃষ্ণাই এই নেপোরা জানিয়াছেন।

প্রকাশক নেপো— ছাপার কলটি কাঁদিয়া এঁরা পাঠ্যপুস্তক ও ত্রিকোণ ধেমের দরবারে উচ্চুপ করিয়াছেন।

সম্পাদক নেপো— বলিয়া মরি আর কি। আমি লিখিব, আর অন্যের নামে তাহা ছাপা হইবে। তাই এই নেপোর পৌ আমিও ধরিলাম।

শেষ কথা : হি ছি, এক্স জঙ্গালময় রামমুখের লেখা আপনি পড়িলেন। আপনার মতো ডেপো তো দেখি নাই মশাই। যান যান, নেপোরা আপনার ডেপোমি ঘুচাইবে বলিয়া এক বি আই-কে খবর দিয়াছে।

শেষ কথা এক কথা : নেপো কি কম পড়িল? নিজেকে যোগ করিয়া অন্যদের শ্রদ্ধা করুন।

আমাকেও বাদ দিবেন না।

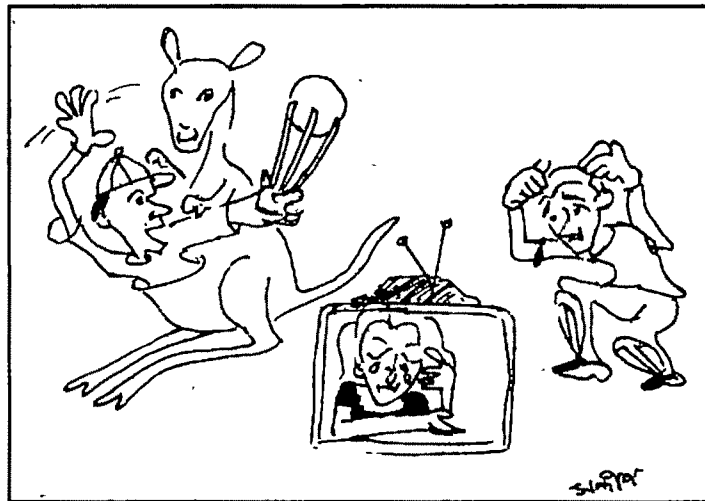
বোকাক্সের খিলাড়ি

বিশ্বকাপে ম(ন)দিয়ার ফেনা

অরুণোদয় ভট্টাচার্য

২০০৩ নাকি আমাদের
ক্রিকেট দলের পক্ষে
শুভসূচক সংখ্যা ছিল। তবু
বিশ্বকাপের স্বর্ণ পুনরুদ্ধার
করতে পারলেন না ভারতের
নীল সৈনিকরা।

কিন্তু এবারের উদ্যোগ, আবেগ, উদ্বেগ, স্বপ্ন এবং আড়ম্বর ছিল অতীতপূর্ব এবং অসীম। সব কিছুই 'অতি' উপসর্গযুক্ত। আড়ম্বর-এর সঙ্গে মিল রেখেই বিনোদন ও গ্লামার (আছে নাকি এর কোনো যুতসই বাংলা প্রতিশব্দ?) মঞ্চ দখল করেছিল।



কখন সন্ধ্যা ফ্যানদের কাছে
 গিয়ে 'ইন্ডিয়া জিতেগা'
 কোরাসের সূচনা করবেন বা
 মারিয়া কোন খেলোয়াড়কে
 ধাক্কা দিয়ে 'স্টাম্প্‌ড' করার
 চেষ্টা করবেন। কিম্বা টাওয়ার-
 এ উঠে লাইটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট
 বিষয়ে আলোকপাত করবেন।
 সবকিছুই করাবেন মন্দিরা।
 ট্যারট প্রেডিকশান-এর সময়
 তিনি কার্ডগুলি নিজের হাতে
 বেছে দেবেন বিশেষজ্ঞের
 হাতে। যুযুধান দলগুলির ভাগ্য,
 তাদের অধিনায়ক এবং Key
 player-দের ভাগ্য সবই তাঁর

এমন অবস্থা হয়েছে আধুনিক ভারত তথা পশ্চিমবাংলার যে, জীবন মানেই টেলিভিশান, আব টেলিভিশান মানেই বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনের আনুকূল্যে এ মুহূর্মুহু হস্তক্ষেপ ছাড়া কোনো টেলি-অনুষ্ঠানই সম্ভব হয়। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতা নামক উৎসব এলে বিজ্ঞাপনের একেবারে পোয়া একশ বারো। আর এগুলিই তো এখন জাতীয় সংহতির অবকাশ, সব ধর্মাবলম্বীদের প্রধানতম পার্বন।

এমনিতেই ক্রিকেট আর অ্যাডজগত বাজ্যবোটক, তার ওপর বিশ্বকাপের মওকা। তাই ম্যাজিমাং টোপ পেলে ম্যাজ আদায় করল সম্পূর্ণ একক সম্প্রসারণ স্বত্ব। জগতে আনন্দযজ্ঞে সবার নিমজ্ঞ। কিন্তু এই আনন্দযজ্ঞ কিভাবে পরিচালিত হবে তা ঠিক করলেন ম্যাজ চ্যানেলের বস বা বসেরা। মেগা সিরিয়ালের সুপরিচিতা নায়িকা ‘শান্তি’কে তাঁরা (অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে) এ আনন্দযজ্ঞের হোষ্ট্রী হিসাবে বরণ কবলেন। অর্থাৎ বিশ্বকাপকাং মেগা সেরিমনিতে মন্দিরা বেদী বেদীতে আরাধ্যা হলেন মিসট্রেস অব সেরিমনি (M.C.) রাণে। অসম্পূর্ণ ‘এজুট্রা ইনিসং’ সিরিয়ালটি সঙ্কালনার দায়িত্ব তাঁর হাতে এল। একেই বলে ‘কর লো দুনিয়া মটটি মো’

মাঠের ভিতর সৌরভ গাঙ্গুলির যে গুরুত্ব এবং দায়িত্ব, অসাধারণ আফ্রিকী প্রকৃতি-সৌন্দর্যযুক্ত, টেবল-মাউন্টেন ব্যাকড্রপ-শোভিত ম্যাস্স স্টুডিওতে মন্দিরার মাথায় ঠিক তেমনই গুরুদায়িত্ব। কারণ তিনিই ঠিক করবেন কখন 'খেডিক্টা' হবে সেলফোন ইউজারদের উল্কে দিতে, কখন ফিমের নায়িকা এবং নায়কদের ক্রিকেট বিষয়ে সচিৎ মতামত প্রচার হবে।

সব্ব অঙ্গুলি সঞ্চালনের ওপর নির্ভরশীল। এ ছাড়া আছে থেকে থেকে অ্যাড্-ট্রেক-এর ব্যবস্থা করা (ম্যায় জানতি হঁ আপ্ হামে ছোড়কে কতি ঠোর কঁই নেহি জায়েগে।), পিচ, রিপোর্ট, আবহাওয়ার পূর্বাভাস এবং সর্বোপরি মশিনার নিজের ভাবায়, 'দ্য অল্-ইম্পার্ট্যান্ট টস্'-এর দৃশ্যে নিয়ে যাবার দায়িত্ব। এ কি সৌরভের টস করা, ব্যাট বা ফিল্ড করার সিদ্ধান্ত নেওয়া, বোলার এবং ফিল্ডিং পোজিশান নির্ধারণ করা, সময় ও থ্রোজেনমতো বোলার ও ব্যাটিং অর্ডার পাশ্টানোর চেয়ে কোনো অংশে কম?

সাহায্য করার জন্য অবশ্য আছেন চারুশর্মা, অশোভন স্বপ্ন কেশ এবং ছাইরঙা মুখ নিয়েও যিনি অনর্গল চোস্ত ইংরাজি বলেন। ক্রিকেট বোঝেন এবং নিবপেক্ষ মনোভাব বজায় রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু ওনার কাজ শুধু বিশেষজ্ঞদের অভিমতগুলো আদায় করা, এবং পরিস্থিতির সারমর্ম পেশ করা। শুকনো কর্তব্য। হয় বোচারা! 'মুছকটি'কর্ম'এর চারুদপ্ত। নায়ক হলেও কেউ তাঁকে পৌঁছে না। সবার দৃষ্টি বসন্তসেনার ওপরই নিবদ্ধ।

সুতরাং এবারের বিষ্ণুকাপ যেমন সৌরভের, তেমনি মন্দিরার জীবনের পরমতম সুযোগরূপে এসেছিল। বিষ্ণুমের তিন-চারটি দিন ছাড়া টানা প্রায় দেড়মাস ধরে রোজ ক্যামেরা মন্দিরার আবক্ষ মূর্তি প্রদক্ষিণ করে দিন শুরু করেছে। কেশসজ্জা, কপালের বিশি আঁকা ভূয়ুগলের দিল্লি বিভাগী ইশারা, চোখের পাতায় মাক্কার আর তারায় বুদ্ধি ও লাস্যের যুগপৎ চমক, ম্যাচ করা প্রসবিত কণ ও হীবালাকার, রাশার-পিক গালে অমোঘ টোল, মাণা হাসিতে গুঠগার্ধে তরঙ্গিত কঙ্কনবেধা। মৌচাকে মন্দিরাগীর মতো মন্দিরাকে ঘিরে

মন্দিরাও প্রতিদিন বেশি করে আত্মবিশ্বাসী হতে লাগলেন, ফ্যাশান চ্যানেলের পোশাক থেকে সালোয়ার-কামিজ, সালোয়ার-কামিজ থেকে শাড়িতে উদ্ভীর্ণ হয়ে। সেই সঙ্গে হাতের কজিতে তেরঙ্গি রিস্টব্যান্ড বা চুড়ির সিরিজ।

প্রবীণ ভাষ্যকারদের মৌখিক।

দু'জনেরই শুক্রটা হয়েছিল দুর্বল। স্নায়ুজড়তার চিহ্ন প্রকট ছিল প্রতিপদে।
হল্যান্ডের কমলা রঙের সর্বের ফুল দেখেছিল গান্ধুলির দল। তার পরের
ম্যাচেই ক্যান্সারের ঠাণ্ডাভের মত লাঠি মেরে শুইয়ে দিয়েছিল ওদের।
মন্দিরাও তুল দিয়ে শুরু করলেন। বিশেষজ্ঞদের অনুসরণে অতি-সমঝাবারের
মত হিংলিশে ভবিষ্যদ্বাণীর চেষ্টা চালালেন। সুপুরুষ কিউই ক্রিকেটারদের
প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ করলেন। শ্রোতাদের বিশেষভাবে মুগ্ধ করার জন্য
মাইকে সশব্দ শ্বাস টেনে খুব 'ক্যাচি' কিছু বলতে গিয়ে প্রথম শব্দটাতে হেঁচট
খেলেন। সর্বোপরি, আকর্ষণীয় আধুনিক হবার চেষ্টায় কাঁধ দুটিকে
পোশাকমুক্ত করে (পাঠক, টিভিতে AC Black পানীয়ের এ্যাড-দৃশ্যটি স্মরণ
করুন।) এবং স্বচ্ছ আবরণের নীচে চোঁচ প্রদর্শন করে সাহসিকা হতে
চাইলেন। সৌরভের মত তাঁর কপালেও জুটল মিডিয়া ও জনতার খিঁকার।
বিদ্রোহ, অতীত যা লাগার মত বীকা মস্তব্য।

শক থেরাপিতে সৌরভের মত মন্দিরারও কর্মক্ষমতা এবং শারীরি
ভাষায় উন্নতি ঘটল। ভারতীয় দল টপকে এল জিম্বাবোয়ে, ইংল্যান্ড, জিম্বাবু,
পাকিস্তান, নিউজিল্যান্ড সহ পরপর সাতটা দুরন্ত চড়াই। দারুণ জঙ্গি
মেজাজে। মন্দিরাও প্রতিদিন বেশি করে আত্মবিশ্বাসী হতে লাগলেন, ফ্যাশান
চ্যানেলের পোশাক থেকে সালোয়ার-কামিজ, সালোয়ার-কামিজ থেকে
শাড়িতে উদ্ভীর্ণ হয়ে। সেই সঙ্গে হাতের কজিতে তেরঙ্গি রিস্টব্যান্ড বা চুড়ির
সিরিজ। ড্যানিয়েল ভিটোরির প্রেমিকার ভূমিকা ত্যাগ করে হয়ে গেলেন
বিশুদ্ধ ভারতপ্রেমী।

টিকা-টিকনি সন্তোষ মেনে নিল গোটা দেশ। মেনে নিল বিশ্ব। কপিগদেব
সহজে বিচলিত হন না, কিন্তু ব্যারি রিচার্ডস, ম্যাক্স, মাইকেল হোল্ডিং,
এ্যাথারটন, ইত্যাদিরা 'ম্যানডিরার'কে অজস্র কমপ্লিমেন্ট দিতে লাগলেন।
জীকাজু তো হে-হে করেই আছেন।

ক্রিকেট-প্রেমী তথা টেলি-প্রেমী হিসাবে এতে দোষ দেখার আছেই বা
কী? কেবী প্যাকার তো অনেক আগেই ক্রিকেটকে সার্কাসে পরিণত
করেছেন। রঙিন পোশাকের খেলা, রাতের খেলা, টেলি-বিস্তারন এবং রাশি
রাশি টাকার এই খেলার আসরে পিউরিটানিক কপি-বুক সমর্থকদের স্থান
কোথায়? টিভি চ্যানেলরা জানে, বিজ্ঞাপনী রসদ জুটলেই যে কোন মেগা
চলবে, আর চললেই তা হবে সুপারহিট। তাই হল। প্রতি সপ্তাহে জনপ্রিয়তা
বেড়ে বেড়ে সংবাদের দীর্ঘমণি হয়ে গেলেন মন্দিরা। তাঁকে নিয়ে অজস্র
রচনা ও সাক্ষাৎকার বেরল নানান কাগজে। কজন তাঁর জীবনী এবং বকলমে
আত্মজীবনী লেখা শুরু করেছেন, জানা নেই। হয়তো তাঁর নামে ক্রিকেট
কোচিং ক্যাম্পের খঁটও পুঁতে ফেলেছে ফ্যানেবা।

এখানেও ভারত-অধিনায়কের সঙ্গে সমান্তরাল-এ রয়েছে মন্দিরা।
কুমোরটুলির শিল্পী বহু ছাড়া টাকা খরচ করে সৌরভের মূর্তি বানালেন,

হয়ত বা দুর্গাপ্রতিমার মতো সার্বজনীন পূজার জন্য। মডেল-কাম-অভিনেত্রী
পিউ সরকার, ডোনার হাতে দিয়ে এলেন নিজের হাতে আঁকা ছক্কা-হাঁকানো
পোজে মহারাজের ছবি। পাড়ায় পাড়ায় প্যান্ডেল, মন্ত্রীদের পৃষ্ঠপোষকতায়
আগাম সন্মত সূচী, পোস্টার, ফেস্টুন, ব্যান্ড, বেলুন, জাতীয় পতাকা, বিজয়
মিছিলের মহড়া, পটকা ও আবিরের সংগ্রহশালা।

অবশেষে এল সেই ২৩শে মার্চ, রবিবার। ইতিহাসের সঙ্গে মূল্যকাত-
এর অবিস্মরণীয় দিন। ইতিমধ্যে আবেগ-হজু-কুসংস্কারের প্রবল কম্পনে
R.L. N.R.L. সব ভারতীয় অস্বাভাবিক অবস্থায় পৌঁছেছেন। 'গাছে কাঁঠাল
গোঁফে তেল' প্রবাদের অযৌক্তিকতা লজ্জা দিয়ে তাঁরা ধরে নিয়েছেন কেদা
ফতে। মিশন ইমপসিবল-কে তাঁরা মিশন সাকসেসফুল ভাবতে যুক্তি
জলাঞ্জলি দিয়েছেন। আরো বাবা, অস্ট্রেলিয়ার হাতে কাপ কি ছেলের হাতের
মোয়া? যাগ যজ্ঞ-তাবিজ-জ্যোতিষ এসবের ঠেলায় পশ্চিৎ কি ফেশিৎ?

সৌরভ টস করার আগেই কিন্তু দৈবী আভাস মিলে গেল মন্দিরার
স্টুডিওতে। মা ঋতন্তরার ট্যারট ভবিষ্যদ্বাণীতে। এই ভদ্রমহিলা আগেও
জানিয়েছিলেন একটি খেলার আরম্ভকালে যে, ওয়াশিং আক্রমণ—যীব তখন
গাচশ উইকেট নিতে দুটি বাকি ছিল—একটি অবশ্যই পাবেন, কিন্তু দুটি
পাবেন না। স্ববহ মিলে গিয়েছিল।

আজ দুকদুক বক্ষে মন্দিরা দুটি কার্ড বাহলেন। একটি ভারতের, একটি
অস্ট্রেলিয়ার। 'অসি'রা 'অসাম', তাদের শক্তিতে আজ কোন ঘটতি হবে না,
জানালো ঋতন্তরা। ভারতের কিন্তু সুরুতেই শুরু সমস্যা, পরে উন্নতির চেষ্টা
হতে পারে। মন্দিরা দু দলের হয়ে আরো এক জোড়া করে কার্ড বেছে দেখতে
চাইলে, যদি তাতে ভারতের পক্ষে কোন শুভ সংকেত আবিষ্কার করা যায়।
তাতেও কিন্তু ম্যাচ অস্ট্রেলিয়ার অনুকূলেই রয়ে গেল। তাতেও ক্ষান্ত না হয়ে
দুই অধিনায়কের ব্যক্তিগত ভাগ্য এদিন কেমন, দেখার জন্য মন্দিরা রিকির
জন্য একট কার্ড টানলেন, সৌরভের জন্য আর একটা। ভবিষ্যদ্বাণী
অস্বাভাবিকভাবে জানাল, রিকি পশ্চিৎ-এর আজ দারুণ পারফরম্যান্স হবে। আর
সৌরভ? তার দিকে শুধু আশীর্বাদ আর শুভেচ্ছা। নেই কোন গ্যারান্টি।

এই প্রেডিকশানের সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরার মুখ শুকিয়ে কাগজে হয়ে গেল।
দেশপ্রেম তাঁর নিখাদ। নিজের দেশকে জিতিয়ে দেবার মত কার্ড তিনি বাহতে
পারেননি, এই অপরাধ-বোধ তাঁকে অদ্ভুতরকম বিষময়ন করে ফেলল।
এরপর সারা দিন তাঁর হাসি ছিল শুষ্ক, কঠিন নিরুৎসাহ। জগতের আনন্দযজ্ঞে
তোমার নিরুৎসাহ।

জাহিরের প্রথম ওভার থেকে সে ভয় দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর ছায়া
ছড়িয়েছে। নির্দয় ক্যান্ডার-সর্দার যখন দলের রানকে আকাশে তুলে ইনিংস
শেষ করলেন, ডাক ছেড়ে কাঁদা ছাড়া সৌরভ বাহিনীর আর কিছু করার
থাকল না। বিরতির সময় চার্লস যখন বললেন, 'মন্দিরা, বিমর্ষতা কাটাবার
জন্য ইস্টারেস্টিং কিছু বলো। আমাদের Cheer up করো। করুণ হতাশা কঠে
মন্দিরা নিজের অসহায়তা প্রকাশ করলেন— 'মায় ক্যা বসু?'

সত্যি তো মাঝ গাঙে ডুবলে প্রত্যাশা কম থাকে, অত আঘাত লাগে না,
যত লাগে তীরে এসে তরী ডুবলে।

হল না। বিজয়োৎসবের শ্যাম্পেন তথা মদিরায় স্নান করা হল না
আমাদের ক্রিকেটরদের। জীবন্ত কিংবদন্তী হওয়া হল না বাঙালি
অধিনায়কের। শাহরুখকে হয়ত সারা জীবন বসে থাকতে হবে 'আর এক
কাপ'—এব আশায়। কিন্তু ভাবুন, ঐ রানের পাহাড় ধাওয়া করে যদি জিতত,
কেউ আটকাতে পারত তেঁতুলকারের ভারতরত্ন হওয়া? আর তখন, মন্দিরা
তাঁর অনন্য ভূমিকার জন্য নিদেনপক্ষে পদ্মশ্রী দাবীদার হতেন। অপম্য বদনাম
নিয়ে বিশ্ব মন্দিরের মতো অবহেলিত হতেন না।

পুরুষ মহল

‘গাঁক্ গাঁক্’ বিভাগ

সামলাচ্ছেন : উদ্মান দলপতি

● খুব সমস্যা। আমি কারো খেমে পড়িনি, আমার মতো অপোগন্ডর খেমে পড়েছে একটি কুংফু-মেয়ে। এদিকে তাকে দেখলেই আমার পিস্তি জ্বলে যায়, ওদিকে সে আমার সঙ্গে গায়ে-গায়ে লেগে থাকে। বাঁচার উপায় বাতলাতে পারেন?

—সম্বরণ দাস, কলকাতা-৮৪

□ একটি ব্ল্যাকবেস্ট যুবকের সন্ধান করুন, তারপর ওই মেয়েটির গুণগান তার কাছে শতমুখে ব্যাখ্যান করুন যাতে সে মেয়েটির খেমে পড়ে যায়। অবশ্য তারপর কিছুদিন নিজে গা-ঢাকা দিন, নিজ হাড়গোড়ের নিরাপত্তার কারণেই।

● আমার মাথার গুণগোল দেখা দিয়েছে, ভালো চিকিৎসা কোথায় হতে পারে?

—বিশ্বপতি বারুই, মালদা

□ রৌচিতে আমার সিঁটা কি আর খালি আছে এতদিনে।

● আমার বয়স ৩৫। বিয়ে করিনি, কারণ মেয়েদের দেখলেই আমি কেমন ভীত সজ্জ হতে পড়ি। বন্ধুরা বলছে—চোখ কান বুজে জয় মা বলে একটা বিয়ে করে ফেললেই মেয়েদের সম্পর্কে ভয় কেটে যাবে। আপনি কি বলেন?

—হারাধন চক্রবর্তী, কলকাতা-২৭

□ ঠিকই বলেছে বন্ধুরা। ওই একজন মহিলা ছাড়া আর কোনো মেয়েকেই তখন ভয় করবেন না। এনার কাছে তাদেরকে মনে হবে— যাকে বলে নসি।

● আমার বউ ইদানীং আমাকে পাশাই দিচ্ছে না। তিনি শাহরুখ খানের খেমে হাবুডুবু খাচ্ছেন। কী করি বলুন তো?

—জয়দেব বিশ্বাস, চুইড়া

□ আপনিও ঐশ্বর্য রাই-এর খেমে পড়ে যান।

● কোনো ঘটকই আমার জন্যে ভালো পাত্রী বেছে দিতে পারছে না। একজন ভালো ঘটকের নাম বলুন তো।

—ধীমান রায়, গড়িয়া

□ কেন, ঋত্বিক ঘটক। অবশ্য তিনি আর ইহজগতে নেই।

● আমাদের বনেদি ব্যবসায়ী পরিবার। যথেষ্ট টাকা থাকলেও বংশে কারোর টাক-নেই। অথচ এই তিরিশ বছর বয়সে আমার টাক পড়ে গেল কেন?

—অপূর্ব গড়গাড়ি, বর্ধমান

□ ট্যাকের জোর থাকলে ট্যাকের জন্যে ভাবনা কিসের?

● আপনি হাত দেখতে জানেন?

—মণ্টু শিকারি, কাকদ্বীপ

□ পা-ও দেখতে পারি। আমার দৃষ্টিশক্তি বেশ ভালোই।

পত্রপাঠের নতুন গ্রাহকদের রেজিস্ট্রেশন নম্বর জানানো হল। কখনো যোগাযোগ করলে দয়া করে নিজের রেজিস্ট্রেশন নম্বর উল্লেখ করবেন।

- ২১৭ তপন কুমার চ্যাটার্জি, বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজ
- ২১৮ শঙ্কর কর্মকার, কলকাতা-৪৭
- ২১৯ বিপ্লব কুমার দাস, নিউ আলিপুর কলেজ
- ২২০ সুশেখরবিকাশ প্রকায়ক, কলকাতা-৬১
- ২২১ মণিশঙ্কর চৌধুরী, আমতা, হাওড়া

পত্রপাঠ বিভ্রান্তি

পূর্বের মতো পত্রপাঠ-এর সেপ্টেম্বর-অক্টোবর যুগ্ম সংখ্যা শারদীয় ১৪১০ হিসেবে প্রকাশিত হবে। সুতরাং সেপ্টেম্বর '০৩ সংখ্যা আলাদা করে প্রকাশিত হবে না। তাই সেপ্টেম্বর সংখ্যা কেন পেলাম না এই চিন্তায় শরীরপাত করবেন না।

সাহিত্য দুঃসংবাদ

বারো ভূতারি উপাখ্যান

প্রা ব্রাবই। গর্ভই যে বস্তু-বিশেষটির একমাত্র উৎসস্থল এমন কোনো নির্দেশ নেই শব্দকোষে। শরীরতত্ত্ব নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করলে এমন অনেক প্রাবেরই প্রবণ নজরে আসে। কিডনি-নির্গত প্র-বাচক নির্ধারিত তো প্রাবই।

তবে লেখালিখি নিয়ে লিখছি বলেই বলছি, ‘গর্ভপ্রাব’ শব্দটির একটি আলাঙ্কারিক ব্যঞ্জনা আছে। বিশেষ করে নেতিবাচক অর্থে। গৌরবে বহুবচনে প্রয়োগ করা না গেলেও অগৌরবে নানান বিষয়ে প্রয়োগ করার চলন আছে শব্দটির। সেই সুবাদেই লেখায় এবং কথায় শব্দটি প্রায়ই চোখে পড়ে বা কানে আসে। সৃষ্টির প্রয়াস যখন অনাসৃষ্টিতে এসে দাঁড়ায় তখনই উপমা হিসেবে শব্দটি উঁকি দিয়ে যায় মনে। তাই বলছিলাম, প্রাব প্রাবই, সে গর্ভপ্রসূতই হোক বা মগজ-প্রসূতই হোক। শেষোক্তটি আজকের বাহারি সাহিত্য-ক্ষেত্রে বিশেষ করে প্রযোজ্য।

তাই কেউ কেউ যেমন তালের টাটকা
রস পরম পরিভৃপ্তির সঙ্গে সেবন করে
থাকেন, তেমনি তাড়িখোরেরা আবার
বেশ জমিয়ে গাঁজলা না উঠলে
তালের রসের আশ্বাদই পায় না।

সেদিনের বটতলা থেকে আজকের কলুতলার গা-বরাবর কলেজ স্ট্রিট অর্থাৎ বইপাড়ায় লেখনী-নির্গত যে অবিরাম কালির স্রোত বয়ে চলেছে তাতে যেমন ন’মাসে ছ’মাসে কিছু কিছু পবিত্রত পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য-সৃষ্টি ভেসে এসেছে তেমনি বহুল পরিমাণে অনাসৃষ্টির গর্ভপ্রাবও ক্রমাগতই গাঁজলা তুলেছে সেই স্রোতে। ইদানীং গাঁজলারই যেন বান ডেকেছে বলে মনে হয়।

কথায় বলে, ভিন্ন রুচিহি লোকাঃ। তাই কেউ কেউ যেমন তালের টাটকা রস পরম পরিভৃপ্তির সঙ্গে সেবন করে থাকেন, তেমনি তাড়িখোরেরা আবার বেশ জমিয়ে গাঁজলা না উঠলে তালের রসের আশ্বাদই পায় না। তাই নিজেদের ভাঁড়ে গাঁজলা-ওঠা রস পরিবেশন করে “প্রাবিত”, “অভিভূত”, “পুরস্কৃত” অনুভব করাটা কিছু বিচিত্র নয়। তেনাদের মতোই মালাটি তারিখে তারিখে সেবন করে বৃন্দ হয়েছেন হয়ত আরো কেউ কেউ।

তা হোন। কিন্তু তাই বলে তাড়িকে তো আর শুদ্ধ তালের রসের মর্যাদা দেয়া যায় না। আমেরিকান কৈ (তেলাপিয়া) কি যন্ত্রে তেল কৈ-এর স্থান নিতে পারে? ছাইপাঁশ লেখায় পাঠক হিসেবে আমরাও আজ “অভিভূত” বা “পুরস্কৃত” বোধ না করলেও “প্রাবিত” ঠিকই, হয়ত ভুবোও গেছি।

আনন্দ-হরণ কিংবা আনন্দ-হনন বাজারি কাগজটিতে আট হপ্তা ধরে ‘ছায়া অনুগামী’, বিকল্পে “ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করে গায়ে হল ব্যথা” তো বটেই, মগজেরও কেমন যেন একটা ম্যাজম্যাজানি ভাব এসে গিয়েছিল। গজাল মেরেও সজাগ করতে পারিনি মগজটাকে। সুদীর্ঘ গঙ্গোপাধ্যায় কাহিনীর শুরুতেই রহস্যের দানা বাঁধলেন। ভালোই। ঝরঝরে, ছিমছাম ভাষা। কোনো অনাব্যাক চটক, চমক নেই। “তবু এ রকম সংসারেও হঠাৎ একটা উজ্জ্বল এসে সবকিছু তখনই করে দিতে পারে” যেন ইঙ্গিতও দিয়েছিল কাহিনীর গতিপথের। সমরেশ মজুমদারের কাহিনী বিন্যাসে রহস্যটি আরো ঘনীভূত হল। পাঠকের মনেও প্রবল উঠল—“কে মনোজ্ঞ?” রহস্যের জালটি বেশ সুন্দরভাবেই ছিটিয়ে ছড়িয়ে পাতলেন সমরেশ। কিন্তু ওই পাতাই সার হল, গুটিয়ে আনতে হিমসিম খেয়ে গেলেন বাকি জেলে, জেলিনীর দল। মাছকে খেলিয়ে ডাঙায় তোলাতেই কারদা, কৌশল ও কেরামতির প্রয়োজন হয়। টেনে হিঁচড়ে তোলা হয় কচ্ছপ। হারপুন গেঁথে ফ্রেন দিয়ে জ্বরদন্তি তুলতে হয় তিমি মাছ। এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। শেষমেষ রীতিমতো লড়াই করে হিঁচড়েতে, হিঁচড়েতে স-হর্ষ তিলকে তাল করতে যা জ্বরদন্তি টেনে তোলা হল সেটি কচ্ছপও নয়—বকচ্ছপ।

হবারই কথা। হাঁস ছিল সজ্জার, (ব্যাকরণ জানি না।) হয়ে গেল ‘হাঁসজ্জার’ কেমনে তা জানি না”, সে তো সুকুমার রায় বহুদিন আগেই বলে গেছেন। বাণী বসু তাঁর কিত্তিতে গল্পের সারাংশের মধ্যে বিশেষ দুকলেন না। এদিক ওদিক গালগল্প করে শেষমেষ ‘সজ্জার’ মনোজ্ঞকে সশরীরে হাজির করে জল ঘোলাটে করে কেটে উঠলেন।

এরপরই শুরু হয়ে গেল হাবুডুবু শাওয়ার পালা। খুব একটা দোষও দেওয়া যায় না পরের কলমচিদের। এমন জলে পড়লে খাবি সবাই খায়। কিন্তু প্রবল হল, জলে পড়তে বলেছিল কে? এমন একটা উদ্ভট গল্প লেখার পরিকল্পনাটি কার? বারোয়ারি হলেও কথা ছিল। কিন্তু একে কী বলা যাবে? বারো ভূতারি কাণ্ডকারখানা? (কেউ কেউ অবিশ্যি বলছেন বারো ভাতারি। বহুজন ভর্তৃ যেন।) ‘সে’ অর্থে কথাটি অস্বাভাবিক নয়। আমরা তাকে তাকে আছি—কোনটি আখ্যা দিলে পুরস্কার পাওয়া যাবে।

অধিক সন্ধ্যাসীতে গাছন নষ্ট। টু মেনী কুক্স স্পায়েল দি ব্রথ। আর কমিটির তুলিতে অশ্বের অবয়ব উদ্ভের আকার নেয়। অতএব আটজনের

এমন একটা উদ্ভট গল্প লেখার পরিকল্পনাটি কার?
বারোয়ারি হলেও কথা ছিল। কিন্তু একে কী বলা
যাবে? বারো ভূতারি কাণ্ডকারখানা?

কলমে উপন্যাসও অষ্টাবক্র হবারই কথা। হয়েছেও তাই। কাহিনী চৌমাথায় নয়, অটি-মাথায় এসে, দাঁড়িয়ে ঠিক নয়, তালগোল পাকিয়ে গেছে। চরিত্রগুলো—কেউ কেউ রঙ বদলে সঙ সেজেছে। কেউ কেউ কুস্তমেলার ভিড়ে হারিয়ে গেছে। মনোজ্ঞ কে বা কেন বা কোথায়। বৃদ্ধাশ্রমের লাবণ্য আর মেয়েপাড়ার (সেটা কোথায়?) সমাজ সেবিকা কেনই বা এল আর কোথায়ই বা গেল কে জানে।

এ তো গেল কাহিনীর কেজ্জা। এবার ভাবার বুনোনের দৃষ্টান্ত দি : “চোয়াল শক্ত হয়ে গেল ইম্মাধীর, হঠাৎই ওর মনে হল, দাঁড়িয়ে থাকবার মতো শক্তি নেই, ও, যেন বা, ভেঙে ভেঙে পড়ে যাচ্ছে মেঝেয়।” কন্মার থাকায় চোখ গোলগোল হয়ে ওঠে, “শক্তি নেই, ও, যেন বা,” কন্মাই কন্মা, রমরমা। বাজারি কদান্যতায় তিলোত্তমা যা সব রন্ধি মাল বাজারে ছাড়ছেন

তা বদীর আরকেও হজম হবার নয়। আশার কথা, তিনি কন্মায় ঠেকেছেন। কবে যে তাঁর লেখায় সত্যিকারের দাঁড়ি পড়বে। অবিশ্যি বহু আগেই সুকুমার রূপকের চঙে এঁদের উদ্দেশ্যে হুকুমনামা জারি করে গেছেন—“বাস বাস। ওইখানে দাঁড়ি দে।”

তিলোত্তমার কন্মার রমরমার পর হর্ষ-অত্যাক্তি: “রক্তের সম্পর্কের বাইরেও আবির্ভে লক্ষ-কোটি সম্পর্ক পড়ে তুলেছে মানুষ। আকাশের তারার মতো সেই সব রিলেশন অনন্ত, ধ্রুব।”

হবেও বা। লক্ষ-কোটিতে কটা শূন্য লাগে কে জানে। তা হোক, সবটাই তো মহাশূন্য।

—ওম্বিকা গুপ্তা

ছাইপাঁশ

মিলনের স্থানটা ধর্মস্থান ছিল না, মিলনেজুরাও ছিল না শুদ্ধম অপাপবিদ্ধম। এক মজলিসে গান-বাজনার মধ্যে রাত্রি গভীর হইতেছিল। হঠাৎ পবিত্রাদা প্রত্যাশিষ্টের মত অনুভব করিলেন, এমন একটা রাতে “In such a night as this” নজরুল এবং সজ্জনীকান্ত পৃথক থাকিবেন, ইহা হইতেই পারে না। সেই গভীর রাতেই তিনি পড়ি-কি-মরি করিয়া ছুটিলেন এবং ব্যাপারটার তাৎপর্য আমাদের ঠাহর হইতে না হইতেই মজলিস ভবনের দ্বারে কাজীর চক্চকে চকলেট

রক্তের জনহিসলার গাড়ির দরজা খোলা ও বন্ধ হওয়ার শব্দ পাওয়া গেল। মাটিতে চাদর লুটাইতে লুটাইতে তামুলরাগরজাধরোষ্ঠবন্ধ নজরুল আসিয়া ঘরের মেঝেতে দাঁড়হিতেই আসরে উপবিষ্ট আমাকে পাঁচজনে মিলিয়া জোর করিয়া তুলিয়া দাঁড় করাইল। তারপর হ্রমসো হ্রমসো দুই পুরুষের নারীসুলভ কোমলললিত-সবঙ্গলতা পঙ্কতিতে প্রথম মিলন সংঘটিত হইল সদ্য-পরিচয়ের “আপনি আছা” সম্বোধন অর্ধঘণ্টায় “তুমি” এবং পরবর্তী আধঘণ্টায় চড়ুড় করিয়া “তুই-তোকারি”র অধোভুমিতে নামিয়া আসিল।

আত্মস্মৃতি—সজ্জনীকান্ত দাস



জৈবিক হাবানা

ফ্ল্যাট গরু

কৈ চো খুঁড়তে সাপ বেরোয়। কিন্তু খুনি-ডাকাত খুঁজতে গিয়ে গরু বেরোয়—এমন দৃষ্টান্ত মেলা ভার। কিন্তু মিলেছে। খোদ কলকাতায়। একটি ফ্ল্যাটে। সেখানে মানুষ থাকে না, থাকে গরু। তারা দুধ দেয়। খাটালটি সেখানো করে ওল্লা। শুণ্ডা খুঁজতে বেরিয়ে পড়েছে ওল্লা। সম্ভবত এটি তার আসল নাম নয়, দুধে জল গুলে গুলেই এই উপাধি জুটেছে তার। লাভের ব্যবসা। অনেক ফ্ল্যাট-বাসিন্দাই এই ঘটনায় নিজেরা খুপড়িতে থেকে ফ্ল্যাটে খাটাল করায় উৎসাহী হয়ে পড়েছে। খাটে আর তাঁরা নয়, শোবে খাটালের গরু।

বীর নার্স

এতদিন অফিসে কারখানায় ভাঙচুরের একচেটিয়া অধিকার ছিল পুরুষদের। সে গৌরবও যায়-যায়। স্বাস্থ্য দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টরের অফিস ভেঙেচুরে ছত্রাণ করে নার্সরা এই গৌরব পতাকা ছিনিয়ে নিয়েছে। পুরুলিয়া থেকে জনা পঞ্চাশ নার্সের পুরো ব্যাটেলিয়ন এসে এই ব্যাটল চালিয়েছে কলকাতায়। ধুন্ধুমার কাণ্ড যাকে বলে। এদের চাকরির শর্ত ছিল, বদলি হবে না। কিন্তু বিয়ের পর স্বামীর কর্মস্থলে বদলি চেয়ে এবং না পেয়ে এই বদলা। কোনো কোনো নার্সীবাদী সংগঠন এদের সমর্থনা দেওয়ার কথা ভাবছেন। অবশ্য এনাদের স্বামীর প্রমাদ শুনতে গুরু করেছেন, এই ভাঙচুরের দক্ষতা যে কোনো সময়ে তাঁদের পাঁচরে প্রযুক্ত হতে পারে ভেবে।

শিক্ষামন্ত্রীর শিক্ষালাভ

মাতৃভাষার মাতৃদুখে আর বল খুঁজে পাচ্ছেন না উচ্চশিক্ষামন্ত্রী। ইংরেজি হঠাতে গিয়ে ছোট এক এস ইউ সির কাছে নাকের জলে চোখের জলে একাকার হবার পর উচ্চশিক্ষামন্ত্রীর দিব্যদৃষ্টি খুলে গেছে। সম্প্রতি তিনি মন্তব্য করেছেন যে ইংরেজি ছাড়া আজকের দুনিয়ায় এক পা-ও চলা যাবে না। শুধু তাই নয়, হিন্দির প্রয়োজনীয়তাও তিনি নাকি হাড়ে

হাড়ে উপলব্ধি করেছেন। ইদানীং অধ্যাপকদের হাড়ে দুকোবাস গজানোর চিন্তাতেই ব্যস্ত থাকেন তিনি। এখন আবার নতুন দুটো চিন্তা ভর করেছে। ইংরেজি এবং হিন্দি শিক্ষকরা চোখে সর্বেশ্বল দেখতে শুরু করেছেন শিক্ষামন্ত্রীর সুনজর তাঁদের দিকে পড়ল বলে, যাকে বলে শনিমামার দৃষ্টি।

ভুরুবাজি

কো তল-ফর্মান খ্যাত সলমন রুশদির চিন্তায় চিন্তায় ভুরু কুঁচকে গেছিল। সেইজন্যে তিনি প্লাস্টিক সার্জারি করে ভুরুর ধরণ-ধাঁরণই বদলে ফেলেছেন। কিন্তু তার পরই যা করেছেন তাতে ব্রিটেনের আয়কর দপ্তরের কর্তাদের ভুরু কপালে উঠে গেছে। ভুরুর চঙ পাশ্টাতে নাকি তাঁর বেজায় খরচ হয়েছে এবং সেজন্য তাঁর আয়করে এই বাবদ ছাড় দিতে হবে বলে তিনি কাঁদুনি শুরু করে দিয়েছেন। সংবাদ পেয়ে ভারতের আয়কর দপ্তর নড়ে উঠেছে। অসুখ-বিসুখ নয়, শুধু ভুরুবাজির জন্যে কর ছাড়। দপ্তর যে লাটে উঠে যাবে। শোনা যাচ্ছে শিগগিরই লোকসভায় প্রস্তাব আনা হবে, ভুরু নিয়ে গুরুগিরির চেষ্টা হলেই কড়া শাস্তি।

কেজো ডাক্তার

লাসবাগ হাসপাতালের ডাক্তাররা বড়ই কাজের মানুষ। কাজের আর শেষ নেই তাঁদের। এমনই সেসব কাজ যে তাঁর ফলে হাসপাতালে ডাক্তারিটা করার সুযোগই পান না তাঁরা। দিল্লির বিশেষজ্ঞ দল হঠাৎ হাজির হলে সুপার লোক পাঠিয়ে পাঠিয়ে পটিশজনের মধ্যে মাত্র পাঁচজনকে পাকড়ে হাজির করাতে পেরেছেন। বাকিরা নাকি ‘অন্য কাজে’ এমনই ব্যস্ত যে তাঁদের টিকির নাগালও পাওয়া যাচ্ছে না। অবশ্য সেই ‘অন্য কাজ’ যে কী বস্তু, সেটা খায় না পাশবালিশ করে—সে সম্পর্কে কিছুই বলতে পারেননি সুপার সাহেব। এম বি বি এস কোর্সে একটি ‘অন্য কাজ’ নামক স্পেশাল পেপার সংযুক্ত করার সুপারিশ করতে চলেছেন নাকি উক্ত বিশেষজ্ঞ দল। এঁরা তো আর ডাক্তারি না-পড়া হাভুড়ে নন। রীতিমতো পাশ করা। ‘অন্য কাজ’ সম্পর্কে পড়াশুনা না করে ‘অন্য কাজ’ করলে জনস্বাস্থ্য হানির আশঙ্কা প্রবল।

খবর চড়-চাপড়

টিপ্পনী দেবী

এক বৌনকর্মীর প্রাণ্য টাকা নিয়ে হাতাহাতিতে জখম হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হল দুই ব্যক্তি। শুক্রবার দুপুর নাগাদ এই ঘটনাটি ঘটে জগৎহরলাল নেহরু রোড ও মিডলটন স্ট্রিটের সংযোগস্থলে। ডিসি সদর জানান, চম্পা দাস নামে ওই বৌনকর্মী ময়দানে এক অজ্ঞাতপরিচয় সামরিক বাহিনীর কর্মীর সঙ্গে ঘোপের আড়ালে যান। পরে বেরিয়ে এলে চম্পাকে দেওয়া টাকার বখরা চাইতে আসে ইসমাইল খান। চম্পা দিতে অস্বীকার করে এবং তার দালাল হরিলাল সিংয়ের সঙ্গে ইসমাইলের মারামারি বাধে। ইসমাইল হরিলালকে ছুরি দিয়ে আঘাত করলে হরিলালও তাকে বাঁশ দিয়ে আঘাত করে। পরে দু'জনেই আহত হয়ে এস এস কে এম হাসপাতালে ভর্তি হয়। পুলিশ চম্পাকে নিরাপদে রেখেছে। ময়দানে ক্রমশই বৌনকর্মীদের যাতায়াত বৃদ্ধি পাওয়ার প্রশাসন নীরব ভূমিকা নেওয়ার ইতিমধ্যেই অনেকেই ক্ষুব্ধ।

—ময়দানের নতুন নামকরণ হোক ‘বৌনোদ্যান’।

○○○

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে হাওড়া থেকে হাজার হাজার জাল বই উদ্ধার করল কলকাতা পুলিশের এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ। এই ঘটনায় পুলিশ দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতারও করেছে। এনফোর্সমেন্ট দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন প্রথমে নারকেলডাঙা থানা এলাকার রাজা দীনেন্দ্র নাথ স্ট্রিট থেকে পুলিশ শঙ্কর বসু চৌধুরী এবং মানিক দে নামে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। তাদের জেরা করে এরপর এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ হানা দেয় হাওড়ার বাগনান রোডে। সেখান থেকে উদ্ধার হয় মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ২৪০০০ জাল বই। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের পর্বদ স্বীকৃত বই জাল করে ছাপিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই বিক্রি করা হচ্ছিল এই সব জায়গা থেকে। তবে একাংশের ধারণা বইয়ের কালোবাজারির জন্য কিছুটা মধ্যশিক্ষা পর্ষদও দায়ী।

—এইসব জাল-কীর্তির রাস্তা বোয়ালরা কিন্তু সবসময় জালের বাইরেই থাকে, ভেজাল-প্রক্রিয়ার নিরবচ্ছিন্নতা বজায় রাখতে।

○○○

সাংসদ সনৎ মণ্ডলের পর আর এস পি বিধায়ক নির্মল দাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠল, উনিশ বছর ধরে স্কুলে না গিয়েই বেতন তোলা এবং সামান্য মাসোহারার বিনিময়ে অন্য একজনকে দিয়ে নিজের ক্লাসগুলি করিয়ে নেওয়ার। দলের মথুরাপুরের সাংসদ সনৎবাবুর মতো আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক নির্মলবাবুও গত উনিশ বছর স্কুলে যান না। কিন্তু প্রতিমাসে বেতন তোলেন।

—এ যে স্কুলজীবনে রোজ ইচ্ছে হত স্কুলে যাব না। এখন বড় হয়ে ক্ষমতায় এসে সেই ইচ্ছে পূরণ করছেন মাননীয় সাংসদ-রা।

○○○

চীনের যুব প্রজন্ম এক অদ্ভুত রোগের শিকার হয়ে পড়েছেন। ডাক্তারি

পরিভাষায় যাকে বলা হচ্ছে, ‘মোবাইল ফোন ডিপেন্ডেন্স সিনড্রোম’ অর্থাৎ ‘মোবাইল আসক্তি’। সারা পৃথিবীর মধ্যে চীনেই সবচেয়ে বেশি মানুষ মোবাইল ফোন ব্যবহার করে থাকেন। আর মোবাইলেব ধাতব শব্দের মারাজালে বাঁধা পড়েছেন তাঁরা। রিং-এর মধুর শব্দ শোনার জন্য তাঁরা সর্বদাই তৃষ্ণার্ত। মোবাইলের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার, আধুনিক প্রযুক্তি আর নব্যউপভোক্তা সমাজের গগনচুম্বী উচ্চাকাঙ্ক্ষাই ভয়ঙ্কর চাপ সৃষ্টি করছে তাঁদের মনে, যা জন্ম দিচ্ছে ‘মোবাইল আসক্তি’র মতো এক সামাজিক মানসিক ব্যথার। চিন্তার বিষয় হল, চীনের যুবসমাজই বিশেষ করে ‘মোবাইল আসক্তি’র শিকার।

এই অদ্ভুত রোগের উপসর্গগুলি কেমন? চীনের বিশিষ্ট মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ইয়াং লিং জানিয়েছেন, “এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা মোবাইল ফোনেই নিজের মন-প্রাণ সঁপে বসেন। সব সময় নিজের সেল ফোনটির প্রতি তাঁদের সতর্ক দৃষ্টি। যেন অপেক্ষা করে রয়েছেন তাঁরা—কখন ফোনটি বেজে উঠবে, কখন তাঁরা শুনতে পাবেন বহুকাঙ্ক্ষিত রিং-টোনের শব্দ। আর, সেল ফোন চূপ করে গেলেই অস্থির হয়ে ওঠেন ওঁরা। বারবার ফোনটি উল্টে-পাল্টে দেখেন—যদি কোনো ফোন এসে থাকে। এমনকি, আশে-পাশে কোনো ব্যক্তির সেল ফোন বেজে উঠলেও প্রচণ্ড উজ্জ্বল হয়ে পড়েন।

—ডাক্তাররা ধরতে পারেননি। এ অসুখের নাম ‘রাধা সিনড্রোম’—শ্যামের বাঁশির জন্যে সদা উৎকর্ষ।

○○○

চাঁদের মাটি চুরিব দায়ে ধরা পড়ে এক ব্যক্তি। ধৃতের নাম গর্ডন ম্যাকগুয়ার্থার। ২৭ বছরের ম্যাকগুয়ার্থার ‘নাসা’ থেকে চুরি করা চাঁদের মাটি বিক্রি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ে। জাতীয় সম্পত্তি চুরির অভিযোগে ২৫ বছরের জেল হয়েছে তার, সঙ্গে ২৫০,০০০ ডলার জরিমানা। গত বছর ‘নাসা’র তিন কর্মী মূল্যবান চাঁদের মাটি চুরি করেছিল সেখান থেকে। ঘটনাক্রমে ওই চোরাই মাটি এসে পড়ে ম্যাকগুয়ার্থারের হাতে। আর, তার ফায়দা ভুলতে গিয়েই ধরা পড়ে যায় ম্যাকগুয়ার্থার। ১৯৬৯ থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত ‘নাসা’র ‘অ্যাপোলো মিশন’-এ চাঁদের মাটি সংগ্রহ করা হয়েছিল। গবেষণার স্বার্থে সংগৃহীত মাটি এবং পাথর ‘নাসা’র দফতরে এতদিন রাখা ছিল। সেই বহুমূল্য মাটিরই বেশ কিছুটা অংশ চুরি হয়ে যায়।

—চাঁদের কলঙ্ক। ফলং, নাকে অর্থাৎ নাসা-য় দড়ি দিয়ে ঝোরানো।

○○○

এবার পরীক্ষার প্রথম ফাঁসের অভিযোগ উঠল দুই অধ্যাপকের বিরুদ্ধে। মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞানের পরীক্ষার প্রশ্ন তৈরি করার দায়িত্বে যাঁরা ছিলেন, অভিযোগ, তাঁরাই ছাত্রছাত্রীদের হাতে হব্ব তুলে দেন প্রশ্নপত্র।

—বিদ্যা দানের অভিনব পদ্ধতি। বিদ্যাসাগরের নাতিপুতি তো।

সাক্ষীগোপাল

দেবপ্রসাদ কুমার

কোনদিন শুনিবেন যে—প্রেমিক রবীন্দ্রনাথে দাড়ির ভূমিকা, সমাজ সংস্কারক ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের মুণ্ডিত শ্বশুর অনিবার্যতা, দরদী শরৎচন্দ্রে আফিং ও সুরার দৌরাণ্ডা—
জাতীয় বিষয় লইয়া গবেষণা করিয়া কেহ ডক্টর হইলেন।

আচ্ছা, গোপাল কি কখনো সাক্ষ্যদানে অনুরুদ্ধ হইয়াছিল? অথবা তাহাকে এই জটিল মামলায় লুপ্ত অথবা প্রস্তুত করা হইয়াছিল? অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে এই বিষয়ে পুরাণ বা ভাগবত আশ্চর্য রকমে নীরব। যনি ধরিয়া লওয়া হয় (অবশ্যই তর্কের খাতিরে) যে শ্রীশ্রী গোপাল উক্ত কর্ম বা অপকর্ম কদাপি করেন নাই, তাহা হইলে ঋতিসুখকর প্রবাদ সদৃশ এই শব্দটির সৃষ্টি হইল কেমন করিয়া? এবং ইহা অবিসংবাদিত সত্য যে এই শব্দব্রহ্মেব সৃজনকালে গবেষককুল ডক্টরেট লাভের জন্য নিশ্চয়ই নিশীথ হৈলদাহ করেন নাই। ডক্টরেট লাভের জন্য হেন বিষয় নাই যাহা লইয়া উদ্বেগের গাণপাত করেন নাই। শুনিতে কিঞ্চিৎ কষ্ট হইলেও ধীমান পাঠক লেখকের সহিত একমত হইতেও পারেন যে ডক্টরেট সোভী গবেষকবৃন্দ তাহাদের গবেষণার বিষয়কে সর্বসাধারণের হিতার্থে যুক্তি সম্মতভাবে প্রাঞ্জল এবং সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রাণপাত করার পরিবর্তে ডিগ্রিধারী হইয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করাকেই শ্রেয় জ্ঞান করেন। হয়ত বা কোনদিন শুনিবেন যে—প্রেমিক রবীন্দ্রনাথে দাড়ির ভূমিকা, সমাজ সংস্কারক ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের মুণ্ডিত শ্বশুর অনিবার্যতা, দরদী শরৎচন্দ্রে আফিং ও সুরার দৌরাণ্ডা—জাতীয় বিষয় লইয়া গবেষণা করিয়া কেহ ডক্টর হইলেন। সূত্রাং রামায়ণ, মহাভারত, মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলী বা চর্যাপদ যাঁটিয়া গোপালের সাক্ষ্য দানের সম্ভাব্যতা লইয়া কেহ যে অদূর ভবিষ্যতে লেখনী ধারণ করিবেন না—এমন সম্ভাবনাকে একেবারে ফুৎকারে উড়াইয়া দেওয়া বিজ্ঞজ্ঞানোচিত হইবে না। বিশেষত ডক্টরেট লাভের সম্ভাবনা যেখানে প্রবল। তবে একটি বিষয়ে রসিক পাঠকদের আশ্বস্ত করা হইতে পারে যে এই নিরেট লেখককে দ্বিখণ্ডিত করিলেও (এমনকি শয্যাসঙ্গিনীর রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করিয়াও) সে সাক্ষীগোপালকে লইয়া গবেষণা করিবে না। কারণ তাহার বিদ্যার দৌড় সে জানে এবং সে হস্তিমূর্খ হইলেও সে যে হস্তিমূর্খ এটুকু বোঝার ন্যায় বুদ্ধি তাহার ঘটে আছে।

ভূমিকা স্বরূপ এ পর্যন্ত যাহা বর্ণিত হইল, পবিভাষায় ইহাকে বলে To make a mess of অর্থাৎ তালগোল পাকানো। তালকানা লেখকের সহিত আসুন দেখা যাক সাক্ষীগোপালের মামলায় আভিধানিকদের মতামত কিরূপ। চলন্তিকা নীরব। আশুতোষ দেব ও সুবল মিত্র একমত—নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থিত বক্তি। সুবল মিত্রের অতিরিক্ত সংযোজন—কথিত আছে যে সাক্ষ্য দিয়া ঐ নামে অভিহিত হইয়াছেন। ‘কথিত আছে’ অর্থে জনশ্রুতি বা লোকপ্রবাহ এই যে, জনশ্রুতির একটি বিরাট সুবিধা—তাহা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না বা বিশ্বাস করিবার জন্য কাঠ-খড় দস্ত করিতে হয় না।

আমরা এমনই বিশ্বাস প্রবণ জাতি যে বিশ্বাস করিবার জন্য ঔৎ পাতিয়া বসিয়া আছি, আধিদৈবিক হইলে তো আর রক্ষা নাই। গজানন যে সম্প্রতি দুধ পান করিয়া বিশ্বকে বাধিত করিয়াছেন ইহা তো কল্পকথা নহে, সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় ইহার সচিব বিবরণ মুদ্রিত হওয়ার রতসে আপামব পূণ্যবান ভারতবাসী তাহা মুদিতনয়নে শুধু যে বিশ্বাস করিয়াই ধন্য হইয়াছিল তাহা নহে, উচ্ছ্বাস ইহা নৃত্য ও করিয়াছিল। অতএব গোপাল যে সাক্ষ্য দিয়াছিল তাহা বিশ্বাস করিতে বাধা কোথায়? গোপালকে আমরা কৃষ্ণ বলিয়াই জানি। দহরম শব্দটির মহরমের পূর্বপদ হিসাবে গণ্য হওয়া ভিন্ন তাহাকে আমরা কিছু গণ্যমান্য বলিয়া অতিরিক্ত খাতির করি না। কিন্তু দহরম বিহনে মহরমের গতি নাই, যখন মাখামাখির কথা ওঠে। কৃষ্ণও রাধা বিহনে শতকরা পঞ্চাশ বা অর্ধাঙ্গ, রাধা যদিও কৃষ্ণের অর্ধাঙ্গিনী নহেন। পদকর্তারা যতই লক্ষ্যসম্পন্ন করুন না কেন রাধার সহিত কৃষ্ণের প্রেমকে তথাকথিত বৈধ বলিয়া কেহ দাবী করিতে পারেন না। এবং এ বিষয়ে কাহারো মর্মবিদারক আপত্তি থাকিতে পারে। রাধার বৈধ স্বামী আদ্যান ঘোষ। জনশ্রুতি এই যে তিনি মানুষটি নিরীহ ছিলেন, যাহাকে বলে মাটির মানুষ। কিন্তু তাহার দেহটি তো মৃত্তিকা নির্মিত নহে, প্রকৃতির নিয়মে রক্তে মাংসে গড়া। নিজের তেমন গরজ না থাকিলেও লোক অপবাদে অতিষ্ঠ হইয়া সম্ভবত তিনি কৃষ্ণের বিরুদ্ধে পরত্নী লইয়া জীলাষেলার অপরাধে নালিশ করেন ইহার প্রতিকার কল্পে নহে, আত্মরক্ষার তাগিদে। আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার সকলেই আছে। এখানে পদকর্তা-সমর্থন বিপুল হইলেও আত্মরক্ষার জন্য ইহা যথেষ্ট নহে বিশেষত রক্তচক্ষু বিচারকের চক্ষে। কল্পনা করিতে বাধা নাই যে পেয়াদা নিশ্চয়ই কৃষ্ণকে সমন ধরাইয়া দিয়াছিল এবং রাধার বৈধ স্বামী না হওয়ার অপরাধে তাহাকে অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া গীতা হস্তে হলফনামা পাঠ করিতে হইয়াছিল।

পাঠক তুমি যে শিশিয়ার তাহা আমি অবগত আছি, কারণ গীতা শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ নিসৃত যুদ্ধবিমুখ অর্জুনকে দেওয়া বাণী, যাহার উদ্ভব রাধিকা-পর্ব উত্তরকালে। এবং ইহাও ধর্তব্যের মধ্যে আনিতে হইবে যে গীতার বাণী যখন তিনি বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন তখন তাহার বুদ্ধি যথেষ্ট পাকিয়াছে—পরত্নীর সহিত লাগামছাড়া প্রেম করার মতো কাঁচা বুদ্ধিকে অতিক্রম করিয়া। তবেই পাকা পলিটিশিয়ানের মতো বলিতে পারিয়াছিলেন—ম্মা ফলেযু কদাচন। সর্ব ধর্মনি পরিত্যজ্য মামেকং স্মরণং ব্রজ। উচ্চাসের এই দর্শনকে নিদর্শন স্বরূপ আমাদের নেতারা কেমন Exploit করিতেছে তাহা সকলে অবশ্যই অবগত। সূত্রাং গীতার জন্ম উত্তরকালে হইলেও সাক্ষ্য দিতে হইলে

গীতা স্পর্শ না করিলে সাক্ষ্য বৈধ হইবে কেমন করিয়া মামলা যেখানে অবৈধ প্রেমের। ইহাতে গীতার অস্তিত্ব না থাকিলেও কিছু যায় আসে না। নেকড়েবাঘ কি মেঘশাবকে বলে নাই—তুই জল ঘোলা না করিলে কি হইবে, তোর বাপ জল ঘোলা করিয়াছিল। অর্থাৎ আমার মতো দুরাত্মার ছলের কখনো অভাব হয় নাই আর হইবে না বলিয়াই ভরসা রাখি। আমি ভরসা রাখি ক্ষতি নাই কারণ আমার ইহকাল পরকাল দুই-ই বাজেয়াপ্ত। কিন্তু পাঠক, তুমি তাই বলিয়া ফস্ করিয়া আহাম্মকেব মতো ভরসা রাখিতে যাইও না। আমার যে বিবিধ কারণে এবং অদৃষ্টপূর্ব পরিস্থিতিতে নানাবিধ ছলের প্রয়োজন হয় তাহার একমাত্র কারণ আমি একজনের কাছে সম্বেদ্যতা ভাবে প্রমাণিত হইয়াছি যে আমি দুরাত্মা। কাহার কাছে? যাঃ, বারে বারে বলিতে আমার মতো বেহায়ারও হায়া হয়।

কিন্তু বিচারকের রায় কাহার পক্ষে গিয়াছিল? এস. ওয়াজেদ আলির ‘ভারতবর্ষ’ প্রবন্ধের সেই অবিস্মরণীয় উক্তিটির সমর্থনে পরদ্বীর সহিত ঢলাঢলি করার ন্যায় অদৃষ্টপূর্ব গর্হিত কর্মের ‘সেই Tradition সমানে চলে আসছে’। কখনো কি শুনিয়াছেন যে মিস্টার মজুমদার সুরাসক্ত হইয়া মিসেস পাকড়াশির সহিত গভীর রাত্রি অবধি অতিরিক্ত আন্তরিক হওয়াব জন্য শ্রীযুক্ত পাকড়াশি উত্তেজিত হইয়াছেন? বরং ইহাই স্বাভাবিক যে বীর উত্তেজনা প্রশমন হেতু পাকড়াশি মহাশয় শ্রীমতী চাকলাদারের দ্বারস্থ হইলে শ্রীযুক্ত চাকলাদার প্রমত্তকণ্ঠে উদাত্ত স্বরে আহ্বান করিয়াছিলেন—কেন রে তোর দুয়ারটুকু পার হতে সংশয়?

মহাভারতে আছে যে শিখণ্ডীকে পুরোবর্তী করিয়া অর্জুন ভীষ্মের সহিত সমরে ধ্বংস হন এবং শিখণ্ডী নপুংসক বলিয়া তীব্র তাহার অঙ্গে শরক্ষেপ করেন নাই। শিখণ্ডীর সহিত কি সাক্ষীগোপালের কোনো আলঙ্কারিক সাযুজ্য আছে? শিখণ্ডী খাড়া করিয়া কাব্যোচ্চার আর সাক্ষীগোপালকে পুরোবর্তী করিয়া অনুক্রম কার্য করা সমগোত্রীয় সাক্ষীগোপালের পরিভাষা—One in authority rendered powerless and capable only of witnessing (other's misdeeds). এই শব্দগুলির মধ্যে Powerless শব্দটিই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, যদিও ইহার অর্থ টুটো জগন্নাথ। সাক্ষীগোপাল শ্রীক্ষেত্রে অবস্থিত, যে বিরাজধামে বিরাজমান ধ্রু জগন্নাথও, আর ইহা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ যে

পুরীতে জগন্নাথ টুটো। সাক্ষীগোপাল ও টুটো জগন্নাথের অ-ভৌগোলিক ও আলঙ্কারিক অর্থে কি তীব্র সমন্বিত, একের দৃষ্টে অপর বিপণিত। উভয়ে যেন মস্তকদ্বয় অগ্রসর করিয়া দিয়া সাদর আহ্বান জানাইতেছেন—আইস, আমাদের সুলভ মস্তকে পনস (কাঁঠাল) ভঙ্গ করতঃ সুখে ভক্ষণ করিয়া আমাদের উদ্ধার করো।

কিন্তু সাক্ষীগোপালকে কটাক্ষ কবিয়া যতই বিদ্রোপ বাণে বিদ্ধ করা হউক না কেন তাহা তাঁহার গণ্ডার-সদৃশ স্বকে প্রতিহত হইয়া আসে এবং তাঁহাকে ন্যায্য পাওনাগণ্য হইতে সাধারণত বঞ্চিত করা হয় না। ক্ষাণ্ণপহীন সাক্ষীগোপালের সঠিক বিদ্রোপের বিপক্ষে সেই সংলাপই চমৎকার খাপ খাইয়া যায়, পরশুরাম-যাহা তাঁহার ‘লব্ধকর্ণ’ পত্রের উপসংহারে লিখিয়াছেন, “লোকে দূর হইতে তাহাকে বিদ্রোপ কবে। লব্ধকর্ণ গভীর ভাবে সমস্ত শুনিয়া যায়, নিতান্ত বাড়াবাড়ি করিলে বলে ব-ব-ব অর্থাৎ যত ইচ্ছা হয় বকিয়া যাও। আমি ওসব গ্রাহ্য করি না।”

উপদেশ দেওয়া লেখকের কর্ম নহে এবং তাহা দেওয়ার দুঃসাহস অথমেই কখনো হয় নাই। পরন্তু অধম সর্বধা অন্যের উপদেশ অনুযায়ী চলিয়া থাকেন। (এই উপদেশটা মণ্ডলীর মধ্যে বীর শ্রীমতী একাই একশ, অন্যের উপদেশ বড় একটা প্রয়োজন হয় না)। তথাপি একটি বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বনের বিশেষ আবশ্যক আছে বলিয়া মনে করি, অন্যথায় হিতে বিপরীত হইতে পারে। স্বরশ থাকিতে পারে যে কতিপয় পরিপক্ক মস্তিষ্ক রাজনীতিকগণ জনৈক প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী-তনয়াকে পিতৃহুলাভিষিক্ত করিবার সমর ভাবিয়াছিলেন যে একটি শালভঞ্জিকাকে (কাঠের পুতুল) তাহারা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন যিনি তাহাদের কথায় উঠিবেন বসিবেন। কিন্তু এশিয়ার মুক্তিসূর্য তাহাদেরকে কদঙ্গী ধর্ষণ করিয়া কেমন করিয়া যে প্রগুক্ত কালনেমিদিগের চক্ষু এবং নাসিকার নীর সর্বধর্মের ন্যায় সমন্বয় করিয়া দিয়াছিলেন তাহার সাক্ষী ইতিহাস, গোপাল নহে। ঈদৃশ জনশ্রুতিও বেশ মুখরোচক বলিয়া প্রচারিত হইয়াছিল যে কিছু দুর্জন তথা অশিষ্ট রসিক অন্যতম উচ্চাকাঙ্ক্ষী নিজলিঙ্গান্নার যে অভিনব ব্যাসবাক্য রচনা করিয়াছিল তাহাকে কোনোমতেই ব্যাকরণ সম্মত বলা চলে না, নিপাতনে সিদ্ধ বা অর্ধসিদ্ধ হইলেও হইতে পারে। সুতরাং সাধু সাবধান।

চিরকালের কৌতুক

কাকলি চৌধুরী

(একটা স্টেশন আসছে, একজন পাশের ভদ্রলোককে সেইসব স্টেশনের নাম জিজ্ঞাসা করছে। পাশের ভদ্রলোক এতে ভারী বিরক্ত হচ্ছে।)

১ম ভদ্রলোক : কোথায় এলাম?

পাশের ভদ্রলোক : (বিরক্তস্বরে) তাহেরপুর।

১ম ভদ্রলোক : ও! এই স্টেশনের নাম হল ‘তাহেরপুর’।

(এরপর আরার একটি স্টেশন আসে এবং ১ম ভদ্রলোকের পুনরায় প্রশ্ন ও পাশের ভদ্রলোকের প্রচণ্ড বিরক্তি প্রকাশ।)

১ম ভদ্রলোক : এটা কোন স্টেশন, দাদা?

পাশের ভদ্রলোক : জানি না।

১ম ভদ্রলোক : ও! তার মানে এই স্টেশনের নাম হল ‘জানি না।’

জিজ্ঞাসা : তুমি তোমার স্বামীকে ছুরি দিয়ে কেন খুন করলে?

আসামী : বাচ্চাদের ঘুমের ব্যাঘাত করতে চাইনি। তাই পিষ্টল দিয়ে গুলি না করে ছুরি দিয়ে খুন করেছি।

প্রেমিক : আপনি আপনার মেয়ের হাতটা শুধু আমার হাতে দিন আমি বিয়ে করব।

হবু স্বপ্ন : কখনোই না, আমার গোটা মেয়েটাকে নিলে তবেই তাকে বিয়ে করতে পারবে।

কড়চা ২০০৩

সুধীর মুকুয্যের দাদাগিরি

অমিতাভ সান্যাল

সুধীর মুকুয্যের ভরাট ও ভারী কণ্ঠস্বর শুনলে তাঁকে অধ্যাপক বলে ভাবাটাই যুক্তিসঙ্গত। রবিবারদিন তিনি পাড়ার হাই প্রোফাইলদের সাথে একাসনে বসে জনকল্যাণের ব্লু-প্রিন্ট রচনা করেন। তা, আয়ার ভাবনা নিদারণ ধাক্কা খেল যেদিন সুধীরকে একটি স্টেটবাসে চালকের আসনে সওয়ার হয়ে এক ট্যাক্সিচালকের সাথে একবারে কাছা খুলে গালি বিনিময় করতে দেখলাম। ইতিমধ্যে ফুটের ধারে আমায় দেখে গালির ডেনসিটি অনেকটা বাড়িয়ে নিলেন। বেড়ে গেল বলা চলে। এই হল দাদাগিরি।

ইতিমধ্যে গঙ্গা দিয়ে যৎপরোনাস্তি জল প্রবাহিত হয়েছে। সুধীরদা অবিবাহিত। প্রায়ই চা খেতে আমাদের বাড়ি চলে আসেন। চায়ের কাপে তুফান তোলেন। চন্দ্রমাধবের পিতা সূর্যমাধব সকালে ফুল চুরি করবার ফাঁকে লাঠি দিয়ে পর্দা সরিয়ে ঘুমন্ত নারী-সৌন্দর্য পান করেন। ‘একদিন হাতেনাতে ধরি বুড়োকে—তারপর বুঝিয়ে দেব, কতধানে কত আউস চাল।’ বললেন সুধীরদা। আমি চন্দ্রমাধব-পিতার সম্ভাব্য পরিণতির কথা ভেবে কম্পিত হলাম।

সুধীরদার ডিসেকশন অনুযায়ী তার বাড়ির মেয়েছেলেরা ছাড়া পাড়ার যাবতীয় মেয়েমানুষ খারাপ। সবগুলি দু-নম্বরী। কেন? সুধীর জবাবী ভাষণে বললেন, ‘এসব ফ্ল্যাট কালচার, বুঝলে? সাতদিন তোমার বউ আর আমি; পরের সাতদিন আমার বউ ও তুমি। তারপর আজকাল বয়স্কা কুমারী মেয়েগুলোও বেজায় সুডসুড়িখোর হয়েছে। কে যে কার সঙ্গে কখন কিভাবে সুডসুড়ি মারছে জানা মুশকিল।’ এটা নির্বিষ দাদাগিরি।

সুধীরদা ব্যাচেলর হওয়া সত্ত্বেও এসব উত্তেজক কথা বলেন অক্রেপে। তা এবার হল কি, সেই-সুধীরদার ছোট বোন লক্ষ্মী অথবা লক্কেট ভর সন্ধ্যাবেলায় পাড়ার এক ছেলে নিয়ে ভাগল। সেই ছোকরার চার মামা যেহেতু ভ্রূরতবর্ষের চার ধাত্তে বসবাস করেন তাই সুধীরদা লঙ্কানুসন্ধান বিশেষ স্পন্দনশীল হবেন বলে ভাবলেন না। অতঃপর তাঁর যত রাগ গিয়ে পড়ল ঠাকুরদাসের ওপর, কারণ লঙ্কার স্পনসর লবঙ্গ হলেন গিয়ে ঠাকুরের বুজ্জু। এখন পাড়ার মধ্যস্থানে ‘আনন্দমূর্তি’ নামে চালু মিস্টার দোকান চালান ঠাকুরদাসের শ্যালক বৈকুণ্ঠ আর ভিয়েন বসে ঠাকুরের উঠোনে। তা সুধীর পাড়ার প্রভাবশালী ডাক্তার নিত্যকর্ম সেনের ঘাড়ে চেপে পরিবেশ দূষণের

চন্দ্রমাধবের পিতা সূর্যমাধব সকালে ফুল চুরি করবার ফাঁকে লাঠি দিয়ে পর্দা সরিয়ে ঘুমন্ত নারী-সৌন্দর্য পান করেন।

অজুহাতে দিলেন সেই ভিয়েন বন্ধ করে, ও বলাই বাহুল্য ‘আনন্দমূর্তি’ গেল উঠে।

আমাদের পাড়ায় ‘ওয়ার অন নার্ভস’ বেশ জনপ্রিয়। কখন কে কার সাথে গাঁটছড়া বেঁধে কাকে ছড়কো দেবে বলা মুশকিল। সুধীরদার বাড়ির পাশে পেট্রায় ফ্ল্যাট উঠছে। একদিন অসাবধানে ধান ইট পড়ল এসে রামাধরের হাদে। অ্যাসবেসটাসের টুকরো পড়ল ফুটন্ত মাছের ঝোলে। আর যাবে কোথায়। ডঃ নিত্যকর্মের অভিভাবকত্বে পাড়ার জমায়েত হল জব্বার। প্রমোটারকে শুধু যে ‘কাকলীজ কিচেন’ থেকে তেরোটি মিল আনতে হল তাই নয়, অ্যাসবেসটাসের জায়গায় পাকা ছাদ গড়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিতে হল তাকে। নরুণ গিয়ে নাক পেয়ে সুধীরদার সে কি টাক্ ডুমা ডুম্ টাক্-বাদি বাজাবার ঘট।

সেদিন শনিবার। সকাল আটটায় বাড়ির সামনে মহা কোলাহল। এতদিন জানতাম সামনের দোতলা বাড়ির মালিক যুগ্মভাবে সহোদর রাজনারায়ণ ও স্বামীনারায়ণ। গত এক বছর ধরে লাগাতার ধুন্ধুমার মারামারি ও গালাগালি চলছিল। আজ কোর্টের রায়ে রাজনারায়ণ বাড়ির বৈধ মালিক রূপে ঘোষিত হয়েছেন। তিনি শুণ্ডা লাগিয়ে স্বামীর স্ত্রী ও সন্তানাদি এবং শাশুড়িকে বাড়ির বার করে দিয়েছেন। সারা রাতএভাবেই থাকলেন স্বামী। স্বামী-কন্যা সুরাধির লভ বৈশ্যম্পায়ন ভাবী স্ত্রী ও ভাবী শ্বশুর-শাশুড়িকে নিজ নিবেদনে নিয়ে যেতে চাইলেন। প্রবল অভিমান হেতু তাঁরা কেউই গেলেন না। মানে রাস্তার ধারেই থাকলেন।

সকালে ডঃ নিত্যকর্ম সমভিব্যাহরে পুনরায় সুধীর মুকুয্যের রাশভারী কণ্ঠস্বর—‘নাঃ, এ হৃদয়বিদারক দৃশ্য তো সহ্য হয় না! ঠাকুরদাস, তোমাব জমিতে যখন ভিয়েন বসে না আর, এদেরকে আশ্রয় দাও না।’

ঠাকুরদাস মওকা খুঁজছিলেন। তিনি বললেন, 'তোমার বারান্দা ও ছাদে এদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করো না মুকুযো। জানো তো, ব্রাহ্মণকে ভূমিদান এক পুণ্যকর্ম।'

সুধীরের দাদাগিরি এই প্রথম জোর চাকুরি খেল।

সুধীরের তো আক্কেল শুভুম। সেদিনের পুচকে ছোঁড়া ঠাকুরদাস মুখে মুখে জবাব দিচ্ছে। তাও 'ভূমি ভূমি' করে। সুধীর নিদারুণ ক্রুদ্ধ হলেন। একেবারে রেগে আগুন তেলে-বেগুন অবস্থা যাকে বলে। তিনি এবার উন্টে খেলার সিদ্ধান্ত নিলেন। সেটা কিরকম? যে চন্দ্রমাধবের পিতা সূর্যমাধব ভোরবেলায় ফুল জোলায় ফাঁকে জানলার ফাঁক-ফোকর দিয়ে আলুখালু নারী-সৌন্দর্য পান করতেন এবং যাদের তিনি একেবারেই পছন্দ করতেন না এবং যাদের সাথে সম্পর্ক রাখার কথা তাঁর স্বপ্ন-সীমার বাইরে ছিল সেই চন্দ্রমাধবের সাথে তিনি সকালে স্নো ওয়াকিং শুরু করলেন আর মাধব-পরিবার এই ঘটনাকে তাদের ঐতিহাসিক জয় ভেবে পরম পরিতোষ লাভ

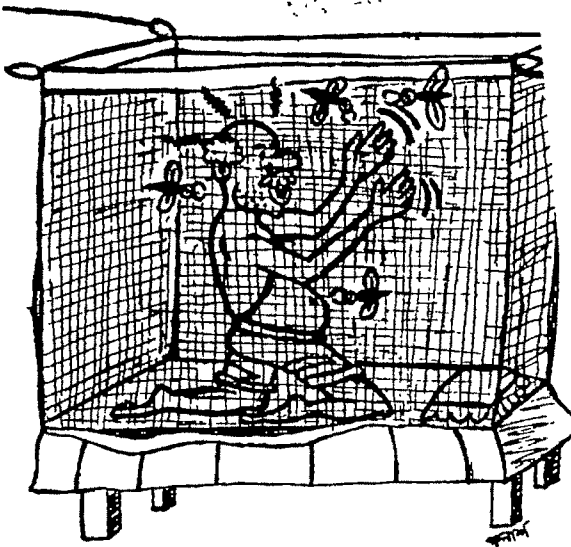
করলেন।

পরিশিষ্ট : দাদাগিরির বিষয়টি দেশলাই কাঠির মতো ভুস করে জ্বলেই ফুস। সুধীরদা আজকাল বাড়ি থেকে বড় একটা বার হন না। তাঁর হেসার হাই ও সুগার অ্যালামিং। ডঃ নিত্যকর্ম পুত্র নিবারণের সাথে কলহ করে আপাতত কনখলের বাসিন্দা। পাড়ায় এখন মেলা দাদা! সবাই যেন 'আই অ্যাম আ নিউট্রামুল দাদা'। তারপর বর্তমান দাদাদের চোখে অতীতের দাদারা অশ্বসিক। এই যেমন এবার পুজোর ডেপুটি সেক্রেটারি-ইন-চার্জ (চাঁদা ম্যাটারস) ঐ সুধীরদাকে সর্বের মতো পিষে দু'শ এক টাকা আদায় করে ছাড়লেন। একেই বলে দাদাগিরির লিগাসি।

সুধীর ভাবছেন, নখদন্তহীন সিংহ ভেবে রোয়াব নিচ্ছে। যা প্রাণে চায়—করো গিয়ে। আমি কামতাপুরী গেলে আর কাকে পাবি? দাজিলিং-এ বেড়াতে আসবি না? দেখিস কি করি তখন। কণিকর স্টাচু করে ছাড়ব।

অ-কাব্যিক

উদয় বন্দ্যোপাধ্যায়

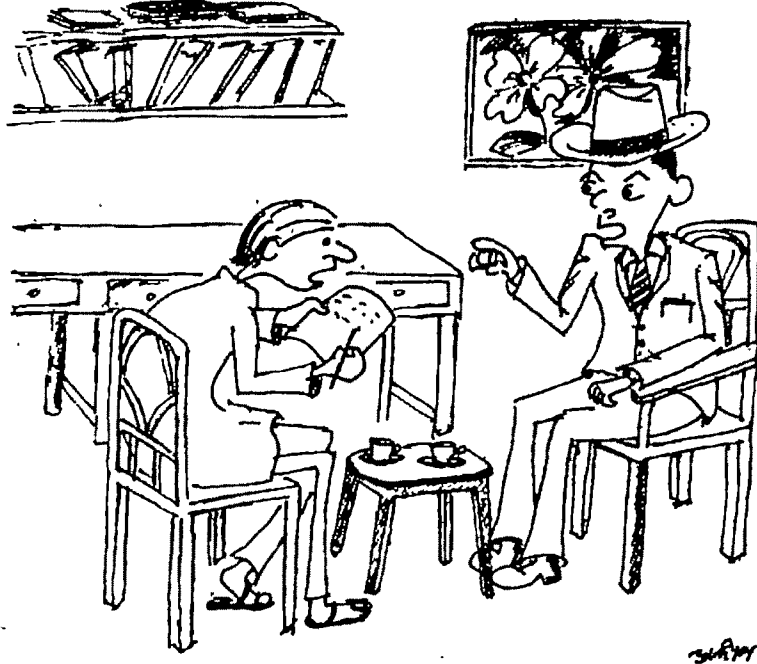


কদিন হল কাব্য টাব্য আসছে না আর এই মাথায়
ধুম, ঝাওয়া আর দশটা বাজলে অফিস গিয়ে সেই ষাভায়
লিখব যে, তা লেখার মতো বিষয়টা আর কই মশাই।
যা লেখার সব লিখেই রাখেন সুনীল কিম্বা জয় গৌসাই।
গান বাঁধতে গেলেও দেখি নতুন কিছুই নেই পড়ে
অনজ্ঞকাল গান ঘোরে সেই প্রেম-পিরিতির চক্কোরে।
সুর মানে তো সেই সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি-র নিচ-ওপর
রাজি বলতে মালকোষ আর ভাঁয়রো, টোড়ি মানেই-ভোর।
তাই মগজে মরচে, কোনো সৃষ্টি-চিন্তা নেই মনে
এক বেয়ে দিন কল্পনায় বন্দী ফ্যাটের এক কোণে।
মাঝরাতে তাও জানলা দিয়ে যেই ভাঙা চাঁদ দেয় উঁকি
পাশেই শোয়া ঝগড়ুটে বউ কোন জাদুতে চাঁদমুখী।
তা দেখে যেই কাব্য ভাবব কানের কাছে অন্য গান,
মশারিতে ফুটো, খাঁটের মাঠে মশার অধিষ্ঠান।
রাত জেগে তাই মশা মারার চটপটাপটি রক্ততো
জীবনমুখী মশার গানে দুইটি তালুর সঙ্গতে।

(ডবল দাদরা তালে পড়িতে হইবে—ধাখিনা নাতিনা/ধাখিনা নাতিনা।
শুরু করুন— যা বোঝাতে চাই, বোঝা যায় কিনা?)

চরণ বৈরাগীর

ইকুডি মিকুডি



অম্লানবদন মাসল্

কলকাতার ব্যাজার পত্রিকাগোষ্ঠীর প্রধান পত্রকার শ্রী চিরহরিৎ অম্লানবদন সাম্প্রতিক পুণ্যতীর্থে আমেরিকা সফরকালে একটি কেজ্জাকাগজে এই ছড়াটি পড়েন—জর্জ বুশ/থায় বুশ/হেলায় রুশ/হল বুস্। ছড়া পড়ে চোখ-ছানাবড়া চিরহরিৎ অম্লানবদনের মগজে গুজরাটী ভূমিকম্প। বুশ ঘুষ খায়—হতে পারে কি? ভারতের এক প্রধানমন্ত্রী ‘সুটাকেস’ নিয়েছিলেন, সর্বজনের জানা। কিন্তু বুশ? সোদগুণ্ডাপ বিশ্ববিদায়ক—তিনিও? অবশ্য নির্বাচনের জন্যে যে কোটি কোটি ডলারের দরকার পড়ে তা তো আকাশ থেকে পড়ে না। যারা দেয়, তাদেরও সেটা ফিরিয়ে দেবার দায় থাকেই। টাকা দেয় সমরাত্র প্রস্তুতকারক ও বিপণন সমাটরা। তৈলকুবের ধনপতিরা। এইসব পেজি তথা চিরহরিৎ অম্লানবদনের নখের ডগায়। খুঁতখুঁতে মন ও আগ্রাসী জিজ্ঞাসা নিয়ে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে অবশেষে বুশের পররাষ্ট্র আক্রমণ বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টার ব্যক্তিগত সচিব থুলভরোঙ্কি গাঁটকাটোঙ্কির সঙ্গে একটি অত্যন্ত গোপন ও একান্ত বৈঠকে মুখোমুখি হন। তাঁদের নিভৃত কথোপকথনের কিছু সুদূরভ কোটস, যা মাধুকরী করতে গিয়ে আকস্মিকভাবে পেয়ে যাই, এখানে নিবেদন করা হল।

থুলভরোঙ্কি গাঁটকাটোঙ্কি : মিঃ সিরহরিৎ অম্লানবদন, আপনার নামটা খুব ইনটারেস্টিং। আমি অনেক ভারতীয় নাম শুনেছি, বিশেষত সাউথের—কিশাল নাম একটা আমার মনে আসছে, এর্নাকুলাম কোডাইকানালা ভূতলিঙ্গম মহালিঙ্গম—বেশ মজার। কিন্তু আপনার নামের তাৎপর্য আমাকে কেউ বোঝাতে পারল না। আমাদের ইন্ডিয়ান ডেক্সের ক্যালকুটা চিফও পারল না। যে আই হেত দ্য প্রেজার—

চিরহরিৎ অম্লানবদন : ওঃ শিওর। আমার নামের অর্থ খুব সোজা। আমাদের কাগজের পলিসি অনুযায়ী আমি নামটা এফিডাবিট করে কপিরাইট নিয়ে নিয়েছি। আমরা মনেপ্রাণে হরিৎ সাংবাদিকতায় অর্থাৎ ইয়েলো জার্নালিজমে বিশ্বাস করি। নো রেড—নো হোয়াইট—সাল বা সাদা কোনো

দলেই নেই। আর অন্নানবদনেই—সত্য মিথ্যা ভুলভাল যাই লেখা হোক, কোনো বিকার দেখতে পাবেন না। প্যাক খেলেও হাপুস করি না, আবার প্রয়োজন মারফিক পৌ ধরতেও পিছলে যাই না।

খুলভরোক্ষি গাঁটকাটোক্ষি : বাঃ, ওয়াভারফুল। উই আর ইন দ্য সেম বোট।

চিরহরিৎ অন্নানবদন : আপনার নামেরও কোনো বিশেষ তাৎপর্য আছে নাকি মিঃ খুলভরোক্ষি গাঁটকাটোক্ষি?

খুলভরোক্ষি গাঁটকাটোক্ষি : অবশ্যই। আমার পিতৃদত্ত নাম ছিল তুলভার গাঁটকাটার। ইস্ট ইউরোপের মানচিত্রে হলুদ হওয়া লাগলে আমাদের সরকার ওখানকার অধেস্ড মানুষদের জন্যে খুব দরাজদিল হয়েছিল। তাই দেখে আমিও নামটা বদলে নিলাম—তুলভার থেকে তুলভরোক্ষি; আর গাঁটকাটার থেকে গাঁটকাটোক্ষি। ইট ওয়ার্ল্ড মিরাক্স। ক' বছরের মধ্যেই দেখুন আমি কোথায় পৌঁছে গেছি।

চিরহরিৎ : (স্বগত) ওঃ তার মানে আজমই গাঁটকাটায় হাত পাকিয়েছে। তোমার চেয়ে যোগ্য লোক কুশ আর পেত কোথায়।

খুলভরোক্ষি : কী বললেন? ঠিক শুনতে পেলাম না।

চিরহরিৎ : ও কিছু না। শুধু বলুন, ইরাকে কোনো মহামারক গোপন অস্ত্রের সন্ধান না মেলা সত্ত্বেও কেন আপনারা আক্রমণ করলেন?

খুলভরোক্ষি : এটা কী বলছেন সিরহরিৎ অন্নানবদন। আমার ডিপার্টমেন্ট আক্রমণ করে না। আমরা শুধু থেসিডেন্টকে আক্রমণ বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি। ফাইন্যান্স ডিসিশন ইজ হিজ ওনলি।

চিরহরিৎ : স্যরি, আমার ভুল হয়েছিল। আপনারা কি আক্রমণের পরামর্শ দিয়েছিলেন?

খুলভরোক্ষি : আক্রমণের পরামর্শ দিয়েছি যেমন বলতে পারছি না, তেমন আক্রমণ না করার পরামর্শ দিয়েছি—তাও বলা যাবে না। আমাদের প্রেসেডেন্টের আমরা দেখিয়েছি কোন কোন অস্ত্র কারখানার কত লাভ হবে, কত বিদেশি অর্ডার আসবে, আমাদের খনিজ তেলের মজুত অক্ষত রেখে কত কম দরে দেশের জনগণকে তেল দেওয়া যাবে—তাতে মোটর কোম্পানিগুলোর ব্যবসা কত বাড়বে, ব্যবসা বাড়লে কত লোকের চাকরি হবে, চাকরি হলে তাদের ক্রয়ক্ষমতার প্রয়োগে আরো কত কলকারখানা ব্যবসা-বাণিজ্যের বিকাশ হবে—এইসব।

চিরহরিৎ : কতজন আমেরিকান সোলজার মারা যাবে বা পঙ্গু হবে কিংবা মিসিং কি বন্দী হবে তার কোনো হিসেব করেছিলেন?

খুলভরোক্ষি : ওটা আমাদের টাস্ক না, প্রতিরক্ষা দপ্তরের। তবে

ওসব তো পার্ট অব লাইফ। জীবনের জন্যে যুদ্ধ, যুদ্ধে কিছু মৃত্যু অনিবার্য। আনএন্ডমেডেবল। কিন্তু দেশের মানুষের কত লাভ ভেবে দেখুন।

চিরহরিৎ : সোলজাররা তো দেশেরই মানুষ। আর লাভ হবে ক্ষমতাস্বার্থে কিছু মানুষের। যারা মারা যাবে তাদের পরিবারের কী লাভ হবে?

খুলভরোক্ষি : তারা ক্ষতিপূরণ—অ্যাক্স পার ক্লস তো পাবেই। আরো পাবে বেটার আমেরিকান লাইফ।

চিরহরিৎ : মৃত্যুশুলোও নিশ্চয় গ্রেট আমেরিকান ডেথ-এর অভিধা পাবে। কার চোখে কত খুলো মারবেন আর মিঃ গাঁটকাটোক্ষি। এবার বলুন তো ভারতকে ইরাকে সৈন্য পাঠাবার জন্যে এত চাপ দেওয়া হচ্ছে কেন?

খুলভরোক্ষি : শুড কোন্সেন। এটা আসলে আমাদের সুদূর প্রসারী পরিকল্পনার অংশ। কথাবার্তা আলাপ আলোচনা পি-এল ৪৮০-র জয়ানা থেকেই চলছে। আপাতত প্রেসারটা যে বেড়েছে তার কারণ একেবারেই প্রাজ্ঞ। ইরাকে প্রতিদিন চোরাগোষ্ঠা আক্রমণে বহু আমেরিকান সৈন্য মারা যাচ্ছে। ভারত সহ অন্যান্য দেশের সৈন্যরা গেলে তারা মরবে, আমেরিকানরা বাঁচবে। অন্তত মরবে কম। আর—

চিরহরিৎ : আরো আছে নাকি?

খুলভরোক্ষি : হ্যাঁ। সেটাই তো আসল মিঃ অন্নানবদন। ভারতে তো ডিসপেনসিমা জিম্বাবুডিয়া এইসব থার্ডক্লাসেরও অধম ব্যামোর মৌরসিপাট্টা। তাই নেতাদেরও মগজে গ্যাঙ্কলা ওঠে। মাঝেমধ্যেই অর্বাচীন কাণ্ড করে ফেলে—যেমন পার্লামেন্টে ইবাক যুদ্ধ সম্পর্কে একটা বিকলাঙ্গ প্রস্তাব নেওয়া। এখন ভারতীয় সৈন্য ইরাকে হাজির হওয়া মানেই, বুঝতে পারছেন মিঃ সিরহরিৎ—যুদ্ধটাকেই লেজিটিমিসি দেওয়া—অন্নানবদনে। অবশ্য তাতে ভারতও লাভবান হবে।

চিরহরিৎ : কিতাবে মিঃ গাঁটকাটোক্ষি, যদি একটু বুঝিয়ে বলেন।

খুলভরোক্ষি : বলব, নিশ্চয় বলব, মিঃ সিরহরিৎ অন্নানবদন। যুদ্ধোত্তর ইরাকে পুনর্বাসন, পুনর্গঠনের জন্যে হাজার হাজার কোটি ডলারের বন্যা বইবে। আমরা দেখব ভারত যাতে তার কিছু কিছু বরাত পায়। আমাদের প্রেস সেক্রেটারি জানিয়েছে আপনার কাগজ ভারতের বিশিষ্ট শিল্পপতিদের হয়ে এর সপক্ষে প্রচুর সোশালিটি করছে। আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন জানাবার জন্যেই আজ এই ইস্টারডিউ দেওয়া। যু মে কোট দিস টু ইওর এডিটর।

চিরহরিৎ : কিছু ডলারের বরাত পাবার জন্যে ভারত আমি

এখন ভারতীয় সৈন্য ইরাকে হাজির হওয়া মানেই, বুঝতে পারছেন মিঃ সিরহরিট—যুদ্ধটাকেই লেজিটিমিসি দেওয়া—অম্লানবদনে।

পাঠাবে ইরাকে? অনেক জওয়ানের তো জান যেতে পারে।

খুলভরোকি : পারে না, যাবে। ওয়র ইজ ওয়র। অবসরের পদ্য লেখা নয়। আপনার দেশের কত গেইন ভেবে দেখেছেন? কত লোক চাকরি পাবে, কত কোম্পানি কতকিছু সাপ্লাই করবে, আপনাদের ইন্ডাস্ট্রির মরা গাঙে জোয়ার আসবে। উৎপাদন বাড়বে, ডলারের চেউ বইবে। বিক্রি বাড়বে টিভি, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন, কম্পিউটার অ্যান্ড— হ্যাঁ, মোটরগাড়ির। বাড়বে বিদেশ-ভ্রমণ। ভাবুন, একবার ভাবুন মিঃ অম্লানবদন, দেশ কী 'তরক্কি' করবে— শুধু কিছু সৈন্য পাঠিয়ে।

চিরহরিৎ : ওবা অনেকেই হয়ত ফিরবে না, মানে ফিরতে পারবে না।

খুলভরোকি : সো হোয়টি? বিদেশ থেকে ভারতীয়রা ফিরে আসুক—কে চায় আপনার দেশে? এই যে প্রতি বছর ঝাঁকে ঝাঁকে আপনাদের ছেলেমেয়েরা সংপথে, কুপথে, আইনে, বে-আইনে, প্রকাশ্যে, লুকিয়ে, বিয়ে কবে বা না করে আমেরিকা-লন্ডনে আসে, কোন মা-বাপ চায় তারা ফিরে যাক? কেউ চায় না। ছেলেমেয়েরা তো চাইবেই না। তাহলে? ইরাক থেকেও কেউ কেউ ফিরবে না— এ তো স্বাভাবিক।

চিরহরিৎ : স্বাভাবিক? নিরীহ প্রাণের বিনিময়ে বিনিয়োগ স্বাভাবিক? কত ডলারে একটা প্রাণ পাওয়া যায়, মিঃ গাঁটকাটোকি?

খুলভরোকি : আপনারও ডিসপেন্সিয়া—মগজে গ্যাংজা, মিঃ সিরহরিট অম্লানবদন। ওসব তো পলিটিশিয়ানবা বলবে, বিশেষত অপজিশনের ঘারা। যেমন আপনাদের মমতা ব্যানার্জি। আমি পড়েছি, কিছুদিন আগেই কোনো এক বাই ইলেকশনে হেরে গিয়ে উনি বলেছেন, কত রেপ, কত মার্ডারের বদলে ভোটে জেতা যায় তিনি আগামীতে দেখিয়ে দেবেন। তা দিন। আপনারা দেখুন। আমি যা বলছিলাম; কটা গুড-ফর-নাথিং জওয়ানের জন্যে এত হেদিরে যাবার কি আছে? জওয়ানরা কোন শ্রেণীর, কোন ঘর থেকে আসে, নিশ্চয় জানেন। গরিব, অশিক্ষিত গ্রাম্য, বাপে-খোনো মামে-তাদানো ছেলের দল সব। ওদের বাড়ির লোকেরা ওদের মৃত্যুর খবরও পায় না সবসময়। তাছাড়া আপনাদের উচ্চ ফলনের দেশ—অতি উৎপাদনের ফসল কিছু অপচয় তো হবেই। বাট লুক অ্যাট দ্য রিটার্ন।

চিরহরিৎ : দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার কথা বলছিলেন।

খুলভরোকি : ও ইয়েস। আমরা প্রেসিডেন্টকে বলেছি, ভারতে আমাদের সামরিক ঘাঁটি দরকার। মায়োপিক গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া গুরুত্বই সম্মতি দেবে না, আমরা জানি। তাই আমাদের প্রস্তাব— ভারতের বিমানঘাঁটিগুলোকে আশাতত আমাদেরও ব্যবহার করতে দেওয়া হোক। আমরা এক ধরনের জয়েন্ট ভেঞ্চারের নজির তৈরি করতে পারি। তাতে দু'পক্ষেরই লাভ।

চিরহরিৎ : এখানেও লাভ?

খুলভরোকি : বিনা লাভে কি কোনো কাজ করা যায়, মিঃ সিরহরিট অম্লানবদন? বাট এই লাভ উইথ Love—আপনারা যাকে বলেন প্যায়ার সে।

চিরহরিৎ : কিরকম? একটু বিশদ যদি বলেন।

খুলভরোকি : প্রথমে বলি, আমরা কেন ইন্ডিয়ান সয়েলে ঘাঁটি পাড়তে চাইছি। চায়না ইজ আগওয়ার মেজর কনসার্ন। তাছাড়াও উত্তর কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া। আর ফ্র্যাঙ্কলি, বতই হাবুডুবু খাক আর ভেঙেচুরে যাক, আমরা এখনো রাশিয়াকে পুরোপুরি বিশ্বাস করি না। ইদানীং আবার পাকিস্তানও একটু-আধটু বেগডব্বাই করার চেষ্টা করছে। ভারতে আমাদের বেস থাকলে এরা সবাই বিশ্বশান্তির জন্যে নিয়ন্ত্রিত আচরণ করবে।

চিরহরিৎ : আসলে বলুন নিজেদের সারভাইভালের জন্য তটস্থ থাকবে। আপনাদের বলবে—দেহি পদপদ্ব মুদারম্।

খুলভরোকি : ওগুলো আপনার কথা। আমাদের নয়।

চিরহরিৎ : লাভের কথা বলেছিলেন,—উইথ প্যায়ার?

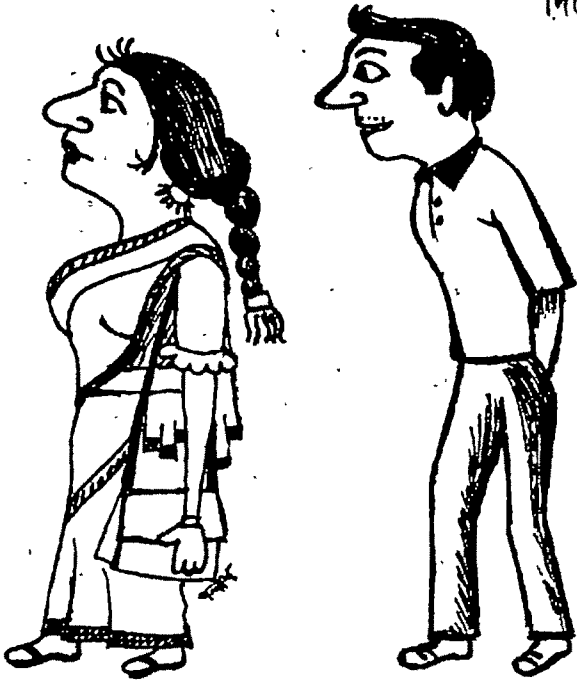
খুলভরোকি : ইয়েস, লাভ অ্যান্ড লব—প্যায়ার—দ্য ডিভাইন থিং। এ বিষয়ে সারাজীবন বলেও শেষ করা যাবে না। টু কাট দ্য লং স্টোরি শর্ট, শুধু এটুকু বলি, আপনাদের বেসগুলো ব্যবহার করতে পারলে আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচারের জন্যে কোনো খরচ করতে হবে না। দ্যাট'স আ প্রেট লাভ। আবার আপনারাও আমাদের লেটেষ্ট ইকুইপমেন্ট দেখবেন, ট্রেনিং নেবেন, জয়েন্ট এক্সসারচাইজও হবে—অর্থাৎ নিখরচায় আপনারাও আপডেটেড হবেন। দিস ইজ উইথ প্যায়ার। বলুন, ঠিক বলেছি কি না?

চিরহরিৎ : ওয়াস্তারফুল। ওয়ান লাস্ট কোম্পেন মিঃ খুলভরোকি গাঁটকাটোকি; গাঁট কটার জন্যে আপনারা কী অস্ত্র ব্যবহার করেন?

খুলভরোকি : কিছু না, কিছু না। ওনলি অম্লানবদন মাসল।

রমার চিঠি

দিব্যেন্দু দাস



“

ওর বাড়িতে একটা গোটা আলমারি চাকরির চিঠিতে ঠাসা। রেল, তেল, জেল, মেল মায় উপজাতি কল্যাণ দপ্তরও বাদ যায়নি ওর দরখাস্ত পেতে। দেশের তিনটি সরকারি ও সাতটি বেসরকারি চাকরিপ্রদান সংস্থায় নাম লিখিয়েছিল রমা।

”

রমার সঙ্গে আমার বিয়েটা শিখিয়ে যাবার কারণ রমার চাকরি। না, শেষপর্যন্ত চাকরি রমার হয়নি। কিন্তু এমন কোনো চাকরি ছিল না যেখানে রমা দরখাস্ত করেনি। ওর বাড়িতে একটা গোটা আলমারি চাকরির চিঠিতে ঠাসা। রেল, তেল, জেল, মেল মায় উপজাতি কল্যাণ দপ্তরও বাদ যায়নি ওর দরখাস্ত পেতে। দেশের তিনটি সরকারি ও সাতটি বেসরকারি চাকরিপ্রদান সংস্থায় নাম লিখিয়েছিল রমা। সারা বছরই ধায় রিনিউয়াল চলত। রমা যত টাকার স্ট্যাম্প কিনেছিল তা দিয়ে বড় রাস্তায় দু'কামরার ফ্ল্যাট হয়ে যেত। কিংবা একজোড়া টেম্পো হয়ে যেত। বছর দশেক ধরে চিঠি আর ইন্টারভিউ দিয়ে দিয়ে জটিল জটিলে ধরে গেল ওকে। আর তখনই ওকে ধরে ফেললাম আমি। ওর হতাশাই আমার মূলধন।

রমা কেমন যেন শুন্ হয়ে গেল। আমার সঙ্গে টুকটাক বেরোচ্ছে, পাশে পাশে হাঁটছে, সিনেমার পোস্টার পড়ছে, গোবর পড়লে ডিঙোচ্ছে, কিন্তু মুখে কথা নেই। নির্বাক চলচ্চিত্র। ওর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে আমারও কথা কমে গেল। ওরাল পরীক্ষাগুলো ফেল মেয়ে গেলাম। পরীক্ষক 'অ্যানসার' 'অ্যানসার' করে ফোঁকলা হয়ে গেল। হেড স্যার শেষে আমাকে টি সি দিয়ে স্কুলের নাম বাঁচাল। রমা অবশ্য আমার দু-বছরের সিনিয়র ছিল। বোর্ডের পরীক্ষায় ভালো নম্বর নিয়েই ও পাশ করেছিল। রাস্তায় ব্রেকডাউন না হলে আমি ওর দু-বছর আগে পাশ করতাম। সেসব কথা এখন থাক।

ধেমের একটা নিয়ম হচ্ছে প্রেমপত্র লেখা। আমি নিয়ম মেনে প্রেম করার মানুষ। সপ্তায় অন্তত একদিন ফুটকা, মাসে অন্তত একটা সিনেমা। পথ

চলতে চলতে কাঁধ দিয়ে রমাকে ছোঁয়া। সপ্তায় কমপক্ষে সাতদিন দেখা করা আর গোটা চারেক চিঠি দেওয়া। রমা তেমনি নিয়মভঙ্গকারী। চলা আছে, কথা নেই। ছোঁয়া আছে, 'ধ্যাৎ' নেই। বছর গড়ালে চিঠি নেই। আমি একদিন থাকতে না পেঁরে রমাকে বললাম, তুমি এত জায়গায় চাকরির দরখাস্ত লেখ, আমার জন্য দু লাইনের প্রেমপত্র লিখতে পারো না?

এর পর ক'দিন আর আমার সঙ্গে দেখাই করল না। আমি নিজের ওপর রাগ করে বিড়ি খাওয়া ছেড়ে দিলাম। কেন যে রমাকে চিঠির কথা বলতে পেলাম। দশ দিনের মাথায় পোস্টে রমার চিঠি পেলাম।

প্রিয় হরেন,

তুমি কি আমার সত্যি ভালোবাসো?

—হ্যাঁ/না (সঠিক জায়গায় টিক দাও।)

যদি বাসো, তবে আর অপেক্ষা করছ কেন?

—যন্ত্র দুর্বল/রোগগ্রস্ত/অসুস্থহীন (যেটি অপ্রযোজ্য, কেটে দাও তোমার বাড়ি থেকে আপত্তি থাকলে নিচে পরিষ্কার করে লেখ।)

আপত্তিকারীর নাম	বর্তমান বয়স	কখন একলা পাওয়া যাবে	লাশের আনুমানিক ওজন (কেজি)

ভালোবাসা নিও।

ইতি—

রমা রায়

২২/৩/০৩

গবেষক দুঃসংবাদ

আয় আয় কে যাবি গরু খুঁজতে

পঞ্চম কলামটি

গবেষণা শব্দটার অর্থ গো-অন্বেষণ, মানে গরু খোঁজা। গবেষক তাহলে নিশ্চয় গো-অন্বেষক, মানে রাখাল। গরু তো রাখালেরই খোঁজার কথা। মালিক কি আর গরু খুঁজতে যায়? গবেষক মানে রাখাল, এই অর্থটি মানতে আমার ভীষণ কষ্ট হত। যাঁদের নামের আগে ড. এর বিসর্গের ভার, বাঁধা মঞ্চে যাঁদের বক্তৃত্তিমে শোনার জন্য আঁতেলদের সগর্ব আনাগোনা, তাঁরা কিনা রাখাল। আসলে রাখাল শব্দটা নিয়ে তো তেমন মহৎ ধারণা নেই। রাখাল বললে ব্রজদুলালকে (সেও তো একটা মাল, ব্যাঙের বুলিতে 'তুমি কি জিনিস গুরু') মনে পড়ে না, মনে পড়ে বিদ্যাসাগরের রাখালের কথা। সে যে কী বস্ত্র তা বাংলািশ বাচ্চারা ছাড়া সবাই জানে। (ওরা জানবে কি করে, ওরা তো 'জ্যাক অ্যান্ড জিল' পড়ে)।

তবে এখন কিন্তু গবেষক মানে যে গরু খোঁজা রাখাল তা মনে নিতে কষ্ট হয় না। হয় না আমার এক সহপাঠিকে দেখার পর। সহপাঠী বলাটা বোধহয় ঠিক হল না। সঙ্গে পাঠ আর করলাম কই? দু'বছরের ইউনিভার্সিটির জীবনে সে দু'দিন ক্লাস করেছে কিনা সম্ভব। অথচ হাজিরা বরাবর। শুধু তাই নয়, ফার্স্ট ক্লাসও মেরে দিল ছোঁড়া। তা হতেই পারে। ইউনিভার্সিটির ছাত্রনেতা। প্রথমে ছাত্র-প্রতিনিধি। পরে সংসদ সভাপতি। তার ওপর অধ্যাপকদের সঙ্গে দহরম-মহরমের নাইন্থ পেপার। ওপেন-সিফ্রেট ব্যাপার। কে কি বলবে? আমার তো আপত্তি ছিল না।

একদিন শবর পেলাম, ব্যাটা এখন রাজনৈতিক উপন্যাস নিয়ে গবেষণা করছে। আর সম্ভব রইল না, গবেষক রাখাল। যাকে রবীন্দ্রনাথের একটা নৈতিক উপন্যাসের নাম জিজ্ঞাসা করলে তিনবার টোক গিলবে, বা 'রী'-র লেখকের নাম জিজ্ঞাসা করলে যে ভব-উদাসীন মৌনী সাধু হয়ে য, সে রাজনৈতিক উপন্যাস সম্বন্ধে কী গবেষণা করবে? ওর অবস্থাটা কি 'রী' রাজনৈতিক উপন্যাসের বিতর্কিত ক্ষেত্রে উচ্চ-পুচ্ছ গো-শাবকের স্ফাদ্ধাবনকাব্যী রাখালের মতোই হবে না?

এ তো বিক্ষিপ্ত নিদর্শন। সহপাঠী তো চুনোপুটি। রাখালিতে সে জুনিয়র অ্যাথ্লেটিক্স। সেদিন 'দেশ'-এ যে এক রাখাল-রাজার সজ্জান পেলাম, যিনি মুক্ত-কচ্ছ, ঋজু দেহ আর রক্তবর্ণ আঁখি নিয়ে বেদম হুটছেন। অমিত্রসুদন স্ট্রীচার্য। কবিপক্ষে মেতেছিলেন কবিকে নিয়ে বাহাত। আসলে মেতেছিলেন কবি-পক্ষীকে নিয়ে। যথেষ্ট সঙ্গত কারণ সমেত। কবির আগপাশতলা তো আমাদের জানা। 'মানস সঙ্গিনী' শ্রীতুঙ্গপুত্রীকে লেখা চিঠির কাঁচি চালানো অনেকগুলো আমাদের তীক্ষ্ণ অনুমান ক্ষমতায় ধরা পড়ে গেছে। ওকাপ্পোর জ্ঞানবৃক্ষের ফল আশ্বাদনের কথা (ব্রহ্মা জ্ঞানেন গোপন) আর অজানা নয়। 'বামুনের মেয়ে'-র বিনি সুতোয় দেওয়া এবং ইত্যাদি ইত্যাদি আমাদের মুখস্থ।

পাণ্ডুরঙ্গের মেয়েকে নিয়ে কম রঙ্গ হয়নি। তারপর সেই জুইফুলের সুগন্ধ পসারিণীর গল্প। (পাঠককে বোধহয় ভ্রমমহিলা কাঠবাঙাল ভেবেছিলেন) এমনকি কটের সেই ফটু করে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া 'তিনকন্যো'দৈরও। এবং অবশ্যই কাদম্বিনী দেবীর কথা। অর্থাৎ রবি-ক্ষেত্রের প্রায় সব গরুকেই এতদিনে বাংলা সাহিত্যের রাখালরা খুঁজে বের করে ফেলেছেন। তাহলে রাখাল-বৃন্তি বজায় রাখার কী উপায়? সুতরাং লাগো এবার কবিপক্ষীর আলো-আঁধারির বনজ ক্ষেত্রে।

ভট্টাচার্য্য মশাই করিতকর্মা রাখাল। ঠিক খুঁজে বের করেছেন। বের করেছেন বলু ঠাকুরকে। বলেছেন ঠাকুর। রবি-কবির আদরের ভাইপো বলাই। তাঁর সঙ্গে কবি-পক্ষীর 'অ্যাক্ফেয়ার' প্রমাণের জন্য কি প্রাণান্তকর পরিশ্রমই না করেছেন রাখাল-রাজ অমিত্রবাবু। প্রথমে প্রমাণ করেছেন, কবিপক্ষী নিঃসঙ্গ ছিলেন। নিঃসঙ্গ অর্থে স্বামীসঙ্গহীন। না হলে, ঠাকুরবাড়ির ওই হুটমালার সেশে নিঃসঙ্গ থাকার উপায় কি? তা ঠাকুরবাড়ির বউরা একটু

চিত্রকর কবির মানসসঙ্গিনী 'বামুনের মেয়ে'-র পোট্রেট আঁকতে আঁকতে হঠাৎই সংঘম হারিয়েছিলেন। চেয়েছিলেন 'বামুনের মেয়ে'-র 'পঙ্ক বিশ্বাধর'-এর একটু আশ্বাদন করতে। নাকের সামনে সবসময় গাঁজর ঝোলানো থাকলে ক্যারেক্টার আর কতক্ষণ বশে থাকে?

নিঃসঙ্গই হন। না হলে, সুনীল গাঙ্গুলী 'প্রথম আলো'-র কলেবর বৃদ্ধি করতেন কিভাবে? কাদম্বিনী দেবী নিঃসঙ্গ না হলে রবি-কাদম্বিনী প্রেমকাহিনী কোথায় মিলত? মৃণালিনী দেবীও ছিলেন। ভট্টাচার্য্য রাখালের বস্তব্য, কবিপক্ষী কবিকে মানসসঙ্গী রূপে নয়, পেয়েছিলেন 'পাঁচটি সন্তানের জনক রূপে।' এ আর নতুন কি? এ তো রবির উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্য। দেবেন্দ্রনাথ সাধু মানুষ। বাইরে বাইরে থাকেন। কখনো পাহাড়ে তপস্যা, কখনো বোলপুরে প্রকৃতিবাস। কিন্তু যখনই খিদে পেত, হাজির হতেন জোড়াসাঁকোয়। ফল? বাংলাদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতি-সমাজের চোদ্দটি অব্যয়রত্ন লাভ। (ভাগিন্দা তখন 'হাম সো হামারে সো' রোগান ছিল না। তাহলে আর

রবীন্দ্রনাথকে পেতে হত না।)। রবিও বাপ কা বেটা। কখনো শিলহিদহ, কখনো পাতিসর। বাহিরে রয়েছে মানসসঙ্গিনীরা। আর ঘরে? “ছিঃ ছিঃ পুতুল নাচের ইতিকথা”র কুসুম হতে পারলে না, ভাই ছুটি?”

সূত্রাং ঠাকুরবাড়ির এই বারমুখো ট্র্যাডিশন নিঃসঙ্গ বধূদের তৃতীয় পুরুষ বেছে নেবার ক্ষেত্রে যথেষ্ট কারণ নয়। বধূরা পরম্পরাগত ভাবে এতে অভ্যস্ত। রাখাল-রাজ অবশ্য এতেও কান্ড নন। তিনি দ্বিতীয় কারণ দেখালেন, বয়সের পার্থক্য। রীতিমতো মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সহ। কবি একত্রিশ, কবিপত্নী আঠারো। সূত্রাং বয়সের সঙ্গে মানসিক পার্থক্যও প্রচুর। অতএব বলুবাবা (ভাসুরপোকে তো বাবা বলাই রেওয়াজ) তুমি এসো।

**ভট্টাচার্য্যি মশাই করিতকর্মা রাখাল। ঠিক খুঁজে
বের করেছেন। বের করেছেন বলু ঠাকুরকে।
বলেজ্ঞনাথ ঠাকুর। রবি-কবির আদরের ভাইপো
বলাই। তাঁর সঙ্গে কবি-পত্নীর ‘অ্যাফেয়ার’
প্রমাণের জন্য কি প্রাণান্তকর পরিশ্রমই না
করেছেন রাখাল-রাজ অমিত্রবাবু।**

রাখাল-মশাই তো দেখি উশ্টো কথা শোনান। এতদিন জ্ঞানতুম, সম্পর্কে তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশের কারণ, মানসিক অতৃপ্তি নয়, সেখানে ভিয়েনার চিকিৎসকের থিয়োরি কাজ করে। ‘রাত ভর বৃষ্টি’, ‘রাত্রি’, ‘সেডি চ্যাটারলীজ লাভার’, ‘মানবজমিনে’ বিলুপ্তীভবনের মাঝে অরুণ ইত্যাদি ইত্যাদি। আর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তেরো বছরের ফারাক? বাঙালিদের মধ্যে বছর-পনেরোর ফারাক কোনো ব্যাপার নয়? এক বিখ্যাত সেতারি তো ভাইবির বয়সী মেয়েকে বিয়ে করে বেশ রসে-বশেই আছেন। বরং তাঁর কাছাকাছি বয়সী শ্রমিকেরা আজ সময়ের বাকি উধাও। সূত্রাং, বয়সের ফারাকের ফাঁক দিয়ে রবি-মৃগালিনীর মাঝে বলুর কোনো চাপ নেই।

এবার অমি-রাখালের তৃতীয় তিরটা দেখা যাক। কবি-পত্নী নাকি তিনবছরের বড় ভাসুরপোকে নাম ধরে ডাকতেন। যুক্তিটা বুঝুন এ কথার। কোনো মেয়ে তার পোপন প্রেমিককে সবার সামনে নাম ধরে ডেকে মুহুর্তার প্রমাণ দিচ্ছে। অবশ্য কবিপত্নী বাঙাল দেশের লোক। তাঁর পক্ষে এবকম বোকামি সম্ভব। তাছাড়া কি-ই বা বলে ডাকতেন তিনি? বলু বয়সে বড় হলেও সম্পর্কে ছোট। ফলে, নাম ধরে ডাকাটাই বাঙালি সুলভ।

এবার ভট্টাচার্য্যি রাখালের শেষ পাঁচনের বাড়ি, পাঠকের মাথায়। স্বামীসঙ্গ-বক্ষিতা কবিপত্নী নাকি বলুর অকাল প্রমাণ সহ্য করতে পারেননি। হৃদয়ক্ষতে নিয়ত দম্ব হতে হতে শেষে তিন বছর পরে ইহলীলা সম্বরণ করেন। (প্রেটেনসিভ লাভ ১)। একবছর নয়, দু’বছর নয়, তিনবছর। প্রেমের মর্যাদা দিতে কবিপত্নীর তো সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুবরণ করা উচিত ছিল। গিরিশের মেলাড্রামার মতো। তিন-তিনটে বছরের বিচ্ছেদ কিভাবে সহ্য করেছিলেন তিনি?

ভট্টাচার্য্যি রাখালের যুক্তি-সাপেক্ষে এবার কবিকে একটু খোঁচানো যাক। ধরা যাক, রবি বলু-মৃগালিনী কেসটার কথা কিছুই জানতেন না। জানতেন না, ঠাকুরবাড়ির এতগুলো লোকও। এতবছর পরে, অমিত্রবাবুর তীক্ষ্ণ কল্পনায় সেটা হঠাৎ-ই ধরা পড়েছে। (অমিত্রবাবু এবার বিখ্যাত হয়ে যাবেন। বাংলাব লেখককুল এবার আপনার আদলে বাঙালি শার্লক ‘হোমস’ তৈরি করবেন।’

‘সরলাক্ষ হোম’—রিটার্ন।) রবি যদি জানতেন তাহলে তুচ্ছ তুলোপা প্রতি বলাই-এর ভালোবাসা নিয়ে ‘বলাই’ গল্পটা লিখতেন না। ‘চতুর’ বদলে ‘ত্রিঙ্গ’ কিংবা ‘নষ্টনীড়’-এর আদলে কোনো ‘কষ্টনীড়’ ফেঁদে বসতেন। নিজে বহুচারী ‘মানস-প্রিয়া’-র গল্পগুলো বাঙালদের জন্য, ওদের হাইকোর্ট দেখানো সহজ, কিন্তু ঘরের বউ-এর এসব বেয়াদপি সহ্য করতে পারতেন না। হয় বিনোদিনীর মতো কাশীবাস করতে বাধ্য করতেন, নয়ত দামিনীর মতো ‘শ্লো-ডেথ’। দারুণ ঈর্ষাপরায়ণ ছিলেন কবি। শান্তিনিকেতনে এক ফরাসি (রাশিয়ানও হতে পারেন, স্মৃতি ধারণা করছে) চিত্রকরের বা হাল হয়েছিল। হয়েছে কি, চিত্রকর কবির মানসসঙ্গিনী ‘বামুনের মেয়ে’-র পোর্ট্রেট আঁকতে আঁকতে হঠাৎ-ই সংযম হারিয়েছিলেন। চেয়েছিলেন ‘বামুনের মেয়ে’র ‘পঙ্ক বিন্ধ্যধর’-এর একটু আশ্বাদন করতে। নাকের সামনে সবসময় গাঞ্জর ঝোলানো থাকলে ক্যারেক্টার আর কতক্ষণ বেশ থাকে? ‘মুনিলাক্ষ মতিভ্রম’ বলেও তো একটা কথা আছে। কবি কিন্তু জানতে পেরে ভীষণ চটিতং হয়ে উঠেছিলেন। চিত্রকরের তো চাকরি যায়-যায়। আবার এলমহাস্ট্রকেও কবির খুব ভয় ছিল। ‘বামুনের মেয়ে’-র এলমহাস্ট্রের সঙ্গে, অন্তরঙ্গতা দেখে কবি ভয় পেয়েছিলেন। ‘রক্তকরবী’র রাজা-নন্দিনী আর রক্তনের টাঙ্গু অব ওয়ার নাকি সেই ত্রৈলোক্যেরই প্রমাণ। এলমহাস্ট্রের ‘এক’ কবি ও একজন চাষা’তে এর উল্লেখ আছে। বিজ্ঞয়াকে নিয়েও নাকি এলমহাস্ট্রের সঙ্গে একটু টানাপোড়েন ছিল। কেতকী কুশারী ক্ষীণভাবে বলায় চেষ্টা করেছেন ‘রবীন্দ্রনাথ, ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর সন্ধান’তে। সূত্রাং, রবীন্দ্রনাথ বলাইকে ছেড়ে কথা বলতেন না।

বলাই-এর প্রতি কবির কোনো বিরোধের পরিচয় এখনো পর্যন্ত কোনো রাখাল আবিষ্কার করতে পারেননি। অতএব ভট্টাচার্য্যি রাখাল, আপনার পশুশ্রম হয়েছে। আপনি কোনো গরুই খুঁজে পাননি। বা যে গরু খুঁজে পেয়েছেন সেটা অন্যের গরু। ভুল করে আপনি গোয়ালে পুরেছেন।

পুনশ্চ : অমিত্রবাবু, সরস্বতীর কর্পোরেট হাউস(বিশ্ববিদ্যালয়)গুলোতে কিন্তু আপনাকে বেশ শ্রদ্ধার চোখেই দেখা হয়। সরস্বতীর বরপুত্রদের অন্যতম ধরা হয়। লক্ষ্মীলাভ আর নামলাভের মোহের কাছে নিজের সুনাম বন্ধক রাখার আগে নিজের বিবেকের প্রতিবন্ধী প্রতিবন্ধকতাটা অন্তত স্বীকার করে নেবেন। অধিয লোভাতুর বিকৃত স্বীকারোক্তিতেও পাপের ভার কিছুটা অস্ততঃ লাঘব হয়।

রসকেলি

কাকলি চৌধুরী

১ম ব্যক্তি : আমি কোনোদিনও বিয়ে করব না।

২য় ব্যক্তি : তবে তুমি প্রেম করলে কেন?

১ম ব্যক্তি : বিয়ে করব না বলে।

যুবক : তুমি এবার বাড়ি যাও।

যুবতী : তোমার পকেটে আর কত টাকা আছে?

যুবক : তিনশো টাকা। কেন?

যুবতী : রোসো। তাহলে এখনো তিনঘণ্টা থাকবো তোমার সাথে।

হেঁসেল

পোদিপিসির টক-ঝাল-মিষ্টি

পোদিপিসি কথিত

গ্যালোবারে নিকে নে গেলি পঞ্চ ব্যানেনের কতা। এখন আবার কানের ধারে ঘ্যানর ঘ্যানর কোরতি নেগিচিস, শোনাতি হবে জ্বার কালির আচারের ফিরিষ্টি। বোলি শান্তিতে এঁই মোরতি দিবি নে তোরা? চোকি দেখতি পাই নে, নইলে তোয়ের করে খেইয়ে দিতি পারতুম। বোলি কি, আচার হলো টক-ঝাল-মিষ্টি, এর জন্য চাই চড়চড়ে ওন্দুর। আজকাল তো কোনো বড় ছাদ ফাঁকা নি, উঠোনও নি যে আচার কোরে ওদে রেকে দেবে। তবু তো খেতি হবে, তাই বোলতিচি, নিকে নিতি. পারিস। আচার কোরতি চাই আম, তেঁতুল, কুল, চালতা আর চাই জলপাই।

আম-কিসমিস—এক কেজি কাঁচা আম (এঁই আঁটির বাগলা বসেচে) ছেঁইড়ে ফালা ফালা করে কেটে হলদি-জলে ভালো করে ধুয়ে নিতি হবে। তারপর একদিন ওদ খাওয়াও চড়চড়ে। চিনি নাগবে তিন প। কিসমিস ৫০ গেরাম। কড়ায় জল দে পেখমে কাটা আম সেদ্ধ করে নিতি হবে। তারপর সব জল ঝাঁকরি বা ছেঁইয়ে দে ঝইরে নে এঁটা গামলাতে রেকে দ্যাও। চিনি খুব অল্প জলে কড়ায় ফুইটে ফুইটে চিট্‌চিট্‌ আনতি হবে। এরপর ঢেলে দ্যাও আম আর কিসমিস। অল্প আদাকুচি আর দানা ফেলে দেওয়া এঁটা কি দুটো কোনো নংকা আর আদখানা পাতিনেবুর অস দে ফোটাতি হবে। জল মরে গে বেষ কাই-কাই হবে, এঁই নালি ভাব আসবে, খুস্তির গায়ে আটকে যাবে—গড়া নেমিয়ে নে শিশি কিয়া বোয়েমে পুরে ফেল—ঠাণ্ডা হলি। আঃ, খেলি এবি কাকে বলে আম-কিসমিস।

সড়া-তেঁতুল—আজার কালে মাটির হাঁড়িতে সরা ঢাকা দে, সাদা পপড় দে বেঁধে থুতো। আর সোমবচ্ছর দুকুরে শাউড়ি-বৌ মিলে ভাত-ওই টাকনা মেয়ে—ঝালতোয়কারির ভাত খেয়ে নিতো। আজকাল না-আস-সব চাকরি কোরতি বেইরে যায়। শাউড়ি থাকে আলাদা। সে সব বৈন আর ফিরে আসবে নে। শখ হোলি তবু তো খেতি হবে। ছোট গুংসারের জন্য বোলতিচি। ৮/১০টা পাকা তেঁতুল শুদু খোলা ভেঙে নিতি হবে। বৌটা শিরা সব থাকবে। তেঁতুলবিচিও ফেলা চলবে নি। হলদি নুন ইকে পেখমে দুদিন ওদে শুকোয়। এরপর পলা তেলে ভিইজে তাতে দে আই-সরবে পাঁচফোড়নের গুঁড়ো, সঙ্গে দুও ১ চামচে শুকনো নংকা-গুঁড়ো। দে দ্যাও। পরে আধ প আকের গুড় ফুইটে নে, তাতে তেঁতুল-কাটা ভিইজে দে। হয়ে গেল সড়া-তেঁতুল। এরপর ঝাতে পারো ভরে রেকো।

কুল-কুটো—আদসের পাকা টোপা কুল কিনে টিপে টিপে ফেইটে তি হবে। তারপর হলদি-নুন মেইকে চড়চড়ে ওদে ৫দিন শুইকে দ্যাও। এরপর এক প আকের গুড় ফুইটে একটু চিট্‌-চিট্‌ হোলি কুলগুনো কড়ায় দে দ্যাও। এরপরে নাগবে ১ চামচে আই-সরবে পাঁচফোড়ন গুঁড়ো, এঁই



শুকনো নংকা গুঁড়ো। ওতে মিইশে খুস্তি দে নেইড়ে নেমিয়ে নিলি হবে। শিশিতে ভরে মদি মদি ওদে দিতি হবে। তবে মোজবে ভালো।

চালতা-চুরচুরে—একটা চালতা নে আগে পেক্‌টিস করে হাত পেইকে নিতি হবে। চালতার বাইরের মোটা সবুজ খোলা বাদ দাও। সাদা-সাদা খোলাগুনো নে হামানদিখে নমত শিলে বেষ করে ছেঁে নিতি হবে। তারপরে নুন-হলদি জলে বেষ করে ধুয়ে হড়হড়ে ভাবটা কেটিয়ে ফেলতি হবে। দুদিন ওন্দুরে শুইকে নে ২ পলা গরম সরষের তেলে আই-সরবে, পাঁচফোড়ন গুঁড়ো (১ চামচে), শুকনো নংকা গুঁড়ো মিইশে সব চালতা ভিইজে রাকো। ওজ চড়চড়ে ওদে দিতি হবে কিন্তু।

মিঠা জলপাই—বোলতি বোলতি গলা শুইকে আসতেচে। এক টোকা জল খেয়ে নে বোলতিচি। এক প জলপাই। আধসেরের এঁই কম চিনি। ১ চামচে আই-সরবে, পাঁচফোড়ন গুঁড়ো, সামান্য নংকা গুঁড়ো, আদখান পাতি নেবুর রস। জলপাই হলদি-নুন মেইকে ধুয়ে নিতি হবে। তারপর জলে সেদ্ধ করে নিতি হবে। জল ফেলে দে সেদ্ধ করা নরম জলপাই চট্‌কে মেকে নে আঁটিগুনো ফেলে দ্যাও। কড়ায় চিনি দে ফোটাও। চিট্‌চিট্‌ হোলি মশলা ও জলপাইমাকা ঢেলে দ্যাও কড়ায়। খুস্তি দে নাড়াতি নাড়াতি হয়ে যাবে মিঠা জলপাই।

ভাত-পাতে খেয়ে এসে শুইনে ঘাস কেমন নেগেচে। আমার আর ও-সব খেতি রচি নি। একবার চিত্তেয় উঠতি পারলি বেঁচে যাই।

[অনুশ্রবণ—পরামের মা]

ফিরে দেখা

অন্তরীণ, শরৎচন্দ্র এবং রবি ঠাকুর

পিনাকী ভাদুড়ী

সাঁরা জীবন ‘অরক্ষণীয়া’, ‘বামনের মেয়ে’, ‘পণ্ডিতমশাই’ লিখে শরৎচন্দ্র জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। শেষ জীবনে তিনিও চেয়েছিলেন ইন্টেলেকচুয়াল হতে। সেজন্য লিখেছিলেন ‘শেষ প্রশ্ন’। সে বই তিনি কেন লিখলেন সেইটাই এক বিশেষ প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এতদিন ‘ইন্টারভিউ’, ‘কোরাস’, ‘মহাপৃথিবী’ মার্কা ছবি তোলার পরে মৃণাল সেনও চেয়েছেন বুদ্ধিজীবী সাজতে। এজন্য তিনি এবারে তুলেছেন ‘অন্তরীণ’। অবশ্য তিনি তাঁর ধরণ মাঝে মাঝেই বদলাতে চেষ্টা করেছেন আগেই। এই ছবিতে তিনি পুরোপুরি পরিচালক শুধু নন, সাহিত্যরসিকও বটে। রবীন্দ্রনাথের সূত্র ধরে যে কাহিনী তিনি বুনেছেন, তাতে অবশ্য তাঁর নায়ক-নায়িকা রবীন্দ্রনাথকে সারাক্ষণ ‘রবি ঠাকুর’ বলেছে, যেমনভাবে আমরা রান্নার ঠাকুরকে ডাকি। একজন বিশিষ্ট মানুষের নাম বলার সময়ে যে সাধারণ সৌজন্য বজায় রাখা দরকার, এ ছবির নায়ক-নায়িকা তা রাখেননি।

তবে রবীন্দ্রনাথের ‘ক্ষুধিত পাষণ’ গল্পের অনুরূপ যে চরিত্র তিনি এই ছবিতে উপস্থিত করতে চেয়েছেন, তার ধারণা কয়েকবার গল্পটা থেকে উদ্ধৃতি দিলেই সম্পূর্ণ হয়। ‘ক্ষুধিত পাষণ’ গল্পের মেজাজ, আবহ যে একেবারেই আলাদা, অপার্থিবতার সীমান্তে দাঁড়িয়ে, এই গল্প ক্ষণে ক্ষণে সেই সীমান্তের পর্পকে যেভাবে দুলিয়ে দিয়েছে, তা বুঝতে পারলে মৃণাল সেন সেই গল্পকে নিয়ে এমন ছেলেমানুষী করতে যেতেন না। ছবির এক নারীর একাকীত্ব এবং বঞ্চনা যে গল্পটির বাঁদীর জীবনের উদ্ভেজনা, রোমাঞ্চ, ইতিহাসকে যুগ্মাক্ষরে সমান্তরাল করে তুলতে পারেনি, সেকথা ঐ গল্প বীরা পড়েছেন তাঁরা জানেন। কিন্তু একজন অন্তত তা বুঝতে পারেননি, তিনি এই ছবির পরিচালক। ‘জাতীয় পরিচালক’ জাতের পরিচয় তিনি কিভাবে পেলেন, সেই ফুকটা আমাদের জানা নেই। বিদেশি চিত্র সমালোচকরা রবীন্দ্রনাথের গল্প জানেন না, জানলেও হয়ত কাঠামোটাই জানেন, তার অন্তর্গত কলাকৌশলকে চেনেননি, তাঁরা হয়ত ভাববেন মৃণাল সেনের ছবি আর রবীন্দ্রনাথের গল্প একই জাতের। রবীন্দ্রনাথকে সাধারণ মানে নামিয়ে ফেলবার জন্য এ এক অসাধারণ ছবি হয়েছে। ছবিতে নায়ক মাঝে মাঝে রবীন্দ্রচরিত্রবলী খুলে বসেছে। নায়িকা বসে থেকেছে নন্দলাল বসুর বই নিয়ে। এতদিনে মৃণাল সেন বুদ্ধিজীবী সাজার নমুনা সংগ্রহ করতে পারছেন। শরৎচন্দ্রের মতোই তিনিও ইন্টেলেকচুয়াল হতে চাইছেন।

ছবিতে যখন নায়ক ‘ক্ষুধিত পাষণ’ পড়ছিল, আমার তখন মনে হচ্ছিল আমি রবীন্দ্রনাথেরই আর্তনাদ শুনতে পাচ্ছি—‘আমাকে তুমি উদ্ধার করিয়া লইয়া যাও।’ দর্শকসনে বসে অঙ্ককার প্রেক্ষাগৃহে মৃণাল সেনের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য রবীন্দ্রনাথের সেই আর্তনাদ শুনতে শুনতে আমি মনে মনে বলেছিলাম—‘আমি কে? আমি কেমন করিয়া তোমাকে উদ্ধার করিব? আমি একজন দর্শক মাত্র।’

এ তো গেল কাহিনীগত গোলমাল। অভিনয়ে ডিম্পল কাপাদিয়াকে নামিয়ে, তার গলায় অনসূয়া মজুমদারকে দিয়ে ডাবিং করিয়ে কী লাভ হল

তা আমরা বুঝিনি। ডিম্পলকে মোটেই বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি, বিশেষ করে তার বাপের বাড়ির দৃশ্যে সে একেবারেই বেমানান। সবশেষে ট্রেনে দরজায় গুলার স্বর শুনে ডিম্পলের নায়ককে চিনতে পারা, এবং কথা না বলার জন্য নায়কের পক্ষে ডিম্পলকে ধরতে না পারা— এর সবটাই ক্লিশে। এবং বস্তাপচা। পরিচালক সেই বস্তা থেকে বেরোতে পারেননি।

তথাপি মৃণাল সেনকে ধন্যবাদ যে তিনি এই কষ্টকল্পিত কাহিনীর জাল বোনার সময়ে অযথা কায়দাবাজি করেননি। সাদামাটা গল্প বলতেই চেষ্টা করেছেন। সেজন্যই এই ছবি শেষ পর্যন্ত দেখা যায়।

তবে ডিম্পলের নিঃসঙ্গতা আমাদের আলোড়িত না করলেও আমরা অবাক হয়ে দেখেছি দীপ্তি রায়কে। ঐর সেই দীপ্তি আর নেই। ‘শেষের কবিতা’র লাবণ্য হিসেবে ‘কালের যাত্রার ধ্বনি’ কবিতাটি পড়েছিলেন দীপ্তি রায় তাঁর যৌবনে, সেটা পঞ্চাশের দশক। আজ বনে যাত্রার সময়ে তাঁর শরীরে কালের যাত্রার চিহ্ন পড়েছে; চলাফেরা, স্বরক্ষেপণেও এসেছে শিথিলতা। তিনি এখন অন্তরীণ নিজের বয়সে। সেটিকে তিনি চমৎকার ধরেছেন।

মৃণাল সেন অন্তরীণ তাঁর ভাবনার শৈথিল্যে। তাঁকে কেউ রিটার্নার করতে বলেনি। আসলে আমাদের দেশে স্ট্রেচারে করে বার না করা পর্যন্ত কেউ বেরোর না। মৃণালবাবুও নিজেকে Stretched করে নিয়ে চলেছেন— হয়ত এ শতাব্দী পার করে দেবেন। শতাব্দী কী রায় দেবে তা না জানা পর্যন্ত তাঁকে থামানো যাবে না বলেই মনে হচ্ছে। থামতে জানা একটি বড় শিখ, কিন্তু তাঁরই হয়ত উপায় নেই।

এজন্য রবীন্দ্রনাথের গল্প ধরে টানটানি করতেও তাঁর আপত্তি নেই। যতই তাঁর নিজস্ব আইডিয়ায় টানটানি ঘটে গিয়ে থাকুক না কেন।

ছবিটি দেখার পরে তাই দুটি প্রশ্ন বড় হয়ে ওঠে—

—রবীন্দ্রনাথের ‘ক্ষুধিত পাষণ’ গল্পটি (রবি ঠাকুরের নয়) কি মৃণালবাবু আদৌ পড়েছেন?

—‘অন্তরীণ’ ছবিটা কি মৃণাল সেন নিজেকে দেখেছেন?

পুনশ্চ: লেখাটি অনেকদিন আগে লেখা হয়েছিল। এতদিনে মৃণালবাবু প্রকৃতই রিটার্নার করে এখন রাজ্যসভার M.P.। রাজ্যসভাটি আসলে একধরনের বুদ্ধাশ্রম। বিজ্ঞান, আরাম, সুখ, সুবিধে। ঐদের কথাও কেউ শোনে না, এঁরাও কারো ‘কথায়’ কান দেন না। ব্যবস্থাটা ভালো, নচেৎ উনি এখনো আবার ছবি করতে চাইতেন। তা থেকে বিধাতা আমাদের রক্ষা করুন।

পরিশেষে : বিধাতা আমাদের রক্ষা করেননি। রাজ্যসভার বনবাস খেয়ে বেরিয়ে এসে আবার ছবি করছেন সেন মহাশয়। সেন মহাশয়ের সঙ্গে প্রীতিপ্রদ, কিন্তু ইনসেন মহাশয়ের সন্দেহ তা নয়। কারো কারো আশিতে বৃদ্ধি খোলে না। সে কথা আমরা জানি।

তবে একটা বাঁচোয়া। মৃণাল সেনের অনেক ছবির মতো অন্তরী-কমার্শিয়াল রিলিজ হয়নি। ছবিটি দেখতে পাননি বহুজন। বহুজন সুখ-হিতায় চ। এইটাই।

বিনামূল্যে দেওয়াল-ঘড়ি

শেষ সুযোগ

৩১শে জুলাই ২০০৩



হ্যাঁ, ওইদিন পত্রপাঠের ঘড়ির বারোটাই বেজে যাচ্ছে। মানে ওইদিনের পর গ্রাহক হলে আর ঘড়ি উপহার পাওয়া যাবে না।

সশরীরে আসা সম্ভব না হলে আগামী এক বছরের চাঁদা বাবদ ১২০ টাকার চেক (শুধুমাত্র কলকাতা এলাকার জন্য) অথবা ড্রাফট বা মানি অর্ডার (কলকাতা ছাড়া অন্য এলাকা) ওই তারিখের মধ্যে পাঠিয়ে দিন।

আপনার ঘড়ি অবশ্যই সুরক্ষিত থাকবে। পরে আপনার সুবিধামতো এসে নিয়ে যাবেন।



চেক বা ড্রাফট এই নামে হবে— *PATRAPATH*

পত্রপাঠ, ১০ জে ফার্ম রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৯

ফোন: ২৪৪০ ৩৮০৩, ৯৮৩০০ ৫২১৮২

শানিবারের ডিঙি

অচলপত্র

সাঁচিল ভারত

এয়া কেউ আর নেই

আছে শুধু এদের একমাত্র উত্তরসূরী
সাদাকে সাদা ও কালোকে কালো বলার একমাত্র সহর্ষ মাসিকপত্র

পট্রপাঠ

কাউকে হাসানোর কাগজ কাউকে ফাঁসানোর কাগজ

১০ জে ফার্ন রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৯

ফোন: ২৪৪০ ৩৮০৩

৯৮৩০০৫২১৮২